বহু হাইকোর্টের জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার, রাজা, মহারাজা, নবাব হইতে সর্ব্বোচ্চ প্রশংসিত
ভারতের অদ্বিতীয় নষ্ট-কোষ্ঠীউদ্ধারক
প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী
পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার জ্যোতির্ভূষণ, এফ্, টি, এস্
(১০৫ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কালীবাড়া, কলিকাতা)
মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজ জীবনের বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ অভ্রান্তরূপে জানিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন।
!! অত্যাশ্চর্য্য কবচ সমুহ !!
বিফলে মূল্য ফেরৎ।
গ্যারান্টি দেওয়া হয়।
নবগ্রহ কবচ
—ইহা ধারণে কুপিত সমস্ত গ্রহ তুষ্ট হইয়া অল্পকাল মধ্যে ধন, মান, যশ, সৌভাগ্য, মানসিক শান্তি, চাকুরী-প্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, পরীক্ষায় পাশ এবং সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার অশান্তি দূর করিতে অব্যর্থ মূল্য—৪।০, সহস্রগুণ শক্তি-সম্পন্ন সত্বর ফলদায়ক মূল্য—১৭৷/০, সূর্য্য-কবচ—সর্ব্বপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভে শ্রেষ্ঠ কবচ মূল্য—৫৷/০ সহস্রগুণ শক্তি-সম্পন্ন মূল্য—১৫৷/০, ইহা ছাড়া বহু কবচ আছে, সফলতা সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রশংসাপত্র আছে।
সম্পাদক—
হেড অফিস—১০৫ নং গ্রেষ্ট্রীট, শোভাবাজার, কলিকাতা, ফোন, বঃ বঃ ৩৬৮৫
ব্রাঞ্চ অফিস—৪৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
ফোন, কালঃ ০৮৫১
কলিকাতা
১৪৪।৩, হ্যারিসন রোড,
ফোন, বঃ বঃ ২৬৮৩

কি ছিলাম—
কী হয়েছি!
স্বরবল্লী কষায়
খেলে মন সদাই
প্রফুল্ল থাকে।
সকল
ডাক্তারখানায়
পাওয়া যায়।
সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিঃ,
২৯, কলুটোলা, কলিকাতা।
ADM
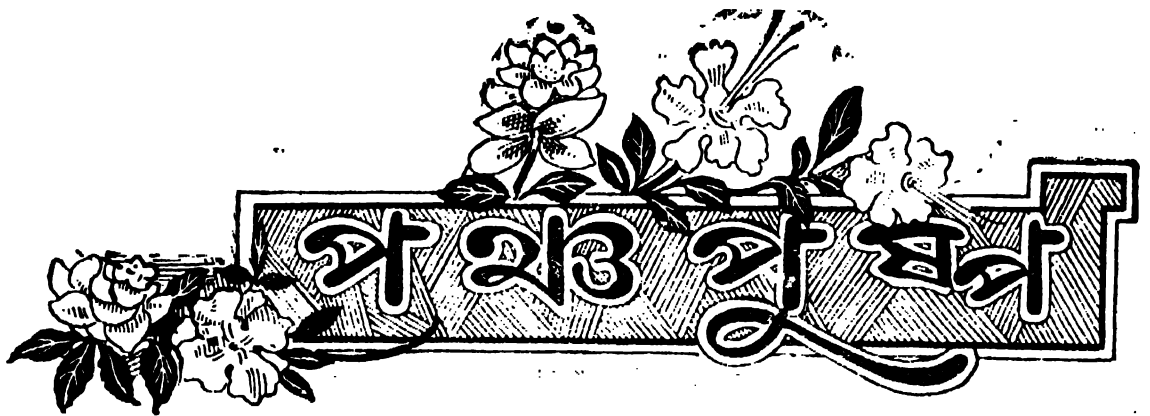
সচিত্র মাসিক পত্র

চতুর্থ বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক—চৈত্র ১৩৩৮

সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

—পঞ্চপুষ্প কার্য্যালয়—

৩১, তেলীপাড়া লেন, কলিকাতা

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বর্ণানুক্রমিক চিত্র-সূচী

নিবেদন

পঞ্চপুষ্পের বর্ত্তমান নিয়মানুসারে পত্রিকাখানি প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে প্রকাশিত হয়। তাহার পর পুলিস-কোর্টে নূতন প্রেস ডিক্লারেশনের জন্য কয়েকদিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে প্রতিমাসের প্রথম তারিখে পত্রিকাখানি বাহির করিবার বন্দোবস্ত স্থির হওয়ায় আমরা ১৩৩৯ সালের আষাঢ় মাস হইতে পঞ্চমবর্ষ আরম্ভ করিতেছি। পঞ্চমবর্ষের প্রথম সংখ্যা পয়লা আষাঢ় (১৩৩৯) বাহির হইবে। আশা করি গ্রাহকগণ আমাদের ত্রুটি ক্ষমা করিয়া পঞ্চমবর্ষেও গ্রাহক থাকিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

ভিঃ পিতে বৃথা কিছু পয়সা নষ্ট হয়। ২৫এ জৈষ্ঠের মধ্যে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া পঞ্চমবর্ষের মূল্য পাঠাইবেন। ইহাতে উভয়েরই সুবিধা। যাঁহারা টাকা ঐ তারিখের মধ্যে পাঠাইবেন না তাঁহাদিগের নামে আমরা আষাঢ় সংখ্যা ভিঃ পিঃ করিব। যাঁহারা গ্রাহক থাকিবেন না তাহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্রদ্বারা জানাইবেন। নতুবা আমাদিগকে বৃথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

JUNO PRINTING WORKS—CALCUTTA.
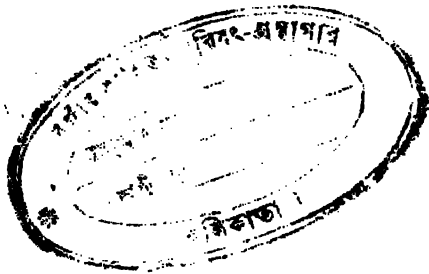
দ্বিতীয়ার্দ্ধ | চতুর্থ বর্ষ, ১৩৩৮ | প্রথম দ্বিতীয় সংখ্যা

হরপ্রসাদ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের বাল্যকালে আমরা একটি নূতন যুগের অবতারণা দেখেছি। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় বিচার-পদ্ধতির সম্মিলনে এই যুগের আবির্ভাব। অক্ষয়-কুমার দত্তের মধ্যে তার প্রথম সূত্রপাত দিয়েছিল। তারপরে তার পরিণতি দেখেছি রাজেন্দ্রলাল মিত্রে। সেদিন এসিয়াটিক সোসাইটির প্রযত্নে প্রাচীনকাল থেকে আহরিত সাহিত্য এবং পুরাবৃত্তের উপকরণ অনেক জমে উঠেছিল। সেই সকল অসংশ্লিষ্ট উপাদানের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সত্যকে উদ্ধার করবার কাজে রাজেন্দ্রলাল অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। প্রধানত ইংরেজী ভাষায় ও য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে তাঁর মন মানুষ হয়েছিল; পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর রচনা ইংরেজী ভাষাতেই প্রকাশ হোত। কিন্তু আধুনিক কালের বিদ্যাধারার জন্যে বাংলা ভাষার মধ্যে খাত খনন করার কাজে তিনি প্রধান অগ্রণী ছিলেন, তাঁর দ্বারা প্রকাশিত বিবিধার্থ-সংগ্রহ তার প্রমাণ। তাঁর লিখিত বাংলা ছিল স্বচ্ছ প্রাঞ্জল নিরলঙ্কার।
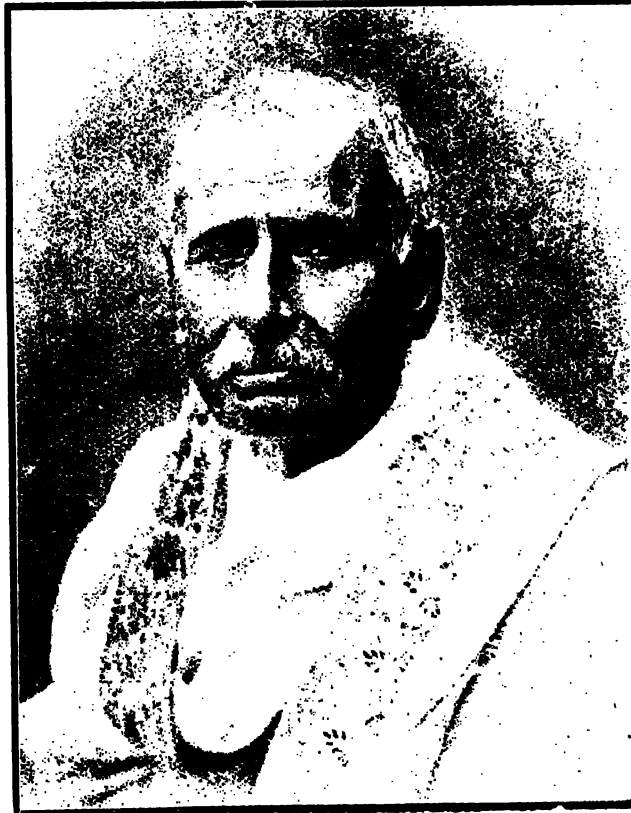
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সে অনেক দিনের কথা। সেদিন একদা পূজনীয় অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের মাণিকতলার বাড়িতে কী উপলক্ষ্যে, গিয়েছিলুম সেটা উল্লেখযোগ্য। বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বেঁধে দেবার উদ্দেশ্যে তখনকার দিনের প্রধান লেখকদের নিয়ে একটি সমিতি স্থাপনের

সঙ্কল্প মনে ছিল। তাতে বঙ্কিমচন্দ্রকেও টেনেছিলুম। বিদ্যাসাগরের কাছেও সাহস করে যাওয়া গেল। তিনি বললেন, তোমাদের উদ্দেশ্য ভালো সন্দেহ নেই কিন্তু যদি সাধন করতে চাও তা হলে আমাদের মতো "হোমরা-চোমরা" কখনই নিয়োনা, আমরা কিছুতে মিলতে পারি না। তাঁর কথা কতক অংশে খাটল, হোমরাচোমরার দল কিছুই করেননি। যত্নের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেছিলেন একমাত্র রাজেন্দ্রলাল। সমিতির প্রত্যেকের কাছে ফেরি করিয়ে নেবার জন্যে তিনি ভৌগোলিক পরিভাষার একটি খসড়া লিখে দিলেন। অনেক চেষ্টা করলুম সকলকে জোট করতে, মিলিয়ে কাজ করতে, তখনকার দিনের লেখকদের নিয়ে সাহিত্য-পরিষদ্ খাড়া করে তুলতে—পারিনি, হয়তো নিজেরই অক্ষমতাবশত। তখন বয়স এত অল্প ছিল যে অনেক চেষ্টায় যাঁদের টেনেও ছিলুম তাঁদের কাজে লাগাতে পারলুম না।

আজ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদের মৃত্যু উপলক্ষ্যে শোকসভায় রাজেন্দ্রলালের উল্লেখ করবার কারণ এই যে আমার মনে এই দুজনের চরিতচিত্র মিলিত হয়ে আছে। হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে একত্রে কাজ করেছিলেন। আমি তাঁদের উভয়ের মধ্যে একটি গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা,—যে কোনো বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল তার জটিল গ্রন্থি-গুলি অনায়াসেই মোচন করে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধন-প্রণালী সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষলাভ করেছিল। অনেক পণ্ডিত আছেন তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না; তাঁরা খনি থেকে তোলা ধাতুপিণ্ডটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক করতে শেখেননি বলেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারী করেন। হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কার-মুক্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে শিখেছিল। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর ছিল না। ভূয়োদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এই তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে স্বচ্ছ ভাষায় প্রকাশের শক্তি আজো আমাদের দেশে বিরল। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই এইটেই আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই, অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশি মার্কা পাবার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে এবং তাঁর ছিল দর্শনশক্তি।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য-পরিষদে হরপ্রসাদ অনেকদিন ধরে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্র-লালের সহযোগিতায় এসিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাভাণ্ডারে নিজের বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা করেছিলেন সাহিত্য-পরিষদকে তারই পরিণত ফল দিয়ে এতকাল সতেজ করে রেখেছিলেন। এমন সর্ব্বাঙ্গীন সুযোগ পরিষৎ আর কি কখনো পাবে? যাদের কাছ থেকে দুর্লভ দান আমরা পেয়ে থাকি কোনো মতে মনে করতে পারিনে যে, বিধাতার দাক্ষিণ্যবাহী তাঁদের বাহুকে মৃত্যু কোনোদিনই নিশ্চেষ্ট করতে পারে। সেই জন্যে যে বয়সেই তাঁদের মৃত্যু হোক দেশ অকাল মৃত্যুর শোক পায়, তার কারণ আলোক নির্ব্বাণের মুহূর্ত্তে পরবর্ত্তীদের মধ্যে তাঁদের জীবনের অনুবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায় না। তবু বেদনার মধ্যেও মনে আশা রাখতে হবে যে, আজ যাঁর স্থান শূন্য, একদা যে আসন তিনি অধিকার করেছিলেন সেই আসনেরই মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে গেছেন এবং অতীতকালকে যিনি ধন্য করেছেন ভাবী-কালকেও তিনি অলক্ষ্যভাবে চরিতার্থ করবেন। *

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শোক-সভায় পঠিত।

জ্ঞানসিন্ধু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

নম প্রশান্ত জ্ঞানের সিন্ধু,
বক্ষে ভারত-কথার মণি,
মণি অপরূপ, মণি উজ্জ্বল,
ইতিহাস-মণি, কত বা গণি !
সিন্ধু, তোমার বেলায় দাঁড়ায়ে
হেরিছে ভারত বিশাল কত,
হেরিছে আর্য্যকীর্ত্তি-কাহিনী
কিবা সীমাহীন, কি উন্নত !

তব তরঙ্গ-ভঙ্গে নিয়ত
অতীত ভারত কল্লোলিয়া
হ'ল জাগ্রত, হ'ল বেগবান্,
পূরাল মোদের শূন্য হিয়া।
তোমারি মাঝারে মণি খুঁজিবারে
ছুটেছি আমরা ক্ষুদ্র দীর্ণ,
হে সাগর, তুমি ছিলে অধৃষ্য,
অভিগম্যও, ছিলে না হীন।

প্রণাম তোমারে, হে কবি-কোবিদ,
হে কালিদাসের ভাবের জ্ঞাতা,
কালিদাস-রস-রসিক মহান্,
কালিদাস-রূপ চিত্র-দাতা !
কালিদাস ছিল বিরাট্ শিল্পী,
গুণী অপরূপ, স্রষ্টা অতুল,
রূপকার সে যে জোড়া মেলা ভার,
ভাতিছে ভারতী-চরণে রাতুল।
সেই কালিদাসে বুঝিলে বুঝালে
আজীবন তুমি কি অনুরাগে ;
বাঙ্গালী কখনও ভুলিবে না তাহা,
রাখিবে তোমারে চিত্তভাগে।

প্রণাম তোমারে ওহে বঙ্কিম-
পথের পথিক, স্রষ্টা-সাথী,
হেরেছ উদিতে সে মহাসূর্য্যে
ভেদিয়া দেশের নিবিড় রাতি।

ওহে বঙ্কিম-শিষ্য মহান,
তাঁহার স্মৃতির বাহক তুমি,
তব ব্যাখ্যায় সেই বঙ্কিমে
উজলি' ভুলালে বঙ্গভূমি !

*　　*

জ্ঞানের সিন্ধু, প্রণাম তোমারে,
ইতিহাসকারী তোমারে নমি ;
কালিদাস-সেবী তোমারে প্রণাম,
নম বঙ্কিম-শিষ্য, শর্মী।

স্মৃতি-তর্পণ

স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বাঙ্গালার নাম করিবার লোকের অভাব ক্রমশঃ অতি দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে। এক এক মহারথের পতন হইতেছে, আর উৎকণ্ঠ উদ্‌গ্রীব বাঙ্গালা কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'ইহার স্থান কে লইবে ?' ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে এই একই প্রশ্ন সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত উত্থিত হইতেছে, কিন্তু সদুত্তর [illegible]।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অকস্মাৎ তিরোধানে এ প্রশ্ন আবার উঠিয়াছে। সদুত্তর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্লভ।

সংস্কৃত, পালি, বাঙ্গালা, প্রাকৃত ইংরেজী সকল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই তুল্য-যশস্বী তুল্য-কৃতী তুল্য-অধ্যবসায়ী হরপ্রসাদের [illegible] কে লইবে ?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক চক্রান্ত-কুহকের জালে শাস্ত্রী মহাশয়ের যশোভাতি কিছুদিন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত ম্লান হইয়াছিল। সে ম্লানতা দূর করিয়া তাঁহাকে স্ব-ক্ষেত্রে ও স্ব-গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিতম্মন্য পুঙ্গব সদর্পে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, হরপ্রসাদ পালির জানে কি ? প্রশ্নের এই অচিন্ত্যনীয় আস্পর্দ্ধাটাই প্রশ্নের উত্তর হইয়াছিল। তাঁহার পালি জানা না থাকিলে কিছুই জানা ছিল না। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় এ প্রশ্নের আংশিক উত্তর দিয়া তাঁহাকে শীর্ষস্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। ৭৯ বৎসর বয়সে মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তাঁহার দেহ সুস্থ ও সবল ছিল। শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে তাঁহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেওয়াতেও কর্ম্মের শিথিলতা শেষ পর্য্যন্ত প্রদর্শিত করেন নাই। রাত্রি ১১টায় মৃত্যু হয়। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সকল জ্ঞানের সহিত শাস্ত্র, সাহিত্য ও সাংসারিক আলোচনা করিয়াছিলেন। চুল পাকে নাই, দাঁত পড়ে নাই, গাল বসে নাই। কেবল ভাঙ্গা কোমরের অনুরোধে কখনও ঠেলাগাড়ী, কখনও বগলে করা লাঠির সাহায্যে কর্ম্মবীর হরপ্রসাদ শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মজীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন, পরিতাপের বিষয় তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তে পুত্রকন্যা কেহ উপস্থিত ছিল না। তিনি একাই থাকিতেন, একাই ভাবিতেন, একাই কাজ করিতেন।

পুনঃ প্রশ্ন এই—এখন সে কাজের বাকী অংশটুকু করিবে কে। সে অংশ অতি গুরু, অতি বিশাল, অতি দায়িত্বপূর্ণ। সে অংশ অসংখ্য সূচিপত্র সংগ্রহ।

তাঁহার ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। তাঁহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারে এমন শিষ্য প্রশিষ্য দুর্ভাগ্যক্রমে প্রস্তুত হয় নাই যে, তাঁহারা তাঁহার এই গুরুভার গ্রহণ করিতে পারে। কে জানে সে সম্বন্ধে কতদূর সুবিধা হইবে। যদি এই অপূর্ব্ব সম্ভারের যথেষ্ট ব্যবহার সম্ভব না হয় তবে তাহা বাঙ্গালার চরম দুর্ভাগ্য।

প্রিন্সিপাল প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় উদ্যোগী মনীষীগণের প্রাথমিক প্রেরণায় হরপ্রসাদ সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ন এবং অচিরে যশোমাল্যে ভূষিত হ'ন।

আমি শাস্ত্রী মহাশয়কে বাল্যকাল হইতেই জানিতাম। তিনি জ্যেষ্ঠতাত প্রিন্সিপ্যাল প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর সত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর সতীর্থ ছিলেন। বলিতে গেলে আমাদের মধ্যে কেবল পাক পৈতার প্রভেদ ছিল। সর্ব্বদা আমাদের বৌবাজার ৫৩ নম্বর বাটীতে আসিতেন ও থাকিতেন। এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, রামতনু লাহিড়ী, তারকনাথ পালিত, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষীগণের সহিত মেলামেশার অবকাশ ছিল এবং সাহিত্যিক আলোচনার যথেষ্ট অবসর ঘটিত। সম্প্রতি

সংস্কৃত কলেজের সুযোগ্য নবীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের চেষ্টায় কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংবর্দ্ধনার জন্য এক সভার অধিবেশন হয়। অভিনন্দনের উত্তরে কবি বলিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত কলেজে তাঁহার সে অভিনন্দনের সার্থকতা তিনি সম্যক্ বুঝিতে পারেন না; কারণ, সংস্কৃত কলেজের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের মৌলিক সম্বন্ধ তাঁহার অজ্ঞাত। এ ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য সম্যক্ উত্তর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এতদুপলক্ষে আরও অনেক নাম করা যাইতে পারে, যথা —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী (প্রথম বৈজ্ঞানিক পরিভাষা), রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী (প্রথম শাসনতন্ত্র সম্পর্কীয় গ্রন্থ), দ্বারিকা নাথ বিদ্যাভূষণ, রাম নারায়ণ তর্করত্ন (নাটক), গিরিশ চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, হরিনাথ ন্যায়রত্ন-কাব্যভূষণ, তারাশঙ্কর তর্করত্ন (কাদম্বরী), তারাকুমার কবিরত্ন, রজনীকান্ত গুপ্ত, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, (অর্থনীতি), শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় (ভূগোল), ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত, কালীধন চট্টোপাধ্যায় (ভূগোল), স্বয়ং ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মধুসূদন বাচস্পতি (বসন্তসেনা), কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামকমল ভট্টাচার্য্য, রামগতি ন্যায়রত্ন, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, তারণীচরণ চট্টোপাধ্যায় (ভূগোল), রায়বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার, খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য চূণীলাল বসু, জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, উমেশচন্দ্র গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ ও এসিয়াটিক সোসাইটী শাস্ত্রী মহশেয়ের নিকট কত ঋণী তাহার বর্ণনা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। গত পূজাবকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে এসিয়াটিক সোসাইটীর মাসিক অধিবেশনে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার শেষ দেখা হয়। পুরী মন্দির-ভিত্তি-সংলগ্ন আবিষ্কৃত এক প্রস্তরফলকের উৎকীর্ণ লিপির সম্বন্ধে তিনি গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক সন্দর্ভ পাঠ করেন। Walshএর History of Murshidabad ও শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজ গবেষণা-ফলের, সর্ব্বাধিকারী বংশের সহিত উড়িষ্যা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দির সংস্কার ও সংরক্ষণ-সংক্রান্ত অনেক প্রয়োজনীয় এবং আংশিক অজ্ঞাত তথ্যের উল্লেখ করিয়া তিনি আমাদিগকে চিরস্মরণীয় করেন।

রাধানগরের অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিরূপে তিনি এই সকল তথ্যের অনেক বিবৃতি করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ চিরদিন নবদ্বীপ ও ভট্টপল্লীর সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বিখ্যাত একথা শাস্ত্রী মহাশয় স্বীকার ও বিবৃতি করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের বংশের অনেকে এখানে গুরুগিরি করিয়াছেন। সেজন্য আমাদের প্রতি শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ আকর্ষণ চিরদিন ছিল।

এই সকল আত্মীয়তা ও আকর্ষণের কথা আজ মনে পড়িতেছে; স্বজন হারাইয়া আমরা মুহ্যমান।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝখানে, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, হরপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ আধুনিক বাঙ্গালার ইতিহাসের সত্যযুগ। জাতীয় জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রের সকল বিভাগেই তখন সব মহারথী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভারতের অন্যান্য দেশের লোকেরা তখন বাঙ্গালার নেতাদের অনুসরণ করিত, বাঙ্গালীর অনুকরণ করিত। বাঙ্গালার সেকাল আর এখন নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেকালের দুইজন

মহাপ্রস্থানে হরপ্রসাদ

মহারথীর সহযোগীরূপে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন; বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে; এবং এই দুই জন মহারথীর মত সারা জীবন একাগ্রতার সহিত অবিশ্রান্ত কাজ করিয়া অনেক স্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙ্গালার সে কালের আর এ কালের মধ্যে একটা বন্ধন-সূত্র ছিলেন। এতদিনে সেই সূত্র ছিন্ন হইল।

বঙ্গদর্শন

হরপ্রসাদ যখন ইংরাজী স্কুলের বঙ্গদর্শন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার গ্রামবাসী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "বঙ্গদর্শন" নামক মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক বৎসর পরে "বঙ্গদর্শন" কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে ছাপা হইয়া বাহির হইতে লাগিল। হরপ্রসাদ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বি-এ, পড়িবার সময় মহারাজ হোলকারের প্রদত্ত পুরস্কার পাইবার জন্য "ভারতমহিলা" রচনা করিয়াছিলেন। বি-এ পাশ হওয়ার পর ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে "ভারতমহিলার" প্রথমাংশের কাপি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে দিয়া আসেন। ভারতমহিলার ১২৮২ সালের চতুর্থ খণ্ড "বঙ্গদর্শনে"র শেষ তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। এই সূত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গের মধ্যে গণ্য হইলেন এবং নিয়মমত "বঙ্গদর্শনে" লেখা দিতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তৎকালে তাঁহার কিরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ছিল

তাহা ১২৮৫ (১৮৭৯) সালের পৌষ সংখ্যার "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত "বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি" নামক প্রবন্ধে দেখা যায়। এই প্রবন্ধটি যে শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনা তাহা তিনি 'নারায়ণ'*পত্রে লিখিয়া গিয়াছেন। এই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে, কালিদাস, বায়রণ, বঙ্কিমচন্দ্র এই তিন জন কবির কাব্য তখন শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণের মন অধিকার করিয়াছিল। এই তিন জন কবির কাব্য হইতে কি প্রকার নীতি শিক্ষা করা যায়, প্রবন্ধে তাহা সুন্দর করিয়া বুঝান হইয়াছে। তখন বঙ্কিমচন্দ্রও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনা যে কিরূপ আদর করিতেন তাহা ১২৮৮ (১৮৮১) সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত "বাল্মীকির জয়" সমালোচনায় দেখা যায়। এই সমালোচনার উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন —

"যেমন কল্পনা, তেমন বর্ণনা। বর্ণনার আমরা অনেক পরিচয় দিয়াছি। ভাষা সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু আমরা এই গ্রন্থের বাঙ্গালাকে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বলি।......গ্রন্থখান অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষার একটি উজ্জ্বলতম রত্ন।"

রাজা রাজেন্দ্রলালের সাহচর্য্য

১২৮৮ (১৮৮১) সালে বঙ্গদর্শন বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পূর্ব্বেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অনুরোধে গোপালতাপনী উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল তখন নেপাল হইতে হজ্‌সন সাহেবের আনা সংস্কৃত বৌদ্ধ পুথিরাশি অবলম্বনে Sanskrit Budhist Literature of Nepal লিখিতেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল সহকারী পণ্ডিতের সহায়তায় সংস্কৃতে পুথিগুলির সারকথা সংগ্রহ করিতেছিলেন এবং নিজে সেই সারকথার ইংরেজী অনুবাদ করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি খুব পীড়িত হইয়া পড়িলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনেকগুলি সংস্কৃত সংক্ষিপ্ত সারের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। এই জন্য ১৮৮২ সালে প্রকাশিত Sanskrit Buddhist Literature of Nepal এর মুখবন্ধে রাজেন্দ্রলাল শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট নিজের ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন হইতে আসিতেছেন

সেই সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলালের একটা নিয়ত কর্ম্ম ছিল সরকারের পক্ষ হইতে ভ্রমণশীল পণ্ডিতদের দ্বারা মফঃস্বলে সংস্কৃত পুথির খোজ করা। সেই সকল পুথির বিবরণ সঙ্কলন করা, এবং বাছা বাছা পুথি খরিদ করা। এই কার্য্যে পরিচয় স্বরূপ প্রতি বৎসর তিনি এক এক সংখ্যা সংস্কৃত পুথির বিবরণ, Notices of Sanskrit Mss. বাহির করিতেন। এইরূপে ১৮৮৮ সাল পর্য্যন্ত রাজেন্দ্রলাল নয় খণ্ডে বিভক্ত ২৩ সংখ্যা পুথির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দশম খণ্ড পুথির বিবরণ লেখার সময় তিনি শেষ রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং এই কার্য্যের কতকটা ভার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপর দিলেন। দশমখণ্ড পুথি-পরিচয়ের মুখবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

'The Raja was in charge of operations (search for Sanskrit Mss) up to the 26th July, 1891, the date of his death. During his last protracted illness he asked me to prepare the English summaries of his notices, which I did to the best of my power with the object of assisting, while the entire management of the work

* নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩২২, ৫২১ পৃঃ

was kept in his hands, and he passed final orders for the press."

সংস্কৃত পুথির বিবরণ ও ক্যাটলগ

রাজা রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরই এসিয়াটিক সোসাইটীর কৌন্সিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপর সংস্কৃত পুথি খোঁজার, পুথি খরিদের এবং পুথির বিবরণ প্রকাশের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। এই ভার প্রাপ্ত হইয়া ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রী মহাশয় চারিখণ্ড Notices of Sanskrit Mss প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৭ সালে, ১৮৯৮—৯৯ সালে এবং আবার ১৯০৭ সালে শাস্ত্রী মহাশয় পুথি পরীক্ষার এবং পুথি খরিদের জন্য বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক নেপালে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নেপালে কাজের ফল নেপাল দরবার-লাইব্রেরীর দুইখণ্ড ক্যাটালগে নিবদ্ধ হইয়াছে।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর লওয়ার পর, ১৯০৯ সালে শাস্ত্রী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর নিকট প্রস্তাব করেন যে, তিনি এখন সরকারী পুথিপুঞ্জের বিস্তৃত ক্যাটালগ Descriptive Catalogue সঙ্কলন করিতে প্রস্তুত আছেন। সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তদুপযোগী ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় এবং তাঁহার সহযোগী পণ্ডিতেরা ক্যাটালগের কাজে ব্যস্ত হওয়ায় পুথি খোঁজা এবং পুথি খরিদ ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সরকারের পুথির ভাণ্ডারে তখন ১১,২৬৪ খানি পুথি জমা হইয়াছিল। তন্মধ্যে রাজা রাজেন্দ্রলাল খরিদ করিয়া গিয়াছিলেন ৩১০৬ খানি, এবং অবশিষ্ট ৮১০৮ খানি শাস্ত্রী মহাশয় খরিদ করিয়াছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন ১২ খণ্ডে ক্যাটালগ সম্পূর্ণ করিবেন; তন্মধ্যে বৌদ্ধ-সাহিত্য, বৈদিক-সাহিত্য, স্মৃতি, ইতিহাস ও ভূগোল, পুরাণ এবং ব্যাকরণ ও অলঙ্কার এই ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই ক্যাটালগের কয়েকখণ্ডের মুখবন্ধে (Preface) সংস্কৃত সাহিত্যের সেই সেই বিভাগের ইতিহাস একরকম ঢালিয়া সাজা হইয়াছে। স্মৃতিখণ্ডের এইরূপ মুখবন্ধ ৭৪ পৃষ্ঠাব্যাপী; পুরাণখণ্ডের মুখবন্ধ ২২৭ পৃষ্ঠাব্যাপী; ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-খণ্ডের মুখবন্ধ ৩৩১ পৃষ্ঠাব্যাপী। কাব্যখণ্ডের ক্যাটালগ ছাপা হইতেছিল, এবং তাহার মুখবন্ধের কতকাংশ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর সেক্রেটারী ভ্যান মেনেন সাহেবের নিকট শুনিয়াছি, শাস্ত্রী মহাশয় দর্শন-খণ্ডের এবং তন্ত্রখণ্ডের বিশেষতঃ তন্ত্রখণ্ডের মুখবন্ধ লিখিয়া যাইবার জন্য বড়ই ব্যগ্র ছিলেন। ১৯৩০ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে লিখিত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার-খণ্ডের মুখবন্ধের উপসংহারের এই কয়টি কথায় ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা সূচিত হইয়াছে—

"My acknowledgements are further due to Dr. Upendra Nath Brahmachari, the late, and Lt. Col. R. B. S. Seymour Sewell, the present, President of the Society, who showed great anxiety to enable me to finish the entire work within my life-time, which is drawing to a close."

এই সদানন্দ, অজরামরবৎ বিদ্যাচিন্তক পুরুষ কেন যে বৎসরাধিক পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, "My life-time, which is rapidly drawing to a close," তাহা অনুমান করা কঠিন। Notices এবং ক্যাটালগ ছাড়া শাস্ত্রী মহাশয় এসিয়াটীক সোসাইটির জার্ণেলে অনেক প্রবন্ধ ছাপাইয়াছেন, বিহার ও উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটীর জার্ণেলে অনেক প্রবন্ধ ছাপাইয়াছেন এবং নেপাল হইতে সংগৃহীত সংস্কৃত পুথির মধ্যে অশ্বঘোষের "সৌন্দরানন্দ কাব্য," আর্য্যদেবের "চতুঃশতিকা, বাঙ্গালীর হিসাবে তাঁহার প্রধান আবিষ্কার, সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" কাব্য এসিয়াটিক সোসাইটীর যোগে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্

এসিয়াটিক সোসাইটির নিকট হইতে সংস্কৃত পুথি খুঁজিবার ভার পাইবার পূর্ব্বেই, ১৮৮৬ সালের আরম্ভে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরীতে শাস্ত্রী মহাশয় অনেক ছাপা প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাইলেন, এবং যখন সংস্কৃত পুথি খোঁজার ভার পাইলেন তখন অধীনস্থ ভ্রমণকারী পণ্ডিতকে বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিবারও আদেশ দিলেন। ১৩০১ (১৮৯৫) সালের শ্রাবণ মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৩০৪ সাল হইতে ১৩০৯ সাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী

সভাপতি ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল ১০ বৎসর পরে ১৮১৮ সালে যখন তিনি পুনরায় সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। শাস্ত্রী মহাশয় ১৩২০ (১৯১৪) সালে কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সভাপতি-রূপে তিনি যে সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন তাহাতে এতকাল প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটিয়া তিনি নানা বিষয়ে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। সম্মিলনের অধিবেশনের কয়েক মাস পরে, সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের সভাপতি এবং পর বৎসরের আরম্ভে সাহিত্যসম্মিলনের বর্দ্ধমানের অধিবেশনে প্রধান সভাপতি এবং সাহিত্য-শাখার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৩২০ সালের শুরু হইতে আর সেদিন তাঁহার তিরোভাব পর্য্যন্ত এই ১৯ বৎসর কাল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কাণ্ডারী এবং তথ্যসম্বল সাহিত্যরাজ্যের একপ্রকার রাজা ছিলেন। এ সময় নানা বিষয়ের অনেক রচনা প্রকাশ করিয়া তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্পদ বাড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি গল্প লিখিয়াছেন, কালিদাসের কাব্যের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস লিখিয়াছেন, অনেক মহাজনের চরিতকথা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মুখ্য কাজ ছিল বাঙ্গালার প্রাচীন ভাষা, বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য এবং বাঙ্গালার প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস লইয়া। এই প্রস্তাবে তাঁহার এই সকল কাজের কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

বৌদ্ধগান ও দোহা

বাঙ্গালার প্রাচীন ভাষার এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রধান কীর্ত্তি সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলীর সামিলে ১৩২৩ সালে প্রকাশিত "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামক সুবৃহৎ নিবন্ধ। ১৮৯৮-৯৯ সালে নেপালে পুথি পরীক্ষার কালে শাস্ত্রী মহাশয় এবং বেণ্ডল সাহেব একপ্রকার অপরিচিত প্রাকৃত ভাষায় রচিত অনেক কবিতা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এইরূপ কতকগুলি কবিতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত টীকাও ছিল।

বেণ্ডল সাহেব বিলাতে ফিরিয়া গিয়া অনেক গুলি কবিতার আবার তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদও পাইলেন। এই টীকা ও অনুবাদের সাহায্যে "সুভাষিত সংগ্রহ" নামক তান্ত্রিক নিবন্ধে যে ২৮টী প্রাকৃত কবিতা আছে বেণ্ডল সাহেব তাহা ইংরেজী অনুবাদসহ প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় "বৌদ্ধগান ও দোহা"র প্রাচীন সংস্কৃত টীকাসহ "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়," সরোজ বজ্রের "দোহাকোষ," কাহ্নুপাদের "দোহাকোষ" এবং "ডাকার্ণব" প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষা এবং মর্ম্ম দুই ইতিহাসের হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। বৌদ্ধগান ও দোহার ভাষা-সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের শেষ সিদ্ধান্ত এইরূপ—

> 'লুই বাঙ্গালী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাঁহার চেলা'ও অনেকে বাঙ্গালী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইকালে বাঙ্গালা দেশে চলিত ভাষায় গান লেখা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে ভাষাকে বৌদ্ধ প্রাকৃতই বল, প্রাকৃতই বল, অপভ্রংশই বল, আর যাই বল; ওটা ত নাম দেওয়া মাত্র। আমি না হয়, বাঙ্গলা দেশের ভাষাকে বাঙ্গালা নাম দিলাম, তাহাতেই বা দোষ কি?"

ডাক্তার মহম্মদ সহিদুল্লা "বৌদ্ধগান ও দোহা"র অন্তর্গত দোহাকোষ দুইখানি তিব্বতীয় ভাষার অনুবাদের সহিত মিলাইয়া ফরাসী অনুবাদের সহিত মিলাইয়া ফরাসী অনুবাদের সহিত পুনঃ প্রচারিত করিয়াছেন। এই প্রাচীন দোহা ও গানগুলি ইতিহাসের আকররূপে ব্যবহার করিবার পক্ষে সুবিধা এই ইহাদের তিব্বতী অনুবাদের সময় এবং যে অক্ষরে এই সকল কবিতা পুথিতে লেখা আছে আকার ধরিয়া তাহার সময় সহজে নিরূপণ করা যাইতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয় যখন ১৯২২ সালে চতুর্থবার নেপালে গিয়াছিলেন তখন আরও অনেক প্রাকৃত কবিতার সন্ধান পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে [illegible] খুঁজিয়া পাতিয়া এখন আর কে আনিয়া দিবে?

বিদ্যাপতির কীর্ত্তিলতা

"বৌদ্ধগান ও দোহা" ছাড়া বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২৯শ ভাগ, ৬৩ পৃঃ।

ইতিহাস উদ্ধার কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে এমন আর একখানি পুস্তক, কবি বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক মৈথিলী ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক কাব্য "কীর্ত্তিলতা" বঙ্গানুবাদসহ শাস্ত্রী মহাশয় "হৃষীকেশ সিরিজে" প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। নেপাল দরবার লাইব্রেরীর তিন শত বৎসরের পুরান একখানি পুথি হইতে "কীর্ত্তিলতা" ছাপা হইয়াছে।

চণ্ডীদাস ও কাশীরাম দাসের মহাভারত

হিন্দুদের একটা দস্তর এই, তাহারা যাঁহাদিগকে খুব ভক্তি করেন এমন মহাপুরুষ বা মহাজনকে দেবতা করিয়া তোলেন। ধর্ম্মোপদেষ্টা বা কর্ম্মবীর ত সরাসরি অবতার বলিয়া গণ্য হন। যাঁহারা গ্রন্থকার, তাঁহারা অবতার না হউন অপুরুষ হইয়া যান, অর্থাৎ তাঁহাদের রচনা অপৌরুষেয় বলিয়া গণ্য হয়। বাঙ্গলার তিন জন কবি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, এবং কাশীরাম দাসের রচনা এইরূপ অপৌরুষেয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের নামে যে সকল পদ চলে, কৃত্তিবাসের নামে যে রামায়ণ চলে, কাশীরাম দাসের নামে যে মহাভারত চলে উহা ঐ ঐ কবির মূল রচনা বলিয়া স্বীকার করা অসাধ্য। শিক্ষিত অথচ যাঁহাদের নামেরই এত মহিমা তাঁহাদের মূল রচনা উদ্ধারের ইচ্ছা স্বাভাবিক।

তাই সাহিত্য-পরিষদের স্থাপন অবধি চণ্ডীদাসের মূল পদাবলী এবং কৃত্তিবাসের মূল রামায়ণ উদ্ধারের খুব চেষ্টা চলিতেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার "চণ্ডিদাস" নামক প্রবন্ধে * চণ্ডিদাসের স্বরূপ সম্বন্ধে কয়েকটী মূল্যবান কথা বলিয়া গিয়াছেন।

সিঙ্গী গ্রাম নামক নদে জেলার একটি গ্রামে কাশীরামের ভিটা, কাশীরামের পাঠশালার আস্তানা, এবং কেশের দীঘি এখনও দেখান হয়। সেই গ্রামের লোকেরা কাশীরামের কাল-সম্বন্ধে যাহা বরাবর বলিয়া আসিতেছেন তাহা হইতে অনুমান হয়, তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। কাশীরাম-সম্বন্ধে সিঙ্গী গ্রামের জনশ্রুতি এ কালের সকল পণ্ডিতই এযাবৎ বিশ্বাস করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদে গিয়া হঠাৎ একদিন শুনিলেন যে, সেখানে ৯৮৫ সালে লেখা কাশীরামের মহাভারতের আদিপর্ব্বের একখানি পুথি আছে। সুদীর্ঘ ভূমিকাসহ আদিপর্ব্ব প্রকাশ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের একটা ফাঁকা জায়গা পূরণ করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালার সভ্যতার ইতিহাস

এই যে সকল এবং আরও হাজার হাজার পুথি শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি তাহাদের বিবরণ এবং তাহাদের মধ্যে খান কয়েক ছাপাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি এই সকল পুথি অবলম্বনে বাঙ্গলার সভ্যতার ইতিহাসেরও পত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস বলিতে সাধারণতঃ রাজাদের এবং রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারের বৃত্তান্ত বুঝায়। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" এক বিরাট আলোক স্তম্ভ! "রামচরিতে"র ভূমিকায় শাস্ত্রী মহাশয় পালরাজাদের ধারাবাহিক বিবরণ লিখিয়াছেন। শুনিয়াছি ইদানীং তিনি "রামচরিতে"র বাঙ্গলা অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষকালে তিনি মজবুত করিয়া ধরিয়াছিলেন বাঙ্গলার সভ্যতার ইতিহাসের দুইটি বিভাগ—জাতিভেদ এবং ধর্ম্মকর্ম্ম, বিশেষতঃ যে ধর্ম্মকর্ম্ম সমাজের নীচের থাক হইতে ক্রমশঃ উপরের থাকে উঠিয়াছে। এই ইতিহাসের সঙ্কলন কার্য্যে তাঁহার প্রধান উপজীব্য ছিল তন্ত্রশাস্ত্র। তাঁহার ক্যাটালগের তন্ত্রখণ্ডের মুখবন্ধে তিনি এই ইতিহাস খোলসা করিয়া লিখিবেন এইরূপ আশা করা গিয়াছিল। সেই আশা আর পূরণ হইবার নহে। সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি এই ইতিহাস-সম্বন্ধে তাঁহার গুটিকয়েক গুরুতর সিদ্ধান্তের আভাস দিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ ইহা লইয়াই আমাদিগকে তৃপ্ত থাকিতে হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আর একখানি পুথি ঐ অক্ষরে (গুপ্তাক্ষরের শেষ অবস্থায়) লেখা। এ খানির নাম 'কুলিকাম্নায়' বা 'কুব্জিকামত' ইহাতে ঈশ্বর দেবীকে বলিতেছেন,—

গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষে অধিকারায় সর্ব্বতঃ।
যাবন্নৈবাধিকারস্তে ন সঙ্গম স্তয়া সহ॥"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, তন্ত্র ভারতের বাহির হইতে

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৯ ভাগ, ১২৭-১৪৫ পৃঃ।

আসিয়াছে।...পুথি দুইখানিই অষ্টম শতকের শেষ ভাগের লেখা।

আমার বোধ হয়, খৃঃ ৭ ও ৮ শতকে যখন উম্মেদিয়া ও আব্বাসিয়া খলিফাগণ তুর্কীস্তানে আপনাদের আধিপত্য ও ইসলামধর্ম্ম বিস্তার করিতেছিলেন, তখন সেখানে নানা রকমের লোক-চলিত ধর্ম্ম ছিল। তাঁহারা সে সকল ধর্ম্ম নষ্ট করায় তাহাদের পুরোহিতেরা পলাইয়া ভারতে আসেন; তাহারাই তন্ত্র এ দেশে প্রচার করেন।......

* * *

বৌদ্ধেরা তখন প্রবল; উহারা সেই তন্ত্র লইয়া আপনাদের প্রচারকার্য্যে নিয়োগ করে। ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মপ্রচার করিবেন না, তাঁহারা লন নাই। শৈব ও বৈষ্ণবেরা প্রচার করে, উহারাও লইয়াছিল [বাঙ্গালায় শৈব ও "পঞ্চরাত্র" নামক বৈষ্ণব-তন্ত্র পাওয়া যায় না।] বাঙ্গালার যাহা পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই বৌদ্ধতন্ত্র ভাঙ্গা। বাঙ্গালায় বৌদ্ধতন্ত্রের প্রধান আড্ডা ছিল।

* * *

আমরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা এখন অর্দ্ধ-হিন্দু, অর্দ্ধ-বৌদ্ধ। যখন সাবিত্রী দীক্ষা লই, তখন আমরা ব্রাহ্মণ। আর যখন গুরু আমার কাণে ফুঁ দিয়া যান, আর আমরা গুরুর পায়ে লুটাইয়া পড়ি, তখন আমরা বৌদ্ধ।

আচ্ছা, যেভাবে তোমরা (ব্রাহ্মণ) বাঙ্গালায় অসিয়াছিলে, সে ভাব ত্যাগ করিয়া এরূপ আধা-বৌদ্ধ আধা হিন্দু ভাব লইলে কেন? তাঁহার কারণ এই যে, আমারা সংখ্যায় কম ছিলাম। পাঁচজন বইত আসি নাই। বল্লালের সময় ৪০০ ঘর মাত্র হইয়াছিল। আমরা রাজার সাহায্য পাইতাম তা রাজা বৌদ্ধ হউন, আর হিন্দুই হউন। আমাদের সমাজও ছোট ছিল; যাহারা অবৌদ্ধ অথবা ব্রাহ্মণ-পক্ষ ছিল, তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতাম।"

মুসলমান-বিজয়ের পরে ব্রাহ্মণেরা রাজার সাহায্য হারাইলেন, সুতরাং পেটের দায়ে বৌদ্ধ-সমাজে যজমান শিষ্য খুঁজিতে বাধ্য হইলেন। শাস্ত্রীমহাশয় লিখিয়াছেন—

"আমাদিগকে দল বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইল। আমাদের সুবিধাও হইল। ভিক্ষুশূন্য বৌদ্ধ সমাজ এক রকম বেওয়ারিশ মাল। যে যাহাকে পারে, আপন দলভুক্ত করিতে লাগিল। ...যাহারা প্রথম হিন্দুদলভুক্ত হইয়াছিল, তাহারা ভাল ব্যবহার পাইয়াছিল। তাহাদিগকে 'নবশাখ' বলে অর্থাৎ নূতন শাখা। তাহার পর কায়স্থগণ আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের মান সম্ভ্রম ও সামাজিক মর্য্যাদা ছিল। ব্রাহ্মণের দলে আসিয়া তাঁহারা সে মর্য্যাদা হারান নাই।" *

এই অভিভাষণের অন্য ভাগে, কেমন করিয়া এদেশে অস্পৃশ্যতা আসিল তাহার-সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণদলভুক্ত লোকদিগের সহিত আহার-ব্যবহারাদি সামাজিক সম্বন্ধ রাখিতেন। এবং নিতান্ত নীচধর্ম্মী ও নীচকর্ম্মী লোক ভিন্ন আর কাহাকেও অস্পৃশ্য বলিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের মতে হিন্দু ভিন্ন আর সকল জাতিই অনাচরণীয় ছিল।......পূর্ব্বকালে যখন বৌদ্ধেরা প্রবল ছিলেন, তাঁহারাও হিন্দুদিগকে অনাচরণীয় মনে করিতেন।......সুতরাং অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় বিচার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে যে দোষী করা হয় সেটা ঠিক নয়।" †

সমাজসংস্কার ও সামাজিক ইতিহাস

শাস্ত্রীমহাশয় সমাজসংস্কারের বিরোধী ছিলেন না। প্রাচীন সংস্কৃত পুথির আলোচনার ফলে কৈবর্ত্ত, বাগ্‌দী যোগী, ডোম প্রভৃতি বাঙ্গলার সমাজের নীচের থাকের লোকের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তিনি "রামচরিত" কাব্যে কৈবর্ত্ত ক্রমোয়েল দিব্বোকের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তন্ত্র পাঠ করিয়া জানিয়াছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ চন্দ্রদ্বীপের জেলে কৈবর্ত্ত ছিলেন। কৈবর্ত্ত, বাগ্‌দী প্রভৃতি জাতের নিকট ব্রাহ্মণেরা কত ঋণী তাহা যিনি সঠিক জানেন তিনি কখনও সমাজসংস্কারের বিরোধী হইতে পারেন না। সাহিত্য-পরিষদের বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়াছেন—

"সহজযান, নাথপন্থ, বজ্রযান, কালচক্রযান, যামল, ডামর, ডাকপন্থ প্রভৃতি যত লোকায়ত ধর্ম্ম ছিল, ইদানীন্তন লোকে তাহার প্রভেদ বুঝিতে

---

* সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা ষট্‌ত্রিংশ ভাগ (১৩৩৬) ১৪—১৯ পৃঃ

† ঐ ঐ ৩ পৃঃ।

না পারিয়া সমূহগুলিকে ভ্রম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।......এখনকার দরকার হইতেছে যে, কতকগুলি লোক ধীরে ধীরে বহকাল ধরিয়া এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহাদের উৎপত্তি, স্থিতি, মেশামেশী ও লয়ের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেন। যতদিন সে ইতিহাস না হয়, ততদিন আমরা আপনাদিগকে চিনিতে পারিব না। কোন্ বিষয়ে আমাদের সংস্কারের আবশ্যক, তাহা জানিতে পারিব না।......মাঝে মাঝে সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা হইবে। না বুঝিয়া না জানিয়া কোন কাজ করিতে গেলে যাহা হয়, সে চেষ্টা বৃথা হইয়া যাইবে। তাহাতে আমাদের ক্ষতি বই বৃদ্ধি হইবে না।" *

লেখার ধরণ ও ভাষা

উপরে যে কয়টি বচন উদ্ধৃত হইল তাহা হইতেই শাস্ত্রীমহাশয়ের গদ্য রচনানীতির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ভাল গদ্য রচনায় একটু কৃত্রিমতা, একটু একটু বাইন বুনট বস্তবিন্যাসের কিছু কৌশল থাকে। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লিখিত বাঙ্গালা গদ্যে সেই কৃত্রিমতার, সেই কৌশলের লেশমাত্র নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা জলের মত সহজ। অথচ সেই সহজ রচনা শক্তিহীন নহে; তাহার যে পাঠককে টানিয়া নিবার একটা শক্তি আছে তাহা পড়িতে পড়িতে বেশ অনুভব করা যায়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের গদ্যের ভাষা বাঙ্গালা গদ্যের আদর্শ স্থানীয়। তিনি সেকালের সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত হইলেও সুরু হইতেই পণ্ডিতী বাঙ্গালার বিরোধী ছিলেন। "বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটাল পাড়ায়" নামক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "ভারত মহিলার" প্রথম অংশ "বঙ্গদর্শনে" ছাপাইবার জন্য দিয়া আসার পর তিনি যখন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করিতে যান তখন—

"তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। আমায় দেখিয়াই বলিলেন, তুমি এসেছ, বেশ হ'য়েছে। তুমি এমন বাঙ্গালা লিখিতে শিখিলে কি করিয়া?' আমি বলিলাম, আমি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি মহাশয়ের চেলা।' তিনি বলিলেন, 'ওঃ' তাই ব-ট। নহিলে সংস্কৃত কলেজ হইতে এমন বাঙ্গালা বাহির হইবে না।' " +

১২৮৫ (১৮৭৮) সালের জ্যৈষ্ঠের বঙ্গদর্শনে, "বাঙ্গালা ভাষা" নামক বেনামা প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পণ্ডিতী ভাষার পক্ষপাতী রামগতি ন্যায়রত্নের এবং বাঙ্গালা রচনায় অবিকল সংস্কৃত (তৎসম) শব্দ বর্জ্জনের পক্ষপাতী শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির মত তুলনায় আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে বাঙ্গালা রচনায় শব্দযোজনা-সম্বন্ধে তিনি যে নিয়ম সঙ্গত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার পরবর্ত্তী ৫৩ বৎসরের রচনায় বরাবর সেই নিয়ম প্রতিপালিত হইয়াছে। সেই নিয়মটি এই, চলিত শব্দ থাকিতে কখনও অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে না; এবং যে শব্দ সকল শ্রেণীর লোকের পরিচিত যথাসম্ভব সর্ব্বদা এইরূপ সহজ শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া শাস্ত্রীমহাশয় লেখায় কথাবার্ত্তার ভাষা চালাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না, যে বাঙ্গালায় লিখন-পঠন হতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা সর্ব্বদা স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন।" *

ভাষার জাত ঠিক হয় তাহার ব্যাকরণ অনুসারে। তাঁহার লেখায় শাস্ত্রীমহাশয় সংস্কৃত পণ্ডিতের হিসাবে প্রচলিত অপশব্দ, ব্যবহার করিয়া থাকিলেও, ব্যাকরণের হিসাবে সে ভাষা সাধুভাষা। সাধুভাষায় সর্ব্বনাম শব্দের তাহাকে, তাহার দ্বারা, তাহার ইত্যাদি রূপ হয়, ধাতুর করিয়া, করিতে, করিয়াছিল, করিতেছিল ইত্যাদি রূপ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার লেখায় সর্ব্বনামের এবং ধাতুর ব্যবহারে সর্ব্বদা এই নিয়মই পালন করিয়া গিয়াছেন।

উপসংহার

এতক্ষণ আমরা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয়ের লেখার কথাই বলিলাম। এই সকল লেখা একত্র প্রকাশিত হওয়া উচিত। যিনি বাঙ্গালা লিখিতে চাহেন তাঁহার এই সকল লেখা অবশ্য পড়া উচিত। এই সকল লেখা না পড়িয়া কেহ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, বাঙ্গালার ইতিহাস শিখিতে পারিবেন না। এই সকল বিভাগে কাজের মত কাজ করিতে হইলে

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, একবিংশ ভাগ, (১৩২১), ৪৬ পৃঃ।

\+ নারায়ণ, বৈশাখ, ১৩২২, ৫২২ পৃঃ।

* বঙ্গদর্শন, ৭মখণ্ড, ১২৮৫, ৮৭ পৃঃ।

একদিকে শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা পড়িয়া লওয়া যেমন আবশ্যক, আর একদিকে শাস্ত্রী মহাশয়ের মত অশ্রান্ত পরিশ্রম করাও আবশ্যক। এই ব্রাহ্মণ এই শ্রমণ-জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমানে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শাস্ত্রী মহাশয় ইদানীং সংস্কৃত পুথির ক্যাটালগ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন, এসিয়াটিক সোসাইটীর হেড ক্লার্ক শ্রীযুক্ত আর পি, মাথাই একদিন অন্তর একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার কাছে গিয়া কাজকর্ম্ম বুঝিয়া লইয়া আসিবেন। ১৭ই নবেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ৭॥ টার সময় গিয়া মাথাই দেখিলেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার কেরাণী এবং আর একটি ভদ্রলোকের সহিত খোস মেজাজে গল্প করিতেছেন, এবং সেদিন অধ্যাপক এগারটনের নব-প্রকাশিত সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস পড়া ভিন্ন আর কোন কাজ করিবেন না স্থির করিয়াছেন। তারপর আহারান্তে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সেই বইখানি পড়িয়া তিনি শুইতে গেলেন। শোয়ার ঘণ্টা খানেক পরে দেখা গেল শাস্ত্রী মহাশয় আর ইহলোকে নাই। এমন জীবন, এমন মরণ খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে।

প্রীতি-অর্ঘ্য

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

হরের প্রসাদরূপে, হে হরপ্রসাদ,
এসেছিলে, শাস্ত্রিবর, হরিতে জীবের
অজ্ঞানতমের রাশি জ্বালি জ্ঞানালোক ;
প্রকাশিলে বহুতত্ত্ব প্রত্ন-তত্ত্ব আদি।
লভিল ভারতবাসী তোমার প্রসাদে
অজ্ঞেয় অজ্ঞাত তত্ত্ব-জ্ঞান সুধারাশি।
সুপবিত্র, সুপণ্ডিত, সদাচাররত
বিপ্রবংশ-জাত সুধী তুমি সুমহান্
বিপ্রোচিত কার্য্য করি সুদীর্ঘ জীবনে
লভিয়াছ অমরতা—অনন্ত বিশ্রাম।
বিদ্যাগুরু, জ্ঞানগুরু, পথপ্রদর্শক,
শাস্ত্রতথ্য-আবিষ্কারে শতেক প্রকারে
ভারতবাসীর তুমি ছিলে আজীবন ;
ইতিহাসে, প্রত্নতত্ত্বে, দর্শনে, ভাষায়,
তোমার গভীর জ্ঞান প্রসিদ্ধ ভারতে।
বৌদ্ধশাস্ত্র-বৌদ্ধতথ্য-সাগর বিপুল
মন্থন করিয়া তুমি লভেছ রতন—
দিয়াছ তাহারে তুলি' শিক্ষিত-সমাজে।
সংস্কৃত-গ্রন্থোদ্ধার তব পরিশ্রমে
হয়েছে সাধিত ; ঘোষণা করিবে যাহা
তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি পণ্ডিত-সমাজে।
ইতিহাস সাহিত্যের কত আবিষ্কার
হয়েছে তোমার শ্রমে, যত্নে, বুদ্ধিবলে,
চিরদিন হ'বে গীত সে কীর্ত্তি তোমার
নশ্বর-জগত মাঝে শিক্ষিত সমাজে।
বঙ্গের গৌরব-স্তম্ভ পরিষৎ-সভা
সুপরিচালিত ছিল নেতৃত্বে তোমার।
প্রাচীন পুথির মাঝে কার্য্য কুশলতা,
বিপুল সে কীর্ত্তি তব ঘোষিবে মহিমা
অসংখ্য অগণ্য কর্ম্ম সাধিলে কোবিদ,
প্রোথিত করিলে ধ্বজা অক্ষয় অমর।
যদিও নশ্বর ধরা ছেড়ে গেছ তুমি,—
ছেড়ে গেছ মানবেরে, ভারত-ভূমিরে ;
তবুও নহ তো মৃত, নহ তুমি লীন
ধরার অন্তর হ'তে। তোমারে হারায়ে সবে
বিচ্ছেদ-বেদনা-ভারে অশ্রুভারাহত।
আজি দেব পরপারে স্বর্গধাম হ'তে
লহ তুলি প্রীতি-অর্ঘ্য অর্পিত সাদরে।

শাস্ত্রী-প্রয়াণে

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন—গীতা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এবং বঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্বের যে বিষম ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহজে বা শীঘ্র পূরণ হইবার নহে। শাস্ত্রী মহাশয়ের ৭৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল। সাধারণতঃ বাঙ্গালীর যে আয়ুষ্কাল, তাহার তুলনায় তাঁহার মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু বলা যায় না। কারণ, 'শতায়ুর্বৈপুরুষঃ' এ প্রাচীন প্রবাদ এখন প্রলাপবাক্যে পরিণত হইয়াছে।

শুনিয়াছি শাস্ত্রী মহাশয় মৃত্যুর দিনও সন্ধ্যা অবধি নিয়মমত সাহিত্য-চর্চা করিয়াছিলেন। ইদানীং তাঁহার শরীর কিছু অপটু হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার মনের বল, কর্ম্মশক্তি ও অনুসন্ধিৎসার কিছুমাত্র খর্ব্বতা হয় নাই। ইহাকেই বলে বর্ম্ম পরিয়া মৃত্যু। শেষ দিন অবধি কর্ম্মরতি। আরও কয়েক বৎসর তাঁহার দেহ রক্ষিত হইলে আরও অনেক জিনিস আমরা পাইতে পারিতাম। দেশের দুর্ভাগ্য! শাস্ত্রীমহাশয় বঙ্গজননীর কৃতী সন্তান। তিনি সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব—বিশেষতঃ প্রত্নবিভাগে যে সকল বহুমূল্য দান দেশকে দিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করিবার সাধ্য আমার নাই। তবে ঐ সকল যে অতি মহার্ঘ্য, একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

পুরুষকারের দ্বারা প্রারব্ধকে কিরূপে নিয়মিত করা যায়, শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বহু পরিজনের ভারগ্রস্ত তাঁহার জনকের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল না। শুনিয়াছি কিশোর বয়সে শাস্ত্রী মহাশয় কাঁদি এন্ট্রেন্স স্কুলে কায়ক্লেশে পাঠাভ্যাস করিতেন। তখন তাঁহার নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য্য। ঐ সময়ে কঠিন পীড়ায় তাঁহার প্রাণ-সঙ্কট উপস্থিত হয়—তখন শঙ্কর হরের প্রসাদে তিনি স্বাস্থ্য লাভ করেন। সেই অবধি তাঁহার স্বজনেরা তাঁহার নাম পাল্টাইয়া 'হরপ্রসাদ' রাখেন। পরে এই নামেই তিনি বিখ্যাত হন। বাস্তবিক হরের প্রসাদ ভিন্ন সামান্ত অবস্থা হইতে কেহই উন্নতির তুঙ্গভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না। অবশ্য এক চাকায় রথ চলে না। ঈশ্বর-প্রসাদের সঙ্গে পৌরুষ ও প্রযত্ন চাই। সেইজন্য ক্রমওয়েল বলিতেন—Trust in God but keep your powder dry. কতটা উদ্যম ও উৎসাহ, পৌরুষ ও প্রযত্ন, প্রয়োগ দ্বারা অজ্ঞাতনামা হরপ্রসাদ বিশ্ববরেণ্য হন এবং শুধু স্বদেশে নয় ইউরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতসমাজেও পূজা লাভ করেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখন আমরা অলিতে গলিতে গবেষকের সাক্ষাৎ পাই। পাশ্চাত্যদেশে প্রকাশিত সূচীগ্রন্থের সাহায্য মাত্র লইয়া অনেকে গবেষণার চরমে উপনীত হইতেছেন এবং বহু চর্ব্বিতের চর্ব্বণ করিয়া প্রতিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের গবেষণা কিন্তু সে ধরণের ছিল না। তিনি ঐ কার্য্যে প্রচুর সময় ও শ্রম ব্যয় করিতেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান করিয়া তবে নিজের মতামত প্রকাশ করিতেন। সেইজন্য তাঁহার অনুসন্ধান ও গবেষণা এত সফল ও সার্থক হইয়াছিল এবং সেই জন্যই তিনি বহুক্ষেত্রে নূতন নূতন তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলতঃ কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সর্ব্বত্র বিদ্বজ্জনের নিকট তাঁহার মত বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া গৃহীত হইত।

শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র ছিল এসিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার অনেকদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যতদূর স্মরণ হইতেছে তিনি তের বৎসর পরিষদের সভাপতিরূপে ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারত্ব করিয়াছিলেন। পরিষদ্ তাঁহার নিকট কত ঋণে ঋণী তাহা বলিয়া নিঃশেষ করা যায় না। পরিষদের সভাপতিরূপে তিনি যে সকল বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করিতেন তাহা সর্ব্বদাই নবতর প্রত্নপুষ্পে সজ্জিত থাকিত। তাছাড়া তিনি পরিষৎ-পত্রিকায় আরও কত প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত করিতেন। তাঁহার আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত 'বৌদ্ধগান ও

দোঁহা' পরিষদের এক অমূল্য সম্পদ্। উহার দ্বারা বাংলা ভাষার ইতিহাস-সম্পর্কে এক নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পরিষদের অর্থসঙ্কট দূর করিবার জন্য তিনি প্রাচীন বয়সেও ভিক্ষাভাণ্ড হস্তে ধনী এবং রাজপুরুষদিগের দ্বারে ধর্ণা দিয়াছিলেন। অনেকস্থলে প্রত্যাখ্যাত হইতেন, কোথাও বা অর্জ্জিত হইতেন, কিন্তু শাস্ত্রী-মহাশয়ের অকুণ্ঠ অধ্যবসায় তদ্দ্বারা দমিত হইত না। পরিষদ্ যে আজ অনেক অংশে অর্থকৃচ্ছ্র হইতে মুক্ত হইয়াছে তাহার জন্য যদি কেহ ধন্যবাদ-ভাজন হয় তবে সে শাস্ত্রীমহাশয়।

শাস্ত্রীমহাশয় যখন স্কুল-বিভাগে একজন নিম্ন-শ্রেণীর শিক্ষক তখনই তাঁহার মধ্যে গবেষণা-বৃত্তি উদ্রিক্ত হয় এবং তিনি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহকারীরূপে শিক্ষানবীশি করেন। ঐ শিক্ষানবীশি একটা কঠোর সাধন। অনেক কণ্টকের ক্ষত সহ্য করিয়া তাঁহাকে ঐ কণ্টকিত ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। ঐ সময় হইতেই এসিয়াটিক সোসাইটীর সহিত তাঁহার যোগ। কালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধান হইয়া উঠেন এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ঐ সভার Philological সেক্রেটারী ছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রাচীন Journal'এর পৃষ্ঠা উল্টাইলে ঐক্ষেত্রে তাঁহার অবদানের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

এসিয়াটিক সোসাইটী অনেকদিন হইতে রাজকীয় সাহায্যে সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এজন্য সোসাইটীর পর্য্যটক পণ্ডিত নিযুক্ত ছিল। শাস্ত্রীমহাশয়ের চেষ্টায় ঐ পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের সহিত বাংলা পুঁথিও সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। তাহার ফলে অনেক অজ্ঞাত বাংলা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটীতে সংগৃহীত সংস্কৃত পুঁথি বহুদিন পর্য্যন্ত স্তূপীকৃত হইয়া জঞ্জাল আকারে অবস্থিত ছিল। শাস্ত্রী-মহাশয়ের চেষ্টায় এবং তাঁহারই শ্রম ও যত্নব্যয়ে ঐ সকল পুঁথি যথাবিভাগে সজ্জিত হইয়া তাহাদিগের সুপরিচায়ক ক্যাটালগ প্রস্তুত হয়। স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের পাণ্ডুলিপির পরিচায়ক এই সকল ক্যাটালগ প্রত্ন-তাত্ত্বিকের পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। কারণ, উহারা শুষ্ক তালিকামাত্র নহে, ঐ ঐ গ্রন্থে শাস্ত্রীমহাশয় নানা প্রসঙ্গের জটিল গহনের উপর যে আলোকপাত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রত্নতাত্ত্বিক ঐ ঐ দুর্গম অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ-পথ খুঁজিয়া লইতে সমর্থ হন।

শাস্ত্রীমহাশয়ের গবেষণার উল্লেখ করিতে গেলে দুইটী বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়—প্রথমতঃ প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও অনেকের ধারণা ছিল যে, বাংলা সাহিত্যের আরম্ভ বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে। যাঁহারা আর একটু পিছাইয়া যাইতেন তাঁহারা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও রাজা রামমোহন রায়ের নাম লইতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ই প্রথম বিশেষ বিবরণসহকারে প্রমাণিত করেন যে তৎপূর্ব্বে শত শত এমন কি সহস্র সহস্র বাংলা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তারপর পুঁথি-সন্ধানের আয়োজন আরব্ধ হয়। এখন আমরা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের শোভা ও সমৃদ্ধি-সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিয়াছি।

ছেলেবেলা হইতেই ধর্ম্মতলার নাম শুনিতাম, ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজাও আমাদের একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু ধর্ম্মঠাকুর যে বুদ্ধদেবের নব কলেবর এবং ধর্ম্মপূজা যে প্রচ্ছন্ন ও বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম, এ নূতন তথ্য কে আবিষ্কার করিল? এ আবিষ্কার শাস্ত্রী মহাশয়ের একটী বিশিষ্ট অবদান।

শাস্ত্রীমহাশয় স্বধামে প্রয়াণ করিয়াছেন—যেখানে যাইলে আর ফিরিতে হয় না।

যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম—গীতা

মানুষের প্রকৃত ধাম কি? ভগবানই আমাদের প্রকৃত ধাম। অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ যেরূপ বিস্ফুরিত হয়, ব্রহ্ম হইতে জীব সেইরূপ বিচ্ছুরিত হইয়াছে—'যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ ব্যুচ্চরন্তি।' সেই সচ্চিদানন্দ-সিন্ধুর বিন্দু আবার সিন্ধুতে নিমজ্জিত হয়—'তত্রাপিযন্তি' বৈদিক ঋষি ইহাকে 'অস্ত'-গমন বলিতেন—'হিত্বায়াবদ্যম্ পুনরস্তমেহি'—ঋগ্‌বেদ। 'অস্ত' শব্দের প্রাচীন অর্থ গৃহ (home)। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—অত্থং গতস্স ন পমাণং অত্থি। আমাদের অস্ত বা home কি? সেই ব্রহ্মণ্যদেব—যাঁহার বক্ষ হইতে আমরা সুদূর অতীতে বিচ্ছুরিত হইয়াছি। তাই কবি বলিয়াছেন—

Frailing clouds of glory do we come
From God who is our home.

শাস্ত্রী মহাশয় সফল ও সার্থক জীবন যাপন করিয়া স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন—ব্রাহ্মণ আবার ব্রহ্মে সংযুক্ত হইয়াছেন অতএব তাঁহার জন্য আমরা অতিমাত্র শোক করিব না। তিনি সেই পরম ধাম হইতে তাঁহার প্রণয়াস্পদ এই বঙ্গদেশের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

মহাপ্রস্থানে হরপ্রসাদ

শ্রীগণপতি সরকার

"পঞ্চপুষ্পের" সম্পাদক অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ আমাকে পরম পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। অমূল্যদা'র অনুরোধ, তাহাত শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা, আমার অমত করিবার উপায় নাই, নতুবা তাঁহার এই অকস্মাৎ বিয়োগে আমার যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে সত্যই কলম চলে না, বাক্যও ঠিক সংযোজন হয় না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে যখন লিখিতেই হইবে তখন চেষ্টা করিয়া দেখি কিছু লিখিয়া সেই অনাবিল পূতচরিত্র পরম শ্রদ্ধেয় পরমপূজনীয় পরম স্নেহশীল পরম পণ্ডিত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা-তর্পণ করিতে পারি কি না।

সতের বৎসর পূর্ব্বে শাস্ত্রীমহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। পরিচয় ঘটিবার কারণও অভিনব। আমার জ্যোতিষ-চর্চ্চাই তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ আনিয়া দেয়। একবার তাঁর দৌহিত্রীর বিবাহের সময় কোষ্ঠীর যোটক মিলকরণের জন্য ও আর একবার অপর এক দৌহিত্রের বিবাহের দিন দেখিয়া দিবার জন্য আমায় বলিয়াছিলেন।

সন ১৩২২ সালে আমি ফলিত জ্যোতিষের গবেষণায় বিশেষ মনোযোগী ছিলাম। তখন জানিতে পারিলাম যে "এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলে" 'ভৃগুসংহিতা' আছে। ইহা জ্যোতিষ শাস্ত্রের এক অপূর্ব্ব বই। উহা দেখিবার বিশেষ কৌতূহল হইল। 'এসিয়াটিক সোসাইটী'তে তখন মাঝে মাঝে বই কিনিতে যাইতাম। বই বা পুঁথি ওখান হইতে কিনিতে হইলে উহার সভ্য হইতে হয়। ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বি-এ, জ্যোতিঃশাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার খুব ঘনিষ্ঠতা থাকায়, তাঁহাকে সোসাইটীর সভ্য হইবার কথা বলায়, তিনি [illegible], সে আর বেশী কথা কি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয়ের সহিত তাঁর খুব হৃদ্যতা আছে, তাঁকে বলিয়া এ ব্যবস্থা করিবেন। আশুবাবুই আমাকে ১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর শনিবার শাস্ত্রীমহাশয়ের সহিত তাঁর পটলডাঙ্গার বাড়ীতে পরিচিত করাইয়া দেন। ১৯১৬ সালে শাস্ত্রীমহাশয় আমাকে সোসাইটীর মেম্বর করেন। এই ১৯১৬ সাল হইতেই তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে থাকে। সোসাইটীর পুস্তকালয়ে রক্ষিত "ভৃগুসংহিতা" দেখিয়া যেরূপ হতাশ হইয়াছিলাম, শাস্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গলাভে সেইরূপ লাভবান হইয়াছি। চুম্বক-লৌহের আকর্ষণের ন্যায় আমাদের মধ্যে আকর্ষণ গাঢ় হইয়াছিল। তাঁর সহিত পরিচিত হইবার পর হইতেই তাঁর কলিকাতায় অবস্থান সময়ে এমন মাস ছিল না যে মাসে আমি কয়েকবার তাঁর সঙ্গে দেখা না করিয়াছি, ক্রমে ঐ মাসের স্থান সপ্তাহ অধিকার করিয়াছিল। তাঁর অমায়িক ভাব, সর্ব্বজনে সদয় ব্যবহার, নিরভিমান অগাধ পাণ্ডিত্য, অকপটে উত্তর প্রদান, বন্ধুবাৎসল্য, কনিষ্ঠদিগের প্রতি স্নেহ, কার্য্যে উৎসাহ প্রদান, অসাধারণ সৌজন্য, সামাজিকতা, ভদ্রতা ও ক্ষমা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী সকলকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত। দেখিয়াছি যিনি একবার তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন, তিনিই তাঁর ব্যবহার ও পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। যিনিই তাঁর সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁর প্রভাবের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি এক কথায় মাটির মানুষ ছিলেন। বিদ্বান যে বিনয়ী হয়, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাঁহাতে দেখিয়াছি।

১৯১৬ সালে আমি ভুবনেশ্বর যাই। আমার গুরুদেব ১০৮ শ্রীশ্রীমৎস্বামী কেশবানন্দ ব্রহ্মচারীমহাশয় তখন গৌরীকেদার মন্দিরের নিকট তাঁর আশ্রম তৈয়ারী করিতেছিলেন। এই আশ্রম নির্ম্মাণের পর হইতেই ঐ স্থান স্বাস্থ্যনিবাসরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে এবং ঐ স্থানে অনেক

পাকা বাড়িতে উঠিয়াছে ; অনেক লোক এখন বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্ম ওখানে যায়। স্বামীজী-মহারাজ আশ্রমের ভিত খুঁড়িবার সময় একখানি শিলালিপি পান। তাহার মাঝখানে একটী সুচারু গণেশের মূর্ত্তি আছে। ঐ গণেশের দুই পার্শ্বে দুই ভাষায় লেখা আছে, আর একপাশেও লেখা আছে। এই লেখার একভাগ তামিল ভাষায়, অন্যভাগ বাঙ্গলা ভাষায় ; তবে বঙ্গাক্ষরের ভাষা বাংলা ও উৎকল ভাষার সংমিশ্রণে জাত। এই শিলালিপিখানি স্বামীজী মহাশয়ের অনুমতি লইয়া আমি বাড়ীতে লইয়া আসি, এখনও তাহা আমার নিকট আছে। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু জমিদার শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম-এ, বি-এল, এটর্ণি মহাশয় ইহার ছাপ তুলিয়া দেন এবং ঐ সূত্রে আমার প্রস্তর ফলকের ছাপ লওয়া শেখা হয়। ঐ ছাপ লইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হই। তিনি উহা তৎক্ষণাৎ একরূপ পড়িয়া ফেলেন। তারপর "এসিয়াটিক সোসাইটীতে" ঐ পাঠোদ্ধার পড়িবার ব্যবস্থা করেন। উহা সোসাইটিতে পড়া হইয়া গেলেও ভুলক্রমে কয়বৎসর ছাপা হয় না। পরে উহা "জারন্যাল এণ্ড প্রসিডিং অব দি এসিয়াটিক সোসাটি অব বেঙ্গলে" নিউসিরিজ ভলম্ ২০, ১৯২৪ সালের প্রথম সংখ্যায় বাহির হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় যে সুবৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে ঐ শিলালিপি হইতে সাহায্য পাইয়াছেন, একথা সুনীতিবাবুই শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন। ঐ শিলালিপির কথা শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয় তাঁর "মন্দিরের কথা" পুস্তকেও উল্লেখ করিয়াছেন। ঐরূপ শিলালিপি ইতিপূর্ব্বে কোথাও বাহির হয় নাই।

ঐ ১৯১৬ সালেই প্রথম আমি পুরী যাই। স্বামীজী মহারাজ আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাকে বলেন যে, পুরীর পাতাল-গৃহে কিছু লেখা আছে। প্রবাদ ওখান হইতে একটী সুড়ঙ্গ ছিল এবং উহার বিষয় ঐ লেখার মাধ্য উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ ঠিক তখনও উদ্ধার হয় নাই। তখন শীঘ্রই ফিরিতে হইয়াছিল বলিয়া ঐ বিষয়ের কোন সন্ধান লইতে পারি নাই। তারপর ১৯২৬ সালে পুরী যাই। পুরীতে গিয়া পুরীর মন্দির ও কোণারক সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্ম শাস্ত্রী মহাশয়কে পত্র লিখি। তিনি তদুত্তরে ৩১শে মার্চ্চ ১৯২৬ সালে আমাকে লেখেন—

কল্যাণবরেষু :—

গণপতিবাবু, পুরীতে আমার ফ্রেণ্ড, ফিলজফার ও গাইড হচ্ছেন মহামহোপাধ্যায় সদাশিব কাব্যকণ্ঠ। তিনি মন্দিরের পূর্ব্ব দরজায় অর্থাৎ অরুণস্তম্ভের কিছু পূর্ব্বে এক বাটিতে থাকেন। তাঁহার কাছে আমার নাম করিয়া গেলেই তিনি আপনাকে সব দেখাইয়া দিবেন। তিনি পুরীর যত সংবাদ জানেন তত আমরা কেহই জানি না।

কোণারকটা আমার অদৃষ্টে নাই। একবার যাইতে যাইতে ব্যাঘাত পাইয়া রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসি। আর একবার সব উদ্যোগ সত্বেও স্ত্রীর দেহত্যাগ সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া আসি। এবার চন্দন-যাত্রায় পুরী যাইবার ইচ্ছা আছে তুমি ততদিন থাকিবে কি ? কোণারক্ সম্বন্ধে বইএর কথা পরে লিখিব।

শুভার্থী

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শাস্ত্রী মহাশয় আমাকেই পত্র লিখিয়া কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। তিনি সদাশিব পণ্ডিত মহাশয়কেও আমার কথা লিখিয়াছিলেন। আমি যখন এদিকে তাঁহার সন্ধানে গিয়াছিলাম, পণ্ডিত মহাশয় ওদিকে তাঁর এক ছাত্রকে আমার বাসায় খোঁজে পাঠিয়েছিলেন। সদাশিব পণ্ডিত মহাশয় বড় মধুর প্রকৃতির লোক ছিলেন, অহঙ্কারশূন্ত ছিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা অপরিসীম ছিল। তিনি আমাকে পুরীর ও কোণারকের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। তাঁর "শ্রীজগন্নাথ-মন্দির" নামক পুস্তক আমাকে উপহার দেন এবং "কল্যাপর্দ্রুম" নামক যে অমূল্য স্মৃতিগ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাও দেখান। তাহাতে তাঁর পাণ্ডিত্যের কুশাগ্র বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় উড়িষ্যাকে অন্ধকার করিয়া মহামহোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গধামে চলিয়াগিয়াছেন। তিনি আমাকে মন্দিরের কয়েকটী শিলালিপির ছাপ দেন এবং তাহাতে কি আছে তাহা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। তিনি ঐ লিপিগুলি মন্দিরের কোন কোন স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে তাহা ঠিক করিয়া বলিয়া দিতে পারেন না। পুরীতে আমার স্ত্রীর অসুখ হওয়ায়

আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসি, এজন্য ঐ লিপিগুলি লইয়া পুরীর মন্দিরে লিপিগুলির সহিত মিলাইতে তখন পারি নাই। তারপর শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত ঐ লিপিগুলির ছাপ লইয়া আলোচনা করি, পাতাল গৃহে যে শিলালিপিখানি আছে তাহাও বলি। তখন কতক কতক পাঠ উদ্ধার করা হয়। আর আমাদের মধ্যে স্থির হয় যে, পুরীতে গিয়া চাক্ষুষ দেখিয়া ও মিলাইয়া ঐ লিপিগুলির ব্যবস্থা করা যাইবে। তদনুসারে ১৯২৭ সালের মে মাসে তিনি ও আমি একত্রে পুরী যাই। তখন তাঁর বড় জামাতা শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুরীতে কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট। আমরা তাঁর আতিথ্য স্বীকার করি। তিনিও খুব সুন্দর লোক। সেই পর্য্যন্ত তাঁর সহিত আমার সৌহার্দ্য স্থাপিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় ও আমি গিয়াছি শুনিয়াই মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র মহাশয় আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। পুরীর রাজার ম্যানেজার শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া গেলেন। পরদিন পুরীর রাজা স্বয়ং শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তারপর দেখি জগন্নাথের প্রসাদ রাজবাড়ী হইতে শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্য আসিয়াছে। আমরা মন্দিরের প্রস্তরলিপি দেখিতে আসিয়াছি একথা শাস্ত্রী মহাশয় রাজাকে ও তাঁহার ম্যানেজারকে বলায় তাঁরা তার বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়াছিলেন। তাঁরা খবর দেওয়ায় আমরা যখন সেখানে গেলাম দেখি পাতাল-গৃহের দুইটী দেওয়াল ভাল করিয়া ঘসিয়া মাজিয়া পরিষ্কৃত করা হইয়াছে এবং অত্যন্ত ভিজা রহিয়াছে। পাতাল-গৃহটী অন্ধকূপ-বিশেষ, সেখানে সূর্য্যদেব বা পবনদেবের প্রবেশ নিষেধ। যাহাহউক প্রদীপের ও কর্পূরের আলোর সাহায্যে কোথায় লেখা আছে তাহা দেখিয়া লওয়া গেল; কিন্তু সে স্থান এমন অসুবিধাজনক যে, দাঁড়াইয়া ঐ লিপি উদ্ধার করা সুকঠিন। তথাপি শাস্ত্রী মহাশয় পাঁচ দশ মিনিট অতিকষ্টে পড়িবার চেষ্টা করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া বাহিরে আসেন। কার্য্যে কিছু মাত্র অগ্রসর হওয়া গেল না, তখন আমি উহার ছাপ লইবার চেষ্টা করিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা দারুণ পরিশ্রমের পর যে কয়খানি লিপি ছিল তাহার ছাপ সংগ্রহ করিলাম। আমি এক একটী ছাপ উঠাইয়া বাহিরে পাঠাইতে লাগিলাম, আর শাস্ত্রী মহাশয় উহা অতি মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন। সদাশিব পণ্ডিত মহাশয় যে ছাপগুলি দিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কয়েকটার সঙ্গে আমার গৃহীত ছাপ মিলিয়া গেল। তখন সেগুলির প্রাপ্তিস্থান ঠিক হইল। পূর্ব্ব-গৃহীত ও আমার গৃহীত এই দুই ছাপ পাওয়ায় পাঠোদ্ধারের সুবিধা হইবে বোধ হইল; শাস্ত্রীমহাশয় একখানির পাঠোদ্ধার প্রায় সেইখানেই ঠিক করিয়া ফেলেন। আমাদের জন্য দেওয়াল পরিষ্কার করিতে গিয়া লাভ হইয়াছে দেখিলাম যে, অক্ষরের দুই এক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; পূর্ব্বেও তাহা কতক ভাঙ্গা ছিল, এবার তার অবস্থা সঙ্গীন হইয়াছে! শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর এক বিধবা ভ্রাতৃবধূ ও বড় পৌত্রকে আনিয়াছিলেন। তাঁহারা তীর্থদর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁরা তীর্থদর্শন করিতে লাগিলেন। সদাশিব পণ্ডিত মহাশয় আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। বাড়ীতে তো 'উড়িয়া' বামুনের রান্নাই খাইয়া আসিতেছি, সেদিন কিন্তু ওদেশের ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে তাদের দেশের খাদ্য খাইলাম। নানাবিধ ব্যঞ্জন ও খাবার প্রভৃতি সবই ভাল লাগিল, কিন্তু সব আহার্য্য বস্তু আমাদের দেশের মত নয়, অনেক রকমারী ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে প্রত্যহই জগন্নাথ-দর্শন, জগন্নাথ-প্রদক্ষিণ, মন্দির-দর্শন প্রভৃতি করা গিয়াছে। বোধ হয় ঐ সময় চন্দন-যাত্রা ছিল। বোধ হইতেছে নরেন্দ্র-সরোবরে আমরা ঐ উৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে পুরীর মন্দিরটী যে ত্রিযাকামন্দির তাহা বুঝাইয়া দেন, কোন সময় হইতে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং কিরূপে উহার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহাও বলেন—পুরীর অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি বলিয়াছিলেন। আমি উপবীতী কায়স্থ বলিয়া শাস্ত্রীমহাশয় আমার প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা কখন দেখান নাই। একই স্থানে জামাতা পৌত্র লইয়া আমার সহিত আহারে বসিতেন। একই কামরায় শাস্ত্রীমহাশয় ও আমি থাকিতাম। শাস্ত্রীমহাশয় কালিদাসের অনুরক্ত ভক্ত শিষ্য জানিয়া কালিদাসের বইগুলি সঙ্গে লইয়াছিলাম। সেখানে অবসর সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন "সঙ্গে কালিদাসের বই আছে?" উত্তরে আমি বলিলাম "আছে"। তখন তিনি আমাকে বলেন 'রঘুর দিগ্বিজয় চতুর্থ সর্গে আছে, খোল, এতো অতি নীরস,

দেখ, আমি বলি তুমি শোন—সরস হয় কিনা।' দেখিলাম তাঁর তো সবই শ্লোক মুখস্থ। ক্বচিৎ কোন স্থানে গোড়াটা ধরিয়ে দিতে হইয়াছে। ঐ নীরস সর্গটা তিনি এমন সরস-ভাবে ব্যাখ্যা করিলেন এবং ভারতের মানচিত্র যেন নখদর্পণে ধরিয়া দিলেন, আর ঐ সর্গে কালিদাসের কলা-কৌশল নিপুণভাবে দেখাইয়া দিলেন; আমি তো বিস্মিত হইয়া গেলাম। জানা বিষয় যে এত ভাল লাগিবে এবং তার মধ্যেও নূতন কথা পাইব তাহা তো ভাবিই নাই, কিন্তু যখন আমাদের ঐ সর্গ শেষ হইল দেখিলাম, তাঁহার নিকট অনেক নূতন তথ্য পাইয়াছি। কাব্যেও তাঁর অদ্ভুত দৃষ্টি ছিল।

যখন কালিদাস লইয়া কথা উঠিল তখন আরও কিছু না বলিলে কালিদাসের কাব্যের রসজ্ঞ শাস্ত্রীমহাশয়ের গভীর জ্ঞানের প্রতি অবিচার করা হইবে ভাবিয়া সংক্ষেপে কিছু বলিব।

আমি পণ্ডিত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ছাত্র। তিনি যেমন সৌম্যদর্শন ও সুরসিক ছিলেন তেমনি কাব্যের বড় বোদ্ধা ছিলেন। তাঁর কাছে পড়িয়াই আমি কালিদাসের ভক্ত হইয়া উঠি। শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার পণ্ডিত মহাশয়ের বেশ আলাপ ছিল। পণ্ডিত মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ডান হাত ছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয়ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহভাজন ছিলেন। এই সূত্রে উভয়ের পরিচয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার কিছু পূর্ব্বে পণ্ডিত মহাশয়ের লোকান্তর ঘটে এবং আমার "ঋতু-সংহারের" পদ্যানুবাদ শেষ হয়। আপশোষের বিষয় শাস্ত্রীমহাশয় আমার 'ঋতুসংহারের' অনুবাদ দেখিয়া যান নাই। আমি শাস্ত্রীমহাশয়কে আমার "ঋতুসংহার" উপহার দিই। তিনি তা পড়িয়া বলেন যে, দেখিলাম সকলে যে ভুল করে তুমিও সেই ভুল করেছ। ভুলটী কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতাম যে, "কঙ্কেলি গাছকে আমি অশোক বলিয়াছি। তিনি বলিয়া-ছিলেন যে কঙ্কেলি নামে স্বনাম-প্রসিদ্ধ গাছ আছে। অমরসিংহ ভুল করায় সেই ভুল চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য আমি আমার ঐ ভুল "প্রকৃতিতে" কালিদাসের 'বৃক্ষলতা' প্রবন্ধে এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় "কঙ্কেলি-পুষ্প" প্রবন্ধে সংশোধন করি। শাস্ত্রীমহাশয় পড়িয়া বলেন, 'হয়েছে ভাল কিন্তু, ঠিক জমেনি।' তার কারণ বলেছিলেন যে 'সব খুলে দেখাতে পারনি; আবার ইহাও বলেছিলেন যে 'সব বুঝাতে যাওয়াও বিপদ।' তিনি মেঘদূতের ব্যাখ্যা বাহির করিয়া কি অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন, তাহা বলেন। গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্রলাল শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার বইখানি অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট বলিয়া রিপোর্ট করায় তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল থাকা সত্ত্বেও কম বেগ পান নি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তাদের মধ্যে তাঁকে কেহ সমর্থন করেন নি। তিনি সরকারকে যে উত্তর দেন তাতে সরকার সন্তুষ্ট হওয়ায় তবে নিস্তার পান। তারপর তিনি বলেন যে "শকুন্তলা" আমার কাছে পশ্চিমের সংস্করণ ও বাংলার সংস্করণ মিশিয়ে পড়। পড়িলাম, তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, কাব্যাংশে বাংলা সংস্করণে কত দোষ ঘটিয়াছে এবং কতক অংশ যে প্রক্ষিপ্ত তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। আর শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যায় বৈশিষ্ট্য যে কোথায় তাহাও দেখিলাম। তারপর তিনি মেঘদূত পড়িতে বলিলেন। তাহাও পড়িলাম। যে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য শাস্ত্রীমহাশয় চোখের সামনে ধরিয়া দিতে লাগিলেন, তা ত লেখাও যায় না! বলাও চলেনা! তাহা কেবল অনুভব করিবার। কি শকুন্তলায়, কি মেঘদূতে প্রত্যেক শ্লোকের ব্যাখ্যাতেই কিছু না কিছু নূনতত্ব পাওয়া গিয়াছে। রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট যাহা পড়িয়াছি তাহা অতি সুন্দর, অতি মধুর, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় ঐতিহাসিক ঘটনা দিয়া ঘটনার স্থান-গুলির চাক্ষুষ দর্শনের অভিজ্ঞতা দিয়া এবং রস-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়া ঐ মধুরত্বকে সুমধুর করিয়া তুলিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মেঘদূতের ব্যাখ্যা পড়িয়া সকলেই মুগ্ধ হয়, কিন্তু যদি ইদানীং উহা লিখিতেন তাহা হইলে উহার মাধুর্য্য আরও যে অনেক বেশী বাড়িত তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়! শাস্ত্রীমহাশয় কালিদাসকে বুঝিতে সারা ভারতবর্ষে বেড়াইয়াছিলেন, তবে তিনি কালিদাসকে বুঝিয়াছিলেন। তিনি যখনই বিদেশে যাইতেন কালিদাসের বই ক'খানি তাঁর সাথী থাকিত। তিনি একাধারে কালিদাসের ভক্ত, শিষ্য ও প্রেমিক ছিলেন। তাঁর নিকট কালিদাসের কথা উঠিলে দেখেছি তিনি যেন কালিদাসময় হইয়া গেছেন।

কালিদাসের প্রত্যেক বইখানি তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। কালিদাস সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিতে আরম্ভ করিলে কাহারও উঠিবার সাধ্য থাকিত না, বরং শুনিবার ক্ষুধা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইত। যে মল্লিনাথ "দুর্ব্যাখ্যা বিষমূর্ছিতা" হইতে "সঞ্জীবনী" টীকারূপ ঔষধ দিয়া কালিদাসকে বাঁচাইয়াছিলেন তিনি যে কালিদাসকে বুঝেন নাই একথা বলা ধৃষ্টতা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মল্লিনাথ কালিদাসকে বুঝিবার জন্য সারা ভারত বোধ হয় ঘুরেন নাই, কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয় সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কালিদাসের রস ও সৌন্দর্য্যের সম্যক্ তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন। "নারায়ণে" কালিদাসের বইগুলির উপর শাস্ত্রীমহাশয় যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন সেগুলি পড়িলেই বোঝা যায় যে, তিনি কি ভাবে কালিদাসকে বুঝিয়াছিলেন। এই কালিদাসের সৌন্দর্য্য বুঝিবার অন্তর্দৃষ্টি তিনি পাইয়াছিলেন তাঁর কাব্যের গুরু রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের নিকট। শাস্ত্রীমহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়েন। কাব্য পড়াইতেন রামনারায়ণ পণ্ডিত মহাশয়। তাঁর নিকট শাস্ত্রীমহাশয় সমস্ত রঘুবংশ পড়েন। পড়ার সময় ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর পড়া হইলে, পণ্ডিত মহাশয় তাঁর ছাত্রদিগকে দেখাইয়া দেন যে, মহাকবি কালিদাস "কুমারসম্ভবে" পার্ব্বতীর রূপ-বর্ণনার মত একস্থানে ইন্দুমতীর রূপ-বর্ণনা না করিয়াও স্বয়ম্বর-সভায় এক রাজার নিকট হইতে অন্য রাজার নিকট যাইবার কালে ইন্দুমতী সম্পর্কে কেবল কয়েকটী বিশেষণ ব্যবহার করিয়াই অদ্ভুত প্রণালীতে তাহার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। শাস্ত্রীমহাশয় তখন অল্পবয়স্ক হইলেও উহা হইতেই কাব্যের সৌন্দর্য্য ও রস উপলব্ধি করিবার সঙ্কেত পান। যে শিক্ষা তিনি বাল্যকালে পাইয়াছিলেন, তাহার ব্যবহারের উদাহরণ আমি স্বয়ং একদিন পাইয়াছিলাম। "অনাথবন্ধু" নামে এক মাসিক পত্রিকায় আমার "কামন্দকীয় নীতিসারের" অনুবাদের কিয়দ্ অংশ ছাপা হয়। আমি একদিন মূল বইখানি ও ছাপা অংশ লইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যাই এবং তাঁহাকে বলি যে, তাঁহাকে দেখিয়া দিতে হইবে, আমার অনুবাদ ঠিক হইতেছে কি না। এ কার্য্যে তাঁহাকে রাজী করাইতে না পারিলেও তিনি সেদিন কিরূপ অনুবাদ হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য কয়েকটী গোড়ার শ্লোক দেখেন। মূলগ্রন্থে চাণক্যপ্রসঙ্গে "সুদৃশ" শব্দ আছে, তাই দেখিয়া তিনি ধরিলেন যে, কামন্দক চাণক্যকে দেখিয়াছিলেন, তাহা না হইলে "সুদৃশ" অর্থাৎ সুন্দর আকৃতি একথা লিখিতেন না। অবশ্য ঐ "সুদৃশ" শব্দের অর্থ টীকাকার ঐ অর্থে ব্যবহার করেন নাই, আমি টীকাকারকে অনুসরণ করিয়াছিলাম সুতরাং ঐ অর্থ যে হয় তাহাও ভাবি নাই। বোধ হইতেছে শাস্ত্রী মহাশয় "বিহার উড়িষ্যার রিসার্চ্চ সোসাইটির জারন্যালে" "কামন্দকীয় নীতিসারে" প্রসঙ্গে যে অর্থ তখন করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্‌কে" যে কত ভালবাসিতেন তা অনেকে জানেন না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পরিষদের ধাত্রীগণের প্রতি অভিমান-বশতঃ তিনি পরিষদের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন; কারণ তাঁর প্রতি অবিচার হইয়াছিল। তিনি যে মেঘদূতের ব্যাখ্যা বাহির করেন তাহা "অশ্লীলতার অমার্জ্জনীয় দোষে দুষ্ট" এই কথা পরিষদের ধাত্রীবৃন্দ প্রকাশ করিতেই তিনি তাঁহাদের সংশ্রব ত্যাগ করেন। পরে তাঁরা তাঁকে পুনর্ব্বার পরিষদে আনিতে চেষ্টা করিলে "আমি খেউড় গাই, আমি কি আপনাদের সঙ্গে একাসনে বসার যুগ্যি" এই কথা বলিয়া শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের তখন আমল দেন নাই, কিন্তু পরে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমান ঘুচিয়া যায়; তাঁহাকে পরিষদে আসিতে হইয়াছিল, পরিষদের সভাপতি হইতে হইয়াছিল এবং তাঁহাকে দুইবার পাঁচবার করিয়া দশ বৎসর সভাপতি থাকিতে হইয়াছিল। দেহত্যাগের সময়ও তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন।

যখন পরিষদ্ মন্দির ফাটিয়া অত্যন্ত জখম হইয়া যাওয়ায় কলিকাতা কর্পোরেশন মন্দিরটীকে 'কনডেম্‌ড' করিয়াছিল (অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে বলিয়াছিল), তখন শাস্ত্রী মহাশয় আমার দিকে একান্ত স্থিরভাবে একরাশ অশ্রুপূর্ণ নয়নে চাহিয়াছিলেন, "গণপতি, আমাদের সাক্ষাতেই পরিষদের সমাধি হ'বে।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সেই অবস্থা দেখিয়া প্রাণে ব্যথা পাই এবং তাঁকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলাম, "আপনি ভাববেন না, এ হ'তে দিব না।" তারপর আমার

মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয় কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলর থাকায় তাঁর সহায়তায় কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে পরিষদের বাড়ীর জন্য ২৫০০০৲ টাকা এককালীন (ক্যাপিট্যাল গ্রাণ্ট) আদায় করাইয়া দিই। সেই সময় দাদার সঙ্গে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ও শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে ছিলেন। করপোরেশন হইতে ঐ দান বাহির করিতে মেজ দাদাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ঐরূপ দান কর্পোরেশনের ইতিহাসে ঐ প্রথম। শাস্ত্রীমহাশয় একথা পরিষদের সভায় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন, হীরেন্দ্রবাবুও স্বীকার করিয়াছিলেন। তারপর পুনর্ব্বার শাস্ত্রীমহাশয়ের অনুরোধেই রমেশ-ভবনের জন্য বার্ষিক ২৪০০৲টাকা গ্রাণ্ট কর্পোরেশন হইতে মেজ-দাদার সহায়তায় মঞ্জুর করাই। শাস্ত্রীমহাশয় ঐ দুই গ্রাণ্ট উপলক্ষ্যে যে সকল চিঠি আমাকে লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে শাস্ত্রীমহাশয় পরিষদ্‌কে যে কত ভাল-বাসিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে রমেশ-ভবনের দেনা মিটাইবার জন্য ১৬০০০৲ টাকা একমাত্র শাস্ত্রীমহাশয়ের চেষ্টাতেই পরিষদ্ পায়। শাস্ত্রীমহাশয় ভাঙ্গা পা লইয়াই গবর্ণমেণ্টের গ্রাণ্ট আদায়ের জন্য পরিষদের হইয়া যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা ঐ ভালবাসার খাতিরে, নতুবা ও-বয়সে ওরূপ পরিশ্রম সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়। পরিষদ্‌কে ভালবাসার আর এক নিদর্শনও জানি! তিনি ও আমি পুরী হইতে যে শিলালিপির ছাপ আনি তাহা উড়িষ্যার ইতিহাসে নূতন তথ্য যোগাইবে একথা শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়াছিলেন। আজও তাহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নি। পুরী হইতে ফিরিবার পর পড়িয়া গিয়া শাস্ত্রীমহাশয়ের পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ঐ কাজ বন্ধ থাকে। তারপর যখন তিনি কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন আমি বিহার অঞ্চল হইতে একটি তাম্র-কলস পাই। উহা তাঁহাকে দেখাই। তিনি উহা দেখিয়া তখনই পড়িতে পারিলেন না, তবে বলিলেন, গুপ্তদের সময়ের বলে বোধ হইতেছে। আরও তিনি বলিলেন, 'পরিষদের তরফ থেকে এক তাম্র-কলস এসেছে তার কাজ না শেষ করে ঐ উড়িষ্যার শিলালিপিগুলি ও আমার এটি দেখিতে পারিবেন না।' এবার পূজার পূর্ব্বে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীতে পুরীর মন্দিরের এক পুরোহিতের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়েন। তাহাতে আমাদের আনীত ঐ পুরীর শিলালিপিগুলি দেখান হয়। তারপর কথা ছিল পূজাতে নৈহাটি যাইবেন, সেখান হইতে ফিরিয়া ঐ শিলালিপির কাজ শেষ করিবেন এবং আমার অনূদিত শুক্র-নীতির মুখবন্ধ লিখিয়া দিবেন। ঐ শুক্র-নীতির অনুবাদ স্বয়ং তিনি আমার সঙ্গে আগাগোড়া মিলাইয়া পড়িয়াছেন এবং আবশ্যক মত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। অনেকদিন যাবৎ ঐ অনুবাদ ও মূল বইখানা তাঁর নিকট মুখবন্ধ লিখিবার জন্য ছিল; কিন্তু আমাকে যেরূপ স্নেহ তিনি করিতেন; তাহাতে আমি তাঁকে জোর ক'রে উহা লিখিয়া দিতে বলিতে পারি নাই; এজন্য আমার ক্ষতি হইল সত্য, কিন্তু আমি কাজ করাইয়া লইতে পারি নাই। তিনি বলিতেন, "গণপতি, তোমায় আমার ভাল লাগে কেন জান? সকলেই আসে আমাকে exploit করতে, কিন্তু তুমি সে জন্য কখন আসনি"। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন তিন-ঘণ্টা ধরিয়া তাঁর সঙ্গে অনেক কথা—অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। তার মধ্যে তিনি বলিয়াছিলেন, কি ভাবে ঐ মুখবন্ধ লিখিবেন; এবং যদি তিনি লিখিয়া যাইতে পারিতেন নীতিশাস্ত্রের ইতিহাসে তাঁর এক অপূর্ব্ব দান থাকিত। দেশের দুর্ভাগ্য যে তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন "সোসাইটির ক্যাটলগের এই খণ্ডটা ৩৪দিন হ'লেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর তোমার ঐ কাজ ক'রে দিব। কিন্তু আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, তিনি আর কয়দিন বাঁচিলেন না, তাঁর সে কাজও শেষ হইল না। তাঁর শরীরে মৃত্যুর কোন চিহ্ন সেদিন দেখি নাই। মৃত্যুর একঘণ্টা পূর্ব্বেও কেহ জানিত না। তিনিও স্বয়ং বুঝেন নাই যে, তাঁহাকে অল্পক্ষণপরেই পরপারের যাত্রী হইতে হইবে। তিনি আমাকে অনেকবার বলিয়া-ছিলেন যে, "আমার উইলে আমি পরিষদ্‌কে ভুলিব না"। তিনি পরিষদ্‌কে এত ভালবাসিতেন।

ইদানীং পরিষদের জন্য প্রায়ই প্রবন্ধ তিনি লিখে

দিতেন। তাঁর প্রবন্ধ এক একটী রত্ন-বিশেষ। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন "পা ভেঙ্গে গেছে,' আর পরিষদে যেতে পারিব না; তবে আমি প্রবন্ধ দিব"। জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত তাঁর বাক্য তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। পরিষদ্‌-সম্পর্কে তিনি বলিতেন যে, "ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী কোন ভাল কাজই করেনি; কেবল একটী ভাল কাজ ক'রেছে, সে কাজটী হ'তেছে 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ'।" পূর্ব্ব হইতে পরিষদের সভ্য থাকিলেও, শাস্ত্রীমহাশয়ই আমাকে পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তাদিগের মধ্যে টেনে আনেন। পরিষদের রক্ষা সম্বন্ধে হীরেন্দ্রবাবু এক সময় তাঁকে এইরূপ বলেছিলেন যে "যদি পরিষদ্‌কে বাঁচান না যায় তো কি করা যাবে, মানুষেরা যা করে ত কি চিরদিনই থাকে"। শাস্ত্রী মহাশয় হীরেন্দ্র-বাবুর মুখে ঐ ভাবের কথায় প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছিলেন। এবং আমাকে কয়েকবার উহা বলিয়াছিলেন। পরিষদের উন্নতির জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের আকুল আগ্রহ ছিল। পরিষদ্‌ যাহাতে ভালভাবে চলে, তার সভ্য বৃদ্ধি হয়, অর্থাগম হয়, পরিষদের সুনাম হয়, পরিষদ্‌কে সকলে ভালবাসে, এসব বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি দুঃখ ক'রে একবার বলেছিলেন যে, পরিষদ্‌কে তিনি আরও কিছু দিতে পারিতেন, কিন্তু পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টার ও আগ্রহের অভাবে তা হ'ল না।'

শাস্ত্রী মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে প্রমাণ করেন যে, বাংলা-দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম আজও বর্ত্তমান। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে "নারায়ণে" তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁর বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান যে কত গভীর তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইদানীং "গাইকোয়াড় সিরিজে" কয়েকটী বৌদ্ধ বই বাহির হয়, তার মধ্যে একখানি শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদন করেন। এই বইগুলি পাইয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান আরও বৃদ্ধি হয়। ভারত-ইতিহাসের ন্যায় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ একথা অকুণ্ঠিত চিত্তে সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা মহাশয় প্রত্যহ রাত্র ৮টার সময় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট লোক পাঠাইতেন। শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে মুখে মুখে বলিয়াছেন, তাঁহার লোকটী তাহাই লিখিয়া লইতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত বিমলাবাবুর লোক আসিবে শুনিয়াছিলাম, মৃত্যুর দিন ঐ লোক আসিয়াছিল কি না জানি না। শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ বিমলাবাবুকে লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা তৎপ্রকাশিত "Buddhistic Studies" গ্রন্থের Chips of a Buddhist workshop। ঐ অংশ ইউরোপের পণ্ডিত-মণ্ডলে খুব সুখ্যাতি পাইয়াছে, এমন কি শাস্ত্রী মহাশয় যে সমস্ত ইউ-রোপীয় পণ্ডিত সম্বন্ধে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন তাঁরাও তাঁকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন, একথা শাস্ত্রী মহা-শয়ের দেহ-রক্ষার পূর্ব্বদিন শুনিয়াছি।

প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে শাস্ত্রী মহাশয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, এ-বিষয়ে তিনি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের শিষ্য। রাজেন্দ্রলালের নিকট তিনি অনেক কিছু শিখিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় রাজা রাজেন্দ্রলাল, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ের লোক। এঁদের সকলের সঙ্গেই তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এঁদের কত গল্পই তাঁর নিকট শুনিয়াছি। পূজার পূর্ব্বে কথা হইয়াছিল যে, পূর্ব্ব-আমলের লোকদিগের সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রাচীন স্মৃতি-কাহিনী আমি লিখিব। কিন্তু তাহা আর হইল না। উহা হইলে অনেক প্রাচীন কথা থাকিয়া যাইত। শাস্ত্রী মহাশয়ের বাল্যজীবন সম্বন্ধে তিনি আমায় কিছু কিছু বলিয়াছিলেন; তাহা লেখা আছে, বাকী জীবনের কথাও লিখিবার কথা ছিল কিন্তু তাঁর তিরোধানে উহা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম যুগের লোক হইলেও তাঁর বাংলা লেখা তাঁহাদের লেখাকে অনুসরণ করে নাই। তাঁর লেখা সংস্কৃত-বহুলও ছিল না বা বর্ত্তমানের মত চলতি ভাষাও ছিল না। বঙ্কিমবাবুর আমলে বাংলা ভাষা পোষাকী ও আটপৌরে এই দুই প্রকার ছিল। বর্ত্তমানে পোষাকী ভাষাকে বাদ দিয়া আটপৌরেকেই সমাজে চালাইবার প্রবল চেষ্টা চলিতেছে; শাস্ত্রী মহাশয়ের বাংলা না পোষাকী, না আটপৌরে; তাঁর লেখা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী। বৌদ্ধধর্ম্ম চর্চ্চা করিয়া বুদ্ধদেবের মধ্যপথ অবলম্বনের উপদেশ তিনি যেন বাংলা-রচনায় মানিয়া লইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষা অনুসরণ করিলে দুই দিকই বজায় থাকে, অথচ প্রকৃত বাংলা লেখা হয়; সংস্কৃতানুসারী ভাষাও হয়

না বা চল্তি ভাষাও হয় না। তাঁর ভাষা স্বচ্ছ, সরল, সরস ও অনাবিল। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন, 'সংস্কৃত কলেজে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় অধ্যাপক শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃাদের ইংরেজি পড়াতেন। তিনি সহজ ও সাদা বাংলা লিখিবার জন্য ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন।' তাঁর উপদেশেই শাস্ত্রী মহাশয়ের বাংলা পণ্ডিতী বাংলা বা বঙ্কিমী বাংলার অনুকরণ করে নাই।

শাস্ত্রী মহাশয় কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া-ছিলেন, অনেক মৌলিক প্রবন্ধ ইংরেজিতে লিখিয়া গিয়াছেন। এ ছাড়া তিনি বাংলা ভাষায়ও অনেক মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজি ভাষায় ও বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে তাঁর "ভারতবর্ষের ইতিহাস" বিশেষ প্রশংসাযোগ্য; কেননা প্রাচীন হিন্দু-ভারতের ইতিহাস তাঁহার পূর্ব্বে এত বিস্তারিত ভাবে কেহ লিখিতে পারেন নাই। তিনি নিজ মুখে বলিয়াছিলেন যে, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ তাঁর লেখা হইতেই অনেক মাল-মস্‌লা লইয়াছেন কিন্তু তাহা স্বীকার করেন নাই। এই ভারত-বর্ষের ইতিহাস হইতেই শাস্ত্রী মহাশয় ৫০,০০০৲ টাকা পান। একদিন শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, পুরো দেড়বর্ষের "বঙ্গদর্শন" একত্র করিলে যতটা হয়, "বঙ্গদর্শনে" তাঁর লিখিত প্রবন্ধ তত আছে। আমাদের জ্ঞাত তাঁর ২৬টী প্রবন্ধ "বঙ্গদর্শনে" আছে। তিনি বহু বাংলা মাসিকপত্রে ও ত্রৈমাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; যেগুলিতে তিনি লিখিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে, সে পত্রিকাগুলির নাম—আর্য্যদর্শন, বঙ্গদর্শন, নারায়ণ, বিভা, প্রবাসী, পঞ্চপুষ্প, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, বসুমতী। যে সকল ইংরেজী পত্রিকায় লিখেছেন, সে গুলির নাম "জারন্যাল অব্‌ দি এসিয়াটিক সোসাইটী অব্‌ বেঙ্গল," "জারন্যাল অব দি বিহার এণ্ড উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটী," "ইণ্ডিয়ান্ এণ্টি-কুয়েরী," এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা" "হিষ্টোরিক্যাল্ কোয়া-টারলি"।

শাস্ত্রীমহাশয়ের জন্মমাস লইয়া একটু গোল হইয়াছে। তাঁকে জন্মের সময় জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, ২২এ অগ্রহায়ণ, ষষ্ঠী, ধনিষ্ঠা নক্ষত্র, এবং লগ্নে চন্দ্র; আর উহা ইংরাজি ১৮৫৩ সালের নবেম্বর মাস। কিন্তু ইহা লিখিতে যাইয়া ঐ সালের পঞ্জিকা খুলিয়া দেখি যে, ইং ১৮৫৩ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখের সহিত ঐ বাংলা তারিখ মেলে। শাস্ত্রীমহাশয়ের স্মৃতিশক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, তারিখ সম্বন্ধে তাঁর ভুল হইত না, এইজন্য তাঁর জীবিতকালে পঞ্জিকা খুলিয়া দেখি নাই। আর প্রতিবর্ষে তিনি জন্মতিথি পূজা করিতেন, এজন্য বাংলা তারিখ ও তিথি তাঁর ঠিক ছিল। এতে যে তাঁর ইংরেজী মাসে ভুল থাকিবে ভাবিতে পারি নাই। বুঝিতেছি যে তিনি তাঁর জন্মসালের বাংলা পঞ্জিকা দেখেন নাই। অগ্রহায়ণ মাসে নবেম্বর ও ডিসেম্বর দুই মাসই পড়ে। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে তাঁর জন্ম-মাস নবেম্বর, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা ডিসেম্বরের ৬ই তারিখ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁর জন্ম সময় খুব ঠিক না হইলেও, লগ্নে চন্দ্র আছে বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁর জন্ম-কুণ্ডলী করা গেল,—

শক ১৭৭৫, ১২৬০ সাল, ১৮৫৩ খৃঃ অঃ, ২২এ অগ্র-হায়ণ, ৬ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, ষষ্ঠী, ধনিষ্ঠা নক্ষত্র।
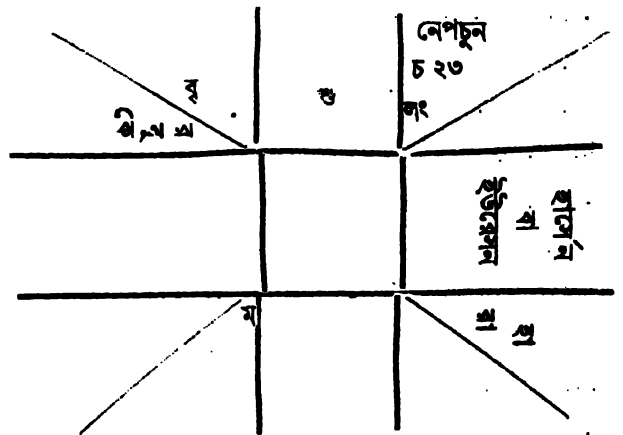
কোষ্ঠীর বিচার করার এখানে আবশ্যক নাই।

শাস্ত্রীমহাশয়ের মৃত্যুর পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি তাঁর নিকট গিয়াছিলাম। দেখি, তিনি তাঁর তেতলার ঘরের বারান্দায় 'ক্রাচ' লইয়া বেড়াইতেছেন। আমায় দেখিয়াই বলিলেন, 'তোমায় খুঁজছি'। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তিনি তাঁর "বেণের মেয়ে" পুনর্ব্বার ছাপাবেন, কিন্তু বই পাচ্ছেন না। তিনি বলিলেন যে, তাঁর বই ছেলেরা কোথায় ফেলেছে পাওয়া যাচ্ছে না, প্রকাশক হরিদাস বাবুও বই দিতে পারেন নি। এজন্য একখানি

পুরাতন "নারায়ণ" কিনেছেন, তাতেও সমস্ত নাই; তাই আমায় খুঁজছেন। আমার "নারায়ণ" আছে তিনি জানতেন। আমি বলেছিলাম "বেণের মেয়ে" বই আছে, আপনাকে দিতে পারিব। তিনি তাতে বলেছিলেন, "খুব নিশ্চয় করে তুমিও বলতে পার না, তোমারও তো বাড়ীতে ভাইপোরা আছে।" আমি তাঁকে ২।৩ দিনের মধ্যেই "বেণের মেয়ে" দিয়ে যাব বলি। তারপর তিনি বলেন যে, "বসব না বেড়াব"। আমি বলেছিলাম, "আপনার যা ভাল লাগে তাই করুন, আমার জন্য বসিবার দরকার নাই"। তিনি বলেন, ২২ বার এ স্থানটা ঘুরলে আধ মাইল হবে, মনে করেছি হাঁটব, একটু হাঁটি"। তারপর তিনি ও আমি হাঁটতে লাগলুম। হাঁটার সময় "বেণের মেয়ে" নিয়ে কথা হইল। পাঁচবার পায়চারি করিবার পর তিনি বলিলেন যে, তিনি আর হাঁটিবেন না, কারণ বলিলেন, মাথাটা একটু ঘুরছে। মাঝে মাঝে এরূপ তাঁর হইত। তখন ঘরের মধ্যে দুই চেয়ারে দুজনে বসে নানা কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। গোল-টেবিল বৈঠকের কত কথা হইল। মহাত্মা গন্ধী-সম্বন্ধে কথা হইল। এ প্রসঙ্গে তিনি পূর্ব্বে অনেকবার বলেছেন, পুনর্ব্বার বলিলেন, নুন তৈয়ারীর সময় যখন খুব পুলিশের মার-ধর হইতেছিল, তখন একজন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করে যে, বড় মার আরম্ভ হলো যে; তাতে গন্ধীজী উত্তর দিয়েছিলেন, "মারনে দেও উস্‌মে পয়সা পয়দা ন হোগা", এ কথাটা তাঁর বড় ভাল লেগেছিল। তিনি মহাত্মাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। শাস্ত্রীমহাশয় প্রকৃত দেশভক্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন যে তিনি প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে যে সকল মাল-মসলা সংগ্রহ করে গেলেন তাতে দেশের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি আনতে সহায়তা করেছে ও করবে। তিনি স্বদেশী বক্তৃতা না দিয়াও দেশের যে সকল লুপ্তকীর্ত্তি পুনরুদ্ধার করেছেন তাতে দেশকে বড় করে তোলার অনেক কিছু করেছেন। নেপালের মৃত মন্ত্রী মহারাজ চন্দ্রসমসের জঙ্গ বাহাদুরের এক পুত্র তাঁকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া, শাস্ত্রী মহাশয়ের যাবতীয় লেখা যে তিনি বাঁধিয়ে রেখেছিলেন তাহা দেখান। আর বলেন যে লোকে স্বদেশী স্বদেশী কি বলে, খাঁটী স্বদেশী কাজ তো তিনি করেছেন, এগুলি তো তার নিদর্শন। ঐগুলি দেশের লোকের চোখ খুলে দিয়েছে। এক কথার মধ্যে অনেক কথা আসিয়া পড়িল। শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে এত কথা মনে পড়ে যে, কথা আপনিই বেড়ে যায়। শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলিতেছি এমন সময় তাঁর তৃতীয় পুত্র পরিতোষ বাবু এলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, ২।৩ দিনের মধ্যে কাব্যখণ্ডটী শেষ হইবে, তখন আমার শুক্রনীতির মুখবন্ধ ও শিলালিপি প্রভৃতি কাজ করে দিবেন। তিনি আমার নিকট স্তবের বই আছে কিনা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন। ঐ সময় কথা হয় যে উহাও "বেণের মেয়ের" সঙ্গে নিয়ে যায়। তিনি আমার সামনে তাঁর পুত্রকে বলেন যে, শুক্রবার নাগাদ ২।৩ দিনের জন্য নৈহাটী যাবেন। তারপর তাঁর বাতের চর্ব্বি ভাঙ্গাস্থানে মালিস করিবার সময় হওয়ায়, তিনি পুত্রের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন, আমি বিদায় লইয়া আসিলাম। এই আমার শেষ সাক্ষাৎ, শেষ বিদায় ও শেষ প্রণাম করিয়া আসা।

মৃত্যুর দিন তাঁর মধ্যম পুত্র আশুতোষবাবু শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত বৈকালে দেখা করিয়া গেছেন। তখন কোন কুলক্ষণ দেখে যান নি। দৈনন্দিন কাজ যেমন করিতেন সেদিনও তাই করিয়াছেন। রাত্রে ৬ খানির স্থানে ৪ খানি লুচি খান। বর্ত্তমানে যে ছেলেটী তাঁর গণেশের কাজ করিত সে "কমলা বুক ডিপো"র চাকরি পাওয়ায় তিনি তাঁকে আশীর্ব্বাদ করে রাত ১০টায় শুইয়াছেন। এই "কমলা বুক ডিপো"র সহিত শাস্ত্রী মহাশয় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি আমাকেও উহাতে লইয়া গিয়াছেন। তিনি শয়ন করিলে, সকলে নীচে নামিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ 'মরে গেলুম' চীৎকার শুনে, সকলে তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে ঘরে গিয়ে দেখে যে, তিনি বসিয়া ছটফট করিতেছেন, কাশছেন, আর কাশি ফেলিতেছেন। সকলে তাঁকে সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। তিনি ঘামিতেছিলেন, মুছাইয়া দেওয়া হইল। তিনি স্বভাব-সুলভ ধীরে বলিয়াছিলেন, "বাবা রামলাল এবার আর আমায় রাখতে পারলি নি।" এখন-কার চাকরটির নাম "রামলাল"। পুত্রেরা কেহ কাছে বর্ত্তমানে থাকিত না। ঐ সময় বড় পৌত্র ও এক দৌহিত্র তাঁর নিকট ছিল। অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া একজন

নিকটস্থ ডাক্তার ডাকিতে গেল, অন্য একজন শাস্ত্রী মহাশয়ের ভ্রাতষ্পুত্র ডাঃ শিববাবুকে ডাকিতে গেলেন। ইতিমধ্যে শাস্ত্রী মহাশয় একবার স্বয়ং উঠিয়া প্রস্রাব করিলেন, ত.রপর জল খাইয়া বিছানায় ডানদিকে কাত হইয়া পড়িলেন। সুস্থভাবে শুইয়াছেন বোধ করিয়া গায়ে লেপ দেওয়া হয়; কিন্তু পায়ে হাত দিতে পা ঠাণ্ডা বোধ হয়, আরও ভাল করে চাপা দেওয়া হয়। তারপর হাত ধরে হাতে নাড়ী না পাওয়ায় সকলে চঞ্চল হয়ে উঠে। তখন একজন ডাক্তার এসে পড়ে। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে 'সময় নেই', তার একটু পরেই শিববাবু সপরিবারে আসিয়া পড়েন, বোধ হয় তখন শাস্ত্রী মহাশয় পরপারে চলে গেছেন।

সেই রাত্রেই শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্রদের খবর দেওয়া হয়। বড় ও চতুর্থ পুত্র কর্ম্মস্থানে থাকায় তাঁরা আসিতে পারেন নাই। অন্য তিন পুত্র আসিয়া তাঁর ভৌতিক দেহ নৈহাটীতে লইয়া যান, সেখানেই তাঁর শেষ কার্য্য যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হয়, কারণ শাস্ত্রী মহাশয়ের এইরূপই ইচ্ছা ছিল।

শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা

শ্রীনিখিলনাথ রায়

একালে শাস্ত্রী মহাশয় বলিতে স্বর্গগত পাণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে বুঝায়, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাই আমরা 'শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায়' তাঁহারই সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতেছি। নৈহাটীর সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-পাণ্ডিত-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বংশানুরূপ ব্রাহ্মণ্যের সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষার সংমিশ্রণে যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধান হইতে সকলেই বুঝিতে পারেন। তিনি প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে যে একজন দিক্‌পাল ছিলেন, সে কথা বোধহয় নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্নতত্ত্বে তিনি অনেক সময়ে পাশ্চাত্য মতের পক্ষপাতী হইলেও নিজের মৌলিকতা দেখাইতে ত্রুটী করিতেন না, আর আচার-ব্যবহারে তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই ছিলেন, তিনি তথাকথিত সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, সামাজিক আচার-ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তত্ত্ব-হিসাবে তিনি পাশ্চত্য মতের অনুসরণের চেষ্টা পাইতেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যে তিনি যে সকল অক্ষয় দান দিয়া গিয়াছেন, তাহাও যে অতুলনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার 'বাল্মীকির জয়' বঙ্গ-সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নিকট শুনিয়াছি যে, হরপ্রসাদের 'বাল্মীকির জয়' ও চন্দ্রশেখরের 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' জগতের যে কোন সাহিত্যের নিকট স্পর্দ্ধা করিতে পারে। আর শাস্ত্রী মহাশয়ের মেঘদূত ব্যাখ্যা যে বঙ্গসাহিত্যে এক নবরসের সঞ্চার করিয়াছে তাহাও বলিতে হইবে। তাঁহার 'বেণের মেয়ে' যে সেকালের একটী নিখুঁত চিত্র, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহার 'কাঞ্চন-মালার' কথা কেহ ভুলিতে পারিবেন না। আর তাঁহার গবেষণা পূর্ণ প্রত্নতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী তাঁহাকে সকলের নিকট চির-অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার শেষ-জীবনের কার্য্য হইয়াছিল, বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণের বিবরণ প্রদান। একার্য্য তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, সম্পূর্ণ হইলে ইহা বাঙ্গলার ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা করিত।

প্রত্নতত্ত্বে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিভা উজ্জ্বলভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি যে কত পুঁথি ঘাঁটিয়া নূতন নূতন পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ইহার জন্ত তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণও

করিয়াছেন। নেপাল হইতে অনেক নূতন পুঁথির আবিষ্কার করিয়া তিনি অনেক নূতন নূতন তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনই প্রধান। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কিরূপে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, নানা পুঁথি-পত্র হইতে তিনি তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালার ধর্ম্মঠাকুরের পূজা যে বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন, শাস্ত্রীমহাশয় প্রথমেই তাহা বুঝাইয়া দেন। হিন্দু-দর্শন ও বৌদ্ধদর্শনের সম্বন্ধ কিরূপ, অনেক সময়ে তিনি তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালীজাতির প্রতিভা প্রাচীনকাল হইতে কিরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, শাস্ত্রী মহাশয় তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীকে একটা আত্মবিস্মৃত জাতি বলিয়া অভিহিত করিতেন। কি প্রত্নতত্ত্বে, কি সাহিত্যে, সর্ব্বত্রই শাস্ত্রীমহাশয় অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শাস্ত্রীমহাশয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকটেই প্রথমে প্রত্নতত্ত্ব-আলোচনা আরম্ভ করেন। সে সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রত্নতত্ত্বে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন ও সে বিষয়ের অনেক নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেছিলেন. ডাক্তার রামদাস সেনেরও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় নাম ছিল। হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন, এমন কি ভয়ও করিতেন। সে বিষয়ে তাঁহার নিজ মুখ হইতে শ্রুত একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। যে সময়ে পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। অবশ্য দত্ত মহাশয় পাশ্চাত্য মতের ব্যাখ্যারই পক্ষপাতী ছিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের ন্যায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কদাচ তাহার সমর্থন করিতে পারেন না। তাই বঙ্গবাসীতে তিনি রমেশচন্দ্রের মতের প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন। কেহ কেহ চূড়ামণি মহাশয়কে, আবার কেহ কেহ রমেশচন্দ্রকে সমর্থন করিতে লাগিয়া যান। 'গ্রীক ও হিন্দু' প্রণেতা প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি চূড়ামণি মহাশয়কে এবং হরপ্রসাদ প্রভৃতি রমেশচন্দ্রকে সমর্থন করেন। হরপ্রসাদের চূড়ামণি মহাশয়ের কথার প্রতিবাদ রাজেন্দ্রলালের ভাল লাগে নাই। তিনি তজ্জন্য হরপ্রসাদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন। একদিন হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে রাজেন্দ্রলাল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হরপ্রসাদের সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। পরে হরপ্রসাদের অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর রাজেন্দ্রলাল তাঁহাকে জানাইয়া দেন যে,চূড়ামণি মহাশয়ের কথার প্রতিবাদে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। হরপ্রসাদ তাহার পর হইতে সে সম্বন্ধে আর কিছুই লেখালিখি করেন নাই।

সাহিত্যালোচনায় ইনি অবশ্য বঙ্কিমতরুর ছায়া আশ্রয় করিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম যুগে অক্ষয়চন্দ্র, দীনবন্ধু, রামদাস প্রভৃতই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান সহায়ক ছিলেন। কিন্তু শেষ যুগে চন্দ্রনাথ হরপ্রসাদ প্রভৃতি বঙ্গদর্শনের গৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠাল-পাড়ার ভবনে একটা সাহিত্য-বৈঠক বসিত। হরপ্রসাদ প্রভৃতি সেই বৈঠকে যোগদান করিতেন। আনন্দমঠের পূর্ব্বে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। সঙ্গীত রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বৈঠকের সকলকে শুনাইলেন। হরপ্রসাদও সে বৈঠকে ছিলেন। বাঙ্গলা ও সংস্কৃত মিশ্রিত সঙ্গীতটী তাহাদের ভাল লাগিল না বলিয়া প্রকাশ করায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন যে, 'দেখিবে দেশে ইহার কিরূপ আদর হয়'। হরপ্রসাদ প্রভৃতি সাহিত্যের দিক দিয়াই ঐ কথা বলিয়াছিলেন, আর বঙ্কিমচন্দ্র দেশানুরাগের দিক দিয়া তাঁহার মত ব্যক্ত করেন। শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমবাবুর কথাই যে শেষে ঠিক হইয়াছিল, তাহা অবশ্য এক্ষণে বুঝা যাইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু এখানে তাহা সম্ভব নহে। মাত্র এই দুই চারিটী কথা বলিয়াই শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা শেষ করিলাম।
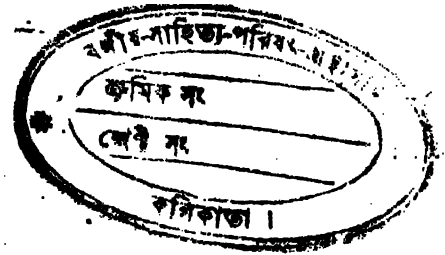
মনীষী হরপ্রসাদ

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

গত ১লা অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, রাত্রি এগারটার সময় মনীষী মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এই অতন্দ্রিত নিরলস একনিষ্ঠ মনস্বী যশস্বী সাহিত্যিকের পরলোক-গমনে কেবল বঙ্গসাহিত্যের নয়, শিক্ষিত বঙ্গীয় সমাজেরও ইন্দ্রপাত হইয়াছে। সাহিত্যের তপোবনে আজ বিষাদের পরিম্লান ঘনচ্ছায়া প্রকটিত হইতেছে।

পূর্ণ অর্দ্ধ শতাব্দী কাল শুধু বাঙ্গালী কেন,—ভারতবাসী, ভারতবাসী কেন—ইংলণ্ড ও আমেরিকাবাসী তাঁহার অম্লান প্রতিভার জ্যোতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। বাঙ্গালীর অতীত গৌরব—সম্যক্ বিলুপ্ত ঐশ্বর্য্য এই আত্মসমাহিত নীরব তপস্বী বিস্মৃতির অতলগর্ভ হইতে টানিয়া তুলিয়া বিশ্বের নিকট তাহা প্রচার করিয়া বাঙ্গালীকে গৌরবদীপ্ত করিয়াছেন —সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে বাঙ্গালীর সম্মান ও মর্য্যাদা বাড়াইয়াছেন। অতঃপর 'বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি' এই মহাতত্ত্বের নিগূঢ়তা প্রকীর্ত্তন করিয়া তিনি স্বজাতির উদ্বোধন করিয়াছেন; ইহাতে তিনি দেশবাসীর নিকট অমর ও পূজাস্থানীয় হইয়াছেন।

তিনি ছিলেন তপোব্রতী; জীবনব্যাপী বিরাট্ জ্ঞানযজ্ঞ ও তপঃসাধনার সমগ্র ফল জাতির প্রাণ-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কামনাশূন্য হইয়া জাতিকে বিলাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

যে শক্তিশালী পুরুষের তিরোধানে শ্রদ্ধাঞ্জলি-তর্পণে ধন্য হইবার জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার সংস্কৃত-সাহিত্যে ও প্রত্নতত্ত্বে অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া মস্তক আপনা হইতেই তদীয় চরণে অবনত হইয়া পড়ে।

ত্রিশ বৎসরের অধিক সেই পূজ্যপাদের পদানুধ্যাত হইয়া তাঁহার মধ্যে দেখিয়াছি—কি তীব্র কি দৃঢ় তাঁহার জেদ। যাহা করিতেন তাহা করিতেনই, কাহারও বাধা শুনিতেন না। কি উৎকট ছিল তাঁহার সাহসিকতা—কিন্তু তাহা একেবারেই অনুদ্ধত; মধ্যে মধ্যে তাঁহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া ভয় হইত—কিন্তু সে গাম্ভীর্য্য ছিল সতত নিষ্কপট। ধার্ম্মিকতার চিত্র তাঁহার মধ্যে দেখিয়া মনে মনে চরণে প্রণিপাত করিয়াছি—সে ধার্ম্মিকতা সকল সময় দেখিয়াছি অনাড়ম্বর। অমায়িকতা তাঁহার কথালাপকে সর্ব্বদা হাস্যোজ্জ্বল রাখিত। ন্যায়ের পক্ষপাতী হইতে গিয়া খোসামোদকে তিনি কখনও ভুলিতেন না, মিষ্ট কথায়ও বাধ্য হইতেন না—সেখানে তাঁহার চিত্ত ছিল বজ্র হইতেও কঠোর। কিন্তু অন্য সময় কাহার সাধ্য বোঝে তিনি এত বড় একটা তুখোড় পণ্ডিত। তখন তিনি রঙ্গ-রসিক, একজন পুরাদস্তুর সেকেলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। সকল সময় আবার চালচলনেও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বেশভূষায়ও তাই। এদিকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইলেও বাঙ্গলা ভাষার প্রতি তাঁহার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সুলভ উপেক্ষা ছিল না। দুঃখ-কষ্টে বিদ্যার্জ্জন করিয়া অর্জ্জিত বিদ্যারও যেমন সদ্ব্যবহার তিনি করিয়াছেন, অর্জ্জিত বিত্তেরও সদ্ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার দানও অদ্ভুত ছিল; সে দান এত গোপনে যে কাহারও জানিবার যো ছিল না।

বিশেষ কৃতিত্বের সহিত লিখিত তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তক তাঁহার কীর্ত্তির একমাত্র পরিচয় নয়, পরন্তু যুগে যুগে বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহাসিক ধারাগুলির অজ্ঞাতপূর্ব্ব সম্বন্ধ পরম্পরার কত উৎসের সন্ধান তিনি দিয়াছেন; সেগুলি অবলম্বন করিয়া রাশি রাশি গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে।

বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার মৌলিক প্রতিভার অবদান অতুল্য ও অমূল্য। তাঁহার ধর্ম্মপূজার ইতিহাস, বিবরণ ও ব্যাখ্যা তাঁহার নিজস্ব, তাঁহার আবিষ্কার। তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী, তাঁহার ভাষাও ছিল খাঁটি বাঙ্গলা। ভাষার ধাতু তাঁহার হাতে কোথাও বিগড়াইয়া যায় নাই। তাঁহার বুঝাইবার পদ্ধতি এমন সরল, সুন্দর— তাঁহার ভাষা এমন স্বচ্ছ ও তরল যে, ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত বুঝিয়া আস্বাদন করিতে

পারে। তার উপর তাঁহার মত সরল কাণ্ডজ্ঞানী পুরুষ মেলা ভার।

তাঁহার প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইবে না। জগতের যেখানে প্রাচীনতত্ত্বের আদর সেইখানেই শাস্ত্রী-মহাশয়ের আদর হইয়াছে।

এইবার তাঁহার জীবন সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

রাজেন্দ্র বিদ্যালঙ্কার যশোহর নলডাঙ্গার রাজাদের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজেন্দ্রের বংশ পণ্ডিতের বংশ বলিয়াই বিখ্যাত ছিল। মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ রাজেন্দ্রের প্রপৌত্র ছিলেন। ইনি খুলনা জেলা, দৌতা পরগণা, কুমিড়া গ্রাম হইতে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া নৈহাটীতে বাসস্থান স্থাপন করেন; ইনি জগন্নাথ তর্কালঙ্কারের সমসাময়িক ছিলেন। সে প্রায় ১৭৬০ সালের কথা। ইহার কিছু পূর্ব্বে আমাদের বংশ নৈহাটীতে গিয়া বাস করে। ৯০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া মাণিক্যচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহার দুই স্ত্রী ছিলেন। প্রথমার গর্ভে সদাশিব তর্কভূষণ—ইনি শ্রীরামপুরের গোস্বামীদের সভাপণ্ডিত ছিলেন। দ্বিতীয়ার গর্ভে শ্রীনাথ তর্কপঞ্চানন—ইহার পুত্র রামকমল ন্যায়চুঞ্চু পরে 'ন্যায়রত্ন' উপাধি পান। ইনি বঙ্গদেশের মধ্যে একজন বড় নৈয়ায়িক ছিলেন। রামকমলের ছয় পুত্র—নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু, রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য, যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, হেমনাথ ভট্টাচার্য, শরৎনাথ ভট্টাচার্য্য ও মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য। নন্দকুমার 'শব্দসার' অভিধান-প্রণেতা। ইনি ন্যায়শাস্ত্রে মস্ত পণ্ডিত ছিলেন। শরৎনাথ ও মেঘনাথ যখন শিশু তখন রামকমলের মৃত্যু হয়। শরৎনাথের জন্ম ১৮৫৩ সালের নভেম্বর মাসে। বাল্যকালে গ্রামে কিছুদিন অধ্যয়নের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকুমারের সহিত মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীতে গমন করিয়া যদুনাথ, হেমনাথ, শরৎনাথ ও মেঘনাথ কান্দী (রাজ) স্কুলে ভর্ত্তি হ'ন। ১৮৬১ সালের ১লা নভেম্বর ৭ বৎসর বয়সের সময় তিনি ঐ স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হ'ন। তারপর ১৮৬৩ সালে শরৎনাথ কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হ'ন। তখন 'শরৎনাথ' নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার নাম 'হরপ্রসাদ' হইয়াছে। এরূপ নাম হইবার একটু রহস্যও আছে। সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে তাঁহার কঠিন পীড়া হয় এবং মহাদেবের অনুগ্রহে ও প্রসাদে আরোগ্যলাভ করেন। এইজন্য বালক শরৎনাথের নাম হইল 'হরপ্রসাদ'। হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আগমন করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে বাসস্থানাদি দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৮৭১ সালে প্রথম বিভাগে Entrance পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে ১৮৭৩ সালে প্রথম বিভাগে হরপ্রসাদ F. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। ১৮৭৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অষ্টম স্থান অধিকার করিয়া বি, এ পাস করেন। ঐ বৎসর বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু হরপ্রসাদ সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হ'ন। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে তিনি 'ভারত-মহিলা' * নামক গ্রন্থ লিখিয়া মহারাজ হোলকার-প্রদত্ত বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হ'ন। ১৮৭৭ সালে সংস্কৃত কলেজ হইতে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। সে বৎসর সংস্কৃতে আর কেহ পরীক্ষা দেন নাই। বরাবর সংস্কৃত-কলেজের ছাত্ররূপে এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন; সংস্কৃত কলেজে তাঁহার অধ্যয়ন-কালে মনীষী প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৮৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শাস্ত্রী মহাশয় সরকারী অনুবাদক ও হেয়ার স্কুলের হেডপণ্ডিত নিযুক্ত হ'ন। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন।

১৮৮০ সালে নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নিযুক্ত হ'ন।

১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বেঙ্গল লাইব্রেরীর সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষ (Asst. Librarian) নিযুক্ত হ'ন।

১৮৮৩ সালে নৈহাটী বেঞ্চের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হ'ন। পরে বরাবর ইহার সভাপতি থাকেন।

* প্রথমে ইহা বঙ্গদর্শনে বাহির হয়।

১৮৮৯ সালে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য হ'ন।

১৮৮৬ সালে বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান হইয়া আট বৎসর প্রশংসার সহিত কাজ করেন।

১৮৮৮ সালে Central Text Book Committeeর সভ্য হ'ন। ১২ বৎসর আগে ঐ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হ'ন্।

১৮৯১ সালের জুলাই মাসে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যু হইলে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে পুথি-সংগ্রহ-ব্যাপারে ডিরেক্টর হ'ন।

১৮৯৪ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন।

১৮৯৬ সালে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রযত্নে প্রেসিডেন্সী কলেজে এম্ এ ক্লাস খোলা হয়।

১৮৯৮ সালে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষপদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষতার সহিত অধ্যক্ষতা করেন।

১৯০৪ সালে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটীর পক্ষ হইতে প্রতিনিধি রূপে Royal Asiatic Societyর Bombay শাখার শতবার্ষিক উৎসবে যোগদান করেন।

১৯০৮ সালে তিনি সংস্কৃত-কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

শাস্ত্রী মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ ছিলেন তখন স্কুলবিভাগে তিন জন অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত হয়। সংস্কৃত কলেজে পূর্ব্বে এম এ পরীক্ষায় মাত্র 'A.' Group পড়ান হইত। শাস্ত্রীমহাশয়ের উদ্যোগে 'B' ও 'D' Group খোলা হয়। সংস্কৃত কলেজের চতুষ্পাঠী-বিভাগে তিনি একজন ন্যায়ের অধ্যাপক, একজন স্মৃতির অধ্যাপক এবং একজন বেদান্তের অধ্যাপকের পদ প্রবর্ত্তিত করেন। ইহারই ফলে সংস্কৃত কলেজে Associationএর সৃষ্টি হয়।

১৯০৮ সালে অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ম্যাকডোনেল উত্তর-ভারত ভ্রমণ করিবার জন্য ভারতে আগমন করেন। শাস্ত্রী মহাশয় সরকার হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া ঐ অধ্যাপকের সহিত পুরী, বাঁকীপুর, নালন্দা, রাজগৃহ, মুজফ্ফরপুর, কাশী, লক্ষ্ণৌ, বলরামপুর, সাহেট-মাহেট, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, পেশাওয়ার, ঝাঁসী, খাজুরাহো ও বোম্বাই ঘুরিয়া আসেন। এই সময় অক্সফোর্ডে ম্যাক্স্‌-মূলরের স্মৃতি-রক্ষার্থে যে সভা হয়, তাহার জন্য তিনি কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য বৈদিক পুথি সংগ্রহ করেন। নেপাল-মহারাজ স্যর চন্দ্রসমসের জঙ্গ বাহাদুর বোডলিয়ন লাইব্রেরীতে প্রায় ৭০০০ পুথি দান করেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের উদ্যোগেই এই পুথিগুলি কেনা হয়, তিনিই এইগুলি গুছাইয়া তালিকা করিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

১৯১০ সালের ৫ই জানুয়ারির একখানি পত্রে লর্ড-কর্জন শাস্ত্রীমহাশয়কে এজন্য বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১৯১১ সালে তিনি সিমলায় "Conference of Orientalists"এর সদস্য মনোনীত হ'ন।

এই বৎসর দিল্লী-করোনেশন-দরবার উপলক্ষ্যে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, ই উপাধি প্রদান করেন।

১৯১২ সালে স্যর জন মার্শালের অনুরোধে তিনি তিন বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া ১২০০০ পুথি প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের জন্য ক্রয় করিয়া দেন।

শাস্ত্রীমহাশয় সাহিত্যচর্চ্চা, ঐতিহাসিক গবেষণা প্রভৃতি কার্য্যে নিজেকে লিপ্ত রাখিয়াও এক সময় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন-কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের বিদ্যালয়কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া তোলা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। স্যর আশুতোষের সহিত বহুকাল হইতেই তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সাধারণের ধারণা স্যর আশুতোষের সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের মনের মিল ছিল না। শেষ জীবনে অবশ্য মত-বিরোধ হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহাদের বন্ধুত্ব এতই গাঢ় ছিল যে, তাহা সুদৃঢ় করিবার জন্য শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার পুত্রদের নামের সঙ্গে আশুতোষের "তোষ" শব্দটী জুড়িয়া দেন। এদিকে আশুতোষও তাঁহার পুত্রগণের নামের সঙ্গে 'হরপ্রসাদের' 'প্রসাদ' শব্দ যোগ করিয়া দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল 'চেয়ার' লইয়া যখন গোলযোগ আরম্ভ হয় তখন তিনি কলিকাতা হইতে পাটনা বিশ্ব-

[illegible]লয়ে চলিয়া যান। সেখানে 'মগধ' সম্বন্ধে বহু গবেষণার পরিচয় দিয়া বক্তৃতা করেন। মগধসংক্রান্ত গ্রন্থ তাঁহার মনীষার একটী বিশিষ্ট পরিচয়। পাটনা হইতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিডার' নিযুক্ত হ'ন। ঢাকা তাঁহাকে [illegible]r of Literature উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। [illegible] ঢাকার কাজ ছাড়িয়া তিনি কলিকাতায় বসিয়া গবেষণা করিতে থাকেন। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন। তিনি অকাতরে পরিষদের সেবা করিয়াছেন। পরিষদের বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠার মূলে শাস্ত্রীমহাশয়ের কৃতিত্ব অনেকখানি; তিনি ১৪ বৎসর (১৯০৪ ১৯০৯, ১৯১৮,১৩১৯, ১৩২৩, ১৩২৪, ১৩২৫, ১৩৩১, ১৩৩৭, ১৩৩৮) ভারতের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। ৬ বৎসর আবার (১৩২০, ১৩২২, ১৩২৬, ১৩৩০, ১৩৩২ ১৩৩৬) ঐ সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রত্নতত্ত্ব-প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর দুইবৎসর (১৯ ৯-১৯১) সভাপতির পদ গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই সোসাইটীর তিনি Philological Secretary ও সহকারী সভাপতি ছিলেন। পরেও তিনি Philological Secretary ও সহকারী সভাপতির পদে বৃত ছিলেন। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ধন্য হইয়াছে।*

* চন্দননগর নৃত্য-গোপাল লাইব্রেরী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শোক-সভার সভাপতির অভিভাষণ।

পরলোকে হরপ্রসাদ *

শ্রীসতীশচন্দ্র বসু

সভাপতি ও ভদ্রমহোদয়গণ,

শাস্ত্রী মহাশয়ের কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয় কলিকাতায়। কলিকাতা হইতেই তাঁহার যশোরবি সমগ্র ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকা পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। কি সংস্কৃত সাহিত্য, কি প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্যায়, কি প্রাচীন বাঙলা ও বৌদ্ধভাষার আলোচনায়, কি ইতিহাস-চর্চ্চায়, সকল বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং সেই কারণে তাঁহাকে সাহিত্য-মণ্ডলী মধ্যে এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একধারে এত পাণ্ডিত্য [illegible] করা জগতে অতিশয় বিরল, এজন্য তিনি জীবদ্দশায় সমগ্র [illegible] ও রাজসরকারে এমন কি বহু গবর্ণর কর্ত্তৃক বহুবার [illegible] রাজ-সম্মানে বিভূষিত হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার [illegible] লোক ও আত্মীয়—তাঁহাকে পণ্ডিত [illegible] কিন্তু তিনি যে কত বড় পণ্ডিত ছিলেন তাহার ধারণা করা আমাদের জ্ঞানাতীত। তিনি ১৯০৮ সালে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে—কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর দিন ১৭ই নবেম্বর পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যাচর্চ্চা হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কলিকাতায় নানারূপ কার্য্য-কলাপের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও তিনি দেশের অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রথম বয়সে মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ ভাইসচেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান হইয়া দেশের অনেক হিতকার্য্য করেন। পরে যখন দেখিলেন উহাতে দলাদলি পাকান ছাড়া আর কিছুই কার্য্য হয় না, তখন উহা ছাড়িয়া

---

* শাস্ত্রী মহাশয়ের বাসভূমি নৈহাটীতে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে ২২শে নবেম্বর তারিখে নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির অফিস-প্রাঙ্গনে শোকসভায় পঠিত।

দিলেন। এ ছাড়া তাহার দেশের প্রধান কার্য্য ছিল তার সাধের 'মহেন্দ্র-স্কুল'—

১৮৮৩ খৃঃ অব্দে আমার পিতা স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসুর মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার স্থগিত এই স্কুলটী শাস্ত্রীমহাশয়ের হাতে আসে। সে সময়ে তাহার আয় সামান্য ছিল ও অবসর তত ছিল না; কিন্তু যতটা পারিয়াছেন অকাতরে তিনি পয়সা খরচ ও অর্থ-সংগ্রহ করিয়া স্কুলটীকে নানা বিঘ্ন-বিপত্তির হাত হইতে উদ্ধার করিয়া আজ উহাকে যে অবস্থায় দাঁড় করাইয়াছেন সেরূপ করা যে সে লোকের কর্ম্ম নয়। স্কুলটী আজ একটী প্রথম শ্রেণীর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিগণিত হইয়াছে। নিজের আর্থিক উন্নতি ও পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই স্কুলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধন করিয়া তিনি তাঁহার দেশ-হিতৈষণা ও মহানুভবতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁর দেশের কর্ম্মজীবনের কথা বলিতে গেলে তাঁর সাধের নৈহাটির মহেন্দ্র-স্কুলের কথা বলিতে হয় এবং সেই সঙ্গে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের সহিত তাঁর কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল সে বিষয়ে একটু না বলিলে তাঁহার জীবন-চরিতের এক অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দে যখন তিনি প্রথম চাকুরী হেয়ার স্কুলে হেড পণ্ডিতি করিতেন সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে সংস্কৃত-অধ্যাপকের পদ ছয় মাসের জন্য অস্থায়ীভাবে খালি হয়। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় তিনি সেই চাকুরিটী লইয়া লক্ষ্ণৌ যান। আমিও তখন তাঁহার সঙ্গে সেখানে গিয়াছিলাম। আমার তখন বয়স ১০ বৎসর মাত্র। এরূপ অল্পবয়সে পিতামাতার কোল ছাড়িয়া তাহার সহিত যেমন বিদেশে গিয়াছিলাম তিনিও তদ্রূপ আমাকে পুত্রাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। এমন কি রাত্রে একখানি দড়ির খাটিয়ায় দুজনে শয়ন করিতাম। আমার পিতা আমাদের হুগলির পোলে তুলিয়া দিবার সময় বুঝিতে পারেন নাই যে, আমি বাস্তবিক তাঁহার সঙ্গে যাইব। কিন্তু আন্তরিক স্নেহ এমন জিনিষ যে, আমি পিতামাতাকে ছাড়িয়া দশ বৎসর বয়সে তাহার সহিত সুদূর লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলাম। যাবার সময়ে আমার পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, প্রথমে কার্ম্মটার ষ্টেশনে নামিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রণাম করিয়া যাইও। সেজন্য আমরা সন্ধ্যার সময় কার্ম্মটারে নামিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রণাম করিবার সময় তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ ছেলেটী কে?" তিনি বলিলেন, "এটি আমার ভাই-পো"। তাঁর 'ভাই-পো' বলিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট তখন পরিচিত হইলাম। তারপর যখন রাত্রে আহারের সময় হইল, আমার আসন একটু পৃথক করিয়া দিতে পাচককে ইঙ্গিত করায় বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ হে হরপ্রসাদ, তুমি না বললে এ ছেলেটী তোমার 'ভাইপো'? তবে আহারের আসন এরূপ পৃথক করছ কেন।" তাহাতে তিনি যে উত্তর দিলেন তাহা আজও আমার অন্তরের মর্ম্মস্থলে চিরদিনের মত জলন্ত অক্ষরে গাঁথা রহিয়াছে। তিনি বলিলেন "ওরা কায়স্থ, কিন্তু আমার মা সর্ব্বদা বলেন যে, তোমরা ছয়টী সহোদর বটে, কিন্তু তোমার মহেন্দ্রদাদাও আমার আর একটী সন্তান জানিবে। মাতৃবাক্য তিনি ও তাঁর সহোদরেরা কিরূপ প্রতিপালন করে এসেছেন তার আর একটু আভাস এইখানে দিই। যেদিন আমার পিতা ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, সেদিন শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতায়। তাঁর কনিষ্ঠ মেঘনাদবাবু বাবার নিকটে ছিলেন, মুমূর্ষু অবস্থায় আমার বাবা তাঁকে বলিয়া যান, হরপ্রসাদকে বলিও আমার স্কুল আর ছেলেরা রহিল।"

বাবার মৃত্যুর পর আমাদের সাংসারিক অবস্থার ভীষণ পরিবর্ত্তন ঘটে, এমন কি অতি কষ্টে ভরণ-পোষণ হইত। কিন্তু আমার পড়াশুনার ব্যবস্থা শাস্ত্রীমহাশয় করিয়া দেন। তিনি আমার মাসিক ৩৲ টাকা বেতন দিয়া হুগলি কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন ও সর্ব্বদা লেখাপড়ার তত্ত্বাবধাণ করেন। বলিতে গেলে তিনি আমার একরূপ প্রতিপালক হইলেও তাঁর কণিষ্ঠ মেঘনাদবাবুও এ বিষয়ে পরাঙ্মুখ হ'ন নাই। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শাস্ত্রী মহাশয় ও তাঁর ভা'য়েরা তাঁদের সেই মাতৃবাক্য কিরূপভাবে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় ২৪ বৎসর গবর্ণমেন্টের পেনসেন ভোগ করিয়া পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু কর্ম্ম-জীবনের অবসর লইবার সময় পান নাই। এসিয়াটিক্

সোসাইটী, সাহিত্য-পরিষদ, ইউনিভারসিটী আর তাঁর দেশের স্কুলগুলির কার্য্য করিতে করিতে দেহপাত করিয়াছেন, এমন কি মরণের শেষদিন পর্য্যন্তও স্কুলের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে গিয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহার মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বেই স্কুলের সেক্রেটারী নরেন রায়ের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। কাহার উপর সেই ভার দিবেন সেই ভাবনাই তাঁর প্রধান ভাবনা হইয়াছিল। কলিকাতার কার্য্যগুলিতে যথেষ্ট কর্ম্মী আছেন, কিন্তু দেশের স্কুলে তিনি একমাত্র কর্ণধার ছিলেন বলিয়া এই ভাবনা তাঁর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ছিল।

ট্র্যাফালগার যুদ্ধে আহত হইয়া বীরবর হোরেশিও নেলসন যেরূপ মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া তাঁহার নিকটস্থ সহকর্ম্মী এডমিরল হার্ডিকে ডাকিয়া মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে যুদ্ধের শেষ ফল জানিবার পূর্ব্বে স্বদেশবাসীদিগকে 'কর্ত্তব্য-কর্ম্ম হইতে বিচলিত হইও না' বলিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয়ও তদ্রূপ শেষ মুহূর্ত্তে তাঁর কাজের অসম্পূর্ণতার ভাবনা ভাবিয়া তাঁর নিকটে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বলেন "কিরে বাঁচাতে পারলিনে—যাঃ ভবের খেলা সাঙ্গ হ'ল" এই শেষ বাক্য বলিয়া তার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, আর সেই সঙ্গে বঙ্গের সাহিত্যাকাশের প্রদীপ্ত রশ্মি চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়া গেল। নশ্বর দেহ কলিকাতা হইতে আনিয়া নৈহাটির গঙ্গাতীরে ভস্মীভূত হইল—সব ফুরাইয়া গেল।

আজ আমরা সেই মহাপুরুষের মহাপ্রস্থানের শোক-প্রকাশে সমবেত হইয়াছি। কি করিয়া তার স্মৃতিরক্ষা করিতে পারি তার উপায় উদ্ভাবনা করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আপনারা তাঁর সহৃদয় দেশবাসী—আপনাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, যাতে তাঁর দেশের অসম্পূর্ণ কার্য্য সাধের 'মহেন্দ্রস্কুলটী' বজায় থাকে, তাহা করুন। তাহা হইলেই তাঁর পবিত্র আত্মা পুলকিত হইবে। স্কুলের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে যেমন তিনি শান্তি-ময়ের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, পরলোকও সেইরূপ চিরশান্তি ভোগ করিবেন। আসুন আমরা সাশ্রুনয়নে সেই মহাত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া তাহারই পথ অনুসরণ করিয়া তাহার কৃত কার্য্যটীকে যাহাতে অধিকতর সাফল্য-মণ্ডিত করিতে পারি তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হই।

শাস্ত্রি-চরণপ্রান্তে

শ্রীমণীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আর নাই, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য ইহাতে আমাদের অভিযোগ করিবার বিশেষ কিছুই নাই; জীবনকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়া পরিণত বয়সেই প্রস্থান করিয়াছেন; কিন্তু তবুও কেবল মনে হয় তিনি আরও কিছুদিন থাকিলে আমরা আরও কত নূতন জিনিস পাইতে পারিতাম।

আজ তাঁহার শ্রাদ্ধদিনে অনেক উপযুক্ত ভক্তই তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছেন, আমার কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয়ের জ্ঞানের আশীর্ব্বাদ ধারণ করিবার সামর্থ্য একেবারেই নাই, আজীবন কাল ধরিয়া যে সব অমূল্য বস্তু তিনি সুধী-সমাজকে দান করিয়াছেন, তাহাতে যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহারা সে বিষয় আলোচনা করুন,—আমি শুধু যে কয় ঘণ্টা তাঁহার নিকট অতিবাহিত করার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম সেই

সময়টুকুই স্মরণ করিতে পারি। আমার মত নগণ্য এবং অনভিজ্ঞ অপরিচিতকে তিনি যেরূপ স্নেহ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মহত্ত্বের গুণেই করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে "রামচরিত" অনুবাদ করিবার আদেশ পাইয়া আমি একদিন অপরাহ্ণে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট গমন করি। ইতিপূর্ব্বে আমি তাঁহাকে চাক্ষুষ কখনও দেখি নাই। সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহার নিকট যাইবার সময় বেশ একটু nervou ই হইয়াছিলাম কিন্তু তিনি প্রথমেই আমার সহিত এমন পরিচিতের ন্যায় কথা কহিলেন যে, আমি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম।

তেতলার ঘরে তাঁহার লাইব্রেরী ও শোবার ঘর। ঘরের সম্মুখে খানিকটা খোলা ছাদ। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই দেখি খোলা দরজার সামনে ইজিচেয়ারে বসিয়া কি একখানা তাম্রলিপি লইয়া magnifying glassএর সাহায্যে পড়িতেছেন। আমি নিকটে যাইয়া দাঁড়াতেই আমার দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন "কে"? আমি পরিষদের পরিচয় দিয়া রামচরিত-অনুবাদের জন্য প্রেরিত হইয়াছি বলিলাম। স্নেহসহকারে বসাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সংস্কৃত আমি কিরূপ জানি, এবং বুঝাইয়া দিলেন যে "রামচরিত" বইখানি নেহাৎ সহজ নয়, খৃঃ ১২শ শতকের রচনা,—প্রত্যেক শ্লোকের দুইটী করিয়া অর্থ, চার সর্গের পুস্তক, কিন্তু দেড় সর্গের অধিক টীকা নাই, অনুবাদ করিবার চেষ্টা অনেকে অনেকবার করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি বলিলাম "সংস্কৃত আমি একেবারেই জানি না এবং আমার সংস্কৃত জানা না-জানায় কিছু আসে যায় না, কারণ আমি মাত্র লেখকের কাজ করিব; আপনার সুবিধামত সময়ে আসিয়া আপনি যাহা বলিবেন লিখিয়া লইব মাত্র"। তিনি হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন 'ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত জান না কি রকম, ছেলেবেলা থেকে সংস্কৃত পড়া হয় নি, তাই বল, তা নইলে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম যাদের তাদের আবার কষ্ট করে সংস্কৃত শিখ্‌তে হয় না কি"। তারপর "রামচরিত" পুস্তক আনিবার জন্য Asiatic societyর Secretaryর নিকট চিঠি দিয়া, কখন তাহার নিকট যাইলে সুবিধা হইবে ইত্যাদি উপদেশ দিয়া শেষে বলিলেন "কলেজের ছুটীর পর আস্‌ছো, এখনও বাড়ী ফেরনি, একটু জল খেয়ে যাও" এবং তারপর নৈহাটী হইতে আনীত খইয়ের মোয়া খাওয়াইয়া বিদায় দিলেন।

তারপর তাঁহার নিকট অনেকবার যাইতে হইয়াছিল। যদিও রামচরিতের অনুবাদ-কার্য্য বিশেষ কিছুই অগ্রসর হয় নাই বা সবদিন তিনি রামচরিত লইয়া বসিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার নিকট চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও একটা আনন্দ পাওয়া যাইত। আমার এম্ এ পরীক্ষার পূর্ব্বে পরীক্ষার জন্য কিরূপ পড়া শোনা করিতেছি ইত্যাদি তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া পরীক্ষার পূর্ব্বে আর তাঁহার নিকট যাইতে হইবে না বলিয়া চার মাসের ছুটী দিলেন। দিনের বেলা অন্য লোক সমাগমের জন্য এক একদিন দুপুরে তিন চার ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া চলিয়া আসিতে হইত বলিয়া তিনি নিজে এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন যে তাহাতে আমার লজ্জা বোধ হইত। কয়েকদিন এইরূপ হওয়াতে তিনি আমাকে সন্ধ্যার পর আসিতে বলিলেন। আমি সন্ধ্যার পরও কয়েকদিন গিয়াছিলাম, কিন্তু বাগবাজার হইতে এই কাজের জন্যই যাইতে হয় শুনিয়া তিনি আবার বিকালে আমার কলেজের ছুটীর পরই সময় ঠিক করিলেন।

এম্ এ পরীক্ষার পর আবার তাঁহার নিকট হাজির হইলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের বইখানি ও আমার হস্তলিখিত অনুবাদগুলি আর খুঁজিয়া মিলিল না। তাঁহারই ঘরে র‍্যাকের উপর বই ও কাগজ একসঙ্গে ছিল, কিন্তু কোথায় যে হারাইয়া গেল তাহার কোন তল্লাস পাওয়া গেল না। কয়েকদিন ধরিয়া তাঁহার দুইটি র‍্যাক ও সমস্ত কাগজপত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও পাওয়া গেল না। এইরূপে তাঁহার Memoir এর volume একরূপ আমারই জন্য খোঁড়া হইয়া গেল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে Societyর বইখানি পূর্ব্বেই ফেরৎ দেওয়া হইয়াছিল।

পুনর্ব্বার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয় হইতে রামচরিত লইয়া প্রথম হইতে আরম্ভ করা গেল, কিন্তু উপর্য্যুপরি কয়েকবার তাঁহার নৈহাটী যাওয়ার জন্য সেবার অনুবাদ একটুও অগ্রসর হয় নাই। একদিন তিনি হাসিয়া আমাকে বলিলেন "দেখ তোমার চেয়ে অনেক কম উৎসাহ

নিয়ে আমার কাছে অনেকে অনেক কাজ করে নিয়ে গেছে; এর তর্জ্জমা হবে না"।...প্রথমবার প্রথম সর্গটি প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অনুবাদ করা হইয়াছিল, উহা হারাইয়া যাওয়াতে আমার উৎসাহ কিছু কমিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয় ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; আবার আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তার পরেও আর একবার কি কারণে গোলমাল হওয়াতে পুনর্ব্বার প্রথম হইতে অনুবাদ আরম্ভ করা হয়। আজ কেবল বারবার মনে হইতেছে এরূপ প্রশ্রয় দেওয়া কেবল একমাত্র তাঁহার ন্যায় সাধকদেরই সম্ভব, মানুষের দ্বারা এরূপ বুঝি হইত না।

আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিব। একদিন কি এক কার্য্য উপলক্ষে হঠাৎ তাঁহাকে নৈহাটী যাইতে হইবে। আমি তাহার পূর্ব্বদিনে তাঁহার নিকট গিয়াছি। আমাকে কয়েকখানা পোষ্টকার্ড দিয়া কয়েকজন লোককে লিখিতে বলিলেন। পোষ্টকার্ড দ্বারা তাঁহাদের লিখিয়া জানান হইল যে, তিনি নৈহাটী যাইতেছেন এবং এক সপ্তাহ পরে ফিরিবেন; কথা ছিল তাঁহারা দু'একদিনের মধ্যে তাঁহার সহিত দেখা করিবেন, পাছে আসিয়া ফিরিয়া যাইতে হয় এইজন্য তিনি তাঁহাদের পূর্ব্বেই জানাইয়া দিলেন। ছোট বড় সকলকেই সমানভাবে লিখিয়া জানাইয়া দিলেন। কেহ তাঁহার সন্ধানে আসিয়া তাঁহারই দোষে ফিরিয়া যাইবে ইহা তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইত।

তাঁহার নিকট আর একটা জিনিস শুনিতে আমার বড় ভাল লাগিত। তাহা তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী। ভারতের সর্ব্বত্র তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক গ্রাম প্রত্যেক নদীটী তাঁহার জানা ছিল। কোথায় কোন সময় কি মেলা হয়, কোথায় কোন পাহাড় কত ফিট উঁচু, কোন দেশে কিসের মন্দির আছে এবং সে মন্দিরের মূর্ত্তির ও কারুকার্য্যের বিশেষত্ব কি, কালিদাস-বর্ণিত ফুল-ফলগুলি ভারতের কোন স্থানে পাওয়া যায় এ সমস্ত তিনি নিজে অনুসন্ধান করিয়া যেন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এক একদিন তাঁহার ছেলেবেলাকার পণ্ডিতমহাশয়দিগের গল্প বলিতেন। নারিকেল-বৃক্ষের তলায় বসিয়া সিদ্ধান্তকৌমুদী তিনি কিরূপে পাঠ করিয়াছিলেন, সংস্কৃত কলেজে Heli-centric এবং Geometric theory লইয়া কে কিরূপে তর্ক করিতেন, প্রথম নাগরী অক্ষরে সংস্কৃত পুস্তক মুদ্রাঙ্কন লইয়া পণ্ডিতমহলে কিরূপ আন্দোলন চলিয়াছিল ইত্যাদি বিষয় তিনি আমাদের নিকট গল্প করিতে করিতে যেন একেবারে ছেলে মানুষের মত সরল ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন। পা পড়িয়া যাওয়াতে বগলে লাঠিছাড়া তিনি উঠিতে পারিতেন না, বার্দ্ধক্যের জন্য শরীরও তাঁহার একেবারেই জুৎসই ছিল না, কিন্তু তবুও তাঁহার কর্ম্মশক্তি ও মনের তারুণ্য যে কোন যুবককেও হার মানাইতে পারিত।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আমি তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম! এদিক্ ওদিক্ দু'চার কথার পর তাঁহার পায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। পূর্ব্বে দিনকতক ক্যালিপাস দিয়া পা'খানি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, সেদিন সে সব দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, পা'খানি সারিয়াছে কি না। উত্তরে তিনি হাসিয়া বলিলেন 'দেখ, machineএর যখন যখন কোন একটা part খারাপ হয় তখন সেইটুকুই মেরামত কর্‌তে হয়, কিন্তু সবগুলাই অল্প-বিস্তর খারাপ হ'লে সমস্ত machineটাই বদ্‌লাবার চেষ্টা দেখ্‌তে হবে;" এবং তারপর দু'একদিন পরে একদিন সকালবেলা যেতেই তিনি জোর করে আমায় পরিষদের "রামচরিত" ফেরৎ দিয়ে দিলেন; বল্লেন শীতকালে নৈহাটী যাবার ইচ্ছে আছে; তবে এতদিনে যখন কিছুই হ'ল না তখন আর কিছু হবে বলে ত বোধ হয় না! তারপর আরও বল্লেন ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত জ্ঞান নিয়ে এর অনুবাদ সুবিধে হবে না, রামপাল সম্বন্ধে আরও কিছু বিশদভাবে জানা চাই। সেদিন আর বিশেষ কিছু কথা হয় নি, আমার ওপর তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন কি না জানি না, শেষে আমি বইখানি নিয়ে চলে এলাম, কিন্তু সে সময় আমার একবারও মনে হয় নাই যে সেই আমার তাঁহার সঙ্গে শেষ দেখা।

পৃথিবীর কাজ শেষ করিয়া মহাপুরুষ তাঁহার অর্জ্জিত লোকে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে দুঃখে বিপদে বর্ম্মের মত রক্ষা করুক।

বাঙ্গলার গৌরব

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রথম গৌরব

হস্তী-চিকিৎসা

বেদের আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা হাতী চিনিতেন না, কারণ, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে হাতী পাওয়া যায় না। বেদের আর্য্য জাতির প্রধান কীর্ত্তি ঋগ্বেদে "হস্তী" শব্দটি পাঁচ বার মাত্র পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে তিন জায়গায় সায়ণাচার্য্য অর্থ করিয়াছেন, হস্তযুক্ত ঋত্বিক্ বা পদযুক্ত ঋত্বিক্। দুই জায়গায় তিনি অর্থ করিয়াছেন, হাতী। সে দুইটি জায়গা এই :—

"মহিষাসো মায়িনশ্চিত্রভানবো
গিরয়ো ন স্বতবসো রঘুষ্যদঃ।
মৃগা ইব হস্তিনঃ খাদথা বনা
যদারুণীষু তবিষীরযুগ্ধ্বং॥" ১।৬৪।৭

'হে মরুদ্গণ, তোমরা বড় লোক, জ্ঞানবান ; তোমাদের দীপ্তি অতি বিচিত্র। তোমরা পাহাড়ের মত আপন বলে বলীয়ান। তোমরা হস্তী মৃগের মত বনগুলি খাইয়া ফেল। অরুণবর্ণ দিক্‌সমূহে তোমার বল যোজনা কর।'

"সূর উপাকে তন্বং দধানো
বি যত্তে চেত্যমৃতস্য বর্পঃ।
মৃগো ন হস্তী তবিষীমুষাণঃ
সিংহো ন ভীমঃ আয়ুধানি বিভ্রৎ॥" ৪।১৬।১৪

'হে ইন্দ্র, তুমি যখন সূর্য্যের নিকটে আপনার রূপ বিকাশ কর, তখন সে রূপ মলিন না হইয়া আরও উজ্জ্বল হয়। পরের বলনাশক হস্তী মৃগের ন্যায় তুমি আয়ুধ ধারণ করিয়া সিংহের মত ভয়ঙ্কর হও।'

এ দুই জায়গায়ই, হস্তী মৃগের ন্যায়, "মৃগা ইব হস্তিনঃ", "মৃগো ন হস্তী" এইরূপ প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ এই যে, উঁহারা হস্তী নূতন দেখিতেছেন। উহাকে মৃগবিশেষ বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে। তাই তাঁহারা মৃগজাতীয় হাতী বলিয়া উহার উল্লেখ করিতেছেন। পলিনেসিয়ায় ওটাহিটি দ্বীপের লোক কেবল শূকর চিনিত। ইউরোপী-য়েরা যখন সেখানে ঘোড়া, কুকুর, ভেড়া, আরও নানা রকম জানোয়ার লইয়া গেলেন, তখন তাহারা ঘোড়াকে বলিল চিঁ-হিঁ-হিঁ শূয়ার, কুকুরকে বলিল ঘেউ-ঘেউ শূয়ার, ভেড়াকে বলিল ভ্যা-ভ্যা শূয়ার। আর্য্যগণ সেইরূপ মৃগ চিনিতেন, কেন না তাঁহারা শীকারে খুব মজবুত ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া যখন তাঁহারা হাতী দেখিলেন, তখন তাঁহারা তাহাকে হাতওয়ালা মৃগ বলিলেন।

হাতীর আসল বাসস্থান বাঙ্গলা, পূর্ব্ব-উপদ্বীপ, বোর্ণিও, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপ। পশ্চিমে দেরাদুন পর্য্যন্ত হাতী দেখা যায়, দক্ষিণে মহিসুর ও লঙ্কায় দেখা যায়। আফ্রিকায়ও হাতী দেখা যায়, কিন্তু এত বড় নয়, এত ভালও নয়। সুতরাং বৈদিক আর্য্যেরা যে হাতীর বিষয় অল্পই জানিতেন, সে কথা এক রকম স্থির।

ঋগ্বেদে হাতীর নাম ত ঐ দুই বার আছে। ও যে ঠিক হাতীরই নাম, সে বিষয়েও একটু সন্দেহ। কারণ, "হাতওয়ালা" মৃগ বলিতেছে, যদি স্পষ্ট করিয়া "শুঁড়ওয়ালা" বলিত, তবে কোন সন্দেহই থাকিত না। আরও সন্দেহের কারণ এই যে, সংস্কৃতে হাতীর অনেক নাম আছে :— করী, গজ, দ্বিপ, মাতঙ্গ—ইহার একটি শব্দও ঋগ্বেদে নাই, এমন কি ঐরাবতের নাম পর্য্যন্তও নাই। যাহারা কাল হাতীই চিনিত না, তাহারা সাদা হাতী কেমন করিয়া জানিবে?

ঋগ্বেদে হাতীর নাম থাকুক বা না থাকুক, তৈত্তিরীয় সংহিতায় উহার নাম আছে। অশ্বমেধের কথা বলিতে বলিতে, যখন কোন দেবতাকে কোন জানোয়ার বলি দিতে হইবে, এই প্রশ্ন উঠিল, তখন প্রথম এগার জন দেবতাকে বন্য জন্তু দিতে হইবে স্থির হইল। কোন কোন মতে এই বন্য জন্তুর ছবি বলি দিলেই হইল; কোন কোন মতে বলিল, "না, যেমন গ্রাম্য জন্তুর বেলায় আলম্ভই ব্যবস্থা, বন্য জন্তুর বেলায়ও সেইরূপ।" এই দেবতা ও জন্তুদিগের নাম যথা :—

রাজা ইন্দ্রকে শূকর দিতে হইবে, বরুণ রাজাকে কৃষ্ণসার হরিণ দিতে হইবে, যমরাজকে ঋষ্য মৃগ দিতে হইবে, ঋষভ দেবকে গবয় বা নীলগাই দিতে হইবে, বনের রাজা-শার্দ্দূলকে গৌর মৃগ দিতে হইবে, পুরুষের

রাজাকে মর্কট দিতে হইবে, শকুনরাজ বা পক্ষিরাজকে বর্তক পাখী দিতে হইবে, নীলজ সর্পরাজকে ক্রিমি দিতে হইবে, ওষধির রাজা সোমকে কুলঙ্গ দিতে হইবে, সিন্ধুরাজকে শিংশুমার দিতে হইবে, আর হিমবান্‌কে হস্তী দিতে হইবে।

ঋগ্বেদে হিমবান্ বলিয়া দেবতার কথা নাই। দশম মণ্ডলে একবার হিমবন্ত শব্দ আছে, তাহার অর্থ বরফের পাহাড়—ঐ পাহাড় ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতায় হিমবান্ দেবতা হইয়াছেন এবং বন্য হস্তী, এখন আর্য্যগণ যাহা ভাল করিয়া চিনিয়াছেন, তাহাই তাঁহার বলি হইয়াছে। হিমবানের দেবতা হওয়া ও বন্য হস্তীর তাঁহার বলি হওয়া, এই দুই ঘটনায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আর্য্যগণ এখন ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন।

হিমবান্ এক কালে দেবতা ছিলেন না, পরে দেবতা হইয়াছেন। ইহার একটা কারণ বিষ্ণুপুরাণে দেওয়া আছে। সে পুরাণে প্রজাপতি বলিতেছেন, "আমি যজ্ঞের উপকরণ সোমলতাদির উৎপত্তির জন্য হিমালয়ের সৃষ্টি করিয়াছি।" তাই দেখিয়াই কালিদাস বলিলেন, "যজ্ঞাঙ্গযোনিত্বমবেক্ষ্য যস্য" ইত্যাদি। অর্থাৎ হিমালয়ের দেবত্ব পরে প্রজাপতি করিয়াছেন এবং যজ্ঞে তাঁহার ভাগও একটু পরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

খৃঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে হাতী পোষা খুব চলিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের এক হাতী ছিল। তাঁহার ভাই দেবদত্তেরও হাতী ছিল। বুদ্ধদেব কুস্তী করিতে করিতে একটা হাতী শুঁড় ধরিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন তাহাতে হাতী যেখানে পড়িয়াছিল সেখানে একটি কোয়ারা হইয়া গিয়াছিল। উদয়ন রাজার "নলাগিরি" নামে একটি প্রকাণ্ড হাতী ছিল। তাঁহার নিজের ও চণ্ডপ্রদ্যোতের বড় বড় হাতীশালা ছিল, হাতী ধরারও খুব রেওয়াজ ছিল।

এই যে হাতী ধরা ও পোষমানান, তাহার চিকিৎসা, তাহার সেবা, যুদ্ধের জন্য তাহাকে তৈয়ার করা—এ সব কোথায় হইয়াছিল? এই প্রশ্নের এক উত্তর আছে। আমরা এখন যে দেশে বাস করি, যাহা আমাদের মাতৃভূমি, সেই বঙ্গদেশই এই প্রকাণ্ড জন্তুকে বশ করিতে প্রথম শিক্ষা দেয়। যে দেশের এক দিকে হিমালয়, এক দিকে লৌহিত্য ও এক দিকে সাগর—সেই দেশেই হস্তিবিদ্যার প্রথম উৎপত্তি। সেই দেশেই এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি বাল্যকাল হইতেই হাতীর সঙ্গে বেড়াইতেন, হাতীর সঙ্গে খাইতেন, হাতীর সঙ্গে থাকিতেন, হাতীর সেবা করিতেন, হাতীর পীড়া হইলে চিকিৎসা করিতেন, এমন কি এক রকম হাতীই হইয়া গিয়াছিলেন। হাতীরা যেখানে যাইত, তিনিও সেই খানেই যাইতেন। কোন দিন পাহাড়ের চূড়ায়, কোন দিন নদীর চড়ায়, কোন দিন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে, হাতীর সঙ্গেই তাঁহার বাস ছিল। হাতীরাও তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসিত, তাঁহার সেবা করিত, তাঁহার জন্য ফল খাবার যোগাইয়া দিত, ব্যারাম হইলে তাঁহার শুশ্রূষা করিত।

অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ বঙ্গবাসীর সুপরিচিত। তিনি রাজা দশরথের জামাই ছিলেন। তাঁহার একবার সখ হইল, হাতী আমার বাহন হইবে। ইন্দ্র স্বর্গে যেমন হাতী চড়িয়া বেড়ান, আমিও তেমনি হাতীর উপরে চড়িয়া বেড়াইব। কিন্তু হাতী কেমন করিয়া বশ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি সমস্ত ঋষিদের নিমন্ত্রণ করিলেন। ঋষিরা পরামর্শ করিয়া কোথায় হাতীর দল আছে, খোঁজ করিবার জন্য অনেক লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা এক প্রকাণ্ড আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে আশ্রম "শৈলরাজাশ্রিত," "পুণ্য" এবং সেখানে "লৌহিত্য সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে।" সেখানে তাহারা অনেক হাতী দেখিতে পাইল এবং তাহাদের সঙ্গে একজন মুনিকেও দেখিতে পাইল, দেখিয়াই তাহারা বুঝিল যে, এই মুনিই হাতীর দল রক্ষা করেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া রাজা ও ঋষিদিগকে খবর দিল। রাজা সসৈন্য সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঋষি আশ্রমে নাই; তিনি অগ্নি-সেবার জন্য দূরে গমন করিয়াছেন। রাজা হাতীর দলটি তাড়াইয়া লইয়া চম্পানগরে উপস্থিত হইলেন ও ঋষিদের পরামর্শ মত হাতীশালা তৈয়ার করিয়া সেখানে হাতীদের বাঁধিয়া রাখিয়া ও খাবার দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। ঋষি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার হাতীগুলি নাই। তিনি চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলেন ও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অনেক দিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষে চম্পানগরে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার হাতীগুলি সব চম্পানগরে বাঁধা আছে, তাহারা রোগা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের গায়ে ঘা হইয়াছে, নানা রূপ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ লতা, পাতা, শিকড়, মাকড় তুলিয়া আনিয়া বাটিয়া তাহাদের গায়ে প্রলেপ দিতে লাগিলেন, হাতীরাও নানারূপে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর পরস্পর মিলনে, তাঁহার ও তাঁহার হাতীদের মহা আনন্দ। রাজা সব শুনিলেন,—তিনি কে, কি বৃত্তান্ত জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। মুনি কাহারও সহিত কথা কহিলেন না। ঋষিরা আসিলেন, তাঁহাদের সহিতও কথা কহিলেন না; রাজা নিজে আসিলেন, মুনি তাঁহার সহিতও কথা কহিলেন না। শেষে অনেক সাধ্য-সাধনার পর মুনি আপনার পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন, "হিমালয়ের নিকটে যেখানে লৌহিত্য নদ সাগরাভিমুখে যাইতেছে, সেখানে সামগায়ন নামে এক মুনি ছিলেন। তাঁহার ঔরসে ও এক করেণুর গর্ভে আমার জন্ম। আমি হাতীদের সহিতই বেড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহারাই আমার স্বজন। আমার নাম পালকাপ্য। আমি হাতীদের পালন করি, তাই আমার নাম পাল। আর কাপ্যগোত্রে আমার জন্ম, সেই জন্য আমার নাম কাপ্য। লোকে আমায় পালকাপ্য বলে। আমি হস্তিচিকিৎসায় বেশ নিপুণ হইয়াছি।" তাহার পর রাজা তাঁহাকে হাতীদের বিষয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহার উত্তরে তিনি হস্তীর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার শাস্ত্রের নাম "হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ" বা "পালকাপ্য"। উহা প্রাচীন গ্রন্থের আকারে লেখা। অনেক

জায়গায় পদ্য আছে, অনেক জায়গায় গদ্যও আছে। আধুনিক সূত্রে সকল কেবল বিভক্তিযুক্ত পদ, তাহাতে ক্রিয়াপদ নাই। প্রাচীন সূত্রে যথেষ্ট ক্রিয়াপদ আছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে "ব্যাখ্যাস্যামঃ" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা আছে। প্রাচীন সূত্রের সহিত "পালকাপ্যের" প্রভেদ এই যে, এখানে রাজা ও মুনির কথোপকথনচ্ছলে সূত্র লেখা হইয়াছে। ভরত-নাট্যশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন প্রাচীন সূত্রে এরূপ কথোপকথন নাই। বোধ হয়, কোন একখানি প্রাচীন হস্তিসূত্র পরে পুরাণের আকারে লেখা হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে যে, ঋষি বলিলেন, "কাপ্যগোত্রে আমার জন্ম।" কিন্তু চেন্তসাল রাও সি, আই, ই, যে "গোত্রপ্রবরনিবন্ধকদম্বম্" সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার শেষে তিনি প্রায় সাড়ে চারি হাজার গোত্রের নাম দিয়াছেন, ইহাতে কাপ্যগোত্র নাই। অর্থাৎ যে সকল গোত্র-প্রবরের গ্রন্থ এ দেশে চলিত আছে, তাহার কোথাও কাপ্যগোত্রের নাম নাই। তবে পালকাপ্য কিরূপে কাপ্যগোত্রের লোক হইলেন, কিরূপেই বা তাঁহাকে আর্য্য বা ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই পুস্তকের প্রথমে লোমপাদ যে সকল মুনিদের আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাপ্য বলিয়া একজন মুনি আছেন, আশ্বলায়নবৌধায়নাদির সূত্রে তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, তিনি আর্য্যগণের মধ্যে চলিত গোত্রের লোক নহেন, এ গোত্র বোধ হয় বাঙ্গলা দেশেই চলিত ছিল। পালকাপ্য বঙ্গদেশের লোক ছিলেন। লোহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের ধারে, সমুদ্র ও হিমালয়ের মধ্যে তাঁহার জন্মভূমি ও শিক্ষার স্থান। যদিও অঙ্গরাজ্যে চম্পানগরে তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ লেখা ও প্রচার হয়, তিনি আসলে বাঙ্গলা দেশেরই লোক। এই যে প্রকাণ্ড জন্তু হস্তী, ইহাকে বশ করিয়া মানুষের কাজে লাগান, ইহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা—এ সমস্তই বাঙ্গলা দেশে হইয়াছিল। পালকাপ্য পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে মনে হয় যেন উহা অন্য কোন ভাষা হইতে সংস্কৃতে তর্জ্জমা করা হইয়াছে, অনেক সময় মনে হয় উহা সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে চলিতেছে না। এ গ্রন্থ যে কত প্রাচীন তাহা স্থির করা অসম্ভব। কালিদাস ইহাকে অতি প্রাচীন শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন। রঘুর ষষ্ঠ সর্গে তাঁহার সুনন্দা অঙ্গরাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, বহুকাল হইতে শুনা যাইতেছে যে, স্বয়ং সূত্রকারেরা ইহার হাতীগুলিকে শিক্ষা দিয়া যান, সেই জন্যই ইনি পৃথিবীতে থাকিয়াই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে "হস্তিপ্রচার" অধ্যায়ে হস্তি-চিকিৎসকের কথা আছে। পথে যদি হাতীর কোন অসুখ হয়, মদক্ষরণ হয়, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে চিকিৎসক তাহার প্রতিবিধান করিবেন, ইহার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং কৌটিল্যেরও পূর্ব্বে যে হস্তি চিকিৎসার একটি শাস্ত্র ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। যে আকারে পালকাপ্যের সূত্র লেখা, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, উহা অতি প্রাচীন। সুতরাং ম্যাক্সমুলার যাহাকে "Sutra period" বলেন, সেই সময়েই পালকাপ্য সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। বিউলার সাহেব বলেন, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে সূত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহারও আগে বশিষ্ঠ ও গৌতমের সূত্র লেখা হয়। পালকাপ্যও সেই সময়েরই লোক বলিয়া বোধ হয়।

ভারতের পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, সূত্র-রচনার কাল আরও একটু আগে হইবে, কিন্তু সে কথা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে যদি বাঙ্গলা দেশে হস্তি-চিকিৎসার এত উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেটা বাঙ্গালাদেশের কম গৌরবের কথা নয়।

আমাদের ইতিহাস

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আমাদের দেশের ইতিহাস ঢালিয়া সাজিতে হইবে। এতদিন আমরা যে ভাবে ইতিহাস পড়িয়া আসিতেছিলাম, সে ভাবে আর চলিবে না। আমাদের ইতিহাস ছিল না, ইউরোপীয়ানেরা আমাদিগকে ইতিহাস শিখাইয়াছেন, সে কথা সত্য। তাঁহারা আমাদিগকে যে পথে চালাইতেছিলেন, আমরা এখনও সেই পথে চলিতেছি; কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনিলে আর চলিবে না। তাঁহারা আমাদের দেশের সব খবর রাখেন না, সব বই পড়েন না, সকলের সঙ্গে মিশেন না; দুই দশখানি বই পড়িবেন, তাহা হইতেই একটা ইতিহাস খাড়া করিয়া দেন। আমাদের দেশের অনেকের সংস্কার যে, আমরা যে পুরাণ জাতি, এটা বলিতে তাঁহাদের সঙ্কোচ হয়। প্রথম প্রথম তাঁহারা বলিয়াছেন,—"মুসলমানদের আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসই ছিল না; রাজা-রাজড়া থাকিতে পারে, ছোট বড় রাজা থাকিতে পারে, কিন্তু সে বড় বিশেষ কোন কাজের নয়। তাহাদের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, তাই সেটা একেবারেই অগ্রাহ্য।"

"মুসলমানদের আগে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ নানা ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ-করা ছিল। সেখানকার লোক অত্যন্ত মিথ্যাবাদী ও জুয়াচোর ছিল; তাহাদের সভ্যতা ছিল না, মিথ্যা কথা তাহাদের স্বভাবের মধ্যে হইয়া গিয়াছিল।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই ভাবে কিছু দিন চলার পর যখন অনেকে সংস্কৃত পড়িতে লাগিলেন, তখন বলিলেন,—"না, এরাও যেন একটু ভাল লোক ছিল, একটু যেন অমনি সভ্য হইয়াছিল; কিন্তু ইতিহাস তাদের একেবারেই নাই। দুই-চারখানি কাব্য আছে। ব্যাকরণ আছে, একটু আধটু দর্শনশাস্ত্রও আছে, আর বাকী সব অগ্রাহ্য—ইতিহাস একেবারেই নাই।"

এই ভাবে দিন কতক গেল, তারপর খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ হইল। রাশি রাশি তামার পাত বাহির হইতে লাগিল। সাহেবেরা একটু চমকিয়া গেলেন। অশোক রাজার কতকগুলি রবকারী (পাথরের লেখা) বাহির

হইল। আমাদের দেশের লোক সেগুলি পড়িতে পারিত না। সাহেবেরা পড়িলেন। শেষে স্থির হইল, সেগুলি চন্দ্রগুপ্তের নাতির সময়ের। কিন্তু সেগুলি থেকে আরম্ভ করিয়া মুসলমানদের সময় পর্য্যন্ত মাঝখানটা খালি রহিয়া গেল। বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন—সাহেবেরা বিশ্বাস করিলেন না। সুতরাং প্রায় ষোল শত বৎসর একটা ফাঁক পড়িয়া রহিল। তারপর ক্রমে তামার পাত আর পাথরের লেখা পড়া একটা বিস্তার মধ্যে হইয়া দাঁড়াইল।

অনেকে মনে করেন, সাহেবেরা এ বিদ্যা জানিতেন; আমাদের দেশের লোক একেবারেই জানিত না। কথাটা সত্য নয়। সাহেবেরা পড়াইয়া লইতেন—দেশের পণ্ডিতদের দিয়া। কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মস্তিষ্ক চালনা করাইয়া যে তাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। একটা কথা সম্প্রতি জানিয়াছি—অতি সম্প্রতি জানিয়াছি। উইল্‌সন্ সাহেব ও প্রিন্‌সেপ্ সাহেবের শিলালেখাগুলি প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় পাঠ করিয়া দিতেন। ক্রমে এই সকল লেখা পড়িয়া ও সিকা পড়িয়া জানা গেল যে, ভারতবর্ষে অনেক রাজার রাজত্ব ছিল—স্বাধীন রাজারা সেখ দিতেন। তাঁহাদের প্রজারা লেখ দিবার সময় তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিত। স্বাধীন রাজাদের সকলেই সিকা তৈয়ার করিতেন এবং সিকায় তাঁহাদের নাম থাকিত।

এইরূপে দেখা গেল, প্রায় হাজার দুই হাজার রাজা এই ষোল শত বৎসরের ভিতর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে তাঁহাদের বংশলতাও পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁহারা কোন্ সময়ের রাজা এবং কোন্ দেশের রাজা, সেটা পাওয়া গেল না। যেমন কলিকাতার গঙ্গায় বয়া ভাসে; তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে কতকগুলি রাজবংশ ভাসিতে লাগিল; পরস্পরের কি সম্বন্ধ, বুঝা গেল না; সুতরাং ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা হইল না।

দু চার দেশের দু চারখানি ছোট বড় ইতিহাসও পাওয়া গেল, তাহাতে ইতিহাসের ধারাটা ঠিক হইল না। এত বড় যে সংস্কৃত সাহিত্যটা, সেটার দিকে ইতিহাসবাগীশেরা চোখও দিলেন না। সুতরাং যদিও কতকটা ইতিহাস হইল, সেটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা, বেশ ঠাস গাঁথুনী হইল না।

সাহেবেরা কিন্তু বলিলেন যে, "ভারতবর্ষের সভ্যতাটা এই গুপ্তদের সময়েই হইয়াছিল—১৩।১৪ শত বৎসর আগে। তার আগে কাব্য ছিল না, দর্শন ছিল না, অলঙ্কার ছিল না, থিয়েটার ছিল না, সভ্যতার চিহ্ন বড় একটা ছিল না। তবে অশোকের সময় ব্যাকরণ-শাস্ত্রের একটু চর্চ্চা হইয়াছিল। কিন্তু চর্চ্চা হইলে কি হয়। মোক্ষমুলার সাহেব বলিলেন যে, বুদ্ধদেব যেই জন্মিলেন, সংস্কৃত অমনি ঘুমাইয়া পড়িল; সে ঘুম একেবারেই ভাঙ্গে নাই, গুপ্ত রাজারা কোন রকমে ভাঙ্গাইলেন। বুদ্ধদেবের আগে উঁহাদের ইতিহাস টিতিহাস কিছু পাওয়া যায় না। সব অন্ধকার।"

"আলোর মধ্যে বেদ। সে বেদও অনেকটা বুদ্ধদেবের পরের লেখা, কিন্তু আমরা ধরিতে পারিতেছি না। সুতরাং ঋগ্‌বেদ যিশু খৃষ্টের ১২।১৩ শত বৎসর পূর্ব্বের লেখা, তার আগে কিছুতেই যাইতে পারে না। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বোধ হয় হইয়াছিল, সেটা ১১।১২ শত বৎসর যিশু খৃষ্টের আগে।"

এই ভাবে আমাদের ইতিহাস ক্রমে পিছাইয়া গিয়া যিশু-খৃষ্টের ১২।১৩ শত বৎসর আগে পর্য্যন্ত পৌঁছিল। তার মধ্যে আবার বুদ্ধদেবের পর থেকে সেটার একটু আঁট বাঁধিল। তার আগে সব ফসকা।

এই ভাবে আমাদের ইতিহাস চলিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত-সাহিত্যটা ভাল করিয়া সব দিক্ থেকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা কেহ করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও অতি অল্প লোকের ছিল। সেটা ভাল করিয়া পড়িলে কিন্তু ইতিহাসের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, সেটা হইত না।

অনেক শাস্ত্র আছে, যে শাস্ত্রে প্রমাণ দিতে হয়—প্রমাণ না দিলে শাস্ত্র কেহ বিশ্বাস করে না। প্রমাণ দিতে গেলেই আগে সে শাস্ত্রে যাঁহারা বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম করিতে হয় এবং তাঁহাদের কথা তুলিতে হয়। এই রকম করিয়া কথা তুলিতে তুলিতে একটা পূর্ব্বাপর ধারা দাঁড়ায়। স্মৃতিশাস্ত্র এইরূপ প্রামাণিক শাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্রে, অকাট্য প্রমাণ দিতে না পারিলে লোকে বিশ্বাস করে না, শ্রদ্ধাও করে না।

এই শাস্ত্রের যত পুথি আছে, সব পুথির একখানি ভাল ক্যাটলগ আজও তৈয়ারি হয় নাই। আর ইহা হইতে যে ইতিহাস পাওয়া যায়, সেটা এখনও লোকের ধারণাও হয় নাই। কিন্তু শুধু ক্যাটলগ হইতেই দেখা যায় যে, নূতন রাজত্ব হইলেই নূতন স্মৃতি হইয়াছে। ঋষিদের যে স্মৃতি, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তৈয়ারি হইয়াছে, টীকাকারেরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেই ঋষিদের স্মৃতির টীকা করিয়াছেন।

তারপর মুসলমানেরা যে সময় এদেশে আসিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতে ঋষিদের স্মৃতি ও টীকাকারদের টীকা চলিল না। ব্রাহ্মণেরা তখন প্রত্যেক দেশের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া এক একটা নিবন্ধ তয়ারি করিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমানদের সময় যেখানে হিন্দুদের রাজনীতিতে একটু ক্ষমতা হইয়াছে, সেখানে তাঁহারা নিবন্ধ তৈয়ারি করিয়াছেন। নিবন্ধে আর একটু বিশেষত্ব আছে। যেখানে হিন্দুরা স্বাধীন, সেখানে নিবন্ধের মধ্যে একখানি বই রাজনীতির আছে। কিন্তু যেটা মুসলমানের দেশ, সেটায় রাজনীতির গন্ধও নাই। অনেক জায়গায় হিন্দুরা মুসলমানের দেশে আপনাদের দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতেন। সেখানে নিবন্ধের মধ্যে ব্যবহারের জন্য একখানি বই আছে। যেখানে মুসলমানের দেশে হিন্দুরা স্বাধীন হইয়াছে, সেখানে রাজ্যাভিষেকের উপর একখানি বই আছে।

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্মৃতির বই লিখিতে গেলে প্রমাণ দেওয়া চাই।

এই প্রমাণ ক্রমে খাটিয়া খুটিয়া দেখিতে গেলে, কোন্ বইখানি কোন্ সময়ে হইয়াছে, তাহা বেশ ধরা যায় এবং যদি আমাদের দেশীয় আচার ব্যবহারের তেমন জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে কোন্ দেশে হইয়াছিল, তাহাও বলিয়া দেওয়া যায়।

সুতরাং ভাল করিয়া স্মৃতিটা পড়িলে ইতিহাসটা পাকাপাকি তৈয়ারি হইয়া যাইতে পারে। আমি যেরূপ জ্ঞানের কথা বলিতেছি, এরূপ জ্ঞান—এই ভাবে পড়া, পূর্ব্বে না হইলেও পূর্ব্বে যাঁহারা বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের একটা আবছায়া আবছায়া এই রকম ভাব ও জ্ঞান হইয়াছিল। তাই রাজেন্দ্রলাল মিত্র এসিয়াটিক সোসাইটীতে "হেমাদ্রি"র প্রকাণ্ড নিবন্ধটা সব ছাপাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিন ভাগের দুই ভাগ ছাপান হইয়া গিয়াছে, হেমাদ্রির সময়ও জানা ছিল। তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন,—দেবগিরির রামচন্দ্র রাজার অধীনে তিনি বড় বড় রাজকার্য্য করিতেন। সেটা ১২৫০ খৃঃ হইতে ১৩০০ খৃঃ পর্য্যন্ত। সুতরাং তিনি যে সকল বই হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলি তাহার পূর্ব্বে হইবে নিশ্চয়ই। কারণ, তিনিও ত একজন বড় পণ্ডিত, বড় রাজার সভাসদ্। তিনি আর পুথি না দেখিয়া তাহা হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করেন নাই।

এই রকম করিয়া বোম্বাইর মাণ্ডলিক সাহেব, মনুর উপর মেধাতিথির যে টীকা আছে, সেটা ছাপাইয়াছেন। মেধাতিথি যে সকল বইএর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেগুলিও তিনি দেখিয়াছেন। এইরূপ করিতে করিতে গিয়াছেন।

বিউলার সাহেব বলিয়াছেন যে, গৌতমের ধর্ম্মশাস্ত্র খৃষ্টের হাজার বৎসর পূর্ব্বে বলিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করি না। গৌতমের ধর্ম্মশাস্ত্র বৈদিক সংস্কৃতে লেখা নয়,—পাণিনি যে সংস্কৃতের জন্য ব্যাকরণ করিয়াছেন, সে সংস্কৃতে লেখা নয়,—মাঝামাঝি এক অবস্থার সংস্কৃত। পাণিনির সময় এখন এক রকম ঠিক হইয়াছে—খৃষ্টের ৫ শত বৎসর আগে; গৌতম হাজার বৎসর আগে। গৌতমের ভাষার সঙ্গে পাণিনির ভাষা তুলনা করিলে অনেক জ্ঞান লাভ করা যায়।

গৌতমও তাঁহার আগেকার স্মৃতির বই পড়িয়াছেন—তিনিও প্রমাণ দিয়াছেন। সে সব প্রমাণ আমরা খুঁজিয়া পাই না, লোপ হইয়াছে। তিনিও স্মৃতিরই প্রমাণ দিয়াছেন। তাহা হইলে গৌতমের আগেও স্মৃতি ছিল। স্মৃতি ত স্বাধীন শাস্ত্র নয়। সবাই বলে, স্মৃতি বেদের অধীন। লোকের সংস্কার, অনেক বেদ লোপ হইবার পর ঋষিদের যে সকল কথা স্মরণ ছিল, তাহা একত্র করিয়া স্মৃতি হয়।

তাহা হইলে বেদ ছিল, বেদ লোপ হইয়াছিল, তারপর স্মৃতি হইয়াছে,—এই রকম করিয়া ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসটা আরও পিছাইয়া যাইবে। কত পিছাইয়া যাইবে, তাহার একটা আভাস দিতেছি।

পুরাণে এক জায়গায় লেখা আছে, মহাভারতের যুদ্ধের পর অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর মগধে পর পর ৫৯ জন রাজা হইয়াছিলেন। তারপর নন্দরাজারা রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। নন্দরাজারা খৃষ্টের ৪ শত বৎসর পূর্ব্বে মগধে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। পার্জিটার সাহেব এই ৫৯ জন রাজার নাম অনেক পুথিপাঁজি ঘাঁটিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। মোটামুটি ধরিতে গেলে এক শতাব্দীতে ৪ জন রাজা হন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে ৬০ জন রাজায় ১৫ শত বৎসর হইবে; ৪শ আর ১৫শ যোগ করিলে ১৯০০ হয়। কিন্তু পার্জিটার সাহেব একশ বৎসরে ৪ জন রাজা ধরেন নাই—১০।১২ জন ধরিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা খৃষ্টের পূর্ব্বে ১২শত বৎসরে অথবা তাহারও পরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু সে কালের রাজারা এখনকার চেয়ে একটু দীর্ঘজীবী হইতেন। আমরা বরং একশতে তিন জন রাজা ধরিতে পারি। তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ আরও পিছাইয়া যাইবে। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে বলে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ খৃষ্টের ২৫শত বৎসর আগে হইয়াছিল। কেন না, তাঁহারা বলেন, কলির ৬ শত বৎসর পরে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হয়, আর কলি ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হয়; সুতরাং ২৫ শত বৎসর তেরিজের হিসাবে পাওয়া যাইতেছে।

ঋষিদের তখন অসীম প্রভাব। তখন দেখা যায় যে, বেদ খানিক খানিক লোপ হইয়া আসিতেছিল। মহাভারতে যজ্ঞের যে সব বর্ণনা আছে, তাহাতে কেবল জাঁকজমকের বর্ণনা। যজ্ঞটা কেমন করিয়া হইল, সে প্রয়োগ-পদ্ধতির দিক্ দিয়াও যায় নাই। তাতেই বুঝিতে হয়, তখন যাগ-যজ্ঞ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল এবং বেদও ক্রমে লোপ হইয়া আসিতেছিল। বেদ তখন ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্বে ভাগ হইয়াছে। তাহা হইলে বেদ বিস্তর পিছাইয়া পড়িল।

মহাভারতে লেখা আছে যে, ধৃতরাষ্ট্র রাজার এক কন্যা ছিল, একমাত্র কন্যা; তাহার বিবাহ হইল জয়দ্রথের সঙ্গে; এই জয়দ্রথ হইলেন সিন্ধু-সৌবীরের রাজা। সিন্ধুদেশে সৌবীরবংশ অনেক দিন রাজত্ব করিতেছিলেন। সে বংশের জয়দ্রথের সঙ্গে দুঃশলার বিবাহ হইল। সম্প্রতি সিন্ধুদেশে সিন্ধু নদের দুইটী মরা গর্ভের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড নগর খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে সুমেরদের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে এতদিন সুমেরদের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, যা পাওয়া গিয়াছে পারস্য উপসাগরের ধারে। অনেকে বলেন, সুমেররা মিশর দেশের অপেক্ষাও প্রাচীন। অনেক বলেন—না, এরা মিশরের চেয়ে একটু নূতন। আমরা বলি, সুমেরদের যখন এত বড় একটা নিদর্শন সিন্ধুনদের ধারে পাওয়া গিয়াছে, তখন সুমেররা ভারতবর্ষ হইতে পারস্য উপসাগরে যাইতে পারে, পারস্য উপসাগর হইতে ভারতবর্ষেও আসিতে পারে। এই সুমের জাতিই ভারতবর্ষের সৌবীর। সে ত খৃষ্টের ৩।৪ হাজার বৎসর আগে। আর কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যদি তাহাদের সঙ্গে তুল্যকালে হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সভ্যতাটা কোথায় গিয়া দাঁড়াইল, দেখিবার বিষয় হইয়াছে।

বেদ, স্মৃতি, এই দুইটী জিনিষ ছাড়িয়া দিলে আর একটা কথা আমাদের মনে করিতে হইবে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর পরীক্ষিৎ হস্তিনায় রাজা হন। তাঁহার ৪।৫ পুরুষ পরে হস্তিনা নগর গঙ্গায় ভাসিয়া যায় এবং পরীক্ষিদ্‌বংশ কৌশাম্বী তে আসিয়া রাজত্ব করেন। হস্তিনা—গঙ্গার ধারে মিরাট জেলায় ছিল। কৌশাম্বী এলাহাবাদ হইতে ১৫।১৬ ক্রোশ পশ্চিমে যমুনার ধারে। প্রায় এই সময় পরিক্ষিদ্‌বংশে অধিসীমকৃষ্ণ নামে একজন রাজা হন। তাঁহার সময় ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস লেখা হয়। তাঁহার পূর্ব্বকার ঘটনাগুলি লিখিবার সময়ে অতীত কালের বিভক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে। তাঁহার নিজের সময়ের ঘটনাগুলি বর্ত্তমান কালের ব্যাপার, আর তাঁহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি ভবিষ্যৎ কালের ব্যাপার। যাঁহারা পুরাণ পড়েন, সকলেই মনে করেন, পুরাণগুলি অধিসীমকৃষ্ণের সময়ের লেখা। বাস্তবিক যদিও ভবিষ্যৎ কাল, অধিসীমকৃষ্ণের সময় হইতেই, হস্তিনা, অযোধ্যা, মগধ প্রভৃতি দেশের রাজাদের বংশতালিকা অনেক পুরাণে পাওয়া যায়, সেই বংশতালিকা হইতেই পার্জিটার সাহেব ৫৯ পুরুষ মগধের রাজা পাইয়াছেন। ইতিহাস মানে পুরাণ ঘটনা। ইতিহাস অতীত কালের হইয়া থাকে, বর্ত্তমানেও হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে কেমন করিয়া হয়? পুরাণের মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য পরবর্ত্তী কালের লোক ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার করিয়া পরের ঘটনাগুলি পরে জুড়িয়া দিয়াছেন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে এই ঘটনাগুলি একেবারে অসত্য হইতে পারে না। এখনকার লোক ভবিষ্যতের ইতিহাস লিখিতে পারেন না। তাঁহারা এটাকে হয় নির্ব্বোধের কাজ, না হয় জুয়াচোরের কাজ বলিয়া মনে করেন। করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু পুরাণে ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার অধিক এবং ভবিষ্যৎ কালের ইতিহাসও অধিক। আর সে ইতিহাস যে প্রামাণিক, এ কথা পার্জিটার সাহেব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং অন্য লোককেও স্বীকার করিতে বলিতেছেন।

অধিসীমকৃষ্ণের সময় যখন পুরাণ আরম্ভ হইল, তাহার আগের ইতিহাস খুঁজিতে গেলে বেদের ভিতর গিয়া খুঁজিতে হয়। পার্জিটার সাহেব সে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যাবজ্জীবন পুরাণ পড়িয়াছেন। বয়স তাঁহার এখন ৭৫।৭৬ হইবে। তিনি যখন ভারতবর্ষে সিভিলিয়ান হইয়া আসেন, তখন হইতেই পুরাণের উপর তাঁহার বড় মায়া; আমি সে সময় হইতেই তাঁহাকে জানিতাম। তিনি যতদিন ভারতবর্ষে ছিলেন পুরাণ সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক কথা হইত। সুতরাং পুরাণ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন, সেটা একটু মন দিয়া শোনা উচিত। তিনি যখন বেদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন কিন্তু তিনি নিজের কোট ছাড়িলেন। তাঁহাকে ম্যাকডোনাল্ড ও কীথ সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। কারণ, ইঁহারাই এখন ইউরোপের মধ্যে বেদের সম্বন্ধে বেশী বই লিখিয়াছেন। পার্জিটার সাহেব খুব হুঁসিয়ার লোক। তিনি যে আপনার কোট ছাড়িলেন, তাহা তিনি বেশ বুঝিয়াছেন। সত্য অনুসন্ধান করা তাঁহার কাজ। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—আমি এখানে ম্যাকডোনাল্ড ও কীথের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছি। ম্যাকডোনাল্ড ও কীথে তোমাদের ভক্তি থাকে, আমাকে বিশ্বাস কর; না থাকে না কর; কিন্তু আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের যে tradition, সেটা বিশ্বাসযোগ্য।

এই সকল কারণে বলিতেছিলাম যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসটা পুরাইয়া চালিয়া সাজিতে হইবে। একশত বর্ষ পূর্ব্বে একজন দশকুমারচরিতকে যিশু খৃষ্টের ৬ শত বৎসর পরের লেখা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি দশকুমারচরিত ভাল করিয়া পড়িয়া ইহাকে যিশু খৃষ্টের ২ শত বৎসর পূর্ব্বে বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। যাঁহারা ব্যাকরণ লিখিয়াছেন পাণিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়ি, পতঞ্জলি ইঁহাদের সময় লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনেকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। একজন পাণিনিকে খৃষ্টের [illegible] শত বৎসর আগেকার বলিয়া গিয়াছেন। একজন দুইশত বৎসর আগের বলিয়াছেন। পতঞ্জলিকে কেহ দুই শত বৎসর আগের বলিয়াছেন, কেহ যিশু খৃষ্টের ছয় শত বৎসর পরের বলিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্যের বই পড়িতে পড়িতে এক জায়গায় দেখা গেল, এখন হইতে ১২শত বৎসর পূর্ব্বে রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসায় বলিয়া গিয়াছেন, পাণিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়ি, পতঞ্জলি, ইঁহারা সকলেই পাটলীপুত্রে পরীক্ষা দিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। পাটলীপুত্র নগর যিশু খৃষ্টের ৫শত বৎসর পূর্ব্বে রাজধানী হয় এবং হাজার বৎসর ভারতবর্ষের প্রধান নগর বলিয়া গণ্য থাকে। সুতরাং পাণিনিকে ৫শত বৎসরের পূর্ব্বে দিবার আর উপায় নাই।

এইরূপ সংস্কৃত-সাহিত্যের বই পড়িতে পড়িতে অনেকের স্থান ও কাল ঠিক হইয়া যাইবে। এ জিনিষটীকে ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। শুধু ইংরাজী পড়িয়া আর সাহেবদের বই পড়িয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস জমিবে না, জমাইতে পারিবে না। কিন্তু এখনকার ইতিহাসবাগীশেরা সাহেবের বই ছাড়া পড়িতে পারেন না। সংস্কৃত তাঁহাদের একেবারেই বাঘ বলিয়া মনে হয়। অনেকে আবার ১৮৲।১৯৲ টাকার একজন পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃতের কাজ সারেন। পণ্ডিত যাহা বলিয়া দেন, তাঁহাকে তাহাই বিশ্বাস করিতে হয়। এই ভাবে ইতিহাস চালাইলে ভারতবর্ষের ইতিহাস সত্যের না হইয়া মিথ্যার রাশি হইয়া উঠিবে।
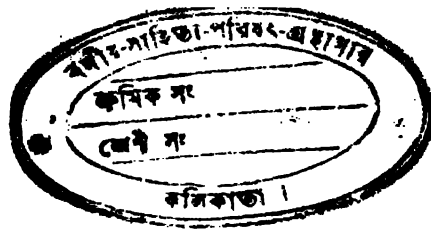
কোবিদ-কুল-পুঙ্গব হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" দারুণ গ্রীষ্মাতিশয্যের পর বর্ষার প্রারম্ভে কালিদাসের যক্ষ তাঁহার বিরহ-গাথা-গান আরম্ভ করেন। আর এই অগ্রহায়ণ মাসের সেই প্রথম দিবসে দারুণ "ভাদুরে গুমোটে"র পর শীতের প্রাক্কালে—ইংরেজি ১৭ই নবেম্বর মঙ্গলবার রাত্রি ১১টার সময়—কলিকাতা মহানগরীতে শাস্ত্রীমহাশয় পৃথিবীর নিকট হইতে চিরবিদায়গ্রহণ করিয়া অনেক সজ্জনকে তাঁহার বিয়োগ-ব্যথায় ব্যথিত করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার মৃত্যু জনসাধারণের নিকট একটা বড়লোকের মৃত্যুর অধিক কিছু না হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা বিশেষ শিক্ষিত তাঁহারা অবশ্যই বুঝেন যে, তেমন ভাবের গীর্ব্বাণীর কোন বরপুত্রের আবার পৃথিবীতে সহসা আসিবার আশা করা যায় না। আমি তাঁহার সম্বন্ধে অন্ধভাবের গোঁড়া নহি—বরং কোন কোন বিষয়ে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী; কিন্তু যখনই আমার মনে হয় যে, কি এক চিররুদ্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বারের চাবি হাতে লইয়া তিনি এ দেশে জন্মিয়াছিলেন, তখনই আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তিতে বঙ্গরাণীর কিরীট হইতে যে মহার্ঘ রত্ন খসিয়া পড়িল, তাহা কে কতদিনে আবার বঙ্গজননীর মুকুটে পুনঃসংস্থাপিত করিতে পারিবেন, তাহা বিধাতাই জানেন।

শাস্ত্রীমহাশয় গবর্ণমেণ্টের এবং বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট উপযুক্ত সম্মান পাইয়া গিয়াছেন। ১৮৭৮ সালে তিনি হেয়ার স্কুলের হেড্ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তাহার পর তিনি ক্রমশঃ লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের এবং তৎপরে সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক হন। ঐ কার্য্যের পরিপক্ক অবস্থায়—১৯০০ সালে—তিনি শেষোক্ত কলেজের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তৎপূর্ব্বে বহুবৎসর পর্য্যন্ত তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ানের কার্য্য যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে থাকিবার সময় তিনি পেনসন্ লন। তাহার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডীন অফ ফ্যাকাল্টী অফ্ সংস্কৃত ষ্টডিজ্" পদে অধিরূঢ় হন। বহু ভাষায়—যথা সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, বাঙ্গালা এবং ইংরেজিতে—তাঁহার বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "অর্ডিনারী ফেলো"র পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "রিসার্চ প্রাইজ" পরীক্ষার, পরন্তু প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি-সম্বন্ধীয় এবং পি এচ্, ডি, ও অন্যান্য পরীক্ষার, তদ্ভিন্ন এলাহাবাদ ও মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষার পরীক্ষকের কার্য্যও বহুবৎসর করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষার 'অনার্স' পরীক্ষকও তিনি হইয়াছিলেন।

সরকারি কর্ম্ম হইতে অবসর-গ্রহণের পরে—১৯০৮ সালে—তিনি "বুরো অফ ইনফরমেশন"এর ভার প্রাপ্ত হন। বাঙ্গালার সিবিল কর্ম্মচারীদের ধর্ম্ম, ইতিহাস ইত্যাদির তথ্য-সম্বন্ধে খোঁজ-খবর দিয়া সাহায্য করার জন্য ঐ "বুরো" সংস্থাপিত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটিরও তিনি অন্যতম জীবিত-কল্প কর্ম্মী সদস্য ছিলেন। "বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ"-প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যেও তিনি একজন। অনেক বৎসর—তাঁহার মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত—তিনি উহার সভাপতিত্ব করিয়াছেন। বৌদ্ধ-সাহিত্য, বাঙ্গালা-সাহিত্য প্রভৃতি-সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধান কার্য্যের ফল চিরস্মরণীয় থাকিবে। অনেক সাময়িক পত্রেও তিনি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; সে সকল লেখা অবশ্য তাঁহার বিলক্ষণ গৌরবের।

শাস্ত্রী মহাশয়ের বংশ পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাত। ধনাঢ্য পরিবারে তাঁহার জন্ম না হইলেও তিনি আপনার চেষ্টাতেই অতবড় বিদ্বান্ হইতেই পারিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাবসায় দুর্দ্দমনীয় ছিল। এম্-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে তিনি প্রথমস্থান অধিকার করেন, বি-এ পরীক্ষাতেও তাহাই হন। এম্-এ পরীক্ষার ফলে তিনি শাস্ত্রী উপাধি পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডক্টর অফ লিটারেচার" উপাধি দেন

আর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহামহোপধ্যায় ও সি-আই-ই উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

হস্ত-লিখিত পুরাতন সংস্কৃত পুঁথি উদ্ধার-কল্পে শাস্ত্রী মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সে পরিশ্রমও অনেকটা সার্থক হইয়াছিল। তৎকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস, বিশেষতঃ বৌদ্ধ-যুগের সাহিত্যাদি-ঘটিত গবেষণা ও বক্তৃতাদি বাস্তবিক উচ্চ প্রশংসার্হ। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি বাঙ্গালাগ্রন্থও উপাদেয়।

সিবিলিয়ান জজ বেভারিজ প্রভৃতি একসময়ে জিদ ধরিয়া বসিয়াছিলেন, যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার লেখাপড়ায় সর্ব্বত্র —ইউরোপের ন্যায়—রোম্যান অক্ষরের প্রচলন হয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের যুক্তি ও তর্কে তাহা ঘটে নাই।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়ার সংলগ্ন নৈহাটী শাস্ত্রী মহাশয়ের পৈতৃক বাস-স্থান। এখন নৈহাটী একটি বিখ্যাত জংসন ষ্টেশন। কাঁটালপাড়াও পরমবন্দ্য বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-ভূমি বলিয়া এখন সর্ব্বজন-বিদিত। তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই শাস্ত্রী-মহাশয়ের সাহিত্য-জীবনের আরম্ভ হয়, ইহা নিঃসংশয়ভাবে বলা যাইতে পারে। সেই সময়ে তাঁহার প্রথম রচনা "ভারত মহিলা," যাহা তৎপূর্ব্বে মহারাজা হোলকার-প্রদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল, ১২৮২ সালের শেষ দুই মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তাহার পরের বৈশাখ হইতে বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ থাকিয়া একবৎসর বাদে পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেব সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় উহা আবার প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় হইতেই আমার পিতা ও পিতৃব্যের সহিত শাস্ত্রী-মহাশয়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইতে থাকে এবং তিনি বঙ্গদর্শনে প্রায়ই লিখিতে থাকেন। নৈহাটীতে থাকিলে তিনি প্রায় প্রতিদিনই আমাদের বাড়ীতে আসিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন। পিতৃব্যমহাশয় তাঁহার হাত ধরিয়া লিখিতে শিখাইয়াছিলেন, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। গত ১৬ই মে ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে কবীন্দ্র রবীন্দ্রের জন্ম-দিন উপলক্ষে যে সভা হয়, তাহার সভাপতি ছিলেন শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং। তিনি সে সভায় তাঁহার নিজের ও রবীন্দ্রনাথের পিতৃব্য মহাশয়ের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

১৮৮৭সালে ন্ জেনারেল-এসেম্ব্লিকলেজের রেভারেণ্ড হেষ্টী সাহেবের সহিত পিতৃব্য মহাশয়ের হিন্দুধর্ম-সম্বন্ধে লেখালেখি ভাবের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন বাঙ্গালার সুধী-সমাজ রুদ্ধশ্বাসে সে যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। অবশ্য শাস্ত্রীমহাশয়ও তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যবর্ত্তিতায় সে যুদ্ধ নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে হেষ্টী সাহেব পিতৃব্য-মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন এবং পরে এক দিন শাস্ত্রী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া পিতৃব্য-মহাশয়ের কলিকাতার বাসায় আসিয়া তাঁহার সহিত সাগ্রহে আলাপ করেন। প্রোক্ত যুদ্ধের রথীদ্বয়ের পরস্পর সাক্ষাৎকার শাস্ত্রী-মহাশয়ের যত্নেই সংঘটিত হইয়াছিল।

শাস্ত্রী-মহাশয় এবং ক্ষুদ্র জীব আমি, আমরা এক অধ্যাপকেরই ছাত্র। ভাটপাড়ার পূজ্যপাদ জয়রাম ন্যায়-ভূষণ মহাশয় তদানীন্তন কালের জনৈক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যাধ্যাপক ছিলেন। আমি যখন প্রথম সে বৃদ্ধের চরণ-প্রান্তে বসিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করি, তখন তাঁহার নিকট শাস্ত্রী-মহাশয় উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ও অলঙ্কারাদি পড়িতেন। শাস্ত্রী-মহাশয় বয়সে আমার অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন। এই সুযোগে আমরা পরস্পরের নিকট পরিচিত হই। তাহার পর যখন শাস্ত্রী-মহাশয় কাঁটাল পাড়ায় যাতায়াত আরম্ভ করেন, তখন হইতে আমাদের উভয়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকে। অনেক সময়ে আমরা একত্রে সাহিত্য-চর্চ্চা করিতাম। আমি তখন স্কুলের লেখা-পড়া ছাড়িয়া দিয়া—কলেজের মুখ দেখা আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই—বিদ্যাহীন লেখক হইবার জন্য শিক্ষানবিশী করিতেছিলাম। তখন হইতেই আমাদের 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমর' পত্রিকায় আমি প্রবন্ধ, কবিতা ও সমালোচনা লিখিতাম। শাস্ত্রী-মহাশয় সে সকলের প্রশংসা করিতেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ সুকবি ঈশানচন্দ্র আমার একজন অকপট সুহৃৎ ছিলেন। তিনি আমার কাছে কাঁটালপাড়ায় মধ্যে মধ্যে আসিতেন। সেই সূত্রে শাস্ত্রী-মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং তাঁহাদের উভয়ের সে আলাপ শীঘ্রই সৌহার্দ্দ্যেও পরিণত হয়। তাহার ফলে এক সময়ে তাঁহারা উভয়ে একত্রে কলিকাতার কোন এক বাসায় কিছুদিন ছিলেন। ঈশান বঙ্গদর্শনে প্রায়ই কবিতা লিখিতেন, পরে প্রচারেও তাঁহার কয়েকটী কবিতা

প্রকাশিত হয়। ঈশানচন্দ্র কবিবর নবীনচন্দ্রেরও বন্ধু ছিলেন। নবীনচন্দ্রের সহিত তখন আমার দেখাশুনা হয় নাই। তবে আমাদের উভয়ের মধ্যে চিঠি পত্র চলিত। ঈশান তাঁহার লিখিত "যোগেশ" নামক একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য আমাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনে আমি তাহার একটা বিস্তৃত সমালোচনা করি। এক দিন আমি সে সমালোচনার প্রুফ দেখিতেছি, এমন সময় শাস্ত্রী-মহাশয় সেখানে আসেন এবং সাগ্রহে তাহা পড়েন। সে সমালোচনায় ঈশানের ঐ পুস্তকের এক স্থানের লেখা আমি বৈদেশিক কোন গ্রন্থকারের রচনা-মাধুর্য্যের সহিত তুলিত করিয়াছিলাম। তাহা পড়িয়া শাস্ত্রী মহাশয় চটিয়া যান। তিনি আমাকে এই রকম ভাবের কথা বলেন, "দূর ছোঁড়া—এ কি করেচিস্, বইএর এ স্থানের রচনা যে কালিদাসের যোগ্য, এখানে (প্রুফে) কালিদাসের নাম বসিয়ে দে।" অবশ্য তখনই তাহা করা হইল। আমাদের উভয়ের মধ্যে তখন এতদূর প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল। বাস্তবিক আমরা একে অপরকে কেবল নাম ধরিয়াই ডাকিতাম, আর ঐরূপ ভাবের কথাবার্ত্তাও আমাদের মধ্যে অনেক সময়ে চলিত। কিন্তু এই প্রবন্ধে—কতকটা শিষ্টাচারের অনুরোধে, কতকটা বা অন্য কারণে—আমি "শাস্ত্রী-মহাশয়" "শাস্ত্রী-মহাশয়" বলিয়া বারংবার সেই পণ্ডিত-প্রবরের উল্লেখ করিতেছি।

তখন দেখিয়াছি, শাস্ত্রী-মহাশয় তাঁহার অগাধ বিদ্যাবত্তা সত্ত্বেও নিরহঙ্কার ছিলেন। একটি দৃষ্টান্ত দিব। তখন বঙ্গদর্শনে তাঁহার "বাল্মীকির জয়" ক্রমিকভাবে প্রকাশিত হইত পরে উহা গ্রন্থকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। শাস্ত্রী-মহাশয় তাহার একখণ্ড কলিকাতা হইতে আমাকে ডাকে পাঠাইয়া দেন; কভারের উপর আমাকে লিখিয়া আমার মন্তব্য চাহিয়াছিলেন।

বই পাইয়া আমি তাঁহাকে লিখি যে, তাঁহার মত অত বড় একজন পণ্ডিতের এবং অমন একজন উচ্চদরের এম-এর লিখিত পুস্তকের সমালোচনা আমার মত একজন স্কুলেরও বিদ্যাহীন লোকের দ্বারা শোভনীয় হয় না—অতএব আমি তাহা পারিব না। তদুত্তরে পণ্ডিতবর তখনকার কালের প্রচলিত অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের একখানি পোষ্টকার্ডে আমাকে লেখেন। এই লেখা তাঁহার নিরহঙ্কারিত্বের সম্পূর্ণ পরিচায়ক। ঐ লিপিতে যে "বঙ্গ" কথাটি পাঠক দেখিতেছেন, উহা "বঙ্গ-দর্শন" "কথাটির সংক্ষেপ। পাঠক কিন্তু উহাতে আরও দেখিবেন যে ঐ পুস্তক-সম্বন্ধে আমার লিখিত বা বাচনিক অভিমত জানিবার ইচ্ছা শাস্ত্রী-মহাশয় প্রকাশ করিলেও বঙ্গদর্শনে যে আমি উহার একটা সমালোচনা করি, তাঁহার এ বাসনা তিনি ঐ লেখায় গোপন রাখিতে পারেন নাই। তিনি আমাকে এতই ভালবাসিতেন। ইহা আমার যৌবনের প্রারম্ভাবস্থার কথা—১৮৮২ সালের। ঐ ভালবাসা-সম্বন্ধে আর এক সময় তিনি আমাকে স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন—

18. 2. 82

My Dear Jyotish,

I really value your opinion on these half Poetical Books more than that of the best M. A. I don't request you to write a review in the Banga. But I want to have your sincere opinion on it either written or verbal. But as we meet but rarely it will give me the greatest pleasure to have it written in Banga. I am all right, I hope you are all right.

Yours Sinly,
H. P. Shastri.

পত্রখানি আমি রাখিয়া দিয়াছি।

ভালবাসায় যেন একটা কি অভিসম্পাত আছে, একথা সত্য। এ সকলের পরেও আমাদের উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। শাস্ত্রী-মহাশয় তখন নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্ চেয়ার ম্যান্ ও অনারারি ম্যাজিষ্টেট এবং আমি তথাকার কমিশনার আর অনরারি ম্যাজিষ্টেট। মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য লইয়াই আমাদের মধ্যে মনান্তর ঘটে; কিন্তু কথাবার্ত্তায় সে প্রণয়-ভঙ্গের বাহ্য লক্ষণ আমরা কেহই প্রকাশ হইতে দিই নাই। উত্তর কালে—যখন আমি ক্রমান্বয়ে তের বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক থাকি—সেই সময়ের মধ্যে দুইবার শাস্ত্রী-মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি পরীক্ষক হওয়ায় তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করেন। ইহার পর আমি দীর্ঘ কয়েক বৎসর কাশীধাম প্রভৃতি স্থানে

থাকি। সে সময়ের মধ্যে আমি একবার কলিকাতায় আসিলে সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরের এক অধিবেশনে আমাকে উপস্থিত থাকিতে হয়। সেখানে সভাপতি ছিলেন শাস্ত্রী মহাশয়—অধিবেশনের কার্য্য ছিল তথায় খুল্লতাত মহাশয়ের নব-সংস্থাপিত মর্ম্মর-মূর্ত্তির তৎকর্ত্তৃক আবরণ উন্মোচন। আমাকে দেখিয়া সাদর-সম্ভাষণ-পূর্ব্বক শাস্ত্রীমহাশয় আমাকে তাঁহার পার্শ্বে বসাইলেন। সেখানে আবরণ উন্মোচনের পর আমি তাঁহার অনুরোধে একটি কীর্ত্তন গান করি। শুনিয়া শাস্ত্রী-মহাশয় ও তথায় সমুপস্থিত আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, অধুনা পরলোক-গত আমার পূর্ব্বতন উপরিস্থ কর্ম্মচারী ভূতপূর্ব্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ সূর্য্যকুমার অগস্তি মহাশয় এবং অন্যান্য বন্ধুগণ ও সমবেত সভ্যগণ সকলে বড়ই আনন্দ প্রকাশ করেন। আমাদের এই কয়বার সাক্ষাতের কথা এইজন্য লিখিলাম যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে বহুদিন-ব্যাপী একরূপ ইচ্ছাকৃত বিচ্ছেদ তখনও চলিতে থাকিলেও শাস্ত্রী-মহাশয়ের আমার সহিত কথাবার্ত্তায় সেই পূর্ব্বের ভাব প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে প্রশংসারই কথা।

বিগত শারদীয়া-পূজার অনতিপূর্ব্বে আমি বিদেশ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছি। গত বিজয়াদশমীর পর-দিন—কি জানি কেন?—শাস্ত্রী-মহাশয়ের সহিত একবার বিজয়ার সম্ভাষণ করিতে প্রবল ইচ্ছা হইল। তখনি তাঁহার পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যাইলাম; সেখানে শুনিলাম, তিনি নৈহাটীতে আছেন। তাহার পর এখন সব ফুরাইয়াছে—তাঁহার মহাযাত্রা হইয়াছে। তবে—

"গচ্ছ শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু।"

——:**:——

সম্মোহিতা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী উষা মিত্র

দশ

বিপদের সম্ভাবনায় মানব শিহরিয়া উঠে ততক্ষণ, যতক্ষণ না সে উহার সম্মুখীন হয়; আবার দেখা-সাক্ষাৎ হইলে সে দাঁড়াইয়া উহার সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সমুদয় শক্তি সংগ্রহ করিয়া লয়। ক্রমে আসন্ন বিপদের প্রচণ্ড দাহকারী শক্তি সহিতে না পারার ভয় থাকে না। ইহাই না কি প্রকৃতির নিয়ম; তাই রায়-পরিবারে অমন শোচনীয় ঘটনার পরেও আজ আবার নিয়মিত কার্য্য চলিতে লাগিল। হঠাৎ—দুই দিনের ওলাওঠায় শান্তি দেবী যেদিন জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়াছিলেন সুলেখার মনে হইয়াছিল—এ আঘাত [illegible] তে পারিবে না—মাতৃ-শূন্য গৃহে থাকিতে [illegible] ক্রমে দেখিল সবই সহিয়া যায়। [illegible] চালিতে রীতিমত বিস্মিত হইয়া দেখা [illegible] দিকে চাহিয়া রহিল।

"কি রে—অমন হাঁ করে চেয়ে রইলি যে?"

"তোমার নতুন পোষাক দেখ্‌ছি দাদা, মাগো এত মোটা বিশ্রী ধুতি তুমি কেমন করে পরেছ?"

জিতেন সুলেখার আরও একটু কাছে গিয়া কোঁচার একটা অংশ উহার হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—"দেখ কি চমৎকার জিনিস।"

"এমন মোটা খড়খড়ে কাপড় যদি ভাল হয় তবেই গেছি।" বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

"হাসিস না লেখা—আমাদের বাড়ীতে বিলাতী জিনিস ছাড়া এসব কোনদিন দেখ নি—তোমার দোষ কি—যাক্ সে কথা। এ আমাদের দেশের—তোমার মত মেয়েরা চরকায় সুতো কাটে, আর সেই সব সুতো দিয়ে যে কাপড় তৈরী হয় তার নাম খাদী, এ নাম শুনিস নি কি কখন? এ সেই খদ্দর।"

"না দাদা এ বড় বিশ্রী।"

"না রে খুব নরম—পরবি একখানা?"

"কিন্তু এত মোটা কি আমি পরতে পারব দাদা?"

"কেন পারবি না রাণী? কত বড় ঘরের কোমলাঙ্গীরা এ পরছেন—আর পারবি না তুই? আমাদের দেশের জিনিস আমরাই যদি ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে দি, তবে বিদেশীকে দুষবার কি আছে? তাদের বরং বিদ্রূপ করবার অধিকার আছে।"

"আর আমাদের?"

"কি পাগলের মত কথা বল্‌ছ লেখা? আমাদের হাতের তৈরী আমাদেরই নিজস্ব জিনিস দেখে হাস্‌বার অধিকার কেমন করে থাকবে রে পাগলী?"

"আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগছে—তুমি যা বিলাসী, শান্তিপুরের মিহি ধুতী ছাড়া পর না তাই—"লেখা চুপ করল।

"কিন্তু মানুষের মন পরিবর্ত্তন হ'তে এক মুহূর্ত্তের দরকার, মনের এ পরিবর্ত্তন সময়ে-সময়ে যে কত তুচ্ছ ব্যাপারের ওপর নির্ভর করে লেখা। মত মানুষের কি চিরকাল সমান থাকে? না, তাই থাকা সম্ভব?

"কেন থাকে না দাদা?"

"আবার অবুঝের মত প্রশ্ন—এ যে প্রকৃতির নিয়ম রে রাণী।"

"এতবড় শক্তি তার যে মানুষের চিত্ত—তাকেও সে জয় করবে?"

"কিন্তু মানুষের চিত্ত যদি প্রকৃতির উপাদানে তৈরী হয়।"

হাসিয়া লেখা লুটাইয়া পড়িল,—"সে আবার কি দাদা?"

"সব কথার মীমাংসাই কি কেতাবে থাকে? না সব মানুষের মনই সমান? আমার যদি এই বিশ্বাস, এই ধারণা হয়।"

অন্যমনস্কভাবে লেখা বলিল,—"তা হ'বে কিন্তু হঠাৎ তুমি স্বদেশী হ'য়ে উঠলে কেন?"

"দেশী মায়ের গর্ভে, দেশী মাটীতেই যে জন্মেছি দেশী উপাদানেই যে শরীর-মন গঠিত, লেখা।"

"কিন্তু এসব কারণ আগেও তো বর্ত্তমান ছিল দাদা।"

"বর্ত্তমান ছিল—প্রকাশ হ'বার সুযোগ বা সুবিধা পায় নি। তখন আমার মধ্যে সুপ্ত ছিল বুঝলি—আর একটা কথা জেনে রাখ, কারণ বিনা কাজ হয় না।"

"কিন্তু সম্প্রতি কি এমন কারণ ঘটে উঠেছে যাতে সেটা প্রকাশ হ'তে পেরেছে।"

"সেই কারণই যে আজ বলব, পল্লীগ্রামে আবর্জনার মধ্যে যে এক বিদূষী নির্ব্বিকার উদারচেতা রমণী আছেন, সেই মহিমময়ীর সংস্পর্শে আমার সুপ্ত প্রকৃতি জেগে উঠে ধন্য হ'য়েছে—কিন্তু শুনে আশ্চর্য্য হ'বি তুই মুখে তিনি কিছু বলেন নি—সামান্য একটু ইঙ্গিত পর্য্যন্তও করেন নি।"

"তবে—তবে কি—"

বিস্মিত সুলেখার মুখের ভাব দেখিয়া জিতেন বলিয়া উঠিল,—"হাঁ তাঁর কাজের শক্তি মনের আমার সব জঞ্জাল সাফ করে দিয়েছে—সে অনাবিল আকর্ষণী শক্তির পরিচয় মুখে বলা যায় না তা সুধু অনুভবের জিনিস। তোকে একবার আমার সেই দিদির কাছে নিয়ে যাব। দেখ্‌বি অভাবের ভেতর হাসিমুখে কেমন করে সংসার চালাতে হয়—দুঃখী আতুরকে কেমন করে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে বাঁচিয়ে তুলতে হয়—মরণাপন্ন রোগীকে সেবা-শুশ্রূষা করে কেমন করে অমৃতের প্রলেপ ছড়িয়ে দিয়ে যাতনার লাঘব করতে হয়—কেমন করে—সম্মানের সহিত নারীর নারীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়,—দেখ্‌বি রাণী কেমন করে সংসারের সব দুঃখ, সব ঝঞ্ঝা, সব লাঞ্ছনা-গঞ্জনা স্থিরভাবে হাসিমুখে বুক পেতে নিতে হয়।"

অপূর্ব্ব তৃপ্তি ও পুলকে জিতেনের চিত্ত ভরপুর হইয়া উঠিল।

শুনিয়া আনন্দে সুলেখা বলিল,—"যাব আমি তাঁর কাছে—তিনি বুঝি খদ্দর পরেন?"

"হাঁ,—জমীদারের বৌ ছোট এক মেয়ে নিয়ে বিধবা হ'য়েছিলেন—দেবর সব বিষয়-আশয় গ্রাস করে ফেলেছে; ছোট্ট এক ঘরে সেই মেয়েটাকে [illegible] তিনি থাকতেন, কিন্তু কে জানে কার অভিশাপে সে [illegible] মারা গেল।"

তাঁর এতবড় দুঃখের কাহিনী [illegible] তে পরদুঃখ-কাতরা লেখা চঞ্চল হইয়া পড়িল। [illegible] বিবর্ণ পাংশু

হইয়া উঠিল। বাবের স্মৃতি প্রবলতর হইয়া পীড়া দিতে লাগিল। অঞ্চল দ্বারা সুলেখা নেত্র মার্জ্জনা করিল।

বিচলিত হইয়া—জিতেন ভগ্নীকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া বলিল,—"চুপ কর লক্ষী বোন, বাবা আবার দেখ্‌তে পেলে অস্থির হ'বেন।"

"বাবা দেখ্‌তে পাবেন, শুন্‌তে পাবেন বলে যে আমি কোন দিন কাঁদি না দাদা, কিন্তু বাবার শরীর দিন দিন বড় খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে, এত যত্ন করছি কিছু হচ্ছে না।"

"আমিও দেখ্‌ছি এ আঘাত তিনি সইতে পারছেন না, ভেঙ্গে পড়েছেন। তুই ভাবিস না বাবা আবার সাম্‌লে উঠ্‌বেন।"

"আমরা পেরেছি দাদা, তিনি কেন পার্‌ছেন না?"

"আমরা আঘাত সইতে পেরেছি সত্য কিন্তু সকলের মন তো সমান হয় না বাবার মনটা বড় কোমল—আর এটাও মনে রেখ ওঁরা কত দিনের সাথী, কত সুখ-দুঃখ এক সঙ্গে ভোগ করেছেন।"

"আমার মনে হয় মাকে বাবার মত আমরা অত ভাল-বাসি না।"

"ভালবাস না? কি বলতে চা তুমি? তাঁকে ভুলে গেছি?"

"পারি না দাদা—আজও মাকে ভুলতে, তবুও বলব' বাবার মত গভীর আমাদের ভালবাসা নয়। মা যেন বাবার নিজের হাতে গড়া জীব।"

উহার অশ্রু মুছাইয়া জিতেন বলিল,—"আমি সব বুঝি লেখা—যেতে দে ও-কথা—ওই যে মেয়েটার কথা বল্লুম ইনি কে জানিস—নরেনের বৌদি।"

"মনে পড়্‌ছে এঁর কথা নরেন-দার মুখে কত বার শুনেছি—নিয়ে যাবে তুমি আমার?"

"নিশ্চয়। নরেন আজ কত দিন আসে নি রে?"

"সে আমার মনে নেই—কিছু দিন থেকে তিনি আসছেন না; আমার কিন্তু একটা জিনিস চাই দাদা।"

"কি জিনিস?"

"না তুমি হাসবে।"

"বল লক্ষী হাসব না।"

"জিন প্রতিজ্ঞা কর হাসবে না।"

মৌখিক ক্রোধের সহিত জিতেন বলিল, "যা শুন্‌তে চাই না তোর কথা।"

ভ্রাতার মুখের দিকে অভিমানভরা চোখে চাহিয়া সে বলিল,—"না চাই না।"

কিছুমাত্র আগ্রহের ভাব না দেখাইয়া জিতেন বলিল,— "যখন বলবিই না, তখন শুনব কেমন করে? আমি তো, নরেন নই—"

রাগিতে গিয়া সুলেখা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল,—"যাও— তুমি ভারি দুষ্টু—আমার ই—য়ে চাই।"

"সে আবার কি?"

সঙ্কোচের সহিত ধীরে ধীরে সে বলিল, "একটা চরকা শাড়ী।"

জিতেন হাসিয়া উঠিল। সে বুঝিল তাহার সৌন্দর্য্য-প্রিয় ভগ্নী ভ্রাতার খাতিরে খদ্দর পরিবার বাসনা করিয়াছে মাত্র, না হইলে উহার চক্ষুতে খাদী কোন দিনই সৌন্দর্য্যশালী হইয়া উঠিবে না। ভগ্নীর শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া সে ব্যথিত হইল,—নিজের উপর বিরক্ত হইল, তারপর আদর করিয়া কোমলকণ্ঠে বলিল,—"বেশ তুলো আর চরকা কাল এনে দেব, কেমন করে সুতো তৈরী করতে হয় তাও দেখিয়ে দেব।"

গভীর বিস্ময়ে লেখা বলিল,—"সুতো কাটতে জান তুমি?"

"দিদিকে কাটতে দেখছি যে, তাঁর কাছে শিখেছি।"

"ওঁর চরকা আছে?"

"নয় তো সুতো তৈরী করেন কেমন করে? আর আমিও একটা চরকা কিনে দিয়েছি।"

"আমায় আজই এনে দেবে?"

"আচ্ছা।"

"আর খাদির শাড়ী?"

"এনে দেব কিন্তু সে যে তুই পরতে পারবি না।"

"কেন?"

"তোর চোখে ও জিনিসটা সুন্দর লাগবে না।"

"হোক গে,—সুন্দর আমার চাই না, দেশের যা গর্ব্ব, আমার দাদার যা গর্ব্ব, সে কুৎসিতই আমার ভাল।"

স্নেহে ভগ্নীর মস্তকে হাত দিয়া জিতেন বলিল, "তুই আমার

এত ভালবাসিস রাণী ? আচ্ছা লেখা নরেনের চেয়েও ?" কুল্লাবরে সে বলিল, "যাও তুমি ভারি দুষ্টু।"

এগার

ক্ষুব্ধকণ্ঠে জিতেন বলিল,—"শুনেছ লেখা নরেন ফেল হয়েছে।" স্তব্ধমুখে লেখা বসিয়া রহিল।

"না, না—তোর ও শুকনা মুখ আমি দেখ্‌তে পারি না, দেখতেও চাই না—অমন করে থাকিস না লেখা।"

"কোথায় দেখলে আমায় শুকনো মুখ ; তোমার বন্ধু, তোমার কি তার ফেল হওয়ায় কষ্ট হচ্ছে না ; পরিচিত লোকের অমন বিপদে কার না মনে একটু কষ্ট হয় ? যাক্ আজকাল তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ দাদা।"

"আমি ?" জিতেন জোর করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"না তুমি হেস না, তুমি তুমি—"

"কি বল্ না—থামলি কেন ?"

"তুমি বিয়ে কর।"

"এই কথা ?" জিতেন গাম্ভীর্য্যের ভাব মুখে আনিয়া বলিল,—"কিন্তু—নরেনের মত অমন সুন্দর যদি বৌ দেখতে হয় তবেই না।"

"কি যে বল তুমি—ভারি অসভ্য হ'য়ে উঠছ তুমি—তোমার সঙ্গে কখনও আর কথা বলব না।" অভিমানে লেখা মুখ ঘুরাইয়া লইল।

ভগ্নীর এই অভিমানটুকু দেখিতে উহার বড় ভাল লাগিত, তাই সময়ে-অসময়ে উহাকে রাগাইয়া প্রাণ ভরিয়া উহা উপভোগ করিবার লোভ—কিছুতে সে সংবরণ করিতে পারিত না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"লেখা, লেখা রাণী কথা বল্‌বি না ? আচ্ছা যা—বলিস না কথা—আজ আর জল-খাবার খাব না, রাতেও কিছু খাব না।" জিতেন আড়-চোখে উহার দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"দাদা ?" বলিয়া লেখা জিতেনের হাত ধরিল।

"কথা না কি বল্‌বি না ?

"তুমি যা দুষ্টু—কিন্তু—সত্যি এবারে বিয়ে কর দাদা, বল করবে ?"

অশ্রুভরা নেত্রে জিতেন বলিল,—"মার বড় সাধ ছিল—কত বলেছেন, জানিস তুই—কিন্তু তাঁকে যখন সুখী করতে পারি নি—"

"সেইজন্যেই যে বল্‌ছি জীবিত মাকে খুসী যখন করতে পার নি—তাঁর আত্মাকে সুখী করে তাঁকে একটু শান্তি পেতে দাও।

জিতেন নীরব রহিল।

আগ্রহভরে লেখা বলিল,—"বল দাদা একবার বল তুমি বিয়ে করবে।"

ব্যথিতস্বরে জিতেন বলিল,—"না লেখা এ অনুরোধ কর না, জানিস্ না তোর কোন কিছু একটা—সামান্য কথা রাখ্‌তে না পারলে কত দুঃখ পায় তোর দাদা।"

"সেই জন্য যে বলছি গো বিয়ে কর, বিয়ে কর, তুচ্ছ এই বোনের আব্দার রেখেছ কতবার—এখন এই সত্যিকার অনুরোধ রাখ। বল, বল দাদামণি। একথার তুমি না করো না।"

বিষাদগম্ভীরকণ্ঠে জিতেন বলিল, "এ যে পারব না রাণী ?"

"কেন ?"

"সে তুই বুঝবি না ; তুই যে জানিস না অন্তরে তোর দাদা কত দুর্ব্বল, সেই দুর্ব্বলতাকে জয় করবার জন্যে কি ভীষণ চেষ্টাই না ক'রেছ সে,—যে দিন তা পারব সে দিন তোর অনুরোধ রাখ্‌ব এখন মিছে অনুরোধ করিস নি দিদি।"

সুলেখা অন্য নূতন নূতন কথা শুনিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া এক দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে আপন মনে জিতেন বলিল, "না—না এ অসম্ভব এ হ'তে পারে না। এর কারণ কোন দিন জিজ্ঞাসা করিস নি লক্ষ্মী ; আর তোর দাদার দোষ—অন্য লোকের মত বিচারের নিক্তিতে তুলে ধরিস নি, সে আমি সইতে পারব না।"

"কি বলছ দাদা সত্যি করে অপরাধ যে কোন দিন তুমি করতে পার এ আমি বিশ্বাস করি না, তুমি চুপ কর।"

"সত্যি কি মিথ্যে জানি না কিন্তু তুই তাকে নিক্তিতে তুলিস নি ; হয় তো তুলিস না, শুধু এই টুকু আমি তোর কাছে চাই—।"

"থাম দাদা আগোল্-তাবোল বক্লে না, চুপ কর তুমি

যেমন আমার ভক্তি-শ্রদ্ধার দাদা আছ, তেমনি চিরকালই থাকবে।"

"আর যদি সত্যিকার দোষ করি?"

"তবুও তুমি তাই থাকবে কিন্তু—।"

"না আর কিছু নয়, তুইও এবার থাম।"

"বেশ তাই, যেতে দাও ও কথা; তুমি যে বলেছিলে এক দিন দিদির কাছে নিয়ে যাবে?"

"তাঁর কাছে? চল যাই।"

"ও কি এখুনি উঠে দাঁড়ালে কেন? বসে পড় তোমার মন এখন ঠিক নেই।" সুলেখা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল।

হাসিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া জিতেন বলিল,—"না ওটা কিছু নয় কি বলছিলি তুই।"

"এখন আর কোন কথা না তুমি শুয়ে পড়।"

"আমি ভাল আছি রে পাগল—কোথায় যাবার কথা বলছিলি?"

"তোমার দিদির কাছে।"

"এখন কি করে হয় লেখা—বাবার শরীর দেখছিস কেমন হয়ে যাচ্ছেন দিন দিন—দিন কতক পুরী যা তোরা, ফেরবার পর সেখানে নিয়ে যাব।"

"তুমি?"

আমি এখন যেতে পারব না রাণী। পড়ার ব্যবস্থা করতে হ'বে, শেষে দিন কতকের জন্যে যাব।"

কি ভাবিয়া লেখা বলিল, "আচ্ছা দাদা সবাই মিলে যে তাঁকে এত ব্যথা দেয়—এমন ভাল তিনি কিন্তু তাঁকে লোকে অযথা কষ্ট দেয়, এতে এতটুকু কি তাদের মনে ব্যথা হয় না?"

"তোর মত এমন করে পরের ব্যথা সবাই যে অনুভব করতে জানে না—আবার দিদিটার মত এমন উদার মনের লোক জগতে খুব কমই আছে—সাধারণ মানুষ জানে শুধু বিচারের ভাণ করতে—ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, সত্যি-মিথ্যা যাই হোক—জানে অপরাধীর বিচার না করেই দণ্ড বিধান প্রয়োগ করতে মাত্র—বিচারের নিক্তিতে তুলে [illegible] মর্য্যাদা রক্ষা ক'রবার তারা কোন [illegible]

[illegible] লেখা [illegible] দিয়া দেখিয়া কেন যেন সঙ্কুচিতভাবে দ্বার খুলিয়া আবার উহা বন্ধ করিয়া দিল। বিস্মিত লেখা জিজ্ঞাসা করিল,—"কে ওখানে দাদা?"

"দেখি" বলিয়া বাহির হইয়া জিতেন বিমর্ষ নরেনকে দ্বারপার্শ্ব হইতে ধরিয়া আনিল, লেখা তখন অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল। "তুমি একটু লেখার কাছে বস, দোকান থেকে ওর চরকা নিয়ে শীগ্‌গীর আস্‌ছি।"

"ফেল হয়েছি—শুনেছ।"

"এর জন্যে দুঃখ করছিস কেন? আবার চেষ্টা কর পাস হ'বি।"

"কিন্তু আমি—"

বাধা দিয়া জিতেন বলিল,—"মেয়ে মানুষের মত মন তোর—একটু আঘাত সইতে পারিস না। আচ্ছা আমি আস্‌ছি এখুনি।"

"শুনে যাও জিতেন।"

"না—না এসেই শুনব—বড় দরকার ভাই।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া জিতেন চলিয়া গেল। স্তব্ধভাবে নরেন বসিয়া রহিল। সে যে সারারাত জাগিয়া, ক্ষত-বিক্ষত হইয়া নিজকে দৃঢ় করিয়া—কৃতসংকল্প হইয়া আসিয়াছে, অস্বীকার করিতে—সুলেখাকে বিবাহ করিতে পারিবে না বলিতে কোনমতেই সে তাহার উপযুক্ত নয় জানাইতে, কিন্তু জিতেন চলিয়া গেলে সব যেন গুলাইয়া গেল। লেখার নিকটে বসিয়া নরেন অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। নরেনের অদ্ভুত ব্যবহার লেখার যেন কেমন কেমন লাগিতেছিল। অজ্ঞাত আশঙ্কায় সে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। এ নীরবতার ভিতর প্রচ্ছন্ন লজ্জা উভয়কে পীড়া দিতেছিল। জোর করিয়া সঙ্কোচটুকুকে সরাইয়া কম্পিত-কণ্ঠে লেখা জিজ্ঞাসা করিল,—"কিছু কি বলবার আছে?"

"না।

লেখা উঠিয়া বলিল। "একটু বস তুমি চা নিয়ে আসছি।"

"দাঁড়াও লেখা।"

বিস্মিত লেখা ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরও নরেন যখন কিছু বলিল না, লেখা তখন আরও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল,—"ফেল হয়েছ? বলে এত দুঃখ করছ কেন? আবার চেষ্টা কর কৃতকার্য্য হ'বে।"

"কিন্তু আমি আর পড়ব না।"

"বেশ না পড়, অন্য কিছু কর—যা তোমার ইচ্ছে।"

অপরাধীর ন্যায় মুখ তুলিয়া নরেন বলিল,—"সেই কথা বলতে এসেছিলুম জিতেনকে ?"

সুলেখার বক্ষে যে ভারী পাথরখানা চাপান ছিল, এই কথায় সরিয়া যাওয়ায় মন হাল্‌কা হইয়া উঠিল।

মৃদু হাসিয়া সে বলিল,—"কিন্তু এর জন্যে সঙ্কোচের কিছু নেই।"

"না আছে।"

আশ্চর্য্যভাবে লেখা বলিল, "কিন্তু আমি যে বুঝছি না।"

"বলতে এসেছি,—থাক, সে কথা জিতেনকে বল্‌ব।"

অধৈর্য্য হইয়া লেখা বলিল,—"কেন আমি কি শুনতে পারি না ?"

"পার।"

"তবে ?" লেখা উদগ্রীব হইয়া কহিল।

"হাঁ শোন—আমার ইচ্ছে যতক্ষণ না নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি, অন্ততঃ তিন-চার শ টাকা উপার্জ্জন করতে না পারি, বিয়ে করব না।"

উভয়েই নিস্তব্ধ। কতক্ষণ পরে নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিয়া নরেন বলিল,—"তুমি কি বল ?"

ধীরকণ্ঠে লেখা বলিল, "বেশ তো চেষ্টা কর।"

"কিন্তু যে কত দিনে, কত বছরে হবে তার ঠিক নেই, সেইজন্যে তোমার দাদাকে ও বাবাকে বলতে এসেছি অন্যত্র তাঁরা তোমার বিয়ে দিন।"

"তুমি——"অসহ্য বিস্ময়ে লেখা নীরব হইল। তাহার পায়ের তলার পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছিল বোধ হইল। মাথা-ঘুরিয়া উঠিল—ভগবান—ভগবান হৃদয়ে বল দাও, ঐ নির্দ্দয়, হৃদয়হীন লোকটার সামনে তার এ দুর্ব্বলতা যেন প্রকাশ হইয়া না পড়ে। সমগ্র শক্তি একত্রিত করিয়া শান্তকণ্ঠে সে বলিল,—"আমি তাঁদের একথা বলে দেব।" উহার মুখ দেখিয়া নরেন বুঝিতে পারিল না, উহার অন্তঃকরণ এ সংবাদে দুঃখ পাইল—না—আনন্দ পাইল। পুনরায় বলিল,—"আর শোন আমি এর জন্যে বিশেষ লজ্জিত।"

ঐ—নির্লজ্জ চঞ্চল-চিত্ত লোকটা বলে কি ? এর জন্য শুধু সে একটু লজ্জিত ! নিয়তির একি পরিহাস ! শুষ্ককণ্ঠে লেখা বলিল, "এর জন্যে লজ্জার কিছু নেই—তা হ'লে দাদাকে বলে দেব'খন।"

"অন্যের সঙ্গে বিয়ে হ'লে তুমি সুখে থাকবে, কিন্তু কখন কি আমাকে মনে করবে না ? বল লেখা দিনান্তে একবার—" আবেগভরে নরেন লেখার হাত ধরিল। লেখা কাঁপিয়া উঠিল—আবার—আবার সেই মোহকর সব-ভুলান স্পর্শ দেহমনে কি এক ব্যাকুল শিহরণ জাগিয়া উঠিল—চীৎকার করিয়া উহার বলিতে ইচ্ছা হইল—"ওগো নিষ্ঠুর, ওগো নির্ম্মম-অস্থিরচিত্ত, নিজেকে নিঃস্ব করিয়া তোমারই চরণে বিলাইয়া দিয়াছি—অনেকদিন আগে—সেইদিনই—সেই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই—আমার নিজের বলিতে সম্বল মাত্র কিছুই রাখি নি, রিক্ততার নেশায় মাতিয়া উঠিয়া—রিক্ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি—নাই দেবতা কিছুই নাই। যদিও—নির্ম্মম তুমি আজ প্রত্যাখ্যান করে আমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার মুলে কুঠারাঘাত করলে—কিন্তু সেই সর্ব্বগ্রাসী নেশা ও স্পর্শের সেই স্মৃতি যে অমরত্ব লাভ করে ফেলেছে—এই বুকের মাঝে চিরদিন অম্লানভাবে তা থাকবে, তাহার শেষ যে কখনও হবে না ; কিন্তু না—নারীর অবমাননাকারী অস্থিরচিত্ত—অবিবেচক হৃদয়হীনকে একথা বলিয়া নিজেকে হীন—দুর্ব্বল, পরাজিতা স্বীকার করিয়া লইতে সে প্রস্তুত নহে। এ না-পাওয়ার দুঃখ অন্তর ব্যাপিয়া উঠিলেও উহার মধ্যে যে শান্তি ও সুখ গোপন ছিল—আগ্রহ-ভরে সে উহাকে বুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল। কিন্তু হায় নারীর যে সঞ্চয় করিয়া রাখিবারও অধিকার নাই ! অদৃষ্টের একি লাঞ্ছনা একি বিদ্রূপ—এইমাত্র যে যাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল উহারই নিমিত্ত হৃদয়ের এ উন্মত্ততা, এ ব্যাকুলতা—তাজ্জব ব্যাপার ! নিজের উপর ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল। আত্মসম্ভ্রম জাগিয়া উহাকে সচেতন করিয়া তুলিল। বিষম বিরক্তির সহিত লেখা হাত ছাড়াইয়া লইয়া পরিষ্কার কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা আজ তুমি এস।"

"যাচ্ছি—লেখা, জন্মেরমতই যাচ্ছি—আর কোনদিন তোমার পথে এসে দাঁড়াব না কিন্তু—"

"না কিন্তু আব নেই—এর মধ্যে [illegible] থাকতে

পারে না।" নরেনকে তদবস্থায় রাখিয়া ধীরপদে সুলেখা স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া আরাম-কেদারাখানায় শুইয়া পড়িল। সে তো উহাকে চাহে নাই, তবে কেন দিনে রাতে এত আশ্বাসবাণী দিয়া, নিজের সঙ্গ দিয়া, স্পর্শ দিয়া শনির ন্যায় ঘিরিয়া থাকিয়া ভবিষ্যতের মধুর ছবি আঁকিয়া উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল! প্রত্যাখ্যানে উহাকে পথে টানিয়া ফেলিয়া দিবারই যদি ইচ্ছা ছিল, তবে কেন—কিসের জন্য নিজের সর্ব্বগ্রাসী লালসা অগ্নিতে উহাকে দগ্ধ করিয়াছিল। লেখার মনে পড়িল সে দিবস উহার মোহময় স্পর্শের সহিত কেমন করিয়া সে উহার উন্মাদ মনকে লোকচক্ষুর অগোচরে এক পূর্ণ শান্তিভরা দেশে ছাড়িয়া দিয়া স্বার্থকতার আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ সত্যের কঠোর আঘাতে তার সব স্বার্থকতা—সব মাদকতা সুখ-শান্তি আনন্দ ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। কি সে অসীম শান্তি, বিপুল স্বার্থকতা, অফুরন্ত উন্মাদনাই না ছিল উহার পরিত্যক্ত স্বপ্নের ভিতর। স্বপ্ন ফুরাইয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার অণুতে-পরমাণুতে—স্বীয় মোহময় কাম্য স্মৃতিটুকু মাদকতার মদিরায় অবলিপ্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে আজ সে রিক্ত আজ সে কাঙ্গাল। নেত্র মার্জ্জনা করিয়া লেখা উঠিয়া বসিল। এমন সময়ে দুই ব্যগ্র বাহু উহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"দিদি—রাণী—লেখা আমার।"

ব্যথিত স্বরে সে বলিল,—"কেন দাদা।"

"নরেনের দেওয়া এ দুঃখ সইতে কি তুই পারবি বোন?"

"পারব দাদা।"

"না দিদি তুই পারবি না—যখন সে আমায় বললে তার মাথাটা ভেঙ্গে গুঁড়ো করতে ইচ্ছে কর্‌ছিল, কাপুরুষ—বিশ্বাসঘাতক—যাক্ সে কথা. কিন্তু তুই কি পারবি—এ——"

"কেন পারব না দাদা, তোমার দিদি যদি অতবড় দুঃখ সইতে পেরে থাকেন, তখন আমিই বা পারব না কেন? সেই নারীরই যে জাত আমি।"

"আশ্চর্য্য ও নরেন ছেলেটা, ছোট বেলা থেকে দেখছি তাকে ওই একগুঁয়ে খামখেয়ালী। অস্থির স্বভাব কিছুতেই গেল না। কস্ত সে যে এমন পাষণ্ড এ জানতুম না।"

"থাক্‌গে ও সব কথা—চুপ কর দাদা।"

চকিতে ভগ্নীর দিকে চাহিয়া জিতেন বলিল,—"আমি জানি সে তোকে ভালবাসে, তবে ঐ এক খেয়াল; আর একবার তাকে বুঝিয়ে বলব।"

"দাদা ছিঃ" উহার কণ্ঠে ঘৃণা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। "নারীর কি আত্মসম্মানও অক্ষুণ্ণ রাখবার অধিকার নেই?"

"আছে।"

"তবে?"

"ক্ষমা কর্ রাণী—আমার দিদিকে বুঝি নি আগে।"

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

জৈন-সাহিত্যে কৃষ্ণচরিত্র

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

গত ভাদ্র মাসের 'পঞ্চপুষ্পে' অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'বৌদ্ধ ও জৈন-সাহিত্যে কৃষ্ণ-চরিত্র' নামে একটী উপাদেয় বহুতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্বেতাম্বর জৈনদিগের সাহিত্যে কৃষ্ণসম্বন্ধে যে সকল কথা পাওয়া যায়, তাহাদের কতকগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। দিগম্বর জৈনদিগের সাহিত্যেও যে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় তাহার কোনও আভাস তাঁহার প্রবন্ধ হইতে পাওয়া যায় না। তাই বর্ত্তমানে দিগম্বর-সাহিত্যে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের কিছু ইঙ্গিত প্রদান করিতেছি।

জৈনেরা কৃষ্ণের উপাসক না হইলেও কৃষ্ণকে তাঁহারা মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের ত্রিষষ্টি-শলাকা-পুরুষের মধ্যে কৃষ্ণ অন্যতম। দিগম্বর জৈনদিগের সাহিত্যের মধ্যে জৈন মেনাচার্য্যকৃত জৈন হরিবংশপুরাণ, (৭০৫ শকাব্দ বা ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রচিত), গুণভদ্রাচার্য্যকৃত উত্তর-পুরাণ (৮২০ শকাব্দ বা ৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রচিত) ও প্রদ্যুম্ন-চরিত্র (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত) প্রভৃতি গ্রন্থে কৃষ্ণের বিবরণ বিস্তৃত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। (এইরূপ জৈন পদ্মপুরাণাদি গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্রাদি হিন্দুপুরাণ প্রসিদ্ধ চরিত্রের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩৩১ সালের জৈনবাণী নামক অধুনালুপ্ত বাঙ্গালা জৈন পত্রিকায় মল্লিখিত 'জৈন-পদ্মপুরাণ' নামক বিস্তৃত প্রবন্ধে জৈন-পদ্মপুরাণের বাঙ্গালা সার দ্রষ্টব্য।)

এই সকল গ্রন্থ খুব প্রাচীন না হইলেও ইহাদের মূলীভূত বর্ণনীয় বিষয়গুলি জৈন-সমাজে জনশ্রুতির (ট্র্যাডিশন্) আকারে এবং প্রাকৃত প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। বস্তুতঃ, হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনে হিন্দুপুরাণাদিতে যেরূপ কৃষ্ণচরিত্র উপ-বর্ণিত হইয়াছে—জৈনদিগের মধ্যেও ঠিক সেইরূপে কৃষ্ণচরিত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। জৈনসমাজে কৃষ্ণচরিত্র কতদিন হইতে আলোচিত হইতেছে জিনসেনাচার্য্য স্বরচিত হরিবংশপুরাণের প্রারম্ভে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'এই কৃষ্ণচরিত্রের মূল প্রকাশকর্ত্তা ভগবান্ মহাবীর এবং তৎপরে (তাঁহার শিষ্য) গৌতমগণধর প্রভৃতি। এইরূপে বহু আচার্য্য উত্তরকালে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের গ্রন্থই আমি প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছি।' (জৈন হরিবংশ ১।৫২—৭)

জৈন হরিবংশে বর্ণিত কৃষ্ণ-চরিত্রের সংক্ষিপ্ত সার আমি জৈনবাণী পত্রিকায় (১৩৩১, কার্ত্তিক—মাঘ) প্রকাশ করিতেছিলাম। পত্রিকা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। তাহাতে রুক্মিণী-হরণ পর্য্যন্ত আখ্যানভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই অংশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। জৈন হরিবংশ মতে কৃষ্ণ জৈনদিগের দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমির খুড়তুতো ভাই। যদুবংশে অন্ধকবৃষ্টির জ্যেষ্ঠপুত্র সমুদ্র-বিজয়ের মহিষী শিবাদেবীর গর্ভে অরিষ্টনেমির জন্ম। সমুদ্র-বিজয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র বসুদেবের দেবকী নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। অরিষ্টনেমি ও কৃষ্ণের সমসাময়িকতা হইতে ডাক্তার বার্ণেট মহোদয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে বা তৎসমসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। (শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা লিখিত মধ্য ভারতের ক্ষত্রিয় জাতি, প্রথম খণ্ড, নামক ইংরেজী গ্রন্থের ডাঃ, এল, ডি, বার্নেট্ লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।)

কৃষ্ণের জন্মের পর কৃষ্ণের হাতে ও পায়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ, অঙ্কুশ, পদ্ম প্রভৃতির রেখা দেখিয়া সকলেই বুঝিল যে, বালক ভবিষ্যতে মহাভাগ্যবান্ হইবে। এই রেখা হস্তে থাকার বর্ণনা ও শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী—এইরূপ কল্পনা, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তাহা দ্বারকাপুরীর নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হইলে কুবের কৃষ্ণের নিকট আসিয়া তাঁহাকে নানাবিধ অলঙ্কার, কুমুদ্বতী গদা, নন্দক নামক খড়্গ, শার্ঙ্গধনুক, গরুড়-চিহ্নযুক্ত ধ্বজা, নানাবিধ শাস্ত্রপূর্ণ দিব্যরথ, চামর ছত্র প্রভৃতি উপহার প্রদান করিলেন (৪১।৩৫)। হিন্দুপুরাণের মতে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের বাহন গরুড় নামক পক্ষিরাজ। (জৈনদিগের গ্রন্থে [illegible]

এইরূপ পশুপক্ষী-চিহ্নিত ধ্বজাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। এক রাজবংশের পতাকা বানর-চিহ্নিত ছিল বলিয়া ঐ বংশের নাম হয় বানর-বংশ। 'ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিকাল কোয়াটারলি'-পত্রের প্রথমখণ্ডে মল্লিখিত 'বানর ও রাক্ষসজাতি' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

জৈন হরিবংশে ৪২ অধ্যায়ের ৫২ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় কৃষ্ণের সর্ব্বসমেত ষোল শত স্ত্রী ছিল। শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয়ও এই সংখ্যাই পাইয়াছেন। সুতরাং এই সংখ্যার কল্পনা খুব প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

দ্বারকপুরী পরিদর্শন প্রসঙ্গে নারদের এক বিস্তৃত বিবরণ রুক্মিণী-হরণ-বৃত্তান্তের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই বর্ণনার মধ্যে তাঁহার বীণার কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

নৃসিংহমুরারী মিত্র ঠাকুর

শ্রীগৌরীহর মিত্র

নৃসিংহমুরারী (বা বল্লভ) মিত্র ঠাকুর মহাশয় মনোহরসাহী কীর্ত্তনের বিশিষ্ট গায়ক-পরিবার ময়নাডালের মিত্র ঠাকুর-বংশের আদি পুরুষ। ইঁহার আদি নিবাস রাজুড় গ্রামে। এই গ্রাম পূর্ব্বে বীরভূম জেলার অন্তর্গত মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্ত্তমানে ইহা বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত হইয়াছে। এই গ্রাম আমোদপুর-কাটোয়া-রেললাইনের রামজীবনপুর ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে নৃসিংহমুরারী তাঁহার আদি বাসভূমি রাজুড় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বীরভূমের ময়নাডাল নামক গ্রামে আসিয়া শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক স্থায়ী বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। অণ্ডাল-সাঁইথিয়া-লাইনের পাঁচড়া ষ্টেশনের দুই মাইল পশ্চিমে ময়নাডাল গ্রাম অবস্থিত। নৃসিংহমুরারীর জন্ম এবং স্বগ্রাম পরিত্যাগের যে গল্প শুনিতে পাওয়া যায় তাহা এই—

নৃসিংহমুরারীর মাতার মৃতবৎসা দোষ ছিল, তাঁহার [illegible] এবং পিতামহ দুর্গাচরণ এ দোষ নিবারণের [illegible] 'মানত' করিয়া এবং কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসাদি করাইয়াও কোন ফললাভ করিতে পারেন নাই।

রাজুড় হইতে কাটোয়া বেশী দূর নয়। চতুষ্পার্শ্বের লোক কোন না কোন উৎসব-উপলক্ষে প্রায়ই কাটোয়া যাতায়াত করিত। নৃসিংহমুরারীর মাতাও কাটোয়া যাইতেন। একদিন তিনি কাটোয়ায় গিয়া আপন দুঃখের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় রাজুড় গ্রামের নিকটবর্ত্তী কান্দড়া গ্রামের এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণী আপন দুঃখের সকল কথাই ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিলেন। ব্রাহ্মণ রমণীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিলেন—'যাও, বাড়ী যাও, এবার থেকে তোমার পুত্র বেঁচে থাক্‌বে—মরবে না। এবার প্রথমেই তোমার যে পুত্র হবে তার নাম নৃসিংহমুরারী মিত্র ঠাকুর রাখবে এবং তাকে আমার শিষ্য করবে।' এই বলিয়া ঠাকুর তাঁহার মুখস্থিত চর্ব্বিত তাম্বুলের কতক অংশ রমণীকে খাইতে দিলেন এবং সকল কথা গোপন রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

রমণী অন্তঃসত্ত্বা হইলেন এবং যথাসময়ে এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। বলা বাহুল্য এই পুত্রই নৃসিংহমুরারী। নৃসিংহমুরারী বাল্যকালে বোবার মত থাকিতেন। এগার বৎসর বয়সেও তাঁহার বাক্যস্ফূরণ হইল না দেখিয়া সকলে মনে করিল যে, বালক পাগল হইবে; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না। নির্দ্দিষ্ট দিনে সেই ব্রাহ্মণঠাকুর আসিয়া নৃসিংহমুরারীকে দীক্ষিত করিলেন। দীক্ষিত হইবার পর বালকের বাক্যস্ফূরণ হইল। নৃসিংহ ব্রাহ্মণঠাকুরের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত যাইতে চাহিলেন; কিন্তু ঠাকুর বলিলেন—"গৌরাঙ্গ প্রভুই সকলের প্রভু, আমি কারও প্রভু নাই; তুমি তারই শরণ লও।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

বালক নৃসিংহ প্রভুকে বনে বনে ডাকিতে লাগিলেন। প্রভু আবির্ভাব হইয়া বলিলেন—"তুমি বীরভূমের ময়নাডাল গ্রামে গিয়া, সেখানে আমার মূর্ত্তি স্থাপন কর। সেখানে একটী প্রকাণ্ড নিম্ববৃক্ষ দেখিতে পাইবে। স্থানীয় ভাস্কর দ্বারা তাহাতেই আমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইবে

প্রভুর প্রত্যাদেশ মত নৃসিংহমুরারী স্বগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক বীরভূমের এই ময়নাডালে আসিয়া প্রভুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ধন্য হইলেন। বর্ত্তমানে ইহা সেই গৌরাঙ্গসুন্দরের মূর্ত্তি।

নৃসিংহমুরারী মিত্র ঠাকুর মহাশয় জাতিতে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা এখন ময়নাডালেই বাস করিয়া প্রভুর সেবাকার্য্য এবং মনোহরসাহী কীর্ত্তনে ও মৃদঙ্গবাদনে অসাধারণরূপ কৃতিত্ব লাভ করেন। ময়না-ডালের মিত্র ঠাকুর-পরিবারের এই সঙ্কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গ-বাদনের দেশব্যাপী খ্যাতি কোথাও অজ্ঞাত নহে। পরবর্ত্তীকালে বীরভূমের তদানীন্তন অধিপতি নগরের মুসলমান রাজা, মহাপ্রভুর সেবার জন্য বহু নিষ্কর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন।

নৃসিংহমুরারী মিত্র ঠাকুর এবং তাঁহার পুত্র হরেকৃষ্ণ মিত্র ঠাকুর মহাশয় গীতবাদ্যাদিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নৃসিংহমুরারী মিত্র ঠাকুর মহাশয়-রচিত অনেকগুলি পদ আছে,—সেগুলি এ-যাবৎ আদৌ প্রকাশিত হয় নাই। এই স্থলে কয়েকটী পদ প্রকাশিত হইল—

শ্রীগৌরচন্দ্র

(১)

মধুর মধুর মধুর মঞ্জু, চারু বিমল কনক কঞ্জ,
ঝল মল বর, উছলে জ্যোতি, গৌরবদন ইন্দুয়া॥
বদন ছদন বিম্বু কাঁতি, নাশা তুঙ্গ সুভগ ভাঁতি,
হেরি মুরছে মদন কোটি, বদন অমৃত সিন্ধুয়া॥
অতি সুললিত বাহুগণ্ড, কি গুণে তুল করভ শুণ্ড,
মহাভুজ তুলি হরি হরি বলি, সতত নটন রঙ্গিয়া॥
সোঙরি সে মুখ নিকুঞ্জ বাস, ভকত নিকর গাওত রাস।
প্রেম সদন মাধব নন্দন, ধীর গদাধর সঙ্গিয়া॥
রাতুল নয়নে ব্রহত লোর, পূরল বিমল গণ্ড জোর,
ঢরকি ঢরকি সঘনে গিরত, ভকত কণ্ঠ কম্বুয়া॥
জনু মেরু পর পরম সার, সুরধনি বনি ঝরত ধার,
ত্রিবিধ লোক তারণ কারণ, গত ভূণতুর বিম্বুয়া॥
অজভবাদি ধ্যান করণ, দীন শরণ অরুণ চরণ,
উজোর নখর শোহত ভাল, বর বিধু বর পাঁতিয়া॥
প্রাণ পঁহু মোর গৌর সঙ্গ, নরসিংহ সুখ পরম রঙ্গ।
সতত মিলত্র সাধু সঙ্গ, ফিরি গোরা গুণে মাতিয়া॥

(২)

উজোর বিজুর শ্রীঅঙ্গ মাধুরী শ্রীমুখ পঙ্কজ রাজে।
রাঙা উৎপল নয়ন যুগল ভুরু কাম লাজে॥
মাই গো, কি না সে গৌরাঙ্গ রূপ।
কি এ পরতেক প্রেম সুধারস মনমথ মনভূপ॥
আজানু লম্বিত বাহু সুবলিত বসন ভূষণ তনু।
সুরবে সুন্দর রসে ঢর ঢর তসর মিলিত জনু॥
তরুণ অরুণ চরণ সুন্দর নখমণিগণ শোভা।
তাহা উপজিল ধনি মন্দাকিনী নরসিংহ মনলোভা॥

(৩)

কোটি ইন্দু বিনিন্দিত সুন্দর শ্রীমুখ শোভা।
কোটি অনঙ্গ অঙ্গে নিরঞ্জন সৌদামিনী নিজ আভা॥
সুন্দর গৌর কিশোর।
অবনি মনে পেখলু দ্বিজমণি সুরধনী তীর॥ ধ্রু॥
সুভগ সুনাগর, সুশাবক করজিনি সুবলিত বাহুরসাল।
উর অতি পীণ, ভুবন মোহন বিলম্বিত করবীর মাল॥
তরুণ অরুণ কিরণ জিনি শ্রীচরণ,
হেরি নখমণি কান্তি বিকাশ।
অজভব মুনিগণ ধ্যানধরত তহি —সেন নরসিংহ দাস॥

(৪)

শ্রীগৌরাঙ্গের আরতি

আরতি কি জয় শ্রীগৌর-গোপাল কি।
কনক কমল, রুচিরানন, ছলক তিলক বরভাল কি॥
ঘণ্টা ঘনরব, ঝন্‌ঝন ঝাঝরী, মুরজ মৃদঙ্গ জয় তাল কি।
করবীকুন্দ, কুসুম তুলসীদল, শোভাবলি বনমাল কি॥
বামে ধরে, শ্রীমাধবনন্দন, সঙ্গিনী কুঞ্জ রসাল কি।
ভকত শুভঙ্কর, গায়ত চৌরব, বলি বলি দ্বিজবর লালা কি॥
রূপক ভূপ, অনুপ বর, নাচনি উছলত গৌর দয়াল কি।
গৌর অজ পঁহু, নরসিংহ কা গতি, কাতর [illegible] কি॥

অভিনন্দ কবির রামচরিত

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত রামচরিতকাব্য অনেকের নিকটই পরিচিত, কিন্তু এই অভিনন্দ কবি-রচিত রামচরিতের কথা বোধহয় খুব কম লোকেই জানেন। এই পুস্তকখানি সম্প্রতি গাইকোবার দরবার হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মহাকাব্যের আকারে লিখিত এবং চল্লিশ সর্গে সমাপ্ত। প্রথম ছত্রিশ সর্গ অভিনন্দের লিখিত। শেষ চারি সর্গ দুইজন বিভিন্ন কবির রচিত। ইহার মধ্যে একজনের নাম জানা যায় না। অন্যের নাম ভীম। তিনি নিজকে 'কায়স্থ-জাতিকুলতিলক মহৎশ্রীদেবপালের পুত্র মহৎ শ্রীভীম' নামে পরিচিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রচনার খুব গর্ব্বও করিয়াছেন, লিখিয়াছেন :—

"ন মধুরং মধু কস্ত চ ফাণিতং রসপরা ন সিতাহপি সুধা মুধা
অধর এব নবপ্রমদাধরো লসতি ভীমকবেঃ কবিতারসে॥"
[৩৮১ পৃষ্ঠা]

কবি যে তাঁহার জীবনকালেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের কথা দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন :—

"কবীনাং কিং দত্তৈর্নৃপপশুভিবর্ণ্যৈরবসরে পরং পৃথ্বীপালঃ
ক্ষণমপি স কর্ণো বিতরতু।
অনাস্তং তত্ত্বজ্ঞৈরপি সুবিপুলার্থব্যয়ভিয়া প্রতিষ্ঠাং যেনোচ্চৈঃ
জগতি নমিতং রামচরিতম্॥ ২০ পৃষ্ঠা
তথা তূর্ণং কবেঃ কস্ত নির্গতং জীবতো যশঃ।
হারবর্ষপ্রসাদেন শতানন্দের্যথাহধুনা॥ ৩৭ পৃষ্ঠা

অভিনন্দ যে একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন তাহা তাহার পরবর্ত্তী কবিগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কবি সোড্ঢল্ তাঁহার উদয়সুন্দরীকথা নামক চম্পুকাব্যে অভিনন্দকে কালিদাস, বাণ এবং বাকপতিরাজের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, যথা :—

"বাগীশ্বরং হন্ত ভজেহভিনন্দমর্থেশ্বরং বাকপতিরাজমীড়ে।
রসেশ্বরং স্তৌমি তু কালিদাসং বাণস্তু সর্ব্বেশ্বরমানতোহস্মি॥

পরবর্ত্তী কবিগণ নিজ নিজ গ্রন্থে অভিনন্দের কবিতা [illegible] উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কবিত্বের সম্মান করিয়াছেন। একাদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত বিভিন্ন দেশীয় সদুক্তিসংগ্রহকাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ইত্যাদি নিম্নলিখিত গ্রন্থে রামচরিতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাঁহার কবিতা প্রশংসিত হইয়াছে :—

১। শ্রীধরদাসের সদুক্তি কর্ণামৃত—
(১২০৬ খৃঃ অঃ, বঙ্গদেশ)
২। জল্হনের সূক্তিমুক্তাবলী—
(১২৪৭ খৃঃ অঃ, দাক্ষিণাত্য)
৩। শারঙ্গধর পদ্ধতি—(চতুর্দশ শতাব্দী, শাকম্ভরী)
৪। সোড্ঢলের উদয়সুন্দরীকথা—
(একাদশ শতাব্দী, গুজরাট)
৫। উজ্জ্বলদত্তের উণাদিসূত্রবৃত্তি (ত্রয়োদশ শতাব্দী)
৬। বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দ-রচিত অমরকোষের টীকাসর্ব্বস্ব
—(দ্বাদশ শতাব্দী, বঙ্গদেশ)
৭। রায়মুকুটের অমরকোষের টীকা—
(পঞ্চদশ শতাব্দী, বঙ্গদেশ)
৮। ভোজদেব-কৃত শৃঙ্গারপ্রকাশ ও সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ
(একাদশ শতাব্দী, ধারা)

ইহা ভিন্ন বহু গ্রন্থে অভিনন্দ, অভিনন্দন, গৌড়-অভিনন্দ নামা কবিগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহারা রামচরিতকাব্যের কবি কি না তাহা সঠিক জানা যায় না বলিয়া তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা গেল না। সূক্তিমুক্তাবলী ও শারঙ্গধর-পদ্ধতিতে অমর, অচল, অভিনন্দ এবং কালিদাসের প্রশংসাসূচক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এই চারিজনই প্রকৃত কবি, কবি নামে পরিচিত আর সকল অনুকরণকারী কপি মাত্র, যথা :—

কবিরমরঃ কবিরচলঃ কবিরভিনন্দশ্চ কালিদাসশ্চ।
অন্যে কবয়ঃ কপয়ঃ চাপল্যমাত্রং পরং দধতি॥

অভিনন্দ নামে যে একাধিক কবি ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাদম্বরী-কথাসার ও যোগবাসিষ্ঠসার অভিনন্দ নামক এক ব্যক্তির রচিত। কাহারও কাহারও মতে এই অভিনন্দ ও রামচরিতের কবি অভিনন্দ বিভিন্ন ব্যক্তি। কাদম্বরী-কথাসারের রচয়িতা নিজকে জয়ন্তভট্টের পুত্র, কল্যাণভট্টের পৌত্র এবং শক্তিস্বামীর প্রপৌত্র বলিয়া পরিচয়

দিয়াছেন। শক্তিস্বামীর পিতামহ শক্তি পূর্ব্বে বাঙ্গলার গৌড়ের অধিবাসী ছিলেন। পরে কাশ্মীরের দার্ভাভিসার গ্রামে বিবাহ করিয়া সেইস্থানে বাসস্থাপন করেন। এই অভিনন্দের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে জয়ন্তভট্ট ও শক্তিস্বামী ইতিহাসে পরিচিত। জয়ন্তভট্ট ন্যায়মঞ্জরী রচনা করেন এবং শক্তিস্বামী কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের মন্ত্রী ছিলেন। রামচরিতের অভিনন্দের বংশ অথবা বাসস্থান সম্বন্ধে কোন বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি একস্থলে মাত্র আপনাকে শাতানন্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৩৯ পৃষ্ঠা)। শাতানন্দ অর্থাৎ তিনি শতানন্দের পুত্র। এই শতানন্দ কে? ডাক্তার এফ, ডবলিউ টমাস বলেন অলঙ্কার-সাহিত্যে সুপরিচিত রুদ্রট একস্থলে বামুকভট্টের পুত্র শতানন্দ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মনে করেন এই শতানন্দেই রামচরিতের অভিনন্দের পিতা। রুদ্রট নামদ্বারা তাহাকে অনেকে কাশ্মীরবাসী বলিয়া মনে করেন। শতানন্দ নামে একজন কবিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি সম্ভবতঃ বঙ্গদেশবাসী ছিলেন, কারণ বঙ্গদেশে সংকলিত সদুক্তিকর্ণামৃত ও কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় এই উভয় গ্রন্থেই শতানন্দ নামা কবির কবিতা বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত হইয়াছে। রুদ্রট-শতানন্দ এবং এই শতানন্দ এক ব্যক্তি না হওয়ারও খুব সম্ভব। রামচরিতের অভিনন্দ এই শেষোক্ত শতাশন্দের পুত্র হওয়া সম্ভব, কারণ উক্ত সদুক্তিসংগ্রহদ্বয়ে অভিনন্দ ও শতানন্দের কবিতা পর পর উদ্ধৃত হইয়াছে।

আমাদের অভিনন্দ আপনাকে আর্য্যাবিলাস ও বিলাস নামেও পরিচিত করিয়াছেন। রামচরিত-কাব্যের সম্পাদক রামস্বামী শাস্ত্রী মনে করেন যে, অভিনন্দ আর্য্যা বা দেবীভক্ত ছিলেন, সেইজন্য আর্য্যাবিলাস নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তিনি বলেন রামচরিতের ষোড়শ সর্গে হনুমানের যুগে বহুশ্লোকযুক্ত দেবীর স্তোত্র পাঠ করাইয়াছেন; তাহা দ্বারা তিনি যে দেবীভক্ত ছিলেন তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই বিস্তৃত প্রশংসার কোথায়ও দেবীর আর্য্যা নামের উল্লেখ পাওয়া গেল না। আমাদের মনে হয় কবি আর্য্যা ছন্দপ্রিয় ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার আর্য্যাবিলাস নাম হইয়া থাকিবে।

কবি যে রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার রামচরিতকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহার নাম লিখিয়াছেন হারবর্ষ ও যুবরাজদেব। ইহা ভিন্ন নানা শ্লোকে তাঁহাকে পালান্বয়াম্বুজবনৈকবিরোচন, পালকুলপ্রদীপ, পৃথ্বীপাল, ভীমপরাক্রম, বিক্রমশীলজন্মা, বিক্রমশীলনন্দন, পালতিলক, রামপরাক্রমের সুত ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। এই হারবর্ষযুবরাজদেব কে? সম্পাদক রামস্বামী মনে করেন, এই রাজা পালরাজবংশীয় মহারাজ ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল। পালরাজবংশের তাম্রশাসনসমূহে ধর্ম্মপালের পুত্র যুবরাজ ত্রিভুবন পাল ও মহারাজ দেবপাল এবং দেবপালের পুত্র যুবরাজ রাজ্যপাল। ধর্ম্মপালের বংশীয় আর কোন নাম জানা যায় না। ইহার পরে ধর্ম্মপালের ভ্রাতার বংশ আরম্ভ। ত্রিভুবনপাল ও রাজ্যপাল যুবরাজ ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যে কোন সময়ে রাজা হইয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই যুবরাজদেব হারবর্ষ যে রাজা ছিলেন তাহা বেশ বুঝা যায়। কবি হারবর্ষের দানশীলতার প্রশংসা করিয়াছেন। মুঙ্গের-তাম্রশাসনে দেবপালেরও দানশীলতার কথা লিপিবদ্ধ আছে। দেবপাল নবম শতাব্দীর লোক। কবি সোড্ঢল পূর্ব্বকবিদিগের প্রশস্তিতে অভিনন্দের নাম রাজশেখরের পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছেন। রাজশেখর ১০ম শতাব্দীর লোক। এই কারণে রামস্বামী অভিনন্দকে নবম শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করেন। ধর্ম্মপাল বিক্রমশীল বিহারের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। এই কারণে দেবপালকে বিক্রমশীলনন্দন বা বিক্রমশীলজন্মা বলা যাইতে পারে। দেবপাল তুঙ্গরাজবংশের দৌহিত্র। তুঙ্গরাজগণের অনেকের নাম বর্ষান্ত। এই কারণে দেবপালের নাম হারবর্ষ হইতে পারে।

উপরে যে সব কারণ প্রদর্শিত হইল তাহা দ্বারা হারবর্ষকে দেবপাল মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু আরও কতকগুলি কারণ আছে যাহাতে তাহাকে দেবপাল, এমন কি বঙ্গের পালরাজবংশীয় কি না সে বিষয়েও সন্দেহ জন্মে। দেবপাল হৈহয়রাজবংশে বিবাহ করেন। এই হৈহয়রাজবংশে যুবরাজ কেয়ূরবর্ষের নাম পাওয়া যায়। হারবর্ষকে পালান্বয় কিম্বা পালকুলপ্রদীপ বলিলেও তাঁহার পালান্ত কোন নাম উল্লিখিত হয় নাই। পৃথ্বীপাল তাঁহার বিশেষণ বলিয়াই মনে হয়। যে কয়খানি হস্তলিপি দেখিয়া

এই পুস্তক সম্পাদিত হইয়াছে তন্মধ্যে বরদার ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুঁথি অন্যতম। ইহার প্রথম সর্গের পুষ্পিকার শেষে বস্তুপালের প্রশংসাসূচক একটী শ্লোক দেখা যায়। এই বস্তুপালকে তৎসম্বন্ধে সম্পাদক কিছুই বলেন নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গুজরাটে ভীমদেব ও লবণপ্রসাদ নামে দুইজন রাজা ছিলেন। বস্তুপাল নামে তাঁহাদের একজন মন্ত্রী ছিলেন। এই বস্তুপাল কীর্ত্তিকৌমুদী ও সুরথোৎসব-রচয়িতা কবি হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু এই বস্তুপালের নাম রামচরিতে আসিল কি প্রকারে? পালরাজগণের কোন লিপিতে ইহাদিগকে পালান্বয় কিংবা পালকুল বলা হয় নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর কামরূপ-বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতেই ইহাদিগকে প্রথম পালকুল বলিয়া উল্লিখিত করা হইয়াছে। ধর্ম্মপালের বিক্রমশীল, রামপরাক্রম ইত্যাদি নামের বা বিশেষণের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। বাঙ্গলার পালরাজবংশেই যে কেবল ধর্ম্মপাল নামে রাজা ছিলেন তাহা নহে। কামরূপেও ধর্ম্মপাল নামক এক রাজার তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই ধর্ম্মপালকে কবি 'পালান্বয়াম্বুজরবি ও কবিচক্রবাল-চূড়ামণি' বলা হইয়াছে, ছিলেন।

"পালান্বয়াম্বুজরবিঃ কবিচক্রবালচূড়ামণিঃ
কলিতসর্ব্বকলাকলাপঃ।
শ্রীধর্ম্মপালনৃপতি র্গুণরবসিন্ধুরেতাং
প্রশস্তিমকরোবদাতকীর্ত্তিঃ॥"

—রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, দশম ভাগ, ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা।

এই ধর্ম্মপাল দশম শতাব্দীর শেষভাগ কিংবা একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান থাকা সম্ভব। হারবর্ষ এই ধর্ম্মপালের বংশধর হওয়া অসম্ভব কি? কবির বংশধর কবির উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক হওয়া খুবই সম্ভব।

অভিনন্দকে যে কারণে সম্পাদক নবম শতাব্দীর লোক বলিতে চাহেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সোড্ঢল যে সময় ধরিয়া পর পর কবিদিগের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কি? রাজশেখর ও অভিনন্দ প্রায় সমসাময়িকও হইতে পারেন অর্থাৎ উভয়েই দশম শতাব্দীর লোক হইতে দোষ কি? অভিনন্দ বলিয়াছেন, তিনি জীবিতকালেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যদি নবম শতাব্দীর লোক হ'ন তবে নবম বা দশম শতাব্দীর কোন পুস্তকে রামচরিতের উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন? তাঁহার কাব্যের উল্লেখ একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর পুস্তকেই পাওয়া যায়। এই কারণে আমাদের মতে অভিনন্দ দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে কিংবা একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হারবর্ষও সম্ভবতঃ কামরূপের ধর্ম্মপালের বংশসম্ভূত এবং ঐ কালের লোক।

রামস্বামী মনে করেন যে, অভিনন্দ বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালী কবি কামরূপ-রাজ্যের সভাকবি হওয়ার পক্ষে কোনও বাধা নাই, কিন্তু যে কারণে তিনি অভিনন্দকে বাঙ্গালী মনে করেন সেই কারণগুলি কামরূপবাসীর পক্ষেও প্রযুজ্য, সুতরাং আমাদের অনুমানে যদি কোন সত্য থাকে, তবে তাঁহার কামরূপবাসী হওয়াই বেশী সম্ভব। অভিনন্দ সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন না, কারণ দেখা যায়, তিনি হারবর্ষকে নমস্কার করিতেছেন, যথা:—

"পালান্বয়াম্বুজবনৈকবন বিরোচনায় তস্মৈ
নমোঽস্তু যুবরাজনরেশ্বরায়।"
(৩য়, ৮ম, ১৪ম ও ৩৬শ সর্গ)

"নমঃ শ্রীহারবর্ষায় যেন হালাদনন্তরম্।"
(৫ম ও ৮ম, ১০ম ও ১২শ সর্গ)

সেকালে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণেতর রাজাদিগকে নমস্কার করিতেন কি না জানি না।

———:•••:———
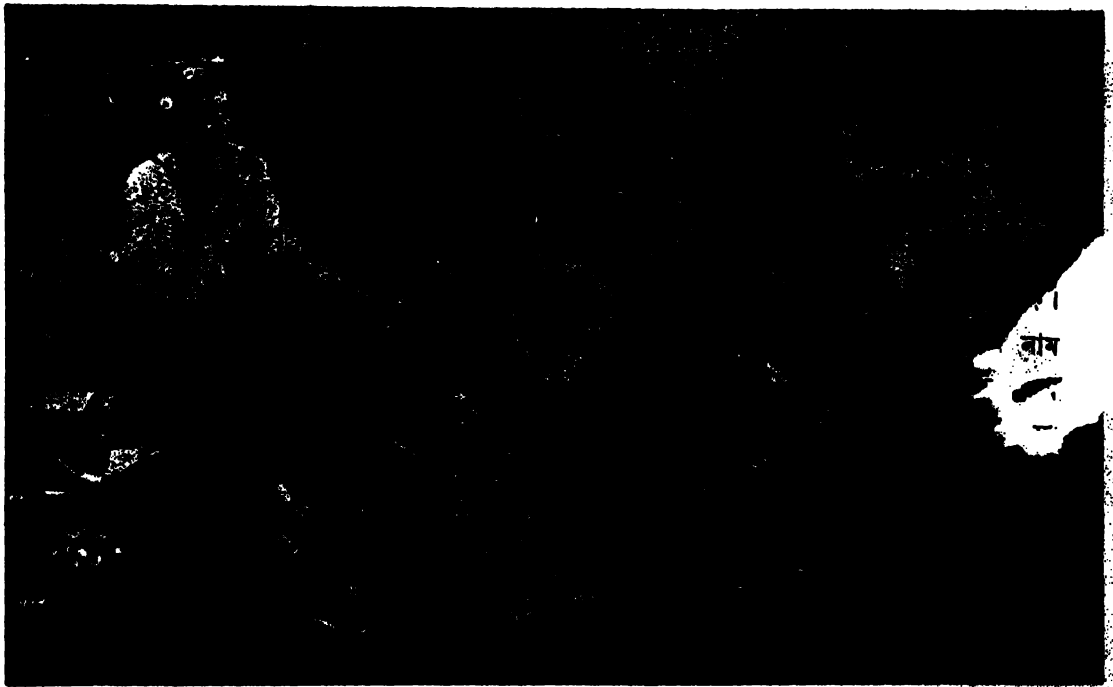
হেমন্ত-শ্রী
(বিলাতী ছবি হইতে)

দরদী
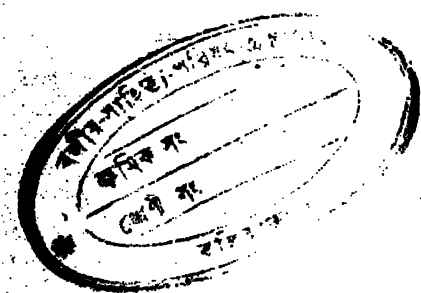
শ্রীন'রেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এক

মোহিনীমোহনকে দেখিয়াই চন্দ্রকান্তবাবু বলিয়া উঠিলেন—আজ যে একলা—খোকা কোথা ?…

মৃদু হাসিয়া মোহিনী বলিল—আজ তার মা'র কাছ-ছাড়া হ'ল না—

চন্দ্রকান্তবাবু পরের কথাগুলা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—বা ! তাও কি হয় ? এই ষাট বছর বয়সে এক মাইল পথ হেঁটে আমি এখানে আসি—তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে, আর সে আসবে না ?…যাও নিয়ে এস তাকে, নিজের মনে যে যখন আমার সঙ্গে আত্মকথা বলে তখন আমি যেন আত্মহারা হয়ে যাই !…

আনন্দোদ্বেলিতকণ্ঠে মোহিনী বলিল—আসুন না গরীবের কুঁড়েয় ··

হাসিয়া চন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন—ঘরের ভেতরের চেয়ে এ ফাঁকা যায়গাটা আমার বেশ ভাল লাগে। আমার ভাইকে বলুন গিয়ে—আমি এসেছি, শুনে সে থাকতে পারবে না—আসবেই।…

ইহার পর মোহিনীমোহন আর কোনও কথা না বলিয়া বাড়ীর উদ্দেশ্যে পা বাড়াইয়া দিল।

মাঠখানার প্রান্তভাগেই টিনের একখানা বাড়ী। এই বাড়ীর একখানা ঘরভাড়া করিয়া সস্ত্রীক মোহিনী বাস করে।

মোহিনী চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্তবাবু একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আকাশের পানে তাকাইয়া রহিলেন।… সম্মুখের পথ দিয়া অবিরাম যে মানুষ গাড়ী-ঘোড়া চলিয়াছে, সেদিকে তাঁহার লক্ষ্যই নাই।.

খোকাকে লইয়া মোহিনীকে বাটীর বাহির হইতে দেখিয়া চন্দ্রবাবুর চিন্তার খেয়াল ছুটিয়া গেল।…উৎফুল আনন্দে সেইস্থান হইতেই ডাক দিলেন—ভাই ! ··

স্বর্গের হাসি মুখখানিতে উদ্ভাসিত করিয়া পিতার কোল হইতেই শিশু উত্তর দিল—দাদু !…

আয় দাদু আয় !…হাঁরে দাদু ! এক মাইল দূর হতে আমাকে এখানে টেনে এনে তুই ব'সে থাকবি মায়ের কোলে ?…পাজী কোথাকার ?—তোরা কি সবাই এমনি দাগাবাজ ?

চন্দ্রকান্তবাবুর এতগুলো কথার উত্তরে দুই বৎসরের শিশু কেবল তাঁহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডাকিল—দাদু !…

বৃদ্ধ তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—বেড়াতে যাবি ভাই !

কুন্দফুলের মত সাদা দাঁতগুলি বাহির করিয়া শিশু বলিল—দা-ব।

য়া মোহিনী-

মোহিনী বলিল—বাড়ীতে বলছিল, একবার যদি কুড়েয় য'ন।…

চন্দ্রকান্তবাবু বলিলেন—মাকে বলবেন …লো …র কাজ যাবোই, কিন্তু এখন তো পারছি না।… …ছ…জবাব বেড়াতে যেতে চায় !

এই বলিয়াই বৃদ্ধ শিশুকে জিজ্ঞাসা … …ন তো ? দিকে যাবি ভাই।…

…ন—নিশ্চয়ই

হাত বাড়াইয়া শিশু বলিল—এদিকে।

চন্দ্রকান্তবাবু মোহিনীকে বলিলেন একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি একে।…

দুই

ঘড়ির কাঁটা যখন নয়টার ঘরে গিয়া পৌছিল তখনও চন্দ্রকান্তবাবুকে আসিতে না দেখিয়া মোহিনীমোহন পুত্রের জন্ত একটু চঞ্চল হইয়া পড়িল, অথচ আর অপেক্ষা করিবারও সময় নাই, অফিস যাইতে হইবে।…

আহারে বসিয়া স্ত্রীকে মোহিনীমোহন জিজ্ঞাসা করিল—

কি ব্যাপার বল দেখি, কখন খোকাকে নিয়ে গেলেন এখন পর্য্যন্তও—”

নিরুদ্বিগ্নভাবেই পত্নী নীরদা বলিল—দিয়ে যাবে’খন এখন ত প্রায় নিয়ে যান।…

সহাস্যমুখে মোহিনীমোহন বলিল, তাতো যান, কিন্তু ভাত যে মুখে দিতে পারছি না। সঙ্গে বসে খায়—মনটার বেশ আমোদ পাচ্ছি না।

নীরদা বলিল—তুমি অমনভাবে ছেড়ে দাও কেন! জানা নেই, শোনা নেই”—

বাধা দিয়া মোহিনী বলিল—তুমিও জাননা নীর! দু’জনের ওপর দু’জনের কি ভালবাসা—পঞ্চাশ হাত দূরে ওঁকে দেখতে পেলে—“দাদু” বলে তার কোলে ছুটে যাবার জন্যে খোকার কি ব্যাকুলতা, আর খোকাকে দেখবার জন্যে সেই ভদ্রলোকেরই বা কি আগ্রহ—এক মাইল দূর হতে রোজ—

নীরদা জিজ্ঞাসা করিল—তার বাড়ী কোথা?

মোহিনী বলিল—তাত জানি না, তিনি বলতে চান না… এইটাই হ’য়েছে যে বড় মুস্কিল।

উত্তরে সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহাকে আর বলিতে হইল না—বাহির হইতে ডাক আসিল—মোহিনীবাবু!……

মোহিনীর তখন আহার প্রায় শেষ হইয়াছিল। ব্যস্ত ভাবেই আচমণ করিয়া বাহিরে আসিতেই দেখিতে পাইল খোকাকে কোলে লইয়া চন্দ্রকান্তবাবু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।……

মোহিনীমোহন হাত বাড়াইয়া খোকাকে লইতে গেলে চন্দ্রকান্তবাবুর বুকে মাথাটা গুঁজিয়া নির্বিকারভাবে শুইয়া রহিল। হাসিয়া চন্দ্রবাবু বলিলেন—ও আর আপনার কাছে যাবে না মোহিনীবাবু।…

ঠিক তেমনি হাসিয়া মোহিনী বলিল—তাইত দেখছি… আয়রে আয় লক্ষ্মী বাবা, আয় অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।…

মোহিনীমোহন একরূপ জোর করিয়াই খোকাকে কোল হইতে টানিয়া লইয়া চন্দ্রবাবুকে বলিল—চলুননা একটু বসবেন।…

আজ আর নয় মোহিনীবাবু—বলিয়া চন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন ভাই বড্ড জড়িয়ে ফেলছে, দিনকতক আসা বন্ধ করতে হ’বে দেখছি!

মোহিনী উত্তর দিল—তা’হলেই হয়েছে! বাড়ীতে বলছিল —দুপুরবেলা ঘুমোয় না, কেবল ডাকে—দাদু আর দাদু!…

তা আমি জানি মোহিনীবাবু, তা না হ’লে আমিই বা ছুটে আসব কেন।…ডাক দেয় বলেই আমি এখন চললুম।…আপনারও অফিসের বেলা—

তিন

গোড়ার একটু কথা।…

স্ত্রীকে সাংসারিক কাজের একটু সুবিধা দিবার জন্য মোহিনীমোহন প্রায় প্রত্যহই তাহার দুই বৎসরের পুত্রটীকে লইয়া বাটীর সম্মুখের মাঠে আসিয়া বসিত। সম্মুখের রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া, বহু মানুষের পথ-চলা দেখিতে দেখিতে খোকা যেন সব ভুলিয়া গিয়া তন্ময় হইয়া যাইত।…পাড়ার আরও পাঁচ সাত জন তাহাদের ছোট ছোট ছেলেগুলি লইয়া সেইখানে আসিয়া সমবেত হ’ত; খোকা সেই সব ছেলেদের সহিত খেলা করিতে করিতে উৎসাহের আনন্দে মাতিয়া উঠিত।…

সেদিনও মোহিনীমোহন খোকাকে লইয়া—মাঠে বসিয়াছিল।…

খোকা ইতস্ততঃ খেলা করিতে করিতে ফুটপাতের উপর চন্দ্রবাবুকে তাহার দিকে অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার নিকট ছুটিয়া গিয়া ডাকিল—“দাদু!”

তাহার এই ডাক শুনিয়া বৃদ্ধের সমস্ত শরীর যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল। এতখানি আগ্রহের সঙ্গে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলেন যেন এই ডাকটা শুনিবার জন্যই তাহার স্থবির মনের প্রত্যেক স্থানই লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল।…

এই একান্ত অজানিত শিশুটীকে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া অজস্র স্নেহ-চুম্বনে তাহার মুখখানাকে ভরাইয়া বৃদ্ধ যেন অনেকটা সুস্থির হইয়া উঠিলেন।…

মোহিনীমোহন পুত্রের এই কাণ্ড দেখিয়া তাড়াতাড়ি চন্দ্রবাবুর নিকট ছুটিয়া আসিতেই তিনি বলিলেন—থাক, থাক… ও আমার সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে…

তাহার মুখে পরিপূর্ণ তৃপ্তির উজ্জ্বল হাসি।

মোহিনীমোহন উত্তর দিবার মত কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল—ওর ঐ রকমই স্বভাব—আপন-পর বোঝে না, যাকে সামনে পাবে তার কাছেই ছুটে যাবে।··

সহাস্যে চন্দ্রবাবু বলিলেন—ভবিষ্যতে আপনার এ ছেলে মানুষ হ'বে।··

তারপর তিনিও মোহিনীবাবুর সহিত মাঠের উপর আসিয়া বসিলেন।···খোকা তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া আধ আধ ভাষায় কত কথাই বলিতে লাগিল, চন্দ্রবাবুও আপন-ভোলা হইয়া তা'তে যোগ দিলেন।···

সম্মুখের রাস্তায় ফেরিওয়ালা ডাকিল—চাই আঙুর।···

চন্দ্রবাবু তাহার নিকট হইতে আধসের আঙুর কিনিয়া একটা খোকার মুখে দিতেই মোহিনীমোহন ব্যস্ত হইয়া বলিল—কি করছেন আপনি!··

চন্দ্রবাবুর এ কথার উত্তর দিবার সময় হইল না, খোকা তাঁহার হাত হইতে একটা আঙুর লইয়া বৃদ্ধের মুখে দিতে দিতে বলিল—"কা।"

চন্দ্রবাবু "না" বলিলেন না,—খোকার অনুরোধ রক্ষা করিয়া মোহিনীমোহনকে বলিলেন—দেখলেন মোহিনীবাবু, সম্পর্ক কেমনভাবে নিবিড় করতে হয় তা আপনার খোকা বেশই জানে।···

সেইদিন হইতেই চন্দ্রবাবু প্রায় প্রত্যহই খোকার কাছে আসিতেন।···তাহাকে দেখিয়া খোকাও যেন সব ভুলিয়া যাইত।···

ঘনিষ্ঠতা এতখানি স্থাপিত হইলেও চন্দ্রবাবু কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন পরিচয়ই মোহিনীকে দেন নাই।···

জানিবার জন্য মোহিনী দুই একদিন চেষ্টা করিয়াও যখন জানিতে পারিল না, তখন আর তাঁহাকে সে বিষয়ের জন্য কোনরূপ অনুরোধ করিত না।

চার

সর্ব্বপ্রকারে একান্ত অপরিচিত অনাত্মীয় এই ছেলেটাকে লইয়া চন্দ্রবাবু এমন মাতিয়া উঠিলেন, যেন তাহারা পরস্পর কত জন্ম-জন্মান্তর হইতে আপনার হইতে আপনার। কাহার অভিশাপে এই জন্মটাই কেবল একটু দূরে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই বুঝি খোকাকে নিকটে রাখিবার জন্য তাঁহার ব্যাকুল মনের এতখানি আগ্রহ।

আবার নিকটে রাখিলেও অন্তরের কোনও একস্থানে যেন কণ্টক বিদ্ধ হয়,···যাতনায় চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়ে, কিন্তু সেই যাতনা চাপা দিবার জন্য খোকাকে বুকের মধ্যেই নিবিড় ভাবে চাপিয়া ধরেন।···

কিন্তু একদিন যখন তাহার অন্তরের মণিকোঠার হইতে কে বলিয়া দিল, খোকা তো তার নিজের পৌত্র নয়, তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল···সত্যই তিনি একি করিতেছেন?···

তাই সেদিন খোকাকে রাখিতে আসিয়া মোহিনীমোহনকে বলিয়া গেলেন—মায়ার ফাঁস এমন করে গলায় পরব না মোহিনীবাবু!···গঙ্গার দিকে পা করে ব'সে আছি, কেন আর এ মিছে মায়াই···কি বল দাদু!···

দাদু—ওরফে খোকা—শুধু হাসিয়াই জবাব দিল—কোনও কথা বলিল না।···

করুণ-দৃষ্টিতে চন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া মোহিনীমোহন বলিল,—হঠাৎ আপনার এ ভাব হ'ল কেন?···

হাস্য-তরলকণ্ঠে চন্দ্রবাবু উত্তরে বলিলেন—দিনগুলো যখন ফুরিয়েই আসছে মোহিনীবাবু, তখন নিজের কাজ একটু করি···পরকাল ব'লেও একটা কিছু আছে···জবাব দেব কি? বুঝলেন না।··

স্মিতহাস্যে মোহিনীমোহন বলিল—পারবেন তো?

উৎসাহের আতিশয্যে চন্দ্রবাবু বলিলেন—নিশ্চয়ই! ওপার হ'তে ডাক আসছে···এখনও কি এপারের মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে থাকা উচিত—পারবোই হ'বে! দেখবেন, তখন বলবেন—হাঁ চন্দ্রবাবুর কথা বটে!

সহাস্যে নমস্কার করিয়া চন্দ্রবাবু চলিয়া গেলেন।··· দিন পাঁচ সাত সত্যই তিনি আর দেখা দিলেন না,··· তারপর হঠাৎ একদিন মোহিনীমোহনের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া ডাক দিলেন—দাদু!

পাঁচ

নিজের সঙ্কল্প হইতে পুনঃ পুনঃ বিচ্যুত হওয়ায় চন্দ্রবাবু যেন অনেকটা অস্বস্তি. অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার

হাত হইতে তাঁহাকে মুক্ত হইতেই হইবে, তাহা না হইলে, হরিণ হইয়া ভরত মুনির মত কি তাহাকেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে !...

এবার তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, ওপথেই আর তিনি চলিবেন না,.. কে খোকা ?—কেন ?...

সেইদিনই তিনি ধর্ম্মচর্চ্চায় মনোযোগ দিলেন।

বাড়ীর পাশেই ছিল শিরোমণি মহাশয়ের টোল,... সকাল-সন্ধ্যায় সেইখানেই গিয়া তিনি তত্ত্ব-কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন—দ্বৈত-মতের বিশিষ্টাদ্বৈত্য, মায়াবাদ প্রভৃতির কোনও বিষয়ই বাদ থাকিত না,...কিন্তু বাটীতে ফিরিয়াই তাহার সব গোলমাল হইয়া যাইত।...

নিঃসঙ্গ-জীবন,.. স্ত্রী-পুত্র কেহই নাই।...স্ত্রী গত হইয়াছেন। ভৃত্য ও পাচক তাহার বাড়ীখানার মধ্যে একমাত্র অবলম্বন। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় যতটা সময় কাটে...

অলস দ্বিপ্রহরে শ্রীমদ্ভাগবতের পাতায় চক্ষু দুইটা মেলিয়া তিনি আনমনা ভাবে কি ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ শুনিতে পাইলেন দ্বারপ্রান্ত হইতে খোকা ডাকিতেছে—দাদু !...

সেই অবস্থায় তিনি বলিয়া উঠিলেন—এসেছিস, আয় ভাই আয় !...

ভৃত্য বলিল—কাকে ডাকছেন, কে ?...

অপ্রতিভের স্থায় চন্দ্রবাবু বলিলেন—কেউ নয় ? আমাকে কে যেন ডাকছিল শুনলুম।

সেইদিনই তিনি মোহিনীমোহনের দ্বারদেশে আসিয়া ডাকিলেন—দাদু !...

মোহিনী তখন অফিসে।

অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া মোহিনীমোহনের স্ত্রী খোকাকে কোলে লইয়া সদরের দর খুলিয়া দিতেই—চন্দ্রবাবু পরিপূর্ণ আনন্দে ডাকিলেন—দাদু !

খোকা ছুটিয়া তাহার কোলে আসিল।...

দুইজনের মধ্যে কত কথা, কত হাসি, কত খেলা চলিল।...

খোকা বলিল—ঘোড়া চলব।' চন্দ্রবাবু তখনই ঘোড়া হইলেন, আর খোকা তাহার পিঠের উপর চাপিয়া বসিল। তাহাকে সওয়ার করিয়া চন্দ্রবাবু ঘরখানার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।...বুকপকেট হইতে ঘড়িটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

ঠিক সেই সময়েই মোহিনী অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া বৃদ্ধের এই অদ্ভুত ব্যবহার দেখিয়া প্রথমটা নির্ব্বাক হইয়া গেল, তাহার পর লজ্জিতভাবে বলিল—এ কি করছেন আপনি ?

সহাস্তমুখে চন্দ্রবাবু বলিলেন—মায়ার ফাঁস কাটাচ্ছি মোহিনীবাবু, একরাশ শাস্ত্র-গ্রন্থ কিনেছি কিনা !...

মোহিনীমোহন তাড়াতাড়ি খোকাকে তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল—ক'দিন যে ওর কি ভাবে কেটেছে তা আর আপনাকে কি বলব।...কেবলই—আপনাকে চায় রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ডাকে—দাদু !...

গম্ভীরভাবে চন্দ্রবাবু বলিলেন—ডাকবেই তো, ডাকাই তো স্বাভাবিক ! ও আপনার আমার মত ত আর নেমক-হারাম হ'তে শেখে নি !...কি বলিস রে ভাই এঁ্যা। বলিয়াই খোকাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন।

ছয়

অফিস হইতে ফিরিবার পথে মোহিনীমোহন দেখিল, একখানা দ্বিতল বাটীর বারাণ্ডার দিকে অপলকনেত্রে চাহিয়া চন্দ্রবাবু 'ন-য-যৌ-ন-তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন,...আর বারান্দার উপর হইতে কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে চীৎকার করিতেছে—দাদু—ও দাদু !...

ডাক শুনিয়া চন্দ্রবাবু সেদিকে অগ্রসরও হইতে পারিতেছেন না বা সেখান হইতে চলিয়াও আসিতে পারিতেছেন না—যেন আর কাহারও অধীর আহ্বানের জন্ত লালায়িত হইয়াই অতি আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন।...অথচ সে আহ্বান অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কানে আসিয়া না পৌঁছাতে তিনি ক্ষুধিত-দৃষ্টিতে ছেলেগুলিকে দেখিতে লাগিলেন।...

মোহিনীমোহন ডাকিল—চন্দ্রবাবু !...

চমকিত হইয়া চন্দ্রবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।...

মোহিনীমোহন জিজ্ঞাসা করিল—এখানে দাঁড়িয়ে ?

বিষাদহাস্তে চন্দ্রবাবু ছেলেগুলিকে দেখাইয়া বলিলেন—

শুনতে পাচ্ছেন না ডাক—দাদু দাদু !·· চলুন খোকাকে দেখে আসি।...

দুইজনেই পথ চলিতে লাগিলেন; কিন্তু চন্দ্রবাবুর পা-দুইটা যেন চলিতে চাহিতেছিল না···অন্তরের উৎসাহও যেন অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল।···

মোহিনীমোহন বলিলেন—জগতের সব ছেলেগুলির সঙ্গেই দেখছি আপনার ঐ সম্পর্ক।···

চন্দ্রবাবু বলিলেন—কিন্তু বাড়ীর মালিক কি রকম নেমক-হারাম, কি রকম দাগাবাজ দেখলেন তো? ছেলে-গুলো ডাকছে দাদু বলে;·· মালিক জানালার ভেতর দিয়ে একবার আমাকে দেখলে, অথচ ডাকলেও না একটী বার বা ছেলেগুলোকেও একবার কাছে আসতে দিলে না।···অথচ আমিও যেমন ঐ ডাক শোনবার জন্যে পাগল; ওরাও কাছে আসবার জন্যে তেমনই অধীর। একটু দাঁড়ান মোহিনীবাবু ছেলেগুলো এখনও ডাকছে—আর একবার তা'দিকে দেখে আসি।

মোহিনীমোহন সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন চন্দ্রবাবু ফিরিয়া গেলেন;···কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—না মোহিনীবাবু!···তারা ভেতরে চলে গেছে।··

দুইজনেই পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন।··

তারপর মোহিনীমোহনের বাড়ীতে আসিয়া ডাকিলেন—দাদু!··

খোকা দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহার বুকে উঠিতেই চন্দ্র-বাবুর দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল!... যেন কতকালের সঞ্চিত দুঃখ জল হইয়া তাহার চক্ষু দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

মোহিনীমোহন জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'বে এবার?···

—না কিছুনা আপনি কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে আসুন!—

চন্দ্রবাবু খোকাকে লইয়া মাঠের উপর বেড়াইতে লাগিলেন।

সাত

ইহার পর প্রায় একমাস গত হইয়াছে।···

এই সময়ের মধ্যে চন্দ্রকান্তবাবুর কোনও সংবাদই মোহিনীমোহন না পাইয়া বিস্মিতও যেমন হইয়া পড়িল, চিন্তিতও তাহা অপেক্ষা কিছু কম হইল না,...যে লোক খোকাকে দেখিতে প্রত্যহ অন্ততঃ একবার, কোনও কোনও দিন দুইবারও আসেন, আজ এতদিন তিনি নীরব থাকিলেন কি করিয়া?···শরীরের কোনরূপ———

তাহার চিন্তায় বাধা দিয়া খোকা ডাকিল—বাবা! —দাদু!······

আজ কয়দিনই সে দাদুর জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।··· কিন্তু তাঁহার ত কোন সন্ধানই নাই, ঠিকানাও জানে না যে খোকাকে লইয়া তাহার নিকট যাইবে।······

খোকা পুনরায় ডাকিল—দাদু!···

ভুলাইবার জন্য মোহিনীমোহন তাহাকে কোলে লইয়া বলিল—চল্ তোর দাদুর কাছে যাই!

মোহিনীমোহন বাটীর বাহির হইতেই একটী লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনার নাম মোহিনীবাবু?—

মোহিনী বলিল—হ্যাঁ, কি দরকার?···

লোকটী বলিল—সে চন্দ্রবাবুর ভৃত্য, আজ মাসাধিক তাহার জ্বর—বাঁচিবার আশা নাই। খোকাকে এবং মোহিনীবাবুকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

শুনিয়া মোহিনীমোহন আর স্থির থাকিতে পারিলনা—খোকাকে লইয়া—ভৃত্যের সহিতই চন্দ্রবাবুকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল।···

* * *

চন্দ্রবাবুর শরীর শয্যার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া আর চিনিবার উপায় ছিল না;·· মোহিনী-মোহনও হয়ত চিনিতে পারিত না কিন্তু তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া ক্ষীণকণ্ঠে চন্দ্রবাবু যখন ডাকিলেন—দাদু!·· মোহিনীমোহনের চক্ষের জল আর বাধা মানিল না।

মলিনহাস্যে চন্দ্রবাবু পুনরায় ডাকিলেন—দাদু! খোকা তাহার পাশে বসিয়া—অতি বড় দরদীর মত তাঁহার মাথায় হাত দিয়া ডাকিল—দাদু!···

চন্দ্রবাবু বলিলেন—আঃ ভাইরে—তোর এই সেবা-টুকুর অপেক্ষাতেই বোধহয় এখনও বেঁচে আছি! আর একটু অমনি করে মাথায় হাত দিয়ে থাক ভাই!

ক্ষীণ দুর্ব্বল হস্তে খোকাকে কাছে টানিয়া আনিয়া মোহিনীমোহনকে চন্দ্রবাবু বলিলেন—ওপর হ'তে কে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—থাকতে তো আর পারবনা মোহিনীবাবু!···যেতেই হ'বে! এই দলিল-খানা রেখে দিন!···গরীব আমি, সামান্য চাকরির উপায়·· এই বাড়ীখানা···আর দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ···আমার ভাইকে দিয়ে গেলুম। দেখবেন ওর যেন কোনও অযত্ন না হয়, ওকে মানুষ করবেন—মানুষ হবেও।···আর একটা কথা বলে যাই! সেদিন সেই যে বারান্দার ওপর ছেলেগুলিকে দেখছিলুম, তারাই আমার পৌত্র! ছেলে আমার ডেপুটী—তাই হয়ত গরীব বাপের খোঁজ নেবার সময় পায় না—বাড়ীতে ঢোকবার ভয়ে দ্বার মুক্ত করতে লজ্জিত হয়!—আমার এত বড় অসুখের খবর পেয়েও একবার দেখতে এল না, কতবার খবর পাঠিয়েছি··ওঃ মোহিনীবাবু! বুকটায় বড্ড ব্যথা লাগল যে—দাহ!···

চন্দ্রবাবু নির্জ্জীবের মত হইয়া পড়িলেন...মোহিনীমোহন তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিল—চন্দ্রবাবু!··

চন্দ্রবাবুর নিকট হইতে কোনও উত্তর আসিল না. ব্যস্তভাবেই মোহিনীমোহন ভৃত্যকে বলিল—ডাক্তার—শীগগীর যাও!—

চন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া ভৃত্য কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।··পা দুইখানা আর সেখান হইতে উঠিল না।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

এক

বিজয়কৃষ্ণের স্মৃতি-গাথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একবার তাঁহার জীবন-কথা আলোচনা করিব। বিজয়কৃষ্ণ অদ্বৈত গোস্বামীর বংশধর। মহাপ্রভুর সময়ে শান্তি-পুরের গোঁসাই বলিলে অদ্বৈত গোস্বামীকে বুঝাইত। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিয়াছেন যে—

"অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার॥
সংকীর্ত্তন প্রচারিয়া জগৎ তারিল।
অদ্বৈত প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল॥
অদ্বৈত মহিমা অনন্ত—কে পারে কহিতে।
সেই লিখি—যেই শুনি মহাজন হৈতে॥
আচার্য্য চরণে—মোর কোটী নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার॥
তোমার মহিমা কোটী সমুদ্র অগাধ।
তাহার ইয়ত্তা কহি, এ বড় অপরাধ॥"

অদ্বৈত গোসাঞির আসল নাম কমলাক্ষ। ইনি মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অদ্বৈত গোস্বামী নাম ধারণ করেন। বাঙ্গালা দেশে ইনি প্রথম ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করেন। কেন না

"প্রভুর আবির্ভাব পূর্ব্বে সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈতাচার্য্য স্থানে করেন গমন॥
গীতা ভাগবত কহে আচার্য্য গোসাঞি।
জ্ঞান কর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি॥
সর্ব্বশাস্ত্রে করে কৃষ্ণ ভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ নাহি মানে আন॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ইনি কৃষ্ণ-পূজায়, কৃষ্ণ-কথায়, নাম-সংকীর্ত্তনে বৈষ্ণবের পথ

আনন্দে কাল কাটাইতেন। কিন্তু সকল লোককে বিষয়-নিমগ্ন ও কৃষ্ণ-বহির্মুখ দেখিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হইতেন। একান্তে বসিয়া তিনি ভাবিতেন, কেমন করিয়া এই সব লোকের উদ্ধার হয়? যদি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিধর্ম্মের বিস্তার করেন, তবে তো লোক তরিবে? জীবনদুঃখে ব্যথিত-হৃদয় অদ্বৈত গোসাঞি শ্রীকৃষ্ণকে নর-দেহ ধারণ করাইবার সংকল্প করিলেন। তুলসী গঙ্গাজলে কৃষ্ণপূজা করিয়া সঘন হুঙ্কারে কৃষ্ণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ভক্তের ব্যাকুল আহ্বানে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু আর থাকিতে পারিলেন না। রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য নামে শচীর উদরে আবির্ভূত হইলেন। তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতচন্দ্র এই তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে আত্মসাৎ করিয়াছেন। "এতিনের চরণ বন্দ; তিনে মোর নাথ।"

এই পবিত্র বংশে বাঙ্গালা ১২৫১ সালে বিজয়কৃষ্ণ ঝুলন-পূর্ণিমায় শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আটাশ বৎসর বয়সে যুবক বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বাবস্থায় তাঁহার স্বলিখিত আত্মজীবনা-লোচনায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, "পূর্ব্বে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে আমার বিশেষ আস্থা ছিল। ভক্তির অবস্থা স্মরণ করিতেও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। হিন্দুধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাসী ব্যক্তির যে যে লক্ষণ থাকা উচিত, তাহা সমস্তই আমাতে বর্ত্তমান ছিল। দেশের স্ত্রীপুরুষ সকলেই আমাকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতেন। কিন্তু অসত্য কুসংস্কার চিরদিন মনুষ্য-হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। যে হিন্দুশাস্ত্র হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারক, সেই হিন্দু-শাস্ত্রই আমার আন্তরিক কুসংস্কারের উন্মূলক হইল—হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঘোর বৈদান্তিক হইয়া পড়িলাম—তখন সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম—'অহং ব্রহ্ম' এই সত্য বিশ্বাস করিতাম, উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতাম না। এই সময়ে আমার এক শিষ্য আমার পদপূজা করিতে-ছিলেন—আমি মন্ত্র পড়াইতেছিলাম, হঠাৎ আমার মনে হইল যে, আমাতে এসকল ক্ষমতা নাই, আমি স্বয়ং কিরূপে পরিত্রাণ পাইব তাহার নিশ্চয়তা নাই, আমি পরিত্রাণ করিব কিরূপে? দূর হউক, এরূপ কপটাচরণ আর করিব না। ইহার পূর্ব্বে আর একটী ঘটনা হয়—আমাকে কে ডাকিয়া বলিল পরলোক-চিন্তা কর। কে বলিল, লোক দেখিলাম না। ভয়ে জ্বর হইল।"

ইহার কিছুদিন পরে বিজয়কৃষ্ণ বগুড়া জেলায় গমন করেন এবং তথায় তিনজন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট পরিচয় হয়। বিজয়কৃষ্ণ বলেন, "সেইখানেই প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের কথা শ্রবণ করিলাম। ইহার পূর্ব্বে এইমাত্র জানিতাম যে, কলিকাতায় একদল ব্রহ্মজ্ঞানী আছে, তাহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া সুরাপান, মাংস-ভোজন করে। এজন্য ব্রহ্মজ্ঞানীর নাম শ্রবণ করিলেই আমি বিরক্ত হইতাম। কিন্তু বগুড়াতে তিনজন ব্রাহ্মের বিশুদ্ধ জীবন আমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাদের সহিত বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলাম বটে, কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মই রহিলেন, আমি বৈদান্তিক রহিলাম। ভিন্নমত হইলে যে প্রণয় হয় না, ইহা সকলস্থানে সত্য নহে। যাহা হউক আমাকে ব্রাহ্ম করিবার জন্য তাঁহাদের সম্পূর্ণ যত্ন। তাঁহারা কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজে উপস্থিত হইতে আমাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন।"

বিজয়কৃষ্ণের উদ্ধৃত কতিপয় পংক্তিতে আমরা তৎ-কালীন সামাজিক ইতিহাস জানিতে পারি। বিজয়কৃষ্ণ যৌবনের প্রারম্ভেই গুরুগিরি ব্যবসা করিতেন। শিষ্য গুরুপদ পূজা করিতেন এবং গুরু স্বয়ং সে মন্ত্র বলিয়া দিতেন। নদীয়া, শান্তিপুরে তখন শাঙ্কর বেদান্তের আলোচনা ছিল এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রচার মুগ্ধ ব্রাহ্মরা বাঙ্গলাদেশে সুরাপায়ী, মাংসভোজী ও স্বেচ্ছাচারী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। হিন্দুর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে বিদ্রোহের অস্ফুট বাণী বেশ স্পষ্টই শ্রুতি-গোচর হইত। বৈষ্ণব গোসাঞি বিজয়কৃষ্ণ বাল্যকালে রীতিমত গোঁসাই ভাবেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং যৌবনের প্রারম্ভেই কুলাচরিত গুরুগিরি-ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সত্যপ্রিয় সত্যনিষ্ঠ বিজয়কৃষ্ণ এই মিথ্যা ব্যবসা চালাইতে পারেন নাই এবং এই মিথ্যা আচরণ তাঁহার বিবেককে আঘাত করিত। তাঁহার সরল অন্তঃকরণে স্বতঃই উদিত হইত যে, "আমি নিজে ঈশ্বর [illegible]

আমার অন্তকে ঈশ্বরের পথ দেখাইয়া দিবে কিরূপে ?—”
“অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধ”

বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় আসিয়া একজন বন্ধু সহ কোন ভদ্রলোকের বাসায় থাকিলেন। বিজয়কৃষ্ণ লিখিয়াছেন যে, “এই ভদ্রলোকটী সুরাপান-সভার সভাপতি। এখন যাঁহাদিগকে বড় ব্রাহ্ম বলিয়া দেখিতেছি, সেইসময়ে তাঁহাদিগকে উদরপূর্ণ করিয়া সুরা সেবন করিতে দেখিয়াছি। তাঁহারা আমাকে সুরাপায়ী করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেন, আমি প্রাচীন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার-পূর্ব্বক সুরার নিন্দা করিতাম। আমি অদ্বৈতবংশজাত গোস্বামী ; আমি সুরাপান করিলে অথবা অন্ত কোন পাপাচারণ করিলে আমার নির্ম্মল পিতৃকুল কলঙ্কিত হইবে, কেবল এই সংস্কারে অনেক সময় আমাকে কুসঙ্গ নরক হইতে রক্ষা করিয়াছে। সেই অবধি তাঁহারা আমাকে গোপন করিয়া সুরাপান করিতেন। সুরাপান-নিবারণ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের শাসন অতি চমৎকার! ইংরেজী ভাষা শিক্ষা এবং ইংরেজদিগের সহবাস, খৃষ্টান-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, বিলাতী সভ্যতার বাহিরের আকর্ষণ, এইসকল কারণে সুরাপান অধিক প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কারণগুলির একটীরও সাহায্য না পাওয়াতে ঘোর পাড়াগেঁয়ে অসভ্য হইয়া সুরাপায়ীদিগকে বিলক্ষণ-রূপে গালিবর্ষণ করিতাম। তখন আমি অসভ্য না থাকিলে নিশ্চয়ই প্রধান প্রধান লোকের স্থায় সুরাপায়ী হইতাম, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।” বিলাতী-সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সুরা ভারতবর্ষে বিশেষরূপে আমদানী হইয়াছে এবং বিজয়কৃষ্ণের বাল্য বা যৌবনকালে বিলাতী সভ্যতায় কেবল কলিকাতায় সুরাপান না করিলে শিক্ষিত বাঙালী সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইত না।

নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীবিহারীলাল সেন মহাশয় তাঁহার প্রণীত “জীবনে ব্রহ্মকৃপা স্বীকার” পুস্তকের [illegible] পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, “তখন (১৮৬৭ খৃঃ) ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য এবং ব্রাহ্মদের মধ্যে মদ্যপান সম্বন্ধে [illegible] অতি শিথিল ভাব ছিল ; এমন কি কোন ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য মদ্যপান করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলে মদের নেশাতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ীতে পৌছান হইল।”—কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রচারকদের দ্বারা এই দোষ পরে ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল।

বগুড়ায় ব্রাহ্ম বন্ধুগণ বিজয়কৃষ্ণকে ব্রাহ্মসমাজে যাইতে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। একদিন তাহারা বিজয়কৃষ্ণের স্মরণপথে উদিত হইল। তখন প্রতি বুধবার ব্রাহ্ম-সমাজের অধিবেশন হইত। বিজয়কৃষ্ণ বলেন, “ব্রাহ্মসমাজ দেখিবার পূর্ব্বে আমার সংস্কার ছিল যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেমন তবলা বাজাইয়া গান করে, বেদ পাঠ করে, অবশেষে সুরাপান ও মাংস ভোজন করে। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কতদূর অজ্ঞতা থাকিতে পারে, তাহা আমি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছি।—সায়ংকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্ম-সমাজে গমন করিলাম! সমাজের আলোকমালা, তালমানসংযুক্ত মধুর সঙ্গীত, ভক্তিভাবে স্তোত্রপাঠ, বহুসংখ্যক লোকের গম্ভীরভাব, এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আমি ব্রাহ্ম-সমাজকে স্বর্গধাম বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম। আমার পূর্ব্বের সংস্কার তিরোহিত হইল। পরে ভক্তিভাজন বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বর্গীয়ভাবে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। পাপীর দুর্দ্দশা—ঈশ্বরের বিশেষ করুণা এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমার পূর্ব্বকার ভক্তিভাব স্মৃতিপথে উদিত হইল, এতদিন যে ইষ্টদেবতার পূজা করি নাই তজ্জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, সমস্ত শরীর গদ্‌গদ্‌ঘর্ম্মে কম্পিত হইতে লাগিল, অশ্রুজলে হৃদয় ভাসিতে লাগিল, চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিয়া অন্তরে দয়াময়ের নিকট এই প্রার্থনা করিলাম যে ‘দয়াময় ঈশ্বর! প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে আমার বিশ্বাস হয় না, অন্য কোন ধর্ম্মেও আমার বিশ্বাস নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার স্থায় হতভাগ্য বোধহয় পৃথিবীতে আর কেহ নাই। যখন পৌত্তলিক-ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল, তখন ইষ্ট-দেবতার পূজা করিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিতাম, এখন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। এইমাত্র শুনিলাম তুমি অনাথের নাথ, প্রভো! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাকে রাখ, আর আমি কোথাও যাইব না, তোমার দ্বারে পড়িয়া রহিলাম।”

(ক্রমশঃ)

ফুল

(গল্প)

[মূল জার্ম্মান হইতে অনূদিত]

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র বাগচী

শীতের সন্ধ্যায় বরফে ঢাকা মাঠের উপর পায়চারী ক'রে বাড়ী ফিরেছি। চারিদিক্ নিস্তব্ধতার মৌন গাম্ভীর্য্যে ভ'রে গিয়েছে। আমার হৃদয়ের অস্ফুট বেদনা নিবিড় নিস্পন্দতায় মুখর হ'য়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে অন্ধকার তার কাল সাড়ী প'রে নেমে এল। আমার পড়ার ঘরে ল্যাম্প জ্বেলে, একটা চুরুট মুখে দিয়ে এই মাত্র বসেছি। টেবিলের উপর খানকতক বই এলোমেলো হ'য়ে প'ড়ে আছে। এই রাত্রির মৌন আহ্বান আমাকে কোন এক অতীন্দ্রিয় জগতে এনে আমার সকল ব্যথা ক্ষণেকের তরে স্নিগ্ধ প্রলেপে ঢেকে দিয়েছে—বেশ একটু স্বচ্ছন্দতা বোধ হচ্চে।...আবার সেই চির-অস্থির চিন্তার ঢেউ হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে কাঁপিয়ে তুলল...সেই একই কথা বার বার কাণে আস্‌ছে—'তোমার জগতের সব আলো যে নিবে গিয়েছে।'

কতদিন হ'ল সে চ'লে গিয়েছে। কতবার প্রতারিত ছোটছেলের মত ভেবেছি, সে মরলেই ভাল হ'ত, এ যে মরার চেয়ে নিকৃষ্ট ! না-মরার চেয়ে নিকৃষ্ট নয়, সে তো সত্যই আমাদের হাসিকান্না-ভরা জগৎ ছেড়ে গিয়েছে ! সে এখন মাটীর নীচে, গভীর অন্ধকারের মধ্যে শুয়ে আছে। কতবার দিনের আলো, রাতের অন্ধকার এল', গেল', কত গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্ত তাহার উপরের মাটী মাড়িয়ে গেল', সে তো আর এল না—তার অভাব কি আমায় বেদনা-জড়িত করেছিল ? বেদনা ? না, এ ত বেদনা নয়। মানুষের কথা তাহার বোধকে অর্দ্ধ-প্রকাশ করে। আমার ভিতরের আমি কেমন এক নিঃসঙ্গতার অব্যক্ত ভয়ে মূঢ় হ'য়ে পড়েছে। যে চ'লে গিয়েছে তার অশরীরী অবস্থান কি এক অনভ্যস্ত জগতের হাসি-কান্নার শব্দে আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছে—তার অতৃপ্ত চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাকে অনৈসর্গিক শঙ্কায় পূর্ণ ক'রে তুলেছে !

যেদিন তাহার ছলনা আমি জানতে পেরেছিলাম সেইদিনের কথা মনে হ'চ্চে; হঠাৎ আমার চারিদিকে যেন অমাবস্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। তখন কোলাহলময় জগতের চাঞ্চল্যে আমার বেদনা অতি তীব্র হ'য়ে উঠেছিল—হিংস্র ঘৃণায় দীপ্ত অহমিকা নিরতির নিষ্ঠুর পরিহাসের নির্দ্দয় আঘাতে আমার জগৎ রিক্ত, জর্জ্জরিত। ক্রমে ক্রমে বেদনায় যন্ত্রণা বোধ হচ্চে, এমন সময় শুনলাম সেও যন্ত্রণাক্লিষ্ট—আমার স্বার্থান্ধ হৃদয়ে কি তৃপ্তি, কি সান্ত্বনার অবসাদে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হ'য়ে গেল সেই ছোট্ট চিঠিখানির ফুলের গন্ধে এখনও তা' আমার মানস-মাঝে ভরপুর। সে চিঠি এখনও আমার কাছে আছে।...আজ এই শীতের রাত্রির অন্ধকারে, আমার জানালার বাহিরে এসে সে দাঁড়িয়েছে। তাকে দূরের পথের শেষে, তারার ছটায় নীলাম্বরী-বেষ্টিত দেখেছি। সে ধীরে আমার চেয়ারের পাশে এসে কতবার দাঁড়িয়েছে ! তেমনি জীবন্ত হাসিভরা মুখে কতবার যেন চোখের ভাষায় ব'লেছে—'আমি যাই নাই, আমি তোমারই কাছে'... তখনি সুপ্তোত্থিতের মত চমকে উঠেছি।

...যখন তাকে শেষবার দেখি সে তখন তার ছেলেবেলার মতনই সরল স্বচ্ছ চোখের চাহনিতে আমার দিকে চেয়েছিল। আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিই নি—সে চ'লে গেল, শেষবার চ'লে গেল।—সেবারও রাস্তার কোণে সে মিলিয়ে গেল—সে আর আসবে না !

আমি ঘটনাক্রমে জেনেছিলাম সে আর আসবে না। প্রথমে ভেবেছিলাম হয় তো সপ্তাহ কতক, জোর মাস কতক পরে সে আবার ফিরবে। হঠাৎ এক বছর পরে তার এক আত্মীয়ের দেখা পাই, তিনি কখন কখনও জিজনার আসতেন। পূর্ব্বে দু' একবার তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল। একবার তিনি [illegible]

[illegible] সে যখন তার মা'র সঙ্গে আসে তখন সেই আত্মীয়টা এসেছিলেন। তার পর আমি একবার দু' একজন বন্ধুকে নিয়ে প্রাটের সার্দ্দা হোটেলে ছিলাম, সেইখানে সেই লোকটীকে আর তিনজনের সঙ্গে খাওয়ার টেবিলে ব'সে থাকতে দেখি। তিনি আমাকে ডেকে একধারে নিয়ে গিয়ে বললেন "আমার ভাইঝি যে তোমার জন্ত পাগল!" সেই বীণাবেণু-মুখরিত হোটেলের ঘরটী যেন এক অপার্থিব আলোতে ভ'রে গেল। আমি যেন বৃদ্ধকে মনুষ্যের সকল আকাঙ্ক্ষার, সকল সৌভাগ্যের পূর্ণতাব্যঞ্জক মঙ্গলমূর্ত্তিরূপে দেখলাম। তখন যেন তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে আনন্দের ঢেউ বইছে—আর এখন—আজ প্রভাতে! আমি তাঁর পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছি, এমন সময় সৌজন্যের খাতিরে—বিশেষ কোন ঔৎসুক্যের জন্ত নয়—তঁকে তার ভাইঝির কথা জিজ্ঞাসা করলাম। আমি তার খবর অনেক দিন পাই নি, চিঠি আসা অনেককাল বন্ধ হ'য়ে গেছে, শুধু আমাদের মিলনের স্মৃতিরূপে মাসে মাসে তার কাছ থেকে ফুল আসত—কেবল ফুলের শব্দহীন কোমল করুণ ভাষায় তার খবর এনে দিত। বৃদ্ধকে তাঁহার ভাইঝির কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি চমকে উঠলেন, বললেন, "জান না সে যে হপ্তাখানেক হ'ল এ জগৎ ছেড়ে গিয়েছে।" আমি মর্ম্মভেদ যাতনায় চীৎকার ক'রে উঠলাম। তখন তিনি আর কিছুই বলেন নি; সে অনেক দিন রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করে, কিন্তু আটদিনও শয্যাশায়ী হয় নাই—তার রোগ প্রধানতঃ মানসিক—শারীরিকের মধ্যে রক্তাল্পতা। ডাক্তারেরা [illegible] বুঝতে পারে নি।

বৃদ্ধ [illegible] দাঁড়াতে দেখেছিলেন সেখানে আমি [illegible] দাঁড়াই নি—আমার বল-শক্তি সব নিঃশেষ [illegible]। কি এক বিরাট্ পাহাড় আমি যেন [illegible] ব'য়ে এনেছি তথাপি আমি আজ সে পুরান [illegible]। আমার জীবনের [illegible] পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছে। [illegible] কেন? আমি যে একেবারে [illegible] চ'লে এসেছি! জগতের সঙ্গে [illegible] গেছে, তাই আমার পড়ার ঘরটার [illegible]—হাসিকান্নার সীমা ছাড়িয়ে আশা-নিরাশার অতীত অনন্তে এসে পড়েছি। এখন কেবলই মনে হ'চ্ছে 'ফুলের বার নাহিক আর ফসল যার ফল্‌লো না' তাকে আর মঙ্গল-অমঙ্গলের খবর নিতে হয় না—এ কি অনাবিল শান্তি—এ কি চিরনির্ব্বাণ··· ··আজ চোখের জল ফেলতে সত্যি হাসি পায়।

শীতের দিনে খানিকটা বাহিরে ঘুরে বাড়ী ফিরেছি। আকাশ তার ম্লান-ধুসর দিগন্তবিস্তৃত বিরাট্ শরীর নিয়ে শীতে কাঁপছে ···আর আমি শান্ত, মৌন, নিশ্চল। যে বৃদ্ধের সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল, তিনি আবার পুরাতন মূর্ত্তিতেই আমার মানস-দৃষ্টির সম্মুখে এসেছেন। আমি গ্রেটেলকেও বেশ স্পষ্ট দেখি, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাল নিকষে সোনার রেখার মত ফুটে উঠেছে—ঠিক আগের মতই তাকে দেখি—তবে একটু তফাৎ আছে। আজ আর তার স্মৃতি কোন বিরক্তি, কোন অস্থিরতা নিয়ে আসে না। সে যে মানুষের জগৎ ছেড়ে গিয়েছে, নির্জ্জনে অন্ধকার মাটীর নীচে একটী ছোট বিছানায় শুয়ে আছে একথা কিন্তু মনেই হয় না। আজ আমার বিচ্ছেদ-ক্লেশ-বোধ নাই—বিশ্বগ্রাসী নীরবতা আমার চারিদিকে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আনন্দ-নিরানন্দ এসব কিছুই নয়—জগৎ তো শুধু আহ্লাদ-বিষাদের ব্যঙ্গ হাসিতে ভরা—আমরা নিরর্থক হাসিকান্নায় অন্তরের শূন্যতা ভরিয়ে তুলি। আমি এখন গভীর অর্থপূর্ণ বইসকল প'ড়ে তাদের সার সংগ্রহ করতে পারি। যে পুরান ছবিগুলি মাঝে নিরর্থক হ'য়ে পড়েছিল আবার তাদের তিমির-গূঢ় সৌন্দর্য্যে আমার সুমুখে দাঁড়ায়। মরণের পরপারে আমার কত পরিচিত প্রিয়জন চ'লে গিয়েছে, আজ আর সে চিন্তা আমাকে বেদনাক্লিষ্ট করে না। মৃত্যু অর্থহীন—তা'কে ভাল-মন্দ বিশেষণে অভিহিত করি না। সে নিষ্কলঙ্ক—নিষ্ঠুর মোটেই নয়।······

পথ ঘাট বরফে আচ্ছন্ন। বরফের আচ্ছাদন দিন দিন পুরু হ'য়ে চলেছে। একটা ভাবনা ক'দিন থেকে কেবলই মনে আসছে। একদিন আমিও এই বরফের আস্তরণের নীচে শুয়ে পড়বো। তখন ঘরের মধ্যে আগুনের সেঁকের চার ধারে হাত, কোলাহলে চ'লবে, আর আমি—আমি আমার নিঃসঙ্গ, নিস্পন্দ জগতে চির-অন্ধকারে—জীবনের [illegible]

দুঃখ-স্বপ্ন ভুলে অনন্ত নিদ্রায় মগ্ন—'নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপং'।—

কখন গ্রেটেল এসে দাঁড়িয়েছে জানি না। সে বললে...'আজ আমি বরফের মধ্যে তোমার ভাষা পেয়েছি, তোমার সকল আশা সকল আলো আবার ফিরিয়ে এনেছি। জগতে কিছুই একেবারে ধ্বংস হয় না। তোমার যে আশা, নিরাশা, সফলতা, বিফলতা একবার মূর্ত্ত হ'য়েছে—তারা কি আর চ'লে যায়? আমার সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার তোমার কাছে এসেছে'—সে যেন অপরাজেয় শক্তিতে আমার সকল বন্ধন ছিন্ন ক'রে দিলে।

আজ নিশীথ রাতে অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় একটা অদ্ভুত চিন্তা মনে এল। আমি যেন আমার দেহ থেকে বাহিরে এসেছি—আমার ভিতরের মানুষটা স্বরূপে দেখা দিয়েছে। সে নির্দ্দয়, নির্ম্মম; সে আপনার চিরপ্রিয়কে চিরনিদ্রার শয়নে দেখেও এক ফোঁটা চোখের জল ফেললে না। একবারও মৃত্যুর বজ্রকঠোর উগ্রমূর্ত্তি দেখেও শিউরে উঠল না। সত্যই নিষ্ঠুর পেষণে আমার অন্তরের কোমলতা কে যেন নিঃশেষে বাহির ক'রে নিয়েছে।

অতীত অতীতে মিশে গিয়েছে। জীবনের নব-উচ্ছ্বাসে, নব চাঞ্চল্যে আবার চারিদিক্ পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। আবার আমি মানুষের দলে এসেছি। আমার সকল আবেষ্টন উল্লাস-হিল্লোলে তরঙ্গায়িত। এমন সময় গ্রেটেল তার করুণ-দৃষ্টিতে সজল নয়নে আমার দিকে চাইলে। সে তখন অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। শত সূর্য্যের কিরণছটায় তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। অঙ্গ নিরাভরণ; সে এসেছিল 'শুধু চরণে জড়ায়ে বনফুল।' মর্ত্ত্যজগৎ ছায়ার মতন মিলিয়ে গেল। সেই অনন্ত নারী আবার আমাকে ঊর্দ্ধে নিয়ে চলল।

আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। আজ মাসের প্রথম দিন। এই দিনেতেই প্রায় গ্রেটেল আমাকে ফুল পাঠিয়ে দিত।

আজও ফুল এসে হাজির। সকালে পোষ্টম্যান একটা কাগজের বাক্স দিয়া গেল। সেই বাক্সটাতেই ফুলগুলি এসেছে—যেন চিরন্তন প্রথার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমি তন্দ্রালস ছিলাম, তখনও ঘুমের ঘোর কাটে নি। বাক্সটা খুলতেই ফুলের গন্ধে ঘর ভ'রে গেল, আমিও বেশ সজাগ হ'য়ে উঠলাম।

...তখন চমকে দেখি সোণালি রংএর ফিতা দিয়া একটা পিংক্ ও ভাওলেট ফুলের গুচ্ছ...কে যেন তাদের একটা কার্ডবোর্ডের শবাধারে শয়ন করিয়ে দিয়েছে। ফুলগুলি হাতে করতেই আমার সকল হৃদয় করুণ সরস হ'য়ে উঠল। আমি বুঝিলাম আজ সেই পুষ্পগুচ্ছ কেন এসেছে। গ্রেটেল তাহার মৃত্যুশয্যায় আমাকে ভুলে নাই। যা'তে ঠিক নিয়মিত আমার কাছে তাহার ফুলের উপহার পৌঁছায়, তার বন্দোবস্ত সে করে গেছে। আজিকার কোমল-করুণ ফুলের সম্ভাষণে আমি আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়েছি।

—আজকের পুষ্প-দূত সান্ত্বনা বহন ক'রে এসেছে। সব যেন আজকের মতনই আছে। কিন্তু ফুলগুলি হাতে নিয়েই বোধ হ'ল তাদের নির্ব্বাক্ আলাপের ছন্দে ছন্দে মৃত্যুর বিয়োগ-করুণ ক্রন্দনের সুর বহন করেছে—মরণোন্মুখ, জীবিতের কাছে তাহার শ্রদ্ধার শেষ নিবেদন পাঠিয়েছে। —হায় আমার মরণ কি—তাহা বুঝি না অথচ প্রিয়জন, বিয়োগজনিত শূন্যতা পূর্ণ ক'রে আছে মৃত্যু! আজ এই ফুলগুলির স্পর্শে আমার চিন্তাধারা অন্যপথে বইতে লাগল, বোধ হ'তে লাগ্‌ল এই ফুলগুলি আমাদেরই মত সজীব, একটু জোরে চেপে ধ'রলে এরা বেদনাক্লিষ্ট হ'য়ে অস্ফুট কান্নার স্বরে সকল প্রাণীকে অধীর ক'রে তুলবে। আমার পড়ার টেবিলের উপর ফুলের তোড়াটী রেখে দিলাম, তাহারা বিষাদ-করুণ হাসিতে যেন আমাকে ধন্যবাদ দিল। কোন অতীতের অনন্ত-করুণ বিচ্ছেদ-বেদনা আমার হৃদয়ের অন্তর-তম প্রদেশে প্রবেশ ক'রেছে! আমার বোধ হ'চ্ছে এই ফুলের ভাষা আমি বুঝতে পারলে তারা হয় তো কোন শেষ বিদায়ের মর্ম্মস্পর্শী আহ্বান আমার কাণে পৌঁছে দিত।

যা'ক্ আর আবল-তাবল বক্‌বোনা, এগুলি ত ফুল ছাড়া আর কিছুই নয়! এরা শুধু জীবনের পরপার থেকে অমৃতের ধারা এনেছে—এরা মৃত্যুর বাণী নয়, মৃত্যুর আহ্বান নয়। যে কোন ফুলওয়ালীর কাছে এমন একটী ফুলের তোড়া কিনে যাকে ইচ্ছা পাঠান যায়—তাই যদি হয় তাহ'লে এ ফুলের তোড়াটীকে একদিকে ফেলে রাখিলেই তো পারি!...

আজকাল আমি বেশীক্ষণ নির্জ্জন পথে পায়চারি ক'রেই কাটাই, মানুষের কোলাহলের স্বরের সঙ্গে আমার অন্তরের স্বর মিলাতে পারি না—আমার হৃদয়-তন্ত্রী কেমন বেসুরো বেজে উঠে শতছিন্ন হ'য়ে যায়। গ্রেটেল আমার ঘরে ব'সে কত কি ব'কে যায়—কি বলে তাহার কোনই অর্থ আমার বোধ হয় না। যখন সে চ'লে যায় মনে হয় অনন্ত মানব-সমুদ্রের একটা ঢেউ আমার কাছ দিয়ে চ'লে গেল। সে আর না এলেও কোন অভাব বোধ করি না।

ফুলগুলি সব একটা ফুলদানিতে রেখে দিয়েছি, সমস্ত ঘর তাদের সুগন্ধে ভরপুর—এক সপ্তাহের উপর ফুলগুলি র'য়েছে, এখন দেখছি প্রকৃতির নির্ম্মম করস্পর্শে তারা চঞ্চল হ'য়ে উঠছে, শুকিয়ে যাচ্ছে! আমার খেয়াল হ'য়েছে সজীব নির্জ্জীব সকলের সঙ্গে আলাপের ভাষা শিখবো। নদীকে—ঝরণাকে কত কথা জিজ্ঞাসার আছে, এই ফুলগুলিকেও প্রশ্নের পর প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলবো। হয়তো কিছুদিন তাদের ভাষা আমার কাছে অর্থহীন থাকবে, তারপর ওদের সঙ্গে আমার মেলামেশার একটা পদ্ধতি আপনিই স্থির হ'বে।

উপল-কঠোর শীত শেষ হ'য়ে গেছে। বসন্তের বাতাসে আহ্বান ব'য়ে এনেছে। পূর্ব্বের মতনই দিনগুলি যাচ্ছে, তথাপি বোধ হ'চ্চে যেন আমার জীবনের বেষ্টনী একটু শিথিল হ'য়ে প'ড়েছে। অতীত জীবন কোথায় হারিয়ে গেছে, দুদিনের পূর্ব্বেকার ঘটনাও স্বপ্ন ব'লে বোধ হ'চ্ছে। কোন জীবনে গ্রেটেলের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল কি না তাহা এখন [illegible] মনে আনতে হয়—সেকি সত্যই মানুষের মতন [illegible] ছিল না শুধু মানসচক্ষুতেই আমি তাকে [illegible]। কোন স্বর্গের সুদূর পথের [illegible] দেখেছি?—তারপর যখন সে কথা বলতে [illegible] অমনি আমার সমস্ত জড়াজড় ভেদবুদ্ধি জেগে [illegible] কথার আওয়াজ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'য়ে [illegible] উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হ'তে [illegible] কমনীয়তা-মণ্ডিত হ'য়ে [illegible] আমি একাকী, সঙ্গী সেই [illegible]। [illegible] মলিন [illegible] প'ড়েছে, [illegible]

সব পাঁপড়ী ঝ'রে পড়বে। তাদের গন্ধসত্তার নিঃশেষ হ'য়ে এসেছে। গ্রেটেল অনেকদিন তাদের দেখে নি, আজ যেন একবার অনেকক্ষণ ধ'রে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে, কি যেন আমাকে ব'লবে ব'লে বোধ হ'ল, কিন্তু হঠাৎ কেমন ভীত হ'য়ে ত্রস্তপদে সে চ'লে গেল।

ফুলগুলি আস্তে আস্তে শুখাচ্ছে। তাদের মৃদু হাসি মলিন হ'য়ে এসেছে। মরণের হিমস্পর্শে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীতল হ'য়ে উঠেছে, তার আসন্ন আলিঙ্গন-শঙ্কায় মানুষ কেমন অধীর, ভীত হ'য়ে ওঠে এখন বুঝতে পেরেছি। এই মরণোন্মুখ ফুলগুলির করুণ ক্রন্দনের আকুল আহ্বান গ্রেটেলের মর্ম্ম স্পর্শ ক'রেছে, সে আবার এসেছে। এবার কিন্তু গ্রেটেলের ধরণ বদলে গেছে, সে আর হাসে না, কথাও কহে না, কেবল করুণ চাহনিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে—কি যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করবে। কেমন একটা অনির্দ্দিষ্ট উদ্বেগে, ভয়ে আমি চঞ্চল হ'য়ে পড়ি। মাঝে মাঝে সে আমার পাশের চেয়ারে তার উল বোনার চুপ্‌ড়িটী নিয়ে বসে—নিঃশব্দে শেলাইয়ের কাজ করে। আমাকে বই পড়তে দেখলে সে শেলাইয়ের কাজ বন্ধ ক'রে কি একটা যেন আমাকে বলতে চায়। আমি তখনই ল্যাম্পের ওপরকার রেশ-মের সেড্‌টা সরিয়ে রাখি। উজ্জ্বল দীপ্তিতে গ্রেটেলের চোখ দু'টা হাসতে থাকে। তারপর কখন যে অন্ধকার ঘরের কোণে ঘনিয়ে এ'ল বুঝিতে পারি নি, এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে দেখি গ্রেটেল ঘরে নাই, কখন চলে গেছে জানতে পারি নি। আজ বসন্ত-সন্ধ্যায় আমার ঘরের জানালা খুলে দিয়েছি···দূরে রাস্তার ধারে ল্যাম্প-পোষ্টের নীচে গ্রেটেল মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। একি আলো-ছায়া-সম্পাতে একটা দৃষ্টিভ্রম মাত্র? তা' কেন হ'বে! গ্রেটেল তো আমার চারধারে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আজ বসন্তের আহ্বানে সে আমার জীবনের বসন্ত জাগিয়ে তুলেছে। কে বলে মানুষ মরলে অন্য জগতে চ'লে যায়। আমি জানালার পর্দ্দা নামিয়ে সূর্য্যের আলোক ঘর থেকে তাড়িয়ে দেই, পর্দ্দার অপর পাশে সূর্য্যের আলো কি একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়? গ্রেটেলের পার্থিব-জীবনের যবনিকা প'ড়ে গিয়েছে, তাই ব'লে সে

মরে নাই। আমরা একটা কল্পনা-জগৎ সৃষ্টি ক'রে সেই জগতে জন্মমৃত্যুর অভিনয় চিরকাল দেখছি। তাই ব'লে কি চিরসৎ কখন অসতে পরিবর্ত্তিত হয়? জীব যে অমর—'ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা কদাচিৎ'। তাই আজ এই বসন্তের সন্ধ্যায় তারার আলোর প্রেটেল তাহার চির-মৌন অনন্ত নারীত্ব, অনির্ব্বাণ সত্তা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে। আমার জীবনের সকল প্রদীপ আবার জেলেছে—আমি অমৃতের সন্ধান পেয়েছি।

আঘাত

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

সমস্ত সহিতে পারি যদি আসে নাথ
তোমার চরণ হ'তে কঠিন আঘাত;
জীবন হারাতে পারি তোমার খেলায়,
তবু মানুষের এই বিচারশালায়
মরিতে পারি না প্রভু; যারা নাহি জানে
সমস্ত জীবন ছোটে কিসের সন্ধানে--
তাই তারে খণ্ড করে। নাহি দেখে সব
বিচারের ছলে খেলে তোমার মানব।
ফাল্গুনের রাতে আসে উৎসারিত সুর
চিত্ত নিত্য-মুখরিত-বেদনা-বিধুর
কণ্ঠ পরিমাল্য যবে সুগন্ধ আকুল
এই জীবন-পথ-প্রান্তে কত ঘটে ভুল।
দূর যাত্রা-পথ হ'তে আবাহান আসে
অনন্ত জীবন ছোটে অনন্ত আকাশে।
এ সমস্ত লাভ ক্ষতি তুচ্ছ নিন্দা যত
যে অঞ্চলে আছে বাঁধা সে দোলে সতত
গগনে গগনে আর ঘন মেঘে মেঘে
অধীর অন্তর ছোটে দুরন্ত আবেগে।
যারা নীচে বসে থাকে তারা শুধু হায়
তাহারি একটি কণা দেখিবারে পায়;
তাই লয়ে ঘরে ঘরে নাহি পায় তল
তর্কে তর্কে বিরচিত কঠিন শৃঙ্খল।
নিরবধি অতি ক্ষুদ্র বিচারের ঘরে
শিশু সম অর্থহীন খেলা করে মরে।
তারা নাহি জানে প্রভু এ সুদীর্ঘ পথে
ছুটিতে ছুটিতে ধূলা ঝরে অঙ্গ হ'তে।
তুমি যবে ব্যথা দাও মুদিত নয়নে
তারা তারে অবিরাম শাস্তি বলে মানে।
নাহি জানে যেতে হ'বে কত ঊর্দ্ধে নাথ
তোমার নিকটে টানে তোমার আঘাত।

ষট্-সম্পত্তি

শ্রীঅর্পণাচরণ সোম

(১)

মোক্ষ-দায়িকা অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করিতে হইলে, তৃতীয় যে সাধনটী অর্জ্জন করিতে হয়, তাহা ষট্‌-সম্পত্তি। ভগবান্ বুদ্ধদেব এই ষট্‌-সম্পত্তিকে পালি ভাষায় "উপচারো" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার অর্থ সদাচার। সেই ষড়্‌বিধ সম্পত্তি বা সদাচার কি কি? শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও বুদ্ধদেব উভয়েই বলিয়াছেন, "সমাদিষট্‌কং নাম শমদমোপরতি-তিতিক্ষা সমাধান-শ্রদ্ধাঃ"—সম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান।

১। শম

"শমঃ নাম অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ; অন্তরিন্দ্রিয়ং নাম মনঃ, তস্য নিগ্রহঃ অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ। শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিগ্রহঃ শ্রবণাদৌ বর্ত্তনং শমঃ" (আত্মানাত্ম-বিবেক)—অন্তরিন্দ্রিয় যে মন, তাহাকে শ্রবণাদি ভিন্ন অন্য বিষয় হইতে নিরোধের নাম 'শম'।

এই শম-সাধন সম্বন্ধে সদ্‌-গুরু বলিতেছেন :—

বৈরাগ্য-সাধন শিক্ষা দেয় যে, প্রাণময় কোষের সংযম করিতে হইবে, আর শম সাধন শিক্ষা দেয় যে, মনোময় কোষের সংযম করিতে হইবে। মনোময় কোষের সংযম—ইহার অর্থ মনোবৃত্তির সংযম, ইহার ফলে তুমি ক্রোধ বা অস্থিরতা অনুভব করিবে না; মনটীর সংযম, ইহার ফলে চিন্তা সর্ব্বদা স্থির ও অবিক্ষিপ্ত হইবে; আর (মনের সাহায্যে) নাড়ীগুলির (১) (Nerves) সংযম, ইহার ফলে ইহারা যত দূর সম্ভব কম উত্তেজিত হইবে।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা যেমন অন্নময় কোষের ধর্ম্ম, রাগ-দ্বেষ,—অনুরাগ ও বিরাগ—সেইরূপ প্রাণময় কোষের ধর্ম্ম। রাগ-দ্বেষ জয় করিলে অর্থাৎ বৈরাগ্য সম্বন্ধে সিদ্ধিলাভ করিলে প্রাণময় কোষ যেরূপ সংযত হয়, সেইরূপ শম-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলে মনোময় কোষ সংযত হয়।

মনোময় কোষ কাহাকে বলে? আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন :—"মনোময় কোষো নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মনশ্চ এতৎ সর্ব্বং মিলিত্বা মনোময়-কোষ ইত্যুচ্যতে"—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন একত্র মিলিত হইয়া মনোময় কোষ নামে অভিহিত হয়।

উপরি-উক্ত প্রবচন মধ্যে সদ্‌-গুরু বলিতেছেন যে, এই মনোময়-কোষ, অর্থাৎ মনোবৃত্তি, মন ও (মনের সাহায্যে) নাড়ীগুলির সংযম করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, মনোবৃত্তির সংযম। এ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের মনস্তত্ত্ববিদ্ ঋষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "যোগশ্চিত্ত-বৃত্তিনিরোধঃ" (১।২)—চিত্ত-বৃত্তিগুলি নিরোধের নাম যোগ, ইহাতে চিত্ত নির্ম্মল হয়। তারপর তিনি বলিয়াছেন, "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" (১।৩)—চিত্ত-বৃত্তি-সমূহ নিরুদ্ধ হইলে, দ্রষ্টা অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা স্বরূপে অবস্থান করেন, চিত্তবৃত্তিগুলির নিরোধ দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে, সেই নির্ম্মল চিত্তে আত্মার স্বরূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু "বৃত্তি সারূপ্যমিতরত্র" (১।৪)—চিত্ত-বৃত্তি সমূহ নিরুদ্ধ না হইলে, সেই "নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব" আত্মা স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন না—মনোবৃত্তির সারূপ্যে অবস্থান করেন, অর্থাৎ মনোবৃত্তির সহিত একীভূত থাকেন—যখন যেমন মনোবৃত্তির উদয় হয়, তখন তিনি সেই মনোবৃত্তির সহিত একীভূত হয়েন। আমরা জানি "সোঽহমেব সঃ" 'আমি সেই "নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব" আত্মা'; কিন্তু আমাদের মনে যখন যে বৃত্তির উদয় হয়, তখন আমরা আত্ম-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আমাদের আত্মাকে সেই বৃত্তির সহিত একীভূত করি। [illegible] যখন ক্রোধের উদয় হয়, তখন আমরা মনের সেই ক্রোধবৃত্তির সহিত আমাদের আত্মা বা নিজকে একীভূত করিয়া [illegible]

---

(১) ইংরেজী "নার্ভ" (nerve) শব্দ বাংলা ভাষায় "স্নায়ু" বলিয়া [illegible] চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহা প্রাচ্য শরীর-শাস্ত্রের মত-বিরুদ্ধ [illegible] শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন ও রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র [illegible] তাঁহারা বলেন যে ইংরেজী "নার্ভ" শব্দের [illegible] "নাড়ী" ও ইংরেজী "লিগামেণ্ট" শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ "স্নায়ু"।

"আমি ক্রোধার্ত", যখন মনে বিষাদ উৎপন্ন হয়, তখন আমরা নিজকে বিষণ্ণ অনুভব করি ও বলি, "আমি বিষণ্ণ", এইরূপে আমাদের পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বা ইহ-জন্মের স্বভাববশতঃ আমাদের মনে নিরন্তর যে-সকল মনোবৃত্তির উদয় হইতেছে, আমরা আমাদের নিজকে সর্ব্বদা সেই মনোবৃত্তি-সম্পন্ন করিতেছি, কাজেই আমাদের আত্ম-স্বরূপ দেখিতে পাইতেছি না—আত্মোপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। কিন্তু আত্মোপলব্ধিই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য। যতদিন না আমরা আত্মোপলব্ধি করিতে পারিব, ততদিন আমরা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারি না। সেইজন্য বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন—"আত্মানং বিদ্ধি" —আত্মাকে জান; গ্রীক্ ঋষি বলিয়াছেন—Man, know thyself"—মানব, নিজকে জান। নিজকে জানিতে হইলে, আত্মোপলব্ধি করিতে হইলে, আমাদিগকে মনোবৃত্তিগুলি সংযত করিতে হইবে।

কিন্তু মনোবৃত্তিগুলি সংযত করিবার উপায় কি? মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন :—"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" (১।১২)—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনোবৃত্তিগুলির নিরোধ হয়। অভ্যাস কি? "তত্রস্থিতৌ যত্নোভ্যাসঃ" (১।১৩)—অবৃত্তিক চিত্তের যে প্রশস্তিবাহিকা স্থিতি, তাহার জন্য যে নিয়ত প্রযত্ন, তাহার নাম অভ্যাস। আর বৈরাগ্য কি? "দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্"—স্ত্রী, অর্থ, পান, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি দৃষ্ট বিষয়ে ও স্বর্গ, বিদেহ লয়, প্রাকৃত লয় প্রভৃতি আনুশ্রবিক বিষয়ে যে বিতৃষ্ণা, তাহার নাম বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্য (১)। আমরা যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, কামনাই যত মনোবৃত্তির জননী—রাগ-দ্বেষ হইতেই যত মনোবৃত্তির উৎপত্তি। সুতরাং সকল বস্তুতে যদি কামনাহীনতা বা বৈরাগ্য জন্মে,—সকল বস্তুতে যদি রাগ-দ্বেষ জয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সহজেই মনোবৃত্তিগুলির নিরোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার সহিত মনকে প্রশান্ত রাখিবার জন্য অনন্তরিত প্রযত্ন বা অভ্যাস চাই।

তারপর মনের সংযম। মনেরও সংযম করিতে হইবে। কারণ মন জীবাত্মার করণ। ইহা যদি সংযত না হয়, জীবাত্মার বশীভূত না হয়, তাহা হইলে জীবাত্মা তাহার অন্তর্জগতের এবং বাহ্যজগতেরও কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না। সেইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :- "অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপঃ"- যাহার মন অসংযত, যোগ তাহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু "বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ" (গীতা—৬.৩৬)—যাহার মন বশীভূত, সে যথোপায়ে যত্ন করিলে যোগ লাভ করিতে পারে। যোগলাভ তো দূরের কথা, মনঃ-সংযম করিতে না পারিলে, মানুষ সাংসারিক বিষয়েও কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে না। যে যত মনঃ-সংযম করিতে পারিয়াছে, সে তত সফলতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "যে মন জয় করিতে পারিয়াছে, সে জগৎ জয় করিতে সমর্থ।" ইহা অসম্ভব নয়। কারণ সুসংযত মনের অসীম শক্তি। বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন :—

> যৎ প্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ
> যজ্জ্যোতিরন্তরমৃতং প্রজাসু।
> যস্মান্ন ঋতে কিং চ ন কর্ম্ম ক্রিয়তে
> তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥ শুক্লযজুঃ ৩৪।৩

"এই মনই তো পরম প্রজ্ঞা, এই মনই তো যথার্থ চেতনা, এই মনের বলেই তো সকল বিবৃত হইয়া আছে, সকল মানবের অন্তরের মন্দিরে মনই তো জ্যোতির্ম্ময় দেবতা; মনই মানব-সমাজের প্রাণকে জড়তার, অবসাদের মৃত্যু হইতে রক্ষা করে এই মনকে বাদ দিয়া কোনো সত্য কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না; সকল কর্ম্মের জীবন্ত সত্য চৈতন্যময় উৎস যে আমার মন, সে কল্যাণ সঙ্কল্পে জীবন্ত হউক।" কিন্তু হায়! এ হেন মনকে আমরা এমনিই অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল করিয়া ফেলিয়াছি যে, ইহা দ্বারা জীবাত্মারূপী আমাদের কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। আমরা একটু অন্তর্দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইব যে, মন আমাদের বশীভূত নয়—আমরাই মনের বশীভূত। এরূপ অসংযত মনের দ্বারা আমাদের শুধু যে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তাহা নহে, প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্য বলিয়াছেন—

---

(১) আর এক প্রকার বৈরাগ্য আছে, তাহার নাম পর-বৈরাগ্য (পাতঞ্জল-দর্শন ১।১৬); বশীকার-সংজ্ঞক বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ হয়, তারপর সাধন পরিপাকের পর বৈরাগ্য সিদ্ধি হয়।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ গীতা ৬।৬

"যে মন দ্বারা মন জয় করিয়াছে, মন তাহার আপনার বন্ধু, কিন্তু যে মন জয় করিতে পারে নাই, মন শত্রুর ন্যায় তাহার শত্রুতা করে।" সুতরাং সাধনার পথে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে এরূপ শক্তিসম্পন্ন মনকে সংযত করিয়া আমাদের অভীপ্সিত বিষয়ে পরিচালিত করিতে হইবে। তাহা আমরা করিতে পারি; কারণ, বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন:—

যত্তৎ সদসতোর্মধ্যং যন্মধ্যং চিত্তজাড্যয়।
তন্মনঃ প্রোচ্যতে রাম দ্বয়োর্দোলায়িতাকৃতি।

মন সৎ ও অসৎ—এই দুইএর মধ্যে দোলায়মান, ইহাকে যেদিকে চালিত করিবে, সেই দিকে যাইবে। ইহাকে আমাদের অভীপ্সিত দিকে চালিত করিলে, অগ্রে ইহাকে সংযত করিতে হইবে। কিন্তু ইহাকে সংযত করা সুকঠিন, কারণ "চঞ্চলং হি মনোধর্ম্ম বহ্নে র্ধর্ম্মো যথোষ্ণতা" —উষ্ণতা যেমন অগ্নির ধর্ম্ম, চঞ্চলতাও সেইরূপ মনের ধর্ম্ম। ইহাকে সংযত করিবার উপায় সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ গীতা ৬।৩৫

"মন যে চঞ্চল ও ইহার নিগ্রহ যে কঠিন, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা ইহার নিগ্রহ হয়।" এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য মনোবৃত্তি-নিরোধেরও উপায়। আমরা যে মনকে স্থির ও সংযত করিতে পারি না, তাহার কারণ নানাবিধ মনোবৃত্তি সর্ব্বদা মনোমধ্যে উদিত হইয়া মনকে বিচলিত করিতেছে। আবার আমরা মনোবৃত্তিকে যে নিরুদ্ধ করিতে পারি না, তাহার কারণ আমাদের মন আমাদের বশীভূত নয়। মন ও মনোবৃত্তি—ইহাদের উভয়কেই সংযত করিবার উপায়:—অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

অভ্যাসের অসীম শক্তি। "অভ্যাসাৎ সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ" —অভ্যাস দ্বারা সকল বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করা যায়। এই যে নানাবিধ মনোবৃত্তি আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনোমধ্যে নিয়ত উদিত হইতেছে, [illegible] আকাঙ্ক্ষানুসারে নিয়ত নানাবিধ বিষয়ে ভ্রমণ করিতেছে, ইহাও অভ্যাসের ফল। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া আমরা নানা অবাঞ্ছনীয় মনোবৃত্তিকে আমাদের মনোমধ্যে স্থান দিয়াছি, মনকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করিতে স্বাধীনতা দিয়াছি, তাই এখন আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই সব মনোবৃত্তি মনোমধ্যে বাসস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া মনকে সর্ব্বদা বিচলিত করিতেছে, তাই মনও মর্কটের মত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বশীভূত হইতে চায় না। যদিও আমাদের অতীত জন্মের সেই মন ও দেহ ইহজন্মে নাই, কিন্তু বিধাতার এমনই অপূর্ব্ব বিধান যে, মানুষ প্রত্যেক জন্মে যে সব মনোবৃত্তির অনুশীলন করে, মৃত্যুর পর সেই সকল মনোবৃত্তি ও চিন্তার সংস্কার-বীজরূপে তাহার প্রত্যেক জন্মের সহগামী অস্তিত্বের (মানসিক) "ভূতসূক্ষ্ম" মধ্যে লীন থাকে। বটবৃক্ষ-বীজ হইতে বটবৃক্ষেরই জন্ম হয়—অন্য কোন বৃক্ষের জন্ম হইতে পারে না। কিন্তু সেই বৃক্ষের উৎপত্তির জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হয়, তারপর উপযুক্ত জল, বায়ু প্রভৃতি অনুকূল অবস্থার সাহায্যে তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, এবং সেই অঙ্কুর ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হয়। সেইরূপ মানুষের পুনর্জ্জন্ম গ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে, যখন সে "দেহবীজৈঃ ভূত-সূক্ষ্মৈঃ সংপরিষ্বক্তো" – দেহ-বীজ ভূত-সূক্ষ্ম (১) সমূহদ্বারা পরিষ্বক্ত হইয়া স্বর্গ হইতে ভুবলোকের মধ্য দিয়া এই পৃথিবীতে অবতরণ করে, তখন সে এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে, এমন পিতার ঔরসে, এমন মাতার গর্ভে প্রেরিত হয়, ও তাহার দেহ-গঠনের জন্য এমন সব উপাদান (factor) প্রদত্ত হয় যে, তাহার পূর্ব্বজন্মের অভ্যস্ত মনোবৃত্তি ও চিন্তার সংস্কার,—যাহা বীজরূপে তাহার মধ্যে লীন ছিল—ইহজন্মে অঙ্কুরিত হয়। পূর্ব্বজন্ম ও ইহজন্মের মধ্যে শত সহস্র জাতি, বহুদূর দেশ ও কল্পকোটি কাল ব্যবধান থাকিলেও পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ইহজন্মে একরূপই থাকে (পাতঞ্জল-দর্শন ৪।৯)। এই এই অলঙ্ঘনীয় নিয়মবশতঃই আমাদের পূর্ব্বজন্মের অভ্যস্ত অবাঞ্ছনীয় মনোবৃত্তি ও চিন্তাগুলি ইহজন্মে অঙ্কুরিত হইয়া আমাদিগের স্বভাব গঠন করিয়াছে। স্বভাব হইতে এখন

(১) "ভূত সূক্ষ্ম" [illegible] — ২ [illegible]

যদি এই সকল অবাঞ্ছনীয় মনোবৃত্তিকে দূরীভূত করিবার জন্য নিয়ত প্রযত্ন করি—এরূপ করিতে আমাদের অবশ্যই স্বাধীনতা আছে ও করিতে পারি—এখন যদি বিপরীত মনোবৃত্তির অনুশীলন করিতে অনন্তরিতভাবে প্রচেষ্টা করি, তাহা হইলে ইহাও অভ্যাস হইয়া যাইবে এবং তদ্দ্বারা নূতন স্বভাব গঠিত হইবে। কিন্তু এই অভ্যাস দুই এক দিনে বা দুই এক মাসে দৃঢ় হয় না। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন :—"স তু দীর্ঘকাল নিরন্তর্য্যসংকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ" (১।১৪)—দীর্ঘকাল অনন্তরিতভাবে তীব্র শ্রদ্ধার সহিত প্রযত্ন করিলে অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হয়। আমরা যে কোন একটা পুরাতন বদ্‌-অভ্যাস সহজে জয় করিতে পারি না, তাহার কারণ আছে। প্রত্যেক অভ্যাসের—তা' তাহা ভালই হউক্ বা মন্দই হউক—একটা শক্তি আছে, এবং সেইজন্য অভ্যাস যত পুরাতন হইবে, তাহার শক্তি তত বেশী হইবে, ও তাহা জয় করা তত কঠিন হইবে। কোন একটা বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিলে বা কোন একটা কার্য্য পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলে ইহার মধ্যে একটা সংস্কারাখ্য বেগ (momentum) সঞ্চিত হয়। সহসা ইহার প্রতিরোধ করা সহজ নয়। ইহার প্রতিরোধ করিতে পারে, এমন শক্তি এখন আমাদিগকে সংগ্রহ করিতে হইবে। উহার ঐ বেগ সঞ্চয়ের জন্য আমরা ইতঃপূর্ব্বে যতটা শক্তি ব্যয় করিয়াছিলাম, উহার প্রতিরোধের জন্য এখন আমাদিগকে ততটা শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। সেইজন্য আমাদিগকে ধৈর্য্যধারণ করিয়া উহার প্রতিরোধের জন্য প্রচেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্য প্রথমতঃ আমারা পুনঃ পুনঃ বিফল হইব, কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না; কারণ আমাদের প্রত্যেক প্রচেষ্টা উহার বেগ হ্রাস করিয়া দিবে। অবশেষে এমন সময় আসিবে, যখন উহার সমস্ত শক্তিই শূন্য হইয়া পড়িবে। বর্ত্তমান জন্মই আমাদের একমাত্র জন্ম নয়—ক্রম-বিকাশের তুঙ্গশিখরে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে অনেকবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, এবং ইহজন্মে যদিও আমরা আমাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মন ও মনোবৃত্তি সংযত করিবার অভ্যাস দৃঢ় করিতে নাও পারি, তাহা হইলেও আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই, কারণ ইহজন্মে আমরা ক্রম-বিকাশের যে সোপানে থাকিয়া দেহ-ত্যাগ করিব, পরজন্মে আমরা ঠিক সেই সোপান হইতে কার্য্য আরম্ভ করিব, এবং ইহজন্মে আমরা যেরূপ যোগ-বুদ্ধি ও অভ্যাসলাভ করিব, পরজন্মে আমরা ঠিক তাহাই পাইব, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপিসঃ।
প্রযত্নাদযতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং॥ গীতা৬।৪৩-৪৫

"যোগানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি যোগি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজন্মের বুদ্ধিসংস্কার পায় ও উহা হইতে অধিক সিদ্ধি পাইবার জন্য যত্ন করে। পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ সে অবশ অর্থাৎ আপন ইচ্ছা না থাকিলেও সিদ্ধির দিকে [illegible] হয়। এই প্রকার প্রযত্নপূর্ব্বক উদ্যোগ করিতে পাপ হইতে শুদ্ধ হইয়া যোগী অনেক জন্মের পর পরা গতি লাভ করে

যাহা হউক, মন ও মনোবৃত্তিদমনের জন্য আমাদিগকে অভ্যাস করিতে হইবে। পতঞ্জলি বলিয়াছেন :—তৎ প্রতিষেধার্থ একতত্ত্বাভ্যাসঃ" (১।৩২)—ইহার প্রতিষেধ জন্য এক তত্ত্বের অভ্যাস করিবে। কিন্তু একই এক তত্ত্ব সকলের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না; সেইজন্য তিনি পরবর্ত্তী সূত্রগুলিতে (১।৩৩-৩৯) কয়েকটী তত্ত্বের নাম করিয়াছেন। কাহার পক্ষে কোনটী উপযোগী, তাহা প্রত্যেকের নিজে পরীক্ষা করিয়া তাহার অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। তবে আমাদের মনে হয় যে, যাঁহারা বীত-রাগ সদ্‌-গুরুর সেবক হইবার অভিলাষী, তাহাদের পক্ষে মহর্ষি পতঞ্জলির নির্দ্দেশিত ৫ম উপদেশটী উপযোগী। সেটী হইতেছে, "বীতরাগং বিষয়ং বা চিত্তম্ (১।৩৭)—যিনি বীতরাগ, এমন কোন মহাপুরুষের ধ্যান করিবে, ইহাতে অস্থির মন স্থির ও শান্ত হইবে।

তারপর (মনের দ্বারা) নাড়ীগুলির সংযম সম্বন্ধে। ইহা বুঝিতে হইলে, নাড়ীগুলি কি ও ইহাদের কার্য্যাবলী কি ও নাড়ীগুলির সহিত মনের সম্পর্ক কি, তাহা বুঝিতে হইবে। আমরা সকলেই জানি যে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও

ত্বক—এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যথাক্রমে রূপ, ও স্পর্শ অনুভব করি, এবং বাহ্য জগতের যাবতীয় বস্তুর জ্ঞান লাভ করি ও বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাবতীয় চেষ্টনা কার্য্য সম্পা ন করি। মন এই দশ ইন্দ্রি.য়র অধিপতি। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ য হাদিগ'কে চক্ষু াদি ইন্দ্রিয় বলি। জানি, সে-গুলি প্রকৃত প্রস্তাবে ইন্দ্রিয় নয়—ইন্দ্রিয়-দ্বার (sense organ) প্রকৃত ইন্দ্রিয় অভ্যন্তরে অবস্থিত। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"চক্ষুরিন্দ্রিয়ং নাম গোলকব্যতিরিক্তং গোলকাশ্রয়ং কৃষ্ণতারকাগ্রবর্ত্তী রূপগ্রহণশক্তিযুক্তং যদিন্দ্রিয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়মিতি"—গোলাকৃতি চক্ষুর আয়তন হইতে ভিন্ন অথবা গোলকাশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ তারকার অগ্রবর্ত্তী রূপগ্রহণশক্তিযুক্ত ইন্দ্রি.ের নাম চক্ষুরিন্দ্রিয়। সুতরাং চক্ষু ও চক্ষুরিন্দ্রিয় এক জিনিস নয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই এই কথা। প্রকৃত ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়-দ্বারের অভ্যন্তরে অবস্থিত ও তাহা অতি শক্তিশালী সূক্ষ্ম বস্তু বিশেষ (শ্রীশঙ্করাচার্য্যের "আত্মানাত্মবিবেক" দ্রষ্টব্য)। শারীর-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, আমাদের মস্তিষ্ক সংজ্ঞার আধার, ও এই মস্তিষ্ক হইতে টেলিগ্রাফের তারের ন্যায় দুই শ্রেণীর কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম তন্তুবৎ পদার্থ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-দ্বারের সহিত সংলগ্ন আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শারীর-তত্ত্বের ভাষায় এই সূক্ষ্ম তন্তুবৎ পদার্থগুলি যথাক্রমে "নাড়ী" ও "নার্ভ" (nerve) নামে অভিহিত। সংজ্ঞাশক্তি ও বেষ্টন-শক্তি ইহাদের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে। বাহ্যজগৎ হইতে রূপ-রসাদির স্পন্দন আসিয়া যখন আমাদের তত্তৎ ইন্দ্রিয়-দ্বারে অভিঘাত উৎপন্ন করে, তখন তত্তৎ ইন্দ্রিয়-দ্বারের অভ্যন্তরে অবস্থিত সংজ্ঞা-নাড়ী (sensary nerve) সেই উত্তেজনা-প্রবাহ বহন করিয়া মস্তিষ্কে লইয়া যায়। ইহার ফলে বিশেষ বিশেষ সংবেদন (sensation) উৎপন্ন হয় ও ইহা হইতে অনুভূতি ও বাহ্যবস্তুর জ্ঞান জন্মে। সংজ্ঞা নাড়ী দ্বারা উত্তেজনা-প্রবাহ মস্তিষ্কে গৃহীত হইলে, তথা হইতে আবার প্রেরণা হইতে পারে। এই প্রেরণা মস্তিষ্ক হইতে আজ্ঞা-নাড়ী (motor nerve) দ্বারা পেশীতে অবশেষিত হয়। ইহার ফলে অঙ্গ-সঞ্চালন আদি ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। ইহা ভিন্ন আর এক শ্রেণীর নাড়ী আছে, তাহারা মস্তিষ্কের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত নহে; ইহাদের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস ও পাকাশয় প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহের ক্রিয়া পরিচালিত হয়। ইহা ভিন্ন মানসিক ক্লেশ সংবেদনের স্বতন্ত্র নাড়ী আছে। বাহ্যজগতের রূপ-রসাদির স্পন্দন দ্বারা তত্তৎ ইন্দ্রিয়-দ্বারা উত্তেজিত হইলে, কেবল যে বিশেষ বিশেষ সংবেদন উৎপন্ন হয়, তাহা নহে—ইহার আনুষঙ্গিক সুখ, দুঃখ, ক্রোধ, ভয়, লজ্জা প্রভৃতি নানাবিধ মনোবৃত্তির উদয় হয়। আলোকের সংবেদন তীব্র হইলে চক্ষুর কষ্ট হয়, অপ্রিয় কথা শুনিলে ক্রোধ ও দুঃখের অনুভব হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শারীরিক ও মানসিক সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি ব্যাপারগুলি নাড়ীর উপর নির্ভর করে।

কিন্তু কেবল নাড়ী দ্বারা কোন প্রকার অনুভূতি হইতে পারে না, ইহার সহিত মনের সংযোগ চাই। অনেক সময় এমন হয় যে, আমার সম্মুখস্থিত ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। আমা হইতে দূরবর্ত্তী লোকে তাহা শুনিতে পাইল, কিন্তু আমি ঘড়ীর সম্মুখে থাকিয়াও তাহা শুনিতে পাইলাম না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আমার মন শ্রবণ-নাড়ীর (auditory nerve) সহিত সংযুক্ত থাকে নাই—অন্য কোন বিষয়ে সংযুক্ত ছিল। সুতরাং দর্শনাদি ব্যাপারে মন তত্তৎ নাড়ীগুলির সহিত সংযুক্ত না থাকিলে চক্ষু দেখিয়াও দেখে না, কর্ণ শুনিয়াও শুনে না। সেই জন্য উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন; অন্যত্র অভূবং নাদর্শম্, অন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষম্ ইতি, মনসা হ্যেব পশ্যতি, মনসা শৃণোতি" (বৃঃ আঃ ১।৫।৩)—আমার মন অন্যত্র ছিল, সেইজন্য আমি দেখিতে পাই নাই; আমার মন অন্যত্র ছিল, সেইজন্য আমি শুনিতে পাই নাই; কারণ মন দর্শন করে, মন শ্রবণ করে।" আসল কথা, ইন্দ্রিয়-দ্বারের অন্তরস্থ নাড়ীগুলি দ্বারা সুখদুঃখাদির অনুভূতি ও বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু নাড়ীগুলির সহিত মনের সংযোগ থাকা চাই। মন নাড়ীগুলির সহিত যত তীব্রভাবে সংযুক্ত থাকিবে, অনুভূতি ও বাহ্যবস্তুর জ্ঞানও তত তীব্র হইবে ও মন যত ক্ষীণভাবে উহাদের সহিত সংযুক্ত থাকিবে, অনুভূতি ও বাহ্য বস্তুর জ্ঞান তত ক্ষীণ হইবে। সুতরাং মস্তিষ্ক হইতে

যে, নাড়ীগুলিকে যদি সংযত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে মনের দ্বারাই সংযত করিতে হইবে।

উপরিউক্ত প্রবচন মধ্যে সদ্‌গুরু আমাদিগকে আমাদের নাড়ীগুলির সংযম করিতেও উপদেশ করিয়াছেন। কারণ বাহ্যজগতের রূপরসাদির স্পন্দন নিয়ত আমাদের তত্তৎ ইন্দ্রিয়-দ্বারে অভিঘাত উৎপন্ন করিতেছে; ইহার ফলে আমাদের নাড়ীগুলি উত্তেজিত হইয়া আমাদিগকেও উত্তেজিত করিতেছে; সেইজন্য আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট পথে দ্রুতভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। কিন্তু যদি আমরা আমাদের নাড়ীগুলিকে সংযত করিতে পারি, তাহা হইলে বাহ্যজগতের রূপরসাদির স্পন্দন ইহাদিগকে উত্তেজিত করিলেও, আমরা উত্তেজনা অনুভব করিব না। এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন :—

"আমরা চঞ্চল বা বাহ্য স্নায়ু (নার্ভ) দিয়া সর্ব্বদাই কার্য্য করিতেছি। এই চঞ্চল স্নায়ু দিয়াই আমরা মনোভাব গ্রহণ ও বিকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু সাম্য বা equilibrium অবস্থায় স্নায়ুর কোন চিন্তাই করি না। চঞ্চল স্নায়ু সব সময়ে আমাদিগকে কার্য্যে প্রেরণা দিতেছে। এই জন্য আমরা সব সময় চঞ্চল ও মনও চঞ্চল। কিন্তু যদি নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারা (রাজযোগ প্রক্রিয়ার দ্বারা) আমরা চঞ্চল স্নায়ু হইতে স্থির স্নায়ুতে গমন করিতে পারি—তাহা হইলে বাহ্যিক জগতের কোলাহল বা স্পন্দন বা শব্দ ক্রমেই দূরীভূত হয় এবং ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। তখন আমরা বাহ্যজগতের শব্দ বা স্পন্দন আর অনুভব করিতে পারি না।" (১৩৩৬। অগ্রহায়ণ, প্রবর্ত্তক)

কিন্তু নাড়ীগুলিকে সংযত ও স্থির করিবার উপায় কি? ইহার উপায় মন—একমাত্র মনের সাহায্যেই নাড়ীগুলি সংযত ও স্থির হইতে পারে। নাড়ীগুলির সহিত মন সংযুক্ত হইলেও যখন সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি, মনোবৃত্তির প্রকাশ ও বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হয়, এবং উহাদের সহিত মন যত তীব্রভাবে সংযুক্ত হয়, অনুভূতিও তত তীব্র ও মন যত ক্ষীণভাবে সংযুক্ত হয়, অনুভূতিও যখন তত ক্ষীণ হয়; তখন মনের দ্বারা নাড়ীগুলি সংযত ও স্থির হইতে পারে ও হইয়া থাকে। মনের মধ্য দিয়া যদি আমরা আমাদের অন্তরস্থ ঈক্ষা-শক্তি (will-power) পরিচালিত করি, তাহা হইলেই নাড়ীগুলি সংযত ও স্থির হইয়া থাকে। ইহার একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত এই যে, আমাদের চক্ষু মধ্যে কিছু পড়িলে, সাধারণ যে উত্তেজনা হয়, তাহার ফলে চক্ষু-পল্লব আপনা-আপনি ঘন ঘন পড়িতে থাকে; কিন্তু যদি আমরা ঈক্ষা করি যে, পল্লব পড়িতে দিব না, তাহা হইলে পল্লব স্থির রাখিতে পারা যায়। দেহ-মধ্যস্থ সকল নাড়ীই যদি স্ব স্ব প্রধান হইত, তাহাদিগকে সংযত করিবার যদি কোন উপায় না থাকিত, তাহা হইলে দেহ মধ্যে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইত অনেকস্থলে আমরা অজ্ঞাতসারে মনের মধ্য দিয়া ঈক্ষা-শক্তির পরিচালনা করিয়া নাড়ীগুলিকে সংযত করিয়া দেহকে বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিয়া থাকি; সুতরাং আমরা জ্ঞাতসারে আমাদের ঈক্ষা-শক্তি মনের মধ্য দিয়া প্রবল ভাবে পরিচালিত করি, তাহা হইলে নাড়ীগুলি সংযত হইবে। তখন বাহ্যজগতের কোন প্রকার স্পন্দন আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবে না। ইহা অসম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় লিখিয়াছেন :—"... সুতরাং দেখা যায় যে, স্নায়ু-সূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ ইচ্ছানুক্রমে (১) হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।......বাহিরের শক্তি দ্বারা যাহা ঘটিয়া থাকে, ভিতরের শক্তি দ্বারাও অনেক সময় তাহা সংঘটিত হয়। বাহিরের আঘাতে হস্তপেশী যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, ভিতরের ইচ্ছায় (২) সেইরূপ সঙ্কুচিত হয়। উল্টা রকমের হুকুমে হাত শ্লথ হইয়া থাকে। ইহাতে দেখা যায় যে, স্নায়ু-সূত্রে আণবিক সন্নিবেশ ইচ্ছা-শক্তি (৩) দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে। তাহা হইলে ভিতরের শক্তিবলেও স্নায়ু-সূত্রে উত্তেজনাপ্রবাহ বর্দ্ধিত বা সংযমিত হইতে পারে, তবে এই দুইপ্রকার আণবিক সন্নিবেশ করিবার ক্ষমতা বহুদিনের অভ্যাস ও সাধনা সাপেক্ষ। শিশু প্রথমে হাঁটিতে পারে না, কিন্তু অনেক দিনের চেষ্টা ও অভ্যাসের ফলে চলা-ফেরা স্বাভাবিক হইয়া যায়। সুতরাং মানুষ কেবল অদৃষ্টের দাস নহে—তাহারই মধ্যে এমন এক শক্তি নিহিত আছে, যাহা দ্বারা সে বহির্জ্জগতে তাহারই ইচ্ছানুসারে বাহির-ভিতরের প্রবেশ-দ্বার কখনও উদ্‌ঘাটিত, কখনও বা অবরুদ্ধ করিতে পারিবে।

(১), (২) ও (৩) আমরা যাহাকে "ঈক্ষা-শক্তি" নামে অভিহিত করিয়াছি, জগদীশচন্দ্র তাহাকেই "ইচ্ছা-শক্তি" বলিয়াছেন।

অন্য প্রকারে সে বাহিরের সর্ব্ব বিভীষিকার অতীত হইবে, অন্তর-রাজ্যে সে স্বেচ্ছাক্রমে বাহিরের ঝঞ্ঝার মধ্যেও অক্ষুব্ধ থাকিবে।" (অব্যক্ত)

তারপর সদ্-গুরু বলিতেছেন :—

এই শেষোক্ত বিবৃতী [মনের দ্বারা নাড়ীগুলির সংযমসাধন] কষ্টসাধ্য,কারণ যখন তুমি সাধন-পথের জন্য নিজকে প্রস্তুত কর, তখন তোমার দেহ তীক্ষ্ণতর অনুভূতি-শক্তিবিশিষ্ট না হইয়া যায় না। সে-জন্য তোমার দেহের নাড়ীগুলি কোন শব্দ বা কোন ধাকায় সহজেই উত্তপ্ত হইয়া পড়ে ও সামান্য কষ্টকে তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করে। কিন্তু তোমাকে তোমার যথাসাধ্য করিতে হইবে।

নাড়ীগুলিকে সংযত ও স্থির করা কঠিন; কারণ ইহাদের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র হইয়েছে স্থূলদেহ ; আর এই স্থূলদেহের উপর মন--যাহা দ্বারা নাড়ীগুলি সংযত হইতে পারে —সহজে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। মনের দ্বারা সূক্ষ্মদেহগুলিকে অর্থাৎ প্রাণময় ও মনোময় কোষকে বরং সহজে সংযত করিতে পারা যায়, কিন্তু স্থূলদেহ বা অন্নময় কোষকে সহজে সংযত করা যায় না ; কারণ সূক্ষ্মদেহগুলি সূক্ষ্মতর উপাদান অপ্ ও অগ্নিতত্ত্বে গঠিত বলিয়া সম্বাদী অর্থাৎ সহজে সাড়া দেয়, কিন্তু স্থূলদেহ স্থূল উপাদান ক্ষিতিতত্ত্বে গঠিত বলিয়া অসম্বাদী অর্থাৎ সহজে সাড়া দেয় না, সেইজন্য ইহাকে সংযত করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। তাহার উপর উচ্চতর স্পন্দনে সাড়া দিবার উপযুক্ত করিবার জন্য অধ্যাত্ম-বিদ্যার্থী বিশুদ্ধ আহার-বিহার, ধ্যান-ধারণা আদি দ্বারা যতই তাহার দেহকে সংস্কৃত করিতে থাকে, ততই ইহা তীক্ষ্ণতর অনুভূতি-শক্তিসম্পন্ন হইতে থাকে। আর যতই ইহা তীক্ষ্ণতর অনুভূতিশক্তিসম্পন্ন হয়, ততই ইহাকে সংযত করা কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ তখন ইহা সামান্য শব্দ বা আঘাতেই অভিভূত হয়, যে শব্দকে সাধারণ মানুষ ভ্রূক্ষেপও করে না, সেই শব্দ তীক্ষ্ণতর অনুভূতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যন্ত্রণাপূর্ণ অনুভব করে। মৎস্য-মাংসভোজী ও মদ্য এবং ধূমপায়ী ব্যক্তির নিকট অবস্থান করাও তাহার পক্ষে অস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয়। অনেক পীড়া আছে, যাহাতে নাড়ীগুলি অতিশয় অনুভূতি-শক্তিসম্পন্ন হইয়া পড়ে, এরূপ অবস্থায় এমন কি, কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনিয়া রোগীর আক্ষেপ (Convulsion) হইতে থাকে। নাড়ীগুলি যে কিরূপ তীব্র অনুভূতি-শক্তিবিশিষ্ট হয়, এবং এরূপ হইলে, ইহাদিগকে সংযত ও স্থির রাখা যে কিরূপ কঠিন, ইহা তাহারই একটা দৃষ্টান্ত।

কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যার্থীর নাড়ীগুলি কোনরূপ পীড়া-গ্রস্ত নয়—যদি হয়, তাহা হইলে সে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে পারে না—তাহার নাড়ী কষা বা টানা (tense) দড়ির মত সামান্য আঘাতেই স্পন্দিত হইতে থাকে, সে-জন্য ইহাদিগকে সংযত করা তাহার পক্ষে নিরতিশয় কঠিন হয়, তথাপি ইহার জন্য তাহাকে তাহার যথাসাধ্য করিতে হইবে— ইহাই সদ্-গুরুর বাণী। আমরা ইহাতে পুনঃ পুনঃ বিফল হইতে পারি, কিন্তু তাহাতে কিছু যায়-আসে না। তিনি চাহেন যে, আমরা যথাসাধ্য করি।

তারপর সদ্‌গুরু বলিতেছেন :—

মনঃ-স্থৈর্য্যের অর্থ সাহসও বটে, ইহার ফলে তুমি নির্ভয়ে সাধন পথের দুঃখ ও পরীক্ষাগুলির সম্মুখীন হইতে পারিবে।

মন স্থির হইলে, কোন প্রকার মনোবৃত্তি দ্বারা ইহা বিন্দুমাত্র আলোড়িত না হইলে, সেই স্থির মনে "অমৃত" ও "অভয়" আত্মার স্বরূপ দর্শন হয়। মানুষ তখন নিজকে অমৃত ও অভয় আত্মা বলিয়া উপলব্ধি করে। কাজেই তখন সকল প্রকার ভয় বিদূরিত হয় ও সাহস জন্মে।

সাধনার পথে প্রবেশ করিতে হইলে অধ্যাত্মবিদ্যার্থীকে সকল প্রকার ভয় দূরীভূত করিয়া অবিচলিত সাহস অর্জ্জন করিতে হইবে ; কারণ সাধনার পথে প্রবেশ করিলে সাধককে নানাপ্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ইহা অনিবার্য্য। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। মানুষ যতদিন সাধারণ মানবের স্তরে থাকে, যতদিন না সে মুমুক্ষু হইয়া অধ্যাত্মবিদ্যালাভের জন্য সাধনার পথে প্রবেশ করে, ততদিন তাহার জন্ম-জন্মান্তরের "সঞ্চিত" কর্ম্ম ক্রম-বিকাশের সাধারণ নিয়মানুসারে শত শত জন্মে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং এইরূপে যখন তাহার সমস্ত "সঞ্চিত" কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন সে সংসার-চক্র হইতে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু যে-ব্যক্তি সত্বর মোক্ষলাভ করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণ মানবের স্তর অতিক্রম করিয়া সাধনার পথে প্রবেশ করে, তাহার সেই জন্ম-জন্মান্তরের "সঞ্চিত" কর্ম্মসমূহ,—যাহা সাধারণ নিয়ম অনুসারে তাহার শত শত জন্মে ক্ষয়প্রাপ্ত হইত—তাহা কয়েক জন্মে ক্ষয় করিবার আবশ্যক হয় ; নতুবা সে সত্বর মোক্ষলাভ করিতে পারে না। সেইজন্য

সাধনার পথে প্রবেশ করিলে, সাধককে তাহার পূর্ব্ব-জন্মের অশুভ কর্ম্মসমূহ ক্ষয় করিবার জন্য রোগ, শোক, ব্যাধি, দারিদ্র্য, দুর্ণাম, অপমান প্রভৃতি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়, এই সব দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হইবার জন্য, স্বস্থান হইতে বিচ্যুত না হইবার জন্য, লোকে তাহার সম্বন্ধে যাহাই বলুক, যাহাই করুক, যাহাই ভাবুক, তাহাতে দৃকপাত না করিয়া, তাহার নিজের নিকট যাহা ন্যায় ও সত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাই করিবার জন্য, তাহার যথেষ্ট নৈতিক ও মানসিক সাহস আবশ্যক প্রকৃত ভৌতিক সাহসও আবশ্যক। সাধন পথে এমন কতকগুলি বিপদ ও কষ্ট আছে, যাহা আদৌ সাঙ্কেতিক বা উচ্চতর জগৎসংক্রান্ত নয়, আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রসর মধ্যে সাহস ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা আসিবেই আসিবে। সেইজন্য অধ্যাত্মবিদ্যার্থীকে পূর্ব্ব হইতেই ভয়হীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বলিয়াছেন :—

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারি ব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত তৎপরঃ॥ গীতা ৬।১৪

"ভয়হীন হইয়া শান্ত-চিত্তে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়া এবং মনকে সংযত করিয়া আমাগত-চিত্ত ও আমাপরায়ণ হইয়া যোগ-রত হইবে।"

সর্ব্ববিধ ভয়হীন হইবার—অবিচলিত সাহস লাভ করিবার একমাত্র উপায় ব্রহ্মের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করা। ভয় হয় কাহার? ভূতাত্মার বা দেহের—প্রকৃত আত্মার নহে। কারণ, "এতদমৃতমভয়মেতদ্" (ছান্দোগ্য ৪।১৫।১)—ব্রহ্ম অমৃত ও অভয়, এবং আমরা যখন সেই "অভয়" ব্রহ্মের অংশ, তখন আমরাও স্বরূপতঃ অভয়। কিন্তু আমরা আমাদের আত্ম-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভূতাত্মার সহিত আমাদিগকে একীভূত করিয়াছি বলিয়া ভয় পাই। উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন যে, জীব যখন সেই "অভয়" ব্রহ্মের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করে, তখন "সোঽভয়ং গতো ভবতি" সে ভয়হীন হয়, কিন্তু যখন সে ব্রহ্মের সহিত নিজের ভেদ দর্শন করে, তখন "তস্য ভয় ভবতি" (তৈত্তি, ২।৭।১)—তাহার ভয় হয়। সুতরাং যত দিন না আমরা সেই "অভয়" ব্রহ্মের সহিত আমাদের একত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, তত দিন আমরা সম্পূর্ণরূপে অভয় হইতে পারি না। আমরা বলিয়া থাকি বটে :—"অহং ব্রহ্মাঽস্মি"—"আমি ব্রহ্ম"; কিন্তু তাহা আমরা মুখে বলিয়া থাকি মাত্র,—অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারি না। সেইজন্য আপদ-বিপদ উপস্থিত হইলেই আমরা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। কিন্তু এই ভয়ে অভিভূত না হইবার জন্য আমাদিগকে সেই "অভয়" ব্রহ্মের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিবার দৃঢ় প্রচেষ্টা করিতে হইবে। উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন, এতদমৃতমভয়ং শান্ত উপাসীত"—অমৃত ও অভয় ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া শান্ত হও। এতদর্থে আমরা যদি প্রত্যহ প্রাতঃকালীন ধ্যানের সময় "ব্রহ্মৈবাহং সমঃ শান্তঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ"—"আমি বিচারহীন শান্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" ধ্যান করি ও ইহা উপলব্ধি করিবার জন্য অনন্যরিক্ত-ভাবে কিছু দিন প্রচেষ্টা করি, তাহা হইলে ইহার ফলে যে শক্তি লাভ হইবে, তাহার কতকাংশ সমস্ত দিন আমাদের সহিত থাকিবে ও সেজন্য প্রাত্যহিক জীবনে আপদ-বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাতে আমাদিগকে অভিভূত হইতে না দিয়া ইহার সম্মুখীন হইবার জন্য সাহস প্রদান করিবে। ইহা ভিন্ন সাহস অর্জ্জনের অন্য উপায় নাই।

আরও এক কথা। আমাদের মধ্যে যে আত্মা বিরাজমান আছেন,

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ং ক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ গীতা ২।২৪

"তিনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, ও অশোষ্য, কারণ তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থির, অচল ও সনাতন" সুতরাং আমরা যদি উপলব্ধি করি যে, আমরা সেই আত্মা—বাহ্য-দেহ নহি, তাহা হইলে আমাদের কোন ভয় আসিতে পারে না। কিন্তু ইহাও উপলব্ধি করিবার সামর্থ্যও আমাদের সকলের সমানভাবে নাই। জীবাত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি যাহার যত বেশী প্রবুদ্ধ হইয়াছে, তাহার ইহা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য তত বেশী। মূলতঃ আমরা সকলেই সমানভাবে শক্তিমান, কারণ "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্" (গীতা ১৩।২৭)—'এক পরমেশ্বর সকল জীবের মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান'। কিন্তু আত্মার অভিব্যক্তির ক্রমের তারতম্য আছে। যখন আমরা

সেই আত্মা, তখন আমরা জানি যে, আমাদের সেই আত্মার অপ্রবুদ্ধ শক্তির পরিমাণের উপর আমাদের শক্তি ও দুর্ব্বলতা নির্ভর করে। সুতরাং যখনই কোন ভয় অনুভূত হউক না কেন, তখন বাহির হইতে অন্য কাহারও সাহায্য প্রার্থনা না করিয়া নিজের অন্তর হইতেই অধিকতর শক্তি বাহির করা কর্ত্তব্য; কারণ আমদের মধ্যেই সেই শক্তির উৎস বিদ্যমান আছে। কিন্তু "নাভি কা সুগন্ধ মৃগ নাহি পাওত ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোই"—মৃগ যেমন নিজের দেহস্থিত নাভিকে সুগন্ধের উৎস না জানিয়া সুগন্ধের সন্ধানে ব্যাকুলভাবে ইতঃস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করে, অজ্ঞ মানব ভয়াভিভূত হইলে নিজের অন্তরস্থ শক্তির উৎস ত্যাগ করিয়া অপরের নিকট সাহায্যলাভের জন্য ব্যাকুল হয়।

আপদ্-বিপদের সময় অনেকে সদ্গুরুর নিকট রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন। সদ্গুরুর চিন্তা সর্ব্বদা আমাদের নিকটে আছে, তাহার সন্দেহ নাই এবং আমাদের প্রার্থনা যে তাঁহার নিকট পৌছিতে পারে ও তাঁহার সাহায্য যে আমরা পাইতে পারি, ইহাও নিশ্চিত। যিশু খৃষ্ট বলিয়াছেন, "যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহা প্রাপ্ত হইবে।" কিন্তু যে কার্য্যটী আমাদের নিজে করিবার জন্য সমর্থ হওয়া উচিত, তাহার জন্য তাঁহাকে আমরা উত্যক্ত করিব কেন? ইহা সত্য যে, যদি আমরা ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমরা রক্ষার জন্য, শক্তির জন্য তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারি, কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমরা যদি আমাদের অন্তরস্থ ঈশ্বরকে স্মরণ করি ও অধিকতর শক্তি বাহির করিতে পারি, তাহা হইলে সাহায্যের জন্য ক্ষীণভাবে তাহাকে আহ্বান করিয়া যাহা করিতে পারিতাম, তাহা অপেক্ষা ভাল করিব ও তাঁহার অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইব। ইহা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার অধিকার বা অনধিকারের কথা নয়। কিন্তু সেই "অহেতুক দয়াসিন্ধু" সদ্গুরু "জনানহেতুনান্যানপি তারয়ন্ত"—জগতের বহু নর-নারীগণকে ভব-সাগর হইতে ত্রাণ করিবার জন্য যে কিরূপ ব্যস্ত আছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমাদের ব্যক্তিগত আপদ্-বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা করা উচিত নয়, বিশেষতঃ আমাদের নিজের মধ্যেই যখন শক্তির ভাণ্ডার আছে, এবং তাহা হইতে আমরা নিশ্চিতই শক্তি বাহির করিতে পারি। ইহা করিতে অকৃতকার্য্য হওয়ার অর্থ:—বিশ্বাসের অভাব—নিজকে ও নিজের ঐশী-শক্তিতে বিশ্বাসের অভাব। কিন্তু "যে নিজের জন্য সাহায্য করে, ঈশ্বর তাহারই সাহায্য করেন।"

তারপর সদ্-গুরু বলিতেছেন :—

মনঃ স্থৈর্য্যের অর্থ মনের অটলতাও বটে, ইহার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে যে-সকল দুঃখকষ্ট আসে, তাহা তুমি তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিবে, এবং অনেক লোকে সামান্য সামান্য বিষয়ে যে-সব উদ্বেগ করিয়া তাহাদের অধিকাংশ সময় কাটায়, সেই সব বিরামহীন উদ্বেগ হইতে তুমি রক্ষা পাইবে।

মন স্থির হইলে, সেই স্থির মনে অবিকারী আত্মার স্বরূপ দৃষ্ট হয়, তখন মানুষ দুঃখ-কষ্টে বিচলিত না হইয়া অটল থাকে।

অধ্যাত্ম বিদ্যার্থীর জীবনের উপর দিয়া যে-সব কাল-বৈশাখীর ঝড় বহিয়া যায়, তাহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য মনের যেরূপ সাহস আবশ্যক, তাহাদের দাপটে ভাঙ্গিয়া না যাইবার জন্য সেইরূপ অটলতাও আবশ্যক; সকল প্রকার মানসিক কষ্টের মধ্যে উদ্বেগই জঘন্যতম। কারণ মানুষকে ধ্বংস করে উদ্বেগ—পরিশ্রম নহে। সেইজন্য প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :—"চিতা ও চিন্তার (দুশ্চিন্তার) মধ্যে চিন্তা (দুঃশ্চিন্তা) গরীয়সী, কারণ চিতা মৃতকে দগ্ধ করে, কিন্তু চিন্তা (দুশ্চিন্তা) জীবিতকে দগ্ধ করে।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান যুগ উদ্বেগ ও সম্বেগের যুগ—অধিকাংশ ব্যক্তি কোন না কোন বিষয়ে উদ্বিগ্ন। কিন্তু কোন বিষয়ে উদ্বেগ আসিলে, প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, সেই বিষয়টীর প্রতিকারের কোন উপায় আছে কি না, যদি থাকে ও তাহা যদি আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে তাহা আয়ত্ত করিতে হইবে; আর যদি কোন উপায় না থাকে, থাকিলেও তাহা অনায়াত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া নিরর্থক। অনেকে অতীত বিষয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হন। তাঁহারা বলেন, "যদি ইহা করিতাম (বা না করিতাম), তাহা হইলে এরূপ ঘটিত না।" তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা যখন করা হইয়া গিয়াছে (বা

করা হয় নাই) তখন তাহার জন্য চিন্তা করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব। এমত অবস্থায় "গতস্য শোচনা নাস্তি"—এই মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া নিরুদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। আবার অনেকে ভবিষ্যতের জন্য উদ্বিগ্ন। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্যও উদ্বিগ্ন হওয়া সমানভাবে নিরর্থক, কারণ ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, তাহা জানি না, তাহা ঘটিতেও পারে, নাও ঘটিতে পারে। সুতরাং তাহার জন্য এখন হইতে উদ্বেগানলে দগ্ধ হওয়া বিজ্ঞের কার্য্য নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক লোক ভাবী সম্ভাব্য বা অতীত ঘটনার বা অন্য কোন ঘটনার উদ্বেগে সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকে, আর দিবাভাগের ত কথাই নাই। কিন্তু উদ্বেগে মন ক্ষিপ্ত ব্যক্তির ন্যায় উদ্দেশ্যবিহীনভাবে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়। মনের এরূপ ধাবনের পরিণাম নিশ্চয়ই মারাত্মকভাবে অনিষ্টকর। মনের উপর উদ্বেগের এই নিশ্চিত অনিষ্টকারিতা ও অসারতা বুঝিয়া উদ্বেগ অপরিহার্য্য-ভাবে পরিত্যাগ করা ও ইহার পরিবর্ত্তে ঈশ্বরের অপার করুণা ও মঙ্গলময়ত্বে ও অখণ্ডনীয় কর্ম্ম-বিধিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্থির হওয়া উচিত। জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হইলেও অকারণ নয়, নিরর্থক নয়। সকল ঘটনার মূলেই একটী কারণ আছে ও একটী মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত আছে। বিনা উদ্দেশ্যেও কারণে বৃক্ষের একটী ক্ষুদ্র পত্রও ভূমিতে পতিত হয় না, ঘটনামাত্রই কার্য্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত। সকল ঘটনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য—জীবের কল্যাণ সাধন। জগতে আকস্মিক ঘটনা বলিয়া কিছু নাই—থাকিতে পারে না। যাহাকে আমরা আকস্মিক ঘটনা বলি, তাহার মূলে একটা কারণ আছেই আছে, যদিও তাহা আমরা স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে পাই না; কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতেই পারে না। এক জন সুধা-ধবলিত প্রাসাদে অগাধ সুখ ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সুখভোগ করিতেছে, আর একজন পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র ভিক্ষুক একমুষ্টি অন্ন ও ছিন্ন কন্থার জন্য দ্বারে দ্বারে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে—এগুলি কি আকস্মিক ঘটনা? আমি জীবনে প্রতিপদে লাঞ্ছিত, অপমানিত, নিগৃহীত হইতেছি,—যে কাজ করি, তাহাতেই বিফল হই—"অভাগা যে-দিকে চায়, সাগর শুখায়ে যায়"; আর একজন পদে পদে কৃতকার্য্য, সম্মানিত, পূজিত ও প্রশংসিত হইতেছে—তাহার "ধুলিমুঠি সোনামুঠি" হইয়া যাইতেছে। এগুলি কি আকস্মিক ঘটনা? না, সমস্তই আমাদের অতীতের স্বকৃতকর্ম্মের ফল।

এপ্রিল ফুল

(গল্প)

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আদি

শাঁখারীটোলায় ফাল্গুনদাস লেনের একটা মেস-বাড়ীতে সেদিন বন্ধুমহলে আলোচনা চলেছিল,—কেমন ক'রে এই এপ্রিল মাসটা সব দিক দিয়েই সার্থক ক'রে তোলা যায়।

বন্ধুদের মধ্যে নিরীহ অচিন্ত্যই প্রথমে ব'লে উঠ্‌ল—আচ্ছা এই সামনের ছুটীতে পুরীতে গেলে হয় না? —পুরী যায়গায়টাও নেহাৎ…

এ দলের অগ্রণী সীতুদা ওরফে সীতানাথ একগাল হেসে ব'লে উঠ্‌ল—কেন হে, পুরীর পারে অত টান কেন?—তোমার শ্রীমতী সেখানে আছেন তা' আমাদের কি?…

—কথাটার মধ্যে একটু ইতিহাস আছে। শ্রীমান্ অচিন্ত্যকুমার সত্তঃবিবাহিত। শ্রীমানের শ্বশুরালয়ের সকলেই গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে রেহাই পাবার জন্যে সকাল সকাল সাগরকূলে পাড়ি দিয়েছেন।…অচিন্ত্য-গৃহিণীও ওঁদের সাথে আছেন।…

সীতুদার কথায় সবাই হেসে উঠ্‌ল। বন্ধুদের মধ্যে কবি-যশ-প্রার্থী উদীয়মান সাহিত্যিক শ্রীকোরক রায় (নবীন কবি সম্প্রতি কবিতা ছাড়িয়া গল্পে হাত দিয়াছেন—দু' একখানি মাসিকেও তাহার লেখা বাহির হয়। ইহা ছাড়াও শোনা যায় কোরককুমার রায় স্থলে আধুনিক আওতায় পড়িয়া কেবল মাত্র কোরক রায় হইয়াছেন এবং মাথায় বাবরী রাখিয়া আপনাকে মস্ত বড় আর্টিষ্ট বলিয়া পরিচয় দেন, এতক্ষণ তাঁহার স্বভাব গাম্ভীর্য্য নিয়ে চুপ ক'রেই ছিলেন কিন্তু, এ হেন সীতুদার আশ্চর্য্য সত্য-আবিষ্কারে সবুজ কবির বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল—You are quite right Situ Da, I support you in every respect. (খাঁটী কথা বলেছ সীতু-দা আমি সব দিক থেকে তোমার প্রস্তাব সমর্থন করছি)…বন্ধুদের হাসির হর্‌রা এখনও থামে নি।…

Oriental Artist প্রাচ্যকলাশিল্পী মনোজ (ইনি অহীন্ চৌধুরী এবং শিশির ভাদুড়ীর আর্টকে একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া বন্ধুমহলে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন) বলে উঠ্‌ল—আ—রে, ওসব কথা ছেড়ে দাও এখন!…একটা মতলব আমার মাথায় এসেছে হে,—এটা যদি হয় ভারী মজা হ'বে কিন্তু…

উপস্থিত বন্ধুবর্গের সবাই সমান উৎসুকভাবে মনোজের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে—কি,—কি…

মনোজ বিশিষ্ট বিজ্ঞের মত ব'লতে লাগ্‌ল—তোমরা সবাই বোধ হয় জান অচিন্ত্যদা সত্ত্যঃ-বিবাহিত; দাদা আমার, বৌদির সম্বন্ধে প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন যে, বৌদি নাকি তার সম্বন্ধে একরূপ উদাসীনই;—অর্থাৎ শ্রীমতী বৌদি দাদার অজ্ঞাতেই সমুদ্র-কূলে পাড়ি দিয়েছেন।…আজ প্রায় দু'মাস হ'ল—একটা চিঠি দিয়েও দাদার—মানসিক তো দূরের কথা—শারীরিক কুশলও নেন্ নি।…সুতরাং…এ ক্ষেত্রে দাদাকে দিয়ে এমন কিছু একটা করাতে হ'বে যা'তে পুজনীয়া বৌদির একটু হুঁস হয়, আর দাদাও এই দীর্ঘ বিরহের পর একটু মধু-বসন্তের আস্বাদ পান।

…দাদা ছাড়া উপস্থিত বন্ধুরা সকলেই একবাক্যে মনস্তত্ত্ববিদ্ মনোজের কথা সমর্থন ক'রে নিয়ে ঘাড় নেড়ে বল্লে—হাঁ হাঁ—ভারী মজা হবে তা' হ'লে। আর্টিষ্ট না হ'লে কি আর এমন মাথা খেলে!…কিন্তু কি ক'রে…

—আহা রোস না, দাদার এ বিরহে তোমাদের সহানুভূতি প্রকাশ করা একান্ত কর্ত্তব্য!—আমরা সব সময়েই প্রস্তুত—সকলে সোৎসাহে বলে উঠ্‌ল।

বলা বাহুল্য, দাদা আমাদের নির্[illegible]। সুতরাং, একটু লজ্জার খাতিরেই হোক, অথবা আড়ালে থেকে এই 'রোমান্সটা' অধিকতর শ্রুতি-রুচিকর হ'তে পারে এই আনন্দে দাদা দরদী বন্ধুদের ছেড়ে উঠে গেলেন।

মনোজ পুনরায় ব'লে চলল—যাক্, অচিন্ত্যদা' উঠে গেল ভালই হ'ল।···ভাখ, দাদার শ্বশুর বাড়ীর সবাই পুরী থেকে সম্প্রতি ফিরে এসে ঐ সামনের বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে আছেন। অচিন্ত্যদার শালা সুভাষের সঙ্গে আমার বিলক্ষণ পরিচয় আছে।··শুনলুম, বৌদিও আছেন ঐ বাড়ীতে; কিন্তু দাদা এ-সম্বন্ধে কিছুই জানে না।—সুভাষরাও জানে না যে দাদা এখানে এই মেসে প'ড়ে বৌদির বিরহে ছট্‌ফট্ কচ্ছে।···সুতরাং এক্ষেত্রে দাদাকে দিয়ে একটা কিছু করতেই হবে।—আমি বলি,—ও বাড়ীতে ঐ বারান্দায় যখন বৌদি এসে রেলিং ধ'রে দাঁড়ান ও বেড়িয়ে বেড়ান সেই সময় দাদাকে দিয়ে আমাদের ছাদের ওপর থেকে বৌদির মুখের উপর টর্চ্চ লাইট ফেল্‌তে হ'বে। ·· অম্‌নি ওদের বাড়ীতে হৈ চৈ প'ড়ে যাবে।···দাদাকে কিন্তু এই ব'লে বুঝাতে হ'বে যে—ও বাড়ীর ওই ষোড়শী আইবুড়ো মেয়েটা দাদার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী—তাই থেকে থেকে ঘরের বাইরে এসে বারান্দায় রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে,—বেড়িয়ে বেড়ায়।—আরও দাদাকে ব'লে কয়ে বুঝতে হ'বে যে, বৌদি যখন দাদার মুখের দিকে চাইলে না তখন দাদার এ সুযোগ ত্যাগ করা একান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় হ'বে।—এই দীর্ঘ বিরহের মধ্যে দাদা নিশ্চয়ই রাজী হবে না হ'লে করাতেই হ'বে যে কোন উপায়ে।

হাস্‌তে হাস্‌তে সবাই মনোজের এ হেন উদ্ভাবনী-শক্তিকে তারিফ করতে লাগল'।···

মনোজ পুনরায় ব'ল্‌তে লাগ্‌ল'—আহা, এখুনি হেসে রসভঙ্গ ক'র কেন?···তারপর এ নিয়ে ওদের বাড়ীতে যা' হ'বে তার জন্তে আছি শেষে আমি আর সুভাষ।·· আচ্ছা, এ ব্যাপারটা হ'লে কেমন মজা হ'বে বল তো?

সকলেই প্রশংসদৃষ্টিতে মনোজের দিকে কিছুক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে রইল। সবুজ-সাহিত্যিক কোরক রায় ব'লে উঠ্‌লেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা যদি হয় তো ভারী 'রোমাণ্টিক' হ'বে কিন্তু···Art of Love (প্রেমের আর্টের) দিকে দিয়েও এ যে একটা মস্ত বড় থিওরী,' তা কেউই অস্বীকার ক'র্ব্বে না ব'লে দিচ্চি।···বন্ধুদের মধ্যে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে মনোজের প্রস্তাবটাই বহাল হ'য়ে গেল, আর···অচিন্ত্যদাকে সমস্ত কর্ম্মার ভার প'ড়ল এ কাজে সিদ্ধহস্ত আমাদের সীতুদার ওপর।

মধ্য

তারপর ··

—কয়েকদিন পরের কথা। সন্ধ্যের পর অচিন্ত্য বন্ধুদের প্ররোচনায় ও কতকটা অচিন্তিতার প্রেম-কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে ছাদের ওপর পায়চারী আরম্ভ ক'রে দিল, ও মাঝে মাঝে বাঁশীতে ফুঁ দিতেও সুরু করলে।··· রোজই দেখে, সামনের বাসার মেয়ে হিমানী অর্থাৎ অচিন্ত্য গৃহিণী ওদের এদিককার বারান্দায় এসে বেড়িয়ে বেড়ায়,—কখনও কখনও রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে। ও বাসার পুব দিকের বারান্দাটা আর মেসের ছাদটা প্রায় সাম্‌না সানেই ছিল, এই যা সুবিধে। কিন্তু···

এই দুই বাড়ীর মধ্যে দূরত্বটাও কম ছিল না—আর এর জন্তেই কেউ কাউকে স্পষ্টরূপে চিন্‌তে পারে নি।··

দাদা আমাদের দু' একদিন পায়চারী করতেই নিজে এসে প্রেমের আর্টের ফাঁদে পা দিলেন—নিজে এসেই বন্ধুদের কাছে ও বাড়ীর ওই আকাঙ্ক্ষিতার গুণ গায়িতে আরম্ভ কল্লেন,—কখনও বা ও বাড়ীতে কোনও একটা ছুতো ধ'রে যেতেই চাইছিলেন কিন্তু বন্ধুর দল রসভঙ্গের আশঙ্কায় অতিকষ্টে অচিন্ত্যকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে,—দাদা, ধৈর্য্য ধর,—সবুরে মেওয়া ফলে···

দাদার ধৈর্য্যের গুণেই হোক্ অথবা হিতৈষী বন্ধুদের বন্ধু-প্রীতিতে হোক্ দু'এক দিনের মধ্যেই মেওয়া ফলিল। · অর্থাৎ···

সেদিন সন্ধ্যের একটু পরেই ও বাড়ীর সেই মেয়েটী তার পিসীমার সাথে বারান্দায় বেড়াতে এলেই আত্মহারা অচিন্ত্য প্রেমে ও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে ওবাড়ীর বারান্দায় তারই উদ্দেশ্যে টর্চ্চ লাইট ফেলল। পিছনে ছিল অভয়দাতা সীতুদা ও মনোজ প্রভৃতি।

কিন্তু দাদার এম্‌নি দুর্ভাগ্য যে ফোকাস লাইট তাঁর আকাঙ্ক্ষিতার মুখের উপর না প'ড়ে ঐ রসহীন প্রৌঢ়া পিসীমার মুখের ওপরই পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গেই ও বাড়ীতে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়।

অন্ত

বুড়া পিসীমা মুখে আলো প'ড়তেই চেঁচিয়ে উঠলেন—ওরে,—ও সুভা, ও-চারু, দেখ্‌তো, ঐ সাম্‌নের ছাদ্‌ থেকে কে আলো ফেল্‌ছে···ওমা, কি লজ্জা, ঘেন্নায় মরি, ঘেন্নায় মরি।

ফোকাস্‌ লাইট পড়তেই হিমানী পিসীমার সঙ্গ ত্যাগ ক'রে ঘরের ভিতর ঢুকে যায়—আর অচিন্ত্য, পিসীমার চীৎকারে ভড়্‌কে গিয়ে ছুটে দোতালায় এসে একেবারে পায়খানায় দোর দিয়ে বসল।···

ও বাড়ীর কলরব ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল।···

দেখতে দেখতে সুভাষ প্রভৃতি ছুটে এসে মেস বাড়ী চড়াও করে—কিন্তু কেউই কিছু স্বীকার করতে চায় না।...

পায়খানার দুর্গন্ধ অধিকক্ষণ সহ্য ক'তে না পেরে অচিন্ত্য বাইরে আস্‌তেই মনোজ হাস্‌তে হাস্‌তে তা'র দিকে দেখিয়ে বল্ল—ওই যে আসামী!

সুভাষ আচিন্ত্যকে দেখেই বিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌ল—আচিন্ত্য!—এখানে কোত্থেকে?

* * *

—তারপর অচিন্ত্যকে সঙ্গে নিয়ে সুভাষ বিজয়ী বীরের মত বাড়ীর ফটকের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—আসামী ধ'রে এনেছি পিসীমা!—

···বাড়ীর একদল ছেলে-মেয়ে ছুটে নেমে এল' আসামী দেখ্‌তে।···

···ওমা,—একি গো, অচিন্ত্য যে!—সবারই মুখে বিস্ময়-পুলক ফুটে উঠ্‌ল!

—সুভাষের মুখে আসামীর অপরাধ শুনে সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন।···শালীর দল ব্যাচারী-দাদার কান দু'টী অস্বাভাবিক রকম লাল ক'রে দিয়েছিলেন—বাক্য-বাণে বিদ্ধ করতেও কসুর করেন নি।

·· বলা বাহুল্য, বেশী রাত হ'য়ে যাওয়ায় সে রাত্রে দাদা আমাদের, হিমানীর প্রেম-কারায় কয়েদী হ'য়েছিলেন।

জেনেভা-ভ্রমণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্যর শ্রী:দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

রবিবার, ১৯ অক্টোবর, ১৯৩০

বম্বে এটর্ণী-সভার সম্পাদক মিঃ নারায়ণ পাণ্ডে বম্বেতে দুইদিন থাকিয়া এটর্ণী সম্প্রদায়ের কনফারেন্সের যে সব কাজ বাকী আছে তাহার আংশিক আলোচনার জন্য লিখিয়াছেন। সহসা বম্বে আসা সম্ভব হইবে না বলিয়া ইহাতে স্বীকার করিয়াছি। বম্বে হইতে ছাড়িবার সময় তাহারা এ কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু বম্বেতে গোলমাল যেরূপ বাড়ীতেছে তাহাতে এ সকল কাজ-কর্ম্ম ধীরে সুস্থে করিবার সময় ও সম্ভাবনা কোথায়—দেশের সাধারণ বিপদে সকলেই ব্যস্ত, এ সকল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিষয়ে সংযতভাবে মন দেওয়া সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ।

এডেন হইতে পূর্ব্বমুখ হইয়া জাহাজ দ্রুত চলিতে পারিতেছে না—জোর হাওয়া বাধা দিতেছে। গরম ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে, জাহাজ যত পুরাতন শুনিয়াছিলাম তত নয়। ইলেকট্রিক পাখা নাই; তাহার পরিবর্ত্তে আছে বড় বড় নলে করিয়া ঘরে ঘরে জমাট ঠাণ্ডা হাওয়া বিতরণের ব্যবস্থা, যে দিকে ইচ্ছা নল ঘোরান যায়, কিন্তু ঘর ঠাণ্ডা হয় না। এক জায়গাতেই হাওয়া লাগে।

সোমবার, ২০ অক্টোবর, ১৯৩০

আজ ভূত চতুর্দ্দশী—আগামী কাল অমাবস্যা, কালী পূজা—বম্বে পৌছিব। বৃহস্পতিবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। বম্বে হইতে যাত্রার দ্বিতীয় দিবসে হইয়াছিল জন্মাষ্টমী, পথে পথেই সব পাল পার্ব্বণ কাটিতেছে। ভবঘুরের দশাই এই। এ বয়সেও আমাতে ইহা বিশেষ প্রযোজ্য। তিনবার বিলাত, একবার দক্ষিণ আফ্রিকা, একবার বর্ম্মা, একবার সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, তারপর কতবার বম্বে, লাহোর, সিমলা, দিল্লী, গৌহাটী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি ঘুরিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। ভূত হাজার হাজার মাইল জলে স্থলে ঘুরিলাম, পাইলাম কি তা জানি না। যিনি ঘুরাইতেছেন তিনিই জানেন। আমি পাই নাই কিছু, খুজি নাই কিছু। যখন যে কাজে ভাগ্যবিধাতা ফেলিয়াছেন বিনা দ্বিরুক্তিতে তাহা করিয়া গিয়াছি। হৃদিস্থিত হৃষীকেশ তাঁহার কাজ জানেন বোঝেন করেন, আমার এই নেশার মধ্যে দিয়াই তাঁহার কাজ।

আর কিছু করিতে পারি বা না পারিয়া থাকি, দেশের কোন কাজ হউক না হউক যেখানে ব্যথা পৌছায় ও খুবলাগে সেখানে যথেষ্ট ব্যথা দিয়াছি—এটা ধ্রুব স্থির. আর সকল আপদ-বিপদ কাটিয়া যাইতেছে, সে কেবল সেই ব্যথার মাঝে তন্ময় তপস্যার ফলে। সকল রকমে সুদরিদ্র হইয়া আমি ধন্য।

অশ্রান্ত অক্লান্তগতিতে আবহমান কালের সাগর চলেছে—মানবকে সে তার মহান্ কর্ত্তব্য শিখাচ্ছে নিশিদিন যুগ যুগান্ত ধরে। ক্যাবিনে শুয়ে এবং ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নরনারীর স্রোতের মাঝে আমি ক্ষুদ্র তৃণের মত মহাস্রোতে ভেসে যাবার অনুভূতি পেয়ে আমি একটা আশ্বাস ও অভয়বাণী পাই। ষাট হাজারের মাইলের বেশী বোধ হয় জলভ্রমণ হয় নি। প্রতি উত্তাল তরঙ্গের তলে তালে যেন মনে হয় আমি স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্য দিয়া জীবনের আদি হ'তে এই তরঙ্গেরই মত উঠিতেছি পড়িতেছি ছুটিতেছি। কোথায় অন্ত কে জানে?

স্যর জাহাঙ্গীর কয়াজী রান্নাবান্না ও Special Dishএর তদ্বির খুব করিতেছেন—পোলাও, কালিয়া, খিচুড়ী, পায়স (চৌদ্দ শাঁক না জুটুক) অনেক রকম সব্জী ভূত-চতুর্দ্দশীর মহিমা রক্ষা করিয়াছে। সাহেব বা মেমদের কাছে ভূত-চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জন্মাষ্টমী প্রভৃতির তথ্য আলোচনা করিতেছি। বুঝাইলে অনেকে বোঝে, কেহ কেহ চমকিত ও মোহিত হয়। তার প্রেমীর

ইংরেজ স্ত্রী ও পুরুষের ভারতে যথেষ্ট প্রয়োজন। সখ্যতা ও শান্তিসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইলে পরস্পরের বোঝা-পড়া নিতান্ত আবশ্যক। বিনাতারে যে সকল সংবাদ জাহাজে পৌছিতেছে তাহাতে বোঝা-পড়ার চিহ্ন তো কিছু নাই। বম্বের অবস্থা শোচনীয়, সর্ব্বত্রও তাই।

মঙ্গলবার ২১ অক্টোবর, ১৯৩০ অমাবস্যা

জাহাজের জোর বাড়িতেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪২৮ মাইল দৌড় করিয়াছে। জাহাজের দৌড়ের পরিমাণ উপলক্ষ্য করিয়া অনেক জুয়া-বাজী-খেলা হইতেছে। দেওয়ালী পর্ব্ব এইরূপেই রক্ষিত হইতেছে। কালরাত্রে "গুপ্তধন অন্বেষণের" দৌড় ধাপে রাত বারটা পর্য্যন্ত কাটিয়াছে। জাতটা আমোদ-আহ্লাদে বিশেষ পারদর্শী, আজ খেলাধুলা শেষ হইয়া বিজয়ী দলকে পুরস্কার বিতরণ করা হইবে, সুন্দরী যুবতীরা প্রোগ্রাম বেচিয়া বেড়াইতেছে। আসিয়া হাসিয়া দাঁড়াইলেই লইতে হয়। যেমন এসব ব্যাপার চলিয়াছে তেমনি চলিয়াছে স্যার জর্জ অ্যাণ্ডার্সন, মিঃ জষ্টিস ম্যাকফারসন, কর্ণেল উইওহ্যাম, প্রোফেসর ক্রস, কর্ণেল কণ্ট্রাক্টর, কর্ণেল কারউইলের সহিত নানা বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা, কলিকাতার সদাগর স্মিথ সাহেবের স্ত্রী সেণ্ট এন্‌ড্রুজের গ্রাজুয়েট, তাহার সঙ্গে ও অন্যান্য মহিলাগণের সহিত আলাপ আপ্যায়ন চলিয়াছে।

বুধবার ২২ অক্টোবর, ১৯৩০

জাহাজ খুব চলিয়াছে দিনে ৪০৮।৪০৯মাইল চলিয়াছে। কাল বেলা ৯॥০ টার সময় জাহাজ বম্বে বন্দরে লাগিবার কথা, দেশে যাইতেছি, বাড়ী যাইব ; তবু মন এত নিরুৎসাহ কেন ; এত ভার কেন? দেশের দিন দিন যে সংবাদ আসিতেছে তাহাতে মন ভার ও নিরুৎসাহ হইবে বিচিত্র কি? ভগবান যে জ্ঞান, শক্তি, বুদ্ধি ও ইচ্ছা দিয়াছেন দেশমাতৃকার সেবার চেষ্টায় তাহার ইচ্ছাকৃত ত্রুটী এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্তু কোথাও যেন কিছু খাপ খাওয়াইতে পারিতেছি না। চারিদিকের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া নিরাশার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, ঝাঁসীর কাছে বিস্ফোরক গানকটন (Guncotton) দিয়া আততায়ীর দল রেলপথ দুই চারদিন পূর্ব্বে উড়াইয়া দিয়াছে, কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়েতে এই ব্যাপার হইয়াছে। খুন-খারাপী দাঙ্গা লুট ঘর-জ্বালান জেল নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

উভয় পক্ষেই পাগলের মত ব্যবহার করিতেছে, কর্তৃপক্ষ কি করা উচিৎ তাহার সু-পরামর্শ চাহিলেই বা কি পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত ও কি পরামর্শ গ্রাহ্য হইবে তাহাও তো বোঝা যায় না। যাঁহারা **অহিংস অসহযোগিতা** নামে এই আগুন জ্বালাইয়াছেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলেও এ আগুন আর নিবাইতে পারেন না বলিয়াই বোধ হয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সএ না যাইবার অছিলা খুজিয়া যাইবার দায়িত্ব হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন।

এই তো সব দেশের দশের কথা, পারিবারিক ক্ষেত্রেও চিন্তার যথেষ্ট কারণ—যত ভারতবর্ষের নিকটবর্ত্তী হইতেছি তত চিন্তাভারে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি। রহস্য করিয়া কেহ কেহ বলিলেন যে, যেরূপ সুন্দরভাবে জাহাজ চলিয়াছে—সকলেই যে যে যার নিজের ইচ্ছামত বুঝি আমোদ পাইতেছে ও করিতেছে। তাহাতে মনে হয় আরও কিছুদিন এইরূপে চলিলে হয় ভাল। এত শীঘ্র বম্বে পৌছান কাহার কাহার ভাল লাগিতেছে না, যদি এ বিষয়ে ভোট দিতে হয় তবে কোন পক্ষে ভোট দিব স্থির করা দুঃসাধ্য। জাহাজ চলিতেছে ভাল—হাওয়া ভাল, গরম কাটিয়া গিয়াছে—খাওয়া-দাওয়ার তদ্বির রীতিমত চলিয়াছে—কর্ম্মচারীরা সকলেই আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। P. & O. Companyর অধীনে রাজমাক জাহাজের এই শেষ যাত্রা বলিয়াই বুঝি সকল যাত্রীর সুখ-আনন্দ-সুবিধার জন্য বদ্ধপরিকর।

সহযাত্রীগুলিও ভাল জুটিয়াছে, নূতন কত লোকের সঙ্গে আপ্যায়ন হইল তাহার ইয়ত্তা নাই, কাহারও কাহারও সঙ্গে এ বয়সেও এই চিন্তাভারগ্রস্ত মনেও বন্ধুত্বের সূত্রপাত হইয়া গেল, কোন কাজ নাই কর্ম্ম নাই—চক্ষুর হাঙ্গামার জন্য পড়াশুনার বালাই নাই কেবল চিন্তা আর কথা।

নানান্ লোকের সঙ্গে নানা ছাঁদে নানা ভঙ্গিতে কথা। সর্ব্বত্রই ভাবরাজ্যের আধিপত্য-স্থাপনের চেষ্টা এ স্থানে স্বতঃসিদ্ধ, বহু স্থলেই সে চেষ্টা কৃতিত্ব মণ্ডিত। জজ সম্প্রদায় আছেন, শিক্ষক সম্প্রদায় আছেন, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার

সরকারী কর্ম্মচারী, কণ্ট্রাক্টর, সওদাগর মহাজন সব আছেন, দলে দলের সহিত স্বতন্ত্র কথা অনেক লিখিতেছি; বুঝি বা দেশহিতার্থে কিছু শিখাইতেছি।

এ দিক হইতে দেখিলে ম্লাজমাক জাহাজে যাত্রা নিতান্ত নিষ্ফল হইল না।

Last night of the voyage বলিয়া বিশেষ খ্যাতনামা ইংরেজ শিল্পীর চিত্রপট বহুদিন পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। আজ সেই Last night—সকলেই বিদায় গ্রহণে তৎপর। জিনিস প্যাক ও চিঠি লেখার হাঙ্গামাও খুব চলিয়াছে। কর্ম্মচারীদিগকে বকশীস (tip) কি হারে দেওয়া হইবে তাহার পরামর্শ ও ব্যবস্থা চলিয়াছে, খেলা-ধূলা, আমোদ-আহ্লাদ, ব্যাণ্ড, নাচ ইত্যাদি চলিতেছে। আজ রাত্রি আহারের পর Spanish bandএর আয়োজন। ইংরেজ কাজও জানে আমোদও জানে ও করে।

বম্বে প্রদেশের পুনার নিকটবর্ত্তী ভোর (Bhore) রাজ্যের অধিপতি বিশেষ ভদ্রতা দেখাইছেন ও আদর-আপ্যায়ন করিয়াছেন। নিজ রাজ্যে যাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ আমন্ত্রণ জানাইলেন।

মেয়ের পীড়াপীড়িতে দীর্ঘ সুন্দর ভ্রমণ কথা লেখা হইল, তাহারা ছাড়া আর কেই বা পড়ে বা পড়িবে। যদি তাহারা কিছু আমোদ ও শিক্ষা পায় তাহাই যথেষ্ট। বহু কার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে। শ্রীভগবানের নাম লইয়া বুদ্ধি ইচ্ছা ও শক্তিকৃত নিজ ত্রুটীর সম্যক প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দেশমাতৃকার মহাসেবায় যেন জীবন সন্ধ্যা কাটাইতে পারি—উচ্ছ্বাসে এই কথা লিখিলাম।

বৃহস্পতিবার ২০শে অক্টোবর, ১৯৩০

আজ সমুদ্র যাত্রার শেষ দিন—যেমন হয় তাই হইল। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, আশায় উৎকণ্ঠায়, আশঙ্কায় রাত্রি প্রভাত হইল, ভারতের সূর্য্য আবার ভারত গগনে উদিত দেখিলাম। 'জয় জগদীশ হরে'—নিরাপদে মার চরণ তলে আবার ফিরাইয়া আনিলে প্রভু। প্রিয়জনের আশঙ্কা শঙ্কা, দূর করিলে, তুমি জান আমার কি গন্তব্য, কি পথ, কোথায় গিয়া উঠিব, চক্ষু দৃষ্টিহীন, তুমি না আলো দিলে, শক্তি দিলে কে দিবে?

বম্বের কূলের দৃশ্য ভোরের আলোতেই চ'খে পড়িল / তখন তালীবনরাজি নীলের শোভা কমে নাই বরং বাড়িয়াছে। সৌধ-হর্ম্ম্য-শোভাও অতুলনীয় কিন্তু কি একটা দারুণ অভাব বিরাট শূন্যতায় বুক ভরিয়া যাইতেছে।

জাহাজ থামিবার নাবিবার মামুলী গোলযোগে বহুক্ষণ কাটিল, বিদায়ের পালা দীর্ঘ হইল, বহুলোকের সহিত নূতন পরিচয় হইয়াছে; বহু পুরাতন পরিচয় ঘনীভূত হইয়াছে, চৌদ্দ দিন এক জায়গায় বাসে সাদা-কালার ভেদ অনেক কমিয়া যায়। সুয়েজের পূর্ব্বেই না কি সে প্রভেদ আবার জাগিয়া উঠে, আমার ভাগ্যে তাহা হয় নাই, জাহাজ হইতে নামিবার সময় ও নূতন পরিচয়ের সূত্রপাত অনেক হইল, জাহাজ সময়ের পূর্ব্বেই পৌঁছিল কাজেই বন্ধু-বান্ধব যাহাদের বন্দরে যাইবার কথা তাহাদের পৌঁছিতে বিলম্ব হইল, চুঙ্গী, মাশুল কর্ত্তাদের হাত হইতে মাল খালাস করিতে দৌড়াদৌড়ি করিতে হইল, গলদঘর্ম্ম হইতে হইল। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিবার সময়ও এই কথা মনে হইয়াছিল, বিদেশে আদর-আপ্যায়ন ও সুবিধার অন্ত নাই আর দেশে ফিরিতে না ফিরিতে তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরে।

Incorporated Law Societyর President Mr. Pyne স্বয়ং অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন এবং আসিয়াছিলেন চিরসহিষ্ণু লোকপ্রিয় কর্ম্মঠ নীরব কর্ম্ম সেক্রেটারী নারায়ণ পাণ্ডে মহাশয়। দুই জায়গাতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু পাণ্ডে মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া বাড়ীর মত থাকিয়া সুস্থ হওয়াই শ্রেয় বোধ হইল, বহুকালের পর ডাব খাইয়া ধুতি পরিয়া মাদুরের উপর বসিয়া পান খাইয়া বাঁচিলাম।

এগার সপ্তাহ সাহেবানার পর আর তাজমহল হোটেলে বাস চলিল না।

দশবার জলযাত্রা শেষ হইল, যাঁহার কৃপায় সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি তাঁহার অভয় চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত।

ইজিপ্ট ও অ্যারেবিয়া (Egypt and Arabia) নামক যে দুই জাহাজে প্রথমবার যাওয়া আসা হইয়াছিল, তাহা যুদ্ধের সময় ডুবিয়াছে। একবার (Brindisi) হইতে আইসিস (Isis) নামক জাহাজে পোর্ট সৈয়দ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম

তাহা বিক্রয় হওয়ায় হস্তান্তর হইয়া গিয়াছে। এবার যে জাহাজে আসিলাম রাজমাক (Rajmakh) তাহাও বিক্রয় হইয়া Newzeland চলিয়া গেল। আমায় দয়া করে যাহারা আশ্রয় দেয় তাহাদের অনেকেরই এই দশা।

যাহাদের সনির্ব্বন্ধ আগ্রহে বম্বেতে দুই দিন থাকা স্থির করিয়াছি—যাহাদের পত্র পাইয়া এখানে রহিয়া গেলাম, তাহাদের কেহ কেহ বিষম বিপন্ন। স্বাধীনচেতা—নির্ভীক প্রিয়ভাষী খেয়াব পূর্ব্ব হইতেই জেলে পচিতেছেন; নগেন্দ্র মাষ্টার (Nagendra Master) বিলাত যাইবার সময় মেয়েকে শুদ্ধ সঙ্গে লইয়া গিয়া বন্দরে মালা পরাইয়াছিলেন—অন্তরের শুভ ইচ্ছার সহিত বিদায় দিয়াছিলেন, তিনিও জেলে। পুলিসের অবিমৃষ্যকারিতায় বম্বে শহর থরহরি কম্প। এডেনে আমি পাণ্ডের যে পত্র পাই তাহার পর নগেন্দ্র মাষ্টার কারারুদ্ধ হইয়াছেন,—কার কখন নির্য্যাতন ও কারারোধ হয় কে বলিতে পারে?

স্বয়ং সম্রাট্ Round Table Conference, House of Lords Royal Galleryতে রাজকীয় বক্তৃতার সহিত খুলিবেন। এরূপ সভার আয়োজন—যথার্থ কাজ কতদূর হইবে কে জানে। জনসাধারণ মর্ম্মপীড়িত—উভয় পক্ষেই বুদ্ধির ক্রটী যথেষ্ট হইতেছে।

বম্বেতে দেওয়ালীর ধূমধাম কিছু মাত্র হয় নাই। কোন প্রাণে ধূমধাম হইবে?

শুক্রবার, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৩০

পুরাদস্তুর দেশী ভাবে বেশে ও ধরণে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাইয়া বিশেষ আরাম হইল। Incorporated Law Societyর নারাণ পাণ্ডে পুরা দেশী ভাবের গুজরাটী ব্রাহ্মণ—নিষ্ঠা ও শুদ্ধাচারের পরাকাষ্ঠা, নাগর ব্রাহ্মণদিগের আহারাদি সম্বন্ধে যেরূপ কঠোরতা তাহা পূর্ব্ব হইতে জানা আছে। ইংরেজী হোটেলে কিংবা ব্রহ্মচারী পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করিলে এরূপ স্বাধীন স্বদেশী ভাবের আরাম পাইতাম না।

যেরূপ কাজের মধ্যে বম্বেতে আটক পড়িলাম, তাহার সম্বন্ধে মিটিং কাল বম্বে হাইকোর্টে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, আজ দলে দলের সহিত হইয়া গোলযোগ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। যেখানে যাও—যে বিষয়ে হউক—শুধু তর্ক বাদানুবাদ নয়, আসল ঝগড়া পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে, কাজেই কাজের চেয়ে অকাজই বেশী। ২।৩ দিনে এই সব হাঙ্গামা মিটাইয়া কাল শনিবার রাত্রের বম্বে মেলে কলিকাতা যাওয়া স্থির হইয়াছে। যাহাদের সঙ্গে দেখা হইবার কথা ছিল তাহারা কেহ কেহ Round Table Conferenceএ গিয়াছেন, কেহ কেহ পুণা কিংবা মাথেরান এইরূপ কোন ঠাণ্ডা জায়গায় গিয়াছেন, কেহ বা অন্য কাজকর্ম্মে গিয়াছেন, সকলের সঙ্গে দেখা হইল না, গরমের ছুটীতে হাইকোর্ট এখন বন্ধ, যাঁহারা আছেন তাঁহাদের লইয়াই কাজকর্ম্ম যতদূর সম্ভব সারিয়া লইতে হইল।

স্বদেশী ও স্বরাজী দলগুলির মধ্যে হাঙ্গামা গোলমাল না কমিয়া নিত্য বাড়িতেছে। **বানর-সেনা** বলিয়া ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া একদল হইয়াছে। **মার্জ্জার সেনা** নামে ছোট ছোট মেয়েদের দল হইয়াছে, **স্বদেশী-সেবিকা** সঙ্ঘ লইয়া মেয়েদের দল হইয়াছে; এ ছাড়া পিকেটদল, ভলানটিয়ার দল প্রভৃতি আছেই। নিত্য পুলিশের সঙ্গে মারামারি নিত্য হরতাল, জেলে যাওয়া ইত্যাদি লইয়া মানুষ যেমন অত্যাচার-জর্জ্জরিত, তেমনই ভয় শূন্য হইতেছে। দুইজন প্রধান এটর্ণী ও আমাদের বন্ধু স্থানীয় Khare এবং Nagendra Das, Merchant জেলে গিয়াছেন, যাহারা Round Table Conferenceএ গিয়াছেন কিংবা যাইতেছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও অপমান ব্যবস্থা হইতেছে, নগরের বাণিজ্য ও শ্রী সব অন্তর্হিত, গরমও তেমনই পড়িয়াছে।

আড়াই বৎসর পূর্ব্বে যখন আসিয়াছিলাম; তখন প্রসিদ্ধ ভাস্কর ওয়াগ (Wagh) এক প্রস্তর মূর্ত্তি আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তাহা শেষ হয় নাই। তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে হইয়াছিল বলিয়া কাজ কর্ম্ম বন্ধ ছিল, এবার দুই তিনদিন ধরিয়া সব কাজ তিনি শেষ করিলেন। জেনেভার অমূল্য চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ও জামাতা তাঁহার পত্র পাইয়া দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবও অনেক দেখা শুনা করিতে আসিয়াছিলেন; অতএব বিশ্রামের সময় অল্প, স্বদেশী দলের কর্ত্তাদের সঙ্গে দিবা-রাত্র বিস্তর কথাবার্ত্তা চলিতেছে, কিন্তু বিশেষ ফলোদয়ের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। যেখানে সপ্রু ও জয়াকর কৃতকার্য্য হন নাই সেখানে আমার কথা কি ফলদায়ক হইবে? উহার মধ্যে যাহারা মধ্যপন্থী তাঁহারা অনেকে আমার কথা বুঝিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়, আজ অনেক মিটিং ও লোকজনের সঙ্গে দেখা করার দরকার ছিল, সে সকল সারিতে অনেক বিলম্ব হইল।

পুরাতন আঙ্‌রাখা*

(গল্প)

শ্রীফণীভূষণ রায়

তখন আমি কমিসিরিয়টে কেরাণীগিরি করি—জঁা হ্বিদালও আমাদের আফিসে কেরাণীগিরি কর্ত্ত এবং আমার সহযোগী ছিল। ইতালী যুদ্ধে তার বাঁ-হাত কাটা পড়েছিল—সে তখন ছিল "ননকমিশন্‌ড্‌ অফিসার"—কিন্তু ডান হাতখানা বেঁচে গিয়েছিল। ভাগ্যের কথা! কারণ তার ডান হাতখানা একখানা হাতের মত হাত ছিল—কলম ধরে সে যখন লিখতে সুরু কর্ত্ত, মনে হ'ত যেন মুক্তা বর্ষণ হচ্ছে—তা' লেডীহাণ্ডই বলুন, উকীলি ধরণের লেখাই বলুন—জাঁদরেলী কায়দার লেখাই বলুন। যে কোনো ছাঁদের লেখাই বলুন—যেন মুক্তপাঁতি··আর সবশেষে নাম সই কর্ব্বার সময়—কলম্‌ দিয়ে এমন একটা প্যাঁচাল খোঁচা মার্ত্ত—বোঝাই যেত না নামই সই কল্ল—না ছোট্ট একটা পাখী এঁকে বস্‌ল!

খুব ভারিক্কি ধরণের লোক ছিল—হ্বিদাল! সেই পুরান আমলের সৈন্য—সন্ন্যাসীর মত সাধু, কুমারীর মতন পবিত্র। বয়েস হ'বে বোধ হয়—বছর চল্লিশেক—এরি মধ্যে কিন্তু সোণালি রংএর দাড়ীতে পাকাচুল দু'এক গাছা দেখা দিয়েছিল—বহুকাল "আফ্রিকায়" কাটাবার জন্য হ'বে হয় তা। এই প্রাচীনকালের যোদ্ধাটীকে আফিসের সকলেই আমরা "ফাদার হ্বিদাল" বলে ডাকতাম—কিন্তু এই ডাকা-ডাকির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা যতটা না ছিল ততটা ছিল সম্ভ্রম এবং মর্য্যাদা, কারণ আমরা তো জানতাম—কি উচ্চ, কঠোর কর্ত্তব্যময় ছিল তার জীবন। "এফিয়েল টাওয়ার" এর কাছে সস্তা ভাড়ার একটা ছোট্ট বাসায় সে তার বোনকে এ'নে জুটিয়েছিল। বোনটী বিধবা—তার একপাল ছেলেপেলে—মাসের পর মাস তার উপার্জ্জনের সব টাকা কয়টা দিয়ে তাদের ভরণপোষণ করে যাচ্ছিল। উপার্জ্জনই বা কি—পেন্সনের টাকা, মাহিনার টাকা, "লিজিয়ন অব্‌ অনারের" পদক প্রাপ্তির দরুণ বিশেষ পেন্সন্‌—সব কুড়িয়ে তিনশ ফ্রাঁ (franc)—লোক কিন্তু হ্বিদাল ছাড়াই পাঁচজন। সে যাই হোক—"ফাদার হ্বিদালের" ফ্রক—কোট্‌গুলো—হাতায় তিন্‌টে, তিন্‌টে বোতাম আর বুকেও তিন্‌টে করে বোতাম—সেগুলা সর্ব্বদা ব্রাস করে এমন চক্‌চকে করে রাখা হ'ত যে দেখ্‌লে মনে হয় "ইনস্‌পেক্টর জেনারেল" আজই পরিদর্শনে আস্‌ছেন আর কি! আর রাস্তাতে বেরুতে হ'লেই, "লিজিয়ন্‌ অব্‌ অনারের" লাল্‌ ফিতা "বাটুন হোলে" পরাই চাই—"লাতুর" কোম্পানীর বুট জুতা পায়ে···তা' না হ'লে ঘরের বার হ'বার তার উপায় ছিল না।

আমি তখন পারী সহরের দক্ষিণ দিকের সহরতলীতে বাসা নিয়েছিলাম; সুতরাং অনেক সময়েই বাসার ফির্ব্বার পথে "ফাদার হ্বিদালের" সঙ্গে যেতাম আর মজাকরে যুদ্ধের গল্প শুন্‌তাম। "মিলিটারী" কলেজের সাম্‌নে দিয়ে ছিল আমাদের যাবার পথ—ওর ধারের কাছে এলে নানারংয়ের পোষাকের নানারকম সৈন্য দেখ্‌তে পেতাম—"ইম্পীরিয়াল গার্ডের চোখ-ঝলসানো পোষাক, "গাইড্‌দের" সব্‌জে," "ল্যান্সার"দের শাদা—আর "আর্টিলারি" অফিসার-দের জমকালো—কালো এবং সোণালি রংয়ের পোষাক হাঁ,—ওর কম পোষাক পর্ত্তে পেলে—মরেও সুখ আছে। ······যেদিন খুবই গরম বোধ হ'ত—ফাদারকে বল্‌তাম চল না একটু গলাটা ভিজেয়ে আসি—আমিই গরজ ক'রে বল্‌তাম—জানি যে বেচারী হাজার তৃষ্ণা পেলেও খরচের ভয়ে ওইটুক পর্য্যন্ত অমিতব্যয়িতা স্বীকার কর্ব্বে না! সেই, সেই দিন "ম্যা-পিকে" রাস্তার মিলিটারী কাফেতে আমাদের দুই, এক ঘণ্টা বেশ দেরী হ'য়ে যেত। রাস্তায় বেরিয়ে সেদিন কি রকম উদ্দীপনায় যে "ফাদার" যুদ্ধের গল্প বলে যেতে—তা' আপনারা বুঝ্‌তেই পার্চ্ছেন।

একদিন সন্ধ্যায়—আমার এখনও স্পষ্টই মনে আছে—

---

* Mon Franco'is Coppee La Veiille Tunique নামক ফরাসী গল্পের অনুবাদ।

"মদটা" সেদিন একটু মাত্রা ছাড়িয়েই খাওয়া হয়েছিল—যখন আমরা "বুলহ্বার……" দিয়ে যাচ্ছিলাম—হঠাৎ "ফাদার" একটা পুরানো মিলিটারী পোষাক বিক্রেতার দোকানের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পড়ল…ঐ রকম "সেকেণ্ড হ্যাণ্ড" দোকানের ছড়াছড়ি ঐ অঞ্চলে খুবই…বিশ্রী, নোংরা দোকান জানলা দিয়া দেখা যাচ্ছিল—বহুকালের মর্চ্চে পড়া পিস্তল, কাচের বাটীতে বহু রকমের বোতাম—বহু পুরান কোটের-কাপড়ের গাদা এবং মধ্যে মধ্যে মিলিটারী অফিসারদের "আঙ্গরাখা"—বৃষ্টি এবং রৌদ্রে বিবর্ণ—হিবদাল তার যে হাতখানা ছিল—সেই হাত দিয়ে আমার হাত ধর্‌ল—এবং একটু উত্তেজনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে—হাতের লাঠি দিয়ে একটা পুরান আঙ্গরাখা তুলে দেখাল—"আফ্রিকান্" সৈন্যদলের কোনো কর্ম্মচারীর পোষাক হ'বে হয় তো;—সাত জায়গায় কুঁচকান বিবর্ণ যদিও স্বর্ণবর্ণের সামরিক "তারকা"গুলি তখনও নজরে আস্‌ছিল। হিবদাল, আমাকে বল্‌ল—দেখ্‌ছ আমি পূর্ব্বে যে সৈন্যদলে চাকরী কর্ত্তাম—সেই সেন্য দলেরই পোষাক—যার তার পোষাক নয়—স্বয়ং কাপ্তেনের। এই বলিয়া পোষাকটীকে ভাল করিয়া দেখ্‌বার জন্য সে আগাইয়া গেল। আঙ্গরাখার বোতামে সৈন্যদলের সংখ্যা পড়ে ফেলে—মহা উৎসাহে বলে উঠ্‌ল—'এ যে আমাদেরই' রেজিমেণ্ট—"আলজিরিয় আর্ম্মার" প্রথম রেজিমেণ্ট।' এই বলিবামাত্র ফাদার হিবদালের হাতখানি যা তখনও সেই বহু-পুরাতন পোষাকটীর উপর ন্যস্ত ছিল—হঠাৎ কেমন স্থির হ'য়ে গেল। তাঁহার উদ্দীপনাময় মুখমণ্ডল বিবর্ণ এবং পাংশুটে হ'য়ে উঠ্‌ল—ওষ্ঠদ্বয় মৃদুকম্পিত হ'ল—সে অস্পষ্টকণ্ঠে ধীরে ধীরে বল্‌ল—হা ভগবান—এটা কি সেই পোষাক!—বল্‌বামাত্রই পোষাকটীকে টেনে ফেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। আমিও মুহূর্ত্তমধ্যে দেখে নিলাম—পোষাকটীর ঠিক মাঝামাঝি ছোট্ট একটা ছিদ্র—নিশ্চয়ই বন্দুকের গুলীর—অনেক দিনের রক্ত লেগে চারদিক্‌টা কেমন কালো হয়েছে। ছিদ্রটা এমন ভয়াবহ এবং করুণ দেখে মনে হয় যেন ক্ষতটাই চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠেছে।

হা—হা—কি ভয়ানক!—বল্লাম আমি "ফাদার"কে—ফাদার কিন্তু ততক্ষণ পোষাকটা ছেড়ে বেশ তাড়াতাড়ি হাঁট্‌তে সুরু করেছে—মাথাটা হেলিয়ে হেলিয়ে…ভাবলুম, এই পুরান আঙ্গ্‌রাখাটীকে নিয়ে হয়তো একটা বেশ রোমাঞ্চকর গল্প আছে—তাই তার পেট থেকে কথা বার করবার জন্য বল্‌লাম…দেখ ফাদার—সচরাচর সেনাপতিদের পোষাকের পিছনে ত গুলীর দাগ থাকে না কিন্তু সে যেন শুন্‌তেই পেল না, তাঁর গোঁফ কাঁম্‌ড়িয়ে ধরে—কি যে বিড়্‌বিড়্ কর্ত্তে লাগ্‌ল—এটা এখানে এল কি করে! কোথায় "মেলেগনানো" যুদ্ধক্ষেত্র আর কোথায় "বুলহ্বার…" এর পুরাতন কাপড়ের দোকান। হাঁ, জানি শকুন প্রকৃতির লোকগুলা—মৃতদেহের পোষাক পর্য্যন্ত খুলে নিয়ে আসে। কিন্তু কেন ওখানে, এখান থেকে "মিলিটারী" কলেজ দু'পা দূরে…নিশ্চয়ই সে এই পথ দিয়ে যায় নিশ্চয়ই পোষাকটী দেখ্‌লে চিন্‌তে পার্ব্বে, কিন্তু কি চমৎকার চেনাই চিন্‌বে।

—দেখ, ফাদার—তাঁর হাত ধরে নাড়া দিয়ে বল্লাম,—এ তোমার অন্যায় হচ্ছে, হিবদাল, কি সব হেঁয়ালী আরম্ভ করেছ, তোমার যদি কোন পুরান গল্প, পুরান আঙ্গ্‌রাখা দেখে মনেই পড়ে থাকে—তা' আমাকেও বল্‌তে হ'বে।

আমার কথা শুনে হিবদাল কেমন যেন অবিশ্বাস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল, কেমন যেন ভয়-ভয় চাহনি …কিন্তু হঠাৎ সে মনস্থির করে ফেল্ল। তারপর এক নিঃশ্বাসে আরম্ভ করে দিল—বুঝ্‌লাম "বার্"এতে আজ যদি পিপাসা না মিটিয়ে আসা যেত, তা' হ'লে হিবদালের পেট থেকে এ' কথা কিছুতেই বেরুত না।

হাঁ, বেশ, বল্‌ছি তোমায় গল্পটা…তুমি ছোক্‌রা বয়সেই বেশ ভারিক্কি ধরণের, অনেক বিষয়ে তোমার জানাশোনা, দেখ তোমার উপরে আমার খুবই শ্রদ্ধা। যখন আমার গল্প শেষ হ'বে, তোমাকে বল্‌তে হ'বে। বল্‌তে কি বুকের উপর হাত রেখে বল্‌তে হ'বে, যে তুমি মনে কর কি না—আমি যেরূপ আচরণ করেছিলাম—ন্যায়সঙ্গতই? করেছিলাম …শোন, কিন্তু কোন্‌খানে আরম্ভ কর্ব্ব! প্রথমেই বলে রাখ্‌ছি, আমি তার নাম বল্‌তে পার্ব্ব না—দ্বিতীয়তঃ এখনও যখন সে বেঁচে আছে—তখন আমরা তাকে যে ডাকনামে ডাকতাম, সেই নামেই গল্পটা বল্‌ছি…"লা-সোয়াক"—হাঁ,

আমরা তাকে ডাকতাম—লা-সোয়াফ্ বলে এবং সে এই নামের অযোগ্য ছিল না; কারণ মদের তৃষ্ণা সৈন্যদলে অনেকেরই থাকে কিন্তু বাোটা বাজ্‌বার তালে তালে বারো গ্লাস মদ খেতে লা-সোয়াফই পারত। আর্ম্মির দ্বিতীয় সৈন্যদলে সে ছিল সার্জেণ্ট, আমি ছিলাম "কোয়ার্টার মাষ্টার" খুব ভাল যোদ্ধা ছিল—খুব যোদ্ধা…কিন্তু যেমন মাতাল, তেমনি ঝগ্‌ড়াটে। আবার ছোটখাট জিনিস নিয়ে প্রতারণাটুকুও বেশ ছিল। অর্থাৎ সৈন্যদলে থাক্‌লে যা' যা' কিছু বদ্‌গুণ হয়—কিন্তু উদ্যত অস্ত্রের মত সাহসী ছিল সে। কি সুনীল চক্ষু, শান্ দেওয়া ইস্পাতের মত তীব্র। কটা রংএর দাড়ীতে মুখ ঢাকা। তার মুখ দেখ্‌লেই মনে হ'ত লোকটা মিশুক প্রকৃতির মোটেই নয়। আমি যখন সৈন্যদলে প্রথম ঢুকলাম, তখন ও ছুটীতে ছিল। ছুটী ফুরালে ও পুনর্ব্বার এসে ঢুকল। একসঙ্গে কিছু টাকা পেল কি না—ওর কাণ্ড দেখে কে! জন পাঁচ ছয় মিলে, একটা গাড়ী ভাড়া করে শহরের যত নীচ-পল্লী টু টুঁ করে বেড়াতে লাগ্‌ল। অবশেষে তাকে তারা একদিন ধরাধরি করে নিয়ে এল—মাথায় তরোয়ালের আঘাত। এক মুর-গণিকার বাড়ীতে "আর্ম্মকরের" সৈন্যদের সঙ্গে মারামারি হয়েছিল—সেই হট্টগোলের সময় লাথির চোটে গণিকাটাও মারা পড়ে। সে যা হোক্, লা-সোয়াফ দিন পনের পর সেরে উঠ্‌ল। সেরে উঠ্‌বার পর তার কয়েদ হ'ল—আর হ'ল "ডিগ্রেডেসন্"। এইরকম নীচু দিকে প্রমোশন সে এর আগেও ন'বার পেয়েছিল! এই রকমের বদ্ চরিত্রের লোক না হ'লে, কবে সে কাপ্তেন হয়ে যেত। লেখাপড়া জানে সে—ভাল যোদ্ধা সে! যাক্, এই মুর-মেয়েটির ঘটনার পরেও সে আবার প্রমোশন পেয়েছিল। প্রায় মাস দশেকের পরে—কাপ্তেন সাহেবের অনুগ্রহে—যাঁর অধীনে ও প্রথম যুদ্ধ করে!

আমাদের বুড়া কাপ্তেন সাহেব যখন সেনাপতি হ'য়ে চলে গেলেন, তখন আমাদের কাপ্তেন হ'য়ে এলেন কুড়ি বছরের ছোক্‌রা, একজন কর্শিকান—নাম তার জাঁতিল। তিনি সবে মাত্র সামরিক কলেজ হ'তে পাশ করে বেরিয়েছেন—খুব গম্ভীর প্রকৃতি, উচ্চাশা এবং কাজে-কর্ম্মে বেশ অভিজ্ঞ। কিন্তু কড়াক্কর ছিল তার নিয়ম। কারো বন্দুকে যদি একটু "মরচে" পড়া থাক্‌ত কিংবা বোতামের "ঘাট" ঢিলে দেখা যেত, তবে কিছুদিনের জন্য শ্রীঘর বাস তার ভাগ্যে ঘট্‌ত। কাপ্তেন সাহেব এর আগে "আলজেরিয়া"তে কাজ করেন নি; সুতরাং ওখানকার বিশৃঙ্খলা এবং অনিয়ম বরদাস্ত করে উঠ্‌তে পাচ্ছিলেন না। প্রথমেই তিনি পড়লেন লা-সোয়াফ্‌কে নিয়ে—লা-সোয়াফ্ অবশ্য ছেড়ে কথা কইল না। প্রথম যেদিন লা-সোয়াফ সন্ধ্যার সময় হাজির হ'ল না, তিনি তাকে পঁচিশ ফ্রাঁ জরিমানা করলেন এবং প্রথম যেদিন লা-সোয়াফ মাতাল হ'য়ে ঢলাঢলি আরম্ভ করল'—তিনি তাকে পনের দিনের কয়েদ করে দিলেন। ছোট্টখাট্ট, আধ-ময়লাটে রংএর সেই ছোক্‌রা কাপ্তেন সাহেব যেন ঋজু লৌহস্তম্ভ, রাগ করলে তাঁর গোঁফ জোড়া শিকারী বিড়ালের গোঁফের মত ফুলে ফুলে উঠ্‌ত। …লা-সোয়াফকে দণ্ড দিবার সময় খুব কর্কশকণ্ঠে বলেছিলেন—"আমি জানি তুমি কেমন…কিন্তু তোমাকে আমি সায়েস্তা করব'ই।" লা-সোয়াফ্ কিন্তু কোনো কিছু না বলেই বেশ ঠাণ্ডা সুস্থিরভাবে, সামরিক কয়েদ-খানার দিকে হেঁটে গিয়েছিল। অবশ্যই কাপ্তেন সাহেব লা-সোয়াফকে চিনতেন না, তা' না হ'লে লা-সোয়াফের ইস্পাতের মত তীব্র চক্ষুতে যে নিদারুণ প্রতিহিংসা বিদ্যুতের মত ঝলক্ মেরে উঠেছিল, তার কথা ভাবতে ভাবতে তাকে দুর্ম্মনা হ'তে হ'ত।

ইতি মধ্যে সম্রাট্ (তৃতীয় নেপোলিয়ান) যুদ্ধ ঘোষণা করলেন অষ্ট্রীয়ানদের বিরুদ্ধে—কাজেকাজেই "ইতালী" যাবার জন্য আমাদিগকে জাহাজে উঠ্‌তে হ'ল। যাক্—যুদ্ধের কথা এখানে আর বলে কি হ'বে,…মেলেগনানো (Melegnano) যুদ্ধের পূর্ব্বদিন—তুমি তো জানই ঐ যুদ্ধে আমার বাঁ হাত কাটা পড়ে—ছোট্ট একটা গ্রামে আমরা তাঁবু ফেলেছিলাম। সৈন্য পরিদর্শনের সময় সেদিন কাপ্তেন সাহেব বলেছিলেন যে, (লেকচার দেবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল)—আমরা যেন ভুলে না যাই—আমরা মিত্ররাজ্যে উপস্থিত রয়েছি—কেউ যদি কোনো প্রকারের অত্যাচার অধিবাসীদের উপরে করে—তবে তাকে তিনি আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করবেন। কাপ্তেন সাহেব যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন—লা-সোয়াফ আমার পাশেই ওর বন্দুকের উপর কোনো

মতে দাঁড়িয়ে দুলছিল—আর বিদ্রূপের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়ছিল—কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় কাপ্তেন সাহেবের নজরে ও পড়ে নি।

আমরা শুয়েছিলাম খোলা-বারান্দায়—মাঝ রাত্রিতে হঠাৎ চমকে উঠে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়ফড়িয়ে উঠে বিছানার উপর বসেছি—দেখি আমাদের কয়েকজন সৈন্য এবং গ্রামের কতকগুলো চাষী জড় হয়ে লা-সোয়াফের হাত থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে অতি সুন্দরী একটি মেয়েকে—আহা বেচারীর চুলের গোছা এবং কাপড়-চোপড় সব এলোমেলো হ'য়ে গেছে… লা-সোয়াফ্ গর্জ্জাচ্ছে যেন হিংস্র পশু আর মেয়েটী কাতর কণ্ঠে "ম্যাদানা" "ম্যাদানা" বলে বিলাপ করছে! লাফিয়ে গিয়ে ওকে শিক্ষা দেব—দেখি স্বয়ং কাপ্তেন সাহেব এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর চোখের চাহনিতে- প্রভুর দৃষ্টি ছিল ওঁর চোখে—ঐ ছোট্টখাট্ট কৃষিকানটির—লা-সোয়াফ্ যেন কুঁচ্‌কিয়ে গেল। মিষ্টি মিষ্টি আদরের কথায় মেয়েটীকে আশ্বস্ত করে—লা-সোয়াফকে নিয়ে তিনি নিজের তাঁবুতে গেলেন—সেখানে গিয়ে রাগ সামলাতে না পেরে লা-সোয়াফের গালে সটান্ এক চড় বসিয়ে দিলেন—"তোর মত জানোয়ারকে পাগলা কুকুরের মত গুলী করে মারা উচিত—যে মুহূর্ত্তে কর্ণেলের সঙ্গে আমার দেখা হ'বে—সেই মুহূর্ত্তে তোর চাকরী যা'বে…কাল যুদ্ধের দিন—যুদ্ধে মরার একটা কিন্তু গৌরব আছে।"

এর পরে সকলে গিয়ে শুয়ে পড়লাম—কিন্তু কাপ্তেন সাহেব ঠিক বলেছিলেন—শত্রুপক্ষের কামানের শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙ্‌ল। তাড়াতাড়ি হাতিয়ার নিয়ে লাইন-বন্ধ হ'য়ে আমরা দাঁড়ালাম—লা-সোয়াফ্ ওর নীল চক্ষুতে অমন হিংস্রভাব আর কখনও দেখি নি। আমার আশেপাশেই ছিল—তখন "মার্চ্চ" করার হুকুম হয়েছে। "মেলেগনানো" গ্রামে অষ্ট্রীয়ানেরা কামান সাজিয়ে বসেছিল—ওদের হটাতে হ'বে। দ্রুতবেগে আমরা অগ্রসর হচ্ছি—দু'-কিলোমিটার যেতে না যেতেই অষ্ট্রীয়ানদের গোলা এসে পড়ল—দেখতে না দেখতে জন দশেক ধরাশায়ী হ'ল। তখন কর্ম্মচারীরা আমাদিগকে ভুট্টাক্ষেতে লুকোতে বল্লেন—তাঁরা কিন্তু ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন এবং আমি তোমাকে ঠিক বলছি—সকলের আগে সটান দাঁড়িয়ে ছিলেন আমাদের সেই ছোক্‌রা কাপ্তেন সাহেব। আমরা গুঁড়ি মেরে নিঃশব্দে অগ্রসর হচ্ছিলাম—হঠাৎ শত্রুপক্ষের কামানের উপর রুখে পড়বার জন্য: হঠাৎ কে যেন আমার কনুই ধরে ধীরে ধীরে নাড়া দিল—মুখ ফিরিয়ে দেখি লা-সোয়াফ আমার দিকে তাকিয়ে আছে…নীচের ঠোঁটটা ভেঙ্‌চিয়ে সে বন্দুকে একমনে গুলী ভর্‌ছে! মাথা নেড়ে ইসারা করে সে কাপ্তেন সাহেবকে দেখিয়ে বল্‌ল',—'দেখ্‌ছ—কাপ্তেন সাহেবকে' ‥

'কেন দেখ্‌ব না, বেশ দেখ্‌ছি' আমি তাকে বললাম—কাপ্তেন সাহেব আমাদের থেকে মোটে কুড়ি পা দূরে দাঁড়িয়েছিলেন।

'বেশ, বেশ—কালরাত্রিতে যা' তা বলে অপমান করেছিল না আমাকে'—বল্‌তে না বল্‌তে নিপুণভাবে লক্ষ্য স্থির ক'রে হঠাৎ হাত উঁচিয়ে সে গুলি করল'! আমার চোখের সাম্‌নে কাপ্তেন সাহেব—হঠাৎ তাঁর দেহ ঝুঁকে পড়্‌ল—মাথা পিছন দিকে এলিয়ে এল—এক নিমেষের জন্য দু'হাত দিয়ে যেন বাতাস আঁকড়িয়ে ধরতে চাইলেন‥হাত থেকে তরোয়াল পড়ে গেল—তিনিও সংজ্ঞাহীন হ'য়ে গড়িয়ে পড়লেন।

'খুনে-ডাকাত' বলে আমি লা-সোয়াফের হাত দুটো চেপে ধরলাম। কিন্তু সে আমার বুকে বন্দুকের হাতল ঘুরিয়ে এমন ঘা মারল যে তিন হাত দূরে গিয়ে ছট্‌কে পড়লাম।

—গাধা—আহাম্মক কে প্রমাণ করবে—আমি যে মেরেছি!

মরিয়া হ'য়ে উঠে পড়েছি—কিন্তু দেখি, আর সকলেও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে—আর আমাদের কর্ণেল সাহেব—মাথায় তাঁর টুপী নাই—একটা ঘর্ম্মাক্ত ঘোড়ার পিঠে চড়ে চীৎকার করে বল্‌ছেন, এগোয়, এগোয়—সঙ্গীন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়—অষ্ট্রীয়ান কামানের উপর—অষ্ট্রীয়ান কামানের উপর…

তখন আর আমার কি কর্‌বার ছিল—কিছুই না—সকলের সঙ্গে আক্রমণের যোগ দেওয়া ছাড়া…গেলেগনানো রণক্ষেত্রে আলজীরিয় সৈন্যের সেই আক্রমণ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা—তোমাকে আর নতুন করে বলব কি? ঝড়ের দিনে পাহাড়ের উপর অশান্ত সমুদ্রের তরঙ্গ বিক্ষেপ দেখেছ

তো! আমি তাই যেন সেদিন নিজের চোখে দেখছিলাম। ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ ঢেউগুলো যেন প্রপাতের মত গিয়ে পাহাড়ের গায়ে পড়ে—দলের পর দল ফরাসী সৈন্য তেমন করে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। তিন, তিনবার অষ্ট্রীয়ানদের জলন্ত কামানগুলো ফরাসী সেনার নীল পোষাকে ঢেকে গেল—তিন তিনবারই পাহাড়ে-আহত ঢেউয়ের মত ফরাসী সেনাকে বিমুখ হয়ে হটে আসতে হল।

চতুর্থবারের আক্রমণের পালা পড়ল—আমাদের দলের উপর। তিন থাকে আমরা গিয়ে কামানগুলোর সামনে দাঁড়ালেম—বন্দুকের হাতলের উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে গিয়ে পড়ব—এমন সময় প্রৌঢ় গোছের একজন অষ্ট্রীয়ান তরোয়াল দিয়ে আমার বাঁ হাতে এমন আঘাত করল' যে মনে হ'ল বাঁ হাতখানা উড়েই গেল—বন্দুক হাত হ'তে খসে পড়ল মাথা ঘুরতে লাগল—আমি একখানা কামানবাহী গাড়ীর চাকার কাছে—কাৎ হ'য়ে পড়ে—অচৈতন্য হ'য়ে পড়লাম···

যখন চক্ষু মেললাম—তখন দূর হ'তে গোলাগুলির শব্দ আর শোনা যাচ্ছিল না। আমার সঙ্গীরা অষ্ট্রীয়ান কামানগুলোর চারদিকে ইতস্ততঃ দাঁড়িয়ে "জয় সম্রাটের জয়" বলে উল্লাস এবং হাতের বন্দুক নেড়ে খুব আস্ফালন কচ্ছিল।

ঘোড়া ছুটিয়ে এমন সময় একজন বুড়া সেনাপতি এসে পড়লেন- তাঁর দলবল নিয়ে। তিনি এসে তাঁর ঘোড়া থামালেন—সোনালি কাজ করা মাথার টুপী উঠিয়ে আমার সঙ্গীদিগকে অভিনন্দন করে বল্লেন—'সাবাস, সাবাস্—আলজীরিয় সৈন্যগণ পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা যোদ্ধা তোমরা'

আমি তখন অতি কষ্টে উঠে বসেছি গাড়ীর চাকাটা ধরে ডান হাত দিয়ে আমার আহত বাঁ হাত খুব চেপে ধরেছি—তখনও কিন্তু সকল চিন্তা ছাড়িয়ে একটা চিন্তা আমার মনে ভাসছিল—ঐ লা-সোয়াফ কাপ্তেন সাহেবকে পিছনদিকে গুলী করে মারল

সম্মুখে চেয়ে দেখলাম—সঙ্গীদের পিছনে ফেলে—দু'এক পা করে ও বুড়ো সেনাপতির দিকে এগিয়ে এল—হাঁ—সেইই লা-সোয়াফ—কাপ্তেন সাহেবের হত্যাকারী··· যুদ্ধে ওর মাথার আরবী ফেজ্ কোথায় উড়ে গেছে—মাথায় প্রকাণ্ড গভীর ক্ষত—তখনও নাক মুখ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। এক হাতে ওর বন্দুক—আর এক হাতে একটা "অষ্ট্রীয়ান্" পতাকা—শতছিন্ন—রক্তরঞ্জিত—শত্রু পরাজয় করে ওটা ও ছিনিয়ে এনেছিল।

বুড়া সেনাপতি প্রশংসমান দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরে সেই জয়-নিদর্শনটী দেখলেন—তারপর তাঁর "এডিকং"-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন,- দেখছ ত্রিকুর-যোদ্ধা বটে এরা। লা-সোয়াফ গর্ব্বিতকণ্ঠে বলে উঠল,—"আপনি সত্য বলেছেন সেনাপতি—কেন হ'বে না—আলজীরিয় সেনাদলের প্রথম রেজিমেণ্ট যে—তবে আর একবার আক্রমণ করতে পারি এই কয়টা লোকই আমরা বেঁচে আছি।

—তোমার বীর উক্তির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ—পদক পাবে তুমি জান?

"কোন যোদ্ধা—কোন যোদ্ধা"—বারবার এই কথা শোনা গেল। সেনাপতি "এডিকং"কে আর যেন কি বল্লেন—জানই তো মুখ্যু-সুখ্যু লোক আমি মানে বুঝি না—বলে দিলেন- কেমন—না ত্রিকুর যেন প্লুটার্ক (Plutarch) এর কোনো চরিত্র কথা বলছে।

হাতটা বড় চিন-চিনিয়ে উঠল—আমার মাথা ঘুরতে লাগল—আর কিছু দেখতে, শুনতে পাচ্ছিলাম না—মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লাম।

বাকীটুকু তোমার জানা আছে। তোমার কাছে অনেকবারই বলেছি—ডাক্তার আমার হাত কেটে ফেলল'—ছ'মাস হাঁসপাতালে মরমর অবস্থায় কাটাতে হ'ল। রাত্রিতে যখন ঘুম আসত না—তখন মনে মনে ভাবতাম—কি আমার করা উচিত? লা-সোয়াফের বিরুদ্ধে সব প্রকাশ করে দেওয়া! অবশ্যই দেওয়া উচিত—কিন্তু প্রমাণ করব' কি করে? আর লা-সোয়াফ—নরঘাতক—কিন্তু বীরও বটে—কাপ্তেন জাঁতিলকে হত্যা করেছে—কিন্তু শত্রুর হাত হ'তে ঐ তো "পতাকা" ছিনিয়ে এনেছে—ভাবতে, ভাবতে আমি কিছুই ঠিক্ করে উঠতে পারতাম না। তারপর যখন সেরে উঠলাম—তখন শুনলাম যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের জন্য ও "লীজিয়ন অব্ অনারের" পদক পেয়েছে এবং "ইম্পীরিয়াল" গার্ড দলে উন্নীত হয়েছে। পদক ও পদোন্নতি ওর প্রাপ্যই···তবে কি না—আজকে

এ'সব মনে হ'চ্ছে কতদিনের ঘটনা—বহুদিন লা-সোয়াফের সঙ্গে দেখাশুনা নাই—আমি এখন কেরাণীগিরি করি—ও পূর্ব্বের মত সৈন্যদলেই আছে। আজকে হঠাৎ পুরানো কাপড়ের দোকানে সেই "আঙ্গ্রাখা"—সেই পেছন থেকে মারা গুলীর দাগ দেখে—(ভগবান জানেন কা'র হাত হ'তে গুলীটা এসেছিল) মনে হচ্ছে পাপের এখনও প্রায়শ্চিত্ত হয় নি—কাপ্তেন জাঁতিলের তৃষিত আত্মা এখনও তৃপ্তিলাভ করে নি।

আমি যথাসাধ্য "ফাদার হ্বিদাল কে (Vidal) শান্ত করবার চেষ্টা করলাম—সে বল্‌তে বল্‌তে খুব উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল···আমি তাকে বল্লাম—হত্যাকারী তবু বীরও বটে– যাক্ চুপ করে থাকাই ভাল হয়েছে!

দিন কয়েক পরে আফিসে এসে দেখি—হ্বিদাল আমার চেয়ারে বসে আছে—একখানা খবরের কাগজ আমার দিকে ঠেলে দিয়ে সে বল্‌ল,—'জান কি ব্যাপার?'

আমি খবরের কাগজখানা তুলে ধরে পড়লাম—"মদ-খাবার বাড়াবাড়িতে আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। গত কল্য দুপুর-বেলা—"মাপ্লে" (ডাক নাম লা-সোয়াফ্) আলজীরিয় সৈন্যদলের সার্জ্জেন্ট—দু'জন বন্ধুকে নিয়ে "বুলভোর···" এর "বারে"র সম্মুখে রাস্তায় বসে—গ্লাসের পর গ্লাস মদ ওড়াচ্ছিল। সেই সময় রাস্তার ওপারে একটা পুরানো কাপড়ের দোকানে—একটা পেষোকের উপর তার নজর পড়ে—নজর পড়্‌তেই সে হঠাৎ ক্ষেপে উঠে। সঙ্গীন্ উঠিয়ে সে রাস্তায় যা'কে তা'কে আক্রমণ করতে থাকে এবং চীৎকার করে বল্‌তে থাকে "নরহত্যা আমি করি নি—আমি মেলেগনানো রণক্ষেত্রে—অষ্ট্রীয়ান-পতাকা জয় করে এনেছিলাম"···তার সঙ্গীদ্বয় অনেক কষ্টে তা'কে পাক্‌ড়াও করে। তাকে মিলিটারী হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়েছে—কিন্তু সকলেই বল্‌ছে এ হতভাগ্যের প্রকৃতিস্থ হ'বার আশা খুব কম।···"

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানি—সত্যসত্যই "মাপ্লে" মেলেগনানো রণক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাবার জন্য "পদক" পেয়েছিল এবং মদ খাবার বদ্ অভ্যাসের দরুণ কোনদিন 'কাপ্তেন' হ'তে পারে নি।

যতক্ষণ পড়ছিলাম—ফাদার হ্বিদাল মৌন-গম্ভীর নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল···তারপর ধীরে ধীরে বল্‌ল,—কাপ্তেন জাঁতিল "কর্শিকান" ছিলেন—এতদিনে তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ হ'ল—তাঁর আত্মার রক্ত তর্পণ হ'ল।
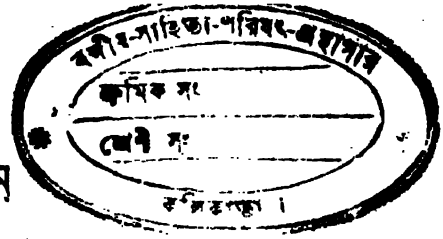
বিসর্জ্জন

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকরক্লিষ্ট বসুন্ধরায় যখন হাহাকার উঠে তখন সভ্যসমাজের অন্তরালে নিভৃত প্রান্তরে নবজীবনের বীজ বপন করিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে তাপদগ্ধ দেহে নীরব কর্ম্মী ব্যস্ত থাকে। সহস্রাংশুর তীক্ষ্ণ রশ্মি-জ্বালায় মাতার তপ্ত হৃদয়শ্বাস ক্রমে দ্রুত হইতে দ্রুততর বহিতে থাকে এবং শেষে প্রলয়ের বাতাস সৃজন করে। সেই ঝটিকা দেখিলেই বারিবাহনের রণভেরী বাজিয়া ওঠে, আর ঊর্দ্ধ হ'তে পর্জ্জন্য প্রবলবেগে নামিয়া আসে; তাহাতে তুমুল সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। সেই আহবে তাপিতের আশ্রয়রূপ কত উন্নতশির তরুরাজি—কত গর্ব্বমণ্ডিত সৌধশিখর ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হয়। দীনের কুটীরও নিষ্কৃতি পায় না। গৃহহীন নীরব কর্ম্মী নিরুপায় হইয়া বিশ্বেশ্বরের নাটমন্দির আশ্রয় লয় ও প্রকৃতিপুঞ্জের তাণ্ডবলীলার অবসানের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। অবসর পাইলেই সে একবার ঊর্দ্ধে চাহিয়া বিশ্বপতির চরণে প্রণিপাত করে এবং আশায় হৃদয় বাঁধিয়া সঞ্জীবনী-বীজ ছড়াইয়া দেয়। তারপর তাহার চির-আদৃত দুঃখ ও দৈন্যের মধ্যে বসে কয়েকটা দিন কাটাইবার জন্য ঘরে চলিয়া যায়। উৎসাদিত দুই একটা তরুশাখায় নির্ম্মিত ও তালবৃক্ষের দুই চারিটা ছিন্নপত্রাচ্ছাদিত অপূর্ব্ব আবাসে তাহার সহধর্ম্মিণী ভবিষ্য-কর্ম্মীকে তার স্নেহধারা দিয়া রক্ষা করিতেছে। কিন্তু কর্ম্মী যখন দেখিল কত পুরাতন সদন শ্রীহীন হইয়াছে, কত নূতন নিবাস ক্লেদক্লিন্ন শরীরে লাঞ্ছনা ও অবমাননার সাক্ষ্য দিতেছে, তখন নিজের ঘরের দিকে একবার না চাহিয়া সে ছুটিল, বিপর্য্যস্ত প্রজামণ্ডলীর ভগ্ন-গৃহ সংস্কার করিতে অথবা নূতন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি নির্ম্মাণ করিতে। তাহার এই কর্ম্ম শেষ না হইতেই নির্ম্মম মহীধরের পাষাণবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ধরিত্রীর অবরুদ্ধ স্নেহধারা প্রবলবেগে চারিদিক প্লাবিত করিয়া দিল। কর্ম্মী আবার ছুটিল—সেই অপ্রত্যাশিত অতিরিক্ত স্নেহধারা স্থানে স্থানে বাঁধিয়া রাখিল, ভাবিল—জীবন লাভ করিলে তার পরিপোষণের নিমিত্ত বর্ষান্তে প্রয়োজন হইবে; কর্ম্মী নিজের প্রাণধারণের উপযোগী যৎসামান্য রাখিয়া তাহার সমস্ত উপার্জ্জন বিশ্ববাসীর আনন্দের জন্য উৎসর্গ করে। তাহার যাতনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রতিনিয়ত অত্যাচার সহ্য করিয়া দিবাবসানে যখন তাহার দেহ ক্লান্ত হয় তখন সে নীরবে মাতার বক্ষ আশ্রয় করে, দিবার আলোকে জাগ্রত হইলে সমস্ত দুঃখ দৈন্য ভুলিয়া মাতার কার্য্য করিতে পুনরায় চলিয়া যায়।

এইরূপে জ্বালাময় গ্রীষ্মের অবসান করিতে যে বীরদর্পী বর্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেও চলিয়া গিয়াছে। বারিবাহনের বিজয়-নিনাদ ক্ষান্ত হইয়াছে। পবনের প্রবল বাহিনী শান্ত হইয়াছে। গগনগবাক্ষে চপলের ক্ষণহাসি থামিয়া গিয়াছে। শরৎ শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে। বিহগকুল আনন্দে আকুল হইয়া তার অভিষেকসঙ্গীত গায়িতেছে। তার স্নিগ্ধ শাসনে চারিদিকে শান্তির ধারা বিরাজ করিতেছে। লতাগুল্ম তরুরাজির অঙ্গে কুসুমের হার দুলিতেছে। শ্যামলা ধরণীর বক্ষে নবজীবনের বীজ ঔষধিসমূহ খেলা করিতেছে। তারকাভূষণ নিশানাথের অধরে জ্যোৎস্নার হাসি ফুটিয়াছে। নবজীবনের আশায় ভূতগ্রামের অন্তরে একটা আনন্দের উৎস উঠিতেছে। এমন সময় মৃন্ময়ী প্রতিমায় বিশ্বজননী মহামায়া আদ্যাশক্তির আবাহন হইলে, তাঁর সঙ্গে শ্রীবিদ্যা সিদ্ধি শৌর্য্যও আহূত হইলেন। মৃন্ময়ীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইলে তিনি চিন্ময়ী হইয়া যজমানের, পুরোহিতের, পৌরজনের সকল কাম পূর্ণ করিতে বসিলেন।

সেই পূজার নিমিত্ত বিগত তিন দিন আনন্দ উৎসব চলিয়াছিল। আজ সেই প্রতিমার বিসর্জ্জন। নদীতীরে দলে দলে আবালবৃদ্ধবণিতা সাধ্যমত বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া এই বিসর্জ্জন দেখিতে চলিয়াছে। আমি চলিয়াছি আর

ভাবছি—বিসর্জ্জন কেন? বিসর্জ্জনের পর এই আনন্দ কোলাহল নিবিয়া যাবে। তখন মনে হইল আজ 'বিজয়া দশমী'; বিসর্জ্জনের পর সিদ্ধি সেবন করে বিজয়ার আনন্দ উপভোগ করিতে হয়। কিন্তু—ব্রাহ্মণঠাকুর তো পূর্ব্বেই চিন্ময়ীর বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহার সঙ্গে সিদ্ধি সম্পদ শৌর্য্য বিদ্যা যাহা ছিল সবই গিয়াছে। বাকী ছিল মাটীর প্রতিমা, তাহাও জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইবে—থাকিবে কি? যাহার জন্য সিদ্ধি সেবন করিয়া আনন্দ করিতে হইবে? তবে এ বিজয়া এ সিদ্ধি কাহার? মনের ভিতর একটা বিষম ধাঁধা ধোঁয়াইয়া উঠিল। হঠাৎ একটা লোক পশ্চাৎ থেকে বলিল,—'এ সনাতন ধর্ম্ম সকলের ধর্ম্ম, এখানে হিন্দু-অহিন্দু ভেদ নাই, সকলেরই সমান আনন্দকর।'

ফিরে দেখি লোকটা কিশোর নহে, বয়সের চপল ভঙ্গিমা নাই; যুবক নহে, অহঙ্কারে বক্ষ বিস্ফারিত হয় নাই; বৃদ্ধও নহে, নৈরাশ্যে তাহার জানু ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই; তার জাতি বোঝা গেল না, কারণ শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত বা পীঙ্গলের কোন বর্ণই ভালমত প্রকাশ পাইতেছিল না। তার দেশটী ধরিতে পারিলাম না—কারণ বিলাসব্যঞ্জক কেশ-বিন্যাশ নাই, মুণ্ডিত মস্তক বা জুটিকাগ্রস্ত নহে, রমণীসুলভ কেশদাম নাই, শিরে কোন প্রকার শিরস্ত্রাণ নাই। ধর্ম্মও বুঝিতে পারিলাম না—কারণ তার তিলক নাই, অজ-শ্মশ্রুর অপূর্ব্ব আন্দোলন নাই, উৎসাদোন্মুখ বা একেবারে উৎসন্ন শ্মশ্রু নহে; পরিধেয়েরও কোন পারিপাট্য নাই। সে ক্ষিপ্ত কি শান্ত বুঝিতে পারিলাম না। দৈন্যের দারুণ চিহ্ন তার অঙ্গে আঁকা ছিল, কিন্তু দীপ্ত আশার উজ্জ্বল কিরণ তার তীক্ষ্ণ চক্ষু হইতে বাহির হইতেছিল

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'সকলের আনন্দ কোথায়? বিসর্জ্জনেই বা আনন্দ কেন?'

সে উত্তর দিল,—'যজমানের আনন্দ—যশে, পুরোহিতের আনন্দ—দক্ষিণায়, পুরবাসীর আনন্দ—অশন-ভূষণে আর বিশ্ববাসীর আনন্দ বিসর্জ্জনে। আনন্দময়ীর বিসর্জ্জনে আমাদের অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়! বসন্তের উল্লাস, নিদাঘের উচ্ছ্বাস, বর্ষার বেদনা শরতের হাসি, হেমন্তের ক্রন্দন শিশিরের শোক-সন্তাপ আমরা সহিতে পারি। কালচক্রে বিশ্বপ্রাণ বিভাবসুর সম্বৎসর ধরে আবর্ত্তন প্রাণের আনন্দে দেখতে পারি। দিনের আলো রাতের আঁধার, শুক্লপক্ষের অভ্যুদয়, কৃষ্ণপক্ষের অপক্ষয়, মাসের মাসশুদ্ধি আবার অধিমাসের মলিনতা সমান আদরে নিতে পারি! ষোল আনা আনন্দের অধিকারী হইয়া সাত আনায় প্রাণধারণ করি, পাঁচ আনা পাঁচ জন আত্মীয়কে বিতরণ করি আর চার আনা চতুর্বর্গ ক্রয় করিতে রক্ষা করি।'

লোকটী এই বলিয়া জনসমুদ্রে মিলিয়া গেল। আমার মনের ধাঁধা ঘুচিল না। বিসর্জ্জন দেখিয়া কাহাকে হাসিতে, কাহাকে কাঁদিতে, কাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া ঘরে ফিরিলাম। ঘরে আসিয়া সিদ্ধিটা কিছু বেশী মাত্রায় সেবন করিলাম। হৃদয়ের সকল ভাব গোপন করিয়া কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া শত্রুকেও আলিঙ্গন করিলাম। বিজয়ার প্রীতি-আলিঙ্গন শেষ করিয়া যখন ঘরে ফিরি, তখন দেখি সিদ্ধির নেশাটা বেশ চড়িয়া উঠিয়াছে। মাথা গরম হইতেছিল ক্রমে জলিয়া উঠিল আর চারিদিক আলোতে ভরিয়া গেল। আমি আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িলাম। সেই আলোর মধ্যে মা ভগবতী তাঁর পূর্ণ স্বরূপ নিয়ে ধীরে ধীরে প্রকটিত হইলেন।

আমার আচারে নিষ্ঠা নাই কিন্তু হৃদয়ে ভক্তি আছে। মন্ত্রে বিশ্বাস নাই, কিন্তু ভাবে শ্রদ্ধা আছে। বাহুতে বল নাই তথাপি পরপীড়ন দেখিলে ক্ষীণবাহুও কম্পিত হয়। কোন সম্পদ নাই তবু পরদুঃখে বেদনা জাগিয়া ওঠে। রূপের গৌরব নাই অথচ প্রাণে প্রেমের তরঙ্গ খেলে শিরে বিদ্যার ভার নাই কিন্তু মনে অবিদ্যার ঘৃণা আছে। আমি বলিলাম,—'মা! সত্যই কি এসেছিস্, না কোন অতীত যুগে হিমাদ্রি-ভবনে তোর আগমন হ'ত, বিস্মৃতির আবরণ সরাতে তার যে অভিনয় হ'য়ে গেল, আমার উষ্ণ মস্তিষ্কে তুই সেই অভিনয়ের প্রতিক্ষেপ মাত্র।'

মা বলিলেন,—'আমি নিত্য ও সত্য, সুরাসুর নরের জননী সর্ব্বজীবের সর্ব্বানন্দকরী মহাপ্রাণশক্তি। আমি যেখানে অভিনীত হই সেখানে উপনীত হই না। তবে আনন্দ-ময়ীর অভিনয়ে যে আনন্দ আছে সে আনন্দ অভিনেতৃগণ ও দর্শকবৃন্দ যথাকাম উপভোগ করে। প্রাণময়ীর অভিনয়ে প্রাণের উৎস কিছুক্ষণ ছুটতে থাকে, তারপর দুঃখ ঘিরে ফেলে, প্রাণ নিশ্চেষ্ট হয়। কিন্তু সত্যস্বরূপিণী আমার

আবাহন আবির্ভাব নহে, উদ্বোধন; আমার বিসর্জ্জন তিরোভাব নহে, তাহা অন্তর্নিধান। অজ্ঞানের প্রভাবে ভ্রান্ত জীব আমার নিত্যতা উপলব্ধি করতে পারে না। প্রাণময়ী আমি উদ্বুদ্ধ হ'লে প্রজ্ঞানেত্র সদাশিবকে শিরে ধারণ ক'রে দশভুজে দশ দিক্ হ'তে সিংহবিক্রমে খলতাবদ্ধ অত্যাচারী অসুরের দমন ক'রে থাকি। তখন সিদ্ধিসম্পদ্ এসে আমার দক্ষিণ দিক্ আলোকিত করে, শৌর্য্য ও বিদ্যা এসে আমার বাম দিক্ ভূষিত করে। আমি আনন্দময়ী, বিনাশের আনন্দ পেতে অসুরেরা বসন্তে আমার উদ্বোধন করে; সম্ভূতির আনন্দ পেতে দেবতারা শরতে আমার উদ্বোধন করে। অসুর-নিধনে, দেবতা-সংরক্ষণে আমার নিধান যেখানে হয় সেখানে আমি নিত্য বিরাজ করি। দুঃখের তুষারপাতে অঙ্গ হিম হ'লে, অত্যাচারের কশাঘাতে দেহ অচল হ'লে মানুষ কেঁদে আমার উদ্বোধন করতে চায়; কিন্তু আমার মহাশক্তি ধারণ করবার প্রতিমা গড়তে জানে না। যখন সুচতুর শিল্পী অনিত্যকুলের উচ্ছেদিত সুদৃঢ় কাষ্ঠ, পরার্থজীবন খরকরশুষ্ক তৃণসমূহ আর নিত্য পদদলিত হেয় মৃত্তিকার সংহতিতে আমার প্রতিমা গড়বে; যখন জ্ঞানশিখী ব্রাহ্মণ অদ্বৈত-মন্ত্রে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে, যখন ধনবান্ যজমান রত্নাভরণ দিয়া তার নগ্নতা ঢাকবে, যখন ভক্তপুরবাসী শ্রদ্ধার সম্ভার বহন করবে তখনই আমি মহাশক্তি হ'য়ে দেখা দেব। আমার শক্তির প্রভাবে প্রতিমাও সত্য হ'য়ে যাবে। অন্তরে অন্তরে সে শক্তির নিধান হ'লে ভবার্ণবে প্রতিমার বিসর্জ্জন করবে। যে উপর উপর দেখে সে বিজয়া সেবন করে আমার নিত্য প্রতিমা দেখতে পায় না। আর যে অন্তরে ডুব দিয়ে দেখে সে বিজয়া সেবন না করেও আমার প্রাণময়ী প্রতিমাকে পেয়ে সকল সিদ্ধিলাভ করে। সম্বৎসর অনেকবার ঘুরে এসেছে; কিন্তু যে সম্বৎসরে আমার আবাহন হয় সে সম্বৎসর তো কই আসে নাই। এখনও তোমাদের পৈতৃক কাঠামখানা ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপে বল্মীকের আবরণে ঢাকা রয়েছে। আমার প্রতিমা গড়তে শিল্পীকে খোঁজ, ব্রাহ্মণকে জাগাও, জ্ঞান পুঁথির মধ্যে না রেখে শিরে ধরতে বল, উদার যজমানকে উত্তেজিত কর, আপামর সাধারণকে শ্রদ্ধারণ করতে বল, চণ্ডীমণ্ডপের সংস্কার কর। আবার আমি প্রচণ্ডশক্তি ধারণ করব। দেবতারা নিজেদের তেজ পুঞ্জীকৃত করে আমায় জাগিয়ে ছিল। অসুরেরা আত্মবলি দিয়া আমায় কিনেছিল। তারা জানত আমি তাদের প্রাণের শক্তি। তাদের মত প্রত্যেক শক্তিবিন্দুকে প্রত্যঙ্গের প্রতি প্রধাবিত কর। প্রত্যঙ্গের শক্তি প্রতি অঙ্গে পুঞ্জীকৃত কর। সকল অঙ্গের শক্তি দেহে কেন্দ্রীভূত কর। দেখবে আমি এক অদ্বিতীয় মহাশক্তি! মৃত্যুবাহন মহিষাসুরের অত্যাচার হ'তে তোমাদের রক্ষা করতে বিরাট্ অবয়ব চালনা করছি। জানবে এ অসুর আমারি বলে বলীয়ান! আমার মহিমা প্রচার করতে এ অসুরকে আমিই কল্পনা করেছি। তাই দেবতার মত এ অসুর অমর। যদি অমৃতত্ত্ব লভিবে তবে এমনি করে আমার পূজায় দৃঢ়ব্রত হও।

আচারেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে; আচারে নিষ্ঠা-ভক্তির নিদর্শন। শব্দ আকাশে বিলীন হয় অর্থ থাকিয়া যায়। মন্ত্রে বিশ্বাস কর, মন্ত্রোচ্চারণে ভাব স্থায়ী হ'বে। বলের অনুশীলন কর, বাধা দিতে সক্ষম হ'বে; তপস্যা কর, সম্পদ আপনি আসবে, অনৌদার্য্যের আক্ষেপ রহিবে না। বিশ্বরূপের উপাসনা কর, রূপ ফুটে উঠবে; প্রেম প্রত্যাখ্যাত হ'বে না। বিদ্যার আলোচনা কর, অবিদ্যা লজ্জায় লুকাবে।

আমি সত্য বলছি—আমি প্রাণ, আমি শক্তি, আমিই বিশ্বের জননী। যে আমার আবাহন, বিসর্জ্জন জানে সে কখনও প্রাণহীন শক্তিহীন হয় না এই বলিতে বলিতে মা অন্তর্হিত হইলেন।

ক্রমে সে আলোক অস্পষ্ট হইয়া গেল। ঘুমের আঁধারে সব ঢাকা পড়িল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন শুনিতে পাইলাম কে যেন আমার ভিতর হইতে বলিতেছে—'আমি প্রাণ, আমি শক্তি; আমি প্রেম আমি ধর্ম্ম; আমি সিদ্ধি, আমি সম্পদ; আমি শৌর্য্য, আমি বিদ্যা; আমি তেজ, আমি যশ;...... সোঽহং।' এখনও সে ধ্বনি যেন কোন দূর-দূরান্তর হইতে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া ভাসিয়া আসিতেছে! তোমরা কি শুনিতে পাইতেছ?

পূজারী

(চিত্র)

শ্রীননীগোপাল নিয়োগী

পূজারী নিত্য পূজা করে। কি যে তার একাগ্র ব্যগ্রতা কে জানে! বাহ্যজগতের পরিচয় যেন সে রাখতেই চায় না। সাজিভরা রাশি রাশি ফুল—ডালাভরা নানা উপচার—পূজার কত আয়োজন! পূজার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কত ভক্ত-দর্শক সমবেত হয় সেই মন্দিরতলে; কিন্তু তাদের প্রাণের গভীর মর্ম্মকথা পূজারীর হৃদয় স্পর্শ করে না—তার পূজা স্বার্থনিহিত—বেদীপরে বিগ্রহের মুখের উপর কি যে মলিন বিষণ্ণতা তখন ফুটে ওঠে তা' তার চোখেই পড়ে না।

*　　*　　*

সেদিন সব আয়োজন ঠিক—নেই শুধু দূর্ব্বাদল। পূজারী বেরিয়ে যায়—ক্ষিপ্রপদে—মুক্ত দ্বার দিয়ে—দূর্ব্বার অনুসন্ধানে—ক্ষণেক পরে আবার ফিরে আসে। কিন্তু হায়, ক্রোধের বহ্নিশিখা তখন পূজারীর নয়নে প্রতিভাত। অদূরে ছিল শিশুর দল ব্রাহ্মণের অনুপস্থিতির সুযোগে নৈবেদ্যের উপচার নিয়ে তাদের অভিনয় লেগে গেছ্‌ল—তাদেরই উপর ব্রাহ্মণের সমস্ত ক্রোধ-গর্জ্জন বর্ষিত হ'ল। শিশুর সরল অজ্ঞানতার ভিতর থেকে যে অভিমান তখন জেগে উঠল তা' নিষ্ঠুরভাবে গিয়ে বাজল দেবতার অন্তরে—তাদের অশ্রুধারা নামবার পূর্ব্বেই যে দেবতার অশ্রুজল গো নে দেখা দিয়েছিল তা' পূজারীর লক্ষ্যেই এ'ল না।

*　　*　　*

সন্ধ্যাপূজার সময় হ'য়ে আসে; ব্রাহ্মণ এল পূজা করতে। কিন্তু সর্ব্বনাশ, দেবতা তো নাই! পূজারী আকুল হ'য়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়ে। দেবতাহীন শূন্য মন্দিরে বিশ্বের হাহাকার যেন তা'কে বিদ্রূপ করে উঠ্‌ল। দূর্ব্বাদল, পূজোপচার অবহেলায় পড়ে থাকে—পূজারী মন্দির থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে—তারপর—ছুটে চ'ল যায়—অনির্দ্দেশের পথে। একটা বিরাট নিঃস্বতা যেন তাকে উন্মাদ করে দিলে।

*　　*　　*

বহুদিন পরে ব্রাহ্মণ ফিরে এল। এবার তার বুকে এক নূতন প্রেমের আন্দোলন সাড়া দিয়েছে। সে এখন বালকদের নিয়েই থাকে—তাদের সেবা তার শ্রেষ্ঠ ব্রত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পূজামণ্ডপে দেবতার পুনরাবির্ভাব হ'য়েছে। পূজারী এখন নূতন করে নূতন অনুপ্রেরণা অনুভব করে—শিশুর অন্তরের ভিতর দিয়ে যেন সে ভগবানের অন্তর দেখতে পায়—আর দেখতে পায় মহান্ পবিত্রতার প্রতিচ্ছবি।

হতশ্রী

শ্রীস্নেহলতা সেন

মুকুরে হেরিয়া আপনার ছায়া শিহরি উঠি
রুক্ষ চিকুর কপালে, কপোলে প'ড়েছে লুটি
পলক বিহীন আমার যুগল নয়ন তারা
চাহিয়া র'য়েছে উদাসীর মত লক্ষ্য হারা
কাহারে বাঁধিতে চাহিছে আমার এ বাহু দুটি
মুকুরে হেরিয়া আপনার ছায়া শিহরি উঠি।

চরণের তলে কেন বারে বারে টলিছে ভূমি?
ওকি চায় মোরে আদর করিতে চরণ চুমি?
প্রিয়ারে স্মরিয়া বক্ষ দুলিছে ক্ষণে, ক্ষণে,
সে স্মৃতির ছবি এঁকেছি হৃদয়-দেবায়তনে।
অধর প্রান্তে পাগলের হাসি উঠেছে ফুটি,
ছায়াটুকু মোর মুকুরে হেরিয়া শিহরি উঠি।

মুকুর ফেলিয়া ভাবি, হায় কত হ'য়েছে ভুল,
মিলনের ক্ষণে সাজিনি যতনে, বাঁধিনি চুল,
সখারে সাজায়ে দিইনি আদরে পুষ্প ডোরে,
বিদায়ের ব্যথা সদা শঙ্কায় দিয়েছে ভ'রে।
আজ মনে হয় সে মধুক্ষণের সকল ত্রুটি
হেলায় শুকানো রূপ হেরে তাই শিহরি উঠি।

ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পে আসামের স্থান

শ্রীঅজিত ঘোষ

স্থাপত্য ভারতের একটী গৌরবের জিনিস। Vincent A. Smith বলিয়াছেন, "Architecture is the dominant art of India." শুধু যে ভারতের সভ্যতার ইতিহাসে উহার প্রভাব প্রবল শক্তিশালী তাহা নয়, উহা জগতের সভ্যতার বিরাট্ কীর্ত্তিস্বরূপ। অতীত জাতীয় সভ্যতার ইতিহাসে স্থপতি-বিদ্যার মত এরূপ মহান্ অবদান আর কোন দেশ জগতকে দিতে পারে নাই। দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্য, নালন্দা ও তক্ষশিলার ভগ্নস্তূপ অজন্টা, এলিফান্টা ও বাঘগুহার ভাস্কর্য্যনিচয়, মাহেঞ্জোদারো, ও পাহাড়পুরের সুপ্রাচীন শিল্প-সম্ভার ইহার অপূর্ব্ব নিদর্শন।

মূর্ত্তিশিল্প স্থাপত্যের একটী প্রধান অংশ। মূর্ত্তিশিল্প মৃন্ময়, প্রস্তর, ধাতু, চুণ, কাঠ, মোম প্রভৃতি যে কোন জিনিসে নির্ম্মিত হইতে পারে এবং যে কোন জিনিসেরও হইতে পারে। আমাদের আলোচ্যবিষয় কিন্তু মূর্ত্তিশিল্পের সেই অংশ, য হাকে ইংরেজীতে বলে 'Statuary.'

স্থাপত্যে ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পের প্রাধান্য খুবই বেশী। ভারতের সর্ব্বত্রই এই শিল্পের প্রাদুর্ভাব। মূলতঃ ধর্ম্মভাব লইয়াই উহারা গঠিত - অর্থাৎ উহারা বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ মূর্ত্তির অভিব্যঞ্জনা। ভারতের চিন্তাধারা ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; ধর্ম্মকে ছাড়িয়া ভারতবর্ষ মূর্ত্তির কল্পনাই করিতে পারে না।

জনার্দ্দন মূর্ত্তি—গৌহাটী

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আসামের মূর্ত্তিশিল্পই আমাদের আলোচ্য। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আসামের মূর্ত্তিশিল্প অনুন্নত নহে। প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলন ও অনুসন্ধানের যে প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহার ফলে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সফলতার পরিচায়ক ও আশাপ্রদ।

মূর্ত্তিশিল্পের মধ্যে শিলামূর্ত্তিরই প্রাচুর্য্য আসামে বেশী। আসামের নানাস্থানে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এখানকার মূর্ত্তিশিল্প প্রধানতঃ তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রথম, পর্ব্বতের গাত্রে খোদিত মূর্ত্তি; দ্বিতীয়, প্রস্তর-নির্ম্মিত স্বতন্ত্র মূর্ত্তি এবং তৃতীয়, মন্দিরের গাত্রে খোদিত অথবা বিশেষ বিশেষ ঘটনা-নির্দ্দেশক মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলি শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়; তবে উহাদের মধ্যে শাক্তধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় শিলামূর্ত্তিই খুব বেশী। মূর্ত্তিগুলি প্রাচীন কলার অনুপাতে এরূপভাবে গঠিত যে,উহাদের সময় ও তথ্য নিরূপণ করা একরূপ দুরূহ!

স্থাপত্য-শিল্পসম্ভারে দাক্ষিণাত্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুমিত। আসামের অনেক মূর্ত্তিশিল্পে ঐ শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার ছায়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ আসামের মূর্ত্তিশিল্প অনেক স্থানেই দাক্ষিণাত্যের অনুকরণ মাত্র।

আসামের কামাখ্যার মন্দির ভুবন-বিখ্যাত। উহার কারুশিল্প কাহারও অবিদিত নাই। কামাখ্যা গৌহাটীতে অবস্থিত। উহার হাতীমুড়া মন্দির ও সদিয়ার কেচাই-

শিলা-কালীমূর্ত্তি—শিবসাগর

খাইতী মন্দিরও সমধিক প্রসিদ্ধ—উহাদের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী দুর্গা ও কালী। এই দুইটী মূর্ত্তির শিল্পকলারও বিশেষত্ব এমন সুন্দর যে, দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। শ্রীযুক্ত লক্ষীনাথ বড়ুয়া শিবসাগরের ফুকন নামক নগরে একটী কালীমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন—উহা প্রস্তরনির্ম্মিত ও একটী বিশেষ কলার পক্ষপাতী। আরও অনেক শিলামূর্ত্তি ও কালীমূর্ত্তি শিবসাগরে পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু

ডিকগড়ে আবিষ্কৃত ও কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতি-গৃহে রক্ষিত পিত্তলের দুর্গামূর্ত্তি ও বিষ্ণুমূর্ত্তি

শ্রীযুক্ত বড়ুয়া মহাশয়ের আবিষ্কৃত এই নূতন মূর্ত্তিটীর বিশেষত্ব খুব স্পষ্ট। বৈষ্ণবধর্ম্মসম্বন্ধীয় মূর্ত্তিগুলির মধ্যে অশ্বক্রান্তের বিষ্ণুমূর্ত্তি ও নানা বাহন-বিশিষ্ট বিষ্ণুমূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। এই বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলির ভাস্কর্য্য ও কারুকার্য্য বিশেষ নিপুণতার পরিচায়ক। ইহার একটী দৃষ্টান্ত আমরা পাই গৌহাটীর অশ্বক্রান্ত-মন্দির হইতে। ঐ মন্দিরের দেববিগ্রহ বিষ্ণুমূর্ত্তি অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম-কারুকার্য্য খচিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আসামের মূর্ত্তিশিল্প অনেকস্থানে দাক্ষিণাত্যের অনুকরণে গঠিত। অশ্বক্রান্তের এই বিষ্ণুমূর্ত্তিটীই উহার একটী দৃষ্টান্ত স্বরূপ। দাক্ষিণাত্যের বিষ্ণুমূর্ত্তির সহিত এই মূর্ত্তিটীর কোনরূপ অসামঞ্জস্য দেখা যায় না।

মন্দিরের দেওয়ালে অঙ্কিত মূর্ত্তিগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনামূলক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয়—একথার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সচরাচর আসামদেশে দশ-অবতার-মূর্ত্তি খোদিত থাকে। এতদ্ভিন্ন সূর্য্য, ব্রহ্মা, বরুণ, বলরাম, পরশুরাম প্রভৃতিরও মূর্ত্তি দেখা যায়। ইহা ছাড়া গণেশ ও শিবলিঙ্গের মূর্ত্তিও খোদিত থাকে—তবে এরূপ দৃষ্টান্ত কম।

ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের ইতিহাসে আসামের কামরূপ, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, গৌহাটীর চিত্রকূট পর্ব্বত, শুক্রেশ্বর মণিকূট পর্ব্বতের দেবালয়, শালগ্রাম, গোয়ালপাড়ার সূর্য্য প্রাহাড়, তেজপুর নগর, বামনী পর্ব্বত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান। গৌহাটীর শুক্রেশ্বর মণিকূট পর্ব্বতের হয়গ্রীব-মাধবের মন্দিরের নাম উল্লেখযোগ্য। ঐ মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে আসামের যে সমস্ত মূর্ত্তিশিল্পের নিদর্শন আছে, তাহা বাস্তবিকই সুন্দর ও বিস্ময়প্রদ।

আসামদেশে মন্দিরগুলির বেদীর উপরে দুই প্রকার মূর্ত্তি স্থাপিত থাকে। আসামে উহাদের বলে 'চলন্তা মূর্ত্তি' ও 'অচলা মূর্ত্তি'। পূজার্চ্চনার জন্য যে বিগ্রহ পূজা-বেদীতে স্থাপিত থাকে তাহাকে বলে 'অচলা মূর্ত্তি' আর অন্যান্য যে সকল মূর্ত্তি ইতঃস্তত: থাকে তাহাদের বলা হয় 'চলন্তা মূর্ত্তি'। 'চলন্তা মূর্ত্তি' অর্থে যে মূর্ত্তির ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার শক্তি আছে, আর 'অচলা মূর্ত্তি' অর্থে যে মূর্ত্তির নড়িবার শক্তি নাই, উহা কেবল এক স্থানে অধিষ্ঠিত থাকে। আসামের কি চলন্তা, কি অচলা—অনেক মূর্ত্তির সহিত লিপি সংযোজিত থাকে। ঐ লিপিসমূহ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। গোলাঘাটের দেও-পানীর বিষ্ণুমূর্ত্তির গাত্রে এইরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দেও-পানীর বিষ্ণুমূর্ত্তিটী প্রত্নতাত্ত্বিকগণ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করেন। এই অনুমান যে উহার লিপি হইতে করা হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ-ভারতের আর একটী অনুকরণের উদাহরণ নৃসিংহমূর্ত্তি। আসামের নানাস্থানে এই মূর্ত্তির প্রাচুর্য্য দেখা যায়। বহু মূর্ত্তি ছিন্নমস্তা, সুতরাং উহাদের মূর্ত্তিতত্ত্বের তথ্যাবিষ্কারে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। তেজপুর নগর ও বামনী পাহাড়ের মূর্ত্তি অসংখ্য—এগুলি প্রধানতঃ দেবদেবীর মূর্ত্তি। গৌহাটীর শুক্রেশ্বর মন্দিরে স্থাপিত জনার্দ্দন-মূর্ত্তি বিশেষ বিখ্যাত। এই মূর্ত্তিটী যেমন বিরাট্ তেমনই সুন্দর। আজ পর্য্যন্ত আসামের অন্য কোন স্থানে এরূপ মূর্ত্তি আর আবিষ্কৃত হয় নাই, এমন কি ইহা ভারতের যে কোন জনার্দ্দনমূর্ত্তির সমতুল্য হইতে পারে। অনেকে এই মূর্ত্তিটীকে বৌদ্ধ-মূর্ত্তি বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কামরূপের হয়গ্রীব-মাধব মূর্ত্তিকেও অনেকে বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন। লক্ষ্মীপুর জেলার শিলামূর্ত্তির বাহুল্য খুব। ইহাদের লইয়াও বৌদ্ধ ও হিন্দু মতভেদ দেখা যায়। শিবসাগরের প্রাচীন শিলামূর্ত্তিগুলি খুবই সুন্দর। একস্থানে কতকগুলি
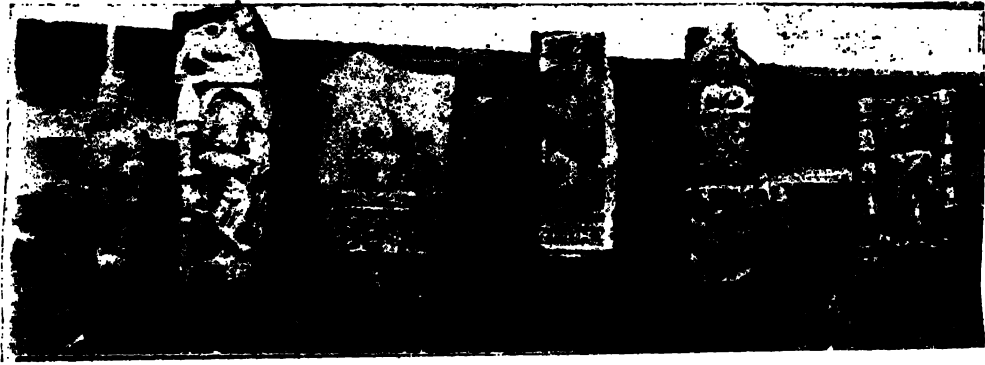
আসামের কয়েকটী মূর্ত্তি—বাম হইতে দক্ষিণে—(১) গোলাঘাটের বিষ্ণুমূর্ত্তি (২) অজ্ঞাত (৩, ৪, ৫, ৬) যথাক্রমে বিষ্ণুমূর্ত্তি, সিংহমূর্ত্তি, নৃসিংহমূর্ত্তি ও বিষ্ণুমূর্ত্তি।

মূর্ত্তিকে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি বিষ্ণুমূর্ত্তি।

শিবলিঙ্গের মূর্ত্তির সংখ্যাও আসামে অনেক। গঙ্গার উপনদী গণ্ডকী নদীর তীরে এই স্থান অবস্থিত। শালগ্রাম হিন্দুর একটী প্রসিদ্ধ স্থান—উহাতে হিন্দুগণ স্নান করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করেন। এই শালগ্রামে বহু শিবলিঙ্গ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন গোয়ালপাড়ার সূর্য্যমন্দিরেও অগণিত শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গৌহাটীর চিত্রাচল পর্ব্বতের নবগ্রহের মূর্ত্তি শিবলিঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রমতানুসারে নব-গ্রহের মূর্ত্তি বিভিন্ন ও নানা লক্ষণযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরের নবগ্রহ-মূর্ত্তি হইতে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গৌহাটীর শুক্রেশ্বর-মন্দিরে স্থাপিত শিবলিঙ্গও সুবৃহৎ।

আসামের মূর্ত্তিশিল্পে আর এক প্রকার বিশেষ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—উহারা নগ্ন মূর্ত্তি। কামরূপের কামদেব মদনের ধ্বংসাবশেষে বহু নগ্ন প্রণয়াসক্ত মূর্ত্তি আছে। স্থানীয় অনুসন্ধান-সমিতির গৃহে এইরূপ কতক-গুলি নগ্ন মূর্ত্তি আছে। উহাদের অপরূপ গঠন-সৌন্দর্য্যের ভঙ্গিমা অনুপম। কামশাস্ত্রীয় মতে যে উহাদের গঠন হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আর একটী বিশেষ শ্রেণীর মূর্ত্তি গোপাল-মূর্ত্তি, যাদব-মূর্ত্তি ও বংশীবাদন-মূর্ত্তিতে সন্নিবেশিত। গোপাল-মূর্ত্তি ও যাদব-মূর্ত্তি প্রভৃতির অপেক্ষা বংশীবাদন-মূর্ত্তির সংখ্যাই বেশী। কুচবিহার অঞ্চলে ও আসামের আরও নানাস্থানে এগুলি দেখা যায়।

এই তো গেল শিলা-মূর্ত্তির কথা। এছাড়া ধাতুমূর্ত্তি-সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন; কারণ শিলা-মূর্ত্তির ন্যায় আসামের ধাতুমূর্ত্তিও সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই মূর্ত্তিগুলি সোণা, রূপা, পিতল, তামা ও ব্রোঞ্জের নির্ম্মিত। এগুলি অসমীয়া জাতির পারিবারিক জীবনে, গোঁসাই-ঘরে প্রায়ই দু'একটা দেখা যায়। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে গোপাল-মূর্ত্তি, যাদব-মূর্ত্তি, বংশীবাদন-মূর্ত্তি, গোবিন্দ-মূর্ত্তি, ও কালী বা কৃষ্ণমূর্ত্তিরই প্রচার বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুচবিহারের রাধাবিহীন বংশীবাদন মূর্ত্তি, আউনীআটীর গোবিন্দমূর্ত্তি, দক্ষিণপাটের যাদবমূর্ত্তি উৎকৃষ্টতম। ডিব্রুগড়ের তিনিচুকিয়া নামক স্থানে একটী দুর্গামূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, মূর্ত্তিটীর ভঙ্গিমা অতি সুন্দর এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-ময়। এই শ্রেণীর আর একটী প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি গৌহাটীর মঙ্গল-চণ্ডীমূর্ত্তি।

আসামের ধাতুমূর্ত্তির প্রচলন যে কেবলমাত্র আসাম-প্রদেশের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল তাহা নয়, ইহার বাহিরেও অস-মীয়া শিল্পী-গঠিত মূর্ত্তি লইয়া যাওয়া হইত। ইহার প্রমাণ আমরা অনেক পাই। কাশীতে এইরূপ একটী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সেটী অসমীয়া শিল্পী গঠিত।

শাস্ত্রীয় মতে দেবদেবীর নাম, লক্ষণ, ভঙ্গিমা, প্রতিষ্ঠা ও অলঙ্কার-সজ্জা বিভিন্ন প্রকারের। মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আমরা এই সত্য নিরাকরণ করিতে পারি। (১)

শিলা-বিষ্ণুমূর্ত্তি—জুবিলী গার্ডেন, গোহাটী

আসামের ধাতুমূর্ত্তি শিলামূর্ত্তিরই অনুরূপ। উভয়ের বৈশিষ্ট্য একরূপ এবং উভয়েরই গঠন-সৌন্দর্য্য ও ভঙ্গিমা-মাধুর্য্য মনোরম। *

(১) এই সমুদয় শাস্ত্রনিচয় মন্থন করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, শিলামূর্ত্তির হাতে শঙ্খ, চক্র, খেটক, অঙ্কুশ, গদা, বাণ, অগ্নি, বজ্র, শূল, মুষল, হাল, পরশু, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র থাকে; বীণা, ডমরু, মুরলী, বংশী, ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্য থাকে; কমণ্ডলু, দর্পণ, কপাল, পুস্তক, অক্ষমালা, নীলোৎপল পদ্ম প্রভৃতি দ্রব্য থাকে; বরদা, অভয়মুদ্রা, কটকমুদ্রা, জ্ঞানমুদ্রা, যোগমুদ্রা শুচিহস্ত, কার্য্যবলম্বিনহস্ত, দণ্ডহস্ত গজহস্ত, অঞ্জলি-হস্ত, বিস্ময়হস্ত প্রভৃতি বিবিধ লক্ষণযুক্ত হস্ত থাকে; পদ্মাসন, কূর্ম্মাসন, মকরাসন, ভদ্রাসন, প্রভৃতি আসন থাকে; হার কেয়ূর, কঙ্কণ, মেখলা, কটিবন্ধ, কুচবন্ধ, ভুজবলয়, কুণ্ডল, পত্রকুণ্ডল, রত্নকুণ্ডল, সর্পকুণ্ডল, মকরকুণ্ডল, শ্রীবৎস, বৈজয়ন্তী প্রভৃতি অলঙ্কার থাকে, আর থাকে মস্তকাভরণ বা মুকুট। এই মুকুট—জাতমুকুট,-কিরীটী-মুকুট, মকরগুমুকুট নামে বিদিত।

* এই প্রবন্ধ-সঙ্কলনে অসমীয়া ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা কটকী মহাশয়ের সাহায্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি।

ভূমধ্যসাগরে ইংরাজশক্তি

সসাগরা ধরণীর ৫২,৫০০,০০০ বর্গ মাইল আয়তনের ১২ ০০০,০০০ বর্গ মাইল ইংরাজের। আজ ইংরাজ শুধু তরবারি দিয়া নহে, তাহার ভাষা দিয়া, সাহিত্য দিয়া, তাহার শিক্ষা ও সাধনা দিয়া, নানা জাতি ও নানা বর্ণের প্রায় ৪৫ কোটী মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চায়। ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরাজের ললাটে জয়টীকা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। আজ জেনেভার "জাতি-সঙ্ঘ"কে উপহাস করিয়া ইংরাজের কণ্ঠে সগর্ব্বে এমন কথাই উচ্চারিত হয়—"The British Emp're embraces parts of every continent and includes sections of all the major races of mankind, with their diversities of colour, creed and culture. It is so to speak a microcosm of the world and consequently all the main problems of worl l-society can be found in operation within it......The dominions and Britain together constitute a unque international soc'e'y. It is a league of nations more closely bcund together than the League of Geneva by common traditions and sentiments aud a preponderance of common blood." শুধু "League of Nat'ons" নহে, ইংরাজ-সাম্রাজ্য ... ধীরে ধীরে একপ্রকার "L.:ague of Races" হইতেই চলিয়াছে।

জিব্রল্টার

ভূমধ্যসাগরে, রাষ্ট্রবিৎ ইংরাজ-শক্তি ঘাঁটি আগলাইয়াছে—জিব্রল্টার ও মাল্টায়।

৭১১ খৃঃ মুর সেনাপতি তারিক বর্ব্বর গণশক্তিকে তিন দিনের মহাযুদ্ধে পরাভূত করিয়া আন্দালুসিয়া ও বার্বাস অধিকার করেন ও আফ্রিকার সহিত সংযোগ রক্ষা করিবার জন্য "মনস্ কাল" নামক গিরিশৃঙ্গের উপর এই সুদৃঢ় দুর্গ স্থাপন করেন। ৭৪২ খৃঃ ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হয়। ১৩০৯ খৃঃ স্পেন ইহার উদ্ধার করে; কিন্তু ১৩৩৩ খৃঃ পুনরায় ইহা মুরাধিকৃত হয় ও ১৪১১ খৃঃ উহা গ্রাণাডার মুরশাসনকর্ত্তার অধীন হয়। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ইহা আবার যখন স্পেনের হস্তান্তরিত হয়, স্পেনরাজ্যের খাস দখলে ইহাকে সুদৃঢ়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়।

১৭০৪ খৃঃ ২৪ জুলাই অষ্ট্রীয়ার মিত্ররূপে সংযুক্ত ইংরাজ ও ডচ সেনা তিন দিন ধরিয়া অবরোধ করিয়া এই গিরিদুর্গ অধিকার করে। চতুর বৃটিশ এড্মিরাল স্যার জর্জ্জ রূক নিজের দায়িত্বে সেই দিনই সেখানে ইংরাজের জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দিলেন ও রাণী আনীর নামে উহা ইংরাজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। ইহার পর বারংবার স্পানিয়ার্ডগণ ইহার পুনরুদ্ধার-প্রয়াসী হইলেও, সফলকাম হয় নাই। কিন্তু ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ-ঘোষণার সুযোগ পাইয়া স্পেন যে পঞ্চবর্ষব্যাপী সুদীর্ঘ অবরোধ করে। ইংরাজের অসীম বীরত্ব ও আত্মদানে তাহাও অবশেষে ব্যর্থতায় পরিণত হয়। তদবধি জিব্রল্টার ইংরাজেরই করায়ত্ত আছে।
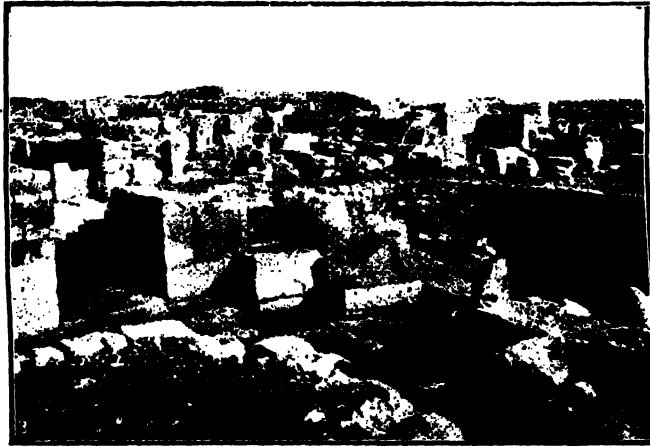
হাল টার্কসিয়ান শহরের সাধারণ দৃশ্য

মাল্টা

ভূমধ্যসাগরে ইংরাজের দ্বিতীয় ঘাঁটি—মাল্টা। প্রসিদ্ধ কার্থেজ-জেনারেল হ্যানিবলের জন্মভূমি এই প্রাচীন দ্বীপে খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ফিনিসিয়ন জাতির এক শাখা প্রথমে আসিয়া বসতি স্থাপন করে ও পরে রোমের সহিত বিরোধিতার ফলে ইহা রোমের হস্তগত হয়। নির্ব্বাসনদণ্ডপ্রাপ্ত সিসেরো এই স্থানই নির্ব্বাসনের জন্য সর্ব্বপ্রথমে মনোনীত করেন। আবার জগদ্বিখ্যাত সেণ্টপল জাহাজ-ডুবি হইয়া এই দ্বীপেই আসিয়া না কি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাল্টার যে সকল স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগেরও বহু স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন

পাওয়া যায়, তন্মধ্যে হাল টার্সিয়ানই প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। এই স্থানটী প্রত্নতাত্ত্বিকগণ-কর্তৃক বৈজ্ঞানিকভাবে খনিত হওয়ায় যে মন্দিরাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহা এক সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

রোমের বিরাট সাম্রাজ্য দ্বিখণ্ড হইয়া বিভক্ত হইলে, মাল্টা কন্‌ষ্ট্যান্টী-নোপল-সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। ৮৭০ খৃঃ তৃতীয়বার আরব আক্রমণ হইলে, মাল্টাবাসী বাইজাইণ্টাব চমুর বিরুদ্ধপক্ষ গ্রহণ করিয়া বহু সহস্র গ্রীক হত্যা করে। আরবগণ মাল্টার সভ্যতা ও ভাষার উপর কিন্তু বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ১০৯০ খৃঃ নর্ম্মান বীর কাউণ্ট রজার সিসিলি বিজয়পূর্ব্বক মাল্টায় উপনীত হন; মাল্টাবাসী তাঁহাকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া অভিনন্দন করেন। এই নর্ম্মনারাই দ্বীপ হইতে মোস্‌লেম প্রভাব দূরীভূত করে।

১৪২৭ খৃঃ তুর্কগণ মাল্টা লুণ্ঠন করে; ১৫৬৫ খ্রীঃ যে বিপুল তুর্ক-বাহিনী মাল্টা অবরোধ করে, সেণ্ট জন সম্প্রদায়ের বীরবৃন্দ অতুল বিক্রম তাহাদিগকে প্রতিহত করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপে মুসলমান শক্তির অগ্রগতি চিরদিনের জন্য নিরস্ত করিয়া দেয়। এই বীরমণ্ডলীর মধ্যে

সাইপ্রাসের দুর্ভেদ্য ভার্জিন দুর্গ

যার একজন ইংরাজ নাইট ছিলেন—তাঁহার নাম অলিভার ষ্টার্কি। এই বিজয়লাভের পর এই নাইট সম্প্রদায়ের প্রভাবপ্রতিপত্তি সারা ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হয় ও দলে দলে তরুণ বীরবৃন্দ আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন; এই সম্প্রদায়ের নেতা লাভ্যালেটের নামে যে মহাদুর্গ বিনির্ম্মিত হয়, তাহা সত্যই জগতে অতুলনীয়।
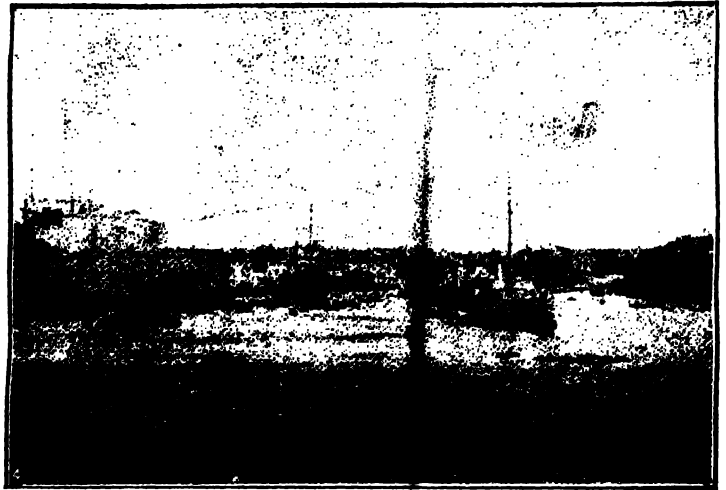
মাল্টার বন্দর ইংরাজ নৌ-ভূমিকা

১৭৯৮ খৃঃ নেপোলিয় বোনাপার্ট অতি সহজেই মাল্টা জয় করিয়া, ছয় দিন পরে মিশরাভিযানে প্রস্থান করেন। পরে নীল নদীতীরে বোনাপার্টির পরাজয়ে, মাল্টাবাসী ফরাসী আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও এই বিদ্রোহকালে ইংরাজকর্ত্তৃক অবরোধের সম্ভাবনায় সমধিক উৎসাহিত হয়। বৃটিশ এডমিরাল নেলসন পর্টু গীজের সহায় করিয়া দ্বীপে অবতরণ করিয়া ফরাসীদের হস্ত হইতে উহা উদ্ধার করে। ফরাসীর পাশাপাশি ইংরাজ পতাকা উড়িতে আরম্ভ করে ও ১৮১৪ খৃঃ প্যারীর সন্ধিপত্রে মাল্টাকে খাস বৃটীশ রাজ্যেরই অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হয়।

পরিশেষে যেদিন মাল্টার স্বভাষাকে বেদখল করিয়া ইংরাজী ভাষাকেই আদালতের ভাষায় পরিণত করা হইল, সেদিন পুঞ্জীভূত মর্ম্মবেদনা ধূমিয়া ধূমিয়া মাল্টার জাতীয় নেতা মিজ্জীর নেতৃত্বে ইতালীয় ভাষার সপক্ষে আন্দোলন আরম্ভ হইল ও ১৮৯৯ খৃঃ এই আন্দোলনই ক্রমে প্রবলতর হইলে জাতীয় পক্ষ শাসনপরিষদের সহিত সকল সম্পর্ক বর্জ্জন করিল। ইহার ফলে মাল্টায় কঠোর আমলাতন্ত্রই পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়। অবশ্য মহাযুদ্ধে প্রাণপণ সহায়তা করায়, ১৯২১ খৃঃ মাল্টাবাসী নাম মাত্র কিছু শাসনসংস্কার পাইয়াছে।

সাইপ্রাস

ভূমধ্যসাগরের ইংরাজের তৃতীয় অধিকার-ভূমি—সাইপ্রাস দ্বীপ। এই ক্ষুদ্র দ্বীপটীর লোকসংখ্যা তিন লক্ষাধিক। তন্মধ্যে মুসলমান ৬১,৪২২ জন ও অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ গ্রীক অর্থাৎ খৃষ্টান। কাজেই হিন্দুর স্থানে খৃষ্টানকে ধরিলে, এই রমণীয় দ্বীপ ঠিক যেন ভারতেরই একটী

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলিয়া অনায়াসেই মনে হইতে পারে। ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যার ন্যায় সাইপ্রাসের খৃষ্টান-তুর্ক সমস্যা তাহার অখণ্ড স্বাধীন জীবনের ঘোর অন্তরায়স্বরূপ বিরাজ করিতেছে।

এখানে খৃষ্টান ও মুসলমানদের পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তবে ইংরাজী পাঠশালায় জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষেই শিক্ষা প্রদান করা হয়।

সাইপ্রাস প্রাচীন দেশ। ট্রোজান যুদ্ধের সমকালেই বোধ হয় পাফো ও সালামিসে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। গ্রীক ও ফিনিশিয়ান সংমিশ্রিত সভ্যতার কেন্দ্ররূপেই এই দ্বীপ ৫৬০ পূঃ খৃঃ ষড়বিংশ রাজবংশীয় মিশর-রাজ দ্বিতীয় অহ্মাসিক-র্ত্তৃক বিজিত ও অধিকৃত হয়।

আবার ৫২৫ খৃঃ পূঃ পারস্যরাজ ক্যাম্বিসেস মিশর জয় করিলে, সাইপ্রাস স্বতঃই আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক দরায়ুসের রাজ্যান্তর্ভুক্ত পঞ্চম সাত্রাপি বলিয়া পরিগণিত হয়। ৫০০ খৃঃ পূঃ যবন (আইওনিয়া) বিদ্রোহদমনে সাইপ্রাস পারস্যকে ১৫০ খানি জাহাজ দিয়া সাহায্য করে। ৩৩৩ খৃঃ পূঃ ইসাসের যুদ্ধে ম্যাসিডনরাজ আলেকজান্দার বিজয়-লাভ করিলে, সাইপ্রাসের সমস্ত নগর-রাষ্ট্রগুলি তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করে; কিন্তু ৩২৩ খৃঃ পূঃ তাঁহার মৃত্যুর পরেই সমগ্র দ্বীপ আবার মিশররাজ টলেমির করায়ত্ত হয়। ম্যাসিডোনিয়া আর একবার আধিপত্য-স্থাপনে প্রয়াস করিলেও, টলেমি ইহা ক্ষিপ্র পুনরধিকার করেন। মাঝে একবার এই দ্বীপ স্বাধীনতা লাভ করে; কিন্তু ৫৮ খৃঃ পূঃ ঋণের দায় শোধ করিতে না পারায়, ইহা রোমরাজ্যের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হয়। ২য় শতাব্দীতে জুগণ প্রবল হয় ও বিদ্রোহের জয়ধ্বজা তুলিয়া বিরাট্ হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে; কিন্তু শীঘ্রই সে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।

অখণ্ড রোম-সাম্রাজ্যের পতনে, সাইপ্রাস পূর্ব্ব-খণ্ডের রাষ্ট্রভুক্ত হয় ও দীর্ঘ সপ্ত শতাধিক বৎসর ধরিয়া ইহারই অধীনতা চলে। ৬৩২ খৃঃ আরবজাতির আক্রমণ আরব্ধ হইয়া তিন শতাব্দী ধরিয়া ধারাবাহিক চেষ্টার পর খলিফা ওঠমানের অধীনে ইহা একবার মুসলমানাধিকৃত হয়; কিন্তু দুইবৎসর পরেই আবার সম্রাট্-কর্ত্তৃক আরবগণ বিতাড়িত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে হারুণ আল-রশিদ আর একবার ইহা জয় করেন; কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষভাগে ইহা পুনশ্চ বাইজাইণ্টাইন শাসনভুক্ত হয়। ইহার শাসনকর্ত্তৃগণ কার্য্যতঃ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারীই হইয়াছিল। ১৮৪ খৃঃ ক্রুজেডারদের ইচ্ছাপূর্ব্বক অবমাননা করায়, সাইপ্রাসের স্বেচ্ছাচারী শাসক আইজ্যাক্ কমেনাস ইংলণ্ডরাজ প্রথম রিচার্ডের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করেন। রিচার্ড আইজ্যাককে পরাস্ত ও বন্দী করেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া নাইট্‌স্ টেম্পলারদের তাহা বিক্রয় করেন। ইঁহারা আবার দ্বীপটি জেরুসালেমরাজ গুই লুসিগন্তানকে পুনরায় বেচিয়া ফেলিলেন। গুই-এর ভ্রাতা আমোরি রাজোপাধি গ্রহণ

মাল্টার রাজধানী ভ্যালিটা

করিয়া সাইপ্রাসে যে স্বাধীন রাজবংশের সূচনা করেন, তাহা প্রায় তিন শতাব্দী ধরিয়া ধারাবাহিক অনুসৃত হয়। ইঁহারা সাইপ্রাসে সামন্ততন্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন ও পশ্চিম ইউরোপের উন্নতিশীল সভ্যতার বিবিধ অনুষ্ঠানও সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত হয়। এই সাইপ্রাস রাজগণই জেরুসালেমরাজ ও পরে আর্ম্মেনিয়ারও রাজা বলিয়া উপাধি ধারণ করিতেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, ইহা ভিনিশিয়ান গণতন্ত্রের হস্তগত হয় ও ৮২ বৎসরকাল এই শাসন চলে। ১৫৭০ খৃঃ তুর্করাজ দ্বিতীয় সেলিম ৬০,০০০ সেনা লইয়া সাইপ্রাস আক্রমণ করেন ও দীর্ঘ দিন অবরোধের পর রাজধানী নিকোসিয়া অধিকার ও অধিবাসিবৃন্দকে হত্যা করেন। ভিনিস তুর্কদের আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তিন শতাব্দী ধরিয়া তুর্কশাসন স্থায়ী হয়। তুর্ক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ উপস্থিত হয় ও ১৮৭৮ খৃঃ ৪ঠা জুন সুলতানের সহিত সন্ধির ফলে, সুলতানকে নামে স্বীকার করিয়া ইংরাজগণই সাইপ্রাসের শাসন-ভার কার্য্যতঃ নিজহস্তে গ্রহণ করে। ১৯১৪খৃঃ ইউরোপের কুরুক্ষেত্র-সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই সাইপ্রাসকে খাস বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হইয়াছে। লুসেনের সন্ধিপত্রে এই অন্তর্ভুক্তি তুর্কও যথারীতি মানিয়া লইয়াছে।

ইংরাজাধিকারের প্রথম সূচনায়, দ্বীপের গ্রীক অধিবাসিবৃন্দ কতকটা

আগ্রহসহকারে এই নবশাসন অভিনন্দিত করিয়াছিল—তুর্কের উৎপীড়ন-মুক্ত হওয়ার আশাই তখন তাহাদের একমাত্র আশু কাম্য ছিল। কিন্তু গ্রীকের রক্তকৌলীন্য অন্তরে অন্তরে সজাগ হইয়া ইহাদিগকে অখণ্ড গ্রীসের অঙ্গীভূত হইবার অনির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তুর্কগণ বোধহয় স্বাধীনতাই চায়। ভূমধ্যসাগরের ইংরাজ সাম্রাজ্যান্ত-

সাইপ্রাসের দ্বিতীয় শহর লাইমসল

র্গত এই ক্ষুদ্র দ্বীপেও আজ জাতীয়তার যে গর্ভবেদনা ভোগ চলিয়াছে পরিণাম কোথায়—অদূর ভবিষ্যতের ইতিহাস-লেখকই তাহার সত্য উদ্ধার করিয়া দেখাইবেন। (প্রবর্ত্তক, অগ্রহায়ণ)

রোগ নিবারণের ছয়টী সাধারণ উপায়

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মধ্যে উপবাসের প্রতি একটা অনুরাগ উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় যেরূপ উপবাস দেওয়া হইত—তাহার প্রণালী পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের ব্যবস্থিত উপবাস-প্রণালী হইতে বিভিন্ন। এসম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে যাহা ছিল, তাহাই আমরা এক্ষণে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

রোগনিবারণের নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদে যে ছয় প্রকার সাধারণ উপায় অবলম্বিত হইত,—তাহারই অন্তর্গত লঙ্ঘন-প্রক্রিয়ার একতম ব্যাপার উপবাস।

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই সাতটী পদার্থ মনুষ্য-শরীরের মূল উপাদান। ইহারা শরীরকে ধারণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ধাতু এবং ইহারা দোষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দূষিত অর্থাৎ রোগগ্রস্ত হয় বলিয়া ইহাদিগকে দূষ্যও বলে। দোষ—বায়ু, পিত্ত ও কফ।

'দোষ' অর্থাৎ বায়ুপিত্ত-কফ—ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন, অথচ একত্র সদ্ভাবে অবস্থান করে ও পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু যখন ইহাদের মধ্যে একটীর বৈষম্য বা প্রকোপ উপস্থিত হয়, তখন অন্যান্য দোষদ্বয়েও বৈষম্য উপস্থিত হয়।

প্রকুপিত দোষের প্রশমন করার নাম চিকিৎসা। এই প্রশমন-কার্য্য বা চিকিৎসা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। মহর্ষি অগ্নিবেশ বলিয়াছেন—"দোষাণাং বহুসংসর্গাৎ সংকীর্য্যন্তে হ্যুপক্রমাঃ" অর্থাৎ দোষ সকলের বহু সংসর্গবশতঃ তাহাদের প্রতীকার অসংখ্য প্রকারের হইলেও উহাদের উদ্দেশ্যসকল বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, উহারা ছয়টী প্রধান বিধির উপর ব্যবস্থাপিত। সেই ছয়টী ক্রিয়াকে যিনি জানেন অর্থাৎ কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ প্রকার ক্রিয়া কর্ত্তব্য এবং কি প্রকারে সেই ক্রিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল হইয়া রোগের উপশম করে ও অন্যবিধ রোগের উৎপত্তি না করিতে পারে—ইত্যাদি যিনি বিশেষরূপে অবগত আছেন—তিনিই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।

রোগোপশমের অসংখ্য উপায় যে ছয়টী মাত্র উপায়ের অন্তর্গত, তাহাদের নাম, লঙ্ঘন, বৃংহণ, রুক্ষণ, স্নেহন, স্বেদন ও স্তম্ভন। ঐ ছয়টী বিধি-সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞাতব্য এই যে, দেহ-ধারণ করিতে হইলে সর্ব্বদা দুইটী বিপরীত ভাবের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়, নতুবা কখনও মানুষ বাঁচিতে পারে না। দেহকে রক্ষা করিতে হইলে পান-ভোজনের যেমন প্রয়োজন, পান-ভোজন ত্যাগ করিয়া নিরম্বু উপবাসেরও তেমনই প্রয়োজন। আহারের গুণে যেমন শরীর সুস্থ, সবল, কর্ম্মক্ষম ও দীর্ঘ-জীবী হয়, আহারের দোষেও তেমনই শরীর অসুস্থ, দুর্ব্বল, কর্ম্মাক্ষম ও অচিরজীবী হইয়া থাকে। যেখানে আহারের দোষে শরীরে রসবৃদ্ধি, জ্বর, পেটের অসুখ ও অজীর্ণ প্রভৃতি দেখা দেয়, তথায় সেই সকল দোষের প্রতীকারের জন্য উপবাসের একান্ত প্রয়োজন। হিন্দুশাস্ত্র সুস্থ ব্যক্তিরও পক্ষান্তে একদিন উপবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কর্ম্মময় মনুষ্য জীবনে স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যহ দেহের ক্ষয় হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন

যখনই কোন রোগ আসিয়া দেহকে পীড়িত করে, তখন স্বাভাবিক পথ্যাদির অভাবে অথবা রোগপ্রবাহে ও রোগান্তে শরীর ক্ষয় হইতে থাকে। তখন সেই ক্ষয় নিবারণের জন্য, পুষ্টিকর, বলকারক ঔষধ-পথ্যাদির একান্ত আবশ্যক হইয়া থাকে, এজন্য যাহাতে ক্ষয় নিবারিত হইয়া শরীর সুস্থ, সবল ও পুষ্ট হইতে পারে—তাহার জন্য যে ব্যবস্থা আয়ুর্বেদ নির্দ্দেশ করেন—তাহারই নাম বৃংহণ। সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবারণের জন্য প্রয়োজন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে রুক্ষণ ও স্নেহন পরস্পর বিপরীত গুণসম্পন্ন। আহার ও উপবাস যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ, রুক্ষণ ও স্নেহনও তদ্রূপ।

শরীরকে স্নিগ্ধ রাখা, সেজন্য ঘৃত তৈল প্রভৃতি পান ও অভ্যঙ্গাদিরূপে প্রত্যহ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু নিত্য পরিবর্ত্তনশীল শরীরের স্বাভাবিকভাবে অথবা রোগাদি দ্বারা এমন সকল অবস্থা কখন কখনও আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন শরীরকে স্নেহনের বিপরীত রুক্ষণের দ্বারা সুস্থ রাখিতে হয় অথবা রোগমুক্ত করিতে হয়। পক্ষান্তরে শরীরের স্নেহের আতিশয্য উপস্থিত হইলে, বায়ুবৃদ্ধি হইলে, অথবা শরীর শুকাইয়া যাইতে থাকিলে স্নেহনেরও আবশ্যক হইয়া থাকে।

জীবন যাত্রার দুইটী বিশেষ কর্ম্ম—ত্যাগ আর গ্রহণ। এই ত্যাগ ও গ্রহণ ব্যতিরেকে মানুষ বাঁচিতে পারে না, সুতরাং দেহও থাকে না। এজন্য মানুষ কেন, জীব মাত্রেই পান-ভোজনাদির গ্রহণ ও মল মূত্রাদির বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। রোগে ইহাদের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। অতিসার অর্থাৎ পেটের অসুখ, বহুমূত্র ও ক্ষয় প্রভৃতি অত্যধিক মাত্রায় হইতে থাকে, তখন উহাদের প্রতিরোধ করিবার জন্য স্তম্ভনের আবশ্যক হইয়া থাকে। এই লঙ্ঘন, বৃংহণ, রুক্ষণ, স্নেহন ও স্তম্ভন ব্যতীত অসুস্থ দেহকে সুস্থ করিতে হইলে আর একটী ক্রিয়া চিকিৎসার অঙ্গরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহার নাম স্বেদন।

জগতে অসংখ্য খাদ্যপদার্থ বিদ্যমান আছে, প্রত্যেকের স্বাদ বিভিন্ন। তথাপি সেই অশেষ আস্বাদ্য পদার্থকে যেমন ছয়টী মাত্র রসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়, তদ্রূপ অসংখ্য প্রকারের চিকিৎসা প্রণালীও এই লঙ্ঘন বৃংহণ, রুক্ষণ, স্নেহন, স্তম্ভন ও স্বেদন নামে ছয়টী উপায়ের অন্তর্গত। চিকিৎসক রোগনিবারণের নিমিত্ত যতই কিছু নূতন বা পুরাতন উপায় অবলম্বন করুন না কেন, সে সমস্তই ঐ ছয়টী মাত্র উপায়ের মধ্যে পরিগণিত হইবেই।

—শ্রীরাখালদাস সেন
(আয়ুর্বিজ্ঞান-সম্মিলনী)

হরিতকী

[illegible] লাটিন নাম—"চেবুলা মায়রোবোলাম, (Chebulia Myro-[illegible])। এদেশের অনেক জঙ্গলে ইহা এত প্রচুর জন্মে যে, ইহা এদেশের সওদাগরেরা ক্রয় করিয়া বিদেশে পাঠাইয়া থাকেন; ইহা সংগ্রহ করিলে এদেশের অনেক লোকের অন্নের সংস্থান হয়।

এই হরিতকীর অশেষ গুণের কথা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এত আলোচিত হইয়াছে যে, আমাদের সামান্য স্থানে তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

বিদেশের রসায়নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এবং চিকিৎসকগণ এই হরিতকী সম্বন্ধে কি মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে বোধ হয় মন্দ হইবে না।

বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নাল নামক চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকা বলেন, "ইহা বিরেচক, অভ্যস্ত কোষ্ঠ বদ্ধতায় ইহা সুন্দর কার্য্যকরী। আমাদের যত প্রকার বিরেচক ঔষধ আছে, ইহা তাহার তালিকাভুক্ত হইতে পারে।

'We have tried it carefully in several cases of habitual constipation and have no doubt it is a valuable addition to our list of laxatives.

ডাক্তার ওয়ারিং বলেন, এই হরিতকী বাজারে সকল বেনের দোকানেই পাওয়া যায়। ইহা কষায় আস্বাদ বিশিষ্ট, একটু লম্বা, ৫।৬টী শিরা বিশিষ্ট। ইহাকে চিবুলীক হরিতকী বলে (Chebulic)। হরিতকীর বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, পাটকিলে রঙ্গের।

মৃদু বিরেচকরূপে ইহা ব্যবহার করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে ব্যবহার করিলে ২।৩ দাস্ত কোষ্ঠ সাফ হইতে পারে। ইহাতে পেট বেদনা হইবে না।

পূর্ণ বয়স্কের জন্য হরিতকী চূর্ণ	১ ড্রাম
দারুচিনি চূর্ণ	১ ঐ
জল বা দুগ্ধ	৪ আউন্স

দশ মিনিট অগ্নিতে চড়াইয়া নামাইয়া ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা হইতে দাও। এই পরিমাণে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি খাইলে ২।৩ বার পরিষ্কার দাস্ত হইবে।

১৪।১৫ বৎসরের বালকের মাত্রা উহার অর্দ্ধেক, ৮।১০ বৎসরের বালকের পক্ষে সিকি মাত্রা; খুব ছোট ছেলেকে ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপ দেওয়া উচিত।

ইহার আর একটী বিশেষ গুণের কথা বলিব। ইহার ক্ষত আরোগ্যকারী ক্ষমতা অদ্ভুত। যে সকল ক্ষতে রস এবং পুঁজ প্রচুর পরিমাণে পড়িতে থাকে, তাহাতে নিম্নলিখিত মলমটী দিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

হরিতকী চূর্ণ }
খদির চূর্ণ } সমভাগ।

উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া খুব ভাল গাওয়া ঘৃতের সহিত উত্তম রূপে মিশাইবে, যেন পাতলা না হয়, মলমের মত হইবে। তাহাই [illegible] বা তুলার দ্বারা ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিলে, অবিলম্বে প্রায় ক্ষত [illegible]

ক্ষত আরোগ্য হইয়া যাইবে। দুইটী জিনিসই সঙ্কোচক (astringent)। একটা দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদান করা গেল। পরমীর রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, পায়ের চাটুর উপর একটী ক্ষত হইয়া, প্রচুর জলবৎ দুর্গন্ধ স্রাব বাহির হইতে থাকে। স্থানীয় ডাক্তারগণ ইহাতে আইডোফরম, বোরাসিক, কার্ব্বলিক তৈলাদি দ্বারা ড্রেসিং করিয়া সুফল দেখাইতে পারেন নাই। স্ত্রীলোকটী ক্রমে মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন; ক্ষতের অবস্থা দেখিয়া নিম্নলিখিত ঔষধটী প্রয়োগ করা হয়।

(১) জাঙ্গী হরিতকী — সিকি তোলা
(২) চিকি সুপারী — ঐ
(৩) জৈনপুরী খদির — ঐ

ইহার প্রথম দুটীকে কাঠের কয়লার আগুনে অর্থাৎ Charcoalএর মধ্যে দগ্ধ করিতে হয়। যখন খুব লাল হয়, তখন আগুন হইতে বাহির করিয়া একটা বাটী চাপা দিতে হয়, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া জাঙ্গী হরিতকী ও সুপারীগুলি কাল হইয়া যায়। বাটী চাপা না দিয়া হাওয়ায় ফেলিয়া রাখিলে, জিনিস দুটী ভস্ম হইয়া যাইত কোন কাজ হইত না। তারপর জৈনপুরী খদিরকেও আগুনে দিয়া একটু কড়া করিয়া লইতে হয়। তারপর হামানদিস্তায় ফেলিয়া খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একটি মটর পরিমিত তুঁতেকে (Sulphate of copper) অগ্নিতে পোড়াইয়া যখন সাদা হইয়া যায়, তখন ঐ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া আরও পিষিয়া একটি নেকড়ায় সমস্তগুলি রাখিয়া একটা পুঁটলী করিতে হয়। ক্ষতস্থান উত্তমরূপে নিম পাতার জলে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া, সেই পুঁটলীটা আস্তে আস্তে ক্ষতের উপর নাড়িলেই সূক্ষ্ম বস্ত্র মধ্য দিয়া যে গুড়া পড়ে, তাহার উপর ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়।

ফলাফল

প্রথম দিবসেই স্রাব বন্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয় দিবস ধৌত করিয়া দেখা গেল ক্ষতস্থান স্বাস্থ্যযুক্ত, লাল হইয়াছে; তৃতীয় দিবস ক্ষত স্থান আর খোলা হয় নাই। ৭ দিন পরে ক্ষত আরোগ্য হইয়া একটি চটা উঠিয়া গেল, রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলেন। একটী স্ত্রীলোকের স্তনে ক্ষত হইয়া ক্যানসারের মত হইয়াছিল, একবার তাহাতেও উক্ত ঔষধ দিয়া আশাতীত সুফল পাওয়া গিয়াছিল। হরিতকী যাহা বাজারে বিক্রয় হয়, উহা বহুবার গুণ বিশিষ্ট, ইহাতে প্রচুর পরিমাণে গ্যালিক এ্যাসিড বিদ্যমান থাকে। কাঁচা হরিতকীর বিরেচক গুণ অধিক। হরিতকী অশেষ গুণবিশিষ্ট, এদেশেই জন্মে কিন্তু এদেশের লোকে এ সকল বিষয়ে উদাসীন, তা না হইলে আমাদের এমন দশা হইবে কেন?

(ব্যবসা ও বাণিজ্য)

বন্ধু অচেনা মোর

বন্দে আলী মিঞা

অচেনা বন্ধু নয়নে তোমার হলুদ ফুলেরআলো,
বেগুন কুঁড়ির কচি তনু তব লাগিয়াছে মোর ভালো।
তোমারে দেখিয়া মনে হয় মোর ছিলে কবে আপনার
ভুলে গিয়েছিনু—তারি ব্যথা লয়ে এসেছো কি আরবার।
এ জনম আগে কবে নাহি জানি ছিলে তুমি মোর কেহ
আজ আসিয়াছ বন্ধু কি তাই ভরিতে এ অমাগেহ!
প্রাতে এলে তুমি রাতের পথিক অচেনা বধূর বেশে
তোমারে হেরিয়া আপনারে আজি হারাইনু নিঃশেষে।
কাছে বসাইয়া ওই চোখে চাহি কহিতে নারিনু কথা
জানো নাকি রাণী কিসের ব্যথায় বাজে এই ব্যাকুলতা!

তোমারি আদল অমনি কাজল অমনি গড়ন তার
পেয়েছিনু তায় একছড়া যেন কল্‌মি ফুলের হার,
বুকে এনে তায় পরিনু গলায় আঁধার পথের 'পরে
ভেবেছিনু মনে লয়ে যাবো ওরে সারাটি জীবন ভরে।
গোপন কামনা কুঁড়ির মতই নীরবে রহিল ঢাকা
দুখ নীড়ে তার রহিল পড়িয়া চরণ-চিহ্ন আঁকা।

চট্টগ্রাম-লুণ্ঠন
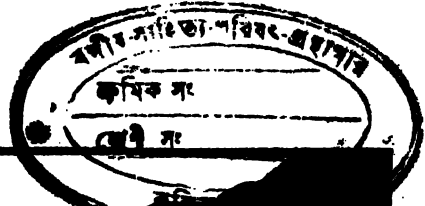
মুসলমানগণ কর্ত্তৃক চট্টগ্রামের লুণ্ঠনের ফলে হিন্দু ব্যবসায়ী ও মহাজনগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। লক্ষপতি আজ পথের ভিখারী হইয়াছে; সৌধবাসীকে বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। আসাম-বঙ্গযোগি-সম্মিলনীর সম্পাদক মহাশয় যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন এবং সংবাদপত্রসমূহে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চট্টগ্রামের যোগিজাতীয় মহাজন ও ব্যবসাদারগণই অত্যধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

	নাম	ঠিকানা	ক্ষতির পরিমাণ
১।	শ্রীশশিকুমার নাথ	চাক্‌তাই	৪০ ৲
২।	শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরী	খাতুনগঞ্জ	১,৫৩,৪৫০৲
৩।	শ্রীরেবতীরমণ মহাজন	ঐ	৫,০০০৲
৪।	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র নাথ বেপারী	ঐ	৩৮,০ ০৲
৫।	শ্রীজীব কৃষ্ণ মহাজন	ঐ	১ ৩৪০০৲
৬।	শ্রীনন্দকুমার মহাজন	বক্সীর হাট	৮৫,০০০৲
৭।	শ্রীরজনীকান্ত নিশিকান্ত মহাজন	বিট্‌নীগঞ্জ	১২,০০০৲
৮।	শ্রীজলধর এণ্ড ব্রাদার্স	ঐ	১৮,০০০৲
৯।	শ্রীপ্রসন্নকুমার মহাজন	টেরী বাজার	২২, ০০৲
১০।	শ্রীদ্বারকানাথ মহাজন	ঐ	৬,০০০৲
১১।	শ্রীযাত্রামোহন নাথ	রামপুর	৫০০৲
১২।	শ্রীগোপালকৃষ্ণ নাথ অধিকারী	ঐ	৪,০২৫৲
১৩।	শ্রীনিত্যানন্দ নাথ মহাজন	হোলাহাট	১৮,০০০৲
১৪।	শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাথ	নছিরাবাদ	১,০০০৲
১৫।	শ্রীরামকৃষ্ণ নাথ	ঐ	৫০০৲
১৬।	শ্রীরমেশচন্দ্র শর্ম্মা	ঐ	৩৫০৲
১৭।	শ্রীঅম্বিকাচরণ নাথ	ঐ	৫০০৲
১৮।	শ্রীজগবন্ধুনাথ মোহরের	হালিসহর	১৪,৭০০৲
১৯।	শ্রীরামকুমারনাথ মহাজন	ঐ	৪৭৭৫৲
২০।	রসিকচন্দ্র নাথ	ঐ	৪০০৲
২১।	শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ নাথ	ঐ	১২৫৲
২২।	শ্রীরমেশচন্দ্র নাথ	হালিসহর	৫০৲
২৩।	শ্রীভৈরবচন্দ্র মহাজন	মুরাদপুর	২,০০০৲
২৪।	শ্রীদীনবন্ধু নাথ	খন্দকীয়া	১,০০০৲

উপরোক্ত তালিকা সম্পূর্ণ নহে। কারণ গ্রামাদিতে যে সমস্ত স্বজাতীয় গৃহস্থ লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের সকলের সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। এই দুর্দ্দিনে দরিদ্র যোগিজাতির যে অর্থনাশ ঘটিল তাহার পূরণ কি আর হইবে?

—যোগিসখা

শান্তিপুরস্থ বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ্

বিগত ৭ই কার্ত্তিক অপরাহ্নে শান্তিপুরস্থ "বঙ্গীয় পুরাণ-পরিষদের" ত্রয়োবিংশ বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রহরব্যাপী বৃষ্টিপাত সত্বেও সভাগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। যথারীতি উদ্বোধন-সঙ্গীত ও সভাপতি মহাশয়ের অভিনন্দন-পত্র প্রদানের পর পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিষদের বর্ত্তমান অন্যতম সম্পাদক শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন মহাশয় ত্রয়োবিংশ বর্ষের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে বার্ষিক পুরাণ পরীক্ষার ফল অনুসারে পরীক্ষার্থিগণকে ৩ খানি সুবর্ণ পদক, ১৭ খানি রৌপ্যপদক পুরস্কার এবং উপাধি ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করা হয়। আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন হইলে স্থানীয় দুই একজন মহোদয় পরিষদ-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। পরে নির্ব্বাচিত সভাপতি যশোহর বীরেশ্বর আর্য্যবিদ্যাপীঠের প্রধান অধ্যাপক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভারতী স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসা-তীর্থ মহাশয় তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণে পুরাণের উৎপত্তি হইতে বর্ত্তমান পরিণতি পর্য্যন্ত ইতিহাস-প্রসঙ্গে বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করেন। পরিষদ ও শান্তিপুরবাসী জনসাধারণের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভাভঙ্গ হয়।

—হিতবাদী

নিখিল বঙ্গ কৃষক ও শ্রমিক কন্‌ফারেন্স

ময়মনসিংহ জিলার কৃষক ও শ্রমিকদলের উদ্যোগে বর্ত্তমান বৎসরের শীতকালের শেষভাগে এই নগরে নিখিল বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক [illegible]

কারেন্সের অধিবেশন হইবে বলিয়া এক বিজ্ঞাপন বিতরিত হইয়াছে। ঐ বিজ্ঞাপনে প্রকাশ আগামী ২০শে অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় স্থানীয় পাট অফিসের নিকট শ্রীযুত হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের বাসভবনের দক্ষিণদিকের ময়দানে ময়মনসিংহ জিলার সমস্ত শ্রমিক, কৃষক ও তাহাদের হিতৈষী ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী অভ্যর্থনা কমিটী গঠন করিবার জন্য এক সভার অধিবেশন হইবে। শুনা যায় এই কন্‌ফারেন্সে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় নাকি সভাপতিত্ব করিবার জন্য স্বীকৃত হইয়াছেন। যাহাতে ধনী দরিদ্র উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়, সাম্প্রদায়িক ব্যাধি যেন কৃষক শ্রমিকের মধ্যে আর সংক্রামিত হইতে না পারে এবং দেশের কৃষক শ্রমিকদের ষোল আনা স্বার্থ সংরক্ষিত হইতে পারে এবং জমিদার ও কৃষক শ্রমিকদের মধ্যে পরস্পরের স্বার্থের একটা মীমাংসা হয় তজ্জন্য সমস্ত বাঙ্গালায় একটী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন জন্য এই কন্‌ফারেন্স আহ্বানের কারণ বলিয়া বিজ্ঞাপনদাতা জানাইয়াছেন।

- চারুমিহির

বিরাট্ কৃষক সভা

গত ২৫শে অক্টোবর সোমবার কুলছড়ি বন্দরে এক বিরাট্ কৃষক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় বাবু দেবীপ্রসাদ সিংহ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নিখিলবঙ্গ প্রজাসমিতির সেক্রেটারী মৌঃ রজিবদ্দিন তরফদার সাহেব প্রায় তিন ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া জমীদার এবং মহাজনগণের অন্যায় অত্যাচারে যে দেশ দিনের পর দিন ধ্বংসের পথে যাইতেছে, তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি আরও বলেন, জমিদার এবং মহাজনগণের কর্ত্তব্য দেশের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা যেন সুদের হার কমাইয়া টাকা আস্তে আস্তে কিস্তিবন্দী মূলে আদায়ের ব্যবস্থা করেন, অন্যথায় দেশের অকল্যাণের সহিত তাঁহাদের অকল্যাণও অনিবার্য্য। অতঃপর মৌলবী মুনছেক আলী সাহেব বক্তৃতা করেন এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার পর রাত্রি ১০টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

—হিতবাদী

পদব্রজে দেশ-ভ্রমণ

ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য গত ১৩৩০ সালের ৩রা ডিসেম্বর পদব্রজে দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তিনি ১২ই অক্টোবর বোম্বাই পৌঁছিয়াছেন। এ যাবৎ তিনি ৩০০০ মাইল পথ চলিয়াছেন। বোম্বাই হইতে তিনি সুরাট, নাসিক ও অজন্তায় গিয়াছেন।

—চুঁচড়া বার্ত্তাবহ

রংপুরে ক্ষত্রিয় মহিলা জাগরণ

[illegible] জেলার অন্তর্গত বড়াইল গ্রামে গ্রাম্য মহিলাদের সম্প্রতি এক [illegible] সভা হইয়াছে। এই সভায় রংপুরের [illegible] উকিল শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সিংহ মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা জগৎতারিণী বর্ম্মণী ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বর্ম্মণ মহাশয়ের বিদুষী কন্যা শ্রীযুক্তা কৃষ্ণকুমারী বর্ম্মণী মহাশয়া বর্ত্তমান সমস্যার প্রতিকার ও ক্ষত্রিয় নারী-সমাজের উন্নতিসাধনকল্পে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার ফলে চুড়ি পরিহীতা মহিলাগণ তৎক্ষণাৎ হাতের চুড়ি খুলিয়া ফেলেন এবং সমবেত মহিলাগণ বিদেশীবর্জ্জনে বদ্ধপরিকর হয়েন।

রংপুরের ক্ষত্রিয় মহিলা দেশ এবং নারী সমাজের উন্নতিপরিকল্পে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। আমরা কামনা করি তাঁহাদের জয়যাত্রা রংপুরবাসীর মুখ উজ্জ্বল করিবে।

—রঙ্গপুর-দর্পণ

কাঁথিতে গান্ধী-মেলা

মহাত্মা গান্ধীর কাঁথি আগমনের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া কাঁথি সহরের পূর্ব্ব-প্রান্তবর্ত্তী দারুয়া লাগার হাট ময়দানে গান্ধী মেলা হইয়া আসিতেছে। এবারও গত শারদীয় উৎসবের সময় তথায় ৫।৬ দিন ধরিয়া এই মেলা বসিয়াছিল। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মেলা উদ্বোধন করেন। কয়েকদিন মেলায় বক্তৃতা, ছায়াবাজী, ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা ও বেতার-বার্ত্তাদি হইয়াছিল। বহু নরনারী মেলায় যোগদান করিয়াছিলেন।

—নীহার

প্রশংসনীয় কার্য্য

ভাগ্যকুলের জমিদার মৃত নন্দলাল রায় মহাশয়ের বিধবা পত্নী শ্রীমতী শ্যামরঙ্গিণী রায় চৌধুরাণী গত অষ্টমী পূজার দিবস প্রায় এক হাজার গরীব লোককে ভোজন করাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকেশ্বরী মিলের ৫ শত কাপড় দান করিয়াছেন। তিনি একটী অন্নছত্র খুলিয়াছেন। সেখানে প্রত্যহ ২৫।৩০ জন, অন্ধ খোঁড়া প্রভৃতি লোককে খাবার দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত একটী জলছত্রও তিনি খুলিয়াছেন।

—ঢাকা প্রকাশ

নবাবজাদার আকস্মিক মৃত্যু

আমরা আজ গভীর শোকের সহিত জানাইতেছি আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন নবাবজাদা হৈয়দ মহম্মদ হোসেন সাহেব মাত্র দুই দিন হৃদরোগে ভুগিয়া গত ১৫ই অক্টোবর রাত্রি ১ ঘটিকার সময় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মুসলমান-সমাজের বিশেষ সম্মানিত সায়েস্তাবাদ মীরবংশীয় নবাব মোয়াজ্জম হোসেন চৌধুরী সাহেবের পুত্র। ইহার অগ্রজ ভ্রাতা ব্যারিষ্টার ৺মোতাহার হোসেন। নবাব সাহেব স্বর্গীয় ব্রজমোহন দত্তের সমসাময়িক সদরওয়ালা (ছোট আদালতের জজ) ছিলেন। নবাব সাহেব দীর্ঘায়ু ছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমান জাতিবর্গ নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রীতিভাজন ছিলেন। ব্যারিষ্টার ৺মোতাহার হোসেন স্বদেশীযুগে ৺অশ্বিনীকুমারের সহকর্মী ছিলেন এবং জিলা কন্‌ফারেন্সের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। স্বদেশী-

যুগে বিশেষতঃ সায়েস্তাবাদ নবাব-পরিবারের আদর্শ প্রভাবে বাখরগঞ্জ জিলায় কোন হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামা হয় নাই। ৺মোতাহার হোসেন সাহেবের মৃত্যুর পরে নবাবজাদা মহম্মদ হোসেন সাহেব সায়েস্তাবাদ ষ্টেটের আমরণ মোতোয়ালী ছিলেন।

যৌবনে তিনি স্পেস্যাল সবরেজিষ্ট্রার ছিলেন। কর্ম্মোপলক্ষে তিনি সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র ও কবিবর হেমচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। স্বর্গীয় অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ নবাবজাদা সাহেবের পরম বন্ধু ছিলেন এবং তাহার সঙ্গে তিনি বহুকাল সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন। তিনি আমরণ সাহিত্যসেবী ছিলেন এবং তাঁহার পুস্তকাগারে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের পুস্তক সংগৃহীত ছিল এবং এতবড় বিশাল পুস্তকাগার বাংলাদেশে অতি কমই আছে। তিনি গ্রন্থরাজীর মধ্যেই নিমজ্জিত থাকিতেন এবং গ্রন্থগুলি তাঁহার কাছে "প্রিয়াৎ প্রিয়তরং" ছিল।

তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের মত তাঁহাকেও কোনদিন হীন সাম্প্রদায়িকতা স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি সম্ভ্রান্ত মুসলমানবংশীয় কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বলে তিনি প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াস করেন নাই—তাঁহার উদারতার জন্যই তিনি হিন্দু-মুসলমানের শ্রদ্ধাভাজন ও স্থানীয় জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ও ব্রজমোহন স্কুল-কমিটির সভাপতি হইয়াছিলেন এবং স্থানীয় বিবিধ সদনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন।

তিনি একবার ৺অশ্বিনীকুমারের শ্রাদ্ধবাসরে এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর বরিশালে আগমনোপলক্ষে বিরাট জনসভাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কলিকাতা মুসলমান কনফারেন্সে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সমাধানে সভাপতির অভিভাষণ বাংলার প্রাণে বিশেষ স্পন্দন আনিয়াছিল। বর্ত্তমান সঙ্কটে নবাবজাদা সাহেবের মত উচ্চ-শিক্ষিত সম্ভ্রান্তবংশীয়, উদারহৃদয় মুসলমান নেতার অভাব বরিশাল তথা সমগ্র বাংলার প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবে। আমরা আশা করি তাঁহার উদার আদর্শ হিন্দু ও মুসলমান সমাজকে অনুপ্রাণিত করিবে। আমরা সাশ্রু নয়নে তাঁহার উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

—বরিশাল

বালিকাদের প্রশংসনীয় কার্য্য

রাজসাহী পি, এন, গার্লস্ হাই স্কুলে ছাত্রীরা তাহাদের বার্ষিক পুরস্কার গ্রহণ না করিয়া ঐ টাকা পূর্ব্ববঙ্গের বন্যাপীড়িতদের সাহায্যকল্পে পাঠাইয়াছে। পুরস্কার-বিতরণী সভার সভাপতি বালিকাদিগকে খাওয়াইবার জন্য ও তাহাদের আমোদ প্রমোদের জন্য ১ শত টাকা দিয়াছিলেন। সেই টাকাও বালিকারা কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। আমরা এই বালিকাদিগকে কি বলিয়া প্রশংসা করিব, জানি না। ইহাদের প্রাণে যে সৎকার্য্যের প্রেরণা আপনা-আপনি আসিয়াছে, তাহা দিন দিন বর্দ্ধিত হউক। মতিভ্রান্ত ও অবিবেচক লোকের প্ররোচনায় যে সকল নারী অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত সর্ব্বজনসমক্ষে নৃত্য ও অভিনয় করিতে লজ্জিত হন না, তাঁহারা রাজসাহীর এই বালিকাদের পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্য হউন।

—সঞ্জীবনী

খুলনায় সর্ব্বপ্রথমে বিজলী বাতি

খুলনা জেলার অন্তর্গত কপিলমুনির ন্যায় পল্লীগ্রামে সর্ব্বপ্রথমে বিজলীবাতি জ্বলিয়াছে। পল্লীবন্ধু রায় সাহেব বিনোদবিহারী সাধু মহাশয় তাঁহার জন্মভূমি কপিলমুনি গ্রামে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন ও তৎসংলগ্ন একটী টেক্‌নিক্যাল স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। সেই টেক্‌নিক্যাল স্কুলে ইলেক্‌ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, কার্পেনটারী, উইভিং ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবার জন্য যে মোটর ডায়নামো বসান হইয়াছে, তাহা হইতে কপিল-মুনির রাস্তায়, 'হাইস্কুলে' তাঁহার নব-প্রতিষ্ঠিত "ভরতচন্দ্র ইনডোর হাঁসপাতালে', 'বেদমন্দিরে' ও তাঁহার আবাস ভবনে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। রায় সাহেবের অক্লান্ত চেষ্টায় আজ সুদূর পল্লীবাসিগণ সহরের যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগদখল করিতে চলিল। ভগবান রায় সাহেবকে দীর্ঘজীবী করুন।

—খুলনাবাসী

রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

গত ২০শে নভেম্বর ভোর ৫টার সময় রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে অকস্মাৎ সন্ন্যাস-রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স একাত্তর বৎসর হইয়াছিল। স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই সময় সংযুক্ত প্রদেশের কলেজগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি প্রথমে কিছুদিন মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়া স্যার চার্লস্ এলেন সাহেব যখন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান হন, সেই সময় মিউনিসিপ্যালিটীর সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন পদে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বৌবাজার রিফিউজের এবং কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের অনারারি সেক্রেটারী, যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজির কোষাধ্যক্ষ এবং কলিকাতা গীতা-সোসাইটীর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাহা ছাড়া শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকারের তালতলা এম ই স্কুলের ৩০ বৎসরকাল সভাপতি থাকিয়া বহু উপকার করিয়াছিলেন। গত ২০শে [illegible] তাঁহার সম্মানার্থ এই স্কুল বন্ধ রাখা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে [illegible] মহাশয় একজন নিরপেক্ষ ছিলেন। তাঁহার [illegible]

লোক ছিল। অন্ত্যেষ্টির সময় তাঁহার বহু বন্ধুবান্ধব নিমতলার ঘাটে উপস্থিত ছিলেন।

—বঙ্গবাসী

নবদ্বীপে নব নারী-আশ্রম

আমরা অবগত হইলাম, নবদ্বীপে এক নব নারী-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সিন্ধুদেশের এক ব্যক্তি এই আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ঐ আশ্রমে গৃহশিল্প ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং বরপণ লইয়া বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের সহিত আশ্রমবাসিনীদের বিবাহ হইবে। বাঙ্গালী অবলাদের হিন্দী শিক্ষা দেওয়া হইবে, এই সংবাদ পাঠ করিয়া আমাদের মনে নানা আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। অবলাদিগকে সিন্ধু ও পাঞ্জাবে বিবাহ দেওয়ার জন্যই যেন হিন্দী শিক্ষা দান করা হইবে এই সন্দেহ হইতেছে। শুনা যায়, সম্প্রতি নবদ্বীপে এক জন সিন্ধির সহিত একটী বাঙ্গালী মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহের ঘটক কে, তাহা জানা আবশ্যক। নবদ্বীপের অধিবাসীরা এই আশ্রমের তত্ত্বানুসন্ধান করুন। কে ইহার স্থাপন কর্তা, কে ইহার অর্থদাতা, তাহার খবর লউন। এই আশ্রম কোথা হইতে বাঙ্গালী মেয়ে পায়, তাহা জানা প্রয়োজন। —বঙ্গবাসী

ব্যবসা ও বাণিজ্য

ভারতে বীমা-ব্যবসায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নূতন বীমার পরিমাণ

আলোচ্য বর্ষে বীমা কোম্পানীগুলি জীবন-বীমার ব্যবসায়ে এক লক্ষ ৪৩ হাজার চুক্তিপত্রে (policy) স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরে নূতন বীমার পরিমাণ ২৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। ইহা হইতে বার্ষিক ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা হারে প্রিমিয়ম (চাঁদা) আদায় হইবে। ভারতীয় কোম্পানীগুলি এক লক্ষ ৩ হাজার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া মোট, ১৬½ কোটি টাকার নূতন জীবন বীমা ও বিদেশী কোম্পানীগুলি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ৯১ হাজার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া মোট ১৫½ কোটি টাকার নূতন জীবন-বীমা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (বিদেশী কোম্পানীগুলির নিকট হইতে আলোচ্য বর্ষে নূতন বীমার হিসাব সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত হয় নাই।) ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে নূতন বীমা হইতে ভারতীয় কোম্পানীগুলি প্রায় ১ কোটি টাকা প্রিমিয়ম পাইয়াছিলেন।

ভারতে মোট বীমার পরিমাণ

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লভ্যাংশ সহ ভারতে মোট জীবন-বীমার পরিমাণ ১৪২ কোটি টাকা; ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে উহার পরিমাণ ছিল—১২৪ কোটি টাকা; ভারতীয় কোম্পানীগুলির ৭১ কোটি টাকা ও বিদেশী কোম্পানীগুলির ৫২½ কোটি টাকার জীবন-বীমা সংগ্রহ করিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ভারতীয় কোম্পানীতে জীবন-বীমার পরিমাণ ৭ কোটি টাকা এবং বিদেশী কোম্পানীতে উহার পরিমাণ ১১½ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত ভারতে ব্যবসায়কারী দেশী ও বিদেশী কোম্পানীগুলি মোট ৬,৫৬,০০০ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ১৪২ কোটি টাকার জীবন-বীমা গ্রহণ করিয়াছে; ইহাতে বার্ষিক প্রিমিয়ম বাবদ ৭ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা আয় হয়। ভারতীয় কোম্পানীগুলি বৎসরে প্রায় ৪ কোটি টাকা প্রিমিয়ম পায়; সুদ ও অন্যান্য লাভ-সহ আলোচ্য বর্ষে তাহাদের ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে জীবন-বীমা-ভাণ্ডারে (Life-fund) গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ১½ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

বাতিল বীমার পরিমাণ

পাঠকগণ অনেকেই বোধহয় অবগত আছেন যে, নিয়মিতভাবে প্রিমিয়ম না দিলে চুক্তিপত্র বাতিল (lapse) হইয়া যায়। চুক্তিপত্র বাতিল হইয়া গেলে বীমা-কারী উক্ত

চুক্তির সর্ত্তানুসারে কোন সুবিধা পান না ; পূর্ব্বে যে টাকা তিনি প্রিমিয়ম বাবদ দিয়াছেন কোম্পানী তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লন।

প্রতিবৎসর ভারতে বহু টাকার বীমা ও চুক্তিপত্র প্রিমিয়ম না দেওয়ায় বাতিল হইয়া যায়। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এত বেশী টাকার চুক্তিপত্র বাতিল হয় না। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার চুক্তিপত্র অর্থাৎ নূতন সংগৃহীত বীমার প্রায় শতকরা ৩০ জন বাতিল হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এজেন্টগণই দায়ী। কোম্পানীগুলি অত্যধিক কমিশন দিয়া এজেন্ট নিযুক্ত করেন। এজেন্টও প্রথম বৎসরে মোটা রকমের দাঁও মারিবার উদ্দেশ্যে (বীমাকারীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা না করিয়াই) অনেক সময় জোরজবর-দস্তি করিয়া বীমা সংগ্রহ করেন। (আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব)- এজেন্টের অনুরোধে অনেকে বীমা করেন ও দুই একটা প্রিমিয়ম দেওয়ার পর চুক্তিপত্র স্বেচ্ছায় বাতিল করাইয়া দেন। এজেন্টগণ নিজ স্বার্থসিদ্ধির অলীক আশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বীমাকারীর লাভ-লোকসান চিন্তা করিলে ভারতে প্রতি বৎসর ৫ কোটি বা ততোধিক টাকার চুক্তিপত্র বাতিল হইতে পারে না।

বিভিন্ন দেশে বীমার পরিমাণ

বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে মাথা পিছু (per head) বীমার পরিমাণটী সম্পর্কে সরকারী রিপোর্টে একটি পরিচ্ছেদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নিম্নে আমরা উহা উদ্ধৃত করিলাম :—

দেশের নাম	জনসংখ্যার অনুপাতে "মাথাপিছু" বীমার পরিমাণ
আমেরিকা	২০০০৲ টাকা
কানাডা	১৩০০৲ "
নিউজিল্যাণ্ড	৯০০৲ "
ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস	৬০০৲ "
অষ্ট্রিয়া	৬০০৲ "
নরওয়ে	৪৫০৲ "
সুইডেন	৪২০৲ "
নিদারল্যাণ্ডস্	২৯০৲ "
ডেনমার্ক	৩২০৲ "
ভারতবর্ষ	৫৲ "

আমেরিকায় মোট জীবন-বীমার পরিমাণ সমভাবে ভাগ করিয়া দিলে দেশের প্রত্যেক লোক দুই হাজার টাকা করিয়া পাইবেই, আর ভারতে মোট জীবন-বীমা সমভাবে ভাগ করিয়া দিলে দেশের প্রত্যেক লোক মাত্র ৫৲ টাকা হারে পাইবে। অর্থাৎ ভারতে "মাথাপিছু" বীমার তুলনায় আমেরিকাবাসিগণ ৪০০ গুণ বেশী টাকায় বীমা করিয়াছে।

জার্ম্মাণীতে বীমা-আইন

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় জর্ম্মানীতে বীমা-আইন সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে বিবৃত হইল।

দেশীয় কোম্পানীগুলিকে যেরূপ সাহায্য প্রদান করা উচিত। ভারতে সরকারী বীমা-আইন সেরূপ কোন সাহায্য প্রদান করে না ; শক্তিশালী ও বহুদিনের পুরাতন বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলিকে ভারতের বাজারে দেশীয় শিশু প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা করিতে কোন বাধা দেওয়া হয় না ;—ফলে শক্তিশালী ও বয়োজ্যেষ্ঠ বিদেশী কোম্পানীগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কোম্পানীগুলি ধীরে ধীরে হটিয়া যায়।

জগতের অন্যান্য দেশে কিন্তু বিদেশীয় কোম্পানীকে ব্যবসায় আরম্ভ করার পূর্ব্বে নানারূপ বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয়। বিদেশী কোম্পানীগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে হটিয়া যায়, তৎপ্রতি ঐ সমস্ত [দেশের শাসকগণ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। সেইজন্যই আজ জগতের সমস্ত স্বাধীন দেশে তত্তৎদেশীয় বীমা কোম্পানীগুলি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতেছে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানীতে মোট ১৪৫৬টী কোম্পানী বীমা ব্যবসায় করিয়াছে, তন্মধ্যে ১৩৮৩টী কোম্পানী স্বদেশী ও মাত্র ৭৩টী কোম্পানী বিদেশীয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আরও ২৪টী বিদেশী কোম্পানী ঐ দেশে বীমা ব্যবসায় আরম্ভ করে। কিন্তু জার্ম্মাণগণ এখন পর্য্যন্ত বীমা ব্যবসায়ে বিদেশী কোম্পানীকে কোনরূপ প্রাধান্য দেয় নাই ; তাহারা সাধারণতঃ স্বদেশী কোম্পানীতেই বীমা করিয়া থাকে।

জার্ম্মাণীতে ব্যবসারত বিদেশী কোম্পানীগুলিকে ঐদেশে তাহাদের আফিস পরিচালনার জন্য প্রধান কর্ম্মচারী পদে একজন জার্ম্মাণকে নিযুক্ত করিতে হয় ; স্থানীয় ডিরেক্টর বোর্ডেও অধিকাংশ জার্ম্মাণকে নিযুক্ত করিতে হয়। জার্ম্মাণীর বীমা-আইনের ধারা অনুসারে কোন কোম্পানী

ইহার অন্যথা করিলে জর্ম্মাণ সরকার ঐ কোম্পানীর কারবার জার্ম্মাণীতে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

যতগুলি বিদেশী কোম্পানী জার্ম্মাণীতে ব্যবসায় করিতেছে, তাহারা সকলেই অক্ষরে অক্ষরে ঐ দেশের আইন মানিয়া চলে! বিলাতী, মার্কিন, ইটালিয়ান বা দিনেমার কোন কোম্পানীই জর্ম্মাণীর বীমা-বিধি অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হয় না।

জার্ম্মাণীতে যে সমস্ত বিদেশী কোম্পানী ব্যবসায় করে! তাহাদিগকে বার্ষিক দুই দফা হিসাব নিকাশ প্রকাশ করিতে হয়। জার্ম্মাণীতে তাহারা যে ব্যবসায় করে তাহার হিসাব জার্ম্মাণ মুদ্রায় ও পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্রে সংগৃহীত ব্যবসায়ের মোট হিসাব নিজ নিজ দেশীয় মুদ্রায় দেখান হয়! জার্ম্মাণীতে সংগৃহীত ব্যবসায় সম্পর্কে স্বতন্ত্র রিপোর্ট প্রকাশের প্রতিশ্রুতি না দিলে কোন বিদেশী কোম্পানীকে তথায় বীমা ব্যবসায় করিতে দেওয়া হয় না।

জার্ম্মাণীতে স্বদেশী কোম্পানীগুলিকে যে সমস্ত বিধি নিষেধ মানিতে হয়, বিদেশী কোম্পানীগুলিও তাহা মানিতে বাধ্য থাকে। সরকারী বীমা-বিভাগ সমস্ত বীমা কোম্পানীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে! বীমাকারীর স্বার্থহানি হইতেছে মনে করিলে করিলে সরকারী বীমা-বিভাগ যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন কোম্পানীকে কাজ বন্ধ করিয়া দিতে পারে।

বীমা কোম্পানী অডিটরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া যাহাতে কখনও বীমাকারীকে ফাঁকি দিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে সরকারী বীমা-বিভাগ যে কোন সময় যে কোন কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষা করিতে পারে এবং স্থায়ীভাবে যে কোন কোম্পানীর অডিটার নিযুক্ত করিতে পারে।

প্রতেক দেশেই বীমা-আইন অনুসারে কোম্পানী-গুলিকে প্রিমিয়মের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ স্বতন্ত্রভাবে জমা রাখিতে হয়। জার্ম্মেণীর বীমা-আইন অনুসারে দেশী-বিদেশী সমস্ত কোম্পানীই ঐ টাকা জার্ম্মাণীতে খাটাইতে বাধ্য। তাহারা ঐ টাকা জার্ম্মাণীর বাহিরে প্রেরণ করিতে পারে না। কোথায়, কি ভাবে, ঐ টাকা খাটান হইতেছে সরকারী বীমাবিভাগকে তাহা জানাইতে হয়।

বীমা কোম্পানীর জমা টাকা খাটান-সম্পর্কে সরকারী বীমাবিভাগ যে নির্দ্দেশ প্রদান করে, বিদেশী বা স্বদেশী—প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকেই সেই নির্দ্দেশ মানিতে হয়। মোট কথা, বীমাকারীর স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য জার্ম্মাণ-সরকার সর্ব্ববিধ সতর্কতা গ্রহণ করিয়াছেন;—বিদেশী কোম্পানীর প্রতিযোগিতায় দেশীয় কোম্পানীগুলি যাহাতে হটিয়া না যায়, তাঁহারা তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন।—বলা বাহুল্য, ভারতে বীমা-আইনের এরূপ কোন সুব্যবস্থা নাই।

সন্ধ্যা-তারা

শ্রীকরুণাময় বসু

দিনের সহস্র দাহ, পুঞ্জ পুঞ্জ ঘোর কলরব
আচ্ছন্ন করিয়া রাখে আনন্দের অমৃত উৎসব।
দয়াহীন, ক্ষমাহীন সংঘাতের প্রলয় গর্জ্জনে
দিগন্ত বিদীর্ণ করে বিক্ষোভের বিপুল তর্জ্জনে।
মানুষের সীমা ভেদি' স্বার্থস্ফীত ক্রুর হিংস্রলোভ
রক্তে রক্তে উন্মথিছে খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষতি, ক্ষোভ।
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা এল নতনেত্রে প্রশান্ত হৃদয়ে
সকরুণ অশ্রুজল, সুপবিত্র অন্ধকার লয়ে।
নিশ্বসিছে বনভূমি, কল্লোলিয়া বুঝি নদীজল
কাঁদিছে অব্যক্ত স্বরে, 'যারে চাই, কোথা সেই বল্?'
'কোথা বল? কে থা বলহ?' দিগন্তরে ওঠে প্রতিধ্বনি;
সহসা চমকি উঠি ঊর্দ্ধপানে চাহিনু অমনি।
ওই তরুকুঞ্জ শিরে দেখা দেয় সন্ধ্যা তারা-রেখা—
নিস্তব্ধ আঁধারপটে অসীমের আশীর্ব্বাদ লেখা।
চক্ষে কে যে বুলাইল সুদূরের কিরণ-অঙ্গুলি,
কাঁদাইল বক্ষ মোর পূরবীর শেষধ্বনি তুলি'।
আত্মার অন্তর হ'তে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ একাকী
দাঁড়াল সম্মুখে আসি' প্রসারিয়া অনন্তের আঁখি।

নাতি ও ঠাকুরমা
শিল্পী—শ্রীযামিনী রায়

মোহ
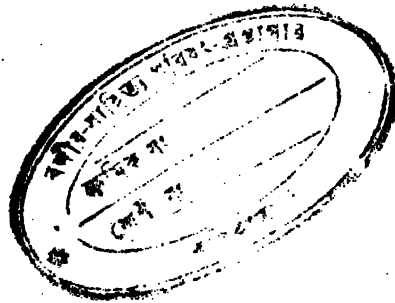
(উপন্যাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী নীলিমা দেবী

আটাশ

প্রীতি লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিবার পর সাড়ে তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দেবব্রতের জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সে এখন আর পূর্ব্বের মত নাই, এখন যে সদাই গম্ভীর ও কিসের চিন্তায় বিভোর। তাহার সংসারে আর সুখ বা শান্তি নাই, বহুদিন যাবৎ স্বামী-স্ত্রীতে মনের মিল নাই। সেই মুশৌরি হইতে যে বিচ্ছেদের ছায়া পড়িয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া এখন ঘোর অন্ধকারে পরিণত হইয়াছে। তাহারা এখন শুধু নামেই স্বামী-স্ত্রী।

এমির দোষেই এতদূর বিচ্ছেদ হইয়াছে। এমি প্রথমে বুঝে নাই যে ভারতীয়কে বিবাহ করিলে, তাহার স্বামীর যত উচ্চ পদই হউক না কেন, তাহার নিজের দেশের লোকের ও সমাজের চক্ষুতে পতিত হইবে—সে আর ইউরোপীয়দের সমতুল্য গণিত হইবে না। প্রথমে সে নূতনত্বের মোহে সুখী হইয়াছিল কিন্তু ক্রমেই নিজ জাতীয়দের ব্যবহার তাহার মনে বিচ্ছেদের বিদ্বেষ জন্মাইতে লাগিল। তাহার পর যখন তাহার পুত্র জন্মিল ও সে অবিকল দেবব্রতের মত হইল, এবং ভারতীয়দের মত বর্ণ পাইল, তখন তাহার স্বামী ও পুত্র উভয়ের উপরই বিতৃষ্ণা জন্মিল, দেবব্রতের ও তাহার মধ্যে এক অভেদ্য ব্যবধান সৃষ্ট হইল।

এমির প্রকৃতিতে উচ্চভাব বড় একটা দেখা যাইত না, সে ছিল বড় স্বার্থপর, অহঙ্কারী ও আমোদপ্রিয়। পিতা মাতার একমাত্র সন্তান ও রূপসী বলিয়া সে বরাবরই স্বেচ্ছামত সব কাজ করিত ও নিজের জেদ সর্ব্বদা বজায় রাখিত। শুধু বিবাহের পরই দুই বৎসর তাহার চিত্তের এক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, সে সত্যই দেবব্রতকে ভালবাসিয়াছিল বলিয়াই হউক, বা প্রণয়ের মোহেই হউক সে কিছু কালের জন্য স্বার্থ ভুলিয়াছিল। সেই জন্য বিবাহের পর প্রথমে দেবব্রতকে সুখী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল ও যথেষ্ট করিয়াও ছিল। কিন্তু সন্তান হইবার পর হইতেই সে আবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। সে কখনও নিজসুখের বা আমোদের এতটুকু ব্যাঘাত সহ্য করিতে পারিত না। সন্তানের যত্ন-পরিচর্য্যা তাহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিল।

দেবব্রতও প্রথমে এমিকে সত্যই ভালবাসিয়াছিল, তাহার সকল সাধ পূর্ণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। সেটা প্রণয়ের জন্য কি সে এমিকে প্রবঞ্চনা করিয়া বিবাহ করিয়াছে তাহার প্রতিদানের জন্য তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক, তখন এমির সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিতে একটু বিব্রত হইলেও দেবব্রত হাসিমুখে সবই করিত। এমির রূপ ও তাহার মিষ্ট ব্যবহারে প্রথম কয়েক বৎসর দেবব্রত তাহাকে সুখী করিয়া আনন্দ পাইত। কিন্তু এখন তাহার মোহ টুটিয়াছে, শুধু তাহার পুত্রের কথা ভাবিয়া সে এমির সঙ্গে সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিতেছে না। আজকাল [illegible] শীতকালে পাহাড় থেকে ফিরিয়া সকল রকমে দেবব্রতকে উৎব্যত করিয়া তুলে ও তাহার সহিত কল[illegible]। ফলে দেবব্রত যতদূর সম্ভব দূরে দূরে থাকে। [illegible] ও কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকে, আর এমি [illegible]আমোদ-প্রমোদ লইয়া জীবন যাপন করে। তবুও [illegible] কারণ দেবব্রত ছেলের প্রতি অযত্ন সহ্য করিতে পারে [illegible] এমি ছেলের যত্ন করিতে মোটেই চাহে না, সে ছেলে মানুষ [illegible] বিড়ম্বনা জ্ঞান করে। দেবব্রত শ্রান্ত হইলে কর্ম্মান্তে [illegible]তর ধ্যানে কাটায়—তাহার জীবন এখন "প্রীতি"ময়। [illegible]ই তাহার নিভৃত চিন্তা, আশা, ধারণা, ধ্যান [illegible] সবই; কিন্তু প্রীতিকে পাইবার কো[illegible] উপায় নাই।

তাহার পুত্রই দেবব্রতের একমাত্র সান্ত্বনা, ছেলেও পিতার অনুরক্ত, এক মুহূর্ত্তও পিতার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চাহে না। অনেক সময় যখন দেবব্রত পাঠে বা

নিজকর্ম্মে মগ্ন থাকে, তখন ছেলেটা তাহার পায়ের কাছে বসিয়া আপন মনে খেলা করে—কেবল মধ্যে মধ্যে সে দেবব্রতকে স্পর্শ করিয়া যায়, সেই পরশেই যেন তাহার আনন্দ, শান্তি। তাহার মাতার সহিত তাহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই।

এমির ছেলের দেখিবার সময় নাই, সে বলে "আমি ও সব ল্যাঠা সইতে পারি না।" এমির পুত্র আয়ার দয়াতে লালিত হইতেছে। এমি যখন শৈলবিহারে যায়, পুত্র সঙ্গে যায় বটে কিন্তু এমির তাহাকে দেখিবার বা তাহার কোন কাজ স্বহস্তে করিবার সময় বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না। শুধু দেবব্রতের ভয়ে প্রত্যহ আয়াকে সকল কথা বুঝাইয়া দেয়। ছেলের অযত্ন দেখিয়া দেবব্রত একবার বড়ই রুষ্ট হইয়াছিল ও কড়া হুকুম দিয়াছিল—কাজেই অতটুকু করিতে এমি বাধ্য হইয়াছিল।

এমি যতদিন পারে পাহাড়ে থাকে ও সেখানে দিবারাত্রি বিবিধ আমোদ-প্রমোদে মাতে ও নিজবাটীতে অতি অল্পক্ষণই থাকে। এমন কি যখন দেবব্রতও আসে তখনও সেইরূপ জীবনই এমি কাটায়; ফলে এক একদিন স্বামী-স্ত্রীতে দেখা পর্য্যন্ত হয় না। দেবব্রত অনেক চেষ্টা করিল যাহাতে কোন প্রকারে বাহিরে ঐক্যের ভাব বজায় রাখিয়া এমির সহিত দিন যাপন করিতে পারে কিন্তু পারিল না। জীবন অসহ হইলেও দেবব্রত এমির সহিত বন্ধন-ত্যাগ করিতে পারিল না, পাছে তাহার ছেলেকে এতটুকু বয়সে মাতৃহারা হইতে হয়। মনে মনে তখনও দেবব্রতের বিশ্বাস ছিল যে যতই অযত্ন করুক মা'র ছেলের প্রতি আন্তরিক স্নেহ নিশ্চয় থাকে, এমি একটু বেশী আমোদপ্রিয় হইলেও সে তাহার সন্তানকে নিশ্চয় ভালবাসে। দেবব্রত বাহিরে মিল রাখিবার চেষ্টা ছাড়িল না, কিন্তু তাহাদের মানসিক মিলের সম্ভাবনা ক্রমশঃ সুদূরপরাহত হইয়া উঠিল।

এমি শুধু আমোদপ্রিয় নহে, অসতী না হইলেও সে পরপুরুষে পুরা অনাসক্ত নহে, বহু পুরুষ-পরিবেষ্টিত হইয়া আমোদ করিতে সে বেশী ভালবাসে। দেবব্রত হিন্দু, তাহার এ সমস্ত বড়ই অশোভন ও বিসদৃশ মনে হয়, তবু সে নীরবে থাকে। যখনই [illegible] সে চিন্তা করে তাহার মনে হয় সে [illegible] অপরাধ করিয়াছে, সে অপরাধের [illegible] সীমা নাই, ইহাই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই ভাবিয়া দেবব্রত নীরবে জীবন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল।

ঊনত্রিশ

দুই বৎসর হইল দেবব্রতের সহিত তাহার মাতার মিলন হইয়াছে, সেইটুকুই তাহার বিষময় জীবনে একমাত্র সুখ ও শান্তি। সে প্রথমে প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন দেখিল যে তাহার মাতা তাহাকে ক্ষমা করিলেন না, তখন সে অভিমানে মাতার সহিত সম্পর্ক তুলিয়া দিবে ভাবিল। সে মাকে পত্র পর্য্যন্ত লিখিত না কিন্তু মধ্যে মধ্যে ভায়েদের পত্র দিত। তাহার মনে হইত যে মাতৃস্নেহ পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করিতে না পারে সে স্নেহে তাহার আবশ্যক নাই, কিন্তু আবার পূর্ব্বের সেই অসীম স্নেহের কথা মনে হইলে সে মনে মনে লজ্জিত হইত। তারপর যখন লক্ষ্ণৌ সহরে প্রীতিকে দেখিল, তখন দেবব্রত বুঝিল যে কত বড় অপরাধ করিয়াছে, তাহার মাতার প্রাণে কত বড় আঘাত দিয়াছে। তখন সে বিশেষ অনুতপ্ত হইল।

দেড় বৎসর কাল অনুতাপানলে পুড়িয়া পুড়িয়া শেষে একদিন আর থাকিতে পারিল না, সে মাতৃসকাশে চলিল। পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়া একদিন প্রাতে সে নিজগৃহে উপস্থিত হইল। বহু দিবস পরে অকস্মাৎ পুত্রকে দেখিয়া দেবব্রতের মাতা জ্ঞানহারার মত ছুটিয়া গিয়া পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিলেন। তাঁহারও প্রাণ ছেলেকে দেখিবার জন্য বহুদিন যাবৎ ব্যাকুল হইয়াছিল, তখন অপ্রত্যাশিত মিলনে তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে পুত্রের সকল দোষ ভুলিলেন। মাতাপুত্রে বহুক্ষণ নীরবে অশ্রুপাত করিলেন।

অবশেষে দেবব্রত কহিল, "মা, তোমাকে দেখবার জন্য প্রাণটা অনেকদিন থেকে বড় ব্যাকুল হ'য়েছিল, তোমাকে না দেখে আর থাকতে পারলাম না, তাই এসেছি। অনেক আগেই আসতাম কিন্তু সাহস করে আসতে পারি নি, ভয় হ'ত পাছে তুমি আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নাও। আমার দোষের ক্ষমা নেই, তবু মা তুমি আমার "মা," তোমার স্নেহ থেকে আর আমাকে বঞ্চিত করে রেখ না। ক্ষমা আশা করি না, কারণ আমার অপরাধের ক্ষমা নেই।"

উত্তরে মা বলিলেন, "আমি [illegible] করলে কি

হ'বে, বাবা? ভগবান আর যার জীবন তুমি একেবারে নষ্ট করেছ তাঁরা তোমাকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌লে তবেই তোমার ক্ষমা। এখন সে কথা যা'ক, তোর চেহারা এমন হয়ে গেছে' কেন? তোর সে হাসিমাখা চোখের চাহনি কোথায়? শুনেছিলাম তুই খুব সুখে আছিস তবে এমন বিষাদমাখা মুখ কেন?"

"অপরাধী কি কখনও সুখী হ'তে পারে?" বলিয়া দেবব্রত অন্য কথা উত্থাপন করিল। সে মাতার নিকট নিজের অশান্তিময় জীবনের কথা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহে। সে বেশ জানিত যে তাহার মা দুই চারিটী কথা কহিলেই সব ধরিয়া ফেলিবেন, সে মায়ের কাছে কিছুই লুকাইতে পারিবে না।

দেবব্রতের মায়ের কাছে আসিবার আরও একটা মস্ত উদ্দেশ্য ছিল। বহুদিন সে প্রীতির খবর পায় নাই। প্রীতিকে আর একবার দেখিবার ও তাহার সহিত কথা কহিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছিল। সে একবার জানিতে চাহে যে তাহার প্রতি প্রীতির মনের ভাব কিরূপ? উহার মনোভাব লক্ষ্ণৌয়ে সে মোটেই বুঝিতে পারে নাই। যদিও বা তখন একদিন অবসর পাইল তখন তার আসিয়া বিড়ম্বনা বাধাইল। সেদিন দেবব্রতের মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে প্রীতি তাহাকে ভালবাসে কিন্তু পরদিন প্রীতির চিঠি দেখিয়া সে কি যে ভাবিবে স্থির করিতে পারে নাই। দেবব্রত এখন আর লক্ষ্ণৌয়ে নাই, সে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে; লক্ষ্ণৌ ছাড়িবার পূর্ব্বে সে শুনিয়াছিল যে প্রীতির সহিত নির্ম্মলের বিবাহ দিবার জন্য সকলে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, তাহার পর আর কোন খবর পায় নাই; রমা তাহাকে মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখিত কিন্তু তাহাতে প্রীতির সংবাদ থাকিত না। কাজেই প্রীতি ও নির্ম্মলের বিবাহ-সম্বন্ধে কি হইয়াছে দেবব্রত জানিত না, আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেও পারে নাই।

অনেকক্ষণ মা-ভাইদের সঙ্গে নানান্ গল্পের পর দেবব্রতের মা বলিলেন, "এইবার স্নান কর্‌তে যা বাবা, অনেক বেলা হ'য়েছে। তোর নিজের ঘরে সব জিনিস রাখিয়ে দিয়েছি ও সব বন্দোবস্ত করেছি। বাবা, তোর কত সাধের ঘর, নিজে [illegible] সাজিয়ে [illegible] আজ ৭।৮ বৎসর তোর [illegible] পড়ে [illegible]

"মা, তুমি কি সে ঘর এতদিন কাউকে ব্যবহার কর্‌তে দাও নি?"

"সে ঘরে যার অধিকার আছে সেই কেবল মাঝে মাঝে ব্যবহার করে, তা' ছাড়া পড়েই থাকে।"

"শুনেছি সে তোমার কাছে সর্ব্বদাই আসে, তখন কি সে এই ঘরেই রাত কাটায়?"

"আমার অসুখ-বিসুখ কর্‌লেই সে আমার সেবা কর্‌বার জন্য এখানে এসে থাকে, এ ঘর সে বড় ভালবাসে, কি যত্নে ঘর রেখেছে দেখলেই বুঝবি। তা'র গুণের কথা কত বল্‌ব, কা'রও পেটের মেয়ে বোধ হয় মা'কে তার চেয়ে বেশী সেবা-যত্ন কর্‌তে পারে না। তার কথা বলে আর কি হ'বে? ভগবান তো আমাকে অমন বউ নিয়ে ঘর কর্‌তে দিলেন না, বাছাকে আমার কি অপরাধে এত কষ্ট দিলেন জানি না। তার কথা এখন থাক, তা'র মুখ মনে পড়্‌লে বুক ফেটে যায়। তার কথা মনে পড়লে তোর উপর আমার এত রাগ হয় যে তোকে আর দেখ্‌তে পর্য্যন্ত ইচ্ছা হয় না। আজ অনেক দিন পরে তোকে পেয়েছি, বাবা, ক্ষোভ ভুলে তোকে বুকে করে একটু শান্তি পাই। যা, এখন স্নান কর্‌তে।"

ঘরে গিয়া দেবব্রত যাহা দেখিল তাহাতে তাহার প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। প্রবাসে যাইবার দিনের সকল কথা একে একে তাহার চক্ষুর সামনে পটে আঁকা ছবির মত জাগিয়া উঠিল। ঘরটী যেমন ভাবে সে রাখিয়া গিয়াছিল ঠিক তেমনই ভাবে সাজান রহিয়াছে, সকল দ্রব্যাদি নিজ নিজ স্থানেই তখনও রহিয়াছে। দেবব্রত চেয়ারে বসিয়া পড়িল, পূর্ব্ব-স্মৃতিগুলি আরও স্পষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল— প্রীতির তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কান্না, তাহাকে কিছুতেই যাইতে দিবে না বলা, ফলে দেবব্রত যে বহু চুম্বন দিয়া তাহাকে বলিয়াছিল যে সে শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে—এই সকলচিত্রই তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে বহুক্ষণ দেবব্রত চিন্তামগ্ন রহিল। এক ঘণ্টা পরে যখন তাহার মা তাহাকে ডাকিতে আসিলেন, সেই ডাকে তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিল, সে লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিতে গেল। তাহার মা তখনই জানিলেন যে পুত্রের মনে অনুতাপ জাগিয়াছে। তাঁহার প্রাণে আশার উদ্রেক হইল কিন্তু কি ভাবে যে প্রীতি ও দেবব্রতের পুনর্মিলন হইবে সে সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিলেন না।

দশদিন দেবব্রত মায়ের কাছে রহিল। এই দশদিন সে ঠিক ছেলেবেলার মত দিন-রাত কেবল মায়ের কাছে কাছে থাকিত, মা বসিলে তাঁহার কোলে মাথা দিয়া শুইত, ভাইদের সঙ্গে পূর্ব্ববৎ খেলা ও গল্প করিত কিন্তু এত করিয়াও দেবব্রত তাহার মায়ের চোখে ধূলা দিতে পারিল না। তিনি জানিলেন যে দেবব্রত অসুখী, তাহার মনে শান্তি নাই। তিনি আপনা হইতে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন নাই, তাহার সন্তান প্রাণের কথা তাঁহারই কাছে প্রকাশ করিবে এই আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। সেই প্রথম দিনের পর প্রীতির কথা আর কেহই উত্থাপন করে নাই, কেবল প্রতিদিন রাত্রে যখন মাতা-পুত্রে আলাপ হইত দেবব্রত কি যেন বলিবার প্রয়াস পাইত কিন্তু বলিতে পারিত না। দেবব্রতের মা একদিন দেবব্রতের মেমের কথা বা তাহার সংসারের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, সে তো কোন কথাই বলে নাই, কিন্তু ছেলেটার গল্প সর্ব্বদাই দেবব্রত করিত। সে একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিল "মা তোমার কি তাকে একবারও দেখতে ইচ্ছা করে না?"

"তোমার ছেলের যে আমার কণ্ঠমালা হ'বার কথা, তুমি নিজেই তো সে সাধে বাদ সেধেছ। যদি কখনও তাকে আন তো দেখ্‌ব, তোমার মেমের বাড়ী তো আমি যাব না। তোমার দুঃখ হ'তে পারে কিন্তু তোমার এ ছেলে কখনই আমার প্রাণ জুড়ে বসবে না।"

"আমার দুঃখও নেই রাগও নেই, তোমার প্রাণে যে আমি কত ব্যথা দিয়েছি তা' কি আমি বুঝি না? আমার ছেলেকে ভালবাসা তো দূরের কথা আমাকে যে তুমি আবার এমন করে স্নেহ করবে সে আশাও আমি করি নি, মা। তুমি আমার প্রাণে কত শান্তি দিয়েছ তা' তুমিও বুঝ্‌বে না মা।" সেদিন এই বলিয়াই সে উঠিয়া গিয়াছিল।

দেবব্রত চলিয়া যাইবার আগের দিন রাত্রিতে খাবার পর সকলে একত্রে ছিলেন, দেবব্রত মায়ের কোলে মাথা দিয়া শুইয়াছিল। রাত্রি দশটা বাজিতে তাহার মা বলিলেন, "শুতে যাবি নি, বাবা, রাত হয়েছে।"

"তোমার কি ঘুম পেয়েছে, মা?"

"আমার কি আজ আর ঘুম হ'বে?"

"তবে চল, তোমার ঘরে যাই, তোমাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।"

এই কথা শুনিয়া দেবব্রতের ভ্রাতারা নিজ নিজ ঘরে চলিয়া গেল। দেবব্রতের মা বলিলেন "তুমি চল, আমি এখনই আস্‌ছি।" দেবব্রত মাতার ঘরে প্রীতির একখানা মস্ত রঙ্গীন আলোক-ছবি দেখিয়া তাহারই সামনে তন্ময় চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল ও সে অস্ফুট স্বরে কি বলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে যে তাহার মা আসিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইয়াছেন তাহা দেবব্রত জানিতেই পারে নাই। তিনিও পুত্রকে বিরক্ত না করিয়া নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি একটা শব্দ হওয়াতে দেবব্রতের হুঁস হইল, সে বলিল, "মা, তুমি কতক্ষণ এসেছ? এ ছবি খানা কি সম্প্রতি তোলা হয়েছে? বড় সুন্দর হয়েছে।"

"ছবি ছ'মাস হ'ল তোলা হয়েছে।"

"শুনেছিলাম যে প্রীতি তোমার কাছে সর্ব্বদা আসে, তা' কই এ ক'দিনের মধ্যে একবারও তো এল না। আমি এখানে এসেছি শুনে বুঝি আসে না, না, কি তার নির্ম্মলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে?"

"কে তোকে বল্লে রে যে তার বিয়ে হয়েছে?"

"শুনেছিলাম যে নির্ম্মল ও প্রীতির বিয়ে দেবার জন্য নির্ম্মলের বাবা খুব চেষ্টা করছেন ও অনেক দূর এগিয়েছেন। তারপর আর কোনও খবর পাই নি।"

"চেষ্টা যথেষ্টই হয়েছিল, কেবল আমার সতীলক্ষ্মী মা কিছুতেই তাহার বিয়ের কথা কাণেই তুল্লে না, তাই হ'ল না।"

"কেন সে রাজী হ'ল না? সে তো নির্ম্মলকে খুব ভালবাসে আর নির্ম্মলও তো তা'কে ভালবাসে।"

নির্ম্মলকে প্রীতি বড় ভায়ের মত ভালবাসে। প্রীতি বা নির্ম্মল কেহই জানে না যে তাদের বিয়ের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছিল। নির্ম্মলকে শুধু বলা হয়েছিল প্রীতিকে জিজ্ঞাসা করতে যে সে আবার বিয়ে করতে চায় কি না। তা'তে প্রীতি বলে যে ও কথা কেউ আমাকে বল না, আমি কখনই আর বিয়ে করব না।

দুই মাস হ'ল প্রীতিরা এখানে নাই, [illegible] দাক্ষিণাত্যে

বেড়াতে গেছে, তারপর "উটি"তে থাকবে। কবে যে বাছার মুখ আবার দেখ্‌ব জানি না। তুমি যে এখানে এসেছ সে খবর তাকে সেই দিনই দেওয়া হয়েছে, তা'র চিঠির উত্তরও পেয়েছি, তার ভারী আনন্দ হয়েছে। তোমাকে দেখ্‌তে যেতে সে আমাকে অনেক করে বরাবর বল্‌ত।"

"দেবব্রত, তুমি আমাকে একটা কথার উত্তর দেবে কি? আজ পর্য্যন্ত আমি প্রীতির কাছ থেকে কোন কথা টের পেলুম না, লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে অবধি বাছার আমার কি যে হ'য়েছে, সে যেন কোথাও তিষ্ঠতে পারছে না, কেবল এ-দেশ, ও-দেশ, সে-দেশ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন তা'র মন এত চঞ্চল হয়েছে? এর কারণ কি তুই জানিস্? সুরবালার বিশ্বাস নীলিমার বিয়ে হ'য়ে গেছে বলে প্রীতির এমন হয়েছে, আমার কিন্তু তা' মনে হয় না। প্রীতির মা তো জানে না যে, তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে কিন্তু আমি তো জানি। প্রীতি তার মাকে জানতে দেয় নি যে তুমি লক্ষ্ণৌএ ছিলে ও তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ হ'য়েছিল। আমি জান্‌তুম্ বলে সে শুধু বলেছে যে তুমি তাকে চিন্‌তে পেরেছিলে এবং সকলের সামনে তোমরা বন্ধুর মত ব্যবহার করতে। হাঁরে প্রীতিকে দেখেও কি তুই টলিস্ নি? তোর মেম যে আমার প্রীতির চেয়ে কোন অংশে ভাল তা' আমার বিশ্বাস হয় না। শুধু কটা চাম্‌ড়ার কি এত মহিমা? প্রীতির মত মেয়ে আজ পর্য্যন্ত আর একটীও দেখ্‌লাম না, তার রূপ-গুণের তুলনা নেই।"

"তুমি কি জান্‌তে চাও? জান্‌বার কি আছে? আমি আমার নিজের জন্য যে শয্যা পেতেছি, তাতেই আমাকে শুতে হ'বে। এখন আমার জীবন দুঃখময় হ'লেও তো আমি কাউকে দোষ দিতে পারব না। তবে এই অনুতাপ যে আমার পাপের ফলে তা'কে কেন ভুগ্‌তে হচ্ছে; তার জীবনটা আমি একেবারে নষ্ট করে দিয়েছি। আমি যদি সেই দু'চার দিনের জন্যে তার জীবনপথে না আস্‌তাম, তো আজ সে কত সুখী হ'তে পারত। তাকে সুখী করবার ক্ষমতা আমার নেই, আমি যদি পারতুম তো প্রাণ দিয়ে তাকে সুখী করতে চেষ্টা করতুম কিন্তু চারিদিকে কেবল বাধা আমাকে যেন ঘিরে রেখেছে, কোন দিকেই আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। তা, ছাড়া আমার ওপর তো সব নির্ভর করছে না, আমি তাকে চাইলে কি হ'বে, সে তো আমায় চায় না! চাইবেই বা কেন, তার তো আমাকে ঘৃণা করবার কথা।

"অনেক কথা তো বল্লে কিন্তু যা জান্‌তে চাইলুম তা' জান্‌তে পারলাম না। প্রীতির সঙ্গে তোমার কি এ সব বিষয়ে কোন কথা হ'য়েছিল?"

"হ'য়েছিল বৈ কি, সে তো আমাকে আমার কর্ত্তব্য শিখিয়ে দিয়েছে, কি বলেছে জান? সে বলেছে যে, আমার প্রথম কর্ত্তব্য এখন আমার ছেলের ও তা'র মা'র প্রতি, তাদের সুখ নষ্ট করা আমার উচিত নয়।"

"তোর প্রতি তার মনের ভাব কিছু বুঝ্‌তে পেরেছিলি কি?"

"না, সে ঠিক এক একটী হেঁয়ালির মত, কখনও মনে হ'ত যে বুঝিবা একটু টান আছে, আবার পরমুহূর্ত্তেই মনে হ'ত যে তা' নয়। তার কাছে ভালবাসা আশা করাও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। ও সব কথা ছেড়ে দাও, মা, আমি শুধু আশা করেছিলাম যে, একবার তা'কে এখানে দেখ্‌তে পাব, তাও হ'ল না। তা'কে যদি আমি মাঝে মাঝে শুধু দেখ্‌তে পাই তা' হ'লেও তৃপ্তি হয়।"

"এত যদি তুই তাকে ভালবাসিস ও চাস, তবে কেন তার কাছে আসিস্ না, কেন সকলকে তার পরিচয় দিস্ না।"

"পরিচয় এমনি দিতে প্রস্তুত আছি—তা'তে যদি সে সুখী হয়। মা, তাকে জোর করে তার অনিচ্ছায় আমি নিতে চাই না। সেই বা কেন নিজের পরিচয় লুকিয়ে রেখেছে, আমি তো লুকোতে বলি নি।"

"তুই তো বড় মূর্খ, তোর সুখ ও সুনাম বজায় রাখ্‌বার জন্যই সে নিজ পরিচয় লুকিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা করছে। তোর ওসব বাজে কথা রাখ, মেমের ভয়ে পারবি না। মেম থাক না, তাকে যখন বিয়ে করেছিস, ছেলে হয়েছে, তাকে আর কি ছাড়তে বল্‌তে পারি, তবে অনেকে তো দুই স্ত্রী নিয়ে ঘর করেছে, তাই কেন কর না?"

"প্রীতিকে কি বলে আমি অন্যের অংশীদার হ'তে বল্‌ব? তার যে সর্ব্বেশ্বরী হবার কথা! আর সে কখনও এ

ঔঁচ প্র াবে রাজী হ'বে না আমি জানি। কোন উপায় নেই, মা, এ জীবনে আমাদের আর মিলনও হ'বে না, সুখও হ'বে না।"

দেবব্রত আর কিছু বলিল না, নিজগৃহে চলিয়া গেল। তাহার পরদিন যাইবার সময় শুধু বলিয়া গেল, "মা, মনে করো না যে আমি সুখে আছি, তোমাদের যে চোখের জল ফেলিয়েছি, তার ফলে আমাকে সারা জীবন কাঁদ্‌তেই হ'বে।"

এই কয় বৎসরের ভিতর দেবব্রত আরও দুই চারিবার বাড়ী আসিল, কিন্তু প্রীতির সহিত সাক্ষাৎ হইল না। একবার দেবব্রতের মা প্রীতিকে দেখা করিবার কথা বলাতে প্রীতি সম্মত হয় নাই, বলিয়াছিল "কি হ'বে দেখা করে? তা'তে কোন ফল হ'বে না, মিছে তাঁর অশান্তি বাড়বে।"

উত্তরে তিনি বলেন,—"তোর কি, মা, একবারও দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় না, এতই কি তা'কে ঘৃণা করিস্? তা'কে কি এ জন্মে ক্ষমা করবি না, মা? সে বড়ই অসুখে ও অশান্তিতে আছে, তাকে দেখ্‌লে বুঝ্‌বি, মা, যে অনুতাপ তাকে কি রকম করেছে। সে শুধু তোর সঙ্গে দেখা করে তোর কাছে অনুমতি নিয়ে আত্মপরিচয় সকলকে দেবে।"

"তাঁকে বল্‌বেন যে আমার এতদিন যেভাবে জীবন কেটেছে, সেইভাবে দিন কেটে যাবে, আমার জন্য আবার কেন আর একজনকে কষ্ট দেন? আর অন্য রকম কিছু এখন সম্ভব নহে। ক্ষমা তাঁকে আমি করেছি, তিনি ও তাঁর স্ত্রী-পুত্রাদি সুখে থাকুন এই আমি চাই। আমার পূর্ব্বজন্মের পাপের নিশ্চয় এই প্রায়শ্চিত্ত, নইলে এমনই বা হ'বে কেন। এ মা, ভগবানের অভিসম্পাত তাঁর দোষ কি?"

প্রাতি একবারও সাক্ষাৎ করিতে সম্মত না হওয়ায় দেবব্রতের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, প্রীতি তাহাকে মোটেই ভালবাসে না। কিন্তু সে বুঝিল না কেন সে নির্ম্মলকে বিবাহ করিতে সম্মত হয় নাই

ত্রিশ

এই সাড়ে তিন বৎসরে প্রীতির জীবনেও অনেক পারবর্ত্তন হইয়াছে। যে লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া কেমন যেন হইয়া গিয়াছিল। কখনও বা দিনের পর দিন তাহার স্ফূর্ত্তির সীমা থাকিত না, আবার যখন সে ঝোঁক যাইত তখন আনন্দের স্থানে ঘন বিষাদ তাহার প্রাণ ভরিয়া দিত। তখন সে প্রাণহীন পুত্তলিকাপ্রায় হইত; কেবল নির্ম্মলের সাহচর্য্য তাহার প্রাণের ভিতর একটু স্পন্দন আনিতে পারিত।

এই কার ই সকলের মনে হইয়াছিল যে নির্ম্মলের সহিত প্রীতির বিবাহ হইলেই প্রীতি সুখী হইবে ও সেইজন্যই সকলেই সেই বিবাহের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু প্রীতি যখন সে কথা শুনিল না, তখন সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। প্রীতির যে স্বামীকে মনে আছে বা সে স্বামীকে ভালবাসিতে পারে এ কথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না।

ছয় মাস পরে প্রাতির সেভাব কাটিয়া গেল, দেশভ্রমণের প্রবল ইচ্ছা হইল। প্রায় এক বৎসর কাল সে কখনও শহরের বাটীতে, ককনও পল্লীগৃহে, কখনও দূর-দেশান্তরে থাকিল কিন্তু তবু তাহার চিত্তচাঞ্চল্য গেল না। তখন সে আবার অন্য দিকে মন দিল, সভা, সমিতি, শিক্ষা, দেশের নানান্ কাজ, তবু তাহার তৃপ্তি নাই, মনের শান্তি নাই। প্রীতির মাতা বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন, তিনি আশঙ্কা করিলেন বুঝি তাঁহার কন্যার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়।

নির্ম্মল প্রীতির চিত্ত-চাঞ্চল্যের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু স্থির করিতে পারিল না। ই চারিবার তাহার মনে জাগিয়াছিল যে, হয় তো দেবব্রতের সহিত প্রীতির কোন সম্পর্ক আছে ও তাহার কারণেই তাহার অশান্তি; আবার পরমুহূর্ত্তেই সে চিন্তা দূর করিত। একদিন নির্ম্মল প্রীতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে, তুমি কেন হঠাৎ লক্ষ্ণৌ থেকে ফেরবার পর এমন হ'য়ে গেলে? তোমার এ পরিবর্ত্তন আমি প্রথম সেখানেই একটু একটু লক্ষ্য করেছিলাম। প্রীতি, আমাকেও কি তুমি বল্‌বে না কেন তুমি স্থির হ'তে পারছ না? আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি যে তুমি কোন বিষয়ে চিত্তসংযম করতে চেষ্টা করছ। প্রাতি, আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারব না?"

"দাদা, সময় এলে তোমাকে একদিন আমি সব কথা বলব, তোমার কাছে আমি কিছু লুকাব না। তোমাকে

বলতে পারছি না বলেই এত কষ্ট পাচ্ছি, কিন্তু এখন আমি নিজেই বুঝতে পারছি না যে আমি কি চাই। তোমার ও মায়ের অসীম স্নেহের জন্যই আমি এ কষ্ট সহ্য করতে পারছি, তুমি আমার জন্য এত কর বলেই দিনগুলা কেটে যাচ্ছে। তুমি না থাক্‌লে আমি কি যে করতাম জানি না, অথচ আমি এত স্বার্থপর যে, তোমার কাছে সবই নি কিছুই দিতে পারি না। তোমার যেন পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই, কোন কাজ নেই, কেবল আমার সুখের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। এদিকে আমি শুধু সে স্নেহ লুটেই চলেছি; কত আব্‌দার করি, কেন যে তুমি আমার এত অত্যাচার সহ্য কর জানি না!"

"পাগলামী রাখ, তোমার জন্য আমি সব করতে পারি, তোমাকে সুখী করতে পারলেই আমি সুখী হ'ব, আমি প্রতিদান চাই না। প্রতিদানের আশাতেই কি জগতে সব কর্‌তে হয়?"

"তোমার মত ভালবাস্‌তে কেউ জানে না। আমার বড় সৌভাগ্য যে তোমার মত দাদা পেয়েছি। যে এত নিঃস্বার্থভাবে ভালবাস্‌তে জানে, সে যে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসারী হতে চাইছে না এই বড় দুঃখের বিষয়।"

"প্রীতি, আবার ও কথা তুল্‌ছ, আমি তোমাকে কি অনুরোধ করেছিলাম?"

"আমি নিজের স্বার্থে ও কথা তুল্‌ছি। তুমি কি ভেবে দেখেছ যে তুমি যদি বিয়ে না কর আর কেবল আমার জন্য এত কর তো লোকে কি বল্‌বে? তোমার মত দেবতার কেউ বদ্‌নাম করবে সে আমি সইতে পারব না, কাজেই আমাদের ছাড়াছাড়ি করতে হ'বে।"

নির্ম্মল হাসিয়া উঠিল। বলিল, "যারা বদ্‌নাম করবে তারা কি একটা বউ থাক্‌লে করবে না ভাব্‌ছ? বদ্‌নামের ভয় আমি করি না, নিজে খাঁটি থাক্‌লেই হ'ল, তবে আমার জন্য যে তোমার পবিত্র নামে কেউ কিছু বল্‌বে তা' আমারও সহ্য হ'বে না। কিন্তু লোকের মুখ কেউ কি কখনও বন্ধ করতে পারে? ও সব গ্রাহ্য না করাই ভাল। এসব কথা ছেড়ে চল একটু গান-বাজনা করি গিয়ে। কতদিন তোমার গান শুনি নি, জানই তো তোমার গান শুনতে আমি কত ভালবাসি।"

চিত্তের চাঞ্চল্যবশতঃ সেদিন আর নির্ম্মলের উপরোধ সে রাখিত পারিল না। কি করিলে এই দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারা যায় তাহাই এখন প্রীতির একমাত্র ভাবনা হইল। হঠাৎ তাহার মনে হইল পল্লী-জননীর সেবা করিয়া একবার দেখিবে যে তাহার চিত্ত জয় হয় কি না? ভাব-প্রবণ প্রীতি তখনই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল।

প্রায় একবৎসর হইল প্রীতি নিজের পল্লীগ্রাম সংস্কারে মত্ত হইয়াছে। সুরেনবাবু চিরদিনই এই কাজটী অল্পস্বল্প করিতেন, এখন প্রীতির অত্যন্ত উৎসাহ দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন। প্রীতিদের যাহা আয় ছিল তাহার মাত্র এক অংশ তাহাদের খরচ হইত, প্রতি বৎসর বাকী টাকা কেবল জমাই হইতেছিল। প্রীতি অনেক দান করিত, তবু তাহার টাকা কেবল বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। অবশেষে সে টাকার কিয়দংশ ব্যয় করিবার উপায় স্থির করিল, সে তাহার গ্রামে এক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিল। সে বিদ্যালয়ের সমস্ত ভারই প্রীতি লইল, উচ্চ বেতন দিয়া সুশিক্ষিত মহিলাদের এই গ্রাম্য-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী আনিল। তাহার গ্রাম্য প্রাসাদে তাঁহাদের সকলের বস-বাসের ব্যবস্থা করিল। সেইখানেই তাঁহাদের আহারেরও ব্যবস্থা হইল। আবার পাছে ম্যালেরিয়ার ভয়ে শিক্ষয়িত্রীরা পল্লীগ্রামে আসিতে দ্বিধা বোধ করেন সেজন্য প্রীতি ব্যবস্থা করিল যে, বিদ্যালয় শ্রাবণের শেষ হইতে কার্ত্তিকের শেষ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এ বিদ্যালয়ে শুধু পাঠের ব্যবস্থা হইল না, সর্ব্ববিধ কলাবিদ্যাও শিখান হইত। প্রীতি নিজে সেলাই ও গান বাজনা শেখাইত ও প্রত্যেক শনিবার নির্ম্মল আসিয়া চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিখাইতে লাগিল। বিদ্যালয়ে বিনাবেতনে সেই গ্রামের ও নিকটস্থ সকল গ্রামের বালিকারা বিদ্যালাভ করিতে লাগিল। বিদ্যালয়ের আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সেখানে ধনী-দরিদ্রের মেয়েরা সবাই সমান ব্যবহার পাইত। দরিদ্র সন্তানদের প্রীতি নিজে বস্ত্রাদি দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিত।

নিজ পল্লীতে প্রীতির জীবন বেশ কাটিতে লাগিল। সে সমস্ত দিন বিদ্যালয় লইয়া মাতিয়া থাকে। অপরাহ্নে সে তাহার মাতা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে বেড়াইতে যায় ও দরিদ্র প্রজাদের বাটী গিয়া তাহাদের দুঃখ-মোচনের

সেবা করে। তাহাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা, রোগের ঔষধ পথ্য সকলই প্রীতি জোগায়। প্রতি শনিবার কলিকাতা হইতে নির্ম্মল আসে, সেও দুই দিন এই সকল শুভকর্ম্মে প্রীতির সঙ্গী ও কর্ম্মী হয়।

কিন্তু মন এত প্রকারে পূর্ণ রাখিয়াও প্রীতি দেবব্রতকে ভুলিতে পারিল না। সে তাহাকে প্রকৃতই ভালবাসে কিন্তু তাহাকে অন্যের কাছ থেকে কাড়িয়া লইতে চাহে না। তবু সে মধ্যে মধ্যে দেবব্রতকে দেখিবার জন্য তাহার কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িত। অথচ যখন দেবব্রত আসিয়া অনেক করিয়া অনুরোধ করিয়াছিল শুধু একবার দেখা করিবার জন্য, তখন প্রীতি কিছুতেই সম্মত হয় নাই। সে কি যে চায় তাহা সে নিজেই জানিত না।

একমনে এক বৎসর কাজ করিয়া আবার প্রীতির চিত্তে চাঞ্চল্য জন্মিল, সে আবার দেশ-ভ্রমণে ব্যগ্র হইল। তখন বিদ্যালয় বেশ সুন্দরভাবে চলিতেছে, সকল বিষয়ে সুবন্দোবস্ত হইয়াছে, সুতরাং প্রীতি মনে করিল যে, এইবার একটু ভ্রমণে বাহির হইলে বিদ্যালয়ের কোন অনিষ্ট হইবে না। সুরেনবাবু ও সুরবালার কিন্তু আর তাহাতে উৎসাহ নাই। বহুদিন পরে দশজনের সহিত মিশিয়া নানা কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া তাঁহারা দুঃখকষ্ট কতক ভুলিয়াছিলেন। দিবানিশি মেয়ের ভাবনা ভাবিয়া প্রীতির মাতার মন কেমন চির-বিষাদে ভরিয়া গিয়াছিল, এখন দেশের কাজে দশের মধ্যে তিনি যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সে কাতরতার স্থানে এমন কি একটু আনন্দের চিহ্নও দেখা যাইত—তাই তিনি পুনঃ দেশ-ভ্রমণে যাইতে কিছুমাত্র ইচ্ছুক ছিলেন না। সুরেনবাবু ও তিনি প্রীতিকে বিরত করিবার বহু চেষ্টা করিলেন।

প্রীতির কিন্তু দেশ-ভ্রমণের ইচ্ছার আরও এক কারণ হইল। তাহার মধ্যম দেবর পরীক্ষায় সফল হইয়া সরকারী কোষাগারের অধ্যক্ষের পদ পাইল। তাহার সহিত রমার বিবাহের সম্বন্ধ চলিতেছে। নির্ম্মল সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। প্রীতিরও তাহাতে খুবই মত, কিন্তু এ বিবাহে তাহার এত দিনের সযত্নরক্ষিত গুপ্ত কথা প্রকাশ হইয়া যাইবে, তাহাতে দেবব্রতের ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া প্রীতি ভীত। সকলেই পাত্রকে প্রীতির দেবর বলিয়া জানিত কিন্তু এতাবৎ কাল কেহই তাহার সহিত দেবব্রতের কি সম্পর্ক তাহা জানিত না, কারণ সকলেই দেবব্রতের পরিচয় গোপন রাখিতেন। দেবব্রতের ব্যবহারে তাহার মাতা বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তিনি বলিতেন "তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নাই, তার নাম আর কেউ করবে না।" আজকাল যদিও দেবব্রত মধ্যে মধ্যে আসে সে কখনও আত্মীয়স্বজনের সহিত দেখা করে না, কাজেই সে কে, কোথায় থাকে জনসাধারণ জানিল না। প্রীতি বেশ জানিত যে চিরদিন তাহাদের সম্পর্ক কখনই লুকান থাকিতে পারে না, তবু সে এই বিবাহ পাকা হইবার পূর্ব্বেই দূর দেশে চলিয়া যাইতে চাহে। দেবব্রত স্বেচ্ছায় তাহাকে স্বীকার করিল না, অন্য লোকে যে সে সম্বন্ধ প্রচার করিবে তাহা প্রীতির পক্ষে অসহ্য হইল। সে চায় যে দেবব্রত সকলকে সে পরিচয় দিবে, কিন্তু সে আশা তো বিফল; সুতরাং প্রীতি মাতা বা খুল্ল-পিতামহের কোন কথাই শুনিল না, সে দূর-দেশ-ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে লাগিল, সে বদরীকাশ্রম যাইবার মানস করিল।

একত্রিশ

এক দিন নির্ম্মলের পত্রে প্রীতি খবর পাইল যে নীলিমারা কয়েকদিনের জন্য কলিকাতা আসিয়াছে। সে সংবাদে প্রীতি নীলিমাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইল, নীলিমার পুত্র হইবার সময় শেষ দেখা হইয়াছে, তাহার পর দুই বন্ধুতে আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। পত্র পাইয়াই প্রীতি সুরেনবাবুর সহিত কলিকাতায় আসিল নীলিমাকে তাহার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিতে। প্রীতি নীলিমার খোকাকে রাখিয়া দিতে চাহিয়াছিল, ফলে তাহার বন্ধু কথা দিয়াছে যে, তাহার আবার সন্তান হইবার পূর্ব্বে যদি প্রীতি ও তাহার স্বামীর পুনর্মিলন না হয় তো তাহার দ্বিতীয় সন্তান প্রীতিকে দিবে। তদ্ভিন্ন প্রীতির বিশেষ ইচ্ছা যে অমিয় ও নীলিমাকে সে তাহার দেশ দেখায় ও সেখানে দুই চারি দিন তাহাদের রাখে। তাহাদের অবাক করিবার ইচ্ছায় সে পূর্ব্বে কোনও খবর না দিয়াই আসিল। কলিকাতা পৌঁছিয়া নিজগৃহে সব ঠিক করিয়া প্রায় সন্ধ্যা ছয়টায় মোটর করিয়া নির্ম্মলের মামার বাড়ী গেল, সেইখানেই নীলিমারা উঠিয়াছে।

সেখানে পৌঁছিয়া প্রীতি শুনিল যে নীলিমারা সান্ধ্য-বিহারে গিয়াছে, গৃহে আছেন শুধু তাহাদের মাসীমাতা ও নির্ম্মল। গৃহিণীও গিয়াছেন স্নানে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। কি আর করিবে সে তো এ বাড়ীতে নবাগতা নহে, সে বরাবর নির্ম্মলের ঘরের দিকে গেল। নির্ম্মল তেতলায় নিজের ঘর নির্ম্মাণ করাইয়াছে, কারণ সে মধ্যে মধ্যে একটু নির্জ্জন স্থান উপভোগ করিতে চাহে। সেখানে বড় কেহ যায় না, যখন তাহার ইচ্ছা হয় নির্ম্মল সেখানে গিয়া নির্জ্জনে চিত্রাঙ্কনে মন দেয়। প্রীতিকে দেখিয়া নির্ম্মলের বালক ভৃত্য বলিল, "দাদাবাবুকে খবর দিই।" প্রীতি উত্তরে বলিল, "তোকে আর খবর দিতে হ'বে না আমি নিজেই খবর দিচ্ছি।" ভৃত্য বলিল, "দাদাবাবু যে আমাকে বলেছেন কেউ এলে তাঁকে আগে খবর দিতে, আমাকে যে বক্‌বেন।" ততক্ষণ প্রীতি বারণ না শুনিয়া দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া দ্রুত ধাবমান ভৃত্যকে অতিক্রম করিয়া তাহার পূর্ব্বেই নির্ম্মলের গৃহে গেল। সেথায় উপনীত হইয়া সে ডাকিল "দাদা" কিন্তু সে যাহা দেখিল তাহাতে সে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। নির্ম্মল স্বহস্তে তাহারই জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি, তৈলচিত্রে অঙ্কিত করিয়া ছবির নিম্নে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে "দেবী আমার"; আর তাহারই সম্মুখে মুগ্ধ বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে রহিয়াছে।

প্রীতির কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল, প্রথম তাহার মনে হইল যে, সে জাগ্রতেই স্বপ্ন দেখিতেছে, কিন্তু ফিরিয়া দেখিল প্রীতি সশরীরে উপস্থিত। সে প্রীতির দিকে অগ্রসর হইল। প্রীতি আর দাঁড়াইতে পারিল না, সে নির্ম্মলের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নির্ম্মল তাহারই পার্শ্বে বসিয়া আবেগ-ভরে বলিল, "প্রীতি,কি হ'য়েছে, আমাকে বল। তুমি কেন হঠাৎ এসেছ, কেনই বা এমন করে কাঁদ্‌ছ?" প্রীতির সমস্ত শরীর তখনও কাঁপিতেছিল, সে উত্তর দিতে পারিল না। নির্ম্মল তাহার পৃষ্ঠে ও মস্তকে হাত বুলাইয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা পাইল।

কিছুক্ষণপরে প্রীতি মুখ তুলিয়া ধীরে ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দাদা, ও কি করেছ?"

নির্ম্মলের তখন হুঁস হইল যে ছবিখানা খোলা আছে, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পর্দ্দা টানিয়া দিল। আজ দুই বৎসর হইল নির্ম্মল নিজ হস্তে এই ছবি আঁকিয়াছে। প্রীতি যখন কেবল দূরে দূরে বেড়াইত তখন তাহাকে দেখিবার অন্য উপায় না পাইয়া আত্ম-তৃপ্তির জন্য নির্ম্মল তাহার এই জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তির সৃজন করিল। নির্ম্মলের জীবনে প্রীতির চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা নাই, তাহার ধ্যান-ধারণা সবই প্রীতিময়। সে প্রেমে স্বার্থ নাই, প্রতিদানের আশা নাই। নির্ম্মল ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিল, "কি আবার হ'বে, তোমার ছবি কি আঁক্‌তে নেই? আমি তো সকলেরই ছবি আঁক্‌ব মনে করেছি, সময় পাই নি বলে হয় নি।"

নির্ম্মল আশা করিয়াছিল যে প্রীতি তলার লেখাটা দেখে নাই, তাই তাহার প্রীতিকে ভুলাইবার এই প্রয়াস। কিন্তু প্রীতি উত্তর করিল, "দাদা, লুকাচ্ছ কেন? আমার আর কিছু বুঝ্‌তে বাকী নেই, এই অভাগিনীর জন্যই তুমি সংসারী হ'লে না। জেনে শুনে কেন এমন বিষ পান করলে, দাদা? এতদিন আমি ভাব্‌তাম না জানি কেমন সে মেয়ে যে তোমার প্রাণে এমন সুন্দর প্রণয় জাগিয়েছে, যা'র জন্য তুমি সকল কামনা ত্যাগ করে প্রসন্নবদনে জীবন-পথে এগোচ্ছ। যদি আগে জান্‌তুম যে তোমারই সুখের পথে কাঁটা হ'য়ে দাঁড়াব—"

নির্ম্মল প্রীতির মুখ চাপিয়া ধরিল, কথা শেষ করিতে দিল না, বলিল, "ও কথা বলতে পাবে না। তুমি কি জান যে তুমিই আমার সুখ, আমার শান্তি, আমার ধ্যান, আমার ধর্ম্ম। প্রীতি, কেন দুঃখ করছ, আমি সুখে এই জীবন বরণ করেছি। প্রীতি, তোমার কাছে একটা অনুরোধ এ ঘটনা যেন আমাদের মধ্যে কোন ব্যবধানের সৃষ্টি না করে, আর আমার প্রতি তোমার মনের ভাব যদি বদ্‌লে যায় তো আমার দুঃখের সীমা থাক্‌বে না।"

"দাদা, তোমাকে আমি চিরদিনই বড় ভাইয়ের মত ভালবাস্‌ব, গুরুজ্ঞানে, দেবতাজ্ঞানে আমি তোমায় পূজা করি, তুমি চিরদিনই আমার প্রাতঃস্মরণীয়। তোমার কাছে কত না সুশিক্ষা পেয়েছি, তুমিই আমাকে এমন করে গড়ে তুলেছ। তবু বলি এ ব্যাপার না হ'লেই ভাল ছিল। দাদা, আমার একটী কথা স্থিরভাবে শোন, তার পর বেশ ভাল করে সব দিক একবার বিবেচনা করে দেখ। প্রকৃতির

নিয়মে সকলেই সঙ্গী চায়, ভালবাসা দিতে ও পেতে চায়, সন্তান চায়। কেউ তো স্বেচ্ছায় প্রণয়হীন, সঙ্গীহীন জীবন চায় না। যাদের ভাগ্যদোষে সঙ্গীহীন অবস্থাতে দিন কাটাতে হয় তাদের কত দুঃখ, তাদের কত বিড়ম্বনা, তাদের জীবন শেষে হয় তো তিক্ত হয়ে ওঠে। বেশী আমি বল্‌তে পারছি না। দাদা, আমার কথা শোন, এমন করে নিজের জীবন মাটি করো না, একটা মনের মত মেয়ে দেখে বিয়ে কর। স্ত্রীর ভালবাসাতে, সন্তানাদির কলকণ্ঠে তোমার জীবন পূর্ণ হ'য়ে উঠবে। আমি তোমার ছেলেদের নিয়ে নিজের দুঃখ কষ্ট ভুলব।"

"প্রীতি, কেন মিছে এত বাজে কথা বল্‌ছ। তুমি কি করে আমাকে বিয়ে কর্‌তে বল্‌ছ? আমি একজনকে বিয়ে করে তার কাছে প্রাণভরা ভালবাসা নেব, আর দেব ভালবাসার অভিনয়। তা'তে সে তৃপ্ত হ'বে কেন?"

"কালে তুমি তাকে ভালবাস্‌তে শিখ্‌বে।"

"বৃথা, আমি আমার মন বেশ জানি, ও সব হ'বে না, আমি কিছুতেই বিয়ে কর্‌ব না। আমার প্রাণের মন্দিরে অন্য কারও আসন নাই, হ'তেও পারে না।"

প্রীতি চুপ হইয়া গেল, নির্ম্মল আরও বলিল, "প্রীতি, আমি তো একজনকে ভালবেসে তাকে জীবন উৎসর্গ করেছি, তুমি কা'র জন্য নিজেকে সব সুখ হ'তে বঞ্চিত করেছ? সে তো তোমার ভালবাসা পাবার উপযুক্তও নহে।"

"আমি যে কিছুতেই তাঁকে ভুল্‌তে পার্‌ছি না, দূরে গিয়ে, কাজে মন ডুবিয়ে কিছুতেই আমি সংযত হ'তে পার্‌ছি না। দাদা, তুমি তো বেশ স্থির আছ, আমি কেন এমন অস্থির হই?, আমার মনে হয় যদি তিনি আমাকে একবার পত্নীবলে স্বীকার করে নন, তা হ'লেই আমি সব অপমান ভুলে তাঁর সেবাদাসী হ'য়ে ধন্য হই।"

"প্রীতি, লক্ষ্ণৌ যাবার আগে তো তোমার এ-ভাব লক্ষ্য করি নি, তখন তুমি কেবল সতীত্বের আদর্শ নিয়ে বিভোর ছিলে। কিন্তু এখন তোমার কথায় বেশ বোঝা যাচ্ছে যে তোমার অন্তরাত্মা জাগ্রত হয়েছে—কবে, কেমন করে এ পরিবর্ত্তন হ'ল। লক্ষ্ণৌ থেকেই আমি তোমার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখেছি, তোমাদের বাহাদুরী দিতে হ'বে যা হোক্‌, এতগুলা লোকের চোখে ধুলা দিলে কেমন করে? সে তো তবু এক দিন প্রায় ধরা দিয়েছিল, তখন তোমার ব্যবহারেই তো আমি ঠ'কে গেলাম। আজ বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে কেন অমন শিষ্টাচারী অমায়িক লোক হঠাৎ আমার প্রতি বিদ্বেষভাব দেখাল, অথচ পূর্ব্বে আমার সঙ্গে বেশ ভাব ছিল। আমি মনে মনে ভাবতুম যে এ কেন এমন ভাবে ঈর্ষা প্রকাশ করে। দুই তিন দিন তো তোমাকে নিয়ে ঝগড়া বাঁধ্‌বার মতই হ'য়েছিল। কেবল তুমিই তার সঙ্গে এমন সহজ ব্যবহার কর্‌তে, যেন সত্যই বহুদিনের আলাপমাত্র; আমিও কিছু ধর্‌তে পারি নি যে তা'তে তোমাতে কোন সম্পর্ক থাক্‌তে পারে।"

প্রীতি এতক্ষণ মাথা নীচু করিয়া ছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, "আজ তোমার কাছে আর কিছুই লুকাব না, দাদা। তোমাকে অনেক দিন বল্‌তে গিয়েও বলি নি, কেন তা' জান কি? আমি চেয়েছিলাম যে লোকে যেন তাঁর মুখ থেকে আমার পরিচয় পায়। তুমি কেমন করে আজ আমাকে ধরে ফেল্লে? দাদা, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হ'বে যে তুমি এখনও কারোর কাছে আমার এ পরিচয় দিবে না। চিরদিন একথা লুকান থাকবে না সত্য, তবু আমি দেখ্‌তে চাই তিনি নিজে কি করেন। রমার যদি ওঁর ভায়ের সঙ্গে বিয়ে হয় তখন তো সবাই জান্‌তে পারবে, তুমি অন্ততঃ ততদিন কা'রও কাছে কথাটা প্রকাশ করো না।"

"আচ্ছা, সে যেন হ'ল, আমি কাউকে বল্‌ব না, কিন্তু তোমার ওপর আমার বড় অভিমান হচ্ছে। তুমি কি বিশ্বাস করে আমাকেও বল্‌তে পার নি। প্রীতি, তোমার জন্য আমি কি না করেছি, বিলেতে সমস্ত বড় বড় কলেজে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। নামটা পর্য্যন্ত মিথ্যা বলেছিলে।"

"না, দাদা, নাম মিথ্যা নয়, ঐ নামে আমাদের বিয়ে হ'য়েছিল। তুমি রাগ করলে আমার প্রাণে বড় বাজ্‌বে। আমি তো তোমাদের সকলকে সন্ধান নিতে বারণ করেছিলাম, তোমরাই শোন নি। আমি যে তাঁর সুখে ব্যাঘাত দিতে চাই নি দাদা, আমি যদি ঘুণাক্ষরে জানতুম যে তিনি ওখানে আছেন আমি লক্ষ্ণৌ যেতাম না। প্রথম যখন তাঁকে দেখি তখন আমার কি অবস্থা হ'য়েছিল বুঝ্‌বে কি? আমি যে সেইখানেই মূর্চ্ছা যাই নি সেটা আমার বড়

মনের জোরের জন্য। তার পর দিনের পর দিন আমার কত যে মনোকষ্ট গেছে তাতে যে ভেঙ্গে পড়ি নি এ আরও আশ্চর্য্য, তাঁর পক্ষে তো ব্যাপারটা অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। তোমাকে বলি নি বলে রাগ করো না ভাই, আমার মা আজ পর্য্যন্ত জানেন না যে আমাদের দেখা হ'য়েছে। কেবল আমার শাশুড়ী জানেন, তিনি তো জান্‌তেন যে তাঁর ছেলে সেখানে আছেন কিন্তু তিনি তাঁকে বা আমাকে সাবধান করে দেন নি। তাঁর অভিপ্রায় বোঝা শক্ত নয়, তিনি আশা করে-ছিলেন যে ওখানে আমাদের মিলন হ'বে।"

নির্ম্মল প্রীতিকে বাধা দিয়া বলিল, "আগে আমাকে একটা কথা বল, তোমাতে তা'তে এখন কি সম্বন্ধ?"

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া প্রীতি বলিল, "তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়েছে দাদা, তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক থাকা সম্ভব? আগেও যা' ছিল এখনও তাই আছে।"

"তোমাদের কি কোন রকম বোঝা পড়াও হয় নি?"

"দাদা, ধৈর্য্য ধরে সব শোন, তোমার কাছে সব বলে আমি নিজের মন হাল্‌কা করব।" প্রীতি তাহারপর ধীরে ধীরে প্রায় সবই বলিল, কেবল শেষ দিনের আলাপের কথা বলিতে পারিল না।

সকল শুনিয়া নির্ম্মল দেবব্রতের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "সে তোমাকে পাবার উপযুক্ত নয়। মুখে প্রণয় দেখায় কাজে কিছুই করে না, সে প্রণয়ের কি মূল্য।"

"তাঁর প্রতি অবিচার করো না দাদা। তিনি এখন কি করতে পারেন, নিজ কর্ম্ম ফল তো এখন ভোগ করতে হ'বে। অবশ্য আমার বিশ্বাস হয় না যে প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাকে ভালবাসেন, হয় তো আমার প্রতি যে অন্যায় করেছেন তার জন্য অনুতপ্ত হ'য়ে তারই সংশোধনের প্রয়াস পাচ্ছেন। যদি আমাকে সত্যই চাইতেন তো এত দিনে একটা কিছু বিহিত করতেন, কিছু দিন আগে তাঁর মার মুখে খবর দিয়েছিলেন যে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান ও আমি সম্মত হ'লে সর্ব্বসমক্ষে আমার পরিচয় দেবেন। আমি দেখা করি নি, দেখা করায় কি লাভ? আমার অনুমতি নেওয়ার কি দরকার তাও বুঝি না? তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এ-বিষয়ে পরামর্শ করে তবে তাঁর এ কথা তোলা উচিত ছিল না কি? তাঁর স্ত্রী যদি আমাকে নিয়ে একসঙ্গে ঘর না করতে চায়, তা হ'লে তাকে তো দোষ দেওয়া যায় না, কারণ এ রকম যে হ'তে পারে তা ইংরেজের মেয়েদের ধারণার অতীত।"

"তুমি যে তাকে ভালবাস সে কি তা' জানে?"

"কি বল্‌ছ তুমি দাদা? আমার কি এতটুকু আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান নেই যে আমি এ-কথা তাঁকে জান্‌তে দেব? বরং এ তাঁর ধারণা যে আমি তোমাকে ভালবাসি। এমন দিন যদি কখনও আসে যে তিনি আমাকে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে চাইবেন তখন আর আমার মান-অভিমান থাক্‌বে না, তিনি যদি সত্য আমাকে চান, তখন আমি তাঁর কাছে যাব। দেখছ তো ভাই আমার দুর্দ্দশা, আর তুমি কি না এই আমার জন্য তোমার অমূল্য ভালবাসা বিসর্জ্জন দিতে মানস করেছ।"

এ উত্তরে প্রীতির দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল দেখিয়া নির্ম্মল বলিল, "কেঁদ না, প্রীতি, আমার কোনও কষ্ট নেই, তোমাকে ভালবেসেই আমি সুখী। আমি তোমার প্রতিদান চাই না। চল, নীচে যাই, নীলিমা হয় তো এসেছে।"

নীচে যাইবার পূর্ব্বে প্রীতি তাহার অশ্রু-বিধৌত নয়নে নির্ম্মলের মুখপানে চাহিয়া তাহার দুইটী হাত ধরিয়া বলিল, "যে বড় ভাগ্যবতী হয় সেই এমন অপার্থিব ভালবাসা পাবার যোগ্য, কিন্তু পরস্ত্রী হ'য়ে এ ভালবাসার কথা আমার ভাবাও পাপ।"

ইতিমধ্যে প্রীতির ভ্রমণের সঙ্কল্প সুদৃঢ় হইল, সে স্থির করিল যে, এক বৎসর কি ততোধিক কাল বিদেশে থাকিবে, ফলে হয় তো নির্ম্মল তাহাকে ভুলিতে পারিবে। আর সেই সঙ্গে নিজেও ভগবদ্ চিন্তায় নিজের মন ভুলাইবার চেষ্টা পাইবে, দেবব্রতকে ভুলিবে ও সংসারের সুখলালসা হইতে মুক্ত হইবে। হিমালয়ের সকল তীর্থ-ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা তাহার জাগিল। কিন্তু সঙ্গে যাইবে কে? সুরেনবাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি তো সে দুর্গম পথ পদব্রজে অতিক্রম করিতে অসমর্থ।

সেইদিনই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে প্রীতি নির্ম্মলকে বলিল, "দাদা, আমার জন্য তোমাকে একটা কাজ করতে হ'বে, আমি কোন আপত্তি শুনব না। আমি তীর্থ-ভ্রমণে যাব, আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্পত্তির ভার ও আমার

দেশের সকল কাজের ভার তোমাকেই নিতে হ'বে। তোমার ইচ্ছামত তুমি কাজ চালাবে।"

"তোমরা কোথায় যাবে আগে শুনি।"

সব মতলব জানিয়া সে আরও বলিল, "অন্তদূরে আমি তোমাদের কখনই শুধু দাদুকে নিয়ে যেতে দেব না। আমাকে যখন তুমি বড় ভাইয়ের স্থান দিয়েছ, তখন আমার মতে চল্‌তে হ'বে। আমি নিজে তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

"না, দাদা, তুমি গেলে আমার এত সাধের সকল কাজ পণ্ড হ'বে, তা' ছাড়া তোমারও কাজের ক্ষতি হ'বে। সে হ'বে না। আমাদের সঙ্গে যাবার লোক জুটে যাবে, আমার ছোট দেবরকে তো নিয়ে যেতে পারি।"

"আমার কাছ থেকে দূরে থাক্‌বার জন্য বুঝি এসব মতলব করেছ প্রীতি? তা বেশ তোমার ইচ্ছামতই কাজ হ'বে। কিন্তু আমার কাছে তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে এবার বদরিকাশ্রম থেকে আর বেশী দূর দুর্গম পথে যাবে না, ফিরে আস্‌বে। এর পরে তুমি যেখানে যেতে চাও আমি নিজে সঙ্গে করে তোমায় নিয়ে যাব।"

"তোমার সঙ্গে যেতে তো ভালবাসি, তা'তে কত শিক্ষা, পাই, তোমার শিল্পীর চোখে কত নূতন সৌন্দর্য্য দেখতে পাই, কত আনন্দ উপভোগ কর্‌তে পারি,—কিন্তু এবারটা থাক। তবে একথা স্পষ্ট করেই বলি তুমি যে উদ্দেশ্যের কথা তুলেছ সেটা আদৌ সত্য নয়, আমি প্রকৃতই তীর্থ-দর্শনের মানস করে সব আয়োজনও ঠিক করেছি, আমি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভেতর ডুবে থেকে পতি দেবতাকে ভুল্‌তে পারি কি না দেখ্‌তে চাই—আর চাই সত্য-শিবসুন্দর হৃদয়-দেবতার সাক্ষাৎ পেতে। আশীর্ব্বাদ কর দাদা যেন মনস্কামনা সফল হয়।"

বিস্মিত নির্ম্মলকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই প্রীতি গৃহ ত্যাগ করিল।

ক্রমশঃ
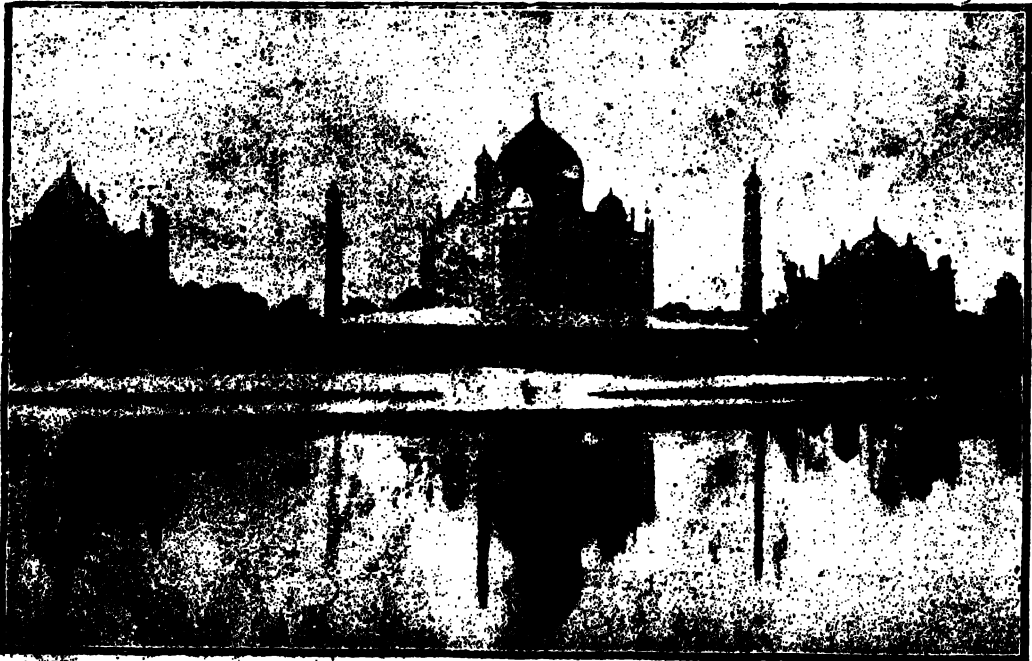
শান্তিপুর-চিত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সাত

ভোলানাথবাবু শান্তিপুর-বর্ণনা প্রসঙ্গে তথায় বহু বিবাহ ও বিধবা-বিবাহের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের 'সমাচার-দর্পণে' উত্তর-প্রত্যুত্তররূপে 'শান্তিপুরনিবাসিনী' কুলীনকন্যা ও বিধবাদের মর্ম্মখেদ ইংরাজী অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখা পুরুষের বলিয়াই বোধ হয়। ইহাতে রাজসকাশে প্রতীকারের প্রার্থনা করা হইয়াছে। তৎকাল-প্রচলিত ব্যবহার-মত একটু খোলাখুলি ভাব দেখা গেলেও ইহা বর্ত্তমান কালের 'কামায়ন'-সাহিত্যের নিকট পরাভব মানে। এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে 'শান্তিপুর-নিবাসিনী' ১৪ইমার্চ্চ তারিখে প্রথম তাঁর খেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ১৮ই এপ্রিলের 'সমাচার-দর্পণে' নবদ্বীপ-বাসী-কর্ত্তৃক 'সমাচার-চন্দ্রিকা'য় লিখিত এই খেদের প্রতিবাদের উত্তর দিয়াছিলেন, ২১শে মার্চ্চ 'চুঁচুড়ানিবাসী-স্ত্রীগণ' 'সমাচার-দর্পণে' উক্ত খেদের সমর্থন করিয়াছিলেন। (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩৮, পৃঃ—২৫৮-৯।)

"শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের দর্পণৈকদেশে স্থান-দানে প্রাণদানের সম উপকার হয় অর্থাৎ আমরা প্রৌঢ়া পতিহীনা দীনা ক্ষীণা এবং অবিবাহিতা কুলীন-ব্রাহ্মণের কন্যা, পতি অভাবে আমারদিগের যে বেদনাবেদন ভূপতিকে অবগতকরণে অশক্তা এজন্য মহাশয়ের সমাচার দর্পণে প্রেরণে আকাঙ্ক্ষা। কারণ দর্পণৈকদেশে মুদ্রাঙ্কিত হইলেই শ্রীযুতেরদিগের দৃষ্টিক্ষেপণে এবং শ্রবণে ২ ভূপতির শ্রবণগোচর হওনের অসম্ভাবনাভাব।

শ্রীযুত ইঙ্গরেজবাহাদুরের রাজ্যমধ্যস্থ অনেকানেক জাতীয় স্ত্রীলোকের বৈধব্যাবস্থা হইলে তাহারদিগের পুনরায় বিবাহ হয় কেবল আমারদিগের এই বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর মধ্যে যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কন্যা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না এবং কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সমমেল না হইলে বিবাহ হয় না। যদ্যপি ঐ স্ত্রীলোকেরা উপপতি আশ্রয় করে তবে যে কুলোদ্ভবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্তু ঐ উভয় বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্যালয়ে গমনপূর্ব্বক উপ-স্ত্রী লইয়া সম্ভোগ করেন তাহাতে কুল নষ্ট হয় না। বিশেষতঃ তাঁহারা মান্যমতে ধন্যবাদ পাইতেছেন এবং ধর্ম্মে কর্ম্মে পৈতৃক আশ্রমে ধর্ম্মবৎ ধর্ম্মের ভারাক্রান্ত আছেন তজ্জন্য সমন্বয়ভারাক্রান্ত নহেন। কেবল স্ত্রী-লোকের নিমিত্তে সমন্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাঙ্গালা শাস্ত্রমতে এমন আছে যে অপ্রৌঢ়া বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। তাহার প্রমাণ আছে যাহারা সুরাসুর ও প্রধান প্রধান পুরাতন রাজা তাঁহারদিগের পত্নী পতি-অভাবে পুনঃ-স্বয়ম্বরা হইয়াছেন এবং স্বামিসত্বে অনায়াসে উপপতি লইয়া সম্ভোগ করিয়াছেন তাহাতে ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় নাই। অদ্যাপিও তাঁহারদিগের নাম উচ্চারণে এবং স্মরণে পাপধ্বংস হয়। তৎসময়ে কুলীনাকুলীন ছিল না কিমাশ্চর্য্য। সুরাসুর রাজাদিগের ঐ সকল কর্ম্মে ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় নাই। এইক্ষণে পুরুষেরদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় না। কেবল স্ত্রীলোকের সুখসম্ভোগ নিষেধার্থে কি ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণতন্ত্র সৃজন হইয়াছিল।

আমরা আমারদিগের শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধ্যমতে আছি তথাচ আমারদিগের বেশভূষা ও আকাঙ্ক্ষীয় উত্তম আহারীয় দ্রব্যাদি ও পতিসংসর্গ বর্জ্জিতা হইয়া অহরহঃ অসহ্য বিরহবেদনায় বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া কি নিমিত্তে কালযাপন করিতে হয়। ইহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক অবলার অবলা মনোব্যথা শমতা-করণের কর্ত্তা পতিঅভাবে ভূপতি। অতএব নিবেদন এইক্ষণে ধার্ম্মিক রাজা ইংরেজ বাহাদুর নানাবিধ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেছেন। আমারদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই যাতনা নিবারণের উপায় আছে তাহা প্রাচীন পুরাণ ও শাস্ত্রে দৃষ্টি-পূর্ব্বক ও প্রধান ২ পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা অবগত হইয়া শুদ্ধ সদ্বিচার করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আইন অনুসারে প্রকাশ করেন। কিম্বা

বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়ের দিগের উপস্ত্রী সহিত সম্ভোগ রহিত করেন। তাহা হইলে আমারদিগের ধর্ম্ম বলবৎ হয় এবং রাজার প্রধান ধর্ম্ম সংস্থাপন হয়। কেন না স্ত্রীলোক ব্যভিচারী কেবল পুরুষের দ্বারা যদ্যপি পুরুষ সকল উপস্ত্রীবর্জ্জিত হন তবে স্ত্রীলোক কুলটা হইতে পারে না। স্বভাবে ধর্ম্মে ধর্ম্ম রক্ষা করেন। কাচিৎ শান্তিপুরনিবাসিনী।" (সমাচারদর্পণ, ১৪।৩।১৮৩৫।

ইহা হয় তো গোঁড়া সমাজ হইতে লেখা হইয়াছিল। মিশনারী ও ব্রাহ্ম সমাজের ঢেউ অবশ্যই লাগিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও রাজা রাজবল্লভের পর বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে সনাতনপন্থী সমাজ হইতে এই প্রচেষ্টা নৈতিক সাহসের প্রকাশ দেখাইতেছে। যাহা হউক, ইহার প্রতিবাদের উত্তর প্রদত্ত হইল।

"শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

আমারদিগের এই কএক পংক্তি মহাশয়ের দর্পনৈকদেশে স্থানদানে প্রৌঢ়া অনূঢ়া পতিহীনা বিরহিনীরদিগের মনের ব্যথা অনেক শমতা হইতে পারে অর্থাৎ সগুণনির্গুণ উপাসক অসীম বুধগণ দর্পণপাঠক দর্পণে আমারদিগের বেদনাবেদন অবগত হইয়া যদ্যপি কোন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ভূপতির গোচরপূর্ব্বক আমারদিগের প্রত্যুপকার করেন সে মহাশয়ের দর্পণপার্শ্বে অর্পণ ব্যতীত হইতে পারে না।

২ চৈত্র শনিবার শান্তিপুরনিবাসিনীর উক্ত এক পত্র শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় প্রকাশ করেন। ২১ চৈত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাপ্রকাশক নবদ্বীপনিবাসীর উক্তি তাহার উত্তর বলিয়া যথার্থ শাস্ত্রের দর্পণ শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়কে অবিবেচনা রচনা পূর্ব্বক নানাবিধ ভৎর্সনা করেন সে তাহার অজ্ঞানান্ধতা প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল অজ্ঞসমীপে বিজ্ঞতা যেন দ্বিতীয় কুন্তীর গর্ভজাত যুধিষ্ঠির ন্যায় ধর্ম্মপুত্র যেমন গঙ্গাপুত্র এইক্ষণে ধর্ম্মসভাসম্পাদক কিবা সদ্বিবেচক উত্তরকারক যেমন যুদ্ধে বিরাটপুত্র উত্তর তেমনি উত্তরোত্তর পত্রের উত্তরে বিদ্যাপ্রকাশ হইয়াছে। শোভাবস্থায় বিড়াল স্কন্ধে করিয়া সিংহের সহিত শিকারে স্বীকার করিয়াছেন। সে যাহা হউক ধর্ম্মপুত্রদিগের অধার্ম্মিকতা দেখিয়া আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী দেশাধিপতিকে মর্ম্মবেদনাবেদন অবগত করিয়া আমারদিগের যাতনা নিবারণার্থ ও লম্পটদিগের লম্পটতা বারণকরণার্থ উদ্যোগী তাহাতে দুর্যোগী ধর্ম্মপুত্র প্রতিবাদী। ইহাতে বোধ হইল যে ধর্ম্মপুত্রের স্বীয় পরিবারের মনের ব্যথা বুঝি অবগত নহেন। কেবল ভেকের ন্যায় কমলমূলে বসিয়া মধু আহরণ করিতেছেন। কিন্তু সঙ্গোপনে ভৃঙ্গ আসিয়া রঙ্গে ভঙ্গে কমলাঙ্গসঙ্গে অনঙ্গপ্রসঙ্গে মধুপান করে সেই সময় ধর্ম্মশালিনীর ধর্ম্মশালায় ধর্ম্মের ছালা বাঁধা যায় তাহা কথায়ও রহিত হয় না। কিম্বা তুলসীপত্র ও করদ্বয় দিয়া আটক করিতে পারেন না। তবে যে প্রতিবন্ধক ইহাতে অনুভব এই যে বিরহিণীরদিগের উচিত বিহিত ব্যবস্থা হইলে যোটক পটক ঘটকের বৃত্তিচ্ছেদ হয়। সুতরাং বিহিতানুসারে বিরহিণীর স্বীয় ২ মনোরঞ্জনানুযায়ী মূলধর্ম্মশাস্ত্রমতে স্বামিগ্রহণ অর্থাৎ স্বয়ম্বরা হইলে অপ্রকাশিত হর্ত্তা কর্ত্তা যোজনকর্ত্তার কি প্রয়োজন তাহার আর প্রভুত্ব থাকে না। সে যাহা হউক বিবাহের প্রার্থনা তাহার অন্তে তাৎপর্য্য কতিপয় পংক্তিতে এমত আছে যে স্ত্রীলোকের বৈধব্যযাতনা নিবারণের ব্যবস্থা নিগূঢ় ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা রাজ্যাধিপতি আইন অনুসারে প্রকাশ করেন কিম্বা পুরুষসকল উপস্ত্রীবর্জ্জিত হন কেন না স্ত্রীলোককে কুলটাকরণের কর্ত্তা পুরুষ সকল অতএব পুরুষ উপস্ত্রী বর্জ্জিত হইলে স্ত্রীলোক কুলটা হইতে পারে না স্বভাবে ধর্ম্মে ধর্ম্ম রক্ষা করেন। আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি সকলের প্রতি তাহাতে পুরুষ বা স্ত্রীলোকের ভেদ নাই তাহা বিতর্ক না করিয়া কেবল ইতরের পক্ষ বলিয়া কুবাক্য সম্ভাষণ করিয়োছেন আর দেবাসুরের প্রতি উপমা দেখিয়া লিখিয়াছেন যে দেবাসুরের সহিত উপমা দেওয়া সে উকীলের ঠাকুরালি। তাহার প্রমাণ দৃষ্টি করিবেন। যথা মহাভারতীয়ং। অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা। পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥ দেবপক্ষে। ভেজে গৌতমসুন্দরীং সুরপতিশ্চন্দ্রশ্চ ইত্যাদি। এমত আর ২ অনেক ২ দেবী ও দেবতার গুণাগুণ পুরাণে প্রকাশ আছে সে কি উকীলের ঠাকুরালি কি ঠাকুরেরদিগের ঠাকুরালি ইহা বিবেচনা না করিয়া কেবলি কুকথা বলিয়া চিত্তে কালি দিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন। সকল অনূঢ়া প্রৌঢ়া পতিহীনার প্রতি যে বিধি নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধান করিয়াছেন

তাহা প্রনিধান না করিয়া বধিরের মত অব্যবস্থা করিয়া দুরবস্থায় রাখিয়াছেন যেমন চন্দ্রমা রাহুগ্রস্ত তেমনি নিগূঢ় ধর্ম্মের অবস্থা করিয়াছেন।

পরন্তু রাজ্যাধিপতিকে অধার্ম্মিক অবিচারক বলিয়া নানাবিধ ভর্ৎসনাকরণে কি তাৎপর্য্য। রাজ্যাধিপতি তোমারদিগের সাধারণ ধর্ম্ম ধার্য্য করিয়া সুবিচার্য্যমতে আজ্ঞা করেন যেহেতুক বাঙ্গলা ধর্ম্মশাস্ত্রে এমত আছে যে স্ত্রীলোক পতিপরিত্যাগ করিয়া উপপতি লইয়া জবন ভূপতির হুজুরে হাজির হয় তাহার আরজেতে জাতিতে কি অধিকার থাকে। তিনি পুনরায় পতিগৃহে প্রবেশ করিলেই দেশবিদেশে অশেষ লোককে জবনজাতি প্রাপ্ত করান। যেহেতুক আপনারা ধর্ম্ম ভাবিয়া কহেন যে পাপান্ন গ্রহণ করিলেই জাতিচ্যুত হইতে হয় তজ্জন্যই দেশাধিপতি সেই মত আজ্ঞা করেন যে হে পুরুষ তুমি ক্ষান্ত হও তোমাকে ও চাহে না। সে যাহা হউক বাদানুবাদে বিরহযন্ত্রণা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। আমরা অকূলে পড়িয়া আকুলা হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণতি পূর্ব্বক ভূপতিকে নিবেদন করিতেছি আমারদিগের যাতনা নিবারণের ব্যবস্থা আমারদিগের নিগূঢ় ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এ দুঃখ হইতে রক্ষা করেন তাহা হইলে প্রাণরক্ষা হয় এবং বিপক্ষের কুবাক্যে চক্ষের জলে ভাসিতে হয় না বিশেষতঃ দেশাধিপতির প্রধান ধর্ম্ম সংস্থাপন হয়।

কাসাং শান্তিপুর নিবাসীন্যনেকবিরহিণীনাং।" (সমাচার-দর্পণ, ১৮।৪।১।১৮৩৫। শ্রীপূর্ণচন্দ্র উদ্ভট্‌সাগর মহাশয়ের সৌজন্যে সংহীত।)

৺দাশরথি রায় বিধবাবিবাহের কথায় শান্তিপুরের নবীনা বিধবাদের আনন্দ ও প্রবীণাদের আক্ষেপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।)

"ফিরে বিবাহ দিবার, বিপদ শাস্তি বিধবার,
শান্তিপুরে যে দিন রটিল।
যত বিধবা যুবতীরে, স্নান করে সব গঙ্গাতীরে
এক যুবতী কহিতে লাগিল॥…"

শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ কাপড়ের পাড়ে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে অনেক গান বয়ন করিয়াছিল। তন্মধ্যে চন্দননগর খলসিনীর ৺বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (ধীরাজ) কর্ত্তৃক রচিত গীতটী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে।
সদরে করেছ রিপোর্ট বিধবা রমণীর বিয়ে॥
কবে হবে হেন দিন, প্রকাশ হবে এ আইন,
জেলায় জেলায় থানায় থানায় বেরুবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম।
কে যাবে এদের সনে বরণ ডালা মাথায় ল'য়ে
কবিবর হেসে কয়, ঘুচিল নারীর ভয়,
সকলের হাতের খাড়ু হইল অক্ষয়।
সবে বল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জয়॥"

এই গানের ব্যঙ্গ পাল্‌টা গানও হইয়াছিল :—

"শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চির-রোগী হ'য়ে। (নদীয়া-কাহিনী।)

কিন্তু শান্তিপুরে এপর্য্যন্ত হিন্দু-সমাজের উচ্চস্তরে বিধবা বিবাহের ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। বাং ১৩৩৬ সালে ছুতারপাড়ার শ্রীশরচ্চন্দ্র ভবাই ১৮ বৎসর বয়স্কা একটী বিধবাকে বিবাহ করিয়াছিল, সে বিবাহের ৪ মাস পরেই বিধবা হইয়াছিল; ইহাতে তাহাকে সামাজিক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। আর একবার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যার বিবাহের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-বর্গকে লইয়া 'ঘোঁট' চলিয়াছিল। সম্প্রতি কলিকাতার নিখিল বঙ্গনারী মহাসম্মেলনে শান্তিপুরের অন্যতম প্রতিনিধি শ্রীযুক্তা প্রতিভা রায় এ প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল—"এখন বহু বিবাহ বড় কেহ করে না। সকলেরই সংসারের অবস্থা খারাপ, বহু বিবাহ ক'র্‌লে খাবার দিবে কোথা থেকে? যদি এমন হয় স্ত্রীকে পছন্দ হ'ল না, তা হ'লে কখন কখন স্বামী অন্য বিবাহ করে। যে রইল তাতে তার অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল হয় না। আইন থাক্‌লে এটাও বন্ধ হ'য়ে যায় সেজন্য আইন দরকার। তার পর বিধবা-বিবাহ প্রচলন—বড় যারা হয়েছেন, ছেলেপিলের মা তাদের বিয়ের কথা নয়। ছেলে মানুষ যারা, ১০।১২ বৎসরে যাদের বিয়ে হ'য়েছে, যারা সংসারের কিছুই বুঝে না সে সব বিধবাদের বিয়ে হওয়া উচিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নজীর দেখাইয়াছেন। ছোট ছোট বিধবাদের বিবাহ দিলে ক্ষতি অপেক্ষা সমাজের লাভ বেশী,

সেইজন্য তাদের বিবাহ বাঞ্ছনীয়। (নিখিল বঙ্গ নারী-মহাসম্মেলনের কার্য্য-বিবরণী।) ইনি সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদেরও সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন।

ভোলানাথবাবু শান্তিপুর-সম্বন্ধে আর একটী কথা লিখিয়াছেন। "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্তিপাড়া হইতে বাঁদর সংগ্রহ করিয়া প্রায় অর্দ্ধলক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া তাহাদের বিবাহ দেওয়াইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী। (পাদরী লঙ্ সাহেব বলিয়াছেন এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।) তদুপলক্ষে নবদ্বীপ, গুপ্তিপাড়া, উলা ও শান্তিপুর হইতে পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে ঐ ঘটনার উপর মন্তব্য করিতে গেলে বলিতে হয় যে, মহারাজ নিশ্চয়ই ঐ দুই দলের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব অনুভব করিয়াছিলেন,, নতুবা তিনি পণ্ডিত ও বানরে মিলন করাইতেন না।"

ফিরে পাওয়া

শ্রীসুকুমার সরকার

উষার সাগ্রহ ল'য়ে ছুটিয়াছে কাহার সম্মুখে
ভাবমুগ্ধ মর্ম্ম মোর, যৌবনের উৎকণ্ঠিত সুখে
আকুল এ তনু-তীর্থ ; চক্ষে মোর লক্ষ স্বপ্নে হারা
ধরার ধ্যানের রস ; অবিশ্রাম ঢালে সুধা ধারা
শ্যামল কপোল তার ; আমি যেন হয়েছি অদ্ভুত
আবিষ্ট রূপের মোহে ; মানসীর মাধুর্য্যের দূত
লেখে লিপি বর্ণাক্ষরে ; তার প্রতি ছন্দ প্রতিরেখা
চিকনিছে পত্রে পত্রে ; ছন্দ তার দিলো আজি দেখা
মেঘের মেদুর পায়ে ; তৃষাতুর মোর বক্ষ-কোণে
আকাশ পাঠায় বার্ত্তা ; বালুতে কি মায়া-জাল বোনে
রূপহীন বাতাসের স্পর্শ-রস-আমন্ত্রণ খানি !
বিচ্ছেদ-বারিধি হ'তে সমুত্থিতা মিলনের রাণী
উঠেছে অমৃত লয়ে ; কি আবেশে কেন যে হৃদয়
আপন স্পন্দন সাথে আপনি সুখের কথা কয় !
তৃণের মুখের পরে সজল অধর-স্পর্শ সাজি
নিলাজ শিশির হানে ; দূরে বহু দূরে উঠে বাজি
নদীর গতির বীণা শুনি আমি আর মনে হয়
প্রতি তন্ত্রী সুর সাথে আছে মোর স্নিগ্ধ পরিচয় !
ঘুমায়ে পড়িছে প্রাণ ; সুখ শুধু জেগে আছে চোখে
কম্পনের রূপ ধরি, হেরি আমি অমর্ত্ত্য-আলোকে
সে মোর এসেছে কাছে ক'য়েছে যে কথা ধীরে ধীরে,
'বিস্মৃতির রাজ্য হ'তে এসেছি স্মরণ-লোকে ফিরে !'

তারি রূপ-সরোবরে দৃষ্টি মোর মরালের সম
পলকের পাখা মেলি সঞ্চারিছে ; মন-বিহঙ্গম
অস্ফুট কাকলী করে ; মনে হয় মোর ক্ষণে ক্ষণে
আরো কতবার মোর কৈশোরের স্ফুটন-লগনে
পাঠায়েছে প্রেম তার ; নিদ্রা-হারা চামেলীর রূপে
দিনান্তের পাত্র ভার কত বার দিলো চুপে চুপে
প্রেম ; জ্যোৎস্না ধবল মোর রাতেরে তুষারে
কত স্বপ্ন সাধ হ'য়ে প্রেম তার গিয়েছে মিশায়ে
আমার অধীর চোখে ; মধ্যাহ্নের বন-বীথি দিয়া
ঝরে পড়া বকুলের ধূলি-ম্লান রূপখানি নিয়া
কতবার দিলো ধরা ; নিলো ঘিরে পদপ্রান্ত মোর
বসন্তের বিটপিতে হয়ে বাঁকা লতা-বাহু-ডোর
কতবার ডাকিলো সে ; কতবার রুদ্র অন্ধকারে
রহস্যের রূপ ধরি প্রেম তার ডেকেছে আমারে !
মৃন্ময় কারার বন্ধ ছিন্ন করি পাগলের মত
তৃণে রূপান্বিত হ'য়ে প্রেম তার যেন অবিরত
আমারি চরণ-স্পর্শ বিলায়েছে পরিপূর্ণ সুধা !
সে দিন আধেক পাওয়া ; আজ মোর হৃদয়ের ক্ষুধা
ভাদ্রের নদীর মত তৃপ্তির আনন্দ খানি বহি
কাঁপায় হাসিরে মোর ; তারি সাথে কাঁপে রহি রহি
সুখের চোখের জল ; প্রাণের অমরাবতী থাকি
ফুটিছে কি মায়া-লোক সাথে লয়ে স্বপ্নের ইন্দ্রাণী !
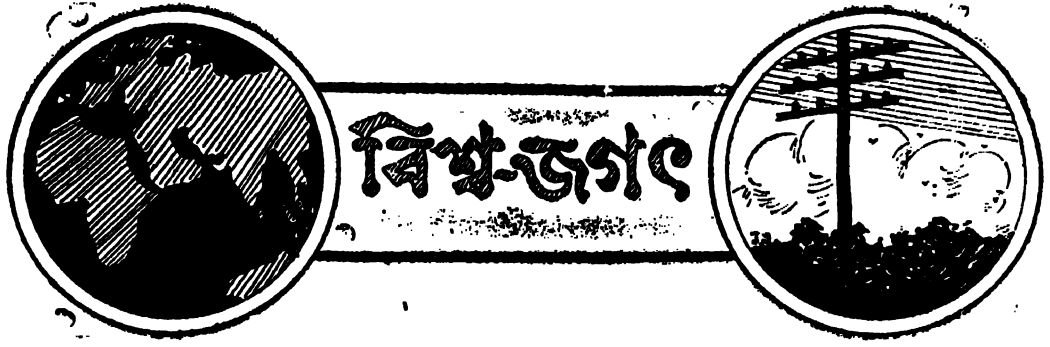
পরলোকে টমাস এডিসন :—

টমাস আলভা এডিসনের নাম শুনে নাই, জগতে এরূপ লোকের সংখ্যা বিরল। এত বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক এ পর্য্যন্ত আর কেহ জন্ম গ্রহণ করেন নাই।
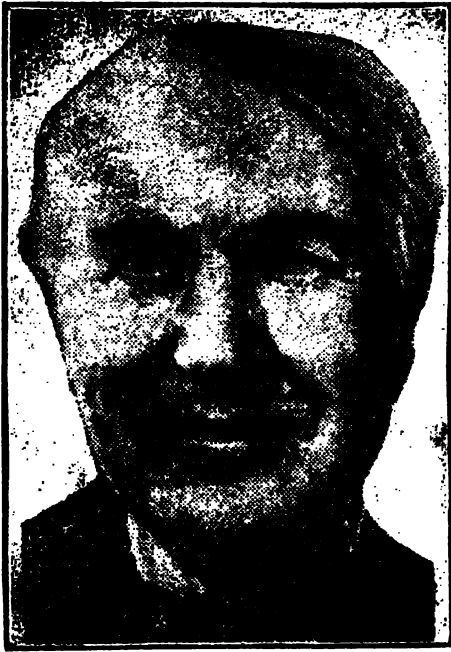
কলির বিশ্বকর্ম্মা টমাস্ এডিসন্

এডিসনের জন্ম হলাণ্ডে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মিলানে জন্মগ্রহণ করেন। এডিসনের বয়স যখন সাত বৎসর তখন তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে লইয়া মিচিগানে বসতি স্থাপন করেন। জাতীয় যুদ্ধের সময় এডিসন সামান্য খবরের কাগজের ফেরিওয়ালারূপে ষ্টেশনে ঘুরিতেন।

মানুষের প্রতিভা কখনও বদ্ধ থাকে না। একবার না একবার তাহা আত্মপ্রকাশ করিবেই। এডিসনেরও তাহাই হইল। তিনি মাত্র টেলিগ্রাফের কাজ শিখিয়া সামান্য চাকুরী হইতে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া দু'একটী টেলিগ্রাফ সম্বন্ধীয় যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া সাধারণে তাঁহার পরিচয় দিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ উন্নতি হইতে উন্নতির শিখরে উঠিয়া তিনি কালে সহস্রেক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার ফেলিলেন। বৈদ্যুতিক আলো, চলচ্চিত্র, সবাক্-

মহাত্মার জন্য ছাগদুগ্ধ দোহন করা হইতেছে।

চিত্র, ফনোগ্রাফ, রেমিংটন টাইপ-রাইটিং-যন্ত্র প্রভৃতি তাঁহারই আবিষ্কার।

বিগত ১৭ই অক্টোবর, ৮৪ বৎসর বয়সে এই অলোক-সামান্য ব্যক্তি পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি একজন আদর্শ কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিজ্ঞান-জগতে যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।

মহাত্মার জন্ত ছাগ-দুগ্ধদোহন :—

সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন, মহাত্মা গন্ধী বিলাতে থাকিবার সময় তিনি যে ছাগলের দুগ্ধ খাইতেন সেটী বিলাতে ছাগ-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহাতে মনে হয়, মহাত্মার ছাগদুগ্ধের জন্য কোন ত্রুটি হয় নাই। লণ্ডনে দুইজন দুগ্ধদোহন করিয়া সপ্তাহের এক কারবার করিয়াছে—গন্ধীজীর জন্য তাহারাও ছাগ দুগ্ধ সরবরাহ করিত। এই ছবিটীতে ব্যবসায়ী দুইজন মহাত্মার জন্ত ছাগ-দোহন করিতেছে।

আমেরিকায় মহাত্মার বাণী-প্রেরণ :—

নিম্নে যে ছবিটী দেওয়া হইয়াছে, উহা আমেরিকা-প্রবাসী এক ভারতীয় পরিবারের। উঁহারা আমেরিকার ভারতীয় জাতীয়-কংগ্রেসের সদস্য। মহাত্মা গন্ধী রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে গিয়া বিলাতে পদার্পণ করিয়াই যে বাণী আমেরিকায় বেতারের সাহায্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন,

[illegible] ভারতীয় পরিবার বেতারের সাহায্যে [illegible] বাণী শ্রবণ করিতেছেন

[illegible] কেবলমাত্র [illegible]

বেতারে চিত্র :—

বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের যুগে নানান্ দৃষ্টান্তে মানুষের শক্তি যে কতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে তাহা ধারণা করাও দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে। ক্রমে ক্রমে দেখা যাইতেছে যেন মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ নয়। নিত্য নূতন আবিষ্কার ও মানুষের নূতন উদ্ভাবনী-শক্তি জগৎ কে যেন আত্মহারা করিয়া তুলিয়াছে।

বেতারে চিত্র-প্রেরণ বিংশ-শতাব্দীর বিজ্ঞানের একটী নূতন অবদান। বেতারে সঙ্গীত কিংবা নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে গায়ক বা নর্ত্তক কিংবা নর্ত্তকীর চিত্রও শ্রোতার সম্মুখে প্রতিফলিত করা কম শক্তির পরিচায়ক নহে। এইরূপ একটী যন্ত্রের উদ্ভব সম্প্রতি হইয়াছে। ইংলণ্ডে মিঃ বেয়ার্ড বি, বি, সি, ষ্টুডিও হইতে ৮টী মানবের পূর্ণ চেহারার সমান দৃশ্যাবলী বিক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মিস্ মুরিয়েল হোয়াইট পিয়ানো বাজাইয়া গান করিবার সময় ও মিস্ ষ্টানলী নাচিবার সময় উঁহাদের প্রতিকৃতি শ্রোতার সম্মুখে পরদার উপর প্রতিফলিত করা হইয়াছে। এক্ষণে ঐ যন্ত্রে চেহারা পূর্ব্বের দ্বিগুণ আকারে প্রতিফলিত করা যায়।

মিঃ বেয়ার্ড আশা করেন যে, এই নূতন বেতারের সুবিধায় অনেকেই বেতারের পক্ষপাতী হইবে। সুদূর ভবিষ্যতে তিনি যে কেবলমাত্র একটী ছবি বিক্ষিপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, শুধু তাই নয়—অর্কেষ্ট্রার সমস্ত বাদ্যকরগণকেও দূরবর্ত্তী রেডিওর যবনিকায় প্রতিফলিত করিতে পারিবেন, ইহাই তিনি মনে করেন।

আমেরিকাতেও বেতারে চিত্র-প্রেরণের উন্নতিকল্পে খুব চেষ্টা চলিতেছে। কলম্বিয়াতে দৈনিক দুইবার বেতার-দৃশ্য প্রেরণ করা হয়। দি ন্যাশনাল ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী দিনে দুইবার 'ফেলিক্স দি ক্যাট' নামক নীরব চিত্র প্রেরণ করিতেছে—অদূর ভবিষ্যতে আরও কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র যাহাতে প্রেরণ করা যায় তাহার চেষ্টাও চলিতেছে।

[illegible] রেডিও কর্পোরেশনের সভাপতি মি [illegible] এই নূতন আবিষ্কারে বেতার-বার্ত্তা [illegible]

বা ছায়াচিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। ইহাতে মানুষ তাহার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি পৃথিবীময় বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে।

গাভীর শিংএর বহর :—

যে গাভীর ছবিটী আমরা এখানে দিয়াছি, উহা চাম্পিদেশীয়। পাঠক পাঠিকাগণ বেশ দেখিতেছেন, উহার
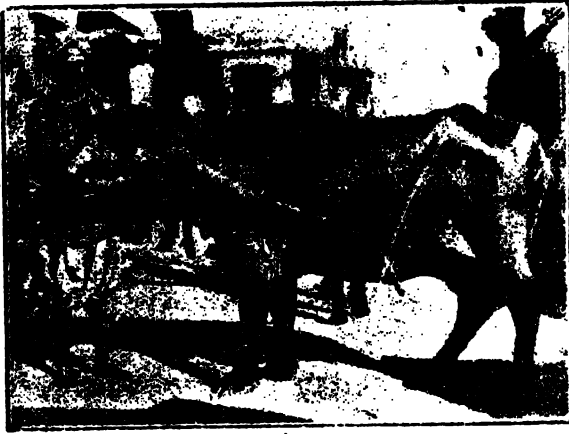
অদ্ভুত শিংবিশিষ্ট গাভী

শিং কেমন বরাবর গায়ের পাশ দিয়া কতখানি আসিয়া পড়িয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত বড় একটা দেখা যায় না। গাভীটার অসুবিধার অন্ত নাই—না পারে ঘাড় ফিরাইতে, না পারে আত্মরক্ষা করিতে। ভগবানের সৃষ্টির ইহা এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত।

চড়াই ও মানুষে বন্ধুত্ব :—

পাখী ও মানুষে বন্ধুত্ব একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে, কিন্তু

মশিয়ে এম, পোল দুইটী চড়ুই লইয়া বসিয়া আছেন

নূতন কিছু ব্যাপার নহে। এরূপ ব্যাপার আমরা অনেকবার শুনিতে পাই।

মশিয়ে এম, পোল চড়ুইদের খাওয়াইতেছেন

প্যারী শহরের মশিয়ে এম, পোল পাখীর সহিত বন্ধুত্ব করিয়া বেশ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার বন্ধু একদল চড়ুই পাখী। ইনি ইহার ইচ্ছানুরূপ তাদের ডাকিয়া,

মশিয়ে এম্ পোল চড়ুইদের লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন

হাতে বসাইয়া, আদর করিয়া খাওয়ান। ইনি ঐ চড়াইগুলির ভাষা, হাবভাব সমস্ত বুঝিতে পারেন—আশ্চর্য্য ক্ষমতা বটে!

জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ পুরুষ ও বৃদ্ধা রমণী :—

আমরা অনেক সময় অনেক বৃদ্ধ লোকের পরিচয় পাই, কিন্তু কে যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ তাহার বড় একটা সংবাদ পাই না। এছাড়া জীবিতদের মধ্যে কাহার বয়স যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তাহা জানিতে খুবই কৌতূহল হয়।

'ইরার আগা' একজন তুরস্কবাসী বৃদ্ধ। ইহার বয়স ১৫৭ বৎসর। সম্প্রতি শোনা গিয়াছে যে, ইনিই জগতের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ লোক। আগা [illegible]

কানের মাপ সাড়ে চার ইঞ্চি এবং নাক চোখ দেখিলে মেকেলে বড় লোকদের মতন দেখায়।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে 'ইয়ার আগা' নাকি আক্রার যুদ্ধে নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এছাড়া পিট, নেলসন্ ও ট্রাফলগারের কথাও তিনি শুনিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তাহার মনে নাই। তিনি এগারবার বিবাহ করিয়াছেন, এবং তাহার মোট সন্তানের সংখ্যা ৩৬টী। তাঁহার বর্ত্তমান স্ত্রীর বয়স ৬০ বৎসর এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের বয়স ৬৬ বৎসর।

এই তো গেল বৃদ্ধ পুরুষ। এছাড়া ইয়ার আগার সমসাময়িক একজন বৃদ্ধার খোঁজ পাওয়া গিয়াছে, তিনি নাকি জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধা রমণী। ইঁহার নাম গ্রোভ্‌কা মিডভা—বয়স ১৫২ বৎসর। গ্রোভ্‌কার বাড়ী বুলগেরিয়ার

শ্রীমতী গ্রোভ্‌কা মিডভা

বর্ণী প্রদেশের পার্নোলি গ্রামে। ইনি একজন কৃষকের বিধবা। এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও গ্রোভ্‌কা বেশ শক্তিসম্পন্ন। চলিবার সময় তাঁহার লাঠির দরকার হয় না এবং ইনি দুগ্ধ দোহন করা, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পালন করেন ও সকলের [illegible] পৌত্রাদির সন্তানগণকে শিক্ষাদান করেন।

পৃথিবীর বৃহত্তম ডক :—

বর্ত্তমানে আমেরিকার বোষ্টনের ডক পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ডক। কিন্তু সম্প্রতি লণ্ডনে এমন একটী ডক নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে যাহা বোষ্টনের ডককেও অতিক্রম করিয়া যাইবে। ম্যানচেষ্টারের মেসার্স এডমাণ্ড নাট্যাল এণ্ড কোং ও লণ্ডনের মেসার্স জন্ মৌলেম এণ্ড কোং সম্মিলিতভাবে এই ডক নির্ম্মাণে প্রস্তুত হইয়াছেন। সাউথ হ্যাম্পটনের মিলব্রুকে এই বিরাট্ ডক প্রতিষ্ঠিত হইবে। ৭৩ হাজার টনের কুনার্ড লাইনের জাহাজের জন্যই এই ডক প্রধানতঃ নির্ম্মিত হইতেছে। এই ডকের দৈর্ঘ্য ১০০০ ফিট, প্রস্থ ১৭৫ ফিট ও গভীরতা ৪৫ ফিট এবং ইহা তৈয়ারী করিতে প্রায় ১৮৫ হাজার পাউণ্ড খরচ হইবে।

মাটীর তলায় মানুষের বাসস্থান :—

প্রাচীনকালে মানুষে যে মাটীর তলায় ঘর-বাসা বাধিয়া বাস করিত তাহার অনেকে প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। এখনও কোন কোন স্থানে যে এরূপ নাই তাহা নহে।

মাটির তলায় বাসগৃহ

উত্তর আফ্রিকার এটলাস নামক পর্ব্বতের গাত্রে গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া এইরূপে প্রায় ১২ হাজার মানুষ বাস করে। ইহাদিগকে 'ক্লাইফ্ ডুয়েলোটাইট্‌স' বলা হয়।

আলাপ আলোচনা

নিবেদন

দেশের এই মহাদুর্দ্দিনে আমরা মহামায়ার পূজা করিয়া ধন্য হইয়াছি—মার কাছে আমাদের প্রাণের কামনা জানাইয়া শক্তি চাহিয়াছি,—তারপর মার নিরঞ্জ করিয়া বিজয়া করিয়াছি ; তারপর মার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলাম। অনিবার্য্যকারণে আমাদের পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকাগণের নিকট

রাজপুতনা জাহাজে মহাত্মাজী ও মীরাবাই

আমাদের যে যথেষ্ট ত্রুটি হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মাসিক-পত্র পরিচালনে কর্ত্তব্যের অনুরোধে যাহা কিছু করিয়াছি বা বলিয়াছি বিদ্বেষের বশে করি নাই বা বলি নাই ; তবু বলি যদি কাহারও সহিত আমাদের মতদ্বৈধ ঘটিয়া থাকে বা সমালোচন-ব্যাপারে যদি কাহারও মনে অপ্রিয় সত্য বলিয়া কষ্ট দিয়া থাকি তবে তাঁহাদের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, যেন তাঁহারা উহা মনের মধ্যে পোষণ করিয়া না রাখেন। তাঁহাদিগকেও আজ আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। মানুষ মাত্রেরই ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে ; মানবেরই ভুল ভ্রান্তি হয়, এ সকলের জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার আশীর্ব্বাদে দেশবাসী ও সুধীজনের শুভ ইচ্ছায় আমরা কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে পারি।

* * *

বিলাতে মহাত্মাজীর ঘরের ভিতরকার অবস্থা

ভারত-সমস্যায় জেনারল স্মাট্‌স

বিলাতে অবস্থানকালে দক্ষিণ-আফ্রিকার জাতীয়-নেতা জেনারল স্মাট্‌স্ ভারত-সমস্যা-সম্বন্ধে গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ তারিখে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"বিলাতের পক্ষে বর্ত্তমানে ভারত-সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এবং বিপজ্জনক সমস্যা ; ভারতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য গ্রেট-বৃটনকে অনেক দূর অগ্রসর হইতে হইবে এবং তাহা যত শীঘ্র সম্ভবপর, ততই বৃটিশের পক্ষে মঙ্গল ; যেহেতু বর্ত্তমান সুযোগ দীর্ঘস্থায়ী না হইতে পারে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস্ যে, মিঃ গন্ধী ন্যায়সঙ্গত আপোষ মীমাংসার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে বদ্ধপরিকর আছেন। তাঁহার যে প্রবল শক্তি, তাহা আপোষ মীমাংসায় নিয়োজিত করার পক্ষে বর্ত্তমান সুযোগ ইংলণ্ডের কখনই পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

তাঁহার মত ক্ষমতাপন্ন নেতা ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। ভারত ও বিলাতের মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি হইয়া ভারতে পুনরায় যাহাতে প্রবলতর অশান্তির আবির্ভাব না হয়, তৎপ্রতি ইংলণ্ডের সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ফেডারেল কমিটীর অবসানে মালব্যজী

শারীরিক শক্তি এবং ধর্ষণনীতি দ্বারা কখনও বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান হইতে পারে না; সদ্ভাব এবং মিত্রতা দ্বারাই ইহার স্থায়ী মীমাংসা সম্ভবপর। সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন এবং সংরক্ষণীয় বিষয়গুলির সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা কখনও এই সমস্যা সমাধানের বিরুদ্ধে অনতিক্রম্য অন্তরায় হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে প্রকৃত পক্ষের আন্তরিকতা থাকিলে, আপোষ মীমাংসা কদাপি অসম্ভব হইতে পারে না।"

হইবেন। এতবড় যোদ্ধাও শান্তির-প্রয়াসী হইয়া আপোষ-মীমাংসারই পক্ষপাতী। বাস্তবিক এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করিতে পারিলে বুঝিব ইংলণ্ডে প্রকৃত রাজনৈতিকের একান্ত অভাব হইয়াছে।

মহাত্মার বিদায়-বাণী

মহাত্মা গন্ধীজী ইংলণ্ড ত্যাগ করিবার সময় রয়টারের বিশেষ প্রতিনিধির নিকট নিম্নলিখিত শেষ বিদায়-বাণী প্রকাশ করেন:—

বিলাতে একটী বালক ও একটী বালিকা গন্ধীজীকে কমলালেবু দিতেছে

ফেডারেল ষ্ট্রাকচার-সাব-কমিটিতে সভাপতির পার্শ্বে গন্ধীজী ও তাঁহার পরে মালব্যজী

[illegible] ব্যক্তিমাত্রেই এই মনীষীর সহিত একমত

"ভারতে ফিরিতেছি; এজন্য আমি আনন্দিত, কিন্তু

ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া আমার দুঃখ হইতেছে। এখানে আমি সুখে ছিলাম।" তৎপরে তিনি বলেন,—"ভগবান না করুন যেন ইংরেজের সহিত আমাকে অসহযোগ যুদ্ধ না চালাইতে হয়—আর যদি কোনদিন চালাইতেই হয়, তা হইলে ইংরাজকে বলি আমি বিদ্বেষ-বশে যুদ্ধ কখনই করিব না। আমার নিতান্ত প্রিয়জনদের সহিতও কখন কখন আমাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেক্ষেত্রে আমি যেমন প্রেমপ্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছি, এক্ষেত্রে তাহাই করিব। সুতরাং ভারতের আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সহযোগিতা করিবার জন্য আমি সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিব।

* * *

মহাত্মাজী ও রোমাঁ রলাঁ

ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া গন্ধীজী ঋষি রোমাঁ রলাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সুইজারলণ্ডে যাত্রা করেন। নিসর্গ সুষমা-মণ্ডিত ঋষির আশ্রমে সরস্বতীর ঋষি উপস্থিত হইয়া যে কথাবার্ত্তা কহেন তাহা সাধারণে প্রচারিত হয় নাই। উভয়েই গুরু-ভাই, একই ঋষির শিষ্য—রুসিয়ার মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি টলষ্টয় উভয়েরই গুরু। টলষ্টয় যে অসহযোগ-নীতির কথা জগতে প্রথম প্রচলন করেন, তাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে ব্যাবহারিক সত্যে প্রতিভাত করিতে পারেন নাই—শিষ্য এ পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন কি আমাদের আশা হয় শীঘ্রই জগৎ এই নূতন সত্যের সম্যক্ উপলব্ধি করিবে যে, নিরুপদ্রব অসহযোগ নীতির কি অদ্ভুত শক্তি আছে। জগতে শান্তি-স্থাপনের এমন অমোঘ প্রতিকার আর নাই—মানবকে হত্যা করিয়া মানবের যে পৈশাচিক আনন্দ হয়, তাহা জগৎ হইতে উঠিয়া যাইবে। মহাযুদ্ধের পর হইতেই এই নৃশংস ব্যাপারের যবনিকা-পাতের জন্য, 'অল্ কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রণ্ট' প্রভৃতি পুস্তকের লেখকরা একবাক্যে এই মত সমর্থন করিতেছেন।

মনীষী রোমাঁ রোলাঁ
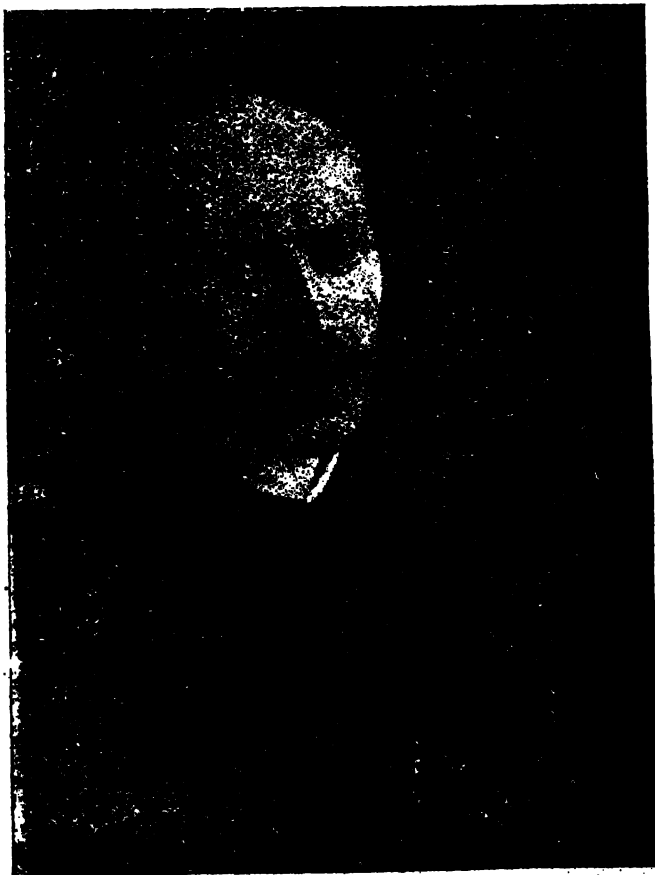
গন্ধীজী ও ডাঃ হিউলেট জনসন।

লণ্ডনে নামিলে মহাত্মাজী ও শ্রীযুক্ত নাইডু।

বাড়ী ভাড়া হ্রাসের চেষ্টা

কলিকাতার ব্যবসাদারের আড়তগুলির বাটী ভাড়া অনেক কমিয়া গিয়াছে। সাহেব-অঞ্চলের বাড়ীভাড়া প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু উত্তর কলিকাতার বাড়ী ভাড়া এখনও কিছুমাত্র কমে নাই। দেশের এই দুর্দ্দিনে কলিকাতার বাড়ী ভাড়া কমাইবার সম্বন্ধে যে আন্দোলন তাহা অতিশয় ন্যত। বাড়ীর মালিকেরা এখনও ভাড়া কমাইবার কোন লক্ষণ দেখাইতেছেন না; কিন্তু আমরা যদি এই আন্দোলনকে প্রবল ও আন্তরিক করিতে পারি, তাহা হইলে জমিদারগণকে টলিতেই হইবে। সমগ্র দেশের আবহাওয়ার বিরুদ্ধে কতদিন তাঁহারা যুদ্ধ করিবেন।

* * *

জন্মদিন-উৎসব উপলক্ষে বিলাতের ভোজে গন্ধীজী

জমিদারদের শোচনীয় অবস্থার কারণ

আমাদের জমিদারগণ সেদিন বড়লাটের নিকট কাঁদুনি গাহিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে তাঁহাদের অবস্থা কাহিল এবং দেশের দুঃস্থ বলিয়াই তাঁহাদের এমন হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি একথা ঠিক নয়। সরকারী দলিল হইতে জানা যায় যে, বহু জমিদারের সম্পত্তি সরকারের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।
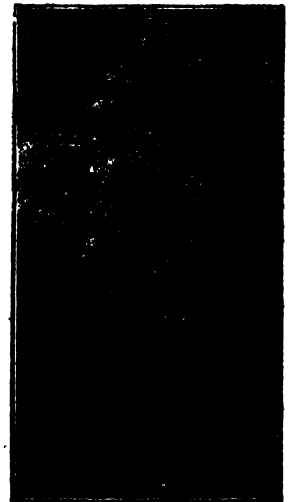
* * *

দেনার দায়ে জমিদারীর দুর্গতি হওয়াতে তাঁহারা আর নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে পারেন নাই, সরকার বাহাদুরকে তাহার ভার লইতে হইয়াছে। এই ঋণের কারণ বাহিরের কোন কিছুর অভাব নয়। আমাদের অধিকাংশ জমিদার বিলাসিতা ও স্বীয় সম্পত্তি পরিদর্শন করিবার অক্ষমতাহেতু ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। অথবা ব্যয় করিয়া 'বাবু' হইয়া পড়েন। তাঁহাদের যদি আজ শোচনীয় অবস্থা হইয়া থাকে তবে তার জন্য দায়ী তাঁহারাই।

* * *

মহাত্মাজী ও শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু একজন ভারতীয় মহিলার সহিত কথা কহিতেছেন

বিলাতে পৌঁছিবার পরে মহাত্মাজী

বিলাতের ফ্রেণ্ডস্ হাউসে মহাত্মা বসিয়া বক্তৃতা দিতেছেন

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে কি পাইলাম

এত দিনের পর গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা শেষ হইল। এ বৈঠকে নূতন কিছু পাওয়া যায় না—প্রথম বৈঠকে যে সকল সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছিল, সেই গুলির এবার পুনরাবৃত্তি হইয়াছে মাত্র। প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা হইতে জানিতে পারা যায় —

(১) বর্ত্তমান বৃটিশ-গভর্ণমেণ্ট বিগত ১৯ জানুয়ারী তারিখের ঘোষণা পুনরুক্তি করিতেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষ লইয়া সংযুক্ত-রাষ্ট্র-গঠন-সম্পর্কে বৃটিশ-গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস আছে এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সেই পক্ষই অনুসরণ করিবেন।

(২) প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণার মধ্যে যে নীতির কথা আছে, তাহা অনুমোদন করিবার জন্য শীঘ্রই পার্লামেণ্টের কমন্স-সভাকে অনুরোধ করা হইবে।

(৩) অল্পদিনের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় যদি নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা করিতে না পারেন, তাহা হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং একটা মীমাংসা করিয়া দিবেন।

(৪) সকলের সম্মতকে ভিত্তি করিয়া নির্দ্ধারিত সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের স্বাভাবিক দাবী ও অধিকার রক্ষা করা হইবে—এই মর্ম্মে শাসন-তন্ত্রের মধ্যে একটা বিধান সংযুক্ত করা হইবে।

(৫) গোলটেবিল বৈঠকের একটা ওয়ার্কিং-কমিটী করা হইবে। ভারতের বড়লাটের মারফতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সময় সময় এই কমিটীর সহিত পরামর্শ করিবেন।

(৬) শাসনতন্ত্রের সমতা প্রস্তুতের জন্য যে কমিটী গঠিত হইবে, সেই কমিটীর সিদ্ধান্ত-সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে বিবেচনা করিবার জন্য তৃতীয়বার গোলটেবিল-বৈঠক আহ্বান করা হইবে।

(৭) সীমান্তের প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এবং বর্ত্তমান ভারত-শাসন আইনের গণ্ডী অতিক্রম না করিয়া অগোণে সীমান্ত-প্রদেশকে গবর্ণর-শাসিত প্রদেশের সমান করা হইবে।

(৮) অর্থ-সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হইলে সিন্ধুদেশকে পৃথক প্রদেশ করা হইবে এবং অর্থ-সমস্যা-সমাধানের জন্য চেষ্টা হইবে।

(৯) তিনটী নূতন কমিটী গঠন করা হইবে—(ক) বাজেটের ভিত্তিতে সংযুক্ত রাষ্ট্রের রাজস্ব সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য একটী কমিটী হইবে (খ) ভোটাধিকার ও নির্ব্বাচন-কেন্দ্র সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য একটা কমিটী করা হইবে (গ) দেশীয় রাজ্যের সহিত বর্ত্তমানে যে-সমস্ত

সন্ধি আছে, তাহার বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য আর একটী কমিটী হইবে।

(১০) কেন্দ্রীয় আইন-সভায় কোন দেশীয় রাজ্য হইতে কতজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন, ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে সাহায্য করিবেন।

গন্ধীর শেষ কথা

প্রধান মন্ত্রী গন্ধীজীর সহযোগিতার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। উত্তরে তিনি তাঁহার স্বভাবানুগত সত্যবাদিতা ও নির্ভীকতার সহিত বলেন, "সম্মানজনক সর্ত্তে আমরা সখ্যতার জন্য প্রস্তুত; কংগ্রেস. শুধু কথায় ভুলিবে না—কংগ্রেস ভারতে প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা দেখিতে চায়। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আপনারা ভারতের সে ন্যায়সঙ্গত দাবী উপেক্ষা করিবেন ততদিন পর্য্যন্ত আপোষ-নিষ্পত্তি হইতে পারে না।

আমি আইন-অমান্য-আন্দোলন পুনরায় প্রবর্ত্তন করিতে চাহি না—আমি শান্তির প্রয়াসী। এই যে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে মহামতি লর্ড আরউইন ব্যতিব্যস্ত হইয়া কঠোর আইন প্রচলন করিয়া কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে যুদ্ধ-বিরতি করিয়াছেন, এই বিরতিকে স্থায়ী শান্তিতে পরিণত করিতে চাই। লর্ড আরউইন মুক্তকণ্ঠে যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

আপনাদের হাতে আইন আছে। আইনের বেড়াজালে ফেলিয়া বিপ্লববাদের সহিত আপনারা সংগ্রাম করিতে পারেন; কিন্তু ভারতকে যতদিন পর্য্যন্ত আপনারা স্বাধীনতা না দিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত এমন সহস্র সহস্র নিরুপদ্রব অসহযোগী ভারতবাসী আছেন, যাহারা ততদিন পর্য্যন্ত নিজেরাও শান্তি কাহাকে বলে জানিবে না, আপনাদিগকেও জানিতে দিবে না।

প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিতে হইলে সামরিক ও পর রাষ্ট্র-বিভাগে সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকা চাই। এ সম্বন্ধে বিগত ১৭ই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্র-সংগঠন-কমিটীতে যে সুদীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার একস্থলে বলিয়াছেন—"পূর্ণ-স্বায়ত্ত-শাসন লাভে কেবল যে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ হইবে তাহা নহে, উহাতে ইংরেজেরও লাভ হইবে। পুলিশ বা তথাকথিত আইন ও শৃঙ্খলা, সামরিক ও পররাষ্ট্র-বিভাগ, এই সকলে পূর্ণ ক্ষমতা যে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীতে না থাকিবে, তাহা স্বায়ত্ত শাসন নহে।"

গন্ধীজী ও আইনষ্টাইন

বিখ্যাত জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অধ্যাপক আইনষ্টাইনের নিকট হইতে গন্ধীজী নিম্নলিখিত বাণী পাইয়াছেন—"আপনি আপনার সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, বিনা রক্তপাতেও আমরা আমাদের আদর্শলাভ করিতে পারি; অহিংসানীতির দ্বারা হিংসার পূজারিগণকে আমাদের আনুকূল্যে আনিতে পারি। আপনার আদর্শের প্রেরণা হিংসা হইতে জাত মানবের স্বার্থ-সংঘর্ষ দূর করিবে এবং এ আদর্শ আহরণ করিলে সমগ্র জাতির কল্যাণ ও শান্তি আসিবে। আপনার প্রতি আমার অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আমি আপনার সহিত চাক্ষুষ আলাপের আশা করিতেছি।" গন্ধীজী উহার যথোচিত জবাব পাঠাইয়াছেন। তিনি অধ্যাপক আইনষ্টাইনকে সবরমতী আশ্রমে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

ম্যালেরিয়ার নূতন প্রতিষেধক ঔষধ

ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালাদেশ চিরজীর্ণ। মফঃস্বলের দিকে চাহিলেই জানা যায় কত সোণার ক্ষেত্র এই রোগের প্রভাবে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং এই রোগের আরোগ্যকল্পে যাঁহারা জীবনব্যাপী অনুসন্ধান ও উদ্যম করিতেছেন, তাঁহাদের কাছে আমরা একান্ত ঋণী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জর, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দেশে আমরা বাস করি, কিন্তু এ বিষয়ে যাঁহারা বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের দ্বারা কৃতী হইয়াছেন, তাঁহারা বিদেশী।

* * *

সম্প্রতি স্প্যাসমো কুইন নামক ঔষধের পক্ষে এমন দাবী করা হইতেছে যে ইহাতে ম্যালেরিয়া সারিয়া যাইবে। ষোলটী ক্ষেত্রে ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে এবং পরীক্ষার ফল

সন্তোষজনক হইয়াছে। যদি সত্যই ম্যালেরিয়া-নাশক এমন ঔষধ কার্য্যকর হয় তবে বাঙ্গালা দেশের চেয়ে উপকার আর কোন স্থানের হইবে না। যাঁহারা এমন ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা, দেশ তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

ম্যালেরিয়া দূর হওয়ার উপকারিতা-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এই ঔষধের পরীক্ষাকারী বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন যে আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও পূর্ব্ব আশিয়ায় যে-সব জাহাজ বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করে, সে সকলের কর্ম্মাধ্যক্ষরা ও নাবিকরা প্রায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। তাহারা এই ঔষধের গুণে রক্ষা পাইবে। এত বড় একটা দেশ যে ম্যালেরিয়ায় জীবন্মৃত হইয়া আছে, তাহার কথা উল্লিখিতও হইল না। যাহা হউক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের আবিষ্কৃত এই নব-ঔষধের গুণ বাঙ্গালা-দেশের ন্যায় পরীক্ষার স্থানের ন্যায় আর কোথাও পাইবে না—আর যদি এইখানে পরীক্ষিত হইয়া সফলতা লাভ করে তবেই বুঝিব ঔষধের অমোঘ শক্তি।

শর্করা-সংরক্ষণে

কৃষি-অনুশীলন-বিভাগ-সংক্রান্ত ইম্পিরিয়াল কাউন সিলের 'শর্করা-সমিতি'র বিবরণী হইতে জানা গেল যে, ভারতীয় শর্করা-শিল্পকে আপাততঃ ১৫ বৎসর রক্ষা করিবার জন্য সরকার বাহাদুর সমিতির হাতে বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা দিবেন। ভারতের শর্করা-শিল্পকে রক্ষা করা যে দরকার এতদিন পরে কর্ত্তৃপক্ষের ইহা মনে পড়িয়াছে তবু ভাল। জাভা ও জার্ম্মানী হইতে আনীত শর্করার সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতের শর্করা-শিল্প পঞ্চত্ব পাইতে বসিয়াছে। সেই শিল্প-সংরক্ষণের ব্যবস্থায় গভর্ণমেণ্ট উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহারা দেশবাসীর আনন্দের কারণ হইবেন।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

আগামী বড়দিনের ছুটীতে এলাহাবাদে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের দশম অধিবেশন হইবার কথা ছিল, কিন্তু ঐ সময় কলিকাতায় রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশের অনেক সাহিত্যিক উৎসবে যোগদান করিবেন বলিয়া সম্মেলনের কর্ম্মকর্ত্তারা ঐ সময় সম্মেলন হইবে না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কাজটা যে তাঁহারা ভালই করিয়াছেন তা আর বলিতে হইবে না। তাঁহাদের বিচার বুদ্ধির আমরা প্রশংসা করি। দেশের এই দুর্দ্দিনে সভা-সমিতি যত কম হয় ততই ভাল। নূতন আইনের বেড়া জালে বাঙ্গলায় যে কত শত যুবকের পড়িতেছে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের মনের অবস্থা ভাবিয়া ও দেশের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের কথা চিন্তা করিয়া একেবারেই বন্ধ করাই ভাল। রবীন্দ্র-জয়ন্তী সম্বন্ধেও আমাদের ব্যক্তিগত অভিমত এইরূপই; কিন্তু এক্ষেত্রে একটা কথা হইতেছে যে জয়ন্তীর কথা বহুদিন পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙ্গলা বা বাঙ্গালীর নয়—সমগ্র জগতের। জগতের বহু মনীষীই ইতিপূর্ব্বে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। যদি বন্ধ করা হয় তাহা হইলে তাঁহাদের মনঃক্ষোভ ও অর্থনষ্ট উভয়ই হইবে; নচেৎ রবীন্দ্রনাথকেই আমরা অনুরোধ করিতাম রবীন্দ্র-জয়ন্তী বন্ধ করিয়া দিবার জন্য।

বাঙ্গালী-মুসলমান ছাত্রের কৃতিত্ব

ডাঃ কুদ্রাতি খুদা নামে একজন বাঙ্গালী মুসলমান লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস্‌সি উপাধি পাইয়াছেন। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই সম্মানীয় উপাধি পাইলেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ইনি সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশ তাঁহার ন্যায় কৃতী একজন বাঙ্গালীর নিকট রাসায়নিক গবেষণামূলক আবিষ্কার দেখিতে চায়। রসায়নের ব্যবহারের দিকের আলোচনা করিয়া তিনি বাঙ্গালীর উপকার করুন।

বাঙ্গালী হিন্দু ছাত্রের কৃতিত্ব

নিখিল-ভারত প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ কলেজের মেধাবী ছাত্র শ্রীমান্ অবনীমোহন কুশারী লর্ড আরউইন স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় ছিল "বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ ও বেকার-সমস্যা" ভারতের সমুদায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রেরা এই প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। সকল দেশের ছাত্রদের ভিতর শ্রীমান্ অবনীমোহন প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। বাঙ্গালার ছাত্ররা যে চিন্তাশীল তাহার

প্রমাণ দিয়াছে। এত বড় সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা যে যুবক করিতে অগ্রসর হইতে পারে তাহার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।

বাঙ্গলা-দেশ হইতে বেকার-সমস্যা কি ভাবে দূর করিতে পারা যায় কিংবা বাঙ্গালীর অবস্থা উন্নতি করিতে পারা যায় সে বিষয় লইয়া অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি চেষ্টা করিতেছেন—জানিনা কবে কোন মনীষীর উদ্ভাবনী-শক্তি হইতে ইহার প্রশমনের উপায় বাহির হইবে? তবে কিছুদিন পূর্ব্বে রুশিয়ার পাঁচ বৎসরের কৌশলবিলাতে প্রচার করিবার সময় জনৈক রুশ-দেশের সাংবাদিক গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সমগ্র জগতে যদি কোন দেশে বেকার না থাকে তাহা একমাত্র রাশিয়ায় অন্য কোন দেশে এরূপ নাই।

জগতের মধ্যে রুশিয়া ছাড়া কোন দেশ এমন নাই যেখানে বেকার-সমস্যা নাই। আমাদের দেশে বেকার কেহ নাই। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ,স্যর সি ভি, রমন প্রভৃতি এদেশের অনেক সুধী সোভিয়েট-গবর্ণমেন্টের মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করিয়া একথায় সাক্ষ্য দিয়াছেন। রুশিয়া ও বাঙ্গালাদশের অবস্থা প্রায় একরূপ। বাঙ্গালীর সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত কি করিয়া রুশিয়া বেকার-সমস্যাকে আয়ত্ত করিয়াছে। রুশিয়া যেভাবে কাজ করিয়া আসিয়াছে ও কৃতকার্য্য হইয়াছে বাঙ্গালীদেরও সেইভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিত।

মীরাট মামলার বিরাট ব্যয়

সন ১৯৩১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মীরাট ষড়যন্ত্র-মামলায় সরকার মোট ৭২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন, এই ব্যয় ভারত-সরকার এবং যুক্ত-প্রদেশে সরকারের তহবিল হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার ভিতর সাক্ষী ও এজহার দিবার ব্যয় বাবদে প্রায় ষাট হাজার টাকা এবং উকীল-ব্যারিষ্টারের ফিঃ বাবদে নয় লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত এই মকদ্দমায় যে কত টাকা খরচ হইবে তাহাতে স্থিরতা নাই। একটা মকদ্দমার জন্য, দরিদ্র ভারতের এত টাকা খরচ করা কোন মতেই সমর্থন করিতে পারা যায় না। এত ব্যয় না করিয়া কি মকদ্দমা চালান যাইত না? দ্বিতীয়তঃ এই সকল শিক্ষিত ব্যক্তিদের এতদিন আটক করা কি ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত? সভ্য-জগতের কোন দেশে ফৌজদারী মামলায় এত বিলম্ব হইয়াছে কি? সরকারের উচিত যাহাতে এই মকদ্দমার যবনিকাপাত হয়,তাহার ব্যবস্থা করা।

বিলাতের নির্ব্বাচনে বার্ণাড শ'র অভিমত

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ লেখক জ্ঞানবৃদ্ধ চিন্তাশীল বার্ণড্ শ' বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলের প্রাধান্য দেখিয়া সন্তোষ-লাভ করিতে পারেন নাই; কারণ তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন,—গতবারে রক্ষণশীল দল নীল-নদের বাঁধ কাটিয়া মিশর দেশ ডুবাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন এবং আর্কদের ডাকাতি করিয়াছিলেন। এবার ম্যাকডোনাল্ড্ এই দলকে শাসনা-ধীনে রাখিতে না পারিলে আবার অনুরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা।" একথা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় রক্ষণশীল দলের লোকেরা যে ভারতবর্ষকে সহজে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিবেন তাহা কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে; তাহাদের ক্ষমতায় যতটুকু আছে তাহারা বাধা দিবেনই। ইতি মধ্যেই হাউস অব কমন্সে তাঁহারা নানারূপ গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দেখা যাক্ কি হয়?

মুলগন্ধ-কুটিবিহারের উদ্বোধন-উৎসব

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া সারনাথে তাঁহার উপাসনা-বাণী প্রথম প্রচার করিয়া নির্ব্বাণ লাভের সহজ সরল উপায় দেশবাসীকে জানাইয়াছিলেন যেখানকার মুলগন্ধ-কুটিবিহার হইতে বৌদ্ধদের দর্শন, মনো-বিজ্ঞান, চারিত্র্য প্রচারিত হইয়া ভারতবর্ষ তথা জগৎকে নূতন বিজ্ঞান ও দর্শনের সন্ধান দিয়াছে কালের কুটিল গতিতে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—এখানকার বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে কত ছাত্র জ্ঞানলাভ করিয়া দেশ-বিদেশে শিক্ষাদান করিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব কীর্ত্তি লাভ করিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। সেই বিহারের ভগ্ন স্তূপের উপর নূতন বিহার সংস্থাপিত হইল। গত ২২এ নভেম্বর এই বিহারের দ্বার-উদ্ঘাটন ও উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল এবং ইহাই সেকালে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল। ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে মহম্মদ ঘোরী এই বিহার বিনষ্ট করেন। এই বিহারের যে প্রকোষ্ঠে বুদ্ধদেব বাস করিতেন তাহা "গন্ধকুটী" বা, সুগন্ধামোদিত' প্রকোষ্ঠ নামে অভিহিত হইত। মহাবোধি সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অনগারিক ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এই স্থানের এক লিখিত তাম্র-

ফলকের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সারনাথে ঐ নামে এক বিহার ছিল। ঐ বিলুপ্ত বিহারের স্মৃতি-রক্ষণের জন্য ঐ স্থানে নির্ম্মিত বিহারের ঐ নামই রাখা হইয়াছে।

এই বিহার-নির্ম্মাণে এক লক্ষ দশ হাজার মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। প্রাগুক্ত শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মপাল, মিসেস্ মেরী এলিজাবেথ সচরাচর এবং অপরাপর কয়েকজনের অর্থসাহায্যে ইহা নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছেন। ১৯২২ সালে এই বিহারের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়; কিন্তু কয়েক বৎসর ধরিয়া ইহার কার্য্য বিশেষ বাধা ও অনিবার্য্য কারণে বন্ধ থাকে, তাহার পর ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে পুনরায় কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে উহা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধসম্রাট্ কণিষ্ক সর্ব্বশেষ আন্তর্জ্জাতিক বৌদ্ধ-সম্মিলন আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহার পর বৌদ্ধধর্ম্ম দুইটী বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়—একটা মহাযান, অপরটী হীনযান। হিমালয়স্থিত বৌদ্ধগণ প্রথমটী এবং দক্ষিণ-বিভাগের বৌদ্ধগণ দ্বিতীয়টীর অন্তর্ভুক্ত হন। তাহার পর ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধ-সম্মেলনের কোন উল্লেখ নাই। নূতন সারনাথ-বিহারের উদ্বোধন-উৎসবে উত্তর-বিভাগের বৌদ্ধগণকে বহু সম্মানে ভূষিত করা হয় এবং দক্ষিণস্থ বৌদ্ধদিগের পুরোহিত রতনাসর থেরো এই সম্মিলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহাতে এই বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগের মধ্যে মিলন স্থাপিত হয়। বারাণসীর কলেক্টর বাহাদুর যুক্ত-প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পক্ষ হইতে মহাবোধি সোসাইটিকে একটি রৌপ্য-নির্ম্মিত আমলকী ফল উপহার প্রদান করেন। সস্ত্রীক পণ্ডিত জহরলাল উৎসবে যোগদান করেন ও কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বিহারকে একটী জাতীয় পতাকা উপহার দেন।

এইবার আমরা হিন্দু-মহাসভার বাণী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

হিন্দু-মহাসভার পক্ষ হইতে মহাসভার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উক্ত সম্মেলনে নিম্নলিখিত বাণী পাঠ করিয়াছেন—"হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটীর গত ৭ই নভেম্বর তারিখে দিল্লীতে মহাসভা হইয়া গিয়াছে, ঐ সভায় তাঁহারা গন্ধকুটী-বিহারের স্থাপনে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের আমল হইতে আজ ১৭ শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত ঐ বিহারের স্মৃতি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ৮ শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানেরা এই বিহার ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। বুদ্ধদেবের শ্রীচরণপূত এই ভূমিতে যে মন্দির নির্ম্মিত হইল, ঐ মন্দিরে হিন্দুধর্ম্মের যাবতীয় সম্প্রদায় দর্শনার্থ প্রবেশাধিকার পাইবেন। এই কমিটী আশা করেন যে, এতদ্দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটিবে। এই কমিটী ভারতের যাবতীয় হিন্দু-সম্প্রদায়কে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন সকলের সহিত, এমন কি ভিন্নদেশীয় বৌদ্ধদিগের সহিতও মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন, কারণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক নশ্বর জীবনের মূলে যে সত্য নিহিত আছে, ঐ সত্য প্রাচীন যুগের ঋষি জিন ও যুবকগণ একই ভাবে প্রচার করিয়া দিয়াছেন।

তক্ষশীলার ধর্ম্মরাজিকা স্তূপে পশ্চিমে সারি সারি কতকগুলি মন্দির আছে। স্যার্ জন মার্শাল এই সকল মন্দিরের ভিতর বুদ্ধের দেহাবশেষ দেখিতে পাইয়াছিলেন। একটা রজতাধারের ভিতরে রূপার তার-বেষ্টিত একটা স্বর্ণাধার ছিল। সেই স্বর্ণাধারের ভিতর পাথরের কৌটায় অতি সাবধানে বুদ্ধের দেহাবশেষ সুরক্ষিত ছিল। এই কৌটা তক্ষশীলায় পাওয়া গিয়াছিল। ভারত-সরকার এই দেহাবশেষ আর একটী নূতন রজতাধারে রাখিয়াছিলেন।

কথিত আছে খৃঃ পূঃ ৭৯ অব্দে ১৫ই আষাঢ় তক্ষশীলার প্রাঙ্গণে বোধিসভা-মন্দিরে উরাস্কা নামক একজন ব্যাক্ট্রিয়ানবাসী বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষিত করিয়াছিলেন।

এক্ষণে আমরা রবীন্দ্রনাথ এই বৌদ্ধ-বিহার-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে কবিতা রচনা করিয়া বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম:—

ঐ নামে একদিন ধন্য হ'ল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি॥
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ,
আবার সার্থক হোক্, মুক্ত হোক্ মোহ-আবরণ,

বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
তব প্রাতে উঠুক্ কুসুমি' ॥

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক্ প্রাণবান্।

খুলে যাক্ রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক্ শঙ্খধ্বনি
ভারত অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্ত্তা শতকণ্ঠে উঠুক্ নিঃস্বনি'
এনে দিক্ অজেয় আহ্বান ॥

এই সম্পর্কে গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মপাল মহাশয় উদ্বোধনের প্রারম্ভে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে সংযমের অভাব অত্যন্ত লক্ষিত হইয়াছিল—ভারতের অন্যান্য ধর্ম্মের সম্বন্ধে তিনি যেরূপ মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারা যায় না—তাঁহার অভিমত খৃষ্টান প্রচারকদিগের বক্তৃতার মতই হইয়াছিল—অসহিষ্ণু ব্যক্তিরা যেমন আপনাদের ধর্ম্মমতের প্রাধান্য স্থাপন করিতে গিয়া অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অযথা কুৎসা করিয়া থাকেন এক্ষেত্রেও তিনি ঠিক সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আর না হয় তিনি সেই সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পরের মুখে ঝাল খাইয়া তিনি ওরূপ কথা বলিয়াছেন—মূল সংস্কৃত বা প্রকৃত সংস্কৃত-পণ্ডিতদের অনুবাদ পড়িয়া এরূপ ভ্রান্ত মত পোষণ করিতে পারিতেন না। আর্য্য-ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া বলি, হিন্দু-ধর্ম্মের যদি উদারতা না থাকিত তাহা হইলে বুদ্ধদেবকে কি হিন্দুরা ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইত। তাঁহার উচিত ছিল সকল ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের পার্থক্য কোথায় আর মিলন-ক্ষেত্রই বা কতটুকু দূর বিস্তৃত তাহাই বলা। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের চেষ্টার দিকে কোন কথা না বলিয়া গর্ব্বান্ধ হইয়া—বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় কিছুই না দিয়া—হিন্দু-ধর্ম্মের যে নিন্দা করিয়াছেন, তাহা আদৌ শোভন হয় নাই। বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মমতের অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্ম হইতে গৃহীত। বৌদ্ধধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য মনোবিজ্ঞান ও চারিত্র্যে।

লোকান্তরে

স্বর্গীয় অবতারচন্দ্র লাহা

বিগত ২রা কার্ত্তিক ১৩৩৮ সোমবার মহাষ্টমীর রাত্রিতে প্রবীণ সাহিত্যিক অবতারচন্দ্র লাহা ৭৫ বৎসর বয়সে ৺কাশীধামে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ বঙ্কিম-যুগের আর একজন সাহিত্যিককে হারাইল। শৈশবে পিতৃ-

স্বর্গীয় অবতারচন্দ্র লাহা

হীন হইয়া তিনি নিজের যত্ন ও অধ্যবসায়ে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা অসাধারণ ছিল। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত নানা বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ যৌবনের মতই প্রবল ছিল। বই না হইলে তিনি [illegible] থাকিতে পারিতেন না। সুরসিক অবতারচন্দ্র [illegible] ও কথাবার্ত্তায় পাঠক ও শ্রোতৃবর্গকে বিমল আনন্দ দান [illegible]। রসরচনায় অবতারচন্দ্রের কৃতিত্ব তাঁহার যৌবনে [illegible]-লহরী" নামক উপন্যাসখানিতে প্রকাশ পাইয়া[illegible]সম্রাট্

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। সে যুগের দু'এক-খানি বিখ্যাত প্রহসনের উপর এই রঙ্গোপন্যাসখানির প্রভাব পড়িয়াছে। "আমার ফটো", "শুভদৃষ্টি" প্রভৃতি তাঁর আরও কয়েকখানি সুন্দর উপন্যাস আছে। যৌবনে তাঁহার সাহস ছিল অপরিসীম। বিমানবিহারী স্পেন্সারের নিকট ব্যোমযান লইয়া অবতারচন্দ্রই প্রথম এদেশে বেলুনযাত্রী হইবার সঙ্কল্প করেন। আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে বাধা ঘটে, শেষে তাঁহার বন্ধু রামচন্দ্র এই সৌভাগ্য লাভ করেন। রামচন্দ্রের সম্বন্ধেই তখনকার দিনে সকলের মুখে মুখে ফিরিত —'উঠ্‌ল বেলুন গড়ের মাঠে, পড়ল গিয়ে বালির ঘাটে।' স্বদেশী-আন্দোলনের পূর্ব্ব হইতেই তিনি স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মত পরোপকারী অমায়িক প্রকৃতির সুরসিক মিষ্টভাষী সুলেখকের লোকান্তরে আমরা বেদনা অনুভব করিতেছি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকবি ও সুলেখক শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ও তাঁহার মধ্যম কন্যা শ্রীমতী বিহঙ্গবালা দাসী ইতিপূর্ব্বেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথিতযশ হইয়াছেন।

স্বর্গগত কুমারকৃষ্ণ দত্ত

বিগত ১৫ই কার্ত্তিক রবিবার বেলা দুই ঘটিকার সময় গোয়াবাগান ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে কুমারকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা হাই-কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী ছিলেন। তাঁহার সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, তাঁহাকে বরেণ্য করিয়া রাখিয়াছিল। অসহযোগ-আন্দোলনের সময় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার বন্ধু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ধৃত হন তখনই তিনি আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

কুমারকৃষ্ণবাবু ছিলেন একজন নিঃস্বার্থ কর্ম্মী। জন-হিতকর সাধারণ আন্দোলনে তিনি সর্ব্বদাই যোগদান করিতেন। দরিদ্রনারায়ণের সেবায় তিনি প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা ও কৃষির উন্নতির জন্য তিনি পরিশ্রম করিয়াছেন—বৈদ্যনাথের নিকটবর্ত্তী রিখিয়া গ্রামে ও কুসম নামক স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া দেশবাসীকে পাশ্চাত্য-দেশের বিজ্ঞানসম্মত উন্নত প্রণালীতে শিক্ষিত হইবার সুযোগ ও সুবিধা দিয়াছিলেন।

কুমারকৃষ্ণবাবু ছিলেন একজন প্রকৃত সাহিত্যিক। তাঁহার মত অধ্যয়ন-পরায়ণ ও চিন্তাশীল লেখক বড় কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় তাঁহার দখল ছিল অসাধারণ। ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ পত্রিকায় ও অন্যান্য ইংরেজী পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে চিন্তাশীল প্রবন্ধাদি লিখিতেন। অনেক সময় আমরা বসিয়া থাকিতে থাকিতেই তিনি মস্ত বড় একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করিয়া ফেলিলেন দেখিয়াছি। তাঁহার উভয় ভাষায় লিখিত প্রবন্ধই চিন্তার খোরাক জোগাইত। কয়েক বৎসর ধরিয়া দর্শন ও ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া-ছিলেন যে, এদেশের শিক্ষা-প্রণালীতে দেশের বালক-বালিকারা প্রকৃত মানুষ হইতেছে না। ধর্ম্মহীন শিক্ষাকে বিষবৎ ত্যাগ করা উচিত। দেশের সর্ব্বনাশের মূল হইতেছে কর্ম্মহীন শিক্ষাই। কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি একখানি পত্রিকা সুন্দরভাবে চালাইয়া আসিতেছিলেন। ইহাতে তাহার লোকসান হইত সত্য, তত্রাচ তিনি কোন দিন সুচিন্তিত রচনা ছাড়া লঘু রচনা পত্রস্থ করেন নাই।

৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

গত ৯ই অগ্রহায়ণ আমরা রায় বাহাদুর প্রিয়নাথ মুখো-পাধ্যায় মহাশয়কে হারাইয়াছি। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। জনহিতকর নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অন্যত্র আমারা জীবন-কাহিনী পত্রান্তর হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। গীতা-সোসাইটীর তিনি একজন কর্ণধার ছিলেন। বাঙ্গালা-সাহিত্যেও তাঁহার অনেক সুচিন্তিত দার্শনিক ও জনহিতকর প্রবন্ধ 'পন্থা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পরলোকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রামাণিক

বিগত ২রা অগ্রহায়ণ, বুধবার আমরা আমাদের আর একজন বন্ধু জ্ঞানেন্দ্রনাথকে হারাইয়াছি। জ্ঞানেন্দ্রনাথের ন্যায় ছাত্রবৎসল, দানশীল মনীষী বাংলায় খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইনি ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী কার্য্য গ্রহণ করেন। কালে এই কার্য্য হইতে ইনি বহু অর্থ, যশ, মান অর্জ্জন করিতে সক্ষম হ'ন। নিজের প্রতিভা ও কর্ম্মদক্ষতায় বহুকাল সরকারের কার্য্য

করিয়া ঐ কার্য্য ছাড়িয়া ইনি ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ আজীবন বহু সদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন। দান, দুঃস্থ ছাত্রগণকে সাহায্য, বিধবাদের সাহায্য প্রভৃতি তাঁহার নিত্য-কর্ম্ম ছিল। তিনি কলিকাতার ধর্ম্মসমবায়-

পরলোকগত জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রামানিক

সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন ও বহুকাল স্বর্গীয় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী প্রমুখ মনীষীগণের সহিত ঐ সমিতির উন্নতিকল্পে কার্য্য করিয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের নিবাস বরাহনগরে। স্থানীয় বিদ্যালয়ের তিনি একজন কর্ণধার ছিলেন। আমরা এই সজ্জনের মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত।

নোবেল পুরস্কার

এবৎসরে সাহিত্য বিভাগে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন সুইডেনের মৃত কবি ডাঃ ইরিক এক্সেল কার্লফেল্ড। বিগত ৪ঠা এপ্রেল তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বেই পুরস্কার যে তাঁহাকে প্রদান করা হইবে তাহা স্থির হইয়া গিয়াছিল। ইনি ছিলেন সুইডিন একাডেমির স্থায়ী সম্পাদক। ইতিপূর্ব্বে একবার যখন তাঁহাকে এই সম্মানই পুরস্কার দিবার কথা হইয়াছিল তখন তিনি এই সম্মান গ্রহণে সম্মত হন নাই।

শ্রীগৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক বিশ্বভাণ্ডার প্রেস, ২১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত
এবং পঞ্চপুষ্প-কার্য্যালয়, ৩১ ভেলিপাড়া লেন হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

করিয়া ঐ কার্য্য ছাড়িয়া ইনি ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ আজীবন বহু সদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন। দান, দুঃস্থ ছাত্রগণকে সাহায্য, বিধবাদের সাহায্য প্রভৃতি তাঁহার নিত্য-কর্ম্ম ছিল। তিনি কলিকাতার ধর্ম্মসমবায়-

পরলোকগত জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রামানিক

সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন ও বহুকাল স্বর্গীয় মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী প্রমুখ মনীষীগণের সহিত ঐ সমিতির উন্নতিকল্পে কার্য্য করিয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের নিবাস বরাহনগরে। স্থানীয় বিদ্যালয়ের তিনি একজন কর্ণধার ছিলেন। আমরা এই সজ্জনের মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত।

নোবেল পুরস্কার

এবৎসরে সাহিত্য বিভাগে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন সুইডেনের মৃত কবি ডাঃ ইরিক এক্সেল কার্লফেল্ড। বিগত ৪ঠা এপ্রেল তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বেই পুরস্কার যে তাঁহাকে প্রদান করা হইবে তাহা স্থির হইয়া গিয়াছিল। ইনি ছিলেন সুইডিন একাডেমির স্থায়ী সম্পাদক। ইতিপূর্ব্বে একবার যখন তাঁহাকে এই সম্মানই পুরস্কার দিবার কথা হইয়াছিল তখন তিনি এই সম্মান গ্রহণে সম্মত হন নাই।

শ্রীগৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক বিশ্বভাণ্ডার প্রেস, ২১৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত
এবং পঞ্চপুষ্প-কার্য্যালয়, ৩১ তেলিপাড়া লেন হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয়ার্দ্ধ | পৌষ, ১৩৩৮ | তৃতীয় সংখ্যা

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

এবারের বড়দিনের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষ পরিসমাপ্তি উপলক্ষে কলিকাতা টাউন-হলে গত ৯ই পৌষ (২৫শে ডিসেম্বর) শুক্রবার হইতে এক বিরাট্ উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। রবীন্দ্র-জয়ন্তী-শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন ত্রিপুরাধিপতি বীর বিক্রম কেশর মাণিক্য বাহাদুর। উদ্বোধনের সময় তিনি বঙ্গ-ভাষায় লিখিত অভিভাষণে বলেন—

"আপনারা আমাকে এই মহাযজ্ঞের হোতৃপদে বরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। জগৎপূজ্য বিশ্বকবির সংবর্দ্ধনায় কোনো অংশের নেতৃত্ব করিতে আমার ন্যায় ব্যক্তির সঙ্কোচ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তথাপি কবির সহিত ত্রিপুরারাজ-পরিবারের যে চির-প্রীতির সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তাহাই আজ আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে। পূর্ণ গৌরব-মণ্ডিত রবির ভাস্বর দীপ্তির ঐশ্বর্য্যে জগতের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের প্রতি আজ আমার লক্ষ্য নাই। আমি আপনাদিগের আহ্বানে আমার পিতামহ প্রপিতামহের স্নেহপরায়ণ বন্ধু—আমাদিগের বিশ্বজয়ী অন্তরঙ্গের জয়ন্তী-উৎসবে যোগদান

প্রৌঢ়ে রবীন্দ্রনাথ

করিতে পারিয়া আপনাকে সৌভাগ্যান্বিত মনে করিতেছি। দরিদ্র সুদামা ব্রাহ্মণের সাহসে আজ আমি বলীয়ান্।

বিধাতার বিধানে ত্রিপুরা-রাজপরিবার চিরকালই কলা-সৌন্দর্য্য সেবী। তাই শুভক্ষণে উদীয়মান রবির তরুণ সৌন্দর্য্যের ছটায় আমার প্রপিতামহ পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্য আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তদবধি কবিবরের সহিত আমাদিগের বিশেষ সম্বন্ধ। পিতামহ রাধাকিশোর মাণিক্য তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন এবং পিতৃদেব বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যও সে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

উত্তরায়ণে'—২৫শে বৈশাখ,—৩৮ গৃহীত

শিল্পপ্রিয় ত্রিপুরা রাজবংশের উপর কবির প্রভাব সামান্য নহে। পক্ষান্তরে গিরিনির্ঝরিণী-শোভিতা বনপুষ্পভূষিতা, শ্যামলা পার্ব্বত্য ত্রিপুরার স্বভাবসৌন্দর্য্য, গোবিন্দমাণিক্য-প্রমুখ আমার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ, ত্রিপুরার সাহিত্য-চর্চ্চা, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্র ও বয়ন-শিল্প মহাকবিকেও আকৃষ্ট করিয়াছে, ইহাতে ত্রিপুরাবাসী মাত্রেই গৌরবান্বিত।

আপনারা ক্ষমা করিবেন আমি স্বার্থপরের ন্যায় মহাকবির সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধের উল্লেখ করিলাম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'বাঙ্গলার কবি—ভারতের কবি—বিশ্বকবি'—আমি তাঁহাকে ত্রিপুরার কবি বলিয়া অর্ঘ্য-প্রদান করিতেছি।

তথাপি একথা কোনমতেই ভুলিলে চলিবে না যে, মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মক্ষেত্র কেবলমাত্র সাহিত্য-জগতেই
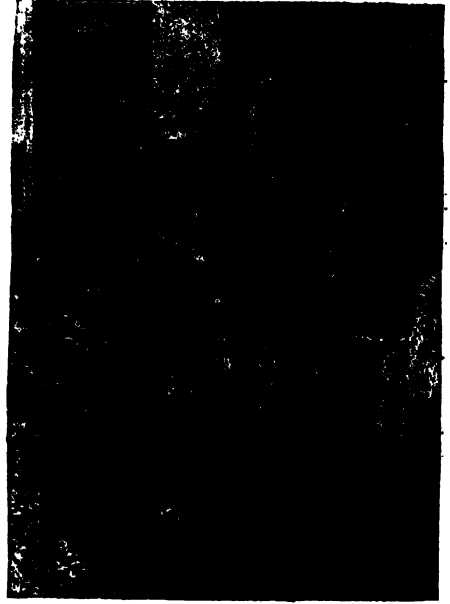
'উত্তরায়ণে' শয়ন-গৃহে রবীন্দ্রনাথ

আবদ্ধ নহে। বিশ্বমানবের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উদাত্তস্বরে বাজিয়া উঠিতেছে; কিন্তু সেখানে তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তাহাদের চরিতার্থতার জন্য

'উত্তরায়ণে'র তোরণদ্বারে কয়েকজন ভক্ত

তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, সামান্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনও তাঁহার নিকট উপেক্ষার বস্তু নহে; কারিতে শ্রীতে মণ্ডিত

হইয়া যাহাতে উহা অখণ্ড বিশ্ব-জীবনের মধ্যে আপন প্রতিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট না হয়,—উপদেশের দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা নিজের জীবনব্যাপী কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সর্ব্বদাই তিনি এই আদর্শকে অপামরসাধারণ সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেই জন্যই শিল্পকলাকে কোনদিনই তিনি কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞের উপদেশবাণী রাজ্যপরিচালনকে—সৌন্দর্য্য এবং কল্যাণের কান্তিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার বিষয়ে দিব্য ইঙ্গিতের নির্দ্দেশ আমাদিগকে ধন্য করিতেছে।

আমি আর অধিকক্ষণ আপনাদের সময় লইতে চাহি না। আসুন, আজ মহাকবির সপ্ততিতম জন্মোৎসবে

স্বীয় পাঠাগারে রবীন্দ্রনাথ—স্যর রমণ-কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে

উপভোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই; নিজের দেশের শিল্প-কলাকে সমগ্রভাবে, যথার্থভাবে দেখিবার শিক্ষা আমরা তাঁহারই নিকট পাইয়াছি; তাঁহারই নিকট দীক্ষা পাইয়া শিল্পসৌন্দর্য্যের দিব্য-নিকেতনের সমস্ত দ্বার আমাদিগের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। এবিষয়েও ত্রিপুরাবাসীর সৌভাগ্যের সীমা নাই। কেননা দেশীয় শিল্পকলাসম্বন্ধীয় তাঁহার সর্ব্বপ্রধান প্রবন্ধ 'দেশীয় রাজ্য' প্রায় ২৬ বৎসর পূর্ব্বে আগরতলায় ত্রিপুরা সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত হয়। আজ একদিকে যেমন গীতাঞ্জলির করুণ সুরের ঝঙ্কার আমাদিগের বৈষ্ণব পরিবারের প্রাণে অহরহ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধের মহতী আমরা সমবেতভাবে শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করিব যে, তিনি তাঁহার বরপুত্রকে সুদীর্ঘ জীবন প্রদান করিয়া তাঁহার মুখে স্বীয় অভয়বাণী বিশ্বময় প্রচার করিতে থাকুন।

কবিবরের আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমি এক্ষণে এই শিল্পপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইতি ৯ই পৌষ, ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ।"

কবি তাঁহার উত্তরে বলেন—

"ত্রিপুরার মহারাজকে এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে এবং তিনি এই কলা-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে রাজী হইয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমি বিশেষ আনন্দের সহিত এখানে আসিয়াছি। এই রাজপরিবার সম্পর্কে আমার

দুইটী বাল্যস্মৃতির উল্লেখ করিতেছি। অল্প বয়সে যখন আমি মাসিক কাগজে লিখিতাম, তখন একদা বর্ত্তমান মহারাজার প্রপিতামহের নিকট হইতে দূত আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, আমার লেখা পড়িয়া মহারাজা সুখী হইয়াছেন। তাঁহার

রবীন্দ্রনাথ—স্যর রমণ-কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে

সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাকে তখন কার্শিয়াংএ নিমন্ত্রণ করা হয়। তথায় গেলে মহারাজা আমার পরম আগ্রহে অভ্যর্থনা করেন। তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং আমার রসসৃষ্টির প্রশংসা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মহারাজার পিতামহের সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত বিষয়েও আমার পরামর্শ চাহিতেন। আমি তাঁহাকে যথাশক্তি পরামর্শ দিতাম।

প্রাচীন-ভারতে রাজন্যবর্গই চিত্র, কলা, সঙ্গীত, কাব্য ইত্যাদির পোষক ছিলেন। বর্ত্তমানে এ বিষয়ে দেশীয় নৃপতিগণের তাদৃশ অনুরাগ দেখা যায় না। তথাপি ত্রিপুরা-রাজপরিবারে কলাবিদ্যার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়, ইহা বড়ই আনন্দের কথা।”

ঐদিন অপরাহ্নে বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে টাউনহলের দ্বিতলে এক সাহিত্য-সম্মেলন হইয়াছিল। ঐ সভায় শ্রীযুক্তা মান-কুমারী বসু, প্রিয়ম্বদা দেবী, কামিনী রায়, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, রাধারাণী দেবী, জলধর সেন, প্রমথ চৌধুরী, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিকগণ প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় তাহার অভিভাষণে বলেন—

"কবির জীবনের সপ্ততি বৎসর বয়স পূর্ণ হোলো; বিধাতার এই আশীর্ব্বাদ কেবল আমাদিগকে নয় সমস্ত মানবজাতিকে ধন্য ক'রেচে। সৌভাগ্যের এই স্মৃতিকে আনন্দ-উৎসবে মধুর ও উজ্জ্বল কোরে আমরা উত্তরকালের জন্য রেখে যেতে চাই, এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও এই পরিচয়টুকু তাদের দিয়ে যাব যে, কবির শুধু কাব্যই নয়, তাঁকে আমরা চোখে দেখেচি, তাঁর কথা কানে শুনেচি, তাঁর আসনের চারিধারে ঘিরে বসবার ভাগ্য আমাদের ঘটেচে। মনে হয়, সেদিন আমাদের উদ্দেশেও তারা নমস্কার জানাবে।

সেই অনুষ্ঠানের একটী অঙ্গ আজকের এই সাহিত্য সভা। সাহিত্যের সম্মিলন আরও অনেক বসবে, আয়োজনে-প্রয়োজনে তাদের গৌরবও কম হবে না; কিন্তু আজকের দিনের অসামান্যতা তা'রা পাবে না। এ'তো সচরাচরের নয়, এ বিশেষ এক দিনের, তাই এর শ্রেণী স্বতন্ত্র।

সাহিত্যের আসরে সভানায়কের কাজ করিবার ডাক ইতোপূর্ব্বে আমার আরও এসেচে, আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিনি। নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করেও সসঙ্কোচে কর্ত্তব্য সমাপন করে এসেচি; কিন্তু এই সভায় শুধু সঙ্কোচ নয়, আজ লজ্জা বোধ করচি। আমি নিঃসংশয় যে, এ গৌরব আমার নয়, এ ভারবহনে আমি অক্ষম। এ আমার প্রচলিত বিনয় বাক্য নয়, এ আমার অকপট সত্য কথা। তথাপি আমন্ত্রণ অস্বীকার করিনি—কেন যে করিনি আমি সেইটুকু শুধু ব্যক্ত কোরব।

আমি জানি বিতর্কের স্থান এ নয়, সাহিত্যের ভালোমন্দ বিচার, এর জাতিকুল-নির্ণয়ের সমস্যা নিয়ে এ পরিষদ আহূত হয়নি—তার প্রয়োজন যথাস্থানে—আমরা সমবেত হয়েচি বৃদ্ধ কবিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিতে। তাঁকে সহজভাবে বল্‌তে—কবি তুমি অনেক দিয়েচো, এই দীর্ঘকালে তোমার কাছে অনেক পেয়েচি। সুন্দর, সবল, সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী ভাষা দিয়েচো তুমি, দিয়েচো বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েচো অপরূপ সাহিত্য, দিয়েচো জগতের কাছে বাংলার ভাষা ও ভাব-সম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েচো যা সকলের বড়—আমাদের মনকে দিয়েচো তুমি বড় করে। তোমার সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আমার সাধ্যাতীত—এ আমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ; প্রাজ্ঞমান যারা, যথাকালে তাঁরা এর আলোচনা করবেন; কিন্তু তোমার কাছে আমি নিজে কি পেয়েছি, সেই কথাটাই ছোট করে জানাবো বলেই এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

ভাষার কারুকার্য্য আমার নেই, ওতে যে পরিমাণ বিদ্যা এবং শিক্ষার প্রয়োজন, সে আমি পাইনি, তাই মনের ভাব প্রচলিত সহজ কথায় বলাই আমার অভ্যাস,—এবং এমনি কোরেই বল্‌তে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্গ্রহ এসে বিঘ্ন ঘটালে। একে আমি বিখ্যাত কুঁড়ে, তাতে বায়ু-পিত্ত-কফ আদি আয়ুর্ব্বেদোক্ত চরের দল একযোগে কুপিত হয়ে আমাকে শয্যাশায়ী করে দিলে। এমন ভরসা ছিল না যে, নড়তে পারবো। কিন্তু একটা বিপদ এই যে, চিরকাল দেখে আসচি, আমার অসুখের কথা কেউ বিশ্বাস করে না; কেন ও আমার হ'তে নেই। কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম সবাই ঘাড় নেড়ে স্মিতহাস্যে বলচেন, উনি আসেন নি ত? এ আমরা জানতাম! সেই বাক্যবাণের ভয়েই আমি কোনমতে এসে উপস্থিত হয়েচি। এখন দেখচি ভালই করেচি। এই না আসতে পারার দুঃখ আমার আমরণ ঘুচতো না, কিন্তু যা লিখে আনবার ইচ্ছে ছিল সে হয়ে উঠেনি। একটা কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করেচি, তার চেয়েও বড় কৈফিয়ৎ আছে। মানুষের অল্পসল্প পাওয়ার কথাই মনে থাকে, তাই লিখতে গিয়ে দেখলাম কবির কাছ থেকে পাওয়ার হিসাব দিতে যাওয়া বৃথা—দফাওয়ারি ফর্দ্দ মেলে না।

ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধ'রে ডোঙ্গা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাকরেদি করি, তার আনন্দ ও

আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বার হই। ঠিক বিশ্ব-কবির কাব্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হলে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জ্জীব-দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর-অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান করে দেন। সেখানে আর এক দফা সম্বর্দ্ধনা-লাভের পর আবার বোধোদয়, পদ্যপাঠে মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার সাগরেদি সুরু করি আবার নিরুদ্দেশ-যাত্রা, আবার ফিরে আসা, আবার তেমনি তাদের আপ্যায়ন-সম্বর্দ্ধনার ঘটা—এমনি করে বোধোদয় পদ্যপাঠ ও বাল্যজীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হ'ল।

এখন শহরে, একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্ত্তি ক'রে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাশে; তথায় পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাব-শতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে যাওয়া নয়, মাসিকে সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘট্‌লো চোখের জলে। তারপর বহুদুঃখে আর একদিন সে মিয়াদ্‌ও কাটলো, তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য আছে!

যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্যউপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য; সেখানে সবাই চায় পাশ করতে এবং উকীল হ'তে; এরি মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্য্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ, কাব্যে আসক্তি; বাড়ীর মেয়েদের জড় করে তিনি একদিন প'ড়ে শোনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চ'লে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘটলো, এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়। এরপরে এবাড়ীর উকীল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে সইল না, আবার ফিরতে হলো আমাদের সেই পল্লী-ভবনে। কিন্তু এবার আর বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙ্গা দেরাজ থেকে খুঁজে বের কোরলাম "হরিদাসের গুপ্তকথা" আর বেরোলো "ভবাণী-পাঠক"। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ্‌ছেলেদের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই করে নিতে হোলো আমাকে বাড়ীর গোয়াল-ঘরে, সেখানে আমি পড়ি তারা শোনে। এখন আমি পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে জানিনে।

একই স্কুলে বেশী দিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাষ্টার মশাই স্নেহবশে একদিন এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন, অতএব আবার ফিরতে হোলো শহরে। বলা ভাল, এর পরে আর স্কুলে বদ্‌লাবার প্রয়োজন হয়নি। এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস-সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না। প'ড়ে প'ড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধ হয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়, লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হ'য়েছে; কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তারপর এলো বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে প'ড়লো, সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলবো না। কোন কিছু যে এমন ক'রে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক প'ড়লেই যে অনেক পাওয়া যায়, একথা সত্য নয়। ঐতো খানকয়েক পাতা, তার মধ্যে দিয়ে যিনি এতবড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?

এর পরেই সাহিত্যেরসঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনদিন লিখেচি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র ক'রে কি ক'রে যে নবীন বাঙলা-সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভ'রে উঠলো, আমি তার কোন খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোনোদিন দৃষ্ট হবারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর কাছে ব'সে সাহিত্যের শিক্ষা-গ্রহণেরও সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন; এইটা হলো বাইরের সত্য কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও সাহিত্যে এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বারবার ক'রে পড়েছি, কি তার ছন্দ, ক'টা তার অক্ষর, কা'কে বলে আর্ট কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনো ত্রুটী ঘটেছে কি না, এসব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হ'তেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে আমার ছিল এই পুঁজি।
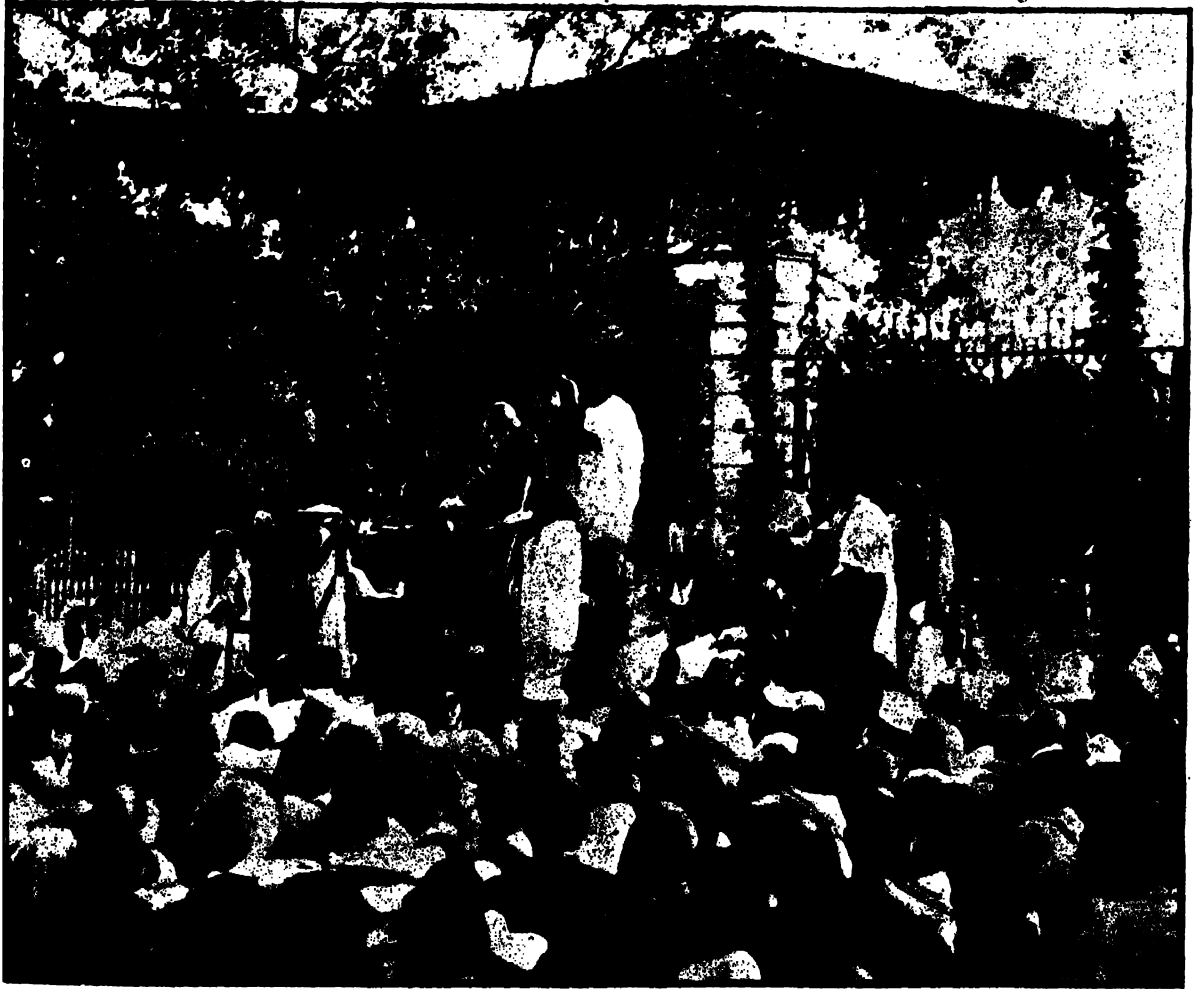
জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদ-প্রদত্ত অর্ঘ্যদান

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ ক'রে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—

শেখবার বয়স পার হ'য়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু অকালে সাড়া দিলাম—ভয়ের কথা মনেই না। আর কোথাও না হোক্, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যা ক'রতে আমি পারিনে, কিন্তু ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ওঁর অন্তরের সন্ধান আমাকে দিয়েছে। পণ্ডিতের তত্ত্ববিচারে তা'তে ভুল যদি থাকে তো থাক্, কিন্তু আমার কাছে সেই সত্য হ'য়ে আছে।

গিয়েছিলাম বাঙ্গালা-সাহিত্যে সমালোচনার ধারা প্রবর্ত্তিত করার প্রাস্তব নিয়ে; নানা কারণে কবি স্বীকার করতে পারেননি, তার একটা হেতু এই দিয়েছিলেন যে, যার প্রশংসা করতে তিনি অপারগ, তার নিন্দে করতেও তিনি তেমনি অক্ষম। আরো বলে দিলেন যে তোমরা যদি একাজ কর, কখনো ভুলোনা যে অক্ষমতা ও অপরাধ এক বস্তু নয়। ভাবি, সাহিত্য-বিচারে এই সত্যটা যদি সবাই মনে রাখত।

শ্রীমতী কামিনী রায় রবীন্দ্রনাথ উৎসবান্তে আচার্য্য রায়, মেয়র

জানি রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় এ সকল অবান্তর, হয় তো বা অর্থহীন; কিন্তু গোড়াতেই আমি বলেচি যে আলোচনার জন্য আমি আসিনি, এর সহস্র ধারায় প্রবাহিত মাধুর্য্যের বিবরণ দেওয়াও আমার সাধ্যাতীত, আমি এসেছিলাম শুধু আমার ব্যক্তিগত গোটা কয়েক কথা এই জয়ন্তী-উৎসব সভায় নিবেদন ক'রে যেতে।

কাব্য, সাহিত্য ও কবি রবীন্দ্রনাথকে আমি যেভাবে লাভ ক'রেচি, তা জানালাম। মানুষ রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আমি সামান্যই এসেচি। কবির কাছে একদিন

কিন্তু এই সভার অনেকখানি সময় নষ্ট করেচি, আর না, অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্ব্বাচন করারই এটা দণ্ড, এ আপনাদের সইতেই হইবে। সে যাই হোক রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এ সমাদর ও সম্মান আমার আশার অতীত। তাই সকৃতজ্ঞচিত্তে আপনাদিগকে নমস্কার জানাই।

দ্বিতীয় দিন

১০ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর) স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভানেতৃত্বে ইংরাজী ভাষায় সভা হইয়াছিল। এই সভার

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ রবীন্দ্রনাথের রচনা-সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন ও বক্তৃতা দেন। এই সভায় সমাগত ডাঃ আর্কুহার্ট, স্যর সি, ভি, রমণ, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হাসান সুরওয়ার্দ্দি ও প্রোঃ এইচ, কে, ভট্টাচার্য্যের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সভাপতির অভিভাষণ—

"কবির মহৎ কার্য্য ও অসীম প্রভাবের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতে পারিয়া আমি অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। জীবনের মাধুর্য্য ও মানব-সভ্যতায় তাঁহার প্রচুর দান। আমাদের অনেকের জীবন যখন সংশয় ও সন্দেহে দুর্ব্বহ, যখন বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে এবং যখন রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আমাদের গতি প্রতিহত হইতেছে, সেই সময় তিনি উদ্দীপনাময়ী বাণী দিয়া আমাদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন যে, অর্থ, সম্পদ বা জড় জগতের উপর কর্ত্তৃত্ব করাই সভ্যতার মাপকাঠি নয়, পরন্তু সত্য ও প্রেম বিতরণ দ্বারা সভ্যতার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

শরীর বা মনকে মানুষ ধরিয়া লইলে চলিবে না। আরও এমন কিছু আছে যাহা বুদ্ধির অতীত—সেটা হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মা—যাহা সর্ব্বভূতের সহিত এক বা যাহা নিজেই সত্যং শিবং সুন্দরম্।

যদি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মধ্যে তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে, প্রতীচ্য সভ্যতার ভিত্তি হইতেছে, যুক্তিতর্ক ও বস্তুতন্ত্রের উপর; আর প্রাচ্য সভ্যতার ভিত্তি হইতেছে অধ্যাত্মবাদের উপর। সক্রেটিস হইতে রাসেল পর্য্যন্ত সকলেই তর্কশাস্ত্রের উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন।

ধরিয়া লওয়া যাউক যে, আমরা ইউটোপিয়ার অধিবাসী, সেখানে রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি নাই—সকলেই উত্তম বাড়ীতে বাস করে, খাওয়া পরার কোন কষ্ট নাই। ইহাই কি আমাদিগকে সুখ দিতে পারে? না। আমাদের ভিতর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, অপূরণীয় কামনা সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়াছে। মানবাত্মা সর্ব্বদা এমন একটা কিছু চায়, যাহা এই বাহ্য-জগৎ দিতে পারে না—যখনই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মানুষ প্রতিদিন মরিতেছে, মানুষ নিরাশায় জ্বলিয়া যাইতেছে, ভালবাসা পদদলিত হইতেছে, সরলতা প্রতারিত হইতেছে—তখনই মনে এ সমস্ত বিষয়ের সমাধানের জন্য শত সহস্র প্রশ্ন জাগিয়া উঠে; তখন বিজ্ঞান, যুক্তিতর্ক বা বস্তুতান্ত্রিকতা ইহার উত্তর দিতে পারে না। আমরা আরও কিছু ভিতরের জিনিস চাই—আমরা চাই এমন কিছু যাহা অন্তরাত্মাকে সুখী করিতে পারে। আজ হয় তো অনেকেই সুখস্বচ্ছন্দে আছেন কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা অন্তরে বিরাট্ শূন্যতাই অনুভব করিতেছেন।
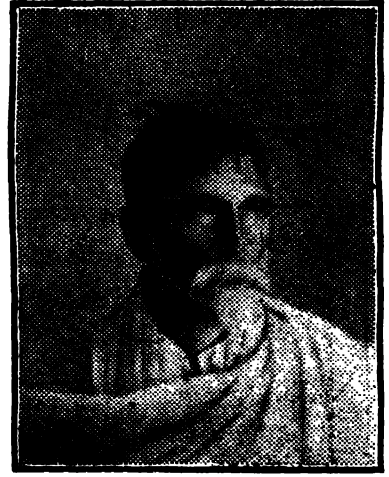
আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার লেখার ভিতর দিয়া এই অন্তর্দৃষ্টিই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক অধিকাংশ সাহিত্যেই ভাব ও প্রেরণায় অভাবই দৃষ্ট হইতেছে। বার্ণার্ড শ' এবং এইচ্ জি, ওয়েলসের লেখা বেশ উপদেশপ্রদ, মনোজ্ঞ, চিত্তাকর্ষক ও প্রতিভার পরিচায়ক কিন্তু ঐ সমস্ত লেখা আমাদের মনের অন্তস্থলে মোটেই ঘা দেয় না। রবার্ট ব্রীজের "টেষ্টামেণ্ট অব বিউটী" দার্শনিকতত্ত্বের উচ্চাঙ্গের বিশদব্যাখ্যা কিন্তু উহাও মরমের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। ভাবের ঘরে লুকোচুরি করিলে চলে না। নিজের অন্তর্দৃষ্টি না হইলে অন্যকে অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ এমন দেশের লোক, যে দেশের লোকেরা বংশ-পরম্পরায় এমন একটা অধ্যাত্ম-প্রেরণার ধারা রাখিয়া গিয়াছেন যাহার ফলে আজ আমরা কবি রবীন্দ্রনাথকে পাইয়াছি। তাঁহার লেখার ভিতর এমন একটা শাশ্বতের প্রেরণা রহি-

আছে, এমন একটী অন্তদৃ'ষ্টি রহিয়াছে যাহারা ফলে আমাদিগকে বাস্তবজগৎ হইতে গভীর সত্যের সন্ধানে লইয়া যায়। তাঁহার লেখা যে কেবল আমাদের অন্তদৃ'ষ্টি ফুটাইয়া দেয় এমন নহে, পরন্তু ইহলোকেই পরলোকের একটা সন্ধান দেয়। জগৎটা মায়াময় বলিলে চলিবে না—এই জগতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাটকে একটী বালিকার চরিত্র অঙ্কন করিয়া একটী সন্ন্যাসীকে ইহাই উপলব্ধি করাইয়াছেন যে, স্নেহ ও ভালবাসার বন্ধন পাশ ছিন্ন করিলেই যে মুক্তির পথ প্রশস্ত হয় তাহা নহে, কিন্তু পার্থিব অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেই উহা পাওয়া যায়—সসীমের ভিতরেই অসীমকে লাভ করা যায়।
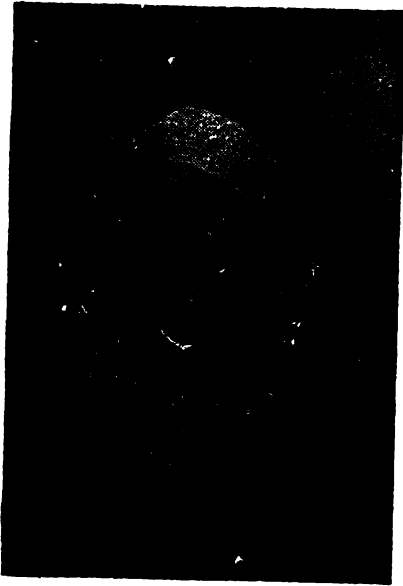
আচার্য্য সি, ভি, রমণ

তিনি নিজে অনুভূতির উচ্চস্তরে উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়াই সামাজিক বিধানের নামে যে সমস্ত ভণ্ডামি ও দুর্নীতি চলিয়াছে, তিনি তাহার বিরোধী। মানবজীবন আইনের গণ্ডীর বহু উপরে—সেইরূপ সৌন্দর্য্য শৃঙ্খলার উপরে এবং সত্য সামঞ্জস্যের উপরে। যে আত্মার অন্তদৃ'ষ্টি ঘটিয়াছে, সেই আত্মা বিশ্বমানবকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে না। ইহা প্রেম দ্বারা সকলকে জয় করে,—শত্রুকে বশীভূত করে, দুষ্টকে দমন করে এবং পাপীকে উদ্ধার করে—কবির সমস্ত লেখার ভিতর দিয়া এই তিনটী সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে :—আত্মার অন্তদৃ'ষ্টি, ব্যর্থ বৈরাগ্য এবং প্রেম ও দয়ার পরিপূর্ণতা। তাঁহার আদর্শ হইতেছে—বহুর ভিতর একের দর্শন। এই আদর্শ লাভ করিতে যাইয়া নিজেকে একেবারে বিসর্জ্জন দিলে চলিবে না, পরন্তু আত্মোন্নতি লাভ করিতে হইবে।

ডাঃ আরকোহার্ট

স্কটীশচার্চ্চ কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ আরকোহার্ট বক্তৃতাপ্রদানকালে বলেন যে, যদিও তাঁহার নাম কার্য্যতালিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তথাপি তাঁকে যে "রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় ধর্ম্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা"-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে হইবে, এই বিষয়ে, এমন কি একখানি পোষ্টকার্ড দ্বারাও তাঁহাকে জানান হয় নাই। শনিবার প্রাতঃকালে সংবাদপত্রে এই মহতী ও বিদ্বজ্জনপূর্ণ সভার অন্যতম বক্তারূপে তাঁহার নাম দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন। সুতরাং অতীব দুঃখের সহিত তাঁহাকে জানাইতে হইতেছে যে, তিনি যথোচিতভাবে তাঁহার কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হইবেন না। যাহা হউক, মহাকবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে সুযোগ পাইয়া তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। যদিও তিনি ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ভারতেই অতিবাহিত করিয়াছেন। কবির অতুলনীয় কাব্য ও সাহিত্য সমগ্র জগতকে মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার পথে কতখানি সাহায্য করিয়াছে বক্তা তাহা বিবৃত করিতে ইচ্ছা করেন। রবীন্দ্রনাথ কোন স্থানবিশেষের কবি নহেন, পরন্তু তিনি সমগ্র জগতের কবি। সমগ্র জগত তাঁহাকে অনুপ্রেরণা দিয়াছে। অতঃপর বক্তা বলেন যে, পার্থিব দুঃখকষ্ট ভোগের পর মানুষ কি করিয়া ভাগবত আনন্দলাভ করিতে পারে রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রত্যেকটী ছত্র হইতে তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া যায় এবং এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মানব জাতির হৃদয় অধিকার করিয়াছেন।

আচার্য্য সি, ভি, রমণ

স্যর সি, ভি, রমণ বক্তৃতাপ্রদান কালে বলেন যে, যদিও তিনি গত ২৫ বৎসরকাল যাবৎ কলিকাতা শিখ

বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন এবং মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ, ডিগ্রী লাভ করা সত্বেও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতার কথা তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে (হাস্য)। অতঃপর তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাজনীতির দিক দিয়া কবির কার্য্যকলাপের আলোচনা করেন। এতৎসম্পর্কে তিনি গত ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সেই সময় জাতীয় প্রেরণা দানে রবীন্দ্রনাথের দান বাঙ্গলা কিছুতেই ভুলিতে পারিবে না।

ডাঃ হাসাম সুরওয়ার্দ্দী

ভাইস চান্সেলার ডাঃ সুরওয়ার্দ্দী কবির বহুমুখী প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করিয়া বলেন যে, একমাত্র কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ দ্বারাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কৃষ্টির মিলন সম্ভব হইয়াছে।

অধ্যাপক এইচ কে ভট্টাচার্য্য

পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি অধ্যাপক এইচ, কে, ভট্টাচার্য্য কবির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়া কবির দীর্ঘ-জীবন কামনা করেন এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন বিশ্ব-মানবকে আরও জ্ঞানের আলোক দিতে পারেন। কবির সমস্ত লেখা যাহাতে সমগ্র ভারতে পঠিত হয়, তজ্জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে ঐ সমস্ত লেখা পড়ার বন্দোবস্ত করার জন্য প্রস্তাব করেন এবং কবির যে সমস্ত লেখা এখনও অন্য ভাষায় অনূদিত হয় নাই, সত্বর তাহার অনুবাদ করা উচিত।

তৃতীয় দিন

১১ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর) অপরাহ্ন ৪৷৹ ঘটিকার সময় টাউন হলের সম্মুখস্থ রাজ পথের উপর কবিগুরুকে অভিনন্দিত করা হয়। টাউন হলের সম্মুখস্থ সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র অতি অপূর্ব্বভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। রাজপথের দক্ষিণ দিকে বিচিত্র চন্দ্রাতপতলে পুষ্প ও পল্লবমালায় সুসজ্জিত বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। বেদীর উপর কবির আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মঞ্চোপরি রবীন্দ্রনাথকে আনিয়া বসান হইলে পাঁচটী বাঙ্গালী মহিলা সম্পূর্ণ হিন্দু-প্রথায় তাঁহাকে বরণ করেন।

প্রথমে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে মেয়র শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় কবিকে মাল্যে বিভূষিত করেন এবং নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কর-কমলে —

বিশ্ববরেণ্য মহাভাগ,

তোমার জীবনের সপ্ততিবর্ষ পরিসমাপ্তি উপলক্ষে কলিকাতা নগরীর পৌরবৃন্দের পক্ষ হইতে আমরা তোমাকে অভিবাদন করিতেছি।

এই মহানগরী তোমার জন্মস্থান এবং তোমার যে কবিপ্রতিভা সমগ্র সভ্যজগৎকে মুগ্ধ করিয়াছে এই স্থানেই তাহার প্রথম স্ফুরণ। এই মহানগরীই তোমার ঋষিতুল্য জনকের ধর্ম্মজীবনের সাধনক্ষেত্র, এই মহানগরীই তোমার নরেন্দ্রকল্প পিতামহের আজীবন কর্ম্মক্ষেত্র এবং এই মহানগরীর যে বংশ ভাবে, ভাষায়, শিল্পে, সাহিত্যে সঙ্গীতে, অভিনয়ে, শিষ্টাচার ও সদালাপে সমগ্র সজ্জনসমাজের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে, তুমি সেই বংশেরই অত্যুজ্জ্বল রত্ন—তাই তুমি সমগ্র বিশ্বের হইলেও আমাদের একান্ত আপনার জন। বিশ্বের বিদ্বজ্জনসমাজের সমাদর লাভ করিয়া তুমি কলিকাতাবাসীরই মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। তোমার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বঙ্গ-ভাষাকে অপূর্ব্ব বৈভবে মণ্ডিত করিয়া জগতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তোমার অভিনব কল্পনাপ্রসূত শিক্ষার আদর্শ বাঙ্গলার এক নিভৃত পল্লীকে বিশ্বমানবের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে, এবং তোমার লেখনীনিসৃত অমৃতধারা বাঙ্গালী জাতির প্রাণে লুপ্তপ্রায় দেশাত্মবোধ সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে মাতৃপূজার প্রধান পুরোহিত, হে বঙ্গভারতীর দিগ্বিজয়ী সন্তান, হে জাতীয় জীবনের জ্ঞানগুরু, আমরা তোমাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। বন্দেমাতরম্।

তোমার গুণগর্ব্বিত কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য-বৃন্দের পক্ষে শ্রীবিধানচন্দ্র রায়, মেয়র।

এই অভিনন্দনের উত্তরে কবি বলেন, একদা কবির অভিনন্দন রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা আপন রাজমহিমা উজ্জ্বল করিবার জন্যই কবিকে সমাদর করিতেন, জানিতেন সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী নয়, কবিকীর্ত্তি তাহাকে অতিক্রম করিয়া ভাবীকালে প্রসারিত।

আজ ভারতের রাজসভায় দেশের গুণিজন অখ্যাত—রাজার ভাষায় কবির ভাষায় গৌরবের মিল ঘটে নাই। আজ পুরসভা স্বদেশের নামে কবিসম্বর্দ্ধনার ভার লইয়াছেন। এই সম্মান কেবল বাহিরে আমাকে অলঙ্কৃত করিল না, অন্তরে আমার হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিল।

এই পুরসভা আমার জন্মনগরীকে আরামে আরোগ্যে আত্মসম্মানে চরিতার্থ করুন, ইহার প্রবর্ত্তনায় চিত্রে,
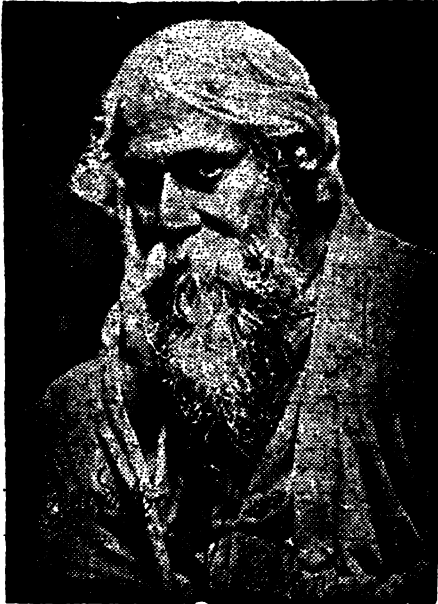
রবীন্দ্রনাথ

স্থাপত্যে, গীতকলায়, শিল্পে এখানকার লোকালয় নন্দিত হউক, সর্ব্বপ্রকার মলিনতার সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষার কলঙ্ক এই নগরী ক্ষালন করিয়া দিক,—পুরবাসীদের দেহে শক্তি আসুক, গৃহে অন্ন, মনে উদ্যম, পৌরকল্যাণসাধনে আনন্দিত উৎসাহ, ভ্রাতৃবিরোধের বিষাক্ত আত্ম-হিংসার পাপ ইহাকে কলুষিত না করুক—শুভ বুদ্ধি দ্বারা এখানকার সকল জাতি, সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া এই নগরীর চরিত্রকে অমলিন ও শান্তিকে অবিচলিত করিয়া রাখুক এই আমি কামনা করি।

উৎসব-সমিতির অর্ঘ্য

অতঃপর রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কবিকে অর্ঘ্যদান করেন। কবিকে ধূপ, দীপ, শঙ্খ, দূর্ব্বাদল, চন্দন এবং সচন্দন পুষ্পোপচারে অর্ঘ্যপ্রদান করা হয়। কয়েকটী বালিকা অর্ঘ্যসম্ভারপূর্ণ থালিগুলি কবির নিকট বহন করিয়া লইয়া যান এবং সেগুলি কবি স্মিতহাস্যসহকারে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করেন।

এতচ্চন্দনমত্র শীলমিব তে চন্দ্রোজ্জ্বলং শীতলং
দীপোহয়ং প্রতিভাপ্রভাব ইব তে কান্তঃ
স্থিরং দীপ্যতে।
ধূপোহয়ং তব কীর্ত্তিসঞ্চয় ইবামোদৈর্দিশো
ব্যশ্নুতে
মালং নির্ম্মলকোমলং তব মনস্তুল্যং সমুদ্ভাসতে॥
কম্বুস্থাপিতমেতদম্বু সরসং কাব্যং ত্বদীয়ং যথা
পুষ্পশ্রেণিরিয়ং গুণালিরিব তে পশ্যজ্জনাকর্ষিণী
অর্ঘ্যং ভাবাদদং কৃতং তব কৃতে
দূর্ব্বাঙ্কুরাগ্রন্বিতং
নন্বেতৎ প্রতিগৃহ্যতাং করুণয়া স্বস্ত্যস্তু তে
শাশ্বতম্॥

আপনার শীলের ন্যায় এই চন্দন চন্দ্রের মত উজ্জ্বল ও শীতল, আপনার রমণীয় প্রতিভাপ্রভাবের ন্যায় এই দীপ স্থিরভাবে দীপ্তি প্রাপ্ত হইতেছে। আপনার কীর্ত্তিরাশির ন্যায় এই ধূপ-সৌরভে সমস্ত দিক্‌কে ব্যাপ্ত করিতেছে। আপনার মনের ন্যায় নির্ম্মল ও কোমল এই মালা উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। আপনার কাব্যের ন্যায় সরস এই জল শঙ্খে স্থাপিত করা হইয়াছে এবং আপনার গুণসমূহের ন্যায় এই কুসুমগুলি দর্শকগণকে আকর্ষণ করিতেছে।

দুর্ব্বার অঙ্কুর প্রভৃতির দ্বারা আমরা আপনার জন্ম এই অর্ঘ্য রচনা করিয়াছি। আপনি করুণা করিয়া ইহা গ্রহণ করুন! আপনার শাশ্বত কুশল হউক।

প্রশস্তি পাঠ

ভেদো যস্য ন চ স্বতোঽস্তি ভুবনে প্রাচী-
প্রতীচীতি বা
মিত্রত্বং প্রকটীকৃতং চ সততং যেনাত্মনঃ কর্মণা।
বিশ্বং যস্য পদং প্রসিদ্ধমনিশং সত্যে চ যস্য
স্থিতির্ভূয়াৎ তস্য জয়ো রবেরবিরতং তেনাস্ত
তৃপ্তং জগৎ॥

যাঁহার প্রাচী ও প্রতীচী বলিয়া ভুবনে বস্তুতঃ কোনো ভেদ নাই, যিনি সতত নিজের কর্ম্মের দ্বারা প্রকটিত করিয়াছেন যে তিনি মিত্র, বিশ্বই যাঁহার প্রসিদ্ধ স্থান এবং সত্যেই যিনি নিয়ত অবস্থান করেন, সেই রবির অবিরামে জয় হউক ও তাহা দ্বারা জগৎ তৃপ্তি লাভ করুক।

শান্তিপাঠ

পৃথিবী শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তন্দ্যৌ শান্তিরাপঃ
শান্তি রোষধয়ঃ
শান্তির্বিশ্বে নো দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ
শান্তিভিঃ।
তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্ব্বশান্তিভিঃ শময়ামোবয়ং
যদিহ ঘোরং
যদিহ ক্রূরঃ যদিহ পাপং তচ্ছান্তং সর্বমেব
শমস্তুনঃ॥

পৃথিবী শান্তিময় হউক! অন্তরীক্ষ শান্তিময় হউক! দ্যুলোক শান্তিময় হউক! জল শান্তিময় হউক! ওষধি-সমূহ শান্তিময় হউক! বিশ্বদেবগণ আমাদের জন্য শান্তিময় হউন! এখানে যাহা কিছু ভয়ানক, যাহা কিছু ক্রূর, যাহা কিছু পাপ তাহা আমরা সেই সকল শান্তি দ্বারা, সমস্ত শান্তির দ্বারা উপশমিত করি! তাহা শান্ত হউক। তাহা শিব হউক, সমস্তই আমাদের কল্যাণকর হউক!

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ

অতঃপর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে কবিকে নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন :—

হে কবীন্দ্র, বঙ্গদেশের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ ভবদীয় সপ্ততিতম জন্মতিথি-উপলক্ষে সাদরে ও ও সগৌরবে আপনাকে বরণ করিতেছে।

কিশোর বয়সেই আপনি বঙ্গবাণীর অর্চ্চনায় আত্মনিয়োগ করেন। তদবধি ব্রতধারী তপস্বীর ন্যায়, সুচিরকাল নিয়ম ও নিষ্ঠার সহিত অক্লান্ত- অক্ষুণ্টভাবে তাঁহার আরাধনা করিয়াছেন। হে তাপস, আপনার সাধনার সিদ্ধি হইয়াছে—দেবী আপনার শিরে অমর-বর বর্ষণ করিয়াছেন—আপনার ত্রিতন্ত্রীতে তাঁহার অমৃত-বাণীর অভয় মূর্চ্ছনা সঞ্চারিত করিয়াছেন। হে বরাভয়মণ্ডিত মনীষী, আপনি শতায়ু হইয়া, এই মোহনিদ্রায় নিসুপ্ত জাতির প্রাণে বীর্য্য ও বলের প্রেরণা দ্বারা, তাহার সুপ্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করুন এবং প্রতিভার কল্পলোকে বিরাজ করিয়া, মুক্তহস্তে প্রাচ্যকে ও প্রতীচ্যকে নব নব সুষমা ও সৌন্দর্য্য, কল্যাণ ও আনন্দ বিতরণ করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ ঊনচত্বারিংশ বৎসর ব্যাপিয়া আপনার উপচীয়মান শুভ সাহিত্য-সম্পদে বিপুল গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। আপনার বক্তৃতার মন্ত্রে ইহার আদ্য বার্ষিক উৎসব মন্ত্রিত হইয়াছিল। আপনার পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ণ হইলে পরিষৎ আপনাকে অভিনন্দিত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। আবার আপনার স্মরণীয় ষষ্টিতম জন্মদিনে সম্বর্দ্ধনার সম্ভার সজ্জিত করিয়া পরিষৎ আপনাকে সম্ভ্রমের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিল। কবি-জীবনের সেই সেই সন্ধিক্ষণে উচ্চারিত পরিষদের উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা আপনার কীর্ত্তি-ভাতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া আজ সফলতার তুঙ্গ-ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে। সুধন্য আপনি বিনশ্বর দুঃখ-সুখের মধ্যে সত্যের শাশ্বত স্বরূপকে দর্শন এবং খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি, বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইয়া যুগযুগান্তলব্ধ ভারতের সনাতন আদর্শকে জাগ্রিয়া-

ধারার ন্যায় মর্ত্তে আবার অবতীর্ণ করায়াইছেন। হে সত্যদ্রষ্টা, আপনাকে শত শত নমস্কার।

হে বাণীর বরপুত্র, হে বিশ্ববরেণ্য কবি, 'বর্ণ-গন্ধ-গীতময়' এই বিচিত্র বিশ্ব যাহার সুরভিশ্বাস, কবি-কোবিদের 'ধী'র' অভ্যন্তরে মুখরিত প্রেম-প্রজ্ঞা-প্রতাপ যাঁহার সৎ-চিৎ-আনন্দের প্রচ্ছন্ন আভাস, সেই শঙ্কর বিশ্বম্ভর বিশ্বকবি আপনার চিরস্বস্তি ও শান্তি বিধান করুন; যদ্ ভদ্রং তদ্ বা আ সুবতু; আর, স বো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

॥ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ স্বস্তি॥"

কালকে উজ্জ্বল করিলেন, এই কথা বিনয়নম্র আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়া লইলাম।"

শাস্ত্রী বর্ত্তমান জয়ন্তী উৎসবের সূচনা সভায় সভানায়কের আসন হইতে প্রশংসাবাদের দ্বারা আমাকে তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদ দান করিয়া, গিয়াছেন। আমি অনুভব করিতেছি এই মানপত্রে আমার পরলোকগত সেই সহৃদয় সুহৃদের অলিখিত স্বাক্ষর রহিয়াছে, যাঁহাদের হস্ত অদ্য স্তব্ধ—যাহাদের বাণী নীরব।

অদ্য পরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি সর্ব্বজন-বরেণ্য জননায়ক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এই যে মানপত্র সমর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিলেন, এই পত্রে সাহিত্য-পরিষদ বঙ্গ-ভারতীর বরদান বহন করিয়া আমার জীবনের দিনান্ত-

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র
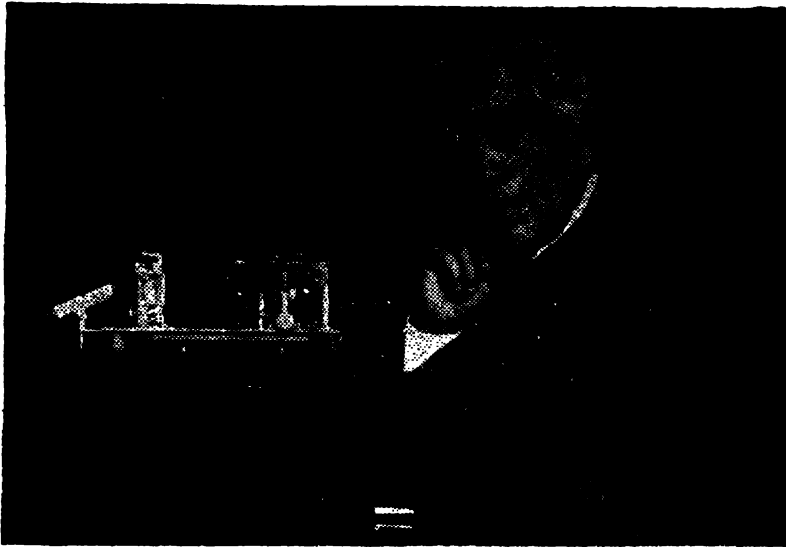
উত্তরে কবি বলেন, "সাহিত্য-পরিষদের প্রথম আরম্ভ-কালেই এই প্রতিষ্ঠান আমার অন্তরের অভিনন্দন লাভ করিয়াছিল—এ কথা তাঁহারা সকলেই জানেন, যাঁহারা ইহার প্রবর্ত্তক। আমার অকৃত্রিম প্রিয় সুহৃদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অক্লান্ত অধ্যবসায়ে এই পরিষদকে স্বভবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে বিচিত্র আকারে পরিণতি দান করিয়াছেন। একদা আমার পঞ্চাশৎবার্ষিকী জয়ন্তীসভার তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী এবং সেই সভায় তাঁহারই হস্ত হইতে আমার স্বদেশদত্ত দক্ষিণা আমি লাভ করিয়াছিলাম, পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ

হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন

তৎপরে পণ্ডিত অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষ হইতে কবিকে নিম্নলিখিত অভিনন্দনের দ্বারা সংবর্দ্ধিত করেন,—

"শ্রীকবীন্দ্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়!

মাননীয় মহোদয়,

হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষ হইতে আপনার সপ্ততিবর্ষ প্রাপ্তির অবসরে আমরা আপনাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি এবং আপনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছি।

শ্রীমান, ভারতবর্ষে অনেক প্রতিভাশালী এবং প্রভাবশালী কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা পর্য্যপ্ত ধন এবং সম্মানের দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছেন। রাজপুতনার চারণ-কবিগণ অনেক সাময়িক কবিত্বপূর্ণ উপদেশ দ্বারা ইতিহাসের স্বরূপ পর্য্যন্ত বদলাইয়া দিয়াছেন। সেইরূপ হিন্দী-কবিগণ মোগল-সম্রাটকে পর্য্যন্ত নিজেদের কবিতার চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাকবি ভূষণ তো আপনার কবিতার দ্বারা হিন্দুরাজ্য পুনঃ সংস্থাপনে প্রভূত সাহায্যই করিয়াছিলেন। আপনিও আপনার বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির প্রভাবে স্পৃহনীয় নোবেল-পুরস্কার লাভ করিয়া ভারতের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

কবীন্দ্র! আপনি বিশ্বভারতী স্থাপন করিয়া প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সম্মিলনের জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে আপনার কীর্ত্তি-কৌমুদী চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়াছে। আমাদের সভ্যতার প্রতিনিধি-স্বরূপে আপনি ইউরোপে ও এসিয়ার দেশসমূহে যে প্রকারে ভারতের মহিমা প্রচার করিয়াছেন, সেজন্য আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।

আমরা পুনরায় আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি এবং পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করুন।"

উত্তরে কবি বলেন—"আজ হিন্দী ভারতীর সহোদরগণ বঙ্গ-ভারতীকে সম্মানিত করিলেন। দৈব কৃপাতে আমি এই শুভ অনুষ্ঠানের উপলক্ষ যে হইতে পারিয়াছি, এজন্য আমি নিজকে ধন্য মনে করিতেছি। কবির হৃদয় কখনও আপনার জন্মস্থানের সীমার ভিতর বদ্ধ থাকিতে পারে না, আর যদি তাঁহার যশঃ ঐ সীমা অতিক্রম করে, তাহা হইলে তিনি সৌভাগ্যবান। হিন্দী-সাহিত্যের দূতরূপে আপনারা আমার এই সৌভাগ্য বহন করিবার জন্য আসিয়াছেন, এজন্য আপনারা আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করুন।"

প্রবাসী

বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

ইহার পর প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষ হইতে শ্রীমতী প্রতিভা দেবী কবিকে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন এবং নিম্নলিখিত কবিতাটির দ্বারা অভিনন্দিত করেন :—

হে কবি! জয়ন্তী-অর্ঘ্য নিয়ে হাতে
তোমার স্মরণে
সুদূর প্রবাস হ'তে এই পথে, কবি নিকেতনে,
এলো যারা, সে কি তারা বয়সের দাবী
শুনে তব?
তা তো নয়, দেখি রূপ, অপরূপ,
চির অভিনব;
বয়সের সীমা তব, নিত্য নব নর্ত্তনের কোলে,
সপ্ততি বৎসর বুকে, সাত বৎসরের
শিশু দোলে
সৃষ্টির আনন্দে মগ্ন; সময়ের হিসাব না রাখে
বিস্মিত বিশ্বের মন তার পানে চেয়ে
শুধু থাকে।
কার চোখে এত দীপ্তি? কার বাণী
নিত্য বহমান?
কার প্রীতি নিতি নিতি, রচি চলে
বিশ্বের কল্যাণ
অফুরন্ত প্রাণ-রসে; সে যে এই শিশু
চিরন্তনী,
যুগে যুগে হে প্রবীন! গাহ নবীনের
জয়ধ্বনি।
বাঙ্গলার বুকের দুলাল! সত্যদ্রষ্টা!
হে অমর কবি!
কালজয় করে তুমি জয় গেয়ে যেও
সুরের পূরবী।
চির-সবুজের সমারোহ নিত্য হোক
জীবনে তোমার,
প্রবাসের ভালবাসা-ভরা এই
অর্ঘ্য উপচার।

ইহার পর আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার বেকিন্স্ আমেরিকাবাসীর পক্ষ হইতে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অতঃপর জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা কামিনী রায় নিম্নলিখিত অর্ঘ্য পাঠ করেন।

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম-বর্ষ শেষে একান্তমনে প্রার্থনা করি, জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হোক।

বাণীর দেউল আজ গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্ম্মাণকল্পে দ্রব্য-সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন; তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যাচার্য্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ-বিকসিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য-পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্ব্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি বারবার নতশিরে নমস্কার করি। ইতি।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের পক্ষে
শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু, সভাপতি।

উত্তরে কবি বলেন,—"বিপুল জনসঙ্ঘের বাণী-সঙ্গমে আজ আমি স্তব্ধ। এখানে নানা কণ্ঠের সম্ভাষণ, এ যে আমারই অভিবাদনের উদ্দেশে একথা আমার মন সহজে ও সম্যকরূপে গ্রহণ করিতে অক্ষম। সূর্য্যের আলোক খাপসিক ধূলিবিকীর্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়, কোথাও বা সে ছায়ায় ম্লান, কোথাও বা ———— প্রত্যাখ্যাত, কোথাও বা সে বাষ্পহীন আকাশে সমুজ্জ্বল, কোথাও বা পুষ্পকাননে বসন্তে তাহার অভ্যর্থনা, কোথাও বা শস্যক্ষেত্রে শরতে তাহার উৎসব। দৈবকৃপায় আমি কবিরূপে পরিচিত হইয়াছি; কিন্তু সেই পরিচয়ের স্বীকার দেশবাসীর হৃদয়ে অবচ্ছিন্ন নহে, তাহা স্বভাবতঃই বাধাবিরোধ ও সংশয়ের দ্বারা কিছু না কিছু অবগুণ্ঠিত। তাহাকে বিক্ষিপ্ততা হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়া, আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া এই জয়ন্তী অনুষ্ঠান নিবিড় সংহতভাবে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া দিল—সেই সঙ্গে উপলব্ধি করিলাম, দেশের প্রীতিপ্রসন্ন হৃদয়কে—তাহার আপন অপ্রচ্ছন্ন বিরাটরূপে। সেই আশ্চর্য্যরূপ দেখিলাম পরম বিস্ময়ে, আনন্দে, সম্ভ্রমের সঙ্গে, মস্তক নত করিয়া।

অন্তরের এই প্রকাশ কেবল যে আমারই কাছে অপরূপ অপূর্ব্ব তাহা নহে, দেশের—নিজের কাছেও। উৎসবের আয়োজন করিতে গিয়াই দেশশ্রী সহসা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার গভীর অন্তরের মধ্যে কতটা আনন্দ, কতটা প্রীতি নানা ব্যবধানের অন্তরালে অজস্র সঞ্চিত হইতেছিল। আবাল্যকাল দেশমাতার প্রাঙ্গণে গাহিয়াই আমার কণ্ঠ-সাধনা। মাঝে মাঝে যখন মনে হইত উদাসীন তিনি, তখনো বুঝিয়া তাঁহার অগোচরেও সুর পৌঁছিয়াছিল তাঁহার অন্তরে; যখন মনে হইয়াছে তিনি মুখ ফিরাইয়াছেন, তখনো হয়ত তাঁহার শ্রবণদ্বার রুদ্ধ হয় নাই। ভালো ও মন্দ—পরিণত ও অপরিণত, আমার নানা প্রয়াস তিনি দিনে দিনে মনে মনে আপন স্মৃতিসূত্রে গাঁথিয়া লইতেছিলেন। অবশেষে সত্তর বৎসর বয়সে যখন আমার আয়ু উত্তীর্ণ হইল, যখন তাঁহার সেই মালার শেষ গ্রন্থি দিবার সময় আসন্ন, তখনই আমার দীর্ঘ জীবনের চেষ্টা তাঁহার দৃষ্টিসম্মুখে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণপ্রায়। সেইজন্যই তাঁহার এই সভায় সকলের আমন্ত্রণ, স্নিগ্ধস্বরে তাঁহার এই বাণী আজ উচ্চারিত—'আমি গ্রহণ করিলাম।' সংসার হইতে বিদায় লইবার দ্বারের কাছে সেই বাণী স্পষ্ট ধ্বনিত হইল আমার হৃদয়ে। ত্রুটী বিস্তর আছে, সাধনায় কোন অপরাধ ঘটে নাই, ইহা একেবারে অসম্ভব; সেইগুলি বুঝিয়া বুঝিয়া বিচার করিবার দিন আজ নহে। সে সমস্তকে অতিক্রম করিয়াও আমার কর্ম্মের যে সত্যরূপ, যে সম্পূর্ণতা প্রকাশমান তাহাকেই আমার দেশ তাঁহার আপন সামগ্রী বলিয়া চিহ্নিত

করিয়া লইলেন। তাঁহার সেই অঙ্গীকারই এই উৎসবের মধ্য দিয়া আমাকে বরদান করিল। আমার জীবনের শেষ বর, এই শ্রেষ্ঠ বর।

অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষের মতোই, উভয়েরই যোগে রাত্রির পূর্ণ আত্মপ্রকাশ। আমার জীবন নিষ্ঠুর বিরোধের প্রভূত দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু তাহাতে আমার সমগ্র পরিচয়ের ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ তাহার যা শ্রেষ্ঠ যা সত্য তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমার জীবনেও যদি তাহা না ঘটিত, তবে অন্তকার এই দিন সার্থক হইত না। আমার আঘাতপ্রাপ্ত শরবিদ্ধ খ্যাতির মধ্য দিয়া এই উৎসব আপনাকে প্রমাণ করিয়াছে। তাই আমার শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই তিথিকে প্রণাম করা আমার পক্ষে আজ সহজ হইল। যে ক্ষয়ের দ্বারা ক্ষতি হয় না, তাহাই বিধাতার মহৎ দান—দুঃখের দিনেও যেন তাহাকে চিনিতে পারি, শ্রদ্ধার সহিত যেন তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধা না ঘটে।"

পরিশেষে "গোল্ডেন বুক অব টেগোর" কমিটির পক্ষ হইতে উক্ত কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কবিকে উক্ত গ্রন্থ উপহার প্রদান করেন।

অতঃপর "বাঙ্গলার মাটী, বাঙ্গলার জল" গানটী সুমধুর কণ্ঠে গীত হইবার পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন

সেনেট হলে ছাত্র ও ছাত্রীগণ কবির যে সংবর্দ্ধনা করেন, তাহার উত্তরে কবি প্রথমে মুখে মুখে কিছু বলিয়া পরে এই মুদ্রিত প্রতিভাষণ পাঠ করেন—

"যে-সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম, সে ছিল অতি নিভৃত। শহরের বাইরে শহরতলীর মত, চারিদিকে প্রতিবেশীর ঘর-বাড়িতে কলরবে আকাশটাকে আঁট করে বাঁধেনি।

আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্ব্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।

আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি, তার ছিল [illegible] [illegible] ও ঘরচে-পুড়া [illegible] খাটানো দেউড়ি, ঠাকুর-দালান, তিন চারটে উঠোন, সদর অন্দরের বাগান, সংবৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখবার মোটা মোটা জালা-সাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্ব্বযুগের নানা পালাপার্ব্বণের পর্য্যায় নানা কলরবে সাজসজ্জায় তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল ক'রেছিল, আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নাম্‌ল, তার আসবাবপত্র তখনও এসে পৌছায়নি।

এ বাড়ি থেকে এদেশীয় সামাজিক জীবনের স্রোত যেমন সরে গেছে, তেমনি পূর্ব্বতন ধনের স্রোতেও পড়েছে ভাঁটা। পিতামহের ঐশ্বর্য্যদীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল, সেদিন বাকী ছিল দহন-শেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটীমাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিখা। প্রচুর উপকরণসমাকীর্ণ পূর্ব্বকালের আমোদ-প্রমোদ বিলাস-সমারোহের সরঞ্জাম কোণে কোণে ধূলিমলিন জীর্ণ অবস্থায় কিছু কিছু বাকী যদি বা থাকে তাদের কোনো অর্থ নেই। আমি ধনের মধ্যে জন্মাইনি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।

এই নিরালায়, এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক,—মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মত। তাই আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গী ছিল, কল্‌কাতার লোক যাকে ইসারা ক'রে ব'লত ঠাকুর বাড়ির ভাষা। পুরুষ ও মেয়েদের বেশভূষাতেও তাই, চালচলনেও।

বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিত সমাজ অন্দরে মেয়েমহলে ঠেলে রেখেছিলেন, সদরে ব্যবহার হ'ত ইংরেজী—চিঠিপত্রে, লেখাপড়ায়, এমন কি, মুখের কথায়। আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারেনি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।

আমাদের বাড়িতে আর একটা সমাবেশ হয়েছিল সেটা উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রত্যহই বিশুদ্ধ [illegible] অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের [illegible]

এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণতঃ বাংলাদেশে ধর্মসাধনার ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে, আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করেনি। পিতৃদেবের প্রবর্ত্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।

এই যেমন একদিকে তেমনি অন্যদিকে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজী-সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ির হাওয়া শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যরস-সম্ভোগে আন্দোলিত, সার ওয়াল্‌টার স্কটের প্রভাবও প্রবল। দেশ-প্রীতির উন্মাদনা তখন দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে" আর তারপরে হেমচন্দ্রের "বিংশতি কোটি মানবের বাস" কবিতায় দেশ-মুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখীর কাকলীর মত শোনা যায়। হিন্দুমেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা "জয় ভারতের জয়," গণ্দাদার লেখা "লজ্জায় ভারত-যশ গাইব কি করে," বড়দাদার "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।" জ্যোতিদাদা এক গুপ্ত সভা স্থাপন ক'রেচেন, একটা পোড়োবাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্‌বেদের পুঁথি আর মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।

এইসকল আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ উদ্যোগ এর কিছুই ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ ক'রেছিল। রাজসরকারের কোতোয়াল, হয় তখন সতর্ক ছিল না, নয় উদাসীন ছিল, তারা সভার সভ্যদের মাথার খুলি ভঙ্গ বা রসভঙ্গ করতে আসেনি।

কলকাতা শহরের বক্ষ তখন পাথরে বাঁধান হয়নি, অনেকখানি কাঁচা ছিল। তেল-কলের ধোঁয়ায় আকাশের মুখ তখনও কালী পড়েনি। ইমারৎ-অরণ্যের ফাঁকায় ফাঁকায় পুকুরের জলের উপর সূর্য্যের আলো ঝিকিয়ে যেত, বিকেল বেলায় অশথের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়ত, হাওয়ায় দুলত নারকেল গাছের পত্র-ঝালর, বাঁধা নালা বেয়ে গঙ্গার জল ঝরনার মত ঝরে পড়ত আমাদের দক্ষিণ বাগানের পুকুরে, মাঝে মাঝে গলি থেকে পাল্কী বেহারার হাঁইহুঁই শব্দ আস্‌ত কানে, আর বড় রাস্তা থেকে সহিসের হেইও হাঁক, সন্ধ্যাবেলায় জ্বল্‌ত তেলের প্রদীপ, তারই ক্ষীণ আলোয় মাদুর পেতে বুড়ী দাসীর কাছে শুনতুম রূপকথা। এই নিস্তব্ধপ্রায় জগতের মধ্যে আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ, লাজুক, নীরব, নিশ্চঞ্চল।

আরও একটা কারণে আমাকে খাপছাড়া করেছিল। আমি ইস্কুল-পালানো ছেলে, পরীক্ষা দেইনি, পাস করিনি, মাষ্টার আমার ভাবী কালের সম্বন্ধে হতাশ্বাস। ইস্কুল-ঘরের বাইরে যে অবকাশটা বাধাহীন, সেইখানে আমার মন হা-ঘরেদের মত বেরিয়ে পড়েছিল।

ইতিপূর্ব্বেই কোন্ একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম, লোকে যাকে বলে কবিতা, সেই ছন্দ মেলানো মিল-করা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে। তখন দিনও এমন ছিল ছড়া যারা বানাতে পারত তাদের দেখে লোক বিস্মিত হ'ত। এখন যারা না পারে তারাই অসাধারণ বলে গণ্য। পয়ার ত্রিপদী-মহলে আপন অবাধ অধিকার-বোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম। আট অক্ষর, ছয় অক্ষর, দশ অক্ষরের চৌকো-চৌকো কত রকম শব্দ ভাগ নিয়ে চল্‌ল ঘরের কোণে আমার ছন্দ-ভাঙাগড়ার খেলা। ক্রমে প্রকাশ পেল দশজনের সাম্‌নে।

এই লেখাগুলি যেমনই হোক, এর পিছনে একটা ভূমিকা আছে—সে হচ্চে একটা বালক, সে কুণো, সে একলা, সে একঘরে, তার খেলা নিজের মনে। সে ছিল সমাজের শাসনের অতীত, ইস্কুলের শাসনের বাইরে। বাড়ির শাসনও তার হাল্‌কা। পিতৃদেব ছিলেন হিমালয়ে, বাড়িতে দাদারা ছিলেন কর্ত্তৃপক্ষ। জ্যোতিদাদা, যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মান্‌তুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোন বাঁধন পরাননি, তাঁর সঙ্গে তর্ক করেচি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেচি বয়স্যের মত। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার

চিত্ত-বিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার 'পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তাহ'লে ভেঙেচুরে তেড়েবেঁকে যা-হয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয়ত ভদ্রসমাজের সন্তোষজনকও হ'ত, কিন্তু আমার মত একেবারেই হ'ত না।

সুরু হ'ল আমার ভাঙা ছন্দে টুক্‌রো কাব্যের পালা, উল্কাবৃষ্টির মত; বালকের যা'-তা' ভাবের এলোমেলো কাঁচা গাঁথুনি। এই রীতিভঙ্গের ঝোঁকটা ছিল সেই একঘরে ছেলের মজ্জাগত। এতে যথেষ্ট বিপদের শঙ্কা ছিল। এখানেও অপঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি। তার কারণ আমার ভাগ্যক্রমে সেকালে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতির হাটে ভিড় ছিল অতি সামান্য—প্রতিযোগিতার উত্তেজনা উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠেনি। বিচারকের দণ্ড থেকে অপ্রশংসার অপ্রিয় আঘাত নাম্‌ত, কিন্তু কটূক্তি ও কুৎসার উত্তেজনা তখনও সাহিত্যে ঝাঁঝিয়ে ওঠেনি।

সেদিনকার অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে আমি ছিলেম বয়সে সব চেয়ে ছোট, শিক্ষায় সব চেয়ে কাঁচা। আমার ছন্দগুলি লাগাম-ছেঁড়া, লেখবার বিষয় ছিল অস্ফুট উক্তিতে ঝাপসা, ভাষার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে। তখনকার সাহিত্যিকেরা মুখের কথায় বা লেখায় প্রায়ই আমাকে প্রশ্রয় দেননি,—আধ-আধ বাধো বাধো কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন। সে হাসি বিদ্বেষের নয়, সেটা বিদূষণ্যব্যবসায়ের অঙ্গ ছিল না। তাঁদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিল না লেশমাত্র। বিমুখতা যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সেখানেও বিদ্বেষ দেখা দেয়নি। তাই প্রশ্রয়ের অভাব সত্ত্বেও বিরুদ্ধরীতির মধ্য দিয়েও আপন লেখা আপন মতে গড়ে তুলেছিলেম।

সেদিনকার খ্যাতিহীনতার স্নিগ্ধ প্রথম প্রহর কেটে গেল। প্রকৃতির শুশ্রূষা ও আত্মীয়দের স্নেহের ঘনচ্ছায়ায় ছিলেম ব'সে। কখনও কাটিয়েছি তেতালার ছাদের প্রান্তে কর্ম্মহীন অবকাশে মনে মনে আকাশ-কুসুমের মালা গেঁথে, কখনও গাজিপুরের বৃদ্ধ নিমগাছের তলায় ব'সে ইঁদারার জল বাগান সেঁচ দেবার করুণধ্বনি শুনতে শুনতে সুদূর গঙ্গার স্রোতে কল্পনাকে অহৈতুক বেদনায় বোঝাই করে দূরে ভাসিয়ে দিয়ে। নিজের মনের আলো-আঁধারের মধ্য থেকে হঠাৎ পরের মনের কুস্রয়ের ধাক্কা খাবার জন্যে বড় রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হবে এমন কথা সেদিন ভাবিওনি। অবশেষে একদিন খ্যাতি এসে অনাবৃত মধ্যাহ্নরৌদ্রে টেনে বের করলে। তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠল, আমার কোণের আশ্রয় একেবারে ভেঙে গেল। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্লানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অন্যদের চেয়ে তা অনেক বেশী আবিল হ'য়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরুণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মত আর কোনো সাহিত্যিককেই সইতে হয়নি। এও আমার খ্যাতি-পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি। এ কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি যে, প্রতিকূল পরীক্ষায় ভাগ্য আমাকে লাঞ্ছিত করেছে, কিন্তু পরাভবের অগৌরবে লজ্জিত করেনি। এছাড়া আমার দুর্গ্রহ কালো বর্ণের এই যে পটটা ঝুলিয়েছেন এরই উপরে আমার বন্ধুদের সুপ্রসন্ন মুখ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেচে। তাঁদের সংখ্যা অল্প নয়, সে কথা বুঝতে পারি আজকের এই অনুষ্ঠানেই। বন্ধুদের কাউকে জানি, অনেককেই জানিনে, তাঁরাই কেউ কাছে থেকে কেউ দূরে থেকে এই উৎসবে মিলিত হয়েছেন, সেই উৎসাহে আমার মন অভিনন্দিত। আজ আমার মনে হচ্চে তাঁরা আমাকে জাহাজে তুলে দিতে ঘাটে এসে দাঁড়িয়েচেন—আমার খেয়াতরী পাড়ি দেবে দিবালোকের পরপারে তাঁদের মঙ্গল-ধ্বনি কানে নিয়ে।

আমার কর্ম্মপথের যাত্রা সত্তর বছরের গোধূলি-বেলায় একটা উপসংহারে এসে পৌঁছল। আলো ম্লান হবার শেষ মুহূর্ত্তে এই জয়ন্তী-অনুষ্ঠানের দ্বারা দেশ আমার দীর্ঘজীবনের মূল্য স্বীকার করবেন।

ফসল যতদিন মাঠে ততদিন সংশয় থেকে যায়, বুদ্ধিমান মহাজন ক্ষেতের দিকে তাকিয়েই আগাম দাদন দিতে দ্বিধা করে, অনেকটা হাতে রেখে দেয়। ফসল যখন গোলায় উঠল তখনই ওজন বুঝে দামের কথা পাকা হ'তে পারে। আজ আমার বুঝি সেই ফসল-তোলার হিসাব চুকিয়ে দেবার দিন।

যে মানুষ অনেক কাল বেঁচে আছে সে অতীতেরই সামিল। বুঝতে পারচি আমার সাবেক বর্ত্তমান এই হাল বর্ত্তমান থেকে বেশ খানিকটা তফাতে। যে সব কবি পালা শেষ ক'রে লোকান্তরে, তাঁদেরই আঙিনার কাছটায় আমি এসে দাঁড়িয়েছি তিরোভাবের ঠিক পূর্ব্বসীমানায়। বর্ত্তমানের চল্‌তি রথের বেগের মুখে কাউকে দেখে নেবার যে অস্পষ্টতা সেটা আমার বেলা এতদিনে কেটে যাবার কথা। যতখানি দূরে এলে কল্পনার ক্যামেরায় মানুষের জীবনটাকে সমগ্রলক্ষ্যবদ্ধ করা যায়, আধুনিকের পুরোভাগ থেকে আমি ততটা দূরেই এসেচি।

পঞ্চাশের পরে বানপ্রস্থের প্রস্তাব মনু করেচেন। তার কারণ মনুর হিসাবমত পঞ্চাশের পরে মানুষ বর্ত্তমান থেকে পিছিয়ে পড়ে। তখন কোমর বেধে ধাবমান কালের সঙ্গে সমান ঝোঁকে পা ফেলে ছোটায় যতটা ক্লান্তি ততটা সফলতা থাকে না, যতটা ক্ষয় ততটা পূরণ হয় না। অতএব তখন থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে সেই সর্ব্বকালের মোহনার দিকে যাত্রা করতে হবে যেখানে কাল স্তব্ধ। গতির সাধনা শেষ ক'রে তখন স্থিতির সাধনা।

মনু যে মেয়াদ ঠিক ক'রে দিয়েচেন এখন সেটাকে ঘড়ি ধ'রে খাটানো প্রায় অসাধ্য। মনুর যুগে নিশ্চয়ই জীবনে এত দায় ছিল না, তার গ্রন্থি ছিল কম। এখন শিক্ষা বল, কর্ম্ম বল, এমন কি আমোদ-প্রমোদ খেলা-ধূলা, সমস্তই বহুব্যাপক। তখনকার সম্রাটেরও রথ যত বড় জমকালো হোক্, এখনকার রেলগাড়ির মত তাতে বহুগাড়ির এত বন্দসমাস ছিল না। এই গাড়ির মাল খালাস করতে বেশ একটু সময় লাগে। পাঁচটায় আপিসে ছুটী শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বটে, কিন্তু খাতাপত্র বন্ধ ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাড়ি-মুখো হবার আগেই বাতি জ্বালতে হয়। আমাদের সেই দশা। তাই পঞ্চাশের কোঠা পেরিয়ে না নিলে ছুটী মঞ্জুর অসম্ভব। কিন্তু সত্তরের কোঠায় পড়লে আর ওজর চলে না। বাইরের লক্ষণে বুঝতে পারচি, আমার সময় চল্‌ল আমাকে ছাড়িয়ে—প্রমাণ ক'রে রাখছে অন্তত দশ বছর আগেকার তারিখে আমি ব'লে আছি: দূরের নক্ষত্রের আলোর মত, অর্থাৎ সে যখনকার সে তখনকার নয়।

তবু একেবারে থামাবার আগে চলার ঝোঁকে অতীতকালের খানিকটা ধাক্কা এসে পড়ে বর্ত্তমানের উপরে। গান সমস্তটাই শমে এসে পৌছলে তার সমাপ্তি; তবু আরও কিছুক্ষণ করমাস চলে পালটিয়ে গাবার জন্যে। সেটা অতীতেরই পুনরাবৃত্তি। এর পরে বড়-জোর দুটো একটা তান লাগান চলে, কিন্তু চুপ ক'রে গেলেও লোকসান নেই। পুনরাবৃত্তিকে দীর্ঘকাল তাজা রাখবার চেষ্টাও যা, আর কই মাছটাকে ডাঙায় তুলে মাসখানেক বাচিয়ে রাখবার চেষ্টাও তাই।

এই মাছটার সঙ্গে কবির তুলনা আরও একটু এগিয়ে নেওয়া যাক। মাছ যতক্ষণ জলে আছে ওকে কিছু কিছু খোরাক জোগানো সৎকর্ম্ম, সেটা মাছের নিজের প্রয়োজনে। পরে যখন তাকে ডাঙায় তোলা হ'ল তখন প্রয়োজনটা তার নয়, অপর কোন জীবের। তেমনি কবি যতদিন না একটা স্পষ্ট পরিণতিতে পৌছয় ততদিন তাকে কিছু কিছু উৎসাহ দিতে পারলে ভালই—সেটা কবির নিজেরই প্রয়োজনে। তারপরে তার পূর্ণতায় যখন একটা সমাপ্তির যতি আসে তখন তার সম্বন্ধে যদি কোনো প্রয়োজন থাকে সেটা তার নিজের নয়, প্রয়োজন তার দেশের।

দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব ততই জবাব-দিহির দায় বাড়বে, প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হ'ল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে উঠে মারী বীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্য-কথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।

তাই দেশ নিজের সত্তা প্রমাণেরই খাতিরে অহরহ তাকিয়ে আছে তাদেরই জন্যে যারা কোন সাধনায় সার্থক। তারা না থাকলেও গাছপালা জীবজন্তু জন্মায়,

বৃষ্টি পড়ে, নদী চলে কিন্তু দেশ আচ্ছন্ন থাকে, মরুবালুতলে ভূমির মত।

এই কারণেই দেশ যার মধ্যে আপন ভাষাদান প্রকাশ অনুভব করে তাকে সর্ব্বজনসমক্ষে নিজের ব'লে চিহ্নিত করবার উপলক্ষ্য রচনা করতে চায়। যেদিন তাই করে, যেদিন কোনো মানুষকে আনন্দের সঙ্গে সে অঙ্গীকার করে, সেদিনই মাটীর কোল থেকে দেশের কোলে সেই মানুষের জন্ম।

আমার জীবনের সমাপ্তিদশায় এই জয়ন্তী-অনুষ্ঠানের যদি কোনো সত্য থাকে তবে তা এই তাৎপর্য্য নিয়ে। আমাকে গ্রহণ করার দ্বারা দেশ যদি কোনোভাবে নিজেকে লাভ না ক'রে থাকে তবে আজকের এই উৎসব অর্থহীন। যদি কেউ এ কথায় অহঙ্কারের আশঙ্কা ক'রে আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হন তবে তাঁদের উদ্বেগ অনাবশ্যক। যে খ্যাতির সম্বল অল্প তার সমারোহ যতই বেশী হয় ততই তার দেউলে হওয়া দ্রুত ঘটে। ভুল মস্ত হয়েই দেখা দেয়, চুকে যায় অতি ক্ষুদ্র হয়ে। আতস বাজির অভ্রবিদারক আলোটাই তার নির্ব্বাণের উজ্জ্বল তর্জ্জনী-সঙ্কেত।

এ কথায় সন্দেহ নাই যে পুরস্কারের পাত্র-নির্ব্বাচনে দেশ ভুল করতে পারে। সাহিত্যের ইতিহাসে ক্ষণমুখরা খ্যাতি মৌনসাধন বার-বার দেখা গেছে। তাই আজকের দিনের আয়োজনে আজই অতিশয় উল্লাস যেন না করি এই উপদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি চলে না। তেমনি তা নিয়ে এখনি তাড়াতাড়ি বিমর্ষ হবারও আশু কারণ দেখি না। কালে কালে সাহিত্য-বিচারের রায় একবার উল্‌টিয়ে আবার পাল্‌টিয়েও থাকে। অব্যবস্থিত-চিত্ত মন্দগতি কালের সব-শেষ বিচারে আমার ভাগ্যে যদি নিঃশেষে ফাঁকিই থাকে তবে এখনি আগাম শোচনা করতে বসা কিছু নয়। এখন[illegible] মত এই উপস্থিত অনুষ্ঠানটাই নগদ লাভ। তারপরে চরম জবাবদিহির জন্যে প্রপৌত্রেরা রইলেন। আপাততঃ বন্ধুদের নিয়ে আশ্বস্তচিত্তে আনন্দ করা যাক, অপর পক্ষে যাঁদের অভিরুচি হয় তাঁরা ফুৎকারে বুদ্‌বুদ বিদীর্ণ করার উৎসাহে আনন্দ করতে পারেন।

এই দুই বিপরীত ভাবের কালো সাদায় সংসারের আনন্দধারায় যমের কালো যমুনা ও শিবজটা-নিঃসৃত গঙ্গা মিলে থাকে। ময়ূর আপন পুচ্ছগর্বে নৃত্য ক'রে খুশী, আবার শিকারী আপন লক্ষ্যভেদগর্বে তাকে গুলি ক'রে মহা আনন্দিত।

আধুনিক কালে পাশ্চাত্য দেশে সাহিত্যে কলাসৃষ্টিতে লোকচিত্তের সম্মতি অতি ঘন ঘন বদল হয়, এটা দেখা যাচ্চে। বেগ বেড়ে চলেচে মানুষের যানে বাহনে, বেগ অবিশ্রাম ঠেলা দিচ্চে মানুষের মন প্রাণকে।

যেখানে বৈষয়িক প্রতিযোগিতা উগ্র সেখানে এই বেগের মূল্য বেশী। ভাগ্যের হরির লুট নিয়ে হাটের ভিড়ে ধূলার 'পরে যেখানে সকলে মিলে কাড়াকাড়ি সেখানে যে-মানুষ বেগে যেতে পারে তার জিৎ। তৃপ্তিহীন লোভের বাহন বিরামহীন বেগ। সমস্ত পশ্চিম মাতালের মত টলমল করচে সেই লোভে। সেখানে বেগবৃদ্ধি ক্রমে লাভের উপলক্ষ্য না হয়ে স্বয়ং লক্ষ্য হয়ে উঠ্‌চে। বেগেরই লোভ আজ জলে স্থলে আকাশে হিসটীরিয়ার চীৎকার করতে করতে ছুটে বেরলো।

কিন্তু প্রাণ-পদার্থ তো বাষ্প-বিদ্যুতের ভূতে তাড়া করা লোহার এঞ্জিন নয়। তার একটা আপন ছন্দ আছে। সেই ছন্দে দুই এক মাত্রা টান সয় তার বেশী নয়। মিনিট কয়েক ডিগবাজি খেয়ে চলা সাধ্য হ'তে পারে, কিন্তু দশ মিনিট যেতে-না-যেতে প্রমাণ হবে যে মানুষ বাইসিক্‌লের চাকা নয়, তার পদাতিকের চাল পদাবলীর ছন্দে। গানের লয় মিষ্টি লাগে যখন সে কানের সজীব ছন্দ মেনে চলে। তাকে দুন থেকে চৌদুনে চড়ালে সে কলা-দেহ ছেড়ে কৌশল-দেহ নেবার জন্যই হাঁসফাঁস করতে থাকে। তাগিদ যদি আরও বাড়াও তাহ'লে রাগিণীটা পাগলা-গারদের সদর গেটের উপর মাথা ঠুকে মারা যাবে। সজীব চোখ তো ক্যামেরা নয়, ভাল ক'রে দেখে নিতে সে সময় নেয়। ঘণ্টায় বিশ পচিশ মাইল দৌড়ের দেখা তার পক্ষে কুয়াসা দেখা। একদা তীর্থযাত্রা ব'লে সজীব পদার্থ আমাদের দেশে ছিল। ভ্রমণের পূর্ণস্বাদ নিয়ে সেটা [illegible]।

কলের গাড়ির কল্যাণে তীর্থ রইল, যাত্রা রইল না, ভ্রমণ নেই পৌঁছনো আছে, শিক্ষাটা বাদ দিয়ে পরীক্ষাটা পাস করা যাকে বলে। রেল-কোম্পানীর কারখানায় কলে-ঠাসা তীর্থ-যাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দামের বটিকা সাজানো, গিলে ফেল্‌লেই হ'ল—কিন্তু হ'লই না যে সে কথা বোঝবারও ফুরসুৎ নেই। কালিদাসের যক্ষ যদি মেঘদূতকে বরখাস্ত ক'রে দিয়ে য়েরোপ্লেনদূতকে অলকায় পাঠাতেন তাহ'লে অমন দুই সর্গভরা মন্দাক্রান্ত ছন্দ দুচারটে শ্লোক পার না হ'তেই অপঘাতে মরত। জলে-ঠাসা বিরহ তো আজ পর্য্যন্ত বাজারে নামেনি।

মেঘদূতের সেই শোকাবহ পরিণামে শোক করবে না এমনতর বলবান পুরুষ আজকাল দেখতে পাওয়া যাচ্চে। কেউ কেউ বলচেন, এখন কবিতার যে আওয়াজটা শোনা যাচ্চে সে নাভিশ্বাসের আওয়াজ। ওর সময় হয়ে এল। যদি তা সত্য হয় তবে সেটা কবিতার দোষে নয় সময়ের দোষে। মানুষের প্রাণটা চিরদিনই ছন্দে বাঁধা, কিন্তু তার কালটা কলের তাড়ায় সম্প্রতি ছন্দ-ভাঙা।

আঙুরের ক্ষেতে চাষী কাঠি পুঁতে দেয়, তার উপর আঙুর লতিয়ে উঠে আশ্রয় পায়, ফল ধরায়। তেমনি জীবনযাত্রাকে সবল ও সফল করবার জন্যে কতকগুলি রীতিনীতি বেঁধে দিতে হয়। এই রীতিনীতির অনেকগুলিই নির্জ্জীব নীরস; উপদেশ অনুশাসনের খুঁটি। কিন্তু বেড়ায় লাগানো জিয়ল কাঠের খুঁটি যেমন রস পেলেই বেঁচে ওঠে তেমনি জীবনযাত্রা যখন প্রাণের ছন্দে শান্ত গমনে চলে তখন শুকনো খুঁটিগুলো অন্তরের গভীরে পৌঁছবার অবকাশ পেয়ে ক্রমেই প্রাণ পেতে থাকে। সেই গভীরেই সঞ্জীবনরস। সেই রসে তত্ত্ব ও নীতির শুষ্ক পদার্থও হৃদয়ের আপন সামগ্রীরূপে সজীব ও সজ্জিত হয়ে উঠে, মানুষের আনন্দের রং তাতে লাগে। এই আনন্দের প্রকাশের মধ্যেই চিরন্তনতা। একদিনের রীতিকে আর-একদিন আমরা গ্রহণ নাও করতে পারি, কিন্তু সেই রীতি যে-প্রীতিকে যে-সৌন্দর্য্যকে আনন্দের সত্য ভাষায় প্রকাশ করেচে সে আমাদের কাছে নূতন থাকবে। আজও নূতন আছে মোগল সাম্রাজ্যের শিল্প—সেই সাম্রাজ্যকে, তার সাম্রাজ্যনীতিকে আমরা পছন্দ করি আর না করি।

কিন্তু যে-যুগে দলে দলে গরজের তাড়ায় অবকাশ ঠাসা হয়ে নিরেট হয়ে যায় সে যুগ প্রয়োজনের, সে যুগ প্রীতির নয়। প্রীতি সময় নেয় গভীর হ'তে। আধুনিক এই ত্বরা-তাড়িত যুগে প্রয়োজনের তাগিদ কচুরি পানার মতই সাহিত্য-ধারার মধ্যেও ভুরি ভুরি ঢুকে পড়েচে। তা'রা বাস করতে আসে না, সমস্যাসমাধানের দরখাস্ত হাতে ধন্না দিয়ে পড়ে! সে দরখাস্ত যতই অলঙ্কৃত হোক্ তবু সে খাঁটা সাহিত্য নয়, সে দরখাস্তই। দাবি মিটলেই তার অন্তর্দ্ধান।

এমন অবস্থায় সাহিত্যের হাওয়া বদল হয় এবেলা-ওবেলা। কোথাও আপন দরদ রেখে যায় না, পিছন-টাকে লাথি মেরেই চলে, যাকে উঁচু ক'রে গড়েছিল তাকে ধূলিসাৎ ক'রে তার 'পরে অট্টহাসি। আমাদের মেয়েদের পাড়ওয়ালা শাড়ি, তাদের নীলাম্বরী, তাদের বেনারসী চেলি মোটের উপর দীর্ঘকাল বদল হয়নি—কেন-না ওরা আমাদের অন্তরের অনুরাগকে আঁকড়ে আছে। দেখে আমাদের চোখের ক্লান্তি হয় না। হ'ত ক্লান্তি, মনটা যদি রসিয়ে দেখ্‌বার উপযুক্ত সময় না পেয়ে বে-দরদী ও অশ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে উঠ্‌ত। হৃদয়হীন অগভীর বিলাসের আয়োজনে অকারণে অনায়াসে ঘন ঘন ফ্যাশানের বদল। এখনকার সাহিত্যে তেমনি রীতির বদল। হৃদয়টা দৌড়তে দৌড়তে প্রীতি সম্বন্ধের রাখী গাঁথতে ও পরাতে পারে না। যদি সময় পেত সুন্দর ক'রে বিনিয়ে বিনিয়ে গাঁথত। এখন ওকে ব্যস্ত লোকেরা ধমক দিয়ে বলে, রেখে দাও তোমার সুন্দর। সুন্দর পুরোনো, সুন্দর সেকেলে। আনো একটা যেমন-তেমন ক'রে পাক-দেওয়া শণের দড়ি—সেটাকে বল্‌ব রিয়ালিজম—এখনকার হুদ্দাড় দৌড়ওয়ালা লোকের ঐটেই পছন্দ। স্বল্পায়ু ফ্যাশান হঠাৎ নবাবের মত উদ্ধত—তার প্রধান অহঙ্কার এই যে সে অধুনাতন, অর্থাৎ তার বড়াই গুণ নিয়ে নয়, কাল নিয়ে।

বেগের এই মোটর-কলটা পশ্চিম দেশের মর্ম্মস্থানে। ওটা এখনও পাকা দলিলে আমাদের নিজস্ব হয়নি। তবু

আমাদেরও দৌড় আরম্ভ হ'ল। ওদেরই হাওয়া-গাড়ির পাদানের উপর লাফ দিয়ে আমরা উঠে পড়েচি। আমরাও খর্ব্বকেশিনী খর্ব্ববেশিনী সাহিত্যকীর্ত্তির টেকনীকের হাল্ ফ্যাশান নিয়ে গম্ভীরভাবে আলোচনা করি, আমরাও অধুনাতনের স্পর্দ্ধা নিয়ে পুরাতনের মান হানি করতে অত্যন্ত খুসী হই।

এই সব চিন্তা করেই বলেছিলুম আমার এ বয়সে খ্যাতিকে আমি বিশ্বাস করিনে। এই মায়ামৃগার শিকারে বনে-বাদাড়ে ছুটে বেড়ানো যৌবনেই সাজে। কেন-না সে-বয়সে মৃগ যদি বা নাও মেলে মৃগয়াটাই যথেষ্ট। ফুল থেকে ফল হ'তেও পারে, না হতেও পারে, তবু আপন স্বভাবকেই চাঞ্চল্যে সার্থক করতে হয় ফুলকে। সে অশান্ত বাইরের দিকেই তার বর্ণ গন্ধের নিত্য উদ্যম। ফলের কাজ অন্তরে, তার স্বভাবের প্রয়োজন অপ্রগল্ভ শান্তি। শাখা থেকে মুক্তির জন্যেই তার সাধনা,—সেই মুক্তি নিজেরই আন্তরিক পরিণতির যোগে।

আমার জীবনে আজ সেই ফলেরই ঋতু এসেচে। যে ফল আশু বৃন্তচ্যুতির অপেক্ষা করে। এই ঋতুটার সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে হ'লে বাহিরের সঙ্গে অন্তরের শান্তি স্থাপন চাই। সেই শান্তি খ্যাতি-অখ্যাতির দ্বন্দ্বের মধ্যে বিধ্বস্ত হয়।

খ্যাতির কথা থাক। ওটার অনেকখানিই অবাস্তবের বাষ্পে পরিস্ফীত। তার সঙ্কোচন-প্রসারণ নিয়ে যে মানুষ অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হ'তে থাকে সে অভিশপ্ত। ভাগ্যের পরম দান প্রীতি, কবির পক্ষে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাই। যে-মানুষ কাজ দিয়ে থাকে খ্যাতি দিয়ে তার বেতন শোধ চলে, আনন্দ দেওয়াই যার কাজ প্রীতি না হ'লে তার প্রাপ্য শোধ হয় না।

অনেক কীর্ত্তি আছে যা মানুষকেই উপকরণ ক'রে গড়ে তোলা। যেমন রাষ্ট্র। কর্ম্মের বল সেখানে জন-সংখ্যায় —তাই সেখানে মানুষকে দলে টানা নিয়ে কেবলই দ্বন্দ্ব চলে। বিস্তারিত খ্যাতির বেড়াজাল ফেলে মানুষ ধরা নিয়ে ব্যাপার। মনে কর, লয়েড জর্জ্জ। তাঁর বুদ্ধিকে তাঁর শক্তিকে অনেক লোকে যখন মানে তখনই তাঁর কাজ চলে। বিশ্বাস আলগা হ'লে বেড়াজাল গেল ছিঁড়ে, মানুষ-উপকরণ পুরোপুরি জোটে না।

অপর পক্ষে কবির সৃষ্টি যদি সত্য হয়ে থাকে সেই সত্যের গৌরব সেই সৃষ্টির নিজেরই মধ্যে, দশজনের সম্মতির মধ্যে নয়। দশজনে তাকে স্বীকার করেনি এমন প্রায়ই ঘটে থাকে। তাতে বাজারদরের ক্ষতি হয়, কিন্তু সত্যমূল্যের কম্‌তি হয় না।

ফুল ফুটেচে এইটাই ফুলের চরম কথা। যার ভাল লাগল সেই জিৎল, ফুলের জিৎ তার আপন আবির্ভাবেই, সুন্দরের অন্তরে আছে একটি রসময় রহস্যময় আত্মতের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর, গভীর, উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রাঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গ রঙে রসে মিলে যায়—একেই বলে অনুরাগ।

কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা। সেই কবিকেই মানুষ বড় বলে যে এমন সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেচে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর। কলা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের অনুরাগের সম্পদ রচিত ও সঞ্চিত হয়ে উঠ্‌চে। এই বিশাল ভুবনে বিশেষ দেশের মানুষ বিশেষ কাকে ভালবেসেচে সে তার সাহিত্য দেখ্‌লেই বুঝতে পারি। এই ভালবাসার দ্বারাই তো মানুষকে বিচার করা।

বীণাপাণির বীণায় তার অনেক। কোনটা সোনার, কোনটা তামার, কোনটা ইস্পাতের। সংসারের কণ্ঠে হাল্কা ও ভারী, আনন্দের ও প্রমোদের যত রকমের সুর আছে সবই তাঁর বীণায় বাজে। কবির কাব্যেও সুরের অসংখ্য বৈচিত্র্য। সবই যে উদাত্তধ্বনির হওয়া চাই এমন কথা বলি নে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্য্যবান ও বিশুদ্ধ করে। ভর্তৃহরির কাব্যে দেখি ভোগের মানুষ আশ্রয় সুর পেয়েচে, কিন্তু সেই সঙ্গেই কাব্যের গভীরের মধ্যে

[illegible] ত্যাগের মানুষ আপন ধ্রুবতারা নিয়ে—এই দুই সুরের সমবায়েই রসের ওজন ঠিক থাকে, কাব্যেও মানবজীবনেও। দূরকাল ও বহুজনে যে-সম্পদ দান করায় যারা সাহিত্যে স্থায়িভাবে সার্থক হয়, কাগজের নৌকায় বা মাটির গাম্‌লায় তো তার বোঝাই সইবে না। আধুনিক-কাল-বিলাসীরা অবজ্ঞার সঙ্গে বল্‌তে পারেন এ-সব কথা আধুনিক কালের বুলির সঙ্গে মিল্‌চে না—তা যদি হয় তাহ'লে সেই আধুনিক কালটারই জন্যে পরিতাপ করতে হবে। আশ্বাসের কথা এই যে সে চিরকালই আধুনিক থাক্‌বে, এত আয়ু তার নয়।

কবি যদি ক্লান্ত মনে এমন কথা মনে করে যে কবিত্বের চিরকালের বিষয়গুলি আধুনিককালে পুরোনো হয়ে গেছে, তাহ'লে বুঝ্‌ব আধুনিক কালটাই হয়েচে বৃদ্ধ ও রসহীন। চিরপরিচিত জগতে তার সহজ অনুরাগের রস পৌঁছাচ্চে না, তাই জগৎটাকে আপনার মধ্যে নিতে পারল না। যে-কল্পনা নিজের চারিদিকে আর রস পায় না, সে যে কোনো চেষ্টাকৃত রচনাকে দীর্ঘকাল সরস রাখতে পারবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা। রসনায় যার রুচি মরেচে চিরদিনের অন্নে সে তৃপ্তি পায় না, সেই একই কারণে কোনো একটা আজগুবি অন্নেও সে চিরদিন রস পাবে এমন সম্ভাবনা নেই।

আজ সত্তর বছর বয়সে সাধারণের কাছে আমার পরিচয় একটা পরিণামে এসেচে। তাই আশা করি যাঁরা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেচেন এতদিনে অন্ততঃ তাঁরা একথা জেনেচেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনও তাতে ক্লান্ত হ'ল না, বিস্ময়ের অন্ত পাইনি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহতবাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাকে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েচে, মনে হয়েচে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের [illegible] পৃথিবীকে ঋতুর আকাশ-দূতগুলি [illegible] সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই [illegible] আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে [illegible] করিনি। প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েচি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েচি যিনি সকল সত্তার সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, যাঁর খুশীতেই নিরন্তর অসংখ্যরূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশী হয়ে উঠচে—ব'লে উঠ্‌চে—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ; যাতে কোনো প্রয়োজন নেই তাও আনন্দের টানে টান্‌বে, এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারের চরম অর্থ যাঁর মধ্যে; যিনি অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপূর্ণ ক'রে বিদ্যমান ব'লেই প্রাণপণ কঠোর আত্মত্যাগকে আমরা আত্মঘাতী পাগলের পাগলামি ব'লে হেসে উঠলুম না।

যাঁর লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চ'লেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে
যাঁর লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক, মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারে ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, তুচ্ছের কুৎসার তলে
প্রত্যহের বীভৎসতা।
যাঁর পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
যাঁহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে।

ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন, সেই মন্ত্রটি বার-বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েচে, বার-বার নিজেকে বলেচি—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ; আনন্দ কর তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েচে তোমার চারিদিকে, তারই মধ্যে চিরন্তন, লোভ ক'রো না; কাব্য-সাধনার এই মন্ত্র মহামূল্য। আসক্তি যাকে মাকড়সার মত জালে জড়ায় তাকে জীর্ণ ক'রে দেয়, তাতে গ্লানি আসে ক্লান্তি আনে। কেন না আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন ক'রে নিজের সীমার

মধ্যে বাঁধে—তার পরে তোলা ফুলের মত অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়। মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্য্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজে দণ্ডধারীদের কাছ থেকে। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী, রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেইখানেই তাঁর সত্যপ্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, লোভের কাছে তার স্থূল মাংস।

অনেকদিন থেকেই লিখে আসচি, জীবনের নানা পর্ব্বে নানা অবস্থায়। সুরু করেচি কাঁচা বয়সে—তখনও নিজেকে বুঝিনি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জ্জনীয় জিনিষ ভূরি ভূরি আছে, তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জ্জনা বাদ দিয়ে বাকী যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে আমি ভালবেসেচি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেচি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেচি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমি আবাল্যঅভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য-সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্ম্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেচি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েচি প্রসাদ। আমি এসেচি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্ব্বদেশ সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহঙ্কার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।

আমার যা-কিছু অকিঞ্চিৎকর তাকে অতিক্রম করেও যদি আমার চরিত্রের অন্তরতম প্রকৃতি ও সাধনা লেখায় প্রকাশ পেয়ে থাকে, আনন্দ দিয়ে থাকে, তবে তার পরিবর্ত্তে আমি প্রীতি কামনা করি আর কিছু নয়। এ কথা যেন জেনে যাই, অকৃত্রিম সৌহার্দ্য পেয়েচি সেই তাঁদের কাছে যাঁরা আমার সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও জেনেচেন সমস্ত জীবনে আমি কি চেয়েচি, কি পেয়েচি, কি দিয়েচি, আমার অপূর্ণ জীবনে অসমাপ্ত সাধনায় কি ইঙ্গিত আছে।

সাহিত্যে মানুষের অনুরাগ-সম্পদ সৃষ্টি করাই যদি কবির যথার্থ কাজ হয়, তবে এই দান গ্রহণ করতে গেলে প্রীতিরই প্রয়োজন। কেন-না প্রীতিই সমগ্র ক'রে দেখে। আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যে যাঁরা সম্মান পেয়েচেন তাঁদের রচনাকে আমরা সমগ্রভাবে দেখেই শ্রদ্ধা অনুভব করি। তাকে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছিদ্র সন্ধান বা ছিদ্র খনন করতে স্বভাবত প্রবৃত্তি হয় না। জগতে আজ পর্য্যন্ত অতি বড় সাহিত্যিক এমন কেউ জন্মাননি, অনুরাগবঞ্চিত পুরুষ চিত্ত নিয়ে যাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাকেও বিদ্রূপ করা, তার কদর্থ করা, তার প্রতি অশোভন মুখ-বিকৃতি করা, যে কোনো মানুষ না পারে। প্রীতির প্রসন্নতাই সেই সহজ ভূমিকা যার উপরে কবির সৃষ্টি সমগ্র হয়ে সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশমান হয়।

মর্ত্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠদান এই প্রীতি আমি পেয়েচি এ কথা প্রণামের সঙ্গে বলি। পেয়েচি পৃথিবীর অনেক বরণীয়দের হাত থেকে—তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা নয়, আমার নিবেদন ক'রে দিয়ে গেলেম। তাঁদের দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানবেরই স্পর্শ লেগেচে আমার ললাটে,—আমার যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা তাঁদের গ্রহণের যোগ্য হোক্।

আর আমার স্বদেশের লোক যাঁরা অতি-নিকটের অতি-পরিচয়ের অস্পষ্টতা ভেদ করেও আমাকে ভালবাসতে পেরেচেন, আজ এই অনুষ্ঠানে তাঁদেরই বহুযত্নরচিত অর্ঘ্য সজ্জিত। তাঁদের সেই ভালবাসা হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করি।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা।
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমিষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব-জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।
হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্জলিতে ঢাকি।

[illegible]ের সাথী, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুঃখের প্রীতি,
বিদায় বেলায় আজিও রহিল বাকী॥
যা-কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছিয়া রহিল পড়ে,
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের' পরে॥

গীত-উৎসব

গত ৯ই ও ১০ই পৌষ রজনীযোগে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে গীত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত সঙ্গীত-[illegible] মধ্য হইতে পরবর্ত্তী সঙ্গীত উৎসবে গীত হইয়াছিল। সঙ্গীতগুলির প্রথম চরণগুলি আমরা এখানে উদ্ধার করিলাম। বেদগান দ্বারা গীত-উৎসবের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন হয়।

প্রথম রজনী

"বয়েমি প্রস্তুরিব দৃতির্ন্ধাতে অগ্রিবঃ"
(বেদগানটীর প্রথম চরণ)

"যদি ঝড়ের মেঘের মত আমি ধাই চঞ্চল অন্তর,"
(রবীন্দ্রনাথ-কৃত বেদগানটীর অনুবাদ)

"ভুবনেশ্বর হে, মোচন কর বন্ধন সব, মোচন কর হে।"
"তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম,"
"হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে।"
"বিপুল তরঙ্গ রে সব গগন উদ্বেলিয়া"
"[illegible] মম কে আসিলে হে।"
"স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে,"
"[illegible]তীরে হে এসেছে নরনারী সুধারস-পিয়াসে।"
"[illegible]।"
"[illegible] তাঁহারে কোথা খুঁজিছ—"
"মোরে বারে বারে ফিরালে।"
"আজি মম মন চাহে জীবন-বন্ধুরে,"
"আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে,"
"এমন দিনে তা'রে বলা যায়,"
"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম।"
"আমারে কর তোমার বীণা, লহ গো লহ তুলে।"
"মরি লো মরি, আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে।"
"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে।"
"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।"
"বেদনা কি ভাষায় রে,"
"আমি কান পেতে রই ও আমার
আপন হৃদয় গহন দ্বারে।"
"বারে বারে পেয়েছি যে তারে,
চেনায় চেনায় অচেনারে।'
"শুষ্কপাতার সাজাই তরণী,"
"মনরে ওরে মন"
"চৈত্র পবনে মম চিত্ত-বনে"
"প্রখর তপন তাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে,
বায়ু করে হাহাকার।"
"আমার নয়ন ভুলানো এলে,"
"আ।জ বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।"
"নিবিড় ঘন আঁধারে জলিছে ধ্রুবতারা।"
"দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে হে।"
"কেন আমার পাগল করে যাস্"
"দে পড়ে দে আমায় তোরা"
"দিনগুলি মোর সোনার খাচায় রইল না।"
"আসা যাওয়ার মাঝখানে"
"দেশ দেশ নন্দিত করি' মন্দ্রিত তব ভেরী,"

দ্বিতীয় রজনী

"বাজাও তুমি কবি তোমার সঙ্গীত সুমধুর"
"মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে"
"যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে,"
"তোমায় আমায় এই বিরহের অন্তরালে,"
"মনোবাসনা পূর্ণ হলো, আজি মম পূর্ণ হলো"

শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথ যামিনীরে"
"আমার প্রাণের পরে চ'লে গেল কে,"
"তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, আমার সাধের সাধনা,"
"বাজিল কাহার বীণা মধুরস্বরে"
"সখি, আমারি দুয়ারে কেন আসিল"
"ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল ক'রেছ,"
"বড় বিস্ময় লাগে হেরি' তোমারে।"
"তুমি যেয়ো না এখনি।"
"অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী,"
"তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে"
"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে"
"জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।"
"আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয়"
"যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,"
"বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি,"
"ফিরবে না তা জানি,"
"তুমি একলা ঘরে বসে বসে কি সুর বাজালে"
"ঝরঝর বরিষে বারিধারা।"
"শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
আমলকির এই ডালে ডালে।"
"আকাশে আজ কোন চরণের আসা যাওয়া।"
"এই শরৎ-আলোর কমল বনে"
"তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চ'লে।"
"কান্না-হাসির দোল-দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা,"
"প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর,"
"কোন্ সুদূর হ'তে আমার মনোমাঝে"

---:*:---

রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ

শ্রীজলধর সেন

বিগত ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ সত্তর বৎসর অতিক্রম করেছেন।

কবির প্রতি আমাদের অসীম শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভক্তি নিবেদন করবার জন্য আমরা 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসবের আয়োজন করেছি। এ উৎসব শুধু বাংলা দেশের নয়, ভারতবর্ষের নয়—সমস্ত পৃথিবীর। কাঙ্গালের ঘরের কোহিনুর—যে আজ জগৎ-সভার উজ্জ্বলতম রত্ন! বিশ্বকবির চরণে আজ তাই নিখিল-ভক্তের শ্রদ্ধাঞ্জলি এসে পৌঁছেছে।

মহাকবির এই মহাপূজায় যোগ দেবার জন্য আমারও ডাক পড়েছে। আমার মত একজন জরাজীর্ণ অশক্ত বৃদ্ধ .ক অর্ঘ্য দিতে পারে, আমি কিছুই তা এতদিন ভেবে পাইনি।

এই ভাবনার কথা একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে বলতে তিনি বললেন, আপনার সহিত বিশ্ব-কবির অনেক দিনের পরিচয়; কতদিন কত ব্যাপারে আপনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে, কত বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে, সেই কথাগুলিই গুছিয়ে বলুন না।

বন্ধুবরের এ-কথা অবশ্য আমাকে মানতেই হবে যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার অসংখ্যবার সাক্ষাৎ হয়েছে। অসংখ্যবার যে আমি তাঁকে দেখেছি, এ-কথা অস্বীকার করতে পারব না। কিন্তু, সে ত' আজকার কথা নয়—সত্তর বছরের কথাও নয়;—কালজয়ী কবির আয়ু কি বৎসর দিয়ে গণনা করা যায়? সে যে অগণিত যুগ-যুগান্তরের কথা—শত সহস্র বৎসরের কথা। বারে বারে—কালে কালে এই কবির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু, সে কথা ত' গুছিয়ে বলবার আমার শক্তি-সামর্থ্য নেই—সে সাধনাও যে আমার নেই।

সে কোন্ স্মরণাতীত যুগে—কোন্ সত্যকালে, এই আর্য্যভূমির ব্রহ্মাবর্ত্তে, কোন্ পুণ্যতোয়া সরস্বতী-দৃষদ্বতীর পবিত্র তীরে শান্তরসাস্পদ তপোবনে, কোন্ দেবদত্ত মহা-

[illegible] জগতের অধিবাসীকে অভয়কণ্ঠে ডেকে [illegible]—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—

সেই আত্মজ্ঞ ত্রিকালজ্ঞ তত্ত্বদর্শীদের মধ্যে আমি সেদিন বরেণ্য রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

সেই যে কবে, কোন্ আরণ্যকের স্নিগ্ধ-ছায়াচ্ছন্ন যজ্ঞবেদী-মূলে সমবেত মহর্ষিবৃন্দ গগন-পবন মুখরিত ক'রে উদাত্ত-কণ্ঠে সামগান করেছিলেন, সেই অসামান্য গায়কমণ্ডলে আমি সেদিন সুকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

যে পুণ্যশ্লোক আর্য্যঋষিগণ গম্ভীরকণ্ঠে জগতে অতুলনীয় বেদমন্ত্র উচ্চারণ ক'রে পবিত্র হোমানলে অগ্নি-দেবতাকে যজ্ঞাহুতি দিতেন, আমি সেই মন্ত্রদ্রষ্টাদের মধ্যে ঋত্বিক্ রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম।

যে ব্রহ্মবিৎ তাপস-সংহতি একদিন সেই মহতো মহীয়ান্ সর্ব্বশক্তিমানের উদ্দেশে নতজানু হ'য়ে যুক্তকরে প্রার্থনা করেছিলেন—

"অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়"—

সেই নিত্যমুক্ত শুদ্ধস্বভাব পরমোপাসকদের মধ্যে আমি সাধক রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম—তাঁর মধুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম।

সেই যে কোন্ দূরগত দিনে, নৈমিষারণ্যে এক মহতী পরিষদের অধিবেশন হয়েছিল, সেই পবিত্র স্থানে সমবেত মহাপুরুষগণের মধ্যে আমি জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানমূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম—তাঁর অভয়-বাণী শুনতে পেয়েছিলাম।

তারপর, তাঁকে দেখেছি ব্যাধবাণাহত ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে তমসাতীরে অশ্রু-বিসর্জ্জন করতে; তাঁকে দেখেছি [illegible]-বিহারে বৌদ্ধসঙ্ঘে শ্রীভগবান শ্রমণ গৌতমের পার্শ্বে [illegible] রূপে; তাঁকে দেখেছি উজ্জয়িনীর রাজসভায় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন মণ্ডলে। এমনিতর শত সহস্র স্থানে, শত সহস্র রূপে, শত সহস্র বেশে, শত সহস্র বার আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি। বারেবারেই এই মহাপুরুষকে চিনতে পেরে আমার সভক্তি প্রণতি জানিয়েছি—সে যে অনেক কথা। এই স্রষ্টা, দ্রষ্টা, অদ্বিতীয় মহামানবের সঙ্গে আমার সে অনন্ত পরিচয় কেমন ক'রে আমি গুছিয়ে লিপিবদ্ধ করব?

এবারকার এই সত্তর বছরের মধ্যেও সেই যুগ-যুগান্তরের রবীন্দ্রনাথকে যে আমি দেখেছি, কখন রাজবেশে, কখন ফকিরের আঙরাখায়, কখন বাউলের আলখাল্লাপরা একতারা-হাতে নৃত্য করতে, কখন আত্মভোলা কবির বেশে, কখন জ্ঞানবৃদ্ধ তত্ত্বদর্শীর মূর্ত্তিতে। কখন দেখেছি স্বদেশের সুখ-দুঃখে কাতর মানুষের মত, কখন দেখেছি সর্ব্ব-মায়া-মুক্ত, সকল বন্ধন-বিমুক্ত উদাসী ঋষির মত।

আজকের এই সত্তর বছরের রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ-বর্ণনা করতে ব'সে আমি যে দেখতে পাচ্ছি সেই যুগ-যুগান্তরের মহাপুরুষকে—যিনি মৃত্যুঞ্জয়, আপনার অবিনশ্বর কীর্ত্তির চেয়েও যিনি মহৎ, যিনি লোকে লোকে চির-পূজিত। এই রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সম্যক্ বিশ্লেষণ আমার কাছে তাই অসম্ভব ব'লেই মনে হয়। সত্তর বছর দিয়ে কি তার পরিমাপ করা যায়, যা' সত্তর শতাব্দী ব'লেও শেষ করা যাবে না? রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিতে যাঁরা সাহস ও স্পর্দ্ধা রাখেন তাঁরা সে-কাজের ভার নিন্—আমার সে-শক্তি নেই—আমি সে সাধনা করিনি।

আমাদের এই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দেশ-বিদেশের বহু মনীষীর লেখা অনেক প্রবন্ধ আমি পড়েছি; কবির কথা নিয়ে রচিত দু'চারিখানি পুস্তকের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছে; কিন্তু প্রত্যেকটী পড়্বার পর আমার অজ্ঞাতসারেই আমার মুখ দিয়ে যেন বেরিয়েছে—হল না—হল না,—"ইহ বাহ্য, আরও কহ।" রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ নির্ণয় করা এত সহজসাধ্য নয়।

হয়ত এই 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসবে কবির উদ্দেশে রচিত বিশ্বের বন্দনা শুনেও আমাকে বলতে হবে—

"ইহ বাহ্য, আরও কহ।" *

---

* রবীন্দ্র-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

জয়ন্তী

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্তরে মাধুরীলক্ষ্মী, কণ্ঠে তব মহাসরস্বতী,
ধূলির আসনে বসি' গাহিতেছ ভূমার আরতি ;
সোনার বাঁশীতে বাজে সুন্দরের জয়ধ্বনি গান,
রচিয়াছ রসমূর্ত্তি, মহিমার পেয়েছ সন্ধান।

ললাট প্রদীপ্ত তব কি অপূর্ব্ব মোতির তিলকে,
কি রহস্য প্রতিভাত আলোকের অতীত আলোকে ;
বাণীর বাহিনী তব বসুন্ধরা করে প্রদক্ষিণ,
উজ্জীবন-মন্ত্র সুরে ঝঙ্কারিছ কি উদাত্ত বীণ্।

চিরন্তন সত্য শিব,—সেই কাব্য, অমৃত-প্রাশন,
উপহার-ডালি ভরি' নানা দেশে কর বিতরণ;
নানা ভাবে বিকসিত তোমার মানসপদ্মমালা
কেশরে পরাগে তার স্বর্গের কুসুমরেণু ঢালা।

যেই অ-বিনাশী প্রাণ তরু-তৃণে, মাটিতে-আকাশে
আনন্দের আলিম্পনে ঋতুর উৎসবে ফিরে আসে,
অসীম—অ-পরিমাণ সেই প্রাণ, তারি স্পর্শ লভি'
ভারতের পুণ্য-ক্ষেত্রে উদিয়াছ তুমি মহাকবি।*

* রবীন্দ্র-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

——:*:——

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

যে জাতিতে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন সে জাতি ধন্য। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর বয়সের জন্য তাঁকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে আমরা নিজেদের জগতের কাছে প্রশংসিত করেছি। অনেকবার তাঁকে এর আগে আমরা অভিনন্দিত করেছি, আরও অনেকবার করব এ আশা রাখি।

বিদেশ থেকে সাহিত্যের জন্যে পুরস্কৃত হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্‌লা ভাষাকে তাদের কাছে গণ্য করেছেন এবং তাঁর প্রতি তাদের শ্রদ্ধান্বিত অনুরাগ জেগেছে—আমাদের কাছে তার খুব বেশী দাম নেই। যারা পেয়েছে যৎকিঞ্চিৎ, তাদের স্বাভাবিক গুণগ্রাহিতার বলে তাকেই তারা বড় করে দেখেছে—তাতেই তারা মুগ্ধ হয়েছে।

আজকের বাঙ্‌লা ভাষাকে তৈরী করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙ্‌লা ভাষাকে তৈরী না করলেও সব দিক দিয়ে, তার সকল বিভাগে যে [illegible] [illegible] শক্তি ও সম্পদ পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য নিয়ে দেখা দিয়েছে তার উৎস একা রবীন্দ্রনাথ। শুধু তাঁরই প্রভাবে এর এমন অভাবনীয় পরিণতি ঘটেছে। যেখানে তিনি হাত দিয়েছেন তাঁর স্পর্শের ইন্দ্রজালে সেখানেই সোণা ফলেছে। ছবি আঁকবার জন্যে তিনি তুলি ধরে—চিত্রকলায় পৃথিবীর বহু ওস্তাদ ছবির সমজ্‌দারকে বিস্মিত—চমকিত করেছেন। তারা তাঁর আঁকা ছবিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্য্যাদা দিয়েছেন। অনেকবার একথা বলেছি, আবার বল্‌ছি যে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এমন উদাহরণ দ্বিতীয় নেই। আমরা অনেক পূর্বজন্মে পুণ্য করেছিলাম—রবীন্দ্রনাথকে আমাদের বলে দাবী করতে পারছি। শরৎচন্দ্র যথার্থই বলেছেন, ভবিষ্যতে যারা আসবে তারা রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়বার সৌভাগ্য লাভ করবে কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দেখেছে, তাঁর [illegible] তাঁর কাছে যেতে পেয়েছে এমন গর্ব তারা [illegible]

পারে...... দাবীর কেবল তাঁরাই অধিকারী হ'য়ে ......অনেকে বলছেন এমন সময় রবীন্দ্র-জয়ন্তী হওয়া উচিত ছিল না—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুগীতোৎসবের আয়োজন করা উচিত ছিল না। মতভেদ জগতে হ'তে পারে, হ'য়েই থাকে; কিন্তু সবচেয়ে দুঃখ হয় তাদের উক্তিতে, যাঁরা এমন ইঙ্গিত করেন যে, দেশের বিষয়ে যেন রবীন্দ্রনাথ উদাসীন। রবীন্দ্রনাথ কি দেশকে ভালবাসেন না, রবীন্দ্রনাথ কি দেশের জন্যে কারুর চেয়ে কম কিছু করেছেন, দেশের বর্ত্তমান দুঃসময়েও কি তাঁর বাণী তাঁর রচনা, তাঁর ভাবনা অন্যায় প্রধিকারকে তীক্ষ্ণতায় বিদ্ধ করেনি? কিন্তু তিনি প্রধানতঃ কবি—কবির স্বভাব তিনি ছাড়বেন কি করে! সকলে সব সময়ে শুধু একদিক দিয়েই, শুধু একটী মাত্র ব্যাপার অবলম্বন করেই দেশের মুখ চাইবে না তো। দেশের কি আনন্দ পেতে হবেনা রসের দিক থেকে তার কি হৃদয়ের কোন আকাঙ্ক্ষাই থাকবে না? সে আনন্দ, সে আকাঙ্ক্ষা দুঃখের পাশে পাশেই চলবে, দুঃখের তীব্রতাকে মোলায়েম করবার জন্যে তারও যে দরকার। তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি :—

'শুনেচো অলিমালা, ওরা বড় ধিক্কার দিচ্ছে, ঐ ও পাড়ার মন্ত্রের দল, উৎসবে তোমাদের চাপল্য ওদের ভালো লাগ্‌চেনা। শৈবালপুঞ্জিত গুহাদ্বারে কালো কালো শিলাখণ্ডের মতো তামস্রগহণ গাম্ভীর্য্যে ওরা নিশ্চল হয়ে ভ্রূকুটি করচে, নির্ঝরিণী ওদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে এই আনন্দময় বিশ্বের আনন্দ-প্রবাহ দিকে দিগন্তে বইয়ে দিতে, নাচে গানে কল্লোলে হিল্লোলে কলহাস্যে;—সূর্য্যের আলো উদ্বেল তরঙ্গভঙ্গের ছন্দে ছন্দে বিকীর্ণ করে দিতে। এই আনন্দ-আবেগের অন্তরে অন্তরে যে অক্ষয় পৌরুষের অনুপ্রেরণা আছে, সেটা ওদের শাস্ত্রবচনের ...... দিয়ে চ'লে গেল। ভয় ক'রোনা তোমরা; ...... নিমন্ত্রণে তোমরা এসেচো, তাঁর প্রসন্নতা ...... আমাদের নিকুঞ্জে অন্তঃস্থিত গন্ধরাজ মুকুলের ......, তেমনি নামুক তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে, ... উৎসবে। সেই যিনি ...... তাঁর ...... নৃত্যের অর্ঘ্য নিবেন ......

রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে বিরুদ্ধমতবাদী আছেন এবং থাক্‌বেন। থাকাই তো স্বাভাবিক। পৃথিবীর সকলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছে এমন ব্যাপার বা এমন মানুষ ছিলনা—নেই—থাকবে না। বিরুদ্ধ মত যাঁদের, তাঁদের যুক্তিও সম্মানযোগ্য যতক্ষণ তা বিদ্বেষবিষে কলুষিত, শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বা ইতর না হয়—যতক্ষণ তা রবীন্দ্রনাথের রচনার সমালোচনা হয়, রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তির নয়।

রবীন্দ্রনাথকে যারা ভালবাসেন না, রবীন্দ্রনাথের কাছে যাবার কোন তাগাদা তাঁদের নেই, কিন্তু তাঁকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের অনেকেও তাঁর কাছে যেতে পান না এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। অভিযোগ সত্য হ'লে খুবই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু মনকে এই ব'লে তাঁদের প্রবোধ দিতে হ'বে যে, তাঁদের চেয়ে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে বেশী ভালবাসেন বলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, সেই সব ব্যক্তিদেরই ভাগ্য ভাল—বা এমনও মনে করা যেতে পারে যে যারা ভালবাসা দেখায়, প্রচার করে বা নানা উপায়ে প্রকাশ করবার কৌশল আয়ত্ত ক'রেছে, তাদেরই হয় জয়জয়কার, যারা সত্যি ভালবাসে কিন্তু তার ঢাক পিটায় না বা বিজ্ঞাপন দিতে জানে না তারাই হয় বঞ্চিত। জোর যারা করতে পারে তাদেরই দিন আজ, যারা বিরক্ত করেনা 'এপ্রপ্রিয়েট' করে না তাদের পিছনেই প'ড়ে থাকতে হ'বে, ভালবাসার বিষয়েও এমন হ'লে সেটা অঘটন, কিন্তু যদি হয় তো উপায় কি?

কলিকাতা পৌর-সভার অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তারই প্রতিধ্বনি করে বলি 'এই পুরসভা আমার জন্মনগরীকে আরামে আরোগ্যে আত্মসম্মানে চরিতার্থ করুক, ইহার প্রবর্ত্তনে চিত্রে, স্থাপত্যে, গীতকলায়, শিল্পে এখানকার লোকালয় নন্দিত হউক, সর্ব্বপ্রকার মলিনতার সঙ্গে সঙ্গে অশিক্ষার কলঙ্ক এই নগরী ক্ষালন করিয়া দিক,—পুরবাসীদের দেহে শক্তি আসুক, গৃহে অন্ন, মনে উদ্যম, পৌরকল্যাণ-সাধনে আনন্দিত উৎসাহ হোক। ভ্রাতৃবিরোধের বিষাক্ত আত্মহিংসার পাপ ইহাকে কলুষিত না করুক—শুভবুদ্ধি যাহা এখানকার সকল জাতি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া এই নগরীকে ...... অবিচলিত করিয়া রাখুক. এই আমি ......

যাত্রা-পথে

(গল্প)

শ্রীমনোজ গুপ্ত

(১)

খতেন ছেলেটা ভারি অদ্ভুত। মেশে সে অনেকের সঙ্গে, কিন্তু বন্ধুত্ব ছিল খুব অল্প লোকের সঙ্গে। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলত, "খতেনের সব চেয়ে বন্ধু হচ্ছে 'সিনেমা।' সে নিজেও একথা বড় অস্বীকার করত না। সিনেমা দেখা তার নিত্য চা খাওয়ার মতই স্বাভাবিক হ'য়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম তার আত্মীয়-স্বজন আর পরিচিত লোক অনেকেই তাকে বারণ করেছিলেন, কিন্তু সে তা হেসে উড়িয়ে দিত। চশমার 'পাওয়ার'ও বেড়ে চলেছিল, কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করবার তার মোটেই সময় ছিল না। অবশ্য পড়তে তার কোন আপত্তি ছিল না, আর সে পড়তও ভাল। তা না হ'লে কি আর 'মেডিকেল কলেজে' বরাবর রীতিমত পাস করে যেতে পারে? লেখাপড়া কিছু করত বলেই তার বিপক্ষে বাড়ীতে বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা উঠ্‌ত না কিন্তু তার প্রতি সন্তুষ্ট কেউই বড় ছিল না, কারণ তাকে যদি বলা হ'ত, পুব দিকে যেতে সে তা হলে পশ্চিম দিকে যাবেই যাবে। এতে সব চেয়ে আঘাত পেতেন তার মা। সে যে বুঝতে পারত না তা নয়, তবে বুঝতে পেরেও কিছু করে উঠতে পারত না। এটা তার এখনই অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিল। এ হেন খতেন যখন এলাহাবাদ থেকে প্রণতির এক আহ্বান আসতেই যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল, তখন্ তার পরিচিত বা অল্প পরিচিত সকলের কাছেই এ খবরটা গিয়ে পৌঁছল; আর সকলেই বেশ আশ্চর্য্য হ'য়েছিল, কারণ এটা ছিল তার স্বভাব-বিরুদ্ধ! তার মা একটু দুঃখ করেই বললেন, "কোথাকার কে প্রণতি ডাকতে ছেলে একেবারে এলাহাবাদে চললেন, আর আমরা যদি একবার শ্যামবাজার যেতে বলি তা হ'লে ছেলের পড়ার ক্ষতি হয়। ধন্যি ছেলে!" বাস্তবিক কারুর কথা শোনা তার যেন ধাতসহ ছিল না। যে কোন কথাতেই সে গোড়ায় না বলে বসে, তাই সে যখন এক ডাকে প্রণতির কাছে ছুটল তখন সকলেই আশ্চর্য্য হ'য়েছিল।

প্রণতির কাছে খতেন ছিল আর এক রকমের মানুষ। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একেবারে ভাল মানুষ হ'য়ে যেত—যেন কত বাধ্য লক্ষ্মী ছেলেটী! কোন মেয়ের কাছে সে যে এত শান্ত হ'য়ে যাবে তা সে ভাবতেও পারে নি। সত্যি, মেয়েদের দেখলেই তার কেমন একটা আক্রোশ হ'ত যে, সে আঘাত না করে থাকতে পারত না। আঘাত করে সে মনে করত সে যাকে আঘাত করলে সে তার কাছে আর আসবে না, কিন্তু তা হ'ত না—আর হ'ত না বলেই তার আক্রোশ আরও বেড়ে যেত। কেবল প্রণতির বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ত।

(২)

প্রণতির সঙ্গে তার পরিচয় হ'য়েছিল এক অদ্ভুত রকমে। সে দিন ছিল তার স্পেশাল ডিউটী (বিশেষ কাজের পালা), ঘরে গিয়ে দেখে একটী বছর পাঁচেকের ছেলে—তার হ'য়েছে ডিপথেরিয়া। তার পাশেই বসেছিল প্রণতি। একবার ছেলেটাকে দেখে নিয়ে খতেন নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। মাঝ রাতে যাদের 'ডিউটি' (কাজ) পড়ে—বিশেষতঃ এই সব রোগের কাছে, তাদের অবস্থা কি ভয়ানক! ঘুম থেকে উঠে এসেছে—চোখ তখনও ঘুমে ভেঙে পড়ছে, অথচ এক মুহূর্ত্ত অন্যমনস্ক হ'বার উপায় নেই। ছেলেটার গলায় দুটো 'টিউব' (রৌপ্যের নল) দেওয়া আছে—একটার মধ্যে আর একটা। ছেলেদের কাজ হচ্ছে ভেতরকার 'টাউব'টা পালক দিয়ে পরিষ্কার করা। যদি পালক না দেওয়া যায় তা হ'লে কোন হাউস-সার্জেনকে ডেকে পাঠাতে হ'বে। খতেন বহুবার উঠে 'টাউব' পরিষ্কার করে দিলে—বেশ সহজ অবস্থায় ছেলেটা ছিল। হঠাৎ প্রণতি তাকে ডেকে বললে, "কি রকম করছে দেখুন!" খতেন উঠে গিয়ে দেখলে একেবারে নীল হ'য়ে উঠেছে—আর পালক চলে না। কোন দিক্ না ভেবে সে 'ইনার' (ভিতরকার) 'টাউব'টা টেনে বার করে দিলে। ছেলেদেরই এ বিষয় কিছু জানা ছিল না। [illegible]

হয়তো [illegible] থাকে, কিন্তু কি রকম করে যে বার করতে হয় তা জানে না। 'টাউব'টা বার করে দিতে ছেলেটা সুস্থ হ'ল বটে, কিন্তু খতেনের বেজায় ভয় হ'য়ে গেল। টাউব বার করবার তো তাদের কোন অধিকার নেই। সে 'হাউস ফিজিসিয়ানকে' ডেকে পাঠালে। তিনি এসে বললেন, "বাঃ, এত বেশ রয়েছে, তুমি আমায় ডাক্‌লে কেন?"

"আর একটা অন্যায় করেছি। ছেলেটার দম আটকে যায় দেখে ভিতরকার টাউবটা খুলে দিয়েছি।"

"বল কি? প্রিন্সিপাল জানতে পারলে—"

প্রণতি বললে, "উনি যদি তখন এই সামান্য অন্যায়টা না করতেন তা হ'লে একে বাঁচান সম্ভব হ'ত না। তখন যে অবস্থা হ'য়েছিল তাতে আপনাদের কারুকে ডেকে আনবার আগেই আপনাদের আসবার দরকার ফুরিয়ে যেত।"

"বড় লাভের জন্যে ছোট ক্ষতি সব সময় স্বীকার করে নেওয়া যায় কি বল খতেন? হাউস ফিজিসিয়ান চলে গেলে প্রণতি বললে, "তুমি ভাই আজ যে উপকার করলে—"

"ভাই বলেই যদি মেনে নেন তা হ'লে আর উপকার করার কথা বলছেন কেন?"

"এটা কি শুধু কথার কথা না সত্যি বল্‌ছ?"

"সে কথা তো আপনাকেও জিজ্ঞেস করতে পারি।"

"আচ্ছা যে ক'দিন এখানে থাকব তার মধ্যেই বুঝতে পারা যাবে।"

(৩)

হাসপাতাল থেকে চ'লে যাবার সময় প্রণতি খতেনকে অনুরোধ করেছিল তার বাড়ী যাবার জন্যে। অন্য কেউ এ কথা বললে খতেন হেসেই উড়িয়ে দিত, কিন্তু প্রণতির কাছে তা পারে নি। প্রণতিদের বাড়ী গিয়ে সে অবাক্ হ'য়ে গেল—প্রণতি আর তার ভাই ছাড়া তার আপনার বলতে আর কেউ ছিল না। প্রণতি বুঝতে পেরেই বললে, "আমাদের একা থাকতে দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়েছ না? [illegible] যে কি ভাবে কেটেছে তা কি বলব! এলাহাবাদে [illegible] এক [illegible] পেলাম যে মা'র অবস্থা খুবই খারাপ— [illegible] ছুটী পেলেন না তাই একাই [illegible]

"এলাহাবাদ থেকে একা এলেন?"

"তা এলাম বৈ কি? আমি তো ভাই গোঁড়া হিন্দুর ঘরের মেয়ে নই; আমাদের মাঝে মাঝে এ রকম করবার দরকার হয়। যদি না আসতাম তা হ'লে কি হ'ত বলতো? যেদিন এলাম, সেই দিনই মা মারা গেলেন। ভাইটাকে নিয়ে ফিরে যাব ভাবছি এমন সময় ওর হ'ল 'ডিপাথরিয়া'; এই যদি গাড়ীতে হ'ত তা হ'লে কি বিপদেই পড়তাম বল তো?"

"শ্বশুর বাড়িতে আপনার এমন কেউ নেই যে এই বিপদের সময় সঙ্গে আসতে পারের?"

"আছে সবাই, কিন্তু আমাদের সাহায্য কররার কেউ নেই। আমার স্বামী হিন্দুর ছেলে, খৃষ্টান হ'য়ে আমায় বিয়ে করেছেন কি না!"

"আপনার স্বামী কি করেন?"

"সেখানকার কলেজে অধ্যাপনা করেন।"

"আপনি তা'হলে নিশীথদার—"

"তুমি তাঁকে জান?"

"হাঁ জানি,—আপনার চেয়ে বোধ হয় ঢের আগে থেকেই জানি। তা হ'লে তো আপনাকে দিদি বলা চলে না, বৌদি' বলতে হয়!"

"না ভাই, যে সম্পর্ক অজান্‌তে হ'য়ে গেছে সেটাই ভাল—বৌদি বললেই পুরোন কথা সব মনে পড়ে যাবে। তিনি আমায় বিয়ে করে শুধু যে জাত হারালেন তা নয়, সেই সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ থেকেও বঞ্চিত হ'লেন।"

"স্নেহ থেকে বঞ্চিত হ'য়েছেন তা ঠিক বলা চলে না। কঠোরতাটা হয়তো তাদের বাইরের খোলস হ'তে পারে—সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে অনেক সময় মানুষকে নিজের সঙ্গেও প্রতারণা করতে হয়।"

"এ কিন্তু ভাই ভারী অন্যায়! ধর্ম্ম বদলে গেলেই কি ভালবাসার বন্ধন ছিঁড়ে যায়, না তা ইচ্ছে করলেই ছিঁড়ে ফেলা যায়? মনের স্বাভাবিক বন্ধনের মাঝে মানুষের হাতে গড়া কৃত্রিম ব্যবধান কি টিঁকতে পারে না তা গড়তে যাওয়া উচিত?"

"স্নেহ কি সত্যই কমতে পারে? ও শুধু [illegible] ভয়ে লোকের চোখে ধুলো দেওয়া [illegible] [illegible]"

(৪)

এলাহাবাদে ফিরে যাবার আগে প্রণতির কাছে ঋতেনকে প্রতিজ্ঞা করতে হ'ল যে, সময় পেলে সে প্রথমেই যাবে এলাহাবাদে।

ঋতেন শুধু কথাই দেয় নি, প্রণতি চলে যাবার পর সে রোজই তার কথা ভাবত, আর ভাবত কবে তার ডাক আসবে, তাই সে ডাক যেদিন এল, সে দিন আর সে ভাববার অবসর পেল না, একেবারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে গেল।

প্রণতির পরিচয় সে বাড়ীতে কারুকে দেয় নি, আর সে যে নিশীথদের বাড়ী যাবে একথা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি, তাই তার পক্ষে যাওয়াটা খুবই সহজ হ'য়ে গিয়েছিল।

প্রণতির চিঠি পেয়ে পর্য্যন্ত অনেক কথাই তার মনে হচ্ছিল। নিশীথ তাকে দেখে কি বলবে, প্রণতি তাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করবে ইত্যাদি। এলাহাবাদে সে গিয়েছে অল্পদিন আগেও—নিশীথের বিয়ের আগে পর্য্যন্ত; তবু মনে হচ্ছে যেন কত দিন সে যায় নি।

খুব আনন্দের সঙ্গে সে নিশীথের বাড়ীর কাছে এগিয়ে চলেছিল, দূর থেকে নিশীথকে সে দেখতে পেলে, কিন্তু সে তাকে দেখে যে খুব সন্তুষ্ট হয়েছে তা তার মনে হ'ল না। সে ভারি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। এতো সে ধারণাও করতে পারে নি। নিশীথ বললে—"এসেছিস্! আয়!"

প্রণতির সঙ্গে দেখা হ'তে বললে, "ব্যাপার কি বলুন তো?"

"কেন?"

"এতদিন পরে এলাম তা নিশীথ-দা ভাল করে কথাই কইলেন না! নাঃ; এসে তো তাহলে ভাল করি নি!"

"হাঁ, আজকাল উনি একটু বেশী গম্ভীর হ'য়ে গেছেন। তা হ'লেও তুমি তো আর ওঁর ডাকে আস নি, এসেছ আমার কাছে। বোনের কাছে ভাই এসেছে, তাতে আর একজন যদি কথা নাই কয় তাতে ক্ষতি কি?"

(৫)

দিন গুলো যে কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছিল তা ঋতেন মোটেই বুঝে উঠতে পারলে না। কলেজের পড়ার সময় তো দিনগুলো এত সহজে কাটে না! তখন মনে হয় পৃথিবী এত বৃদ্ধা হ'য়েছে যে সে আর এক-টানা চলতে পারে না, তাই বোধ হয় একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। লেখা-পড়ার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাই, কোন বিশেষ কাজ তার ছিল না। দিনের মধ্যে অনেকটা সময়ই সে ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিত, আর বাকি সময়টা কেটে যেত প্রণতির সঙ্গে গল্প করে। যে ঋতেন মেয়েদের দেখলে ঠাট্টা করবার লোভ কোনদিন সংবরণ করতে পারত না, সে যে হঠাৎ প্রণতির সঙ্গে এত সহজ ভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারবে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ঋতেন বলত সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরেছে তার কথা, আর প্রণতি বলত তার ছোট বেলাকার কথা। রোজই প্রায় এই প্রসঙ্গতেই আলোচনা চলত, কিন্তু তাতে তাদের আনন্দের কোন ব্যাঘাত হ'ত না।

নিশীথের সঙ্গে ঋতেনের দেখা হ'ত অল্পই। কলেজের কাজ তার বেশীক্ষণ করতে হয় না, তবু বাড়ীতে তার দেখা পাওয়া যেত না—জিজ্ঞেস করলে বলত "অনেক কাজ আছে।" কাজ যে এত কি তা ঋতেন তো বুঝতই না, প্রণতিও বোধ হয় জানত না। একদিন ঋতেন বললে, "আচ্ছা নিশীথদা আগে তোমার কাছে এলে তুমি আমায় একা থাকতে দিত না, আর এবার তোমার দেখাই পাওয়া যায় না! কি হ'য়েছে বলত?"

"তখন ছিলাম মানুষ, এখন এসে দাঁড়িয়েছি ঠিক মানুষ ও পরবর্ত্তী জীববিশেষের ব্যবধানের রেখায়, আর দুদিন পরে হয় তো আমায় সাধারণ লোকের মধ্যেই খুঁজে পাবি না।"

"সেই ভয়ই করছি, কিন্তু কারণ কি বল তো?"

"জলে ডোববার সময় লোকে যে কাঠে ভর দিয়ে চলে সেটা যদি হঠাৎ ফোঁপ্‌রা হয়ে ডুবে যায় তা হ'লে কি আর ভাসা চলে?"

ঋতেন এ কথার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝে উঠতে পারলে না।

কোন ... করবার আগেই নিশীথ চলে গেল, কারণ প্রণতি এসে দাঁড়িয়েছিল।

ঋতেন তার মুখের দিকে চাইতেই প্রণতি বললে, "বুঝতে পারলে না? ভেবেছিলাম তোমায় একদিন বলব, কিন্তু পেরে উঠি নি। আজ কথাটা যখন উঠল তখন বলি! আমায় বিয়ে করে তোমার দাদা একটুও সুখী হন নি। বিয়ের আগে ভেবেছিলাম তাঁকে সুখী করতে পারব, কিন্তু আজও তা পেরে উঠলাম না! যে বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে আমায় বিয়ে করেছিলেন, সে বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল হয়েছে! তাকে দৃঢ় করতে যত বেশী চেষ্টা করি, সেটা তত বেশী শ্লথ হয়ে যায়।

ঋতেন বুঝলে ঝড় উঠবে, আর সে ঝড়ে বোধ হয় এদের এ নূতন সুখের নীড়টা অটুট থাকবে না। এ সব কথা ভাববার কোন দিন সে অবসর পায় নি—তাই আজ যখন তার সামনে এসে কাল বৈশাখীর অগ্রদূত ছোট মেঘটা দেখা দিল, তখন সে বেশ বিরস হ'য়ে উঠল। এর চেয়ে যে প্রণতিকে না জানা ছিল ভাল! তাই কি?

(৬)

দুঃখের সঙ্গে ঋতেনের বড় বেশী পরিচয় ছিল না, তাই এত বড় একটা দুঃখের ছায়াপাত হ'তে দেখে প্রথমে সে একটু চমকে উঠেছিল। ভাবলে, ভেবে কিছু ঠিক করে উঠতে পারলে না। বিরক্ত হ'য়ে প্রণতিকে বললে, "চলুন বেড়িয়ে আসা যাক্"

সন্ধ্যার পর তারা বেড়িয়ে ফিরছিল গল্প করতে করতে। মেঘটা যেন অনেকটা হাল্‌কা হ'য়ে এসেছিল। হঠাৎ প্রণতি চলতে চলতে দাঁড়াল। সে যে দিকে চেয়েছিল, সেদিকে চেয়ে ঋতেন বললে, "নিশীথদা না? সঙ্গে কে বলুন তো?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রণতি বললে, "চল ভাই তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যাই; ঘরের কাজ করতে হবে তো!"

তার প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে ঋতেন একটু আশ্চর্য্য হ'য়েছিল। প্রণতির মুখের দিকে চেয়ে সে বেশ বুঝলে যে সে তাকে এড়াবার চেষ্টা করছে! কেন, তার কথার জবাব এখনও দিল না? শুনতে না পেয়ে? না অন্য কোন কারণে ... হ'ল।

রোজ বেড়িয়ে ফেরবার সময় পোষ্ট মাষ্টারের বাড়ী হ'য়ে, ঋতেন ফিরত। তার চিঠি আসত 'কেয়ার অব পোষ্ট মাষ্টার' বলে; পাছে কেউ জানতে পারে সে নিশীথদের বাড়ী আছে তাই সে এই পথ ধরেছিল। আজ প্রণতি সঙ্গে ছিল বলে আর পোষ্ট অফিসে যাওয়া হল না। সন্ধ্যার পর তার চিঠি দিয়ে গেল একটা চাকর। চিঠি দিয়েছেন তার বাবা, আর তাকে পরদিনই ফিরে যেতে লিখেছেন—বিশেষ কাজ আছে। এমন কি কাজ থাকতে পারে সে ভেবেই পেলে না। এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে হ'বে বলে তার খুব দুঃখ হচ্ছিল।

কথাটা জান্‌তে পেরে প্রণতি বললে, "তোমায় ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না ভাই, কিন্তু কি করব? তুমি চলে যাবার পর আর কিছু ভাল লাগবে না ভাই।"

ঋতেন ঠাট্টা করে বললে, "চলে গেলে আর মনেও পড়বে না।"

"অনেক কাজের মধ্যে তুমি হয় তো আমার কথা মনে না করতে পার, কিন্তু আমি এত অবসরের মধ্যে মনে না করে তো থাক্‌তে পারব না।"

(৭)

আশ্চর্য্য অনেকে অনেক রকমে হয়, কিন্তু ঋতেনের মত বোধ হয় কেউ কোনদিন হয় নি। বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতেই ছোট ভাই ছুটে এসে খবর দিলে, "দাদা, তোমার বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে গেছে। বাবা বলেছেন আমাদের মাষ্টার ছাড়িয়ে দেবেন, বৌদি এসে পড়াবে।" এতবড় সুখবরের বদলে হঠাৎ কাণমলা খেয়ে বেচারা বেজায় চটে গেল; কিন্তু ঋতেনের হ'ল ভারি বিড়ম্বনা! এসব কথা আজ পর্য্যন্ত সে তো কোনদিন ভেবে দেখবার অবসর পায় নি! বিয়ে করবে? তাও কি সম্ভব? সকলে করছে বলেই তাকে করতে হ'বে? কিন্তু না করেই বা উপায় কি? বাবা যদি হুকুম করেন তাহলে কি সেটা অমান্য করা উচিত হ'বে? কি করা যায় তা ভেবে ঠিক করবার আগেই তার বাপের কাছ থেকে ডাক এল।

বাবার কাছে যেতে যেতে তার মনে হ'ল তার ... অনেকেরই তো বিয়ে হ'য়েছে, তারা কি ...

বাপের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি বললেন, "তোমার এত তাড়াতাড়ি বিয়ে এসেছি কেন তা বোধ হয় তুমি পল্টুর কাছে শুনেছ। এতে তোমার কিছু বলবার নাই?"

ঋতেন কোনদিন তার বাপের মুখের ওপর কথা কয় নি। আজ তার কি হ'ল হঠাৎ বলে ফেললে, "এখন বিয়ে করা কি ঠিক হ'বে?"

"না হ'বেই বা কেন?"

"আমার এখনও পড়া শেষ হয় নি।

"তা আমি জানি।"

"নিজে দাঁড়াতে না পেরে আর একজনের ভার নেওয়া কি—"

"এর মধ্যে কারুর ভার নিতে তোমাকে বলা হচ্ছে না! সে ভাবনা আমার। তুমি কি মেয়ে দেখতে চাও? দেখে এস সেই ভাল।"

"দেখবার কোন দরকার নেই—আপনাদের পছন্দ হ'লেই হ'ল।"

"তাকে দেখলে অপছন্দ করবার কারণ যে কিছু থাকতে পারে না—'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী'—তার উপর বড় লোকের মেয়ে, আদব-কায়দা দুরন্ত।"

"বড় লোকের মেয়ে?"

"আঁত্‌কে উঠ্‌লে যে! তাতে দোষ কি? শুধু বড় লোকের মেয়ে হ'লে আমি নিজেই বারণ করতাম, কিন্তু সে যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছে। আমি সেইজন্যই তার দিকে এত ঝুঁকেছি।"

ঋতেনের কোন আপত্তি টি'কল না। এতে সে বিশেষ দুঃখিত নয়! একদিকে জীবনের এক নূতন দিক্ তার কাছে খুলে যাবার অবসর হ'ল, আর অপর দিকে একজন বড় লোকের শিক্ষিতা মেয়েকে আপনার সে করতে পারে এতে জয়ের আনন্দও হ'তে লাগল। শীলার মত বিদুষী তরুণীকে সে নিজের সম্পূর্ণ অধীনে পাবে—তবু যেন কোথায় একটা অনির্দ্দিষ্ট শঙ্কা তার মনে মাঝে মাঝে উঁকি মারতে লাগল।"

নিশীথের যে নিমন্ত্রণ হবে না তা সে জানত, তবু একবার মা'কে বললে। তার বাপ শুনে বললেন, "সমাজে থাকতে গেলে তাকে কি করে নিমন্ত্রণ করি বল!" ঋতেন আর এ বিষয়ে কিছু বলিল না।

(৮)

শীলার সঙ্গে ঋতেনের ভাব হ'য়ে গেল খুব অল্প দিনে। আর এত বেশী যে কোন অশিক্ষিত মেয়ের পক্ষে তা ভাবাই কঠিন। শীলা তার কবিতার খাতা ঋতেনকে দেখাতে রাজি হ'ল, আর ঋতেন তার বদলে তাকে তার ডায়েরী দেখতে দিলে। সে বেশ জানত তার সিনেমা দেখার হিসেব শীলার বেশীক্ষণ ভাল লাগবে না, তাই তাকে একমনে পড়তে দেখে বললে, "ব্যাপার কি? এ তো হতাশ-প্রেমিকের ডায়েরী নয়, এত করে পড়ছ কি বল তো?"

"আচ্ছা তুমি তোমার 'প্রণতি-দি'টাকে খুব ভালবাস না?"

"প্রণতি-দি? তুমি তার নাম জানলে কি করে?"

"বাবা ডায়েরীর পাতায় পাতায় তার নাম, আর আমি তার নাম জানলাম কি করে? আচ্ছা তাকে খুব ভালবাস না? আমার চেয়ে বেশী?"

"তোমার চেয়ে? পৃথিবীর সকলের চেয়ে তোমায় তো এই কদিন কাছে পেয়েছি।"

শীলার সম্মানে আঘাত লাগল, সে আর কোন কথা বললে না। ঋতেন কোনদিন মনস্তত্ত্বের ধার ধারত না, তাই শীলার মধ্যে যে কোন পরিবর্ত্তন হ'তে পারে তা মনেও করলে না। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলে, "তোমার কি রাগ হল না কি?"

"রাগ হ'বে কেন সত্যিই তো! এ ক'দিনের পরিচয়ে অতটা আশা করা কি ঠিক?"

ঋতেন মনে করলে ঝড় কেটে গেল। সে জানত বন্ধুদের মনের ঝড় ঠিক এমনি ভাবেই কেটে যায়। মেঘ ঘন অন্ধকার হয়ে আসে, কিন্তু কোত্থেকে ঝড় এসে সে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যায়—আবার আসে, দেখা দেয়। শীলা হেসে তার সঙ্গে কথা কইলে, সে মনে করলে সব বিপদ এখানেই কেটে গেল।

(৯)

দুঃখ কষ্ট সহ্য করা প্রণতির কোনদিন অভ্যাস ছিল না। তাই দুঃখ যখন তার সামনে এসে দাঁড়াল, সে তাকে

দেখে চমকে উঠল। সে আর তার ভাই ছাড়া তার বাপ-মার আর কেউ ছিল না; তাই বরাবর তারা সাধারণ ছেলে-মেয়ের চেয়ে অনেক সুখ-সুবিধা উপভোগ করেছে। বাপ মারা যাবার পরও সে কোনদিন কোন কষ্ট পায় নি; কারণ তার বাপ মারা যাবার সময় তাঁর সঞ্চিত বহু টাকা ব্যাঙ্কে রেখে গেছেন। আর সেটা ভাই-বোনেদের আধা-আধিই।

তাই তার 'ডিপথেরিয়ার পর থেকে বরাবরই ভুগছিল। আর তাতে নিশীথ এত বিরক্ত হ'য়েছিল যে তার কোন ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা তার কথা শুনলেই তার রাগ হ'ত। প্রথম প্রথম সে কোন কথা বলত না, কিন্তু বেশীদিন সে ভাবে গেল না। সারাদিন সে বাড়ি থাকত না। কোন কথা জিজ্ঞেস করলে বলত যে, 'হাঁসপাতাল বাড়ীতে বসেচে, তা'তে কারুর বাড়ী ঢুকতে ইচ্ছা হয় না।' একথাও প্রণতির সয়ে গেছল কিন্তু যেদিন সাহেব ডাঃ গ্রিফিথকে ডাকবার কথায় নিশীথ বললে, "আচ্ছা বিপদে পড়া গেছে তো, ছেলেটার যাবারও নাম নেই"—সেদিন প্রণতি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলে না। সে বললে, "বলতে একটু বাধল না? তোমার এক কড়া কাণা-কড়ির ধার ও ধারে?"

"না তা ধারে না, কিন্তু আমার বাড়ীতে—"

"তোমার বাড়ী? বলতে একটু লজ্জা হ'ল না?"

নিশীথ আর কথা কইতে পারলে না। আঘাত করবার ইচ্ছে তার ছিল না—আর আঘাত সে করতেও চায় না, কিন্তু না জেনে এমন জায়গায় সে ঘা দেয় যে তার ব্যথায় সে নিজেই চমকে উঠে। আজও সে বুঝলে কত বড় কঠিন আঘাত সে করেছে, কিন্তু কি করবে? ইচ্ছে করে তো করে নি।

(১০)

নিশীথের কথা শুনে প্রণতি ভয়ে চমকে উঠল। তার সমস্ত সুপ্ত মাতৃত্ব সে ভয়টাকে যত দূর করতে চেষ্টা করলে তত নিশীথের ওপর রাগ তার কমে যেতে লাগল। সে ভাবলে 'কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়েছে বলেই তো, আর বলা যায় না যে উনি সত্যি এই চান।' কিন্তু ভয় তার বাধা মানে না। সে ভাবতে চেষ্টা করত যদি শেষে [illegible] তা হ'লে কি হ'বে: কিন্তু ভাবতে পারত না। এক একবার তার মনে হ'ত যদি এ সময় মা বেঁচে থাকতেন তা হ'লে এ দায়িত্বের হাত থেকে সে বেঁচে যেত বটে, কিন্তু এই দায়িত্বের মধ্যে সে যা পেয়েছে তা তো কোনদিন পাবার আশা তার থাকত না। আচ্ছা যদি কেউ এসে তাকে তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয়, সে কি সন্তুষ্ট হ'বে? মোটেই না; এ শুধু তার দায়িত্ব নয়, এ তার অধিকার। মার কাছ থেকে সে যেমন সম্পত্তি পেয়েছে ঠিক সেইরকম এ দায়িত্বও পেয়েছে! ছাড়তে পারবে না।

ছাড়তে হ'ল! মানুষ সবচেয়ে বেশী যাকে আঁকড়ে ধরতে চায় সেই বোধ হয় সব চেয়ে আগে তার কাছ থেকে সরে যায়! যে প্রণতির মুখ কেউ কোনদিন গম্ভীর দেখেনি তার চোখে জল দেখে নিশীথ বললে, "কেঁদো না, ন'ত, চলে গেছে আবার আসবে।"

প্রণতি চমকে উঠে বললে, "আসবে? না, না, সে আর আসবে না! অভিমান করে সে চলে গেছে আর তো ফিরে আসবে না।"

প্রণতি অ-বুঝ নয়; তাকে বোঝাতে যাওয়া ঠিক নয়, তাই নিশীথ আস্তে আস্তে সরে গেল—তাকে একা রেখে। প্রণতি তা জানতে পারে নি—নিজের দুঃখে সে এমনি অভিভূত হয়ে গেছল। সে ভাবত, 'যদি এমনি করেই কেড়ে নেবে ভগবান তা হ'লে দাও কেন?' এ প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে পেত না। সময়ে যেমন সব সহ্য হ'য়ে যায়, তারও তেমনই এ শোকের বেগ কমে যেতে লাগল।

(১১)

সেদিন নিশীথ কলেজে ছিল। চাকর এসে প্রণতিকে জানালে ডাক্তার রায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। প্রণতির ভারি বিস্ময় বোধ হ'ল। তাকে আসতে বলতেই চাকর চলে গেল।

ডাঃ রায় এসে বললেন, "আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় খুব অল্প সময়ের, কিন্তু তার ভেতরই আপনার ভায়ের পাশে দেখে আপনাকে জানবার কতকটা সুযোগ আমার হয়েছে। তাই অত্যন্ত অপ্রিয় এবং [illegible]

একটা কথা আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি। আজকাল আপনার স্বামীর কাজের প্রতি আপনি একটুও লক্ষ্য রাখেন না!"

"স্বামীর কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্ত্রীর কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি না।"

"আপনাকে সব কথা স্পষ্ট করে বলতেই আমি এসেছি। আপনার স্বামীর আচরণের উপর আমার মান-সম্ভ্রম অনেকটা নির্ভর করে।"

"কি রকম?"

"আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার বাড়ী এত বেশী যান যে, তা আমি পছন্দ করে উঠতে পারছি না। তাঁকে বাধা দিয়েছিলাম, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নি।

"তা হ'লে তাঁকে সাবধান না করে নিজে সাবধান হ'লে বোধ হয় ভাল হয়।"

"তা যে হয় তা আমি জানি, কিন্তু সেটা করতে গেলেই এমন পথ আমায় নিতে হ'বে যেটা নিশীথবাবুর পক্ষে মোটেই ভাল হ'বে না—আর আপনার পক্ষে তো নয়ই। আমি সেটা ইচ্ছে করি না, তাই আপনাকে জানাতে এসেছি, যদি আপনি কিছু করে উঠতে পারেন।"

"আমি কিছু পারব না, আপনার যা ইচ্ছে হয় করতে পারেন।"

'কিছু পারব না' বলেও প্রণতি চুপ করে থাকতে পারলে না। সে নিশীথকে জিজ্ঞেস করলে, "তোমার সঙ্গে ডাক্তার রায়ের কি খুব বেশী আলাপ আছে?"

"না।"

"তবে তুমি তার বাড়ী যাও কেন?"

"সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে বাধ্য নই।"

"কতকটা কারণ তার ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করছে।"

"তার মানে?"

"ডাঃ রায় আজ এখানে এসেছিলেন! তুমি যদি এখনও তাঁর কথা না রাখ তা হ'লে তোমায় তাঁর কথা রাখবার জন্যে শেষ উপায় যা তা তাঁকে নিতে হ'বে—তার মানে তোমায় এখান থেকেও সরতেই হ'বে, আর কোন ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারবে না।"

'কাদায় ঢিল ছুঁড়লে নিজের গায়েও কাদা লাগে।"

"কথাগুলো বলতে লজ্জা হ'ল না?—তিনি কিছু করবার আগে তা হ'লে আমাকেই কিছু করতে হ'বে। এর পর তোমার সঙ্গে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়।"

(১২)

ঋতেন তার ডাক্তারির শেষ পরীক্ষা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে, প্রণতির কোন খবর নেবার অবসর তার ছিল না। পৃথিবীর কোন খবরই সে তখন রাখত না! পরীক্ষার পর সে ভাবলে একবার এলাহাবাদে যাবে, কিন্তু একা যেতে ইচ্ছে হল না। প্রণতি বলেছিল শীলাকে নিয়ে যেতে, অথচ তাকে এখন নিয়ে যাওয়া সোজা নয়, তাই আর যাওয়া হল না। চিঠি দিয়ে কিন্তু কোন জবাব পেলে না প্রণতির কাছ থেকে—জবাব দিলে নিশীথ! পড়ে ঋতেন চমকে উঠল; শীলাকে দেখালে। শীলা পড়ে বললে, "এতো জানা কথাই! খৃষ্টানের মেয়ে—"

তাকে বাধা দিয়ে ঋতেন বললে, "ছিঃ শীলা, তুমি ভেতরকার কোন কথা জান না, তাঁকে দোষ দিও না! যদি কোনদিন তাকে দেখতে পাও তা হ'লে বুঝতে পারবে আজ কত বড় অন্যায় তুমি করলে।"

শীলা খুব অসন্তুষ্ট হ'ল কিন্তু কিছু বললে না। সে বুঝেছিল ঋতেন প্রণতিকে শ্রদ্ধা করে দেবীর মত—তবু বাধা না দিয়ে পারল না।

নিশীথ লিখেছিল—সে প্রণতির ঠিকানা জানে না, তাই ঋতেনের পক্ষে তার খোঁজ করা একেবারেই অসম্ভব হ'ল। তবু সে চেষ্টা করতে ছাড়ে নি! দিনকতক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে কিন্তু কোন ফল হ'ল না। শেষে সে বন্ধ করে দিলে। সে আশা করেছিল প্রণতি তাকে চিঠি দেবে, কিন্তু কেন যে দিলে না তা সে ভেবে ঠিক করে উঠতে পারলে না। সে ভেবেছিল দিনকতক বাইরে ঘুরে আসবে। সেটা ভালও লাগবে, আর হয় তো কোথাও প্রণতির সঙ্গে দেখাও হ'য়ে যেতে পারে; কিন্তু তাও হ'ল না। দ্বিতীয় সরকারী হাসপাতালে সে একটা চাকরী পেয়ে, আর তাই নিয়ে আছে

চলে [illegible] হল। সেখানে কোয়ার্টার (থাকবার বাসস্থান) পেয়েছিল বলে শীলাকেও তার সঙ্গে নিয়ে গেল। মা তার সঙ্গে যেতে পারলেন না, কারণ তিনি তো আর তার একার মা নন—আর বৃদ্ধ বাবাকেও তাঁকে দেখতে হ'বে।

(১৩)

ঋতেন আর শীলা দিল্লীতে ছিল বেশ মনের সুখে। এখানে গিন্নীপণার সম্পূর্ণ সুবিধা পেয়ে শীলার দিনগুলি ভালভাবেই কাটছিল; কেবল প্রণতির কথা মনে হ'লে ঋতেন ভারি গম্ভীর হ'য়ে যেত। শীলা এ কথা বুঝতে পারত, কিন্তু কোন কথা তুলত না। ঋতেন চাইত শীলার সঙ্গে প্রণতির সম্বন্ধে কথা কয়, কিন্তু পারত না—দু'একবার চেষ্টাও সে করেছিল, তবে শীলার কোন আগ্রহ নেই দেখে সে চুপ করে যেত। নিশীথকে চিঠি লিখতে তার মোটেই ইচ্ছে হ'ত না। এমনি করে একদিন হয় তো প্রণতির কথা তার কাছে অতীতের ইতিহাস হ'য়ে যেত। ভুলতে হয় তো সে কোনদিনই পারত না, তবু তার কথা যে পুরান হ'য়ে যেত তা নিশ্চয়—এবং পুরান হ'লে ভাবের তীব্রতাও কমে যেত; কিন্তু...

একদিন 'অপারেশন থিয়েটার'এ (অস্ত্রোপচারের টেবিলে) গিয়ে দেখলে সেখানকার নার্স আসে নি। 'জেনারেল ওয়ার্ড' থেকে একজন নার্স পাঠাবার জন্যে সে লিখে পাঠাল। নার্স এসে তাকে কাজ বুঝিয়ে দিতে গিয়ে সে চমকে উঠল। দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর ঋতেন বললে, "নতি-দি? তুমি এখানে এলে কি করে?"

"এখন তো বলবার সময় হ'বে না, পরে বলব।"

"বেশ, তোমার কাজ শেষ হলে আমার কোয়ার্টারে (বাসায়) যাবে তো?"

"যাব।"

কোন রকমে কাজ শেষ করে ঋতেন গেল শীলার কাছে খবর দিতে। শীলা শুনে কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে বললে, "শেষে তিনি নার্সের কাজ নিলেন। স্বামীর ভাত কি তাঁর [illegible] হয়েছিল?"

"ভাজের মতে তাঁকে এ কাজ নেবার কোন দরকার ছিল না। তাঁর যা আছে, তাতে তিনি আমাদের মাইনে দিয়ে [illegible] পারেন।"

ওঃ তবে এটা নিছকই পরোপকার?"

"দেখ শীলা আমার সামনে তাঁর সম্বন্ধে ও-ভাবে কথা কওয়া তোমার উচিত নয়, তা কি তুমি বুঝতে পার না? তুমি জান আমি তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করি।"

"তাই আমাকেও শ্রদ্ধাভক্তি করতে হ'বে!"

"নিশ্চয়।"

"বেশ।"

প্রণতি এসে দাঁড়াতেই ঋতেন বললে, "তোমায় একটা নতুন জিনিস দেখাব।"

"কি বল তো?"

"দাঁড়াও না, শীলা কে এসেছে দেখবে এস।"

"বৌকে নিয়ে এসেছ তা বলতে হয়।"

শীলা এসে দাঁড়াতেই প্রণতি তার হাত ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ দেখে বললে, "ভাই ঋতেন যে, রত্ন পেয়েছ তার মর্য্যাদা যেন কোনদিন ভুলে যেওনা।"

"আর উপায় কি? কিন্তু বাইরে থেকে তোমরা দেখ শুধু রত্নের দীপ্তিটা কিন্তু যে বেচারাকে তার ভার বইতে হয় সে আর দীপ্তি দেখবার অবসর পায় না। যাক, এখন কথা হচ্ছে তুমি যতদিন দিল্লীতে থাকবে ততদিন তোমাকে আমার কাছেই থাকতে হ'বে।"

"তা হ'লে দিল্লীতে থাকাই হয় না।"

"তার মানে?"

"মানে—ভায়ের ঘরে বোন চিরদিনই পর। ভাজ যদি আদর করে ডাকে তা হ'লেই তো সেখানে থাকা যায়।"

"তা হ'লে শীলা, তুমি দিদিকে জোর করে আটকে রাখ। আচ্ছা নতিদি তুমি হঠাৎ নার্স হ'তে গেলে কেন বল ত?"

"একটা কাজ তো চাই। দিনরাত কিছু চুপ করে বসে থাকা যায় না—আর একমাত্র এই কাজটাই আমি কিছু জানি।"

ঋতেনের কাতর অনুরোধে শেষ পর্য্যন্ত প্রণতিকে রাজি হ'তে হ'ল ঋতেনের বাড়ী থাকতে। শীলা কথা এত কম কইছিল যে ঋতেন আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে, "কি তুমি যে একেবারে চুপ করেই রইলে ব্যাপার কি?"

শীলা কোন উত্তর দিল না। প্রণতির সম্বন্ধে হ'য়ে [illegible] তার আসা শীলার ভাল লাগেনি।

নারীর মন বুঝতে পুরুষের যত দেরী লাগে পুরুষের মন বুঝতে নারীর তত দেরী লাগে না, তাই ঋতেন এতদিনে যা বুঝে উঠতে পারে নি প্রণতি অল্প ক'টা কথায় তা বুঝে নিলে। ফিরে যেতে চাইলে ঋতেন কৈফিয়ৎ চাইবে; কি কৈফিয়ৎ তাকে দেবে?—আর একা থাকতে তার সত্যই ভাল লাগে না। ঘর ছেড়ে সে চলে এসেছে পরের ঘরে তার এ আকর্ষণ কেন? সে বেশ বুঝতে পারলে থাকতে সে কিছুতেই বেশী দিন পারবে না তবু চলে যেতে চাইতেও পারলে না।

(১৪)

প্রথম প্রথম কেউ অত লক্ষ্য করত না প্রণতি থাকে কোথায়। হঠাৎ একদিন একজন ডাক্তার আবিষ্কার করে ফেললেন যে, নতুন নার্স থাকে ডাঃ ঋতেনের বাড়ী। তাই নিয়ে ডাক্তার-মহলে আলোচনাটা খুব বেশী চলতে লাগল—এত বেশী যে তা প্রণতি এবং ঋতেন দু'জনেরই কাণে পৌঁছুল। ঋতেন শুনে বললে, "লোকগুলোর খেয়ে-দেয়ে কি কাজ-কর্ম্ম নেই যে কে কোথায় থাকে তারই খবর নিয়ে বেড়াচ্ছে।" মুখে একথা বললেও মনে মনে যে সে বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। সে ভাবত, হঠাৎ একজন ডাক্তার তারই সম্বন্ধে একজন নার্সের সঙ্গে কথা কইছেন। সে ভদ্রতাঅভদ্রতার বিচার ভুলে গিয়ে বললে, "ডাঃ বোস, কোন ভদ্রলোকের সাংসারিক কথাবার্ত্তার বিষয় তার অসাক্ষাতে আলোচনা করাটা কি সঙ্গত?"

ডাঃ বোস একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গিয়েছিলেন।

নার্সটী বললে, "দু'জন লোকের কথার মধ্যে কথা কওয়াটা কি ভদ্রতা না কি?"

"আপনি চুপ করলে বিশেষ বাধিত হ'ব—কথা হচ্ছে ডাক্তার বোসের সঙ্গে আপনার সঙ্গে নয়। আর আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে কাজের সময় গল্প করার জন্যে আপনার বিপক্ষে আমি 'রিপোর্ট' করব।"

"তাতে আমার বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে পারবেন না" এই বলে সে চলে গেল।

ঋতেন বললে, "দেখুন ডাঃ বোস এ সব কথা বলে আপনাকে অপমান করবার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না, কিন্তু ওর সাহস দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম, তাই এই ক'টা কড়া কথা বলতে হ'ল। আমার সম্বন্ধে যত ইচ্ছে আলোচনা করুন কোন ক্ষতি নেই কিন্তু আর একজন ভদ্র মহিলার সম্বন্ধে—"

"তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করবার অনেক কারণ রয়েছে। পর্দ্দার আড়ালে কি আছে লোকে সেটা দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়, তার সুমুখে কি আছে তা দেখতে চায় না। উনি একজন নার্স অথচ যা রোজগার করেন তার চেয়ে ঢের বেশী রুগীদের জন্যে খরচ করেন আর নিজেও থাকেন যথেষ্ট ভালভাবেই। তাই তো লোকে এত আশ্চর্য্য হয় আর তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করে।"

"আমি এতদিন স্পষ্ট করে বলবার এই সুযোগ খুঁজ-ছিলাম, উনি নার্সের কাজ নিয়েছেন সখ করে। ওর যা টাকা আছে তাতে উনি বেশ বড় লোকের মতই থাকতে পারেন। আমাদের বাঙ্গালী ডাক্তার বাবুদের সকলকে বাড়ীতে মাহিনা দিয়ে রাখতে পারেন।"

"উনি আপনার কে হন জানতে পারি?"

"আমার এক দাদার বৌ।"

"আমি এ কথা কল্পনাও করতে পারি নি। মাফ করবেন। কোনদিন আর তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা উচ্চারণ করব না।"

ডাঃ বোস, ভাবলেন প্রণতি নিশ্চয় বিধবা কারণ, সে ঋতেনের বৌদি আর তার মাথায় সিঁদুর নেই। তা না হ'লে ঋতেনকে মহা বিপদে পড়তে হ'ত সব কথা বলতে গিয়ে। ডাঃ বোস সব বুঝলেন, কিন্তু নার্সটী কোন কথা শোনে নি, তাই কিছুই জানল না।

(১৫)

ঋতেন কিছু সত্যিই নার্সটীর বিপক্ষে রিপোর্ট করলে না কিন্তু সে তার বিপক্ষে এমনি আরম্ভ করলে যে তার পক্ষে চুপ করে থাকা অসম্ভব হ'য়ে উঠল। একদিন ডাঃ বোস তাকে বললেন, দেখুন ঋতেনবাবু এখানকার নার্সগুলো বড় বাড়াবাড়ি সুরু করেছে। আমি তাদের বিপক্ষে রিপোর্ট করব, আপনি সই করতে রাজি আছেন?"

"গরীবদের কতকগুলো টাকা মাইনে কাটা যাবে, কি দরকার?"

ডাক্তার ঘোস তা শুনলেন না, তাদের বিপক্ষে 'রিপোর্ট' করে দিলেন। তাদের কিছু করে জরিমানা হ'য়ে গেল। এর ফল হ'ল এই যে তারা মনে করলে এটা নূতন ডাক্তার ঋতেনেরই কাজ আর তার ওপর চটলো ঠিক সেই পরিমাণে। তাই সবাই মিলে জোট বেঁধে তার বিপক্ষে এক নালিশ করলে কর্তৃপক্ষের কাছে। বিশেষ কিছু ফল হ'ল না বটে, কিন্তু কথাটা মোটেই চাপা রইল না। শীলাও শুনলে নার্সরা ঋতেনের বিপক্ষে নালিশ করেছে—প্রণতিই না কি তাদের রাগের কারণ। কোন কথা না বলে সে তার ভাইকে এক চিঠি লিখে দিলে এসে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে! ঋতেন একথা জানত না তাই শালকে হঠাৎ আসতে দেখে বললে, "কিহে ব্যাপার কি? হঠাৎ যে খবর না দিয়েই?"

"কি রকম? শীলা যাবে বলে চিঠি লিখেছে, আর তুমি জান না?"

"শীলা যাবে? কৈ সে কথা তো কিছু বলে নি!"

"হাঁ একটা কথা, তোমার নিশীথদার খবর জান?"

"না, কেন বল তো?"

"কে এক ডাক্তার রায় তাঁর বিপক্ষে ড্যামেজ-স্যুট (ক্ষতিপূরণের মকদ্দমা) করেছে; মকদ্দমায় তিনি হেরে গেছেন" এই বলে সে একটা খবরের কাগজ দেখালে।

ঋতেন এতদিনে প্রণতির চলে আসার আসল কারণ বুঝতে পারলে। সে হেসে বললে, "নিশীথদার যে কোন দিন এত অবনতি হ'তে পারে তা আমি কল্পনাও করি নি!"

"আচ্ছা, তোর চাকরি যাবে তো নিশ্চয়; আত্মীয়-স্বজন তো সকলেই তার বিপক্ষে। তার চলবে কি করে বল তো?"

"না চললেই বা কি এসে যায়? ও রকম লোকের চলার চেয়ে না চলাটাই বোধ হয় জগতের পক্ষে মঙ্গল।"

ঋতেন ভেবেছিল প্রণতিও ঠিক তার মতই কথা কইবে তাই কাগজটা নিয়ে তাকে দেখাতে গেল। প্রণতি পড়ে গেল। তার মুখের কোন পরিবর্তন হ'ল না। সে বললে, "ভাই, আমার যে আজই যেতে হ'বে!"

"সে কি? কোথায় যাবে?"

"তোমার দাদার কাছে।"

"একদিন তো তুমি স্বেচ্ছায় সেখানে সেখান থেকে চলে এসেছিলে!"

"সেদিন তাঁর সাহায্যের দরকার ছিল না, আজ তিনি যে সহায়হীন!"

"তিনি তোমার সাহায্য নেবেন?"

"নিশ্চয়! তিনি তো অবুঝ ন'ন ভাই।"

(১৬)

ঋতেন শীলাকে বললে, "তুমি চলে যাচ্ছ, নতি-দিও আজই চলে যাচ্ছেন!"

"সত্যি? ঠাকুরকে ষোল আনা পুজো দোব!"

"তার মানে?"

"কোনদিন যে উনি যাবেন তা ভাবিনি!"

"উনি তোমার কাছে এতই ভার হ'য়ে উঠেছিলেন না কি?"

"তা কেন হ'বে? তোমার তো আর লজ্জা-সরম নেই। মনে কর আমি কিছুই জানি না, নার্সরা তোমার বিপক্ষে নালিশ করলে কেন?"

"সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হ'বে না কি?"

"দরকার নেই! আমি আজ যাচ্ছি বাপের বাড়ী! যদি কোনদিন নিজেকে আমার স্বামী বলে দাবী করবার উপযুক্ত মনে কর, তা'হলে হয় তো ফিরে আসতে পারি!"

"সে প্রয়োজন আমার যেন কোনদিন না হয়।"

সেইদিনই এক সময়ে দু'জনে দুদিকে চলে গেল প্রণতি আর শীলা। তারপর ঋতেনকে ডাকতে এল হাঁসপাতাল থেকে, কিন্তু সে কার্টার-এ ছিল না, সকলেই মনে করেছিল কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসবে কিন্তু তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। সে এক সীমাহীন পথ ধরে চলেছিল—কোথায়, তা সে নিজেই জানে না।

সম্ভবামি যুগে যুগে

অধ্যাপক শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মানব-সভ্যতার আদিম যুগে যখন মানব অভাব-ক্লিষ্ট হয় নাই, যখন বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে অতি অল্প-সংখ্যক মানবের অবস্থিতিবশতঃ ভূসম্পত্তি বা বাসস্থানের জন্য পরস্পর বিবাদ করিবার আবশ্যকতা হয় নাই, যখন বাণিজ্য বা দলাদলির অত্যাচারে ধরিত্রী ভারাক্রান্ত হয় নাই, তখন মাসিডোনাধিপতি মহাবীর সিকন্দরের ন্যায় কোনও মহাবীরের দিগ্বিজয় প্রয়াস জন্মে নাই। তখন বিরাট্ বিশাল বসুন্ধরা ভিন্ন ভিন্ন মানবের সম্পর্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া মানবের সম্পর্কজাত 'দখল' বা 'অধিকার-স্বত্বের' সীমানা রেখারূপ অনন্ত ঋজু-বক্র রেখায় কলঙ্কিত হইয়া গোলকধাঁধার আকার ধারণ করে নাই। কারণ স্থানাভাব রূপ আবশ্যকতা তখনও প্রাগৈতিহাসিক মানবকে চিন্তাক্লিষ্ট করে নাই। কিন্তু মানবজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব না থাকিলেও মানবজাতি পরস্পর বিবাদ করিবার কারণের অসদ্ভাব বোধ করে নাই। গ্রাসাচ্ছাদন বা আবাসভূমির অভাবের অভাবে মানবের বিবাদের হেতু হইয়াছে ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধর্ম্মানুষ্ঠান। তোমার ধর্ম্মবিশ্বাসে যদি আমার বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে তোমাতে ও আমাতে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগে যে কত ধর্ম্মযুদ্ধের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ধর্ম্মযুদ্ধের নামে কতই যে রক্তপাত হইয়াছে, ধর্ম্মের নামে কতই যে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? এই সকল রক্তারক্তি বা নরহত্যা বিভীষিকার ফলে কত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, বিশ্বমানব যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আপনাদিগকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে, তাহার নির্ণয় অসম্ভব। কিন্তু প্রতি যুগেই মানবের আত্মঘাতিনী বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে একটী শান্তিবিধায়িনী অন্তঃশক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে দেখা যায়। আমাদের গীতার নিরপেক্ষ আলোচনা করিলে আমরা মানব-ইতিহাসের এই মূল তথ্যটী জানিতে পারি। ভারতীয় আর্য্যজাতি অতি প্রাচীন কালেই এই তথ্যটী হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ॥

মানুষের একটী মানসিক ধর্ম্ম এই যে, মানুষ সকল বিষয়েরই আদি কথা জানিবার জন্য ব্যগ্র হয়। কোনও কার্য্য দেখিলে তাহার কারণ জানিতে ইচ্ছা এই মানস ধর্ম্মেরই ফল। এই কারণেই কোনও ঘটনার বিষয় শুনিবামাত্র সেই ঘটনার আদি বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমাদের স্বাভাবিক কৌতূহল জাগরিত হয়। কিন্তু সেই আদিবৃত্তান্তের অস্তিত্ব যদি আমাদের প্রত্যক্ষগম্য না হয়, অথবা তদ্বিষয়ে যদি কোনও পরিষ্কার প্রমাণ না থাকে, তবে সেই সকল বিষয়ে নানা প্রকার কল্পনা উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু আদিম যুগের যে মানবজাতির যে কল্পনাশক্তি প্রচুর ছিল না তাঁহারা যে কল্পনাটী স্বয়ং আবিষ্কার করিতে পারিতেন তাহাতেই তাঁহাদের মন সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত, অন্য কোনওরূপ কল্পনা তাঁহাদের মনে স্থান পাইত না। সুতরাং সেই কল্পনাটীকেই তাঁহারা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহার অন্যথাচরণ কেহ করিলে অথবা তাহার বিরুদ্ধমত কেহ প্রচার করিলেই বিবাদের সূত্রপাত হইত এবং তাহারই ফলে রক্তারক্তি অনুষ্ঠিত হইবার পক্ষে কোনও বাধা থাকিত না। তখন বহিঃশক্তিরূপ পশুবলের পরিমাণ দ্বারা অন্তঃশক্তিরূপ ধর্ম্মবলের পরিমাণ নির্ণয়-চেষ্টায় ঘোর অধর্ম্মের সৃষ্টি হইত।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। প্রাচীন যুগের

মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস অনেকাধিক কল্পনামূলক dogmatism. কিন্তু কল্পনা-শক্তির বহু দিক্-প্রসারিণী অন্তর্দৃষ্টির অভাবে আমরা আমাদের সাধারণ বিচারে যেমন ভ্রমে পতিত হই, ধর্ম্মবিশ্বাসেও সেই প্রকার ভ্রমের সম্ভাবনা আছে। যে ব্যক্তি অল্প কথা কহে তাহাকে আমরা অনেক সময় অহঙ্কারী বলিয়া বিশ্বাস করি, অথবা চাণক্যের দোহাই দিয়া তাহাকে মূর্খ বলি এবং সাফাই দিই—"যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।" যে অধমর্ণ উত্তমর্ণকে তাঁহার প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে না পারে, সে কুটিল চরিত্র দুরাত্মা বলিয়া অধিকাংশক্ষেত্রেই বিবেচিত হয়। গাছ হইতে পাখী উড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি ফলের পতন ঘটে, তাহা হইলে আমরা বলি পাখীই ফল ফেলিয়া দিল। এই সকল উদাহরণে আমাদের ভ্রমগুলি যেমন স্পষ্ট প্রতীয়মান, ধর্ম্মবিশ্বাসের ভ্রম তত স্পষ্ট হয় না এবং একবার অশিক্ষিত হৃদয়ে সে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইলে তাহা প্রবল শক্তিমান্ অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হয়। তাহার উচ্ছেদসাধনের জন্য প্রতিভাশালী মনস্বী ব্যক্তিগণকে যুগব্যাপী সাধনা করিতে হয়।

ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বা পরে, অথবা আফগানিস্থান ও শকস্থানকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত ধরিয়া লইলে ভারতবর্ষের ঐ অঞ্চলে বাসকালে, আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যে একটা বিবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, যে বিবাদের ফলে এক সম্প্রদায় গিয়াছেন পশ্চিমমুখে পারস্যে ও অপর সম্প্রদায় আসিয়াছেন পূর্ব্বমুখে আধুনিক ভারতে, সেই বিবাদের মূল কারণ ধর্ম্মবিশ্বাসে মতভেদ। এই কারণে ভারতীয় আর্য্যগণ যে মত পোষণ করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ উপনিষদ্ ও দর্শনাদির বীজ নিহিত রহিয়াছে দেখা যায়। দৃশ্যমান জগৎকে তাঁহারা আত্মীয় ভাবিতে পারেন নাই। সাংখ্য, দার্শনিক প্রকৃতির আকর্ষণে পুরুষকে তাঁহারা বন্দী করিতে রাজি হন নাই। পুরুষকে নির্লিপ্ত রাখাই তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূলসূত্র। তাই তাঁহারা বলিলেন,—"এ জগৎটা কিছু না।" কিন্তু ইরাণীয়গণ একথা মানিলেন না। [illegible] এ জগৎ উপভোগ্য। এই যে ফুল [illegible] ফুটিতেছে, বায়ু বহিতেছে, ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নানাবিধ রূপ-পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, ইহা কি উপভোগ্য নয়? ভারতীয় ঋষি বলিলেন, "না ওটা প্রলোভনমাত্র, ওই প্রলোভনে ভুলিলেই তোমার বন্দিত্ব অবশ্যম্ভাবী।" ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ সংঘটিত হইল। দুই সম্প্রদায় পরস্পরের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। প্রাচীন আর্য্যজাতির 'দেব'-শব্দ ঐ পশ্চিমমুখী ইরাণীয় সম্প্রদায়ের নিকট দেবদ্বেষী দৈত্য শব্দের বাচক হইল। আমাদের 'ইন্দ্র' তাঁহাদের ঐ 'দএব'-গণের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। আমাদের 'অসুর' শব্দের প্রাচীন অর্থ ছিল 'বলবান্, বীর্য্যবান্'। এই অর্থে এই শব্দ ঋগ্বেদে বরুণ দেবতার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অসু' শব্দের 'প্রাণ' অর্থ অতি প্রাচীন। অস্তিত্ববাচী অস্ ধাতু আমাদের শ্বাসধ্বনির অনুকরণজাত ধ্বন্যাত্মক। শ্বাসক্রিয়াই প্রাচীন মানবের নিকট জীবনের পরিচায়ক চিহ্ন। নাকে হাত দিয়া বা সন্দেহের ক্ষেত্রে তুলা দিয়া দেহের জীবন আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার পদ্ধতি অতি প্রাচীন। সুতরাং অস্ ধাতু ও অসুশব্দও অতি প্রাচীন। এই 'অসু' শব্দের উত্তর 'র' প্রত্যয় যোগে 'অসুর' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এই শব্দের মৌলিক অর্থ 'প্রাণবান্' বা শক্তিবান্'। এ শক্তি কিন্তু ঐহিক শক্তি বা দৈহিক শক্তি। আধ্যাত্মিক বা মানসিক শক্তি নহে। তাই ঐহিক-সম্ভোগ-কামী ইরাণীয়গণ তাঁহাদের উপাস্য দেবতাকে 'অসুর' বা 'অহুর' পদবাচ্য করিলেন এবং তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হইলেন—'অহুরো মজ্দা'। ভারতীয় আর্য্যগণ কিন্তু এই 'অসুর' শব্দকে 'দেবতার শত্রু' অর্থাৎ দৈত্যবাচক করিয়া লইলেন এবং সেই সঙ্গে একটী নূতন শব্দের সৃষ্টি করিলেন 'সুর'। ধাতু প্রত্যয় দিয়া এ শব্দ নিষ্পন্ন হয় না। অন্যান্য আর্য্য ভাষাতেও এ শব্দ নাই। এ শব্দের উৎপত্তি একটা বিস্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ প্রাচীন 'অসুর' শব্দের প্রথম আকারটীকে নঞর্থক কল্পনা করিয়া তাহার বর্জ্জন দ্বারা এই শব্দ উদ্ভূত হইল এবং আজ পর্য্যন্ত আমাদের ভাষায় এই শব্দ সজীব। সে যাহাই হউক এই শব্দটী আমাদের প্রাচীন যুগের ধর্ম্মমতবিষয়ে সাম্প্রাদায়িক বিবাদের সনাতন সাক্ষিস্বরূপ বিদ্যমান।

বেদে দুইটী শব্দ আছে—'ঋত' ও 'সত্য'। দৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগতের নিয়ামক শক্তি 'ঋত'; এবং নৈতিক জগতের নিয়ামক শক্তি 'সত্য' এই 'ঋত' (বা 'অষ') শক্তিকে দেবতারূপে গ্রহণ করিয়া ইঁহার সর্ব্ব-শক্তিমত্তা স্বীকার করিলেন। ইহাও তাঁহাদের ঐহিকতার আর একটী প্রমাণ। এই 'অষ' শক্তির তাঁহারা একটী বিশেষণ দিয়াছেন। তাঁহাদের এই দেবতার নাম 'অষ বোহিষ্ত'। এই 'অষ বোহিষ্ত' দেবতার প্রভাবে চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহতারা-সমন্বিত বিশ্ব স্ব স্ব নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অবিরত কার্য্য করিতেছে। এই শক্তির প্রভাবেই অগ্নির দাহিকা শক্তি ও জলের শৈত্য সম্ভবপর হইয়াছে। এই শক্তি আছে বলিয়াই মেঘ বৃষ্টি দান করে। ইহারই প্রভাবে ঋতুগণের ক্রমান্বয়ে আবির্ভাব হয়। এক কথায় সমস্ত জড়-জগতের ইহাই নিয়ামক শক্তি। পরবর্ত্তী যুগে ইহার শক্তি নৈতিক জগতে সংক্রমিত হইয়াছে দেখা যায়। স্বয়ং 'অহুরো মজদাও' এই শক্তিপ্রভাবেই শক্তিমান্। আমাদের ধর্ম্ম শব্দ এখন প্রায় এই শব্দের সমার্থক। কিন্তু মূলে অষ দেবতার এ শক্তি ছিল না। ইরাণীয়গণ এই প্রাকৃতিক শক্তির বশে যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ফলেই আজ পার্সীগণ এই সংসারে সমৃদ্ধিশালী। আর ভারতীয়-গণ যে কারণে তাঁহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন তাহার ফলেই তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত ভাবপ্রবণ ও আধ্যাত্মিক।

আমাদের দেশের ধর্ম্মবিশ্বাসের আলোচনায় একটী তথ্য সুপরিস্ফুট—সেই তথ্যটী এই যে, যুগে যুগে আমাদের দেশে ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে এবং যুগে যুগে সেই বিপ্লবের অবসানে ধর্ম্মের গ্লানি-মোচন আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমাদের ধর্ম্মের গ্লানি ঘুচে নাই। তাই যতই ভাবি ততই মনে হয় আমাদের গীতার ঐ একটী কথার মধ্যে কি নিগূঢ় ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে! ঐ একটী কথার মধ্যে সমস্ত ইতিহাসের মূল সত্য ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে—

"সম্ভবামি যুগে যুগে।"

ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন তখন এ দেশটা জনশূন্য ছিল না। একাধিক অন্-আর্য্য জাতি তখন তাহাদের অন্-আর্য্য সভ্যতা ও অন্-আর্য্য ধর্ম্ম-বিশ্বাস লইয়া ভারতবর্ষে বসবাস করিতেছে। ইহাদিগের সহিত বিবাদ-বিসংবাদ ও মিলন করিয়া আর্য্যগণকে ইহা-দিগের মধ্যেই বাস করিতে হইয়াছে। এই বিবাদ-বিসংবাদের ফলে হয় তো অনেক অন্-আর্য্য সন্তান পর্ব্বত ও জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে, আবার অনেকেই হয় তো উন্নততর আর্য্যসভ্যতার আশ্রয়ে দাসত্ব ও শূদ্রত্ব স্বীকার করিয়া আর্য্যসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে। অনেকে হয় তো ঋষিত্ব লাভ করিয়া রোমসাম্রাজ্যে নিগ্রো ওথেলোর ন্যায় আর্য্য-সাম্রাজ্যে যশ, মান, প্রতিষ্ঠা এবং হয় তো ডেস্‌ডেমোনা-লাভ করিয়াছে। আর্য্য ও অন্-আর্য্য জাতির পরস্পর সম্পর্কে শত শত বৎসর ধরিয়া পর-স্পরে পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাতে উভয় সভ্যতার মিলনজাত আধুনিক ভারতীয় সভ্যতার কোন্ উপাদানটী মূলপ্রবাহে আগত, কোন্‌টী বা উপ-প্রবাহের আনয়ন তাহা নির্ণয় করা নিতান্তই কঠিন। দক্ষিণ ভারতের আধুনিক দ্রাবিড়গণ এখন হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। বলা বাহুল্য এখনকার মত দ্রাবিড়গণ কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতে বাস করিতেন না, উত্তর ভারতেও এই দ্রাবিড়গণই আর্য্যপূর্ব্ব যুগে বাস করিতেন। সেইজন্যই দ্রাবিড়গণের ভাষার প্রভাব বেদের ভাষায় সংক্রমিত হইয়াছে দেখা যায়। আবার ভাষা বাহ্য-বস্তু বলিয়াই ভাষার উপর দ্রাবিড়-প্রভাব এত সহজে ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার মৌলিক দলিলে অন্-আর্য্য সভ্যতার যে ছাপ পড়িয়াছে তাহাতে মূল দলিলের অক্ষরগুলি প্রায় দুষ্পাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে।

বেদ আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রাচীন শাস্ত্র। কিন্তু বেদের মধ্যে আমরা কোনও যুগবিশেষের সভ্যতা দেখিতে পাই না। ব্যাসদেব যিনিই হউন না কেন, তিনি বেদমন্ত্র-সমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু বেদ রচিত হইয়াছিল কোন্ যুগে ও কোন দেশে? বেদ রচনা বা বৈদিক সভ্যতা প্রণয়নের দেশ-কাল-নির্ণয় এখন অসম্ভব বলিলেই হয়। কেন না আমরা জানি বেদ বিভিন্ন দেশীয় ও বিভিন্ন-কালীয় ঋষি-সম্প্রদায়ের নিকট রক্ষিত ছিল। এখনও কোনও বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইলে ঋষির নাম

উল্লেখ করিতে হয়। সুতরাং বেদমন্ত্রসমূহের মধ্যে যে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যাইবে তাহা এক যুগেরও নহে, এক দেশেরও নহে, এক সম্প্রদায়েরও নহে। ইহার মধ্যে বহু যুগের, বহু স্থানের ও বহু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত একত্র সংগৃহীত রহিয়াছে। কোনও কোনও স্থলে মতের বিভিন্নমুখিতা সুপ্রতীয়মান। আমি সে সকলের আলোচনা করিব না। তবে আমার আলোচ্য বিষয় এই যে, ইহার মধ্যে কোনও কোনও অনুষ্ঠান ইরাণীয়গণের সহিত বিভিন্ন হইবার পূর্ব্বযুগের এবং কোনও কোনও অনুষ্ঠান পরযুগের। ইন্দ্র বরুণাদি যে-সকল প্রাচীন দেবতার স্তোত্র বেদে আছে তাহার অধিকাংশই পূর্ব্বযুগের। কারণ ঐহিক 'অব'-শক্তিতে শক্তিমান্ বরুণদেবতা ইরাণীয়গণের শ্রেষ্ঠ দেবতা 'অহুরো-মজ্দা' রূপে ইরাণীয়গণের উপাস্য হইয়াছেন। অগ্নি দেবতা ইরাণীয়গণেরও দেবতা। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে 'পুরুষ' দেবতা 'প্রজাপতি' দেবতা, 'হিরণ্যগর্ভ' দেবতা, 'রুদ্র' দেবতা, 'বিষ্ণু' দেবতা প্রভৃতি দেবতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, বা নূতন উদ্ভূত হইয়াছেন। প্রাচীন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে এ যুগের ঋষিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন তাহা আমরা নাসদীয় সূক্ত, পুরুষসূক্ত, হিরণ্যগর্ভ সূক্ত ও প্রজাপতি দেবতার প্রাধান্যজ্ঞাপক সূক্তগুলিতে দেখিতে পাই। ঐহিক সুখের হেতুভূত ধর্ম্মের উপাদানসমূহ এযুগে অনাদৃত হইয়াছে এবং পারত্রিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। একটা বিচার ও বিশ্লেষণের যুগ যে এই কালের মন্ত্রগুলিতে প্রকাশ করিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাচীন নরবলি-প্রথার নিদর্শন-স্বরূপ শুনঃশেফের আখ্যান অনাদৃত হইয়াছে। যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা ইন্দ্রত্বলাভ প্রভৃতি প্রলোভনের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ জাগরূক হইয়াছে। ব্রাহ্মণের উপর স্থানে স্থানে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য দেখা দিয়াছে। পরবর্ত্তী উপনিষদের যুগে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য সুপরিলক্ষিত হয়। কেবল যে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন এবং সারাজীবন বশিষ্ঠের সহিত কলহ করিয়াছেন, তাহা নহে। বহু স্থলেই ক্ষত্রিয়গণ পুরোহিতের কর্ম্ম করিয়াছেন, এবং অনেক রাজার নিকট ব্রাহ্মণগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছেন। অশ্বপতি কৈকেয়, কাশীরাজ অজাতশত্রু, প্রাবাহণ জৈবলি, রণবিদ্যাকুশল সনৎকুমার, চিত্র গাঙ্গায়নি, রাজর্ষি জনক প্রভৃতি বহু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগেই হউক, আর এই যুগেই হউক পরশুরাম ভার্গব-প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন। মোট কথা সনাতন আর্য্যধর্ম্মে একটা মালিন্য এই যুগে দেখা দিয়াছে এবং এই ধর্ম্মগ্লানি বিদূরিত করিবার জন্য ভগবানের আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছে। ইহার ফলে দেখিতে পাই রুদ্র দেবতা প্রলয়ের বিষাণ ধ্মাত করিয়া নটরাজের তাণ্ডব আরম্ভ করিয়াছেন। ইন্দ্রাদি প্রাচীন দেবগণ ইহার নিকট মাথা নত করিয়াছেন। আর্য্য ও অনার্য্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শুভ মিলন সংঘটিত হইয়াছে। রাক্ষস, অসুর ও দৈত্যগণের লিঙ্গদেবতা 'মহাদেব' আর্য্যসমাজের সুসংস্কৃত হইয়া 'ঈশ্বর' দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। অনার্য্যদিগের ভূতনাথ আর্য্যরুদ্র দেবতার সহিত মিশিয়া আদর্শ ত্যাগের দেবতারূপে 'ঈশ্বরত্ব'ও 'মহেশ্বরত্ব' লাভ করিয়াছেন। ইহার পর হইতেই ভোগের দেবতা ইন্দ্র আর্য্যসমাজে অনাদৃত।

এই পরিবর্ত্তন ধ্যান করিলে কাহার না চিত্ত আর্য্য-সভ্যতার মহামিলনাত্মক মহামন্ত্রে মুগ্ধ হয়! কোথায় ভূতপিশাচের অধীশ্বর লিঙ্গদেবতা, আর কোথায় অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর ত্যাগের দেবতা শিব! ইহার পরবর্ত্তী যুগের শাস্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, স্মৃতি-পুরাণাদি কতকগুলি শাস্ত্র ঋষিরচিত এবং কতকগুলি এই 'মহাদেব'-রচিত। মহাদেবের নামে প্রচলিত তন্ত্রাদি শাস্ত্রসমূহ অনার্য্যশাস্ত্র আর্য্যসভ্যতায় গৃহীত বলিয়া পণ্ডিতগণের বিশ্বাস।

এইরূপেই আর একবার ধর্ম্মযুদ্ধের ফলে বিষ্ণুদেবতা আর্য্যসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বেদের যুগের সেই সূর্য্যরূপী ত্রিবিক্রম বিষ্ণুই রূপান্তরিত হইয়া আচণ্ডাল সকলকে একত্র সম্মিলিত করিয়া সমগ্র ভারতে এক ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছেন ইনি একদিকে যেমন ক্রোধোন্মত্ত ব্রাহ্মণগণের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া সনাতন কালের মানবগণের নিকট ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের ধর্ম্মহীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, অন্যদিকে সেইরূপ ব্রাহ্মণ-পরিত্যক্ত চণ্ডালের মালিন্য মোচন করিয়া স্বক্রোড়ের শীতল ছায়া দান করিয়াছেন। ইহার পর হইতে ভারতীয় আর্য্য বৈদিক-

যুগের ইন্দ্রাদি দেবতাকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্ত্তিকে সমধিক সমাদরের সহিত হৃদয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

কিন্তু ইহাতেও ঠাকুরের শান্তি হয় নাই। পাপী আমরা, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, আর সেই নির্লিপ্ত পুরুষপ্রবরকে যুগে যুগে পাপের কালিমা মুছিবার জন্য আমাদেরই ন্যায় নব নব জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। আমরা আবার জীবহিংসা ও জীবে দ্বেষ করিতে লাগিলাম। শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব আবার অহিংসামন্ত্র প্রচার করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি মোচন করিলেন। এইরূপে যুগে যুগে ঠাকুর আমাদের আমাদেরই মধ্যে আবির্ভূত হইয়া আমাদেরই মালিন্য মোচন করিতেছেন। অধিক উদাহরণ দিয়া আমার প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করিব না। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে যেমন ভগবান্ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া জাতীয় ধর্ম্মের গ্লানি-মোচন করিয়াছেন, ব্যক্তিগতভাবে মানবের চিত্ত যখন পাপের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন তিনিই বিবেক-রূপে আবির্ভূত হইয়া মানবচিত্তের পাপরাশি অনুতাপানলে দগ্ধ করিয়া দেন এবং সেই নির্ম্মল পবিত্র চিত্ত-সিংহাসনে স্বয়ং অধিরূঢ় হইয়া মানবকে দৈবশক্তি সম্পন্ন করিয়া তুলেন। ইহাই মানব জীবনের ইতিহাসে একমাত্র সনাতন সত্য কথা। আবার আমাদের মধ্যে যাঁহারা পরোপকারার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ঐ ভগবানেরই অবতার স্বরূপ। আমরা যেন তাহা বিস্মৃত না হই।

হে ঠাকুর! হে হৃদয়েশ্বর! তুমিই তো প্রজাপতিরূপে আমাদের আর্য্যসভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছ, তুমিই বিষ্ণুরূপে যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের পালন করিতেছ, আবার তুমিই রুদ্ররূপে আমাদের ধর্ম্মের সংস্কার করিয়া আমাদের মালিন্য তোমার কণ্ঠে ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠরূপে বিরাজ করিতেছ। হে অনন্ত! হে অসীম! তুমি আমাদের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ভাঙ্গিয়া দাও। হে নির্লিপ্ত পুরুষ! তুমি আমাদের হৃদয়কে সংস্কারমুক্ত করিয়া অনন্ত লোকের সঙ্গে মিলিত কর। হে বাঙ্গালীর গৌরাঙ্গ কৃষ্ণচৈতন্য! তুমি আমাদের চৈতন্যের কালিমা মুছাইয়া দিয়া আমাদের চিত্তের ভ্রাতৃবিরোধ কাড়িয়া লও। হে রামমোহন! তুমি আমাদের অন্তরের কুসংস্কার ও বাহিরের পাপের আকর্ষণ হইতে রক্ষা কর। হে বিদ্যাসাগর! তুমি আমাদের আর্ত্ত ও পতিত মহিলাকুলের অশ্রুমোচন কর। হে রামকৃষ্ণ! তুমি আমাদিগকে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় প্ররোচিত কর। হে নরেন্দ্র! তুমি আমাদিগকে অস্পৃশ্য মেথরের সেবায় আত্মদান করিতে শিখাও। হে শ্রদ্ধানন্দ! তুমি আমাদের পতিতকুলের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়া আমাদের সমাজকে পতিতশূন্য ও পবিত্র কর। হে প্রায়শ্চিত্ত! তুমি অনুতাপরূপে পাপীতাপীর হৃদয়ে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদের পাপরাশি ধ্বংস কর। হে সচ্চিদানন্দ! তুমি সত্যজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে আমাদের মনের অন্ধকার দূর করিয়া দাও, যেন আমরা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রতি জীবনের মধ্যে শিবকে দেখিতে পাই। যেন আমরা তোমার অবতার স্বরূপ মানুষকে নীচ বা হীন বলিয়া ঘৃণা না করি। আমাদের হৃদয় সেই ভক্তিতে পূর্ণ কর, যাহার প্রভাবে আমরা পাপীর চিত্ত হইতে দানবকে বিতাড়িত করিয়া সেইখানে তোমার প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। তোমার আত্মজস্বরূপ মানবের সেবা করিয়া যেন আমরা সেই আনন্দ লাভ করিতে পারি, যাহার বলে আমাদের 'অমৃতের সন্তান' নাম সার্থক হয়। সেই অমৃতের পুণ্য স্পর্শে যেন আমাদের পূর্ব্ব গৌরব ও পূর্ব্ব বিশালতা আমাদের স্মৃতিতে জাগরূক হয়। তোমার দিব্য চক্ষু পাইয়া যেন আমরা দেখি যে, আমাদের উদার আর্য্যসভ্যতা পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশের ভিন্ন ভিন্ন মানব জাতিকে এক ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিয়া ছিল। যেন মনে পড়ে যে শ্যাম-কম্বোজ আনাম-চম্পা সুবর্ণভূমি-যবদ্বীপ-বলিদ্বীপ প্রভৃতিতে একাল পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্ম বিরাজ করিতেছে এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ প্রভৃতি দেবগণ মন্দিরে মন্দিরে পূজিত হইতেছেন। কি বিরাট্-বিশাল মন্দিরমালা সেই সকল দেশে আকাশে মাথা তুলিয়া আর্য্যসভ্যতার উদারতা ও মানুষের মনে মনে মিলনের শক্তি ঘোষণা করিতেছে!

আমাদের যে তেজস্বী অগ্নিসম তপোদীপ্ত পূর্ব্ব পুরুষ-গণের পুণ্যকীর্ত্তি আজ শত শত বৎসর কালের বাত্যা ও ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া বরবুদুর, প্রাম্বানান্, ওঙ্কারধাম, আনুধিয়া প্রভৃতি পূর্ব্বদেশে ও মধ্য এসিয়ার মরুভূমে

[illegible] দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাঁহাদের তেজস্বিতা [illegible] করিয়া যেন আমরা সকলে প্রতিজ্ঞা করিতে পারি যে আবার আমরা আমাদের পূর্ব্ব গরিমা, আমাদের সভ্যতার প্রাচীন আদর্শ, মহামানবের মধ্যে মহামিলনের অমৃতমন্ত্র প্রচার করিতে পারি। অজ্ঞতার অন্ধকারে বা পাপের কলঙ্কে আমাদের মধ্যে যাহাদের চিত্ত আজ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের মালিন্য মোচন যেন আমরাই করিতে পারি। আমরা যেন আবার আমাদের মগ্নতরীর উদ্ধার করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত জ্ঞানধন লাভ করিতে পারি।

আমরা এবার মন করেছি ডোবা জাহাজ তুলতে
যাচ্ছি সাগর—ভরা ডুবির ধনের ঘড়া খুলতে।
মোহর ভরা ধনের ঘড়ায়
যদিই লোনা জল ঢুকে যায়
সোনা তবু সোনাই থাকে পারিনে সে ভুলতে।
আমরা এবার পণ করেছি ডোবা জাহাজ তুলতে॥

মন করেছি আমরা ক'জন নষ্ট মানুষ তুলতে।
পক্কে আছি নাগতে রাজি মনের চাবি খুলতে॥

দোষ যদি হায় ঢুকেই থাকে
মজিয়ে থাকে মগজটাকে
মানুষ তবু মানুষ, ওগো, পারব না ভুলতে।
মন করেছি, পণ করেছি হারা হৃদয় তুলতে॥

উছল ঢেউএর পিছল পিঠে হবে রে আজ দুলতে।
ক্ষতির খাতায় পড়বে না সব পারিস্ যদি উলতে
জাহাজীরা যাদের মানে
হাজা-মজার হিসাব জানে
তারা তো কেউ দেখায়না ভয়, দিচ্ছে সাহস উলটে
আয় তবে আয় চল দরিয়ায়, ওলোন ঝোলায় ঝুলতে॥

লোনা জলে রেশম পশম, আর দেওয়া নয় ফুলতে।
আর দেওনা নয় পতিত জনে পাপের নেশায় ঢুলতে॥
দোষ যদি হায় ঢুকেই থাকে
আমরা শোধন করব তাকে
করতে হবে নূতন বোধন জাগিয়ে তারে তুলতে।
মানুষ, দোষে গুণেই মানুষ, পারব না সে ভুলতে॥ *

কুহু ও কেকা

* রাজসাহী কলেজ গীতা-পরিষদের বাৎসরিক উৎসবে পঠিত।

শব্দব্রহ্ম

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়

১

শব্দ বোঝা যায়, কিন্তু শব্দব্রহ্ম বোঝা বড় কঠিন। শব্দ-ব্রহ্ম কথাটা সাধু-সন্ন্যাসীদের মুখে সর্ব্বদাই শুন্‌তে পাওয়া যায়। গৃহীদের মধ্যে সকলে না বললেও পণ্ডিত মহাশয় পুঁথি খুলেই শব্দব্রহ্মকে নমস্কার করে পাঠ আরম্ভ করেন 'সহর্ণের্ঘঃ'। আর আমাদের হারুমাষ্টার তানপুরা নিয়ে 'ভ্যাররম্যাও' সাধ্‌তে সাধ্‌তে বলেন, শব্দব্রহ্ম।

পুঁথি অনেক দিন পাথারে ভাসিয়ে দিয়েছি, সরস্বতীর সরস শ্রুতি শ্রুতিপথে আর উদিত হয় না। মনে হ'ত, পণ্ডিত মহাশয়কে একবার জিজ্ঞাসা করি; কিন্তু যখন দেখতাম, তিনি দেবঋণ, ঋষিঋণের খবর না ক'রে পিতৃঋণ পরিশোধ করতে অনেক নূতন ঋণ করেছেন, আর সেই ঋণের ঘায়ে একেবারে 'সহর্ণের্ঘঃ' হয়ে বসে পড়েছেন, আর এক পা এগুতে পার্চ্ছেন না, তখন ভাবতাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করা বিড়ম্বনা।

হারু মাষ্টারের ওখানে প্রায় সকল সময়েই একটা ছোট-খাট আড্ডা বস্‌ত; সকালে তামাকের, দুপ'রে তাসের, বৈকালে সিদ্ধির, আর ভাল রকম জম্‌ত সন্ধ্যার পর। মাষ্টার সন্ধ্যা-বন্দনা সেরে প্রবীণদের নিয়ে বিবিধ যন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে ঘণ্টা দুই শব্দব্রহ্মের আলাপে আসর জমিয়ে রাখতেন। তারপর আসর তরুণদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি যেতেন পাকের ঘরে।

নিত্য নূতন রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য প্রস্তুত করতেন, নিজে খেতেন অল্প, খাওয়াতেন তার অনুগতদের, যাদের মধ্যে আমি একজন। আমার বেসুরো বেতালা দোষ তিনি কিছুতেই সারাতে পারতেন না। রান্নাঘর থেকে আমার সাধনা লক্ষ্য করতেন আর বল্‌তেন; 'ও হ'ল না, ও হচ্ছে না; তারপর বিরক্ত হ'য়ে খুব নিকট সম্বন্ধসূচক সম্বোধনে আদর করতেন।

হারু মাষ্টারের তিন কুলের কাহাকেও কখন দেখি নাই। ঘর সংসার কখন ছিল কি না জানি না। বড়-লোকের ছেলেদের গান বাজনা শিখিয়ে নিজের খরচের উপায় হ'ত, আড্ডার খরচ চল্‌ত চাঁদায়। শনিবারের রাত্রিটায় ছোট রকমের ভোজ হ'ত। কোন কোন মাসে বড় বড় শিষ্যদের খরচায় বড় রকম ভোজের আয়োজন হ'ত। সেদিন বাহিরের দুএকজন ওস্তাদ ও ,বান্ধব শিষ্যেরা আস্‌তেন।

মর্ত্ত্য জগতে যার অপ্রতিহত প্রভাব তার ভৈরব আহ্বানে এক ভীমা রজনীতে আমাদের একজন ছুটিয়া চলিয়া গেল। পরদিন আড্ডা প্রায় খালি। আনন্দ কোলাহল নিবে গেছে; যেন একটা দুর্ব্বিষহ অন্ধকার আমাদের চেপে ধরছে। আমাদের সদানন্দ মাষ্টারকেও নিরানন্দ আশ্রয় করেছে। তিনি উর্দ্ধমুখে গম্ভীরভাবে বসে আছেন। আমরা অধোমুখে মাটীতে দাগ কাটছি। মাষ্টার বল্লেন,—"যাঃ, আর ভেবে দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে কি হ'বে, কালের ডাকে একে একে সকলকেই যেতে হ'বে। রতনা চলে গেল, তার যতনটা রেখে গেল। ঐটাই সত্যিরে, ঐটাই সত্যি। যাতনা যদি ভুলতে চাস্ তবে তার ঐ যতনকে ধর, ঐ যতনই তোদের রতন মেলাবে। যা এখন তোরা ঘরে যা, যে যার নিজের কাজে মন দিগে। মন ভোলারে মন ভোলা, কাজ পেলেই ভুলে যাবে।" এই ব'লে উঠে দাঁড়ালেন, চোখ দুটা অশ্রুতে ভরে গিয়াছিল, গজমতির মত দু ফোঁটা মাটিতে পড়ে মিলিয়ে গেল।

সকলেই চলে গেল, আমি থাক্‌লাম একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে। বল্লাম,—"মাষ্টার, রতনা চ'লে গেল, কিরূপ যতন করলে তাকে ফিরে পাওয়া যাবে?"

মাষ্টার হেসে বল্লেন,—"তুই হাসালি, আরে যে যায় সে কি ফেরে! সে শব্দব্রহ্মে লীন হ'য়ে গেল, রেখে গেল তার সাধনা। সেই সাধনা ধর, সেই সাধনাই সকল রত্নের

আগুন; সেই শব্দ রত্ন মেলাবে—তুই চিরকালটাই বেসুরো বেতালা থাকলি।

বল্লাম,—"মাষ্টার, এইটে তোমার সেরা হেঁয়ালী, বলতে পার, ঐ শব্দব্রহ্ম পদার্থটা কি? আকাশে বায়ুর তরঙ্গে ধ্বনি উঠে, ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হ'য়ে মিলিয়ে যায় তার থাকে কি?"

মাষ্টারের উত্তর যোগায় না, বিরক্ত হ'য়ে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকলেন; তারপর অপ্রতিভভাবে বল্লেন,—"ভাই ন আমি কে তাই আজ পর্য্যন্ত জানলাম না, তার উপর শব্দব্রহ্ম, সে তো মস্ত বড় কথা।"

বল্লাম,—"তোমার ঐ সব স্থাকামী ভাল লাগে না, তুমি আবার তোমাকে জানবে কি? তোমার যদি ভীমরথী ধরে থাকে তবে আমি তোমাকে বলছি শুন তুমি আমাদের হারু মাষ্টার।"

—টার হো হো করে হেসে বল্লেন,—"হারু মাষ্টার কি ন, কোথা থেকে এল, জানিস্?"

বল্লাম,—"তুমি আমাদের ঠাকুরদার বয়সী, তোমাকে জন্মে পর্য্যন্ত হারু মাষ্টার দেখছি;—আমাদের হারু মাষ্টার আমাদের মধ্যে আছে, সে আনন্দের খনি, তার আনন্দমঠে আমাদের সকলের আনন্দ। তার জাতকুল শীলের খবর রাখি না। বল না—তোমার বিবরণটা আজ শুনি।"

মাষ্টার বুকের মধ্যে জাপটে ধরে বল্লেন,—"শুনেছি, বাপ্ ছিল আমার সাপুড়ে, মা ছিল হাড়ী। তাদের জাতের ছিল না ঠিক আমি তাদের কুড়ান ছেলে। বাবা বাঙ্গলাবাজার থেকে আমাকে সাপের ঝাঁপিতে ক'রে এনে মাকে ...ছলেন। তিনি তুবড়ী বাজিয়ে বাজারে খেলাতেন সাপ আর ঘরে খেলাতেন আমাকে। মা—অভাগীর হারাধন বলে আমায় চুমো খেতেন। মা'র আভরণ ছিল জগতের ঘৃণা, বাবার সম্পদ ছিল দুনিয়ার দৈন্য। তার প্রেমের তুবড়ীতে খলের রাজা সাপও বশীভূত হ'ত! শেষ কালসাপের তাড়নাতেই তাঁকে সংসার ছেড়ে যেতে হ'য়েছিল। মা থাকলেন একা, আমি হলাম তার কারাগারের বেড়ী। আমি একটু বড় হ'তে যখন বেড়ী আলগা হ'ল—তখন আমায় বিশেশ্বরের নাটমন্দিরে ছেড়ে দিয়ে, মা বাবার খোঁজে চলে গেলেন। রেখে গেলেন আমার জন্য বাবার তুবড়ীটী আর তার গলায় আঁটা একখানা টিকিট—লেখা তায় 'শব্দব্রহ্ম'। সেই হারাণ এখন তোমাদের হারুমাষ্টার। শব্দব্রহ্মে খবর হ'লে তাই জানতে পারবি।"

এই কথাগুলার সঙ্গে মাষ্টারের হৃদ্‌পিণ্ড ঘনঘন স্পন্দিত হচ্ছিল, আমি ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়েছিলেম।

২

রত্না যাওয়ার পর আমাদের আড্ডাটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকত। মাষ্টারও মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হ'তেন। সে ছিল মাষ্টারের প্রিয়শিষ্য, সকল যন্ত্রে পটু, গুণদের মধ্যে সব চেয়ে সঙ্গীতনিপুণ। আহা! কি মধুর কণ্ঠ, কোনরূপ মুদ্রাদোষ ছিল না। যখন গাহিত, তখন মাষ্টারের মুখ লাল হ'য়ে উঠত, গান থামলে বলতেন, 'রতন, তুই শব্দব্রহ্মকে ঠিক জাগাতে পারবি।' সেই রতন চলে গেছে, আড্ডায় একটা বিষাদের ছায়া তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে মাষ্টার মন-প্রাণ দিয়ে বড় একটা গান করেন না।

একদিন বল্লাম,—"মাষ্টার, সেরকমটা আর জমাতে পার না কেন?"

বল্লেন,—"তানপুরোটা পুরাণো হ'য়ে গেছে, বসটা চটেছে, সোয়ারীটা ফেটেছে, তারগুলায় মরচে ধরেছে। এটাকে মেরামৎ না করলে শব্দের সুরত হ'বে না।"

বল্লাম,—"একবার তুবড়ীটা বাজাও না, ওতেই হয় তো তোমার শব্দব্রহ্ম প্রকট হ'তে পারেন।"

বল্লেন,—"বাপ ওকি আমার কাজ? ওতে বড় দমের দরকার, আর ধৈর্য্য চাই অসীম। ওর শব্দ শুনলে সাপ জড় হ'বে। তখন একটু বেসুরো বল্লেই ছোবল মারবে ওতে আমি কখন হাত দিই নি।"

যোড়াশাঁকোয় তানপুরা মেরামৎ করতে দিয়ে মাষ্টার বাড়ী ফিরলেন। দেখলাম চোখদুটী লাল করেছে। জিজ্ঞাসা করলাম,—"কি হয়েছে মাষ্টার?"

বল্লেন,—"আরে ছ্যাঃ তোমাদের পাঠালেই হ'ত। সব যন্ত্রের বিকৃত শব্দের সঙ্গে নানা জন্তুর বিকৃত ... প্রলয়ের বাজনা উঠছে—সেখানে গিয়ে

আকর্ষণ

শিল্পী—শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র বরুয়া

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া প্রেস।

মাথা ধরে গেছে। কাণের মধ্যে নানারকম শব্দের ধ্বনি হচ্ছে। সাজ দেখি একছিলুম তামাক।"

তামাক সাজা হ'ল, টেনে বল্লেন, "এঃ, এটাও বিস্বাদ। যা'রে তোরা বাড়ী যা। আজ সব বেসুরো মেরে গেছে, কিছুই ভাল লাগ্ছে না।"

সকলে বল্লে,—"দেখো, মাষ্টার রতনার মত তুমিও যেন আমাদের কাঁদাইয়ো না। তোমার আনন্দমঠ উঠে গেলে আমরা আর বাঁচব না।"

সকলে চলে গেল। আমি মূর্ত্তিমান্ বেতাল, আমার আগাগোড়া বেসুরে বাঁধা। বল্লাম,—"আমিও তা হ'লে যাই।"

বল্লেন,—"কেন রে? তোর মা নেই যে কাঁদবে। বউ নেই যে ধড়্ফড়্ করবে। এক আছে পিসি—তিনি নিশ্চয়ই বারোয়ারী তলায় বালকসঙ্গীত শুনতে যাবেন। তুই আজ এখানে থাক্।"

বল্লাম,—"আমার বেসুরো বেলয় বাতাসে তোমার বেগড়ান স্থর আরো বেসুরো বল্বে।"

বল্লেন,—"চুপ কর্। ওরে মুর্খ, বেসুরের ভিতর থেকেই স্থর উঠে, বেলয়ে লয় লুকিয়ে থাকে। কিছু থাক্লে, তা থেকে অনেক কিছু হয়। আর, কিছু না থাক্লে কিছুই হয় না। এক ছিলুম ভাল করে তামাক সাজ দেখি, নল্চে খোল পরিষ্কার করে জল ফিরিয়ে সাজ্বি বুঝ্লি?"

বল্লাম,—মিছে আর তামাক খেয়ে মাথা গরম করবেন কেন?"

বল্লেন,—"চোপ্রাও গাধা; তুই আমাকে শেখাবি? নারিকেল নির্ম্মিত খোল, ও ব্রহ্মার কমণ্ডলু। পূর্ণ তাহে ভাগীরথীর পুণ্য বারি। যুক্ত ঐ যে নল, ও বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত যষ্টি, ওর এক টুকরার কাছে দধীচির হাড় হার মেনে যায় বাবা। আর ঐ যে কল্কে দেখ্ছ, ও মহামায়ার সৃষ্টি। তাম্রকূট-ওটা কালকূটের অধিক—তমের সঙ্গে রসের পাক। যার বিষ্ণুপুরে জন্ম তার তুলনা নাই। বিধিমতে তাকে পোড়াতে হয়। যে পারে সে মধুর গুরুর গুরুর ধ্বনি শুনতে পায়। শ্রীগুরুর কৃপা হ'লে তবে তো শব্দব্রহ্ম প্রকাশ পাবেন। খুব মন দিয়ে আমার কথাগুলো ভাব্তে ভাব্তে সাজাবি। ...মননই সাধনা। সাধ্তে জান্তে হবে না।"

আঃ—

মাষ্টার অর্দ্ধশায়িত অর্দ্ধউপবিষ্ট অবস্থায় শয্যা নিলেন। হুঁকোর নলচে খোল সব পরিষ্কার করে, বিষ্ণুপুরি খাম্বি সেজে তাওয়া চড়ান হ'ল। ক্রমে খাম্বিরার গন্ধে চারিদিক আমোদিত হ'তে বল্লাম—"কেমন খাম্বিরার গন্ধে হাঘী নেমে আস্‌চ তো।"

এক টান টেনে বল্লেন,—"উঁহু এখনও হয় নি। তো... মোহ যায় নি। ঐশ্বর্য্যের কড়া গন্ধ রয়েছে, ও টান্‌কে কলিজা আড়ষ্ট হ'য়ে যাবে, আর একটু পুড়্ক্।"

খানিক পরে বল্লাম,—"একবারে পুড়ে ছাই খাবে ছাই।"

বল্লেন,—"না রে না, ও পুড়তে অনেক সময় লাগে। কেহ ধরতে না ধরতে দুটান টেনে নামিয়ে রাখে—বলে, নেশা হ'ল না। শেষে দেখা যায়, ওপর ওপর একটু পুড়েছে। ভেতরে কাঁচা মাল যেমন তেমনি। হাঁ, এই বার ধরেছে—তাম্র পুড়ে গেছে, আছে কেবল রস। এই রসে মজলে ঘরে ঝিঁঝিঁর ডাকে ঝালাপালা হ'তে হয়, আর যদি বাহিরে বার হ'বে তবে বারিদের কৃপাপুষ্ট অলস দাদুরগণের জয়ধ্বনিতে দেশত্যাগী করবে। এই যে কাণের ভিতর শব্দব্রহ্ম বোঁ বোঁ করছেন। প্রাণটা পা... খাচ্ছে, ব্রহ্মলোকের দিকে ছুটবে।"

মাষ্টার এই বলে নলে মুখ দিলেন প্রথমে আস্তে আস্তে —'গুরু গুরু গুরু' তারপর একবার জোরে 'গুরুর' ... চোখ কপালের দিকে উঠতে থাক্ল। শেষ একবার ... শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। নলটা মুখ থেকে পড়ে গে... চোখের মণি তখন একবারে ভিতরে। মাথায় হাত দি... হাত পুড়ে যেতে লাগল; পা পা একটু একটু ঘামছে দেখে একটু আশা হ'ল। মাষ্টার তবে সশরীরে ব্রহ্মলোকে গেলেন।

ও

তারপর কয়েকদিন বেহুঁস জ্বর। ঔষধি পথ্য কি জল মুখের কাছে ধরলে ইঙ্গিতে নিষেধ করতেন আর পাশ ফিরে শুতেন কেবল এইটুকু হুঁস দেখা যেত। যেদিন তার

যায় দিয়ে আর ছাড়ল সেদিন আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

অটলা (অটলরাম) ... হরিলুট মেনেছি বাবা, সারবে না তো কি ?"

পেঁচো (পঞ্চানন) বল্লে,—"আমি বাবাঠাকুরের কাছে যোড়া দুধো মেনেছি বাবা, না সেরে যাবে কোথা ?"

ছিরে (ওরফে—শ্রীকান্ত) বল্লে, "পীর সাহেবের দরগায় তিন বেলা করে প্রদীপ দিয়েছি বাবজান, সেই জন্যে সেরেছে।"

শেষ সতে (সত্যশরণ) বল্লে,—"সত্যনারায়ণের সিন্নির ব্যবস্থা শিগ্‌গির কর—আমাদের হারাণ মাষ্টারকে ফিরে পেয়েছি। দুনিয়ার যত সওয়া আছে সব একজায়গায় কর ; আমাদের সত্যস্বরূপ মাষ্টারের চারিদিকে কঞ্চির বেড়া দিয়ে কুমারীকাটা সুতা দিয়ে ঘিরে ফেল, যা'তে আনন্দমঠ ছেড়ে মাষ্টার কোন অসত্য-ধামে না যেতে পারে। হারুমাষ্টারই আমাদের সত্যনারায়ণ। যে নিজেকে হারিয়েছে সেই সত্যকে দেখেছে ও সত্য হয়েছে।"

আমি বল্লাম,—"মাষ্টার ব্রহ্মলোক দর্শন হ'ল ?"

হেসে বল্লেন,—"হাঁ তার বিবরণ একদিন বলব। এখন শীঘ্র সিন্নির ব্যবস্থা কর। সওয়ার সিকি আমায় দিস, তোদের জন্য পুরো রাখিস।"

আমি চিরদিনই বেসুরা বেতালা। সতেটা মাষ্টারের কথার বেশ অনুকরণ করতে পারে। আমি কিছুই বুঝতে পারি না। অকৃতি হ'য়েও মাষ্টারের ভালবাসা পেয়েছি এতেই মহা আনন্দ। ভাবলাম—আচ্ছা যেটা ধরি সেটাই তো পুরো! পুরোটাকে পাঁচভাগ করলে কি সওয়া পাওয়া যায় তবে পাই কোথা ? পুরোটার যদি একপাদ বৃদ্ধি হয় তবে বাড়তির পোয়াটা তোমায় নিবেদন করা যেতে পারে। যারা পাঁচের উপর সওয়া চাপিয়ে বাহিরের দ্রব্য আহরণ করে—সপাঁচপো সপাঁচগণ্ডা—তারা নিজের ভোগেই সব লাগায়। তাহাদের হিসাবের ভুল সত্য-নারায়ণের নিকট ধরা প'ড়ে সব মিথ্যে হয়ে যায়। আর যাদের লক্ষ ধন বাড়তে থাকে তারা তাহার অপচয় করবে তবু একপাদ সত্যের উদ্দেশে উৎসর্গ করবে না। মাষ্টারের মলিন মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখে আশ্বস্ত হ'লাম, ভাবলাম সময়ে জিজ্ঞাসা করব।

যার যাহা মানত ছিল ক্রমে দেওয়া সুরু হ'ল। মাষ্টারের ঘোরা দিগম্বরী মুক্তকেশী নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গমুণ্ডধারিণী বরাভয়করা ত্রৈলোক্যতারিণীর প্রকাণ্ড পট প্রলম্ব ছিল। তার নীচে ঝুলতো গলায় টিকিট আঁটা সেই তুবড়ীটা। অটলা মার কাছে হরিলুট দিলে। পাড়ার ছেলেদের খুব আনন্দ, সেই আনন্দে আমারও আনন্দ। মাষ্টার মজলিসে গাইলেন—

'তারা পরমেশ্বরী।
কখন পুরুষ হও মা কখনও ষোড়শী নারী।
অজ্ঞানে জ্ঞানদায়িনী, ভক্তিমুক্তি প্রদায়িনী,
এ ভব সংসারে মাগো ভরসা শ্রীপদতরী।'

পেঁচো পঞ্চানন-তলায় যোড়া মেষ বলি দিয়ে নিয়ে এল। তার স্কন্ধে একদিন জমাট মজলিস চল্‌ল। তার মধ্যে মাষ্টার গায়িয়াছিলেন :—

'ভূতনাথ ভব ভৈরব শঙ্কর, গঙ্গাধর হর মশানবিহারী,
মাতে ভৈরব ভৈরব রঙ্গে, প্রমত্ত ভৈরব ভীম তরঙ্গে
রুধির ভূষণ জয় পিণাকধারী'।

ছিরে কতকগুলা পয়সা অপব্যয় ক'রে একদিন আড্ডায় দেওয়ালী দিলে। সেদিন পাড়ার লোক ভেঙ্গে পড়েছিল, জমকাল মজলিসে বড় বড় রাগ-রাগিণীর আলাপ চলতে লাগল, তার মধ্যে মাষ্টার ধরলেন—

"নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি ;
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরি গুহাবাসী।"

কয়েকদিন অপেক্ষা ক'রে স'তেকে বল্লাম,—"কি বাবা তোমার সত্যনারায়ণের সিন্নিটা এইবার হ'য়ে যাক্।"

স'তে বল্লে,—"বুড়োর জন্য কুমারীর সুতা পাওয়া গেল না অঙ্গহানি হ'লে অকল্যাণ হ'বে।"

বল্লাম,—"মাষ্টার যদি পালায় ?"

বল্লে,—"আমরা প্রেমের ডোরে বেধে রাখ্‌ব।"

মাষ্টার বল্লেন,—"যখন প্রেমের ডোরে বেঁধেছিস্ তখন পূজো হ'য়ে গেছে সবলে এখন প্রসাদ পাও দেখি।" এই বলে বিবিধ ফল মিষ্টান্ন বিতরণ করতে লাগলেন। নিজের জন্য কিছুই রাখলেন না। ভাবলাম, বাড়তি সিকিটা বুঝি আগেই ভোগে লাগিয়েছেন, নতুবা প্রসাদ

হ'ল কি ক'রে। মাষ্টার তখন মনে মনে গুণগুণ করে গাচ্ছিলেন—

"চিত্তের চাঞ্চল্যে জীবভাব ঘটে, চঞ্চলতা গেলে
সকল আশা মেটে
স্থির হ'লে চিত্ত হের চিত্তপটে, আঁকা আছে
বাঁকামদনমোহন।"

৪

'কয়েকদিন চেপে বর্ষা ভর করল। আড্ডায় মেঘ-মল্লারের মোহড়া চলতে লাগল। যেদিন বাদ্‌লা ছাড়ল, সেদিন আঁজল আঁজল বাদ্‌লে পোকা এসে কর্ণ ও নাসার মধ্যে বাসা নেবার ব্যবস্থা করতে লাগল দেখে আলো নিবিয়ে সব আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে আছি। সেই সময় আমি শব্দব্রহ্মের বিবরণ শুনবার জন্য মাষ্টারকে নাছোড়বন্দা হ'য়ে ধরলাম।

বাহিরের আলো নিবিয়ে দিলে ঘরের আলো খোলে ভাল, সে দিন আমি তাহা বেশ বুঝেছিলাম! এই বলে মাষ্টার আরম্ভ করলেন—

'তামাক টানতে টানতে শরীর অবশ ও ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল, আর শিরে সহস্ররশ্মির প্রচণ্ডকিরণ জমাট বাঁধল,—মনে হ'ল, ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে আমি বিদ্যুত শিখার মত বের হ'য়ে যাচ্ছি। মুখ হ'তে নলটি খসে পড়ল, দেহটা মড়ার মত পড়ে রইল। আমি ব্যোমপথে আলোক-গতির কোটীগুণ বেগে ছুটতে লাগ্‌লাম। এক একটা ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুর মত প্রকাশ পেয়ে নিমিষের মধ্যে অসীম বিস্তার লাভ করলে; আবার দেখ্‌তে না দেখ্‌তে ক্ষুদ্রতম বিন্দুতে পরিণত হ'য়ে লীন হ'য়ে গেল। এরূপ কত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত আঁধার কোলে বুদ্‌বুদের মত উঠ্‌ল আর লয় পেয়ে গেল। শেষ আমি লোকালোকের সীমায় উপনীত হ'লাম। তখন মনে হ'ল এই অনন্ত আকাশ সঙ্কুচিত হয়ে আমায় পিশে ফেলতে আসচে অনন্ত আঁধার জমাট বেঁধে আমাকে চেপে ধরতেই এক অব্যক্ত মধুর ধ্বনি শুনতে পেলাম 'ও আয়াহি'—আমি শিহরিয়া সংজ্ঞাচ্যুত হলাম। যখন চৈতন্য হ'ল তখন দেখি কোটীসূর্য্যের জ্যোতির মধ্যে কোটী চন্দ্রমা খেলা করছে। তার অনন্ত বিস্তৃত স্নিগ্ধ সুধার হিল্লোলে হংস-হংসী নৃত্য করছে। কুন্দ-কেতকী, চাঁপা-চামেলী, টগর-পারিজাত, বেল-বকুল, শেফালী-শতদলের গন্ধে ভরে গেছে। বসন্তের বাতাস বইছে। তার মাঝে একটা অব্যক্ত সুর আর আমি তার সঙ্গে মিশে আছি। মনে হ'ল, সুপ্তধাতু-নির্ম্মিত সপ্ততারে মাকড়সার জালের মত ঘিরে রয়েছে। তাতে সপ্তসুরের তরঙ্গ উঠে কেন্দ্রাভিমুখে চলেছে। সেখানে অধঃ, ঊর্দ্ধ, পার্শ্ব, কিছুই নাই। আমি তরল স্নিগ্ধ জ্যোতির মধ্যে হাত্‌ড়ে পেলাম দুখানা পাদুকা।'

এই বলে বীণা-সংলগ্ন তুম্বী দুইটা দেখাইলেন—'সেই দুটা দুই করে ধরতেই আমার এক অপূর্ব্ব দারুময় শরীর সৃষ্ট হ'ল। তাতে সপ্ততার এসে যুক্ত হ'য়ে ত্রিসপ্ত সন্ধির সৃজন করল। ভাবলাম আমি কে? ধ্বনি উঠ্‌ল, ওঁ। মুখ খুললাম, শব্দ হ'ল, ও মা ওঁ ৮৮। চেয়ে দেখি সমস্ত জ্যোতি জমাট বেঁধে এক আনন্দময়ী মূর্ত্তি হ'য়েছেন, আর আমি তার কোলে ব'সে আছি।' জিজ্ঞাসিলাম,—'কে—মা?'

মা বল্লেন—বাক্ দেবী।

বল্লাম—আমি কে মা?

মা বল্লেন—তুমি শব্দব্রহ্ম।

বল্লাম - তিনি যে মা নিত্য, আর আমি অনিত্য।

মা বল্লেন—তত্ত্বমসি—তুমিই সেই—তোমার নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করতে অনিত্য যন্ত্রের সৃজন করেছি।

বল্লাম—কিরূপে প্রতিপত্তি হ'বে?

মা বল্লেন—তোমার আদি নাই সুতরাং অন্ত নাই। তোমার সংবৃত স্বর যখন বিবৃত হয় তখন আদিস্বর রূপে ব্যক্ত অকারের উৎপত্তি হয়। তাই লোকে কিছু বলতে চাইলে প্রথমে বলে অ বা অরে। যখন ভাল মত বিবৃত হ'ল তখন উঠল 'উ'। তাই শব্দ শোনা গেলে লোকে বলে উ বা হুঁ। যার উৎপত্তি হয় তার বিনাশ অনিবার্য্য। স্বরকে জাগাইয়া এইরূপে ছেড়ে দিলে লয় পেয়ে যাবে। তাই স্বরের বিরামের পূর্ব্বে মুখ সংবৃত করতে হ'বে। তা করলেই তোমার নিত্য স্বরূপটী দেখতে পাবে অ—উ—ম্ বা ওঁ। এখন ওঁ ভিতরে কুণ্ডলী পাকাতে থাকুক

এবং ব্যস্থিত স্বরবেগের পুনরাহরণ করুক। এইবার সংরুদ্ধ স্বরবেগকে একবার বাহিরে আসতে দিয়ে পুনরায় সংবৃত কর, দেখ দেখি কি হয়। ওঁ মা ওঁ ৺৺। পুনঃ পুনঃ সাধন কর, ওমা ওঁ ৺ ওমা ও ৺ ওমা ওঁ ৺ ৺। নিরবচ্ছিন্ন স্বর যখন ইচ্ছা তখন বাহির করতে হ'লে অনিত্য যন্ত্রের আবশ্যক। অনিত্য যন্ত্রের নিত্য-স্বর সংলীন থাকে। স্বর যখন নিরবচ্ছিন্ন চলতে থাকবে' তখন সপ্তভূমিতে তাকে সংবর্দ্ধনা করবে। তা হ'লে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, এই সাতরকম সাজে স্বর সজ্জিত হ'বে। তারপর উদারা, মুদারা, তারা, এই তিনগ্রামে প্রাতর্মাধ্যন্দিন সায়ং সময়ে সঞ্চারিত করবে। স্বর যখন স্ববশে আসবে তখন বিবিধ মূর্চ্ছনার সহিত বিবিধ ছন্দে যোজনা করবে। তাহাতে বিবিধ রূপ ও রসের সৃষ্টি হ'বে এবং নিত্য নূতন স্বর্গে স্বরের মহিমা প্রচার হ'বে। এই নিত্য-সাধনা যেখানে, শব্দব্রহ্মের নিত্য-ধামও সেখানে। তুমি সেই শব্দব্রহ্ম আমি তোমায় অনন্ত মহিমা প্রচার করতে অনন্ত রূপ দিয়েছি।

এই বলে মা নিরস্ত হ'লেন। আমার ও মোহ কেটে গেল।

আমি বল্লাম, "মাষ্টার, তোমার মোহ কাট্‌ল, কিন্তু আমি যে তিমিরে সে তিমিরে।"

বহুরূপী

(গল্প)

[চেখভের ছায়া অবলম্বনে]

শ্রীযতীশচন্দ্র বাগচী

শীতের প্রভাত। ভোরের আলো সবেমাত্র ফুটিয়াছে। ফরিদগঞ্জ শহরের বাজারে লোক-চলাচল তেমন সুরু হয় নাই। রুটীওয়ালা তোমিজ মিঞার টীনের ঘরের মটকার উপর চট্টলবাসী মোরগরাজ ঝুঁটী নাড়িয়া ডাক-হাঁক করিতেছে। মাথায় কমফর্টার বাঁধিয়া রেগুলেশন লাঠির আকৃতি একগাছি নিম্বযষ্টি হস্তে লোলজিহ্ব শিবু ময়রা বিকট হ' হ' শব্দে মুখ প্রক্ষালন করিতেছে। এমন সময় দারোগা অচ্যুতবাবু রোঁদ হইতে থানায় ফিরিতেছিলেন। সঙ্গে জমাদার খোদাবক্স থান্‌দার। জমাদারের হস্তে এক ঝোঁপা লাল টক্‌টকে মূলা। বোধ করি কোনও ব্যাপারীর গাড়ী হইতে পড়িয়া সদর রাস্তা অবরোধ করার অপরাধে তাহারা ধৃত হইয়া থানায় নীত হইতেছিল।

এমন সময় পঞ্চানন চা-ওয়ালার দোকানের দিকে বিষম গণ্ডগোল উঠিল।

"ছেড়ো না, ছেড়ো না বলচি! খোক্কস বেটা, আমাকে কামড়ান! কামড়ান আজকাল আইনে বারণ, তা জানিস?"

পীতাম্বরের কাঠের গোলার পাশে গিয়া একটা কুকুর কেঁউ কেঁউ করিতে করিতে তিন পায়ে লাফাইতেছিল। লাল বনাতের ফতুয়া গায়ে একটা লোক তাহার পিছনের একটা পা চাপিয়া ধরিল। কুকুরটা তখন দ্বিগুণ বিক্রমে কেঁউ কেঁউ করিতে সুরু করিয়াছে। দাঁতন-কাঠি বগলে চাপিয়া ঘটী হস্তে শিবু ময়রা শো-কেশ ঠেলিয়া তক্তাপোষের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

জমাদার বলিল, "ওখানে একটা হাঙ্গামা হচ্চে হুজুর।"

পীতাম্বরের কাঠের গোলা ডাইনে ফেলিয়া দারোগাবাবু পঞ্চাননের চায়ের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, লাল বনাতের ফতুয়া গায়ে লোকটা ডান হাতের একটী আঙুল তুলিয়া সকলকে দেখাইতেছে। আঙুলটী

হইতে একটু একটু রক্ত ঝরিতেছে। দেখিয়াই দারোগা বাবু চিনিলেন—মাঝের পাড়ার হরিহর সেক্‌রা।

অপরাধী কুকুর বেচারা হরিহরের পায়ের তলায় বসিয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল।

"ব্যাপার কি? চেঁচাচ্চ কেন ষাঁড়ের মত? রক্ত কিসের?" দারোগাবাবু গর্জ্জন করিলেন।

সেলাম করিয়া হরিহর বলিল, "আমি এই রাস্তা দিয়ে যাচ্চিলুম, হুজুর! কারুর কিছু করি নি, ধর্ম্মাবতার! গরীব মানুষ, গতর খাটিয়ে খাই। কারুর সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। পঞ্চাননের সঙ্গে দেখা। আজকাল ফুঁকো কয়লার দর কি তাই শুধোচ্ছিলুম। এমন সময় এই খোক্কস বেটা ধুমকেতুর মত কোত্থেকে হাঁ হাঁ করতে করতে ছুটে এসে দিলে আমার এই আঙ্গুলে ঘ্যাঁক্ করে কামড়ে। গরীব মানুষ—আঙ্গুলই আমার সর্ব্বস্ব। হাঁসপাতালে গেলে যম ডাক্তাররা কি এ আঙ্গুল রাখবে? দেবে কেটে উড়িয়ে। গরীব মানুষ—গোঁদলপাড়া যাবার পয়সাই বা পাব কোথায়? মরব শেষটা হন্যে হ'য়ে। কি ভয়ঙ্কর কুকুর, হুজুর! আপনি তো আইনের মা-বাপ। বলুন তো আজকালকার আইনে মানুষকে কামড়াবার বিধেন আছে? পথে ঘাটে এ রকম করে কামড়াতে আরম্ভ করলে মানুষ কি টিঁকে থাকতে পারবে? আমি নালিশ করব। কুকুরওয়ালার কাছ থেকে 'ডামিশ' আদায় করে ছাড়বো।"

ভ্রূ কুঁচকাইয়া দারোগাবাবু বলিলেন, "হুঁ, কার কুকুর এটা? এ রকম মানুষ-খুনে কুকুর পথে ঘাটে ছেড়ে দেবার মানেটা কি? শহরে যে পাঁচ আইন জারী আছে সে হুঁস বুঝি নেই? এ আমি ছেড়ে কথা কইব না। কুকুর কি বেড়াল যে যেখানে সেখানে ছেড়ে দেবে? যখন জরিমানা হ'বে তখন সে আক্কেল জন্মাবে। খোদাবক্স! দেখ তো কার কুকুর এটা।"

দর্শকগণের মধ্যে একজন বলিল, "ম্যাজিষ্টর সায়েবের বলে মনে হচ্ছে।"

"ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের? হুঁ। এই, সরে দাঁড়াও সব। ভিড়ের চোটে দম আটকে আসচে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের! হুঁ। তা বাপু, এই তো ইঁদুর-ছানার মত একরত্তি কুকুর! তুমি তালগাছের মত ধাড়া পাঁচ হাত জোয়ান—তোমার আঙ্গুলের ডগায় কামড়াল কি করে বাপু? নিশ্চয় হাতুড়ি ঠুকে আঙ্গুলের ডগা ফাটিয়েচ। আমি জানি তোমাদের ভিটকেলেমি। পাজীর পা-ঝাড়া সব!"

কুণ্ডই পোদ্দার বলিল, "ওটা একটা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্যি লোক, হুজুর! কুকুরটার মুখে বিড়ি গুঁজে দিয়ে মজা দেখছিল। দিয়েচে তেমনি কটাস্ করে কামড়ে।"

"মিথ্যে কথা বলিস নি, কুণ্ডই! তুই দেখেচিস্ আমি বিড়ি খাওয়াচ্ছিলুম! হুজুরের একটা জ্ঞান-গোচর আছে। 'ডামিশ' আমি আদায় করবই। আইনে লেখা আছে। আমার ভাই রেজেষ্টারী আপিসের প্যায়দা!—"

"বাজে বকো না।"

নিবিষ্টচিত্তে কুকুরটা দেখিয়া জমাদার বলিল, "না, হুজুর! এ মাজেষ্টার সাহেবের কুকুর নয়। তাঁর সব বিলাতি কুকুর। এ কোথাকার একটা খেঁকি কুত্তা।"

দারোগা বলিলেন, "আমিও তো তাই বলি। এও কি একটা কথা হ'ল? একি একটা কুকুর? ঘেয়ো বেটা—গায়ে একটা রোঁ নেই! কল্‌কাতা শহরে এ রকম একটা কুকুর বের হ'লে তখুনি তাকে ঠেঙিয়ে মারত। এখানে লোকগুলোর কি এতটুকুও আইন-জ্ঞান নেই গা! এই যে লোকটাকে কামড়ে খেলে—না, হরিহর! আমি ছেড়ে কথা কইব না।"

জমাদার আপন মনে বলিল, "মাজেষ্টার সাহেবের হ'লেও হ'তে পারে। এইরকম একটা কুকুর যেন তাঁর বাড়ীতে দেখেছিলুম।"

শো-কেসের আড়াল হইতে গলা বাহির করিয়া দাঁতন-কাঠি নাড়িয়া শিবু ময়রা বলিল, "নিঘ্যস্ মাচেরটক্ সায়েবের। আমি নিজ চ'খে কাল-বিকালে দেখেছি—"

"হুঁ। সরে দাঁড়াও সব। জমাদার! তুমি এটা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠিতে নিয়ে যাও। সেলাম দিয়ে বলো যে, আমি একে রাস্তায় দেখতে পেয়ে ধরেচি। এ রকম দামী কুকুর পথে ঘাটে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। যে চোরের দেশ! এইরকম হারামজাদা বেটারা সবাই মিলে যদি বিড়ি খাওয়াতে সুরু করে, তাহলে কি এমন দামী কুকুরটা আর বাঁচবে? এই বদমাইস, আঙুল নাবা। চালাকী পেয়েচ? নিজে দোষ করে এখন আবার

নেকামি? বগ্‌লসটা কোথা গেল? খুলে নিয়েছিস বুঝি? এই যে ম্যাজেষ্টর সায়েবের চাপরাশী আসছে। হ্যাঁ হে মিঞাজান, এটা হুজুর বাহাদুরের কুকুর না?"

"ক্ষেপেছেন? এ রকম কুকুর হুজুর কখনও পোষেন?"

দারোগাবাবু বলিলেন, "আমি আগে থাকতেই জানি। তবু ওই শিবে বেটা—"

দাঁতনকাঠি ফেলিয়া দিয়া শিবু ঘরে ঢুকিল। "আর সময় নষ্ট করো না। নিয়ে চল্ বেটা খেঁকি কুত্তাকে ধরে। লোকটাকে কামড়ে আধ-মরা করে দিয়েছে। আজই খুনে বেটাকে সাবড়ে দিতে হ'বে। লে চলো।—"

মিঞাজান বলিল, "কুকুরটা হুজুরের নয়। হুজুরের ভাই আজ ক'দিন হ'ল এসেচেন। তাঁরই কুকুর।"

"হুজুরের ভাই এসেছেন? তা তো এতক্ষণ আমাকে বল নি। বেড়াতে এসেচেন বুঝি? হুজুরের ভাইয়ের কুকুর? তা এতক্ষণ বলতে হয়। আমি গোড়াতেই বুঝেছিলুম, ভাল জাতের কুকুর। ম্যাসকট্ বোধ হচ্ছে কি চমৎকার লোম! মুখখানা কি! তুলে নাও তুলে নাও মিঞাজান! বজ্জাত বেটারা! হুজুরের ভাইয়ের কুকুর—তাকে গেছিস বিড়ি খাওয়াতে! এ কি নিধে বাউরির কুকুর যে পয়সায় তেরগণ্ডা বিড়ি খাওয়াবি। এ হচ্ছে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভাইয়ের কুকুর! দশ টাকা ডজনের হাভানা চুরুট খায়। কাঁপচিস কেন রে? দুষ্টুটা রেগে উঠ্‌চে বুঝি? তুলে নে, মিঞাজান! আমি আর সকাল বেলা ছোঁব না। খাসা কুকুর!"

মিঞাজান কুকুর লইয়া চলিয়া গেল। দর্শক-বৃন্দ হরিহরের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল।

হরিহরের নাকের কাছে ঘুসি তুলিয়া দারেগা বলিলেন, "চড়িয়ে লাল করে দেব, পাজি কোথাকার! আঙ্গুল কামড়েচে! তোর নাকটা কামড়ে নিলে আমার মনের দুঃখ যেত। বিড়ি খাইয়েচেন! এ্যাঃ—"

দারেগা বাবু জুতা মস্ মস্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

"আর ভুলায়োনা"

শ্রীঅনিলবরণ রায়

আর ভুলায়োনা মোরে অশেষ ছলনে
হে সুন্দরি! মায়া তব কর সম্বরণ।
জন্ম জন্ম আছি বাঁধা তব বাহুপাশে
সাধ্য নাই পাশ ফিরে চাহি একবার!
যত ভাবি আর নাহি রব বদ্ধ হয়ে
যত চাই আপনারে নিতে সরাইয়া—
কি মোহিনী জান তুমি, নিমেষের মাঝে
দাও সব উলটিয়া! আত্মহারা হ'য়ে
মিশে যাই তোমা সনে, ইঙ্গিতে তোমার
উঠি বসি প্রাণহীন পুতুল যেন গো!
তোমারি হাসিতে হাসি, ফেলি অশ্রুজল
তোমার ব্যথায় ব্যথী, তোমা ছাড়া আর
তিলমাত্র আপনারে না পারি ভাবিতে!
শৈশবে লইয়া ক্রোড়ে জননীর রূপে
এ-বিচিত্র ধরণীর দিলে পরিচয়,
বিস্ময় পুলকে প্রাণ হ'ল বিমোহিত—
নিঙাড়ি বক্ষের সুধা দিলে ওষ্ঠে ধরি
বাঁধিলে স্নেহের ডোর শিরায় শিরায়।
মধুময় যৌবনের করিয়া উন্মেষ,
মর্ত্ত্যমাঝে অমরার দেখালে স্বপন,
লইয়া রূপের ডালি দাঁড়ালে সম্মুখে,
বুকভরা যৌবনের পূর্ণ মাধুরিমা;
চঞ্চল আঁখির ঠারে নাচে রক্তধারা,
ছুটাইলে পিছু পিছু উন্মাদের প্রায়!
জীবন-সংগ্রামে কভু জয়-লক্ষ্মীরূপে
দিলে গলে বরমালা, কভু নিক্ষেপিলে
পরাজয়ে অসম্মানে ধূলির উপর।
জরারূপে সর্ব্বশক্তি করিয়া হরণ
জাগায়ে রাখিলে শুধু অন্তরের তৃষা
যেন জন্ম জন্মান্তর সেবি দাস হ'য়ে!
মৃত্যুরূপে জীর্ণ দেহ করি অবসান,
আবার নবীন দেহ দিলে ফিরাইয়া
পরাইতে নবভাবে মায়ার শৃঙ্খল!
কতকাল খেলিবে এ খেলা, কুহকিনী?
বন্ধনের ব্যথা আজি বড় বাজে বুকে—
মুক্ত কর—মুক্ত কর তব মোহপাশ,
দাও এবে অবসর লইগো চিনিয়া
কে তুমি কে আমি কেন মিলেছি হেথায়।

প্রাচীন বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা

শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত

বঙ্গের এক গৌরবময় যুগ আজ বিস্মৃতির অতল সলিলে নিমগ্ন। যে যুগে বাঙ্গালী নাবিক অকুতোভয়ে সমুদ্রপথে বাণিজ্য-তরী লইয়া গিয়া দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত, অথবা উপনিবেশ স্থাপন করিত—যে যুগে একজন বাঙ্গালী মহাপুরুষ তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করিয়া তথাকার মহাসম্মানিত অন্যতম "লামা" বা পুরোহিতের আসন অলঙ্কৃত করেন—যে যুগে বাঙ্গালী ভাস্কর, বাঙ্গালী শিল্পী, বাঙ্গালী স্থপতি, বাঙ্গালী ধর্ম্মোপদেষ্টা, বাঙ্গালী বীর ও বাঙ্গালী রাজনীতিজ্ঞ দেশ-বিদেশে বাঙ্গালীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ও ধর্ম্মের নূতন ধারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন হিন্দু-যুগ ধন্য। এই যুগের ইতিহাস কালের কুক্ষিগত হইলেও অধুনা দেশবৎসল অনুসন্ধিৎসুগণ আজীবন সাধনায় লিপ্ত থাকিয়া ইহার কথঞ্চিৎ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এতদ্দেশে নানা কারণে ঐতিহাসিক উপাদানের বিশেষ অভাব থাকিলেও সেই অভাব ক্রমে দূরীভূত হইতেছে। আশা করা যায় প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার-সাধন ইতঃপূর্ব্বে একরূপ অসম্ভব হইলেও এখন আর অসম্ভব মোটেই নয়। সেই সুদিন আগতপ্রায়। যে সব উপাদানের মধ্যে দেশের ইতিহাস তাহার রেখাপাত করিয়া যায়, সাহিত্য তাহার অন্যতম। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যের অধিকাংশ ভাগই কবিকল্পনা-সৃষ্ট। এই হেতু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে এতদ্দেশের ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কথাটা আংশিক সত্য হইলেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস উদ্দাম কবি-কল্পনার মধ্যে অনুসন্ধান করিলেও এই দেশের প্রাচীন ইতিহাসের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু মূল্যবান উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কবি-কল্পনা নিশ্চিতই কথঞ্চিৎ সত্য আশ্রয় করিয়া সংগঠিত হইয়াছিল। বাংলার সেই অতীত সুবর্ণময় যুগে বাঙ্গালী যত বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল, স্ত্রীশিক্ষা তন্মধ্যে অন্যতম। সমাজের একার্দ্ধ পূর্ণতা লাভ করিবে ও অপরার্দ্ধ অপূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে, ইহা কখনও হইতে পারে না। প্রাচীন বঙ্গসমাজ এই বিষয়ে যথেষ্ট সাবধান ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন কবির অতিশয়োক্তিপূর্ণ কাব্য ও কথাসাহিত্য হইতে আমরা আজ প্রাচীন বঙ্গের স্ত্রীশিক্ষার কথঞ্চিৎ আভাষ দিতে চেষ্টা করিব। কাব্যগুলির অধিকাংশ ভাগ মুসলমান-বিজয়ের পরে লিখিত হইলেও প্রধানতঃ হিন্দুযুগ ও আংশিক মুসলমান যুগের অবস্থা হইতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। এই বিষয়ে সঠিক কাল নির্দ্দেশের সময় এখনও আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গলায় এক সময় স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ছিল। ইহার অন্যতম কারণ সম্ভবতঃ এতদ্দেশে বৌদ্ধপ্রভাব। বৌদ্ধ-যুগে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই সমভাবে বৌদ্ধবিহারে শিক্ষালাভ করিতেন। ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নাই। তৎকালে জাতিভেদের অবর্ত্তমানতা এই বিষয় নিঃসন্দেহে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার পরে পৌরাণিক যুগের অভ্যুদয়ে জাতিভেদ বেশ সুস্পষ্ট কঠিন আকার ধারণ করিল ও "স্ত্রী ও শূদ্র"-সম্বন্ধে সমাজপতিগণের বিচার যেরূপ দাঁড়াইল তাহাতে তাহাদের মধ্য হইতে শিক্ষাবিষয়টী একেবারে লোপ পাইবার উপক্রম হইল। যাহা হউক অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিগণের কাব্যের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই রমণিগণ তাঁহাদের প্রাচীন শিক্ষার ফল হইতে একেবারে বঞ্চিতা হন নাই। এই কবিগণের বর্ণিত রমণিগণের মনের বল, ধর্ম্মবুদ্ধি—শিক্ষা-দীক্ষা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের বর্ণিত রমণিগণ অপেক্ষা বিশেষ হীন নহে। প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে হইলে যে মানসিক ও দৈহিক এই উভয়েরই উৎকর্ষ লাভ আবশ্যক উহা প্রাচীনগণ সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইজন্য দেখিতে পাই প্রাচীনযুগের রমণিগণ এই উভয় বিষয়েই যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতেন। আমরা নিম্নে এই উভয় শিক্ষা-সম্বন্ধে দু'একটী উদাহরণ দিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে একই পাঠশালায় পুত্রকন্যাগণ শিক্ষালাভ করিতেন,

এমন উদাহরণ প্রাচীন সাহিত্যে আছে। 'পুষ্পমালার' গল্পে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, এক রাজকন্যা ও এক কোতোয়ালের পুত্র একই পাঠশালায় লেখাপড়া করিতেন। ইহার ফলে এতদুভয়ের প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার এই গল্পে বর্ণিত আছে! দয়ারামের সারদামঙ্গল কাব্যে (১৭শ শতাব্দী) বর্ণিত আছে যে, বৈদেব দেশের রাজার কন্যাগণ একটী ছেলের সহিত একই পাঠশালায় পড়িতেন। এই ছেলেটী রাজকন্যাগণের লিখিবার ধূলা ও কুটা জোগাইয়া 'ধুলাকুট্যা' এই নাম লাভ করিয়াছিলেন। এই তো গেল ছেলে-মেয়েদের একই পাঠশালায় যাইবার কথা। শুধু মেয়েদের পাঠশালায় যাওয়ার বর্ণনা আমরা ১১।১২শ শতাব্দীর গোবিন্দচন্দ্রের গানে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। রাণী ময়নামতী একস্থানে বলিতেছেন—

যেকালে জনক গৃহে আছিলাম আমি।
মোরে জ্ঞান দিয়াছেন গোর্ক্ষনাথ মুনি॥
পাঠশালে পড়ি আমি যাই নিকেতন।
ষোল শত যোগী লইয়া গোরক্ষ গমন॥

গোবিন্দচন্দ্রের গান।

এইতো গেল পাঠশালার সাধারণ লেখাপড়ার কথা। মেয়েদের উচ্চাঙ্গের লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা পাঠশালায় ভালরূপ ছিল কি না তাহা জানা যায় না। তবে সম্পন্ন ঘরের মেয়েরা নিশ্চয়ই বাড়ীতেই উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে রীতিমত লেখাপড়া শিখিতেন। মেয়েরা যে ভালরূপে শিক্ষিতা হইতেন তাহার কিছু প্রমাণ খনার বচন হইতে পাওয়া যায়। খনার সম্বন্ধে কিংবদন্তী যাহাই থাকুক না কেন, বাঙ্গলা ভাষায় তাঁহার নামে যে বচনাবলী চলিতেছে, তাহাতেই প্রতীয়মান হয় যে, মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষা প্রাচীনযুগে আকাশকুসুমবৎ প্রতীয়মান হইত না। বিদ্যাসুন্দরের গল্পে দেখিতে পাই রাজকন্যা এরূপ উত্তমরূপে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, তদ্দারা তাঁহার বিদ্যা নামের সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছিল। তৎকালে সমাজের একদিকের আলেখ্য আমরা বিদ্যাসুন্দরের গল্পে প্রসঙ্গক্রমে জানিতে পারি। ইহা বিদ্যাপণে মেয়েদের বিবাহ। যে ব্যক্তি কোন শিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইবে তাহাকে বিদ্যায় তর্কে পূর্ব্বে সেই কন্যাকে পরাজিত করিতে হইবে, নতুবা বিবাহ হইবে না। কন্যাদিগের কি সঙ্গত প্রতিজ্ঞা! বিদ্যাসুন্দরের পুরাতন গল্প অবলম্বন করিয়া মহাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এই সম্বন্ধে বিদ্যার পণের কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই—

শুন রাজা সাবধানে, পূর্ব্বে ছিল এইস্থানে,
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যানামে তার কন্যা, আছিল পরম ধন্যা,
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই, বিচারে জিনিবে যেই,
পতি হবে সেই সে তাহার
রাজপুত্রগণ তায়, আসিয়া হারিয়া যায়,
রাজা ভাবে কি হবে ইহার॥

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

বিদ্যা ও সুন্দরের তর্ক-প্রসঙ্গের বর্ণনা এইরূপ:—

পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধুক॥

* * *

বেদান্ত একমেবাদিত্ব্যা ম্ববাদি তর্ক।
মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক
বৈশেষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে।
পাতঞ্জলে মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে॥
সাংখ্যেতে কি সংখ্যা হবে আত্মনিরূপণ।
পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ নন॥ ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

"চন্দ্রহাস-বিষয়ার" গল্পে আছে, নিদ্রিত সরল যুবক চন্দ্রহাসের আনীত গুপ্ত চিঠিতে লিখিত বিষ শব্দটীতে মন্ত্রী-কন্যা বিষয়া গোপনে "য়া" যোগ করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।

নয়নের কজ্জল লইল সুবিধানে।
লেখিল বিষয়া দান দিহত মদনে।

—ঘনশ্যাম দাসের মহাভারত।

চণ্ডীকাব্যের ধনপতি-উপাখ্যানে বর্ণিত আছে যে, সাধুর প্রথমা পত্নী লহনার অনুরোধে লীলাবতী ধনপতির লিখিত

একখানি পত্র সম্পূর্ণ জাল করিয়াছিলেন, এবং ধনপতির দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী খুল্লনার ও তাঁহার স্বামীর হস্তাক্ষর যে জাল তাহা বুঝিতে বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। যথা—

লীলাবতী পত্র লিখন।
দুই জনে একস্থানে করিয়া যুকতি।
কপট প্রবন্ধে পত্র লেখে লীলাবতী॥
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি।
অশেষ মঙ্গল ধাম লহনা যুবতী।
লহনার বোলেত খুল্লনা পড়ে পাতি।
হাসেন খুল্লনা ছন্দ দেখি ভিন্ন ভাতি॥
বলে দিদি ইথে আমি না করি তরাস।
কেবা পত্র লিখে মোরে করে উপহাস॥
শুন দিদি সাধুর অক্ষর ভিন্ন ছন্দ।
কেবা পত্র লিখে মোর করিয়া প্রবন্ধ॥

—কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য

ময়মনসিং গীতিকায়-বর্ণিত মলুয়া ও কমলার ছড়ায়, বংশীদাসের পদ্মা-পুরাণে ও পশ্চিম ময়মনসিংহে প্রচলিত চান্দমীরার গল্পেও স্ত্রীশিক্ষার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে এইরূপ শিক্ষিতা নারীগণের নাম কত করিব। সুবিখ্যাত মনসামঙ্গলরচক বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী, চণ্ডীদাসের প্রেমপাত্রী রামী বা রামমণি ও রাজা রাজবল্লভের আত্মীয়া আনন্দময়ী—ইহারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রাবতী, রামী এবং আনন্দময়ীও সাহিত্য-সাহিত্য জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে চন্দ্রাবতী (১৬শ শতাব্দী), রামী (১৪শ শতাব্দী) ও আনন্দময়ীর (১৮শ শতাব্দী) অভ্যুত্থান অনেক পরবর্ত্তী যুগে হইলেও প্রাচীনকালের কাব্যে ও গল্পে বর্ণিত শিক্ষিত নারিগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহাদিগের নাম উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ ভিন্ন স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতির আরোও পরিচয় আছে। বারবণিতাগণও লেখাপড়ায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিত। ইহারা নিজহস্তে দলিল লিখিত বলিয়া মাণিক-চন্দ্র রাজার গানে হীরানটীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে। যথা:—

দোয়াত খত কলম যোগাইল আনিয়া।
বার কড়া কড়ি নষ্ট আনিল গণিয়া॥
লেখ লেখ বলিয়া হাড়ি হুকুম ডালা দিল।
সন তারিখ-শ্রী কাগজত লিখিল।
ঐ বার কড়া কড়ি কাগজত লিখিল।
ধর্ম্মর নামটা কাগজত লিখিল॥

মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

বারবণিতা সুরিক্ষা-সম্বন্ধে ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে বর্ণিত আছে যে, সে যুবরাজ লাউসেনকে এমন সব কূট প্রশ্ন করিয়াছিল যে, লাউসেন অনন্যোপায় হইয়া মহাদেব, পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবদেবীগণের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের বারবণিতা বাসবদত্তার ছায়া এই সব বার-বণিতাতে দেখিতেও পাওয়া যায়।

সেকালের নারিগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেন বলিয়া চিত্রবিদ্যা, সূচিকার্য্য, নৃত্যগীত এমন কি রন্ধন বিদ্যাতেও অমনোযোগী ছিলেন না। এই বিষয়ে তাহারা সম্যক দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহগীতিকায় বর্ণিত কাঁজল রেখার আলিপনা দেওয়ার বর্ণনা এইরূপ:—

উত্তম সাইলের চাউল জলেতে ভিজাইয়া।
ধুইয়া মুছিয়া কন্যা লইল বাটিয়া॥
পিটালি করিয়া কন্যা পরথমে আঁকিল।
বাপ আর মায়ের চরণ মনে গাঁথা ছিল॥
জোরা টইল আঁকে কন্যা আর ধান ছড়া।
মাঝে মাঝে আঁকে কন্যা গিরি লক্ষীর পারা।
শিবদুর্গা আঁকে কন্যা কৈলাস ভবন।
পদ্মপত্র আঁকে কন্যা লক্ষী নারায়ণ॥

ইত্যাদি—কাজলরেখা

সূচিকার্য্যে এতদ্দেশের নারিগণের দক্ষতা চিরপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন কাঁচুলি নির্ম্মাণে যে সব সূক্ষ্ম সূচিকার্য্যের পরিচয় বর্ণিত আছে, তাহা যে নারীর হস্তের এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঢাকাতে অদ্যাপি শ্রেণীবিশেষের রমণিগণ এই বিষয়ে সিদ্ধহস্তা। কবিকঙ্কণে মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে বর্ণিত দুর্গার কাঁচুলি ও রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল বর্ণিত নয়ানীর কাঁচুলির বর্ণনা সূক্ষ্ম সূচিকার্য্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে বারবণিতা সুরিক্ষা-সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে—

সূক্ষ্মতর তৎপর আনিয়া খড়িকা।
হাতা হতি পত্র লিখে সুরিকা নায়িকা॥

পত্রের পত্রের রচিল দুই আল।
খুরি বাটী ব্যঞ্জন যোগাতে কালেকাল ॥
নানাচিত্র বিচিত্র নির্ম্মাণ পরিপাটী।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজে শতাধিক বাটী।
রচিত তেঁতুল পত্রে পরিপূর্ণ বারি ॥

—ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল

এক সময়ে নৃত্যগীত স্ত্রী-শিক্ষার একটী বিশেষ অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। উচ্চশ্রেণীর রমণীগণ ইহাতে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিতেন। মনসামঙ্গল কাব্য বর্ণিত বেহুলা শুধু নৃত্যের দক্ষতা দেখাইয়া দেবপুরী হইতে মৃত স্বামী লখিন্দরের প্রাণভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। নৃত্যের পারদর্শিতার জন্ম বেহুলা "নাচুনি বেহুলা" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যেও রাধাকৃষ্ণের বর্ণনা-প্রসঙ্গে রমণিগণের নৃত্যে দক্ষতালাভের কথা পাওয়া যায়।

রন্ধন-বিদ্যায় প্রাচীনকালে রমণিগণ বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করিতেন। কি উচ্চ কি নীচ সব শ্রেণীর রমণিগণের মধ্যে রন্ধন-কার্য্যে পটুতা লাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত; ব্যাধকন্যা ফুল্লরার বিবাহ-প্রস্তাবের সময়ে তাহার এক গুণ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছিল :—

রান্ধিতে বাড়িতে ভাল এই কন্যা জানে।
বন্ধুগণ মিলিয়া সবাই গুণগানে ॥

—কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য, কালকেতুর উপাখ্যান

উচ্চশ্রেণীর মধ্যে রাজপত্নীবৎ গৌরবান্বিতা বণিকপত্নী খুল্লনা ও সনকার রন্ধনের বর্ণনা চণ্ডীকাব্য ও মনসামঙ্গলের একটী উল্লেখযোগ্য ভাগ অধিকার করিয়া আছে। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে বর্ণিত সুরিক্ষার রন্ধন ও চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত (মধ্যখণ্ড) সীতাদেবীর রন্ধন এই বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই তো গেল লেখাপড়া, বিভিন্ন শিল্প ও সুকুমার কলা-শিল্পে প্রাচীন বঙ্গের রমণিগণের দক্ষতার কথা। তাঁহারা দৈহিক বলের উৎকর্ষ-সাধনেও কম তৎপর ছিলেন না। এই বিষয়ে তাঁহাদের যথোচিত মনোযোগ ছিল। ফকির-রাম কবিভূষণের সখী সোনার গল্পে আমরা রাজকুমারী মল্লিকার দৈহিক বলের যে পরিচয় পাই তাহা গল্প হইলেও উপভোগ্য বটে। মল্লিকা স্বয়ং পুরুষদের মত বন্যজন্তু শীকার করিতে বাহির হইতেন এবং গল্পে আছে যে স্বহস্তে ব্যাঘ্র শীকার করিতেন। ইহাতে অনেক সময়ে অস্ত্রেরও আবশ্যক হইত না। ছোট তরবারী সাহায্যে তিনি বন্য হস্তী বধ করিতেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাহার পাণিপ্রার্থী হইবেন তাহাকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। মল্লিকাকে যিনি পরাজিত করিবেন তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। আমরা বিদ্যা ও মল্লিকার গল্প দু'টীতে দেখিতে পাই যে, কি মানসিক কি শারীরিক—উভয়দিকেই নারীগণ পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে কুণ্ঠ বোধ করিতেন না। উহা কম গৌরবের কথা নহে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় যে, কালুডোম-পত্নী লক্ষ্মী, রাজকন্যা কলিঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় যোদ্ধা কোন সময়ে পুরুষদিগের মধ্যেও কদাচিৎ সম্ভব হইত। একাধিক কবি ইহাদের রণ-পারদর্শিতা অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

আমরা উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে দেখিতে পাই যে প্রাচীনকালে সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা পুরুষদিগের ন্যায় নারীদিগেরও সমান প্রাপ্য ছিল। অতি নিম্নস্তরেও এই শিক্ষা অল্প বিস্তর প্রবেশ লাভ করিয়া ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও পুরাণাদি-বর্ণিত চরিত্রগুলির বর্ণনা নারীগণের নৈতিক বলাধান করিয়াছিল। লেখাপড়া অল্প জানা থাকিলেও কথকঠাকুর ও মঙ্গল গায়কদিগের কৃপায় পুরাণাদি-বর্ণিত ঘটনাগুলি সকলেই অল্প বিস্তর জানিতে পারিতেন এবং তাহার ফলে চণ্ডীকাব্য বর্ণিত ফুল্লরার ন্যায় সামান্য ব্যাধপত্নীও ছদ্মবেশী চণ্ডীদেবীকে অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি পারিবারিক কর্ত্তব্য পালনে, এবং ডাক ও খনার বচনে বর্ণিত গৃহস্থালী ব্যাপার বঙ্গনারীর বিশেষ অভিজ্ঞতালাভের উপায় করিয়া দিয়াছিল।

পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগাপেক্ষা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধযুগে নারীগণ অধিক কর্ম্মপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা নিজকার্য্যের ফলাফল অদৃষ্টের উপর আরোপ করিতে না। রূপকথার মালঞ্চমালার উপাখ্যানের মালঞ্চমালা ও ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের লক্ষ্মী, কলিঙ্গা প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু পৌরাণিক প্রভাবে অদৃষ্টবাদ কি নারী কি পুরুষ—সকলকেই ক্রমে অভিভূত করিয়া দেবতার উপর নির্ভরশীল করিয়া ফেলিয়াছিল।

যাহা হউক "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" এই নীতি অবলম্বন করিয়া প্রাচীন বঙ্গসমাজ যে নারীগণের শিক্ষায় বিশেষ যত্নবান হইতেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য উদ্ধৃত এই সামান্য কয়টী উদাহরণই বোধহয় তৎপক্ষে কিয়ৎপরিমাণে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

কথা—শ্রীবিভূতিভূষণ দাস, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীহরেন্দ্রকুমার সিংহ

ইমন্ ভূপালী—একতালা

আসিবেই সখা আসিবে।
আমার এ আশা হ'বে না ব্যর্থ
মিলিবেই দেখা মিলিবে।

তুমি ত পার না ভুলে চলে যেতে,
মালা যে রেখেছি নিরজনে গেঁথে,
শুকিয়ে সে ঝরে যাইবার আগে
তোমার বক্ষে শোভিবে।

মিছে নয় মোর নিশি-জাগরণ,
মিছে কভু নয় পূজা-নিবেদন,
তৃষিত পরাণে এই পথ-চাওয়া
পুলকে ভরিয়া উঠিবে।

নিরদয় নাহি যুগ যুগ রবে
ধরা একদিন দিতেই যে হ'বে
বিরহ-অশ্রু আপনার হাতে
তখন যতনে মুছিবে।

সংকেতিক চিহ্ন :—
উদারা— ⌴
তারাগ্রাম— *

শুদ্ধ মধ্যম বর্জিত
কড়ি মধ্যম যুক্ত

০ ১ + ৩
সা ধা ধ প গা | ধা প গা | সা রে গা গা গা |
আ া সি বে ই | স খা—০ | আ সি বে ০ ০ |

০ ১ + ৩ ০ ১ ৩
গা-পা পা | পা পা পা | পা পা মা -া -া -া - গা গা | গ ধ ধ পা | গা গা | সা রে গা গা গা গা }
আ-মা র | এ আ শা | হ বে না ০ ০ ০ ব্য র্থ | মি লি বে ই | দে খা | মি লি বে ০ ০ ০ }

০ ১ + ৩
গা গা গা | গা পা ধা | সা সা রে সা | সা সা |
তু মি তো | পা র না | ভু লে চ লে | যে তে |

০ ১ + ৩
নি নি নি | ধা পা ধা | নি নি ধা পা গা | গা -া -া |
মা লা যে | রে খে ছি | নি র জ ০ নে | গেঁ থে ০ |

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
গা পা পা | পা পা পা | পা ধা ধা ধা পা গা | র গ প ধা পা গা মা রে গা -া -া
শু কি য়ে | সে ঝ রে | যা ই বা র আ গে | তো মা র ব ০ ক্ষে শো ভি বে ০ ০

০ ১ + ৩
গ প প প | মা -া -া -া | গা গা | গা গা রে সা |
মি ছে ন য় | মো ০ ০ র | নি শি | জা গ র ণ |

০ ১ + ৩
সা নি | নি ধা ধা পা | নি নি | নি রে -সা |
মি ছে | ক ভু ন য় | পূ জা | নি বে দন |

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
গ প পা | প প পা | ধা ধা পা গা রে | সা সা ধা | ধা পা গা | সা রে গা -া -া -া -া -া |
তৃ ষি ত | প রা ণে | এই পথ চা ও য়া | পু ল কে | ভ রি য়া | উ ঠি বে ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

০ ০ ০
গা গা পা ধা | ধা ধা | স স রে সা | সা সা |
নি র দ য় | না হি | যু গ যু গ | র বে |

* ০ * * * ০ * ০
সা রে | গা -া -া -া | ধা নি নি | রে সা সা |
ধ রা | এ ক দি ন | দি তে ই | যে হ বে |

০ * ১ * * ০ *০ + ৩ ০ ১ + ৩
সা পা সা | গা গা | নি নি নি রে সা সা | সা ধা ধা পা গা সা রে গা -া -া |
বি র হ | অ শ্রু | আ প না র হা তে | তখ ন য ত নে মু ছি বে ০ ০ |

'তাল', 'মাত্রা' ও 'তারাগ্রাম' উপরে এবং 'উদারা' স্বরলিপির নিম্নে চিহ্নিত হইল।

বৃহত্তর বাঙ্গলা
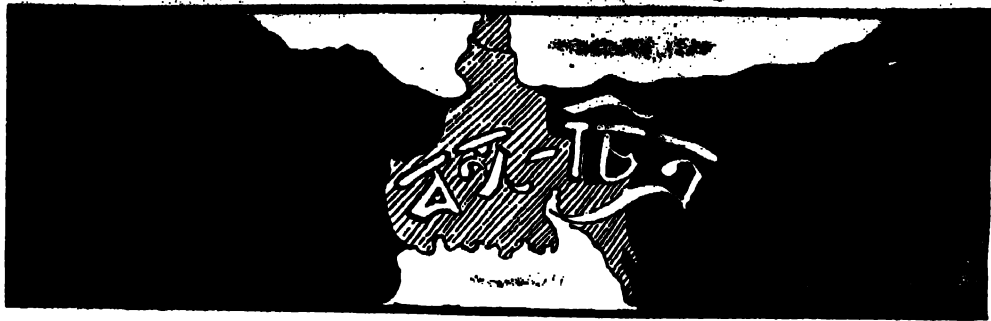
উড়িষ্যাকে একটা পৃথক প্রদেশে পরিণত করিবার আন্দোলন চলিতেছে। বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে তিনটী প্রদেশে বাস করিতেছেন। বাঙ্গলা ভাষা-ভাষীদিগকেও একই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার আন্দোলন চলিতেছে। গত ১৯২১ সালে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা ১৫৬৮১৩৮ জন ছিল। মানভূম জেলার পরিমাণ ৪১৪৭ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ১৫৪৮৭৭৭; ইহার মধ্যে বাংলা ভাষা-ভাষীর সংখ্যা ১০৩৫৩৮৭, হিন্দী ভাষা ভাষীর সংখ্যা ২৮৯ ৫৬. ধানবাদ মহকুমার পরিমাণ ৮০৩ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৪৫৩৯৪৬ জন। মানভূম বাংলা দেশেরই অংশ। সিংহভূম জেলার পরিমাণ ৩৮৭৯ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৭৯৯৪৩৮; ইহার মধ্যে বাঙ্গালী ১২৩০০৭, কোন পরগণার পরিমাণ ও লোকসংখ্যা এবং উড়িয়ার সংখ্যা কত তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

পরগণা	পরিমাণ বর্গমাইল	লোকসংখ্যা	উড়িয়ার সংখ্যা	শতকরা উড়িয়া
চক্রধরপুর	৫৯৬,	১১০৫৩১,	২৪৪৯৫	২২'১৬
ঘাটশীলা	১১৬০,	৩১৬৪২৬,	৪০৩১৮	১২'৬৭
কোলহান	১৩১১,	২৭৮২৬৩,	৬৪৪২৪	২৩'১৫
মনোহরপুর	৮১২,	৫৪২১১৮,	১১৪২৮	২১'০৭

কয়েকটী থানার লোকসংখ্যা ও উড়িয়ার সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল।

	লোকসংখ্যা	উড়িয়ার সংখ্যা	শতকরা
ঘাটশীলা	৯৫০৫০	১০২৫৯	১০'৭৫
জামশেদপুর	৪২২৩৯	১৪৫৫০	২২'৬৭
সাকচী	২৭৬৪০		
বাহারাগুড়া	৬৪০২২		
শাসপুর	৩৯৯০৪	৪৫১	১'১১
কালিকপুর		৮৯৭৪	১৬'৩২

বিহার ও উড়িষ্যার যত বাঙ্গালী বাস করে তাহার শতকরা ৯২'৩ জন বাংলার প্রান্ত-সীমায় বাস করে। ১৯১১ সালে বিহার ও উড়িষ্যার বাংলা-ভাষাভাষীর সংখ্যা ২২৯৯৯৪৪ ছিল। পূর্ব্বে পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জের অধিবাসীদিগকে বাঙ্গালীর মধ্যে ধরা হইয়াছিল কিন্তু গত ১৯২১ সালে উহাদিগকে হিন্দুস্থানীদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ১৯২১ সালে পূর্ণিয়া জেলায় বাঙ্গালীর সংখ্যা ১০২০৩৫ ছিল কিন্তু ১৯১১ সালে ১২০২৫৬৮ ছিল। ভাগলপুর জেলাতেও বাঙ্গালীর সংখ্যা কম ধরা হইয়াছে। সিংহভূমের সরাইকেলা-রাজ্যে কুড়মী-জাতি বাংলা ভাষা ব্যবহার করে।

গত ১৯২১ সালে আসামের লোকসংখ্যা ৭৬০৬২৩০ ছিল, ইহার মধ্যে বাঙ্গালী ৩৫২৫২২০ ছিল। সুরমা উপত্যকা-বিভাগের পরিমাণফল ২৫৩১৭ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৩৫৭১১৯৮, সুরমা উপত্যকার পার্ব্বত্য-বিভাগে বাঙ্গালী ২৬৫২৩৫০। সুরমা উপত্যকার কোন জেলায় কত বাঙ্গালী ও আসামী তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

	বাঙ্গালী	আসামী
শ্রীহট্ট	২৩৩২১৪১	৭২৭
কাছাড়	৩১৩৭৯৭	২০৪৭
খাসিয়া ও জৈন্তিয়া	৪৩১৫	৮৬২
নাগাপাহাড়	৬৩১	১৯২৩
লুসাই পাহাড়	১৪১৬	৫৩

আসাম উপত্যকা-বিভাগে গোয়ালপাড়া-জেলার পরিমাণ ৩৯৫৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৭৬২৫২৩ জন, বাঙ্গালী ৪০৫৭১০ জন। যে সকল জেলায় আসামী অপেক্ষা বাঙ্গালীর সংখ্যা বেশী সেগুলিকে বাংলার সহিত যুক্ত করাই বিধেয়। তাহা হইলে সুরমা-উপত্যকা ২৫৩১৭ বর্গ মাইল এবং গোয়ালপাড়া জেলা ৩৯৫৪ বর্গ মাইল—মোট ২৯২৭১ বর্গ মাইল ভূভাগ আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাংলার সহিত যুক্ত করাই উচিত। শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া এই তিনটী জেলার পরিমাণ ১২৯০৭ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৩৮৩.০৯২ জন, ইহার মধ্যে বাঙ্গালী ৩০৫১৬৪৮ জন।

মেদিনীপুর জেলায় উড়িয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৯০১ সালে ২৭০৪০৫ জন, ১৯১১ সালে ১৮১৮০১ জন এবং ১৯২১ সালে ১৭২১০৭ জন ছিল। যাহারা উড়িয়া ভাষায় লিখিতে ও পড়িতে জানে তাহাদের অধিকাংশই বাংলা ভাষাতেও লিখিতে-পড়িতে পারে। ইহাতে তাহাদের কোন অসুবিধা হয় না। অনেকে আবার মাতৃভাষা উড়িয়া হইলেও বাংলা ভাষাই শিখিয়াছে।

পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমা, মানভূম জেলা, সিংহভূম জেলার ঘাটশীলা পরগণা এবং শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলা বাংলার সামিল হওয়াই উচিত। সিংহভূম জেলার উপর উড়িষ্যার দাবী অসঙ্গত। মানভূম জেলা যদি বাংলার সামিল হয়, তাহা হইলে সিংহভূম জেলাকেও বাংলার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ১৭৬০ সালে নবাব মীরকাশিম চট্টগ্রাম, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর চাকলা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন। বাঁকুড়া জেলার বর্ত্তমান ফুলকুসমা, শ্যামসুন্দরপুর, রাইপুর, অম্বিকানগর, সুপুর, সীমলাপাল, ভালাইডিহা ও ছাতনা পরগণা এবং মানভূম ও বরাহভূম এবং ঘাটশীলা পরগণা সে সময়ে মেদিনীপুর চাকলার অন্তর্গত গোপালপুর-সরকারের সামিল ছিল। এই পরগণাগুলি বাদশাহ আকবরের সময় হইতে গোপালপুর সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আসাম যখন বাংলা দেশের সহিত যুক্ত ছিল তখন শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা ঢাকা-বিভাগের এবং গোয়ালপাড়া জেলা কুচবিহার—বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগের সামিল ছিল।

ভাষা হিসাবে প্রদেশগুলি গঠিত হইলে এই সকল স্থানগুলিকে বাংলার সহিত যুক্ত করিতে হইবে। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ গঠিত হইবার পূর্ব্বে মানভূম ও সিংহভূম জেলার ছাত্রেরা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাঁকুড়া কলেজে পড়িতে পাইত, কিন্তু নব-প্রদেশ গঠিত হওয়ায় তাহাদিগকে হাজারীবাগ, পাটনা ও কটকে যাইতে হয়। ইহাতে তাহাদিগকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাঁকুড়ায় আসা তাহাদের পক্ষে যত সহজ অন্য জেলায় যাওয়া তত সহজ নহে। রাঁচী জেলা স্কুলে আই-এ পড়াইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র লওয়া হয় মাত্র। রাঁচীতে লাট সাহেব ও তাঁহার মন্ত্রীগণ বৎসরে ৭ মাস বাস করিলেও এখনও রাঁচীতে একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হয় নাই। বিহারের সহিত যুক্ত থাকায় মানভূম-সিংহভূম জেলার উচ্চ শিক্ষা-বিস্তারে বিঘ্ন ঘটিতেছে।

—বাঁকুড়া-দর্পণ

(শ্রীরামানুজ কর)

বাঙ্গলায় স্বাস্থ্যের উন্নতি

ডাক্তার বাবাটা বাঙ্গালী স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর। তিনি বলিয়াছেন ১৯০৭ সাল হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে মৃত্যুর হার হাজার-করা ৩১'৮ ছিল, ১৯২০ হইতে ১৯৩০ পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে মৃত্যুর হার হাজার করা ২৫'৩ ছিল; ১৯৩০ সালে মৃত্যুর হার হ্রাস হইয়া ২২'৪ হইয়াছে।

১৮৮০ সালের পূর্ব্বে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হন নাই। ঐ বৎসর স্বাস্থ্য-কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার ফলে ১৮৮৬ সালে স্বাস্থ্য-বোর্ড ও স্বাস্থ্য-ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র কেবল সহরেই ছিল।

ইহার পর ১৯০৬ সালে রোগতত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়। ১৯০১ সালে সেনিটারি ট্যাক-ইন্সপেক্টার ও ১৯০৬ সালে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হ'ন।

১৯১৯ সালে হুক ওয়ার্ম রোগের তদন্ত, কালাজ্বর-নিবারণ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেহ পরীক্ষা ও বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দানের আয়োজন করা হয়।

১৯২৫ সাল হইতে গ্রাম্য স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিধিব্যবস্থা আরম্ভ হয়। ১৯২৭ সালে প্রতি থানায় স্বাস্থ্যতত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের বন্দোবস্ত হয়, এখন বাঙ্গালাদেশে ম্যালেরিয়া ও কলেরা দমনের জন্য ২৫০০ গ্রামে সভাসমিতি হইয়াছে।

ডাক্তার বাবাটা খুব উজ্জ্বল বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু থানায় থানায় স্বাস্থ্যতত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করায় যে ফল লাভের আশা করা গিয়াছিল, অদ্যাপি তাহা পাওয়া যায় নাই। জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীগণ যদি কর্ত্তব্য কর্ম্মে তৎপর হইতেন, তবে বাঙ্গালার রোগ ব্যাধি আরও হ্রাস হইত।

গত কার্ত্তিক মাস হইতে বাঙ্গালার নানাস্থান হইতে কলেরার মহামারীর সংবাদ আসিয়াছে। অনেক স্থানেই চিকিৎসক প্রেরণ করা হয় নাই। এই অবহেলার জন্য বহু গ্রামবাসীর মৃত্যু হইয়াছে।

—সঞ্জীবনী

বাঙ্গালা দেশে অপঘাত মৃত্যু

১৯৩০ সালের পুলিশ-রিপোর্টে প্রকাশ,—বাঙ্গালা দেশে জলে ডুবিয়া প্রায় ৮,৫০০; সাপের কামড়ে ৩০,৫০০; অন্য জন্তুতে ১৫০; ঘর ভেঙ্গে চাপা পড়ে ২০০: আত্মহত্যা করে ৩০০০; অকারণে ২০০০ লোক মারা গিয়াছে।

—খুলনাবাসী

বাঙ্গালার শিল্পবিভাগের অবস্থা

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগের ১৯৩০।৩১ সালের বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ, শিল্পবিভাগের উন্নতির জন্য যে সমস্ত নূতন স্কীম প্রস্তুত করা হইয়াছিল, আর্থিক দুরবস্থার দরুণ সে সমস্ত কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নাই। কেমিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং-বিভাগ যে সমস্ত নূতন নূতন আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাও সব প্রচার করা যায় নাই। সমস্ত দেশেই আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্যের যে দুরবস্থা, তাহাতে জিনিস পত্রের দামও অনেক কমিয়া গিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাও কম; সুতরাং শিল্প-বাণিজ্যের সম্পর্কে ইহাকার অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ ছিল না।

—হিতবাদী

ফরিদপুরের গৃহ-শিল্প

ফরিদপুর জেলার বস্ত্র-বয়ন-শিল্পের অবস্থা মন্দ নহে। বয়নকারিগণ মহাজনের কবলগত নহে। এখানে মোটা কাপড়, নানাপ্রকারের ছিট, মশারির থান, লুঙ্গি, গামছা প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। মিহি কাজ এ জেলায় হয় না। কুমারখালির বাজার হইতে সূতা কেনা হয়। প্রায় ৪০টা গ্রাম বস্ত্র-বয়নের প্রধান কেন্দ্র। অসহযোগ-আন্দোলনের সময় বিলাসখাঁ, মধ্যপাড়া গঙ্গানগর ও মাদারিপুরে কয়েকটা ছোট কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। মাদারিপুরের কারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্যগুলির অবস্থাও খারাপ। মধ্যপাড়ার কারখানায় এখন এণ্ডি, মুগা ও মিশ্রিত সূতা বয়ন হইতেছে।

ফরিদপুর শহরের কলের মোজা লোকে খুব কেনে। এ জেলায় গুড় ও চিনি প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারি হয়। চিনি তৈয়ারির প্রথা পুরাতন। এক প্রকার শেওলা দ্বারা চিনি পরিষ্কার করা হয়।

অতি সাধারণ রকম শাঁখার কাজ এখানে সামান্য কিছু হয়। সাতৈর অঞ্চলে পাটিয়ালগণ শীতল পাটি তৈয়ারি করে। শ্রীহট্টের পাটি অপেক্ষা এই পাটি নিকৃষ্ট হইলেও ইহার বেশ চাহিদা আছে। এ জেলায় উল্লেখযোগ্য আর কোন শিল্প নাই।

—সঞ্জয়

পাটের চাষ

বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকদের আর্থিক অবস্থা একটা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। গত বৎসর পাটের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে কম ছিল, তদুপরি কোন কোন জেলাতে অতিরিক্ত বৃষ্টি হইয়াছিল, ফলে কৃষকদের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা জানি না, কৃষকেরা এখন সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে কি না যে, কেবল মাত্র পাটের উপর নির্ভর করিয়া থাকা নিছক বোকামী,—উহাতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা আর চলিবে না। কিন্তু তাহাদের এখনো উপযুক্ত শিক্ষা হইয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না। এই যে দিনকতক যাবৎ পাটের দর একটু বাড়িয়াছে ইহাতেই তাহাদের মনে লোভ হইছে। তাহারা না কি আগামী বৎসর খুব একটু বেশী পরিমাণেই পাটের চাষ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা যে বিপজ্জনক তাহা তাহারা বুঝিবে না। এই সাধারণ কথাটুকু তাহারা বুঝে না যে পাট পরিমাণে কম উৎপন্ন হইলেই চাহিদা অনুযায়ী মূল্য বাড়িবে।

সঞ্জীবনী

বাঙ্গলায় কুইনাইন

অন্যান্য ঔষধের মূল্য কমিলেও কুইনাইনের মূল্য ১৯২৬-২৭ সন হইতে একরূপই আছে। বাংলায় ২,৬৫৭·৯১ একর জমিতে সিন্‌কোনা উৎপন্ন হয়। কুইনাইনের জন্য প্রতিবৎসর প্রায় ৬৪,৭৬,৪৪৪ পাউণ্ড সিন্‌কোনা-গাছের ছাল সংগৃহীত হয় এবং ৪৪,০২৮ পাউণ্ড কুইনাইন-সাল্‌ফেট প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রতি পাউণ্ডে খরচ হয় প্রায় ২৬০ আনা। ১৯২৯ সনে সরকারের কুইনাইন-প্রস্তুত-বিভাগে ২,৮০,৬৬৭৲ টাকা লাভ হইয়াছিল। ভারতের কুইনাইন-সেবনের পরিমাণ কয়েক বৎসর এইরূপেই চলিতেছে। বার্ষিক কুইনাইন-সেবনের পরিমাণ প্রায় ২,১১,০০০ পাউণ্ড।

—সম্মিলনী

অশ্লীলাত্মক

পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরগাত্রে না কি অনেক অশ্লীল পুতুল আছে। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, কয়েকটা নোংরা অসহ-নেতার কথায় পুরীর রাজা সেগুলি পর্দ্দাচাপা দিবেন অর্থাৎ কাপড় পরাইবেন। কাপড়ের ভিতরে ইহাদের দেখিতেছি কোনই আপত্তি নাই। বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা এই যে জগন্নাথ দেখিতে, যে মনে করিয়া যায়, সে তাহাই দেখে। "নোংরা মনিব মেরা নোংরা বেচাল" স্বরাজী নেতার দল জগন্নাথের মন্দিরে গিয়া ঐ নোংরাই দেখিল—তাহার কপালে উক্তি দিয়া দিলেই হইত। তাহা না করিয়া কাপড় পরাইয়া "সইব্যো" করিবার বাতিক কাহার ঘাড়ে চাপিল? পুতুলগুলিকে না হয় কাপড় পরাইলে; কুকুরগুলোকে কি করিবে, বাঁদরগুলোকে কি করিবে, পায়রা-গুলোকে কি করিবে, চটকপাখীকে কি করিবে—ছুছুন্দরদিগকে ঐ সকল কথার জবাব জিজ্ঞাসা করিবার পর না হয় পুতুলের কাপড় পরাইয়াও। মূর্খের দল কি বোঝে না যে কাপড় দিলে বা পর্দ্দা দিলে ওগুলোর প্রতি আরও মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়। আমাদের বেপর্দ্দা সভ্যতায় "সতীত্বে"র আদর্শ কত হাজার বৎসর বজায় রহিল, আর যেমন সতীত্বে কুসংস্কার প্রচার হইতেছে, অমনি সভ্যতার জন্য পর্দ্দা আবশ্যক—যেমন পর্দ্দা খোলার মাহাত্ম্য প্রচার হইতেছে, অমনি সব কাপড় পরাও রব উঠিল। আমরা সমগ্র হিন্দু-সমাজকে বলিতেছি, পুরীতে গিয়াই ঐ পর্দা টানিয়া দিবে—আর না দাও যদি তবে তোমাদের চোখে মুখে ঐ থাকিবে। দিন নাই, রাত নাই রিরংসার জন্য তোমার মুখ চুলকাইতেছে, আর চোখের সামনে তাহার হুবহু [illegible] অসহ্য বোধ হয়। হাজার করা দর্শকের চারিজনেরও [illegible] যে পুরীতে অশ্লীল পুতুল আছে, আর ব্যাপার লইয়া যাহাদের চোখ টাটায় তাহাদের চোখ উপড়াইয়া ফেলাই সুব্যবস্থা।

—বঙ্গবাসী
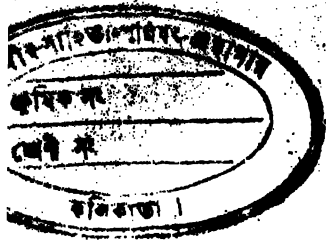
প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

এই প্রার্থনা করিবামাত্র হৃদয়ে অনেক পরিমাণে শান্তিলাভ করিল। তখন মনে করিলাম শান্তিলাভের এমন সহজ উপায় থাকিতে আমি কত অশান্তি ভোগ করিয়াছি। দয়াময় ঈশ্বর অদ্য আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্রাহ্ম-সমাজে আনিয়াছেন, আমারই উদ্ধারের জন্য ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রবাবু অদ্য এই হৃদয়ভেদী বক্তৃতা করিলেন। মনে মনে দেবেন্দ্রবাবুকে ধর্ম্মজীবনের গুরু বলিয়া ভক্তিযোগে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্ম সমাজ হইতে চলিয়া আসিলাম।"

ব্রাহ্ম-সমাজ দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণের সরল মনে কিরূপ ছাপ পড়িয়াছিল তাহা তাঁহার লেখা দেখিয়া সহজে অনুমিত হয়। বৈষ্ণব বিজয়কৃষ্ণ কৌলিক বৈষ্ণবাচরণ মানিয়া লইতে পারেন নাই। বিগ্রহ-সেবায় আনন্দলাভ করিলেও তাঁহার আন্তরিক আধ্যাত্মিক ক্ষুধার তৃপ্তি হয় নাই। বেদান্তের ব্রহ্মভাব ভাল লাগিলেও জীবনে তাহা সাধনাদ্বারা লাভ করিতে ব্যাকুল হন নাই। মনের এই অস্থির অবস্থায় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রার্থনার দ্বারা উপাসনা তাঁহার অন্তরে স্পর্শ করিল। প্রার্থনার দ্বারা উপাসনা খৃষ্টান-ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। রাজা রামমোহন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজে বেদপাঠ, উপনিষদ পাঠ ধর্ম্মব্যাখ্যান ও [illegible] ও ভজন-সঙ্গীতের দ্বারা সমাজ করিতেন। [illegible] প্রার্থনার দ্বারা উপাসনা ব্রাহ্ম-সমাজে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। রামমোহন ছিলেন শঙ্করানুগামী [illegible], কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তৎবিরোধী। রামমোহন [illegible] সর্ববিষয়ে মান্য করিতেন, দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রকে সর্ব্ববিষয়ে অভ্রান্ত ও মান্য বলিয়া মানিতেন না। তাই খৃষ্টীয় রীতি-অনুসারে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও প্রার্থনা দ্বারা উপাসনা ব্রাহ্ম-সমাজে গৃহীত হয়। বিজয়কৃষ্ণের শুষ্ক হৃদয়ে প্রার্থনার দ্বারা উপাসনা ভাবী আধ্যাত্মিক উন্নতির বীজ রোপন করিয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণ এই সময়ের জীবন আলোচনা করিয়া বলেন, "প্রতিদিন প্রার্থনা করিয়া কি অপার শান্তি লাভ করিতে লাগিলাম, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইত, তখনই নির্জ্জনে প্রার্থনা করিয়া দয়াময় পিতার নিকট প্রশ্ন করিয়া উপযুক্ত উত্তর প্রাপ্ত হইতাম। যেদিন সে সত্যলাভ করিতাম, তাহা লিখিয়া রাখিতাম।" বিজয়কৃষ্ণ বুঝিলেন যে, দয়াময় পরমেশ্বর যে গুরু হইয়া অজ্ঞানকে জ্ঞানবান করেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ প্রার্থনা দ্বারা শান্তিলাভ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বগুড়ায় গমন করেন। বগুড়ার ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া বিজয়কৃষ্ণ ডাক্তারী ব্যবসা করিতে মনস্থ করিলেন এবং মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য কলিকাতায় চলিয়া আসেন। পথে কয়েকদিন শান্তিপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় একদিন পরমেশ্বরের পিতৃত্ব আলোচনা করিতে করিতে বিজয়কৃষ্ণের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব জাগিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল "পরমেশ্বর সমস্ত মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি সকলের পিতা-মাতা। এইজন্য প্রত্যেক নরনারীকে ভ্রাতাভগ্নী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর সকলেরই অন্তরে বাস করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, সুতরাং মনুষ্য মনুষ্যকে ঘৃণা করিলে মহাপাপ হয় সন্দেহ নাই। অতএব জাতিভেদ স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া বিশ্বাস করা হয় না। এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছি, এমন সময়ে একাদশবর্ষবয়স্ক একটী বালক বলিয়া উঠিল যে, যদি তুমি জাতিভেদ মান না, তবে পৈতা রাখিয়াছ কেন? তৎক্ষণাৎ বালকের কথা ঠিক বোধ হইল, তখনই তাহার সাক্ষাতে উপবীত ত্যাগ করিলাম। বালকটী তখনই আমার মাতাঠাকুরাণীর নিকট উপবীত-ত্যাগের কথা প্রকাশ করিয়া দিল। মাতাঠাকুরাণী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে গমন করিলেন দেখিয়া পুনর্ব্বার উপবীত

গ্রহণ করিলাম।" পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া মেডিকেল কলেজে পড়িতে আসেন। বিজয়কৃষ্ণ এই সময়ে শুনিলেন যে ইহার জন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হয়। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বিজয়কৃষ্ণের অত্যন্ত অভিলাষ হইল। তিনি দেবেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষা লাভ করিলেন

বিজয়কৃষ্ণ এখন পুরাদস্তর ব্রাহ্ম হইলেন। কিন্তু উপবীত ত্যাগ না করাতে তাঁহার মনে প্রবল অশান্তি হইল। তিনি বলেন, "একদিন ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে 'মহাশয়! উপবীত রাখা উচিত কি না, মৎস্য মাংস ভক্ষন করা উচিত কি না?' তিনি উত্তর করিলেন, 'উপবীত রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উপবীত না রাখিলে সমাজের অনিষ্ট হয়। এই দেখ আমি উপবীত রাখিয়াছি। মৎস্য মাংস না খাইলে শরীর রক্ষা হয় না, মশা ছারপোকা যখন মরে, তখন অন্ত জীব হত্যায় দোষ কি?' এই দুই উত্তরই আমার মতের সহিত ঐক্য হইল না। মনে করিলাম এখনও ব্রাহ্ম-সমাজে কুসংস্কার রহিয়াছে। কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু আমাকে যে পাপ-কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার দূষিত মতের জন্ত তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা হইল না।"

পূর্ব্ববাঙ্গালার কয়েকটী সহপাঠীর সঙ্গে একত্রিত হইয়া বিজয়কৃষ্ণ "হিত-সঞ্চারিণী" নামক একটী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। একদিন সেই সভায় আলোচিত হইল যে, যাহা সত্য বলিয়া বুঝা যাইবে, তাহা প্রতিপালন না করা ভণ্ডামি ও পাপ। বিজয়কৃষ্ণ অমনি উপবীত ত্যাগ করিলেন। বাড়ীতে সে সংবাদ নিজেই লিখিয়া পাঠাইলেন। উৎসাহী বিজয়কৃষ্ণ শুধু উপবীত পরিত্যাগ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না। চতুর্দ্দিকে লোকের অধর্ম্ম পাপ দেখিয়া তিনি অশ্রুপাত করিতেন, শেষে রাজপথে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করিবার সংকল্প করিলেন। একদিন অপরাহ্নে বিজয়কৃষ্ণ প্রেসিডেন্সী কলেজের নিকট দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করিতে লাগিলেন। চারি পাঁচ শত লোক একাগ্র মনে তাহা শুনিলেন। বিজয়কৃষ্ণ বলেন,"কিছুদিন এইরূপ করাতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। ইহাতে লোকের প্রতি দয়া হয়, সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি হয়, সত্যের মহিমা দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।" পাড়াগেঁয়ে বৈষ্ণব বিজয়কৃষ্ণ ধীরে ধীরে কিরূপে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছিলেন, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। প্রথমে প্রার্থনা, উপাসনা, ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও খৃষ্টীয় আধ্যাত্মিক সাধনা স্বীয় আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্ত অবলম্বন করিলেন—ফলে সামাজিকভাবে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাবের বিরোধী জাতিভেদ,অস্বীকার ও উপবীত-ত্যাগ—পরে মানবহিতার্থে পাপীতাপীর জন্ত পাদরীদের স্তায় রাজপথে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মপ্রচার শুধু বিজয়কৃষ্ণ ন'ন বাঙ্গালাদেশে তখন শিক্ষিত যুবক-সমাজ পাশ্চাত্যভাবে ভাবান্বিত হইয়া খৃষ্টীয় ভজনালয়ের অনুকরণে নবধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা, খৃষ্টীয় ভজনালয় প্রচলিত প্রার্থনা ও ভজন সংগীত ও খৃষ্টীয় প্রচারকমণ্ডলীর স্তায় প্রচারকমণ্ডলী-গঠন ও প্রচার গ্রহণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পাপবাদ ও দীক্ষা-গ্রহণ একটী প্রধান ধর্ম্ম মত রূপে ব্রাহ্ম সমাজ অবলম্বন করেন। পাশ্চাত্যভাবে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে সমাজ-সংস্কার ও সংগঠণ করিতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রাহ্ম-সমাজ তৎপর হইয়াছিলেন। ইহাদের সর্ব্বপ্রধান অগ্রদূত ছিলেন আচার্য্য কেশবচন্দ্র।

কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গৎ-সভার সাংবাৎসরিক অধিবেশনে গমন করিয়া 'অনুষ্ঠান' নামে একটী পুস্তিকা বিজয়কৃষ্ণ পাইলেন। বিজয়কৃষ্ণ বলেন, "তাহা পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, তাহাতে লিখিত আছে যে, উপনয়নের সময় উপবীত গ্রহণ করিবে না"—ইহা পাঠ করিয়া মনে করিলাম যে, উপবীত ত্যাগ করা সঙ্গৎ-সভার মত। অতএব এই সভাতে গমন করিতে হইবে। পূর্ব্ববাঙ্গালাবাসী একজন ভ্রাতার সহিত গমন করিয়া সঙ্গতের সভ্য হইলাম। ইহার পূর্ব্বে ভক্তিভাজন কেশববাবুর সহিত আমার পরিচয় ছিল না। সঙ্গতে নিত্য নূতন সত্য লাভ করিয়া ভক্তিভাজন কেশববাবুর নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইতে লাগিলাম। এই সময় হইতে কেশবচন্দ্রের সহিত বিজয়কৃষ্ণের পরিচয় হইল।

(ক্রমশঃ)

ছড়া

শ্রীইন্দুবিকাশ বসু

(৬০১)

জল যাচ্ছে খোলে,
তেঁতুল যাচ্ছে কোণে।

(৬০২)

জামাইয়ের নামে মেরে হাঁস,
আপন জীবে খায় মাস।

(৬০৩)

শাক, শাক, তিন শাক,
তবু বুড়ী করে রাগ।
(কোথাও কোথাও 'বুড়ী'র জায়গায়
মিন্সে'ও শুনিয়াছি)

(৬০৪)

বুঁচকী আগল
সেয়ান পাগল।

(৬০৫)

ধন দিয়ে মন বুঝে
যৌবন দিয়ে আক্কেল বুঝে।

(৬০৬)

প্রয়াগে গিয়ে মুড়িয়ে মাথা,
যাগে পাপী যেথা সেথা।

(৬০৭)

একদিন ঘি রুটী,
একদিন দাঁত ছিরকুটী।

(৬০৮)

যেখান থেকে উৎপত্তি,
সেখান থেকে নিবৃত্তি।

(৬০৯)

গাড্ডায় পড়লে হাতী,
চামচিকেতে মারে লাথি।

(৬১০)

না বিয়েলেক মা, বিয়েলেক ঝী,
ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়াপড়শী।

(৬১১)

বালির বাঁধ, শঠের পিরীতি,
এ দু'য়ের একই রীতি।

(৬১২)

গাছে কাঁঠাল,
গোঁফে তেল।

(৬১৩)

মাঘো জাড়া যাব না,
ফাল্গুন এলে রব না।
(গা-ঢাকা সম্বন্ধে বলা হয়)

(৬১৪)

গরীব মানুষ ফড়িং খায়,
ঘোড়ায় চেপে বা…যায়।

(৬১৫)

থাকত পান দিতাম হাতে,
গুয়া খয়ের দিয়ে ঘরে খেতে,
একলা পোড়া চুণের দায়,
ভরম সরম সকল যায়।

(৬১৬)

থাকরে কুকুর আমার আশে,
ভাত দিব তোরে পৌষ মাসে

(৬১৭)

রেতে মশা, দিনে মাছি,—
এ নিয়ে কলকাতায় আছি।

(৬১৮)

মাগী, কৌ, মিথ্যাকথা,
এ তিন নিয়ে কলকাতা।

(৬১৯)

কুকড়া, কাওয়ারী, হুর,
এ তিন নিয়ে মেদিনীপুর।

(৬২০)

আঁকুড়া বাঁকুড়াবাসী,
মুড়ী খায় রাশি রাশি।

(৬২১)

সকল গুণ আছে পুতে,
হাঁড়িতে খায়, শেযে মুতে।
(শেযে = শয্যায়)

(৬২২)

দুঃখী যায় সুখীর কাছে,
দুঃখ যায় পাছে পাছে।

(৬২৩)

ধা তিং তিং কশ্ মালা,
দেখা শুনা যেই বেলাকে সেই বেলা।
(দেখা শুনা হ'লেই কথা বলা হয়,
তা ছাড়া আর হয় না)

(৬২৪)

সাধিতে আপন কাজ বাঞ্ছা যদি মনে,
কদাচ পরের কথা শুনিও না কাণে।

(৬২৫)

নিগুর্ণ পুরুষের লক্ষণ সার
সদাই করেন মার মার।

(৬২৬)

এত ক'রে পুষিলাম,
না মানিল পোষ,
মানিলাম এ আমার
কপালের দোষ।

(৬২৭)

পণ্ডিতে পণ্ডিতে হয় প্রতি কথায় ছন্দ,
বালকে বালকে হয় প্রতি কথায় দ্বন্দ,
যুবায় যুবায় হয় প্রতি কথায় হাসি,
বুড়ায় বুড়ায় হয় প্রতি কথায় কাশি।

(৬২৮)

আপনখানা কড়ি,
পর পরণা খুলী।

(৬২৯)

লোহা পাথরে যুদ্ধ করে,
শোলা দিদি পুড়ে মরে।

(৬৩০)

যেখানে নাই মান,
সেখানে ছাড় পাকা ধান।

(৬৩১)

অবাক্ কলি, বোবা তার,
গুপ্ত লীলা অতি চমৎকার!

(৬৩২)

যেমন চাষার বুদ্ধি, বলে,
পল্লী গ্রামের মাঠে,
নদী না দেখে নেংটা হ'য়ে
দাঁড়িয়ে আছে হাটে।

(৬৩৩)

পতি ম'ল ভাল হ'ল,
দুই সতীনে পিরীত হ'ল।

(৬৩৪)

ভাবুনী লো ভাবুনী,
তোর ঘর পুড়ে যায়।
যাক গে মোর ঘর পুড়ে,
মোর ভাবুন ব'য়ে যায়।
(ভাবুন = সাজসজ্জা ; ভাবুনী = সজ্জাবিলাসী)

(৬৩৫)

যার কাজ তারে সাজে,
অন্যকে লাঠি বাজে।

(৬৩৬)

ছুঁচোর গোলাম চামচিকে,
তার মাইনে চোদ্দ সিকে।

(৬৩৭)

ললনা তোমার কাছে ছলনা কি খাটে?
তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।

(৬৩৮)

তুমি যদি যাও ডালে ডালে
আমি যাই পাতায়,
তোমার চাতুরী বুঝা যায় কি না যায়

(৬৩৯)

হেদিয়ে পেয়েছ ঘর,
রাতে কান্না, দিনে জ্বর।

(৬৪০)

নেংড়া, খোঁড়া
তিনগুণ বাড়া।

(৬৪১)

কাচ আর মন—দুই সম প্রায়
একবার ভাঙ্গে যদি জোড়া লাগা দায়।

(৬৪২)

গৃহিণী লক্ষ্মীরূপিণী,
বাম হ'লে কাল ভুজঙ্গিনী।

(৬৪৩)

ছিঁড়লে সুতা না যায় গাঁথা
গাঁট দেব তার কত,
ঘুচলো আলাপ তোর সনে মোর
এ জনমের মত।

(৬৪৪)

নদী, নারী, শৃঙ্গধারী
এ তিনে না বিশ্বাস করি।

(৬৪৫)

আমার হ'য়েছে হায় হিতে বিপরীত,
কোঁদল করিয়া শেষে কেঁদে কয় জিত।

(৬৪৬)

মনের ময়লা কাটতে চাও,
সচ্চিন্তায় মন দাও।

(৬৪৭)

দাসখত লিখে দিয়ে পড়ে যদি পায়,
তথাপি নারীর মন পুরুষে কি পায়?

(৬৪৮)

হয়েছ হাটের নেড়া,
হুজুগ তো চাই—
ঠাঠের ঠাকুর বট
নটের গোঁসাই।
বজায় রেখেছ ঠাট,
হ'য়ে ছাড়াছাড়ি,
ভাল আছ ঠাটে ঠাটে
হাটে ভেঙ্গে হাড়ি।

(৬৪৯)

শুসনী শাক রেঁধে মনে বড় খুসী,
দৈবজ্ঞ এসে বলে যথার্থ আজ একাদশী।

(৬৫০)

মিষ্টি লাগল ছাই,
স্বামী পুতকে নাই।
(ছাঁই = পিঠের পুর)

(৬৫১)

আপনার হাতে পড়লে হাঁড়ি,
ভাত রেখে আমানি বাড়ি;
পরের হাতে পড়লে হাঁড়ি,
আমানি রেখে ভাত বাড়ি।

(৬৫২)

ছোট সরাটী ভেঙ্গে গেছে,
বড় সরাটী আছে;
নাচ, কোঁদ বউ আমার
হাতের আটকাল আছে।

(৬৫৩)

কুঁছলী—কড়াই শুঁটী
চুল নেইক দড়ির ঝুটি।

(৬৫৪)

ছিঁচ কাঁছনী নাকে ঘা,
রক্ত পড়ে চেটে খা।

(৬৫৫)

যার নামে উপবাস,
তার সঙ্গে পরবাস।

(৬৫৬)

আহার, নিদ্রা, ভয়;—
যত বাড়াও তত হয়।

(৬৫৭)

কাজের মধ্যে চাষ,
রোগের মধ্যে কাশ।

(৬৫৮)

আ মরি, মিন্সে লোক হাসালে;
গোঁফ রেখেছে তোবড়া গালে।

(৬৫৯)

অন্নের জ্বালা বড় জ্বালা,
একদিন না হ'লে কর্ণে লাগে তালা।

(৬৬০)

মাসী, পিসি, টাটকা বাসী
বনের ধারে ঘর।
কখন মাসী বলে নাক
খই নাড়ুটা ধর।

(৬৬১)

মেঘ ক'রেছে আকাল কুল
ও তাঁতি বৌ চরকা তুল।
(আকাল কুল = আকাশ জুড়ে)

(৬৬২)

ভাত দেবার ভাতার নয়,
কিল মারবার গোঁসাই।

(৬৬৩)

কারও পৌষ মাস,
কারও সর্ব্বনাশ।

(৬৬৪)

ধরি মাছ না ছুঁই পানি,
তবেই বুদ্ধি বলে মানি।

(৬৬৫)

আপনার পোলা খায়,
ঘর পানে ধায়;
পরের পোলা খায়,
বন পানে চায়।

(৬৬৬)

হাতে দই পাতে দই,
তবু বলে কই, কই?

(৬৬৭)

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে,
কাল হ'ল তার এঁড়ে গরু কিনে।

(৬৬৮)

আপনার ধন পরকে দিয়ে,
দৈবজ্ঞ মরে এঁটো পাত কুড়িয়ে।

(৬৬৯)

রাজমাধবী রাজার ঝী,
গিরদে আশে পাশে
দুধের সর গলায় বাধে,
ক্ষীর দেখে বমি আসে।

(৬৭০)

ভাঁড়ে নেই ঘি,
ঠক্‌ঠকালে হ'বে কি?

(৬৭১)

যেমন কর্ম্ম তেমন ফল,
মশা মারতে গালে চড়।

(৬৭২)

আপন কোটে পাই,
ছিঁড়ে কুটে খাই।

(৬৭৩)

গৃহ স্থির আগে করে,
গৃহিণী স্থির তার পরে।

(৬৭৪)

প্রথম পক্ষের মাগ হেলা-ফেলা,
দ্বিতীয় পক্ষের মাগ গলার মালা,
তৃতীয় পক্ষের মাগ পাতে ব'সে খান,
চতুর্থ পক্ষের মাগ কাঁধে চড়ে যান।

(৬৭৫)

দোজপক্ষের মাগ গজরা হাতী,
ভাতারকে মারে তিন লাথি।

(৬৭৬)

প্রথম পক্ষের মাগ চিংড়ী মাছের খোসা,
দ্বিতীয় পক্ষের মাগ করেন গোঁসা।

(৬৭৭)

অকালে না নোয় বাঁশ,
পাকলে করে টঁ্যাশ টঁ্যাশ।

(৬৭৮)

মা দেয় নি চেয়ে,
পেট ভরে নি খেয়ে।

(৬৭৯)

ঘরে নাই দশটা,
তাই করে ফষ্টি নষ্টি।

(৬৮০)

অভিমানী দুয়ো,
নেটি পেটি সুয়ো।

(৬৮১)

দয়ার পর ধর্ম্ম নাই,
হিংসার পর পাপ নাই।

(৬৮২)

যদি সেওড়াতলায় আম পাই,
তবে আমতলায় কেন যাই।

(৬৮৩)

উদরে না থাক্,
খৎ কুড়কে যাক্।

(৬৮৪)

অন্ন চিন্তা চমৎকারা,
ঘরে ভাত নাই জীয়ন্তে মরা।

(৬৮৫)

অজ্ঞানে করে পাপ
জ্ঞান হ'লে হরে।
সজ্ঞানে করে পাপ
সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

(৬৮৭)

আগে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে।
পাছে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে।

(৬৮৮)

সারাদিন ফিরিয়ে মালা,
অতিথ হ'লে সন্ধ্যাবেলা।

(৬৮৯)

দেহ নয় মণি কোঠ',
শেয়াল, কুকুর নয়—জ্যেষ্ঠ বেটা।

(৬৯০)

আরের মন আর দিকে,
চোরের মন বোঁচকার দিকে।

(৬৯১)

কাজ নেই প্রসাদ পেয়ে,
গতর গেল পাথর ধুয়ে।

(৬৯২)

শতদল ভাসিয়ে জলে,
শালুকের মালা পরেছি গলে।

(৬৯৩)

অধিক খেতে করে আশা,
তার নাম বুদ্ধি নাশা।

(৬৯৪)

ন্যাকা, উজল, ঝলসা, কানা—
জল ব'লে খায় চিনির পানা।

(৬৯৫)

দাঁড়িকে মাঝি করা,
মাঝ গাঙ্গে ডুবে মরা।

(৬৯৬)

আগে হাঁটে, পাঁটা কাটে,
প্রদীপ উস্কায়, দই বাঁঠে,
ভাণ্ডারী, কাণ্ডারী, রাঁধুনী বামন
যশ পায় না এই সাত জন।

(৬৯৭)

অন্নপূর্ণা যার ঘরে,
সে কাঁদে অন্নের তরে।

(৬৯৮)

সাধলে জামাই খায় না,
এঁটো পাতটী পায় না।

(৬৯৯)

আগে জামাই কাঁঠাল খান না,
শেষে জামাই ভোঁতাও পান না।

(৭০০)

আগে হাঁটনী, পান বাটনী, বোর ধাই,
এই তিনজনের যশ নাই।
(বোর ধাই—বধূর ধাত্রী)

পাবনা জেলার প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকার

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

গত আশ্বিন সংখ্যার "পঞ্চপুষ্পে" পাবনা জেলার কয়েকজন প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকারের পরিচয় দিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আরও কয়েকজন কবির পরিচয় দেওয়া গেল।

১৫। রণজিৎ রায়

রণজিৎ পোতাজিয়ার রায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের আদি উপাধি নন্দী—রায় ইঁহাদের বাদশাহদত্ত উপাধি। রণজিৎ আরবী, পার্শী, সংস্কৃত, হিন্দি ও বাংলা ভাষা জানিতেন। এমন কি পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকগণের ভাষাও কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সময় হইতে নবাব আলীবর্দ্দি খাঁর সময় পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। রণজিৎ বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়া সেকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার রচিত পরমার্থ তত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক বহু কবিতা প্রচলিত আছে। তাঁহার কোন কোন কবিতায় হিন্দি, সংস্কৃত, বাংলা ও পার্শী ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। বিশুদ্ধ বাংলা ভাষাতেও তিনি কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। রণজিৎএর দোঁহাবলি "চিঁচতান কেতাব" নামে অভিহিত ছিল। তাহাতে প্রায় সহস্রাধিক কবিতা ছিল। রণজিৎ অনেক সমসাময়িক ইতিহাসও কবিতাকারে রচনা করিয়া গিয়াছেন।

১৬। হরিদেব রায়

ইনি তাড়াশের জমিদারগণের পূর্ব্বপুরুষ। পূর্ব্বোক্ত রণজিৎ রায়ের একটী কবিতায় ইঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। হরিদেব রায়ের স্বহস্ত লিখিত অনেক গ্রন্থ এই বংশের গৃহে বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে জৈমিনি ভারতের পুঁথি হইতে ১৬৬০ শকে তিনি উহা নকল করেন জানা যায়। (কায়স্থ পত্রিকা—১৩১৩ সাল ৬৬০ পৃঃ)

১৭। গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ

ইনিও পোতাজিয়ার নন্দীবংশে জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দমোহন গদ্যে ঢাকুরী রচনা করেন। ইনি মৃন্ময়ী, লীলাবতী ও অষ্টাদশ বিদ্যা নামক কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন।

১৮। গুরুচরণ সরকার

গুরুচরণ পাবনা জেলার মালঞ্চি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে "রাধাকৃষ্ণ লীলা" বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইঁহার রচিত ছড়া এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। গুরুচরণের বংশধরগণ মালঞ্চি গ্রামেই বাস করিতেছেন।

১৯। ফকির সেখ

বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য জেলার মত পাবনা জেলাতেও ঠগীদের উপদ্রব ছিল। এক সময়ে এই জেলার শিবপুর গ্রামের মৈত্রবংশীয় জমিদারগণ ঠগীদলের নেতা ছিলেন। এই দস্যুদলের সর্ব্বশেষ নেতা লক্ষ্মীচন্দ্র মৈত্র প্রায় ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে ধরা পড়েন। ফকির সেখ এই লক্ষ্মীচন্দ্রের সমসাময়িক। ইঁহার অনেক কবিতায় শিবপুরের ঠগী দস্যুদলের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ সকল কবিতার শেষে ফকির 'বাহবা গামছা মোড়ার দল" ব্যবহার করিয়াছেন।

২০। সেবকদাস

সেবকদাস সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কীর্ত্তিখোলা গ্রামে বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কবিতাকারে ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি মহারাজ অশোকের যেরূপ গুণ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"অশোক নৃপতিবর পরম ধার্ম্মিক।
সদাচার ন্যায়বান্ বীরেন্দ্র নির্ভীক॥

* * *

সর্ব্বজীবে করিতেন সমভাব জ্ঞান।
ভুল্যাছিল সভাই তখন জাতি অভিমান॥

অহিংসা পরমধর্ম তার আচরণ।
সুখে কাল গোঁয়াইল তার প্রজাগণ॥"

এই পুঁথির শেষ ভাগে জানা যায় যে ইহার লিপিকাল বাঙ্গালা ১১২৫ সাল।

২১। উদীচ্য ভট্টাচার্য্য

ইনি তাহেকের রাজা দেবীদাস ওরফে ঠাকুর কুশলীর সপ্তম অধস্তন পুরুষ। ইহার আসল নাম রামকৃষ্ণ রায়। ইহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রংপুরের তৎকালীন অধিপতি রাজা রায় তাঁহাকে নিজ সভায় লইয়া যান। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ইহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিয়াছিলেন। ইনি "শুদ্ধি কৌমুদী" ও "অধিকরণ কৌমুদী" নামক দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। অধিকরণ কৌমুদীর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অদ্যাপি নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে হইয়া থাকে।

২২। রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার

রামতোষণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলে আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্যের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। ইনি পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তৎরচিত "প্রাণতোষিণী তন্ত্রে" তাঁহার পাণ্ডিত্য। শাস্ত্রজ্ঞান ও তন্ত্রের গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার বাসস্থান এখন হরিপুরে বিদ্যমান আছে।

২৩। বদু গায়ান

পাবনা জেলার দক্ষিণ পূর্ব্বাঞ্চলের কবিওয়ালা। নিবাস বেড়া থানার অন্তর্গত রংপুর গ্রাম। ইঁহার ভাল নাম কি তাহা জানা যায় না। এই নামেই তিনি সাধারণে পরিচিত। ইঁহার কবিগণ এককালে এ অঞ্চলে বিশেষ সমাদৃত ছিল।

২৪। হরু নাপিত

ইনি ফরিদপুর থানার অন্তর্গত ডেমরা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন! ইনি কবিতাকারে ১৮৭৩।৭৮ সালের পাবনা জেলার প্রজা বিদ্রোহের বিবরণ দিয়া গিয়াছেন হরু এই বিদ্রোহকে "পলো বিদ্রোহ" বলিয়াছেন।

ভবিষ্যতে পাবনা জেলার প্রাচীন কবি ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সনেট

(Shakespeare হইতে মর্ম্মানুবাদ)

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

দিশি দিশি ধ্বংসলীলা হেরি আমি যবে,—
জীর্ণ জরা ঝরে যায় শুষ্কপত্র প্রায়;
মহাসিন্ধু আসে ধেয়ে মত্ত কলরবে,
গ্রাসীতে ধরণী; যবে ধূলায় লুটায়,
সুবিশাল সৌধমাল'; সাগরের বুকে,
ভূমি যবে যায় ছুটে আলিঙ্গন মাগি';
নেহারি যখন মোর নয়ন সম্মুখে,—
মহাকাল চলিয়াছে রথচিহ্ন আঁকি',—
দলিত মথিত করি, বিশ্ব-চরাচরে,
হুহুঙ্কার রবে মহাউল্লাসে সদাই;
কাঁপন হয় যে মূক বুকের ভিতরে;—
ভয় হয় সখি, তোরে পাছে বা হারাই।
তাই কাঁদি অহর্নিশ; তুমি জান না লো,
তোমারে হারানো চেয়ে মৃত্যু মোর ভালো।

সম্মোহিতা

(উপন্যাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী উষা মিত্র

বার

স্বামীর দীর্ঘ এক আলোক-চিত্রের সম্মুখে সদ্যঃস্নাতা, ভূনতজানু কুন্তলা মূর্ত্তিমতী পূজারিণীর ন্যায় বসিয়াছিল। কিসের গভীর ব্যথায় নেত্র বহিয়া অশ্রুর বন্যা নামিয়া উহার বসনাগ্রভাগ সিক্ত করিয়া দিতেছিল। বুঝিবা—দুঃখ—কষ্ট—যাতনা—জ্বালা—মর্ম্মের ব্যথা—প্রত্যেক গোপন কথাটী উজাড় করিয়া ঐ দেবতার চরণে—নীরবে নিবেদন করিয়া দিতেছিল। এই সেদিন স্বামীর প্রথম এবং শেষ দান আদরিণী কন্যা গীতালির কোমল গণ্ডে—বিদায়ের শেষ চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। একমাত্র—শান্তি—সান্ত্বনা কাড়িয়া লইয়া বিধাতার কি এমন লাভ হইল। তাঁর অপূর্ব্ব রচনা এই বিশ্ব—এত বড় দুনীয়ার ভিতর কি ঐ ক্ষুদ্র একটী শিশুর মধ্যে খুব ছোট্ট একটু স্থানের সঙ্কুলান হইত না? দেবতা—দেবতা এই অভিশপ্ত জীবনের শেষ কর—মৃত্যু দাও—এ দগ্ধ আত্মার শেষ কর—সকলই তো শেষ হইয়াছে, আছে শুধু বুকভরা দুর্ব্বহ হাহাকার—ও-গুলোরও শেষ করে দাও প্রভু! কুন্তলা আকুলভাবে তন্ময়চিত্তে স্বামীর চিত্রখানা দুই ব্যগ্র বাহু দ্বারা জড়াইয়া ধরিল। এমন সময় তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কে বলিয়া উঠিল, "ও কি করছ বড়-বৌ"।

কুন্তলা বিরক্ত-চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। বহুকাল পরে রমেনের মাসীমাতাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেও বাহিরে সে ভাব প্রকাশ করিল না।

"এস মাসীমা" একখানা পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া কুন্তলা তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইল।

"থাক মা হয়েছে তা ও কিসের পূজো করছিলে?"

"পূজার আমি কি জানি মাসীমা ও অমনি।"

"তা মা ঠাকুর দেবতা থাকতে—সুমুর ছবিকে কেন?"

ম্লান হাসিয়া কুন্তলা বলিল,—"ঠাকুর দেবতা কে তো চিনি না, ওঁকেই চিনি, দেবতা বলে জানি।"

"ও মা সে আবার কি কথা গো, তা যাক্ গে, যার যেমন ইচ্ছে...গীতার কথা শোনবার পর থেকে প্রাণের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করছিল আসবার জন্য, তা পোড়া সংসারের জন্য বাইরে বেরুবার কি ফুরসৎ আছে। কাজ, আর কাজ, আর তাই পারি কি বুড়ো হাড়ে সইতে, জ্বরে পড়লুম, আজ সবে দুটো ভাত মুখে দিয়ে আসছি।"

"কে গা, বড়-গিন্নি না কি?" নবাগতা বিনয়ের পিসীমাতা আসন গ্রহণান্তে বলিলেন, "কার অসুখের কথা বলছিলে বড়-গিন্নী?"

"কার আর বলব দিদি, এই নিজের কথাই বলছিলুম—শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না, এই খাটুনি কি বুড়ো হাড়ে সয়?"

"সত্যি, তা বাপু ছেলের বিয়ে দাও না।"

"আমার কথায় কি সব কাজ হয় দিদি, ছেলের আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ, সুন্দরী মেয়ে, সে আবার যেমন তেমন নয়, নিখুঁত হ'বে তবেই রমেন বে করবে।"

সুন্দরীর অভাব কি। আবার তাও বলি, আমাদের বড়-বৌর মত এমন ডানা-কাটা পরী পাচ্ছেন না।—যাই বল, এত শোকে দুঃখেও কি ছিরি, রূপ যেন দেহে ধরছে না।" তিনি একবার আড়চ'খে কুন্তলার দিকে চাহিতে ভুলিলেন না। কিন্তু যাহাকে নিমিত্ত করিয়া এতগুলা প্রশংসা বর্ষিত হইল লজ্জায় দুঃখে সে অস্থির বিব্রত হইয়া উঠিল। কুন্তলা বুঝিতে পারিল না কিজন্য সে তাহার রূপের স্তুতি করিতেছে। যাহা হউক, মাসীমাতার ইহা সহ্য হইল না, মুখ ঘুরাইয়া কর্কশকণ্ঠে বলিলেন, "দেখ দি আমার ভাসুরপো-বৌকে! গ্রামের লোক একবাক্যে বলেছিল—হাঁ সুন্দরী একটা দেখা গেল বটে। প্রত্যয় যাবে না দিদি, পুকুর-পাড়ে দাঁড়ালে, জলে গায় রং দেখা যায়।"

"হাঁ গা বড়-গিন্নী জলে যে সবারি ছায়া পড়ে।"

"আহা তা আর জানি না; বুড়ো হ'তে চললুম কিন্তু রং আলোর এপর চকচক্ করতে দেখেছ কখন ?"

অবাক্ বিস্ময়ে বিনয়ের পিসী অস্বীকারসূচক মস্তক নাড়িয়া বলিলেন, "তবে ?"

জয়ের গর্ব্বে মাসীমাতা প্রফুল্ল হইয়া গর্ব্বিতনেত্রে চাহিলেন, "শুধু তাই নয়, অন্ধকারে যখন সে দাঁড়ায় আলোর দরকার হয় না।"

"ওঃ, এ আবার কি বলছ বড়-গিন্নী, এ সব কথা যে কেতাবেই পড়েছি, এও না কি সত্যি হয় ?"

রোষভরে মাসীমাতা বলিলেন, "তবে মিথ্যেই বলছি এই বুড়ো বয়সে—পুজোআচ্ছা ছেড়ে দিয়ে মিছে বলব না কি ? সে মরে নি, আমিও না, প্রত্যয় না হয় কলকাতায় গিয়ে দেখে আসতে পার।"

বিনয়ের পিসী বলিল, "তোমায় মিথ্যেবাদী বলি নি বড়-গিন্নী। রাগ করছ কেন, যাক্ গে বাবু, ও-সব কথায় আমার দরকার কি। বড়-বৌর কাছে একটু কাজে এসেছিলুম, তা উঠি এখন বাছা।"

"না, না পিসীমা এসেছ যাবে কেন ?"

"না বাছা, মুখ আলগা মনিষ্যি এক কথা বলতে অন্য কথা বলে ফেলব, উল্টো বুঝে বড়-গিন্নী রাগ করবে। জমীদারের রেয়ত, তাই কি পারি জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া করে গাঁয়ে বাস করতে।"

খুসী হইয়া মাসীমাতা বলিলেন, "আহা যাবে কেন দিদি। আমারি বোজবার ভুল, বস ভাই ভাল আছ তো ? এই বীণু রোজ আসে কত ছেদ্দা-ভক্তি করে আমায়, বীণু আর রমেন যেন একজোড়া, দেখলে চক্ষু জুড়োয়।"

"সেকথা আর বলতে—বাড়ী এসে বীণু আমার কাছে কত সুখ্যেত করে তোমার—বলে গিন্নীর সেরা আমাদের বড় গিন্নী, সেদিন কত সব তরিতরকারী পাঠিয়ে দিছলে—বীণু আহ্লাদে আটখানা তা আমাদের জমিদারও যে শুনি খুব ছেদ্দাভক্তি করেন তোমায়।"

"মিছে বলব না,—মাসী বলতে বাছা অজ্ঞান, তবে কি না ভাই, সোহাগী মেয়েটার জ্বালায় অস্থির হ'য়ে উঠেছি। সময়ে সময়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়—তাই কি আছে যাবার যো! রমেন পায়ে জড়িয়ে ধরে বলে, ছেলে-মানুষ জ্ঞানবুদ্ধি হয় নি।"

চক্ষুদ্বয় কপালে উঠাইয়া পিসীমা বলিলেন—"বল কি গো, ওই আঠার বছরের মেয়ে ছেলে মানুষ !" কুন্তলা অন্তরে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। ধীরে ধীরে পিসীমা বলিলেন, "ছেলে মানুষ বই কি, কতটুকুই বা ওর জ্ঞান হয়েছে।"

অন্য সময় হইলে দু'কথা মাসী শুনাইয়া দিতে ছাড়িতেন না। উহার কথার প্রতিবাদ করিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ নিষ্কৃতি পায় নাই—তবে না কি পাছে কুন্তলার সহিত উহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল—উহাকে চটাইতে তাই ইচ্ছা হইল না, চাপিয়া গেলেন।

তারপর কোমলকণ্ঠে কুন্তলাকে মাসী বলিলেন,— "তোরই বা কি বয়স মা, এই বয়সে কত না সইলি—সব মনে হ'লে চোখে জল রাখতে পারি না। বলছিলুম কি, ইলা তোমার খুব কথা শোনে, তাকে বুঝিয়ে একটু বলো,—রমেনকে বললে সে হেসে উড়িয়ে দেয়, বলে বৌদি ওসব জানে, সেই ওর বিয়ে দেবে। মা ইলাকে ওঁরই হাতে দিয়ে গেছেন—বিয়ের আমি জানি কি।"

উহার উপর দেবরের এখনও এত বড় বিশ্বাস আছে জানিয়া এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও কুন্তলার চিত্ত শান্তিতে ভরিয়া উঠিল।

"ইলাকে রাজী করা তো শক্ত নয় মাসীমা।"

আনন্দিতা মাসী বলিলেন, "রাজী কর বাছা—বিয়ের নামে মেয়ে খড়্গাহস্ত—পাত্তর আমি ঠিক করেছি।"

বিস্মিতা কুন্তলা বলিল, "এখানেই কি ?"

"পাগলীর কথা শোন। এখানে তার যুগ্যি পাত্তর কোথা পাব ? আমার খুড়তুতো দেওরের ছেলে কালী-চরণ, রূপে কার্ত্তিক, তবে লেখাপড়া তেমন শেখে নি, জমীদারের ছেলে কি না, বুঝেছ বৌমা, একটু আদুরে হয়, তাই একটু বা বার দোষ। মা মাগী হাপ্সে মরে ছেলে বাড়ী থাকে না, আমি বলি একটা বড় সড় মেয়ে দেখে বে দে, সব সেরে যাবে—কি বল দিদি ?"

বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধভাবে কুন্তলা বসিয়া রহিল।

মাসী আগ্রহভরে বলিয়া চলিলেন, "বড়লোকের ছেলে

অমন ঘর—বর আর পাবে না বৌ, তুমি ইলাকে রাজী কর বাছা, এই সামনের মাসে বে দিয়ে ফেল।"

ঝড়ের মত হঠাৎ সেখানে আসিয়া ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে ইলা বলিয়া উঠিল, "খুব সভা ব'সে গেছে, কার বিয়ের কথা হচ্ছে শুনি।"

কৌতুকভরে কুন্তলা বলিল, "তোর।"

"কেন আমায় বিদেয় না করে বুঝি তোমার প্রাণ ঠাণ্ডা হ'বে না! বেশ, বিদেয় ক'রে দেখ ক'দিন এ গাঁয়ে থাকতে পার, সবাই মিলে তোমায় চিবিয়ে—মেরে রেখে দেবে।"

উহার বলার ভঙ্গীতে কুন্তলা হাসিয়া ফেলিল।

"ঐ তোমার দোষ বড়-বৌ। এই আস্কারাতে না ও বেড়ে উঠেছে—গুরুজনকে গ্রাহ্যি করে না।"

"কেন তোমার জালায় কি বৌদি একটু হাসবেও না? করবো না আমি বিয়ে, কি করবে তুমি?"

সহসা মাসীমা উগ্রভাব সংবরণ করিয়া যথাসম্ভব মধুর-কণ্ঠে বলিলেন, "এবার ছাড়ান-ছিড়েন নেই, দেখিস্ কেমন টুকটুকে বর এনে দেব,—বড় ঘরের বৌ হ'বি। শ্যামাচরণ দে'র মত এমন বড় জমীদার এ অঞ্চলে নেই।"

হাসিয়া ঢলিয়া পড়িয়া ইলা উত্তরে বলিল, "এতক্ষণে বুঝলুম, তোমার সেই আদরের কালীচরণ বুঝি? জমীদারীর খবর রাখি না, তবে তার মত ধূর্ত্ত—বদমাইস—মাতাল এ অঞ্চলে নেই, এটা ঠিক মাসীমা।"

উত্তরে কুন্তলা বলিল,—"কি বলছ ইলা? মুখ সামলে কথা বল, তার নামে যা তা বল না।"

কুন্তলার দিকে মুখ ফিরাইয়া মাসীমা বলিলেন, "মুখ্যু নয় মা, তিনখানা ইংরেজী কেতাব পড়েছে, জমীদারের ছেলে—।"

ইলা হাসিয়া উঠিল, কুন্তলা হাসিবার জন্য মুখ ফিরাইল।

"ও মা অবাক্ করলে, মেয়ে হেসেই ঢলে পড়লো যে, এমন পাত্তর তোর পছন্দ হয় না?"

শান্তকণ্ঠে কুন্তলা বলিল, "পছন্দ অপছন্দের ও কি জানে।"

"হ্যাঁ তাই বল মা—তোমার পছন্দ হয়েছে তো?"

দৃঢ়স্বরে সে বলিল "না।"

"কেন?"

এই কেনর উত্তর দেওয়া কত কঠিন একথা কুন্তলার ন্যায় অপরে জানিত না, অগত্যা কুন্তলা নীরব থাকাই যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা করিল। ইলাকে তাড়াইতে পারিলে মাসীমা নিশ্চিন্ত হইবেন, ভয়ে ভয়ে কতদিন থাকিবেন তিনি! ইহা ব্যতীত তাহার ধারণা কোনদিন হয়তো উঁহার একাধিপত্য ঐ মেয়েটার কথায় রমেন কাড়িয়া লইবে। কুন্তলার নীরবতায় মাসী অন্তরে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, অন্য স্বভাব-বহির্ভূত কার্য্য করিয়া ফেলিলেও, কুন্তলার করদ্বয় চাপিয়া নরম স্বরে তিনি বলিলেন, "বেশ তো মা,—তুমি, তুমিই না হয় খুঁজে-পেতে সৎ-পাত্রে ওর বে দাও।"

মাসীমার শান্ত সস্নেহ ব্যবহারে ইলা বিস্মিত হইলেও কুন্তলা যেন ইহার কারণ বুঝিয়াছিল। অধিক বাক্য ব্যয় করিতে কুন্তলার প্রবৃত্তি হইল না। সংক্ষেপে বলিল, "তাই দেবো ছেলে একটী আছে।"

আগ্রহভরে মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করে? কোথায় থাকে? নাম কি মা।"

"আগে ঠাকুরপোকে বলি, তখন বলব।"

"কেন আমায় বিশ্বাস হয় না?"

সঙ্কুচিত ভাবে কুন্তলা বলিল, "আজ থাক মাসীমা।"

কি ভাবিয়া মাসী বলিয়া উঠিলেন, "তা হ'লে আজ যাই বৌমা,চেষ্টা করো বাছা যাতে শিগ্গীর হয়।"

খিল্ খিল্ করিয়া ইলা হাসিয়া উঠিল; কুন্তলার ইঙ্গিতে সে চুপ করিল।

কুন্তলার শুষ্ক-ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া ইলার বুঝিতে বিলম্ব রহিল না যে, অদ্য উহার বৌদির আহার হয় নাই। নিকটে সরিয়া আসিয়া সে বলিল, "বড় ক্ষিদে পেয়েছে বৌদি, ভাত দেবে চল।" ইতস্ততঃ করিয়া কুন্তলা বলিল, "ভাত নেই।"

"কেন"

"রান্না করি নি।"

"কেন কর নি?"

"ভুলে গেছি।" কুন্তলা জোর করিয়া হাসিল।

"তুমি এমনি করে না খেয়ে মরবে ভেবেছ। আমার জন্য বাঁচাও কি দরকার মনে কর না? এমনি করে রোজ

গোজ না খেয়ে থাকবে, যা ইচ্ছা তাই করবে? পারব না সইতে আমি" বলিয়া ইলা কাঁদিয়া ফেলিল। বিনয়ের পিসীমাতা বলিলেন, "সে কি মা এখনও তুমি খাও নি, যাও ওঠো ছুটো ফুটিয়ে নাও গে, বেলা যে আর নেই।"

কুন্তলা কেবলই শান্তমুখে বসিয়া রহিল। চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া ইলা সশব্দে রান্নাঘরের দ্বার খুলিল। বাসনগুলার শব্দ করিয়া উনান জ্বালিয়া, রন্ধন চাপাইয়া দিল।

"খাও মা, ওঠ।"

"ইলা রান্না করছে পিসীমা, তুমি ব্যস্ত হয়োনা।"

"এমন আর করো না,—এতে শরীর যে খারাপ হ'বে মা।"

"কি হ'বে আর শরীর নিয়ে পিসীমা—"

"ওমা তা বল্লে কি হ'বে, কিই বা এমন বয়স তোমার, এ বয়সে কত মেয়ে আবার বিধবা বিয়ে করছে তা তুমি জান না? বীণু সে দিন খবরের কাগজ পড়ে বলছিল—কত কত বিধবা না কি বিয়ে করছে। আমি বলি বুঝি সে ভাল, লুকিয়ে কতকগুলা পাপ না করে,একটাকে নিয়ে না হয় রইল, তুমি এ সব শোন নি মা?"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিসী কুন্তলার দিকে চাহিলেন। অন্যমনস্ক-ভাবে কুন্তলা ক্ষুদ্র 'হুঁ' ব্যতীত কিছু বলিল না।

কতক্ষণ পরে পিসী বলিলেন, "তাই আজ তোমার কাছে এসেছি।"

চকিতে কুন্তলার মনে পড়িল, ইনি কি যেন প্রয়োজনের কথা বলিয়াছিলেন, তার পর বিবেচনা করিয়া বলিল, "তুমি কি দরকারের কথা বলছিলে না?"

"সেই কথাই যে বলছি গো, একবার দেখে আসি কেউ—আবার না শোনে।" পিসীমাতা উঠিয়া বহির্দ্দেশ পরীক্ষা করিয়া ফিরিলেন।

উহার এ সতর্কতা কুন্তলার ভাল লাগিল না কিন্তু উহার কারণও সে জিজ্ঞাসা করিল না। উহার নিকট সরিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "তবে শোন মা, বীণু [illegible] কত করে বললে—"জিজ্ঞাসু-নেত্রে কুন্তলাকে [illegible] দেখিয়া পিসীমা বলিলেন, "বিধবা বিয়ে [illegible] বলি তোমার বয়সই বা কি। এখানে কেউ [illegible] পারবে না, কলকাতায় বিয়ে হ'বে—সেখানেই সে তোমায় নিয়ে থাকবে—কত করে বোঝালুম কিন্তু কি শোনে। তার মাকে লুকিয়ে তাই আজ তোমার কাছে এসেছি, অমত করো না মা, এতে ভাল হ'বে সুখী হ'বে।"

মুহ্যমানা কুন্তলার নিকট হইতে আলোকের দীপ্তি সরিয়া গিয়া সীমাহীন অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

সংসারের চক্ষুতে সে বড় হেয় হইয়া পড়িয়াছে, লোকে যে এমন একটা হীন ধারণা তাহার বিরুদ্ধে পোষণ করিয়া লইয়াছে ভাবিয়া সে মরমে মরিয়া গেল। লোকের কি এ বাধা-হীন—সঙ্কোচশূন্য স্পর্দ্ধা। যাহা হউক কুন্তলার নীরবতার সম্মতিসূচক বুঝিয়া পিসীমাতা উঠিলেন, "তবে যাই মা, তাকে এ কথাই ব'লে দেব'খন।"

কুন্তলা শিহরিয়া উঠিল—আর্ত্ত অসহায় কণ্ঠে বলিল,—"কোথায় যাও? কাকে কি বলবে?"

"তবে কি তুমি রাজী নও?"

কুন্তলা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "কি বলছ তুমি, এ'ত বড় কথা বল্‌তে তুমি সাহস কর—তোমার একটু লজ্জা হ'ল না। এখুনি তুমি চলে যাও—যাও, এখুনি ইলা শুনে ফেলবে, যাও—তুমি যাও।"

"ও মা এ কি কাণ্ড কে জানে বাছা আজকালকার মেয়ে-দের চরিত্তির, দেবতাও বুঝতে পারবে না বাছাকে আমার পাগল ক'রে এখন বলে কি না, চলে যাও।

অবজ্ঞার স্বরে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দ্বার দেখাইয়া কুন্তলা বলিল, এখানে দাঁড়িও না—"যাও।" উহার রক্তবর্ণ চক্ষু ও ভীষণ আকৃতি দেখিয়া পিসী আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিলেন না।

(১৩)

"বৌদি"

"কেন ইলি"।

"কি বলছিল ঐ বীণুদার পিসী তোমায়"?

লজ্জায় কুন্তলা রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

"বল না কি বলছিল?"

"সে কথা তুই নাই শুনলি"

"না তোমায় বলতে হ'বে, কেন তুমি অমন রেগে

উঠেছিলে, রান্নাঘর থেকে যে তোমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলুম, চুপ করে থেক না, বল বৌদি।"

পরিষ্কার কণ্ঠে কুন্তলা উত্তর দিল, "ও-কথা তুই জানতে চাস্ না ইলা।"

"কিন্তু কেন?"

কুন্তলা হাসিয়া উঠিল, "যদি তোর 'কেন'রি উত্তর দেব তবে সব বলতে আপত্তি ছিল কি?"

"আমার কাছে লুকবার কিছু থাকতে পারে তোমার, এও কি আজ বিশ্বাস করতে বল বৌদি?"

উহার কণ্ঠস্বরে কুন্তলা চমকিত হইয়া বলিল, "শুনবি যদি তবে শোন, কিন্তু তার আগে প্রতিজ্ঞা কর ইলি, গোল কিছু করবি না, করিস যদি তবে তোর বৌদির ক্ষতি বই লাভ কিছু হ'বে না।"

"সামান্য কথা বলবার জন্য আজ তোমার ভূমিকার দরকার কেন হচ্ছে বৌদি? ভাল লাগছে না, শিগ্‌গীর আমায় বল।"

বেদনার হাসি হাসিয়া কুন্তলা বলিল—"ভূমিকার যে দরকার হ'য়ে পড়েছে কথাগুলো গলা থেকে যে কিছুতেই বার হ'তে চাচ্ছে না।"

"এমন কথা; আর তাই শুনে চুপ করে রইলে তুমি?"

"এ ছাড়া উপায় নেই ইলা আমি যে বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, মিছে তর্ক করে কতকগুলো কটু অশ্রাব্য শুনতে প্রবৃত্তি হ'ল না, বারে বারে বিচারের মাপকাঠিতে তুলে ধরতে আর যে পারি না নিজেকে—আর পারি না সত্যি বলছি ইলি।"

মনে মনে ইলা প্রতিজ্ঞা করিল এইবার সে উহার বৌদির অবমাননাকারীদের উত্তমরূপে শাস্তি না দিয়া ছাড়িবে না। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর বল।"

মৃদুকণ্ঠে কুন্তলা বলিল, "তারা আবার আমায় বিয়ে করতে পরামর্শ দেন।"

দন্তদ্বারা অধর চাপিয়া ইলা বলিল, "এই তারা মানে? কোন মহাপুরুষ?"

"সে কি আর একজন তাই নাম মুখস্থ করে রাখব।"

"দেখ বৌদি মিথ্যে আমায় ভুলিও না, যা-তা-বলে দিও না, বিনয় বাবু স্বয়ং বিয়ে করতে চান বুঝি?"

কুন্তলা চুপ করিয়া রহিল।

"যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। আচ্ছা দেখব এবার এ গাঁয়ে কে থাকতে পায়, জমীদারের বৌকে বিয়ে করার সাহস মন্দ নয়।"

ইলাকে এখন ছাড়িয়া দিলে সে যে কি করিবে তাহা বুঝিতে পারিয়া কুন্তলা তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কি করিস ইলা সব তা'তে ছেলেমানুষী করিস না একটু বুঝতে শেখ।"

"ছাড় ছাড় বৌদি মজাটা একবার দেখিয়ে আসি।"

কুন্তলা অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল, শক্তি সহযোগে ধরিয়াও সে উহাকে রাখিতে পারিতেছিল না। কিন্তু জিতেনকে আসিতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইল, অকস্মাৎ উহার সম্মুখে ইলা শান্তভাব ধারণ করিবে—কিন্তু উহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে এ বিশ্বাস তাহার সত্য নহে।

"বড় আজ যে যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়ে গেছে, ব্যাপার কি দিদি?"

"এরা বলে—এই বিনয় পাজি বলে—বৌদিকে বিয়ে করবে, সে আমি সইতে পারব না, সে এই গাঁয়ে থাকুক নয় আমি তাকে দেখব, একবার, বৌদিকে ছেড়ে দিতে বলুন না জিতেনদা।"

আন্দাজে কতক বুঝিয়া জিতেন স্তম্ভিত হইল। কতক্ষণ পরে শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কিন্তু এই নিয়ে গোল করে কোন লাভ নেই ইলা।"

"বলেন কি আপনি এ কথা শুনেও চুপ করে থাকব?"

"হ্যাঁ"

"কিন্তু কেন, কেন সে যা তা ল ?"

"ভগবান্ মানুষের জিভ্ দিয়েছেন কথা বলবার জন্যে, তাদের যা ইচ্ছা তা বলবে, এ নিয়ে গোল করে লোকসান ছাড়া লাভ নেই।"

"তাই বলে এমন স্পর্দ্ধা দেখেও অন্ধ হ'য়ে থাকতে হ'বে?"

"যখন উপায় নেই তখন সইতে হ'বে বই কি, কিন্তু এ স্পর্দ্ধা তারা পেলে কোথা থেকে সে কথা কি [illegible] কোন দিন?"

"এর মধ্যে আবার ভাব্‌বার কি আছে জিতেন-দা?"

"আরো নাই কি বোন, এ সাহস তারা সেই দিন পেয়েছে, যে দিন—"

"আ না বল দাদা আমি বুঝতে পারছি না, চুপ করে থেক না।"

"কিন্তু সে কথায় যে তুমি আঘাত পাবে দিদি।"

"হোক গে, বল তুমি, আমার কিছু কষ্ট হবে না।"

"বুঝতে পারছ না ইলা? আমার কিন্তু আগেই মনে পড়েছিল, যখন তোমায় দাদা ঐ নীচ প্রকৃতির লোকগুলোর সামনে দিদিকে—"

মুখ ঢাকিয়া ইলা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বুঝেছি, সব বুঝেছি, চুপ কর দাদা চুপ কর। এই লজ্জাকর ব্যাপার চাপা দিবার জন্য হাসিয়া কুন্তলা বলিল, "আজ দুমাস যে দুভায়ের টিকির সন্ধান মেলে নি—ব্যাপার কি?"

"নরেন কেন আসে না সে কথা জানি না, কিন্তু আমি ইচ্ছে করে আসি নি এ ভেব না দিদি, হঠাৎ মা মারা গেলেন—"

"ও তাই" সমবেদনায় নারীদ্বয়ের প্রাণ ভরিয়া উঠিল। "তারপর আমার বোন সুলেখা আর বাবাকে পুরীতে রেখে এলুম। বাবার স্বাস্থ্য একেবারে খারাপ হ'য়ে গেছে; লেখা এখানে আসতে চেয়েছিল।"

"এখানে আমার কাছে?"

"হাঁ দিদি তোমার কাছে, বলেছি ফিরবার সময় তাঁদের কিছুদিন এখানে এনে রাখব। আমার বিশ্বাস তোমার কাছে থাকলে তাঁরা শান্তি পাবেন।"

আগ্রহভরে ইলা বলিল, "এন, দাদা নিশ্চয় এন, আমার বৌদির কাছে থাকলে নিশ্চয়ই শান্তি পাবেন।"

"সে আমি ভাল রকমেই জানি বোন।"

"নরেনের অসুখ-বিসুখ কিছু করে নি তো?"

"অসুখ? কই একথা জানি না।"

"কেন তবে সে আসে না আর?"

"সুলেখার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল না? মায়ের জন্য বুঝি দিন পেছিয়ে দিতে হ'ল?"

"না সে বিয়ে করতে অস্বীকার করছে।"

বিস্ময়ের সহিত জিতেনের দিকে চাহিয়া কুন্তলা বলিল, "কি বলছ তুমি? সে নিজে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলে? কিন্তু সে যে আমাকে অনেকবার বলেছিল যে লেখা বড়ই স্নেহ করে। তবে কি তবে কি—"

"না দিদি সে ভালবাসত না মোটেই, আমরাই ভুল করেছিলুম লেখাকে তার সঙ্গে মিশতে দিয়ে—আর ভুল করেছিল সে অন্তরের কথা ভাল করে না বুঝে, কিন্তু তার এই ভুলের জন্য ও খামখেয়ালিতে কত বড় প্রাণ পৃথিবীর বুকে ফুটতে না দিয়ে নষ্ট করে দিলে, ব্যর্থ করে দিলে তা যদি শান্তভাবে সে একবার বোঝাবার চেষ্টা করত।"

"সে চিরকাল অস্থিরচিত্ত, কিন্তু তার এই অপরিণামদর্শিতার ফলে একটা কোমলপ্রাণা কচি প্রাণ যে নষ্ট হ'য়ে যাবে তা কি সে একবার ভাবে নি, এ আমি ভাবতে পারি না। কিন্তু না এ হ'তে পারে না, নিশ্চয় কোন কারণ ঘটেছে।"

"কারণ সে পাশ হয় নি, কিন্তু সে যে ফেল হ'বে এও যে জানা কথা দিদি, কলেজে অর্দ্ধেক দিন যেত না, সত্যি যদি লেখার ওপর টান থাকত তবে কি ফেল করে এমন উন্মত্ত হ'য়ে উঠত।" "সে ফেল হয়েছে বলে বুঝি বাবা রাজী হলেন না?"

"না বরং নিজেই সে আর প্রস্তুত নয়।"

কুন্তলা নীরব হইল, বহুক্ষণ পরে কুন্তলা বলিল, "তার ঠিকানা আমায় দিও।"

"সে কলকাতায় নেই।"

"কোথায় গেছে?"

"বলে যায় নি দিদি।"

আহারাদি করিয়া কুন্তলা তাহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিল ও অপর গৃহখানিতে জিতেনের শয্যা পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। গভীর নিশীথে কাহার যেন আকুল ক্রন্দনে ধড়ফড় করিয়া কুন্তলা উঠিয়া বসিল, চক্ষু পরিষ্কার করিয়া দ্বারের নিকট গিয়া কাণ পাতিয়া শুনিল, হাঁ এ যে পরিচিত কণ্ঠ। অবিলম্বে জিতেনের রুদ্ধ দ্বারে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। দ্বার খুলিয়া জিতেন জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে?"

"এস আমার সঙ্গে" কুন্তলা শিবানীদিগের গৃহাভিমুখে ছুটিল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সে দেখিল কয়েকজন ভদ্রলোক আলোক হস্তে দাঁড়াইয়া আছেন। শিবানীর জননী পথে পড়িয়া

গগনভেদী হাহাকার করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে।"

উত্তরে শুনিলেন, এই মাত্র কাহারা শিবানীকে র করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

জিতেন জিজ্ঞাসা করিল "তারা কোন দিকে গেছে?"

আকুলভাবে শিবানীর জননী অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পাহাড়ের সরু পথটুকু দেখাইয়া দিলেন।

কুন্তলার হস্তস্থিত লণ্ঠন লইয়া জিতেন প্রাণপণে দর্শিত পথে দৌড়াইলেন।

সাহায্যের নিমিত্ত কুন্তলা সমাগত মনুষ্যদিগের প্রতি চাহিতে গিয়া স্তম্ভিত হইল, সে স্থলে একটীও প্রাণী নাই, মাত্র শিবানীর জননী। তেমনই ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেই পথের দিকে তাহাকে চাহিয়া রহিয়াছে। শিবানীর অপহারকগণ লইয়া পর্ব্বতীয় পথে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। উহাদিগের সহিত আলো ছিল না, কিন্তু স্বীয় হস্তস্থিত লণ্ঠনালোকে জিতেন অনুমান করিল উহারা সংখ্যায় পঞ্চদশেরও অধিক হইবে। মাত্র একজনকে আসিতে দেখিয়া উহারা ফিরিয়া দাঁড়াইল। লম্ফদানে জিতেন এক ব্যক্তির সম্মুখে আসিয়া হাতের লাঠি কাড়িয়া লইল। উহাকে সকলে ঘিরিয়া ফেলিল। লাঠির আঘাতে লণ্ঠন চূর্ণ হইল। অন্ধকার শত্রু-মিত্র চেনা অসম্ভব হইল।

ইহাতে জিতেনের সুবিধাই হইল। এমনই সময় মশাল-হস্তে গ্রামবাসী কতিপয় ভদ্রলোক আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন, লাঠি চলিতে লাগিল—উহা সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিল। মাথায় আঘাত লাগিয়া জিতেন বসিয়া পড়িল। আঘাতের উপর পুনরায় আঘাত লাগায় সংজ্ঞাহীন জিতেনের দেহ মাটীতে লুটাইয়া পড়িল, পরে যখন সে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল, তখন নিজেকে কারাকক্ষের মধ্যে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল।

ক্রমশঃ

———:**:———

মদন-ভস্ম

শ্রীফণিভূষণ রায়

তারকাসুরের তপস্যালব্ধ ঐশ্বর্য্যে দেবলোকের যে দুর্গতি হইয়াছিল—"কুমার-কাব্যের" দ্বিতীয় সর্গে তাহা সম্যক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে। 'কুমার-সম্ভব' মহাকাব্য; সকল মহাকাব্যেই নায়ক এবং প্রতিনায়ক থাকে—দুইটী পরস্পর যুধ্যমান শক্তি থাকে—যাহাদিগের বিরোধিতার ইতিহাস কবির লেখনীমুখে কাব্য-ব্যাপী বিস্তার লাভ করে। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে যাঁহার প্রতি পাঠকের স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব থাকে তিনিই নায়ক বলিয়া অভিহিত হ'ন। কুমার-কাব্যের নায়ক দেবতা এবং প্রতি-নায়ক অসুর। তবে 'নায়ক' বলিতে একটীমাত্র ব্যক্তিকে না বুঝিয়া 'গণ' 'সমূহ' 'সম্প্রদায়' বুঝিতে পারি; নায়কার্থে বহু বুঝিলে, কুমার-কাব্যের নায়ক দেবতা-সমূহ। সে যাহাই হউক, সকল মহাকাব্যের এই একটী বিশ্বজনীন রীতি যে—নায়ককে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া পরিচিত করিতে হইবে। নায়ক হইবে ধীরোদাত্ত-গুণান্বিতঃ ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন কুমার কাব্যের আখ্যান-ভাগ একবার স্মরণ করিয়া দেখি। তারকাসুর উৎকট তপস্যা দ্বারা বীর্য্যবন্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পরাস্ত করিয়াছেন—এমন কি দাসত্বে বিনিয়োগ করিয়াছেন। এই পরাস্ত, বিগত-মহিম, দাসীকৃত দেবতা—কুমার-কাব্যের নায়ক। কুমার-কাব্যে দাস—নায়ক কথাটা উচ্চারণ করিলেই কেমন যেন বিরুদ্ধ ভাষণ বলিয়া কণে বাজে এবং সঙ্গে সঙ্গে মহাকবির অবস্থা-সঙ্কটও মনে পড়িয়া যায়। মহাকবি কিন্তু অসাধ্য সাধন করিয়াছেন; পরাজিত দেবতাকে অবলীলাক্রমে কুমার-কাব্যের নায়ক করিয়াছেন—

অথচ কাব্যের উন্নত মহিমাকে কদাপি ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। পরাজিত দেবতার নায়কত্বে তাঁহার কাব্য কখনও অমহীয়মান হয় নাই। পঙ্গুম্ লঙ্ঘয়তে গিরিম্—কুমার-কাব্যে কথার কথা না হইয়া চাক্ষুষ প্রমাণে পর্য্যবসিত হইয়াছে

কুমার-কাব্যের ২য় সর্গে পরাজিত—উৎপীড়িত দেবতারা ইন্দ্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার সদনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ইন্দ্রকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভগবান্ বৃহস্পতি দেবতাদিগের দৈনন্দিন অপমান ও গ্লানির একটা দীর্ঘ ও বহুল বিবরণ ব্রহ্মার সমীপে উপস্থাপিত করিলেন। এই বিবরণ হইতে একটী শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিলাম। বৃহস্পতি বলিলেন—

> পুরে তাবন্তমেবাস্য তনোতি রবিরাতপম্।
> দীর্ঘিকাকমলোন্মেষঃ যাবন্মাত্রেণ সাধ্যতে॥

মল্লিনাথ শ্লোকটীর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—কঠোর কিরণোঽপি মন্দোষভঃ সন্নেব তদ্‌ভাত্যা পুরে প্রকাশতে ইত্যভিপ্রায়ঃ। ইহা গতানুগতিক ব্যাখ্যা—ইঙ্গিতজ্ঞ অর্থবিন্যাস নহে। এই প্রকার ব্যাখ্যাতে কাব্যালঙ্কার-উজ্জীবিত হইবার আশা কোন প্রকারেই করা যায় না। এই শ্লোকটীর ভিতর মহাকাব্যের যে গূঢ় ইঙ্গিত আছে, তাহাই এখন বুঝিতে চেষ্টা করিব। তারকাসুর পরাজিত, দাসীকৃত সূর্য্যকে ডাকিয়া বলিলেন—অর্য্যমন্—তুমি যে মধ্যাহ্নের প্রখর প্রভায় আমাকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিবে, তাহা হইবে না—তুমি সকালবেলায় সেইটুকু আলোই বিকীর্ণ করিবে, যাহাতে আমার দীর্ঘল দীর্ঘিকায় কমলফুলের উন্মেষ হয়—তারপর তোমার ছুটি অর্থাৎ উদয়-শৈলেই তোমার অস্ত; সত্যকথা, পরাজিত শত্রুর প্রভাব কেহই সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তারকাসুরকে পরাজিত শত্রুর প্রভাব স্বীকার করিতে হইয়াছিল—কারণ তপস্যালব্ধ ঐশ্বর্য্যে তারকাসুর যদি বা আদিত্যদলনের রূঢ় ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন—কিন্তু কমল ফুটাইবার মধুর ক্ষমতা লাভ করেন নাই। এই জন্য ত্রৈলোক্যজয়ী, ইন্দ্র-পরাজক, সূর্য্যজেতা হইয়াও তারকাসুর—অসুর এবং পরাজিত, অপমানিত দাসীকৃত হইয়াও আদিত্য—দেবতা। ব্রহ্মার উক্তির যাথার্থ্য—এইজন্য হৃদয়ে উপলব্ধি করি—'মম্না সৃষ্টির্হি লোকানাং রক্ষা যুষ্মাস্ববস্থিতাঃ'। বিশ্বের সঙ্গে তারকাসুরের স্থায়ী সম্বন্ধ কিছুই নাই—তাঁহার শক্তি বিশ্ব-নিয়ামক শক্তি নয়—তাঁহার অবর্ত্তমানে ফসল কদাপি অস্ফুট থাকিবে না। সুতরাং তারকাসুর "ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ" ছাড়া কিছুই নয়—একটা আকস্মিক এবং প্রচণ্ড উৎপাত। বলিতে কি—ব্রহ্মার বর পাইয়াও তারকাসুর "ব্রাহ্মীস্থিতি" লাভ করেন নাই—শাশ্বত কোন স্থায়িত্ব লাভ করেন নাই।

সে যাহাই হউক—পরাজিত দেবতারা ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে—দেবতাদিগের ত্রাণকর্ত্তা—"গোপ্তারং সুরসৈন্যানাং"কে প্রার্থনা করিলেন—ব্রহ্মা "বিষবৃক্ষোঽপি" বলিয়া স্বয়ং কিছু করিতে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু বলিলেন—নীললোহিত দেব অনুত্তরঙ্গ সমুদ্রের মত সমাধিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন—তাঁহার সংযম-স্তম্ভিত মন উমার রূপদ্যুতিতে আকৃষ্ট করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে; কারণ ইঁহাদের মিলনে যে কুমার সম্ভূত হইবেন, তিনিই দেবতাদিগকে দৈত্যহস্তে ত্রাণ করিবেন।

সুতরাং সমাধিস্থ শিবের তপস্যাভঙ্গ করা দেবতাদিগের পক্ষে জীবন-ধারণ-সমস্যা—এখনকার পরিভাষায় জাতীয় সমস্যা। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণের অস্ত্র—এমন কি হরিচক্র অসুরযুদ্ধে ব্যাহত হইয়াছে; সুতরাং নূতন যুগের নূতন যোদ্ধার আবির্ভাবের আরও প্রয়োজন হইয়াছে। দুঃখের বিষয় দেবতাদিগের এই মহাবিপদের সময় দেবাদিদেব সম্পূর্ণরূপে উদাসীন—অথচ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যখন বিশেষ সৃষ্টি করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন (নত্বস্য সিদ্ধৌ যাস্যামি) তখন শিবের তপস্যা ভঙ্গ করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই রহিল না। ইন্দ্র, এই অবস্থা-সঙ্কটে মদনকে স্মরণ করিলেন—কারণ মদন ব্যতীত হিমাচলের তপস্বীর সংযমাস্তমিত মন রূপের আকর্ষণে আর কে আকৃষ্ট করিবে? জীবনের কৃতযুগে, সত্যযুগে—সহজ আনন্দের যুগে কন্দর্পের প্রকাশ্য সহায়তার কোনই দরকার হইত না। রূপই তখন বিশ্ব জয় করিতে সমর্থ হইত—উর্ব্বশী-রূপের চারু-প্রহরণে কত না জটিল তপস্বী পরাজিত হইয়াছেন। কিন্তু এখন, যখন জীবনের পরিপূর্ণ সুষমা বুদ্ধি এবং দুর্বিনীত বিচারশক্তি দ্বারা খণ্ডিত

হইয়াছে—তখন রমণীরূপের সহায়তায় কন্দর্পবাণের প্রচুর অবকাশ ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। এখন, যখন জীবন ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিচার একটা স্বচ্ছন্দ আনন্দ অনুভব করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তখন কন্দর্পের স্বয়ং রণস্থলে আবির্ভূত হওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

ইন্দ্রকর্ত্তৃক স্মৃত হইয়া কন্দর্প দেবসভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ললিতযোষিতের ভ্রূলতার মতন চারু ধনুচাপ স্কন্ধে ধারণ করিয়াছিলেন—তাঁহার কণ্ঠে রতি-বলয়াঘাতের ইতস্ততঃ চিহ্ন পরিদৃশ্যমান হইতেছিল—তিনি বসন্ত-সখ-সহচর মধুকরের হস্ত ধারণ করিয়া এবং নব-চূতাঙ্কুরেতূণীর পূর্ণ করিয়া শতাশ্বমেধী ইন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া প্রণতি করিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সুন্দর এবং সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা যুগপৎ নয়নাভিরাম এবং চিত্তরঞ্জন। কুমার-কাব্যের তৃতীয় সর্গের প্রথম কয়েকটী শ্লোকে তাঁহার সস্মিত বাগ্মিতা আমাদের মনোহরণ করে! কোন্ শুক্রনীতির অর্প্যাপিতকে জীবনের অনিবার্য্য ভোগে প্রবৃত্ত করাইতে হইবে, কোন্ সুন্দরকে প্রবাল-শয্যা গ্রহণ করাইতে হইবে—কোন্ মুক্তি-অন্বেষীকে জীবনের মায়াপথে বাঁধিতে হইবে—এমন কি যোগীশ্বরের ধ্যানও কি ভঙ্গ করিতে হইবে—এই রকম সব গর্ব্ব মিশ্রিত আনন্দের উক্তি কন্দর্পের উচ্ছ্বসিত বাগ্মিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। এখন যে নীতিজ্ঞ ইহাতে ত্রুটি ধরিবেন—যিনি "অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ" বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন—তাঁহাকে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে মদন দেবতা—অর্থাৎ সত্য, ধ্রুব, এবং অপরিবর্ত্ত-নীয়। তাঁহার পক্ষে মিথ্যাচারিত্ব করা অসম্ভব তাঁহার প্রকৃতি এবং উন্মেষের মধ্যে কোনো দ্বৈতভাব নাই। জল "অগ্ন্যামাসংপ্রয়োগাৎ" উষ্ণ হইতে পারে—কিন্তু দেবতা কখনও প্রকৃতিচ্যুত হ'ন না। সর্ব্বদা স্বধর্ম্মে আরূঢ় থাকেন। সে যাহাই হউক্—ইন্দ্র তাঁহাকে অবস্থাসঙ্কট বুঝাইয়া হর-ধ্যানভঙ্গে প্রবৃত্ত হইতে বলিলেন। মদন প্রশংসনীয় তৎপরতার সহিত সেই গুরু এবং দুঃসাধ্য কার্য্য গ্রহণ করিলেন। তিনি যে সাধ্যাতীত চেষ্টা করিবেন—তাহা তাঁহার মুখের কথাতেই প্রকাশিত হইল (অঙ্গব্যয় প্রদর্শিত কার্য্যসিদ্ধিঃ)। আধুনিক কালের আদর্শে তাঁহাকে বলিব স্বজাতিনিষ্ঠ—সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মবীর। সে যাহাই হউক—দেবতাদিগের পরম দুর্গতি দূর করিবার জন্য মদন যুদ্ধে চলিলেন। মনে রাখিতে হইবে—মদন-দেবতা পৃথিবীর প্রাচীনতম অহিংস যোদ্ধা—পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করাই তাঁহার স্বভাব—বজ্রবাণ তিনি নিক্ষেপ করেন না। তাই বুঝি সহচর মধুকর তাঁহার গমনপথ অকাল বসন্তের প্রচুর পুষ্পসম্ভারে কুসুমাকীর্ণ করিয়া দিলেন।

স্নেহঃ পাপাশঙ্কী—রতির গূঢ় আশঙ্কায় আসন্ন বিপদের আভাস পাওয়া যায়। কবির অপূর্ব্ব নিপুণতায় কুমার-কাব্যের তৃতীয় সর্গ কাব্যেঙ্গিতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মদন-ভস্মের ব্যাপার আরও বিস্তার করিয়া বলিবার দরকার কি। পর্ব্বত-রাজকন্যার রূপকে সার্থক করিবার জন্য মদন সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করিতে দিলেন—এমন সময় উগ্র তপস্বীর ললাট-লুপ্ত তৃতীয় নয়ন হইতে বিনাশী বৈশ্বানর আবির্ভূত হইল এবং পলকেই মদন ভস্মীভূত হইলেন। যে দেবতারা অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাদিগের অগ্রযোদ্ধার নৈপুণ্য দেখিতে ছিলেন, তাঁহারা "ক্রোধং সংহর, সংহরেতি" বলিয়াও মদনকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।

মদন-ভস্মের পর রতির স্বর্গব্যাপী বিলাপে মদন-ভস্মের কারণ এবং নৃশংসতা বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা কিন্তু এখানে হৃদয়ের দিক্ দিয়া না বুঝিয়া—তত্ত্বের দিক্ দিয়া "মদন-ভস্ম" বুঝিতে চেষ্টা করিব। সেইজন্য পুনর্ব্বার শ্লোকটীর উদ্ধার করিতেছি—

পুরে তাবন্ত মেবাস্য তনোতি রবি রাতপম্।
দীর্ঘিকা কমলোন্মেষঃ যাবৎ মাত্রেণ সাধ্যতে॥

তপস্বী তারকাসুর আদিত্য দলনের ক্ষমতা লাভ করিয়া-ছিলেন; এখন দেখি তপস্বী শিব মদনদহনের ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। আমরা বলিব—আদিত্য-পরাজক তারকাসুর ও মদন-দাহক শিব এই দুই জনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। কারণ ইঁহাদের দুই জনেরই তপস্যা। বিশ্বের যাহা চিরন্তনী নীতি—শাশ্বত রীতি তাহার বৈপরীত্য করিতে গেলে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই হয় না কমল ও পার্ব্বতী চিরকালের—জীবনের শাশ্বত দান। তপস্যার বলে আদিত্য ও মদনকে নিগ্রহ করা যায়—মুছিয়া ফেলা যায় না—কমল ও পার্ব্বতীকে যে তাহা হইলে হারাইতে হয়। সুতরাং পরিণামে মদন ও আদিত্যের দেবত্ব স্বীকার করিতে হয়

এবং মদন ও পার্ব্বতীর কাছে ফিরিয়া আসিতে হয়। যাক্, দৈত্য এবং বৈরাগী জীবনের পথে মহা উৎপাত উপস্থিত করেন—কিন্তু জীবন তাহার "আমনোঃ" পথে "যুগ-যুগ-ধাবিত" যাত্রীর মত চিরকাল চলিয়াই যায়। জীবনের এই অফুরন্ত চলিবার পথে ভস্মীভূত "মদন"ই চিরকালের সারথি।

এইরূপে "মদন-ভস্মের" কাব্য-মীমাংসা করা যায়—"ধর্ম্ম-মীমাংসা" করিতে হইলে প্রসঙ্গান্তর অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নাই—যাহা এখানে অসম্ভব। "ইন্দ্রো দেবতা"র যুগ না বুঝিলে মদন-ভস্মের "ধর্ম্ম-মীমাংসা" বুঝিতে পারিব না। কিন্তু কাব্যে "মদন-ভস্মের যে সৌন্দর্য্য তাহা" মহাকবির ইঙ্গিতে বুঝিলাম। ধ্যানী শিবের উপর "মারের আক্রমণ, তপস্বী শিবের পরিচর্য্যায় গৌরীর নিয়োগ, শিবের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য "আ-ব্রহ্ম" দেবতার প্রয়াস, এ সমস্তই হিন্দু কবির প্রতিস্পর্দ্ধিত্ব—বৌদ্ধ মতবাদের উপর প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্ট এবং রিপু আক্রমণ। কুমার-কাব্যে পরিণামে "মদন"ই জয়শীল। কিন্তু এই প্রবন্ধে সে কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে—কারণ, এই প্রবন্ধের নাম দিয়াছি—"মদন-ভস্ম" গৌরীর তপস্যার আলোচনা করিবার সময় "ভস্মীভূত" মদনের জয় কীর্ত্তন করিবার সুযোগ পাইব। এইখানে এইমাত্র বলিতে চাই দেবতাদিগের পরম দুর্গতিতে মদন সহাস্যমুখে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দ্বিতীয় দধীচি বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না।

রস-সৃষ্টি

শ্রীআশু চট্টোপাধ্যায়

সন্তানসৃষ্টিই বলুন আর রসসৃষ্টিই বলুন দু'টারই আরম্ভ হয় সাধারণতঃ যৌবনের আগমনে। অর্থাৎ একটা জিনিসের চরম পুষ্টতা না হ'লে তা' থেকে আর কিছুরই সৃষ্টি হ'তে পারে না।

দেহের দিক্ থেকে একথাটা বেশই বোঝা যায়। একটা পরিপূর্ণ দেহ হ'তেই অপর একটা দেহের উৎপত্তি হয়। এ কথা সেই সৃষ্টির আদি যুগের "সেল্-ডিভিশন্" থেকে আরম্ভ ক'রে আজকালকার সন্তানোৎপাদনের পক্ষে সমান খাটে। শরীরে যতটা পূর্ণতা পাওয়া দরকার, ততটা যদি সে না পায় তা হ'লে সৃষ্টির ক্ষমতাটাও যে সেই পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হয়, এ পরীক্ষিত সত্য।

এই তো সোজা কথা; কিন্তু এটা মনের সম্বন্ধে খাটাতে গেলেই একটু গোলমালের সৃষ্টি হয়। মনের পূর্ণতা কি? আর কি মাপকাঠি আছে? মনকে মাপব কেমন করে?

এর উত্তরে এই কথা বলা যেতে পারে যে মনের কোনো নির্দ্দেশ ও চরম মানদণ্ড নেই আপেক্ষিকতাই তার মানদণ্ড; অর্থাৎ মনের বিকাশের সম্ভাবনা যখন অনন্ত, তখন সুদূর ভবিষ্যতের কথা ছেড়ে দিয়ে বর্ত্তমান ও অদূর ভবিষ্যতে মনের চরম পরিণতির যে আদর্শটুকু আমরা গঠন করে নিয়েছি, সেই আদর্শের সমীপবর্ত্তী মনকেই আমরা পূর্ণ-বিকসিত মন বলতে পারি।

দেহের সম্বন্ধেও একথা বেশ খাটে। ডারউইন প্রভৃতি সৃষ্টিতত্ত্বজ্ঞের মতে অস্পষ্ট পরিবর্ত্তনধারার সাহায্যেই মানুষের আধুনিক দেহের উৎপত্তি। আদিম "নোব" প্রাণিকোষেরই ক্রমোৎকর্ষে আধুনিক দেহের গঠন। তাই যদি হয় তবে যে অনন্তকাল আমাদের সামনে রয়েছে তা'তে ক্রমোৎকর্ষের দ্বারা দেহের এখন তো অনন্ত উৎকর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে; কিন্তু তা হলেও আমরা আমাদের সাময়িক জ্ঞানের গণ্ডীর

মধ্য থেকেই আমাদের দেহকে চিনি, আর সেই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মাপকাটি দিয়েই দেহের পূর্ণতা মাপ করি।

কিন্তু হচ্ছিল মন ও রস-সৃষ্টির কথা—সাময়িক জ্ঞানানুসারে পরিপূর্ণ মন রসসৃষ্টি করে কেন, আর কেমন করেই বা করে?

মন যখন অপরিণত থাকে তখন সে চারদিক্ থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করে। হাজার ভাব তখন তার মনের দ্বারে ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ায়। তখন সে দু'হাতে সংগ্রহ করে। দেবার আগ্রহ বা সময় থাকে না। তাঁর এই সঞ্চয়ের প্রয়াসটাই তাকে অভিজ্ঞতার পথ দিয়ে চরম পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রয়াসটা তো সব সময়ে এক রকমের হ'তে পারে না। বৈচিত্র্যই জগতের প্রাণ। এই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই তার মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"মুক্তি নানা মূর্ত্তি ধরে দেখা দিতে আসে নানা জনে
এক পন্থা নহে,
পরিপূর্ণতার সুধা নানা স্বাদে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।"

কিন্তু এই নানা স্রোতের একটা সমুদ্রের মত মিলনের স্থান আছে। বহুকে একের মধ্যে দেখবার সাধনা ভারতই এতকাল করে এসেছে।

কিন্তু সেটা সম্ভব হয় যদি আমরা স্থান কাল ও পাত্ররূপ পার্থিব বিষয়গুলিকে অনন্তের সেই খণ্ড খণ্ড রূপগুলিকে আমার নিজের মধ্যে দেখবার চেষ্টা করি। আমার নিজের মধ্যেই বিশ্বের বিচিত্ররূপের যোগসূত্র রয়েছে। এই সীমার মাঝে অসীমের উপলব্ধির কথা রবীন্দ্রনাথ তো বলেছেনই! তা ছাড়া জর্ম্মান দার্শনিক "ফিক্‌টে"র মতও তাই। স্ট্রিণ্ডবার্গে তাঁর 'গ্রোথ অফ দি সোল'-(আত্মার উৎকর্ষ) পুস্তকের এক-স্থানে বলেছেন,—

ফিক্‌টে—শেখাতে চেয়েছিলেন, যা কিছু ঘটে তা আমাদের আত্মার অন্তরেই ঘটে, আত্মাকে অবলম্বন করেই ঘটে—আসলে সে ভিন্ন অন্য কিছুই নেই। রোম্যানটি-সিজম্ (কল্পতন্ত্র) আর সাব্‌জেকটিভ আইডিয়ালিজ্‌মের (বস্তুভাবনিরপেক্ষ ভাববাদ) এই হচ্ছে মূল সূত্র।

'রাজদুর্গের ছায়ায় সাগর পাড়ে আমি দাঁড়িয়েছিলুম।' 'পাহাড়ের গুহায় আমার বাস।' 'ছোট-ছেলেটি আমি, দরজার দিকে তাকিয়ে থাকি।' 'খুশীর দিনের কথা ভাব্‌তে থাকি।' -এই সব ছত্রগুলিতে ঐ একই সুর বাজ্‌তে থাকে। সত্যই কি এই 'অহং' এতই উদ্ধত? সম্পাদকের আড়ম্বরের 'আমরা'র চেয়ে কবির ছোট্ট 'আমি কত বিনম্র নয় কি?

সত্যই আমাদের এই আত্মোপলব্ধির মধ্যে ঔদ্ধত্যের কিছু নেই। নিজেকেই যদি প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলাম তবে অপর কিছু প্রতিষ্ঠিত বা সৃষ্টি করব কেমন করে? নিজের ক্ষমতার উপর যদি দৃঢ় প্রত্যয় না থাকে তবে কর্ম্ম-প্রচেষ্টা আস্‌বে কোথা থেকে? আর কর্ম্ম-প্রচেষ্টাই যদি না থাকে তা হ'লে সৃষ্টির পথ তো বন্ধ!

তা' হ'লে আত্মোপলব্ধির সঙ্গে বিশ্বোপলব্ধি মিলিত হ'লেই রস-সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আমায় দেবার জন্য ব্যগ্র মন যা কিছু দেখে, যা কিছু শোনে তা'তেই "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' দেয়। তখন যেটার সৃষ্টি হয় সেটা জলে, স্থলে, আকাশে কোথাও ছিল না। তাকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আর শেলী 'কবি-মানস' নাম দিয়েছেন। এই কবি-মানসের ছোঁয়াচ লেগে সম্পূর্ণ নূতন জিনিসই জগৎ পায়।

কোন অদৃশ্য কবির মনের রঙ্ লেগে অস্ত-মেঘ রাঙা হ'য়ে ওঠে? কোন ছদ্মবেশী রূপ-পূজারীর কামনায় কাননে কাননে গোলাপের সমারোহ?

এই রসোপলব্ধির জন্য স্বতন্ত্র জীবনের প্রয়োজন। জগতের ধূলির আবর্ত্তের দুঃখের সঙ্গে যে উচ্ছলতাটুকু আছে তা' সেই আবর্ত্তের মধুর পরিণতি হ'লে তবেই বোঝা যায়; কিন্তু জয় যদি না হয়—পরাজয়ের গ্লানিই যদি প্রয়াসের আনন্দকে ম্লান ক'রে দেয় তা'হলেও তো আমরা নিজের প্রাণের অক্ষয় স্বর্গলোক থেকে সেই ধরার ধূলিকে দূরে রাখতে পারি। এখানে অবশ্য আমি সর্ব্বসাধারণের কথা বলছি না। কয়েকটী নির্ব্বাচিত লোক, অর্থাৎ রস-স্রষ্টাদের কথাই বলছি। তাঁদের এই মনের স্বর্গলোকে ধূলির প্রবেশাধিকার নেই সত্য, কিন্তু ধূলির ক্রন্দন তো ধ্বনিত হয়; কারণ ক্রন্দনের মধ্যে ক্ষণেকের জন্য ব্যর্থ-মনোরথ একটী প্রাণের জয়ের প্রতি, প্রয়াসের প্রতি উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা লুকান রয়েছে। এই ক্রন্দনের মধ্যেও আশা আছে। আর জয়ের হাসির মধ্যে তো আরও বৃহত্তরের দিকে আশা রয়েছেই।

এই আশাই আমাদের মনের স্বর্গলোক সৃজন করে।

স্বষ্টির উপযোগী এমন কিছু বিকসিত করতে হ'লে মনকে স্ফূর্ত্তি দিতে হ'বে। তা' সম্ভব হয় এই অক্ষয় স্বর্গলোকেই। সুখ-দুঃখের অন্তর্লীন যে আশার আলো আছে,তা' এই স্বর্গেই বুঝতে পারা যায়। এখানকার অধিবাসিনী জেনে অষ্টিন্ ব্যথিত জীবনের মধুর স্মৃতিগুলির চিন্তায় সুখ পান। এখানকার সূর্য্য উজ্জ্বলতর। এখানকার কৃষ্ণরজনীতে রহস্যের মাধুরী, মন্দ বিষণ্ণতা লুকান থাকতে পারে, কিন্তু বিভীষিকা নেই। এখানকার দুর্য্যোগে দরদী মেঘের অশ্রুজল পথের ধূলাই ভিজিয়ে দেয়, ঝড়ে দোলা শুকনো পাতাগুলোকেই উড়িয়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু স্বর্গলোকে থাকলেও সৃজনশীল মনের একটা চাঞ্চল্য, একটা অতৃপ্তির অস্থিরতাও থাকা চাই। এ অস্থিরতা আনবে আমাদের মধ্যে যে অসীম লুকিয়ে আছে তাকেই। একটু আগে বলেছি অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণ বিকাশের আদর্শে বিকসিত মনই—সেই স্বষ্টির অধিকারী—কিন্তু এই স্বষ্টির মধ্য দিয়েই সে ক্রমশঃ এগিয়ে যাবে সুদূর ভবিষ্যতের দিকে। নব নব রূপের মধ্য দিয়েই সে অসীম রূপের আভাস পাবে। রূপই তার সৃজনের প্রয়াসের কারণ ও ফল।

কিন্তু রূপ কি? কাকে রূপ বলব? প্রভাতের প্রথম রশ্মিজাল রোজই আকাশকে অপূর্ব্ব মহিমা দান করে, নব-জাগ্রত নর-নারীর প্রাণে কর্ম্ম-প্রেরণা আনে। রোজই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, আকাশে স্নিগ্ধ তারাগুলি একে একে ফুটে ওঠে, দীঘির ঠাণ্ডা মিঠা জলে গাছের লম্বা ছায়া অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে আসে—মানুষের প্রাণ জুড়িয়ে যায়। এ দুটো রূপ তো চিরকালের;—তবু তারা মানুষকে রোজই এত নূতন আনন্দ কি করে দেয়? এদের—এই সন্ধ্যা ও প্রভাতের—অফুরন্ত রূপের উৎস কোনখানে?

পূর্ব্বেই বলেছি আমাদের রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্যে শেলী, [illegible] প্রভৃতির মতে এই উৎস মানুষের আঁখিতে—[illegible] সে যদি না ওই দৃশ্যগুলিকে মনের মত [illegible] পারত তা হ'লে সেগুলি অত সুন্দর মনে হ'ত কি? সবারই মনের মধ্যে একটা কোমল স্থান আছে। একটা উৎকৃষ্টতরের দিকে সবারই আকর্ষণ আছে। কাজেই যা' আসলে ভাল, আসলে সুন্দর তা সকলেরই ভাল লাগে; কারণ তাদের এই লুকিয়ে রাখা ইচ্ছাটা তৃপ্ত হয়। মানুষের মন ব'লে কোন জিনিস যদি না থাকত আর পঞ্চ-ইন্দ্রিয় যদি শরীরে না থাকত, তা'হলে সৌন্দর্য্য জিনিসটাও মানুষের কাছে চিরদিন অজ্ঞাতই থেকে যেত।

এখন কথা হচ্ছে যে, উৎকৃষ্ট জিনিস মাত্রেই সুরূপ নয়। তার কারণ উৎকৃষ্টের ধারণা সকলের এক নয়। কাজেই একের কাছে যা কুরূপ অপরের কাছে তাই অপরূপ। এখানে দেখতে হ'বে কোন জিনিসগুলিকে মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বিচার করছে, আর কোনগুলিকে তার মন সাধারণ জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে নিয়ে গিয়ে নিজের সম্ভাবিত বিরাটত্বের কল্পনায় মুখর সেই অবসর সময়ে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করছে। শেষেরটাই আসল বিচার, কারণ যা' সঙ্কীর্ণ তা' অনুদার—তা' কখনই শাশ্বত ও সনাতন হ'তে পারে না।

কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

স্বষ্টির সেই আদি যুগ থেকে মানুষ দুটী প্রধান কাজ ক'রে এসেছে—শরীর-রক্ষা আর বংশ-রক্ষা। তাদের যত কিছু কাজ, যত কিছু চিন্তা, যত কিছু আশা—উদ্যম সমস্তই ওই দু'টাকে আশ্রয় ক'রে। বড় বড় যুদ্ধ হ'য়ে গেছে—কত দেশ ধ্বংস হ'য়েছে—কত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও ওদেরি মধ্যে দু' একজন দল-ছাড়া লোকের শিল্প-কার্য্য নষ্ট হয়ে গেছে—শুধু ওই দু'টার জন্য। এই যে আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার উগ্র বাসনা, তা' এখনকার সকল লোকের মধ্যেই আছে—তবে কিছু রঙ্ বদলে গেছে। সভ্যতা মানুষকে ভণ্ডামীর মুখোস দান করেছে। মানুষের বুদ্ধি হয়েছে তীক্ষ্ণ।

কিন্তু শুধু এই কথা বললে সভ্যতার প্রসারের উপর অন্যায় দোষারোপ করা হ'বে। সভ্যতা মানুষকে আরও কিছু দিয়েছে। মানুষের বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ হ'য়েছে তেমনি অনেকস্থলে সূক্ষ্মও হয়েছে। একটা অস্পষ্ট ভাবধারা, যা' এতদিন তার কাছে একেবারে অজ্ঞাত ছিল, আজ তা'

ক্ষণে ক্ষণে তার মানস-লোকের সামনে ক্রুতলাস্তে চমকে যায়। সে আত্মরক্ষা তো করেই, কিন্তু সমাজ-বন্ধনের মধ্যে এতদিন থাকার অভ্যাসের জন্যই অপরের পক্ষে একেবারে অচেতন থাকতে পারে না। অন্ধকে,খঞ্জকে,আতুরকে আগ্রহে সাহায্য করবার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। প্রতিবেশীর বিপদের কথা তো বটেই, দূরের একস্থানের অধিবাসীদের দুঃস্থ অবস্থা শুনলে অনেকের মনে স্বতঃই সাহায্যের ইচ্ছা জেগে ওঠে। দেহাত্মবাদের মূলমন্ত্রে এখনও নর-নারী পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু এমন প্রেমও দেখা গেছে যা' অনির্ব্বাণ দীপ-শিখার মত জীবনের প্রায়ান্ধকার শেষ প্রহরগুলিও ভাস্বর করে তুলেছে। এই সবই হচ্ছে মানবের মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে উৎকর্ষতরের জন্য অস্পষ্ট অনুভূতির বহিঃ প্রকাশ।

কিন্তু এদের চেয়ে আরও একটী নির্ব্বাচিত দল আছে, যাদের দৃষ্টি সূক্ষ্মতর—উৎকৃষ্টের ধারণা যাদের উচ্চতর। জগতে তারা রূপমুগ্ধ, ভাবুক হ'য়ে ঘুরে বেড়ান। অনন্তের চরম আহ্বান এসে পৌছায় ওই ভাবুকদের কাছেই। এরা পুষ্পের কাছে ভ্রমর আসার মধ্যে ক্রমোৎকর্ষের দিকে প্রকৃতির গভীর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে মুগ্ধ হ'য়ে যান। সব জিনিসেরই একটা বিশেষ রূপ তারা দেখতে পান।

আমরা আমাদের আরাধ্য দেবতাকে—অসীমের সেই প্রতীককে—চিরসুন্দর রূপে কল্পনা করি। যারা নিজেদের প্রাণের মাঝে তাকাতে শিখেছে, তারা দেখে সেখানে প্রেমের শতদল ফুটে রয়েছে যার রূপ নয়ন-ভুলান। তাই তারা তারই আনন্দে দিশাহারা হ'য়ে জগদ্বাসীর কাণে সুন্দরের গান গেয়ে বেড়ায়—সে গান তারই নিজের অন্তরের গান। রূপের সঙ্গে রসসৃষ্টির তাই এত নিকট সম্বন্ধ।

এটা বোঝা সহজ কিন্তু বুঝিয়ে বলা শক্ত। সাহিত্যের রস উপলব্ধির জিনিস—তর্ক করবার জিনিস নয়। সকাল বেলা নীল আকাশের তলা দিয়ে একদল বক উড়ে গেলে আমার খুব ভাল লাগতে পারে, কিন্তু যে ভদ্রলোক সকাল হ'তে না হ'তেই হিসাবের বই নিয়ে বসেছেন, তাঁকে তো ঠেলা মেরে ভাললাগাতে পারি না। তাঁর চোখ নীল আকাশের কোলে শ্বেত বলাকার চেয়ে শাদা খাতার উপর কালোর আঁচড়েই বেশী অভ্যস্ত। আবার যে ভদ্রলোক খুব কাজের, তিনি বর্ষার কাদার কদর্য্যটাই দেখতে পান, আর কবির দল বসে বসে-ঘন বরষার নিবিড়তার মাধুর্য্যটুকু অনুভব করেন।

জগতে এমনি দু'দলের লোক আছে—রসিক ও অরসিক। স্বীকার করি কাজটার খুব প্রয়োজন, কিন্তু একথাও মনে রাখতে হ'বে যে, কলালক্ষ্মীর আসন প্রয়োজনের অনেক উপরে। তেমনি রসের বিচার করতে গিয়ে কেবলমাত্র সুনীতির দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলে আসল বিচার হ'বে না; কারণ কেবল নীতির সূত্রগুলা জীবনে খাটিয়ে গেলেই রসসৃষ্টি হয় না। তা' হ'লে "কদাচ মিথ্যা কথা কহিও না" এই বাক্য ভাবে ও সাহিত্য-রসে অনবদ্য হ'য়ে উঠতো। তবে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে বলি না আর রস-সৃষ্টিতে যার সব চেয়ে প্রয়োজন সেই সুরুচির গণ্ডীর বাইরে যেতেও বলিল না। আমাদের কথাবার্ত্তায় যেমন, তেমনি রস-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও একটা সহজ ভব্যতাজ্ঞান থাকা চাই।

জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে মানুষ ক্রমশঃ ভুলে যাচ্ছে যে কোনও রকমে টি'কে থাকাটাই বাঁচার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। খাবার উদ্দেশ্য বাঁচা কিন্তু বাঁচারও একটা উদ্দেশ্য আছে। আত্মার ক্ষুধা মেটাবে কে? প্রত্যেকের মধ্যে যে অসীম আপনাকে ব্যক্ত করবার জন্য হাহাকার করছে, তার স্বরটাকে কি চিরদিন নিষ্ঠুরভাবে চাপা দিয়েই রাখতে হ'বে?

কে উত্তর দেবে? সবাই পেটের ক্ষুধা নিয়েই ব্যস্ত! যাদের সে হাঙ্গামা নেই তারা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা মেটাতেই ব্যগ্র। আত্মার ক্ষুধারূপ পরম-ক্ষুধার দিকে মনোযোগ দেবার অবসর, ইচ্ছা ও ক্ষমতা খুব কম লোকেরই থাকে। যাদের থাকে তাদের মধ্যেই অনেকেই সত্যিকার রস-স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই প্রবন্ধের শেষ করি,—

"আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে একটা অতলস্পর্শ বিরহ আছে। আমরা যার সঙ্গে মিলিত হতে চাই সে আমাদের মানস-সরোবরের অগম্য তীরে বাস করছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠান যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হবার কোন পথ নেই।" অর্থাৎ আমাদের সূক্ষ্ম ভাবধারার অর্থাৎ রস-সৃষ্টির পথদিয়েই আমাদের [illegible] রূপময়তম্ বহিভাতি সেই প্রিয়তম অসীমের পদতলে পৌছায়।

আলোচনা

পাণ্ডব-গৌরব

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র গুপ্ত

ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত নাটকগুলি প্রায়শঃই নায়ক-নায়িকার প্রণয়-রহস্য বর্ণনাচ্ছলেই রচিত হইয়াছিল। এইজন্য বিচিত্র এই মানব-চরিত্রের অনেকখানি অংশই নাট্যকারগণের দৃষ্টি-পথের অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে। দাম্পত্য-প্রেম ছাড়া অন্য নানা ভাবের ভিতর দিয়াও যে মানুষের মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, সংস্কৃত নাটকগুলি হইতে সে কথার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মানব-চরিত্রের বিপুল রহস্যের সন্ধান সংস্কৃত নাটকগুলি বলিয়া দিতে পারে না। ভারতের মহাকাব্য দুটী মানব-চরিত্র-রহস্যের রত্নাকর-বিশেষ। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সকল উপকরণ ঐ দুইটী মহাকাব্য হইতে সংগৃহীত হইয়া সংস্কৃত নাটকগুলির অঙ্গ-সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছে, সে গুলি সবই সেই নায়ক-নায়িকার বিরহ-মিলনের হাহুতাশ ও দীর্ঘ-শ্বাস। এ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুকুমার মাধুর্য্য আছে, পেলব সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু মানুষের ভিতর-বাহিরে যে বহুবিধ সংঘর্ষ অহরহ চলিতেছে এবং অবশেষে যে সংঘর্ষগুলি মানুষের শৌর্য্যে বীর্য্যে ত্যাগে ও নিষ্ঠায় সার্থকতা লাভ করিতেছে সমগ্র সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের ভিতর কোথায় সেই বলিষ্ঠ, দৃঢ়িষ্ঠ ও কর্ম্মনিষ্ঠ জীবনের বহুমুখী উদ্দাম গতি! এইখানেই "পাণ্ডব-গৌরবের" রচয়িতাকে কেবল মাত্র যে মধ্যযুগের ভারতীয় কবিগণ-প্রবর্ত্তিত পন্থাই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে তাহা নহে, এমন কি এ বিষয়ে তিনি তাঁহার সাহিত্য-গুরু সেক্‌স্‌পীয়র-কেও অনুসরণ করেন নাই। সেক্‌স্‌পীয়রের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ নাটকই প্রেমিক প্রেমিকার প্রণয় ব্যাপারকেই কেন্দ্র করিয়া রচিত। বিভিন্ন প্রকৃতির চরিত্র-অঙ্কন পটুতায়, শৃঙ্খলিত ঘটনা-গ্রন্থন কৌশলে গিরিশচন্দ্রকে আমরা সেক্‌স্‌-পীয়রের সমকক্ষ বলিয়া মনে করি, কিন্তু কেবল নরনারীর প্রণয়-কথাকেই তিনি তাঁহার নাটক-রচনার মুখ্য অবলম্বন রূপে গ্রহণ করেন নাই। মানব-জীবনের এক একটা আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই, তিনি যেন পাঠক-চিত্তকে অঙ্কিত চরিত্রের জীবনের পর জীবন, ঘটনার পর ঘটনার ভিতর দিয়া অতি সহজ ও স্বাভাবিক গতিতে লক্ষ্যাভিমুখে লইয়া যান।

মহাভারতে আছে—একজনের পাপের ফল অনেককেই ভোগ করিতে হয়। সুরপুরে, উগ্র-তপস্বী দুর্ব্বাসা ঋষি কাম এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে অনর্থের সৃষ্টি করিলেন, মর্ত্যলোকের অধিবাসিবর্গকে একদা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। তমোগুণে যোগদৃষ্টিহীন ঋষি ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি সাধনে বিফল-মনোরথ হইয়া অপ্সরা উর্ব্বশীকে নিদারুণ শাপগ্রস্তা করিলেন এবং শাপ-মোচনের একটু আভাসও দিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তিনি কি জানিতেন যে, স্বর্গে যে মোহের জন্ম, মর্ত্ত্যেও তাহা সংক্রামিত হইতে পারে, এবং কালের জটিল-কুটিল পন্থা অতিক্রম করিয়া, সে মোহ রূপান্তরিত হইয়া এমন কল্যাণের মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া থাকে যে তাহা স্বর্গেরও কল্যাণাতীত, আর সেই কল্যাণী মূর্ত্তির আবির্ভাবে উর্ব্বশীরাও শাপমুক্তা হইয়া যান—এবং দণ্ডীরাও দিব্যচক্ষু লাভ করেন। মোহে যাহার উৎপত্তি মঙ্গলেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

'পাণ্ডব গৌরব' পাণ্ডবদিগের গৌরব-কাহিনী প্রচার করিতেছে। পাণ্ডবদিগের প্রকৃত মহত্ত্বের উৎস কোথায় সেই কথাই কবি অতি সুন্দরভাবে এই নাটকে দেখাইয়া দিয়াছেন। 'পাণ্ডব-গৌরব' শুধুই পাণ্ডবদিগেরই গৌরব-কাহিনী নয়, উহা মানুষেরও গৌরব-কাহিনী বটে। মানুষ যদি আদর্শভ্রষ্ট না হয়, সত্য ও ন্যায়ের সুদৃঢ় ভূমির উপর অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া মানুষ যদি সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকেও ধর্ম্ম-যুদ্ধে আহ্বান করে, তবে জগতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা মানুষের সেই সমুন্নত মস্তকের একটী মাত্র কেশও কাঁপাইয়া তুলিতে পারে! মানুষ যখন ন্যায়ের পক্ষ লইয়া অন্যায়ের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করে,

তখন 'মহাশক্তি' স্বয়ং আসিয়া মানুষকে তাঁহার বাহুবেষ্টনে মায়ের মত ঘিরিয়া রাখে এবং সংহারোদ্যত অষ্টবজ্রের সম্মিলিত শক্তির সমস্ত শক্তি তখন ব্যর্থ হইয়া যায়। মোহ-ভ্রান্ত, প্রাণভয়ভীত নিরাশ্রয় অবন্তীরাজ দণ্ডী যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থান হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া, দেবী সুভদ্রার মাতৃশক্তির আশ্রয় লাভ করিল, তখন যদি পাণ্ডবগণের পৌরুষ-শক্তি সেই মাতৃশক্তির যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারিত, তাহা হইলে মাতৃ-শক্তির পরাভব যদিও ঘটিত না, কিন্তু পাণ্ডবগণের গৌরব করিবার কিছুই যে থাকিত না সে কথা নিশ্চিত। নারীর মাতৃশক্তি পুরুষকে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবুদ্ধ করিয়া কেমন করিয়া বিশ্বের সমস্ত দৈব-শক্তিকে পরাভূত করিতে পারে, মহাকবির তুলিকাপাতে পাণ্ডব-গৌরব নাটকে সেই কথাই অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু মানুষের এই বিজয়কাহিনী আঁকিতে গিয়া কবি মানুষকে অনর্থক উদ্ধত ও দাম্ভিক করিয়া তুলেন নাই। এই খানে কবির প্রকৃত ভারতীয় হৃদয়টুকুর পরিচয় পাওয়া যায়। কেমন সংযত ধীর ও অনাড়ম্বরভাবে পাণ্ডবগণ আসন্ন সংগ্রামের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন—দেখিলেই শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হইয়া যায়। কাহারও কথাবার্ত্তায় এতটুকু চাঞ্চল্য নাই—অর্থহীন প্রলাপের অনর্গল উচ্ছ্বাস কাহারও মুখ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে না। কোনও প্রতীচ্য-ভাবাপন্ন আধুনিক কবি যদি এই এই আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক লিখিতেন, তাহা হইলে, তথা-কথিত 'যুগধর্ম্মের' অজুহাতে এমনভাবে চরিত্রগুলি অঙ্কিত করা হইত, যাহাতে হয় তো স্থানে-অস্থানে কবিতার বুকনি থাকিত অনেক—কিন্তু যথার্থ ভারতীয় ভাবটুকু কখনই অক্ষুণ্ণ থাকিত না। সে নাটকের প্লট্ হয় তো কতকটা এই রকম ভাবে পরিকল্পিত হইত---"ঋষির ক্রোধে উর্ব্বশী ইন্দ্র-কর্তৃক স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে নির্ব্বাসিতা হইয়া ঘোটকী নামে অভিহিতা হইতেন। মহারাজ দণ্ডী তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার প্রেমে একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন। হয় তো এই সময়ে তাঁহার মুখে রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী' কবিতার আবৃত্তি শুনিতে পাওয়া যাইত। কৃষ্ণ এই প্রণয়ে বাদ সাধিতেন। তাঁহাকে একজন লম্পট ও কূট রাজনীতিজ্ঞভাবে অঙ্কিত করা হইত। তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া প্রেমের দায়ে রাজ্য ও গৃহ পরিবার সমস্ত ত্যাগ করিয়া, দণ্ডিরাজ উর্ব্বশীকে লইয়া আশ্রয়ের জন্য দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া অবশেষে 'উর্ব্বশীর' পরামর্শে সুভদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। সুভদ্রা তাঁহাদের আশ্রয় দিতেন কতকটা অর্জ্জুনকে পরীক্ষা করিবার জন্য, কতকটা বা হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখাইবার জন্য। তাঁহার মুখে আমরা নারী-জাগরণের জ্বালাময়ী বক্তৃতা নিশ্চয়ই শুনিতে পাইতাম। সুভদ্রার বক্তৃতায় লজ্জিত হইয়া পাণ্ডবেরা বাধ্য হইয়া দণ্ডী এবং উর্ব্বশীকে আশ্রয় প্রদান করিতেন। এদিকে কৃষ্ণ এই কথা শুনিতে পাইয়া সমস্ত দেবশক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেন। এই অবসরে খানিকটা দুর্য্যোধনাদির চরিত্র-মাহাত্ম্যও আমরা দেখিতে পাইতাম। তিনি ভ্রাতৃগণের এই বিপদে সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাহার পর দেখিতে পাইতাম দেব-মানবের যুদ্ধ। দেবগণকে গালি দিয়া মানুষেরা জলদ-গম্ভীর ভাষায় নিজেদের মহত্ত্ব প্রচার করিতেছে। হয় তো এক দল নারী-সৈন্যও রণক্ষেত্রে দেখিতে পাইতাম। ইতিমধ্যে নির্ব্বাসন কাজ শেষ হইয়া যাইত, উর্ব্বশী হয় তো পলাইয়া যাইতেন। যুদ্ধ থামিয়া যাইত এবং দণ্ডিরাজ আজীবন বিরহানলে দগ্ধ হইতেন। একটা করুণ রসাত্মক বিরহ-কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই এই রোম্যানটিক নাটকের যবনিকা পাত হইয়া যাইত।"

বলা বাহুল্য, এ ধরণের নাটক-রচয়িতার কল্পনায় 'কঞ্চুকী'র মত চরিত্রের সৃষ্টি সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইত। হয় তো একজন বয়স্য থাকিত—যে সময়ে, অসময়ে ষ্টেজের উপর আসিয়া দণ্ডিরাজের সঙ্গে ইয়ার্কি-মস্করা করিয়া দর্শকগণকে হাসাইয়া যাইবার চেষ্টা করিত। ছেলেরা এ শ্রেণীর নাটকের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিত—কাগজে কাগজে 'যুগান্তকারী' নাটক-রূপে নাটক-খানি অভিনন্দিত হইত।

বড় বড় সাহিত্য-স্রষ্টাদের লেখার দুইটা দিক্ থাকে। একটা স্বাদেশিকতার দিক্—আর একটা সার্ব্বজনীনতার দিক; প্রকৃত পক্ষে, ধরিতে গেলে স্বাদেশিকতা ও সার্ব্বজনীনতা, দুইটা স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দিনে, জাতি-স্বাতন্ত্র্যকে কোন্ যুক্তি বলে অস্বীকার করা

যাইতে পারে, বুঝিতে পারি না। যাহা কোন একটা জাতি বিশেষের সম্পদ্—তাহা এক হিসাবে সমস্ত বিশ্বের ও সম্পদ্। যে খাঁটি বাঙ্গালী—সে খাঁটি মানুষও বটে। সুতরাং যাহা জাতীয়-সাহিত্য—তাহা যে বিশ্ব-সাহিত্য হইবেই। জোর করিয়া বিশ্ব-সাহিত্য গড়িতে গিয়া যদি এমন কিছু গড়িয়া ফেলা হয়, যাহাকে সেই সাহিত্যের জন্ম-ভূমি আপন-সাহিত্য বলিয়া চিনিয়া লইতে না পারে,—তবে তেমন সাহিত্য যে বিশ্ব-সাহিত্য ও হয় না—একথা আমাদের দেশের "যুগ-মানবেরা" কবে বুঝিবেন!

গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী—যেহেতু সেগুলি খাঁটি স্বদেশী সাহিত্য—সেইহেতুই সেগুলি বিশ্ব-সাহিত্যও বটে। বিশ্বের সাহিত্য-দরবারে ইহারা বেশ সগৌরবে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে। ধরা যাক্ এই পাণ্ডব-গৌরবের কথা। 'পাণ্ডব-গৌরবের' 'কৃষ্ণ' কি 'কঞ্চুকী'-চরিত্র—আগাগোড়া ভারতীয় পরিকল্পনা—'পাণ্ডব-গৌরবে'র অন্যান্য চরিত্র-গুলিও ভারতীয়ভাবে ওতঃপ্রোত। সমগ্র মহাভারত-পাঠে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, দুর্যোধন, কর্ণ, কুন্তী, ও সুভদ্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে, এক পাণ্ডব-গৌরব পাঠেই তাঁহাদের চরিত্র-সম্বন্ধে সেই ধারণাই স্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রতিভার স্পর্শ পাইয়া, পাণ্ডব-গৌরবের কৃষ্ণ, ভীম ও সুভদ্রা-চরিত্র আরও যেন মধুর এবং উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা না থাকিলে এই চরিত্রগুলি সম্যক্ ফুটিয়া উঠিতে পাইত না সেই দণ্ডী ও উর্ব্বশী-চরিত্রের মত অপকৃষ্ট চরিত্রগুলিও ঠিক যেন ভারতীয় আবহাওয়ার মধ্যেই গড়িয়া উঠিয়াছে। নাটকের প্রতিপাদ্য মূল-আদর্শও ভারতবর্ষীয়। একদিকে যেমন এই গ্রন্থখানি জাতীয় ভাব-সম্পন্ন—আর একদিক্ দিয়া ইহা সার্ব্বজনীনও বটে। যে মনুষ্যগুলি ইহাতে অঙ্কিত করা হইয়াছে—তাঁহাদের প্রকৃতিগত স্বভাব—যে কোন দেশের মানুষের চরিত্রে ফুটিয়া উঠিতে পারে। বস্তুতঃ কাম ক্রোধ দ্বেষ হিংসা, কাপুরুষতা প্রভৃতি দোষ এবং ক্ষমা, প্রেম, অহিংসা, ঔদার্য্য ও তেজস্বিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি—কোনও জাতি-বিশেষের একচেটিয়া সম্পদ্ নহে। কোনও নৈতিক আদর্শ বা কোনও মহৎ ভাব কেবল কোন একটী বিশেষ দেশ সম্বন্ধেই সত্য হইতে পারে না। মানুষের অন্তর্নিহিত ভাব সর্ব্বত্রই একরূপ, কেবল তাহাদের বিকাশের ধারায় পার্থক্য আছে। তাই যে প্রকার রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পদ্ হইলেও উহার উপর সর্ব্ব-কালের এবং সর্ব্ব-দেশের দাবী আছে—তেমনই জগতের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। পাণ্ডব-গৌরব একদিক্ দিয়া যেমন স্বদেশের নিজস্ব সামগ্রী—তেমনি আর একদিক্ দিয়া সর্ব্ব-কালের এবং সর্ব্বদেশের মানব-মনই ইহার ভিতর হইতে সত্যোপলব্ধির ও সহানুভূতির আনন্দ পাইতে পারে।

একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, গিরিশচন্দ্রের নাটক-রচনা-প্রণালীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর প্রণালী এ পর্য্যন্ত বাংলা-সাহিত্য উদ্ভাবিত হয় নাই। পঞ্চাঙ্ক এই নাটকের প্রত্যেকটি গর্ভাঙ্ক ও অঙ্কই পরস্পর-সম্বন্ধ। কার্য্য-কারণের সূক্ষ্ম যোগ-সূত্রে আগাগোড়া গাঁথা। একটীও খাপ্‌ছাড়া দৃশ্য ঘটনা অথবা একটীও অনাবশ্যক চরিত্রের অবতারণা নাটকের কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। পাঠ করিতে করিতে আগ্রহ যেন জমাট বাঁধে—রসবোধ যেন প্রগাঢ় হইয়া ওঠে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া, কথোপকথনের সাহায্যে একদিকে যদি নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলি বিকসিত হইতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে আর একদিকে স্থান, কাল ও পাত্রের সুসঙ্গতি রক্ষা করিয়া স্বাভাবিকভাবে স্বচ্ছন্দ গতিতে পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে—তবেই তো তাহাকে প্রকৃত নাটক বলা চলিবে। এই লক্ষণ যাহাতে আছে তাহাই খাঁটি নাটক—নহিলে কেবল মাত্র বাহিরের চেহারার একটু আধটু অদল-বদল করিলেই নাট্য-রচনার নূতন রীতি প্রবর্ত্তন করা হয় না।

অনেকে নাটকখানিকে অঙ্ক-গর্ভাঙ্কে বিভক্ত না করিয়া দৃশ্যে দৃশ্যে বিভক্ত করিয়া থাকেন। আমরা এ পরিবর্ত্তনকে কোন একটা মৌলিক পরিবর্ত্তন বলিয়া মনে করি না। 'অঙ্ক' কথাটার বদলে 'দৃশ্য' কথাটা বসাইলেই খুব একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন হয় না। 'দৃশ্যে'র বিস্তৃত বিবরণী দেওয়াও যে খুব আবশ্যক আছে, এমন কথাও আমরা মনে করি না। কারণ এ কাজটা রঙ্গমঞ্চের শিল্পী যিনি—তাঁহারই কাজ। নাটকের প্রত্যেক দৃশ্যের গোড়ায় ঐরূপ এক একটী বিবরণ জুড়িয়া দেওয়ায় শিল্পীকে তাঁহার কল্পনা-বিকাশের কোন সুযোগ দেওয়া হয় না। নাট্যকার শুধু দৃশ্যের একটু ইঙ্গিত

দিলেই যথেষ্ট। ঐ ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন শিল্পী নব নব রূপে শিল্পকলার শোভা-সৌন্দর্য্য মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারেন।

কেহ কেহ আবার আখ্যান-বস্তুর অলৌকিক ঘটনাগুলি অথবা চরিত্রের স্বগতোক্তি পরিহার করিয়া নাটক খানিকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে চাহেন। কিন্তু ইহাতে অনেক সময়ে আখ্যান-বস্তুর কাব্য-সৌন্দর্য্য ও চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ চাপা পড়িয়া যায়। ঘটনা যতই অলৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন—রসজ্ঞ পাঠককে শুধু দেখিতে হইবে, সেই সেই ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া চরিত্রটী বিকসিত হইয়া উঠিতেছে কি না। উর্ব্বশীকে দিবাভাগে 'অশ্বিনী'র আকার লইতেই হইত বলিয়া, দণ্ডীর প্রত্যাখ্যাত হৃদয় প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া স্বীয় প্রকৃতির হিংস্ররূপ এইভাবে প্রকট করিতেছে—

"কাল বল্গা দিয়ে মুখে,
চালাইব সুতীক্ষ্ণ চাবুক ঘায়—
প্রবেশিব সাগর মাঝারে
দেহ তোর মকর-কুম্ভীরে খাবে।"

অথবা—

"প্রাতে বুঝাইব অগ্নি শীতল কেমন,
তুষানলে মায়ারূপী অশ্বিনী পুড়াব।"

ঘটনা যতই অলৌকিক হউক মানব-প্রকৃতি মানব-প্রকৃতিই। স্বগতোক্তি-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে—উহার দ্বারা চরিত্রটীর স্বরূপ অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। স্বগত উক্তির দ্বারা মনের যে কথাটী মুখে বলা হয় তাহা হয় তো, অনেক সময়ে ভাবভঙ্গীর দ্বারাও দেখান যাইতে পারে—কিন্তু অনেক সময় আবার তাহাও সম্ভব হইয়া উঠে না। স্বগতোক্তির সময় দর্শককে মনে করিতে হইবে, ঐযে লোকটী রঙ্গমঞ্চের উপর তাহার মনের আসল যে কথাটী খুলিয়া বলিতেছে, তাহা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী লোকটী সত্য-সত্যই শুনিতে পাইতেছে না। তাহার মনের নীরব কথাটী যেন সরব হইয়া কেবল দর্শকেরই কাণে আসিয়া বাজিতেছে।

নাটকের ভাষা সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও চলিত। কিন্তু সাধারণ পাঠকের উপর এই ভাষার প্রভাব কম নয়, তাই এ সম্বন্ধে দু' এক কথা বলিতে চাই। সাধারণ পাঠক তাহার অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস ও অশোভন কবিত্বের দ্বারা এতটা বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া যান, যে চরিত্র-বিকাশের পক্ষে সেই ভাষা সঙ্গত ও সহায়ক কি না তাহা দেখিবার আর তাঁহাদের অবকাশ থাকে না। নাটকের পাত্র-পাত্রীগণ যদি ঘোরাল পেঁচাল ভাষায়, নিজেরাই নিজেদের চরিত্র-বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া যায়, অথবা স্থানে-অস্থানে কবিতা আবৃত্তি করিতে থাকে, তবে তাহার ভিতর মনস্তত্ব ও কবিত্ব যতই থাকুক না কেন, নাট্য-সৌন্দর্য্য সে ভাষায় কখনই স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। কথোপকথনের ভাষা এমন হওয়া চাই—যেন মনে হয় উহা কথোপকথনেরই ভাষা। গদ্যেই হউক অথবা ছন্দেই হউক—ভাষা হওয়া উচিত চরিত্রোপযোগী, সংযত ও স্পষ্ট—যেন মনে হয় এই ভাবাই স্বাভাবিক। ইহারই ভিতর নাটকের কাব্য-সৌন্দর্য্য নিহিত থাকে। নাটকের এই ভাষার দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলেও—গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ নাট্যকার বাঙ্গলায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য, অন্যান্য নাট্যকারদিগের তুলনায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অমৃতলাল এ বিষয়ে অনেকটা সফল-কাম হইয়াছেন।

সাহিত্য-রচনার কেবল একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকিবে কি থাকিবে না—এ লইয়া বর্ত্তমানে একটা তর্ক পাকাইয়া উঠিয়াছে। উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে সাহিত্য সৃষ্ট হইলে কাহারও কাহারও মতে সাহিত্য কোন রকম পক্ষপাত দোষ-দুষ্ট হইবে না। যখন নিরুদ্দিষ্টভাবে কাজ করিলে মানুষের কোন কাজই সার্থক হয় না, তখন সাহিত্য-সৃষ্টির বেলাতেই বা ঐরূপ মনোভাবকে হয় ন্যাকামী নয় ভণ্ডামী ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? স্রোতের মুখে গা ভাসাইয়া দেওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। সাহিত্য-স্রষ্টা যত বড়ই সাহিত্য-স্রষ্টা হউন—তিনি মানুষ। জগতে যাহা কিছু ঘটিয়া যাইতেছে—সবই কিছু তিনি যেমনটী দেখিতেছেন ঠিক তেমনটী আঁকিতে পারেন না। ঘটনার প্রবাহগুলিকে তিনি তাঁহার মনের জালে ছাঁকিয়া লন। এখানে কবির উদ্দেশ্য হইতেছে জাল পাতিয়া ঘটনাস্রোতের মধ্য হইতে কোন একটা বিশেষ ভাব বা লক্ষ্য

বা আদর্শ বাছিয়া লওয়া। মনের জালের গঠন—কবির শিক্ষা, সংস্কার ও রুচির উপরই নির্ভর করে। তাহা ছাড়া মানুষ যতক্ষণ না একেবারে সংস্কারের সমস্ত শিকড় মন হইতে আমূল ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিতেছে—ততক্ষণ এমন সাহিত্য তাহার কল্পনা-বলে সৃষ্ট হওয়াই সম্ভব নহে, যাহা কি না সকল রকম সংস্কার বা উদ্দেশ্যের ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে গিয়া পড়ে। তবে এমন হইতে পারে—যে, লেখক হয় তো নানা রকম চিন্তা ও মতবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া, মনকে কেন্দ্রগত করিতে না করিয়া মানবজীবনের অন্তর্নিহিত চিরন্তন মূল সত্যগুলি সম্বন্ধে কোন রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া, যাহা আঁকিতে চেষ্টা করেন তাহার ফলে ফুটিয়া উঠে কেবল কতকগুলো পরস্পর-বিরুদ্ধ মতামত ও সমস্যার দুর্ভেদ্য কুহেলিকান্তররূপে। ইহাতে না হয় লেখকের কোন রকম মানসিক উন্নতি, না হয় পাঠকের বা দর্শকের অন্তরের পরিতৃপ্তি। সাহিত্য যখন সত্যেরই অন্যতম সাধন-প্রণালী, তখন সত্যকে পরিস্ফুট করিয়া বুঝিবার চেষ্টাই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। পক্ষপাতবিহীন হওয়াটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়, বরং আমার বিচারে যাহা সত্য ও ন্যায় সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, আমার পক্ষে অপক্ষপাত হওয়ার চেয়ে সেই ন্যায় ও সত্যের পক্ষাবলম্বন করাই সাধুতার ও মহত্ত্বের পরিচায়ক।

শুধুই ভাল ভাল উপদেশ মানুষকে কখন প্রকৃত উন্নত করিতে পারে না। মানুষ চায় মানুষের জীবনের পরিচয়। সেই সব ভাল ভাল উপদেশগুলা মানুষের নিজের জীবনে কিভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে—মানুষ তাহাই জানিতে চাহে। গীতা ও উপনিষদের কার্য্যক্ষেত্র মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ—কাজেই মানুষের ঐ সার্ব্বজনীন জিজ্ঞাসা-বৃত্তির পরিতৃপ্তি-সাধনের জন্য, প্রয়োজন হয় রামায়ণ-মহাভারতের, প্রয়োজন হয় শকুন্তলা-উত্তররামচরিতের। যে যে সাহিত্য মানুষের এই দাবী মিটাইতে না পারিবে, মানুষের হৃদয়ের কাছে সে সাহিত্যের কোনই আবেদন থাকিতে পারে না।

সকলেই জানেন, গিরিশচন্দ্রের প্রত্যেক নাটকখানি এক একটা মূল ভাবের স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ। সেই ভাব একটী বা দুইটী চরিত্রে আশ্রয় লাভ করিয়া কেমন করিয়া নানা অনুকূল প্রতিকূল ঘটনাচক্রের সংঘর্ষে স্তরে স্তরে ফুটিয়া উঠে—গিরিশচন্দ্র নাটকগুলি তাহারই এক একটা জীবন্ত আলেখ্য। যে চরিত্রগুলিকে গিরিশচন্দ্র নাটকের কেন্দ্রগত ভাবমূর্ত্তি রূপে আঁকিতে চাহেন—তাহাদিগকে তিনি নানা-রকম অবস্থার ভিতর ফেলিয়া যাচাই করিয়া লন। 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকে সুভদ্রা ও ভীম চরিত্রই নাট্যনিহিত ভাব-বস্তুর প্রমূর্ত্ত প্রতীক। সুভদ্রা সেই ভাবের নারী-বিগ্রহ—এবং ভীমসেন নর-বিগ্রহ। একই ভাবের দুই রকম অভিব্যক্তি। সুভদ্রা, জগতের মাতৃশক্তির পালনী-শক্তির বিকাশ—ভীম, জগতের পৌরুষশক্তি—রুদ্রশক্তির সংযত ও সংহত প্রকাশ।

প্রথমে সুভদ্রাকে যখন আমরা দেখিতে পাই—তখন তিনি যেন আসন্ন-ভারতসংগ্রামের ফলাফল সম্বন্ধে কতকটা সন্দিহান—অমঙ্গল আশঙ্কায় কিছু চিন্তা-ব্যাকুলিতা। কৃষ্ণ তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন—

> চাহ যদি পাণ্ডব-কল্যাণ,
> পাণ্ডব-ঘরণী তুমি,
> ধর্ম্মে মতি রেখ চিরদিন—

কারণ, যাহারা ধর্ম্মবলে বলী, তাহাদের—"ত্রিভুবনে শক্তি কার পরাজিতে।" সুভদ্রার চিত্ত তখন চঞ্চল—কৃষ্ণ বলিলেন—

> শুন ভদ্রা, সার ধর্ম্ম আশ্রিত-পালন,
> নিরাশ্রয়ে আশ্রয় প্রদান।

এই খানেই নাটকের ভাবের বীজ রোপণ করা হইল। সুভদ্রা তখন জানিতেন না যে এই ভাবের বীজ তাঁহারই জীবনে বিকসিত হইবার জন্য অতি সন্নিকটেই প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার পর, আত্মহননোন্মুখ দণ্ডীকে নিঃসংশয়ে আশ্রয়-প্রদান, কোন দ্বিধা নাই কোন দ্বন্দ্ব নাই, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতেও অকুণ্ঠিতা—সুভদ্রার সে এক অপরূপ মাতৃমূর্ত্তি! দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়া সুভদ্রা সে কথা আর কাহাকেও নিবেদন করিলেন না—এমন কি অর্জ্জুনকেও না—ভীমকে আসিয়াই সব কথা খুলিয়া বলিলেন। সুভদ্রা ভীমকে চিনিতেন। দ্রৌপদীর অপমান তো অনেকেই

দেখিয়াছিল—কিন্তু কেইবা দুর্য্যোধন-দুঃশাসনকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—কেই বা জয়দ্রথকে সমুচিত শাসন ও কীচককে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছিল—আর কাহাকেই বা মাতা রাক্ষসের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য পরার্থে মরণের মুখে সঁপিয়া দিয়াছিলেন? সুভদ্রা ভীমকে ভালভাবেই চিনিতেন। তাই, তাঁহাকে ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হয় নাই। ভীম ভ্রাতৃবধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—

ধন্য ধন্য দয়াময়ী আশ্রিত-পালিনী,
জগন্মাতা অভয়া-স্বরূপা ভবে!
হৃদয়ের লহ আশীর্ব্বাদ,
ধর্ম্মসাধ চিরদিন পূর্ণ হোক তব!

এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন—

যদ্যপি বিরোধ কভু কৃষ্ণ সনে হয়,
সম্ভব এ নয়,
রক্ষিব শরণাগতে প্রতিজ্ঞা আমার।

—ভাব এইখানে বিস্তৃতির অভিমুখে চলিল। ইহার পর বলদেব আসিলেন—সুভদ্রাকে বিচলিত করিবার জন্য। বলদেব কত ভয় দেখাইলেন, তিরস্কার করিলেন, স্নেহপ্রকাশ করিলেন—কিন্তু সুভদ্রার হৃদয়ে ভাব তখন স্থিরভাব ধারণ করিয়াছে। ভদ্রা কহিলেন—

চাহ যদি আমার কল্যাণ,
শ্রীকৃষ্ণে বুঝায়ে কহ,—
প্রাণসম অশ্বিনী দণ্ডীর,
অন্যায় কি হেতু সাধ করিতে হরণ?

চক্রী অন্তরালে বসিয়া হাসিতেছেন, কিন্তু বলদেবের ক্রোধ এ কথায় দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি গালি দিলেন—"জন্ম তোর পাণ্ডব-বিনাশ হেতু" আর বলিলেন—"ভগ্নী আর নহ তুমি মম।" কিন্তু সুভদ্রাকে টলানো গেল না। সুভদ্রার সেই একই ভাবের কথা-

সর্ব্বনাশে নাহি মম ভয়,
চিন্তা, পাছে ধর্ম্ম-ভঙ্গ হয়!
চিরদিন কেবা রয় ভবে?
আছে কত জন পতিপুত্রহীনা!

প্রকৃত সাধ্বী যে—প্রকৃত জননী যে, সেই একথা বলিতে পারে। সুভদ্রা শুধুই ভাব-প্রবণ নহেন, তিনি দৃঢ়চরিত্র। কিন্তু এখানেও সুভদ্রা-চরিত্রের সবখানি পরিচয় দেওয়া হয় না। সদুদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিলে, উদ্দেশ্য যে জয়যুক্ত হইবেই এ বিশ্বাস সুভদ্রার মনে তখন হয় নাই। সেইজন্যই 'কঞ্চুকী'র প্রয়োজন হইয়াছিল।

মহাশক্তির আরাধনা করিতে হইলে যে বিশ্বাসের আলোকে চিত্তকে সর্ব্বাগ্রে ধৌত করিয়া লইতে হয় এবং বিশ্বাসের বলে পরম মূর্খও যে, প্রতিভাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারে এ চিত্র গিরিশচন্দ্র আঁকিবেন না তো আঁকিবেন কে? কঞ্চুকীর করস্পর্শে সুভদ্রা-চরিত্রের যে পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহা অলৌকিক হইলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না। আরও একটা জটিলতর ঘটনা ঘটিয়া সুভদ্রার এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা সপ্রমাণ করিয়া দিল। প্রত্যাখ্যাত দণ্ডী প্রতিশোধ-মানসে উর্ব্বশীকে কৃষ্ণের হাতে সঁপিয়া দিতে চাহিল। এই ঘটনায় সকলেরই টনক নড়িল। সকলেই ভাবিল—যাক এই বিপদটা যখন অতি অল্পের উপর দিয়া কাটিয়া যাইতেছে, তখন আর বৃথা বিবাদ-বিসংবদের প্রয়োজন কি? মানুষ এমনি করিয়াই গোঁজামিল দিয়া অনেক গোলমাল এড়াইতে চাহে। সুভদ্রা বলিলেন——

দণ্ডী আছিল আশ্রয়ে, পেয়ে ভয়—
হয় যদি অরির আশ্রিত,
অশ্বিনী রতন তার রাজ-প্রয়োজন;

সত্যই তো, যে ন্যায়ধর্ম্মের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য, সমস্ত দেবশক্তিকে আজ তাঁহার সম্মুখ-সমরে আহ্বান করিয়াছেন একটা কাপুরুষের বিশ্বাসঘাতকতায় তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে? সুভদ্রার মন এতটা ক্ষণভঙ্গুর নহে। ভীম ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। সুভদ্রা ও ভীমের সমবেত শক্তি, বৃদ্ধ পিতামহের নির্ব্বাপিতপ্রায় উৎসাহ-বহ্নিতে নব-ইন্ধন যোজনা করিয়া দিল।

প্রথমে যখন গঙ্গাতীরে দণ্ডীকে সুভদ্রা আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন—সে আশ্রয়-প্রদানের ভিতর সুভদ্রার কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল

—কিন্তু বিশ্বাসের দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া সুভদ্রা-চরিত্রের যে কি পরিণতি সাধিত হইয়াছিল—তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় দণ্ডীকে দ্বিতীয়বার ক্ষমার দ্বারা, প্রেমের দ্বারা পুত্রের মত আপন করিয়া লওয়ার ভিতরে।

দণ্ডীর ধারণা ছিল—উর্ব্বশীকে সত্যসত্যই যেন তিনি খুবই ভালবাসেন। সুভদ্রা সেই ধারণার মূলে এক প্রচণ্ড নাড়া দিয়া যে কথাগুলি দণ্ডীকে শুনাইলেন—তাহা কেবল প্রাণহীন কতকগুলা হিতবাণী নহে—সুভদ্রা-চরিত্রে সমস্ত শক্তি তাহার ভিতর প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—

যদি প্রেম হইত বিকাশ,
হেরি তার বদনে নিরাশ—
অশ্রুধারা ঝরিত তোমার।
দুঃখভার মোচন কারণ,
কায়মন করিতে অর্পণ।
পরদুঃখে শিক্ষা কর আত্ম বিসর্জ্জন,
ধন্য হবে মানব জীবন!
আত্মত্যাগী পায় মাত্র আনন্দ—আস্বাদ,
নহে বিষাদ—বিষাদ-বিবাদ—
পূরিত এই ধরা!

সুভদ্রা-চরিত্রের ভাষা আলোচনা এইখানেই শেষ করি। শক্তিশালী ও শ্রদ্ধাবান সমালোচক 'পাণ্ডব গৌরবে'র প্রত্যেকটী চরিত্র লইয়া বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিলে নিঃসন্দেহ সে সমালোচনা রসিক বর্গের উপভোগ্য হইবে। দণ্ডী-উর্ব্বশী, দুর্ব্বাসা-নারদ, শ্রীকৃষ্ণ-বিদুর, সাত্যকি-ভীম, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম দ্রোণ-কর্ণ-দুর্য্যোধন-শকুনি, কুন্তী-দ্রৌপদী, কঞ্চুকী ও এমন কি সেই অশ্বপাল ও তাহার পত্নী—এই নাটকের প্রত্যেকটী চরিত্রই কেমন সজীব ও স্বভাবানুকূল। বিশেষতঃ ভীমের সেই সরল, সবল, ভক্তিনম্র, তেজস্বী, ধর্ম্মপ্রাণ ও গর্ব্বোন্নত চরিত্র এবং কৃষ্ণের সেই—'অতিশঠ, অতিখল, অতীব কুটীল' অপ্রমেয় অচিন্ত্যনীয় রহস্যপূর্ণ অপরূপ স্বরূপ—কবি যে কৌশলের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন—তাহা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

পাণ্ডব-গৌরব-নাটকের আবেদন মানুষের কাছে কখনও পুরাতন হইবার নহে। বুদ্ধিমান ও বিবেচক মরণ-জয়ী অথচ ভীতি-বিহ্বল দেবতারা, মানুষের ন্যায় ধর্ম্মকে পদদলিত করিবার জন্য, যে শক্তির শরণ লইয়াছিলেন, সে শক্তি তাঁহাদিগকে পরাজয়ের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে—অথবা সৎকর্ম্মেরসহায়তা করিলে তাহার ফল কখনও অকল্যাণকর হইতে পারে না। তাই যুধিষ্ঠির এবং দুর্য্যোধনের সম্মিলিত শক্তি হরিহরের চক্র এবং ত্রিশূলকেও পরাভূত করিয়া দিল। এই বিজয়-গৌরব—ইহাই মানব-জীবনের চিরন্তন ও চির-নূতন সত্য। বর্ত্তমান ভারতের চোখের সাম্‌নে এই সত্য উজ্জ্বলভাবে আঁকিয়া ধরিবার প্রয়োজন আছে। তাই আটাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে যে নাটক সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হইয়াছিল এখনও তাহার অভিনয়ের আবশ্যকতা আছে এবং যতদিন জগতে ধর্ম্মাধর্ম্মের সংগ্রাম চলিতে থাকিবে, এবং এমন কি সে সংগ্রাম শেষ হইয়া গেলেও ইহার সৌন্দর্য্য কখনও অনুপভোগ্য হইবে না। ভীষ্মদেবের এই কথাগুলি মানুষের জীবন-সংগ্রামের চিরকাল মূলমন্ত্রস্বরূপ হইয়া থাকিবে কারণ এইখানেই মানুষের প্রকৃত গৌরবের চিরন্তন মাহাত্ম্য নিহিত আছে—

তুচ্ছ কর জয়-পরাজয়—
দুখ-সুখ গণে নীচ জনে।
কিন্তু মনুষ্যত্বপ্রার্থী যেই ভাগ্যবান নর,
শুভাশুভ না করে গণনা,
ঝম্প দেয় ধর্ম্মলক্ষ্য করি।

সুন্দর জীবন

শ্রীগোপেশ্বর সাহা

আজি মোর জীবনের সুন্দর প্রভাত ;
শরৎ-শিশির-সিক্ত শেফালির দল,
আমারে করেছে আজ উতলা বিভল ;
আজি যে মিশিয়া গেছি এ বিশ্বের সাথ।

সুনীল গগন-বুকে হাসিটী উদার
আমার জীবনে করে কি যে শান্তি দান,
নীরব সে গীতি-তানে মাতি' উঠে প্রাণ
মনে হয় ও যে মোর কত আপনার !

এ বিশ্বের দ্বারে দ্বারে আনন্দের খেলা ;
আপনি মগন আমি সে খেলার মাঝে,
সেই ধূলা বালি নিয়ে অপরূপ সাজে
আজিকে দেখিতে চাই এ বিশ্বের মেলা।

ওরা যেন হয় মোর কত আপনার,
আকাশের তারাদল কাননের ফুল,
জগৎ শিশুর মুখে হাসিটী অতুল,
পূর্ণিমা চাঁদের শোভা ;—অমা অন্ধকার !

ওরা যেন চিরসাথী ব্যথা বেদনার;
রিক্ত নিঃস্ব ঘৃণ্য দীন ওই অসহায়,
ওই পাপী ওই তাপী চির হায় হায়,
জন্ম জন্ম চির যুগ—কত আপনার।

ধরণীর বুকে বুকে যেই হতশ্বাস
সে যে মোর পরিচিত কত পুরাতন
আমার প্রাণের মাঝে একান্ত আপন,
সে যে মোর আপনার দুখের উচ্ছ্বাস !

এত দিনে লভিয়াছি সুন্দর জীবন ;
সকলি সুন্দর আজি নয়নে আমার ;
পাপ পুণ্য হাসি-অশ্রু কত আপনার,
আজি মোর এ জীবনে আনন্দ-মিলন।

জেনেভা-ভ্রমণ

স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বম্বে পথে। শুক্রবার,১৫ আগষ্ট ১৯৩০

আবার রেলে-জাহাজে চলিতে চলিতে যথাসাধ্য ভ্রমণ-কথা লিখিবার পালা। ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী সবার ইচ্ছায় এই দুঃসাধ্য কর্ম্মচেষ্টা। হাতে-চ'খে বল নাই, মনে-শরীরে বল নাই, তথাপি তৃতীয়বার বিলাত-যাত্রার ইচ্ছা যে করিতে পারিতেছে সে সময়ে সময়ে দুই এক ছত্র লিখিতে পারিবে না একথা শুনিবে কে? যাহারা তাহা দেখিতে ও পড়িতে চায় তাহাদের জন্য এ চেষ্টা—সাধারণ পাঠকের জন্য নয়।

যে দিন বাঙ্গালার গবর্ণর স্যর হিউ ষ্টিভেনসন বড় লাট লর্ড আরউইনের পক্ষ হইতে জেনেভা লীগ অব নেশনস্ যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত আহ্বান ও নিমন্ত্রণ করেন, সে দিন হইতে বাড়ীতে কি নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, কত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কত বুঝিতে ও বুঝাইতে হইয়াছে, কত করিতে ও করাইতে হইয়াছে তাহা যে জানে ও দেখিয়াছে সেই বুঝিবে। অপরকে বুঝাইবার ও জানাইবার অবশ্য প্রয়োজনও নাই। প্রতিবারেই হয় এই ব্যাপার। তিনবার বিলাত, একবার দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাওয়া এ সকল বাধা অতিক্রমও আয়োজনের ভিতর দিয়া করিতে হইয়াছে। অতএব নূতন কিছু নয়। তবে এবার সঙ্গে পুত্র নিখিল যাইতেছিল। শরীর-মন ব্যগ্র ও বাড়ীশুদ্ধ সকলের অসুখ, এই জন্য বাধা আপত্তি গুরুতর। কিন্তু ইচ্ছায় তাহা অতিক্রম হইয়াছে। যাহাদের অসুখ তাহারা সকলে অপেক্ষাকৃত ভাল। আমারও কয়েক মাস ধরিয়া গুরুতর অসুখের পর শরীর অনেক ভাল। কর্ত্তব্যের আহ্বান বলিয়া যাহা মনে করিয়া আসিতেছি ও মনে করি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাহারা শেষে মত করিয়া শক্তি ও উৎসাহ দিয়া এ গুরুতর কার্য্যের সহায়তা করিয়াছে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ও শ্রীভগবানের চরণে তাহাদিগের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া বিলাতি মেলে কাল রাত্র দশটার সময় হাওড়া ষ্টেশন ছাড়িয়াছি।

বিদায় ও আয়োজনের পালা কয়দিন হইতে চলিতেছিল, গতকল্য তাহা চরম মাত্রায় পৌছিয়াছিল। শতজনের সহিত আলাপ আপ্যায়ন শতাধিক রকমের কাজকর্ম্ম সাঙ্গ করিতে যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। সাশ্রু-নয়নে সকলে বিদায় দিল। ধমকাইতে কাহাকেও পারিলাম না। মনে হইল আমিই ইঁহাদের সকলের নিকট অপরাধী। তাই নিঃশব্দে বিদায় লইলাম।

বাড়ীতে ও ষ্টেশনে কতলোক আসিয়াছিল তাহার সংখ্যা করা অসাধ্য। অনেককে আসিতে নিবারণ করিয়াছিলাম অনেকে সে কথা শুনিয়াছিল, অনেকে শুনে নাই। কলিকাতা ও মোগলসরাইতে মালা-তোড়ার অভাব হয় নাই। এখনও এত লোকের দয়া ও স্নেহের পাত্র থাকিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি ইহা অপেক্ষা কি আশা করা যাইতে পারে। সমস্তদিনে কত রকমের কত লোক আসিয়া শুভ ইচ্ছা জনাইয়া গেলেন তাহা বলিতে পারি না। নিজের সাংসারিক আয়োজন, পথের আয়োজন,পরিজনবর্গের সহিত ধীরে-সুস্থে দেখা-শুনায় কথা-বার্ত্তায় এমন কি আরাম-বিশ্রাম ও খাওয়া-দাওয়ার সময়ও শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া দুর্ঘট হইল। বিলাত যাওয়ার, কি আফ্রিকা যাওয়ার কথা লইয়া পুর্ব্ব হইতে কখন কোন ঢক্কা-নিনাদের অভ্যাস নাই। অনেকেই শেষ মুহূর্ত্তে জানিতে পারিয়া দেখা করিতে আসিলেন। অনিশ্চিত অবস্থায় যাওয়া হইবে কি না হইবে জানিবার জন্য অনেকে আসিলেন। এইরূপে অতি কষ্টে-শ্রেষ্টে আসিবার আয়োজন সম্পন্ন হইল। সমস্তদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়াছে—মনে হইল যথাসময়ে হয় তো যাত্রা দুর্ঘট হইবে। কিন্তু সকল রকমেই মেঘ কাটিয়া গেল।

ওভারল্যাণ্ড সুসজ্জিত মেল ট্রেণে যাত্রা হইল। আমার সহযাত্রী স্যর জাহাঙ্গীর কয়াজী—প্রেসিডেন্সী

কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক আমার গাড়ীতেই স্থান পাইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে তুলিয়া দিয়া গেলেন। উভয়ে রাত্র-দিন দুঃখের সুখের সকল কথা কহিতে লাগিলাম। মোমলসরাই ষ্টেশনে রাজা মাধোলালের দৌহিত্র নন্দলাল এবং চিতকী ষ্টেশনে প্রভাতচন্দ্রের শশুর বাবু মণীন্দ্রনাথ মিত্র দেখা করিয়া গেলেন। বর্ম্মার গবর্ণর স্যর চার্লস ইনেস ও কাশীর মহারাজার কর্ম্মচারী কর্ণেল গিরিজাপ্রসাদ এই গাড়ীতে যাইতেছিলেন। সৎসমভিব্যাহারীর অসদ্ভাব নাই। সমস্ত রাত ও আজও ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়াছে। পাহাড়, জঙ্গল বন-প্রদেশ সব বাড়ী ধৌত হইয়া নব শোভা ধারণ করিয়াছে।

খর গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নতাপে দগ্ধ এই প্রদেশের নগ্ন-সৌন্দর্য্য দর্শনে ১৯১২ সালে প্রথম বিলাত-যাত্রার সময় স্তম্ভিত ও ভীত হইয়াছিলাম, ১৯২১ সালেও তাহাই হইয়াছিল। এখন সে বাধা তিরোহিত। ১৯২৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাইবার সময় এ পথে যাওয়া ঘটে নাই, কারণ দিল্লী হইতে বম্বে সেবার যাইতে হইয়াছিল।

যে পথে বারংবার যাওয়া হয় তাহার নব-সৌন্দর্য্য নয়ন-পথের পথিক সহজে হয় না। বিশেষতঃ নয়ন এখন নবীন নহে। কায়ক্লেশে বহু বৎসর সেবার পর নয়ন এখনও যে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে, তাহা শ্রীভগবানের পরম দয়ার নিদর্শন।

সেই মাণিকপুর সটনর, কটনী, জব্বলপুর প্রভৃতি শহর পার হইয়া গাড়ী ছুটিয়াছে। নূতন বড় কিছু দেখিলাম না। নূতনের মধ্যে নর্ম্মদা নদীর বর্ষার নবীন শোভা দেখিলাম। বন্যা হইলে জল প্রায় লোহার পুলের সমান হয়—বর্ষায় ফুলিয়া উঠিয়াছে, কূলে কূলে জল রহিয়াছে, তথাপি পুলের অনেক নীচে। পূর্ব্বে যে পুলে পার হইয়াছিলাম, বন্যায় তাহা নষ্ট করিয়াছে। তাহার ভগ্নাংশ দেখা যাইতেছে। নূতন লোহার পুল নূতন বল সঞ্চার করিয়াছে। পথে মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রামে চাষা কিংবা কুলীর দল রেলের ধারে ঘর বাঁধিবার খামারের মত জায়গা পরিষ্কার করিয়া লইয়া দলে দলে নাচ-গান করিতেছে। নাচটা কতক সাঁওতালী নাচের ধরণ। বর্ষার প্রাচুর্য্যে প্রচুর শস্য লাভের আশায় তাহাদের এই আনন্দ।

কোট-প্যাণ্টের দাসত্ব ছাড়িয়া সমস্ত দিন-রাত ধুতির সাহায্যে কাটিতেছে। কয়াজী-সাহেবের সহিত নানা কথার অসদ্ভাব নাই; তবে নানা কারণে নিদ্রার অভাব।

শনিবার, ১৬ অগষ্ট ১৯৩০

প্রায় সমস্ত রাত বৃষ্টি হইয়াছে। যথেষ্ট ঠাণ্ডা। গায় জামা খুলিতে হয় নাই। তবে গাড়ীর অতি দ্রুত বেগবশতঃ নিদ্রার গ্লানি যথেষ্ট। সময়ে সময়ে দারুণ পতন ও উত্থান অবশ্যম্ভাবী। নাসিক শহরে সকাল হইল। গোদাবরী পার হইয়া নাসিক। রাম-সীতা-লক্ষ্মণের কীর্ত্তিপূত নাসিক তীর্থস্থান হইতে কিছু দূরে। পুণ্য-কথা স্মরণ-পথে উদিত হইল।

ঘাট পর্ব্বতের রেলওয়ে প্রণালীর কৌশলের কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ববারে বিস্তারিত বর্ণণা করিয়াছি। তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। সুইজরল্যাণ্ডের আল্পস্ পর্ব্বতে উঠিবার ছোট রেলওয়ে চড়িবার অবকাশ গতবার হয় নাই, এবার তাহা হইবে। তাহারই অনুকরণে দার্জ্জিলিং-সিমলা-রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে।

বর্ষা বিধৌত ঘাট ও সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের শোভা অতুলনীয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যে মোহিত হইতে হয়। কিন্তু সে মোহের এখন সময় অল্প। নানা মোহে এখন মন সমাচ্ছন্ন। মনে হইয়াছিল সকালে ঘাট পর্ব্বতে কিছু বেশী ঠাণ্ডা হইবে। তাহা না হইয়া বরং গরম এবং জাহাজে উঠিবার আয়োজনের পরিশ্রমে গরম আরও বেশী বোধ হইতে লাগিল। কয়াজী সাহেবের সাহায্যে সে পরিশ্রম অনেক কম হইল। মেয়েরা যত্ন করিয়া যেরূপ সুন্দর ভাবে অল্প স্থানের মধ্যে আসবাব-পত্তর গুছাইয়া দিয়াছিল তাহা আমার অসাধ্য যা হয় তা হয়, করিয়া যেমন সারা জীবন কাটাইলাম এখনও তাই। কোন কাপড়ের পাট ভাঙ্গিবে, ইস্ত্রি নষ্ট হইবে তাহা ভাবিবার শক্তি ও সময় কখন হয় নাই। এই যা হয় তা হয় করিয়াই পুনরায় ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলাম। কল্যাণ-জংসন পার হইয়া সকালের খাওয়া-দাওয়া করিলাম।

কয়াজী সাহেবকে যথেষ্ট ভাগ দিয়াও তিন বেন্দ

...ারে দিন কাটিল। বিশেষ ...জন না হইলে সাধ্যপক্ষে চা কফি ছাড়া আমি তো ...বলের খাবার খাই না, তবে বম্বে-পথে ব্র্যাণ্ডল কোম্পানী ...াবার দেয় ভাল।

ক্রমে বম্বের নিকটবর্ত্তী খাড়ি ও উপনগর ম্যাজগাঁও প্রভৃতি পার হইলাম। বম্বে শহরের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে ডাকগাড়ী একবারে ব্যালার্ড পিয়ার বন্দরে জাহাজের গায়ে লাগিবার জন্য চলিবে। আমিও ভ্রমণ কথার প্রথমাংশ সমাপন করিয়া পুণ্য ভারতভূমির কূল ত্যাগ করিবার জন্য ভগবচ্চরণে প্রণত হইয়া প্রস্তুত হইলাম। তিনি সকলের সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধন করুন ও সকলের সুমতি দিন।

———:**:———

আঁধারে আলো

(গল্প)

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

এক

আধ ভেজান দরজাটা একেবারে খুলিয়া শুভ্র-বসনা এক ...া নারী অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। রান্নাঘরের সম্মুখে বসিয়াই মালতী আলুর খোসা ছাড়াইতেছিলেন; রমণীকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিলেন, 'ঘটক-ঠাকরুণ যে? কি খবর?'

ঘটক-ঠাকরুণ তাঁহার নিকটে উঠিয়া আসিয়া বসিল। ...ার পর ক্লিষ্টমুখে বলিল,—'নতুন খবর আর কিছু নেই মা। আমি সেই মিত্তিরদের বাড়ী থেকেই এলুম জানতে, কি মত আপনাদের?'

মালতী হাতের আলুটা চার টুকরা করিয়া একটা বাটীর জলে ফেলিয়া গম্ভীরমুখে বলিলেন,—'না বাছা সে হ'বে না, বাবুর ইচ্ছে নয়।'

'কেন মা অমন সুন্দর মেয়ে—পরী বল্লেই হয়!'

'তা সে পরীই হ'ক আর অপ্সরীই হ'ক টাকা তো তেমন বেশী দিচ্ছে না। শুধু রূপ দেখলেই তো হ'বে না ...া, এদিকটাও তো চাই।'

কোটরগত চোখ দুইটা যথাসম্ভব বিস্ফারিত করিয়া বিরক্তিজড়িত বিস্ময়ের সুরে ঘটক-ঠাকরুণ বলিল, 'বেশী টাকা দেবে না সে কি কথা মা, নিজে হতে দশ হাজার টাকা দেব বলেছে। বল্লে পল্লে আর দু'এক হাজারেও আটকাবে না; এও তোমাদের পছন্দ নয়? আর কি চাও তা হ'লে?'

'সে তো আগেই তোমায় বলে রেখেছি টগর। কুড়ি হাজার টাকার এক পয়সা কমে আমি ছেলের বিয়ে দেব না, সেই বুঝে তুমি সম্বন্ধ এনো। এ কি কিছু বেশী বলেছি, আমার অমন ছেলে।'

বাধা দিয়া টগর বলিল,—'তোমার কথাই মানলুম মা। ছেলে তোমার খুব ভালো, কিন্তু তাই বলে কুড়ি হাজার টাকাটাও তো কম নয় যে তুমি চাইবে, আর লোকে দেবে। যতই ভালো, ছেলে হোক্ না কেন, চট করে অত টাকা কি কেউ দেয়, না দিতে পারে?'

'আমার ছেলে, মেয়ে তো নয়। বলেছি ঐ টাকা চাই তারপর সুন্দর মেয়ে—বড় বনেদী ঘরও দরকার।'

'তা' হ'লে আমার কাজ নয় মা। আমি তবে আসি—তা হাঁ মা, বাবুরও কি ঐ মত?'

'হাঁ বাছা, আমাদের দু'জনকার কি ভিন্ন ভিন্ন মত হ'বে, ঐ যা বলেছি। ঐ রকম সম্বন্ধ পাও তো এনো।'

"জননী"—বিলাতী ছবি হইতে

JUNO PRINTING WORKS—CALCUTTA.

'উপস্থিত হাতে তো নেই, পরেও যে পাব তাও বোধ হয় না।'

'তবে তুমি এস।'

'যাই।' টগর উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—'তা মা একটা কথা বলব—'

'কি?' বঁটীখানা কাত করিয়া রাখিয়া মালতী জিজ্ঞাসু-নেত্রে তাহার দিকে চাহিলেন।

'বলছি মা, তোমার তো ছেলে ঐ একটী, টাকাও যথেষ্ট আছে। তবে পরের টাকার ওপর এতটা ঝোক কেন? তার চেয়ে একটী সুন্দরী বৌ আন—সব দিকেই ভাল হ'বে। অত টাকা আর সুন্দর মেয়ে তুমি কোথাও পাবে না মা, আমি এই কাজে মাথার চুল পাকিয়েছি তো—একথা তোমায় জোর করে বলে দিচ্ছি।'

অসহ্য ক্রোধে মালতীর শ্যামল মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তরকারীর থালা লইয়া দ্রুতপদে রন্ধন-গৃহে প্রবেশ করিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, 'ভবিষ্যতের কথা তোমার মুখ থেকে শুনবার জন্যে তো আমি ডাকিনি বাছা? কি পাব না পাব, আর কি ভাল হ'বে—না হ'বে,সে আমি বুঝব; তোমার তাতে মাথা-ব্যাথার দরকার নেই তো; আমি সব দিকে মনের মত না হ'লে ছেলের বে দেব না, তাতে বে যদি মোটে না হয় তাও ভাল।'

রোষভরেই জলন্ত উনানের উপর লোহার কড়াখানা বসাইয়া দিয়া মালতী সশব্দে খুন্তী নাড়িতে আরম্ভ করিলেন। সেখানে অপেক্ষা করা অনাবশ্যক বুঝিলেও টগর নড়িল না। দরজার সম্মুখে একটু আগ্রসর হইয়া কণ্ঠস্বরটা সাধ্যমত কোমল করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—'রাগ করলে মা? আমি মন্দ কথা বলি নি। বলি কি, যতই তোমার টাকা থাক মা, এই সে রকম ভাবে তো থাক না। ধর না, এই বাড়ীতে একটা রাঁধুনী কি চাকর নেই, যারা টাকা দেবে তারা তো সব দেখ্‌বে; তারপর কি বলে যে—ইয়ে—আপনাদের বাবুর ঐ একটুখানি-হাঁ—এই একটুখানি বদনামও আছে।'

মালতী এবার ধৈর্য্য হারাইলেন, খুন্তী হাতে লইয়াই লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন,—'কি আমাদের বদনাম আছে?'

'তা মা লোকে যে বলে—'

'আবাগী সর্ব্বনাশী কালামুখীরা নিজের চোখে দেখুক না আমরা কৃপণ কি না—আচ্ছা যাও বাছা তুমি, যাও ছেলে বিয়ে আমি দেব না।'

'তা হ'লে—' টগর কি বলিবার উপক্রম [illegible]

মালতী সগর্জ্জনে বলিলেন—'কিছুই নয় যাও তুমি, আ' ছেলের বে দেব না। হতচ্ছাড়িরা, আমার নামে নিন্দে। যদি ভগবান থাকেন তিনিই এর বিচার করবেন—মধুসূদন।'

টগর আর কোন কথা না বলিয়া ধীরপদে না[illegible] হইয়া গেল।

রাগে মালতীর কটীর বসন প্রায় খুলিয়া আসিয়াছিল কাপড়খানা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া তিনি পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বসিলেন। দারুণ ক্রোধে মুখখানা তখনও বিকৃত হইয়াছিল। টগর অবশ্য কথাটা মিথ্যা বলে নাই। শুধু এ পল্লীর নহে, আশেপাশের পল্লীর লোকেদের ভিতর তাঁহার ও তাঁহার স্বামী ভবেশচন্দ্রের কৃপণ বলিয়া দুর্ণাম ছিল। এখানকার লোকেরা ভবেশচন্দ্রের নাম তো বড় মুখে আনিতই না। সাধ্যমত তাঁহার সান্নিধ্যও বর্জ্জন করিয়া চলিত অক্ষম অধমর্ণের গলায় ছুরী দিতে, সুদের সুদ তস্য সুদে পাওনাদারের সর্ব্বস্ব নিলাম করিতে ভবেশচন্দ্র অদ্বিতীয়। মালতীও পতির যোগ্যা পত্নী। পুত্র সুহাস ঠিক পিতামাতার প্রকৃতির উত্তরাধিকারী না হইলেও শৈশব হইতে এ পর্য্যন্ত জনক-জননীর শাসনে বড় হইয়া তাঁহাদেরই ইচ্ছানুসারে চালিত হইয়া আসিতেছে,—তাঁহার নিজস্ব ব[illegible] কিছুই ছিল না; তবে অনেক সময় উৎপীড়িতে [illegible] বেদনা বোধ করিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেও [illegible] সুহাস শিক্ষিত—এ বিষয়ে [illegible] ছিলেন। উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া তদোপযুক্ত শিক্ষাদানে কৃপণতা করেন নাই। তবে পল্লীর দুষ্ট লোকেরাও ইহার মধ্যে একটা গভীর উদ্দেশ্য নিহিত আছে দেখিত। তাহারা বলিত পুত্রের বিবাহের সময় এই শিক্ষার দ্বারা দাঁও মারিবার জন্য ভবেশচন্দ্রের এই অপব্যয়। অবশ্য ভবেশচন্দ্র কোনদিন এ সব কথাতে কর্ণপাত করেন নাই। সুহাস বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর হইতেই ভবেশচন্দ্রের গৃহে

কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবকদের আসা-যাওয়া আরম্ভ হইয়াছিল—ভবেশচন্দ্রের কুড়ি হাজার আর মালতীর তাহার উপর ডানা-কাটা পরীর ফরমাস শুনিয়া অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবকেরা সরিয়া পড়িলেও কয়েকজন তখনও নাছোড়বান্দা হইয়া পরিয়াছিলেন। তাই বিবাহের বয়স হইলেও সুহাসের তখন পর্য্যন্ত 'আইবুড়ো' নাম ঘুচিবার কোন উপক্রমই দেখা গেল না। অবশ্য ভবেশচন্দ্রের চেষ্টার ক্রটী ছিল না, কিন্তু সে রকম বড় মাছ সত্যই চারে আসিল না। ইহাতে ভবেশচন্দ্র অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভগবানের দয়ায় পুত্র-কন্যার সংখ্যা তাঁহা অতি কম—মাত্র এক সন্তান, বহুদিন গৃহে ছোট ছেলে-মেয়ের আনন্দ-কোলাহল উঠে নাই। তাঁহার নিজের পুত্র-কন্যার আর আশা নাই, কাজেই দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার মত তাহার পৌত্র-পৌত্রীর মুখ দেখিবার জন্য প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু, সে সাধ মিটে কই? তাঁহাদের যে ধনুর্ভাঙ্গা পণ—বিশ হাজার টাকা আর সুন্দরী কন্যা চাই

টগরঘটকীর কথায় মালতী অত্যন্তই চটিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারই গৃহে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কথা শুনাইয়া যাওয়া। স্পর্দ্ধা তো কম নয়। ইহারা ভাবিয়াছে কি? তাহার পুত্র অমন সোণর চাঁদ ছেলে, তাহার জন্য কুড়ি হাজার টাকা কি কিছু বেশী বলা হইয়াছে। আচ্ছা বিবাহটা এক যায়গায় হইয়া যাক তারপর—। ভবেশচন্দ্র আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন। খুন্তি-চালনা বন্ধ রাখিয়া মালতী স্বামীর দিকে চাহিতেই ভবেশ বলিলেন, 'মাঝের ঘরের ভাড়াটেটা ভাড়া দিয়েছে?'

নীচেকার খান দুই ঘর বাদ দিয়া বাকি ঘরগুলা ভবেশচন্দ্র ভাড়া দিতেন। ভাড়া আদায় করিবার ভার ছিল মালতীর উপর। ঘর ছিল অনেকগুলি—চার পাঁচটী পরিবার দুই একখানি করিয়া লইয়াছিল। এভাবে যাহারা থাকে তাহাদের অবস্থা অনুমেয়। ভাড়ার টাকাসম্বন্ধে মালতী দেবী কিন্তু কখনও কাহাকে কিছু মাফ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় নাই। মাস শেষ হইতে না হইতে পয়সাটী পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া তিনি আদায় করিয়া লইতেন—বিপদ-আপদ, অসুখ-বিসুখ কিছুতেই তিনি ভ্রুক্ষেপ করিতেন না।

স্বামীর প্রশ্নে রুষ্টভাবে মালতী বলিলেন,—'না, সে আমি কিছুতে পারলুম না। বীণার বাপ তো শয্যাশায়ী—মেয়েটা কেঁদেই অস্থির। বলে বাবা তো শুয়ে। এমাসে মাইনে পাওয়া যায় নি খাব কি করে? কিছুদিন সময় দিন।'

কক্ষ মধ্যে অগ্রসর হইয়া ভবেশ বলিলেন, 'সময় দিন, এ কি মামার বাড়ীর আবদার না কি? ঘটী-বাটী টেনে আনতে পারলে না। না—না, ওসব চালাকি আমার সঙ্গে চলবে না। মাস শেষ হয়েছে কবে, এ-মাসের আজ ষোল দিন হ'ল, এখনও বলে সময় দাও। মজা আর কি? না, এমন সব হাড়-হাবাতে ভাড়াটে জুটেছে আমার কপালে,যত সব লক্ষ্মীছাড়া যা বলেছ,এমন দেখি নে—বাড়ির ভাড়াটা আগে দে তারপর অন্য কাজ। তা নয়, বলে অসুখ। আরে তোর অসুখ তাতে আমার কি—আচ্ছা দেখাচ্ছি আমি, কেমন অসুখ—'

ভবেশচন্দ্র অদূরবর্ত্তী একটা প্রকোষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। মালতীও ক্ষিপ্রভাবে হাতটা ধুইয়া তাহার অনুগমন করিলেন। প্রশস্ত দালানের পর একখানি ঘর পুরান সেকেলে বাড়ী ঘরগুলায় প্রায়ই-রৌদ্র বাতাস প্রবেশ-পথহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাহারই একটা ঘরে একটী ষোল-সতর বছরের মেয়ে লোহার ছোট উনানে পুরান সংবাদ পত্র জ্বালাইয়া একটা এলুমিনিয়ামের বাটীর মধ্যে খানিকটা সাবু সিদ্ধ করিয়া লইতেছিল। নিকটেই একটা জীর্ণ শয্যায় ততোধিক জীর্ণকায় এক ব্যক্তি শায়িত। সে জাগিয়াই ছিল, ভবেশের কথাগুলা তাহারে কাণে আসিতে কিছুমাত্র বাধা পায় নাই। সাবুর বাটীটা নামাইয়া মেয়েটী ডাকিল, 'বাবা!'

'বীণা মা!'

শয্যাশায়ী ব্যক্তির কোটরগত প্রভাহীন চক্ষুর কোণ্ বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু মলিন উপাধান সিক্ত করিল। বীণারও চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। আপনাকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া পিতার দিকে চাহিয়া ক একটা সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করিতে গিয়াই সভয়ে বীণা স্তব্ধ হইয়া গেল। ভবেশচন্দ্র দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার ঘরের ভিতরটা দেখিয়া লইয়া স্বভাব-সিদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'বলি তোমার মতলবটা কি হে ভূপেন।'

ভূপেন্দ্র দুই একবারের চেষ্টায় শুষ্ককণ্ঠে অত্যন্ত অস্ফুট-স্বরে যাহা বলিল, তাহা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল না। ইহাতে তিনি আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—

'কি বলছ সেটা স্পষ্ট করে বল, না হ'লে বুঝব কি করে? মাস গত হ'য়ে আজ মাসের তো আৰ্দ্ধেক হ'য়ে গেল এখনও তো তুমি ভাড়া দিলে না, কি মনে করে? দেখ্‌ছি তো অসুখ। এ অবস্থায় নালিশ কর্লে তো তোমার পক্ষে বড় সুবিধে হ'বে না।'

পিতা-পুত্রী উভয়েই সত্রাসে শিহরিয়া উঠিল। ভূপেন্দ্রের ওষ্ঠে কথা আর আসিল না, ক্লিষ্ট বিষণ্ণ নেত্রে তিনি কন্যার দিকে চাহিলেন।

ভবেশচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া শান্ত কণ্ঠে বীণা বলিল, 'বাবার কি রকম অসুখ তা'তো দেখছেন জ্যাঠাবাবু। দুমাস বিছানায় পড়ে একটী পয়সা ঘরে আসছে না, তাই সময়মত ভাড়াটা দেওয়া হয় নি।'

ভবেশ প্রচণ্ডভাবে একটা ধমক দিয়া বলিলেন, 'তুমি থাম তো ফাজিল মেয়ে। বড্ড 'লেক্‌চার' দিতে শিখেছ দেখছি যে। ওসব জানি না; ভাড়ার টাকা এখনি দেবে কি না শুনতে চাই?

অতি ক্ষীণকণ্ঠে এবার ভূপেন্দ্র উত্তর দিলেন,—'কি করে দেব দাদা দেখছেন তো—'

'ঐ, আবার তুমিও নাকে কাঁদতে সুরু কর্লে? বলি বলি ঘরে টাকাই না হয় নাই, জিনিসটা-পত্তরটা আছে তো? তাই একটা বেচে কিনে আমার পাওনা ফেলে দাও না তুমিও নিশ্চিন্ত হও, আমিও হই। অনর্থক একটা ঝঞ্ঝাট রাখা বই তো নয়। আমি গরীব মানুষ সময়মত ভাড়াটা না পেলে আমার চলে কি করে? সেটাও তো একটু বিবেচনা কর্ত্তে হয়। ধর্ম্মের দিকে চেয়ে কাজ করতে হয়।'

'অন্যায় অধর্ম্ম কখন ও করি নি দাদা তা'তো আপনি জানেন। আজ চার বছর থেকে মেয়েটীকে নিয়ে আপনার বাড়ি আছি। সামান্য চাকরী, চল্লিশটী টাকা পাই, তবু মাস কাবার না হ'তে হ'তেই আপনাকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছি এবার নিতান্ত দায়ে পড়ে—'

ভবেশের প্রবল কণ্ঠস্বরে ভূপেন্দ্রের ক্ষীণকণ্ঠ চাপিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—'ওহে দায় যেমন তোমার, তেমনই আমারও আছে তো। আমারই টাকা না পেলে চলে কি করে তাই বল তো।'

'ও কথা বল না দাদা এই সামান্য কটা টাকা—'

ভবেশ রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন,—'তোমার কাছে সামান্য হ'তে পারে কিন্তু আমি তো বড় মানুষ নই। আমার কাছে ঐ অনেক; এই ভাড়ার কটী টাকাতেই আমার সংসার চলে। এ কথা অতি সত্য।'

ভবেশচন্দ্রের কথাটা কতকটা সত্য, কারণ ভাড়ার সমস্ত টাকাই তাহার সংসার খরচে ব্যয় হইত না, অধিকাংশই ব্যাঙ্কে গিয়া প্রতিমাসে জমার ঘর বৃদ্ধি করিত।

ইহারা কথা কহে না দেখিয়া ভবেশচন্দ্র আবার বলিলেন,—'তা হ'লে আমায় নালিশই কর্ত্তে হ'বে?'

আর্ত্ত ভূপেন্দ্র বলিল,—'আপনার আশ্রয়ে এতদিন আছি দাদা, আমায় প্রাণে মারবেন না, কি বলব উপায় থাক্‌লে কি আমি আপনার টাকা ফেলে রাখি, ঘরে একটা আধলা পর্য্যন্ত নেই, মেয়েটা দুদিন এক রকম না খেয়ে আছে। ঐ ঘরের নবীনবাবুর স্ত্রী একটু দয়া করেন এটা-সেটা দেন—'

বাধা দিয়া ভবেশচন্দ্র বলিলেন,—'হাঁ৷ হাঁ৷ অমন দয়া-ধর্ম্ম আমি ঢের দেখেছি, আমার অত দয়া-টয়া নেই; শাস্ত্রেই আছে আত্ম রেখে ধর্ম্ম। তা যা'ক তোমারা যখন ভালভাবে দেবে না, তখন বাধ্য হ'য়েই আমাকে কোর্টে যেতে হ'বে। আদালতের লোক এনে অপমান না কর্লে তো হ'বে না ভালভাবে টাকা তুমি দেবে না তো?

ভূপেন্দ্র নির্জ্জীবের মত বিছানার উপর পড়িয়াছিলেন, কথা বলিলেন না। অধীর ভাবে ভবেশচন্দ্র বলিলেন,—

'তা হ'লে কি বল টাকা দিয়ে দেবে?'

'হাঁ৷ জ্যাঠাবাবু আমি যা হোক কিছু বিক্রি করে আজ বা কাল আপনার টাকা দিয়ে দেব?'

'সত্যি বলছ তো?'

'সত্যিই বলছি।'

'বেশ তা হ'লে তাই দিও, তা... বীণা যদি সোণা-রূপোর জিনিষ কিছু হয় তা হ'লে ... কাছেই নিয়ে এস আমি সুবিধে ...রে দাম ... তোর ভালর জন্যই বলছি। ছেলে মানুষ, ... কে ঠকিয়ে নেবে।'

ঘাড় নাড়িয়া বীণা বলিল'—'আচ্ছা তাই যাব।'

'তাই আসিস, দেখিস চালাকি কর্ত্তে যাস নি যেন। আজ সন্ধ্যের মধ্যে। টাকা আমার চাই না হ'লে বাধ্য হ'য়ে কাল আদালতে যেতে হ'বে।'

'আজই টাকা দেব।'

'বেশ বেশ' বলিয়া হৃষ্টমনে পত্নীসহ ভবেশচন্দ্র প্রস্থান করিলেন—

বীণা সাবুর বাটীটা তুলিয়া পিতার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল। বহুক্ষণ কেহই কথা বলিল না; আবার ক্ষীণ-কণ্ঠে ভূপেন্দ্র বলিলেন,—'টাকা তো দিবি বল্লি কিন্তু ঘরে তো আর কিছু নেই—যা কিছু সব তো আমার চিকিৎসায় খরচ কল্লি; বারণ কর্ল্লুম শুনলি না, এখন কি করি বল দেখি।'

একটা হাত তুলিয়া বীণা বলিল, 'আমার এই চুড়ী দুটোয় কত হ'বে বাবা? তিন ভরি সোণা এতে ছিল না? খুব কম হ'লেও টাকা পঞ্চাশ পাব, না?'

'তোর চুড়ী বেচবি? বীণা! বীণা!'

'তা' হলেই বা, বাবা। তোমার অসুখ ভাল হ'লে আবার গড়িয়ে দিও। দেখছ ভবেশজ্যাঠা কি কর্চ্ছেন।'

ভূপেন্দ্র কথা বলিলেন না। বড় বড় অশ্রুর বিন্দু তাঁহার কপোল বহিয়া নামিতে লাগিল। ব্যস্তভাবে বীণা বলিল,—'কি ছেলেমানুষী করছ বাবা নাও সাবুটা খেয়ে ফেল। অসুখে-বিসুখে সকলকারই এ রকম হ'য়ে থাকে বাবা লক্ষীটী কেঁদ না।

পিতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া সেও আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল।

তিন

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে শূন্য প্রকোষ্ঠে ম্লান মুখে ঘরে আসিয়া বীণা বিছানায় বসিয়া পড়িল। ভূপেন্দ্র তার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'বীণু অমন করে এসে বসলি কেন মা? কি হয়েছে?'

বীণা উত্তর দিবার চেষ্টা করিল না। শোকে দুঃখে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। নীরবে নতনেত্রে চাহিয়া সে আপনাকে সংযত করিতে চাহিতেছিল।

ব্যস্তভাবে ভূপেন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—'কথা বলিস না কেন রে? কি হয়েছে?'

পিতার ব্যগ্রভাবে ত্রস্ত হইয়া একান্ত চেষ্টায় আপনাকে কতকটা শান্ত করিয়া লইয়া বীণা বলিল,—'বাবা!'

'কি মা কি হয়েছে?'

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বীণা উত্তর দিল,—'ভবেশজ্যাঠা একটা টাকাও আমায় দিলে, না। আমি যে ভেবেছিলুম ঐ টাকা পেলে তোমায় বড় ডাক্তার দেখাব, তা ছাড়া কাল তোমায় কি খেতে দেব? আর যে একটীও পয়সা ঘরে নেই বাবা; আমি যে বড় আশা করেছিলুম চুড়ী বিক্রীর টাকায় ভাড়া দিয়েও আমাদের মাসখানেক চলে যাবে।'

'কি বল্লেন ভবেশবাবু? কত টাকা হ'ল ওতে।'

'উনি বল্লেন ত্রিশ টাকার বেশী এর দাম হ'বে না, তা এ টাকা আমার কাছেই থাক, মাস ও তো শেষ হ'য়ে এল। সামনের মাসের ভাড়াটাও নিয়ে রাখলুম; তোদের পক্ষে সে তো ভালই। ভাড়া দেওয়া রইল কোন হাঙ্গামা থাকবে না। পাঁচটা টাকা চাইলুম বাবা! তোমার পথ্যের জন্যে, তাও তিনি দিলেন না, আমায় বকে উঠলেন। এমন হ'বে জানলে কখনও ওর হাতে জিনিস দিতুম না। পঞ্চাশ টাকার জিনিস মোটে ত্রিশটী টাকায় নিয়ে নিলেন।'

ভূপেন্দ্রনাথ ব্যথিত বেদনা প্রাণপণে বক্ষের মধ্যে চাপিয়া স্তব্ধভাবে শয্যার উপর পড়িয়া রহিলেন। বাহিরে সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ক্রমশঃ জমিয়া গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। অন্ধকার গৃহে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকার নামিয়া সমস্ত স্থানটা দৃষ্টির অগোচর করিয়া দিয়াছিল। সেই বিকট নিবিড়

অন্ধকারের মধ্যে গভীর ব্যথায় ভারাক্রান্ত চিত্ত পিতা-পুত্রী নীরবে বসিয়া রহিল

বাহিরে মালতীর কণ্ঠ শুনা গেল।

'হ্যাঁরে বিনি ওঁর সঙ্গে কি এত কথা কচ্ছিলি? ঘরে সন্ধ্যেটাও জ্বালতে পারিস নি, আচ্ছা আল্‌সে মেয়ে তো; সন্ধ্যে বেলা ঘরে সন্ধ্যে না পড়লে যে লক্ষ্মী ছেড়ে যায়, তাও কি জানিস না। তোরা ভাড়াটে দোষ তো তোদের হ'বে না হ'বে আমার; একি অলুক্ষুণে কাণ্ড। তোদের অসুখ-বিসুখ বলে কি আমার ভাল-মন্দটা দেখ্‌তে হবে না। ওঠ উঠে দোরে জল দে সন্ধ্যে জ্বাল; অতবড় মেয়ে তার যদি একটু আক্কেল-বিবেচনা আছে।'

বীণা ত্রস্তভাবে উঠিয়া অন্ধকারের মধ্যেই খুঁজিয়া দেশলাই জ্বালিল। প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মি অন্ধকারের বুক চিরিয়া কাল কাপড়ে জরির রেখার মত ঝক ঝক করিয়া উঠিল। দরজার দিকে বীণা চাহিল। মালতী অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে সেইভাবে চাহিয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে পুরাতন জীর্ণ ট্রাঙ্কটা খুলিয়া একখানা বহুদিনের ব্যবহৃত পার্শী শাড়ি বাহির করিল। কাপড়খান হাতে লইয়া বহুক্ষণ সে সেই দিকে চাহিয়া রহিল—এখানি তাহার মার। স্বর্গীয়া জননীর স্মৃতি বলিয়া কাপড়খানি বহুযত্নে সে রাখিয়া ছিল। দরিদ্রের গৃহে জননীর চিত্র বা অন্য কোনও চিহ্ন ছিল না। সামান্য বসনখানিই একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন। মায়ের কথা মনে পড়িলে সেইগুলো নাড়িয়া চাড়িয়া সে তৃপ্তি বোধ করিত। আজও কাপড়খানা হাতে লইয়া তাহার অশ্রুরোধ করা দুঃসাধ্য হইয়াছিল। ট্রাঙ্ক খোলার শব্দে তাহার পীড়িত পিতা একবার চাহিয়া দেখিলেন। বীণাকে একইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন,—'কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন বীণা?'

চমকিয়া চাহিয়া বীণা বলিল,—'বাবা আর তো কিছু আজ ঘরে নেই, দেখি ঐ কাপড়খানা নিয়ে কেউ যদি কিছু দেয়। নইলে আজ রাত্রে তোমায় কি খেতে দেব?'

'ওখানাও নষ্ট করবি বীণা? নিজে তো গেলুমই কিন্তু তোকেও—' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে এইটুকুমাত্র বলিয়া ভূপেন্দ্র আর কথা শেষ করিতে পারিলেন না।

পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া বীণা বলিল,—'ও কি, ও কি বলছ বাবা? না না, তুমি সেরে উঠবে, নিশ্চয় সেরে উঠবে নইলে—আমার—'বলিয়া পিতার বক্ষে মুখ রাখিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল।

চার

মালতী স্নান করিয়া উপরে আসিতেই হাসির ছটায় আকর্ণ বিস্তৃত করিয়া ভবেশ বলিলেন,—'আর কি মালতী বাজিমাত্।'

কথাটা ঠিক না বুঝিয়া বিস্মিতভাবে মালতী বলিল,—'কি?'

'বাজি মাৎ, বাজি মাৎ, খোকার বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল এই সামনের বোশেখে।'

ব্যগ্রভাবে মালতী জিজ্ঞাসা করিল—'কোথায় ঠিক হ'ল? কখন ঠিক করলে? এই তো এই মাত্র তাঁরা এসেছিলেন, কত দেবে থোবে?'

'বাইশ হাজার টাকা নগদ করকরে গুণে দেবে। আর ঐ একই মেয়ে বাপ চোখ বুজলে সবই মেয়ে-জামাইয়ের।'

'তা তো হ'ল মেয়ে কেমন? কোথাকার মেয়ে?'

'সেই বর্ণপুরের জমিদারের মেয়ে গো। মনে নেই? সেই যে সেদিন দেখে এসেছি। পরী গো, পরী, ডানা-কাটা পরী—'

মালতী হাসিয়া বলিলেন—আমি তো বাবু পরী দেখি নি, তোমার বরাত ভাল তুমি দেখ। তা যা'ক সত্যি মেয়ে সুন্দর না হলে কিন্তু বাইশ হাজারই দিক আর বত্রিশ হাজারই দিক আমি ছেলের বে দেব না তা' ব'লে রাখলুম।'

আরে পাগল না কি, মেয়ে ভাল না হ'লে আমি কখন রাজি হই, মেয়ে খুবই ভাল; এইবার একবার দেখিয়ে দেব সেই বেটাদের যারা বড় বলত অত টাকা কেউ দেবে না। বড় আপশোষ হচ্ছে মালতী আর যদি দু' একটা ছেলে থাকত!'

'সে দুঃখু করে আর এখন লাভ কি? যাক্ তা হ'লে বোশেখেই দিন ঠিক হয়েছে?'

'হ্যাঁ গা হ্যাঁ।'

হৃষ্টমনে ভবেশচন্দ্র উঠিয়া গিয়া একটু ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন,—'নীচে অত গোলমাল হচ্ছে কেন? কার ঘরে? ও তোমায় বলতে ভুলে গেছি। ঐ ভূপেনের ঘরেও না কি

বীণার মার অসুখের সময় কার কাছে ত্ব'শ টাকা ধার করেছিল। সুদে-আসলে সেই টাকা আটশ হয়েছে। সেই লোক কি করে খবর পেয়েছে ও মর-মর, তাই এসেছে টাকা আদায় কর্ত্তে।'

'তারপর। টাকা দিচ্ছে নাকি?'

'পাগল তুমি। ও পায় না নিজে খেতে, টাকা দেবে কোত্থেকে? লোকটা ঘটী বাটী সব টেনে বার করছে।'

পত্নীসহ ভবেশচন্দ্র নামিয়া ভূপেন্দ্রের গৃহের সম্মুখে আসিয়া ভিতরের দিকে চাহিলেন। ঈষৎ স্থূলকায় এক বৃদ্ধ ব্যক্তি ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আস্ফালন করিতেছিলেন, এক পার্শ্বে আড়ষ্ট হইয়া বীণা দাড়াইয়া রহিয়াছে, ছিন্ন-শয্যায় ভূপেন্দ্রনাথ মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছেন। লোকটা তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল, 'এ সব জিনিস বেচলে চারটে টাকাও দাম হ'বে না, এতে আমার সব শোধ যাবে কি করে? বদমাইসী ক'রে লোকের টাকা নিয়েছে আজও দেবার নাম নেই। যদি মরে যেতো তাহলে টাকাগুলো আমার মাঠেই মারা যেত, ভাগ্যে খবর পেয়ে আজ ছুটে এসেছি! কি করছ টাকার এখন বল?"

অস্ফুটস্বরে ভূপেন্দ্রনাথ বলিল,—'কি বলব দাদা, যা ছিল সব তোমার ছেড়ে দিয়েছি আর আমার কিছুই নেই। টাকা যখন নিয়েছিলুম ভেবেছিলুম আফিসে যে পাঁচশ টাকা 'ডিপোজিট' আছে, চাকরী ছেড়ে দিয়ে তা পাব—পেয়ে তোমায় দেব। কপালগুণে সে কোম্পানী সকলকে ঠকিয়ে আফিস উঠিয়ে দিয়ে একেবারে লাল-বাতি জেলে দিল। আমি পথে বসলুম, তারপর এই চাকরীটা কোন গতিকে জুটিয়ে কষ্টেশ্রেষ্টে দিন কাটাচ্ছিলুম, উপায় থাকলে তোমার টাকা নিশ্চয় দিয়ে দিতুম।'

লোকটা হুঙ্কার দিয়া বলিল, 'রেখে দাও তোমার ও-সব বাজে কথা। উপায় নেই বললে পাওনাদার শোনে না তো। তোমার ভাঙ্গা বাসনপত্তর নিয়ে তো আমার টাকা উঠবে না, টাকার কি করছ বল? জোচ্চর শয়তান, দেব দেব করে এতদিন কাটিয়ে এখন তো মরতে বসেছ আমায় ফাকি দেবার মতলব, টাকা দাও। তারপর যমের বাড়ী যেও, নইলে এই দণ্ডেই তোমার মেয়ে নিয়ে পুরব তা বলে দিচ্ছি। ভাল-মানুষী ক'রে এতদিন নালিশ না করেই অন্যায় করেছি, ছোট-লোক, ইতর, অকৃতজ্ঞ তখন টাকা না দিতুম যদি?'

ক্ষীণকণ্ঠে ভূপেন্দ্রনাথ বলিল,—'সে তো তোমার দয়া, তুমি টাকা দেওয়ায় তখন সত্যিই আমার অনেক উপকার হয়েছিল—সে ঋণ আমি কখনও শোধ কর্ত্তে পারব না। আমিও তোমার টাকা রাখতুম না, কি করব ভগবান্ মারলেন। আমার অবস্থা দেখে দয়া কর, আমি জোড় হাতে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি।'

'আমি ত এখানে তীর্থ করতে আসি নি যে দয়া দেখাব। উঃ শয়তানী মতলব! দেব দেব করে এতদিন আমায় ভুলিয়ে রেখে এখন মরতে বসেছেন, ভাগ্যে ঠিক সময় এসে ধরেছি। দেখ ভাল কথায় বলছি আমার টাকার ব্যবস্থা কর শুনেছ।

'শুনছি বৈ কি?'

'কি করবে তবে বল?'

'কি করব তুমিই বল। আমার তো কোন উপায় নেই—একজন আত্মীয়-স্বজন পর্য্যন্তও আমার নেই। ঐ অতবড় মেয়ে পয়সার অভাবে আজ পর্য্যন্তও তার কোন উপায় কর্ত্তে পারি নি। আমি চোখ বুঝলে ওর যে কি হ'বে সে ভগবানই জানেন। ভিক্ষে করে হয় তো ওকে দিন কাটাতে হ'বে। এই তো আমার সম্বল ঘরের এই জিনিস কয়টা, তা তো তোমার আগেই ছেড়ে দিয়েছি। মনে কর, রমেশ ত্ব'শ টাকা তোমার ছোট-বেলার বন্ধুকে ভিক্ষে দিয়েছ।'

'হুঁ ভিক্ষে দিয়েছি। কি সুখের কথাই বল্লে। না অত দান করবার ক্ষমতা আমার নেই। টাকা আমার চাই। আজ এসেছি যখন, তখন সব না নিয়ে আমি যাব না। কি করবে আমায় বলে দাও।'

ভূপেন্দ্রনাথ কথা বলিতে পারিল না; রমেশও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বীণার দিকে চাহিয়া বলিল,—'পয়সার জন্যে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছ না বললে না?'

'হ্যাঁ—মেয়ের তো বিয়ে দিতে পারলুমই না।'

'তা দেখ ভূপেন এক কাজ কর হাজার হ'ক ছেলেবেলার বন্ধু তুমি টাকার জন্যে তোমায় বিব্রত আমি কর্ত্তে চাই না। আমার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত কর।'

'কি বন্দোবস্ত?'

ভূপেন্দ্রনাথ শঙ্কিত দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাহিল। বাল্যবন্ধু বলিয়া তাহার নিকট হইতে নিতান্ত দায়ে পড়িয়া টাকা লইয়াছিল। অকস্মাৎ তাহাকে সুর বদলাইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যের পরিবর্ত্তে অন্তরে ভীতিরই সঞ্চার হইল।

রমেশ বলিল,—'টাকা আমি সব ছেড়ে দেব, উপরন্তু তোমায়ও কিছু সাহায্য করব যদি আমার কথা শোন।'

'বল কি কথা।'

রমেশ একবার এদিক্ সেদিক্, একবার নতনেত্র বীণার দিকে চাহিয়া সহজভাবেই বলিল,—'জান তো সত্যর মার কাল হ'য়েছে, একটী গিন্নি নইলে আমার সংসার চলে না, তাই ভাবছি নিতান্ত দায়ে পড়েই ওই আমায় বে কর্ত্তে হ'বে।'

ভূপেন্দ্রনাথ অবাক্ হইয়া শুনিতেছিলেন। তাঁহার রোগক্লিষ্ট মস্তিষ্ক পূর্ব্ব হইতেই অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল, রমেশের এখনকার কথায় যেন ভাবিবার বুঝিবার শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া আসিল। রমেশ বলিতে লাগিল,— 'তাই বলছি তোমার মেয়েটীর সঙ্গেই আমার বে হ'ক না।

সহসা প্রচণ্ড আঘাত লাগিলে গভীর নিদ্রামগ্ন ব্যক্তি যেমন সত্রাসে জাগিয়া উঠে, রমেশের কথায় তেমনই ভাবে চমকিয়া উঠিয়া ভূপেন্দ্র বলিল, 'তুমি বিয়ে করবে? বীণাকে?'

'তোমার ওপর দয়া করেই বলছি। নয় তো মেয়ের কি কিছু অভাব আছে? তুমি নিতান্ত বাল্যবন্ধু

'না ভাই রমেশ মাপ কর। আমি বীণার পিতা। পিতার কর্ত্তব্য যদিও কিছু পালন কর্ত্তে পারিনি তবু তাকে এভাবে বলি দিতে পারব না!'

'পারবে না?'

'না কিছুতেই না। বেশতো ভাই সত্যিই যদি আমার উপর দয়া হ'য়ে থাকে তবে তোমার ছেলে সত্যেনের সঙ্গে ওর বে দাও না,আমি বলছি বীণা তার যোগ্য হ'বে। আমার টাকা নেই সত্যি কিন্তু বীণার আমার গুণের অভাব নাই। সত্যেনের সঙ্গে ওর বে দাও ভগবান্ তোমার ভাল করবেন—

'চুপ রাস্কেল বলছি আমি ওকে বে কর্ত্তে চাই তবু সত্যর নাম করে। সত্যর সঙ্গে বে দেব, তোমার মত হতভাগার মেয়ের সঙ্গে? আমি ওকে বে কর্ত্তে চাই এই তোমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি তা নয়—

'না দাদা আমার অমন ভাগ্যে দরকার নেই।

'তাতো নেই, কিন্তু আমি তো কাল হাতে দড়ি দিয়া তোমায় জেলে পুরব তখন মেয়ের কি হবে।"

"ভগবান্ আছেন, তিনিই দেখবেন!"

'তাই যেন দেখেন, আমি তবে উঠলুম। কাল তৈরী হয়ে থেক। আমি আজই নালিশ করব, এস্তাকাল ক্রোক করাব, শেষ ডিক্রী জারি করে জেলে পচাব।

এক রকম লাফাইয়া রমেশ ঘর ছাড়িয়া আসিতেছিল, সহসা পশ্চাতে কোমল কণ্ঠের আহ্বান আসিল,—"একবার শুনে যান।

রমেশ ফিরিল, বীণা সরিয়া পিতার কাছে বসিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল,—উনি যা বলছেন তাই কর না, বাবা।

বিস্মিত হইয়া ভূপেন্দ্রনাথ বলিলেন,—'কি ওর সঙ্গে তোর বে দেব? পাগল হয়েছিস্ বীণা? না না সে হবে না—হতে পারে না—টাকা নিয়ে ছিলুম দিতে পারি নি, তার জন্যে জেলে যাব তাতে দুঃখু নেই, কিন্তু নিজের সুখের জন্যে তোকে বলি দেব না—

'না বাবা তুমি রাজি হও আমার দিক্‌টাই কেন এত বড় করে দেখছ। এই শরীরে যদি তুমি—'বীণা শিহরিয়া উঠিল। না বাবা সে হ'বে না ওঁকে বলে দাও ওঁর কথায় আমরা সম্মত। বলিল যেন দয়া করে আর উৎপীড়ন না করেন।'

"বীণা! বীণা! একি বলছিস? না না এ হ'বে না।

'না বাবা তুমি অমত কর না এই হ'ক।'

রমেশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিল। বীণার কথায় অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল,—'তুমি যদি সম্মত হও তোমার বাবার অমতে আসবে যাবেনা। তুমি সম্মত তো?'

'হ্যাঁ আপনি দয়া করে আর বাবাকে পীড়ন করবেন না।'

'আরে না না। সে কি। উনি এখন আমার পূজনীয় লোক হলেন—শ্বশুর। আর কি কিছু বলতে পারি?'

ভূপেন কিছু মনে কর না ভাই। দূর কর ঐটেই কেবল

বলে ফেলি ভাই নয়, ভাই নয়,—। দিনটা তাহলে আজই স্থির করে ফেলব। বিকেলে আমি আসব পুরুতের কাছে জেনে। তোমার হ্যাণ্ডনোট খানাও অমনি এনে দিয়ে যাব।

'শুভস্য শীঘ্রম্। বোশেখের প্রথমেই কাজটা সেরে নেওয়া যাবে। ভূপেন, তোমার কিছু ভয় নেই, আমি জামাই হ'লে কোন ভাবনা থাকবে না; অনর্থক মন খারাপ কর না; বয়েস আমার এমন কিছু বেশী নয়—আসি তবে'—মুহ্যমান ভূপেন্দ্রনাথকে সান্ত্বনাদানে চরিতার্থ করিতে রমেশ অগ্রসর হইল। মালতী ও ভবেশ দ্বার-সম্মুখে দাঁড়াইয়া নীরব দর্শকের মত ঘরের দিকে চাহিয়াছিলেন, এইবার ভবেশ অগ্রসর হইয়া রমেশের ঠিক সম্মুখে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন,—'আপনার কত টাকা পাওনা মশায়?'

সহসা তাঁহাকে দেখিয়া ঘরের সকলেই চমকিয়া উঠিল। ক্রুদ্ধভাবে রমেশ বলিল,—'কে আপনি'

'মানুষ।'

'ভূত নয় সেতো আমিও দেখ্‌ছি, পরিচয় কি তাই জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি। আমার পাওনা জেনে আপনার কি দরকার?'

দরকার এই—যে গেঁটের টাকা দিয়ে আপনার পাওনাটা শোধ করে দেব।'

পরলোকগত কোন পূর্ব্বপুরুষকে সম্মুখে দেখিলেও বীণা বা ভূপেন্দ্রনাথ এত চমকিত হইত না যেমন হইল ভবেশের কথায়। বিহ্বল নেত্রে তাহারা শুধু চাহিয়া রহিল। ভবেশ পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'লোহার সিন্দুক খুলে হাজার খানেক টাকা নিয়ে এস তো।' মালতী চলিয়া গেলেন। ভবেশ পুনরায় বলিলেন,—'বলুন আপনার কত পাওনা। পাই পয়সা পর্য্যন্ত আমি দিয়ে দিচ্ছি। বুড়ো শকুন মর্ত্তে চলেছ লজ্জা করে না ভয় দেখিয়ে একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে। এই যে টাকা এনেছ গিন্নি দাও'

মালতী একগোছা নোট স্বামীর হাতে দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। ভবেশ বলিলেন,—'হ্যাণ্ড নোট নিয়ে এসে টাকা নিয়ে যাও, ভারী সুবিধা পেয়ে ছিলে না? মনে করেছিলে জেলে দেবার ভয় দেখিয়ে কচি মেয়েটার সারা জীবন একাদশীর ব্যবস্থা কর্ত্তে পার্ব্বে শয়তান—'রুগ্ন ভূপেন্দ্রের কপোল বহিয়া অশ্রুধারা নামিয়াছিল। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভবেশ সস্নেহে বলিলেন, ভূপেন ভায়া কিছু মনে কর না ভাই। তোমার সঙ্গে আমিও দুর্ব্যবহার যথেষ্ট করেছি, অর্থ-পিশাচ স্বার্থপর আমিও কম নই। কিন্তু আজ,—যাক ওকে আগে বিদেয় করি।' তারপর গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ভূপেন ভায়াকে ওপরে নিয়ে চল, এঘরে থাকলে বেচারা আর বাচবে না।'

মালতী গৃহমধ্যে আসিলেন। ভূপেন্দ্রের দিকে চাহিয়া ভবেশ বলিলেন,—'মেয়ের বিয়ের জন্যে ভেবনা ভাই আমার সুহাস তোমার বীণার অযোগ্য হ'বে না। বীণা মা এই বৈশাখেই আমার লক্ষ্মী হ'বে।'

হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে মালতী বলিলেন,—'আমিও এই কথাই তোমায় বলতে চাইছিলুম, তবে আর কি তা হ'লে পাওনাদার মশায় এখন আস্তে আস্তে সরে পড়ুন, বিকেলে এসে টাকা নিয়ে যাবেন। চলহে বেহাই এ ঘর থেকে ওপরে চল। অবসন্ন ক্লিষ্ট ভূপেন্দ্রকে একরূপ টানিয়া লইয়াই ভবেশ অগ্রসর হইলেন। বীণার হাত ধরিয়া মালতীও স্বামীর অনুগমন করিলেন। এতক্ষণের গোলমালে বাটীস্থ নর-নারী সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া ভীড় করিয়াছিল। অবাক্-বিস্ময়ে তাহারা ভবেশ ও মালতীর বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে কি না দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। রমেশ ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

গীতা কি ?

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

গীতা শ্রীভগবানের অফুরন্ত অনন্ত গান। সে সঙ্গীত মহাশক্তির প্রথম বিকাশ। সে সঙ্গীতের সুর সাত ভাগে বিভক্ত—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, ও সত্য, এই সপ্ত লোক।

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তাহার মাত্রা।

সে গান প্রতি মনুষ্য-হৃদয়ে শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রতি জীবের হৃদয়াকাশে সে গান ধ্বনিত হয়।

গীতা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মুখের বাণী। এই বাণীর এমন অমোঘ শক্তি যে, যিনি ইহাকে শ্রদ্ধা করিয়া শ্রবণ ও মনন করেন, তিনি আনন্দময় পুরুষোত্তমকে লাভ করেন।

বাণী ও বক্তাতে কোন প্রভেদ নাই; নাম ও নামী এক। অতএব গীতাই ভগবান্। যিনি গীতাকে আশ্রয় করেন, তিনি ভগবান্‌কে আশ্রয় করেন। গীতা তাঁহার বাঙ্‌ময়ী মূর্ত্তি। এই দেহের মধ্যেই সেই গান গীত হয়। মনুষ্য-দেহ, এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র আদর্শ। বিরাটে ও দেহ-ব্রহ্মাণ্ডে পরিমাণগত তারতম্য ছাড়া, অন্য কোন প্রভেদ নাই। এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের স্থূল দেহ। উহা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার-তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব, এই সপ্ত আবরণে আবৃত। উহার মধ্যে যে বিরাট্ পুরুষ বাস করিতেছেন, তিনিই ধারণার বিষয়।

ঐ বিশ্বস্রষ্টা পুরুষের পাদমূল—পাতাল, চরণ—রসাতল, জঘনদেশ—মহীতল,নাভি-সরোবর—নভঃস্থল, বক্ষ—স্বর্লোক, গ্রীবা—মহর্লোক, বদন—জনলোক, ললাট—তপোলোক এবং মস্তক—সত্যলোক। আমাদের দেহও সপ্ত আবরণে আবৃত। মা যোগমায়ার কৃপায়, এই সপ্ত আবরণ ভেদ করিয়া আমরা আনন্দময় পুরুষোত্তমকে লাভ করিব।

প্রথমে ভগবানের স্থূলরূপকে হৃদয়ে ধারণা করিতে হয়।

যোগমায়ার আরাধনা করিয়া, বিষ্ণুর শরণ লইতে হয়।

যোগমায়া বিষ্ণুর শক্তি। তিনি প্রসন্না না হইলে, আরোহণের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় না এবং দ্বার উদ্‌ঘাটিত না হইলে, বিষ্ণুর আশ্রয় লাভ হয় না।

শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় লাভ না করিতে পারিলে, সমস্ত কর্ম্ম এমন কি মনুষ্য জন্মও বৃথা।

কি উপায়ে বিষ্ণুর আশ্রয় লাভ হয় ?

অন্তরঙ্গ সাধনার দ্বারা তাহা লাভ হয়।

অন্তরঙ্গ সাধনা কি ?

গুরূপলব্ধ জ্ঞান-বলে নির্দ্দিষ্ট উপাস্য দেবতা এবং নিজের যে অভেদভাবে অবস্থান, তাহাকেই অন্তরঙ্গ সাধনা বলে।

চিত্তের অন্য জ্ঞান-প্রবাহ বিদূরিত করিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে কেবলমাত্র উপাস্য-বিষয়িণী চিন্তাকেই উপাসনা বলে। এতাদৃশ উপসনার দ্বারা দেবতা ও জীবাত্মার অভেদভাব সম্পন্ন হয়।

যেখানে নিজ চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদিত হয়, সেই খানেই সুখে উপবেশন করিবে।

নির্জ্জন প্রদেশে গ্রীবা, শিরোদেশ ও অন্যান্য অঙ্গগুলি সরলভাবে রাখিয়া সংযত চিত্তে উপবেশ করিবে।

ভক্তিপূর্ব্বক প্রথমে নিজ গুরুকে প্রণাম করিয়া, গুরুপদত্ত মন্ত্র জপ করিয়া, যোগমায়াকে প্রসন্না করিবে।

যোগমায়ার প্রসন্না মূর্ত্তিকে হৃদয়ে অনুভব ও ধারণা করিবে।

অনুভব করিতে করিতেই ভাব আসিবে; ভাবময়ের আবির্ভাব না হইলে ভাব আসে না। এই ভাবই তোমার হৃদয়ের দ্বারকে উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবে; এই দ্বার কিন্তু যোগমায়া রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছেন। এই দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে, তবে তুমি বিষ্ণু-মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইবে। শ্রীবিষ্ণুর চরণে সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনকে নিবেদন করিতে পারিলে, তিনি শুদ্ধা বুদ্ধি দিবেন; এবং তাহা দ্বারা

করিলে আত্মজ্ঞান বা গীতা-জ্ঞান লাভ করিবার তুমি উপযুক্ত হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

গীতা ১০।১০

যিনি হৃদয়স্থ শ্রবণাত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা নিদিধ্যাসন-পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর সহিত যুক্ত হইতে পারেন, তিনিই অমৃতত্ব লাভের উপযুক্ত।

এইরূপে শ্রীবিষ্ণুতে যুক্ত হইলে, তুমি দিব্য-শ্রুতি লাভ করিবে। ইহা লাভ করিলে, গীতা তোমারই অন্তরে গীত হইবে এবং সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের গানের ঝঙ্কার তোমার শ্রুতি-গোচর হইবে।

তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে, গীতা নিত্য, গীতা অপৌরুষেয়, গীতা অনাদি কাল ধরিয়া অনাদি হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত।

যেখানে জীবের জীবন-মরণ সংগ্রাম,, সেইখানেই ভগবানের আবির্ভাব, সেইখানে গীতা ভগবৎকণ্ঠে ধ্বনিত। ভগবদ্ বাণী ভগবৎকণ্ঠেই উচ্চারিত হয়; এইজন্য গীতা অপৌরুষেয়।

এই ধ্বনি যতক্ষণ না তুমি শ্রবণ করিবার অধিকার লাভ করিবে, সহস্র বার গীতা পাঠ করিলেও, সহস্র প্রকার টীকার আলোচনা করিলেও, তোমার মুক্তি-গেহিনী ও ভ্রান্তি নাশিনী জ্ঞানশক্তির উদয় হইবে না।

একবার এই জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে, তারপরে পুণ্যই করুক আর পাপই করুক, তদ্দ্বারা জীব লিপ্ত হয় না।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেতথা॥

গীতা ৪।৩৭

এই প্রকারে জ্ঞানপ্রতিবন্ধক কর্ম্মের ক্ষয় দ্বারা, কালে জীব আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন।

গীতা ৪।৩৮

জ্ঞান ব্যতীত জীবের অনারব্ধ কর্ম্মফল বিনষ্ট হইতে পারে না; কিন্তু প্রাণীর দেহারম্ভক যে প্রারব্ধ কর্ম্ম, তাহা একমাত্র ভোগের দ্বারাই বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাহা বিনষ্ট করিতে জ্ঞানও সমর্থ নয়।

আত্মজ্ঞান স্বরূপ অগ্নি, প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভিন্ন অর্থাৎ যে কর্ম্ম-ফল উপস্থিত সময়ে ভোগ হইতেছে, সেইরূপ কর্ম্ম ভিন্ন সকল সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সকলকে ভস্মসাৎ করে। ভবিষ্যতে যে যে পুণ্য ও পাপ কার্য্য করেন, তাহা পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় তাঁহাকে লিপ্ত করে না। অজ্ঞান-জনিত হৃদয়-গ্রন্থির বিনাশই মোক্ষের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ সগুণোপাসনার দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হইলে, নিরাকার নিগুর্ণস্বরূপে অর্থাৎ পরানন্দে জীব মগ্ন হয়।

মোক্ষ-প্রতিপাদক যোগশাস্ত্র-বিষয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, প্রকৃত সুকৃতিমান্ পুরুষ, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও নিষ্কাম জ্ঞান-কামনা করিয়া, ব্রহ্মবিৎ গুরুর শরণাগত হইবেন এবং বহু কাল সমাহিত চিত্তে গুরুর সন্তোষ সাধন করিয়া, অপ্রমত্তভাবে সমস্ত বেদান্ত-বাক্যার্থ শ্রবণ করিবেন। সমস্ত বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য নিশ্চয় করার নাম শ্রবণ। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যার্থের বিচার করার নাম মনন।

নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন, সঙ্গরহিত ও সর্ব্বদা শান্তাদিগুণযুক্ত হইয়া ধ্যানযোগের দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার করার নাম নিদিধ্যাসন।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গুরুর উপদেশ শুনিতে শুনিতে মন পাষাণ-বৎ হইলেও বিগলিত হইয়া যায়। গুরুভক্ত শিষ্যের বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না। গুরুর কথামৃত পান করিতে করিতে হৃদয়ে আপনা আপনি ব্রহ্মভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে। মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিতে গুরু-শুশ্রূষু ব্যক্তির কোন-রূপ ক্লেশ হয় না, মন্দাধিকারীর নিস্তারের উপায় ভগবান্ এইরূপ করিয়াছেন।

গুরুমুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিলে, অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার চিরদিনের জন্য বিদূরিত হইয়া যায় এবং ভ্রান্তি-রাশির সম্পূর্ণ শান্তি হয়।

গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভগবানে বিশ্বাস হইলে, জীবের সমস্ত মোহ নষ্ট হইয়া যায় এবং আত্ম-

জ্ঞান স্বরূপ স্মৃতি লাভ হয়। তখন তাহার সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়। গুরুসেবা না করিলে, গুরুমুখে উপদেশ না শুনিলে, কেবল নিজ বুদ্ধি-বিচারে কিংবা জ্ঞান গ্রন্থ-পাঠ করিলে, তত্ত্বজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে পারা যায় না।

ব্রহ্মবেত্তা গুরুর চরণে প্রণামপূর্ব্বক প্রশ্ন ও সেবা করিয়া আত্মজ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়।

কি করিয়া গীতাজ্ঞান লাভ করিতে হয়?

সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হওয়া।

তাঁহার নিকট শক্তিমন্ত্র গ্রহণান্তে একাগ্রতা লাভ করা। বীজমন্ত্র সমূহ ধ্যানলব্ধ শক্তিবিশেষের সূক্ষ্মতম শব্দময় বিকাশ। ইহাতে স্থির বিশ্বাস করা।

শক্তি ও শব্দ অবিনা-ভাবী অর্থাৎ এক।

যে সূক্ষ্মতম শব্দ অবলম্বনে যেরূপ শক্তি উদ্‌বুদ্ধ হয়, সেই শব্দটী সেই শক্তি বিশেষের বীজ মন্ত্র।

সূক্ষ্মতম নাদ হইতে মহতী শক্তির বিকাশ হয়।

শক্তি চিন্ময়ী, শক্তি আত্মা বা মা; সুতরাং শক্তির উদ্বোধক বীজমন্ত্রসমূহও চৈতন্যময়।

চৈতন্যময় সত্যাশ্রয়ী গুরুর মুখ হইতে বীজমন্ত্র শ্রদ্ধার সহিত চৈতন্যময়রূপে গ্রহণ করিতে হয়।

এই চৈতন্যময় মন্ত্র জপের প্রভাবে সেই মন্ত্রপ্রতিপাদ্য শক্তির আবির্ভাব হয়, অর্থাৎ দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

মন্ত্র চৈতন্যময় হইলে, তবে পূজা সফল হয়।

মন্ত্র-চৈতন্য কাহাকে বলে?

মন্ত্র, গুরু এবং দেবতার সম্যক্ ঐক্য অবধারণের নাম মন্ত্রচৈতন্য।

যে দেবতার প্রথম আবির্ভাবকালে,যে সূক্ষ্ম বীজমন্ত্র ঋষির নির্ম্মল প্রজ্ঞায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই সেই দেবতার বীজ। ঐ মন্ত্র প্রতিপাদ্য যে অর্থ তাহা গুরু অর্থাৎ মন্ত্রার্থ জ্ঞানই গুরু। মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যদি মন্ত্রার্থ জ্ঞানটীও উদ্‌বুদ্ধ হয়, তবেই মন্ত্র ও গুরুর ঐক্য হয়।

কিছুদিন ঐরূপ অর্থজ্ঞানান্বিত মন্ত্র জপ করিতে করিতে দেবীর আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং তখন সেই দেবীর স্বরূপ অবগত হওয়া যায় এবং তখন সাধক বর ও অভয় প্রাপ্ত হন।

গুরূপদিষ্ট উপায়ে এইরূপে অগ্রসর হইলে, শক্তির আবির্ভাব হইবে নিশ্চয়ই।

যদি সাধকের নিকট কোন একটী মন্ত্র চৈতন্যময় হইয়া উঠে, তখন তাঁহার স্তব, স্তুতি, প্রণাম, বন্দনা সকলই চৈতন্যময় হইয়া উঠে।

চিন্ময়ী যোগমায়ার আরাধনার দ্বারা কৃপালাভ হইলে, তিনি ব্রহ্মদ্বার খুলিয়া দিবেন, তখন তুমি হৃদয়স্থ শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ লইবার অধিকার লাভ করিবে, যিনি তোমায় গীতাজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান দান করিবেন।

তৎপরে তুমি ভক্তি করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে, নতুবা তৎপূর্ব্বে তুমি কাহাকে ভক্তি করিবে। শুধু ভক্তি কথা মুখে উচ্চারণ করিলেই হইল না।

> যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
> তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥
>
> —গীতা ৭।২৮

ভক্তের দেবতার সহিত যোগ বা যুক্ত হওয়া চাই, নতুবা তাহা প্রতারণা মাত্র। তখন সে বুঝিতে পারিবে যে ভক্তের বিনাশ নাই এবং ভগবান্‌ই ভক্তকে রক্ষা করেন।

ভক্তের নিকট সমস্ত শাস্ত্র সকলের রহস্য আপনা আপনি উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। বিচার করিয়া তাঁহাকে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় না, তখন তিনি সত্যকে দর্শন করিয়া সিদ্ধ হন এবং যিনি সিদ্ধ হন, সকল সিদ্ধান্ত তাঁহার নিকট আপনি আসে।

ইহাই গীতা এবং সকল শাস্ত্র অধ্যয়নের রহস্য।

গীতা ও তাহার ব্যাখ্যা আমাদের অন্তরেই আছে।

অকপট হৃদয়ে বুদ্ধিযোগের অভ্যাস করিলে, মনের পর্দ্দা একটার পর একটা সরিয়া যায় এবং নব নব সত্যের প্রকাশ আপনি হয়। তখন ধীরে ধীরে আমরা নূতন জগতের সন্ধান পাই এবং আমাদের ভিতর নব নব শক্তির বিকাশ হয়।

মোহ

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীমতী নীলিমা দেবী

বত্রিশ

আশ্বিনমাস। মুশৌরিতে শৈলপাদপগুলি শুষ্কপত্রের মর্ম্মরধ্বনি দ্বারা শীতঋতুর আগমন ঘোষণা করিতেছে। পাহাড়ের গায়ে যে গ্রীষ্মের পূর্ব্ব হইতে বহু পুষ্পের বিবিধ বর্ণের সজ্জা ছিল, সে সজ্জা আর নাই, দূরে দূরে অল্প হরিদ্রা ও নীলের আভা ভিন্ন সে পুষ্পরঞ্জিত শৈলগাত্রে আজ শুধু পত্রিকারই আভরণ; কিন্তু হেমন্তের আগমনে আজ পল্লবদল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, কোথাও রৌদ্র-তাপে প্রজ্বলিত হইয়া তাহাদের সোণার বরণ হইয়াছে, কোথাও সামান্য মাত্র শুষ্ক হইয়া সবুজ ও আরক্তিম বর্ণে সজ্জিত। আবার ঝাউগাছের সঙ্গে যেন নীলজাতীয় বহুবর্ণের সমাগম। প্রকৃতি-দেবী যেন আজ বিরহের সাজে সজ্জিতা, বসন্তকে বরণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাচীন সজ্জাত্যাগ করিতে ব্যাকুল—বিরহ যেমন কখন কখন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে তেমনই আজ শুষ্কপত্রের আভরণে ভূষিতা প্রকৃতিদেবীও সুন্দর মুর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়, এমন সময় দ্রুতপদে একটী রমণী পাহাড়ের চড়াই উঠিতেছিল। রমণী অল্পবয়স্কা, তাহার মুখ শান্ত স্নিগ্ধ,—চোখে যেন কোন অজানা কাতরতার ভাব, চলনে যেন বিরহিণীর মিলনপ্রয়াস। এই সম্ভ্রান্ত যুবতীটা এতই সুন্দর যে, সকলেই তাহার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিতেছে। তাহার—অঙ্গসৌষ্ঠব, সুন্দর গতি সবারই মন হরণ করে। সজ্জাও মনোরম—পরণে বহুমূল্য পাতাভ সাড়ী, অঙ্গে ভূষণাদি অল্প, সজ্জিত হইবার অভিলাষের চিহ্ন পর্য্যন্তও তাহাতে নাই, অথচ সে সজ্জার মাধুরী অসীম। সে পথের একটা বাঁকের কাছে আসিয়া শুনিতে পাইল, একটু দূরেই কোন বালক বা বালিকা তাহার ছোট ছোট পা ফেলিয়া দ্রুতপদে অবতরণ করিতেছে। বাঁকের ঠিক মুখে নিমেষের মধ্যে একটী ছোট ছেলে যুবতীর পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িল। সবেগে পড়ার ফলে বালকটীর ললাট আহত হইয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। যুবতী তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাহীন সেই শিশুকে বুকে করিয়া সেই পথের ধূলাতেই বসিয়া পড়িল, ও তারপর ধীরে ধীরে তাহাকে নিজ ক্রোড়ে শায়িত করিয়া তাহার ক্ষতস্থান রুমাল দিয়া চাপিয়া ধরিল। কিন্তু শিশুর মুখের দিকে চাহিতেই যুবতী বিহ্বল হইল। এ কাহার অবিকল প্রতিমূর্ত্তি! ভগবান্ কাহার সন্তানকে তাহারই পদতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। যাহাকে ভুলিবার জন্য এতদিন সে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছে, যাহার বিরহপীড়িত মনকে শান্ত করিতে সে এত চেষ্টা করিয়াছে, আজ তাহারই সন্তান তাহার বক্ষে জড়িত, তাহার ক্রোড়ে শায়িত। না—হয় তো ইহা তাহার ভ্রান্তি মাত্র, সাদৃশ্য হয় তো তাহারই কল্পনা। নিজেকে সংযত করিয়া সে তাহার সঙ্গের দ্বারবানকে বলিল—"শীঘ্র এই সামনের বাড়ী থেকে একটু পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল নিয়ে এস, আর যদি বরফ পাও তো অল্প এন—দেরী ক'রো না।"

অনতিবিলম্বে জল আসিল, রমণী ধীরে ধীরে ক্ষতগুলি ধৌত করিতে করিতে ছেলেটী সঙ্গীবিহীন আসিয়াছে কেন ভাবিতেছে, এমন সময় উপরে পদশব্দ পাইল। সে মুখ তুলিতেই দেখিল যে, এক পুরুষ তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

মুহূর্ত্তের পরে পুরুষটী বলিল, "প্রীতি, এতদিনে ভগবান্ আমার প্রার্থনা শুনেছেন, তোমাকে দেখতে পেলাম—কিন্তু এ কি ব্যাপার?" এই বলিয়া দেবব্রত চিন্তিত হইয়া সেইখানেই বসিয়া নিজ পুত্রের শুশ্রূষা আরম্ভ করিল। মুখে

জোরে জলের ঝাপটা দিতে ছেলেটী আস্তে আস্তে চোখ মেলিল। তখন প্রীতি বলিল, "এটী আপনার ছেলে ?—আমি দেখেই চিনেছি। কি সাদৃশ্য! একলা ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন ?"

"এই একটু আগে একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, আমরা দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছিলাম, চঞ্চল ছেলে, বাড়ীর কাছে এসেছে ব'লে ছুটে কখন যে চলে এসেছে বুঝতে পারি নি। ওকে না দেখতে পেয়ে আমিও ছুটে আসছি।"

"দেখুন, এই কপালের কাটাটা বোধ হয় ষ্টিচ (শেলাই) কর্‌তে হবে।"

এই সময় সেইখানে তিনজন মেম ও দুইটী সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই বলিয়া উঠিল "কি হয়েছে ?" সঙ্গে সঙ্গে একজন মেম এগিয়ে এসে ছেলেকে একবার দেখে দেবব্রতের উদ্দেশে ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "যদি ছেলেকে না সাম্‌লাতে পারবে তো সঙ্গে করে নিয়ে যাও কেন ? তুমি এই ছেলের মাথা খেলে, তোমার কাছে থাকলে ওর যত আবদার বাড়ে, নইলে আয়া ও চাকরদের কাছে থাকে কোন গোল করে না। এখন এই কাণ্ড হ'ল—আমার আজকের মত সমস্ত আমোদ সাবাড় হ'ল। আজ রাতের এত বড় বল-নাচেও যেতে পাব না।"

"তুমি স্বচ্ছন্দে আমোদ কর গে, 'বল'এও যেও। আমি আমার ছেলে নিয়ে থাক্‌ব, তোমার কোন ব্যাঘাত হ'বে না।"

ব্যাপারটা গরম হইতেছে দেখিয়া প্রীতি বলিল, "দেখুন, আপনারা কেউ আমার রিক্‌স গাড়ীখানা নিয়ে শীঘ্র একজন ডাক্তার নিয়ে আসুন। আমার মনে হ'চ্ছে খোকার কপালের কাটাটা একটু বেশী গভীর হ'য়েছে, শেলাই করা দরকার। অন্য যা' লেগেছে তা' বিশেষ কিছু নয়।" এই বলিয়া প্রীতি তাহার দ্বারবানকে বলিল, "গাড়ী থেকে আমার কোটটা নামিয়ে নাও।" সাহেবদের মধ্যে একজন ডাক্তার আনিতে গেলেন। তখন প্রীতি দেবব্রতকে বলিল, "আপনার বাড়ী তো কাছেই বল্‌ছিলেন, আপনি কি খোকাকে কোলে করে বাড়ী নিয়ে যেতে পারবেন, না দারোয়ান দিয়ে আস্‌বে ?"

"আমিই নিয়ে যেতে পারব, ঐ যে আমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে।"

"আপনার কাছে ফর্সা রুমাল আছে কি ? তা' হ'লে তাই দিয়ে একটু বেঁধে দিই। আমার রুমালটা তো কাটার উপর দিয়েছি। বাড়ী গিয়ে একটু আইডিন্ দিয়ে ধুয়ে দেবেন, তারপর তো ডাক্তারই এসে পড়বেন।"

দেবব্রত প্রীতির কোল হইতে ছেলেকে লইবার সময় নিম্নস্বরে বলিল, "একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই, অনেক কথা আছে।" ছেলেটীকে যখন সে তুলিতেছে ছেলেটী প্রীতিকে বলিল, "আপনি আমাদের বাড়ী চলুন না।"

প্রীতি তাহাকে আদর করিয়া বলিল, "আমার মা আমার জন্য বসে আছেন, আমি এখন বাড়ী যাই।"

ছেলেটী বলিল, "আমাকে দেখতে আসবেন তো ?"

প্রীতি হাসিল, সে উত্তর না দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু এতক্ষণ অনভ্যস্তভাবে সেই সুস্থ সবল বালককে কোলে রাখিয়া তাহার পাগুলি অবশ হইয়াছিল, তাই সে দাঁড়াইতে গিয়া টলিয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি দেবব্রতের বাহুতে ভর দিল ও অন্য সাহেবটীও তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। তখন দেবব্রত ব্যাকুলভাবে বলিল,—

"তোমার গাড়ী তো পাঠিয়ে দিলে এখন যাবে কি করে ?"

এতক্ষণে এমির রাগ কমিয়া ভদ্রতা করিবার জ্ঞান হইল। সে অগ্রসর হইয়া প্রীতিকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, "আপনার পায়ে লেগেছে কি ? আমার বাড়ী চলুন, সেখানে একটু বিশ্রাম ক'রে আমার সাড়া আছে তাই পরে বাড়ী যাবেন। এরকম রক্তমাখা ভিজে কাপড়ে রাস্তা দিয়ে যাবেন কেমন করে।"

উত্তরে প্রীতি বলিল,—"আপনি ব্যস্ত হ'বেন না, আমি কোটটা পরছি, তা' হলেই সব ঢাকা পড়ে যাবে।"

"না, না, ভিজে কাপড়ে গেলে অসুখ হ'তে পারে।"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আমি আর দেরী করতে পারব না। এমনিতেই বড় দেরী হ'য়ে গেছে, আমার মা অস্থির হ'য়ে পড়বেন।"

এমি ও তার সঙ্গের মেমেরা হাসিয়া বলিল, "কেন আপনি তো কচি খুকী ন'ন, সঙ্গে দারোয়ান, তবু আপনার মা ভাববেন ?"

"আমাকে অনেক দূর যেতে হ'বে, আর আমাদের বাড়ীর দিক্‌টা বড় নির্জ্জন, তাই মা রাত পর্য্যন্ত বাহিরে থাকা

ভালবাসেন না। আমাকে ক্ষমা করুন আমি আর অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না।"

"আপনার নামটী জান্‌তে পারি কি? আমার নাম মিসেস্ ঘোষ

"আমিও মিসেস্ ঘোষ" এই বলিয়া সে দেবব্রতের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আর দেরী করবেন না, খোকার ক্ষতি হ'বে—যান, শীঘ্র বাড়ী যান।"

দেবব্রত বলিল "তোমার পায়ে লেগেছে বোধ হয়, তোমার জন্যে একটা রিক্‌স ডেকে দিক, এতদূর হেটে যেতে পারবে কি?"

অন্য সাহেবটীও রিকস ডাকিবার প্রস্তাব করিল, কিন্তু প্রীতি বলিল, "আমার কিছু হয় নি, আমি বেশ চ'লে যেতে পার্‌ব।"

তখন সাহেবটী দারোয়ানের হাত হইতে কোটটী লইয়া প্রীতির জন্য ধরিল ও প্রীতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এই পাহাড়ের সব চেয়ে উঁচু ও শেষ বাড়ীতে থাকেন?"

"হাঁ. আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন?"

"আমি আপনাকে অনেকবার ওদিক্ থেকে আসতে দেখেছি। আপনাকে যে শুধু অনেক দূর যেতে হ'বে তা' নয়, চড়াইটাও কম নয়।"

প্রীতি সকলের নিকট হইতে বিদায় চাহিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। সকলেই তাহার দিকে দেখিতে লাগিল। সাহেবটী বলিল, "কি সুন্দর রূপ—আর তেমনই সুন্দর গঠন ও চলন—শিল্পীর চিত্ত হরণ করা রূপ।" এমি ও অন্য মেমদু'টী একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "তা' তোমার মনটা হরণ ক'রে ফেলেছে দেখছি।" দেবব্রতের এ-সব বড়, খারাপ লাগিল, সে বিরক্ত স্বরে বলিল, "এমি, ওর বাখ্যা না ক'রে বাড়ীতে চল, ছেলেটাকে একটু দেখা দরকার।"

এমি ক্রোধভরে বলিল,—"তুমিই বা এতক্ষণ যাও নি কেন? হাঁ ক'রে ঐ মেয়েটীর দিকে চেয়ে আছ, যেন তাকে চোখ দিয়ে গিলে ফেলবে।" দেবব্রত উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। সাহেবটী বলিল, "সাবধান! মিসেস্ ঘোষ, যদিও আপনি খুব সুন্দরী, কিন্তু এত কম নয় উপরন্তু ওর একটা মোহিনী শক্তি আছে—দেখ্‌বেন, যেন শেষে আপনার স্বামীটী হাতছাড়া না হ'য়ে যায়।"

গৃহে ফিরিয়া এমি দেখিল দেবব্রত পুত্রকে নিজের ঘরে নিজ-শয্যায় শোয়াইয়াছে এবং চাকরকে বলিয়াছে ছেলের ছোট খাটটা তারই ঘরে আনিতে। এমি ছেলের কাছে যাইতে দেবব্রত বলিল, "তুমি এখানে কেন? যাও, নিজের সাজ-সজ্জা করগে। আমি যতক্ষণ আছি আমার ছেলেকে দেখ্‌তে পার্‌ব, তোমার কিছু করতে হ'বে না।"

"অত রাগের মানে আমি বুঝতে পারছি না। তোমারই দোষে ছেলে পড়ে গেল, আমার ওপর রাগ ক'রে হ'বে কি? বেশ, আমি যাচ্ছি, আমি কা'রও অন্যায় রাগকে ভয় পাই না। ছেলেরও একটু শিক্ষা হওয়া দরকার ছিল—কতবার বারণ করেছি তবু পাহাড় থেকে নামতে ছুটবে—এইবার আর করবে না আশা করি। আর আমি ওকে তোমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে দেব না।"

ছেলে সভয়ে বলিল, "মা, এবারটী ক্ষমা কর, আর আমি অবাধ্য হ'ব না। বাবা যতদিন থাক্‌বেন আমাকে তার সঙ্গে বেড়তে দিও, আমি আর কোনও রকম দুষ্টুমি কর্‌ব না বা তোমাকে বিরক্ত কর্‌ব না। আমি কেবল বাবার কাছে থাক্‌তে চাই।"

দেবব্রত পুত্রকে স্থির হইতে বলিয়া এমিকে বলিল, "দয়া ক'রে এখন চুপ করে থাক, আমার এ-সব ভাল লাগছে না।"

"তুমি আজকাল বড় সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি কর, আমি এত সহ্য করতে পারি না।"

"আমি তো তোমার কোনও বিষয়ে বাধা দিই না; তুমি যা' ইচ্ছা তাই কর্‌তে পার আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না। তবে ছেলেটা যতদিন ছোট আছে, তুমি যখন তার মা, তুমি তা'কে যত্ন করবে এইটুকু চাই। আজকাল বড়ই তা'কে অবহেলা করা হচ্ছে, আমি ছেলের প্রতি অযত্ন সহ্য কর্‌তে পারি না। তোমার কি মাতৃ-স্নেহ কিছুমাত্র নেই? একটু বড় হ'লেই ছেলেকে আমি রাখ্‌ব, তখন তুমি যা' ইচ্ছা করতে পারবে। আমি অল্পদিনের জন্য এসেছি, তোমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করতে

চাই না—বাপ-মায়ের ঝগড়া ছেলের শিক্ষার পক্ষে বড় খারাপ ।"

"আহা আমার ভালমানুষটী" বলিয়া এমি সেই ঘর হইতে চলিয়া গেল।

ডাক্তার আসিয়া ক্ষতস্থান শেলাই করিয়া দিলেন ও সাবধানে ছেলেকে রাখিতে বলিলেন, তবে অভয় দিয়া গেলেন। এমি একবার ভাবিল যে সে রাত্রে আর নাচে যাইবে না, কিন্তু এই নাচের জন্য সে নূতন পোষাক কিনিয়াছে, লোকে তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপে মোহিত হইবে সে লোভ সে ত্যাগ করিতে পারিল না। দেবব্রত কিন্তু যাইল না, সে পুত্রের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

সেখানে একলা বসিয়া দেবব্রতের মনে কত রকম চিন্তারই না উদ্রেক হইল। এ রকম করিয়া কতদিন চলিবে? এ তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে বটে, কিন্তু কতদিন সে এই জ্বালা সহ্য করিবে? এমিও তো অসুখী, তার পক্ষেও তো এ বন্ধন বাঞ্ছনীয় নহে, তাহার প্রত্যেক কথায়—ব্যবহারে যেন বন্ধন ছিঁড়িবার প্রয়াস। কিন্তু তাহাদের যে ধর্ম্মবিবাহের অভেদ্য বন্ধন টুটিবার নহে। দেবব্রত ভাবিতে লাগিল, এমি যখন নিজের দেশ ধর্ম্ম ত্যাগ করে আমায় বিয়ে করতে রাজী হ'ল, তখন কি সত্যই আমায় ভালবেসেছিল না শুধু মোহের বশে? যদি ভালই বেসেছিলে তো এর মধ্যে সে ভালবাসা গেল কোথায়, বা কার দোষে? আমি তো জ্ঞানে কোন ত্রুটি করি নি বরং নিজে সব দোষ ঘাড়ে নিয়ে এমির সব অত্যাচার মুখবুজে সয়েছি। তবে কেন এমি সে প্রণয়-বন্ধন ছিড়ল, তার ব্যবহারে কেন মনে হয় যে সে সামাজিক বন্ধনটুকু কাটাতে পারলেই নিজ জাতীয় কাউকে বিয়ে করে সুখী হয়? আর আমি নিজেই বা কিসের জন্য সব ভুলে এতবড় অন্যায় করলাম—সে কি ভালবাসার জন্য নয়, শুধু মোহে? আমিও তো স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে অগ্নি সাক্ষী করে যা'কে বিয়ে করেছিলাম তাকে ভুলে আত্মীয়-স্বজনের সকল বন্ধন ছিড়ে এই পাপ করেছি—সবই কি মোহের বশে? তখন আমি বন্ধুহীন ছিলুম সত্য, প্রণয়-তৃষায় আমার প্রাণ আকুল ছিল বটে, ছোট মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছিল বলে আমার মেজাজ বিগড়ে গেছল সত্য কিন্তু আমি তো প্রণয়ের অন্বেষণে এমিকে পেয়েছি। তবে কি সবই আমার ভ্রম হয়েছে।'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেবব্রতের শরীর অসুস্থ বোধ হইতে লাগিল, বাহিরের শীতল বাতাসের জন্য সে ব্যাকুল হইল। খোকা তখন বেশ সুস্থভাবে ঘুমাইতেছে। দেবব্রত বেয়ারাকে সেই খানে বসিতে বলিয়া নিজে যেমন অবস্থায় ছিল বাহির হইয়া পড়িল। সে আনমনে চণ্ডালগিরি আরোহণ করিতে লাগিল, কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে কিছুই তাহার জ্ঞান নাই। কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি, খুব জোরে বাতাস বহিতেছে, তাহারই মধ্যে অনাবৃত মস্তক দেবব্রত চলিল, বাহিরেও অন্ধকারও ঝড়, তাহার মনেও বিষাদের অন্ধকার, সন্দেহের ঝঞ্ঝা।

কিছুদূর আসিয়া রাস্তা দুইদিকে গিয়াছে, দেবব্রত কিছু না ভাবিয়া তন্মধ্যে দুর্গম পথটী ধরিল। কিছুদূর গিয়া দূর হইতে গানের আওয়াজ পাইল, সে সুর তো ইংরাজী বা পাহাড়ী গানের নহে। সেই মোহিনী সুর যেন দেবব্রতের প্রাণে আশার সঞ্চার করিল, যে দিক্ হইতে স্বরতরঙ্গ ভাসিয়া আসিতেছে সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া সে ছুটিয়া চলিল। ক্রমে সে এমন স্থানে আসিল যে আর উঠিবার পথ নাই—ওদিকে গভীর বনপথ অবতরণ করিয়াছে। সেইখানে দাঁড়াইয়া দেবব্রত তন্ময় চিত্তে গান শুনিতে লাগিল।

কাছে মাত্র দুই তিন খানা বাটী, কোথাও কেহ জাগিয়া আছে বলিয়া মনে হয় না, তবে কে এই গান করিতেছে, কে তাহার সম্মুখে এই আশার আলোক ধরিয়াছে? অল্প পরে সে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর মস্ত বাগানের ভিতর ঢুকিল, যদি সেই গায়িকার সন্ধান পায় এই আশায়। সে যে পরের বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছে, কেহ যে তাহাকে অপমান করিতে পারে তখন সে খেয়াল তাহার ছিল না। ক্রমে সে এক উন্মুক্ত বাতায়নের নিম্নে উপনীত হইল, সেখানে গায়িকার সেই সুললিত কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

এদিকে গায়িকা নিজ মনে গানের পর গান গায়িতেছে, তাহার কণ্ঠস্বর চারিদিকে মধু বর্ষণ করিতেছে। গানগুলি

বাংলা বলিয়া দেবব্রতের প্রাণকে অধিকতর স্পর্শ করিয়া বিভোর করিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে দেবব্রত জানিল যে কে গাইতেছে ও গান থামিতেই সে বেশ উচ্চস্বরে বলিল "গাও] আরও গাও, প্রীতি, থেম না।"

গায়িকা চমকিয়া উঠিল, তাহার প্রাণের ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল। এ কি, কে ডাকিল? এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া, না এ সত্য? কেন এত রাত্রে দেবব্রত আসিল, তবে কি ছেলেটার কিছু হইয়াছে। সে সত্বর মুক্ত বাতায়নের কাছে গেল, বাহিরে দেবব্রতকে ওরূপ অবস্থায় দেখিয়া প্রীতি অধিকতর শঙ্কিত হইল। আবার আর এক দুশ্চিন্তা তাহার মনে আসিল, দেবব্রত কি মনঃকষ্টে সুরাপান আরম্ভ করিয়াছে? প্রীতি ত্বরিত পদে নামিয়া গেল, দরজা খুলিয়া সোজা দেবব্রতের কাছে উপনীত হইল। প্রীতি দেখিল দেবব্রতের চোক উদ্ভ্রান্ত, মুখ বিষাদ-মাখা, প্রীতি ভাবিল যে তাহার ছেলের কোন অমঙ্গল হইয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "খোকা ভাল আছে তো?"

দেবব্রত শুধু বলিল, "হুঁ", তারপর অনিমেষ নয়নে শুধু প্রীতির মুখপানে চাহিয়া রহিল।

প্রীতি সাগ্রহ-ভরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি এই ঠাণ্ডায় টুপী-কোট না নিয়ে এমন করে বেরিয়েছেন কেন? অসুখ করবে যে। এত রাত্রে এত দূরে একা এলেনই বা কেন?"

উত্তরে দেবব্রত বলিল,—মনের মধ্যে যে আগুন জলছে তাই একটু ঠাণ্ডা করবার আশায়। ছেলেটা একটু ঘুমিয়েছে দেখে বেরিয়ে পড়লাম। এতদূর আসব ভাবি নি, কেমন করে এতদূরে এসে পড়েছি তা' জানি না। কোন পথ দিয়ে কেমন করে কে আমায় টেনে এনেছে তাও বলতে পারি না, বোধ হয় কোন অজানা শক্তি প্রাণের টানে আমাকে এনে ফেলেছে। মানুষ যখন একটা বড় জিনিসের জন্য সত্যই ব্যাকুল হয়, তখন হয় তো প্রাণটা পথ দেখিয়ে তাকে সেই-খানে নিয়ে যায়। তুমি যে এখানে থাক তা তো আমি জানতাম না। আমি তো সবে আজ সকালে এখানে এসেছি আর আজই তোমার দেখা পেলাম। এ নিয়তির খেলা।"

"আপনি কতক্ষণ এসেছেন?"

"আধ ঘণ্টার উপর।"

"যদি এসেছেন তো বাড়ীর ভেতর খবর না দিয়ে এখানে শীতে দাড়িয়ে রইলেন কেন?"

"তোমাদের বাড়ী আমি কোন মুখ নিয়ে ঢুকব, যদি আমার ভাগ্যে এমন দিন আবার কখনও আসে যেদিন আমি তোমাকে নিতে আসবার অধিকার পাব, সেইদিন তোমাদের বাড়ী ঢুকব।"

প্রীতি সে কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, "শীতে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাল করেন নি।"

"কি আর হ'বে? আমার মরা-বাঁচা সবই সমান এবং আমি এখন মরলে সকলের পক্ষেই মঙ্গল হ'বে। আমি জীবনটা এমনই বিশ্রী করে ফেলেছি যে আমার আর বাঁচা উচিত নয়। কেবল ছেলেটার জন্য ভাবনা হয়, আমি ছাড়া তো তাকে দেখবার কেউ নেই।"

"কি সব পাগলের মত বকছেন?"

"তুমি জান না প্রীতি যে আমি কি জীবন্ত নরক ভোগ করছি; অবশ্য এ জ্বালা ভোগ আমার করবারই কথা। তবে এটা ঠিক যে আমি মরলে এমির আনন্দ হ'বে, সে তো এ বাঁধন ছিঁড়তে পারলে বাঁচে। আর তুমি—তুমি আমার মৃত্যু না চাইলেও শান্তি পাবে। আমারই জন্য তো তোমার ও নির্ম্মলের জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে। আমি বেঁচে আছি বলে তোমার বোধ হয় নির্ম্মলকে বিয়ে করতে দ্বিধা বোধ হচ্ছে। নির্ম্মল যে তোমাকে খুব ভালবাসে তা আমি লক্ষ্ণৌ থেকেই জানি। সে খুব ভাল ছেলে, সব রকমেই তোমার উপযুক্ত—তার সুখী হওয়া দরকার। আমি এখন তোমাকে যতই ভালবাসি না কেন, আর তোমাকে পাবার যোগ্য নহি। তুমি রাণী, তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিনিস পাওয়া উচিত ছিল, আমার মত লোকে তোমাকে পেতে আশা করতে পারে না। আর একজনের ব্যবহার করা দ্রব্য তোমাকে কি বলে অর্পণ করব, তুমিই বা তা নেবে কেন? তুমি নির্ম্মলকে ভালবাসবে, তাই তো ন্যায্য।"

"আপনার আজ কি হয়েছে? কেন এত বিচলিত হ'য়েছেন?"

"আজ চার বৎসর অনেক সহেছি, আর পারছি না।

এতদিন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলাম, আর তো নীরবে থাকতে পারছি না। প্রীতি আজ যখন এমন করে তোমাকে পেয়েছি, আমার জীবনের ইতিহাস তোমাকে শুনতে হ'বে। আমি আমার ভুলের জন্য কত কষ্ট পেয়েছি জেনেও তোমার কতকটা তুষ্টি হ'তে পারে।"

সেইখানেই দেবব্রত আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল, প্রীতি নীরবে সকলই শুনিল। অবশেষে দেবব্রত বলিল, "প্রীতি, তুমি আমাকে বারণ করেছিলে এমিকে আমাদের বিয়ের কথা বলতে, পাছে তার সুখ নষ্ট হয়। এতদিন তোমার কথা শুনেছি এবং প্রাণপণ চেষ্টা করেছি যাতে সে সুখী হয় কিন্তু আজ আমাকে অনুমতি দাও আমি তাকে সব বলি। আর এ জীবনের অভিনয় আমার সহ্য হচ্ছে না, আমার প্রাণে অন্ততঃ একটু শান্তি পাই। আর পৃথিবীর সকলে জানুক যে আমি কিরূপ নরাধম। এইজন্যেই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছিলাম। প্রীতি, আমি তো এমির প্রতি কোন অন্যায় করি নি, যত অন্যায় তোমারই ওপর করেছি। তোমার কাছেও আমার ক্ষমা নেই, ভগবানের কাছে তো নেইই। তবু আমি তোমায় একটা অনুরোধ করব, আমার অপরাধ নিও না।"

"আপনি যাতে শান্তি পাবেন তাই করুন, আর আপনি কি চান বলুন, আমার ক্ষমতায় যতটুকু আছে আমি করব।"

"প্রীতি, বেশী কিছু চাইবার অধিকার আমি চাই না—আমি চাই শুধু তোমার হাত দু'খানি একবার ছুঁতে।"

প্রীতি দুটী হাত তখনই বাড়াইয়া দিল। দেবব্রত তাহার হাত দুইটী একবার নিজের হাতের মধ্যে রাখিল। তাহার পর প্রীতির ডান হাতখানি লইয়া নিজের মুখে বুলাইয়া, তাহাতে চুম্বন করিল। সব শেষে হাতে করিয়া প্রীতির মুখটী তুলিয়া ধরিয়া সতৃষ্ণ নয়নে সেই মুখের পানে চাহিয়া রহিল, যেন সেই মুখটী চিরদিনের জন্য হৃদয়-পটে অঙ্কিত করিয়া লইল। কিছু পরে হঠাৎ প্রীতিকে ছাড়িয়া, "আমাকে বড় শান্তি দিলে, আমি চল্লুম" বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

প্রীতি বিমোহিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—যখন তাহার জ্ঞান হইল যে দেবব্রত সত্যই চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহার প্রথম আকাঙ্ক্ষা হইল ছুটিয়া গিয়া দেবব্রতকে ফিরাইয়া আনিতে, নিজে সকল দুঃখ, মান-অপমান ভুলিয়া তাহাকে বলিতে, "ওগো, আমি তোমারই, তোমাকেই ভালবাসি, তোমার সুখের জন্য আমি সব করব। তোমার দুঃখ আমাকে বড় কষ্ট দিতেছে।" কিন্তু ততক্ষণে দেবব্রত বহুদূর চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ফিরান অসম্ভব। কিছুক্ষণ একাকী দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রীতি নিজগৃহে গেল কিন্তু সে রাত্রিতে তাহার ঘুম হইল না। তাহার ভয় হইতে লাগিল পাছে দেবব্রত ক্ষোভে নিজের কিছু অনিষ্ট করে।

এতদিন প্রীতি তাহার মাকে বলে নাই যে তাহার দেবব্রতের সহিত দেখা বা কথা হইয়াছে কিন্তু আজ সে তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া তাঁহার সুপরামর্শ লইবার জন্য ব্যস্ত হইল। এমন কি সেই সন্ধ্যায় যখন সে রক্তমাখা ভিজা কাপড়ে আসিয়াছিল তাহার মাকে শুধু বলিয়াছিল, "একটা ছেলে পড়ে গেছল, তাকে কোলে নিয়ে এই অবস্থা হ'য়েছে।" তাহার মা যখন জিজ্ঞাসা করেন যে, সে কাহার ছেলে ও কাহার কাছে তাহাকে দিয়া আসিয়াছে, তাহার উত্তরে প্রীতি বলিয়াছিল, "এক মেমের ছেলে, তারই বাপ-মার কাছে দিয়ে এসেছি।"

পরদিন ভোরে উঠিয়াই প্রীতি তাহার মাতার ঘরে গেল। তিনি তখনও ঘুমাইতেছিলেন। প্রীতি আস্তে আস্তে তাঁহার লেপের ভিতর ঢুকিয়া তাঁর ঘুম ভাঙ্গাইল। তিনি প্রীতির গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কি অসুখ হ'য়েছে মা? এত ভোরে উঠে এসেছিস্ যে, এখনও ভাল করে ফর্সা হয় নি?"

"মনটা বড় খারাপ হ'য়েছে মা, সেজন্য সারারাত ঘুমোতে পারি নি। কাল যে ঘটনা ঘটেছে তা'তে আমায় অত্যন্ত বিচলিত করেছে। মা, ভগবানের কি অভিপ্রায় বুঝতে পারি না। কাল যে ছেলেটাকে তিনি আমার পায়ের কাছে ফেলে দিয়েছেন সেটী কার ছেলে কাল তোমাকে বলি নি। সে তাঁরই ছেলে।"

সুরবালা চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই চিনলি কি করে?"

"ছেলেটাকে দেখেই আমি চিনেছিলাম, একেবারে তাঁর প্রতিমূর্ত্তি। তারপর তিনি নিজেই এসে পড়লেন।"

"তোর সঙ্গে তো সেই দু'চারদিনের পরিচয়, সেও তো বহুদিন হ'য়ে গেল। তুই তাকেই বা চিন্‌লি কেমন করে?"

"মা, তুমি কষ্ট পাবে বলে আমি একটা কথা তোমার কাছে লুকিয়েছিলম। মাসী ও আমার শাশুড়ী ভিন্ন কেউ জানে না।" তাহার পর প্রীতি সেই লক্ষ্ণৌএ প্রথমে সাক্ষাৎ থেকে আগের দিন রাত্রের সকল কথাই বলিল। শেষ বলিল, "কাল রাত্রে যে রকম তাঁর অবস্থা দেখেছি, মা, আমার বড় ভয় হ'য়েছে। আশা করি ভালয় ভালয় বাড়ী গেছেন।"

প্রীতি এতক্ষণ মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কথা কহিতেছিল, সুরবালা তাহার মুখটী তুলিয়া ধরিয়া কি যেন দেখিতে লাগিলেন। প্রীতির চোখে যে ভালবাসা ফুটিয়াছিল তাহা দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন।

সুরবালা মধুরকণ্ঠে বলিলেন, "প্রীতি, তুমি তাকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে কি? তোমাকে যে এত কষ্ট দিয়েছে তাকে ভুল্‌তে পার্‌বে কি?"

"সে কি এতই শক্ত কথা মা? মানুষে যদি একবার একটা ভুল করেই ফেলে, তারপর যদি সত্যই অনুতপ্ত হয়, তাঁকে কি ক্ষমা করা উচিত নয়?"

"কি কর্‌বে কিছু কি ঠিক করেছ?"

"ঠিক আমরা কি কর্‌তে পারি বল, ঠিক কর্‌বার তো কিছু উপায় নেই। যে যা'র কর্ম্মফল ভোগ করবে তো।"

"তুই মা কি করেছিলি যে তোকে তার সঙ্গে এত ভুগতে হ'বে? প্রীতি, এতদিন তুমি তো আমাদের কিছুই কর্‌তে দাও নি, এখন আমরা যা' হোক একটা ব্যবস্থা করবার উপায় দেখি। এইবার হয় তো মেম টাকা পেলে আনন্দের সহিত ফিরে যাবে, তা' হলে আর কোনও ভাবনা বা গোল থাক্‌বে না।"

"কেন ব্যস্ত হচ্ছ মা, দেখাই যাক্ না শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়। আমরা কেন কিছু করি, তিনি তো এখনও কিছু বলেন নি।"

"আমি যে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই রে, যদি হঠাৎ মরে যাই তোকে কার কাছে রেখে যাব, মা? কাকাবাবুও তো বুড়ো হ'য়েছেন, শরীরও ভেঙেছে, তিনিই বা ক'দিন বাঁচবেন?"

"কেন মা ভাবছ? তোমার তো খুবই কম বয়স আমরা দুজনে এখনও অনেকদিন একসঙ্গে থাক্‌ব। আর তা ছাড়া দাদা তো আছে, সে তো আমার গায়ে আঁচ লাগতে দেবে না।"

"সে তো আমি জানি মা, তার হাতে তোকে যদি দিয়ে যেতে পার্‌তুম তা' হ'লে তো সুখেই মর্‌তুম। সে যে হ'বার নয়, সমাজ যে তা' হ'তে দেবে না, কত কুৎসিত কথা তুল্‌বে। এ স্বর্গীয় সম্পর্ক অনেকেই বুঝবে না। লোকেরই বা দোষ কি? স্ত্রী পুরুষে যে বন্ধুত্ব চলে না। কাজেই যার সঙ্গে ধর্ম্মতঃ তোমার এ জীবন বাঁধা তারই হাতে দিয়ে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হই; যদিও সে তোমাকে পাবার মোটেই উপযুক্ত নয়। তার ওপর আমার রাগ কখনও যাবে কি না জানি না। আমার মেয়েকে সে যে অনর্থক কষ্ট দিয়েছে, তার শাস্তি হ'বে না তো হ'বে কার? যদি পারতুম আমি এ সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলে দিতুম।"

"মা, তুমি ও-কথা বলো না, ভগবান যে বাঁধন দিয়েছেন মানুষের কি তা' ছিঁড়ে দেওয়া উচিত? যা'ক্ আর এ সব কথায় কাজ নেই, তোমাকে সব কথা বলে যেন আমার প্রাণটা হাল্‌কা হ'ল। তোমার কাছে কিছু লুকোতে বড় কষ্ট হয়।"

"তুই তবু তো আমার কাছে সব কথা খুলে বলিস নি, এখনও তোর নিজের কি ইচ্ছা তা' তো বললি না। আমিও এতদিন যে কেমন করে এত অন্ধ হ'য়েছিলাম জানি না। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে তুই তাকে ভালবাস্‌তে পার্‌বি। আজ তোর চোখের চাহনিতে তোর অন্তরের কথা আমি জান্‌তে পেরেছি। আজ বুঝেছি যে সে নিতে এলেই তুই তার সব দোষ ভুলে তার কাছে যাবি।"

"আর একজনের সুখনষ্ট করে আমি কখনই যাব না, এটা জেন মা। তিনি তো অনেক দিনই আমাকে ডাক্‌ছেন কিন্তু তা হ'বে না।" এই বলিয়া প্রীতি তাহার মাতার শয্যাত্যাগ করিল ও চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সুরবালা বলিলেন, "একটা লোক পাঠিয়ে খবর নাও সব কেমন আছে।"

ক্রমশঃ

বাংলা ছন্দে ধ্বনিতরঙ্গ

বাংলা ছন্দের মূল প্রবাহ হচ্ছে তিনটী—অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। তার মধ্যে অক্ষরবৃত্ত অনেকটা আড়ষ্ট —এর গতি স্বচ্ছন্দ নয়। এ ছন্দকে কেটে ছেটে বইয়ের রূপ অনেকটা পরিবর্ত্তন করা যায়, কিন্তু এর ভিতরের গঠনে বিশেষ বৈচিত্র্য সাধন করা যায় না।

কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে সংযোগ-বিয়োগে বাহ্য আকৃতি পরিবর্ত্তনীয় হইলেও অন্তরপ্রকৃতিতে অনেক বৈচিত্র্য ঘটান অসম্ভব নয়।

দিগক্ষর, পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী সকলেরই মূল ধ্বনিটা এক, বৈচিত্র্যহীন। বাংলা ছন্দের এই মৌলিক ত্রুটির অবসান ঘটাবার অভিপ্রায়েই প্রায় দু'শো বছর যাবৎ বাংলায় সংস্কৃত ধ্বনিতরঙ্গ (রিথম্) প্রবর্ত্তনের অবিরাম চেষ্টা চলে আসছে। পরম ছন্দবিৎ ভারতচন্দ্রই এ প্রচেষ্টায় প্রথম প্রবর্ত্তক।

বাংলার সংস্কৃত ছন্দ অর্থাৎ ধ্বনিতরঙ্গ-প্রবর্ত্তনের ইতিহাস খুবই বিস্ময়কর। যা হউক, যে সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রবর্ত্তন করলেন সে সময় থেকেই বাংলা ছন্দের ধ্বনি তরঙ্গ ('রিথম্') উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ইহার উৎপাদনের অনেক চেষ্টা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙালী কবিরা শত শত বৎসর চেষ্টা করেও যা ক'রতে পারেন নি, রবীন্দ্রনাথ অনায়াসেই তা' পারলেন। রবীন্দ্রনাথই বাংলার একমাত্র ছন্দস্রষ্টা ঋষি।

রবীন্দ্রনাথের পন্থা অনুসরণ করেই সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দ জিজ্ঞাসার পথে আরও কতকটা অগ্রসর হ'য়েছেন। তিনিই অতি সূক্ষ্মভাবে ধ্বনি-তত্ত্বের মূল কথাটা আবিষ্কার করেছেন, যার ফলে এখন বাংলার নব নব ও বিচিত্র উপায়ে স্বরতরঙ্গের সৃষ্টি করা সম্ভবপর হ'য়েছে। তবে তিনি রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত ছন্দতত্ত্বের উপর কারুকার্য্য করেছেন মাত্র।

বাংলায় দীর্ঘস্বর কার্য্যত না থাকলেও বাংলার সমস্ত মূল ধ্বনিগুলিকে ছন্দের তরফ থেকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) লঘুস্বর, এবং লঘুস্বরান্ত ব্যঞ্জন, যথা অ, আ ই, ঈ, ক, কা, কি, কী, ইত্যাদি। এগুলি সবই অযুগ্ম ব'লে, এদের অযুগ্ম স্বরও বলা যায়। (২) যুগ্মস্বর বা যুগ্মস্বরান্ত ব্যঞ্জন, অই্ (ঐ), অউ্ (ঔ), আই্, উই, খৈ, বৌ, ভাই, তুই, ঢেউ্ ইত্যাদি। যুগ্মস্বরগুলি সবই স্বরান্তিক। (৩) ব্যঞ্জনান্তিক যুগ্মধ্বনি, যথা—অন, ইন, অর্, উর্, উথ্, মন্, দিন্, ঘর্, দূর্, সুখ্ ইত্যাদি। প্রথম শ্রেণীর অযুগ্ম ধ্বনিগুলি লঘু অর্থাৎ একমাত্রিক, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর যুগ্মধ্বনিগুলি গুরু অতএব দ্বিমাত্রিক।

বাংলায় দীর্ঘস্বর না থাকলেও এই এক মাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক ধ্বনিগুলির পর্য্যায়বিন্যাসের দ্বারা বাংলা ভাষায় যে বহু রকমের স্বরতরঙ্গ উৎপন্ন করা সম্ভবপর তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাংলায় স্বরতরঙ্গ সৃষ্টির গোটাকয়েক

তিনটি উপায় আছে বলা যেতে পারে। প্রথম উপায় হ'চ্ছে প্রচলিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে স্বরের সংখ্যা যথাসম্ভব কমিয়ে দেওয়া; তাতেই নির্দ্দিষ্ট মাত্রা স্থির রাখার জন্যে যুগ্ম বা দ্বিমাত্রিক ধ্বনির প্রয়োগ বেশী হয়, ফলে ছন্দ তরঙ্গিত হ'য়ে ওঠে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(১) কলস-ঘায়ে উর্ম্মি টুটে
রশ্মি রাশি চূর্ণি উঠে,
শ্রান্ত বায়ু প্রান্ত নীর
চুম্বি যায় কভু।

রবীন্দ্রনাথ

এটা পঞ্চমাত্রিক ছন্দ। কিন্তু এর কোন পর্ব্বেই পাঁচটি স্বর নেই, চার কিম্বা তিন স্বরের সাহায্যেই পাঁচ মাত্রার পরিমাণ রক্ষা ক'রতে হ'য়েছে।

(২) এ নহে মুখর বন-মর্ম্মর গুঞ্জিত,
এযে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুম রঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে।

রবীন্দ্রনাথ

এটা ষাণ্মাত্রিক ছন্দ, অথচ কোন পর্ব্বেই ছ'টি লঘুমাত্রা নেই।

ছন্দতরঙ্গ উৎপাদনের দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে প্রচলিত স্বরবৃত্ত ছন্দে মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া। তাতেও যুগ্মধ্বনির সংখ্যা বেশী হয় এবং লাস্যলীলায় দুলতে সুরু করে। এখানে আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি।—

(৩) বেণুশাখার অন্তরালের অস্তপারের রবি
আঁকবে মেঘে মুছবে আবার শেষ বিদায়ের ছবি।
ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা স্বর গাথে।

রবীন্দ্রনাথ

এটা চতুঃস্বর ছন্দ। অথচ প্রতি পর্ব্বেই চারের বেশী মাত্রা আছে; কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ধ্বনিমাত্রার পর্য্যায় বিন্যাস ক'রতে হ'লে বাংলা ছন্দের অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা চাই।

বাংলা ছন্দের ধ্বনিতে উত্থান পতনের তরঙ্গলীলা নির্ভর করে প্রধানত তিনটি তত্ত্বের উপর—(১) বাংলা ছন্দপর্ব্বে দৈর্ঘ্য অর্থাৎ তার ধ্বনিসংখ্যা ও মাত্রাপরিমাণ; (২) বাংলা ছন্দের উচ্চারণ পদ্ধতি, ধ্বনির গতি-ক্রম ও বিরতি, ছন্দের ঝোঁক বা অ্যাক্সেন্ট এবং যতি; (৩) লঘু ও গুরুমাত্রিক ধ্বনির পর্য্যায়-সন্নিবেশ। এই তিনটি তত্ত্বের মধ্যে প্রথম দু'টি পরস্পরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ; প্রকৃতপক্ষে এরা দু'টি পৃথক তত্ত্ব নয়, একই তত্ত্বের দু'টি দিক মাত্র।

একেকটি ঝোঁকের দ্বারাই আমাদের উচ্চারণ পদ্ধতি অর্থাৎ উচ্চারিত ধ্বনির গতি ও বিরতি নিয়ন্ত্রিত হয়। গতির যেখানে আরম্ভ সেইখানেই পড়ে ঝোঁক, আর যেখানে সেই গতির অবসান ঘটে সেখানটাকেই বলে যতি। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

সখি প্র´তিদিন হায় | এ´সে ফিরে যায় | কে!
তারে আমার মাথার | এ´কটি কুসুম | দে´।
যদি শু´ধায় কে দিল | কোন ফুল-কান | নে´,
তোর শপথ, আমার | না´মটি বলিস্ | নে´।

রবীন্দ্রনাথ

ঝোঁক ও যতির মধ্যবর্ত্তী যে অংশ তাকেই বলছি ছন্দ-পর্ব্ব। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের প্রত্যেক পংক্তিতে তিনটি করে পর্ব্ব আছে, তাই এ ছন্দকে ব'লব ত্রিপর্ব্বিক। এ ছন্দের তত্ত্ব হচ্ছে ধ্বনিমাত্রার সাম্য। এখানে প্রতিপর্ব্বে ছ'টি ক'রে ধ্বনিমাত্রা আছে; তাই ছন্দকে ব'লব ষণ্মাত্রিক ছন্দ; এখানে প্রত্যেক পংক্তিতেই প্রথম পর্ব্বের পূর্ব্বে দু'টি ক'রে মাত্রা স্থাপিত হয়েছে। অতি মৃদুভাবে এদের উচ্চারণ করতে হয়। তাই এ দু'টি মাত্রা কোনো ঝোঁকের এলাকায় আসছেনা; তাই এ দুটি মাত্রাকে ব'লব অতি পর্ব্বিক মাত্রা। মাত্রা-বৃত্তের ন্যায় স্বরবৃত্ত ছন্দেও অতি-পর্ব্বিক শব্দ যোজনার ব্যবস্থা করা যায়। স্বরবৃত্ত ছন্দের অতি-পর্ব্বিক শব্দকে মাত্রা না ব'লে অতিপর্ব্বিক স্বর বলাই সঙ্গত; কেননা ওই ছন্দে স্বরসংখ্যাই রচনার ভিত্তি, ধ্বনিমাত্রা নয়। অতি-পর্ব্বিক মাত্রা কিংবা স্বর কোনো ছন্দেই দু'টির বেশি ব্যবহার না করাই রীতি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অতি-পর্ব্বিক শব্দ যোজনার ব্যবস্থা নেই। রবীন্দ্রনাথের

অতি-পর্ব্বিক মাত্রা ও স্বর ব্যবহারের প্রবর্ত্তন ক'রেছেন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

দূরে অশথ-তলায়
পুঁতির কণ্ঠিখানি গলায়
বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছো ?
সাম্‌নে আঙিনাতে
তোমার একতারাটী হাতে
তুমি সুর লাগিয়ে নাচো।

রবীন্দ্রনাথ

এটা স্বরবৃত্ত ছন্দ। এবার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অতি-পর্ব্বিক মাত্রার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

অত　চুপি চুপি কেন | কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর | মরণ !
অত　ধীরে এসে কেন | চেয়ে রও,
ওগো একি প্রণয়েরি | ধরণ ?

রবীন্দ্রনাথ

এটী ষণ্মাত্রিক অপূর্ণ দ্বিপর্ব্বিক ছন্দ।

ঝোঁক ও যতি স্থাপনের বৈচিত্র্য

আমরা দেখেছি পর্ব্বসংখ্যারে দ্বারা ছন্দের বাইরের আকৃতি মাত্র নিয়মিত হয় কিন্তু ছন্দের অন্তরের গঠন নির্ভর করে ওই পর্ব্বের নির্ম্মাণ-প্রণালীর উপর। পর্ব্বের নির্ম্মাণ প্রণালী আবার নির্ভর করে দুটী জিনিষের উপর। (১) ঝোঁক এবং যতি,—এই দু'জিনিষের দ্বারা প্রত্যেক পর্ব্বের অন্তর্গত ধ্বনির আয়তন নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি ঝোক ও যতি ঘন ঘন স্থাপিত হয় তবে পর্ব্বের আয়তন হ্রস্ব ও ধ্বনির গতি দ্রুত হয়; আর ঝোঁকও যতি যদি ঘন ঘন স্থাপিত না হয় তবে পর্ব্বের আয়তন দীর্ঘ এবং যতির গতি বিলম্বিত হয়। এই ঝোঁক ও যতি স্থাপনকেই অন্য কথায় তান বলা হয় এবং ধ্বনির গতিক্রমকেই লয় বলা হয় ঘন ঘন তালে লয় দ্রুত এবং বিরল তালে লয় বিলম্বিত হয়। (২) দ্বিতীয়ত' পর্ব্বের নির্ম্মাণ-প্রণালী ধ্বনিবিন্যাসের প্রকার ভেদের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি শুধু ধ্বনি বা স্বরের সংখ্যার উপর নির্ভর ক'রে ছন্দ রচিত হয় তবে সে ছন্দকে ব'লব স্বরবৃত্ত যদি শুধু ধ্বনির মাত্রাপরিমাণের উপর ছন্দকে দাঁড় করানো যায় তবে সে ছন্দ মাত্রাবৃত্ত। যদি একধারে ধ্বনিসংখ্যা ও ধ্বনিমাত্রা স্থির রাখা হয় তবে তার নাম দেওয়া যায় স্বরমাত্রিক ছন্দ। আর যদি বিশেষ উপায়ে স্বরসংখ্যা ও ধ্বনি-মাত্রার মিশ্রণ ক'রে তথাকথিত অক্ষর সংখ্যা ঠিক রেখে ছন্দ রচিত হয় তবে তাকে 'অক্ষর বৃত্ত' সংজ্ঞা দেওয়া যায়। এ স্থলে ঝোঁক ও যতি-স্থাপনের বৈচিত্র্যের দ্বারা ছন্দের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাই দেখাব।

অতি　চুপি চুপি কেন | কথা কও
অতি　ধীরে এসে কেন | চেয়ে রও

এখানে উভয় পংক্তিতেই দু'টি অতি-পর্ব্বিক মাত্রা আছে। ঝোঁক এবং যতির পরিবর্ত্তনের দ্বারা এ দুটি পংক্তিতে কত পরিবর্ত্তন আনা যায় এবার তাই দেখা যাক্।—

অত　চুঁপি চুপি কেন | কথা কও
এটা ষণ্মাত্রিক অপূর্ণ দ্বিপর্ব্বিক ছন্দ।

অত　চুঁপি চুপি | কেঁন কথা | কও

এবার তিনটি ঝোঁক ও তিনটি যতি; চার মাত্রার পরেই ধ্বনিগতির অবসান। এ ছন্দ আর ষণ্মাত্রিক রইল না। এটা হ'ল চতুর্মাত্রিক অপূর্ণ ত্রিপর্ব্বিক ছন্দ।

অঁত চুপি চুপি | কেঁন কথা কও

আবার ছন্দ বদলে গেল। এটা ষণ্মাত্রিক পূর্ণ দ্বিপর্ব্বিক ছন্দ।

ঐ আসে ঐ | অঁতি ভৈরব | হঁরষে

এ ছন্দ হবে ষন্মাত্রিক অপূর্ণ ত্রিপর্ব্বিক। কিন্তু যদি ঝোঁক ও যতি আরও ঘন ঘন স্থাপন করা যায়;—

ঐ আসে | ঐ অতি- | ভৈর্ব | হঁরষে

তবে ষণ্মাত্রিকের বদলে এ ছন্দ হ'ল চতুর্মাত্রিক অপূর্ণ চৌপর্ব্বিক। একটা পর্ব্বই বেড়ে গেছে এখানে।

ভুঁবন মিলায়ে | মোঁর অঞ্চল | খাঁনিতে,
বিশ্ব নীরব | মোর কণ্ঠের | বাণীতে,

রবীন্দ্রনাথ

একে ষণ্মাত্রিক অপূর্ণ ত্রিপর্ব্বিক ছন্দ ব'লব। কিন্তু একে চতুর্মাত্রিক ছন্দের ভঙ্গীতেও পড়া যায়। যথা—

ভুবন মি- | লায় মোর | অঞ্চল | খানিতে
বিশ্ব নী- | রব মোর | কণ্ঠের | বাণাতে।

অনেক সময় এককেটা সমগ্র কবিতাকেও দু'রকম ছন্দে পড়া যায়। রবীন্দ্রনাথের "নটরাজ" ও "মনের মানুষ" কবিতাটি এর একটি সুন্দর নিদর্শন। একটু নমুনা দেখাচ্ছি।—

আজ এক | হয়ে তারা
মোরে করে | মাতোয়ারা,
এক বীণা- | রূপ ধরি'
এক গানে | ফেলে ছায়া।

—রবীন্দ্রনাথ

এ ভঙ্গীতে পড়লে এ হ'ল চতুর্মাত্রিক ছন্দ; দ্বিপর্ব্বিক পূর্ণ চৌপদী। আবার এ-কে ষাণ্মাত্রিক ছন্দেও পড়া যায়।—

আজ এক হয়ে | তাঁ'রা
মোরে করে মাতো- | য়ারা,
এক বীণা-রূপ | ধরি'
এক গানে ফেলে | ছায়া।

যে ঝোঁক এবং যতির দ্বারাও ছন্দে এক প্রকার তরঙ্গের সৃষ্টি হয় সে তরঙ্গকে বলতে পারি "পর্ব্বিক তরঙ্গ", কারণ পর্ব্বটিকে আশ্রয় করেই এ তরঙ্গের উদ্ভব হয়। ঝোঁক ও যতি যত ঘন সন্নিবিষ্ট হবে ছন্দের পর্ব্ব-তরঙ্গও ততই লীলায়িত হ'য়ে উঠবে; আর ঝোঁক ও যতির সন্নিবেশ যত দূরবর্ত্তী হবে পর্ব্বতরঙ্গ ততই দীর্ঘায়ত ও তার লীলা মৃদুতর হবে।

দেখো নাকি, হায়, | বেলা চলে যায় |
সারা হ'য়ে এল | দিন।
বাজে পূরবীর | ছন্দে রবির |
শেষ রাগিণীর | বীণ।

রবীন্দ্রনাথ

এটা হ'ল ষণ্মাত্রিক পর্ব্বের ছন্দ অর্থাৎ সুদীর্ঘ ছ'মাত্রার পর একেবারে ক'রে ঝোঁক আসছে। এককেটা পর্ব্ব অত্যন্ত দীর্ঘ ব'লে তা'র তরঙ্গও খুব আয়ত। তাই তরঙ্গের লীলাও খুব মন্থর, এমন কি সতর্ক না থাকলে এর অস্তিত্বই ধরা পড়ে না। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটার সঙ্গে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির তুলনা ক'রলেই এ কথার তাৎপর্য্য বোঝা যাবে।—

পৌষ প্রখর | শীতে জর্জ্জর, | ঝিল্লি-মুখর | রাতি,
নিদ্রিত পুরী, | নির্জ্জন ঘর, | নির্ব্বাণ দীপ- | বাতি।

—রবীন্দ্রনাথ

চার, তিন এবং দুই স্বরে ও ছন্দের পর্ব্বগুলিও ছোট ব'লে স্বর বৃত্ত ছন্দের পর্ব্বতরঙ্গ খুব খরগতি। যথা—

(১) দুঃখ সহার | তপস্যাতেই | হোক্ বাঙালীর | জয়,
ভয়কে যারা | মানে তারাই | জাগিয়ে রাখে | ভয়।
মৃত্যুকে যে | এড়িয়ে চলে | মৃত্যু তারেই | টানে,
মৃত্যু যারা | বুক পেতে লয় | বাঁচতে তারাই | জানে!

রবীন্দ্রনাথ

এটা চতুঃস্বরপর্ব্বিক ছন্দ। এবার ত্রিস্বর পর্ব্বিকের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

(২) ও'র তরে | মন্থরে | নদ হেথা | চল্‌ছে,
জলপিপি | ওর মৃদু | বোল্ বুঝি | বোল্‌ছে।
দুই তীরে | গ্রামগুলি | ওর জয়ই | গাইছে,
গঞ্জে যে | নৌকো সে | ওর মুখই | চাইছে।

সত্যেন্দ্রনাথ

এখানে প্রতিপর্ব্বে তিনটী ক'রে স্বর। তাই এর পর্ব্বতরঙ্গ চতুস্বরের পর্ব্বতরঙ্গের চেয়ে বেশি লীলায়িত। দুই স্বরের পর্ব্বতরঙ্গ আরও বেগবান্। যথা—

(৩) চুপ্ চুপ্ | -ওই ডুব | দ্যায় পান্- | কৌটী,
দ্যায় ডুব | টুপ টুপ | ঘোমটার বউটী।
ঝক্‌ঝক্ | কল্‌সীর | বক্ বক্ | শোন গো,
ঘোমটায় | ফাঁক বয় | মন উন- | মন গো।

সত্যেন্দ্রনাথ

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পর্ব্বতরঙ্গ অত্যন্ত ঢিমে তেতালা গোছের প্রায় নেই বল্লেই হয়। বাস্তবিক-পক্ষে এ ছন্দ প্রায়ই যুগ্ম পর্ব্বের তালে চলে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

দে'বতার স্তবগীতে | দে'বেরে মানব করি' আনে,
তুলিব দেবতা করি' | মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।

রবীন্দ্রনাথ

এটা আট ও দশ অক্ষরের দ্বিপদী ছন্দ। এখানে এক ঝোঁকে আট ও দশ অক্ষরের একেকটা বড় বড় পদ অতিক্রম ক'রতে হয় ব'লে এ ছন্দের পর্ব্বিকতরঙ্গ এমন নিস্তেজ।

আমরা দেখ্‌লুম যে অক্ষরবৃত্তে পর্বতরঙ্গ প্রায় নেই; কিন্তু মত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তি ছন্দে পর্বতরঙ্গ আছে এবং তার বৈচিত্র্যও আছে। মাত্রাবৃত্তে পর্বতরঙ্গ হ'তে পারে তিন রকম—চতুর্মাত্রিক, পঞ্চমাত্রিক এবং ষণ্মাত্রিক। স্বরবৃত্তের পর্বতরঙ্গও তিন রকম—দ্বিস্বরপর্বিক, ত্রিস্বরপর্বিক ও চতুঃস্বরপর্বিক। কিন্তু এক বিষয়ে এই সব রকম তরঙ্গই সমধর্ম্মী; কারণ এই সব তরঙ্গেই উচ্চারণের ঝোঁকটা থাকে গোড়ার দকে। কথা বলার সময় আমরা যে ঝোঁক দেই সেটা অবশ্য অনিয়মিত অর্থাৎ ক'টা শব্দের পর আবার ঝোঁক হবে তার কিছু নিয়ম নেই; ভাব-প্রকাশের প্রয়োজন অনুসারেই ঘন বা বিরল ভাবে ঝোঁক পড়ে। কিন্তু আমাদের নিত্যকথিত বাংলার উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য ক'রলে দেখা যাবে যে সচরাচর দু'টি ঝোকের মধ্যে চার পাঁচটার বেশি স্বরধ্বনি অথবা ছ'-সাতটার বেশি ধ্বনিমাত্রা থাকে না। একটা দৃষ্টান্ত—

"কোঁলরিজ ব'লে গেচেন,—সমুদ্রে জ'ল সর্ব্বত্রই, কিন্তু ফোঁটা জল নেই যে পান করি সময়ের সমুদ্রে আছি, কিন্তু এ'ক মুহূর্ত্ত সময় নেই।

রবীন্দ্রনাথ

ঝোক যখন অর্থের বাহন হিসেবে অনিয়মিত ভাবে স্থাপিত হয় তখনই ভাষা হয় গদ্য, আর ঝোক যখন নিয়মিত ভাবে স্থাপিত হয় তখনই ভাষা পদ্য হয়ে ওঠে। ঝোককে নিয়মিত করার মানে হচ্ছে টিহ্ ঝোকের মধ্যবর্ত্তী ধ্বনিসংখ্যা বা মাত্রাপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া। ঝোক যদি চার স্বরের পর পর আসতে থাকে তবেই সে ছন্দ হয় চতুঃস্বরপর্বিক, আর যদি ছ'মাত্রার পর পর আসতে থাকে তবে সে ছন্দ হবে ষন্মাত্রিক। বেছে বেছে শব্দ প্রয়োগ ক'রে এ ভাবেই দিস্বর, ত্রিস্বর এবং চতুর্মাত্রিক ও পঞ্চমাত্রিক ছন্দ রচিত হ'য়ে থাকে।

বাংলায় কিন্তু কোনো শব্দেরই প্রকৃতিগত ঝোকপ্রবণতা নেই। সব শব্দই স্বভাবত সমান নিস্তরঙ্গ। বাংলায় যে ঝোকের কথা পূর্ব্বে বলেছি সে কোনো শব্দেরই প্রকৃতিগত নয়, সে ঝোক আমাদের উচ্চারণগত। ভাবপ্রকাশের সুবিধার জন্যই আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুসারে ঝোক দিয়ে কথা বলি; এক সময় সে কথার উপর ঝোঁক দিলুম আরেক সময় সে কথায় উপর ঝোঁক না-ও দিতে পারি।

বাংলায় উচ্চারণ-ঝোঁকের আর একটি বিশেষত্ব এই যে ওই ঝোক সর্ব্বদাই শব্দের আদিতে স্থাপিত হয়, কখনও অন্যত্র স্থাপিত হয় না। তার ফল এই হয়, যে বাংলা পদ্যে ওই ঝোকটাই একঘেয়ে হ'য়ে পড়ে; বাংলা গদ্যে কিন্তু ওই ঝোকের দ্বারা একঘেয়েমের সৃষ্টি হয় না; কারণ গদ্যে ঝোকের ব্যবধান্ নিয়মিত নয়; তা ছাড়া ওই ঝোক অর্থকেই অনুসরণ করে ব'লে এবং শ্রোতার নিকট অর্থই একমাত্র লক্ষ্য ব'লে অনেক সময় ওই ঝোকের অস্তিত্বই অনুভূত হয় না। বাংলায় কিন্তু চতুঃস্বরের ছন্দের প্রয়োগই সব চেয়ে বেশি; তবে খুব নিপুণ ভাবে শব্দ প্রয়োগ করে দ্বিস্বর ও ত্রিস্বরের ছন্দও বাংলায় বেশ রচনা করা যায় এবং তার ছন্দ-সৌন্দর্যাও কম হয় না।

বাংলায় পর্ব্ববিভাগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের উপরকার ঝোকও স'রে যায়; কারণ ওই ঝোক উচ্চারণের উপরই নির্ভর করে, শব্দের উপরে নয়। যথা—

এ'ত বলি | গৃ'হ কোণে
বসিলাম | দৃঢ় মনে
লেখকের | যোগাসনে
পাশে | ল'য়ে মসীপাত্র;

রবীন্দ্রনাথ

এটা হ'ল চার মাত্রার দ্বিপর্ব্বিক চৌপদী ছন্দ; প্রতি পদে দু'টি করে পর্ব্ব এবং প্রতিপর্ব্বের আদি স্বরের উপর ঝোক। পর্ব্ববিভাগের পরিবর্ত্তন ক'রে দেখি —

এ'ত বলি- | গৃহ কোঁণে
বসিলাম দৃঢ় মনে
লেখকের যোগা-সনে,
পাশে লয়ে মসী | পাত্র।

এটা ছ'মাত্রার ছন্দ ; প্রতি পদে একটি পূর্ণ পর্ব্ব (ছ'মাত্রা) এবং একটি অপূর্ণ পর্ব্ব (দু'মাত্রা) রয়েছে। কাজেই এটা হ'ল ছ'মাত্রার অপূর্ণ দ্বিপর্ব্বিক চৌপদী ছন্দ। যাহোক্, এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেক পদেই প্রথম পর্ব্বের আদি স্বরের ঝোকটি ঠিক থাকলেও দ্বিতীয় পর্ব্বের ঝোকগুলি দু'মাত্রা স'রে গেছে। আরেকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

যবে ফিরে আসে গোঠে | গাভীদল
সারা দিনমান মাঠে | ভ্রমিয়া

রবীন্দ্রনাথ

এটা ছ'মাত্রার অপূর্ণ দ্বিপর্ব্বিক ছন্দ। প্রত্যেক পংক্তির আগে দু'টি ক'রে অতি-পর্ব্বিক মাত্রা আছে। পর্ব্ব বিভাগ পরিবর্ত্তন করা যাক্।

যবে ফিরে আসে | গোঠে গাভীদল
সারা দিন মান | মাঠে ভ্রমিয়া—

এখানে অতি পর্ব্বিক মাত্রা দু'টিকেও পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পর্ব্ব বিভাগে যতই পরিবর্ত্তন করা যাক না কেন, বাংলা প্রতিপর্ব্বের আদিস্বরের উপর ঝোক থাকবেই।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

(বিচিত্র—পৌষ)

বনমালী-বন্দনা

(চন্দন-চর্চ্চিত-নীল কলেবর—সুর)

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

গোপিকা-রঞ্জন-লীলা-চিরন্তন মাধবী-মধুবন-মাঝে,
রঞ্জিত-পদযুগ-মুখরিত-মঞ্জীর মোহন বাঁশরী বাজে।
পুঞ্জ-পুঞ্জ অলি গুঞ্জন ঘনঘন নধর-অধর-মধু-ভোলা,
কোকিল কুহু-কুহু সঙ্গীত মুহু-মুহু যমুনা কলতানে দোলা।
ঢালে ব্রজাঙ্গনা প্রেম-পুষ্প-রস-যৌবন-বিকসিত-ডালি।
কৈশোর-নন্দিত-সুন্দর-রসময় জয় জয় জয় বনমালি॥

মুগ্ধ গোপাঙ্গনা মর্ম্মসমর্থন-বিগ্রহ রসঘনানন্দে,
গোকুল-পুলকিত-অন্তর-শতদল নন্দিত তব পদ-গন্ধে।
নন্দ-শ্রীনন্দন পূর্ণব্রহ্ম-ছবি গর্গ নেহারিল ধ্যানে,
ভারতঋষিকুল-আদিম-বন্দিত কৃষ্ণ-নারায়ণ-জ্ঞানে।
চিররস-রঙ্গিনী ব্রজপুর-সঙ্গিনী বনে বনে চিরচতুরালী
কৈশোর-নন্দিত-সুন্দর-রসময় জয় জয় জয় বনমালি॥

কালীয়-মর্দ্দন নটবর-কুঞ্জর তরুযমলার্জ্জুন ভঙ্গে,
[illegible] ব্রজপুর কংসবকাসুর সংহার যুগযুগ-রঙ্গে।
[illegible] বনভুজ-বন্ধন-মধু মধু মিলন-বিলাসী,
[illegible], দীন ভক্তজন রাতুল-পদ-অভিলাষী।
নিত্য পরিবৃতসহ ব্রজবালক নাচত ঘন করতালি।
কৈশোর-নন্দিত-সুন্দর-রসময় জয় জয় জয় বনমালি॥

কুঙ্কুম-রঞ্জিত ফাগ-বিমণ্ডিত উদ্দাম দোল-বিহারী
চাণুর-মুষ্টিক-নির্জ্জিত-দুর্জ্জয় গোকুল-কুল গিরিধারী।
ঝুলন-মহোৎসব-নন্দিত-মাধব মণ্ডিত বল্লবীবালা,
ভক্ত-হৃদয়-পুর-বেদন-বিচলিত লম্বিত নব ঘনমালা।
রাস-রঙ্গ-রস-পুলকিতা গোপিকা নিবেদিত অন্তর-ডালি।
কৈশোর-নন্দিত-সুন্দর-রসময় জয় জয় জয় বনমালি॥

ধার্ম্মিক-পালক দুষ্কৃত-নাশন, পাবন প্রেম-ধ্রুবতারা,
সত্ত্বরজস্তম নির্গুণ নির্ম্মল উদ্ধার সংসার-কারা।
হৃদয়-সরোবর-চিত্ত-কুঞ্জবন মোহিত বাঁশরী-গানে,
রঞ্জিত কর প্রভু জীবন শতদল রাতুল পদতল দানে।
রাখ মম মর্ম্মেরি অন্ধ-তমস্বিনী নিত্য কৃপালোকে জ্বালি,
কৈশোর-নন্দিত সুন্দর রসময় জয় জয় জয় বনমালি॥

শান্তিপুর-চিত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য

আট

ইতিপূর্ব্বে লংসাহেব শান্তিপুরবাসীর উৎকোচ-গ্রহণ-প্রিয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে মিশনারিগণ শান্তিপুরবাসীর 'সত্যগ্রহণে অধিক আগ্রহ' ও' নৈতিক অনুভূতি'র বিষয় লিখিয়াছেন—ইহাও বর্ত্তমান প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের 'সমাচার দর্পণে' বাদ-প্রতিবাদ রূপে যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। প্রথমে ২৩শে মার্চ্চ ও পরে ৬ই এপ্রিলের 'দর্পণে' শান্তিপুরনিবাসী ও নদীয়া জেলার অন্য ভূস্বামিগণ সরকারী কর্ম্মচারীর উৎকোচগ্রহণ, উকীল প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় প্রজার আনন্দ প্রভৃতি আইন-আদালত-সম্বন্ধীয় অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। তখন শান্তিপুর মহকুমার সদর ছিল। ২৭শে এপ্রিলের 'দর্পণে' কৃষ্ণনগরবাসীরা উত্তর দেন যে নাজীর কর্ত্তব্যপরায়ণ ও কর্ম্মক্ষম, ঘুষের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা, ইত্যাদি। তদুত্তরে ৮ই জুনের 'দর্পণে' শান্তিপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী অতিমান্য প্রায় ৩০ জন লোক (নাম সাক্ষর নাই) আদালতের নানারূপ গলদ দেখান, এবং কেবল শান্তিপুরে মুন্সিফের সুখ্যাতি করেন।

"শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

আপনকার দর্পণের দ্বারা এদেশের যে কি মঙ্গল হইতেছে তাহা পত্রে লেখা বাহুল্য সম্প্রতি আপনকার জানুয়ারি মাসের দর্পণে প্রকাশ করেন যে শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এই ইশতেহার দিয়াছেন যে ১৮৩১ সালের পঞ্চম আইনে ও দ্বিতীয় আইনে প্রজালোকের কি উপকার ও অনুপকার তাহা হজুরে জানাও অতএব তাহার জওয়াব আমরা নীচে লিখিতেছি আপনকার দর্পণে স্থান প্রকাশ করিলে অবশ্যই তাহার বিবেচনা হইতে পারিবেক।

১ দফা। ৫ আইনের দ্বারা বাঙ্গালিদিগের অধিক ভার দিয়াছেন তাহাতে দেশের কি পর্য্যন্ত মঙ্গল হইয়াছে তাহা কি জানাইব কিন্তু অপাত্রে সেই সকল কর্ম্ম অর্পণ হইবাতে আমরা বড় দুঃখ পাইতেছি যদি এই সকল কর্ম্ম সদর দেওয়ানীর জজসাহেবো কিম্বা কৌন্সেলে ইম্‌তিহাস (১) লইয়া যোগ্য অযোগ্য বিবেচনা করিয়া লোক মোকরব (২) করেন তবেই সর্ব্বসাধারণ লোকের মঙ্গল হইতে পারে নতুবা জিলার হাকিমেরা আপন অনুগত মোকরব করিয়া প্রজালোককে বড় জ্বালাতন করিতেছেন।

২ দফা। যদি মুনসিফের উপরে লাখেরাজের মোকদ্দমা করিবার ভার হইত তবে সর্ব্বার্থে মঙ্গল হইত কারণ এক ব্যক্তি যথার্থ মালের বিষয় বাবুদী নালিশ করিলেক তাহাতে আসামী মিথ্যা করিয়া লাখেরাজ জওয়াব দিলে তাহার যে মাল কি লাখেরাজ তাহার কিছুমাত্র তদারকের ভার মুনসিফের প্রতি নাই যদি ইহার কিছু বিবেচনা শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণর সাহেব করেন তবে আমরা সর্ব্বদাই তাঁহার মঙ্গল ৺নিকট প্রার্থনীয় কালযাপন করি।

৩ দফা। মুনসিফের করা ডিক্রী এক বৎসরের অধিকে জারী হইবেক না পুনরায় রসুম দিয়া নালিশ করিতে হইবেক হজুরের (৩) ডিক্রী যখন ইচ্ছা জারী হইতে পারে এ বড় অন্যায় কারণ মুনসিফের নিকট যে নালিশ হয় তাহার দাবির কাগজের দাম ও ওকালতনামার খরচা প্রভৃতি কিছু কম নহে তবে যে এক বৎসরের অধিক হইলে পুনরায় নালিশ করিতে হয় ইহাতে প্রজালোক কেবল অনর্থক খরচার দায়ে মারা যায়।

৪ দফা। পূর্ব্বে আইন ছিল যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষয় বয়বলফায় (৪) রাখিত তাহার বয়বাত (৫) জারী করিয়া এক বৎসর মিয়াদে ইস্তাহার (৬) দিতেন ইহার মধ্যে টাকা না দিলে ফরিয়াদীকে বয়বাত প্রমাণ করিয়া সরাসরী হইতে মাল দখল দেওয়াইতেন এইক্ষণে তাহা রদ করিয়া এক বৎসর বাদে ফরিয়াদীকে চহরম কানুনে (৭)

---

(১) পরীক্ষা। (২) নিয়োগ। (৩) হজুরের। (৪) জজের। (৫) অর্থের অঙ্গীকার। (৬) নোটিশ। (৭) আইনে।

দাবি দিয়া নালিশ করিতে হুকুম দেন ফরিয়াদীকে টাকা দিয়া জিনিস খরিদ করিয়া পুনরায় কত খরচের দায়ে পড়ে যদি আপনার সেই বিষয় ভিন্ন বিষয় না থাকে এবং আসামীকে না পায় তবে ফরিয়াদীর খরচের টাকা পাওয়া কঠিন এতদ্বিষয়ে কিছু বিবেচনা শ্রীশ্রীযুত করিলে ভাল হয়।

৫ দফা। শ্রীল শ্রীযুত দএম (১) আইন করিয়া মফঃসলের আমলাদিগের ও দারোগাদিগের হাত হইতে খালাস করিয়াছেন কিন্তু হুজুরের (২) যে বড় বড় আমলারা যাহারদিগের নিকট আসামী ফরিয়াদী গেলেই ঘুসের চোকানের ছুরি গলায় দেন তাহারদিগের হাত ছাড়নের কিছু আইন করেন নাই শ্রীল শ্রীযুত জানেন যে ফৌজদারী বিষয়ে ॥৹ আট আনার কাগজে দরখাস্ত দিলেই কর্ম্ম নিকাশ হয় কিন্তু এমত কত আট আনা যে আমলারা লন তাহাতে প্রজা লোক কোন প্রকারে মোকদ্দমা করিতে পারে না তাহার বেওরা (৩) এই যদি কোন ব্যক্তি হকুম দেন তাহাতে লাটীর (৪) সাহেব এই আইন করিয়াছেন একশত টাকার জামিনী হকুম হইলে ১০ টাকা তাহার কমিস্তন ইহা না হইলে কয়েদ থাকিতে হয় দুর্ম্মতের (৫) ভয়ে দিতে হয় জিলার হাকিমের নিকট জানালে শুনেন না এবং ভয়েতে জানাইতেও পারে না আর মোক্তারনামা দাখিলের ও দরখাস্ত দাখিলের ও শহিদের (৬) জোবানবন্দী করণের সিরিশ্তাদার মহাশয়ের কীচ ২টাকা হিসাবে তিনি আইন করিয়াছেন মুহুরিরা ॥৹ আনা আইন করিয়াছেন কোন কাগজের নকল লইতে হইলে যত টাকার ইষ্টাম্প লাগিবেক তত টাকা মোহাফেজকে দিতে হয় ইহা ভিন্ন কোন মতে হয় না আমলারা এই প্রকার আইন করিয়াছেন তাহারদিগের আইনের জ্বালায় আমরা জ্বালাতন আছি তবে ১৮৩১ সালের দুই আইনে ইহার কি সুখ হইবেক এই কএক রকম ভিন্ন যে কত প্রকারে লন তাহা আমরা লিখিয়া পত্র বাড়ান যদি শ্রীশ্রীযুত আমলাদিগের চলন আইন রদ করিয়া কোন আইন সাদের (১) করেন তবে আমলাদিগের ধারালো খড়্গের ধার হইতে রক্ষা পাইয়া কোম্পানি বাহাদুরের মঙ্গল ৺নিকটে নিরুদ্বেগে চেষ্টা করি।

৬ দফা। দারোগাদিগের হাত হইতে যে প্রকারে ত্রাণ করিয়াছেন তাহাতে অনেক ভাল হইয়াছে কিন্তু তাহারদিগের তাবিয়ান (২) বরকন্দাজ ও হুজুরের (৩) চাপরাসী ও বরকন্দাজ ইহারদিগের সাবেক মতই দস্তুর আছে থানার উপর এক হুকুম আছে রাত্রি দশটার উপর কোন লোক বাহির হইতে পারে না ইহাতে সিন্ধ চুরী কিছু কম হয় নাই কিন্তু বরকন্দাজের ছয়ঘণ্টার (৪) পরেই ভদ্রলোককে পাকড়া করিয়া টাকা লন অধিক রাত্রিতে চোরের সহিত সাজস করিয়া পাকড়া করেন না দিবসে হাট বাজার লুটতরাজ করিয়া তোলা লন এবং কোন তদারক মফঃসলে হইলে যে পাড়ায় তদারক হইবেক তাহার চৌক্রোশী লোক ধরিয়া টাকা লন তাহারা ভয়ক্রমে নালিশ করিতে পারে না ইহার কিছুই বিহিত্ত বিবেচনা করেন নাই এবং হুজুরের চাপরাসীরা যদি নাজীর কোন আসামী জিম্মা করিয়া দেন তৎক্ষণাৎ তাহাকে তফাৎ লইয়া গিয়া তাহার কাপড় ঝাড়া দিয়া পয়সা টাকা যে কিছু থাকে তাহা লয় এবং ভাল কাপড় থকিলে তাহাও মারপীঠ করিয়া লয় যদি না দিতে চাহে তবে তাহাকে যথোচিত নিগ্রহ করে ইহাতে লোকের দিগের পক্ষে বড় মন্দ হইতেছে এই দশাতে কেহ কাহারও উপর মোকদ্দমা করণে অশক্ত। অতএব শ্রীশ্রীযুত এই সকল বিষয়ে কোন আইন সাদের করিয়া লোকেরদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন তবে সকলেই কিঞ্চিৎ সুখী হইতে পারে আমরা আমলাদিগের ঘুসের আইন জারীর বিষয় লিখিতেছি এ নদীয়া জিলার অন্য জিলার কি দস্তুর তাহা পশ্চাৎ লিখিব ইতি সন ১২৩৯ তারিখ ২ চৈত্র।

(সমাচার দর্পণ, ২৩।৩।১৮৩৩।)

শ্রী রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

" রামমোহন চট্টোপাধ্যায়

---

(১) দুই। (২) জজের। (৩) বিবরণ। (৪) নাজার। (৫) দুর্জ্জনের। (৬) সাক্ষীদের।

(১) স্থাপিত। (২) অধীনস্থ। (৩) জজের। (৪) রাত্রি ছয়টার

" সুধারাম স্যানাল

" ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

" রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

" খুদিরাম ভট্টাচার্য্য

" রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

" জগমোহন ভট্টাচার্য্য

" রামরতন সিংহ

" " " সরকার ওগয়রহ

(জিলা নদীয়ার শান্তিপুর গ্রামের বাসিন্দা)।" (১)

পূর্ব্বোক্ত ৬ই এপ্রিলের নিবেদনে নদীয়া জেলার রামপুর, উলা, কৃষ্ণনগর, অগ্রদ্বীপ ও রাণাঘাটনিবাসী ভূস্বামিগণের এবং শান্তিপুরের কতিপয় ভূস্বামীর নাম স্বাক্ষর ছিল, তন্মধ্যে দেখা যাইতেছে যে, কয়েকজন ২৩শে মার্চ্চের নিবেদনে নাম সহি করিয়াছিলেন।

আমরা অতি আহ্লাদপূর্ব্বক সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে আপনার ১৮৩৩ সালের ২০ (?) মার্চ্চের দর্পণে প্রকাশ করেন যে আদালত সম্পর্কীয় কর্ম্ম অনেক পরিবর্ত্তন হইবে তাহার মধ্যে যে উকীলী কর্ম্ম এককালে উঠিয়া যাইবে প্রকাশ করেন তাহা হইলে যে প্রজা লোকের কি সুখ হইবেক তাহা আপনি বিজ্ঞ সকলি জানেন আমরা কি লিখিব কিন্তু ঐ বিষয় যে শীঘ্র সফল হইবেক তাহাতে শ্রীল শ্রীযুত গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের নিকট আমারদিগের কিছু নিবেদন আছে তাহা দফাওয়ারি কিছু লিখিতেছি আপনার মঙ্গলদায়ক দর্পণে স্থান দিয়া শ্রীল শ্রীযুতকে গোচর করাইলে অবশ্যই শীঘ্র সফল হইবেক।

১ দফা। সকল জমীদারের এবং অনেক বর্দ্ধিষ্ণু লোকের প্রায় মোকররী মোক্তারকায় সর্ব্বত্রেই আছে কিন্তু এককেতা মুৎফরক্কা দরখাস্ত দিতে হইলেই উকীল ভিন্ন জজসাহেবেরা দরখাস্ত লন না অত্যল্প বিষয়ের দরখাস্ত দিতে হইলে ওকালতনামার কাগজ আট আনা লাগে এবং উকীল ছোট কর্ম্ম হইলে ফি দরখাস্ত কেতা ২ টাকা দস্তুরে লন ভারি কর্ম্ম হইলে তাহার ভারি টাকা লন কিন্তু মোক্তারকায় রাখিয়া না রাখার তুল্য হইতেছে এবং যখন মোক্তারনামা দেওয়া যায় তখন তাহাতে লিখিয়া দেই মোক্তারমজকুর আমায় তরফ যাহা করিবেন তাহা আমায় মঞ্জুর তবে যে মোক্তারকারের সওয়াল জওয়াব দেওয়ানী আদালতে শুনেন না ইহার কারণ কি কিন্তু ফৌজদারীতে মোক্তারের দ্বারা তজবীজ হইতেছে আমরা জানি যে আদালত সকলি এক তবে ফৌজদারী দেওয়ানী বিশেষ করা এ হাকিমের উচিত নহে যদি ভাবেন উকীলী কর্ম্মে অনেক লোক প্রতিপালন হইতেছে সে মিথ্যা কারণ সকল প্রজার নিকট লইয়া অত্যল্পকে প্রতিপালন করা অন্যায়।

২ দফা। আপনার দর্পণে লেখেন যে অনেক প্রধান ২ সাহেবেরা ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে আমরা কিছুমাত্র ভাবিত নহি কারণ যে শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড উইলিয়ম বেণ্টাঙ্ক তিনি দয়াময় এবং প্রজা প্রতিপালক প্রজারদিগের প্রতি তাঁহার যে দয়া তাহা লিখিতে আমরা অশক্ত তিনি কখন সাহেবেরদিগের অন্যায় প্রস্তাব শুনিবেন না আমারদিগের যে পরম সুখ তাঁহা হইতেই হইতেছে আরো হইবেক ইহার সন্দেহ নাই এই ক্ষণে উক্ত বিষয় শীঘ্র সফল করিয়া প্রজালোকের মঙ্গল করুন যে আমরা সর্ব্বদা তাঁহার মঙ্গল চাহিতেছি আরো ৮।নকট প্রার্থনা করি।

৩ দফা। উকীলী বিষয় বন্দ হইবেক তাহার সন্দেহ নাই কারণ যখন শ্রীশ্রীযুতের নিকট ইহা প্রস্তাব হইয়াছে আর ইহাতে রাইয়ত লোক নাহক টাকা দিতেছে ইহাতে কোম্পানি বাহাদুরের কিছুমাত্র লভ্য নাই এবং যাহার উকীল খরচ দিবার শক্তি নাই এবং আপনি হাজির থাকিলে তাঁহারদিগের পরিবার মারা পড়ে এজন্য তাহারদিগের হক বিষয় উকীলী খরচা অভাবে না হক হইতেছে আর উকীলের বিষয়ে ফি শত ৫টাকা আইন মোকরর আছে কিন্তু ১০ টাকার মোকদ্দমা হইলে আইনমতে আট আনা হয় কিন্তু কদাচ তাহা লন না সদরে ঐ আট আনা কিন্তু মফঃসলে ২ টাকা লইয়া পশ্চাৎ কবুল করেন যদি হাজার টাকার মোকদ্দমা হয় তাহাতে ৫০ টাকা পায় তথাচ কিন্তু অধিক লয় অতএব আইনানুসারে টাকা দিয়া আরো কিছু ২ ঘুস দিতে হয় অতএব শ্রীশ্রীযত ইহা শীঘ্র রদ করিয়া মোক্তারকারের দ্বারা মোকদ্দমা হইবার হুকুম দেন যে প্রজালোক সুখে কালযাপন করে।

(১) শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

৪ দফা। শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করি যে ডিক্রীজারির আসামীর মাল নীলামে যে মুনসিপ প্রভৃতি সরকারী চাকর হইয়া মাহিয়ানা ছাড়া টাকা প্রতি এক আনা দস্তরে রসুম পাইয়া থাকেন সে কেবল সকল প্রজাকে বধ করিয়া এক জন লোককে অধিক টাকা দেওয়া যদি ফরিয়াদীর দাবির টাকা সকল আদায় না হয় কিন্তু মুনসিফদিগের রসুমের টাকা অগ্রে কাটিয়া লন শ্রীশ্রীযুত বিবেচনা করুন যে মুনসিফেরা এই সকল নির্ব্বাহের জন্য কোম্পানি বাহাদুরের চাকর এবং মাহিয়ানা পান তবে যে আলাহিদা রসুম পান এ কেবল প্রজারদিগকে খায়াবি করা মাত্র নীলামের রসুম ছাড়া যদি কোনখানে কিছু তদারক করিতে যান তাহায় মেহনত আনা ও পালকী ভাড়া আলাহিদা লন যে দিবস তদারক করিতে কি নীলাম করিতে যান সে দিবস কি হজুরে মাহিয়ানা বাদ যায় তাহা নহে এবং দারোগারদিগের দ্বারা কোন বিষয় তদারক হয় তাহার অন্য খরচ লাগে না এবং দারোগারদিগের মাহিয়ানা অনেক কম মুনসিফদিগের মাহিয়ানা অধিক এ প্রকার মাহিয়ানা ভিন্ন টাকা পান অতএব আমরা ভরসা করি যে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর বাহাদুর এ সকল দুঃখের বিষয় জ্ঞাত হইলে ইহার বিবেচনা শীঘ্র করিবেন যে আমরা প্রজালোক নাহক খরচ হইতে ত্রাণ পাইয়া কোম্পানি বাহাদুরের মঙ্গল সর্ব্বদা শ্রীশ্রী৺নিকট নিয়ত প্রার্থনা করি।

৫ দফা। আমরা শুনিতেছি যে বর্দ্ধমানের শ্রীযুত ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব ফৌজদারী আমলাদিগের ঘুস লওয়ার বিষয়ে যে মনোযোগী হইয়াছেন এবং অনেক মামলা কয়েদ ও সসপেণ্ড করিয়াছেন বিশেষ নাজিরকে যে প্রকার শাসিত করিয়াছেন তাহাতে আমরা সর্ব্বদা শ্রীযুত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি কিন্তু আমারদিগের নদিয়া জেলার শ্রীযুত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমারদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যদি আপন আমলাদিগের শাসন করেন বিশেষ নাজির সাহেবের এবং তাঁহার তাবের চাপরাসীর দৌরাত্ম্য জন্য আমরা সর্ব্বদাই জ্বালাতন তাহাকে বিশেষরূপে শাসন করিলে আমরা সর্ব্বদা শ্রীযুত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মঙ্গল ৺নিকট প্রার্থনা করি আমরা শপথের ভয়েতে স্পষ্টরূপে তাঁহাকে জানাইতে পারি না যদি শ্রীযুত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এমন কোন হুকুম সাদের করেন যে আমলাদিগের যে জুলুম প্রজার উপর আছে তাহারা জ্ঞাত করে তাহারদিগের হলফ হইবে না।

৬ দফা। যদ্যপি রেসবৎ (১) বিষয়ে নানা আইন সাদের আছে তথাচ আসামী ফরিয়াদীর সর্ব্বদাই আমলাদিগের ঘুসের জ্বালায় জ্বালাতন তথাপি হাকিমের নিকট জানাইতে পারে না কারণ ভদ্রলোকসকল শপথের ভয়ে দরখাস্ত করিতে পারে না যদি কোন কেহ শপথ স্বীকার করিয়া শ্রীযুত ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকট দরখাস্ত করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহার জামিনী হুকুম দেন জামিনীর হুকুম দিলেই নাজিরের হাতে পড়িতে হয় ঘুসের দরখাস্ত করিয়া তখনি নাজির ও চাপরাসীর হাতে পড়িলে তাহারদিগের মতলব হাসিল করে এবং আর ২ আমলার ইসারাতে নাজির সাহেব ৫ টাকার বিষয়ে তাহার নিকট ১০ টাকা লন না দিলে জামিন মঞ্জুর করেন না এবং মোক্তারকার ভিন্ন অন্য মাতবর বাসিন্দা লোকেরে জামিন দিলে তাহা নাজির লন না যদি মোক্তারকারদিগের সহিত আলাপাদি না থাকে তবে সে ফরিয়াদীকে কয়েদ থাকিতে হয় এ বড় অবিবেচনা যে ঘুসের নালিশের জামিন তলব করেন যদি হাকিম ভাবেন নালিশ করিয়া ফরিয়াদী গরহাজির হইবেক এমত হয় না কারণ নিজের টাকা দিয়া নালিশ করিয়া কদাচ গরহাজির হয় না আর গরহাজির হইলেই বা হাকিমের কি ক্ষতি বরং ফরিয়াদী দরখাস্তকরণকালীন তাহার নিকট মোক্তারনাম লন তাহা না করিয়া জামিনী হুকুম হয় যদি জামিন দিতেও পারে তবে সাক্ষী প্রতি ২ টাকা দস্তরে ফীচ আমানত করিতে হুকুম হয় টাকা দাখিল হইলে সাইদ তলব হইবেক অতএব রেসবতের কারণ গরীব লোক শপথ করিয়া ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত করে পুনরায় তাহার উপর জামিনের ও সাইদের টাকার হুকুম হয় ইহাতেই সকল ক্ষান্ত আছে কিন্তু পূর্ব্বের হাকিমেরা রেসবতের বিষয় কিম্বা দারোগারদিগের দৌরাত্ম্যের বিষয় ও চুরির বিষয় এবং চোরা মাল খরিদের বিষয় এই কয়েক দফা মুৎফরক্কা দরখাস্ত পাইলেই তাহার ত তদারক ও তজবীজ করিতেন তাহাতে এই কএক বিষয় অনেক দমন থাকিত এক্ষণে মুৎফরক্কা দরখাস্ত পাইলে হুকুম দেন ফরিয়াদী হাজির

(১) ঘুষ।

হাজির হইয়া দরখাস্ত করিলে শোনাসেব হুকুম হইবে অতএব এক্ষণে কোন উপায় না দেখিয়া আমরা বিবেচনা করিলাম যে আপনার পরোপকারক দর্পণ দ্বারা সকল বিষয় শ্রীশ্রীযুতকে জ্ঞাত করিলে অবশ্যই আমরা এসকল দুঃখ হইতে ত্রাণ পাই।

৭ দফা। আপনার ৩০ মার্চ্চের দর্পণে প্রকাশ করেন যে রিফর্ম্মার সম্পাদক মহাশয়েরা বিবেচনা করিয়াছেন যে এই নূতন আইন জারী হওয়ার পর রেসবতের কোন উদাহরণ নিশ্চয় না পাওয়াতে রেসবতের লিপিসকল তাহারদিগের নিকট একেবারে অপ্রামাণিক হইয়াছে তাহাতে আমারদিগের কথিত এই যে নূতন আইন জারী হওয়ার পর ঘুস লওয়ার দস্তর অদ্যাপি উত্তমরূপে চলিতেছে কিছু মাত্র লাঘব হয় নাই বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু আমরা স্পষ্টরূপে লিখিতে পারি না তাহার এক কারণ শপথের ভয় দ্বিতীয় কারণ যদ্যপি ইহার বিবেচনা হাকিমেরা না করেন তবে আমরা সর্ব্বদাই ঐ সকল নির্দয় আমলাদিগের হাতে পড়িয়া মারা যাইব যদি শ্রীশ্রীযুত হুকুম দেন যে ঘুসের বিষয়ে শপথ করিতে হইবেক না এবং জামিন দেওনের জন্য তৎক্ষণাৎ আমলাদিগের হাতে পড়িতে হইবেক না তবে আমরা স্পষ্টরূপে সন তারিখ ও আসামী ফরিয়াদীর নাম ও যে মোকদ্দমা তাহা ও ঘুসের টাকার তাইন (১) লিখিয়া শ্রীশ্রীযুতক নিবেদন করিতে পারি কিন্তু এ বিষয়ে অধিক তদারক করিবার ফল কি যদি হাকিমেরা আমলাদিগের মাহিয়ানা কি এবং খরচ কত ইহার তদারক করিলেই ঘুস লওয়া না লওয়া বুঝিতে পারেন।

৮ দফা। যদ্যপি উকিলেরা তাবৎ কর্ম্মের মুলের ন্যায় বদ্ধ হইয়াছেন সে যথার্থ কিন্তু যাহারা ২ উকীল মোকরব করে তাঁহারা সকলেই অবিশ্বাসী এবং উকীলের বেতন বিষয়ে যে আইন আছে তাহাতে উকীলেরা খাতি জমায় যে আসামী ফরিয়াদীর পক্ষে ভাল হউক কিম্বা মন্দ হউক আমরা পুরাবেতন পাইব ইহাতে উকীলেরা উত্তম রূপে কর্ম্ম করেন না কিন্তু যদি আপন বিশ্বাসী আত্মীয় কোন ব্যক্তিকে আদালতের সওয়াল জওয়াব কারণ রাখা যায় তবে সে ব্যক্তি আপন বিষয়ের মত জ্ঞান করিয়া প্রাণপণে মোকদ্দমার তদবীর করে আর এক্ষণে উকীলের টাকা অগ্রে আমানত করিলে তবে ওকালত নামা দাখিল হয় কিন্তু উকীলেরা যদি টাকা না পাইয়া উকীলী কবুল করেন তথাপি হাকিমেরা টাকা আমানত না হইলে মঞ্জুর করেন না কিন্তু এ বড় অশ্চর্য্য যাহারা পাইবে তাহারা কবুল করিলেও হাকিম মঞ্জুর করেন না অতএব এ প্রকার নগদ টাকা না দিতে পারাতে অনেক মোকদ্দমা একতরফা হইতেছে ইহাতে হক নাহক হইতেছে অতএব ইহার কোন সুনিয়ম হইলে প্রজাদিগের পক্ষে ভাল হয়।

৯ দফা। আমরা নিতান্ত প্রার্থনা করি ইণ্ডিয়া গেজেট সম্পাদক মহাশয়েরা আপন ২ পরোপকারী পত্রের পার্শ্বে উপরের লিখিত আমারদিগের দুঃখের বিষয় সকল স্থান দিয়া শ্রীশ্রীযত দয়াময় গবর্ণর বাহাদুরের কর্ণগোচর করিয়া আমারদিগের দুঃখ মোচন করেন।

১০ দফা। উপরের লিখিত বিষয় সকলে যাহারা ঐ ২ কর্ম্মে মোকরব আছেন তাঁহারাই প্রতিবাদী নতুবা আর ২ সকলেরি প্রার্থনা উক্ত বিষয়সকল শ্রীশ্রীযুত শীঘ্র সফল করেন পত্র বাহুল্য হইল একারণ অল্প লোকের স্বাক্ষরে হইল অধিক লোকের স্বাক্ষর প্রয়োজন হয় পশ্চাৎ ব্যক্ত হইলে লেখা যাইবেক নিবেদন ইতি সন ১২৩৯ সাল তারিখ ২০ চৈত্র ১৮৩৩ সাল ১ এপ্রিল।

শান্তিপুর নিবাসী—

শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীজগমোহন ভট্টাচার্য্য
" মহেশচন্দ্র রায়	" ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	" কৃষ্ণপ্রসাদ গোস্বামী
" তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়	" রাধানাথ
" কৃষ্ণকুমার "	" রামমোহন চট্টোপাধ্যায়
" রামরতন সিংহ	
" " সরকার	ইত্যাদি।" (১)

উপর্য্যুক্ত ৮ই জুনের 'দর্পণে' লিখিত বিষয়ের সারমর্ম্ম বাহুল্যভয়ে এখানে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। ইহাতে প্রথমতঃ শান্তিপুরের হাকিম ও কৃষ্ণনগরের জজ সাহেবের বিরুদ্ধে যথাক্রমে শপথ বাদ দেওয়া, সকলকে হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়া, একতরফা ডিস্‌মিস্ প্রভৃতি কতিপয়

(১) পরিমাণ।

(১) সমাচার দর্পণ, ৬। ৪। ১৮৩৩।

অভিযোগ করা হইয়াছে। তারপর লেখা হইয়াছে যে নাজিরের অনেক চাপরাশীকে ঘুসের জন্য বরখাস্ত করা হইয়াছে, নদীয়ার আর এক মুন্‌সিফের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করায় তাহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে এবং কেবল শান্তিপুরের মুন্‌সিফ্ কখনও ঘুষ লন না। তারপর প্রার্থনায় বলা হইয়াছে যে—সরকার মা বাপ; জেলা জজ যেন ৬ মাস অন্তর লোক ডাকাইয়া কর্ম্মচারী, জমিদার নীলকর ও ধনীর অত্যাচার, ঘুষ, চুরি, বৃথা অভিযোগ বদ্‌মায়েসী প্রভৃতির অভিযোগ শুনেন। এই তদন্ত কমিটীতে যেন জজ, কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন, ইহার বিবরণী যেন বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে লেখা হয়; এবং ইহাতে সরকারের আয়ের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

নয়

লংসাহেব 'সিলেকসন্‌স্ ফ্রম আনপাব্‌লিস্‌ড রেকর্ডস্ পৃঃ ১২১ এ ১৭৫৮ খৃঃ অব্দের সরকারী দপ্তরের বিবরণ হইতে লিখিয়াছেন যে পলাশীর যুদ্ধের অগ্রে ও পশ্চাতে সরকার গোমস্তাদিগের দ্বারা শান্তিপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে তন্তুবায়দিগকে দাদন দিয়া আনাইয়া কলিকাতার নিকট বসবাস করাইতেন; এবং জব চার্ণকের কলিকাতায় রাজধানী স্থাপনের (১৬৯০ খৃঃ) অন্যতম কারণ এই ছিল যে উহার সন্নিকটে তন্তুবায়দিগের বসতি ছিল।

উক্ত গ্রন্থে (২) কোম্পানীর ১৩টী আড়ঙ্গে কত দেওয়া হইয়াছিল এবং সেখান হইতে কত পাওয়া গিয়াছিল তাহার একটী হিসাব লিখিত আছে। শান্তিপুর আড়ঙ্গে ৯৩, ৫৯২ টাকা ৩ আনা ৯ পাই দেওয়া হইয়াছিল।

দশ

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুরে একটী বিদ্যালয় ছিল বলিয়া পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ইহা এবং নিম্নলিখিত বিদ্যালয়টী অভিন্ন ছিল বলিয়া অনুমান হয়। "শান্তিপুরের আহিরিটোলা।—বিজ্ঞ অগ্রচ্ছ লোকহিতৈষী গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গত ডিসেম্বর মাসের দ্বাদশ দিবসে তাহা স্থাপিত হইয়াছে এবং ঐ বাবু তাহার অধ্যক্ষও হইয়াছেন। ঐ পাঠশালা স্থাপনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত ৫৮ জন বালক পূর্ব্বাহ্নে দশঘণ্টাবধি অপরাহ্নের পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত প্রতিদিন হাজির হইয়া শিক্ষার পৌর্ব্বাপর্য্য এবং উত্তম ধারানুসারে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে।...ঐ বিদ্যালয় উক্ত বাবুর খরচেতে কোম্পানীর রাস্তার পূর্ব্ব দিগে স্থাপিত হইয়াছে। অপর শ্রীযুত জজ এড্‌ৱার্ড মলিন্স সাহেব ঐ পাঠশালার বালকেরদের শিক্ষক হইয়া বৎসরে দুইবার বালকেরদের পরীক্ষার্থ স্থির করিয়াছেন।... কেষাঞ্চিদ্দর্পণগ্রাহিণাং বিদ্যালয়সহকারিণাঞ্চ। শান্তিপুর ১৮৩২ সাল ২৯ জানুয়ারি।"

উত্তরকালে মিশনারীদিগের চেষ্টায় শান্তিপুরে আর একটী বিদ্যালয় কিছু কালের জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। "ইংলণ্ডীয় গির্জ্জাভুক্ত প্রচারকগণের কৃত খৃষ্টানের সংখ্যা নদীয়ার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; এমন কি বঙ্গের অন্য যে কোনও জেলার অপেক্ষা অধিক। এই সমিতির প্রচারকগণই নদীয়ায় সর্ব্বপ্রথম (১৮১১ খৃঃ) প্রচার উদ্দেশে আগমন করেন; প্রায় ইহার সমসময়েই 'লণ্ডন মিশনারী সোসাইটী' মিঃ হিল্, ওয়ার্ডেন, টাইন প্রমুখ পাদরীগণ শান্তিপুরে আড্ডা স্থাপন করেন। ইহা ১৮৬৪ অব্দে সোলোতে স্থাপিত নর্ম্মাল স্কুল যাহা প্রথমে কাপাসডাঙ্গাপরে শান্তিপুরে স্থানান্তরিত হয় তাহা স্থায়ীরূপে কৃষ্ণনগরেস্থাপিত হয়।...বিগত ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের নীল হাঙ্গামার সময় যে সকল মহানুভব ইংরাজ ধর্ম্ম ও ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জেতা বিজেতার তারতম্য ভুলিয়া নীলকর-পীড়িত প্রজাকুলের সাহায্যার্থ নির্ভীক হৃদয়ে স্বজাতীয় অত্যাচারী নীলকরগণের বিপক্ষে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শান্তিপুরের মিশনারী সোসাইটীর রেভঃ সি বমওয়েল্‌স সাহেব অন্যতম।(২)

বর্ত্তমান সময়ে শান্তিপুরে ৩টী উচ্চ ইংরাজী, ২টী মধ্য ইংরাজী, ১টী উচ্চ প্রাথমিক, ২৪।২৫টী নিম্ন প্রাথমিক, ১টী বালিকা মধ্য বাংলা ও ৪টী বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

ক্রমশঃ

(১) সমাচারদর্পণ, ৮। ৬। ১৮৩৩ (২) ৬৩ পৃষ্ঠা।

(১) সমাচার দর্পণ, ৪। ২ ১৮৩২। পঞ্চপুষ্প, জ্যৈষ্ঠ ১৮৩৮।

(২) ইহাদেরর সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। নদীয়া কাহিনীও দ্রষ্টব্য।
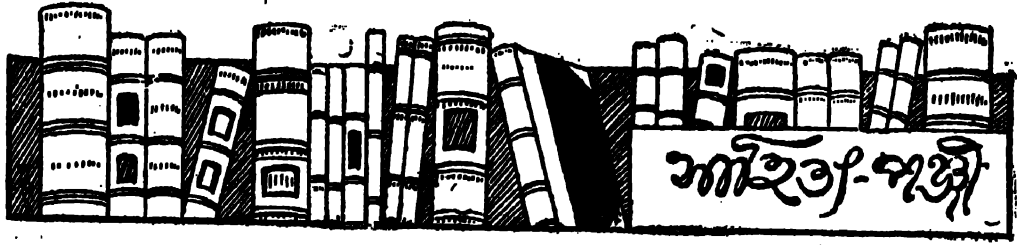
শ্রীহরিহর শেঠ

১২৮৫ সালের ২৮ অগ্রহায়ণ শুক্রবার হরিহর শেঠ জন্ম-গ্রহণ করেন।

অল্পদিন চন্দননগরের সেন্টমেরিস্ ইন্‌ষ্টিটিউটশনে পড়িয়া হুগলী কলেজিয়েট ও তৎপরে হুগলী কলেজ ও রিপণ কলেজে পড়েন। অল্প বয়স হইতেই ইঁহার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। বিদ্যালয়ে পাঠকালেই ইনি লিখিতেন। ব্যবসায়ের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ইহার সাহিত্য-সাধনা বন্ধ থাকে, তৎপরে প্রায় ১৫।২০ বৎসর পরে আবার আরম্ভ হয়।

১৯২৬ সালে ফ্রান্সের মিনিষ্টারের নিকট হইতে ইনি "অফিসিয়েট দাকাদেমী" ও ১৩৩১ সালে সারস্বত মহামণ্ডল হইতে 'সাহিত্য ভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইহার বহু প্রবন্ধ বহু সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার একটী সম্পূর্ণ তালিকা দিলাম।

—প্রবন্ধ—

অদৃষ্ট	পুণ্য	১৩০৭
শ্রান্তপথিক	আলোচনা	ঐ
আধুনিক সমাজ	আলোচনা	১৩০৯
সাহিত্যে ভ্রম	সুধা	ঐ
বাঙ্গলা ভাষার ইংরাজকৃত উন্নতি	প্রবাসী	১৩১০
বিশ্বপ্রমাদ	প্রদীপ	১৩১২
প্রমাদ (পুস্তকের মধ্যে প্রকাশিত হয়)		১৩১৬
অপর দিক্	ভারতবর্ষ	১৩২৫
সুবিধা ওরফে সর্ব্বনাশ	মানসী ও মর্ম্মবাণী	১৩২৯
সভ্যতার মধ্যযুগ	বঙ্গবাণী	ঐ
সামর্থের অপচয়	মাসিক বসুমতী	ঐ
মন্নাজাতির স্বরাজ-সাধনা	ভারতবর্ষ	১৩৩০
দেশের কাজ	নবযুগ	১৩৩১
তন্ত্রোক্ত দেবদেবী-চিত্র	বঙ্গবাণী	ঐ
আমাদের স্বদেশীর গণ্ডি	ভারতবর্ষ	১৩৩২
সাহায্য-সমিতির দ্বারা জনসেবা	নবযুগ	১৩৩৩
প্রতিযোগিতা	নবযুগ	ঐ
রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপন্থী কতটা	মাসিক বসুমতী	১৩৩৪
জনসেবা	মাসিক বসুমতী	ঐ
আমাদের শক্তি ও সমবায়	প্রবর্ত্তক	ঐ
বাঙ্গলার তরুণশক্তি ও তাহাদের কর্ম্মধারা	প্রবর্ত্তক	১৩৩৬

—ছোট গল্প—

অতৃপ্ত বাসনা	প্রয়াস	১৯০০
অনুতপ্তা	প্রয়াস	১৩০৭
উপহার	পুণ্য	ঐ
রমেশ	আলোচনা	ঐ
বিধির বিধান	প্রয়াস	ঐ
পাপের পরিণাম	পূর্ণিমা	১৩০৮
অপূর্ব্ব ব্যাধি	প্রদীপ	১৩১০
সংসারের সুখ	প্রদীপ	ঐ
বীণা	আলোচনা	ঐ
অদ্ভুত গুপ্তলিপি (ডিটেক্‌টিভ গল্প)	প্রদীপ	১৩১১
অমৃতে গরল (ডিটেক্‌টীভ গল্প)—	কুন্তলীন পুরস্কার	১৩১১
ভবিতব্য	প্রদীপ	১৩১২
মায়াদীপ	প্রভাতী	১৩৩২
কালীচরণের দুর্গোৎসব	সুবর্ণ বণিক্-সমাচার	১৩২৮
দীনের অর্ঘ্য	চতুরঙ্গ	১৩৩৫

— ভ্রমণ-কাহিনী —

শ্রীবৃন্দাবন-দর্শন	প্রবাসী	১৩২২
ফতেপুর সিক্রীর স্বপ্নপুরী	বঙ্গবাণী	১৩৩৩
জয়পুর রাজ্যে দুইদিন	প্রবাসী	ঐ
দিল্লীর পুরাতন স্মৃতি	মাসিক বসুমতী	১৩৩৪
নবাবের দেশে তিন দিন	মাসিক বসুমতী	ঐ
কামাখ্যা-দর্শন	বিশ্ববাণী	ঐ
শিলং	মাসিক বসুমতী	১৩৩৫
দার্জ্জিলিংয়ের পত্র	ভারতবর্ষ	ঐ
শ্রীপাট শান্তিপুর	মাসিক বসুমতী	ঐ
মুশৌরীর কথা	মাসিক বসুমতী	ঐ
অযোধ্যা ও ফৈজাবাদ	স্বদেশী বাজার	ঐ
জৌনপুর	প্রবর্ত্তক	ঐ
অমৃতসর	প্রবাসী	ঐ
লাহোর	ভারতবর্ষ	ঐ
আমাদের পল্লীভ্রমণ	প্রবর্ত্তক	১৩৩৬
পল্লীভ্রমণ	মাসিক বসুমতী	ঐ
শ্রীগৌরাঙ্গ-তীর্থে দুই দিন	মাসিক বসুমতী	১৩৩৭
রাঢ়ের কয়েকটী পল্লী-ভ্রমণ	প্রবাসী	১৩৩৭
বিষ্ণুড়ের ভাঁড়ারপোতা	পঞ্চপুষ্প	১৩৩৮

—অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য—

ব্যবসায় ও মূলধন	ভারতবর্ষ	১৩২৯
বাঙ্গালীর ধনলিপ্সা	ভারতবর্ষ	ঐ
ব্যবসায় কথা	ভারতবর্ষ	ঐ
অর্থ সমস্যা ও বিশ্ববিদ্যালয়	ভারতবর্ষ	১৩৩০
অর্থসমস্যায় শিক্ষাকথা	সারদা	১৩৩১
ব্যবসায় মূলধন	উপাসনা ও স্বদেশীবাজার	১৩৩৫

— পুরাতন কথা —

একখানি পুরাতন দলিল	প্রদীপ	১৩১১
ভারতে খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়	ভারতবর্ষ	১৩৩৩
গৌরীসেন ও নবাব খাঁজেহান খাঁ	বঙ্গবাণী	ঐ
ভারতের কয়েকটী প্রাণান্তকর-প্রথা	প্রবাসী	ঐ
রেল ষ্টীমার ডাক টেলিগ্রাফ	ভারতবর্ষ	ঐ
ভারতে ইংরাজ ও ইংরাজি সম্পর্কে প্রথম	ভারতবর্ষ	১৩৩৩
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে পাশ্চাত্য চিত্রকর	মাসিক বসুমতী	১৩৩৪
ভাগীরথী-তীরে	ভারতবর্ষ	ঐ
সেকালের বাঙ্গলা সাময়িকে রসরচনা	ভারতবর্ষ	ঐ
ভারতে পর্ত্তুগীজ-স্মৃতি	ভারতবর্ষ	ঐ
প্রাচীন ভারতে রাজ্যপালন প্রণালী	প্রবাসী	১৩৩৬
সেকালের কলিকাতায় লটারি খেলা	প্রবাসী	১৩৩৭
ভারতে বাষ্পায় জাহাজ পরিচালনের প্রথম যুগ	প্রবাসী	ঐ
প্রাচীন ইংরাজীগ্রন্থে হিন্দু দেবদেবী চিত্র	মাসিক বসুমতী	ঐ

— কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ—

জ্যামিতিক চিত্র দিয়া ছবি আঁকা	প্রবাসী	১৩২৯
অদ্ভুত প্রকৃতির খেয়াল	প্রবাসী	ঐ
চিত্রকরের খেয়াল	প্রবাসী	ঐ
চিত্রে বৈচিত্র্য (১)	মাসিক বসুমতী	১৩৩২
চিত্রে বৈচিত্র্য (২)	ভারতবর্ষ	ঐ
ফটোগ্রাফারের খেয়াল	মৌচাক	ঐ
অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য	মাসিক বসুমতী	১৩৩৩
দৃষ্টি-বিভ্রম	ভারতবর্ষ	১৩৩৩

— শিক্ষা —

শিক্ষার কথা	ভারতবর্ষ	১৩২৯
পাশ্চাত্য মেয়েদের একটী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা	বঙ্গবাণী	ঐ
পল্লী পাঠাগারের আদর্শ	ভারতী	১৩৩৩
শিক্ষার আদর্শ	নবযুগ	১৩৩২
ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা	বিশ্ববাণী	১৩৩৫
শিক্ষায় লাভালাভ	ভারতবর্ষ	১৩৩৫
শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য	পঞ্চপুষ্প	১৩৩৮

— উদ্ভিদ তত্ত্ব —

পুষ্পের বিবাহ	পুণ্য	১৩০৫

উদ্ভিদ-জীবনের দুই একটা কথা	নির্ম্মাল্য	১৩০৮
কফি ও উহার চাষ	প্রদীপ	১৩১০
ফল-ফুলের বৈচিত্র্যসাধন	মাসিক বসুমতী	১৩৩০

— নারীপ্রসঙ্গ —

নারীপ্রসঙ্গে পুরুষের কর্ত্তব্য	ভারতবর্ষ	১৩৩০
বঙ্গ-অন্তঃপুরে রমণী	বঙ্গবাণী	ঐ
নারীর শিক্ষা	ভারতবর্ষ	১৩৩০
স্ত্রী-শিক্ষার একটা দিক	মাসিক বসুমতী	১৩৩৭
নারী-শিক্ষা	বিচিত্রা	ঐ

— উপন্যাস —

অভিশাপ—১৩১০, ১১ ও ১২ সালের 'বান্ধবে' ইহার কতক অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল।

— কবিতা —

শকুন্তলার বিদায়-গ্রহণ	পুণ্য	১৩০৬
অতৃপ্ত আশা	অন্তঃপুর	ঐ
ভগ্নগৃহ	প্রয়াস	১৮৯৯
উদ্বোধন	প্রয়াস	১৯০০
হৃদয়ের কথা	প্রয়াস	১৩০৭
স্বর্গীয় নিত্যকৃষ্ণ বসু	বীণাপাণি	ঐ
অতৃপ্ত পিয়াস	প্রয়াস	১৯০০
পুরাতন বর্ষের বিদায়-গ্রহণ (স্বপ্ন)	পুণ্য	১৩০৭
দোল-পূর্ণিমায়	পূর্ণিমা	ঐ
স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত	পুণ্য	১৩০৮
অন্তরালে	আলোচনা	১৩০৯
দুটী কথার উপহার	আলোচনা	১৩০৮
রাখিপূর্ণিমা	প্রদীপ	১৩১১

— জীবতত্ত্ব —

জীবদেহে প্রকৃতির খেয়াল	প্রবাসী	১৩২৯
মনুষ্যসম্পদরূপে মানবেতর জীব	ভারতবর্ষ	১৩৩০
জীবদেহে লাঙ্গুলের উপকারিতা	প্রকৃতি	১৩৩২
ইতর প্রাণীর মানবীয় ভাব	প্রকৃতি	ঐ
এণ্ডি-পোকা	প্রকৃতি	১৩৩৩

— ইতিহাস, ইতিবৃত্ত ও বিবরণ —

জাপান	পুণ্য	১৩০৬
ইতিহাসের একপৃষ্ঠা	প্রয়াস	১৯০০
কৃষ্ণকুমারী	প্রয়াস	১৩০৭
ব্রহ্মে নাট পূজা	ভারতী	ঐ
আসামী বিবাহ	সখী ও ভারতী	১৩০৯
রয়েল বোট্যানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর	প্রদীপ	ঐ
সেকালের অদ্ভুত কাহিনী	প্রদীপ	ঐ
কোহিনুরের কথা	প্রবাসী	১৩১০
আসামের নাগাজাতি	প্রদীপ	ঐ
কাশীর মানমন্দির	ভারতবর্ষ	১৩২২
চন্দননগর ও শিল্পপ্রদর্শনী	প্রবাসী	ঐ
দুপ্লের সময়ে চন্দননগর	ভারতবর্ষ	ঐ
শিশুদিগের নামকরণ-প্রথা	প্রবাসী	১৩২৯
মধ্য-আফ্রিকার নরমাংশখাদক জাতি	বঙ্গবাণী	ঐ
ওয়াট্‌সনের পদপ্রান্তে শৃঙ্খলিত বন্দী চন্দননগর ও মুক্ত কলিকাতা	ভারতবর্ষ	ঐ
ভারতের উপাস্য বৈচিত্র্য	ভারতবর্ষ	১৩৩০
বিয়ের কনের বেশ	প্রবাসী	ঐ
চন্দননগর-পরিচয়	মাসিক বসুমতী	১৩৩১
চন্দননগরের সাময়িক পত্র ও গ্রন্থ-পরিচয়	প্রবাসী	ঐ
চন্দননগরের বাঙ্গালী সৈনিক	ভারতবর্ষ	ঐ
প্রাচীন চন্দননগরে ফরাসী-শাসন	বঙ্গবাণী	ঐ
চন্দননগরের সাধক ও সিদ্ধপুরুষ	ভারতবর্ষ	ঐ
চন্দননগরের কথক, কবিওয়ালা ও যাত্রা	—প্রবাসী ও বঙ্গবাসী	ঐ
চন্দননগরে দেবালয় ও উপাসনাগার	প্রবাসী	ঐ
চন্দননগরের আদি পরিচয় ও বঙ্গে-ফরাসীদের আদি স্থান-নির্ণয়	প্রবাসী	ঐ
চন্দননগরের ক্রীড়া-কৌতুক	ভারতবর্ষ	ঐ
রুষিয়ার অতীত রাজশ্রী	সারদা	ঐ
চন্দননগরের পাত্রী জ্যোতির্ব্বিদ গেরাদের শতবর্ষের গ্রহণ-গণনা ও তাঁহার সম্পাদিত প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গলা পুস্তক	ভারতবর্ষ	১৩৩২

— বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধ —

— পুস্তকাবলী-তালিকা —

অভিশাপ (উপন্যাস) ১৩৩৫ ; প্রমাদ (প্রবন্ধ-পুস্তক) ১৩১৬ ; অদ্ভুত গুপ্তলিপি ও অমৃতে গরল (ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস) ১৩৩৬ ; প্রতিভা (সামাজিক নাটক) ১৩২৮ ; স্রোতের ঢেউ (চিন্তাকণা) ১৩২৯ ; ঘরের কথা (প্রবন্ধ-পুস্তক) ১৩৩১ ও পুরাতনী (পুরাতন-প্রসঙ্গ) ১৩৩৩ ;
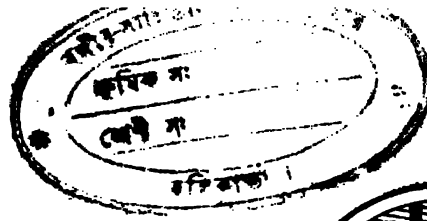
সৌন্দর্য্যের বৈশিষ্ট্য—

পৃথিবীর সকল দেশেরই সৌন্দর্য্যরক্ষার একটা না একটা বৈশিষ্ট্য আছে—কোনটী সুন্দর, কোনটী অদ্ভুত। পাশ্চাত্যের মেয়েদের শীর্ণ চেহারা, চীনের মেয়েদের ছোট পা প্রভৃতি ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত। ইহারা তো সভ্যজাতি, এছাড়া অসভ্য জাতির সৌন্দর্য্যের ধারণার কথা শুনিলে

সৌন্দর্য্য রাখিবার অদ্ভুত ধারণা

বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। আমরা এখানে যে ছবিটী দিলাম এটী মধ্য-আফ্রিকাবাসী একটী অসভ্যজাতীয় যুবতীর ছবি। ছবিটী 'ভয়েজ টু দি কঙ্গো' নামক ছায়াচিত্রে ঐ স্থান হইতে তোলা হয়। উহাদের দেশে এইরূপে নাকি মেয়েদের সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়।

বিলাসের উপকরণ—

আজকাল প্লাটিনম বিলাসের একটী শ্রেষ্ঠ সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণতঃ মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারে ইহা ব্যবহৃত হয়। লণ্ডনের এক্টন নামক এক ব্যক্তি শোনা গিয়াছে পৃথিবীতে যত প্লাটিনম ব্যবহার হয় তাহার

এক্টন প্লাটিনম শোধন করিতেছেন

এক-তৃতীয়াংশ নিজে যোগাইতে পারেন। যে ছবিটী এখানে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এক্টন প্লাটীনম শোধন করিতেছেন—উহাতে ১,৫০০০ পাউণ্ড প্লাটিনম আছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে গো-দোহন—

কি উপায়ে সহজভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে স্বাস্থ্য-রক্ষার উপযোগী উৎকৃষ্ট দুগ্ধ পাওয়া যাইতে পারে তাহার

প্রচেষ্টা ও অনুশীলন গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডের "বাকার গর্ডন লেরবি টেয়িজে" চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি সেখানে এক নূতন উপায় উদ্ভাবন হইয়াছে গুলিকে রাখা হইয়াছে, তাহা ঘোরান হয়। উহা মিনিটে ১৫ ফুট ঘোরে। ইহা একবার ঘোরাইলেই আপনা-আপনিই ৫০টী গাভীর দোহনকার্য্য সম্পন্ন হয়।

গো-দোহন করিবার উপায়

ইহাতে খুব সুন্দর ভাবে সহজ উপায়ে খুব শীঘ্র প্রচুর দুগ্ধ-দোহনকার্য্য সম্পন্ন হয়

গাভীর বাটে যন্ত্র লাগান হইতেছে

প্রথম চিত্রটীতে পাঠকগণ দেখিবেন যে, অনেকগুলি গরুকে বৃত্তাকারভাবে সাজান হইয়াছে। এই বৃত্তটীর ব্যাস ৬০ ফুট। দুগ্ধ দোহনের পূর্ব্বে যাহার উপর গাভী- এইরূপে ৭ ঘণ্টা ঘুরিলে ইহা হইতে ১,৬৮০টা গাভীর দুগ্ধ পাওয়া যায়। প্রত্যেকটী গাভীর জন্য একটী করিয়া লোক নিযুক্ত থাকে—যাহাতে গরুর বাঁট ঠিক

দুগ্ধ পরিষ্কৃত করিয়া বোতলে পোরা হইতেছে

থাকে, তাহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। গাভী-

একজন দুগ্ধদোহন করিয়া আসিতেছেন

গুলির দোহনকার্য্য সম্পন্ন হইলে উহাদের দুগ্ধ আপনা-

গাভীর বাঁটে লাগান যন্ত্র

আপনিই পাম্পের সাহায্যে আসিয়া একটী আধারে সংগৃহীত হয়, তারপর স্বতন্ত্র বোতলে পূর্ণ করা হয়।

ক্ষুদ্রতম ঘোটক—

নিউইয়র্কের জন সি লুসাডেনো নামক এক ব্যক্তির একটী ঘোটক আছে, তাহার নাম 'পিউই'। 'পণ্ডিত'এর ওজন ১০০ পাউণ্ড মাত্র এবং সে উঁচুতে ২৭ ইঞ্চি। এখন তার বয়স মাত্র ৫ বৎসর—তথাপি এ বাড়ে নাই। শুনা যায়, হাজার

ক্ষুদ্রতম ঘোটক

হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশের ঘোড়া না কি ঐরূপই ছিল।

গন্ধী-আরউইন ষ্টেডিয়াম—

মাদ্রাজে কাবেরী নদীর উপর গন্ধী-আরউইন চুক্তির নিদর্শনস্বরূপ একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। সম্প্রতি কইম্বাটুর নামক স্থানে দিল্লী-চুক্তির নিদর্শনস্বরূপ আর একটী স্মৃতি-সৌধ

গন্ধী-আরউইন ষ্টেডিয়াম

নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নাম হইয়াছে—গন্ধী-আরউইন ষ্টেডিয়াম।

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী রেলগাড়ী—

নিম্নে যে ছবিটী আমরা দিলাম এটী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী রেলগাড়ী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী রেলগাড়ী

এটী বৃটেনের গ্রেট ইষ্টার্ণ রেলওয়ের—নাম, "শেলটেন্‌হাম ফ্লায়ার"। লণ্ডন হইতে ৭৭॥০ মাইল দূরবর্ত্তী সুইণ্ডন নামক স্থানে আসিতে না কি ইহার মাত্র এক ঘণ্টা নয় মিনিট লাগিয়াছিল।

অলিম্পিক-ক্রীড়াভূমি—

অলিম্পিক-ক্রীড়া ভুবনবিখ্যাত। প্রতি বৎসর অলিম্পিক-খেলার উদ্যোগও হয় যেমন, লোকও হয় তেমনই। এই বৎসরে (১৯৩২ খৃষ্টাব্দে) এই ক্রীড়া যেখানে হইবে, সেই ক্রীড়াক্ষেত্রের আমরা একটী চিত্র দিলাম—উহা আকাশপথ হইতে গৃহীত চিত্র। এই ক্রীড়াস্থানে ১০,৫০০০ জনের বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

অলিম্পিক ক্রীড়াভূমি

লোম কাটার বহর—

উটের গায়ে জ্যামিতি-মূলক চিত্র

আমরা জানি যে, ব্রুশ তৈয়ারী করিবার জন্য উটের

লোম কাটা হয়, কিন্তু উহাতে উহাদের লোম যে এমনিই কাটিয়া লওয়া হয় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে উহাতে নানা চিত্রও আঁকা হয়। যদিও এটা খুব কম, তবে প্রায়ই দেখা যায়। সম্প্রতি এক উটের গায়ে লোম কাটিয়া এক জ্যামিতিমূলক চিত্র-অঙ্কনের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, লাহোরের মেলায় ইহা প্রদর্শিত হয়। আমরা উহার ছবি দিলাম।

ভ্রাম্যমান চড়ুই—

এই ছবিতে যে তিন সারি চড়ুইএর ছবি দেওয়া হইয়াছে, উহারা গরম সহ্য করিতে পারে না। এগুলি আফ্রিকার
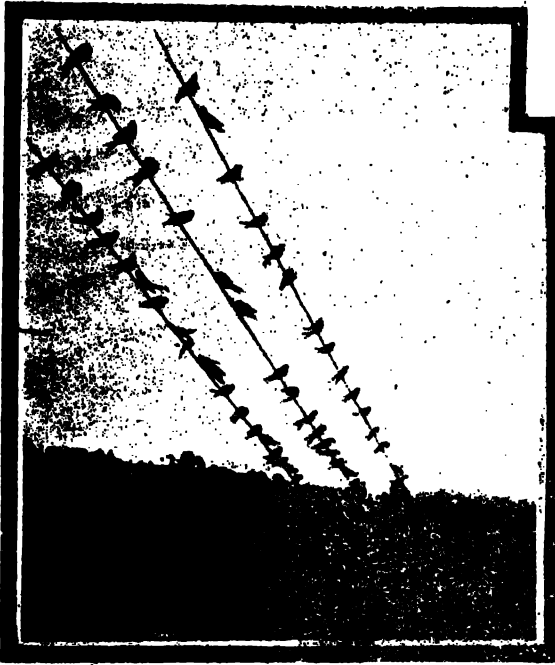
ভ্রাম্যমান চড়ুইএর দল

চড়ুই। যখন যেখানে ঠাণ্ডা থাকে সেইখানেই ইহারা দলবদ্ধ হইয়া গমন করে। এই ছবিতে ইহারা গরমের আগমনের পূর্ব্বে টেলিগ্রাফের তারের উপর বসিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

চড়ুইয়ের জীবনরক্ষা—

নিম্নের ছবিটী একটী 'লাইট হাউসের'। ইহার আলোর ব্যবস্থা এমনভাবে করা হইয়াছে যে, চড়ুইগণ ইহার আলোয় মুগ্ধ হইয়া ইহাতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাতে তাহাদের নিরাপদে থাকিবার ব্যবস্থা আছে
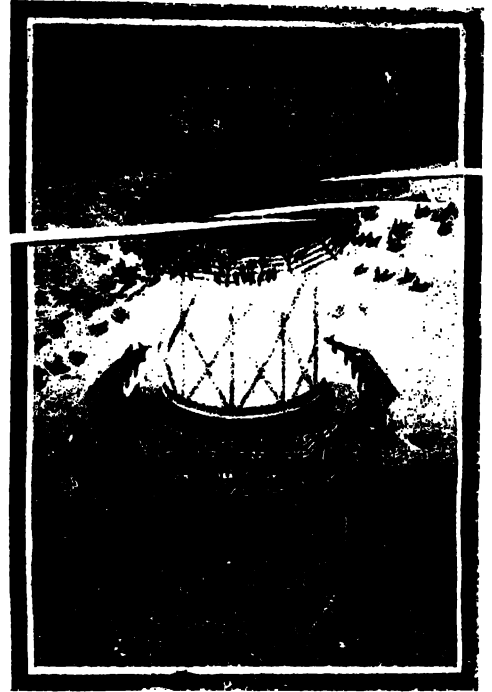
চড়ুইএর জীবনরক্ষার নূতন উপায়

চড়ুই-হিতৈষিণীগণ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা নূতন শুনিলাম।

হিণ্ডেনবার্গের প্রতিমূর্ত্তি—

ছবিতে মোটর গাড়ীর উপর যে বিরাট্ প্রতিমূর্ত্তিটী দেখা

ভন্ হিণ্ডেনবার্গের প্রতিমূর্ত্তি

যাইতেছে উহা জার্ম্মানীর ভন্ হিণ্ডেনবার্গের। হিণ্ডেনবার্গ যেদিন জার্ম্মানীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'ন সেইদিন উহা বার্লিনের রাজপথে প্রদর্শিত হয়। উহা ঐ দিনেরই গৃহীত চিত্র

পৃথিবীর মধ্যে শুষ্কতম স্থান —

আজ পর্য্যন্ত আমরা এই সসাগরা পৃথিবীর অনেক কিছু খবর ও বৈশিষ্ট্যের সংবাদ পাইয়াছি—অনেক সংবাদ রাখিয়াছিও। পৃথিবীর মধ্যে শুষ্কতম স্থান যে কোথায় বা কোনটী, তাহার বোধ হয় বড় একটা খোঁজ রাখি নাই। এখানে আমরা কতকগুলি শুষ্কতম স্থানের সংবাদ পাঠক-সমাজে দিব।

অষ্ট্রেলিয়ার মার্গারেট পর্ব্বত ও দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে এক মরুভূমি আছে, উহা অতিশয় দুর্গম। এখানে না কি ৫।৭ বৎসর অন্তর কখন কখন একটু আধটু বৃষ্টি হয়। সুতরাং স্থানটী এতই শুষ্ক ও কঠোর যে, উহা কল্পনা করাও বিস্ময়জনক। গত বৎসর জনৈক যুবক তাঁহার একমাত্র পূর্ব্বতন এই মরু-অতিক্রমকারীর পদরেখা সাত বৎসর পরে এই মরুর মধ্যে কর্দ্দমে দেখিতে পান। তিনিও ঐ মরু অতিক্রম করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

দক্ষিণ-আমেরিকায় আর একটী মরু আছে। উহা অষ্ট্রেলিয়ার মরু অপেক্ষাও শুষ্কতর। উহা চিলির আটাকামা মরু। আবার ইহা অপেক্ষাও শুষ্কতর বিষুবরেখা হইতে ৫ ডিগ্রি দক্ষিণে পেরুতে অবস্থিত মরুভূমি। এখানে মেঘ ও কুয়াসার অভাব হয় না বটে, কিন্তু অনেকস্থলে বৃষ্টিপাত হইতে প্রায় দেখা যায় না। এমন এমন স্থানও সমুদ্রতীরে আছে যেখানে ৮।৯ বৎসরের মধ্যেও একবিন্দু বারিপাত হয় নাই। এখানে লোকের বসবাসও আছে। পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে যে সকল পার্ব্বত্য নদী এই সকল স্থান দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহারই জলে স্থানীয় লোকেরা তাহাদের জীবন-ধারণের উপযোগী কার্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকে। পেরুতে যে তূলার গাছ হয়, তাহার মূলগুলিও অদ্ভুত। এইস্থানের অত্যন্ত শুষ্কতার জন্য মূলগুলি কেবল একটু আর্দ্রতা ও জলের জন্য মাটীর বহু নিম্নে যাইয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে।

আর একটী শুষ্কতম স্থান দক্ষিণ-আরবের সমুদ্রতীর। এখানে অভ্যন্তর ভাগের পর্ব্বতগুলিতে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় বটে, কিন্তু তীরভূমিতে হয় না। এখানেও লোক বসবাস করে। এখানকার লোকেরা বেশ এক অদ্ভুত উপায়ে নিজেদের জল সরবরাহ করে। সমুদ্রের তলে যে মিষ্ট জলের উৎস আছে, তাহাই তাহাদের জীবন-ধারণের একমাত্র উপায়। স্থানীয় ডুবুরীরা প্রত্যহ জলে নামিয়া ঐ উৎস-মুখ হইতে জল সংগ্রহ করিয়া আনে।

আফ্রিকার কালাহারী ও সোমালী-ল্যাণ্ড আর দুইটী শুষ্কতম স্থান। ইহাদের নাম বোধহয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। কালাহারীতে অবস্থিত মরুভূমির মধ্যে প্রায়ই বৃষ্টি হয় না। দুই তিন বৎসর অন্তর না কি বৃষ্টি হয়, তাহাতেই স্থানীয় অধিবাসীদের জলের অভাব দূর হয়—উহাতেই সেখানে যে সমস্ত জলাশয় থাকে, তাহা পূর্ণ হইয়া যায়।

অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েল্স, পৃথিবীর মধ্যে একটী বিখ্যাত স্থান। ঐ স্থানে বৎসরে ৪ ইঞ্চি মাত্র না কি বৃষ্টি হয়। অনেক সময় হয় তো বৃষ্টিই হয় না। একবার ১৯০০ সাল হইতে ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত সেখানে এমন অনাবৃষ্টি হইয়াছিল যে, জীবনধারণ করা ভীষণ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। যখন ইহা মরু-শ্মশানে পরিণত হইবার উপক্রম হইল, তখন হঠাৎ দেশময় বহু উৎস স্থানে স্থানে মাটী ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া ঐ দেশবাসিগণকে বাঁচাইয়াছিল।

মহিলা-তরবারিক্রীড়া-প্রতিযোগিতা :—

সম্প্রতি ইয়োরোপে আন্তর্জ্জাতিক মহিলা-তরবারি-ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। উহাতে মিস্ পেগী বাটলার নামক বৃটীশ মহিলা প্রথম স্থান অধিকার করিয়া 'হাটন্ কাপ' লাভ করিয়াছেন। 'হাটন্ কাপ' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা নারী-তরবারি-সঞ্চালন-কুশলা জার্ম্মান রমণী ফ্রেডলাইস হেলেন মায়ার লাভ করিয়াছিলেন। মিস্ বাটলার সাতটী খেলায় অপরাজেয় থাকিয়া শেষ খেলায় মায়ারকে পরাজিত করেন। বাটলারই এখন এ বিভাগে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান-যুগে প্রতিযোগিতার যেরূপ নূতন নূতন পথ উদ্ভাবিত হইয়াতেছে বাস্তবিকই তাহা বেশ উপভোগ্য। নারীদের তরবারি-প্রতিযোগিতা একটী সম্পূর্ণ নূতন জিনিস।

জগতের চলচ্চিত্র ব্যবসায় :—

আজকাল চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ের প্রসার বাড়িয়াছে খুবই বেশী। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতা শহরে আমরা বায়োস্কোপ ও দর্শকের সংখ্যা দেখিয়া বিস্মিত হই। ইউরোপ ও আমেরিকার বায়োস্কোপ ও দর্শক-সংখ্যা এতই বেশী যে, আমাদের সহিত উহাদের তুলনাই হয় না। ১৯৩১ সালের ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত দেশের মূলধন ছিল ৫০০, ০০০,০০০ পাউণ্ড, তন্মধ্যে আমেরিকার মূল ধনের পরিমাণ ৪০০,০০০,০০০ পাউণ্ড; যুক্তরাষ্ট্রের সিনেমা গৃহগুলির বার্ষিক আয় ৩১২,০০০,০০০ পাউণ্ড। হলিউডে ২৬টী ষ্টুডিও আছে, ঐগুলির একত্রিত মূলধন ১৫,৬০০,০০০ পাউণ্ড।

হলিউডে যে সকল চলচ্চিত্র-অভিনেতা ও অভিনেত্রী আছে, তাহাদের বার্ষিক বেতনের পরিমাণ ১৭, ০০০, ০০০ পাউণ্ড।

১৯৩১-৩২ সালে চলচ্চিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য ৪০, ০০০, ০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনের ব্যয় হইয়াছিল ২০, ০০০, ০০০ পাউণ্ড।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১৭০৯৭টী সিনেমা-গৃহ আছে, তন্মধ্যে টকি-হাউসের সংখ্যা ১৩৫১টী। ইউরোপে সিনেমাগৃহের সংখ্যা ২৮৪৫৪টী, তন্মধ্যে টকি হাউসের সংখ্যা ১৩৫১৫টী।

প্রতি সপ্তাহে পৃথিবীর সকল দেশে যত লোক বায়োস্কোপ দেখে, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ২৫০, ০০০, ০০০ জন। ইহাদের মধ্যে একা আমেরিকার দর্শক-সংখ্যাই প্রায় ১১৫, ০০০, ০০০ জন। দেখা যাইতেছে, এ বিষয়ে আমেরিকাই সকলের অগ্রণী।

— শ্রীশৌরীন ঘোষ

পুস্তক পরিচয়

পাঞ্চজন্য (প্রবন্ধ-সংগ্রহ)—শ্রীকনকলতা ঘোষ। আর্য্য-সাহিত্য-ভবন, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৩৭ সাল। ।৴০+১৩৭ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০।

লেখিকা সাহিত্য-সংসারে অপরিচিতা নহেন। তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "রেখা" অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁহার যে-সমস্ত গদ্যরচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহারই একত্র সমাবেশে "পাঞ্চজন্যে"র উদ্ভব। ইহাতে মোট ২০টী সন্দর্ভ আছে। সবগুলিই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত। ভাষা সর্ব্বত্রই জটিলতা হইতে মুক্ত। তবে ভাবের মধ্যে এতটুকু নূতনত্বের সন্ধান মিলিল না—প্রগাঢ়তারও কোন পরিচয় নাই। তিনি যে যে বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন সে-সব বহুপূর্ব্বে বহুবার সুষ্ঠুভাবেই আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার লেখা পড়িতে পড়িতে অনবরত মনে হয়—'এ-সব কথা কতবার শুনিয়াছি, দৈনিক পত্রের স্তম্ভে পড়িয়াছি, সভা-সমিতিতে আলোচনা করিয়াছি।' অতএব তাঁহার 'পাঞ্চজন্যে' কোন অভিনব স্বরনিস্বন শুনিতে পাই নাই—যেটুকু শুনিয়াছি তাহা অতি পরিচিত, 'সর্ব্বজনবিদিত' কথার মুখর প্রতিধ্বনি মাত্র। লেখিকার অন্তরে 'দেশানুরাগ' যতই অতলস্পর্শ হউক না কেন, নিজস্ব-বর্জ্জিত কোনও রচনা সাহিত্যে স্থায়ী স্থান অধিকার করিতে অক্ষম। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা যে পাঠের অযোগ্য এ-কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল হইলেও, বর্ণাশুদ্ধি ও মুদ্রাকরপ্রমাদ স্থানে স্থানে অমার্জ্জনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আর এক কথা :—সাহিত্য-চর্চ্চা যদি লেখিকার নিকট শুদ্ধ অবসর-বিনোদনের প্রয়াসেই পর্য্যবসিত হয়, তবে তজ্জন্য সাহিত্য-সমালোচকের নিকট বিচারপ্রার্থী হওয়া বৃথা।

ক, কা, ব

বিবিধ প্রসঙ্গ

১৯৩০—৩১ সালে ভারতে আমদানী পণ্য ও রপ্তানী-ব্যবসায় :—

বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের যেরূপ অবনতি হইয়াছে, এরূপ আর কখনও হয় নাই। গত আষাঢ় মাসেও একথা বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছিল। ১৯৩০—৩১ সালের ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় রিপোর্টে দেখা যায় যে, আলোচ্যবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, পরে উহা যে কিরূপ চরমে গিয়া ঠেকিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এ সমস্যার সমাধানে জগতের বহু শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী, সওদাগরগণ নানা মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ স্বাভাবিক কাট্‌তির তুলনায় কাঁচা মাল ও পণ্যদ্রব্য প্রভৃতি, বিশেষভাবে কাঁচা মালের অতিরিক্ত উৎপন্নে, আমেরিকা ও ফ্রান্সে অত্যধিক পরিমাণে সোণা জমা হওয়ায় বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কসমূহে আমানত টাকার পরিমাণ হ্রাস এবং পৃথিবীর নানা স্থানে—বিশেষতঃ ভারতবর্ষ, চীন দক্ষিণ আমেরিকায়—রাষ্ট্রীয় অশান্তিতে যে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

নানাপ্রকারে উৎপন্ন দ্রব্যের অত্যাধিক্যের ফলে ভারতের এই অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, ইহাতে রাজনৈতিক অশান্তির কিছু ব্যাপরও সংশ্লিষ্ট আছে; কারণ, এই অশান্তি ব্যবসায়ের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা অস্বীকার করা চলে না।

১৯৩০—৩১ সালে মোট ১৯৫ কোটি টাকার মাল ভারতে আমদানী হয় এবং ২২৬ কোটি টাকার মাল বিদেশে রপ্তানী হয়; অথবা পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্যবর্ষে ২৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৩২ টাকা কম দ্রব্য আমদানী হয় এবং ৯০ কোটি ৩২ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ২৯ টাকা কম দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়।

১৯৩০ সালে ব্যবসা-বাণিজ্য যেরূপ ছিল, ১৯৩১ সালের ব্যবসা-বাণিজ্য তদপেক্ষা অধিক শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। আমরা মাত্র পাঁচ মাসের একটী তুলনামূলক তালিকা দ্বারা উহা জানাইলাম—মূল্য হিসাবে উহা দেওয়া হইল।

(টাকা লক্ষ-হিসাবে করিতে হইবে)

	১৯৩০	১৯৩১	কত টাকা কম	শতকরা কত টাকা কম
এপ্রিল—				
রপ্তানী	২৪৫৮	১৪০৮	১০৫০	৪২ ৭
আমদানী	১৮০৬	১২৫৬	৫৫০	৩০-৫
মে—				
রপ্তানী	২১৮৪	১৩১০	৮৩৪	৩৮-২
আমদানী	১৭৯০	১১৪০	৬৫০	৩৬-৩
জুন—				
রপ্তানী	২০৭১	১২৫৮	৮১৩	৩৯-৩
আমদানী	১৩৮৬	১২১৩	১৭৩	১২-৫
জুলাই—				
রপ্তানী	২০৯৬	১২৫৪	৮৪২	৪০-২
আমদানী	১৩৬৭	১০৭২	২৯৫	২১-৬
আগষ্ট—				
রপ্তানী	১৭৬১	১৩৩২	৪৩২	২৪-২
আমদানী	১২৭১	৯৬৬	৩০৮	২৪-২
মোট :—				
রপ্তানী	১০,৫৭৩	৬,৬০২	৩,৯৭১	৩৭-৬
আমদানী	৭,৬২৩	৫,৬৪৮	১,৯৭৫	২৫-৯

সুতবাং বুঝা যাইতেছে বাণিজ্যের ইতিহাসে ১৯৩১ সাল একটী স্মরণীয় বৎসর।

গ্রেটবৃটেনে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্যবর্ষে ভারতীয়

আমদানী-মালে শতকরা ৫-৬ টাকা হারে ক্ষতি হইয়াছে। আমদানী-মালের মধ্যে কাপড়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কমিয়া গিয়াছিল, কারণ পূর্ব্ববৎসর কাপড় আমদানী হইয়াছিল ৭৮ কোটি টাকার এবং আলোচ্যবর্ষে হইয়াছে ৪১ কোটি টাকার। সমস্ত মালই ভারতে আমদানী হইয়াছে; ব্যবসায়ের অবনতিই উহার একমাত্র কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা অন্যান্য কতকগুলি জিনিসের একটী তালিকা নিম্নে দিলাম—উহাতে পূর্ব্ববৎসর ও আলোচ্যবর্ষের তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

	পূর্ব্ববৎসর	আলোচ্যবর্ষ
কাঁচাতুলা	৫৮০০০ টন	২৪০০০ টন
লোহা ও ইস্পাত	৯২৭৭০০ টন	৬১৪২০০ টন
মোটর গাড়ী	৭ কোটী ৫২ লক্ষ টাকার	৪ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকার
	(১৭৪০০ খানি)	(১৩৬০০ খানি)
মোটর বাস	১৫৭০০খানি	৮৯০০ খানি
রবার	৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার	২ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার

এছাড়া ধাতু-দ্রব্যাদির আমদানী কম হইয়াছে ৭ কোটী ৫২ লক্ষ টাকার। রপ্তানীর দিক দিয়া দেখিতে যাইলে আমরা দেখি—তুলাজাত দ্রব্য ৪ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা হইতে ৩ কোটী ৩২ লক্ষ টাকায়, খাদ্যশস্য ৩২ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা হইতে ২৯ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার ও চাউল ২৩ লক্ষ ২৬ হাজার টন হইতে ২২ লক্ষ ৭৯ হাজার টন এ নামিয়াছে। এছাড়া পাটের রপ্তানী কম হইয়াছে ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫ শত টন অর্থাৎ ৩৪ কোটী টাকার কম, আর চায়ের রপ্তানী কমিয়াছে ৩৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার।

মোটের উপর দেখিতে যাইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের এই অবনতি সহজে পূরণ হইবার নহে। রাজনীতিক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা না আসিলে উহা একান্তই অসম্ভব।

বাঙ্গালার তুলা :—

গত বৎসর (১৯৩০-৩১) বাঙ্গালায় ৭৭৩১০ একর বা ২৩১৯৩০ বিঘা জমিতে কার্পাসের চাষ হইয়াছিল। ইহা সমগ্র ভারতের কার্পাস চাবের ৩-২ ভাগ মাত্র।

বাঙ্গালায় যে তুলা উৎপন্ন হইতেছে, ভারতের অন্য প্রদেশের তুলা না পাইলে তদ্দারা বাঙ্গালীর বস্ত্রের অভাব আংশিক ভাবেও দূরীভূত হয় না। ৫০১২২৫৫০ জন বঙ্গবাসীর পক্ষে যদি গড়পড়তা হিসাবে বৎসরে এক রসর করিয়া কাপড় ধরা যায়, তবে আমরা দেখি, প্রতিবৎসর অন্ততঃ ১২৫৩০৬৪৴০ মন তুলা লাগে।

বঙ্গদেশে মোট উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ৯৩৩০৫ মণ। এ স্থানে এই উৎপন্ন তুলা ছাড়িয়াও ১১॥০ লক্ষ মণ অধিক তুলা বাহির হইতে আনিতে হয়। মোট কথা বাঙ্গালী এবিষয়ে পরপ্রত্যাশী।

বাঙ্গালার এই মোট ৯৩৩০৫ মণ উৎপন্ন তুলার মধ্যে আমরা দেখি—৭২৬৬০ মণ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে, ১১২৮০মণ ত্রিপুরারাজ্যে, ৬৫৬০ মণ ময়মনসিংহ জেলায়, ২১০০ মণ বাকুড়া জেলায় এবং মেদিনীপুর জেলায় মাত্র ১৫৴০ মণ। এছাড়া বাঙ্গালার অন্যান্য জেলায় তুলা উৎপন্ন হয় না।

আহারের দিক দিয়া দেখিলে যেমন বাঙ্গালায় চাউলের অভাব নাই, বস্ত্রের অভাব কিন্তু লাগিয়াই আছে। বাঙ্গালার এই পরিধেয়-সমস্যা বিশেষ আলোচনার বিষয়। আহারের সংস্থান ঠিক রাখিয়া বস্ত্রের জন্য বাহিরের সাহায্য গ্রহণ বাঙ্গালীর কার্য্য নহে। স্মরণাতীত প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে ইংরেজ-রাজত্বকাল সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গবাসী পরিধেয়ের জন্য বাহিরে হাত পাতিয়া দাঁড়ায় নাই—তাহারা তাহাদের নিজেদের সংস্থান রাখিত এবং এবিষয়ে বিশেষ সাবধানীও থাকিত। যে বাঙ্গালী বস্ত্র-শিল্পের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল, আজ তাহার চরম পরিণতি কোথায় দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই বস্ত্র-সঙ্কট তুলার অভাবজাত। তুলার চাষই এখন একান্ত প্রয়োজনীয়।

ভারত ও ব্রহ্মের খদ্দর :—

১৯২৯—৩০ সাল অপেক্ষা ১৯৩০—৩১ সালে খদ্দরের প্রসার ও উন্নতি হইয়াছে অনেক বেশী। নিখিল-ভারত কাটুনী-সঙ্ঘের সেক্রেটারীর বিবরণে আমরা এবিষয়ের সম্যক প্রমাণ পাই। ১৯৩১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর

পর্য্যন্ত যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় কোন প্রদেশে কত টাকার খাদি উৎপন্ন ও বিক্রী হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

উৎপাদন

	প্রদেশ	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১
(১)	আসাম	...	৩৭৪১২
(২)	অনধ্র	৮০২৮৩৭	৭৭২৩২০
(৩)	বিহার	৪০১৩৫৯	৩৫৯১৮৫
(৪)	বাঙ্গালা	৪৮৬৭৪৭	২৭৭৩৪৮
(৫)	বোম্বাই	...	
(৬)	ব্রহ্ম	...	
(৭)	গুজরাট	৪৬৬১৭	৮২৫০০
(৮)	কর্ণাটক	৯৮৮০০	২৩৮৬৮১
(৯)	কাশ্মীর	২২২৮০২	১৫০৪৭৭
(১০)	মহারাষ্ট্র	১১৯৮৯৫	১৩২১৭৭
(১১)	পাঞ্জাব	৩০৩৮৯২	২৯১ ৪৩
(১২)	রাজস্থান	৪৮৬২৬৮	৩২৩৮২০
(১৩)	সিন্ধু	...	৩০৪৫৬
(১৪)	তামিলনাড়ু এবং কেরল	১৬২৪৪১১	২৩৯৭৯৩২
(১৫)	যুক্তপ্রদেশ ও দিল্লী	৮১৪৩২০	৬২২৮৪০
(১৬)	উৎকল	৭৫১৬২	৬৩২১২
	মোট	৫৪৯১৬১০	৫৭৮১৮৫২

বিক্রী

	প্রদেশ	১৯২৯-৩০	১৯৩০-৩১
(১)	আসাম	...	১৫০৮১
(২)	অনধ্র	৮২৫০০১	৭১৬৮০
(৩)	বিহার	৪৫০০৯৬	৩১৪২৯৭
(৪)	বাঙ্গলা	৮৯৫৮৩৩	৫৭১৮৯৬
(৫)	বোম্বাই	৫৩৬৪৭২	৬৪৫৩৯৫
(৬)	ব্রহ্ম	৩৯৬২৪	২৫৫৭৭
(৭)	গুজরাট	২৭৬৮৫৬	৩১৯৯৮১
(৮)	কর্ণাটক	৪৪৪২৩২	৩৮৮২১১
(৯)	কাশ্মীর	৭৬৭৫৬	১০৫৭৪৮
(১০)	মহারাষ্ট্র	৪০৬৯৯৬	২৫৭৬১৫
(১১)	পাঞ্জাব	২৬৭৮২৬	২২৪২২২
(১২)	রাজস্থান	২১২৩১৩	১৪৩৬০৭
(১৩)	সিন্ধু	১০৪৬৭৪	৯৯১৩৩
(১৪)	তামিলনাড়ু এবং কেরল	১১৯৬৬০৭	১৯২৮৩০০
(১৫)	যুক্তপ্রদেশ ও দিল্লী	৭৮৮২১৭	৭১৬৩৭৭
(১৬)	উৎকল	১০০৬৬৬	৫৮৮২৬
	মোট	৬৬১৯৮৬৯	৬৫৩১০৪

সুতরাং দেখা যাইতেছে ১৯২৯—৩০ সাল অপেক্ষা ১৯৩০—৩১ সালে খদ্দর বিক্রী হইয়াছে ৮৮৮২৩ টাকার বেশী। বাঙ্গালা, অন্ধ্র, যুক্তপ্রদেশ এই তালিকায় অসম্পূর্ণ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার গোলযোগ সত্ত্বেও ১৯৩০ সনের তুলনায় উৎপাদন ও বিক্রীর মোট পার্থক্য বজায় আছে। কয়েকটী প্রদেশে সংখ্যায় যে অল্পতা দেখা যাইতেছে, তাহার কারণ, বাজার চাহিদা না থাকায় উৎপাদন কমাইয়া দেওয়া। আরও বিশেষ কারণ ১৯৩০—৩১ সালে খাদির মুল্য কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল ও রাজস্থান, যুক্তপ্রদেশ প্রমুখ কোন কোন প্রদেশে শতকরা ২৫ টাকা মুল্য হ্রাস করা হইয়ছিল। খাদি উৎপাদন ও বিক্রী বিষয়ে তামিলনাড়ুর উন্নতি লক্ষ্যনীয়।

---:*:---

আলাপ-আলোচনা

ভারতীয় নরনারীর আচরণ-সম্বন্ধ—

সচিত্র 'টাইম্‌স অফ্ ইণ্ডিয়া'—সাপ্তাহিক পত্রে রোহিণী নাম দিয়া একজন ভারতবর্ষীয় আমাদের স্ত্রী-পুরুষগণের আচরণ-সম্বন্ধে কয়েকটী কৌতূহলোদ্দীপক কথা লিখিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালায় তাহার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিলাম। তিনি বলিয়াছেন, "একজন ইউরোপীয় মহিলা একদিন আমাকে বলেন, 'ভারতের যে সব পুরুষ ইউরোপে কখনও যায় নাই, তাহারা আদব-কায়দা জানে না।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার এমন কথা বলিবার অর্থ কি?' তিনি উত্তর করিলেন, 'স্ত্রীলোকের সম্মুখে ঠিক কি প্রকার আচরণ করিতে হয় তাহা তাহারা জানে না। স্ত্রীলোকেরা ঘরে ঢুকিলে পুরুষরা দাঁড়াইয়া উঠে না বা গিয়া দরজা খুলিয়া দেয় না। তাহাদের 'শিভ্যাল্‌রি' (শৌর্য্য ও শিষ্টাচারের সহিত নারী-সম্মান রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি) নাই।

* * *

উত্তরে আমি বলিলাম, 'ইউরোপের পুরুষদেরও আজকাল এবিষয়ে শৈথিল্য দেখা যাইতেছে। আধুনিক মহিলারা পুরুষদের সহিত সমতা দাবী করার কাল হইতেই পুরুষরা আর স্ত্রীলোকদের প্রতি 'শিভ্যাল্‌রি' দেখাইবার চেষ্টা করেন না। আমি ইংলণ্ডে অবস্থান করিবার সময় দেখিয়াছি যে পুরুষরা মেয়েদের স্থান ছাড়িয়া দেন না, নিজেরা সাধারণের ব্যবহারের যানের মধ্যে আরাম করিয়া স্ব স্ব আসনে বসিয়া থাকে, চামড়া ধরিয়া স্ত্রীলোকরা ঝুলিতে থাকে। আপনি কেবল ভারতীয় পুরুষদেরই দোষ ধরিতেছেন, ইউরোপীয় পুরুষদের সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন না কেন?' তিনি বলিলেন, 'সে স্বতন্ত্র কথা, আমাদের মেয়েরা এরূপ ব্যবহার চাহিয়াছিল, তাই আমাদের পুরুষরা এবিষয়ে উদাসীন হইয়াছেন।

* * *

ভারতবর্ষের পুরুষেরা কিন্তু যে নারীদের প্রতি উদাসীন তাহার কারণ ইহা নহে যে, নারীরা পুরুষদের সহিত সমান হইবার দাবী করিতেছে। নারীদের প্রতি এমন করা পুরুষরা তাহাদের মর্য্যাদার পরিপন্থী বলিয়া বিবেচনা করে, সেই *জন্য* তাহারা নারীদের প্রতি মনোযোগ দেয় না। স্ত্রীলোকদের প্রতি তাহাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা না থাকায় তাহারা তাহাদের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করে।'

* * *

আমি বলিলাম, 'আপনার এ ধারণা একেবারে ভুল, ভারতবর্ষের নারীদের প্রতি পুরুষরা যথেষ্ট শ্রদ্ধান্বিত। পাশ্চাত্য আদব-কায়দার অনুসরণে তাহারা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আচার-ব্যবহার করে না বলিয়া একথা ঠিক নয় যে তাহারা নারীদিগকে ঘৃণা করে। তাহাদের নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী তাহারা মহিলাদিগকে সম্মান দেয় এবং তাহাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করে।' তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'তাহা হইলে বেড়াইবার সময় পুরুষরা কেন মেয়েদের অনেক আগে আগে চলে, কোথাও যাইবার সময় তাহারা লাট সাহেবের মত কেন যায়, জিনিসপত্র নারীরাই বহন করে?'

* * *

আমি উত্তর দিলাম, 'কারণ বহুকাল ধরিয়া এমন প্রথাই চলিয়া আসিতেছে এবং নারীরাও এইরূপ চায়, অন্ততঃ সনাতনপন্থী মহিলারা পুরুষদের আজ্ঞাবহ হইয়াই থাকিতে ইচ্ছা করে। তাহাদের ধর্ম্ম তাহাদিগকে পুরুষদের বাধ্য হইয়া থাকিতে শিখায়, তাহারা ইহাকে নারীর মাধুর্য্যরূপেই গণ্য করে। স্বামী কোন স্থান হইতে ফিরিতে রাত করিলে সেইজন্য সাধ্বী হিন্দু-স্ত্রী কখনও তিনি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে নিদ্রা যায় না; সেই জন্যই সে বাড়ীর সকল পুরুষের ভোজন শেষ না হইলে আহার করে না। সে স্বামীকে এমন শ্রদ্ধা করে যে কথা-বার্ত্তার মধ্যে তাঁহার নাম সে করে না।

* * *

স্বামী দাঁড়াইয়া থাকিলে সাধ্বী স্ত্রী কখনও আসন গ্রহণ করে না, বেড়াইবার সময় তাহার পশ্চাতে চলা উচিত বলিয়াই সে মনে করে, তাই পশ্চাতে চলে। এমন বিশ্বাসও আছে যে পুরুষের ছায়াও স্ত্রীলোকের উপর পড়া উচিত নয়; সুতরাং পুরুষদের আদব-কায়দা নাই বলা চলে না, কারণ পাশ্চাত্য আদব-কায়দায় অজ্ঞ হইলেও তাহারা স্বদেশের আচার-ব্যবহার ভক্তির সহিত অনুসরণ করে।'

* * *

আমার ইউরোপীয় বান্ধবীটী বলিলেন, 'আপনার কথাই হয় তো ঠিক, কিন্তু আমাদের পক্ষে ভারতীয় আচার-ব্যবহার দুর্ব্বোধ্য।' আমি আপনার মনেই ভাবিতে লাগিলাম ইংরেজরা আমাদের আচার-ব্যবহার বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহারা আমাদের শিষ্টাচারহীন বলিবে তার আর আশ্চর্য্য কি। আমরা যখন জনসাধারণের মধ্যে উঁহাদের দেশের স্ত্রীপুরুষদের অবাধ মেলা-মেশা পছন্দ করি না, উঁহাদের চোখেও তেমনই আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের আর পুরুষদের বিচ্ছিন্নভাব বিসদৃশ ঠেকে। সেই জন্য যে ভারতবর্ষের লোক, সে কখনও তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে স্ত্রীকে 'প্রিয়তমা' বলিয়া সম্বোধন করিবার কল্পনাও করিতে পারে না। ইউরোপীয়েরা ভারতীয় পরিবারের জীবন-যাত্রা-সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞানলাভ করে না বলিয়াই তাহাদের পক্ষে ধারণা কঠিন যে হিন্দু পুরুষ অন্তরের সহিত নারীকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান দেয়।

* * *

যে মহিলা ভারতের বাহিরে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে বা বিলাতী-সমাজে মিশিয়াছে তাহার কাছে দস্তুরমত ভারতীয় আচার-ব্যবহার অভদ্র ও অশিষ্ট ঠেকে; তবে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, ভারতীয় পুরুষদের আচার-ব্যবহারের দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; ইহার কারণ, নারীরা তাহাদের নিকট হইতে এই পরিবর্ত্তনের দাবী করিতেছে। পুরুষরা এখন আর তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের এ কথা বিশ্বাস করে না যে ত্রিভুবনে এমন কোনও নারী নাই যে নিজেকে নিজের কর্ত্রী বলিয়া ভাবিতে পারে। বিশ্বাস করে না যে বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্দ্ধক্যে সন্তানেরাই তাহাকে রক্ষণ ও পোষণ করিবে এবং স্ত্রীলোক যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, কখনও স্বাধীন হইতে পারিবে না।

* * *

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের নারীদের সম্বন্ধে এই সব উক্তি হয়তো প্রযুজ্য হইত। কিন্তু আজ তাহারা ডাক্তার হইতেছে, শিক্ষয়িত্রী হইতেছে, ধাত্রী হইতেছে, এমন কি ব্যবহারজীবও হইতেছে, নিজের জীবিকা অর্জ্জন নিজেরাই করিতেছে। এখন আর বলা চলে না যে ইচ্ছা করিলেও নারী কখনও স্বাধীন হইতে পারে না। নারীদের পদোন্নতি হইতেছে, অতএব বাধ্য হইয়া পুরুষকে এই অর্থ-লোভী জগতে নারীদের গণ্য করিতে হইতেছে সহ-কর্ম্মীরূপে, আলয়ের মধ্যে অবস্থিত অসূর্য্যম্পশ্যারূপ মূঢ় জীব হিসাবে নয়। অধিকন্তু পাশ্চাত্য রীতি-নীতি দ্রুত এখানে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—সনাতন-পন্থী হউক বা নাই হউক অচিরেই প্রত্যেক লোকেরই আচার-ব্যবহার এমন হইবে যে আর ইউরোপীয়গণের তাহা বিসদৃশ বলিয়া মনে হইবে না; কিন্তু ভারতবর্ষে তেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় কি না ইহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।"

* * *

ভারতীয় ভাস্করের কৃতিত্ব—

বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত আর পি, কামাৎ একটী সুন্দরী রমণীর ছোট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বিলাতে 'রয়্যাল একাডেমী' হইতে ছয় শত টাকা ও একটী রৌপ্যপদক লাভ করিয়াছেন। ভাস্কর্য্যের জন্য কোনও ভারতীয়ের এমন পুরস্কার-লাভ এই প্রথম। ভারতের শিল্পীরা ভারতের বাইরেও যশস্বী হইলে দেশবাসীর আনন্দের কথা।

* * *

দেশীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সাফল্য—

'বেঙ্গল ইমিউনিটী কোম্পানীর'র যশ পাশ্চাত্য দেশ সমূহেও প্রসারিত হইয়াছে জানিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ

করিলাম। বহু বিদেশী সম-ব্যবসায়ীদের তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও যে এই কোম্পানি স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, বাঙ্গালী পরিচালকদের ইহা বিশেষ কৃতিত্বের কথা। 'ওয়ালিন' নামক বহুমূত্র-রোগের যে নূতন ঔষধ কোম্পানী প্রস্তত করিয়াছেন—তার কার্য্যকারিতার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে শুধু এদেশেই নহে লণ্ডন এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানেও ইহা ব্যবহৃত হইতেছে।

* * *

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল-কেমিক্যাল দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। উহার অনুসরণে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভেষজ প্রস্তত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল যে সকল বাঙ্গালী কোম্পানি তাহাদের মধ্যে এই কোম্পানিও যে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে, ইহাতে আমাদের ব্যবসাত্মিকা বুদ্ধি যে আছে ইহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমরা আশা করি এই দেশীয় ব্যবসায়ী ভারতবাসীদের উৎসাহ ও সাহায্য লাভ করিয়া উত্তরোত্তর অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া সাফল্য-গৌরবে মণ্ডিত হইবে।

* * *

হিন্দুনারী-কল্যাণ-আশ্রম

'হিন্দু অবলা-আশ্রম' সম্পর্কে তদন্তের পর বাংলা-দেশে অসহায়া নারীদিগের রক্ষার জন্য ৮ই নভেম্বর রায় নন্দলাল ও পশুপতি নাথ বসু মহাশয়দের ভবনে যে সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহারই ফলে বেলগেছিয়া ট্রাম ডিপোর নিকট ১১ নং কুণ্ডুলেনে "হিন্দু নারী-কল্যাণ-আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অবলা-আশ্রমের ৬৩জন অধিবাসিনীকে লইয়াই এই আশ্রমের সূত্রপাত হইয়াছে। এইরূপ আশ্রমের আবশ্যকতা সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। আমরা কয়েকমাস পূর্ব্বেও এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। মাতৃ-জাতির কল্যাণের জন্য এইরূপ আশ্রম যাহাতে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয় তাহাতে বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে প্রত্যেক হিন্দুর—অবস্থিত বলিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীরই সাহায্য করা প্রয়োজন। আর কলিকাতা মহানগরীতে হিন্দুরা যদি এরূপ প্রয়োজনীয় একটী অনুষ্ঠান চালাইতে না পারেন, তাহা হইলে অগৌরবের আর সীমা থাকিবে না। এ-সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু না বলিয়া এই আশ্রমের পক্ষ হইতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ নিবেদক দিগের প্রচারিত পত্রিকা খানি পত্রস্থ করিয়াদিলাম :—

দেশবাসীর প্রতি নিবেদন

কালের প্রবাহে সনাতন একান্নভুক্ত প্রথা বিলুপ্ত হওয়াতে শত শত হিন্দু-নারী নিতান্ত নিঃসম্বল হইয়াছে। পৃথিবীতে ইহাদের কোন আশ্রয় বা স্থান নাই। গ্রামে ও নগরে চরিত্রহীন ও দুর্দ্দান্ত লোকেরা কখনও একাকী, কখনও বা দলবদ্ধ হইয়া সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞা বিধবা, সধবা বা কুমারীদিগকে কুলের বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহারা সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা কখনও বা দুর্ব্বৃত্তের ভোগ্যা হইয়া মহাদুঃখে জীবন-যাপন করিতেছে। কখনও বা পতিতার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাজের কলঙ্ক বৃদ্ধি করিতেছে।

'হিন্দু অবলা-আশ্রমে'র তদন্তের পর বাংলার অসহায়া নারী-রক্ষার জন্য ও তাহাদিগকে ধর্ম্মনীতি ও শিল্প-শিক্ষা দান করিয়া স্বাবলম্বী করিবার জন্য অচিরে এক নারী সদন স্থাপন করা প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা অনুভব করিয়া গত ৮ই নভেম্বর রায় ৺নন্দলাল ও পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের ভবনে বিরাট সভায় জনসাধারণ সমবেত হইয়া একটী নূতন আশ্রম স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে "হিন্দু নারী-কল্যাণ-আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ঐ আশ্রমটীর সুপরিচালনের জন্য কতিপয় স্বনামধন্য ব্যক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন এবং কয়েকজন কর্ম্মী আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

যাঁহারা নারীর ধর্ম্ম ও মান রক্ষা করিতে চান, তাঁহাদিগকে এই মহৎ কার্য্যে যোগদান করিতে নিমন্ত্রণ করিতেছি। অসহায়া নারীদিগের আশ্রমের জন্য একটী ভবন নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তাহাদিগের আহার্য্য ও পরিধেয়-সংস্থান এবং সৎশিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। আশা করি হৃদয়বান ব্যক্তিরা আপনাদিগকে ক্লিষ্ট করিয়া এই অনুষ্ঠানে মুক্তহস্তে সাহায্যদান করিবেন।"

* * *

আমরা আশা করি, এই দুর্ব্বৎসরেও প্রত্যেক হিন্দুপরিবার যৎসামান্য সাহায্য করিয়া এই সদনুষ্ঠানটীকে সুশৃঙ্খলতার সহিত চালিত করিবার সহায়তা করিতে কার্পণ্য করিবেন না। কর্তৃপক্ষদের নামেই বুঝিতে পারা যাইতেছে চিন্তাবীর, কর্ম্মবীর ও তৎসহ পুরুষে একত্র সম্মেলনে এই নব-প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান সাফল্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হইবে।

* * *

লোকান্তরে

৺বরদা প্রসাদ বসু

সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী বরদাপ্রসাদ বসু মহাশয়ের পরলোক-গমনে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। 'বাঙ্গবাসী পত্রিকায়' প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরলোকগমনের পর হইতে তাঁহার পদানুসরণ করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বরদাবাবু কৃতিত্বের সহিত পত্রিকাখানি পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দু-বাঙ্গালীর মুখপত্র-রূপে পত্রিকাখানি যেভাবে যোগেন্দ্রবাবুর আমলে প্রকাশিত হইত, সেই ধারা বরদাবাবু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাগজখানি প্রকাশিত করিতেন। 'বঙ্গবাসী' তাঁহার কর্ম্মকুশলতার বিশিষ্ট পরিচয় দিয়া আসিতেছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ক্রম মাত্র ৪২ বৎসর হইয়াছিল।

* *

৺যোগেশচন্দ্র সিংহ

গত ১৩ই পৌষ মঙ্গলবার রাত্রি ১০টার সময় কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাহিত্যের অকৃত্রিম অনুরাগী যোগেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ক্রম ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। পাইকপাড়া রাজষ্টের একজিকিউটার স্বরূপে তিনি ষ্টেটের প্রভূত মঙ্গল-সাধন করিয়াছেন। কায়স্থ-সমাজের ও বৈষ্ণব-সমাজের উন্নতিকল্পে তাঁহার বহুতী চেষ্টা সুফল আনয়ন করিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার খানসাম পাঁচথুপী গ্রামের জনহিতকর সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলেই তাঁহাকে অগ্রণী হইতে দেখা যাইত সাহিত্য-চর্চ্চায়ও তিনি অবহিত ছিলেন। সৎ-সাহিত্যের পোষকরূপেও আমরা তাঁহার নিকট হইতে অনেকগুলি পুস্তক পাইয়াছি; তন্মধ্যে "কালের স্রোত" গ্রন্থখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

* *

সভ্যতার প্রবর্ত্তক কাহারা

বিশ্বসভ্যতার যাঁহারা আদি প্রবর্ত্তক, সংস্কারক এবং প্রচারক তাঁহাদের নাম, ব্যক্তিত্ব, যুগান্তরকারী অবদান, জাতি এবং প্রকৃত আবির্ভাবকাল এতদিন ইতিহাসজ্ঞ মনীষিগণের কল্পনার বিষয় ছিল। এশিয়া-মাইনর, মেসোপোটেমিয়া, ভারতবর্ষ, ইজিপ্ট, দানিউব্ উপত্যকা এবং প্রাচীন বৃটেনে অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব এমন কতকগুলি সমাধিস্তম্ভোৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে যাহা হুবহু সাহিত্যিক ঐতিহ্যের দিক দিয়া মিঃ এল, এ, ওয়াডেল তাঁহার নবপ্রকাশিত "দি মেকার্স অফ সিভিলিজেসন ইন রেস্ এণ্ড হিষ্ট্রী" নামক গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন।

আর্য্য, নর্ডিক বা সুমেরীয় জাতির উত্থান এবং অধিষ্ঠানভূমির কথা যাহা এতদিন অজ্ঞাত ছিল, তাহা এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। ইহা হইতে আরও জানা যাইতেছে,—তাহাদের সভ্যতার ভিত্তিপত্তন ও প্রচারের কথা; ইজিপ্ট (প্রাগ্‌বংশীয় এবং প্রাচীন বংশীয়, ক্রিট, ইণ্ডো-পারস্য ও প্রাচীন ইউরোপে এই সভ্যতা-বিস্তারের কথা; তাহাদের প্রধান নরপতিদিগের ক্রিয়াকলাপ ও কতিপয় সমসাময়িক ঘটনার চিত্র; আদম, কেন, এনক্, নোয়া, নিমরড্ ও প্রমিথিউ তথা প্রধান প্রধান পৌরানিক দেবদেবতা এবং প্রাচীন সাহিত্যের বীরবৃন্দের উৎপত্তি ও যুগপরিচয়; এড্ডা-মহাকাব্যের ওডিন-থরের কথা; রাজা আর্থার ও তাঁহার পারিষদবর্গ এবং হোলি গ্রেলের কথা; কাপাডোসিয়া ও ইংলণ্ডের রেড্‌ক্রশ্‌ধারী আসল সেণ্ট্ জর্জ্জের কথা। এক কথায়, সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক যুগ ঐতিহাসিক কালাবদ্ধ হইয়াছে।

পুস্তকখানি শিক্ষিত পাঠকসাধারণ এবং ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ্, রাজনৈতিক, জাতিবিজ্ঞানাভিজ্ঞ, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ তথা শিল্প-সাহিত্য-পুরাণ-বিজ্ঞান ও তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্বের সাধকের সহায়তাকল্পেই প্রণীত হইয়াছে।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক বিশ্বভাণ্ডার প্রেস, ২১৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত
এবং পঞ্চপুষ্প-কার্য্যালয়, ৩১ ভেলিপাড়া লেন হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পঞ্চপুষ্প

আশ্রয়

শিল্পী—শ্রীহাসিরাশি দেবী।

[প্রবর্ত্তকের সৌজন্যে]

জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া প্রেস, কলিকাতা।

"আমরা এনেছি শেফালি গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালী মালা—" রবীন্দ্রনাথ

* শারদ-প্রাতে আমাদের অভিনব উপন্যাসের ডালি *

* দানে অসীম তৃপ্তি— গ্রহণে অপূর্ব্ব পরিতোষ

* বিবিধ রসের এইরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয় খুব অল্পই দেখা যায়

—সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক—

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য-কুমার সেন গুপ্ত, প্রভৃতির লেখনীর অমৃত রসে মন প্রাণ সিক্ত হইবে

—আমাদের এক টাকা ও আট আনা সংস্করণের সচিত্র উপন্যাস সাহিত্য জগতে নবযুগের হাওয়া আনিয়া দিয়াছে। আমাদের উপন্যাসে আমোদ আছে, শিক্ষা আছে আর আছে কল্পনাশক্তির পরিপুষ্টির ব্যবস্থা। সচিত্র তালিকার জন্য আজই চিঠি দিন।

দেব সাহিত্য কুটীর—২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

আমাদের শিশুপাঠ্য গ্রন্থ-বিভাগ ভারতে সুপরিচিত

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের প্রাণে আনন্দের ঢেউ তুলিতে আমরা কিরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি তাহার পরিচয় লইয়া দেখুন।

আমাদের শিশুপাঠ্য পুস্তক যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি কৌতূহল জনক। বাংলা ভাষায় এমন সুন্দর পুস্তক আর নাই বলিলেই হয়

❋

আমাদের সুরঞ্জিত পুস্তকের তালিকার জন্য আজই পত্র লিখুন।

শিশু-সাহিত্যে

অভিনব অবদান

ছোটদের চয়নিকা

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু ও শ্রীযুক্তসুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত।

রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া শিশু-সাহিত্যের আধুনিক সকল কবির লেখা ইহাতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। শিশুদের শারদীয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার। সমস্ত বিখ্যাত শিল্পীদের বহুচিত্র সম্বলিত অত্যুৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হইতেছে।

দাম ১।৹ টাকা।

সুশোভন গল্পের বই, রূপকথা। কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী, হাসির কবিতা, জন্তু জানোয়ারের গল্প, পো-গল্প প্রভৃতি পাইলে ছেলে মেয়েরা আনন্দে দিশেহারা হইয়া যাইবে।

❋

শিশু সাহিত্যে যাঁহারা চিত্র আঁকিতে ওস্তাদ সেই সব শিল্পীর অদ্ভুত সুন্দর চিত্রে আমাদের পুস্তকের ভিতর বাহির সুসজ্জিত। মূল্য অত্যন্ত সুলভ।

❋

আমাদের তালিকার জন্য আজই পত্র লিখুন।

প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

ছন্দ-প্রসঙ্গ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

বাংলা ছন্দের ধ্বনির 'ইউনিট' বা ব্যষ্টি নির্দ্ধারিত হয় তিনটী বিভিন্ন উপায়ে। ধ্বনি-ব্যষ্টি নির্ণয়ের এই তিনটী পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলা ছন্দকে তিনটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—স্বরবৃত্ত (সিলেবিক), মাত্রাবৃত্ত (কোয়ান্‌টিটেটিভ্‌) এবং যৌগিক বা অক্ষরবৃত্ত। স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রত্যেকটী পর্ব্ব (মেজার) ইংরেজী ছন্দের ন্যায় মুখ্যতঃ ধ্বনি বা স্বরের অর্থাৎ সিলেব্‌ল্‌-এর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পর্ব্ব নিয়মিত হয় ধ্বনির মাত্রা পরিমাণ (কোয়ানটিটি অফ সাউণ্ড) এর দ্বারা। এ ছন্দে অযুগ্মধ্বনিকে লঘু বা একমাত্রিক এবং যুগ্মধ্বনিকে গুরু বা দ্বিমাত্রিক বলে গণ্য করতে হয়। আর প্রতিপর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা দ্বারাই এ ছন্দের আকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলার বহু প্রচলিত মামুলি ছন্দগুলিকে অক্ষরবৃত্ত নাম দিয়েছি, যেহেতু প্রচলিত প্রথায় দৃশ্যমান অক্ষরসংখ্যার দ্বারাই এ ছন্দের পরিমাপ করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু শুধু অক্ষর গণনার উপর ভিত্তি ক'রে কোনো ছন্দই রচিত হ'তে পারে না; কারণ ছন্দের মূলতত্ত্ব অক্ষর নয়, ধ্বনি। প্রকৃতপক্ষে বাংলার লিপিপদ্ধতিতে যদি যুক্তবর্ণের ব্যবস্থা না থাক্‌ত তবে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তিই হ'তে পার্‌ত না। পক্ষান্তরে যুগ্মস্বর (ডিপ্‌থঙ্‌) গুলিকে একাক্ষরের দ্বারা প্রকাশ করার ব্যবস্থা যদি বাংলায় থাক্‌ত তাহ'লেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের রূপ অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যেত। কিন্তু আপাততঃ অক্ষর গণণার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূলেও একটী ধ্বনিতত্ত্ব আছে, নতুবা এ রকম ছন্দ রচনা করাই সম্ভব হ'ত না। সে তত্ত্বটি এই—এ ছন্দের অন্তর্গত প্রত্যেকটী শব্দই (ওয়ার্ড) শেষাংশে মাত্রাবৃত্তধর্ম্মী এবং পূর্ব্বাংশ স্বরবৃত্তধর্ম্মী। সুতরাং অক্ষরবৃত্ত আসলে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের মিশ্রণজাত একটি যৌগিক ছন্দ।

যৌগিক বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের গতি অত্যন্ত মন্থর ও নিস্তরঙ্গ, এর ধ্বনি একঘেয়ে, যতি অনিয়মিত, এবং পর্ব্ববিভাগ অস্পষ্ট। এরূপ হওয়ার কারণ এই যে বহু শতাব্দী যাবৎ কবিদের অজ্ঞাতসারেই খাঁটি প্রাকৃত বাংলার স্বরবৃত্তধ্বনি, সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ এবং সঙ্গীতের সুরের মিশ্রণে এ ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে। বহুদিনের বহু অভ্যাসের স্তর উদ্‌ঘাটিত না করলে এ ছন্দের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বাংলা ভাষার যথার্থ রূপটা চাপা পড়ে গেছে; ভাষার ধ্বনি-বৈচিত্র্য এ ছন্দে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়, এ ছন্দ ধ্বনিবৈচিত্র্য-হিসেবে অত্যন্ত নিস্তরঙ্গ ও একঘেয়ে। অক্ষরবৃত্তের এই ত্রুটি সংশোধন করার জন্যে বহুকাল যাবৎ, বিশেষতঃ ভারতচন্দ্রের সময়ে থেকে, বিশেষ চেষ্টা চল্‌ছে। তখনকার কবিরা সংস্কৃত ছন্দের আশ্রয় নিয়েই বাংলা ছন্দে বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনি বাংলভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব'লে তাঁদের সকল চেষ্টাই বিফল হয়েছে। অবশেষে যখন রবীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রবর্ত্তন করলেন তখন থেকেই বাংলা ছন্দে বহু বৈচিত্র্য ঘটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ থেকে কি ভাবে স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তি হ'ল এ প্রবন্ধে তাই দেখাতে চেষ্টা করব।

এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি যে শুধু দৃশ্যমান অক্ষরের সংখ্যা গুনে কোনো সত্যিকারের ছন্দ রচনা করা সম্ভব নয় এবং তথাকথিত 'অক্ষর'বৃত্ত ছন্দের মূলেও শুধু অক্ষরসংখ্যাটাই আসল তত্ত্ব নয়। যদি বাংলাভাষার যুক্ত ব্যঞ্জনগুলিকে বিযুক্ত ক'রে লেখা যায়, কিংবা বিযুক্ত যুগ্মস্বরগুলিকে যুক্ত করে লেখা হয় তবেই দেখা যাবে এছন্দে প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যমান অক্ষরের সংখ্যাসাম্যই মূল কথা নয়; কারণ তা হ'লে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সর্ব্বত্রই অক্ষরসংখ্যার বৈষম্য দেখা দেবে অথচ ছন্দ ঠিকই থাকবে। মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তও অক্ষরসংখ্যার উপর নির্ভর করে না; তাই বাংলার যুক্তব্যঞ্জনকে বিযুক্ত করলে কিংবা বিযুক্ত স্বরকে যুক্ত করলেও এ দুই ছন্দে কোনো পরিবর্ত্তন হবে না; এরা যেমন আছে তেমনই থাকবে।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে প্রত্যেক শব্দের প্রথমাংশ স্বরবৃত্তের স্বধর্ম্মী আর শেষাংশ মাত্রাবৃত্তের স্বধর্ম্মী। সুতরাং বলা বাহুল্য যে এ ছন্দের শব্দগুলির শেষাংশেও যদি ধ্বনি-'সংখ্যা'র রীতি চালানো যায় তবেই আমরা পাব স্বরবৃত্ত ছন্দ; আর শব্দগুলির প্রথমাংশেও যদি ধ্বনি-'মাত্রা'র রীতি চালানো যায় তবেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উৎপত্তি হ'বে। আসলেও বাংলা সাহিত্যে এ দুটী ছন্দের আবির্ভাব এ ভাবেই হয়েছে। দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হ'বে। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলায় শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে সর্ব্বদাই এক 'ইউনিট' গণনা করা হ'ত। রবীন্দ্রনাথও অল্প বয়সের রচনায় সর্ব্বত্রই শব্দমধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে এক 'ইউনিট' হিসেবেই গণ্য করেছেন। যথা—

+
বসন্ত বাতাসে আঁখি মুদে আসে,
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস,
গায়ে এসে যেন এলায়ে পড়িছে
কুসুমের মৃদুবাস

* * *

আমার যৌবন-কুসুম-কাননে
ললিত চরণে বেড়াবে না?
আমার প্রাণের লতিকাবাঁধনি
চরণ তাহার জড়াবে না?

—জাগ্রত স্বপ্ন, ছবি ও গান, রবীন্দ্রনাথ

এ ছন্দটী হচ্ছে ছয়-ছয়-আট 'অক্ষরে'র সুপরিচিত লঘু ত্রিপদী, শুধু শেষ দুটী পংক্তিতে দুটী করে বেশী অক্ষর আছে। এখানে শব্দের মধ্যবর্ত্তী দুটী মাত্র ধ্বনি (ঢেরা চিহ্নিত) যুগ্ম অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক, প্রথমটী (সন্) ব্যঞ্জনান্তিক এবং দ্বিতীয়টী (যৌ) স্বরান্তিক; বাকি সবগুলি ধ্বনিই অযুগ্ম সুতরাং একমাত্রিক। একটু লক্ষ্য করলেই টের পাওয়া যাবে ঐ ঢেরা-চিহ্নিত স্থানদুটীতেই ছন্দের ধ্বনি যেন ঠিক শোনাচ্ছে না; ওই দুটী জায়গায়ই একটু দ্রুত উচ্চারণ করতে হয়, তবু শ্রুতিকটুতা ঘোচে না। এর কারণ হচ্ছে মাত্রাবৃদ্ধি। ওই দুটী পর্ব্বে বা পংক্তিচ্ছেদে একমাত্রা ক'মে কমিয়ে যদি লেখা হ'ত—

বসন্ত বায়ে | আঁখি মুদে আসে
এবং মম যৌবন- | কুসুম-কাননে

তা হ'লেই কিন্তু ওই দুটী যুগ্মধ্বনি শ্রুতি-কটু শোনাত না। 'মানসী'-রচনার যুগে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন, লঘুত্রিপদী-জাতীয় যে-সব ছন্দের প্রতিপর্ব্বে ছয়ের প্রাধান্য সে-সব ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে দুমাত্রার মর্য্যাদা না দিলে ছন্দ ঠিক থাকে না। তাই 'মানসী'র যুগ থেকেই রবীন্দ্রনাথ লঘুত্রিপদী-জাতীয় ছন্দে শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে এক না ধরে দুই ধরতে আরম্ভ করেন অর্থাৎ অক্ষর-সংখ্যা না গুনে ধ্বনি-'মাত্রা'র ওজন রক্ষা ক'রে লঘুত্রিপদী-জাতীয় ছন্দ রচনা করতে সুরু করেন। এভাবেই বাংলা কাব্যসাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের আবির্ভাব হয়েছে। ১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে রচিত 'ভুল-ভাঙা' নামক কবিতাটাই প্রকৃতপক্ষে বাংলাসাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত সর্ব্বপ্রথম কবিতা; কারণ এই 'ভুল-ভাঙা' কবিতাটীতেই সর্ব্বপ্রথমে শুধু অক্ষর গুনে ছন্দ-রচনার ভুল ভেঙেছে। অক্ষরবৃত্তের শিকল-ভাঙা সর্ব্বপ্রথম বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দটীর একটু নমুনা দিচ্ছি।—

চেয়ে আছে আঁখি, | নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহু-লতা শুধু | বন্ধন পাশ
বাহুতে মোর।

* * *

বসন্ত নাহি | এ ধরায় আর
আগের মতো;
জ্যোৎস্না যামিনী | যৌবন হারা
জীবন হত।

ভুলভাঙা, মানসী, রবীন্দ্রনাথ

শব্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনি যেখানে যেখানে দ্বিমাত্রিক হয়েছে তা দণ্ড-চিহ্নের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হ'ল। ওই 'বন্ধন' কথাটাই সর্ব্বপ্রথমে অক্ষরগুনতির বন্ধনপাশ ছিন্ন করেছে।

স্বরবৃত্ত ছন্দ বহুকাল যাবৎই ছেলে-ভুলানো ছড়া, বাউলের গান প্রভৃতি লোকসাহিত্যে ব্যবহৃত হ'য়ে আসছিল। কিন্তু প্রকৃত রসসাহিত্যে এ ছন্দ অনেক কাল পর্য্যন্ত স্থান পায় নি। রামপ্রসাদের গানেই এ ছন্দের সর্ব্বপ্রথম বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। তারপর নিধুবাবুর টপ্পা, ঈশ্বর গুপ্তের ও হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গকবিতা এবং মধুসূদনের প্রহসনেও এ ছন্দের সাক্ষাৎ মেলে; কিন্তু এসব দৃষ্টান্তগুলিও লোকসাহিত্যেরই অনুবর্ত্তন মাত্র; বিশুদ্ধ সাহিত্যে এঁরা এ ছন্দকে সযত্নে বর্জ্জন করেছেন; আর ওসব দৃষ্টান্তগুলিও অনেক স্থানেই বিশুদ্ধ স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত নয়;—কোথাও ছড়া পাঁচালির মতো ভাঙা-ভাঙা, কোথাও সাধুছন্দের সঙ্গে মিশ্রিত।

স্বরবৃত্ত ছন্দকেও রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে সাধু-সাহিত্যের আসরে অভিনন্দিত করেন। তাঁর পরিণত বয়সের রচনায় এ ছন্দেরই প্রাধান্য দেখা যায়। "ক্ষণিকা"র যুগেই তিনি এ ছন্দকে সর্ব্বপ্রথমে কবিতা রচনার একটী বিশিষ্ট বাহনরূপে ব্যবহার করতে সুরু করেন। সে সময় থেকেই এ ছন্দটী কবি-সমাজে খাঁটী বাংলা ছন্দ ব'লে আদৃত হ'য়ে আসছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষণিকায়ই এ ছন্দের সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার করেছেন, তা নয়। "ক্ষণিকা"র (১৩০৬ সাল) বহুকাল পূর্ব্বেই "ছবি ও গান"-এ (১২৯০ সাল) এ ছন্দের সর্ব্বপ্রথম রচনা দেখ্‌তে পাই। "ছবি ও গান"-এর স্বরবৃত্ত ছন্দের এই একটী বিশেষ মূল্য আছে যে, ওর থেকেই আমরা বুঝ্‌তে পারি স্বরবৃত্ত ছন্দ লোক-সাহিত্যের অনিয়মিত আকৃতি পরিত্যাগ ক'রে কিরূপে কাব্য-সাহিত্যে ব্যবহার-যোগ্য সুস্পষ্ট আকার ধারণ করেছে। একটী দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

একলা পাখী | গাছের শাখে |
কাছে তোর | বসে থাকে, |
সারা দুপুর | বেলা শুধু | ডাকে।
যেন তার | আর কেহ নাই, |
সারাদিন | এক্‌লাটি তাই |
স্নেহভরে | তোরে নিয়েই | থাকে।

—আদরিণী, ছবি ও গান, রবীন্দ্রনাথ

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটী দেখ্‌লেই বোঝা যায় যে ওটা আমাদের পরিচিত আট-আট-দশের দীর্ঘত্রিপদীর ছাঁচে ঢালা। বাস্তবিকপক্ষে উদ্ধৃত পংক্তিগুলির অনেক স্থলেই, বিশেষ-ভাবে ঢেরা-চিহ্নিত তিনটী স্থলে, অক্ষরবৃত্তের ধ্বনিও রয়েছে। স্বরবৃত্তের দিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলে ওই তিন জায়গায় ছন্দ-পতন হয়েছে। এরূপ হ'বার কারণ এই যে এখানে কবি আসলে ঠিক্ স্বরবৃত্ত রচনা করতেই চান নি; তিনি চেয়েছেন প্রচলিত দীর্ঘ-ত্রিপদী রচনা করতে। অথচ শব্দান্তস্থিত কয়েকটী যুগ্মধ্বনিকে (দণ্ড-চিহ্নিত) প্রয়োজনমত এক ইউনিট্ ব'লেও গণ্য করেছেন। তাই এখানে স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের একটা মিশ্রণ হয়েছে; "ছবি ও গান"-এ এরূপ এবং এর চেয়েও বেশি মিশ্রণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আরেকটী নমুনা দিচ্ছি—

+
ধীরে ধীরে প্রভাত্ হ'ল
আঁধারে মিলায়ে গেল,
উষা হাসে কণকবরণী,
বকুল গাছের তলে,
কুসুম রাশির পরে,
বসিয়া পড়িল সে রমণী।
আঁখি দিয়ে ঝর ঝরে
অশ্রুবারি ঝ'রে পড়ে
ভেঙে যেতে চায় যেন বুক,
+
রাঙা রাঙা অধর্ দুটী
কেঁপে কেঁপে ওঠে কতো,
করতলে সকরুণ মুখ।

—বিরহ, ছবি ও গান, রবীন্দ্রনাথ

এটী অক্ষরবৃত্ত দীর্ঘত্রিপদীর দৃষ্টান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঢেরা-চিহ্নিত দুটী স্থানে ব্যতিক্রম আছে; অর্থাৎ স্বরবৃত্তের ন্যায় এ দুটী জায়গায় যুগ্ম ধ্বনিকে এক ইউনিট ধরা হয়েছে। আসল কথা, অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও শব্দান্তস্থিত যুগ্মধ্বনিকে এক ইউনিট ব'লে ধরা যায় কি না রবীন্দ্রনাথ তাই পরীক্ষা কর্‌ছিলেন। এই পরীক্ষা-কার্য্যের ফলেই 'ছবি ও গান'-এ অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের কমবেশি মিশ্রণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই পরীক্ষা ও মিশ্রণের ফলেই রবীন্দ্রনাথ অবশেষে স্বরবৃত্ত ছন্দের আসল প্রকৃতির সন্ধান পেয়েছিলেন। 'ক্ষণিকা'য় আমরা তারই পরিচয় পাই। 'উৎসর্গে' স্বরবৃত্ত দীর্ঘত্রিপদীর পূর্ণাঙ্গ নিদর্শনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

একটী দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

অতি সুদূর দীর্ঘ পথে
আকুল তব আঁচল হ'তে
আঁধারতলে গন্ধরেখা রাখি'
জোনাক-জ্বালা বনের শেষে
কখন্ এলে দুয়ারদেশে
শিথিল কেশে ললাটখানি ঢাকি!

—৩৯, উৎসর্গ, রবীন্দ্রনাথ

সুতরাং দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথ মাত্রাবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ যেমন অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ভিতর থেকেই আবিষ্কার করেছিলেন, স্বরবৃত্ত ছন্দেরও সাহিত্যিক রূপের সন্ধান তেম্‌নি অক্ষরবৃত্তের মধ্যেই পেয়েছিলেন। কারণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত উভয়েরই মূলতত্ত্ব পাশাপাশি অবস্থিত আছে।

——:o:——

শ্রীকণ্ঠ

(গল্প)

শ্রীহরিপদ গুহ

মামাবাবু কি একটা কার্য্যোপলক্ষে নইনিতালে গিয়াছিলেন ; ফিরিবার সময় অনাথ যুবক শ্রীকণ্ঠকে সঙ্গে করিয়া আনেন। তাহার বয়স তখন বছর আঠার-উনিশ হইবে। শ্যামবর্ণ, ছিপ্‌ছিপে লম্বা চেহারা ; একমাথা ঘন কালো কোঁকড়া চুল ; চোখের নীচে একটা গভীর কাটা দাগ। ভাসা-ভাসা বড় দুটী চোখ। দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। সে মামাবাবুর নিকট বলিয়াছিল যে, তাহার কেহই নাই। মা-বাপের কথা তাহার ভাল করিয়া মনেই হয় না। কোন্ এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের কাছে থাকিয়া সে মানুষ হইয়াছে ;—সহসা সেই আত্মীয়ের মৃত্যুতে সে একেবারে নিরবলম্ব ও পথের ভিখারী হইয়া পড়িয়াছে। একটুখানি আশ্রয়ের জন্য সে মামাবাবুর নিকট কাঁদিয়া পড়িল। কোমল-প্রাণ মামাবাবু তাহার কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না ;—সঙ্গে করিয়া একেবারে কলিকাতায় আনিয়া হাজির হইলেন।

আমাদের কয়েকটী ছোট ছেলের ভার পড়িয়াছিল শ্রীকণ্ঠের উপর। প্রথম প্রথম আমরা তাহাকে একটু ভয়ের চ'খেই দেখিতাম ; দু'দিন পরেই কিন্তু তাহা একেবারে কাটিয়া গেল। প্রাণ খুলিয়া মনের আনন্দেই তাহার সঙ্গে মিশিতে লাগিলাম। সে আমাদের স্কুলে পৌছাইয়া দিয়া আসিত এবং ছুটির পরে গিয়া আবার লইয়া আসিত।

আমাদের বাড়ীর পিছনে একটা খালি জমি পড়িয়াছিল, সেখানে আমরা খেলা করিতাম। শ্রীকণ্ঠ আমাদের নিত্য নূতন খেলা শিখাইত, প্রতি খেলায় সে নিজেও যোগদান করিত। তাহার সহিত খেলিতে খেলিতে আমরা বয়সের পার্থক্যের কথা একেবারেই ভুলিয়া যাইতাম।

মাষ্টার মহাশয় পড়াইয়া চলিয়া গেলেও কিন্তু আমরা উঠিতে পারিতাম না ; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের বই লইয়া বসিয়া থাকিতে হইত। সেই সময় শ্রীকণ্ঠই হইত আমাদের মাষ্টার। ভুল পড়িলে সে তাহা সংশোধন করিয়া দিত। কাহারো ঘুম আসিলে কাতুকুতু দিয়া ঘুম তাড়াইত ; কখন কখন বা আস্তে আস্তে দুই একটা গাঁট্টা মারিত। আমরা কখনও কিন্তু এই সব কথা বাড়ীতে জানাইতে সাহস করি নাই ; কারণ সে আমাদের বড় ভালবাসিত, আর জানাইলেও যে বিশেষ কোন ফল হইত বলিয়া মনে হয় না ;—কারণ, মামাবাবুর কড়া-হুকুম ছিল—আমাদের শাসনে রাখিবার জন্য।

দুপুর বেলা শ্রীকণ্ঠ তাহার ঘরে বসিয়া বই পড়িত, কোন দিন বা নীরবে আপন মনে পাতার পর পাতা লিখিয়া যাইত। হঠাৎ কি করিয়া একদিন মেয়ে মহলে শ্রীকণ্ঠের লেখাপড়া জানার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল ; বাস্ আর যায় কোথা! তাহার আর একটা কাজ বাড়িয়া গেল। এখন তাহাকে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ডাকঘরে ছুটিতে হয়, আর সময় সময় দুই একখানি চিঠিও লিখিতে হয়।

সকলেই জানিল বটে—শ্রীকণ্ঠ লেখাপড়া জানে কিন্তু তাহার বিদ্যার পরিমাণ কতটা তখনও কেহ তাহা জানিতে পারে নাই। হঠাৎ মামাবাবু একদিন তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। সেই দিন বোধ হয় শনিবার। মামাবাবু সকাল সকাল বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। প্রথমেই তিনি শ্রীকণ্ঠের খোঁজ লইলেন। সে তখন বাড়ী ছিল না ; কি একটা প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছিল।

মামাবাবু মামীমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখো, এতদিন শ্রীকণ্ঠের উপর আমরা বড় অন্যায় আচরণ করে এসেছি ; অনেক পূর্ব্বেই তার সম্বন্ধে আমাদের খোঁজ লওয়া উচিত ছিল। সে বোধ হয় আমাদের কাছে তার সত্য পরিচয়

দেয় নি! কাল আমাদের ছোট সাহেব একটু জরুরী কাজে আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তো আর বাড়ী ছিলুম না; শ্রীকণ্ঠই সাহেবের সঙ্গে কথা কয়েছিল। আজ সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন—'বাবু, কাল যে যুবকটী আমার সঙ্গে কথা কয়েছিল, সে তোমার কে হয়? কি করে সে? বেশ সুন্দর ইংরেজী বল্‌তে পারে তো!'

মামীমা বলিলেন—'একথা তো তোমায় আমিও একদিন বলেছিলুম যে শ্রীকণ্ঠ ভদ্রলোকের ছেলে, বড় সুন্দর স্বভাব।'

মামাবাবু আর কিছু বলিলেন না।

এই ঘটনার কিছুদিন পর আমাদের প্রাইভেট মাষ্টারের জবাব হইয়া গেল, আর শ্রীকণ্ঠই আমাদের পড়াইতে লাগিল।

শ্রীকণ্ঠকে সকলেই বেশ স্নেহ করিত, শুধু তাহাকে দেখিতে পারিত না মামাবাবুর শ্যালক প্রকাশ। প্রকাশ শ্রীকণ্ঠ অপেক্ষা বছর খানেকের বড়। থার্ডক্লাসে তিনবার ফেল করিয়াছে সে। লুকাইয়া লুকাইয়া বিড়ি খায়, পড়িতে বসিয়া বইয়েতে টোকা মারিয়া শব্দ করে—'তেড়ে কেটে তাক্‌।'

এক নম্বরের ফাজিল ছেলে সে!

শ্রীকণ্ঠ যখন মাষ্টার হইল, প্রকাশ একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া গেল। সে মামীমার নিকট জানাইল যে, ঐ চাকরটার কাছে সে পড়িতে পারিবে না। মামাবাবু শুনিয়া এক ধমকে তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিলেন।

শ্রীকণ্ঠের কাছে তাহাকে পড়িতেই হইল। পড়িতে বসিয়া সে নানারূপ দুষ্টামি আরম্ভ করিল; শ্রীকণ্ঠকে ঠকাইবার জন্য সে নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল; কিন্তু কোনটাতেই সে তাহাকে জব্দ করিতে না পারিয়া মনে মনে আরও ক্ষেপিয়া উঠিতেছিল।

সেবার পরীক্ষার ফল বেশ ভালই হইল। আমরা সকলেই ভালরূপ পাশ করিলাম; প্রকাশ কিন্তু পাশ করিতে পারিল না। সে মামীমাকে জানাইল—শ্রীকণ্ঠ তাহাকে মোটেই পড়ায় নাই,—তাই সে পাশ করিতে পারিল না।

কথাটা শ্রীকণ্ঠের কাণে আসায় সে একটু হাসিল মাত্র।

মামাবাবুকে বলিয়া সে প্রকাশের জন্য আর একজন মাষ্টার রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। এই নূতন মাষ্টারের কাছে খালি প্রকাশই পড়িত। সে আমাদেরও তাহার দলে ভিড়াইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাতেও সফলকাম হইতে পারে নাই।

বেশীদিন কিন্তু আর প্রকাশের লেখা পড়া করিতে হইল না। হঠাৎ সে একদিন বাড়ী হইতে পলায়ন করিল। মামাবাবু খোঁজ লইয়া জানিলেন যে, সে একটা যাত্রা পার্টিতে যোগদান করিয়া মফস্বলে অভিনয় করিতে গিয়াছে।

প্রকাশের এইরূপ ব্যবহারে মামাবাবু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। মামীমার অনুরোধেও তিনি আর তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। তিনি গম্ভীরভাবে শুধু বলিলেন...'ওকে এখানে রেখে আর ছেলেদের নষ্ট করতে পারব না।'

ইহার পর মামীমাও তাঁহাকে আর কোন অনুরোধ করেন নাই।

*

* *

সেবার আমার মামাতো বোন মণিমালার জ্বর হইল; জ্বর ক্রমে টাইফয়েডে দাঁড়াইল। সকলে তাহার প্রাণের আশা এক প্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠ দিবারাত্র তাহার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া অক্লান্তভাবে তাহার সেবা করিয়া তাহাকে এ যাত্রার মতন বাঁচাইয়া তুলিল। সকলেই এক বাক্যে বলিল—'মণি এবার বাঁচ্‌ল শুধু শ্রীকণ্ঠের জন্য।'

মণিমালা প্রায় দুই মাস রোগে ভুগিয়াছিল; আরোগ্য হইল বটে, কিন্তু চেহারা হইল যেন ঠিক্ একখানি পোড়া কাঠ। স্থির হইল—গ্রীষ্মের ছুটীতে সকলে পুরীতে যাইব। মাস দুই তিন পুরীতে থাকিলে মণিমালার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইবে। ডাক্তারবাবুও এই যুক্তি সমর্থন করিলেন।

মাসখানেক হইল আমরা পুরীতে আসিয়াছি। মণি-মালার স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইয়াছে। আমরা সকলে প্রাতে ও বৈকালে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করি। অসুখের পূর্ব্বে মণিমালা শ্রীকণ্ঠের সম্মুখে বড় বাহির হইত না। এখন আর তাহার কোন সঙ্কোচ নাই; এখন সে সর্ব্বদা শ্রীকণ্ঠের সঙ্গে

লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। নানা ছলে সে শ্রীকণ্ঠের সঙ্গে আলাপ করিতে আসে। শ্রীকণ্ঠ কিন্তু লজ্জায় একেবারে লাল হইয়া ওঠে।

শ্রীকণ্ঠ হয় তো বাহিরে গিয়াছে,—আসিয়া দেখে—তাহার ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; কাপড়খানি কোঁচান, আলনায় ঝুলিতেছে, বইগুলো গোছান, বিছানা পাতা। সে কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না; লজ্জায় একেবারে মরমে মরিয়া যায়;—মনে মনে সে ব্যাপারটা যে না বোঝে তাহাও নয়; অথচ উপায়ই বা কি!

মামীমা মণির রকম দেখিয়া মনে মনে হাসিতেন। মামাবাবু প্রতি শনিবার পুরী আসিতেন; মামীমার কাছে সব শুনিয়া তিনিও বেশ উৎফুল্ল হইতেন। মামীমা বলিতেন—'দুটীতে কিন্তু বেশ মানাবে! মণির শরীরটা সেরে উঠুক, সাম্‌নের ফাগুনেই কিন্তু দু'জনের চার হাত এক কর্‌তে হবে।'

মামাবাবু হাসিতেন; বলিতেন—'ফাগুনের এখনও ঢের বাকী, সে দেখা যাবে'খন!'

মামা-মামীর মধ্যে এই রকম আলোচনা প্রায়ই হইত; মণি এবং শ্রীকণ্ঠের কাণেও যে ইহার কিছু না যাইত তাহা নহে! দুজনেই সরমে রাঙা হইয়া ঘামিয়া উঠিত। মণি হয় তো কয়েক ঘণ্টা দূরে দূরে পলাইয়া ফিরিত; তারপর মায় সুদ-সুদ্ধ আদায় করিয়া ছাড়িত। এমন করিয়া বেশ আনন্দেই তাহাদের দিন কাটিতেছিল।

মণিমালা তাহার ভগ্ন-স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছিল।

মামাবাবু একদিন আসিয়া বলিলেন,—'এবার তোমাদের কল্‌কাতায় ফির্‌তে হ'বে; ছেলেদের স্কুল খুলে গেছে!'

তারপরই একদিন মাল-পত্র বাঁধিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

*

* *

কাল সরস্বতী পূজা। শ্রীকণ্ঠ কোথা হইতে অনেক ফুল আনিয়াছিল। মণিমালা বাছিয়া বাছিয়া বড় বড় ফুল দিয়া মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীকণ্ঠ সমস্ত দিন খাটিয়া পূজার ঘরটী কাগজের রঙিন ফুল ও শিকল দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে।

তখন রাত্রি গোটা আটেক হইবে। শ্রীকণ্ঠ মামীমার নিকট ভাত চাহিল।

মামীমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আজ এত তাড়াতাড়ি কেন বাবা?'

শ্রীকণ্ঠ সহাস্য বদনে বলিল—'একটু কাজ আছে মা!'

পরদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি পুলিশে চারিদিক্ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। যে দিকে চাই, সেই দিকেই লাল পাগড়ী। আমাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। ভয়ও বেশ হইতেছিল।

ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব মামাবাবুকে সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট দেখাইয়া বলিলেন,—'আপনার বাড়ীতে আসামী আছে। শ্রীকণ্ঠ ওর ছদ্ম নাম; আসল নাম—অরিন্দম। বি-এ ক্লাসের ছেলে সে; রাজনৈতিক আসামী। দু'-তিন বছর থেকে তাকে ধর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি,—ভয়ঙ্কর ছেলে মশাই, আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে ফির্‌ছে;—আমরা সব হিম্‌সিম্ খেয়ে আজ শিকার পেয়েছি!'

কোথায় শ্রীকণ্ঠ? পুলিশ তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া কোথাও তাহার দেখা পাইল না। ইন্সপেক্টর সাহেব সখেদে বলিলেন,—'শয়তান এবারও ফাঁকি দিয়েছে; দেখা যাবে পাজি কোথায় লুকোতে পারে?'

পুলিশ তাহার কর্ত্তব্য করিয়া চলিয়া গেল।

মণি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু ফুলাইয়া ফেলিল। মামীমার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। কিছুদিন পর্য্যন্ত আমরা সকলেই মন-মরা হইয়াছিলাম। মামাবাবু গোপনে তাহার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু কোন সন্ধানই পান নাই!

সেদিন মণি ঘর পরিষ্কার করিতে করিতে হঠাৎ একটা ছবির পিছনে একখানি কাগজ দেখিতে পাইয়া সেখানি বাহিরে আনিয়া দেখে—একখানি চিঠি এবং সেখানি তাহাকেই লেখা। ভাজ খুলিয়া তাড়াতাড়ি সে পড়িতে লাগিল:—

'কল্যাণীয়াসু,

মণি, বিদায়, চিরবিদায়! যেমন ধূমকেতুর মত এসেছিলুম, আজ আবার তেমন সহসাই আমাকে যেতে হলো! বিধাতার কি অপূর্ব্ব পরিহাস! তোমাদের কাছে পরিচয় দিয়েছিলুম তা' আমার সত্যকার-পরিচয় নয়।

আমার সত্য পরিচয় কাল পুলিশের কাছেই তোমরা পাবে। আমি তোমায় ভালবাসি জীবনে এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু আছে বলে জানি না ;—তবে তার বেশী কামনা করবার অধিকার হ'তে যে আজ আমি বঞ্চিত! পথই যার আশ্রয়, ঘর তার কাছে প্রলোভনের হ'লেও—পথই থেকে যাবে চিরদিন! যদি কোন অন্যায় করে থাকি মণি, আমায় তুমি ক্ষমা কোরো ; আমার দু'দিনের স্মৃতি মুছে ফেলো!

আমার জীবন যে কি ভয়ঙ্কর তা ভাষায় প্রকাশ করবার নয় ;—এক একবার ইচ্ছে হয় চোরের মত এমন করে আর আত্মগোপন করে থাক্‌ব না, নিজেই ধরা দি' ; কিন্তু কেন দিই না যান? তা হ'লে মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হ'বে। আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ-দেখি কতদিনে আমার এ দুঃখের অবসান হয়। চল্‌লুম! কোথায় যাব জানি না। মাকে আমার প্রণাম দিও।

ইতি তোমাদের

শ্রীকণ্ঠ।'

মণিমালার চক্ষুদু'টী অশ্রুতে টলমল করিতেছিল তাহার হৃদয়ে যে তুফান উঠিয়াছিল, তাহাতে সে অনেকক্ষণ অভিভূতের মত হইয়া পড়িয়াছিল, একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আঁচল দিয়া সে চক্ষু মুছিয়া ফেলিল।—আজ তাহার চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল—'ওগো নিষ্ঠুর, ফিরে এস! তুমি ফিরে এস! আজ জগতের সামনে বল্‌তে কুণ্ঠিত হ'ব না যে তুমি নির্দ্দোষ!'

অনেকদিন হইয়া গিয়াছে শ্রীকণ্ঠ এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত তাহার মধুর স্মৃতি কিন্তু কেহ ভুলিতে পারে নাই। এখনো মনে হয় সে নিশ্চয় আসিবে, বিজয়ী বীরের মত যশোমাল্যে ভূষিত হয়ে আসিবে, সেই আশাতে এখনো বাড়ীর সকলে বুক বাঁধিয়া আছে। মিথ্যার কুজ্ঝটিকায় কতক্ষণ সত্য-সূর্য্য ঢাকা থাকে?

আলাপ-আলোচনা

বিবেকানন্দ উৎসব

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার নানাস্থানে বিবেকানন্দ-উৎসব হইয়া গেল। স্বামী বিবেকানন্দ যে বাঙ্গালীর এ গৌরব আমরা কখনই বিস্মৃত হইব না। স্বামীজীকে হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবার আরো অনেক কারণ বাঙ্গালীর আছে, তাঁর আকৃতি যেমন সুন্দর ছিল, তাঁহার প্রকৃতি তেমনই সুন্দর ছিল—হৃদয়ে তাঁর যেমন শক্তি ছিল, তাঁর কণ্ঠেও তেমনই শক্তি ছিল।

• • •

কলিকাতা সিমুলিয়ার দত্তবংশে বিবেকানন্দ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁর পূর্ব্বাশ্রমের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পঠদ্দশাতেই বিখ্যাত দার্শনিক মনীষী হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের সঙ্গে তাঁর দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা হয়। হার্ব্বার্ট স্পেনসারকে তিনি এ-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া পাঠান তাহাতে সেই পাশ্চাত্য মনীষী বিমুগ্ধ হন। ইহার এক খুল্লতাতের দ্বারা ইনি পরমহংসদেবের নিকট নীত হন—পরমহংসদেব তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠের গান শুনিয়া মোহিত হন। প্রথম দর্শনেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

তাঁর পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে ও বক্তৃতায় পাশ্চাত্যদেশের জনসাধারণ কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহা আজ কাহারও অবিদিত নাই, সুতরাং সে সকল কথার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহা উল্লেখযোগ্য যে আচার্য্য ম্যাক্‌স্‌মুলারের "লাইফ এণ্ড সেয়িংস অফ রামকৃষ্ণ"-নামক পুস্তক-রচনা-সম্বন্ধে প্রেরণা দিয়াছিলেন বিবেকানন্দই।

*　　*　　*

দরিদ্র ও অস্পৃশ্যের প্রতি মমতাবশতঃ স্বামীজী যে সেবাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন তাহাই তাঁহার চিরস্মরণীয় মহত্তম কীর্ত্তি। যাহারা দুঃস্থ, যাহারা দুর্গত, যাহারা দুর্ভিক্ষ ও বন্যা-প্রপীড়িত তাহাদের প্রাণপণ সেবা ও যত্নের জন্য রামকৃষ্ণ-মিশন কি ব্রত লইয়াছেন তাহা কে না জানেন? সেই সেবা-ব্রতের উৎস স্বামীজী।

*　　*　　*

দরিদ্র-নারায়ণের সেবাকে বাদ দিয়া বিবেকানন্দকে আমরা ভাবিতে পারি না। ভগবান করুন আমাদের বিবেকানন্দ-স্মৃতি যেন কেবল উৎসব ও বক্তৃতার মধ্য দিয়াই শেষ না হয়, আমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক-অনুসরণ করিয়া দরিদ্রের সেবায় তাঁহারই মত আত্মনিয়োগ করিতে, তাঁহারই মত উন্নত চরিত্র লাভ করিতে পারি। কোন চরিত্রহীন ব্যক্তি কোনদিন দেশকে বড় করিতে পারে না ও পারিবে না, একথা যেন আমরা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখি।

*　　*　　*

ভারতের জন্য যাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে বিবেকানন্দ অন্যতম। তিনি আমেরিকায় গিয়াছিলেন প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে, হিন্দু-ধর্ম্মের উদারতা ও বিশালতার পরিচয় দিতে, পাশ্চাত্য-জগতের হিন্দুধর্ম্মেরর উপর যে একটা ভুল ধারণা ছিল যে, অদ্বৈতবাদের তথ্য হিন্দুরা জানে না—বহু দেব-দেবীর পূজা করিয়াও হিন্দুরা একেশ্বরবাদী এই বিরাট্ সত্য তাহাদের কাছে উপস্থাপিত করিতে—আর তিনি গিয়াছিলেন ভারতের জন্য সহানুভূতি দাবী করিতে—হিন্দুধর্ম্মের উপর যে অযথা অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা দূর করিতে। তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া সেখানের লোক ও চিকাগোর ধর্ম্ম-মহামণ্ডলীর সমবেত সভ্যগণ অন্ততঃ ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, যে দেশে বিবেকানন্দের মত লোক জন্মিয়াছেন, সে জাতিকে অবহেলা করিবার উপায় নাই, সে জাতিকে অবনমিত করিবার শক্তি কাহারও নাই—তাহার বিজয়-কেতন গৈরীক উত্তরীয়।

*　　*　　*

সেই হিন্দু দরিদ্র হইলেও তাহার হৃদয়ের কোমলতা নষ্ট হয় নাই, পরের দুঃখ বোধ করিবার শক্তি তাহার লুপ্ত হয় নাই, দুর্ব্বলকে পীড়া দিয়া সে তাঁহার মনুষ্যত্বে অবমাননা করে না। প্রতি বৎসর তাঁহার জন্মোৎসব দিনে আমরা যেন তাঁহার বিষয়ে ধ্যান-ধারণা করিয়া ধন্য হইতে পারি। মহাকবি স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের উক্তি আমরা সকলকেই স্মরণ করিতে অনুরোধ করি:—"তোদের বিবেকানন্দ বেদ-বেদান্তের পণ্ডিত বলিয়া তাঁহাকে ভালবাসি না—গরীব অসহায় ও নির্য্যাতিতের দুঃখ শুনিয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠে দেখিয়াই তাঁহাকে ভালবাসি। বিবেকানন্দ ছিলেন সত্যকারের প্রেমিক।" এই প্রেমিকের পদাঙ্ক-অনুসরণ করিয়া দেশ উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হউক।

*　　*　　*

স্বর্ণের রপ্তানী

ভারত হইতে ক্রমাগত সোনা রপ্তানী হইতেছে, কিন্তু ইহা রোধ করিবার কোন উপায়ই সাধিত হইতেছে না কেন? ভারতীয় বণিক-সমিতি এ-বিষয়ে আন্দোলন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বড় বড় রাজ-কর্ম্মচারীরা এ-রপ্তানীতে যে দেশের লাভই হইতেছে বলিতেছেন,তাহাদের যুক্তির সারবত্তা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। স্বর্ণের বিনিময়ে অধিক অর্থ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু দেশ হইতে তো স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইতেছে,—যাহা হউক সেপ্টেম্বরের শেষভাগ হইতে জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বিদেশে যেরূপ সোনা রপ্তানী হইয়াছে নিম্নে তাহার একটী তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

	কোটী	লক্ষ	হাজার টাকা
২৬-৯-৩১		২৬	১৭
৩-১০-৩১	২	৫৫	৫৬
১০-১০-৩১	২	৩৩	৬৯
১৭-১০ ৩১	২	২	৮৫
২৪-১০-৩১	১	২৮	৯৭
৩১-১০-৩১	২	৪১	৮২
৭-১১-৩১	১	৪১	৫৫
১৪-১১-৩১	১	১১	৮৯
২১-১১-৩১	২	৬০	৮২
২৮-১১ ৩১	২	৩২	৩২
৫-১২-৩১	২	৪৩	৯২
১২-১২-৩১	৪	২৩	৫৬
১৯-১২-৩১	৪	৬৮	৮৭
২৬-১২-৩১	৩	৯৯	৯৯
১-১-৩২	২	৪৬	৪১
৮-১-৩২	১	৭১	৮৪
১৫-১-৩২	৩	৬৬	১৭

* * *

বিগত ১১ই মাঘ ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের **উদ্বোধনকালে** মাননীয় বড়লাট বাহাদুর যে বক্তৃতা **করিয়াছেন তাহার এক স্থলে বলিয়াছেন** —

"* *একশ্রেণীর লোক ও সংবাদপত্র ভারতের আর্থিক **অবস্থা-সম্বন্ধে এমন** সব বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন, যাহাতে **আশঙ্কার সৃষ্টি হয়।** তাঁহারা বলিতেছেন যে, স্বর্ণ-রপ্তানী ভারতের পক্ষে অশুভকর।" * * "এই সময়ে স্বর্ণ-রপ্তানী ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। **অন্যান্যদেশ** যখন বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তখন ভারতবর্ষ তাহার **অগাধ স্বর্ণ-সম্পদের** অংশ মাত্র ত্যাগ করিয়া বিনিময়ে সন্তোষ-**জনক অর্থ** পাইতেছে। ৪০ কোটী টাকার যে স্বর্ণ-রপ্তানী হইয়াছে, তাহা ভারতের সমগ্র স্বর্ণের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর মাত্র। গত ত্রিশ বৎসরে ভারতের সমগ্র স্বর্ণের মূল্য ৭০০ কোটী টাকা। সম্প্রতি ১৯১৫,১৯১৮ ও ১৯২১ সালে স্বর্ণের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী হইয়াছে। বস্তুতঃ নিরপেক্ষ-ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অর্থনৈতিক বিবর্ত্তনে এমন ক্ষেত্র উপস্থিত হইবার সুযোগ আসিতে পারে, যখন স্বর্ণ-ব্যবসায়-সম্বন্ধে ভারতের অতীত গৌরব দেশের আর্থিক সুবিধা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।"

* * *

বড়লাট বাহাদুর 'সুযোগ আসিতে পারে' বলিয়া যে কথা বলিয়াছেন, তাহা 'নাও আসিতে পারে।' তাঁহার বক্তব্যকে অর্থনৈতিক অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় কি? আমরা একথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। ভারতবর্ষ যদি তাহার অগাধ স্বর্ণ সম্পদের কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া বিনিময়ে সন্তোষজনক অর্থ পায়, তাহা হইলে ব্যবসাদার ইংলণ্ড কেন তাহার স্বর্ণ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভারত হইতে স্বর্ণ অধিক অর্থ দিয়া খরিদ করিতেছে—আপনাদের স্বর্ণ-সম্পদের ভাণ্ডার অধিক মাত্রায় স্বর্ণে পূর্ণ করিতেছে। ইংলণ্ডও তাহার স্বর্ণ-সম্পদ বিক্রয় করিয়া অধিকতর লাভবান হইতেছে না কেন? এ সুযোগ ইংলণ্ড কেনইবা ছাড়িতেছে?

* * *

পয়লা বৈশাখ

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ১লা বৈশাখ সরকারী ছুটীর দিন বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এইদিন বাঙ্গালীর পুণ্যাহ—বাঙ্গালার নূতন বছর ঐ দিন হইতে আরম্ভ—সুতরাং বহু আন্দোলনের ফলে কর্ত্তৃপক্ষ যে ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছেন ইহা আনন্দের কথা। আর যাঁহার ক্রমাগত চেষ্টায় এই দিনটী ছুটীর দিন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেই অক্লান্ত-কর্ম্মী বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরীকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

* * *

বাগ্দেবীর পূজা

এ দেশে অশিক্ষিত যতই থাকুক, বিদ্যার চর্চ্চা যতই কেন স্বল্প হউক, বাগ্দেবীর পূজা হয় অসংখ্য স্থানে। সে পূজা অধিকাংশ স্থলেই কলা ও অন্যান্য বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর

প্রাপ্ত ভক্তিশ্রদ্ধাবশতঃ হয় না, হয় হুজুগে। পাঁচজনে করিতেছে আমরাও করিব না কেন?—এই ভাব হইতে ইহার উৎপত্তি। যিনি বিদ্যাদায়িনী বীণাপাণি তাঁহার পূজায় বহুস্থানে এবার যে বাহুল্য, অযথা অর্থব্যয় ও ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখিলাম, তাহা হইতে মনে হইল দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সম্বন্ধে লেশমাত্র খেয়াল ও দেবীর প্রতি বিন্দুমাত্র ভক্তি থাকিলে আড়ম্বরটা কেহই বড় করিয়া পূজাকে খর্ব্ব করিত না। এই প্রসঙ্গে আমরা সাধক রামপ্রসাদের সেই কথাটা দেশবাসীকে মাত্র স্মরণ করাইয়া দিতে চাই—

'জাকজমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে। ইত্যাদি—'

* *

পূজাকে খর্ব্ব করিবার কথা এইজন্য বলিতেছিলাম, যে কোন এক ধনীর বাড়ীর বাগ্‌দেবী-পূজায় দেখিলাম বায়স্কোপ হইল, গাড়ী-জুড়ী, মোটর আসিল, বন্ধু ও আত্মীয়রা ভূরিভোজনে আপ্যায়িত হইলেন কিন্তু সরস্বতী পূজার দিন কি তাহার পরদিন সেখানে কোন কাঙালীকে খাইতে দেখিলাম না বরং যে দুএকজন বুভুক্ষু দরিদ্র এক টুকরা খাদ্য পাইবার জন্য আধঘণ্টা মাথা খুঁড়িল ভৃত্যের ধমক খাইয়াই তাহাদের বিদায় হইতে হইল।

দেশের আব-হাওয়ার পরিবর্ত্তনের ফলেই কি এমনটা হইতেছে। আমাদের বাল্যকালে শহরে কি পল্লীগ্রামে এমন কোন উৎসব হইতে দেখি নাই, যেখানে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা হইত না—তাহারাও উৎসবের আনন্দে যোগদান করিত ও ভোজনের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইত না।

* * *

প্রসিদ্ধ বিনামা ব্যবসায়ীর সঙ্কল্প

জেকো-শ্লোভোকিয়ার কোটীপতি বিনামা-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত টমাস বাটা সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি সংকল্প করিয়াছেন যে এখানকার ত্রিশকোটী লোককে, যাহারা পাদুকার দ্বারা চরণ আবৃত করে না, জুতা পরাইবেন অর্থাৎ জুতার দাম খুব সস্তা করিয়া তাহাদিগকে বিনামা-পরিধানে প্রলোভিত করিবেন।

দুঃসাধ্য কার্য্য হইলেও শ্রীযুক্ত বাটার সংকল্প যদি সফল হয় তো এখানে একটা নূতন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান হইবে। তিনি যে জুতা প্রস্তুত করিবেন তাহার উপরটা হইবে ক্যান্বিসের আর তলা রবারের। এই রকম জুতা এখন জাপান সরবরাহ করিতেছে। জাপান এত সস্তায় জুতা দিতেছে যে আজকালকার দিনে অর্থের টানাটানির ফলে লোকে চামড়ার জুতা ছাড়িয়া ঐ প্রকারের জুতাই লইতেছে।

* * *

কলিকাতার নিকট জুতার কারখানা খুলিবার মানসে শ্রীযুক্ত বাটা উপযুক্ত জমীর সন্ধান করিয়া কাটিয়ারকুল তেলের কলের নিকট সতের বিঘা জমী পাঁচ বছরের জন্য ইজারা লইয়াছেন এবং এই পাঁচ বছরের মধ্যে, ইচ্ছা করিলে তিনি উক্ত জমী কিনিয়া লইতেও পারিবেন। এখানকার অনেক লোক তাহাতে নিয়োজিত হইবে, বেকার-সমস্যার কিছু কিছু সমাধা হইবে। আর জুতার প্রয়োজন যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই খুব বেশী তাহা আর কাহাকেও কি বলিতে হইবে? এই দেশের 'হুক'-ক্রিমী-হইতে যে রোগের উৎপত্তি হয় তাহাতে দেশের শতসহস্র লোককে অকালে জীবন্মৃত করিয়া রাখে, বহুস্থলে তাহাদের চিরজন্মের মত হারাইতেও হয়। জুতা পরিধান করিলে এই রোগের হস্ত হইতে বৎসরে বহু সহস্র লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারিবে—এই রোগের প্রতিষেধক পরীক্ষিত ঔষধ এখনও বাহির হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই, তবে এ রোগের হাত হইতে জুতা পরিলে সহজেই রক্ষা পাওয়া যাইবে। মাটীর উপর যে সকল রোগের বীজাণু থাকে—তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার ইহা অমোঘ অস্ত্র। অধিকন্তু পল্লীগ্রামের দুঃস্থ লোকেদের যাহাদের রাত্রিকালে বাহির হইতে হয়, জীব-জন্তুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহা ব্যবহার করা খুব ভাল, কারণ হঠাৎ সর্পাদির গায়ে পা পড়িলে তাহারা ভয়েই ছোবল মারিয়া থাকে, তাহাদের আত্মরক্ষার জন্য ঐরূপ করে। বাবুগিরির জন্য গরীবদিগকে জুতা ব্যবহারের কথা বলিতেছি না—জীবন-রক্ষা ও রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই এত কথা বলিলাম।

জাপান সস্তা জুতার রপ্তানী করিয়া এখানকার চামড়ার জুতার বাজারকে কিরূপ কাবু করিয়াছে তাহা সংখ্যার দ্বারা বিবৃত হইতেছে। পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে এই-প্রকারের জুতা আসিত—জাপান আমেরিকাকে বাজার হইতে হঠাইয়াছে। জাপান হইতে আনীত জুতার সংখ্যা দেখুন :—

১৯২৬-২৭	১৯১৫০০০	জোড়া।
১৯২৭-২৮	২৭৭৩০০০	"
১৯২৮-২৯	৩৩২০০০০	"
১৯২৯-৩০	৬৭৬১০০০	"
১৯ -৩১	১০৯২১০০০	"

জাপান ও কানাডা বিনামার বাজারে কর্ত্তৃত্ব না করিলেও ভারতবর্ষীয় ব্যবসায়ীরা জুতার বাজারে লাভবান হইতেন কম, কারণ কলিকাতায় বছরে এক কোটী টাকার জুতার কারবার চলে এবং তাহার মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর লক্ষ টাকার কাজ চীনা জুতা-ব্যবসায়ীদের হাতে, আমাদের অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়।

* * *

দেশের লোকের কি অভাব এবং সেই অভাব অল্পমূল্যে কিরূপে অভাবগ্রস্তেরা ঘুচাইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিবার ও তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার মত বুদ্ধি কি আমাদের কাহারও নাই? ধনীর সংখ্যা আমাদের দেশে অল্প নয়, তাঁহারা যদি বিলাসে ও ব্যসনে অর্থ নষ্ট না করিয়া দেশে উপযুক্ত কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রমের মর্য্যাদা বাড়ান ও শ্রমিকদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করেন তো দেশের অনেক উপকার হয়।

* * *

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা 'ন্যাসনাল টেনারি'র দৃষ্টান্তে আমরা সকলকে অনুপ্রাণিত হইতে বলি। অবশ্য যে মহানুভব এই কোম্পানির কর্ণধার ছিলেন তাঁহার পরিদর্শনের অভাবে ও নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এই টেনারির কার্য্য এতকাল ভালভাবে চলে নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কি এই ব্যবসাটা এদেশে ভালভাবে চলে না। এখন চামড়া পরিষ্কার করিবার বৈজ্ঞানিক উপায় এদেশের অনেক শিক্ষিত যুবক পাশ্চাত্য দেশ হইতে শিখিয়া আসিয়াছে। তাহাদিগকে লইয়া ধনীরা যদি যৌথ কারবার করিয়া এ ব্যবসা চালান তাহা হইলে যে বেশ একটা লাভজনক ব্যবসায় দাঁড়াইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অবশ্য একটী বা দুইটী ব্যবসায়ী ফেল হইয়াছে, অতএব এ ব্যবসা আর চলিবে না এরূপ মনোভাবের পোষণ কোনমতেই করা যায় না। আমরা এই মনোভাবের পোষণ-কারীদিগকে কবি দীনবন্ধুর কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই—

"যে মাটীতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে।"

* * *

ষ্টুডেন্টস্ ওয়েল-ফেয়ার কমিটি—

ছাত্রদের মঙ্গলের জন্য 'ষ্টুডেণ্টস্ ওয়েল-ফেয়ার কমিটি' নামে যে সমিতি আছে তাঁহার কার্য্যবিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় যে, কৃতবিদ্য ডাক্তারদিগের দ্বারা ২১, ১৭০ জন ছাত্র পরীক্ষিত হইয়াছে। ঐ সকল ছাত্ররা বাড়ীতে গড়পড়তা ৩'৬৭ ঘণ্টা করিয়া প্রত্যহ পাঠ করিয়া থাকে। বিদ্যালয় গড়-পড়তা ৫ঘণ্টা করিয়া পড়ে ও ১'৫৪ ঘণ্টা করিয়া খেলে। শতকরা ২১'৩৩ জন ছাত্র টিফিন খাইয়া থাকে। শতকরা ১৭ জন উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ পান করে।

এই রিপোর্টের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া কলিকাতার একখানি বিশিষ্ট দৈনিক পত্র লিখিয়াছে। Would these figures rouse the parents to a sense of what they owe their children? ছাত্রদের পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বলা হইয়াছে, তাহাদের ছেলেদের প্রতি কর্ত্তব্য তাহারা কি যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতেছেন? আমরা বড়-লোকদের ছেলেদের কথা ছাড়িয়া দিয়া গরীব ও মধ্যবিত্ত ছাত্রদের অভিভাবকদের পক্ষ হইতে বলিতে পারি যে অভিভাবকদের পুত্রকন্যাদিগকে বিজ্ঞানসম্মত আহারাদি যোগাইবার সামর্থ্য নাই। এক্ষেত্রে তাহারা কি করিতে পারেন? যে দেশে দুইবেলা করিয়া অন্ন জুটাইতে অভিভাবকদিগের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইতেছে, সে দেশে টিফিন বা দুগ্ধের কথা না তোলাই ভাল।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে দেশীয় এজেণ্ট

ভারতবর্ষে যতগুলি প্রথম শ্রেণীর রেলওয়ে আছে তাহাদের কোনটীতেও আজ পর্য্যন্ত দেশীয় লোকেরা স্থায়ীভাবে তো দূরের কথা অস্থায়ীভাবেও এজেণ্টের পদ পান নাই। রেলওয়ের চাকুরীর মধ্যে এই পদই সর্ব্বোচ্চ পদ। গবর্ণমেণ্ট ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার বি, আর, সিংহকে অস্থায়ীভাবে এজেণ্ট মনোনীত করিয়া ভারতবাসীর ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। বাস্তবিক গুণের আদর হইতে দেখিলে আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া থাকি। আশা করি এই মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য রেলওয়েও উপযুক্ত দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে এই পদে নিযুক্ত করিয়া উদারতার পরিচয় দিবেন। ভারতবাসীর পক্ষে বড় চাকুরীর যে একটা নূতন পথ পরিষ্কৃত হইল ইহা বাস্তবিকই আনন্দের কথা এবং এই পদে দেশীয় লোককে স্থায়ীভাবে দেখিলে আমরা অধিকতর সুখী হইব।

* * *

অধ্যাপক পার্সিভ্যাল সাহেবের তৈল-চিত্র উন্মোচন

বিগত ২৫ শে জানুয়ারী প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক এইচ্, এম্, পার্সিভ্যাল সাহেবের তৈল-চিত্র উন্মোচন করিয়াছিলেন মাননীয় বিচারপতি স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। ১৮৮০ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়া তিনি যশোমাল্য লইয়া বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের গভীরতা যেমন ছিল, তেমনই অন্তঃকরণের উদারতাও ছিল অত্যধিক। বিচারপতি মহাশয় তাঁহার পদতলে বসিবার সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন, ছাত্রদের উপর তাঁহার যে অসীম প্রভাব ছিল, তাঁহার কারণ প্রথমতঃ তাঁহার জ্ঞানের পরিধি ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার চরিত্র ছিল অনবদ্য সুন্দর। এই দুই কারণে ছাত্রদের মনোরাজ্যে তাঁহার আধিপত্য ছিল অত্যন্ত বেশী।

* * *

মিঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থ, যিনি একসময়ে অধ্যাপক পার্সিভ্যালের সহকর্ম্মী ছিলেন, বলেন পার্সিভ্যাল সাহেবের ছিল সাহিত্যিক সহজজ্ঞান। সেই জ্ঞানের উন্নতি করিয়া তিনি সাহিত্য-বিষয়ে যেমন দক্ষ হইয়াছিলেন, তেমনই সেই জ্ঞান তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাঁহার সহিত যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্যকে কেবল সাহিত্য বলিয়া ধরিতেন না, তিনি সাহিত্যকে মানবজীবনের ব্যাখ্যা বলিয়াই ধরিতেন এবং তাঁহার উন্নত আদর্শের সাহায্যে চরিত্রগুলির জীবনের-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিতেন।

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পার্সিভ্যাল সাহেব অধ্যাপক হিসাবে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কারণ তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে তাঁহার জীবনের কাহিনী অকুণ্ঠিতভাবে উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতেন—তাহাদের চরিত্র গঠনের সহায়তা করিতেন।

* * *

যোগদর্শনের তত্ত্ব-কথা

আমাদের যোগশাস্ত্রে কি আছে তাহার যথার্থ বিবরণ জানিবার জন্য পাশ্চাত্য-জগৎ ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। গত বৎসরের পূর্ব্ববৎসর রোমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দার্শনিক ডাঃ ইলিয়েড যোগশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের নিকট আগমন করেন ও দুই বৎসর শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। এবৎসর আমেরিকার 'ইয়েল ইউনিভারসিটী' এই বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য উপযুক্ত বৃত্তি দিয়া ডাঃ কে, টি, বেহেনানকে অধ্যক্ষ দাশগুপ্তের নিকট পাঠায়াছেন।

ডাঃ দাশগুপ্ত পাতঞ্জল দর্শনের কাল নির্ণয় করিয়াছেন পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ ১৫০। তিনি বলেন, ইহার উপর অনেক বড় বড় পণ্ডিত ব্যাখ্যা করিয়া নূতন আলোক-পাত করিয়াছেন। এই দর্শনের পূর্ব্বেও ইহার অনুরূপ ভাবধারা ভারতে চলিয়া আসিতেছিল। ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে ধ্যানরত যোগীমূর্ত্তি ছিল তাহা মহেঞ্জোদারো খননের সময় প্রাপ্ত মূর্ত্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। স্বয়ং বুদ্ধদেব যোগশাস্ত্র-সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া তন্ময়ভাবে বিষয় বিশেষের উপর

মনোযোগ দান করা, কিন্তু এখানে যেভাবে আমরা জ্ঞানমার্গে বা আপেক্ষিক চিন্তারাজ্যে মনোযোগ দিয়া থাকি তাহার বিপরীত মুখী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। এই দর্শনের মূল যে মনস্তত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রোথিত উহা ফ্রয়েড বা জঙ্গের মনস্তত্ত্বের বহু পূর্ব্বে জগতে প্রচারিত হইয়াছে। প্রকৃত কথা বলিতে কি এই মনস্তত্ত্ব ফ্রয়েড বা জঙ্গের মনস্তত্ত্বের পরিপূরকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে; কারণ ফ্রয়েড বা জঙ্গের মতে আমাদের সংবিদের রাজ্য অসংবিদের রাজ্য হইতে উদ্ভূত; সংবিদের বীজ অসংবিদের রাজ্যে উপ্ত হইয়া ক্রমশঃ সংবিদের রাজ্যে আসিয়া অসংবিদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়; যোগশাস্ত্র বলেন মানব চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা অসংবিদের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করিতে পারে—অসংবিদের রাজ্যে যে বীজ উপ্ত হয় তাহাকে সম্পূর্ণভাবে উত্তোলন করিয়া ফেলিতে পারে। যোগের দ্বারা আত্মোন্নতি করিতে পারা যায়। যোগের দ্বারা মন যখন একবিষয়ে সমাহিত হয় এবং চিত্তের অন্যান্য বৃত্তিকে নিরোধ করে তখন নূতন আত্মিক সত্য, এমন কি জড়জগতের সত্যও যোগীর নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। যোগদর্শনের মনস্তত্ত্ব এতদূর বিকসিত হইয়াছে যে সত্যই ইহার বিস্তৃতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়—বিস্মিত হইতে হয় যে ইহা আধুনিক জগতের মনস্তত্ত্বের সমস্যাগুলি কতপূর্ব্বে সমাধান করিয়া গিয়াছে ও নূতন আলোক দান করিয়াছে।

* * *

পরলোকে ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়

বিগত ২২শে জানুয়ারী ডাঃ প্রসন্নকুমার রায় তাঁহার হাজারিবাগ বাংলায় ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তদশকে যে কয়জন যুবক ভারতবর্ষ হইতে জ্ঞানলাভের জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন ডাঃ প্রসন্নকুমার তাহাদের অন্যতম। তাঁহার সঙ্গীরা ছিলেন স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত, মিঃ বিহারীলাল গুপ্ত, মিঃ আনন্দমোহন বসু ও মিঃ পি, এল, রায়। ইঁহারা সকলেই দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেশের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন—শুধু বাংলাদেশ বলি কেন সমগ্র ভারতবর্ষের ভিতর ইঁহারা যে উন্নতির অগ্রদূত ছিলেন তাহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ডাঃ রায় ঢাকা-কলেজ হইতে গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লইয়া বিলাত যান। এডিনবরা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে যখন ইনি দর্শনশাস্ত্রে ট্রাইপস প্রাপ্ত হন তখন সুবিখ্যাত লর্ড হ্যালডেনের সহিত তুল্য যোগ্যতার সহিতউত্তীর্ণ হন। আমরণ এই সহপাঠিদ্বয়ের প্রণয় অক্ষুন্ন ছিল। ডাঃ প্রসন্নকুমার স্বদেশে ফিরিয়া শিক্ষা-কার্য্যে ব্যপৃত হন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডাক্তার অফ সায়ান্স উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পাটনা, ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনের অধ্যাপকের কার্য্য সুন্দরভাবে করিয়াছেন। ভারতবাসীদের মধ্যে বোধ হয় তিনিই সর্ব্বপ্রথম এডুকেশনাল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অস্থায়ীভাবে অধক্ষ্যের কার্য্য তিনিই এদেশবাসীর ভিতর প্রথম করেন। তাঁহার পূর্ব্বে এদেশীয় কোন ব্যক্তি ঐ পদ প্রাপ্ত হন নাই। তৎপরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। স্যর আশুতোষ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলার তখন ডাঃ পি, কে, রায় প্রথম কলেজ ইন্‌স্‌পেকটার নিযুক্ত হন। ১৯১০ সালে তিনি ভারতীয় ছাত্রদিগের শিক্ষার পরিদর্শন ভার লইয়া বিলাত-যাত্রা করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন দেশীয় লোকও এ পদ প্রাপ্ত হন নাই। তিন পুরুষ ধরিয়া বাঙ্গালার ছাত্রদিগের শিক্ষাকার্য্যে তিনি ব্যপৃত ছিলেন। তাঁহার মত নির্ম্মলচরিত্র পুরুষ বড় কম দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ধর্ম্মবলে বলীয়ান ছিলেন বলিয়া তিনি ছাত্রদিগের নৈতিক চরিত্রগঠনে সহায়ক হইতে পারিয়াছিলেন। এরূপ আদর্শ চরিত্র ব্যক্তির মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশ একজন আদর্শ শিক্ষককে হারাইল।

পুস্তক-পরিচয়

মানস-সরোবর ও কৈলাস—শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক—বসুমতী সাহিত্য-মন্দির, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১॥০টাকা।

বাঙ্গালা ভাষায় 'ভ্রমণ-কাহিনী'র সংখ্যা কম নয়। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের 'হিমালয়' সাহিত্যে আসন পাইয়াছে। বাঙ্গালী 'লিলুয়া-ভ্রমণ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'উত্তরাপথ'-ভ্রমণ লিখিয়া থাকেন। পূর্ব্বে 'বদরীনাথ' 'কেদারনাথ' আমাদের বিস্ময়ের বিষয় ছিল। ক্রমে 'অমরনাথ'ও দুর্গম হইয়া সহজ হইয়া গেল। তখন আমাদের মন ছুটিল 'কৈলাস ও মানস-তীর্থে'। স্বেন হেডিন পথ দেখাইলেন। ১৩০৮ সালে শ্রীমদ্ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী 'সাহিত্য'-পত্রে 'হিমারণ্য' নামে কয়েকটী প্রবন্ধে তিব্বত ও মানস-সরোবর-সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা লেখেন। এমন চমৎকার বর্ণনা ও প্রাঞ্জল ভাষা প্রায় দেখা যায় না।

তারপর অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কৈলাস ও মানস সরোবর'-সম্বন্ধে অনেক কথা লেখেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "মানস-সরোবর ও কৈলাস" এই দুর্গম তীর্থের যাত্রার পক্ষে অন্যতম প্রয়োজনীয় পুস্তক। লেখক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, তীর্থ-যাত্রীর উপযুক্ত পথ-প্রদর্শক। লেখকের বর্ণনায় কোথায়ও ফেনিল ভাবোচ্ছ্বাস নাই। "রাবণ-হ্রদের" বর্ণনা এমনভাবে লিখিয়াছেন যে,মনে হয় যেন তুলি দিয়া ছবি আঁকিতেছেন। এ দৃশ্য তাঁহাকে কি বিস্ময় ও পুলকে অভিভূত করিয়াছে তাহা তাঁহার লেখায় সহজেই অনুভব হয়। তা'-ছাড়া হতভাগ্য কুলীর অপমৃত্যুর যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে সেই কালীনদীর মৃত্যু-শীতল তরঙ্গে রক্তাক্ত মানুষের ভয়াবহ অবসান স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই দুই স্থানে তাঁহার সাহিত্যিক শক্তির যথার্থ পরিচয় পাই।

তাঁর উদ্দেশ্য পাঠকসমক্ষে মানস-লোকে 'মানস ও কৈলাসে'র চিত্র ফুটাইয়া তোলা—তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

তিনি ইংরেজী শিক্ষিত নন, কিন্তু তাঁহার মন আশ্চর্য্য রকম আধুনিক। বইখানির শেষে পথ-খরচের এমন একটী তালিকা দিয়াছেন যে, মনে হয় যাহাদের সামর্থ্য আছে, ধর্ম্মপ্রাণতা আছে এবং যাহাদের অগ্রসর হইয়া চলিবার সুখ ও বাহির হওয়ায় অনন্ত কৌতুক আছে, তাঁহারা এই বইখানি হাতে লইয়া সহজেই এই কল্পলোকের 'মানস ও কৈলাস'কে দর্শন করিয়া নয়ন-মন চরিতার্থ করিতে পারিবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অভিশপ্তা (উপন্যাস)—শ্রীননীগোপাল দাশগুপ্ত প্রণীত।

ননীবাবু চিত্রশিল্পী হিসাবে পরিচিত। কথাশিল্পের দিক্ দিয়াও তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই যশোলাভ করিতেছেন। অভিশপ্তা গল্পটীর নায়কের মুখ দিয়া তাহার বিচিত্র জীবন-কাহিনী বলা হইয়াছে। আঘাতের ভিতর দিয়া মানুষ কেমন করিয়া প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নরহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, এবং ঐরূপ অন্তরের মধ্যে নানারূপ চিন্তার, নানারূপ কল্পনা ও জল্পনার ঘাত-প্রতিঘাত যেভাবে প্রত্যেক কথায় প্রত্যেক আচরণে প্রকাশ পাইয়াছে,তাহা বাস্তবিকই মনোরম। নানা ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়া নায়কের জীবনযাত্রা বহিয়া চলিয়াছে। সেই জীবন-যাত্রা-পথে কত ঘটনা ঘটিতেছে। কতজনের জীবনের সহিত তাহার পরিচয় হইতেছে, কতজনের স্নেহ, প্রেম ও ভালবাসার সুধা-স্পর্শে তাহার প্রাণে নূতন আশার আলোকের দীপ্তি প্রতিফলিত হইয়াছে। হীনজাতীয়া রমণীর মাতৃত্বের সুকোমল স্পর্শে তাহার চিত্তে বিশ্ব-মাতৃত্বের পবিত্রতা বিকসিত। কি অন্যায়, কি পাপ, কি শুভ, কি অশুভ, সর্ব্ব-

প্রকারের তাহার বৈচিত্র্য ও মনস্তত্ত্বের অভিব্যক্তি এই গ্রন্থের মধ্যে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আশাকরি, এখানি জনসমাজে সমাদৃত হইবে। ভাষার সম্বন্ধে আমাদের একটু বলিবার আছে। উপন্যাস ও কাহিনীর ভাষা সরল, সহজ ও বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হওয়া আবশ্যক। ননীবাবুর ভাষা বেশ সহজ ও অনাড়ম্বর হইলেও একটু ঘোরালো—ঐ ত্রুটিটুকু ভবিষ্যৎ-রচনায় না থাকিলেই সুখী হইব। যাঁহারা উপন্যাসপ্রিয় ও গল্পপ্রিয়, তাহাদের কাছে এখানি নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শিখের আত্মাহুতি—শ্রীদীনেশচন্দ্র বর্ম্মণ প্রণীত। প্রকাশক—আর্য্য পাব্‌লিশিং হাউস, ২৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

শিখদিগের কথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। এই সম্প্রদায় কিরূপে ধর্ম্ম হইতে কর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া জীবন-যুদ্ধে বাঁচিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। শিখদিগের বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের কথা বহুবার আলোচিত হইয়াছে এবং আরও যত বেশী আলোচিত হয় ততই ভাল। এই গ্রন্থে শিখদিগের ইতিহাস প্রাচীনকাল হইতে তাহাদিগের অধঃপতন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। আশা করা যায় এ পুস্তকখানি অনেকেরই পড়িতে ভাল লাগিবে।

শ্রীরমেশ বসু

শ্রীশ্রীসরস্বতী লীলামৃত—শ্রীসারদাসুন্দরী দাসী প্রণীত। প্রকাশক—বাণী-ভবন, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, নর্থ ব্লক, রুম নং ১৭। মূল্য ৸০ আনা।

দেবী সরস্বতী এবং মহাকবি কালিদাস-সম্পর্কিত প্রচলিত কয়েকটী কাহিনী শিশুবোধ্য করিবার জন্য পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাগুলি ভাল না হইলেও শিশুদের উপযোগী। এই পুস্তকে মহাকবি-সম্বন্ধে যে কয়টী গল্প দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি বালকদিগের উপভোগ্য হইবে। মাঝে মাঝে যে দুই একটী সংস্কৃত শ্লোক আছে, সেগুলির ব্যাখ্যা দিলে ভাল হইত। কাগজ, বাঁধাই ভাল। পুস্তকখানিতে অজস্র বর্ণাশুদ্ধি। এত অশুদ্ধ বানান পড়িয়া ছেলেরা যে শেষে বানানে সরস্বতী হইয়া যাইবে। প্রকাশক বা লেখিকার এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিৎ ছিল।

শ্রীসুধীরকুমার সেন

গ্রন্থ-প্রাপ্তি-স্বীকার

সনাতন হিন্দু—মহামহোপ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ
স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
আমি ও আমার দেহ—শ্রীমন্মথমোহন বসু
শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ইতিহাস—শ্রীমতী অক্ষয়কুমারী দেবী
উদানং—শ্রীজ্যোতিপাল ভিক্ষু
অভিধম্মথ সঙ্গহো—শ্রীধর্ম্মপ্রিয় ভিক্ষু
অদ্বৈতসিদ্ধি (১ম ভাগ)—শ্রী রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রী যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ
কর্ম্মরহস্য—শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার
ভাইটমিন বা খাদ্যপ্রাণ—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত
বেদান্ত-দর্শন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
আত্মনিবেদন—শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
শ্রীহট্টীয়কথ্যভাষা—শ্রীব্রজদয়াল বিদ্যাবিনোদ
শ্রীগীতা-প্রবেশিকা—শ্রীবিনয়কুমার সান্যাল
গীতায় গৃহধর্ম্ম—শ্রীশ্রীশচন্দ্র ধর
শ্রীরূপসনাতন—শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র বসু
সাধনা ও পরমানন্দ—শ্রীদেবেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী
সম্মাননা—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
বৌদ্ধধর্ম্ম ও নববিধান—শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
ভ্রমণের নেশা—শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুস্তোফী
গোগৃহ—শ্রীবিধুভূষণ সরকার
বন্দীর ব্যথা—শ্রীমুরারীমোহন ঘোষ
শ্যামলী—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ সেন
বৈজয়ন্তী—শ্রীবিজয়নাথ মণ্ডল
নমিতা—শ্রীযতীশচন্দ্র বসু
গোপনবঁধু—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
নির্ম্মাল্য—শ্রীদেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
সাঁঝের প্রদীপ—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
মন্দিরের চাবি— ঐ
অশ্রুপূজা—শ্রীকুমররঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মন্দির শিল্পে ভুবনেশ্বর

শ্রীঅজিত ঘোষ

ভুবনেশ্বর ভারতের একটী শ্রেষ্ঠ শৈবক্ষেত্র। মন্দির-শিল্প-কলার ইতিহাসে ইহা যে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে তাহার তুলনা নাই। ইহার অসংখ্য শিবমন্দির, হিন্দু-শিল্পীর অপূর্ব্ব কলা-কৌশল ও ভাস্কর্য্য দেখিলে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। শিল্প ও সৌন্দর্য্য-গৌরবে জগতের ইতিহাসে ইহা এক বিরাট্ অবদান।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের আলোচনার কথা উঠিলেই প্রথমেই ভারতীয় হিন্দু-স্থপতি-কলার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

এই আর্য্য-স্থপতি-বিজ্ঞানের উৎপত্তি যে কোন সময় হইয়াছিল তাহা বলা বড়ই কঠিন। ফার্গুসন্ বলেন—কি পিরামিড, কি সমাধিস্তম্ভ কেহই ইহার উৎপত্তির আভাস দিতে পারে না। কোন স্তূপ সমচতুষ্কোণ হউক কিংবা গোলাকার হউক—তাহার শিল্পকলা পারিবারিক হউক কিংবা পৌরজনঘটিত হউক, তাহার সহিত এই মন্দিরের শিল্পের কোন সামঞ্জস্য দেখা যায় না।
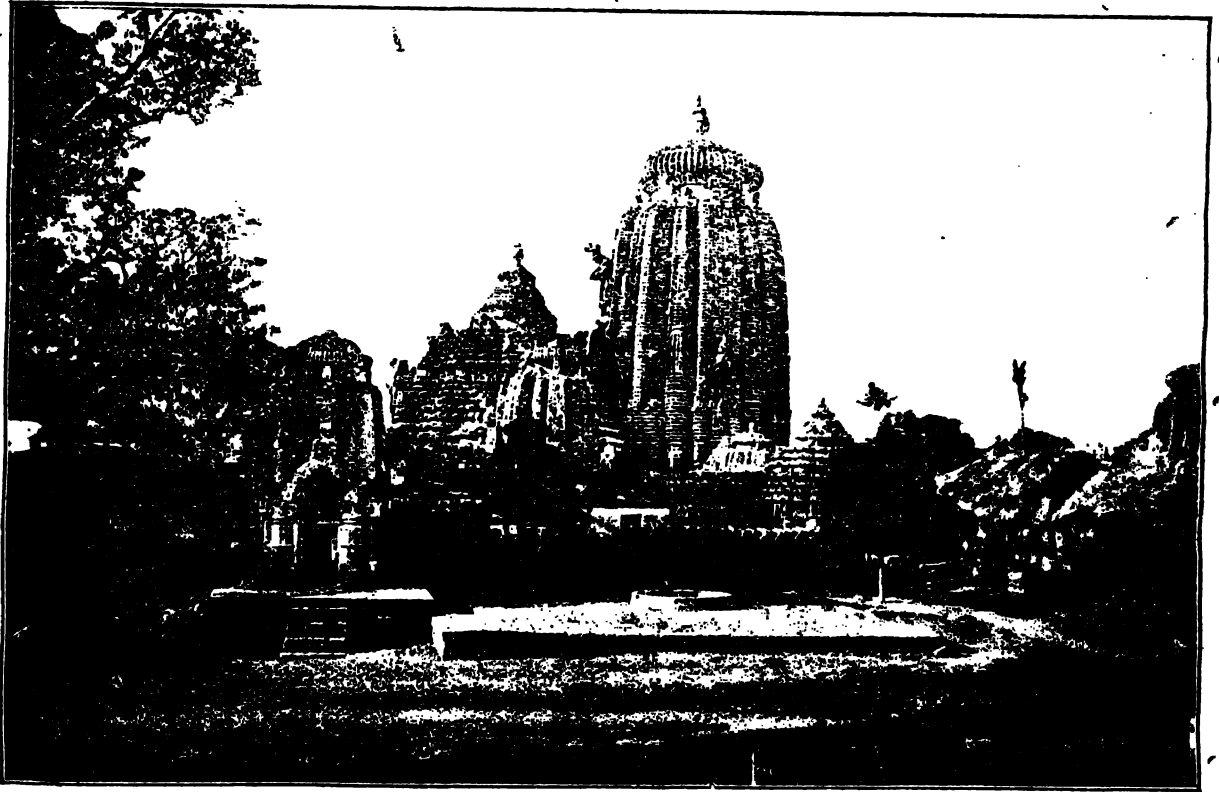
ভুবনেশ্বর মন্দির—উত্তর দিক হইতে

ভারতীয় আর্য্য-স্থপতি-শিল্প অর্থাৎ 'ইণ্ডু-আর্য্য' শিল্পকলার মহিমময় ছায়া পড়িয়াছে এই মন্দিরে। আর্য্য-কলার এই নিদর্শন—এই বিরাট্ কীর্ত্তি আর্য্য-সভ্যতার যে পরিচয় দেয়, তাহাতে আমরা ইহার পৌরাণিক মৌলিকতা উপলব্ধি করি।

হিন্দু-মন্দিরের বৈশিষ্ট্য এই যে, উহার অবয়ব চতুষ্কোণ

ও কারুকার্য্যখচিত এবং উহার মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি সংস্থাপিত থাকে। অনেকস্থানে ঐ সমস্ত মন্দিরের সম্মুখে একটী করিয়া মণ্ডপও দেখা যায়। ঐ মণ্ডপটী সমচতুষ্কোণ এবং উহার ছাদ অনেকটা পিরামিড ধরণের। এই মন্দিরের চক্ররেখা-সমন্বিত শৃঙ্গ এবং তাহার উপর একটী সরলোন্নত দণ্ড বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে এই নিদর্শনগুলি সম্যক্‌রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

বহুল পরিবর্ত্তন ঘটে তবুও উহাতে আমরা পুরাণ-বর্ণিত বহু উদাহরণ দেখিতে পাই।

রোহিলখণ্ডে অহিচ্ছত্র নামক স্থানে ডাঃ ফুরার-কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত (১৮৯১-৯২) হিন্দু-স্থাপত্যের একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির হইতে অনুমান হয় যে, পূর্ব্বে ভারতীয় মন্দির-শিল্প ইষ্টকের দ্বারাই হইত, পরে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা প্রস্তরে নির্ম্মিত হইতে থাকে।

ভুবনেশ্বরে মন্দিরের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শত। উহাদের
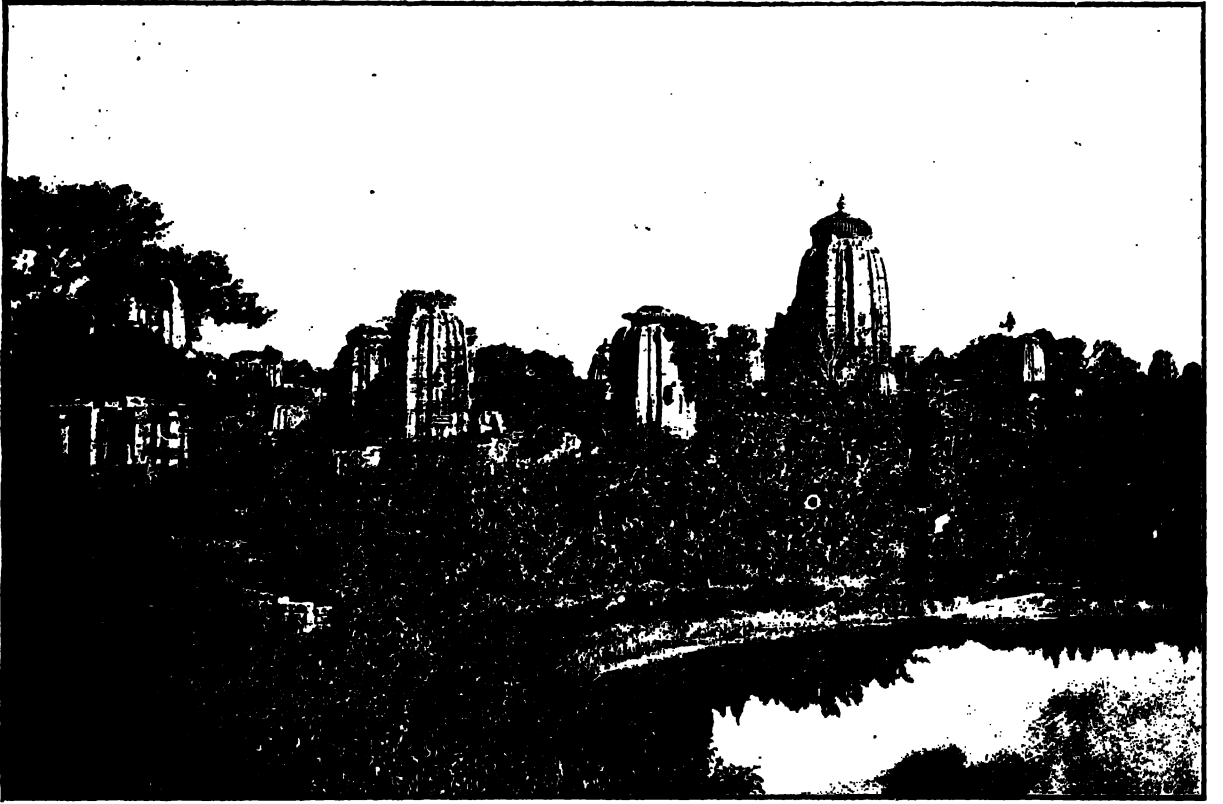
ভুবনেশ্বর মন্দির—উত্তর পূর্ব্বদিক্‌

ভুবনেশ্বর-প্রমুখ সমস্ত হিন্দু-স্থাপত্যের যে পরিচয় আমরা পাই, অনেকের মতে তাহা বৌদ্ধ স্থাপত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকের মতে আবার বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে আমাদের দেশে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি সাধারণ মানুষেরই অনুরূপে গঠিত হইত, পরে বৌদ্ধযুগে উহাতে নানা অপার্থিব লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতে থাকে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা; কারণ হিন্দু-সভ্যতা বৌদ্ধ-সভ্যতার বহু-পূর্ব্বের। যদিও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে হিন্দু দেবদেবী-মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে

মধ্যে প্রধান মন্দিরগুলির নাম—মুক্তেশ্বর, কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, গৌরী, উত্তরেশ্বর, রাজারাণী, পরশুরামেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, নারকেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, মেঘেশ্বর, অনন্ত বাসুদেব গোপালিনী, সাবিত্রী, লিঙ্গরাজ, যমেশ্বর, সাড়ীদেউল, সোমেশ্বর, কোটীতীর্থেশ্বর, হাটকেশ্বর, কপালমোচনী, রামেশ্বর, গোসহস্রেশ্বর, শিশিরেশ্বর, কপিলেশ্বর, বরুণেশ্বর, চক্রেশ্বর, অলাবুকেশ্বর প্রভৃতি; ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন মন্দিরগুলি খৃষ্টীয় প্রায় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত

হইয়াছিল। ইহাদের শিখরগুলি খুব উচ্চ এবং সুন্দর 'আমলক' দ্বারা পরিশোভিত। দ্বার-মণ্ডপগুলি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত এবং সরলোন্নত স্তম্ভের উপর রক্ষিত। এই মন্দিরগুলির আরও কিছু পরবর্ত্তীকালের মন্দিরগুলির শৃঙ্গ আরও অনেক উচ্চ--দ্বারমণ্ডপের ছাদগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর। এইরূপ পদ্ধতির সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ মন্দির লিঙ্গরাজ মন্দির। পরশুরামেশ্বর মন্দিরের সহিত উহার অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভুবনেশ্বরে তীর্থযাত্রীদের প্রথম তীর্থ বিন্দুসাগরের প্রায় ৬০০ হাত দক্ষিণে এই মন্দির অবস্থিত। পরশুরামেশ্বর মন্দিরটীও বিন্দুসাগরের সন্নিকটবর্ত্তী।

লিঙ্গরাজ মন্দিরটী এরূপ বিরাট্ ও অপূর্ব্ব যে ইহার তুলনা ভারতে মেলা অসম্ভব,—অসম্ভবই বা বলি কেন, ইহা অদ্বিতীয়। বিশেষজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিক ও মনীষিমণ্ডলীর মতে পুরীর জগন্নাথের মন্দির মন্দিরশিল্পে জগতে বিশেষ
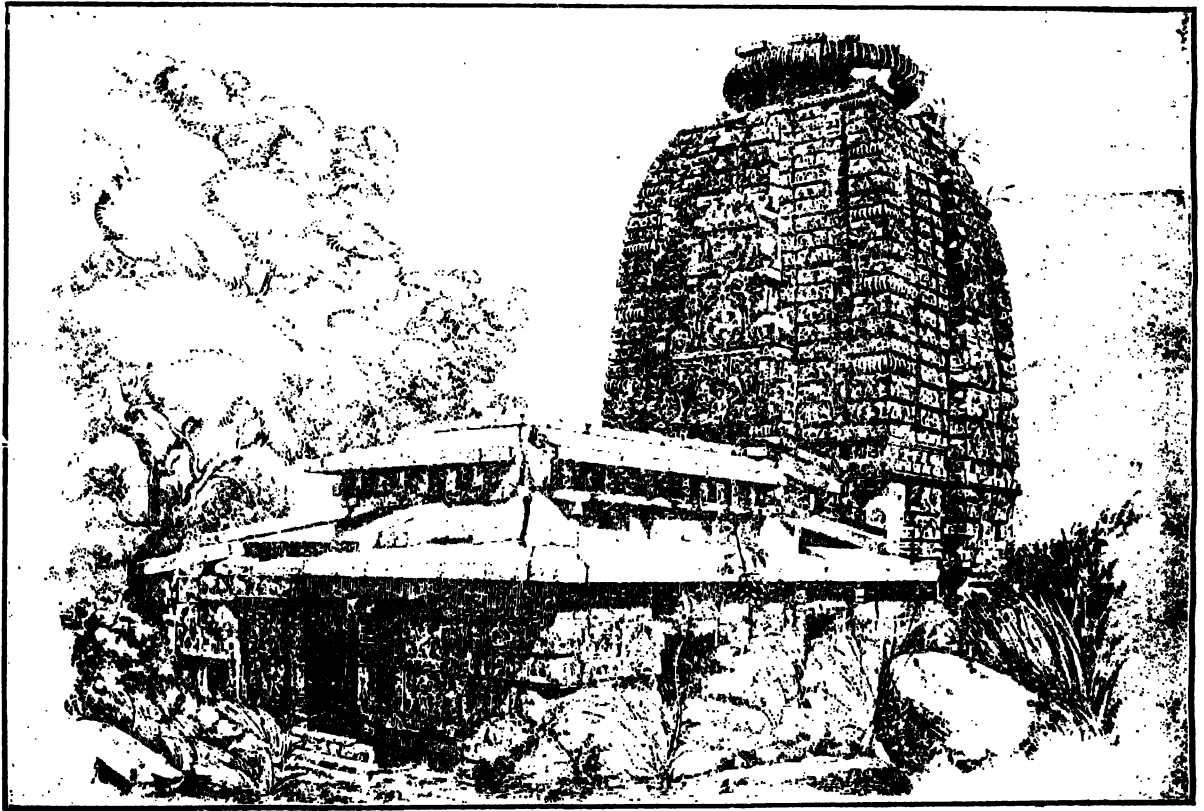
পরশুরামেশ্বর মন্দির

যদিও পরশুরামেশ্বর মন্দিরটী লিঙ্গরাজ মন্দির অপেক্ষা অনেক ছোট এবং শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্য-সৌন্দর্য্যে হীনতর, কিন্তু ইহাতেও যে সৌম্য সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। মন্দিরটী অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-খচিত হইয়া এক বহুমূল্য সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। এ পরশুরামেশ্বর মন্দিরের বড় একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

'লিঙ্গরাজ' অর্থাৎ 'লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বর' মন্দিরটী

স্থান লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর লোক উহাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ মন্দির বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু এই লিঙ্গরাজ মন্দির জগন্নাথ-মন্দিরকেও হার মানাইয়াছে। সুন্দর নয়নমোহন স্থাপত্যকলা ও শিল্পসম্ভারে এই মন্দির এক অপূর্ব্ব-শ্রী ধারণ করিয়াছে। ইহা ভারতীয় আর্য্যগৌরবের এক বিরাট্ কীর্ত্তি। কণারকের সূর্য্যদেউল অর্থাৎ সূর্য্যমন্দিরের—ইংরেজীতে যাহাকে 'ব্ল্যাক প্যাগোডা' বলে তাহার—

সৌন্দর্য্যকেও লিঙ্গরাজ অতিক্রম করিয়াছে। ইহার যে শিখর—উচ্চতায় আর্য্যশিল্পের মহিমায় মহিমান্বিত, তাহার ন্যায় উচ্চ শৃঙ্গ ভারতের আর কোন মন্দিরের দেখা যায় না।

এই সুবৃহৎ মন্দিরভূমি দৈর্ঘ্যে ৫১০ ফুট ও প্রস্থে ৪৬৫ ফুট। প্রাচীরের স্থূলতা ৭ ফুট ৫ ইঞ্চি। প্রাচীরের চারিদিকে বৃহৎ প্রবেশদ্বার সন্নিবেশিত; তন্মধ্যে পূর্ব্বদ্বার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—উহাই সিংহদ্বার। এই তোরণের উভয় পার্শ্বে দুইটী সুবৃহৎ সিংহমূর্ত্তি সংস্থাপিত। এই প্রাচীরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ভেটমণ্ডপ—একটী ছোট প্রস্তরনির্ম্মিত ঘর আছে। শুনা যায়, লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বর যখন রথযাত্রা করিয়া ফিরিয়া আসেন, তখন গৃহমধ্যে পার্ব্বতীমূর্ত্তি আনীত হয়।

এই মন্দির-ভূমির পশ্চিমদিকে ভগবতী-মন্দির অবস্থিত। মাদলাপঞ্জীর মতে আমরা জানিতে পারি যে রাজা বিজয়-কেশরী এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন—ইনি কেশরী বংশজাত। লিঙ্গরাজের মহামন্দিরের সম্মুখাংশে ভোগমণ্ডপ, তাহার পশ্চাতে নাটমন্দির, তৎপশ্চাতে মোহন এবং মোহনের পশ্চাতে মূলমন্দির বা দেউল—ইহার মধ্যে গর্ভগৃহ অবস্থিত।

ভোগমণ্ডপ লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বর মন্দিরের একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিস। সুধী পণ্ডিতবর্গ বেদপাঠ ও ভক্তবৃন্দ উপদেশ শুনিবেন বলিয়া এই ভোগমণ্ডপ প্রথম নির্ম্মিত হয়। রাজা রাজেন্দ্রলালের মতে এই ভোগমণ্ডপ ৭৯২ হইতে ৮১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কেশরী-বংশীয় কমল-কেশরী নির্ম্মাণ করেন। আবার অনেকের মতে গঙ্গাবংশীয় নৃপতি বীর নরসিংহদেব তাহার রাজ্যের ২৪শ অব্দে ভোগমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইনি কণারকের সূর্য্যমন্দির প্রস্তুত করিয়া যশস্বী হ'ন। পূর্ব্বে আমরা যে নাট-মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছি, উহাও এই নরসিংহদেবের কীর্ত্তি। ১১৬৪শকে (১২৪২ খৃষ্টাব্দ) ইহা নির্ম্মিত হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে শালিনী কেশরীর মহিষী ইহা নির্ম্মাণ করিয়া যান (১০৯৯—১১০৪)। গজরাজ তনুজার নাম উৎকীর্ণ শিলালিপিতে দেখিয়া মনে হয়, উনিই শালিনী-কেশরীর মহিষী। ইনি এই মন্দিরের সূত্রপাত করিয়াছিলেন মাত্র।

দেবতৃপ্ত্যর্থে নৃত্যগীতবাদ্যাদির জন্য এই নাটমন্দির নির্ম্মিত হয়। নাট-মন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে মোহন ও মোহনের পশ্চিম পার্শ্বে লিঙ্গরাজের দেউল। উভয়ের গঠন কৌশল একভাবের ও একই রীত্যনুসারী। এবং ইহাদের নির্ম্মাণ কার্য্যও একই সময়ের বলিয়া মনে হয়। মোহনের প্রস্তরময় নির্ম্মাণ কৌশল, ভাস্করকার্য্য ও শিল্পসৌন্দর্য্য দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। মন্দিরটী এতই সুন্দর যে, দেখিলেই কোন দেবশিল্পীর তপস্যা-প্রভাবে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি হইতে সুবৃহৎ মূর্ত্তি যে কিরূপ অপরূপ কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে—উহাতে মানব জীবনের কি সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। এগুলি যেন জীবন্ত।

মোহনের ছাদ ভোগমণ্ডপের ছাদের ন্যায় চূড়াকার। ইহার দৈর্ঘ্য ৬৫ ফুট ও প্রস্থ ৪৫ ফুট। দেউলের ভূম্যংশ মোহনের সমপরিমাণ। ইহার মুখশালীর নিকট নানা পাষাণ-মূর্ত্তি দেখা যায়। এখানকার বৈশিষ্ট্য অষ্ট দিক্‌পাল মূর্ত্তি। ইহার পূর্ব্বদিকে ইন্দ্র, দক্ষিণপূর্ব্বে অগ্নি, দক্ষিণে যম, দক্ষিণ-পশ্চিমে নৈর্ঋত, পশ্চিমে বরুণ, উত্তর-পশ্চিমে মরুৎ, উত্তরে কুবের, উত্তর-পূর্ব্বে ঈশ-মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে।

দেউলের গৃহ দ্বিতল—নিম্নতলে অনাদিলিঙ্গ ভুবনেশ্বর বিরাজমান। এই অনাদিলিঙ্গ দর্শন করিবার জন্য সহস্র সহস্র যাত্রী এখানে আগমন করেন। এই লিঙ্গই লিঙ্গরাজ—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান লিঙ্গ। এই লিঙ্গ মূর্ত্তির আর একটী নাম কৃত্তিবাস—মন্দির প্রতিষ্ঠাতা কৃত্তিবাসের নামেই ইহার নাম।

যযাতিকেশরী যখন যবনদিগকে বিতাড়িত করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবসানে হিন্দুধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তিনি লিঙ্গ-রাজের দেউল মোহনের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন (৪৭৪-৫২৬ খৃষ্টাব্দ)। তাহার বংশধর ললাটেন্দুকেশরী বা অলাবুকেশরীর রাজত্ব কালে ৫৮৮ শকে (৬৬৬ খৃষ্টাব্দ) ইহা শেষ হয়।—রাজা রাজেন্দ্রলালের ইহাই মত। মাদলা-পঞ্জীর উপর নির্ভর করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন স্থানে ইহার অনুরূপ প্রমাণ দেখা যায় না। যে অনঙ্গভীমদেব পুরীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন—তিনিই ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা—প্রাপ্ত শিলালিপিতে ইহাই উল্লিখিত হইয়াছে। এই অনঙ্গ ভীমদেবের আর একটী নাম অনীয়ঙ্ক ভীবদেব। ইনি কৃত্তিবাস বা কৃত্তিবাসেশ্বরের নামে এই মন্দিরের নামকরণ করিয়াছিলেন।

পুরীধামে দ্রষ্টব্য স্থান

শ্রীনটবর দত্ত

১। তুলসী চত্বর বা কমলপুর। পুরীধাম হইতে ৮ মাইল উত্তরে ভার্গী বা দণ্ডভাঙ্গা নদীর পরপারে; বঙ্গদেশ হইতে নীলাচলে উপস্থিত হইতে শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বপ্রথমে এই স্থান হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দর্শন করিয়াছিলেন। কমলপুরের কপোতেশ্বর মহাদেব আছেন।

২। আঠার নালা—হিন্দু রাজার কীর্ত্তি। ইহা পুরীর উত্তর সীমায় মুটিয়া নদীর উপর অবস্থিত।

৩। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দির। শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে রত্ন-বেদী লক্ষ শালগ্রাম শিলা দ্বারা নির্ম্মিত, রত্ন-বেদীর উপর শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীবলরাম, সুদর্শন চক্র, রজতময়ী শ্রীশ্রীসত্যভামা, সুবর্ণময়ী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী, শ্রীনীলমাধব বিরাজিত। নাটমন্দিরে গরুড় স্তম্ভ। এই স্থান হইতে সচল জগন্নাথ শ্রীচৈতন্যদেব অচল জগন্নাথ দর্শন করিতেন। ইহার পার্শ্বে শ্রীচৈতন্য দেবের শ্রীচরণ-চিহ্ন ছিল এক্ষণে তাহা মন্দির-প্রাঙ্গণে ছোট মন্দির মধ্যে রাখা হইয়াছে। মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে, বাহির অঙ্গনে বহু শ্রীবিগ্রহ। মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে অরুণ-স্তম্ভ আছে।*

৪। রন্ধন শালা—ইহা শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত বিরাট্ ব্যাপার।

আনন্দ বাজার—এই স্থানে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ—অন্ন, ডাল, তরকারী, মিষ্টান্নাদি বিক্রয় হয়। ইহারই এক পার্শ্বে রাস্তার ধারে অবস্থিত স্নান-বেদী।

৫। শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের শ্রীচরণ-চিহ্ন—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদ, পদ্ম নামে অভিহিত—শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে উত্তর পার্শ্বে একটী ছোট মন্দিরের মধ্যে অবস্থিত, পূর্ব্বে ইহা শ্রীমন্দিরস্থ নাট মন্দিরে গরুড় স্তম্ভের পার্শ্বে ছিল।

৬। শ্রীচৈতন্য দেবের হস্তের অঙ্গুলির চিহ্ন গরুড় স্তম্ভের পশ্চাতের দরজার দক্ষিণ দিকস্থ প্রস্তর-নির্ম্মিত ভিত্তি-গাত্রে ৪টী অতি ক্ষুদ্র গর্ত্ত—শ্রীচৈতন্য দেব এই ভিত্তি-গাত্রে হস্ত রক্ষা করিয়া শ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি দর্শন করিতেন বলিয়া প্রবাদ।

৮। এমার মঠ—রঘুনন্দন গ্রন্থাগার। ইহা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহ দরজার সম্মুখে অবস্থিত।

৯। পুরী রাজবাটী—শ্রীমন্দির হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে বড় দন্দার (রাস্তার) উপর।

১০। ঝাঁঝ-পিটা মঠ। পুরী রাজবাড়ীর পশ্চাতে গলির মধ্যে। পুরী ধামে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রাচীন মঠ। মঠটী সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ এবং শান্তিপ্রদ। পুরী ধামের বড় বাবাজী শ্রীল রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয় কর্ত্তৃক এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১১। জগন্নাথ-বল্লভ উদ্যান—পুরীধামে রায় রামানন্দের বাসস্থান। বড় দন্দার উপর অবস্থিত।

১২। নরেন্দ্র সরোবর বা চন্দন পুষ্করিণী। পুরী রাজবাটীর কিঞ্চিৎ উত্তরে এবং জগন্নাথ বল্লভ উদ্যানের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। এই সরোবরে বৈশাখ মাসে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের চন্দন-যাত্রা উৎসব হইয়া থাকে।

১৩। শ্রীচৈতন্য দেবের নরেন্দ্র সরোবর তীরে উপবেশন স্থল—শ্রীচৈতন্য দেবের কৃপায় এবং বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদে বহু পরিশ্রমের পর গত ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে এই স্থান আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি। নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর তীরে শ্রীল বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর (জটীয়া বাবা) মঠের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে তাহারই তলে শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তগণসহ উপবেশন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতেন।

---

* অরুণ-স্তম্ভ। ইহা শ্রীমন্দিরের সিংহ-দ্বারের সম্মুখে বড় রাস্তার উপর অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বে কোণারকে সূর্য্য-মন্দিরে ছিল। প্রায় ১৫০ বৎসর হইল ইহাকে পুরীতে আনিয়া শ্রীমন্দিরের সম্মুখে স্থাপিত করা হইয়াছে।

* এসম্বন্ধে কেহ কোন নূতন তথ্য জানাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

১৪। গুণ্ডিচা মন্দির গুণ্ডিচা গড়—শ্রীমন্দির হইতে দেড় মাইল উত্তরে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ-স্থল। এই স্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীবলরাম ও শ্রীমতী

অরুণ-স্তম্ভ

সুভদ্রা দেবী আষাঢ় মাসে রথারোহণে আসিয়া আট দিন উদ্যান-বিহার করিয়া থাকেন।

১৫। নৃসিংহদেব মন্দির। এই মন্দির গুণ্ডিচা গড়ের উত্তর পার্শ্বে; ইহা একটী প্রাচীন মন্দির। ইহার মধ্যে নৃসিংহ বিগ্রহ আছেন।

১৬। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর—গুণ্ডিচা গড়ের কিঞ্চিৎ উত্তরে সুবৃহৎ সরোবর। সরোবরের পশ্চিম পাড়ে একটী প্রাচীন শিব মন্দির আছে। কথিত আছে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বগণের ক্ষুরাঘাতে এই সরোবর খনিত হইয়া যায়।

১৭। সার্ব্বভৌম ভবন বা গঙ্গামাতা মঠ—স্বর্গদ্বার পথে বালিসাইতে। এই স্থানে শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবকে পাণ্ডাদের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার গৃহে আনয়ন করেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করাইতেন। সেই প্রাচীন পুথি এই মঠে অদ্যাপি রহিয়াছে। এবং শ্রীচৈতন্যদেবের উপবেশন স্থলটী এখনও বিদ্যমান আছে।

১৮। শ্বেত গঙ্গা—গঙ্গা মাতা মঠের সম্মুখে। ইহা একটী সুগভীর পুষ্করিণী, সরোবরের তীরে শ্বেত মাধব এবং মৎস্য মাধব মূর্ত্তি আছেন।

১৯। শ্রীশ্রীদক্ষিণা কালিকা—গঙ্গামাতা মঠের কিঞ্চিৎ উত্তরে বালিসাইতে স্বর্গদ্বার রাস্তার সন্নিকটে।

অবস্থিত। ইহা ঠাকুর হরিদাসের ভজন স্থলী। গাছটী কেবল ত্বকের উপর অবস্থিত।

২৩। নানক পন্থী মঠ—স্বর্গদ্বার-পথে।

২৪। নিমাই চৈতন্য মঠ—স্বর্গদ্বারের নিকটে, সমুদ্র-তটে।

২৫। কবীর-পন্থী মঠ—স্বর্গদ্বার-পথে।

২৬। স্বর্গদ্বার—শ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দির হইতে নৈর্ঋত কোণে এক মাইল দূরে সমুদ্রের বেলাভূমিতে। প্রবাদ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় ব্রহ্মা এই স্থানেই প্রথম অবতরণ করেন।

২৭। বিরের আশ্রম—স্বর্গদ্বার-পথে, সমুদ্র-তটে।

গম্ভীরা

২০। শ্রীশ্রীরাধাকান্ত মঠ বা শ্রীল কাশীমিশ্রের বাটী—মঠে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ থাকেন। স্বর্গদ্বার পথে রাধাকান্ত মঠের গ্রন্থাগারে বহু প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত আছে।

২১। গম্ভীরা—রাধাকান্ত মঠের মধ্যে অবস্থিত। ইহা একটী অতি ক্ষুদ্র ঘর, শ্রীচৈতন্যদেব এই স্থানে অবস্থান করিতেন, তাঁহার ব্যবহৃত কয়েকটী দ্রব্য এই স্থানে অতি যত্নের সহিত অদ্যাপি রক্ষিত আছে।

২২। সিদ্ধ বকুল—রাধাকান্ত মঠের দক্ষিণ পার্শ্বে

২৮। গোবর্দ্ধন মঠ বা শঙ্কর মঠ—স্বর্গদ্বার-পথে, সমুদ্র-তটে।

২৯। হরিদাস মঠ বা ঠাকুর হরিদাসের সমাধি স্থান। স্বর্গদ্বার-সমুদ্রতটে। শ্রীচৈতন্য দেব স্বীয় স্কন্ধে ঠাকুর হরিদাসের নশ্বর দেহ বহন করিয়া আনিয়া এইস্থানে স্বহস্তে তাহা সমাহিত করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের সাত্ত্বিকভাবাপন্ন শান্তিপ্রদ স্থান এবং প্রাচীন মঠ। ইহা ঝাঁঝ পিঠা মঠের অধীন। পুরীধামে ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একটী উজ্জ্বল কীর্ত্তি।

৩০। শ্রীল কাশী মিশ্রের সমাধি—হরিদাস মঠের পূর্ব্ব পার্শ্বে। এইস্থানে অনেক প্রাচীন বৈষ্ণবগণের সমাধি আছে। সমাধি গুলির উপর কোন নাম লেখা নাই। ইহা রাধাকান্ত মঠের অধীন।
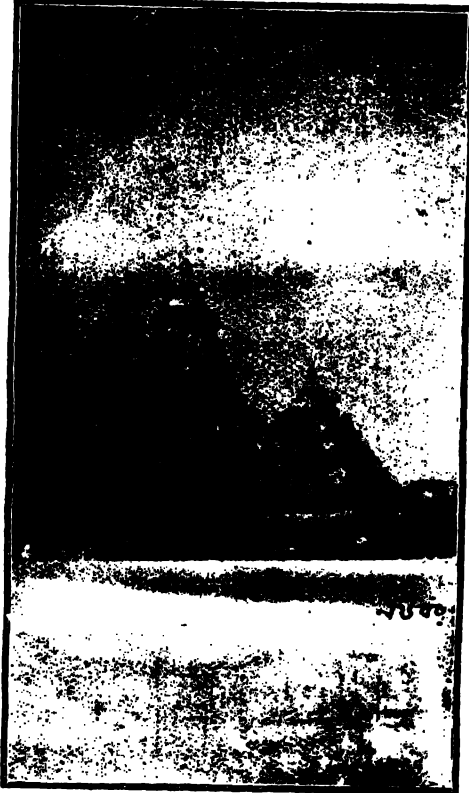
আলাল নাথ-মন্দির

৩১। সপ্ত আসন—গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অতি প্রাচীন ভজন স্থান, হরিদাস মঠের সম্মুখে (উত্তরে) গলির মধ্যে। আসন গুলির বর্ণনা যথা—রাস্তার পশ্চিম দিকে (১) গোকাসন—শ্রীল ঝড়ু ঠাকুরের ভজনস্থলী (২) শ্যামসুন্দর আসন—শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের ভজন স্থান (৩) কৃষ্ণবলদেব আসন—শ্রীল ভগবান্ আচার্য্যের ভজন স্থান; রাস্তার পূর্ব্ব দিকে—(৪) গিরিধারী আসন—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভজন স্থান (৫) কদলী পটকা আসন-শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিতের ভজন স্থান; (৬) বড় আসন—শ্রীল স্বরূপ দামোদরের ভজন স্থান; (৭) মদন মোহন আসন—শ্রীল গোবিন্দের ভজন স্থান (এই সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়)।

৩২। চটক পর্ব্বত—হরিদাস মঠ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত। ইহা একটী অতি উচ্চ বালীর পাহাড়।

৩৩। টোটা-গোপীনাথ বা গোপীনাথ টোটা (উদ্যান)—হরিদাস মঠ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে উত্তর পশ্চিম কোণে সমুদ্র-তটে অবস্থিত। কিংবদন্তী আছে শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে শ্রীচৈতন্য দেব বিলীন হইয়া যান—এসম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়।

৩৪। যমেশ্বর টোটা (উদ্যান) শ্রীগোপীনাথ মন্দিরের পার্শ্বে উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীচৈতন্য দেব সনাতন গোস্বামী মহাশয়কে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার (সনাতন গোস্বামীর) কণ্ডুব্রণ পূর্ণ দেহ রোগমুক্ত করিয়াছিলেন।

জগন্নাথ দেবের মন্দির

৩৫। অলাবুকেশ্বর—যমেশ্বর টোটার নিকট।

৩৬। কপাল-মোচনী। অলাবুকেশ্বরের নিকট।

৩৭। লোকনাথ। শ্রীমন্দির হইতে প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। রাস্তা পাকা এবং পরিষ্কার, মোটর

চলে। ইহা পুরীর পশ্চিম দিকের শেষ সীমায় অবস্থিত। ইনি শ্রীজগন্নাথ দেবের দেওয়াল বলিয়া খ্যাত।

৩৮। পুরী গোস্বামীর কূপ—ইহা লোকনাথ যাইবার পথে পুলিশ ষ্টেশনের (ফাঁড়ি) মধ্যে অবস্থিত। ইহা একটী অতি প্রাচীন কূপ।

৪১। পোর্ট কমিশনার-ফ্ল্যাগ ষ্টেশন, লাইট হাউস, আদালত, ব্যাঙ্ক, মিউনিসিপ্যাল অফিস।

৪২। লাট-ভবন—সমুদ্রতটে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদ।

৪৩। চক্রতীর্থ—ইহা মন্দির হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে সমুদ্র-তটে অবস্থিত। প্রবাদ

নরেন্দ্র সরোবর-তীরে শ্রীগৌরাঙ্গের উপবেশন স্থান

৩৯। দোল মঞ্চ। মন্দিরেরউত্তর পার্শ্বে এইস্থানে শ্রীজগন্নাথদেবের দোল-যাত্রা উৎসব হইয়া থাকে।

৪০। মার্কণ্ড-সরোবর—মন্দির হইতে কিঞ্চিৎ দূরে

—এই চক্রতীর্থের ধারে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মদারু ভাসিয়া আসিয়া ছিলেন। ইহার পার্শ্বে একটী জলের উৎস আছে, জল পরিষ্কার এবং মিষ্ট। এই স্থানে কয়েকটী দেবমন্দির দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে শ্রীসোনার গৌরাঙ্গের মন্দিরটী সমৃদ্ধিশালী।
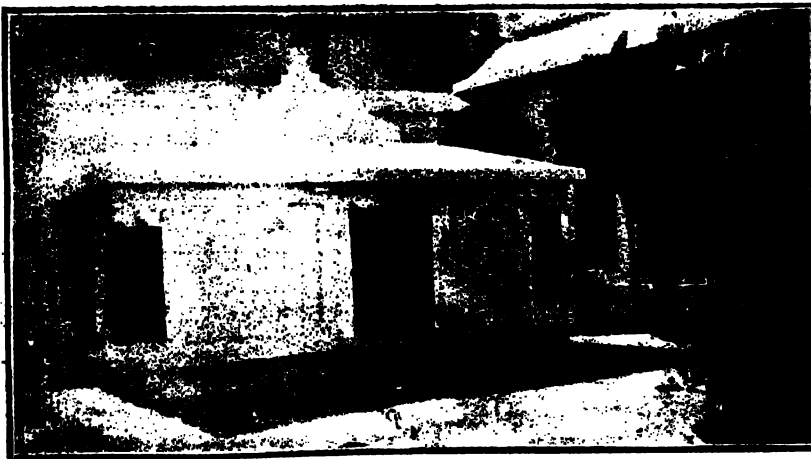
হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মন্দির

উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। সরোবর-তীরে অনেকগুলি শ্রীবিগ্রহ আছেন।

৪৪। আলালনাথ বা অনাথনাথ—ইহা মন্দির হইতে বার মাইল দূরে দক্ষিণে-পশ্চিম কোণে ব্রহ্মগিরির

উপর অবস্থিত। পদব্রজে বা গোযানে যাইতে হয়। সাইকেল আরোহিগণের পথে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না, মধ্যে মধ্যে নামিয়া হাটিয়া যাইতে হইবে মাত্র। সাইকেল, গোযান বা পাল্কী অশ্বারোহণ ব্যতীত অন্য কোন যানে যাইবার উপায় নাই। মোটর সাইকেল ও চলিবে না কারণ মধ্যে মধ্যে পথ অতি জঘন্য। রাত্রি ৪টার সময় গরুর গাড়ী মন্দিরের নিকট হইতে ছাড়িলে আন্দাজ বেলা ৯টায় আলালনাথে পৌছান যায়।
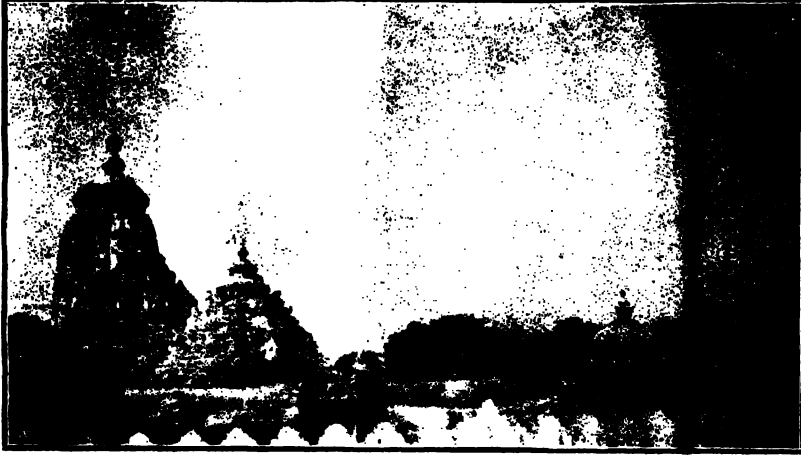
শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির
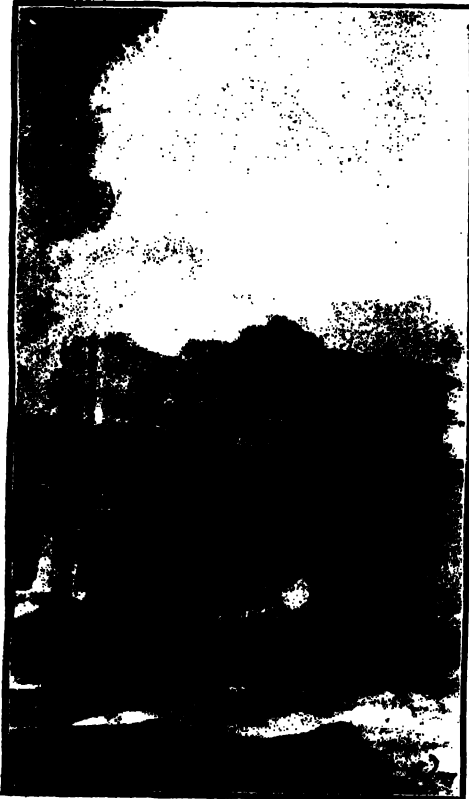
আলালনাথের মন্দির

মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া আসিয়া এই স্থান হইতে প্রথমে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের ধ্বজা দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে যে প্রস্তর খানির উপর উপবেশন করিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়াছিলেন, সে প্রস্তর খানি ভক্তগণ অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; পুরীর রাধাকান্ত মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ একটী মনোরম মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে পবিত্র প্রস্তরখানি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা এবং পূজা করিতেছেন। ইহা রাধাকান্ত মঠের অধীন। মন্দিরের পার্শ্বে সদর রাস্তার উপর পুরীর রাধাকান্ত মঠের একটী শাখা আছে। বাজার অতি নিকটে, রাধাকান্ত-মঠের পার্শ্বে। রাধাকান্ত-মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য একটী মনোরম জলাশয় খনন করাইয়া দিয়াছেন। জল অতি পরিষ্কার। পুরীধামস্থ বা অত্রস্থ রাধাকান্ত-মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণকে পূর্ব্বাহ্নে জানাইলে যাত্রিগণের

কোনই অসুবিধা হইবে না। বাজার অতি নিকটে, বাজারে উত্তম খাদ্য দ্রব্য (চাল-ডাল, ঘি-ময়দা) পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে চিল্কাহ্রদ মাত্র তিন মাইল, বরাবর গোযান চলে।

৪৫। কোণারক (কোণার্ক) বা অর্কক্ষেত্র বা সূর্য্য মন্দির—ইহা শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে দশ ক্রোশ দূরে অগ্নিকোণে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে অবস্থিত। গোযানে বা মোটর যোগে যাইতে হয়। মাঘ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে এইখানে মেলা হয়।

৪৬। শ্রীসত্যবাদী বা সাক্ষীগোপাল—পুরী হইতে রেল বা মোটর বা মোটর বাস্ যোগে যাওয়া যায়। ইহা পুরী হইতে আট মাইল দূরে উত্তরে অবস্থিত।

৪৭। ভুবনেশ্বর—পুরী হইতে রেল মোটর বা মোটর বাস যোগে যাওয়া যায়। মন্দিরে শিবলিঙ্গও আছেন এত বড় শিবলিঙ্গ আর কোথাও দেখা যায় না। ভুবনেশ্বর এক সময়ে উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। এখন বিধস্ত নগরী এবং জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। প্রবাদ আছে প্রায় এক কোটী শিব-মন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে বিদ্যমান ছিল। মন্দির ও বিগ্রহাদির শিল্প-নৈপুণ্য ভারতের ভাস্কর্য্য শিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জগতের খুব প্রাচীন প্রদেশে এরূপ শিল্প নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। ভুবনেশ্বর যে কত সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল এই ভগ্ন মন্দির এবং বিগ্রহাদির অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য কার্য্য তাহা প্রমাণ করে। বিন্দু সাগর বা সরোবর নামে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে। ইহার সন্নিকটে আরও কয়েকটী কুণ্ড আছে। কুণ্ডের জল স্বাস্থ্যপ্রদ। ভুবনেশ্বরেও রথযাত্রা উৎসব হইয়া থাকে।

বিন্দু-সাগর বা সরোবর তীরে অনন্ত বাসুদেব মন্দির বাঙ্গালী-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহা উড়িষ্যার বাঙ্গালীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

৪৮। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি

ভুবনেশ্বর মন্দির হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি দুটী সংলগ্ন ছোট পাহাড়। পাহাড়ের উপরে বহু প্রাচীন কালের বহু গুহা-মন্দির, আকাশ-গঙ্গা প্রভৃতি কয়েকটী কুণ্ড আছে। ইহা নিজে না দেখিলে সঙ্ক্ষেপে বা লেখনী দ্বারা বোঝান অসম্ভব। এইস্থান হইতে ধউলি পাহাড় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

—:*:—

হরিহরছত্রের মেলা *

শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

(১)

হরিহর ছত্রের মেলা খুব ভারী মেলা। এমন মেলা ভারতের আর কোথায়ও হয় না। এ মেলায় দেশ দেশান্তর থেকে কত লোক আসে, কত শত শত সাধু-সন্ন্যাসী একত্র জুটে, কত হাতী, ঘোড়া, উট, গরুর ক্রয়-বিক্রয় হয় তা'র ইয়ত্তা নাই। জ্ঞান হ'য়ে পর্য্যন্ত এই কথাই শুনে আস্‌ছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও দিন এই ভারত-প্রসিদ্ধ মেলা দেখবার সুযোগ ঘটে ওঠে নি। ঘটবার আশাও বড় একটা ছিল না: কারণ এতাবৎ জীবনের অধিকাংশ সময় 'আসামে'ই অতিবাহিত হ'য়েছে। বাংলাদেশ জন্মভূমি হ'লেও, কখনও যে 'বাঙ্গলার মাটি, বাংলার জল' উপভোগ

* ছিন্নু (রাঁচি) সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।

করবো সে কেবল দুরাশা বলে বোধ হ'ত। তাই নিয়তিচক্রে যখন 'ভাঙ্গা বাংলা' আবার জোড়া লাগলো তখন আসাম হ'তে অব্যাহতি পেলাম বটে, কিন্তু সোনার বাংলায় আমার স্থান হ'ল না। দাসত্ব-শৃঙ্খলের সজোর টানে একেবারে বাংলা ডিঙ্গিয়ে এসে পড়্‌লুম এই বিহারে।

হরিহর ছত্রের মেলা যে স্থানে সংঘটন হয়---সে স্থানের নাম শোণপুর। শোণপুর বেঙ্গল এণ্ড নর্থ ওয়েষ্টার্ণ

হরিহরছত্রের মেলা—"বয়েল-হট্টা"

রেলওয়ের একটি জংশন ষ্টেশন। সে বৎসর যে সময় মেলা আরম্ভ হয় তখন কার্য্যোপলক্ষে আমি ছাপরায় ছিলাম। ছাপরা থেকে শোণপুর রেলে দেড় ঘণ্টার পথ।

সে দিন রবিবার। সকালে চা-পানের পর একবার 'বী' দাদার পাড়ায় বেড়াতে যাই। গিয়ে দেখি 'বী'দাদার বাসায় অনেকগুলি ভদ্রলোক জমায়েৎ হ'য়েছেন। সকলে মিলে অনেকক্ষণ হ'তেই নানারকম কথাবার্ত্তা, বাক্‌-বিতণ্ডা, তর্ক-বিতর্ক, গাল-গল্প ইত্যাদি হচ্ছিল। আমি যাবার পরও আলোচনা সমভাবেই চলেছিল। তা'র পর যতই বেলা বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো সে সব আলোচনা-প্রসঙ্গও ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হ'য়ে আস্‌লো এমন সময় ধীর মন্থর-গতি অশ্বযানারোহণে 'স' দাদা সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। 'স' দাদা মৃদু ও মিষ্টভাষী এবং সদালাপী। যথোচিত নমস্কারাদি আদান-প্রদানের পর জনৈক বন্ধু তুললেন শোণপুরের মেলার কথা। এই মেলার কথায় সেই রুদ্ধপ্রায় আলোচনা স্রোতে যেন নূতন জীবন সঞ্চারিত হ'ল। ক্রমে একজন, দু'জন তিন জন করে অনেকেই মেলায় যাবার বাসনা জানালেন। কেহ কেহ সেই দিন দুপুরেই যেতে প্রস্তুত। কিন্তু পরিশেষে স্থির হ'ল পরদিন সকালের ট্রেণে যাওয়া হ'বে।

পরের দিন ছিল সোমবার পূর্ণিমা। সেই কার্ত্তিক-পূর্ণিমার দিনই মেলায় বেশী ভীড় হয়। শোণপুর হ'চ্ছে গণ্ডক নদীর দক্ষিণ কূলের উপর গঙ্গা-গণ্ডক সঙ্গমের অতি নিকটে। কার্ত্তিক-পূর্ণিমার দিন গঙ্গাস্নানের জন্য রাশি রাশি লোক একত্রিত হয়—ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ, অক্ষম-সমর্থ। মেলা হয় সেই উপলক্ষে।

(২)

সোমবারে খুব সকাল সকাল স্নানাদি করে তো ষ্টেশনে যাওয়া গেল। ট্রেণ আস্‌বার কথা ৬-৫৬ মিনিটের সময় কিন্তু ৭॥টা বেলার পরও ট্রেণের দেখা নেই। সেটা কিছু আশ্চর্য্যজনক কথা নয়, কারণ একে এই "বেঙ্গল ও নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেল" অনিয়মিকতার জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছে, তাতে এই মেলার ভীড়, ট্রেণের বিলম্ব হ'বারই কথা। বিশ্রাম গৃহের কিন্তু মৎকুণ সকুল চেয়ারে বসে এমন ব্যতিব্যস্ত হ'তে হ'ল, ষ্টেশনের ভূমণ্ডল প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই রকম পা ব্যথা করতে লাগলো। এদিকে আটটাও প্রায় বাজে, তবুও গাড়ীর দেখা নাই! ক্রমে যখন বিরক্তি পূর্ণ-মাত্রায় উঠেছে—এমন সময় সুমধুর বংশীনিনাদে অস্তিত্ব জানিয়ে ৮ ডাউন বাষ্পীয়রথ খানি নয়ন-পথে দেখা দিল। গাড়ীতে উঠে একবার হাঁফ ছেড়ে নেওয়া গেল। শোণপুর পৌছোতে প্রায় ১॥০ ঘণ্টা লাগ্‌বে; সুতরাং সময় কাটাবার জন্যে সব আজগুবি গল্প জুড়ে দেওয়া হ'ল। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প সব বিষয়েরই আলোচনা হ'ল। প্রত্নতত্ত্বের তো কথাই নেই এমন কি শ্রীরামচন্দ্র জনকপুরে সীতা আনতে যা'বার সময় কোথায় ভূগর্ভে বাণ নিক্ষেপ করে জল পান করেছিলেন তা'ও সাব্যস্ত হ'য়ে গেল।

শোণপুরের পারঘাট

এই রকমে প্রায় ১৫।২০ মিনিট পরে প্রথম ষ্টেশনটী পার হওয়া গেল। এখনও মাঝে তিনটী ষ্টেশন—শাস্তা, দিঘওয়ারা ও বনওয়ার চক। এই ষ্টেশন তিনটীর সঙ্গে কিছু পৌরাণিক সম্বন্ধ আছে বলে অনেকের বিশ্বাস। জনশ্রুতি, দক্ষ-অনুষ্ঠিত শিব-রহিত যজ্ঞে পতির অপমানে সতীর দেহ-ত্যাগের পর সতীদেহ স্কন্ধে যখন ভগবান ভূতনাথ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে উন্মত্তের মত ত্রিভুবন ভ্রমণ করছিলেন সেই রুদ্র কোপানলে আকাশ ও অবনীতল যখন কম্পমান তখন বনমালী বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে সতীদেহ খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন। (বিষ্ণু চক্রে সতীদেহ ৫১ অংশে বিভক্ত হয় এবং যে যে স্থানে সেই অংশ পড়েছিল সেই সেই স্থান এক একটী পীঠস্থান বলে তীর্থস্বরূপ হ'য়েছে)। সেই সময় তাঁর চক্র যে স্থানে পতিত হয়—সেই স্থানের নাম হয় 'বনমালী চক্র'। আর তারই অপ-ভ্রংশ হ'য়েছে "বনওয়ার চক'। তা'র পর সতীদেহ খণ্ড-বিখণ্ড হ'লে ভগবান পদ্মযোণি ও বিশ্বাত্মা নারায়ণ ভয়াকুল দিক সকলকে অভয় প্রদান করেন যেখানে সে স্থানের নাম হয় 'দিক্-বরা' সেই 'দিক্‌বরা' থেকে অধুনা নাম হ'য়েছে 'দিঘ্‌ওয়ারা'। এ বিষয়ে আবার মতান্তরও আছে। 'দিগম্বর' থেকেও 'দিক্‌ওয়ারা' নাম অনুমিত হয়। অর্থাৎ উন্মত্ত ভৈরব এই স্থানে 'দিগম্বর' হ'য়েছিলেন। এই দিঘ্‌ওয়ারার কাছে অম্বিকা স্থান ব'লে একটী জায়গা আছে; সেটী এ অঞ্চলে একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ বলে পরিগণিত। এই অম্বিকা-

স্থানে এক বহু পুরাতন মন্দির আছে। তা'র অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন অম্বিকা ভবানী। সেই দেবীর নামানুসারেই স্থানের নাম 'অমি' বা 'অম্বিকাস্থান' হয়েছে। মন্দিরের সম্মুখে একটী স্থান দক্ষ রাজার 'যজ্ঞ-কুণ্ডের' স্থান বলে আজও নির্দ্দিষ্ট হয়। দক্ষরাজা না কি এইখানেই যজ্ঞ করেছিলেন! (আমরা তো জানি হরিদ্বারের কাছে কনখলে দক্ষ-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল)। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে এইখানেও একটী মেলার সংঘটন হয়। তারপর দিক সকলকে অভয় বর প্রদান করে দেবগণের সঙ্গে দক্ষাদির জীবনার্থ ব্রহ্মা ভগবান ভবের স্তব কর্‌তে আরম্ভ করলেন। তাঁর স্তুতিতে সন্তুষ্ট হ'য়ে ভোলানাথ আশুতোষ যেখানে শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, সে স্থানের নাম হয় 'শান্ত'। সেই 'শান্ত'র অপভ্রংশ হয়েছে এখন 'শান্তা'! এ কেবল জন-শ্রুতিই মাত্র, কিংবা বাস্তবিকই এর কোনও পৌরাণিক ভিত্তি আছে, তা' প্রত্নতাত্ত্বিকগণের বিবেচ্য বিষয়। সত্য হ'ক বা মিথ্যা হ'ক কথাকয়টী নিতান্ত অসঙ্গত বলে তো বোধ হয় না।

(৩)

বনওয়ারচক ষ্টেশনে এসে গাড়ীখানি পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই বি, এন, ডব্লিউ রেল কোম্পানীর অন্নে পুষ্ট কর্ত্তব্য-পরায়ণ একাধিক টিকেট কলেক্‌টর সাহেব, যাত্রীগণের নিকট টিকিটের তাগিদ সুরু করে দিলেন। শোণপুরে বড় ভিড় হয় বলে মেলার সময় এক ষ্টেশন আগে থেকেই টিকিট সংগ্রহ করা হয়। কেহ কেহ মন্তব্য প্রকাশ করলেন "এ বছর মেলায় তেমন লোক জমায়েৎ হ'বে না।" কেন না তাঁদের মতে "৮নং ডাউন গাড়ী বোঝাই হ'য়ে আসছে না।" রেল কোম্পানীর অভিধানে 'বোঝাই' শব্দের অর্থ কি তা' বল্‌তে পারি নে, কিন্তু গাড়ীতে স্বচ্ছন্দে বসে থাকার মত স্থান তো ছিলই না অধিকন্তু সকল বিপদ তুচ্ছ করে ট্রেণের দু' পাশে বাদুড়ের মত লোক ঝুলতে ঝুলতে এসেছিল। সে যা' হ'ক্‌ শোণপুর ষ্টেশনে এসে দেখা গেল প্লাটফরমে লোকের ভিড়ের অবধি নেই। সঙ্গের জিনিসপত্র কুলির মাথায় চাপিয়ে দিয়ে সেই পিপীলিকা শ্রেণীবৎ জনস্রোত ভাসমান তৃণখণ্ডের মত কখন মৃদু, কখন ... ধাক্কা খেতে খেতে রাস্তায় তো এসে পড়া গেল। রাস্তায় এসেই "বী" দাদা ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে দু'খানি ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করে ফেললেন। তাতে বোঝাই করা হ'ল সঙ্গের যাবতীয় জিনিস, কয়েকটী শিশু ও কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে। আমরা সকলে গন্তব্য স্থানে পদব্রজে যাওয়াই সাব্যস্ত করলাম। গাড়ী দুখান আগে চলে গেল।

আমাদের যেখানে বাসস্থান নির্দ্ধারিত হ'য়েছিল, তা'র নাম "গোলঘর"। সেই 'গোলঘরের' পূর্ব্বদিকের খোলা ময়দানে আমাদের জন্যে এক প্রকাণ্ড তাঁবু ফেলা হ'য়েছিল। এসব বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হ'তেই "বী" দাদা তাঁর মক্কেলের মারফৎ সম্পন্ন করে রেখেছিলেন। "গোল ঘরে" উপস্থিত হ'য়ে দেখা গেল স্থানটী একদিকে শোণপুর রেলওয়ে ষ্টেশন ও অন্যদিকে মেলার কেন্দ্রস্থলের প্রায় মাঝামাঝি। স্থানটী বেশ চতুর্দ্দিকে খোলা এবং রেল লাইনের পাশেই অবস্থিত। এই 'গোলঘরে' হচ্ছে বি, এন, ডব্লিউ রেলপথের এসিষ্টাণ্ট ট্রাফিক ইন্সপেক্টারের আফিস্‌ ও তদীয় কর্ম্মচারী "রা" বাবুর আবাস স্থান। সেই স্বল্প পরিসর স্থানের মধ্যে "রা" বাবু তখন সপরিবারে বাস করতেন। যদিও তাঁরই সৌজন্য ও উদারতায় তাঁর বাসার পাশেই আমাদের' শোণপুর-অভিযানের' শিবিকা সন্নিবেশ হ'য়েছিল, তবুও একদল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাঁর বাস-সন্নিধানে জটলা হ'য়ে তাঁর অসুবিধার কম কারণস্বরূপ হ'য়ে ওঠে নি। সুখের বিষয় "রা" বাবু অত্যন্ত ভদ্রলোক এবং যৎপরোনাস্তি অতিথিপরায়ণ। তাঁর আতিথ্য ও সদাশয়তায় আমরা সকলেই মুগ্ধ ও আপ্যায়িত হ'য়েছিলাম। আমাদের "বী" দাদাও উদ্যোগে ও কার্য্য-তৎপরতায় কিছু কম ন'ন। বলা বাহুল্য আমরা অনেকে বোধ হয় তাঁর ভরসাতেই শোণপুর-অভিযানে অগ্রসর হ'য়েছিলাম।

আমরা "গোলঘরে" পৌঁছুবার আগেই দলের অন্যান্য লোক সেখানে জমায়েত হয়েছিলেন। সকলে মিলে সমস্ত দিনের একটী মোটামুটি 'প্রোগ্রাম' ঠিক করা গেল। মেলা দেখ্‌তে যাওয়ার কথায় কারও কারও মতভেদ দেখা গেল; কারণ কাহারও কাহারও ইচ্ছা আহারাদি সমাপন

করে মেলা দেখ্‌তে যান, আবার কেহ বা যতদূর সম্ভব মেলা প্রদক্ষিণ করে এসে আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার বাসনা জানালেন। আমরা কয়েকজন শেষোক্ত মতের পোষকতা করেছিলাম। আমি, সপুত্রক "স"দাদা ও জনৈক জামাইবাবুর সঙ্গে মেলা দেখ্‌তে বা'র হ'লাম। জামাইবাবুর সঙ্গে যাওয়ার আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। তিনি একদিকে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী পুরুষ, অন্যদিকে দিব্য সৌখীন ও আলোকচিত্র-বিদ্যায় যথেষ্ট বুৎপত্তিশীল। আমার সঙ্গে একটা ছোট আলোক-যন্ত্র ছিল; সুতরাং তার উপস্থিতির সুযোগ ছাড়তে আমি মোটেই ইচ্ছুক ছিলাম না। মেলা প্রদর্শন করার সময় আমাদের "গাইড" হলেন "স" দাদা। তাঁর যত্ন ও সৌজন্য ছাড়া স্বল্প-সময়ের মধ্যে মেলার যাবতীয় দর্শনীয় বস্তুর দর্শনলাভ ঘটা দুরূহ হ'য়ে উঠতো।

ঘটনাস্থলের সম্মুখীন হ'য়ে দেখলাম—ওঃ কি বিপুল জনসংসদ! তবুও না কি এবার তেমন লোক জমায়েৎ হয় নি! সর্ব্বনাশ এর ওপর 'তেমন' লোক জমায়েৎ হ'লে অবস্থা যে কি হ'ত তা' বল্‌তে পারি নে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই বিষম ভীড়ের মধ্যে মিশে যাওয়া গেল। বিহার-রমণীর কঠিন-কোমল হস্তে চালিত জাঁতা-নিষ্পেষণ কালে গোধূম সমূহের কি সুখানুভব হয় বল্‌তে পারি নে, কিন্তু সেই কোলাহলপূর্ণ জনসঙ্ঘের মধ্যে একের পর একের অবিরত নিষ্পেষণ ও ধাক্কা-সুখ আমাদের পক্ষে যে কতদূর তৃপ্তিদায়ক হ'য়েছিল তা বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রেই কল্পনা করতে পারবেন; কিন্তু আমরা কিছুতেই পিছুপাও হই নি। সেই দুপুরের প্রখর রৌদ্র মাথায় করে যতক্ষণ "মাথার ঘাম পায়ে না পড়েছিল" অথবা ডিষ্ট্রীক বোর্ডের ধূলিময় পাকা রাস্তায় পরিভ্রমণ করে 'পায়ের ধূলো না মাথায় উঠেছিল,' ততক্ষণ দারুণ উৎসাহের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম কোথায় কি! কিন্তু কোথায় কি, তার বিস্তৃত বিবরণ পাঠকগণকে দিতে হ'লে একখানি ছোট অভিধান সংকলন করতে হয়। কাজেই পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হ'বার ভয়ে সে বিষয়ে উপস্থিত ক্ষান্ত হ'লাম। নীচে একটু আভাসমাত্র দেওয়া গেল।

(৪)

জামাইবাবুর ফরমাস ছিল, লাল মাছ নিয়ে যাওয়া। কাজেই আমরা যে দিকে রঙ্গীন মাছ প্রভৃতির দোকান বসে, সেই দিক থেকে বেড়াতে আরম্ভ করবার সংকল্প করলাম। "গোলঘর" থেকে বেরিয়ে রেল লাইনের পাশ দিয়ে আমরা গন্তব্য স্থানে যাচ্ছিলাম। এক জায়গার এক ব্যাপার দেখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়াতে হ'ল। সেরূপ দৃশ্য আমি জীবনে কখনও দেখি নি। সে জায়গাটার নাম "বয়েল-হাট্টা" কত শত, কত সহস্র কত শতসহস্রাধিক অনডুহ-বলীবর্দ্দের যে একত্র সমাবেশ হ'য়েছে, তা'র ইয়ত্তা নেই! রেল লাইন থেকে দক্ষিণ দিকে দিক্‌চক্রবালরেখা পর্য্যন্ত যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল সেই এক দৃশ্য। সে স্থানকে "বয়েল-হাট্টা" না বলে "গো-সমুদ্র" বল্‌লেও চলে। কিছুক্ষণ আমরা সেই "গো-সমুদ্রের" পাশ দিয়ে দিয়ে পাখীর আড্ডার দিকে যেতে লাগ্‌লাম। কত রকম রং-বেরঙের যে পাখী দেখা গেল, তা' বলা যায় না। দেখলে নয়ন-মন জুড়িয়ে যায়, যেন চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না! কত শালিক, চড়ুই, ময়না, শ্যামা—কত দোয়েল, বুলবুল ময়ূর, তোতা—কত ডাহুক, কপোত, কাকাতুয়া—সমস্ত পাখীর নামও জানি নে; আহা! কিবা তাদের নাচের ভঙ্গীমা—কিবা মধুময় কলরব হয় তো আমারই বুঝবার ভুল। বুঝি সেটা তাদের আনন্দ কোলাহল নয়—রুদ্ধ, ব্যথিত প্রাণের করুণ রোদন! বুঝি বা তাদের সে নর্ত্তন নয়—মুক্তপক্ষ হওয়ায় ব্যাকুল চঞ্চল প্রয়াস! কে জানে কি! সেখানে থেকে যাওয়া হ'ল যে দিকে গাছ-গাছড়ার পালা। দেখলাম—কত সুদৃশ্য কুসুম-শোভিত পরগাছা, কত সুন্দর সুন্দর ক্রোটন, ক্রিসেন্‌থাস—কত কস্‌মস্‌ ডালিয়া, প্যানশী, পাপি—কত গোলাপ, বেলী, চামেলি, চাঁপা—কত জাতী, যুঁই, হাসনা-হানা—কত অশোক,জবা,শিউলি,গাঁদা ফুলের গাছ—নাম বলে শেষ করা যায় না। কত তাল ভাল আম, জাম, পেয়ারা, লিচু গাছের কলম—আরও কত কি মনোহর গাছ পালা—কত ওষধি-বনস্পতির একত্র সমবায়—চোখে না দেখলে অনুমান করা যায় না। সে স্থানটাকে একটা মনোরম বৃক্ষ-বাটিকা, অথবা একটা ছোটখাটো 'বোটানিকেল গার্ডেন

বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। সেই সব গাছ-গাছড়া ও কলম ইত্যাদির-ক্রয় বিক্রয়ও মন্দ হয় না।

এই সব দেখতে দেখতে বেলা ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগলো। আমরা তবুও সেই ভুপুরের দারুণ সূর্য্যকর মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পশ্চাৎপদ হ'লাম না। রাস্তার ত্ব'ধারে সারি সারি কত বা দোকান। কোথাও সেতারা-এস্রাজ বাঁশীর রাশি কোথাও কাঁচের—কোথাও চীনে মাটির—কোথাও পিতল, কাঁসা বা এলুমিনিয়মের সুদৃশ্য বাসনের ব্যূহ কোথাও নয়ন-রঞ্জন কার্পেটের গালিচা,সতরঞ্চি কিংবা কম্বলের স্তূপ— কোথাও মনোহারীর দোকানে মনোমোহকর কত বিবিধ সামগ্রীর অপূর্ব্ব শোভা—কোথাও অলঙ্কার-প্রিয় বিহার-মহিলার নিতান্ত বাঞ্ছনীয় সহজ-সুলভ নানা রঙ্গের কাচের বা গালার চুড়ি এবং ততোধিক বরণীয় ললাট-শোভন "টিকুলির" বিচিত্র বিন্যাস—কোথাও কাপড় জামা, শাল-দোশালার বিরাট্ প্রদর্শনী—কোথাও বা থিয়েটার-দলের নানা ভঙ্গীময় বিজ্ঞাপনের প্রতি নিরীহ "দেহাতী" লোকের বিস্ময়-বিমুগ্ধ কটাক্ষ—কিংবা তথাকথিত "হিন্দু-হোটেলের" চপকাটলেটলোলুপ অথচ হিন্দুয়ানী রক্ষায় যত্নপর হিন্দু তনয়ের সপ্রতিভ বা সভয় চাহনী, কোথাও ময়রা দোকানে বিবিধ মিঠাই তৈয়ারী করে বসে হালুয়াই,—ঘিওরা, জিলাপি, খাজা অগণন—ত'ার চার ধারে মাছি ভন ভন— বিরণীর ভয়ে রেখেছে জ্বালিয়ে ঘুঁটের আগুন তাতে ধুনো দিয়ে—কোথাও বা তামাকের পাতা—পানের বাহার, সিগারেট, বিড়ি, জরদা, সিগার—ইত্যাদি—ইত্যাদি কত কি স্বতঃই যেন অনুসন্ধিৎসু দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তা'রপর আমরা গেলাম হয়-হস্তীর আড্ডার দিকে। দেখলাম 'লাল-কালো সাদা আসমানি জরদা' নানা প্রকারের কত অসংখ্য তুরগতুরঙ্গিণী—কেহ ঘন ঘন হ্রেষারবে রত— কেহ বা অধীর চঞ্চলতায় অপেক্ষা করছে কা'র যেন তূর্য্য-সংকেত—কেহ বা পায়ের ক্ষুর দিয়ে মাটি খুঁড়তে উদ্যত— কেহ দাঁড়িয়ে আছে নিতান্ত অথর্ব্ব অপটুর মত। * * বড় বড় আমগাছের তলায় স্থানে স্থানে কঠিন নিগড়-বদ্ধ কত বিশালকায় বলিষ্ঠ বারণ—স্তব্ধভাবে যেন কি চিন্তায় মগ্ন! হয় তো বা আপনাপন অতীত অবস্থালোচনায় আকুল! অতীতের সেই স্বাধীনতার দিন—যখন পর্ব্বত-পুলিনে ইচ্ছামত বিচরণের অবকাশ ছিল—যখন সরিৎ-সরোবরের শীকর জলে অবগাহন করে তৃষা নিবারণে তৃপ্তি হ'ত— যখন 'পদ্মবনে পদে দলে কোমল মৃণাল ছিঁড়ে ভক্ষণ' করবার সুযোগ ঘটত—এখন আর সে সুখ নেই—এখন 'হীনবল নরের অধীন' হয়ে দিন যাপন করতে হয়।* *

* বাজী-গজের আশে-পাশে দেখা গেল অনেক দ্বি-ককুদ বণিগ্বহের সমাবেশ—'কুব্জ পৃষ্ঠ ন্যুব্জ দেহ'—কদাকার রূপ মরুপ্রিয় স্তিমিতনেত্রে বোধ হয় সাহারার স্বপ্ন দেখছিল। এই উটগুলিকে হাতীর আশে পাশে রাখার একটা উদ্দেশ্যও আছে শুনলাম! হাতী কোনও কারণে সহসা দুঃশাসন হ'য়ে উঠলে এই উট গুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয়—তারা এমন কৌশলে গজেন্দ্রের কুলোপানা কাণ ধরে টান্‌তে থাকে যে কর্ণ-বেদনায় কাতর করী অবিলম্বে শান্ত হ'তে বাধ্য হয়।

বোধ হয় এক শোণপুর ব্যতীত—এত হয়-হস্তী-মরু-দ্বিপের একত্র অবস্থান, শুধু ভারতের কেন, পৃথিবীর অন্য কোথায়ও পরিদৃষ্ট হয় না।

এইবার ফিরবার পালা সুরু হ'ল। সকলে স্থির করা গেল, গঙ্গা-গণ্ডকের কূলে সন্ন্যাসীর জটলা দেখে, তা'রপর দেবদর্শন করে বিজয়ী বীরের মত, তৃপ্ত-চিত্তে শিবিরে ফিরবো। যে কথা সেই কাজ। নদীতীরে এসে দেখি খেয়াঘাটে বড় বড় মহাজনী কিস্তিতে কত লোক গবাদির সঙ্গে পারাপার হচ্ছে—কত যাত্রিবাহী উন্নত-মাস্তুল ছোট বড় তরী তীরে ভিড়িয়ে আছে—নদীর ঢেউ গুলি তা'দের-গায়ে আছড়ে পড়ে চঞ্চল করে তুল্‌ছে। যেন বল্‌ছে,তোরা সরে যা—সরে যা;—আমরা অনন্ত কাল হ'তে আকুল হ'য়ে ওই অনাদি দেবের চরণ ধু'তে ছুটে আসছি— আমাদের লুটিয়ে পড়তে দে—বাধা দিস্ নে। চোখ ফিরিয়ে দেখি শত শত সাধু-সন্ন্যাসীর অদ্ভুত গোষ্ঠী। কাহারও মাথায় কত কালকার রুক্ষ দীর্ঘ জটাসম্ভার—কাহারও মাথায় শুধু চৈতন, অঙ্গে গেরুয়া আচ্ছাদন—কেহ কাপালিক নরখুলীধৃত—কীলক শয্যায় কেহ বা শায়িত—কেহ ক্ষপণক অসংবৃত দেহ—কেহ—ঊর্দ্ধবাহু ঊর্দ্ধপাদ কেহ—ত্রিপুণ্ড্রক-রেখা কাহারও কপালে—ঘোর রক্ত দাগ শোভে কারো ভালে—

কেহ আছে বসে স্থির যোগাসনে—কেহ মগ্ন ধ্যানে স্তিমিত নয়নে—কারো ধিকি-ধিকি জ্বলে দুই আঁখি—কেহ ইষ্টনাম বলে থাকি থাকি—কারো মুখে শুনি শুধু 'সীয়ারাম'—কাহারও বদনে 'হরেকৃষ্ণ' নাম—কারো বাজে গাল বম্-বম্-বম্—কেহ দেয় মুখে গঞ্জিকায় দম—কেহ দণ্ডধারী—কেহ বামাচারী—ছিন্ন কন্থা সাজে কেহ বা ভিখারী। বর্ণনার অতীত সব। কেবা প্রকৃত সাধু, কেবা ছদ্মবেশী, বোঝা যায় না। কিন্তু—

যে ধরেছে সাধুবেশ—নেমেছে সে জলে,
মাছ ধরে উঠিবেই আপন কৌশলে।

স্মরণ-বাণী

বাস্তবিক পক্ষে অনেকের দ্বারা উপেক্ষার চোখে দৃষ্ট হ'লেও, তাদের সকলেই হয় তো উপহাস বা অবজ্ঞার পাত্র নয়। হয় তো খুঁজলে এমন লোকও পাওয়া যায়, যাঁরা জ্ঞানে গরীয়ান্—সাধনায় সিদ্ধকাম হ'য়েছেন। যাঁরা প্রকৃতই জগতের কল্যাণকামী—আর্ত্তের অশেষ সান্ত্বনার পথ-প্রদর্শক। কিন্তু দৃপ্ত যৌবনের রাজটীকা ললাটে পরে সে গূঢ় সন্ধান পাওয়া যায় না। একটু শোকতাপের ঘা না খেলে—হৃদয় একটু নরম না হ'লে—সে সন্ধানের প্রবৃত্তিও মনে জাগে না।

এক জায়গায় দেখলাম পর্ব্বত প্রমাণ "পুরী-কচুরি'। সমাগত সাধু-সেবার জন্য সঞ্চিত হ'য়েছে। সে যে কি বিরাট্ ব্যাপার চোখে না দেখলে, ধারণায় আসে না। একবার সাধ হ'য়েছিল, সেই সামগ্রীর সদ্ব্যবহার দেখে নয়ন সার্থক করবো—কিন্তু ততখানি অপেক্ষা করবার মত ধৈর্য্য ছিল না।

আমরা এই সব দেখে শুনে মন্দির লক্ষ্য করে অগ্রসর হ'লাম। যতই মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হ'তে লাগলাম, ততই শুনতে পেলাম শত সহস্র কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি—"জয় জয় হরিহরনাথ।" মন্দিরের নিকটে গিয়ে সাধ্য হ'ল না যে দেব-দর্শন করি। বোধ হয় অযুত লোকের ভিড় দেবতার দ্বারে। দেবতার চরণ যুগলে জল-অঞ্জলি দেবার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু দূর হ'তে সে জল আর দেবতার পায়ে পৌঁছুচ্ছে না। পুরোবর্ত্তী জমাট লোকের গায়ে সে জল লেগে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবু তাতেই সব সুখী—তাতে সন্তুষ্ট। উদ্দেশ্য তো ব্যর্থ হচ্ছে না। অন্তর্য্যামী ভগবান অন্তরের আকুলতা তো বুঝতে পারছেন!

আমরা মন্দিরাধিষ্ঠিত বিগ্রহের উদ্দেশে সভক্তি প্রণাম জানিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলাম। * * *

আমার এক মিত্রবরের তত্ত্বাবধানে আহারাদি প্রস্তুত হ'য়ে গিয়েছিল। ভাত, বিড়ির দাল, একটা গোলাম-ঘণ্ট আর ওলের আচার। সে দিন তাই যেন বড় মধুর, বড় উপাদেয় বোধ হ'য়েছিল; অবস্থাবিপাকে তাতেই যেন অশেষ তৃপ্তি, অপার আনন্দ অনুভব করেছিলাম। তবে ওলের আচারের কথা অনেক দিন ভুলতে পারি নি—এখনও মনে হ'লে গলা কুট্ কুট্ করে।

শোণপুরের কিন্তু এত প্রসিদ্ধি কেন, আর মেলার নাম হরিহর ছত্রের মেলা কেন হ'ল, এখানে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'এক কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে এক জায়গায় লেখা আছে,(৮ম স্কন্ধ ২য়,৩য়, ৪র্থ অধ্যায়) যে পুরাকালে ত্রিকুট নামে এক পর্ব্বত ছিল। [এই ত্রিকুট থেকে 'ত্রিহুত হয় নি তো?] সেই পর্ব্বত ছিল অতিশয় শ্রীমান্ চারিদিক ক্ষীরোদ সাগরে বেষ্টিত দশ সহস্র ক্রোশ উচ্ছ্রিত—চারিদিকে তত সহস্র ক্রোশ বিস্তীর্ণ। সেই পর্ব্বতের লৌহ রৌপ্য ও স্বর্ণময় তিনটী শৃঙ্গ ছিল; সেই জন্যই পর্ব্বতের নাম হ'য়েছিল ত্রিকুট। সেই ত্রিকুট শিখর সর্ব্বদা কত রকম বৃক্ষ-লতা গুল্ম ও নির্ঝর-জলপ্রপাতে শোভিত হ'য়ে থাকতো। কন্দর সকল ক্রীড়া-কারী সিদ্ধচারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও অপ্সর-কিন্নরে পরিপূর্ণ ছিল। আর ছিল সেই পর্ব্বতপ্রদেশে ভূরি ভূরি নির্ম্মল সরিৎ ও সরোবর। সেই সকল সরিৎ সরোবর-পুলিন সর্ব্বদা মণিময় বালুকায় ঝক্ ঝক্ করতো। সরোবরে কত স্বর্ণপদ্ম ফুটে থাকতো, কত অসংখ্য কুমুদ-কহ্লার, উৎপল ও শত-পত্রের শোভায় সরসীজল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতো। কত মত্ত ভ্রমরের প্রমোদ গুঞ্জনে, কত হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক ও সারসের কলস্বরে, সরোবর মুখরিত ছিল। তা ছাড়া, আরও কত কি যে শোভনীয় জিনিস ছিল, তা বর্ণনা করা যায় না। একদিন ত্রিকুট পর্ব্বতের এক গভীর অরণ্য থেকে নিদাঘ তাপে সন্তপ্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত এক গজেন্দ্র, যূথপরিবৃত হ'য়ে ঐ রকম এক বিপুল সরোবরের তীরে এসে উপস্থিত হ'ল।

তার সঙ্গে ছিল অনেক মদমত্ত হস্তিনী আর বহুতর মদস্রাবী করভ। তাদের সকলের ঘোর দাপটে ত্রিকুট-গিরি যেন কেঁপে উঠ্‌ছিল। যাই হক, সেই যূথপতি গজেন্দ্র. সরোবর সমীপে এসে, তাতে অবগাহন করে তো প্রথমে নিজের, ক্লান্তি দূর কর্‌লে তার পর কাঞ্চন, পদ্ম ও উৎপলরেণুমিশ্রিত সুগন্ধ নির্ম্মল অমৃত জল পান করে যথেষ্ট তৃপ্ত হ'ল। নিজে এই রকম তৃপ্ত হ'য়ে, শুঁড় দিয়ে সরোবরের শীকর জল তুলে, সদয় গৃহী পুরুষের মত, আপনার স্ত্রী করেণু ও সন্তান করভ-গুলিকে স্নান ও পান করাতে আরম্ভ কর্‌লে। এখন সেই গজেন্দ্র ছিল অতিশয় দুর্ম্মদ সে এই রকমে ক্রীড়ামত্ত হ'য়ে সরোবর জল একেবারে তোলপাড় করে তুল্‌লে একবারও ভাব্‌লে না সে তার ওরূপ ব্যবহারে কারও কষ্ট হ'তে পারে। এ দিকে ঘটনাক্রমে, সেই সরোবরে ছিল একটা বলবান গ্রাহ (কুম্ভীর)। সে গজেন্দ্রের দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হ'য়ে দৈব প্রেরিতের মত এসে, যেন কি এক বিজাতীয় ক্রোধে ঐ গজেন্দ্রের এক খানা পা মক্কম করে কামড়ে ধরে, গভীর জলের মধ্যে হড়হড়িয়ে টেনে নিয়ে যা'বার উপক্রম কর্‌লে হাতীরও শরীরে বল কম ছিল না। সে নিজের বল-বিক্রম প্রকাশ কর্‌তে যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌লে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। হাতীও নড়তে চায় না, নক্রেরও জেদ তা'কে টান্‌বেই। সুতরাং রীতিমত এক তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল; সে যুদ্ধে যোগ দিলে এক দিকে জলের যত কুমীর আর অন্য দিকে বনের যত হাতী; এই রকমে হাজার বৎসর অতীত হ'য়ে গেল হাতী কিংবা নক্রের কারও নিধন সাধন হ'ল না। দেবগণ ব্যাপার দেখে বড় আশ্চর্য্য বোধ করলেন। ক্রমে গজেন্দ্রের উৎসাহ শক্তি ও শারীরিক বল কমে আস্‌তে লাগ্‌ল। হাতী ক্রমে অবসন্ন হ'য়ে পড়ল। তারপর যখন তা'র প্রাণ প্রায় সঙ্কটাপন্ন হ'ল, তখন আর উপায়ান্তর না দেখে যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের আশ্রয়, সেই শুদ্ধ পরমেশ্বরের একান্ত শরণাপন্ন হ'য়ে, তাঁকে কাতরভাবে ডাক্‌লে—

"হে গোবিন্দ রাখ শরণে আপ বিপদভারে—"

ভক্তের কাতর প্রার্থনায় অখিলের আত্মা ভগবান হরি, সেই আর্ত্ত গজেন্দ্রকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে, গরুড়ের ওপর আরোহণ করে মহাবেগে সেই সরোবর-তীরে এসে উপনীত হ'লেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এলেন স্বর্গের যত দেবদেবী। তাঁদের আস্‌তে দেখে গজেন্দ্র নিজের শুঁড় দিয়ে সরোবর থেকে একটী পদ্ম তুলে, সব দেবতার উদ্দেশে বল্‌লে—'হে নারায়ণ! হে অখিলের গুরু! হে ভগবন! আমি সকলকে নমস্কার করি—আমাকে আজ এ আসন্ন সঙ্কট থেকে রক্ষা করুন।' ভগবান্ হরি তা'কে অত্যন্ত পীড়িত দেখে দয়ার্দ্র হ'য়ে, হাতী ও নক্র উভয়কেই সরোবর থেকে উদ্ধার কর্‌লেন, আর চক্র দিয়ে গ্রাহের মুখ বিদারণ করে, গজকে করে দিলেন। ভগবানের এই কাণ্ড দেখে সব দেবতারা কুসুম বর্ষণ কর্‌লেন, স্বর্গে অমনি দুন্দুভি বেজে উঠ্‌ল,—গন্ধর্ব্বেরা নাচ-গান আরম্ভ কর্‌লে আর ঋষি, চারণ আর সিদ্ধগণ সেই পুরুষোত্তমের স্তব কর্‌তে লাগ্‌লেন।

এখন কথা হচ্ছে, এই গজ-গ্রাহের উভয়ের কেহই বাস্তবিক গজ ও গ্রাহ ছিলেন না। গ্রাহ ছিলেন তাঁর পূর্ব্বজন্মে একজন গন্ধর্ব্ব-সত্তম, তাঁর নাম ছিল তিনি একদিন অনেকগুলি গন্ধর্ব্ব-রমণী সঙ্গে নিয়ে এই সরোবরে স্নান কর্‌তে এসেছিলেন। ঘটনাক্রমে সে দিন দেবল মুনি নামে একজন ঋষিও সেখানে স্নান কর্‌তে এসেছিলেন! হূ-হূ সেই সকল রমণীর সঙ্গে কেলি কৌতুকে মত্ত হ'য়ে জলের মধ্যে দেবল মুনির পা ধরে টেনে ছিলেন। দেবল মুনির তা'তে বড় রাগ হয়। তিনি সেই রাগের বশবর্ত্তী হ'য়ে হূ-হূকে শাপ দেন যে তিনি গ্রাহ হ'য়ে সেই সরোবরে বাস কর্‌বেন। মুনি ঋষির অভিশাপ কখনও মিথ্যা হয় না। সেই দিন থেকে হূ-হূ গ্রাহরূপে সেই সরসী জলে অবস্থান করছিলেন। ভগবানের চক্রাঘাতে গতাসু হ'বামাত্রই, তিনি সদ্যঃশাপ থেকে বিমুক্ত হ'য়ে, আশ্চর্য্য গন্ধর্ব্ব দেহ ধারণ করে ভগবানকে প্রণাম করে, আবার দিব্যধামে চলে গেলেন। এ দিকে, সেই গজ ছিলেন তাঁর পূর্ব্বে জন্মে পাণ্ড্যদেশীয় এক রাজা। তিনি ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন বড় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। একদিন তিনি মৌনব্রতী জটাধর তাপস হ'য়ে মলয়াচলে গিয়ে ভগবৎ-পূজায় নিবিষ্টচিত্ত হ'লেন। সেই সময় মহাতেজা অগস্ত্য মুনি তাঁর শিষ্যের সঙ্গে ইন্দ্রদ্যুম্নের আশ্রমে এসে উপস্থিত হ'লেন। রাজা তখন ভগবদারাধানায় মগ্ন ছিলেন।

অগস্ত্য মুনির সেখানে আসার কথা কিছুই টের পেলেন না। সে কালে ঋষিরা আবার বড় শীগ্‌গীর রেগে উঠতেন। অগস্ত্য ভেবেছিলেন, রাজা উঠে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করবেন। কাজেই রাজাকে তা' না করতে দেখে তাঁর খুব রাগ হ'ল। তিনি রেগে বল্লেন, "এ নিশ্চয় অসাধু, তা' না হ'লে এ ব্রাহ্মণের এমন অপমান করে। হাতী যেমন স্তব্ধ বুদ্ধি, তাই, এও সেই রকম স্তব্ধ হ'য়ে আছে। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, এ পরজন্মে গজ হ'য়ে জন্ম গ্রহণ করবে।" আগেই বলেছি মুনি ঋষির অভিশাপ কখনও ব্যর্থ হয় না। সুতরাং ইন্দ্রদ্যুম্ন পরজন্মে এই হস্তী হ'য়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও শ্রীহরির স্পর্শে বন্ধন মুক্ত হ'য়ে ভগবানে সরূপতা প্রাপ্ত হ'লেন।

কিংবদন্তী, প্রাগৈতিহাসিক সময়ের এই গজগ্রাহের যুদ্ধের শেষ ঘটনাস্থল হ'চ্ছে এই শোণপুর। এখানে ভগবান্ হরি, মহাদেব হরের সম্মুখে গজ-গ্রাহকে মুক্ত করেছিলেন বলে শোণপুর হরিনাথের মিলন ক্ষেত্র বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তারপর কথিত আছে যে তাড়কা বধ করে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে ফিরবার সময় শ্রীরামচন্দ্র যখন শোণ নদী পার হ'য়ে এই পথ দিয়ে সীতাকে লাভ করতে জনকপুরে যান, তখন তিনি এখানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করে শ্রীহরি হরনাথ মহাদেবের নামে তা' উৎসর্গ করেন। সেই হ'তে মেলার নাম হ'য়েছে "হরিহর ছত্রের মেলা।" কিন্তু হায় কিংবদন্তী! কোথায় সেই ত্রিকূট পর্ব্বত আর কোথায় সেই সরোবর! শোণপুরে এখন তা'র অণুমাত্রও আভাস পাওয়া যায় না।

———:*:———

মোহ

(উপন্যাস)

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীমতী নীলিমা দেবী

ত্রেত্রিশ

এদিকে দেবব্রত যখন বাড়ী ফিরিল তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। সে বাড়ী ঢুকিতেছে আর সেই সঙ্গে এমির রিক্‌স বাড়ী ঢুকিল। এমি দেবব্রতকে দেখিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "খুব তো ছেলেকে দেখা হচ্ছে! চোরের মত কোথায় আমোদ করতে যাওয়া হ'য়েছিল?" দেবব্রত একটু উত্তেজিতভাবে বলিল, "তোমার কাছে আমার কোন কৈফিয়ৎ দেবার দরকার নেই, তোমার মত আমারও বোধ হয় আমোদ করবার অধিকার আছে। আমি যাই করি না কেন তোমার তা'তে কি আসে যায়?" কথাটা বলিয়া দেবব্রত নিজগৃহে চলিয়া গেল। ছেলেটীর সেই রাত্রে জ্বর হইয়া সমস্ত রাত্রি বড় ছট্‌ফট করিল ও মাঝে মাঝে কাঁদিয়া উঠিতেছিল। দেবব্রত তাহাকে সারারাত্রি বুকে লইয়া কাটাইল। এমি পাশের ঘর হইতে সব শুনিতে পাইতেছিল—সেও বিনিদ্র ছিল। সে ছেলের জন্যই নাচ হইতে সে রাত্রে সকাল সকাল ফিরিয়াছিল। কিছু পরে সে একবার উঠিয়া গিয়া দেবব্রতকে বলিল, "তুমি সারারাত বসে আছে, এখন আমি না হয় একটু দেখি, তুমি শোও।"

"তোমাকে কষ্ট করতে হ'বে না, আমার ছেলে আমি দেখ্‌ছি।"

এমিরও রাগ হইল, সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল, শুধু বলিয়া গেল, "আমার কর্ত্তব্য তো আমি করলুম, না যদি চাও তো আমি কষ্ট করি কেন?"

"যথেষ্ট কষ্ট সয়েছ ভবিষ্যতে আর কষ্ট সইতে হ'বে না।"

ছেলেটী কয়দিন বেশ ভুগিল। এই কয়দিন দেবব্রত ও এমির বড় একটা কথাবার্ত্তা হইত না, তাহারা শুধু বাহিরের লোকের সামনে ঠাট বজায় রাখিত। এমি দুই বেলা নিয়ম রক্ষা করিতে ছেলের কাছে যাইত। সকালে যখন ডাক্তার আসিতেন তখন এমি গিয়া ডাক্তারকে সাহায্য করিত আর সন্ধ্যাবেলা প্রত্যহই দেখিয়া যাইত। ছেলেটীও বড় একটা মাকে চাহিত না, তাহার মুখের বুলি হইয়াছিল "বাবা"।

প্রীতি প্রত্যহ দরওয়ান পাঠাইয়া খবর লইত। একদিন দেবব্রতের বাড়ীর সামনের রাস্তায় দাঁড়াইয়া প্রীতি দ্বারবানকে ভিতরে খবর লইতে পাঠাইয়াছে, এমন সময়ে ডাক্তারের সহিত কথা বলিতে বলিতে দেবব্রত রাস্তায় আসিল। প্রীতিকে দেখিয়া সে তাহার দিকে আসিল ও ডাক্তারকে তাহার সহিত পরিচিত করাইতে শুধু বলিল, "মিসেস, ঘোষ।" ডাক্তারের মুখে প্রীতি শুনিল যে ছেলেটী আর তিন চারিদিন গেলেই সুস্থ হইয়া উঠিবে।

দশদিন চলিয়া গিয়াছে। খোকা এখন সুস্থ, সে চাকর ও আয়ার সহিত বেড়াইতে গিয়াছে। দেবব্রত এমির কাছে গিয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটী আবশ্যকীয় কথা আছে, যদি অনুগ্রহ করে আমার বসবার ঘরে এস তো বাধিত হ'ব। অবশ্য তোমার যদি এখন সময় না থাকে পরে হ'লেও চল্‌বে।"

এমি বলিল,—'আমার আজ এখন সময় আছে। তোমার বসবার ঘরে যাবার দরকার কি, এই ঘরে কথা হয় না?"

"আমি একটু নিরালায় কথা কইতে চাই।"

এমি ঘরে আসিলে দেবব্রত দরজা ভেজাইয়া দিল। সে বলিল, "দেখ, এমি, শেষের চার বৎসর আমাদের যে ভাবে দিন কাট্‌ছে তা' আর সহ্য হচ্ছে না। আমি চুপ করে সকল রকম অত্যাচার সয়ে আসছি, একদিনও তোমাকে কিছু বলি নি। কেবল ছেলেটাকে যত্ন করবে, ভালবাসবে এইটুকু চেয়েছিলাম, আমার নিজের জন্য আমি তোমার কাছে কিছু চাই নি। নীরবে এত সহ্য করেছি কেন জান? শুধু আমি একটা দোষ করেছিলাম —তোমাকে একটা বিষয়ে প্রতারণা করেছিলাম বলে।" এই বলিয়া দেবব্রত দুইখানা ফটো বাহির করিয়া একখানা এমির হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "চিন্‌তে পারছ?"

ছবিখানা দেবব্রতের ও প্রীতির, বিবাহের সময় বরকনে বেশে। এমি ছবিটা একটু ভাল করিয়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, "এ তো তোমার ছবি দেখছি, মেয়েটীকে তো চিন্‌তে পার্‌ছি না—কিন্তু এ যে বর-কনের ছবি।" দেবব্রত উত্তর না দিয়া অন্য ছবিখানা এমির হাতে দিল, সেটী প্রীতির পনের বৎসর বয়সের ছবি। সেই সময়ই এমির সঙ্গে দেবব্রতের প্রথম প্রণয় ও ভাব হইয়াছে। ছবিখানা বিলাতে প্রীতি পাঠাইয়াছিল, কোণে ইংরাজীতে ছিল, "আমার স্বামীকে, প্রীতি।"

এই ছবি দেখিয়া এমি লাফাইয়া উঠিল ও রাগে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

দেবব্রত বলিল, "এমি বস, সব কথা আজ তোমাকে শুনতে হ'বে।" এমি তখন জ্ঞানহারা হইয়া দেবব্রতকে খুব গালি বর্ষণ করিতে লাগিল, এমন কি সকল ভারতীয়কে মিথ্যাবাদী, লম্পট, কাপুরুষ, প্রবঞ্চক পর্য্যন্ত বলিতে ছাড়িল না। দেবব্রত এমিকে বাধা দিয়া বলিল, "আমাদের জাতকে খবরদার গাল দিও না। আমাকে তুমি প্রবঞ্চক বল্‌তে পার, অন্য কিছু বল্‌বার অধিকার তোমার নেই। তোমার প্রতি আমি কোন রকম অন্যায় একদিনের জন্যও করি নি।"

"আমাকে রক্ষিতা করে আবার বল্‌ছ অন্যায় কর নি?"

"তুমি আমার রক্ষিতা নও, আমার বিবাহিতা স্ত্রী। তোমাকে তো আমি হিন্দুমতে বিয়ে করেছি, সে কথা ভুল না—তোমার মর্য্যাদার এতটুকুও হানি করি নি, বরং তোমাকে পাবার জন্য আমি বালিকা স্ত্রী, মা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন সকলকে ছেড়েছিলাম। তোমাকে সুখী কর্‌বার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, কি না করেছি, এমি? প্রতিদানে আমি তোমার কাছে কি পেয়েছি? তুমি নিজের আমোদ-প্রমোদ নিয়ে সর্ব্বদা এত

মত্ত যে তুমি আমার দিকে চেয়ে দেখ না। আমার জন্য কিছু না করায় কিছু যায় আসে না, কিন্তু তুমি নিজের ছেলেকে কি রকম অবহেলা করেছ, তা'কে একটুকু স্নেহও দাও নি। যাক আমি তোমাকে দোষ দেবার জন্য ডাকি নি, নিজের দোষ স্বীকার করব বলে ডেকেছি। একটু ধৈর্য্য ধরে আমার কাহিনী শোন।

ছবি দেখে বোধ হয় তুমি বুঝতে পেরেছ যে সেদিন যে মেয়েটী খোকাকে কোলে তুলে নিয়েছিল সেই আমার প্রথমা স্ত্রী। প্রীতিরা যে এখানে আছে তা' আমি মোটেই জান্‌তাম না। আমার বিয়ের অল্প পরেই সরল প্রাণা বালিকা প্রীতিকে রেখে আমি ইংলণ্ডে যাই। সেখানে সঙ্গীহীন হ'য়ে কাতর ছিলাম, এমন সময় প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মাঝখানে তোমার রূপে মোহিত হ'য়েছিলাম। তোমাকে বিয়ে করবার আগে প্রীতির কথা মনে পড়ে একবার ইতঃস্ততঃ করেছিলাম। কিন্তু শেষে যখন তুমি হিন্দু ধর্ম্ম নিলে তখন আমার আর বাধা রইল না। তোমাকে বিয়ে করে অবধি সব ভুলে তোমাকে নিয়ে প্রাণ ভরে ফেলেছিলাম। প্রীতির চিন্তা একেবারে মন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম ও ভেবেছিলাম এ জীবনে আর প্রীতির সহিত সম্পর্ক রাখ্‌ব না। সে পথে প্রীতিও কোন বাধা দেয় নি, তা'র পর অকস্মাৎ দশজনের সামনে লক্ষ্ণৌএ প্রীতির সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। আমরা কেহই প্রস্তুত ছিলাম না, কাজেই পরস্পরকে যে চিনি তা' ধরা পড়ে গেলুম; তখন প্রীতি সকলের কাছে বন্ধু বলে পরিচয় দিল। তারপর লক্ষ্ণৌএ রোজ দেখা হ'ত, বেশ বন্ধুভাবে মেলামেশা করেছি। প্রীতিও বেশ সহজভাবে ব্যবহার করত। প্রীতির রূপে গুণে, মিষ্ট-স্বভাবে যে তার সংসর্গে আসত সেই বিমোহিত হ'ত,সকলেই তার সঙ্গ পাবার জন্য ব্যস্ত হ'ত, ক্রমেই সে আমার বাঞ্ছিত হ'য়ে উঠ্‌ল। যে সময়টুকু প্রীতির কাছে থাকতাম সেইটুকুই শান্তিতে কাট্‌ত, অন্য সময় যে কি কষ্টে কেটেছে তা' বল্‌তে পার্‌ব না। তখন কাতর হৃদয় নিয়ে তোমার কাছে ভিক্ষা করেছি আমার কাছে ফিরে যেতে কিন্তু তখন তুমি আমার প্রাণের ব্যথা বোঝ নি। আমি প্রীতিকে ভুল্‌তে চেয়েছিলাম কিন্তু তোমার নিষ্ঠুরতার ফলে তা' পারি নি। প্রীতি একদিনও আমাদের সুখ নষ্ট করতে বা সংসার ভাঙ্গতে চায় নি, সে বরাবর আমার স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে, তাহার নিজের মনের জ্বালা নীরবে সহ্য করেছে। তার প্রতি যে অন্যায় আমি করেছি তা' আমাকে আত্মগ্লানিতে অনুতাপে ভরে দিয়েছে, চার বছর অহর্নিশি মনস্তাপে দগ্ধ হ'য়েছি। আমি একবার প্রীতিকে বলেছিলাম যে তা'কে আমি স্ত্রী বলে স্বীকার করব কিন্তু, প্রীতি তা, হ'তে দেয় নি, পাছে তার ফলে তোমার সুখের ব্যতিক্রম হয়।

এমিলী তখন বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "প্রীতিও তো তোমাকে ভালবাসে তখন এত কথায় কি কাজ।"

প্রীতির ভালবাসা পাবার আশা করার স্পর্দ্ধা আমার নেই। আমি তার প্রতি যে অন্যায় করেছি তা'তে আমার ওপর তার রাগ ও ঘৃণা হ'বার কথা; কিন্তু প্রীতিকে আমি বুঝতে পারি না, সে একটী হেঁয়ালি। তার আমার প্রতি ব্যবহারে প্রণয় বা ঘৃণার কোন চিহ্ন দেখতে পাই না। প্রীতিকে পাবার আশা ছিল না বলেই তোমার প্রণয় ভিক্ষা করতে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তুমি আমাকে বুঝতে পারও নি, চাও ও নি, তুমি কেবল নিজের স্বার্থ, আমোদ ও ভোগবিলাসে ব্যস্ত।

এর আগে দু'তিনবার প্রীতির সঙ্গে দেখা কর্‌তে চেষ্টা করেছি, সে কিছুতেই দেখা দেয় নি, এত দিন পরে তা'কে দেখলাম খোকাকে কোলে নিয়ে। এমি, আমি যে কত বড় পাষণ্ড তা এইবার আমি সকলকে জানিয়ে দেব, এ প্রবঞ্চকের জীবন আর আমি সহ্য করতে পার্‌ছি না। আমার প্রীতির প্রতি সেইটুকু কর্ত্তব্য আছে, পৃথিবীর লোক জানুক যে সে আমার স্ত্রী। প্রীতি যে আমার কাছে আসবে বা কখনও ভালবাসবে সে আশা আমি করি না, তবুও আমি তাকে আর ভুলতে পারব না। তবে যদি কখনও প্রীতি আমাকে চায় বা আমি তার কোন কাজে লাগতে পারি তো আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াব।

এখন সব শুনে তুমি কি বল তাই জান্‌তে চাই। তুমি আমার সন্তানের জননী, তুমি আমকে যা' করতে বল্‌বে তাই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু এমি এই শেষের প্রায় পাঁচ বৎসর আমাদের যে রকম করে দিন কাটছে তা আর সহ্য

হচ্ছে না। যদি এক সঙ্গে থাক্‌তেই হয় তো অন্ততঃ শান্তি চাই।"

এমি এই কথা শুনিয়া একেবারে আগুণের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি কি মনে কর যে আমি তোমাদের এ দেশের মেয়েদের মত দাসী বাঁদি যে তোমার প্রতারণার কথা শুনে আর তোমার আর এক স্ত্রী আছে জেনেও তোমার সঙ্গে থাক্‌ব? তোমাদের মত নীচ জঘন্য লোকেদর সঙ্গে আমার মেশবার বা থাক্‌বার আদৌ ইচ্ছে নেই—এই অপমানের পর আর এদেশে থাক্‌বারও দরকার নেই। আমি এ বিয়েটাকে বিয়ে বলেই ধরি না, দেশে ফিরে গিয়ে আবার নিজধর্ম্মে ফিরে যাব, জীবনের এই পাগ্‌লামী যত-দূর সম্ভব ভুল্‌তে চেষ্টা করব। তোমার ছেলেকেও আমি চাই না। ছেলের ভার নিতে আমি পারব না। তুমি তোমার ছেলে নিয়ে থাক আর আমার প্রতি যে অন্যায় করেছ তার জন্য উপযুক্ত প্রতি বিধান কর।"

"বেশ, তুমি যা চাও তাই হ'বে কিন্তু তোমার মত পাষাণী আমি কখনও দেখি নি, নিজের সন্তানকে পশুরাও ত্যাগ করতে পারে না। তোমার ব্যবহারে আমি বিশেষ বিরক্ত হয়েছি—মর্ম্মান্তিক কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু তুমি যাতে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পার তা'র ব্যবস্থা আমি করব। যেদিন থেকে তুমি চলে যাবে সে দিন থেকে আমার ব্যাঙ্কার তোমাকে মাসিক খরচ পাঠাবে কিন্তু তোমার বাবুয়ানির খরচা আমি বইব না।"

"আমার তা'তে তো ভারি ক্ষতি, বরং আমি নিশ্চন্ত থাক্‌ব। আমার সব গোছগাছ করতে কিছু সময় লাগবে, মার্চ্চ বা এপ্রিল নাগাদ্ আমি দেশে চলে যাব। শীতটা শুধু এখানে কাটিয়ে যেতে চাই।"

"আমি তো তোমাকে যেতে বলি নি বা এখনই যাও বলি না, তোমার যত দিন ইচ্ছা থাক্‌তে পার। তুমি আমার স্ত্রী সে তুমি মান আর নাই মান। এত রাগের কারণ বুঝি না, তোমার উপর তো কিছুই অন্যায় হয় নি। যা' কিছু অন্যায় করা হ'য়েছে প্রীতির উপর। আর আমি একদিনও লুকিয়ে রাখব না যে প্রীতি আমার ধর্ম্মপত্নী আর তোমাকে সংসার থেকে তাড়িয়ে দেব না। স্বেচ্ছায় তুমি যা করবে তাই হ'বে।

"তোমার যা ইচ্ছা কর গে। আমি যদিও এদেশে থাক্‌ব, তোমার বাড়ীতে থাক্‌ব না। এক শহরে থাক্‌লেও হোটেলে থাক্‌ব।" বলিয়া এমি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দেবব্রত বাধা দিয়া বলিল, "তুমি রাগের মাথায় যে সব স্থির করেছ তাহা আমি ধার্য্য করছি না, তুমি স্থির হ'য়ে ভাল করে ভেবে যা করতে চাইবে তাই হবে—আমাকে পরে বলো যে কি স্থির করেছ।"

"আমি স্থির ভাবে ভেবে চিন্তে বলেছি আর ভাববার কিছু নেই।"

চোত্রিশ

দেবব্রত ও এমির ঝগড়ার পর দশদিন কাটিয়া গিয়াছে। তাহারা এখনও একত্রেই আছে, এমি তাহার বন্ধুদের কাছে এখনও কোন কথা প্রকাশ করে নাই। সে কিন্তু স্থির করিয়াছে যে শীতের শেষে স্বদেশে ফিরিবে এবং যতদিন এ দেশে থাকিবে ততদিন সে পূর্ণমাত্রায় আমোদের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবে। তাহার রূপের পূজারী অনেক, কাজেই তাহাদের মধ্যে কাহাকে না কাহাকে লইয়া সে সর্ব্বদাই মত্ত থাকিত। সে সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে কাটাইত। দেবব্রতের ও তাহার ছেলের সহিত এমির এখন কোন সম্পর্কই নাই, বাড়ীর সঙ্গে শুধু তার শোবার সম্পর্ক।

দেবব্রত একা একা দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়ায়। সে শুধু প্রীতির নিকটে থাকিবার প্রলোভনে সেখানে আছে, তদ্ভিন্ন মুশুরী বাস তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। দূর হইতেও যদি প্রীতিকে দেখিতে পায় তাহা হইলেও সে তৃপ্ত হয়। দেবব্রত পত্রদ্বারা প্রীতিকে সকল সমাচার অবগত করাইয়াছে কিন্তু প্রীতির কাছে আর যায় নাই। সে কি বলিয়া প্রীতির কাছে যাইবে? প্রীতিকে দিবার মত তাহার যে কিছুই নাই। কোন মুখে সে প্রীতিকে তাহার হইতে বলিবে? আরও একটা কারণে সে জীবনের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার পথে অগ্রসর হইতে পারিল না। সে তো প্রীতিকে ভালবাসে কিন্তু প্রীতি তো তাহাকে ভাল-বাসিতে পারে না। প্রীতি তাহার স্ত্রী সত্য কিন্তু সে তো প্রীতিকে জোর করিয়া লইতে পারে না। যদি কখনও

প্রীতি স্বেচ্ছায় তাহার কাছে আসে তবেই তাহাদের মিলন হইবে। দেবব্রত কি করিবে কোথায় যাইবে কেমন করিয়া দিন কাটাইবে দিবানিশি ভাবিয়াও ঠিক করিতে করিতে পারিল না।

দেবব্রতের আর এক চিন্তার কারণ তাহার পুত্র, কেমন করিয়া তাহাকে মানুষ করিবে? দেবব্রতের মা কি এমির গর্ভজাত পুত্রকে লালন-পালন করিতে সম্মত হইবেন? এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আবার প্রীতির কথা মনে পড়িল। প্রীতি কি কখনও এই ছেলেকে লইতে পারিবে, না সে প্রীতির চক্ষুঃশূল হইবে? দেবব্রত তো ছেলেকে কিছুতেই ছাড়িতে পারিবে না। প্রীতিকে সমস্ত দেহ মন দিয়া ভালবাসিলেও সে তো পুত্রকে ভুলিতে পারিবে না, সেই পুত্র যে তাহার নয়নের মণি। হঠাৎ একটা কথা স্মরণ করিয়া দেবব্রতের কেমন একটা অজানা পুলকে দেহ শিহরিয়া উঠিল। কিছুদিন পূর্ব্বে খোকা তাহাকে মহাআনন্দে বলিতেছিল যে সেই রাণীটার সহিত পথে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে তাহাকে খুব আদর করিয়াছিল—দেবব্রত নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল বলিয়া বিশেষ বিবরণ শোনে নাই।

সেদিন দেবব্রতের প্রাণ কেমন হু হু করিতেছিল, কেমন একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় মন অস্থির কিন্তু এ চাঞ্চল্যের কোনই কারণ সে নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। আজই তো বাড়ী হইতে চিঠি পাইয়াছে, তাঁরা তো সকলেই ভাল আছেন। হয় তো নিজের মনের অশান্তির জন্য এই রকম মনে হইতেছে। সারাদিন কোন রকমে কাটাইয়া বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইল। প্রথমে যে দিকে জনসমাগম সেইদিকে গেল, ভাবিল যে দশজন পরিচিত ব্যক্তির সহিত দেখা হইলে গল্প-গুজব করিলে মনের ভার কাটিয়া যাইবে। পরিচিত অনেকের সহিতই দেখা হইল কিন্তু বেদব্রত শান্তি পাইল না, সে অন্য পথে ফিরিল।

তখইন সন্ধ্যা দেবী তাঁহার ধূসর আঁচলখানি পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া দিতেছেন, দিনমণি অস্তগত কিন্তু পশ্চিম আকাশে মেঘের কোলে তখনও অস্তমিত রবির প্রভা প্রস্ফুটিত। ক্রমে ঘরে ঘরে দীপমালা জ্বলিয়া উঠিতেছে, দূরে নীচে দেরাদুনের আলোকগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ পাহাড়ের গায়ে উঁকি মারিতেছে। সকলই মনোরম কিন্তু দেবব্রতের সে শোভায় মন নাই, সে আনমনে পশ্চিম গগণের জ্যোতিঃ লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে। তাহার ভাগ্য রবিও আজ নির্ব্বাণোন্মুখ, সে কি সেই বিদায় দীপ্তির খোঁজে ছুটিয়াছে? তাহার কোন আশা নাই তবু সে লক্ষ্যহীন ভাবে ছুটিয়াছে।

হঠাৎ তাহার প্রীতিকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বড় প্রবল হইল। প্রীতিই তাহার শেষ আশা, বুঝি তাহাকে একবার দেখিলে তাহার সহিত দুইটী কথা কহিলে তাহার এই দগ্ধ তাপিত হৃদয় শান্ত হইবে। অনুশোচনায় যে সে আজ কয়দিন বিনিদ্র, শান্তিহারা—কি ভুলই জীবনে সে করিয়াছে। তখন তো সে সুখলালসায় এমির পাণিগ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু এমির সংসারে সে তো সুখ পাইল না। কিন্তু এখন সে সত্যই প্রকৃত সুখ ও শান্তির জন্য লালায়িত।

দেবব্রত আনমনে চলিয়াছে, পথে কিছুরই দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, বিপরীত দিক হইতে যে এক অশ্বারোহী আসিতেছিল তাহার খেয়াল নাই। অশ্ব থামিল, আরোহী তাহাকে সম্বোধন করিলেন, তখন দেবব্রতের সংজ্ঞা হইল। সে চাহিয়া দেখিল সে তাহার সম্মুখে ডাক্তার, যিনি তাহার খোকাকে দেখিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত তাঁহার চারি বৎসরের আলাপ।

ডাক্তার বলিল, "মিষ্টার ঘোষ, আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম, আপনি ভিন্ন অন্য কোনও বাঙ্গালীকে আমি চিনি না।"

উত্তরে দেবব্রত বলিল, --"কেন ডাক্তার কি হয়েছে?"

"সেদিন যে তরুণীটীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন তার কথা বলবার জন্য।"

"তার কি হয়েছে, ডাক্তার?—শীঘ্র বলুন।"

"মেয়েটীর বড় বিপদ, এখন কেউ তাহার বন্ধুর কাজ করতে পারলে ভাল হয়। আজ পাঁচ দিন হ'ল তার মার অসুখ হ'য়েছে। সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল কিন্তু কাল থেকে বড় বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। নিউমোনিয়া দুইদিকেই আর হৃৎপিণ্ডের অবস্থা মোটেই ভাল নয়—তাই আমি চিন্তিত হ'য়েছি। আহা, মেয়েটী একেবারে ছেলেমানুষ, দেখলে মনে হয় ১৮১৯ বছরের—আর একেবারে সহায়-হীনা। এই সময় তাকে দেখে এমন কেউ নেই। শুনলাম

যে এখানে তাদের পরিচিত স্বদেশের লোক কেউ নেই। তার সঙ্গে তার একমাত্র আত্মীয় ঠাকুরদাদা ছিলেন, তিনিও সাত আটদিন আগে বিশেষ কাজে দেশে গেছেন, এখানে থাক্‌বার মধ্যে লোকজন। মেয়েটীর খুব ধৈর্য্য। আমাকে বাধ্য হ'য়ে তাকেই সব খুলে বল্‌তে হ'ল, আর কেউ তো নেই। শুনে তার মুখের চেহারা এমন হ'য়ে গেল যে আমার ভয়ই হ'ল যে এখনই মূর্চ্ছা যাবে। কিন্তু সে শীঘ্রই মন বেঁধে নিজেকে সাম্‌লে নিলে ও ধীর শান্ত ভাবে দুই তিন খানা তার কর্‌লে ও সব ব্যবস্থা বুঝে নিলে। সে আমাকে কিছুতেই আস্‌তে দেবে না, বেচারা বড়ই বিচলিত হয়েছে। আমাকে সারারাত থাক্‌তে বলেছে, আমি রাত্রে যাব বলে এসেছি। মিষ্টার ঘোষ, আপনি কি তা'কে সাহায্য করতে পারেন না।"

দেবব্রত "আমি এখনই যাচ্ছি" বলিয়া এমন কি ডাক্তারের নিকট বিদায় পর্য্যন্ত না লইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল।

প্রীতিদের বাড়ী পৌঁছিয়া সে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল সিঁড়ির নীচে এক বৃদ্ধ ভৃত্য বসিয়া আছে। সে তাহাকে বলিল, "আমাকে ওপরে নিয়ে চল, তোমাদের দিদিমণির সঙ্গে দেখা করব। চাকরটা দেবব্রতের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া কিছুপরে বলিল "আপনি জামাইবাবু না?" তাহার পর নিজের মনে বলিতে লাগিল, "উঃ! কে বলে ভগবান নেই! তিনি যদি না থাক্‌বেন তো এই দুর্দ্দিনে জামাইবাবু আস্‌বেন কেন? দেবব্রত দেরী সহিতে পারিল না, সে অপেক্ষা না করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। দেবব্রত খুব সন্তর্পণে সিড়ি উঠিতেছিল কিন্তু সেই নিস্তব্ধ বাড়ীতে সেই পদশব্দ ঘরের ভিতর পৌছিল। প্রীতি মনে করিল ডাক্তার ফিরিয়া আসিয়াছেন, সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। দেবব্রতকে দেখিয়া বলিল, "আপনি কেমন করে এলেন?"

দেবব্রত সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "প্রীতি, অন্ততঃ তোমার স্বদেশীয় বলে তো আমাকে খবর দিতে পারতে। এই বিপদে তুমি একা, আমি কাছে আছি জেনেও কি ডাক্‌তে নেই? জানি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে কখনও পারবে না, তবু এই বিদেশে তো লোক অপরিচিতেরও সাহায্য নেয়—না হয় তেমনি আমায় ডাক্‌তে। ভাগ্যে এখানে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হ'ল, নইলে কিছুই জান্‌তে পারতাম না, অম্‌নি ঘুরে চলে যেতুম। তুমি না চাইলেও আমি আর এখান থেকে নড়্‌ছি না—যতদিন না মা ভাল হন।"

প্রীতি কোন কথাই কহিতে পারিল না তাহার ঠোঁট দুইটা কাঁপিতে লাগিল, সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল প্রীতিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য দেবব্রত অতি ধীরে তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহার মাথাটী নিজের বুকে রাখিয়া নিজের রুমাল দিয়া চোখ মুছাইয়া বলিল, "ভয় কি? মা ভাল হ'য়ে উঠ্‌বেন।" প্রীতি একটু শান্ত হইলে পর তাহার কাছে দেবব্রত সবই শুনিল। তখন সুরবালা অজ্ঞান অবস্থায় ভুল বকিতেছেন।

"দাদু কোথায়? কেন চলে গেছেন? তুমি কা'কে কা'কে খবর দিয়েছ?"

"দাদুকে, দাদাকে ও আমার পূজনীয়া শাশুড়ী ঠাকুরণকে—আপনার মাকে—তার করেছি। এ সংসারে এই তিন জন ছাড়া আমার আর কে আছেন? দাদুকে দুর্গোৎসবের জন্য বাড়ী যেতে হ'য়েছে। দাদা মেশোমহাশয়ের সহিত কাশ্মীর গেছে কিন্তু এখন যে কোথায় ঠিক জানি না, এখানে শীঘ্র আস্‌বার কথা আছে। সে তার পাবে কি না সন্দেহ, দাদুরও দেশে তার যেতে দেরী হবে, কাজেই যদি শীঘ্র কেহ আসেন তো মাই আস্‌বেন।"

"আমাকে ডাক নি কেন, প্রীতি?"

"আপনি তো আমার নন।"

"তুমি এখনও কি আমাকে বিশ্বাস কর না।"

প্রীতি কোন উত্তর না দিয়া দেবব্রতের আলিঙ্গন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বলিল, "মাকে দেখ্‌বেন তো চলুন, তিনি কাকেও চিন্‌তে পারছেন না।"

"আমাকে ঘরে ঢুক্‌তে ও সেবা করতে দিতে হ'বে। আমি একবার মাকে দেখে বাড়ী যাচ্ছি, এখনি ফিরে আসব।"

প্রীতি কিছুই বলিল না। প্রীতি বড়ই তৃপ্ত হইল, একজন নির্ভরযোগ্য লোক পাইয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

দেবব্রত এক ঘণ্টার মধ্যে ছেলের সব ব্যবস্থা করিয়া ও নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্য লইয়া ফিরিয়া আসিল। এমি তখন বাড়ী ছিল না, তাহাকে একটী পত্র লিখিয়া আসিল। এখানে ফিরিয়া দেবব্রত আস্তে আস্তে সমস্ত ভার লইল। অবশ্য সমস্ত বিষয়েই প্রীতির মতামত লইয়া কাজ করিতেছিল কিন্তু দায়িত্ব নিজেই সব লইল। বিশেষ প্রীতির যত্ন করা তাহার প্রধান কাজ হইল। শেষের দুইদিন প্রীতিকে কেহ মাতার শয্যা-পার্শ্ব হইতে সরাইতে পারে নাই, সে অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইয়াছে। দেবব্রত তাঁহার জন্য নিজ হস্তে খাবার আনিয়া অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। প্রীতি না খাইলে সেও খাইবে না বলিল, কাজেই প্রীতিকে খাইতে হইল।

চারিদিন জীবন ও মৃত্যুর সহিত ভীষণ সংগ্রাম চলিল, তাহার পর রোগীর অবস্থা ঈষৎ ভাল মনে হইল। তখন অপরাহ্ন পাঁচটা, রোগী বেশ সুস্থভাবে ঘুমাইতেছেন, দেবব্রত ও প্রীতি একসঙ্গে বসিয়া আছে। শেষ কয়দিন প্রীতি যেন বাস্তব জগতের জীবন্ত মানুষ ছিল না, আজ সে একটু জাগ্রত। কয়দিন সে স্নানাহার সবই কলের পুতুলের মত করিয়াছে, তাহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল—জ্ঞান ছিল শুধু তার মাতৃসেবায়। মা ছাড়া তার যে পৃথিবীতে কেহই এত আদরের নাই, তাই সে সব ভুলিয়া তাঁহারই সেবায় নিরত ছিল। নার্স ছিল বটে কিন্তু প্রীতি সবই নিজ হস্তে করিত, সে এ বিষয়ে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে। আজ প্রীতির মনে কত কথা উদিত হইল। আজ তাহার জ্ঞান হইল যে দেবব্রত এই চারিদিন তাহার পাশ ছাড়ে নাই, একটুও ঘুমায় নাই। দেবব্রত না থাকিলে প্রীতি একা কি করিত? আজ পর্য্যন্ত কেহই আসিতে পারেন নি। বিপদ মানুষের যে একা আসে না—এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। দেবব্রতের মা সঙ্গী অভাবে আসিতে পারেন নি। সুরেনবাবু পূজা-বাড়ীতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া শয্যাশায়ী। নির্ম্মলের তার ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

দেবব্রতের দিকে চাহিয়া প্রীতি দেখিল যে তাহাকে শ্রান্ত ও ম্রিয়মাণ দেখাইতেছে। সে বলিল, "আপনি একটু বাইরে ঘুরে আসুন না, আপনাকে বড়ই শ্রান্ত দেখাচ্ছে।"

"তুমিও চল না একটু নীচে বাগানে ঘুরে আসবে। মা তো ঘুমোচ্ছেন আর নার্স তো কাছে আছে।"

"না, আমি মাকে ছেড়ে যাব না, ঘুম ভেঙ্গে যদি আমায় খোঁজেন। আপনি যান, ক'দিনের কষ্টে আপনার মুখ শুকিয়ে গেছে। আমি তো আপনার দিকে মুহূর্ত্তের জন্যও লক্ষ্য রাখতে পারছি না, আপনার কত কষ্টই না হয়েছে।"

দেবব্রত বড় ব্যথিতভাবে বলিল, "ছিঃ প্রীতি, এরকম কথা বলে তুমি আমাকে বেশী কষ্ট দিলে।"

প্রীতি লজ্জিত হইয়া বলিল, "আর বলব না। কিন্তু আজ আপনাকে ঘুমোতে হ'বে।"

"ঘুমাব, কিন্তু এক সর্ত্তে—তোমাকেও ঘুমাতে হ'বে। আজ আমরা পালা করে জাগ্‌ব।"

আরও দুই তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে, প্রীতির মা অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন, বেশ জ্ঞান হইয়াছে। দেবব্রত এখনও সেই বাড়ীতেই আছে কিন্তু এখন আর সে রোগীর ঘরে থাকে না, পাছে দুর্ব্বল অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া 'শক' এ (আঘাত লাগিয়া) রোগীর অসুখ বাড়িয়া যায়। প্রীতির মুখে হাসি দেখা দিয়াছে, সে এখন সময় পাইলেই দেবব্রতের সহিত গল্প করে। প্রত্যহই সুরবালা প্রীতিকে বাগানে বেড়াইতে পাঠান, সেখানে দেবব্রতের সঙ্গে তাহার নানান্ গল্প হইত; সেই দিন ডাকে নির্ম্মলের চিঠি আসিয়াছিল, সে শীঘ্রই আসিবে, আবার অপরাহ্নে তাহারা যখন বেড়াইতেছে তার আসিল যে দেবব্রতের মাতা আসিতেছেন।

দেবব্রত প্রীতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রীতি, তোমার আপনার লোক তো সকলে আসছেন, আমাকে কি এই বার তাড়িয়ে দেবে?"

"আমি তাড়াব কেন? আপনি নিজে বোধ হয় এইবার পালাবেন, তাই আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করছেন।"

"তুমি বেশ জান আমি পালাতে কি রকম চাই। তুমি কি নির্ম্মলকে ফিরে পেলে আর আমার দিকে চেয়েও দেখ্‌বে?"

প্রীতি কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল এমন সময় দেবব্রতের চাপরাসী আসিয়া একখানা চিঠি দেবব্রতের হাতে

দিল। চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে দেবব্রতের মুখ প্রথমে সাদা পরে লাল হইয়া উঠিল। কোন কথা না বলিয়া সে চিঠি প্রীতির হাতে দিল ও চাপরাসীকে যাইতে বলিল। চিঠি এমি লিখিয়াছে, তাহাতে শুধু এই কয়টী কথা লিখিত আছে :—

"আমি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পূর্ণিমায় আগ্রার তাজ দেখতে যাচ্ছি; কাল রওনা হ'ব। এ দেশ ছেড়ে যাবার আগে সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখে যেতে চাই, তাই এখন কিছুদিন দেশভ্রমণ করব। তুমি যখন তোমার কর্ম্মস্থানে ফিরবে তখন সব ব্যবস্থা করতে একবার সেখানে যাব। এখন তুমি এখানের বাড়ী ও তোমার ছেলের ভার লও।"

"আমি কি করি বল তো?"

"এখনই বাড়ী যান, তাকে যেতে দেবেন না। মা হ'য়ে ছেলেকে ছেড়ে যেতে চায়, সে কেমন মা? হয় তো রাগে, দুঃখে যেতে চাইছে—আপনার কর্ত্তব্য তা'কে ফেরান।"

"তুমি তা'কে জান না প্রীতি, সে যা' মনে করে তাই করে, কারও কথা শোনে না। ছেলে নিয়ে আমি কি যে করব সেই আমার বড় ভাবনা হয়েছে। আমার কাজে আমাকে মধ্যে মধ্যে বাহিরে যেতে হয়, ওকে কার কাছে রেখে যাব। আমার মা'কে যে ওকে রাখ্তে বল্ব তাও হ'বে না, তিনি কি তা' রাজী হ'বেন? এই বয়সে যে ওকে মায়ের স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হ'তে হ'বে এইটাই সব চেয়ে দুঃখের বিষয়।"

"মা তো কালই আস্ছেন, ছেলের যা' হোক ব্যবস্থা হ'বে। আপনি তার মাকে যেতে দেবেন না। সে আপনার বিবাহিতা স্ত্রী তো, তাকে কি ছেড়ে দেওয়া আপনার উচিত হ'বে?"

"কাউকে কি জোর করে ধরে রাখা যায়? আর জোর করে রেখেই বা লাভ কি? যেখানে ভালবাসা নেই সেখানে একসঙ্গে বাস করা কারাবাসের মত। এমি বলেছে সে কিছুতেই থাক্‌বে না। আমি তো সেদিনও তাকে বলেছি যে বেশ ভাল করে ভেবে তবে মন স্থির করতে, সে কিন্তু দৃঢ়ভাবেই বলেছে সে ছেলে এখানে রেখেই দেশে ফিরে যাবে। শুধু ছেলের জন্য আমি তার সকল অত্যাচার মুখ বুজে সয়েছি ও আরও সইতে রাজী আছি। ছেলেটা সারাদিন কার কাছে থাক্‌বে? শুধু লোকজনদের কাছে ফেলে রেখে আমি স্থির থাক্‌তে পারব না। আমার মা এ বিয়েটাকে বিয়ে বলেই ধরেন না, এ ছেলেকে তিনি স্নেহের চোখে দেখতে পারেন না, কারণ তিনি বলেন ওর দ্বারা তার বংশের কেউ জল পাবে না। মা'র বয়স হয়েছে, তিনি কখনই ওকে নিতে রাজী হ'বেন না।" এই বলিয়া দেবব্রত বিষণ্ণ বদনে আকাশের পানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া পড়িল।

প্রীতি ধীরে ধীরে তাহার অশ্রু মুছাইয়া বলিল, "কেন এত ভাব্‌ছেন? আমার কাছে খোকাকে দিয়ে কি আপনি শান্ত হ'তে পারবেন? আমি যে ছেলে বড় ভালবাসি, আমি তাকে দেখ্‌ব।"

"প্রীতি, তুমি কি বল্‌ছ? আমার যা কিছু আছে তোমাকে সঁপে দিতে পারি কিন্তু তুমি নেবে কেন প্রীতি? তুমি কি ভেবে দেখেছ কার ছেলে তুমি নিতে চাইলে? তুমি মানবী, না দেবী?"

প্রীতি মৃদু হাসিয়া বলিল, "দেবী মোটেই নই, সামান্য মানবী। তাই স্নেহ দেবার ভালবাসবার পাত্র চাই। এখন এ সব কথা থাক আপনি বাড়ী গিয়ে একবার প্রাণপণ চেষ্টা করুন, যদি মিল হয়। সে যতদিন ভারতে থাক্‌বে আশা ছাড়্‌বেন না ও খোকাকে কারো কাছে পাঠাবেন না। খোকাকে আপনার কাছে একলা দেখে হয় তো তার সন্তানের প্রতি দয়া হ'বে। আর ছেলে হ'তে হয় তো আপনাদের আবার মিল হ'বে। সন্তানের বন্ধন বড় বন্ধন, এ বন্ধনের ফলে বহু স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটেছে।"

"বৃথা চেষ্টা—আর সে চেষ্টারও আমার বিশেষ ইচ্ছা নেই। তুমি কিন্তু যে আশা দিয়েছ তা'তে শেষে নিরাশ করবে না তো? তোমাকে জোর করে কিছু বলতে পারি না, তোমার দয়ার প্রার্থী আমি। আমি এখন যাচ্ছি রাত্রে ফিরে আস্‌ব।"

দেবব্রত বাড়ী গিয়া দেখিল এমি নিজের সব জিনিস-পত্র বাঁধাইতেছে, ছেলেটী তাহার কাছেই দাঁড়াইয়া আছে। দেবব্রতকে দেখিবামাত্র ছেলে বলিল, "বাবা, আমরা কোথায় যাব? মা কেন সব গোছ্‌গাছ্‌ করছে? আমরা কি তোমার সঙ্গে বাড়ী যাব? মা বল্লে আমি তোমার সঙ্গে

যাব মা অন্য দেশে যাবে। মা আমাদের সঙ্গে যাবে না কেন ?"

দেবব্রত পুত্রকে বলিল "তুমি তোমার মাকে বল না, তা হ'লে তোমার মা তোমাকে ফেলে যাবেন না।"

ছেলে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা, তুমি আমাদের সঙ্গে বাড়ী চল না, অন্য দেশে যাবে কেন ?"

এমি প্রথমে নিরুত্তর রহিল শুধু ছেলেকে একটু আদর করিল। বোধহয় সন্তানের কোমল স্পর্শে এমির পাষাণ প্রাণও গলিল। কিন্তু তাহার সে দৌর্ব্বল্য ক্ষণেকের জন্য, সে তখনই আবার মন শক্ত করিয়া পুত্রকে ধীরে ধীরে সরাইয়া বলিল, "এখন কাজের সময় গোল করো না, তুমি খেলা কর গে।" সুযোগ বুঝিয়া দেবব্রত এমিকে থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিল, কাতরভাবে বলিল, স্বামী-স্ত্রীতে মতদ্বৈধ ও মনোমালিন্য ঘটলে কি পুনরায় মিল হয় না।"

এমি চুপ করিয়া সকলই শুনিল,পরে বলিল,"কেন আর অত কথা বল্‌ছ, আমি মনস্থির করেছি, আমি কিছুতেই থাক্‌ব না। ছেলেটাকে পৃথিবীতে আনাই আমাদের ভুল হ'য়েছে। আমর ওর জন্য দুঃখ হয়, আমার দেশে ও তো স্থান পাবে না, আর তোমার দেশেও না, লোকে ওকে অস্পৃশ্য কুকুরের মত ঘৃণা করবে। আমি ওকে নিয়ে আমার নিজের সকল বাধা-বিঘ্নকে বরণ করতে চাই না।" তাহার পর এমিলী টাকার কথা তুলিল তাহাতে দেবব্রতের এমির প্রতি প্রগাঢ় বিতৃষ্ণা জন্মিল।

এমিলী চলিয়া যাইবার অল্প দিন পরেই দেবব্রতের ছুটী ফুরাইল। কর্ম্মস্থানে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে সে তাহার মাতাকে সকল কথা বলিয়া তাহার সহিত যাইবার জন্য অনেক স্তুতি ও সাধনা করিল। তিনি বলিলেন, "যেদিন তোমার ঘরে তোমার গৃহলক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠিত করবে, সে দিন আমি তাকে বরণ করে তুল্‌তে যাব। আমি তো তোমাকে বলেছি যে যে বাড়ীতে তার স্থান নেই সেখানে আমি যাব না, আমার সে প্রতিজ্ঞা অটুট থাক্‌বে।"

"মা, তাকে আমি কোন সাহসে আমার ঘরে আস্‌তে বল্‌ব, আমি তো তার উপযুক্ত নই। সেই বা কেন আস্‌বে ?"

সুরবালার সহিত দেবব্রতের সাক্ষাৎ হইল না, তিনি কোন কথাই জানিলেন না। ডাক্তারের মতে তাহার অবস্থা দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহাকে এ সকল কথা বলা হইল না। কিন্তু তিনি যখন আরও সুস্থ হইলেন, তখন তিনি সকলই শুনিলেন। সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইল।

এ সংবাদে সবাই সুখী কেবল নির্ম্মল হতাশ হইল। প্রীতি কখনও যে তাহার হইবে না, সে তাহা জানিত কিন্তু প্রীতি যে সকল বিষয়ে তাহার উপর নির্ভর করে, সর্ব্বদা সে যে প্রীতির সঙ্গ-সুখ পাইত তাহাতেই সে সুখী ছিল। এখন প্রীতি দেবব্রতের গৃহিণী হইবে, আর তো নির্ম্মল তাহাকে সঙ্গিনীরূপে পাইবে না। আর তো প্রীতি ছোট-বড় সব কথার পরামর্শ নিতে ছুটিয়া তাহার কাছে আসিবে না।

প্রীতি নির্ম্মলের মনোবেদনা বুঝিল, সে যতদূর সম্ভব তাহার নিকট থাকিত ও তাহার মনে শান্তি দিবার চেষ্টা পাইত। একদিন প্রীতি তাহাকে বলিল, "দাদা কেন তুমি ম্রিয়মাণ হ'য়ে আছ ? এখনও তো কিছুই স্থির হয় নি। তিনিও কিছুই বলেন নি, এমিও ফিরে আস্‌তে পারে। আর যাই হোক না কেন, আমি যেমন তোমার ভগ্নী প্রীতি তেমনই থাক্‌ব। কিন্তু দাদা, তুমি যদি সংসারী হও তো সকলের পক্ষে কত সুখের হয়।"

"প্রীতি, আবার ঐ কথা, সে আর হ'বে না, ওকথা বলে বৃথা আমাকে কষ্ট দাও কেন ? তুমি কেন বুঝতে পার না প্রীতি ? আমার কখনও মন বদলাবে না, আমার প্রাণে এ-জন্মে আর কারও স্থান হ'বে না।"

প্রীতি নীরবে রহিল।

পঁয়ত্রিশ

ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে, এমিলী ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়াছে। একমাস পূর্ব্বে দেবব্রতের পত্রে প্রীতি জানিয়াছে যে এমি গিয়াছে কিন্তু তদবধি আর কোনও খবর নাই।

তখন বৈশাখ মাস, উত্তপ্ত দিনের পর গোধূলির সাথে পাগল করা দক্ষিণ হাওয়া জনমানবকে শান্ত করিতে আসিয়াছে। প্রীতিদের বাগান ফুলের গন্ধে আমোদিত, তারই মাঝে প্রীতি একথালা ফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে, আজ তাহার মনে কত আশা-নিরাশার খেলা খেলিতেছে,

তাহার স্মৃতিপটে কত সুখ-দুঃখের কাহিনী ভাসিয়া উঠিতেছে। দশ বৎসর যাবৎ এই দিবস প্রতিবারেই প্রীতি তাহার স্বহস্তে গাঁথা মালা তাহার স্বামীর চিত্রকে পরাইয়াছে, সেই প্রতিমূর্ত্তির পদতলে কত ফুল অঞ্জলি দিয়াছে। আজ কিন্তু পুষ্পচয়নের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে অনেক আশা সঞ্চিত করিয়াছিল। কিন্তু সে আশার মধ্যে কত ভয়, বুঝি বা এবারও তাহার মালা জীবন্ত স্বামীর গলায় দিতে পারিবে না।

মালা গাঁথা শেষ হইল, প্রীতি চিন্তাকুল হৃদয়ে মালাটী তুলিয়া ধরিল, দেখিল সেটী কেমন হইয়াছে। এমন সময় তাহার এক ভৃত্য আসিয়া জানাইল, "একজন বাবু তাহার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।"

"আমার সঙ্গে দেখা করবেন, না দাদুর সঙ্গে?"

"না, তিনি বল্লেন যে আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকারী কথা আছে।"

"আচ্ছা তুমি তাঁকে এখানেই নিয়ে এস।"

আগন্তুককে দেখিয়া প্রীতি দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার রেকাবভরা ফুল নবাগতের পায়ের উপর পড়িয়া গেল। তাহার মালা হাতেই রহিয়া গেল। অতিথিই প্রথম কথা বলিল, "প্রীতি, দশ বৎসর আগে এমন দিনে এমনই সময় তোমার পাশে স্থান পাব বলে এই বাড়ীতে প্রথম পা দিয়েছিলুম। সে স্থান পেয়েও আমি তার অবমাননা করেছি, আবার সে স্থান আমায় দেবে কি? আজ আমি তোমার ক্ষমা ও দয়ার ভিখারী। এ অনুরোধ করবার স্পর্দ্ধা তুমিই আমায় দিয়েছ, মুশুরীতে তুমিই আমার মনে আশা জাগিয়েছ। এখন সে আশা পূর্ণ করবে কি, প্রিয়তমে?"

প্রীতি অধোবদন হইয়া সব শুনিল, তাহার মুখ লজ্জায় রক্তাভ হইয়া উঠিল। সে উত্তর কিছুই দিল না, কিন্তু দেবব্রতের প্রাণ সে নীরব ভাষা বুঝিল। সে প্রীতিকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিতে ব্যস্ত, কিন্তু তার পূর্ব্বে সে প্রীতির নিজমুখে স্বাগত বাণী শুনিতে চায়, তাই বলিল, "প্রীতি একবার আমার দিকে চাও, একটী কথা বলে সাহস দাও—"

"আপনার স্থান তো আপনার জন্য এতদিন অপেক্ষা করছে, আপনিই তো সে স্থান কোন দিন অধিকার করতে চান নি।"

"স্থান তো আছে কিন্তু তার সঙ্গে আমার প্রাণ যা'র জন্য তৃষিত তাকে পাবার আশা করতে পারি কি?"

প্রীতি দেবব্রতের গলায় মালাটী পরাইয়া দিয়া প্রণাম করিল। দেবব্রত ব্যগ্রভাবে প্রীতিকে উঠাইয়া আলিঙ্গন ও চুম্বন করিল। প্রীতি বলিল, "চলুন মার কাছে গিয়া তাঁর আশীর্ব্বাদ চাই।"

——:*:*:——

দম্

শ্রীঅপর্ণাচরণ সোম

দমো নাম বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।...কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ তেষাং নিগ্রহঃ শ্রবণাদিব্যতিরিক্ত-বিষয়েভ্যো নিবৃত্তির্দমঃ :—কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চক ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক বাহ্যেন্দ্রিয় নামে অভিহিত, শ্রবণাদিব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে এই ইন্দ্রিয়-দশকের যে নিগ্রহ তাহার নাম দম।

অধ্যাত্মবিদ্যা লাভের জন সাধনার পথে প্রবেশ করিতে হইলে, অন্তরিন্দ্রিয় যে মন, তাহাকে সংযত করা যেমন প্রয়োজন, বাহ্যেন্দ্রিয়গুলিকেও সংযত করা তেমনি প্রয়োজন; কারণ বাহ্যেন্দ্রিয়গুলির ব্যাপার হইতেছে কার্য্য; সুতরাং বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি সংযত হইলে কার্য্যও সংযত হইবে।

এই দম সাধন-সম্বন্ধে সদ্গুরু বলিতেছেন :—

"চিন্তাটী যাহা হওয়া উচিত, তোমার চিন্তা
যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তোমাকে তোমার
কার্য্যে কোনই কষ্ট পাইতে হইবে না।"

সদ্-গুরুর এই প্রবচনটী হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, মানুষ যাহা চিন্তা করে, তাহা সহজেই কার্য্যে পরিণত হয়; সে-জন্য কার্য্য অপেক্ষা চিন্তার গুরুত্ব বেশী। কিন্তু সাধারণতঃ লোকে তাহা বুঝে না। কিন্তু ইহা সত্য; কারণ প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বে চিন্তার উদয় অবশ্যম্ভাবী—প্রত্যেক কার্য্য চিন্তা-দ্বারাই পরিচালিত। চিত্রকর চিত্র অঙ্কিত করে, সেই চিত্র সম্বন্ধে একটা চিন্তা অগ্রে তাহার মনোমধ্যে উদিত হয়; তারপর সেই চিন্তাই তাহাকে চিত্রাঙ্কন করিতে প্রবৃত্ত করে। প্রত্যেক কার্য্যসম্বন্ধে এই কথা। উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন :—

স যথা কামো ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি।
যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে॥ বৃঃ আঃ ৪।৪।৫

'মানুষ যাহা কামনা করে, তাহা সে চিন্তা করে; যাহা সে চিন্তা করে তাহা কার্য্যে করে।" বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, ইহারা মনের দ্বারা পরিচালিত হয়। ক্রিয়া-শক্তি জীবের স্বাভাবিক (স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ—শ্বেতাশ্বতর); ইহা প্রত্যেকের অন্তঃকরণে নিহিত। যখন কোন কামনার উদয় হয়, তখন, এই শক্তি কার্য্যোন্মুখী হয়; ইহার ফলে মনে চিন্তার উদয় হয়, মনে তখন কর্ম্ম-প্রবৃত্তি জন্মে। সেই কর্ম্ম-শক্তি তখন আজ্ঞা-নাড়ী দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ে পরিচালিত হয়; তখন কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু মনে এই শক্তি ক্রিয়াশীল হইলেও, মন তাহাকে যদি ঊর্দ্ধস্রোতঃ বৃত্তি দ্বারা সংযত করে, তাহাকে আর আজ্ঞা-নাড়ী দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয় পরিচালিত হইতে না দেয়, অথবা পরিচালিত হইলেও নিরোধ-শক্তির সাহায্যে তাহাকে সংযত করে, তবে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ সংযত হয়,—আর কর্ম্ম করে না। কিন্তু সে পৃথক কথা। সাধারণতঃ মনে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি জন্মিলেই, কর্ম্ম-শক্তি আজ্ঞা-নাড়ী দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ে পরিচালিত হয়, তখন কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ মানুষ কার্য্য করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কার্য্যের আগে চিন্তার উদয় হয়, অর্থাৎ মানুষ যাহা চিন্তা করে, তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়। অতএব অচিন্তা-সম্ভূত বা অপূর্ব্বচিন্তিত কোন কার্য্য হয় না—হইতে পারে না। অনেক সময় লোকে বলিয়া থাকে "এ কার্য্যটা করিব বলিয়া আমি আদৌ চিন্তা করি নাই, কিন্তু ইহা আমি না করিয়া পারি নাই।" আসল কথা, সে নিশ্চিতই চিন্তা করিয়াছিল, তবে সে-চিন্তা বর্ত্তমানের না হইয়া অতীতের, এমন কি, হয় তো ইহজন্মের না হইয়া পূর্ব্বজন্মের হইতে পারে।

কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে পৌনঃপুনিক ও প্রবল চিন্তা দ্বারা মনের মধ্যে সেই বিষয়ের প্রভূত চিন্তা-শক্তি সঞ্চিত হয়, এবং তারপর সেই চিন্তাটী প্রকাশের যখন সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন ইহা অনিবার্য্যরূপে কার্য্যে পরিণত হইয়া পড়ে। যদি কোন সুযোগ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে সেই সঞ্চিত চিন্তা-শক্তি বহুকাল মনের মধ্যে সুপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু

সুযোগ উপস্থিত হইবামাত্র, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবেই। প্রত্যেক চিন্তা একটু একটু প্রেরণা দিয়া ইহাকে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করে, অবশেষে এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন প্রেরণাগুলির সঞ্চিত শক্তি মানুষকে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এরূপ প্রণোদিত করে যে, সে তাহা না করিয়া পারে না। মানুষের যে-সকল চিন্তা প্রবল থাকে, মৃত্যু হইলেও সেই সকল চিন্তার শক্তি নষ্ট হয় না—"যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" (ছাঃ ৩।১৪।১)—মানুষ ইহজীবনে যেরূপ চিন্তা করে, আগামী জন্মে সে সেইরূপ চিন্তা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কারণ ইহজন্মের তাহার চিন্তা, সংস্কাররূপে তাহার মনোময় কোষের 'ভূত-সূক্ষ্ম' মধ্যে লীন থাকে। এই 'ভূত-সূক্ষ্ম' অবিনশ্বর, মানুষের প্রত্যেক পথের সহগামী (১)। মানুষ পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিলেও এই 'ভূত-সূক্ষ্ম'টী তাহার পূর্ব্বজন্মের সংস্কার অনুসারে চিন্তা করিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করে। "জাতি-দেশ-কাল-ব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ" (যোগসূত্র ৪।৯) স্মৃতি ও সংস্কার একরূপ বলিয়া জাতি, দেশ, কাল ব্যবহিত থাকিলেও বাসনা ও চিন্তার আনন্তর্য্য থাকে। ইহারই নাম স্বভাব, যাহা পূর্ব্ব-জন্মের চিন্তা অনুসারে গঠিত হয়। স্বভাব অনুসারেই সে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। সেইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—"কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ" (গীতা ৩।৫)—নিজ স্বভাবানুরূপ গুণে বশীভূত হইয়া (স্বামী) মানুষ কর্ম্ম করে। সুতরাং অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মে যতটা সংশ্লিষ্ট, তাহাতে মানুষ কোন জন্মে তাহার স্বভাবের অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বজন্মের চিন্তার প্রেরণায় কোন একটা কার্য্য করিয়া ফেলিতে পারে, যাহা তাহার ইহজন্মে অ-পূর্ব্ব ,চিন্তিত, যাহা মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় অনুষ্ঠিত। ইহা সে তাহার পূর্ব্ব-জন্মের চিন্তার সংস্কারাখ্য বেগ অনুসারেই করিয়া থাকে; এমন কি ইহাকে সে বাধা দিবার চেষ্টা করিলেও সে ইহার অনুষ্ঠান না করিয়া পারে না; কারণ তাহার পূর্ব্বজন্মের চিন্তার সংস্কারের শক্তি ইহজন্মের প্রতিরোধকারিণী শক্তি অপেক্ষা প্রবল। সেইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥
গীতা ৩।৩৩

সুতরাং চিন্তার কার্য্য-প্রণালীটী বুঝিয়া আমাদের চিন্তাগুলির প্রতি অবহিত দৃষ্টি রাখা দরকার, কারণ আমরা জানি না, কখন আমাদের চিন্তা কার্য্যে পরিণত হইয়া পড়িবে। যে-ব্যক্তি এই মনে করিয়া কোন কুচিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় যে, সে কখনও ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিবে না, সে কোন না কোন সময়ে দেখিতে পাইবে যে, তাহার সেই কুচিন্তা তাহার প্রায় অজ্ঞাতসারে কার্য্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে। চিন্তা সহজেই কার্য্যে পরিণত হয় বলিয়াই সকল দেশের ধর্ম্মাচার্য্যগণ অশুভ চিন্তা বর্জ্জন করিয়া শুভ চিন্তা পোষণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়া গিয়াছেন।

* * *

"তথাপি স্মরণ রাখিও, মানবজাতির
মঙ্গল করিতে হইলে, শুভ চিন্তাকে কার্য্যে
পরিণত করিতে হইবে। দীর্ঘসূত্রতা যেন
একবারে না থাকে,—শুভ কার্য্যে যেন
অবিশ্রান্ত উদ্যম থাকে।"

যদিও চিন্তা স্বতঃই কার্য্যে পরিণত হয়, এবং সে-জন্য মানুষের যে-কোন শুভ-চিন্তা কোন না কোন সময়ে স্বতঃই কার্য্যে পরিণত হইবেই তথাপি এ স্থলে সদ্-গুরু একটা বড় প্রয়োজনীয় স্মরণীয় বিষয় বলিতেছেন যে, মানজাতির মঙ্গলসাধন করিতে হইলে, শুভ-চিন্তাটী কার্য্যে পরিণত হওয়া আবশ্যক। এই বিষয়ে কিন্তু আমাদের ক্রটী আছে; আমাদের মতে অনেক শুভ-চিন্তা আছে যাহা কার্য্যে পরিণত করি না। এই সকল চিন্তা দুর্ব্বলতার জনয়িত্রী। একজন সৎ-পুরুষ এক সময় বলিয়াছিলেন যে, যে—শুভ চিন্তা কার্য্যে পরিণত হয় না, তাহা মনে কর্কট রোগের মত কার্য্য করে। এই উপমাটী বেশ সুচিত্রিত। ইহার অর্থ এই যে, এইরূপ চিন্তা যে কেবল কোন কাজের নয়, তাহা নহে, বরং নিশ্চিতভাবে অনিষ্টকর। কার্য্যে অপরিণত চিন্তা দ্বারা আমাদের মানসিক শক্তিকে দুর্ব্বলীভূত করা উচিত নয়; এরূপ চিন্তা আমাদের

(১) মানুষ যে দেহবীজ 'ভূতসূক্ষ্ম' দ্বারা পরিষ্বক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সে সম্বন্ধে 'ব্রহ্মসূত্রের' ৩।১ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

প্রতিবন্ধকরূপে কার্য্য করে ও যখন তাহা পুনরায় উদিত হয়, তখন তাহাকে কার্য্যে পরিণত করা কষ্ট-সাধ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং শুভ-চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব করা উচিত নয়। অনেকে ইহা দ্বারা তাঁহাদের উন্নতির পথ চির-রুদ্ধ করিয়াছেন। সেইজন্য ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—"দীর্ঘসূত্র ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়।"—(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৩৭)।

কার্য্যে-অপরিণত কোন শুভ-সঙ্কল্প অমঙ্গলের একটী শক্তি রূপে পরিণত হয়, কারণ তাহা মস্তিষ্কের অবসাদক ঔষধের ন্যায় মনের উপর কার্য্য করে। সুতরাং আমাদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সতর্ক হইতে হইবে এবং অন্তরাত্মার নিকট হইতে যখন প্রেরণা আসিবে তখন তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে,—আগামী কল্যের জন্য ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। অনেক সদাশয় লোক উন্নতির অগ্রবর্ত্তী সোপানে কেন যে অগ্রসর হইতে পারেন না,—যে-সোপানে অবস্থিত আছেন সেই সোপানেই থাকিয়া যান, তাহার একটা কারণ হইতেছে য তাঁহাদের সংকল্পিত শুভ-কার্য্য-সাধনে দীর্ঘসূত্রতা ও বিলম্ব। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক জন যথার্থতঃ সদাশয় ও ধার্ম্মিক, কিন্তু দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার যে প্রতিবন্ধক ও পাপাসক্তি ছিল, যেরূপ শক্তি ও দুর্ব্বলতা ছিল, এখনও তাহাই রহিয়াছে। সুতরাং আধ্যাত্মিক উন্নতি; কামীর আধ্যাত্মিক জগতের এই সকল নিয়ম জানিয়া তদনুসারে কার্য্যানুবর্ত্তী হওয়া দরকার।

কার্য্যে-অপরিণত শুভ-সঙ্কল্প আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক না হইয়া অন্তরায় হয়, ইহা বুঝিবার ত্রুটীবশতঃ অনেকে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যাহা প্রাপ্ত হই, তাহাকে যদি কার্য্যে প্রয়োগ করি, তাহা হইলে আমরা উত্তরোত্তর বেশী প্রাপ্ত হইব। কোনও অনুকূল বাহ্য ঘটনা বা কোনও বাহ্য জ্ঞানের সংযোগ আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা ও সঙ্কল্পের অভাব পূরণ করিতে পারে না এবং আমরা ইতঃপূর্ব্বে যাহা জানিয়াছি, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার যে অক্ষমতা, তাহারও পূরণ করিতে পারে না। চিন্তাকে সকল স্থলেই কার্য্যে পরিণত করা উচিত। অবশ্য সকল সময়েই চিন্তাকে যে তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইব, তাহা নহে; কারণ "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"—শুভ কার্য্যে বহু বাধা-বিঘ্ন আছে, কিন্তু সুযোগ অনতি-বিলম্বেই আসিবে। এমন স্থলে চিন্তাটীকে লয় প্রাপ্ত হইতে না দিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। যদি তাহা করা যায়, তাহা হইলে অমূর্ত্ত চিন্তাটী আমাদের অনিষ্ট করিবে না এবং সুযোগ আসিবামাত্র তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব।

* * *

"কিন্তু যাহা তুমি করিবে, তাহা
যেন তোমার নিজের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম হয়—অন্যের
না হয়; তবে তাহার অনুমতি পাইলে এবং
সাহায্যস্বরূপে তাহার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিতে পার।
প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজের কার্য্য-প্রণালীতে
কার্য্য করিতে দিবে; যেখানে সাহায্য করিবার
আবশ্যক, সেস্থানে সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত
থাকিবে, কিন্তু অযাচিতভাবে কখনও হস্তক্ষেপ
করিও না। অনেক লোকের পক্ষে (অন্যের
কাজে হস্তক্ষেপ না করিয়া) তাহাদের নিজের
কাজে নিবিষ্ট থাকিতে শিক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা
কঠিন বিষয়; কিন্তু ঠিক ইহাই তোমাকে
করিতে হইবে।"

এই উপদেশটী কর্ম্ম-প্রবণ ব্যক্তিকে সতর্ক করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে। ক্ষুর-ধারাবৎ শাণিত সাধন-পথের অপর দিক্‌টা এখন বিবেচ্য। এক দিকে দীর্ঘসূত্রতা বা নিশ্চেষ্টতা পরিত্যাগ করিতে হইবে, আবার অন্য দিকে অপরের কাজে হস্তক্ষেপও বর্জ্জন করিতে হইবে। যাহারা খুব উদ্যমশীল, তাহারা প্রায়ই অপরের প্রত্যেক বিষয়ে অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করিতে চায়; কিন্তু অন্য লোকের যে কার্য্য, তাহা তাহার নিজের ব্যাপার, তাহাতে আমাদের অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করা কদাচিৎ উচিত নয়। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায় কর্ম্মকে মুখ্য স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কর্ম্মই মানব-জীবনের মূল মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও উক্ত আছে; "পরোধর্ম্ম ভয়াবহঃ—পরের ধর্ম্মে অর্থাৎ কর্ত্তব্য-কর্ম্মে হস্তক্ষেপ অকল্যাণকর।

ইহার কারণ সুস্পষ্ট! প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা ক্রিয়া

নিজের একটা বিশিষ্ট-ধারা আছে ও তাহা অপরের চিন্তা-ক্রিয়ার ধারা হইতে বিভিন্ন এবং প্রত্যেক ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া সেই ধারায় চিন্তা ও কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে; সুতরাং আমি যদি আমার চিন্তা ও কার্য্যের ধারা লইয়া অপরের কার্য্যে অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করি, তাহা হইলে আমি নিশ্চিতই তাহার কার্য্যে বাধা উৎপাদন করিব। তাহার কার্য্য তাহার চিন্তা-ক্রিয়ার যুক্তি-সিদ্ধ পরিণাম, তাহা কখনও আমার চিন্তা-ক্রিয়ার সঙ্গত ও উপযুক্ত পরিণাম নয় ও হইতে পারে না। প্রত্যেক কর্ম্ম-প্রবণ ব্যক্তির শিক্ষা করা দরকার যে, অপরের কাজে অযাচিত-ভাবে হস্তক্ষেপ করিলে কেবল বিরোধের সৃষ্টি হইবে।

এমন কি, অপরে যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছে, তাহা যদি অযথা ও ভ্রান্তও হয়, তাহা হইলেও সেই প্রণালীই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর। "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ"—(গীতা ১৮। ৪৭)। তাহার দোষ ও গুণ উভয়ের শক্তিই তাহার সেই কার্য্য-প্রণালীর পশ্চাতে বিদ্যমান আছে এবং তাহাই ক্রমঃ-বিকাশ-মার্গে তাহার উপযুক্ত স্থান চিহ্নিত করিতেছে। যেমন একজন কলমটীকে ঠিক যে প্রণালীতে ধরিয়া লেখা আবশ্যক, সেই প্রণালীতে না ধরিয়া লিখিতে অভ্যস্ত; কিন্তু আমি যদি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া কলমটীকে তাহার ঠিক-ভাবে ধরিয়া লিখিবার জন্য তাহাকে প্রবর্ত্তিত করি, তাহা হইলে আমি তাহার সুবিধা করিতে গিয়া অসুবিধা উৎপন্ন করিব; কারণ ইহাতে তাহার লেখা ভাল হওয়া দূরে থাক্ খারাপই হইবে। সে তাহার পূর্ব্ব-প্রণালীতে লিখিবার অভ্যাসে সুবিধাগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিবে ও নূতন প্রণালীতে কলমটা ধরিয়া লিখিবার জন্য তাহার অনেক কষ্ট হইবে ও সময় লাগিবে এবং আমার উপর বিরক্ত হইবে। অবশ্য সে যদি নিজে তাহার কলম ধরিবার প্রণালীটার পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিয়া আমার সাহায্য চায়, তাহা হইলে তাহা স্বতন্ত্র কথা। তাহার যাহা খুসী, তাহা করিতে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং সেই অধিকার-অনুসারে যদি তাহাকে কার্য্য করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে তাহার কার্য্যের পশ্চাৎবর্ত্তী নিজের ঈক্ষা-শক্তি লাভ করিবে।

জগতে অসংখ্য বিভিন্ন প্রকৃতির জীব আছে,—তা' যদিও তাহাদের মধ্যে এক একত্ব নিহিত আছে। জগতে নিম্নতর শ্রেণীর জীবগণ তথ্য না জানিয়াই প্রাকৃতিক বিধি পালন করে, কারণ তাহা করিতে তাহারা বাধ্য হয়। কিন্তু ঈশ্বর মানবকে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে চলিবার জন্য জগতে পাঠাইয়াছেন। সে নিয়মের বৃহৎ গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীন, গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারে না; কিন্তু ইহার ভিতরে সে যাহা খুসী তাহাই করিতে পারে। তাহার বিকাশ তাহার কার্য্য করিবার নিজের প্রণালীর মধ্যেই নিহিত। ঈশ্বরের এমনই পরিকল্পনা যে, মানব যতই বিকাশ লাভ করিতে থাকে, ততই তাহাকে স্বাধীনতা প্রদত্ত হয় ও ইহা সে বিচক্ষণতার সহিত ব্যবহার করিবে বলিয়া প্রত্যাশা করা হয়; ইহার ফলেই আমরা একটু একটু করিয়া অবশেষে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই। ক্রমঃ-বিকাশ মার্গের নিম্নতর সোপানে অবস্থিত পশুগণ বিধিগুলি সম্পূর্ণ-রূপে প্রতিপালন করে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে; আর উহার উচ্চতর সোপানে "জীবন্মুক্ত"-মহাপুরুষগণও তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করেন, কিন্তু জ্ঞাতসারে; আমরা সকলে এই দুই সোপানের মধ্যস্থিত কোন না কোন সোপানে অবস্থিত আছি।

"কখনও হস্তক্ষেপ করিও না"—সদ্‌গুরু এই কথাটী খুব জোর দিয়া বলিতেছেন। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই উপদেশটী অপরের যে কেবল কার্য্য ও বাক্য-সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহা নহে,—অপরের চিন্তা-সম্বন্ধেও প্রযোজ্য; কারণ আমরা অপরের চিন্তার উপরেও হস্তক্ষেপ করি। যদি কাহারও উপর আমার সন্দেহ হয়; সে যাহা করিয়াছে, তাহাতে যদি আমি কোন দুরভিসন্ধি আরোপ করি, তাহা হইলে আমি মানস-জগতে তাহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি, কিন্তু ইহা করিতে আমার কোনই অধিকার নাই। কাহারও উপর সন্দেহ সকল স্থলেই অন্যায়,—তা' সেই সন্দেহ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হউক্ বা না হউক। যদি আমি কাহারও উপর সন্দেহ করি, আর যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে আমার দ্বারা মানস-জগতে একটা নির্দ্দিষ্ট শক্তি প্রেরিত হইবে এবং সেই শক্তি এই স্থূল জগতের ধাক্কার মত একটা ধাক্কা দিয়া মানস-জগতের প্রান্তভাগে ফেলিয়া

তিব্বতে পদ্মাসনা সরস্বতী

[লামায় রক্ষিত মূর্ত্তি হইতে]

দিবে। ইহাতে তাহার মনের সাম্যভাব নষ্ট হইবে ও তাহার মন সাম্য অবস্থায় থকিলে সে যাহা করিতে চাহিত না, এমন একটা অন্যায় কাজ করিয়া বসিবে। আর যদি আমার সন্দেহ সত্য না হয়, তাহা হইলেও আমার সন্দেহ-পূর্ণ চিন্তা কোন না কোন সময়ে তাহার অন্যায়ের দিকে যাইবার পথ সুগম করিবে। উভয় স্থলেই তাহার প্রতিকূলে আমি অসৎ চিন্তা প্রেরণ করিয়া তাহাকে অন্যায় পথে যাইতে প্রবর্ত্তিত করিতেছি।

* * * *

"তুমি উচ্চতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছ বলিয়া তোমার নিয়মিত যে-সব কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে সে-সব যেন ভুলিও না; কারণ যত দিন না সে-সব সম্পন্ন হয়, ততদিন তুমি অপরের নিমিত্ত অন্য সেবা মূলক কার্য্যের জন্য স্বাধীন হইতে পার না। নূতন কোন সাংসারিক কর্ত্তব্য-কর্ম্মের ভার লইও না, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে তুমি যে-সকল কর্ত্তব্য-কর্ম্মের ভার লইয়াছ—যে-সকল বিষয়কে তুমি স্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া নিজে বুঝিতে পার, সেই সকল তুমি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিবে অর্থাৎ অপরে যে-সব বিষয়কে তোমার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে সে-সব নহে। যদি তুমি তাঁহার হও, তাহা হইলে সাধারণ কার্য্য তুমি অন্য লোক অপেক্ষা উৎকৃষ্টভাবে করিবে, কারণ তাহাও তোমাকে তাঁহার জন্য করিতে হইবে।"

এই সংসারে জন্মগ্রহণ একটা অহেতুক বা দৈবাধীন ব্যাপার নয়। পূর্ব্ব-জন্মের নিজের কর্ম্ম অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি এমন দেশ, এমন সমাজ ও এমন পরিবার মধ্যে জন্ম-গ্রহণের জন্য প্রেরিত হয়, যাহা তাহার বিকাশের ও কর্ম্মক্ষয়ের ঠিক উপযোগী। এই স্থানটী তাহার বিধাতৃ-বিহিত স্থান। এই স্থানে সে যাহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছে ও যাহারা তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহাদের সহিত সে অতীতের কর্ম্মপাশে বদ্ধ। সেজন্য তাহাদের প্রতি তাহার কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, যাহা সে করিতে ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ বাধ্য। এই কর্ম্মগুলি তাহার নিয়মিত বা বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম। এই কর্ত্তব্য-কর্ম্মগুলি সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিলে সে তাহার অতীত কর্ম্মক্ষয় করিতে পারে। কিন্তু যদি কেহ তাহার সেই সকল কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদনে অবহেলা করে বা যথাসময়ের পূর্ব্বেই তাহার পারিবারিক বন্ধন ছেদন করে, তাহা হইলে সে এই অবহেলার বা নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে এমন কর্ম্ম সৃষ্টি করিবে, যাহা তাহাকে পুনরায় তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিয়া অধিকতর দুঃখ প্রদান করিবে। সেইজন্য প্রত্যেকের তাহার কর্ত্তব্য-কর্ম্মগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যান্য ধর্ম্মাচার্য্য অপেক্ষা ভারতীয় আর্য্যঋষিগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য-কর্ম্মগুলি যথাযথভাবে পালনের জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন। কর্ত্তব্য-বিমুখ অর্জ্জুনকে অধ্যাত্মবিদ্যা উপদেশ করিবার কালে গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং" (গীতা ৩।৮)—তোমার নিয়মিত কর্ম্ম কর।

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, যখন কেহ অধ্যাত্মবিদ্যায় নূতন ব্রতী হয়, তখন সে তাহার নূতন প্রগাঢ় উৎসাহের প্রবল উচ্ছ্বাসে তাহার নিয়মিত কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-পালনে শিথিলতা করে বা সে-গুলিতে অপ্রয়োজনীয়-বোধে তাহাদের পালনে ঔদাস্য প্রকাশ করে। অধ্যাত্মবিদ্যা লাভের জন্য যে প্রগাঢ় উৎসাহ, তাহা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়; কারণ "তীব্র সম্বেগনামাসন্ন" (যোগসূত্র ১।২১)—যাহার প্রগাঢ় উৎসাহ আছে, সে শীঘ্রই কৃতকার্য্যতা লাভ করে। কিন্তু তাই বলিয়া সে যদি তাহার নিয়মিত কর্ত্তব্য-কর্ম্মগুলি অপ্রয়োজনীয়-বোধে প্রতিপালন না করে, তাহা হইলে সে ভুল করিবে; কারণ যত দিন না তাহার নিজের কর্ত্তব্য-কর্ম্মগুলি সম্পন্ন হয়, ততদিন সে সদ্-গুরুর কার্য্য অব্যাহত-ভাবে করিতে পারে না। সে যদি তাহার নিজের কর্ম্ম-পাশেই বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সে সদ্-গুরুর কার্য্য কিরূপে অব্যাহতভাবে করিবে? কিন্তু যে সদ্গুরুর শিষ্য হইতে অভিলাষী, তাহাকে সদগুরুর কার্য্য অব্যাবহতভাবে করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ইহার জন্য প্রস্তুত হইবার উপায় হইতেছে নিজের কর্ত্তব্য-কর্ম্মগুলি প্রতিপালন; কারণ কর্ত্তব্য-কর্ম্মগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করিলে নিজের কর্ম্ম ক্ষয় হইতে থাকে। এই-রূপে যখন সমস্ত, অন্ততঃ আংশিক কর্ম্ম ক্ষয় হয়, তখন সদ্গুরুর কার্য্য অব্যাহতভাবে করিবার যোগ্যতা জন্মে; সুতরাং অধ্যাত্মবিদ্যার্থীর পার্থিব কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলির সম্পাদন অপ্রয়োজনীয়-বোধে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়।

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৬।৩।১০।৫) ও মনুসংহিতায়

(৬।৩৫—৩৭) উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক মনুষ্য জন্ম হইতেই আপন পৃষ্ঠের উপর তিনটী ঋণ-ভার (কর্ত্তব্য-ক) লইয়া উৎপন্ন হইয়াছে ও যে-ব্যক্তি তাহার সহজাত এই সকল ঋণ পরিশোধ না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ভাগবত-পুরাণে বর্ণিত আছে যে, নারদ দক্ষ-প্রজাপতির হর্য্যশ্ব নামক পুত্রদিগকে তাহাদের গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের পূর্ব্বেই নিবৃত্তি-মার্গের উপদেশ করিয়া ভিক্ষু করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এই অশাস্ত্রীয় গর্হিত আচরণের জন্য নিন্দিত হইয়াছিলেন। ব্যাসদেব বিদুরের মুখ দিয়া উপদেশ করিয়াছেন :—

উৎপাদ্য পুত্রাননৃণাংশ্চ কৃত্বা বৃত্তিং চ
তে ভ্যোঽভ্যবিধায় কাঞ্চিৎ।
স্থানে কুমারীঃ প্রতিপাদ্য সর্ব্বা অরণ্য-
সংস্থোঽয়ং মুনির্বুভূষেৎ॥ সভা, উ, ৩৬;৩৯

"গৃহস্থাশ্রমে পুত্র উৎপাদন করিয়া, তাহাদিগকে অঋণী করিয়া, তাহাদের জীবিকার জন্য কিছু সংস্থান করিয়া দিয়া, কন্যাগণকে যোগ্য পাত্রে অর্পণ করিয়া, পরে বানপ্রস্থ লইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের অর্থাৎ অধ্যাত্মবিদ্যা লাভের ইচ্ছা করিবে।" ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতের যখন প্রাণ ছিল, তখন গৃহস্থাশ্রমের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পন্ন না করিয়া কেহ অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করিতে অগ্রসর হইতেন না। কিন্তু এখন সেই চারি আশ্রমের মধ্যে এক গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত অ আশ্রম নাই; সুতরাং এখন আমাদিগকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই অধ্যাত্মবিদ্যার সাধনা করিতে হইবে, অথচ সেই সঙ্গে গৃহস্থাশ্রমের অর্থাৎ সাংসারিক কর্ত্তব্য-কর্ম্মগুলিও সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিতে হইবে; কারণ এ-গুলি আমাদের স্বকর্ম্ম। "স্বকর্ম্ম স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানম" (সাংখ্যদর্শন ৩।৩৩)।—নিজের আশ্রম বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম "স্বকর্ম্ম"। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ (গীতা ১৮।৪৬) —স্বকর্ম্ম দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিলে মানব সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে। কিন্তু

অংহায় নিং কর্ম্ম কৃষ্ণকৃষ্ণেতি বাদিনঃ।
তে হরেদ্বেষিণঃ পাপাঃ ধর্ম্মার্থং জন্ম যদ্ধরে॥
কমলাকর সংগ্রহীত বিষ্ণুপুরাণ

"যে নিজ কর্ম্ম (সকর্ম্ম) ছাড়িয়া "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলে, তাহারা পাপী ও হরিবিদ্বেষী, কারণ শ্রীহরির জন্মও তো ধর্ম্ম-সংরক্ষণ জন্য হইয়াছিল।" সুতরাং যাঁহারা অধ্যাত্মবিদ্যা-লাভের জন্য সাধনার পথে প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহাদের এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, তাঁহাদের পারমার্থিক কার্য্যগুলি সাংসারিক কর্ত্তব্য-কর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। যদি কেহ তাহার নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাহার সাংসারিক কর্ত্তব্য-কর্ম্ম ছাড়িয়া পারমার্থিক কার্য্য-সাধনে অগ্রসর হন তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন।

সাংসারিক কর্ত্তব্য-কর্ম্মগুলি কোন ক্রমেই দোষের নয়, যদি সে-গুলি সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়। গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন: "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" (গীতা ২।৫৯)—কর্ম্মের কৌশলই হইতেছে যোগ। সে-কৌশলটী আর কিছুই নয়,—নিষ্কামভাবে—অনাসক্তচিত্তে সাংসারিক কর্ত্তব্য-কর্ম্মগুলি সম্পাদন। 'অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ' (গীতা ৩।১৯)—আসক্তি ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, সে পরমবস্তু লাভ করে। সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, জয়-পরাজয়ের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, নিষ্কাম-ভাবে কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে সাংসারিক কর্ত্তব্য-কর্ম্মগুলি পালন করিলে, তাহা বন্ধের হেতু না হইয়া মুক্তির হেতু হয়, অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া শুভ কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, নিষ্কামতা, পরার্থপরতা দয়া, প্রেম, ধৈর্য্য প্রভৃতি সাধন-পথের প্রয়োজনীয় গুণগুলির বিকাশ হয়। যিনি সদ্‌-গুরুর যথার্থ সেবক, তিনি তাঁহার সাংসারিক কর্ত্তব্য-কর্ম্মগুলি সদ্‌-গুরুর প্রীতির জন্যই অনুষ্ঠান করেন। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সাংসারিক কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য যখন তিনি বাহ্যজগতে গমন করেন, তখন তিনি বলেন:

"মায়ামতীতোঽস্যসি সত্ত্বরূপ ঈড্যোমহীয়াংশ গুরোর্গরীয়ান্।
তবাজ্ঞয়ৈর্বাপি তব প্রিয়ার্থম্ সংসার যাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥"

প্রভু-ভক্ত ভৃত্য যেমন তাহার করণীয় কার্য্যগুলি "প্রভুর কাজ, আমার নয়"—এই জ্ঞান করিয়া তাহা প্রভুর প্রীতির জন্য সম্পন্ন করে—এবং সুচারুরূপেই সম্পন্ন করে, সেইরূপ যিনি সদ্‌-গুরুর যথার্থ সেবক, তিনিও সদ্‌-গুরুর প্রীতির জন্য সাংসারিক কর্ত্তব্য-কর্ম্মগুলি সম্পাদনের সময় "অহং কর্ত্তে-

শ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি”—‘প্রভু যিনি শ্রীগুরুদেব, তাঁহার প্রীতির জন্য আমি ইহা করিতেছি’—এইরূপ বুদ্ধি দ্বারা মমত্ব ত্যাগ করিয়া সুচারুরূপে সম্পাদন করেন।

যিনি সদ্‌-গুরুর প্রকৃত সেবক হইতে চাহেন, তাঁহাকে সদ্‌-গুরুর কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। সুতরাং সদ্‌-গুরুর কার্য্য করিবার জন্য সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র প্রস্তুত থাকিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার কোন নূতন পার্থিব কর্ম্মের ভার লওয়া উচিত নয়, যাহা যথার্থতঃ তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম নয়। তবে তিনি ইতঃপূর্ব্বে যে-সকল কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদনের ভার লইয়াছেন, যে-সকল কার্য্যকে তিনি নিজে বিচার-বিবেচনা করিয়া নিজের যুক্তিসঙ্গত ও স্পষ্ট কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধি করেন, সেই সকল কার্য্য তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে, কিন্তু অপরে তাঁহার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া যাহা নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহার উপর চাপাইতে চাহিবে, তাহা তাঁহাকে দৃঢ়রূপে কি সংযতভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে; কারণ আমাদের অন্তরাত্মার নিকট যাহা আমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না, তাহা যদি আমরা সমাজের বিধি-নিষেধের চাপে বা অপরের জবর-দাস্ততে করি, তাহা হইলে আমাদের অধোগতি অনিবার্য্য। আবার, আমাদের অন্তরাত্মার নিকট যাহা আমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়, তাহা যদি সমাজের বিধি-নিষেধের চাপে বা অপরের প্রেরণায় না করি, তাহা হইলে আমরা দিব্য-জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। অধ্যাত্ম-বিদ্যার্থীকে তাঁহার নিজের বিবেক-বাণীর অনুসরণ করিতে হইবে। সুতরাং বিচার করিয়া আমাদের নিজের নিকট যাহা আমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধি হইবে, তাহাই আমাদিগকে করিতে হইবে। ইহা সত্য যে “কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতঃ”—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ে পণ্ডিতগণও বিমোহিত হয়েন। সুতরাং আমরা যখন অল্পজ্ঞানী ও অপূর্ণ মানব, তখন আমাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম নির্দ্ধারণে অনেক সময় ভুল করিব এবং সেই ভুলের জন্য দুঃখভোগ করিব। কিন্তু তাহা হউক। আমাদের ভুলের শিক্ষা দরকার, দুঃখ আমাদের জীবনের সেই শিক্ষাদাতা। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া যদি আমরা ভুল করি, তাহা হইলে তাহার পরিণামে আমরা যে দুঃখ ভোগ করিব, তাহা আমাদের অজ্ঞান মনের ময়লা দূর করিয়া দিবে। সুতরাং সেই দুঃখকে আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করা উচিত। অতএব দুঃখকে ভয় না করিয়া আমাদের নিজের নিকট যাহা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধি হয় তাহা ভ্রমপূর্ণ হইলেও তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে ও তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে।

যিনি সদ্‌-গুরুর প্রকৃত সেবক, তিনি সদ-গুরুকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া সমস্ত কার্য্যই এমন কি তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনের সামান্য কার্য্যগুলিও সদ-গুরুর জন্য করেন ও সেজন্য তিনি সেগুলি অন্য লোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাবেই করেন। তিনি বলেন :—

প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥

সুতরাং আমরা যদি সদগুরুর সেবক হইতে চাহি, তাহা হইলে আমাদিগকেও তাহা করিতে হইবে—আমাদের নিয়মিত কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলি ব্যতীত প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ কার্য্যগুলিও সদ্‌গুরুর জন্য করিতে হইবে ও সেজন্য সে সকল অন্য লোক অপেক্ষা উৎকৃষ্টভাবেই করিতে হইবে—নিকৃষ্টভাবে নহে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে অনেকের বিস্তর ত্রুটী আছে। আমরা সাধারণ কার্য্যগুলি অন্য লোক অপেক্ষা উৎকৃষ্টভাবে করা দূরে থাক্, সেগুলিকে তুচ্ছ ও অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া নিকৃষ্টভাবেই করি। কিন্তু আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, যে-ব্যক্তি সাধারণ কার্য্যগুলি উৎকৃষ্টভাবে করে না, সে কখনও অসাধারণ কার্য্যগুলি উৎকৃষ্টভাবে করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। সাধারণ কার্য্যগুলি উৎকৃষ্টভাবে সম্পাদনের মধ্য দিয়াই অসাধারণ কার্য্যগুলি উৎকৃষ্টভাবে করিবার দক্ষতা ও সেজন্য যোগ্যতা লাভ হয়। সুতরাং সাধারণ কার্য্যগুলিও অধ্যাত্মবিদ্যার্থীর নিকট অতিশয় গুরুত্ব-পূর্ণ। কিন্তু অনেকে আধ্যাত্মিকতার অজুহাতে উৎকৃষ্টভাবে বেশ-বিন্যাস করেন না। কিন্তু ইহা আধ্যাত্মিকতা নহে। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব বলিয়াছিলেন : “ভাল না পরিবে।” ইহার অর্থ এমন নয়, যে উৎকৃষ্টভাবে বেশ-বিন্যাস করিবে না—ইহার অর্থ মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবে না, কারণ ইহা মদ-গর্ব্বের বৃদ্ধি করে। অধ্যাত্ম-বিদ্যার্থী

সাদা-সিধে পোষাক পরিধান করিবেন, কিন্তু তাহা উৎকৃষ্ট-ভাবে—সৌষ্ঠবভাবে ও সুন্দরভাবে। সৌন্দর্য্য অধ্যাত্ম-বিদ্যার্থীর নিকট একটী অর্জ্জনীয় গুণ ; কারণ তিনি যাঁহার সহিত মিলিত হইতে চাহেন, সেই ঈশ্বর যে কেবল "সত্যম্", কেবল "শিবম্", তাহা নহে ; তিনি "সুন্দরম্" ও বটেন। সুতরাং আমরা যদি সেই "সুন্দরম্"এর সহিত মিলিত হইতে চাই, তাঁহার উপাসনা করিতে চাই, তাহা হইলে আমা-দিগকেও সুন্দর হইতে হইবে শুধু বাক্যে নয়, শুধু মনে নয়—কার্য্যেও। সেইজন্য বিষ্ণুপুরাণের ঋষি বলিয়াছেন :—

প্রস্নিগ্ধামলকেশশ্চ সুগন্ধিশ্চারুবেশধৃক্।
সিতা সুমনসোহৃদ্যা বিভৃয়া চচ নরঃ সদা॥

বিষ্ণুপুরাণ, ১২।৩

"কেশগুলি চিক্কণ ও পরিষ্কৃত রাখিবে, সুগন্ধ ধারণ করিবে, চারু বেশ পরিধান করিবে, মনোরম শুক্ল পুষ্প ধারণ করিবে।" সুতরাং আমরা দৈহিক সৌন্দর্য্য-সাধনকেও উপেক্ষা করিতে পারি না। ইহা বিলাসিতা নহে—ভৌতিক সৌন্দর্য্যকে আধ্যাত্মিকে পরিণমিতকরণ মাত্র।

আর এক কথা। আপনাদের সামান্য কার্য্যগুলিও সদ-গুরুর জন্য করিতে হইবে। যদি আমরা কি সামান্য, কি অসামান্য, কি সাধারণ, কি অসাধারণ, কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ—সকল কার্য্যই সদগুরুর জন্য করিতে অভ্যস্ত হই, তাহা হইলে আমরা অচিরে সদ-গুরুলাভ করিব। গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন :—

"মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি"

(গীতা ১২।১০)

—আমার জন্য সকল কর্ম্ম করিলে সিদ্ধিলাভ করিবে। কিন্তু আমরা বিস্মিত হইতে পারি যে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সামান্য কার্য্যগুলি কিরূপে তাঁহার জন্য সম্পন্ন হইতে পারে ও তদ্দারা সদ্-গুরু লাভ হইবে। আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আমাদের সামান্য কার্য্যগুলি, যেমন কোন সওদাগরী দপ্তরখানার কেরাণীর কোন চিঠি লেখা বা কোন পার্শেল প্যাক, সদ্-গুরুর জগতের বিরাট কার্য্যের অংশ,—যাহা আমাদের জীবন-পথে আসিয়া পড়িয়াছে। যদি আমরা ঐরূপ কোন চিঠি লিখিবার বা পার্শেল প্যাক করিবার প্রাকালে সদ্-গুরুকে চিন্তা করি ও আমাদের সাধ্যমত তাহা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করি এবং তারপর চিন্তা করি যে, সদ্-গুরুর একটু শক্তি ইহার সহিত উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট গমন করুক্, তাহা হইলে তাহা সদ্-গুরুর কার্য্য হইবে ও সেই মুহূর্ত্তেই তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সুদূরস্থিত কোন বন্ধুকে যখন আমরা চিন্তা করি, তখন যদি তাঁহার মন অন্য কোন চিন্তা দ্বারা অধিকৃত না থাকে, তাহা হইলে আমাদের চিন্তা তাঁহার মন আকর্ষণ করে। কিন্তু "সর্ব্বধী সাক্ষীভূতম্" সদ্-গুরুর মন অন্য চিন্তা দ্বারা যতই অধিকৃত থাকুক্ না কেন, তাঁহাকে চিন্তা করিলে, সেই চিন্তা তাঁহার সংবিতে নিশ্চিতই একটা সুস্পষ্ট ছাপ উৎপন্ন করিবে ও যদিও তিনি সেই মুহূর্ত্তে তাহা অবধান না করেন, তাহা হইলে উহা তাহার সংবিৎ স্পর্শ-করিবে ও তিনি তাহা উপলব্ধি করিবেন এবং সেই চিন্তার প্রত্যুত্তরে তিনি তাহার শক্তি ও প্রেমের ধারা চিন্তকের উপর বর্ষণ করিবেন। প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যেক কার্য্য এইভাবে তাঁহার জন্য সম্পন্ন করিলে, তিনি তাহাকে উপযুক্ত জানিয়া সেবকরূপে গ্রহণ করেন।

শুধু তাহাই নহে, অন্যায় কার্য্য সদ্-গুরুর জন্য সম্পন্ন করিতে কখনও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং আমরা যদি সকল কার্য্যই তাহার জন্য সম্পন্ন কারতে অভ্যাস করি, তাহা হইলে আমরা অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারিব ও কার্য্যে সংযত হইয়া দম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিব।

——:০:০:——

হৃদয়হীনা

(গল্প)

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

[এক]

সে ছিল শহরের বিখ্যাত নটী—নাম সুলেখা। শহরে সকলের মুখেই তার নাম—মহা চাঞ্চল্য উঠেছে তাকে নিয়ে। যুবকেরা তার নামে পাগল, প্রবীণরা আক্ষেপ করে তাদের গত যৌবনের জন্যে। সংবাদপত্র পূর্ণ তার অভিনয়ের শত মুখের প্রশংসায়। প্রাচীর-বিজ্ঞাপনে তার নাম প্রকাশিত হ'লে পথে জনতা হয় কোন ভূমিকায় সে দর্শকদের অভিনন্দিত করবে দেখবার জন্যে, রঙ্গালয়ে সে দিন আর একটীও স্থান খালি পড়ে থাকে না।

রূপ ছিল তার যেন জ্বলন্ত আগুন—নাচের ছন্দে তার কমনীয় তনু যখন দুলে উঠ্‌ত মনে হ'ত বাতাসে অগ্নিশিখা যেন তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠ্‌ছে।

এই আগুনে পুড়ে মরবার পতঙ্গ জুট্‌ত অনেক। তার গৃহের দ্বার অতিক্রম করা সৌভাগ্য বলে মনে করত অনেক লক্ষপতি, দুয়ারে তার ঘা দিতে মান-সম্রম ভুলে যেত সমাজ-পতিরা। লক্ষপতি তার ভাণ্ডার শূন্য করে দিয়েছিল তার গান শোনবার জন্যে, সারা অঙ্গ ভরে দিয়েছিল তার মুখের হাসি দেখবার জন্যে কিন্তু তার অধিক কেউ কখনও পায় নি। পুরুষের হৃদয় যখন তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ত প্রেম ভিক্ষা করে, ঘৃণায় উপেক্ষা করাই ছিল তার আনন্দ। সকলে ভাব্‌ত কি পাষাণে তৈরী তার প্রাণ।

দরিদ্ররা কিন্তু জান্‌ত তাকে দেবী বলে। দরিদ্রের কন্যার বিবাহ রাত্রি সুখময় হ'য়ে উঠ্‌ত কার অদৃশ্যস্পর্শে তা কন্যার পিতা ছাড়া আর কেউ জান্‌ত না, অন্ধ ও খঞ্জের ভিক্ষার ঝুলি কার করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ত তা সাধারণ লোকের নিকট অজ্ঞাত থাকলেও অন্ধ ও খঞ্জেরা দু' হাত তুলে তাদের এই করুণাময়ী মাকে আশীর্বাদ করত। তার আগমনে নিরানন্দ রোগীর গৃহ আনন্দ-নিকেতন হ'য়ে উঠ্‌ত, রোগযন্ত্রণা ভুলে যেত রোগীরা তার কোমল হাতের সেবায়, ধীরে ধীরে চোখ বুজে আস্‌ত তাদের শান্তিময় নিদ্রায়।

[দুই]

তার গৃহের সামনে প্রতিদিন দাঁড়িয়ে থাক্‌ত একটী যুবক। সাহসভরে তার পা দুখানি কখন তাকে দুয়ার অতিক্রম করে ভিতরে নিয়ে যেতে পার্‌ত না। সুলেখাকে দেখাই ছিল যেন তার আনন্দ। সুলেখা ভাব্‌ত লোকটা বোধ হয় কিছু ভিক্ষা চায় তার কাছ থেকে। গোপনে সে তাকে অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছিল, কিন্তু সে তা গ্রহণ করে নি—অর্থের কোন প্রয়োজন নাই সে জানিয়েছিল।

[তিন]

প্রভাতে একদিন তার গৃহে সেই যুবককে আস্‌তে দেখে অবাক্ হ'য়ে গেল সুলেখা। যুবকটিও লজ্জিত হ'য়ে বল্লে, "আজ এই প্রভাতে আপনার কাছে আসাতে নিশ্চয়ই আপনি আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হচ্চেন কিন্তু কাল রাত্রে রঙ্গালয়ের সামনে আপনার এই অলঙ্কার কুড়িয়ে পেয়ে ফেরৎ দিতে এসেছি। ফেরৎ না দেয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই আর শান্তি পাচ্চি না, তাই এই প্রভাতে ছুটে এসেছি আপনার কাছে।"

সুলেখার তখন মনে পড়্‌ল কাল রাত্রে অলঙ্কার খোলবার সময় এই অলঙ্কারখানি খুলে রাখে নি। এমন মূল্যবান অলঙ্কার ফিরে পেয়ে সেই যুবককে অনেক ধন্যবাদ দিল এবং পুরস্কার নেবার জন্যে তাকে পীড়াপীড়ি কর্‌তে লাগ্‌ল। যুবকটি শুধু উত্তর দিল, "আপনার সঙ্গে এই পরিচয় আমার যথেষ্ট পুরস্কার। আমি চিত্রকর—

আমি রূপের উপাসক, অর্থের আমার কোন প্রয়োজন নাই।"

সুলেখা শুনে ব্যথিত হ'য়ে বল্লে, "আপনিও কি এই মূঢ় লোকদিগের মতন নারীর রূপেই আকৃষ্ট হন।"

চিত্রকর তার কথায় বাধা দিয়া বল্লে, "আপনি আমায় ভুল বুঝ্ ছেন। অন্তরের রূপই বাইরের রূপকে মধুর ক'রে তোলে। আমি চিত্রকর আমার কাজ হচ্চে অন্তরে যে রূপের উৎস আছে তাহাই চিত্রে প্রকাশ করা, লোক-চক্ষু হ'তে যে দেবী মূর্ত্তিকে বিলাসিতায় ঢেকে রাখতে চান তাহাই ফুটিয়ে তোলা।"

সুলেখার অন্তরে এ কথাগুলি ঘা দিল—এমন কথা আজ পর্য্যন্ত কেউ তাকে বলে নি। তার মধ্যে নারীত্বকে ফুটিয়ে তুলতে চায় পুরুষ, দেবী বলে তাকে পুজা করতে চায়, তার বিলাসিতার কৃত্রিম আবরণে ভুলতে চায় না। তার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠ্ল, ব্যাকুলকণ্ঠে সে বল্লে, "না না ও কথা বল্‌বেন না, আমি পতিতা, পাপিষ্ঠা নারী, রূপ বিক্রয় করাই আমার ব্যবসায়। আপনি যান এ পাপ পুরীতে আর দাঁড়াবেন না—এ গৃহে আর কখন পদার্পণ করবেন না।" এই বলে চোখে কাপড় দিয়ে সুলেখা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

[চার]

দোল পূর্ণিমার রাত্রি—সুলেখার গৃহে উৎসবের আয়োজন প্রচুর। শহরের ধনীরা আজ সকলেই তার গৃহে সমাগত। তার রূপের নেশায় সকলেই আজ উন্মত্ত—ঐশ্বর্য্যের, বিনিময়ে সকলেই পেতে চায় তাকে।

সুলেখা তাদের উচ্চ কণ্ঠের নিবেদন শুনে হাসতে হাসতে উত্তর দিল, "আজ আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ করব। নারীর মুল্যস্বরূপ সকলেই যথাসর্ব্বস্ব দিতে রাজী আছেন, কিন্তু আমি কাহারও কাছে কিছুই চাই না। হিন্দুধর্ম্ম-মতে বিবাহ করে পত্নী করতে কে আপনাদের মধ্যে প্রস্তুত আছেন?" তার কথা শুনে নীরব হ'য়ে রইল সকলেই—স্তব্ধ হ'য়ে গেল সকল কলরব মুহূর্ত্ত মধ্যে। কিছু আগে মূল্য দিয়ে কিন্‌তে চেয়েছিল যারা, বিনামূল্যে আপনার করে নিতে কেউ তাকে চাইল না।

সুলেখা আবার হেসে বল্লে,—সে হাসিতে লুকানো ছিল পুরুষের উপর প্রতিহিংসা নেবার প্রবল বাসনা—"সকলেই যে নীরব হ'য়ে গেলেন—কেহই আপনারা সম্মত নন আমার প্রস্তাবে। আপনাদের লালসার বহ্নিতে আমাকে ইন্ধন করতে সকলেই প্রস্তুত আছেন, আপনাদের কামের বস্তু করে আমার নারীত্বকে অবমাননা করতে সকলেই ইচ্ছা করেন। নারীর সর্ব্বনাশ করে তাকে পরিত্যাগ করে সমাজের মাঝখানে সাধু সেজে বাস করতে লজ্জা বোধ করেন না কিছুমাত্র। আমি কেবল পরীক্ষা করে দেখ্‌তে চেয়েছিলাম আপনাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে কি না—আজ তার সম্পূর্ণ পরিচয় পেলাম। আজ আপনাদের আমার অতীত জীবনের ইতিহাস কিছু শোনাতে চাই। এমনি এক পূর্ণিমা রাত্রে একটী শান্তিময়ী পল্লীর উপর বিধাতার আশীর্ব্বাদ চাঁদের কিরণ-রূপে ঝরে পড়্ছিল। সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর স্নিগ্ধ স্পর্শে সমস্ত পল্লী ঘুমে আচ্ছন্ন—কুটিরে পল্লী-বধূরা স্বামীর বাহুতে মাথা রেখে সুখস্বপ্নে অচেতন। সেই শান্তি ভঙ্গ করে দুর্ব্বৃত্তের দল একটী পল্লীবধূকে স্বামীর দুর্ব্বল বাহু থেকে ছিন্ন করে নিয়ে চলে গেল। পল্লীবাসীরা কেহই অগ্রসর হ'ল না অবলার রক্ষার জন্যে—ঘরের দুয়ারে দৃঢ়ভাবে অর্গলবদ্ধ করে রইল। বাতাস কেবল সেই অবলার চীৎকার শুনে হা হা করে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগ্ল। দিন কতক পরে সেই নিপীড়িতা যখন গ্রামে ফিরে এল, তখন পুরুষের দল একত্রিত হ'য়ে স্থির করলে যে এ নারীকে সমাজে গ্রহণ করা চলবে না। সেই অসহায়া নারী দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিল আশ্রয়ের জন্যে, কিন্তু তাকে কেউই আশ্রয় দেয় নি। তাকে আশ্রয় দিয়েছিল এক নারী, যে সমাজের শাসন মানে নি—সে ছিল শহরের এক বাইজী। তিনি ছিলেন দেবী, নারীর অপমান তিনি অনুভব করেছিলেন। কন্যার মতনই তাকে স্নেহ ও যত্নে লালন-পালন করে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যে নারীকে আপনাদের মতনই সমাজের নেতারা সমাজ থেকে বার করে দিয়েছিলেন, তারই গৃহে আস্‌তে, তার কাছে প্রেম নিবেদন করতে কিন্তু আপনাদের লজ্জা করে না। যে নারীর হৃদয় আপনারা সে রাত্রে দস্যু

করেছিলেন তার পরেও কি তা'র হৃদয় থাক্‌তে পারে আপনারা আশা করেন। সেই সমাজ-পরিত্যক্তা রমণীই আমি—আর তাই আমি হৃদয়হীনা পাষাণী। আজ রাত্রের উৎসব এইখানেই শেষ, যান আপনারা সকলে চলে যান—ব্যথাভরা অতীতের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে আজ আমার অন্তর ব্যথিত হ'য়ে উঠেছে।"

সকলেই নীরবে একে একে করে চলে গেল কিন্তু ঘরের এক কোণে বসেছিল সেই চিত্রকর একাকী। সকলের অলক্ষ্যে এসে চুপি চুপি সেইখানে বসেছিল। তাকে দেখেই উত্তেজিত হ'য়ে বলে উঠ্‌ল সুলেখা, "কি শিল্পী কি ভাব্‌ছ? এখনও কি প্রেমের স্বপ্ন দেখ্‌ছ, না ভাব্‌ছ কি সুন্দর একে দেখতে, তুলির ঠিক আদর্শ হবার উপযুক্ত।"

তার সেই ব্যঙ্গপূর্ণ কথা শুনে শিল্পী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লে, "প্রেমেরই স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। তোমার উপরের কঠিন আবরণের নিম্নে যে প্রেমের ফল্গু বয়ে যাচ্ছে তাই অনুভব করছিলাম। তুমি হৃদয়হীনা কখনই নও, তুমি প্রেমময়ী—তুমি আমারই এ কথা বলতে সাহস হয় না।"

সুলেখা একথা শুনে উন্মত্তার মতন চীৎকার করে হেসে বল্লে, "তোমার কবির মত রচনা-শক্তি আছে বটে। আচ্ছা পরীক্ষা করে দেখি তোমার ভালবাসা, কবির কল্পনার মতন ফাঁকা কি না। প্রেমের উপহার চাই তোমার ঐ চোখ দুটী—দিতে পারলে বুঝ্‌ব তুমি যথার্থই প্রণয়ী।"

শিল্পী উত্তর দিল "তাই হ'বে—আমার বাইরের দৃষ্টি দিয়ে তোমার অন্তরের দৃষ্টি ফুটিয়ে তুল্‌ব।"

[পাঁচ]

"শিল্পী শিল্পী এ কি উপহার পাঠালে তুমি। মুখের কথাই কি সত্য বলে ধরে নিলে—হৃদয়ের নীরব নিবেদন কি তোমার হৃদয়ে পৌঁছায় নি। হৃদয়হীনাকে কি এমনই করে শাস্তি দিতে হয়।"

শিল্পী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, "ফিরে যাও সুন্দরী তোমার সেই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে—আমার এই মহানিশার অন্ধকারে আমায় একলা ডুবে থাক্‌তে দাও। আমায় বিদায় দাও।"

"না না আজ তোমায় বিদায় দিতে আসি নি—হৃদয়ে তোমায় বরণ করে নিতে এসেছি। আমাদের এই মিলন তোমার মহানিশার সুপ্রভাত ক'রে তুল্‌বে—চল কবি মানুষের বাসস্থান ছেড়ে চলে যাই।"

——:*:*:——

রবীন্দ্র-বন্দনা

শ্রীঅনিলকুমার সরকার

স্বর্গলোকের কোন মহালে
স্বপ্ন-রচা কল্পজালে
বিভোর ছিলে আত্মভোলা কোন সে মায়ার সন্ধানে,
বিরাট্ কি এক সত্যলাগি'
পরম যোগী—
পাঠিয়েছিলে হিয়ার পূজা নীরব তোমার জয়গানে

আত্মভোলা মহান্ কবি
পূজা তোমার-সাঙ্গ সবি?
সহসা কার নূপুরধ্বনি রিণি রিণি বাজলো ধীরে,—
অবাক্ তুমি দেখলে চেয়ে
আকাশ ছেয়ে,
পড়চে ঝরে আলোকধারা অন্ধকারের বক্ষচিরে!

মৃন্ময়ি মা ধরার লাগি'
পরাণ মাঝে উঠ্‌লো জাগি,
কতকালের পুঞ্জীভূত মৌন তোমার নিগূঢ় ব্যথা,
আলোর ধারায় মর্ত্ত্যে এসে
ফুল হ'য়ে তাই ফুট্‌লে হেসে,
হাওয়ার দোলায় পাঠিয়ে ছিলে চরম তোমার সার্থকতা !

সত্যি কবি, অবাক্ মানি
কুহেলিময় তোমার বাণী
জড়ের মাঝে পরাণ আছে, জড়ত্বেরও আছে মোহ,
ধরার বুকে জড়-অজড়ে-
মিলন সুখে দোঁহায় ধরে,
প্রাণের নাচন বিশ্বব্যেপে, এই কথাটি সদাই কহ।

গুল্ম-লতা মরুৎ ছায়া,—
মানব-কায়া,
শূন্য লোকের গ্রহ-তারা,—সকলি এক ছন্দে গড়া
অণুপরমাণুর মাঝে
সত্যিকারের মিলন রাজে—
ঝঙ্কারিলে একটা অণু—বিশ্ব তাতে দেয় যে সাড়া।

প্রকাণ্ড এ পৃথ্বীতলে
প্রকৃতির যে লীলা চলে,
জেনেছ তা, হে দরদি, বিশ্বজয়ী প্রেমের বলে
করুণ তোমার পরাণখানি
শুন্‌চে নিখিল মর্ম্মবাণী,
কি কথা কয় গাছের পাতায়, কল্লোলিত নদী জলে

হে মহীয়ান্, উদার কবি
প্রভাত রবি,
দাওনি আলো,—গাওনি শুধু ছোট্ট আমার আঙিনাতে,
জগৎ-জনের হৃদয়-তারে
যে-ঝঙ্কারে
বাজিয়ে ছিলে, ঢেউ ছুটে তার নাচায় জগৎ মূর্চ্ছনাতে !

অভিশাপের চিহ্ন-আঁকা
বিষাদ-মাখা
কেরে ঐ আঁখির জলে ধরার কোণে ক্ষুব্ধ প্রাণে ;
বিধির বিধান সইতে নারে
দুঃখ-ভারে
রহে যে, বক্ষে নিলে, জুড়ালে তায় করুণ গানে।

আপন ভোলা হে দরদি,
নিরবধি,
বিরহ কার তোমার গহন চিত্ত মাঝে গোপন জাগে,
চির-জনমের হে বিরহী
বিষাদ বহি'—
কোন্ সে দুখের বেদন-বাণী মূর্ত্ত তোমার করুণ রাগে :

সত্যসন্ধ হে মহাকবি,
উজল রবি,
নিখিল মাঝে ছড়িয়ে গেছে দীপ্তি তোমার আঁধার-হরা ;
জগতের তুমি জগৎ তোমার
বড় আপনার
তুমি আমাদের গরবের তাই লহ অর্চ্চনা হৃদয়-ভরা।

———:*:———
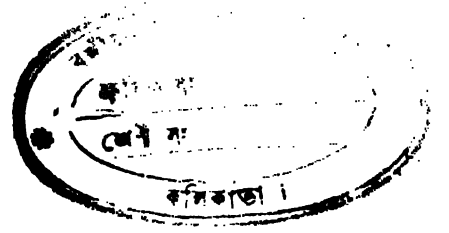
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ছাত্রজীবনে এবং ছাত্রজীবনের পরেও যে কয়জন জ্ঞানবীর মহানুভব ব্যক্তির সহিত পরিচয়ে ও তাঁহাদের স্নেহলাভে জীবনে আমি ধন্য হইয়াছি, স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইঁহাদের প্রায় সকলেই একে একে পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ, অধ্যাপক পার্সিভাল, স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—ইঁহাদের কথা মনে হইলেই মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে ইঁহাদের নিকট হইতে যে উপকার ও যে অনুপ্রাণনা পাইয়াছি তাহা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে ইঁহাদের প্রণাম করি। তারপরে কর্ম্ম-জীবনের সূত্রপাত হইতে স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্নেহ ও উৎসাহ লাভ করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল

শাস্ত্রী মহাশয়ের নামের সহিত পরিচয় স্কুলের ছাত্রাবস্থায় হইয়াছিল—কোনও বাঙ্গালা পাঠ-সংগ্রহে 'বাল্মীকির জয়' হইতে উদ্ধৃত একটী পাঠ-দর্শনে এই পুস্তক ও তাহার রচয়িতা যে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শাস্ত্রী মহাশয় তাহা জানিতে পারি। ১৯০৭ সালে এণ্ট্রেন্স পাস করিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকি এবং ঐ সময়ে কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্স্টিটিউটের ছাত্রসভ্য হই। সেই সময়ে এমন একটী বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের ও ঔচিত্য-বোধের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই, যাহার কথা সাধারণ্যে তেমন পরিজ্ঞাত নহে। ইন্স্টিটিউটে আমাদের সময়ে যাঁহারা কর্ম্মী ও উদ্যোগী এবং জনপ্রিয় ছাত্রসভ্য ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী অন্যতম। দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যকল্পে স্থাপিত ছাত্র-ভাণ্ডারের জন্য বৎসর বৎসর আমরা নাটক অভিনয় করিতাম, ইন্স্টিটিউটের পৃষ্ঠপোষকগণের নিকট টিকিট বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ ছাত্র-ভাণ্ডারে দান করিতাম। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার এই সকল অভিনয়ে আমাদের অগ্রণী ছিলেন। আমি নিজে কখনও অভিনয়-কার্য্যে নামি নাই, কিন্তু কলেজের ছাত্রজীবনের পাঁচটী বৎসর ধরিয়া অন্য বন্ধুগণের সাহায্যে আমাকে ইন্স্টিটিউটের অভিনয়ে বেশকারীর কাজ করিতে হইয়াছিল। নাটকে পাত্রপাত্রীগণের জন্য তখন আমরা ইতিহাসানুমোদিত পরিচ্ছদের প্রবর্ত্তনের প্রয়াস করি। হিন্দুযুগের নাটক হইলে, রাজাদের ও অন্য পাত্রদের বেনারসী জোড় এবং অন্য রঙ্গীন কাপড় পরাইয়া, হাতে গায়ে প্রচুর গহনা দিয়া সাজাইয়া এবং সেলাই করা পোষাক যথাসম্ভব কম ব্যবহার করিয়া প্রাচীন ভারতের একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিতাম। আমাদের সঙ্কল্প ও চেষ্টা ছিল, নাটকাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতার ও প্রাচীন জীবনের চাক্ষুষ পরিচয় দর্শকবর্গের সমক্ষে উপস্থাপিত করা; প্রাচীন বাড়ী-ঘর, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি কিরূপ ছিল, সে বিষয়ে ঐতিহাসিক আলোচনা ও গবেষণার ফল অনুসারে বাঙ্গালা নাট্যাভিনয়ে সেগুলির অবতারণা করা। এই কাজে আমরা আমাদের অধ্যাপক ও ইন্স্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ সকলেরই নিকট হইতে প্রচুর উৎসাহ পাই এবং আমাদের এই চেষ্টায় আমরা সকলের চেয়ে উৎসাহান্বিত হই, শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত নাটক (মালবিকাগ্নিমিত্র) অভিনয় কালে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাটকের পরিচ্ছদের পরিকল্পনা হইতে। ভারহুৎ সাঁচীর ধরণে পাগড়ী এবং কুশীলবদের প্রাচীন ভারতীয় প্রথায় প্রচুর অলঙ্কার-ধারণ, ও বেনারসী জোড়, ওড়না প্রভৃতি পরিধান—যাত্রার দলের জুড়ীর পোষাক বা সল্মা চুমকী দেওয়া নানা রঙ্গের আচকান পেণ্টলেন পীঠবস্ত্র প্রভৃতি কিম্ভূত সাজের সম্পূর্ণ বর্জ্জন—শাস্ত্রী মহাশয় প্রচলন করেন। সংস্কৃত কলেজের অভিনয়ের পরে, কি সূত্রে জানি না, সেই পোষাকগুলি আমরা ইন্স্টিটিউটে পাই। প্রাচীন-সংস্কৃত বিষয়ক গবেষণার একটা অঙ্গ হিসাবে আমার নিকট পরিচ্ছদের আলোচনার একটা

মূল্য ছিল—শাস্ত্রীমহাশয়ের ন্যায় বিশ্ববিশ্রুত সংস্কৃতজ্ঞ ও ঐতিহাসিকের এই দিকে দৃষ্টি আছে দেখিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত হই। তারপরে, কয় বৎসর ধরিয়া ইন্‌স্টিটিউটে আমাদের চেষ্টার ফলে, এই বিষয়ে বাহিরেও লোকের টনক নড়িল, এবং ক্রমে যুগানুযায়ী বা দেশকালানুযায়ী পরিচ্ছদে নাটকের পাত্রপাত্রীগণকে সজ্জিত করার প্রয়াস বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে সাধারণ বস্তু হইয়া দাঁড়াইল।

প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পড়িবার কালে শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সন্তোষ ভট্টাচার্য্য আমাদের সমসাময়িক ছিলেন—তিনি বি এস্-সি পড়িতেন, তবে অন্য বন্ধুদের মারফৎ তাঁহার সহিত পরিচয় ঘটে। ১৩২১ বঙ্গাব্দে বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনীতে শাস্ত্রীমহাশয়কে একটু কাছে থাকিয়া দেখিবার সুযোগ হয়। ১৯১৪ সালে বিবাহসূত্রে শাস্ত্রীমহাশয়ের সহিত আমার আত্মীয়তা ঘটে, কিন্তু তখনও তাঁহার সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশিবার সুযোগ হয় নাই। দূর হইতে তাঁহার নানামুখী প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতাম, এবং বিশেষতঃ তাঁহার অননুকরণীয় বাঙ্গালা গদ্যশৈলীর আদর করিতাম।

১৯১৬ সালে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস বিষয়ে গবেষণার একটী প্রস্তাব দেই, ও সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রস্তাবিত আলোচনার রীতি ও নিদর্শন হিসাবে বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্বের উপরে একটী প্রবন্ধ পেশ করি। পূজনীয় স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ও শাস্ত্রী মহাশয় এই দুইজনে আমার প্রস্তাব ও প্রবন্ধের যোগ্যতা বিচার করিবার জন্য পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এইরূপে এই দুইজন মনীষীর সহিত আমার নিকট পরিচয়ের সূত্রপাত। আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা এই যে, মাতৃভাষার ইতিহাস আলোচনায় এই দুইজন আচার্য্যের নিকট আমার প্রথম প্রয়াস সর্ব্বপ্রথম অনুমোদন লাভ করে, এবং ইঁহাদের নিকট আমি নানা বিষয়ে যথেষ্ট উপদেশ ও উপকার প্রাপ্ত হই। সাহিত্য-পরিষদের সদস্য বিধায়ও আমি নানা বিষয়ে ইঁহাদের স্নেহ ও অনুগ্রহের পাত্র হই।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস প্রণয়নে শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়-কর্ত্তৃক আহৃত উপাদান যতটা কার্য্যকর ও উপযোগী হইয়াছে, ততটা আর কিছুতে হয় নাই। ১৩২৩ সালে পরিষৎ হইতে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' এবং ঐ সালে শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রকাশ করেন। এই দুই বইয়ের আলোচনায় বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস পাকা বুনিয়াদ পাইল, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির ও প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের পত্তন করা সম্ভবপর হইল। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র চর্য্যাপদ কয়টীকে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে স্বীকার করিতেই হয়—রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য যে চারিটী গবেষণাত্মক প্রবন্ধ দিতে হয়, তন্মধ্যে অন্যতমটী ছিল এই চর্য্যাপদের ভাষা অবলম্বন করিয়া। ইতিমধ্যে আমি সরকারী বৃত্তি পাইয়া ইউরোপ যাত্রা করি, এবং তিন বৎসর ইউরোপে অবস্থানের পরে ১৯২২ সালে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমার বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ক বই খানির মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ করিয়া দেই। শাস্ত্রী মহাশয় তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়া গিয়াছেন। উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া যখন তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন আমার বই ছাপা চলিতেছে। এশিয়াটিক সোসাইটীতে শাস্ত্রী মহাশয় একজন অধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন, আমিও উক্ত সোসাইটীতে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য মনোনীত হইলাম। পরিষৎ ও সোসাইটী উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ হইল এবং কুটুম্বিতা-সূত্রের যোগও তখন এই ঘনিষ্ঠতাকে দৃঢ় করিতে সাহায্য করিল। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ বন্ধুগণের সহিত বা একা গিয়া কতদিন কত বিষয়ে আলাপের ফলে নানা দিক্ দিয়া তাঁহার নিকট কত নূতন তথ্য জানিতে পারিয়াছি, তাঁহার ব্যক্তিত্বের কত বিভিন্ন দিক্ আমাদের নিকট আপনাকে সুপ্রকাশিত করিয়াছে। ১৯২৬ সালের শেষভাগে তিন বৎসর ধরিয়া মুদ্রণকার্য্য চলিবার পরে আমার origin and Development of the Bengali language প্রকাশিত হইল। তখন মনে দুঃখ হইয়াছিল যে এই বই স্যর আশুতোষ দেখিতে পারিলেন না, এবং পূজনীয় ত্রিবেদী-মহাশয়ের

নিকটে ইহাকে আমার শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ উপহার দিতে পারলাম না। শাস্ত্রীমহাশয় আমার বই পাইয়া এবং তাহা দেখিয়া এত খুশী হইয়াছিলেন যে, তাহার আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার গৃহে একদিন একটী অপরাহ্ন-সম্মিলনে কতকগুলি মনীষী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আহ্বান করেন ও আমায় অভিনন্দন করিয়া তাঁহার শুভকামনা ও আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। প্রাচীন বিদ্যার ও বিজ্ঞান-সাধনার, এবং ব্রাহ্মণ্যের প্রতিভূস্বরূপ শাস্ত্রীমহাশয়ের এই অভিনন্দন এক দিকে যেমন তাঁহার ঔদার্য্য ও শিষ্যস্থানীয় অনুগামীদের প্রতি তাঁহারস্নেহের ও উপচিকীর্ষার প্রতীক স্বরূপ হইয়া তাঁহারই চরিত্র-মহাত্ম্যকে প্রকাশ করে; অন্য দিকে ইহাদ্বারা প্রচীনের দৃষ্টিতে আধুনিকের প্রচেষ্টার সার্থকতা সূচিত করিয়া বিদ্যালোচনার ধারাবাহিকতাকেও প্রকাশ করে। শাস্ত্রীমহাশয়ের মত জ্ঞান-গরিষ্ঠ পণ্ডিতাগ্রগণ্যের আশীর্ব্বাদ তাঁহার পদধূলির সহিত মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি, এবং তাঁহার স্বতঃপ্রণোদিত আগ্রহের দ্বারা আমার চেষ্টার সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে মনে করি।

শাস্ত্রীমহাশয় আমাদের 'বৃহত্তর ভারত পরিষৎ'-এরও সভাপতি হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুপর্য্যন্ত তিনি এইরূপে উক্ত পরিষদের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। এই পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন তাঁহারই বাটীতে হইত। এশিয়াটিক সোসাইটী, সাহিত্য-পরিষৎ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৃহত্তর ভারতীয় পরিষৎ—এই চারিটী প্রতিষ্ঠানের সমস্ত খুটিনাটী বিষয় তিনি দেখিতেন, এবং সকল বিষয়েই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া যাইতাম। সঙ্গে সঙ্গে ছিল তাঁহার একটী সদাজাগ্রত রসবোধ, এবং তাঁহার সদাপ্রফুল্ল চিত্তপ্রসন্নতা। এই উভয় চিত্তবৃত্তি মিলিয়া তাহার সঙ্গকে সকলের পক্ষে ঔজ্জ্বল্যে ও মধুরতায় মনোরম করিয়া তুলিত। তিনি নিজে অক্লান্তকর্ম্মী ও কর্ম্মনিপুণ ছিলেন বলিয়া,গবেষণা বা অন্য চর্চ্চায় যাহারা শ্রমকাতর ছিল, তাহাদের তিনি কোনও প্রকার প্রশ্রয় দিতে পারিতেন না। 'চালাকী দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য হয় না'—বিবেকানন্দের এই উক্তির সারবত্তা তিনি মানিতেন, এবং যাহাদের সম্বন্ধে তাঁহরে ধারণা হইত যে তাহারা চালাকী দ্বারা তাঁহার নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া নিজ বিদ্যা জাহির করিতে চাহে তাহাদের তিনি কিছুতেই আমল দিতেন না। কিন্তু যাহাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাবোধ জন্মিত, কথা-প্রসঙ্গে নানা বিষয়ে অসঙ্কোচে তাহাদের নিকটে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিতেন।

শাস্ত্রীমহাশয় ছিলেন সেই দরের মনীষী মহাপুরুষ, যাঁহাদের মধ্যে রসস্রষ্ট্রী দিব্য প্রতিভা ও বাস্তবালোচনাত্মক অক্লান্ত অনুশীলন একাধারে বিদ্যমান। এক দিকে তিনি কবি-প্রকৃতির সাহিত্য-স্রষ্টা—তাঁহার 'বাল্মীকির জয়' ও তাঁহার উপন্যাসাবলী তাহার প্রমাণ; এবং অন্য দিকে তিনি সমালোচক, তিনি ঐতিহাসিক, তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক। তাঁহার ভাবুকতা ও তাঁহার কল্পনাদৃষ্টি বাঙ্গালা ভাষাকে দুইখানি অনুপম রত্ন দান করিয়াছে—'বাল্মীকির জয়' ও 'বেণের মেয়ে'। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'-এর লেখক প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রাখালদাস, এবং শাস্ত্রীমহাশয়—ইঁহারা বাঙ্গালীকে তথা ভারতবাসীকে কল্পনা এবং বিজ্ঞান উভয়ের সংযোগের দ্বারা প্রাচীন জীবনের কতকগুলি সুন্দর আলেখ্য আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐতিহাসিক স্থিরদৃষ্টি বাঙ্গালীর আধুনিক সামাজিকতার আচরণ ভেদ করিয়া তাহার সামাজিক পরিস্থিতির রহস্য বাহির করিয়া দিয়াছে—বাঙ্গালার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থান আবিষ্কার করিয়া আমাদের সামাজিক ইতিহাসের জটিলতার সমাধানের পক্ষে এক প্রকৃষ্ট উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন। অপর, এই রূপে বাঙ্গালীর জাতি ও সমাজের রহস্যোদ্‌ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও ভাষার উৎপত্তির নষ্টকোষ্ঠির পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁহার 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' চিরকালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এতদ্ভিন্ন, বাঙ্গালীর প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় তাঁহাকে একজন পথিকৃৎ ও পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে—বাঙ্গালীর প্রাচীন-সাহিত্য-সম্পদের কথা আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে তিনিই প্রথম শুনাইয়াছেন, এবং প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁহাদের অনুপ্রাণনা এখনও পর্য্যন্ত কাজ করিতেছে, তাঁহাদের অন্যতম মৈথিল কবি বিদ্যাপতির ঐতিহাসিকতা ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান ও অন্ধভক্তি প্রসূত অন্ধতমিস্রার মধ্যে একমাত্র আলোক রশ্মিপাত করিয়াছেন। বাঙ্গালা

তাঁহার শ্রেষ্ঠ গল্প কবি ও ঐতিহাসিক কাহিনী লেখক, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান পরিচায়ক, বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপের আবিষ্কারক, প্রাচীন বাঙ্গালার রাজনৈতিক তথা কৃষ্টিবিষয়ক ইতিহাসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বাঙ্গালীর ধর্ম্ম এবং জাতি ও সমাজ-সম্বন্ধে আলোচনার নূতন পথের প্রদর্শক—এত দিক্ দিয়া বাঙ্গালী জাতির আত্মজ্ঞানের পথে সহায়ক হইতে পারিয়াছেন কোন্ পণ্ডিত? ইহা ব্যতীত, সংস্কৃত সাহিত্যের ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনায় ও শাস্ত্রীমহাশয়ে কৃতিত্ব অসাধারণ। অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্য, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের উত্তরাংশ, সন্ধ্যাকরনন্দিকৃত রামচরিত, এবং নেপালে প্রাপ্ত অন্য নানা পুস্তক—এগুলির, ও নানা প্রাচীন লেখের আবিষ্কার ও সংস্করণ করিয়া প্রকাশ করা, সংস্কৃত সাহিত্যের তথা ভারতের ইতিহাসে শাস্ত্রী মহাশয়ের চিরস্মরণীয় দান।

শাস্ত্রী মহাশয়ের তিরোধানে তাঁহার স্ফটিকোজ্জ্বল মনীষার নানা বিকাশের কথা মনে হয়। তিনি ছিলেন যেন এমন সাবেক যুগের ব্যক্তি, আধুনিকের তুলনায় যেন যে যুগে সবই বৃহৎ, সবই অতিকায় ছিল, যে যুগে মানুষ দৈহিক, নৈতিক ও আত্মিক শক্তিতে আমাদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাঁহার পরলোকগমনে রাজেন্দ্রলাল, মাইকেল, বঙ্কিম—ইঁহাদের কালের সহিত যে শেষ প্রাণবন্ত যোগ ছিল তাহা তিরোহিত হইল। বাঙ্গালা সাহিত্যিক তথা সুধী-সমাজে তাঁহার স্থান পূর্ণ হইবার নহে। তাঁহার পাণ্ডিত্যাদি গুণের কথা সকলেরই মনে হইবে; কিন্তু তাঁহার কথঞ্চিৎ সান্নিধ্য ও স্নেহলাভের সৌভাগ্য আমার হইয়া ছিল বলিয়া এবং তাঁহার নিকট হইতে কেবল অনাবিল ও অবিরত প্রীতিমিশ্র আচরণই পাইয়াছিলাম বলিয়া, তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার সেই স্নিগ্ধ মধুর ব্যবহারের ও হাস্যকৌতুক-মণ্ডিত আলাপের কথা আজ আমার বিশেষ করিয়া মনে হইতেছে। তাঁহার স্মৃতিকে তাহার নিজকৃত কীর্ত্তি চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে। কেবল প্রার্থনা এই যে, যেন তাঁহার আদর্শ আমাদের কর্ম্মবুদ্ধিকে প্রণোদিত করিয়া ও আমাদেরই ধন্য করিয়া যেন চিরকালের জন্য আমাদের সমক্ষে বিদ্যমান থাকে।

৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮।

রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনায় ভারতবর্ষের যথার্থ মূর্ত্তি ও প্রকৃতি,—এক কথায়, ভারতবর্ষের স্বরূপ,—প্রখর মনীষাবলে উপলব্ধি করিয়া আসিতেছেন। সমাজে, ধর্ম্মে, রাজশাসনে ভারতের বৈশিষ্ট্য কি, তাহা তিনি কবিতায়, প্রবন্ধে, গানে, উপন্যাসে, নাটকে প্রকটিত করিতেছেন। আমাদের এই কর্ম্মচঞ্চল কালের বিপুল বিক্ষেপের মধ্যে বসিয়া তিনি গভীর-ধ্যানদৃষ্টির দ্বারা ভারতসত্যকে উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন।

আমাদের আলোচ্য "গোরা" উপন্যাসে আমরা এই ভারত-সত্য-সাধক, ভারত-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

'গোরা' পড়িতে পড়িতে মনে হয়, ভারতবর্ষের প্রাচীন উদার সনাতন বেদান্ত-ধর্ম্মই কবির আদর্শ ধর্ম্ম। সে, ধর্ম্মে জাতিভেদ ছিল না, সম্প্রদায়ের গণ্ডী ছিল না বিচার-বিভেদ ছিল না। ভারত কোনো জাতিকে, কোনো সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করিয়া আপনার নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। পৃথিবীর যে-কোন জাতি যখনই তাহার বক্ষে আশ্রয় লইয়াছে ভারত সমান স্নেহে তাহাদিগকে পালন করিয়াছে, শান্তিসুখ

দান করিয়াছে। চিরদিনই ভারতবর্ষের এই বিশ্বমাতৃকার কল্যাণময়ী মূর্ত্তি।

ধর্ম্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা যে ঘোরতর অনিষ্টকর, তাহা যে মানুষকে মানুষের নিকট হইতে নির্ম্মমভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, তাহা কবি বহু স্থলে বলিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ভারতের সনাতন ধর্ম্মেরই প্রকৃষ্ট বিকাশ, এবং আধুনিক কালের হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিভেদ-বোধ যে ঘোরতর অনিষ্টকর পরেশনাথের চরিত্রে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। পরেশনাথ, হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মের তথাকথিত বিভেদকে অস্বীকার করিয়া এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ের মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন।

গোরা মানুষটী ভারতবর্ষের ভালমন্দ বিভেদ-নিষেধ সমস্তকে লইয়াই ভারতকে ভালবাসিত। তাহার দেশপ্রেম অতীব উগ্র তাহাতে বিচার-বিবেচনার স্থান ছিল না। গোরার গোঁড়ামি প্রবল, কিন্তু সে গোঁড়ামির মধ্যে যে একটা অটল নিষ্ঠা ছিল, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়! ইংরেজের শিক্ষা লাভ করিয়া আমরা আপামর সাধারণ হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখিয়াছি। আপানাদিগকে দূরে রাখার এই অনিষ্টকর অভিমান গোরা দুই পায়ে দলিত করিয়াছে। অশিক্ষিত ও শিক্ষিত লোকের পরস্পর মিলনের জন্য সে ব্যাকুল। আধুনিক কালে যে অসহযোগ প্রচেষ্টার ভেরী-নিনাদে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত রণিত হইয়া উঠিয়াছিল, এই গোরা-চরিত্রে সেই অসহযোগ মন্ত্রের বীজ নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। আম্‌লাতন্ত্রের সঙ্গে নৈষ্কর্ম্য সাধন করিতে পারিলে যে তাহাদিগকে শক্তিহীন করা যায় তাহা গোরা বহু পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছে। গোরা স্বদেশপ্রেমর প্রখর অগ্নিশিখায় দেশের সমস্ত কুসংস্কার, সমস্ত ত্রুটী দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চায়। সে বলে দেশকে সংশোধিত ও উন্নত করিতে হইলে, আগে দেশকে ভালবাস, আগে দেশের লোককে আত্মীয় কর; তাহার পর ধীরে ধীরে প্রীতিস্নিগ্ধরসে তাহার আবর্জ্জনা ভাসাইয়া দাও। সে আরো বলে, দেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রেমের গোঁড়ামির প্রয়োজন; উন্নতি সাধিত হইয়া গেলে সেই গোঁড়ামিকে বিচার-বিবেচনায় সংস্কৃত কর, তাহার পূর্ব্বে নহে।

বিনয় গোরার সমক্ষে ভারতবর্ষের যে বিচারবিভেদহীন কল্যাণমূর্ত্তি চিত্রিত করিত, গোরা যে তাহা বুঝিত না, এমন নহে। কিন্তু সে বোধকে গোরা দাবাইয়া রাখিত। সমস্ত ভালমন্দের মধ্যে ভারতবর্ষের সত্য রূপটী কি তাহা জানিয়া ও বুঝিয়া লইবার পর ভারতের মহৎ রূপ তাহার চিত্তে সহজবোধ্য হইয়া উঠিবে, ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস। বিনয়ের সমন্বয়-কল্পনা তাহাকে চঞ্চল করিত বটে, কিন্তু সে চাঞ্চল্য তাহাকে অধিকার করিতে পারে নাই।

বিনয় বিশ্বপ্রেমের মহান্ আদর্শে চঞ্চল, আর গোরা স্বদেশপ্রেমের উগ্রতায় ক্ষিপ্ত। বিনয়কে বুঝিতে হইলে গোরাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। স্বদেশপ্রেমের মধ্য দিয়াই বিশ্বপ্রেমের উপলব্ধি।

এই বিনয়-চরিত্র উপন্যাসের মধ্যে মধ্যস্থের কাজ করিয়া চলিয়াছে। সে ব্রাহ্মদের নিকট বলিতেছে, দেশকে যথার্থ ভালবাসিতে হইলে দেশের প্রথা-আচার সমস্ত বুঝিয়া তাহার মধ্যে যাহা বর্জ্জনীয় তাহা বর্জ্জন কর, যাহা গ্রহণীয় তাহা গ্রহণ কর। আবার গোরার নিকট সে বলিতেছে, ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া প্রথা-আচরকে অভ্রান্ত বলিয়া পরিবর্ত্তনের চেষ্টা না করিলে দেশের উন্নতি অসম্ভব।

গোরা যে ভারতবর্ষকে ভালবাসিত, তাহা সংস্কারমণ্ডিতা, আপন-সীমা-নিবদ্ধা ও স্বধর্ম্মগৌরবা। আর বিনয়ের ভারতবর্ষ উদারতাময়ী বিভেদহীনা বিশ্বমাতৃকা। গোরার প্রেম উগ্র বিবেচনাহীন। আর বিনয়ের প্রেম শান্ত, গভীর, তাহাতে জ্ঞানের সংস্কার আছে। মোট কথা, প্রথমে আমাদের দেশে স্বদেশপ্রেমের যে-মূর্ত্তি আমরা দেখিয়াছিলাম তাহা গোরা-চরিত্রে অভিব্যক্ত। কিন্তু যে প্রেম ভারতবাসীর আদর্শস্থানীয় হওয়া উচিত তাহা বিনয়ের মধ্যে পরিস্ফুট।

পরেশনাথ ও অনন্দময়ী ভারতচিত্তের ঔদার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি; ভারত সাধনা যাহা গড়িতে চাহিয়াছে তাহারা ঠিক তাহাই। যে সমন্বয় প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ যুগে যুগে বিদেশীকে আপনার করিয়া লইয়াছে, পরেশনাথ জীবনে তাহা প্রবলভাবে অনুভব করিয়াছেন। হিন্দু ও ব্রাহ্ম এই দুইটী সমাজের মধ্যস্থলে তিনি সেতুর মত বিরাজ করিতেছেন।

আনন্দময়। ভারতবর্ষের কল্যাণচিত্র। তাহার বিচার নাই; তিনি ভেদজ্ঞানরহিতা। ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, মুসলমান সমস্তই তাঁহার বুকের ধন; কাহাকেও তিনি পর করিতে চান না। তাঁহার গৃহে সকলেই আশ্রয় পায়, সকলেই স্নেহ লাভ করে। খ্রীষ্টান গোরাও তাঁহার কোলে সহজেই স্থান পাইয়াছিল। গোরা একদিনের জন্যও বুঝিতে পারে নাই যে, সে আনন্দময়ীর গর্ভজাত সন্তান নহে,—আনন্দময়ীর স্নেহ এমনই বিপুল ছিল।

গোরা তাহার অত্যুগ্র প্রেমবলে এবং সেবা ও ত্যাগের দ্বারা যেদিন ভারতের যথার্থ রূপ উপলব্ধি করিল, যেদিন সে জানিতে পারিল সে বিদেশী অথচ ভারতবাসীর গৃহে সযত্নে লালিত, সেদিন তাহার চিত্ত ঔদার্য্যরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া পরেশবাবুর নিকট যাইয়া তাহাকে বলিল—"আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো দিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা!"

আনন্দের আবেগে গোরা আনন্দময়ীর কাছে গিয়া বলিল—"মা, তুমিই আমার মা! যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ!"

স্বদেশপ্রেমের মূল ও পরিণতির দুইটী বাণী গোরা উপন্যাসে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পশ্চিম দেশ হইতে আমরা যে স্বদেশপ্রেম লাভ করিয়াছি তাহা গোরার প্রাথমিক স্বদেশপ্রেমেরই অনুরূপ; তাহা উগ্র এবং প্রবল। ভারতের মাটীতে এ স্বদেশপ্রেমের স্থান নাই। ভারত আপনাকে ভালবাসতে গিয়া মানবকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। তাহার স্বদেশপ্রেমের মধ্যে বিশ্বপ্রেম অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। যে প্রেম গোরায় মূর্ত্ত তাহা গোরাতেই পর্য্যবসিত হইল না। সে প্রেম পরেশবাবু ও আনন্দময়ীর চরিত্রে গিয়া পরিণতি লাভ করিল। সে প্রেম উগ্র ও প্রতিকূল রহিল না, শান্ত ও উদার হইল। এইখানেই ভারতচিত্তের বৈশিষ্ট্য, এইখানেই ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে স্বতন্ত্র। তাহার সভ্যতার মধ্যে কল্যাণের বীজ নিহিত আছে।

রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলা হইয়া থাকে। আমাদের মনে হয়, ভারতবর্ষের বিশ্বরূপ, ভারতবর্ষের মানবপ্রীতি উপলব্ধি ও প্রচার করিতে পারিয়াছেন বলিয়াও রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বকবি" আখ্যা লাভের সার্থকতা। তাঁহার স্বদেশের চিত্ত বিশ্বমানবের প্রতি প্রীতি দ্বারা স্নিগ্ধ, এ বোধ লাভ করিয়া তিনি বিশ্বমানবের সঙ্গে তাঁহার সংযোগ অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিয়াছেন। বিশ্বমানবের সহিত ভারতের যোগসূত্রের মূল তিনি ধরিতে পারিয়াছেন

আমাদের জাতীয় জ্ঞানোন্মেষ ও শক্তি-উন্মেষের দিনে রবীন্দ্রনাথের এই ভারতসত্যের উপলব্ধি যে অশেষ মঙ্গলকর, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে, এই ভারত-সত্য-সাধক কবিকে বুঝিবার দিন এখনও বোধ হয় আমাদের আসে নাই। ইউরোপের সংঘাত এখনও আমাদের উপর এতই প্রবল, তাহার ইন্দ্রজালে আমরা এমনই মুগ্ধ যে, স্বদেশের দিকে সুবিচারের দৃষ্টিপাত করিতে আমরা এখনও পারিতেছি না। যেদিন আমরা ভারতের প্রাণগতি ও চিত্তরূপ উপলব্ধি করিতে পারিব, যেদিন আমরা ভারত-ধর্ম্মের বিশ্বমুখিনতার পরিচয় লাভে সমর্থ হইব, সেদিন আমরা এই ভাবিয়া বিস্মিত হইব যে, কেমন করিয়া এত পূর্ব্বে এত বিক্ষেপের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এমন গভীরভাবে স্বদেশকে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তখনই আমরা বুঝিব যে, ভারতধর্ম্মের তথা হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থানের কার্য্যে রবীন্দ্রনাথ কি অসামান্য সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ জানেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল আলোড়নে আমাদের সমাজের ভিত্তি অবধি কাঁপিয়া উঠিয়াছে, এবং ভাঙন-গড়ন হইবে যথেষ্টই। এই আলোড়ন-মুহূর্ত্তে স্বদেশকে তাহার নিজস্ব রূপ, নিজস্ব গতি, নিজস্ব রুচি ও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের কথা তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। পশ্চিমের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা ভারত লউক, কিন্তু নিজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা যেন সে না হারায়। এই বাণীই গোরা উপন্যাসে আভাসে ইঙ্গিতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

গোরা তাহার ব্যাকুল প্রেমকে পরেশবাবুর শান্ত

মাহমায় ও আনন্দময়ীর উদার কল্যাণে নিমগ্ন করিয়া দিল। কর্ম্মময় প্রতীচ্য আসিয়া ধ্যানময় প্রাচ্যের শরণ লইল। ক্ষিপ্ততা শান্তির চরণে অবনত হইল। ভেদবুদ্ধি ঔদার্য্যের মহিমায় স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল।

যে মহামানব, যে মানবকল্যাণকামী ঋষি ভারতের এই বিশ্বপ্রীতির বার্ত্তা উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহারই মৈত্রীগাথা আবৃত্তি করিয়া আমরা যেন বলিতে পারি--

"এস হে আর্য্য, এস অনার্য্য,
　　হিন্দু মুসলমান।
এস এস আজ তুমি ইংরাজ,
　　এস এস খৃষ্টান।
এস ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন,
　　ধর হাত সবাকার ;
এস হে পতিত, হোক্ অপনীত
　　সব অপমান ভার
মা'র অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা
　　তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের
　　সাগরতীরে।" *

* রবীন্দ্র-পরিষদের ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬এর বৈঠকে পঠিত।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য জগতের এক অপূর্ব্ব বিস্ময়।

কবিমাত্রেই নিজের ক্ষেত্র বাছিয়া লয়। নির্ব্বাচিত ক্ষেত্রে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া জয়শ্রী লাভ করে। শক্তিকে সংহত করিয়া বিশেষ সীমার মধ্যে আপনার সাধনাকে সফল করে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক কৌতূহল অনন্ত। রূপকথার তিনি রাজপুত্র। পক্ষিরাজে চড়িয়া তিনি সাহিত্যের ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়াছেন। তবুও তাঁহার আশা মিটে নাই। জীবন-প্রভাতে তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। সাহিত্যের সকল দিকে তিনি রাজ্য-বিস্তার করিয়াছেন। আজ তিনি সম্রাট্।

ভারতের গৌরবের যুগে এমনি কৌতূহল আর এক মহাকবির মধ্যে দেখিয়াছি। এখন আমরা যাহাকে সাহিত্য বলি কালিদাসের কালে কাব্য বলিতে তাহাই বুঝাইত। সংস্কৃতে গদ্যও ছিল, নাটকের কথোপকথন গদ্যেই হইত ; কিন্তু গদ্যের অনেক কাজ ছন্দোময় বাক্যেই চলিয়া যাইত। এই কাব্য অথবা সাহিত্যের সর্ব্ব অঙ্গ কালিদাসের প্রতিভায় প্রদীপ্ত।

যুগান্তরে কালিদাসের নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের রচনার আলোচনা করিতে কতবার বসিয়াছি, কতবার ছাড়িয়া দিয়াছি। কোন কথা রাখিব কোন কথা বলিব? কাব্য না গদ্য-সাহিত্য না গান? অপরিমিত দানে সাহিত্যের সর্ব্ব বিভাগ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে তাঁহার মত আর কে পারিয়াছে? রবীন্দ্র প্রতিভায় এই বিরাট্ ব্যাপকতার মধ্যে বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে।

উপন্যাস, ছোটগল্প, কথিকা, প্রহসন, রসরচনা, ভ্রমণ-কাহিনী, জীবন-কথা, শব্দতত্ত্ব, দর্শন-তত্ত্ব, বিচিত্র প্রসঙ্গ, বিবিধ প্রবন্ধ, আলোচনা, সমালোচনা—গদ্য-সাহিত্য এমন কিছু নাই যাহা না তাঁহার লেখনীস্পর্শে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। খণ্ডকাব্য, নাট্যকাব্য, কথাকাব্য, গীতিকাব্য, গাথা—এক মহাকাব্য ছাড়া নূতন পুরাতন সকল বিভাগেই তাঁহার প্রতিভা নব নব রূপ সৃষ্টি করিয়াছে।

অর্দ্ধ শতাব্দীর বঙ্গ সাহিত্যের মূর্ত্ত প্রতীক—রবীন্দ্রনাথ। একদা বঙ্কিম-চন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার প্রভাবে বাংলা-ভাষা ও বাংলা-সাহিত্য নবকলেবর পরিগ্রহ করে। সেদিন বঙ্গবাণীর মন্দিরে অচিন্তিত চাঞ্চল্য এবং অভূতপূর্ব্ব সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। বঙ্কিম-প্রতিভার তড়িৎস্পর্শে জীবনে জীবনে চিন্তার নূতন দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই অপূর্ব্ব সমারোহের মধ্যে নব-যুগের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সে দিন এক কিশোর কবি মন্দিরের এক প্রান্তে নূতন সুরে বাঁশী বাজাইতে সুরু করে। তূরী-ভেরীর গভীর নিনাদে সে সুর ভাল করিয়া শোনা যায় নাই বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের চির-সজাগ কর্ণে সেই নূতন সুর ধরা পড়িতে বিলম্ব হয় নাই। বাংলার সাহিত্য সম্রাট্ সেদিন তরুণ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে নিজ কণ্ঠের মাল্য পরাইয়া দেন।

বাংলার নব্যঅভ্যুদয়ের প্রেরণাময় যুগে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। ঠাকুর পরিবারের কাব্য ও কলার অনুশীলন, দেশে প্রেম, পুরাতন-প্রীতি এবং নবীন সংস্কৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ফেনিলোচ্ছ্বাস কাটিয়া গেছে। কাল-প্রভাবে ডিরোজিও-শিষ্যদের দারুণ অধৈর্য্য শান্ত হইয়া আসিয়াছে। সামাজিক আন্দোলনে বিদ্যাসাগর, ধর্ম্মমঞ্চে কেশবচন্দ্র, রাজনীতি-ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ, সাহিত্য-সিংহাসনে বঙ্কিমচন্দ্র—এমনি দিনে রবীন্দ্রনাথের সাধনা সুরু হইল। বিভিন্নমুখী চিন্তাধারার ভিতর দিয়া কবির কিশোর-চিত্ত গড়িয়া উঠিল। দেশের সকল আন্দোলনে তাঁহার অনুভূতি-প্রবণ অন্তর চিরদিন সাড়া দিয়াছে। বাল্য-কৈশোরের ভাব-পিপাসু হৃদয় যাহা আহরণ করিল, পরিণত রবীন্দ্রনাথ তাহা সহস্র গুণে ফিরাইয়া দিলেন। এই ঐশ্বর্য্য-শালী হৃদয়ের সঞ্চয় যেমন অপূর্ব্ব, দান তেমনি অসাধারণ।

বাংলা চতুর্দ্দশ শতকের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র লোকান্তর গমন করিলেন। তাহার পরেই রবীন্দ্রযুগের আরম্ভ। ইংরেজী বিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ প্রকাশ—সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

বঙ্কিমচন্দ্রের মায়ামন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া উপন্যাসের যে কল্পমূর্ত্তি একান্তভাবে বাঙ্গালীর মনোহরণ করিল, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেই উপন্যাস-সাহিত্যেই নূতন শ্রী এবং নূতন সুর প্রদান করিল। 'চোখের বালি', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' কথা-সাহিত্যের নূতন নূতন দিক্ খুলিয়া দিল। নূতন পথে পুরাতনের পরিচালনায় যে শক্তির প্রয়োজন তাহা অসামান্য। এই অসামান্যতা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার লক্ষণ।

নূতন সৃষ্টি প্রতিভার মৌলিকত্বের পরিচয়। রবীন্দ্র-নাথের পূর্ব্বেও দু-একটি ছোট-গল্প রচিত হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যের সহিত যে পরিচিত সে-ই জানে ছোট গল্পের প্রবর্ত্তনা ও প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথ হইতে। বাংলার মনে ছোট-গল্প কতখানি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে তাহার জন্য অনুমানের আশ্রয় লইতে হয় না, বাংলা মাসিকের পাতা উল্টাইলেই নজরে পড়ে। ইহার যে রূপ রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত তাহাই ছোটগল্পের আদর্শ হইয়া আছে। ইংরেজী সাহিত্যও ইহার তুলনা নাই। 'অতিথি', 'ক্ষুধিত পাষাণ' 'মেঘ ও রৌদ্রে'র মায়া কাটাইয়া ছোট-গল্পের নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিতে বহু কাল লাগিবে এবং তখনও লোকে এই গল্পগুলি পড়িতে পড়িতে আমাদের যুগের জীবনে ফিরিয়া আসিয়া ধন্য হইবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সম্বন্ধে বঙ্গ-সাহিত্য বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সকল প্রবন্ধে আলোচিত হয় নাই। এমন অল্প বিষয়ই আছে। সাহিত্য ও সামাজের নানাদিক নূতন আলোক-সম্পাতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাবে, ভাষায়, বিষয়-বৈচিত্র্যে এ সকল আলোচনা অনুপম। প্রবন্ধ-সাহিত্যও রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ।

সাহিত্যের সকল বিভাগ এমন ভাবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে জগতের আর কোন সাহিত্যিক পারিয়াছে কি না সন্দেহ। এই দিক্ দিয়া তুলনা করিলে প্রতীচ্য-জগতে শুধু গ্যেটে অথবা ভিক্টর হুগোর কথা মনে পড়ে। আর এক দিকে তিনি অতুলনীয়। আমি রবীন্দ্রনাথের গানের কথা বলিতেছি। এমন সুরের সুরধুনী বহাইতে জগতের আর কোন কবি পরিয়াছে? এখানে যেন শেলী ও ওয়াগ-নারের শক্তি একত্রে মিলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ কবি। তাঁহার প্রকৃতি কবিপ্রকৃতি। বিশ্ব তাঁহাকে কবিরূপেই বরণ করিয়া লইয়াছে। আজ জীবনে জীবনে তাহার কবিতার কলধ্বনি অপূর্ব্ব সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে। যে সৌন্দর্য্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সৌন্দর্য্যে স্নান করিয়া দেশ-প্রকৃতি নবরূপ ধারণ করিয়াছে। দেশের সীমা ছাড়াইয়া সেই অম্লান প্রতিভার ছটা দিগন্তরে দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি বাক্যে নূতন সুর, অর্থে নূতন ইঙ্গিত যোজনা করিয়াছেন এবং ভাবের প্রবাহে অভূতপূর্ব্ব আবেগ দান করিয়াছেন।

মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দর গতি।

তাঁহার ছন্দে অপূর্ব্ব আনন্দ আন্দোলিত হইয়াছে। স্বর্গের রহস্য এবং মর্ত্ত্যের জীবনের মধ্যে তিনি কাব্যের সেতু বন্ধন করিয়াছেন।

ছন্দ সেই অগ্নি সম বাক্যেরে করিব সমর্পণ
যাবে চলি মর্ত্ত্যসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ
গুরুভার পৃথিবীরে টানিয়া লইবে ঊর্দ্ধপানে
কথারে ভাবের স্বর্গে মানবের দেব-পীঠস্থান।

এই কাব্যের ছন্দ তাহার সকল রচনার মধ্যে ছন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিশক্তি তাঁহার সকল রচনাকে সুষমা দান করিয়াছে। যে রস কাব্যরূপ ধারণ করিয়া দেশ-বিদেশের হৃদয়কে আপনার পানে আকর্ষণ করিয়াছে, সেই রসই তাহার সকল সৃষ্টিকে সুন্দর এবং মহিমময় করিয়া তুলিয়াছে। অন্তঃপ্রকৃতি অথবা বহিঃপ্রকৃতি, মানুষের কাজ অথবা মানুষের মন—চিরদিন তাহার অন্তরে নব নব অনুভূতির সঞ্চার করিয়াছে। কাব্য গদ্য অথবা গান—যখন যাহা উপযুক্ত মনে হইয়াছে তখন তাহার ভিতর দিয়াই সেই সকল অনুভূতি অনবদ্যভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কবির দৃষ্টি দিব্য-দৃষ্টি। সেই দিব্য-দৃষ্টি প্রভাবে সকল রহস্য তাহার নিকট সরল হইয়া উঠিয়াছে। নানা কঠিন সমস্যা তিনি অতি সহজে সমাধান করিতে পারিয়াছেন।

শুধু মাতৃভাষায় নয়, ইংরেজী ভাষায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন ইংরেজী সমাজ ছাড়িয়া তাহা সকল দেশের সাহিত্যে ছড়াইয়া পরিয়াছে, আজ বাংলার কবি তাই বিশ্বের কবি। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী রচনার ভিতর দিয়া বাংলা সাহিত্য জগতের ভাবধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পরিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা লোকোত্তর প্রতিভা। অতি সংক্ষেপে শুধু সেই প্রতিভার বিস্তার ও ব্যাপ্তির কথাই বলিলাম। তাঁহার প্রতিভার গভীরতা এবং মনীষার বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতে গেলে বিস্তৃত গ্রন্থ লিখিত হয়।

যে সহজাত শক্তির অধিকারী হইয়া রবীন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি কোন দিন ব্যর্থ হইতে দেন নাই। তাহার অক্লান্ত এবং অসাধারণ প্রতিভা তাহাকে চিরজয়ী করিয়াছে। প্রকৃতির খেলাঘরে কে জানে কবে তিনি এই সোনার চাবি কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন যাহা দিয়া তিনি সাহিত্যপুরীর সকল গৃহদ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। প্রতিভার এই সহজ শক্তি সকল জিনিস্ তাঁহার সাধ্যায়ত্ত করিয়া তুলিয়াছে। অন্যের পক্ষে যাহা নিতান্ত কঠিন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাহা অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠিয়াছে। এক এক বিভাগে তিনি যে কাজ অবলীলাক্রমে করিয়াছেন তাহা করিতে সাধারণ শক্তিশালী লোকের পক্ষে অসীম অধ্যবসায় এবং নিয়ত সাধনার প্রয়োজন হইত। প্রবীণ বয়সে চিত্রকলায় এই শক্তির প্রয়োগ করিয়া বর্ণ এবংরেখার রাজ্যেও তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার চিরনবীন কৌতূহল তাঁহাকে নিয়তই নূতনের সন্ধানে লইয়া যায়। প্রতিভার নব নবোন্মেষে জগৎ বিস্মিত এবং বিমুগ্ধ চক্ষুতে চাহিয়া থাকে।

এমন প্রতিভার নিকট মস্তক আপনিই প্রণত হয়।

তারপর ?

(গল্প)

শ্রীসুধীরকুমার সেন

পাখীর ডাকে মানুষের ঘুম ভাঙ্গে...

রাজলক্ষ্মী সেই কোন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াছে। উঠান ঝাঁট দিয়াছে, বাসন মাজিয়াছে, ঘরদরজা পরিষ্কার করিয়াছে। রাইচরণ হুঁকাটা হাত হইতে নামাইয়া রাখিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া চেঁচাইতে লাগিল; 'ওরে ও হলা, ওঠ্ ওঠ, স্যূর্য্যি কখন উঠে গেছে...দাও গো আমাদের চিঁড়ে মুড়ি যা দেবার দাও...দেখে আসি গরু দুটোকে একবার।' বলিতে বলিতে সে গোয়ালের দিকে চলিয়া গেল।

হলধর দাওয়ায় বসিয়া ঝিমাইতেছে; ঘুমের রেশ এখনও যায় নাই। বিন্দুবাসিনী পিঠে একটা চিম্‌টী কাটিয়া চাপা কণ্ঠস্বরে বলিল, 'এখনও ঝিমুচ্ছ বসে, ঠাকুর যে সেই কখন্ থেকে ডেকে ডেকে হায়রাণ হ'য়ে গেল।'

হলধর চক্ষু মেলিয়া বিন্দুর মুখের দিকে চাহিল। বিন্দুর সারা মুখে ঘুম-জড়ানো,চোখ দুটী স্বপ্নে মাখা। আলুথালু চুলের গুচ্ছ হইতে দুই একটা চূর্ণকুন্তল মুখের উপর ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কপালের সিন্দুরের ফোঁটাটী ম্লান...

হলধরের চোখ দুইটা আপনা হইতেই নামিয়া আসে, কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বলে, 'ঝিমুব না তো করব কি, ঘুমোতে কি দাও সারা-রাত্তিরে।'

বিন্দু ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, লজ্জায় তার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙ্গিয়া উঠিল। হলধর মুখ-চোখ ধুইয়া লাঙ্গলটা কাঁধে লইয়া বাপের সহিত মাঠে চলিয়া গেল। বিন্দু শাশুড়ীর ডাকে রান্নাঘরের দিকে গেল।

* * *

রাইচরণের সংসারটী মোটের উপর সুখের বলা চলে। প্রাচুর্য্য তাহাদের নাই বটে কিন্তু প্রতিদিনকার সংস্থানের জন্যও হাত পাতিতে হয় না। আর একটী সুখের কারণ, অভাব-বোধ তাহাদের কম। মানুষের চোখে অভাবের সৃষ্টি করে জ্ঞান। সভ্যতার আলো তারা পায় নাই...নিজের প্রয়োজনের গণ্ডীর ভিতর অপ্রয়োজনীয় কতকগুলি বস্তুর আকাঙ্ক্ষাকে টানিয়া আনিয়া, অভাবের প্রাচীরকে দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিতে তাহারা শিখে নাই।

সমস্ত দিন মাঠে থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহারা বাড়ী ফেরে। গ্রামে কিছু দিন হইল একটা যাত্রার দল হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের চার পাঁচ খানা গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে যে দুর্গাপূজার সময় এই দল বারোয়ারীতলার সগৌরবে দুইদিন অভিনয় করিবে। হলধর সেখানে একটা সখীর পার্ট পাইয়াছে। কিন্তু তার গলা খুব ভাল নয়, কয়েকবার হারমোনিয়মের সহিত গলা মিলাইতে গিয়া বিফল হইয়া—সে শিক্ষকের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিল যে, 'পার্টটা তাকে বদ্‌লাইয়া দেওয়া হউক...যা' হউক একটা সৈন্য সামন্ত...'

শিক্ষক কিন্তু তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, বলে; 'তোর চেহারায় মানিয়ে যাবে'; কাজেই হলধরকে রোজই মহড়া দিতে হয়।

রাইচরণ রোজ সন্ধ্যার পর দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানে। গ্রামের মধুখুড়া, হরি পোদ্দার, বিপিন পিওন সকলেই সেখানে সমবেত হয়।

হুঁকা হাত হইতে হাতে ফিরিতে থাকে।

আবার ঢালিয়া তামাক সাজা হয়।

মধুখুড়া টানের ফাঁকে হয় তো বিপিনকে জিজ্ঞাসা করে 'হ্যাঁ বিপিন, পোষ্ট মাষ্টার পায় ৭৲ টাকা মাইনে, আর তুমি পাও ১৩৲ টাকা, তবে সে তোমার চেয়ে কাজে বড় হ'ল কেন? সে বসে চেয়ারে আর তুমি বস টুলে।'

সকলেই বিপিনের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে।

হয় তো তাহারা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের মস্ত বড় একটা কূটনীতির সহিত এই মুহূর্ত্তেই পরিচিত হইবে।

অথচ বিপিনের কাছেও এটা মস্ত বড় সমস্যা, সেও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু মাষ্টার শব্দটা গুরুত্বমূলক। সে ইংরাজের তারিফ করে, বলে 'ওরা সাহেব লোক, দেবতা, কি থেকে যে কি করে তা কি আমরা বুঝতে পারি খুড়ো। তুমিই বল না পোদ্দার ?'

পোদ্দার মাথা নাড়িতে থাকে।

রাত্রি গভীর হয়। দূরে একটা পেঁচা ডাকিতে থাকে। উঠানের ওপারে হলধরের দরজায় অতি সন্তর্পণে খিল ওঠে। হুঁকা রাখিয়া সকলে উঠিয়া পড়ে।

* * *

হলধরের ঘর হইতে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ফিস্ ফিস্ গুঞ্জন শোনা যায়। বিন্দুবাসিনী বলে, হলধর শোনে, হলধর বলে বিন্দু শোনে। সে কথার মাথামুণ্ড নাই সমাপ্তি নাই।

বিন্দু হয় তো জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁগা, ঐ যে লোকে বলে আকাশের পেছনে স্বগ্গ, তবে উড়োজাহাজে যারা চড়ে তারা সেখানে যেতে পারে না কেন ?'

প্রশ্নটা সমস্যামূলক। কিন্তু হলধর গোঁজামিল দেয়, বলে, 'কি করে যাবে ? ওরা যে ম্লেচ্ছ।'

বিন্দুর কাছেও ব্যাপারটা অত্যন্ত হাল্কা হইয়া যায়। সত্যই ম্লেচ্ছর কাছে স্বর্গদ্বার তো রুদ্ধ, অথচ এই সহজ সত্যটারই সে এতদিন কুলকিনারা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব'ল, 'ঐ যে বামুনদের ন'বাবু কাগজে জড়ান তামাক খায় ওকে যেন কি বলে...'

হলধর এখবরটা জানে। দুইদিন পূর্ব্বে সে এই রহস্যময় শুভ্র পদার্থটার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানিয়া আসিয়াছিল, সে বলিল, 'ওকে সিগারেট্ বলে, কল্‌কাতায় বড় বড় সাহেবরা ঐ দিনরাত খায়।'

বিন্দু বিস্ময়ে বলে, 'ঐ খায় শুধু, তারা ভাত খায় না ?'

'—হুঁ, সাহেবলোক, তারা ভাত খেতে যাবে। তারা কি খায় জানো, রুটী আর মাংস...'

'—মাংস কিসের গো ?'

হলধর মাথায় জোড়হাত ঠেকাইয়া উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলে, 'মা ভগবতীর, গরুর গো গরুর...'

বিন্দু আঁৎকাইয়া ওঠে; 'ওমা !'

* * *

এক বৎসর পরে...

গ্রামে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। কে এক চিমন-লাল মাড়োয়ারী এবং সলোমন নামে এক ইহুদী সাহেব গ্রামে সশরীরে উপস্থিত হইয়াছে, লোহা-লক্কড়ের কারখানা খুলিবে বলিয়া। দুই মাস পূর্ব্বেও যেখানে মাদার-তাল তমাল এবং আগাছার দুর্ভেদ্য বন ছিল তাহা কবে কোন কুহকমন্ত্রে ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার হইয়াছে...সেখানে এক বিরাট্ টিনের শেড্ উঠিয়াছে, কত লোক-লস্কর-যন্ত্রপাতি।

টুপি মাথায় ইহুদী সাহেব কারখানার সামনে পায়চারী করে, কখনও বা টেবিলের সামনে বসিয়া লেখে। মাড়োয়াড়ী মাথায় পাগ্‌ড়ী জড়াইয়া সারাদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের সঙ্গে শহর হইতে বহু মিস্ত্রী আসিয়াছে, আরও দুইশত লোক নেওয়া হইবে। রোজ, দেড়টাকা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত।

কথাটা মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল।

নগদ টাকা...

সকাল ৭টা হইতে বিকাল ৪৷৷৹টা পর্য্যন্ত কাজ। কাজ হইয়া গেলে রোজ লইয়া বাড়ী ফিরিবে। দেখিতে দেখিতে গ্রামের অর্দ্ধেক লোক কাজে ঢুকিয়া গেল।

হলধর গরুদুটাকে লইয়া লাঙ্গল কাঁধে ফেলিয়া মাঠে যাইতেছিল। বাঁকের মুখে পিছন হইতে কে তাহাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। হলধর ফিরিয়া দাঁড়াইল। যে ডাকিতেছিল সে আসিয়া পড়িল, তাহার নাম গোপীনাথ। গোপী বলিল, 'তুই এখনও মাঠে যাচ্ছিস্ লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে এমন সুখের কাজ ছেড়ে !'

হলধর বিস্ময়ের সহিত বলিল, 'তুই কিসের কথা বল্‌ছিস্ ?'

গোপীনাথ বিস্ময়ের সহিত বলিল, কেন তুই শুনিস্ নি ? কারখানায় রে...আমরা রোজ দশ আনা করে পাচ্ছি ...রোজ....। আমি, কেনারাম, বিভূতি, [নেতে মণ্ডল......'

গোপীনাথের চক্ষু যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল, নিজের

গায়ের নতুন পাঞ্জাবী এবং পায়ের চটীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, 'একেবারে বাবুর কাজ হলা...তোকে কি বলব...'

গোপীনাথ বিস্ময়ে বিরাট্ হাঁ করিয়া রহিল; রোজ দশ আনা, গোপী বলে কি?

গোপীনাথের তখন বক্তৃতায় পাইয়াছে; 'কি করছিস তুই বল্ আমায়, দুটো মোটা ভাত আর বছরে চারখানা মোটা কাপড়...ব্যাস্। একটা জামা গায় দিচ্ছিস্ না এক জোড়া জুতো পায় দিতে পারিস...অ্যাঁ? তোর কচি বউ, কি সুখ শান্তি তাকে দিচ্ছিস্? না তাকে একটা সেমিজ...না একখানা ভাল কাপড়, না একটা মুখে মাখা পাউডার, কিছুই না।'

সেমিজ কাকে বলে হলধর জানে না...পাউডার শুনিয়াছে মেয়েরা মুখে মাখে।

'—ভেবে দেখিস্, যাই এখন সময় হ'ল'—বলিয়া গোপীনাথ হাত দোলাইতে দোলাইতে গম্ভীরভাবে চলিয়া গেল। আর হলধর মাঠে বসিয়া সারাদিন এই কথাই ভাবিল।

তাহার দুইদিন পরে রাইচরণ এবং বাড়ীর সকলে সবিস্ময়ে শুনিল, হলধর কারখানায় কাজ করিতে যাইবে। কথা ঠিক হইয়া গিয়াছে।

আপত্তি হইয়াছিল।

কিন্তু টিকে নাই...

রোজ দশ আনা...

কাজ ভাল করিতে পারিলে মাহিনা আরো বাড়িবে। বাঁধা আয়...রৌদ্র-বৃষ্টির মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না।

অভাব-বোধ ইহাদের জন্মে নাই, কিন্তু মোহ আছে। হলধর সকাল সকাল ভাত খাইয়া কারখানায় চলিয়া গেল।

* * *

বাঁশীর ডাকে মানুষের ঘুম ভাঙ্গে...

পাখী আর ডাকে না। হয় তো কারখানার হুইশ্‌ল্‌এর বিকট আওয়াজের ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে।

রবিবার হলধর রতনপুরের হাটে গিয়াছিল গোপীনাথের সঙ্গে। সেখানে সে পছন্দ করিয়া একটা পাঞ্জাবী কিনিল, বাপের জন্য এক জোড়া চটীজুতা, মায়ের জন্য একখানা লাল চওড়া পাড় শাড়ী, বিন্দুর জন্য একটা সেমিজ, তারপর গোপীনাথ তাহাকে আর একটা দোকানে লইয়া গেল এবং হলধর একটা পাউডার কিনিল। তারপর বিন্দুবাসিনীর সেমিজ এবং পাউডার নিষিদ্ধ ফলের মতো কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া বাড়ী ফিরিল।

বাড়ীতে আমোদের তুফান বহিয়া গিয়াছে।

রাইচরণ জুতা পায় দিয়া রান্না ঘরেই ঢুকিয়া বসে।

কোন্ পায়ের কোন্‌টা ঠিক রাখিতে পারে না...

পিছল পুষ্করিণীর ঘাটে জুতা পায় দিয়া নামিতে গিয়া পড়িয়াছিল আর কি!

আপড়া ঘরে বসিয়া হলধর প্যাকেট হইতে সিগ্রেট বাহির করিয়া মুখে পোরে। সকলে হা করিয়া চাহিয়া থাকে। মুখ হইতে ধোঁয়া ছাড়িলে আশপাশের লোকেরা প্রাণপণে নাক টানিয়া সুঘ্রাণ আস্বাদন করে। অনেকেই প্রসাদ পায়।

গভীর রাত্রে হলধর বাড়ী ফেরে। বিন্দুবাসিনী তখন বিছানায় এলাইয়া পড়িয়া ঘুমায়। হলধর সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আলোটা হাতে করিয়া বিছানার দিকে আগাইয়া আসে। পাউডারের কৌটাটা খুলিয়া বিন্দুর মুখে অতি সাবধানে লেপিয়া দেয়। তারপর মুগ্ধের মতো চাহিয়া থাকে।

বিন্দুবাসিনী হঠাৎ জাগিয়া ওঠে। ত্রস্ত হইয়া অসংযত বসনকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতে করিতে বলে, 'ও কি!' কথা কহিতে গিয়া ঠোঁটের কোণে জমা পাউডার মুখের মধ্যে যায়...মুখে হাত বুলাইয়া দেখিয়া বলে, 'এ কি! ময়দা মাখিয়েছ না কি মুখে?'

হলধর হাসে, বাহারী কৌটাটা বাহির করিয়া আলোর সামনে ধরে বিন্দু শোনে, এর নাম পাউডার, কল্‌কাতার মেয়েরা মাখে। উঠিয়া সেমিজ পরে, আয়নায় বার বার মুখ দেখে।

হলধর বিছানায় শুইয়া সিগ্রেট খায়। আর কারখানার ইহুদী সাহেব তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কি ভাবে তাহার নামটা উচ্চারণ করিয়াছিল সগর্বে স্ত্রীকে তাহাই শুনায়...

তারপর ছয় মাস আরও কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু নিঃশব্দে নয়।

গ্রামে গত রাত্রে একটা ভয়ানক খুন হইয়া গিয়াছে। যতীশ ও কাসিমুদ্দি দুজনেই খুব মদ খাইয়াছিল। নেশার ঘোরে বচসা হয়। পাশেই একখানা কুড়ালি পড়িয়াছিল, কাসিমুদ্দি তাহাই দিয়া যতীশকে আঘাত করে, কাসিমুদ্দিকে পুলিশ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

কারখানার দরজা ছাড়াইয়া কিছুদূরে আসিলেই তাড়ির দোকান এবং অন্যান্য অনেক জিনিসের দোকান। তাড়ি-খানায় বসিয়া এই সব আলোচনা হয়।

হলধর টলিতে টলিতে দাঁড়াইয়া বলে; 'যাক্ গে ও বেটা, এখন কথা হচ্ছে, আমরা না ফ্যাসাদে পড়ি ..'

সকলেই কথাটাকে গুরুতর বলিয়া মনে করে। নেশার ঘোরে খোঁড়া নিতাই আসিয়া হলধরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে, বলে; বাঁচাও গুরুদেব। হলধরকে সে ভক্তি করে। কারণ হলধর আজকাল দেড়টাকা রোজ পায়...

সপ্তাহে দুইদিন সে দেশী মদ খায়...

বাকী কয়দিন তাড়ি।

তাহার কাছে হাত পাতিলে সিগ্রেট পাওয়া যায়।

সম্প্রতি যে পণ্যনারী কয়টী গ্রামের এক প্রান্তে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীর সহিত হলধরের অবৈধ সম্পর্কের কথা সে কাণাঘুষায় শুনিয়াছে। ইহাই গুরুবরণের পক্ষে যথেষ্ট কারণ। হলধর অভয় দিল।

হলধর টলিতে টলিতে বাড়ীর দিকে চলিল। গ্রামের চেহারা এই কয় মাসেই একেবারে বদ্লাইয়া গিয়াছে। মানুষের ঐশ্বর্য্য বাড়িয়াছে, বিলাসিতা বাড়িয়াছে, অভাব-বোধ বাড়িয়াছে।

* * *

যাত্রা পার্টীটা অনেকদিন হইল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই ঘরে একজন পশ্চিমা মুসলমান লজেঞ্চুস-বিস্কুটের দোকান পাতিয়াছে এবং শুনা যায় সে না কি মাদকদ্রব্যও অবৈধ ভাবে বিক্রয় করে।

গ্রামে কাহারও সহিত কাহারও সদ্ভাব নাই। চাষ বন্ধ হইয়া গিয়াছে—কেবল মাত্র দু'চার খানি জমি ছাড়া।

রাত্রির অন্ধকারে পথের ধারে মাতালের প্রলাপ এবং কুৎসিৎ শপথ শুনিতে পাওয়া যায়। হলধর তাই শুনিতে শুনিতে বাড়ী ফেরে।

বিন্দুবাসিনী হাঁড়ি শিকায় তুলিয়া বসিয়া আছে। ঘরে খাইবার কিছুই নাই, একটী পয়সা নাই ... ...

রাইচরণ আর দাওয়ায় বসিয়া তামাক খায় না।

হলধর আসিয়া উঠানের মধ্যে দাঁড়াইয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করে তারপর শ্রান্তদেহে বিছানায় গিয়া ঢলিয়া পড়ে।

বিন্দুর সে রূপ ম্লান হইয়া গেছে। পাউডার আর মাখিতে পায় না .....

সেমিজ ছিঁড়িয়া গিয়াছে—কাপড়খানিও। মাথার কাছে বসিয়া বিন্দু পরের দিনের খাবার-জোগাড়ের কথা বলে ... হয় তো কাপড়ের কথাও। হলধর একটা কুৎসিৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া উঠে, তারপর হাসিতে থাকে; বলে—'কাপড় দিই না কেন জানো?'

বিন্দু হাঁ করিয়া শোনে। হয় তো কিছু রহস্য আছে। ব্যগ্রতা বাড়িয়া উঠে...বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দ হয় ...

কিন্তু রহস্য প্রকাশ পায়। হলধর বলে; 'সেমিজ কাপড় পরে ঢাকবার মতো রূপ আর নেই তোমার ...'

বিন্দুর অনাহারক্লিষ্ট মুখখানা অপমান-লাজে রাঙ্গিয়া ওঠে। পাত্লা ঠোঁট দুইটা কাঁপিতে থাকে। হয় তো কি বলিতে চায় ...

হলধর তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরে। বিন্দু সর্পাহতের মতো পিছাইয়া গিয়া আলোটা ফস্ করিয়া নিবাইয়া দেয়, তারপর মেজের উপড় উপুর হইয়া পড়িয়া থাকে। দেহ-দেউলের অনাদৃত দেবতা গুমরিয়া কাঁদয়া ওঠে।

* * *

সকালে উঠিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া রাইচরণ বলে—'শেষ সম্বল গরুদুটোকেও কি আমার বেচ্তে হ'বে?'

কেহ উত্তর দেয় না।

রাইচরণ আবার বলে—'কারখানায় দুই মাস গেলে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা রোজগার করিস, পাঁচ টাকাও ঘরে আন্তে পারিস্ না। এ কাজে কি আমাদের সাশ্রয় হচ্ছে শুনি ...'

হলধর এবার দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়; বলে—'সে তুমি বুঝবে না।'

রাইচরণ রাগে লাল হইয়া ওঠে; বলে—'বুঝবই না কেন শুনি? এই যে তুই ছাই-পাশগুলো খেয়ে পয়সা ওড়াস্ জলের মতো ...।'

ছাই পাস্ কি তাহা আর বলে না। কিন্তু হলধরই বলে—বলে—'মদ না খেলে খটুনীর কাজ করা যায় না।'

রাইচরণ রাগে গস্ গস্ করিয়া দাওয়ায় ওঠে; বলে 'তবে কাজে কি লাভ। যা' উপায় করলি তা'-কারখানার দরজায় রেখে এলি, তা হ'লে খাটুনীটাই তো' বৃথা...'

এর আর উত্তর পায় না। লাভ কি তা' হলধর নিজেই বুঝিতে পারে না। কারখানার বাঁশী বাজিয়া ওঠে। খাইবার একটা দানাও নাই। হলধর কাজে চলিয়া গেল।

* * *

গ্রামের একপ্রান্তে একটা গাছের তলায় বসিয়া একটী যুবক তার বন্ধুর কাছে এই গল্পটী বলিতেছিল। বন্ধু রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে বলিল; 'তারপর?'

—তারপর? যুবক মাথা তুলিয়া নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকাশের দিকে চাহিল,—'তারপর, এই সেই যন্ত্রশালা, আর এরই অন্তরালে মৃত মানবতার আকাশচুম্বী প্রাচীর অতি ধীরে নিঃশব্দে গড়ে উঠ্‌বে। ইস্পাত আর আগুনের বিরাট ক্ষুধা মানুষের কাছে চেয়ে বেড়াবে; দাও, দাও, আরো দাও। মানুষ তিলে তিলে রক্ত যন্ত্র-দেবতার বেদীতে মোক্ষণ করবে, তাদের রক্তে দেবতার পদ-রজ রেঙ্গে উঠ্‌বে, তবু শুনবে; চাই, চাই, আরো চাই... ...আরো সোনা আরো শক্তি ... ...আরো আহার্য্য ... ...

আর মানুষ? সেও কৃপণতা করবে না; যন্ত্রের মাঝে নিজের সত্তাকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করবে।'

তারপর?

—•:•:•:•—

বিজয়িনী

(গান)

পিয়াসী কামনা রহিল আঁধার মনে
প্রভাতের আলো ম্লান হলো অকারণে;

বিজয়িনী বেশে এলে মায়াবিনী
অপরূপা অয়ি-নাহি তোমা চিনি

তোমারে হেরিয়া লাজে মুখ ঢাকি
নীরব সঙ্গোপনে।

আকাশে চাহিয়া মেঘের বুকেতে চলো
সাগর পারের অজানা কাহিনী বলো
—অবহেলা পেয়ে হানিচ বেদনা
আজিকে কিথনে খনে।

—:•:•:—

বাঙ্গলার কার্পাস

এবার বাঙ্গলায় ৭৫ হাজার ৩ শত ২৭ একর জমিতে আশু কার্পাসের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর উভয় প্রকার জমির পরিমাণ ৭৬ হাজার ২ শত ৭ একর ছিল। এ বৎসরে ১৬ হাজার ৬ শত ৮ গাট আশু তুলা এবং ৩৭৮ গাট গৌণ তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া হিসাব পাওয়া যাইতেছে। গত বৎসর উভয় প্রকার তুলার পরিমাণ যথাক্রমে ১৮ হাজার ৪ শত ৮০ এবং ১০১ গাট ছিল। ফসল সংগ্রহ কালে ক্রমাগত বৃষ্টিপাত হওয়ায়, চট্টগ্রাম পাশ্চাত্যাঞ্চল ও ত্রিপুরারাজ্যে আশু কার্পাসের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছে; অন্যান্য স্থানে গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে ফসলের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। গৌণ ফসলের অবস্থা এ পর্য্যন্ত ভাল বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে।

—সম্মিলনী—

বাঙ্গলার মিলের কাপড় ।—বঙ্গদেশে যে কয়টী কাপড়ের কল রহিয়াছে, তাহাদের উৎপন্ন কাপড়ে দেশের অভাব মিটিতেছে না। বাঙ্গলাতে ২০ কোটী টাকা মূল্যের বস্ত্রের প্রয়োজন, তৎস্থলে ১৯ কোটী টাকার বস্ত্রই বাঙ্গলা দেশের বাহির হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। ইহা হইতেই প্রমাণ হয়, আমাদের কত দুর্দ্দশা এবং আমরা কত নিরুপায়। কিন্তু কেবল তাহাই নহে; বঙ্গদেশে যত বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহার সব বিক্রয় হয় না। আমরা বাঙ্গালীরা বাঙ্গলা দেশে প্রস্তুত কাপড় না কিনিয়া বোম্বাই বা আমেদাবাদ মিলের কাপড় কিনিয়া থাকি। ইহার চাইতে লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? বাঙ্গালী যদি নিজেদের দেশের প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য না করে, তবে ঐ প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হইবে কিরূপে? বাঙ্গলার তৈয়ারী কাপড়ের বিক্রয় বাড়িলেই মিলের উৎপাদন শক্তিও বাড়িয়া যাইবে; সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন মিল সর্ব্বত্র স্থাপিত হইতে পারিবে। অধিকন্তু বহুসংখ্যক বেকার যুবকেরও সংস্থান হইবে। বাঙ্গালীদের মনে রাখা উচিত যে, বাঙ্গলায় যে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা হইতে বাঙ্গালীরাই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে। আর কেহ করিবে না।

—সঞ্জীবনী—

বঙ্গদেশের আর্থিক দুরবস্থা।

বঙ্গদেশের আর্থিক দুরবস্থা ক্রমশঃই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতেছে। মফস্বলের সংবাদে প্রকাশ যে প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়াছে; কিন্তু বহুস্থানে ক্ষেত্র হইতে ধান্য কাটিবার মজুরি ধান্য বিক্রয়ের প্রাপ্য অর্থদ্বারা পোষাইবে না। ধান্যের দর অধিক থাকায় কৃষকেরা উচ্চহারে যে জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল ধান্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় এখন আর তাহার রাজস্ব দিয়া উঠিতে পারিতেছে না। এদিকে সেসের হারও বহুস্থলে অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় সেস শোধ করিবার অর্থও তাহাদের জুটিতেছে না। জমিদারের কর অপেক্ষা গাতিদার ও তালুকদারের পক্ষে সেস পরিশোধ করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। বহু ক্ষুদ্র জমিদার, তালুকদার ও পত্তনিদারের সম্পত্তি নিলামে বিক্রিত হইবার সম্ভাবনা। প্রজারাও ধান্য বিক্রয় করিয়া কোনরূপে জমির কর শোধ করিতে পারিতেছে না। ধান্য বিক্রয় করিয়া বস্ত্রাদি ক্রয়ের সামর্থ্যও হইতেছে না। দারুণ অর্থাভাবে মান-সম্ভ্রম বাঁচাইয়া চলা গৃহস্থের পক্ষেও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই ভবিষ্যতের

চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। অনেককেই বাধ্য হইয়া কর বন্ধ করিতে হইবে; তাহার জন্য আর করবন্ধের আন্দোলনের প্রয়োজন হইবে না। গভর্ণমেণ্ট প্রজার এই দারুণ অর্থাভাবের কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবার অপেক্ষা রাজনীতিক আন্দোলন প্রশমনে চেষ্টায় অধিকতর ভাবে ব্যাপৃত সুতরাং দেশবাসীর দুঃখ দেখিবার আর কেহই নাই।

—হিতবাদী—

বালিতে রেলওয়ে সেতুর উদ্বোধন।

গত ২৯শে ডিসেম্বর, ১৩ই পৌষ মঙ্গলবারে ভারতের বড়লাট লর্ড উইলিংডন বালি ব্রিজের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। মা গঙ্গা "সেপ্টিক ট্যাঙ্কের" উৎপীড়নে ও অসংখ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় দিন অতিবাহন করিতেছেন, এবার তাহার আর একটী গুরুতর বন্ধন বৃদ্ধি পাইল। বিশাল সেতুর নির্ম্মানে সাড়ে পাঁচকোটী টাকারও অধিক ব্যয় হইয়া গেল; ইহাতে রেলপথের কি অভিনব উন্নতি সাধিত হইবে তাহা বিশেষজ্ঞরাই বলিতে পারেন। তবে লোকে বুঝিবে নদীপথ সংস্কারের অভাবে বঙ্গদেশ ক্রমশঃ স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছে, কচুরিপানায় দেশ ছাইয়া গেলেও তাহার প্রতিকার সাধিত হইতেছে না—কারণ অর্থাভাব, কিন্তু রেলের সেতু নির্ম্মানের জন্য টাকার অভাব হয় না গবর্ণমেণ্ট রেলপথ নির্ম্মাণে যে প্রকার আগ্রহের পরিচয় দিতেছেন, জলপথ সুসংস্কৃত রাখিবার জন্যও যদি সেইরূপ আগ্রহের পরিচয় প্রদান করিতেন তবে কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না লোকমতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা কোনও গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই মঙ্গলের কথা নহে।

—হিতবাদী—

বাঙ্গালায় লবণের কারখানা।

কলিকাতায় বেঙ্গল সল্ট ম্যানুফ্যাকচার্স এসোসিয়েসন নামে লবণ তৈয়ারী করিবার এক কারবারকে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষার জন্য লবণ তৈয়ারী করিবার অনুমতি দিয়াছেন। তদনুসারে উক্ত কারবার মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় লবণের কারখানা খুলিবেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের লবণ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার কর্ম্মচারী মিঃ পিট বাঙ্গলা দেশের কোথায় লবণ তৈয়ারী হইতে পারে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া ২৪ পরগণার ফ্রেজারগঞ্জ এবং মেদিনীপুরের কাঁথিতে কারখানা স্থাপনের অনুমোদন করিয়াছেন। উক্ত অনুমোদিত স্থানে লবণ তৈয়ারী করিবার লাইসেন্স পাইবার জন্য বহু আবেদন মিঃ পিটের নিকট গিয়াছে এবং বহু পরিমাণ লবণ কারখানায় যে ভাবে লবণ হয় সেইভাবে এবৎসর প্রস্তুত হইবে। এই দুই স্থানে পূর্ণভাবে লবণ প্রস্তুত হইতে থাকিলে বৎসরে ৫০ লক্ষমণ লবণ প্রস্তুত হইবে। উহা কলিকাতায় প্রতিমণ পাঁচ আনা বা প্রতিশতমণ ৩১।০ দরে বিক্রয় হইবে। বাঙ্গালা দেশে প্রস্তুত লবণের উপর কোনও শুল্ক থাকিবে না এবং ভবিষ্যতে বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালীর দ্বারা লবণ প্রস্তুত হইবে আশা করা যায়।

বাঙ্গালা দেশে ১ ক্রোর ৬৪ লক্ষমণ লবণের প্রয়োজন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণাতেই প্রয়োজনের এক তৃতীয়াংশ লবণ প্রস্তুত হইবে। বরিশাল, খুলনা নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে লবণ তৈয়ারী হইলে সম্ভবতঃ অবশিষ্টাংশ লবণ পাওয়া যাইবে।

—সঞ্জীবনী—

বাঙ্গলায় সংক্রামক ব্যাধি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে, সমগ্র প্রদেশে সংক্রামক ব্যাধিতে ১২২৩ জন মারা গিয়াছে।

২রা জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে (১৯৩২) উক্ত সপ্তাহে বাঙ্গালার ১১টী জেলায় কলেরায় মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মেদিনীপুর ৩৪-৩৯, মুর্শিদাবাদ ১১-২৬, যশোহর ৯৯-১৩৫, দিনাজপুর ২৯-৩২, বগুড়া ১৬—১৮, ঢাকা ৫৪—৫৬, ময়মনসিংহ ৭০—৭৩, ফরিদপুর ১৫—২৮, বাখরগঞ্জ ৪১—৫৩, ত্রিপুরা ২৭৫—৩২৩, নোয়াখালী ৭৬—২২১।

নিম্নলিখিত স্থানে হ্রাস পাইয়াছে—বর্দ্ধমান ৩৩—১৭, বীরভূম ২৭—৫, বাঁকুড়া ১৮—৫, হুগলী ২৯—৯, হাওড়া ৩২—৮, ২৪ পরগণা ১৭৫—৮৩, নদীয়া ২৪—৩, খুলনা ১৭৫—১১৫, রাজসাহী ৪৭—৩২; পাবনা ১৪—৪।

হাওড়ায় বসন্তে ১৩, মৈমনসিংহে ৪, বর্দ্ধমান এবং

ত্রিপুরায় ২ ও বাকুড়ায় এক জন মারা গিয়াছে কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৮ জন মারা গিয়াছে।

—ঢাকা প্রকাশ

বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি—

বৃটিশ-শাসিত বাংলায় মোট ১৩ লক্ষ ৩২ হাজার হিন্দু বৃদ্ধি হইয়াছে হিন্দু-মিশনের কার্য্য-ফলে বৃটিশ-শাসিত বঙ্গদেশে অন্যূন ৫ লক্ষ হিন্দু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত ১৯২১ সালের এবং বর্ত্তমান ১৯৩১ সালের আদমসুমারী পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। এজন্য নিম্নে একটী তুলনা-মূলক বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। সংখ্যাগুলি তত সহস্র বুঝিতে হইবে।

সাল	হিন্দু	মুঃ	খৃঃ	বৌদ্ধ	জড়ো	অন্য	মোট
১৯১১—	২০৩,৭৭	২৩৯,৮৯	১,২৯	২,৪০	৭,২০	—	৪৫৪,৮৩
১৯২১—	২০২,০৩	২৫২,২১	১,৪৭	২,৬৫	৮,৪৫	১৪	৪৬৬,৯৫
১৯৩১—	২১৫,৩৭	২৭৫,৩০	১,৮০	৩,১৫	৫,৪৯	১৬	৫০১,২২
	+১৩,৩৪	+২৩০৬	+৩৩	+৫০	−৩০১	+২	+৩৪,২৭

এই বিবরণে দেখা যায় হিন্দু বাড়িয়াছে ১৩ লক্ষ ৩৪ হাজার। অন্যান্য সকল জাতিই বাড়িয়াছে, কেবল মাত্র জড়োপাসক ৩ লক্ষ এক হাজার হ্রাস পাইয়াছে। এই আদমসুমারীতে জড়োপাসকদের সংখ্যা হ্রাস হইবার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে ইহারা হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া হিন্দু-সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কত জড়োপাসক হিন্দু-সংখ্যাভুক্ত হইয়াছে তাহা এখন পর্য্যন্ত আমরা জানিতে পারি নাই। আমরা খুব নিশ্চিতভাবে অনুমান করিতে পারি যে, স্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে এই আদমসুমারীতে জড়োপাসকের সংখ্যা অন্ততঃ সাড়ে দশ লক্ষ (পূর্ব্বে ৮,৪৫ হাজার+বৃদ্ধি ২ লক্ষ) হইবার কথা। অথচ আমরা সেই স্থলে মাত্র ৫,৪৪ হাজার জড়োপাসক পাইতেছি। ইহা হইতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ন্যূনাধিক ৫ পাঁচ লক্ষ জড়োপাসক গত দশ বৎসরে হিন্দুর সামিল হইয়াছে। আদিম জাতি সকলের মধ্যে হিন্দুমিশনের প্রচারের এই কৃতকার্য্যতা আমরা নিঃসন্দেহে প্রকাশ করিতে পারি। এতদ্ব্যতীত কয়েক সহস্র মুসলমান ও খৃষ্টান হিন্দু সমাজভুক্ত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা নিশ্চিত বলা কঠিন। কারণ যে সকল খৃষ্টান হিন্দু-সমাজভুক্ত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই জড়োপাসক শ্রেণীর। মুসলমান যাহারা হিন্দু-সমাজ ভুক্ত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ৩।৪ হাজারের অধিক হইবে না।

হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির আর একটী কারণ হিন্দুর ক্ষয়ের পথ রোধ করার চেষ্টা। এই দশ বৎসরে বহু সহস্র হিন্দুকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে।

বাংলাদেশে বিধবা-বিবাহের ফলেও হিন্দুর সংখ্যা সামান্য কিছু বাড়িয়াছে।

পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া বাহির হইতে প্রায় লক্ষাধিক হিন্দু এই সময়ের মধ্যে বাংলায় প্রবেশ করিয়া হিন্দু সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে।

সকল দিক বিচার করিয়া ইহাই মনে হয় যে, বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে খুব বেশী হইলে ছয় লক্ষ বাড়িয়াছে।

আদমসুমারীর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইলে উপরোক্ত মন্তব্য ও অনুমানসমূহ কতদূর ঠিক তাহা জানা যাইবে।

কুচবিহার ও ত্রিপুরা দেশীয় রাজ্যদ্বয় বাঙ্গালারই অংশ। এই দুই রাজ্যে মোটের উপর সাড়ে ছয় লক্ষ হিন্দু ও ৩ লক্ষের অধিক মুসলমানের বাস। কুচবিহারে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু ত্রিপুরায় হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। মুসলমান উভয় রাজ্যেই বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।

—খুলনা বাসী

বাঙ্গলার চাষের বলদ—

সমগ্র বঙ্গদেশে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ১৯২৬ সনের তুলনায় ১৯৩০ সনে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৪৮৯ কম হইয়াছে। বঙ্গদেশে দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষীর সংখ্যা মোট ৮৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৫৯৯টী; আর সমগ্র বঙ্গের প্রবাসী ও স্থায়ী অধিবাসীদের (বৃটিশ-এলাকায়) মোট সংখ্যা ৪ কোটী, ৬৬ লক্ষ, ৯৫ হাজার ৫৩৬ (১৯৩১)। অতএব মোটামুটীভাবে বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক শতজন বাঙ্গালীর ভাগে ১৮-২৬টী বা প্রায় ছয়জন বাঙ্গালীর ভাগে একটী করিয়া গাভী রহিয়াছে। এত গাভী থাকিতেও বাঙ্গালীর 'দুধে-ভাতে' খাওয়া উঠিয়া গিয়াছে, বিদেশের জমান দুগ্ধ ও নানা প্রকার 'ফুড্' শিশু খাদ্যের স্থানাধিকার করিয়াছে এবং খাটী ঘৃত একেবারেই দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

—আর্থিক উন্নতি

মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে বাঙ্গালীর প্রভাব

বাঙ্গালী বহুকাল দক্ষিণীদের নিকট যুদ্ধে ও ক্ষাত্রবলে পরাজিত হইয়াছে। চালুক্য-বংশ-গৌরব প্রথম কীর্ত্তিবর্ম্মা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ-ভারতে বাদামীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। মহাকূটের স্তম্ভলিপি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তিনি এক সময়ে বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বাদামীর চালুক্যদের অধঃপতনের পর রাষ্ট্রকূটেরা দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্য স্থাপন করে। উক্ত বংশের নৃপতি ধারাবর্ষ উত্তরাপথ আক্রমণ করিলে পাল-সম্রাট্ ধর্ম্মপাল (খ্রীঃ ৭৯০-৮১৫) গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের ভিতর দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ধারাবর্ষের পরবর্ত্তী রাজা তৃতীয় গোবিন্দ (খ্রীঃ ৭৯৫-৮১৪) পুনরায় উত্তর-ভারত আক্রমণ করিলে ধর্ম্মপাল ও তাঁহার আশ্রিত কনৌজের অধিপতি চক্রায়ুধ রাষ্ট্রকূটাধীশ্বরের নিকট মস্তক অবনত করেন। এই ধর্ম্মপালের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ বাঙলা দেশে কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। গোবিন্দের উত্তরাধিকারী অমোঘবর্ষের (খ্রীঃ ৮১৪-৮৭৮) সমসাময়িক ছিলেন ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল। সিরুরে প্রাপ্ত তাম্রলিপি হইতে পাঠোদ্ধার হইয়াছে যে বঙ্গাধীশ (দেবপাল), অমোঘবর্ষকে বিশেষ সম্মান দেখাইতেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে চালুক্যেরা রাষ্ট্রকূটদের ধ্বংসসাধনপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে পুনরায় তাঁহাদের আধিপত্য স্থাপন করে। এই বংশের নৃপতি ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (খ্রীঃ ১০৭৬-১১২৬) তৃতীয় বিগ্রহপালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিলেন তাঞ্জোরের অধিপতি রাজেন্দ্র চোল (খ্রীঃ ১০১২-১০৫২) রাঢ় ও বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে পাল-সম্রাট্ মহীপাল হস্তী হইতে অবতরণপূর্ব্বক রণে ভঙ্গ দেন এবং বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্র পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষা করেন। এইরূপে কয়েক শতাব্দী পরাভূত হইবার পর বাঙালী অবশেষে দক্ষিণীদের দাসত্ব স্বীকার করে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্ম্মণ-বংশীয় রাজগণ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা কলিঙ্গের অন্তর্গত সিংহপুরের অধিপতি ছিলেন। সেন-বংশীয় রাজগণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙলার রাজা ছিলেন। তাঁহারাও কর্ণাটদেশ হইতে তথায় আগমন করিয়াছিলেন।

ছয় শত বৎসরের ইতিহাস বাঙালীর দক্ষিণীদের কাছে পরাজয়ের কথাই বলিয়া যাইতেছে—দক্ষিণীদের আধিপত্য ও রাজনৈতিক প্রভাব বাঙালী সহ্য করিয়াছে কিন্তু বিজিত বাঙালীকে দক্ষিণীরা ধর্ম্ম ও কৃষ্টি সাধনায় গুরু বলিয়া অনেকবার মানিয়া লইয়াছে, এবং একজন বাঙালী আচার্য্যের পদতলে ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া নিজেরা ধন্য হইয়াছে। এই চিরস্মরণীয় বাঙালীর নাম বিশ্বেশ্বর

শম্ভু। তিনি গৌড় দেশের অন্তর্ভুক্ত রাঢ়ের অন্তঃপাতী পূর্ব্বগ্রামের (বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায়) অধিবাসী ছিলেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশ্বেশ্বর শম্ভুর আবির্ভাব হয়। তিনি নিষ্ঠাবান্ শৈব ছিলেন এবং নর্ম্মদাতীরে ডাহল মণ্ডলের প্রখ্যাত গোলকি মঠের আচার্য্য-পদ লাভ করিয়াছিলেন। ডাহল-মণ্ডলের শৈবাচার্য্যদের আদিগুরুর নাম দুর্ব্বাসা শৈবাচার্য্য সদ্ভাব শম্ভু সুপ্রসিদ্ধ গোলকি মঠ স্থাপন করেন এবং ত্রিপুরীর কলচুরি-রাজ প্রথম যুবরাজের (খ্রীঃ ৯২৫-৯৫০) নিকট হইতে তিন লক্ষ গ্রাম দান-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া মঠের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য ঐ গ্রামসকল উৎসর্গ করেন। তৎপর রামশম্ভু, শক্তিশম্ভু, কেরল-নিবাসী বিমলশম্ভু ও তাঁহার শিষ্য ধর্ম্মশম্ভু গোলকি মঠের আচার্য্য হইয়াছিলেন, আর এই ধর্ম্মশম্ভুর শিষ্যই বাঙালী বিশ্বেশ্বর শম্ভু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব্বার্দ্ধে বিশ্বেশ্বর শম্ভুর ন্যায় বিখ্যাত জনপ্রিয় শৈবাচার্য্য আর কেহই ছিলেন না। কাকাতিয়-বংশের রাজা গণপতি (খ্রীঃ ১২১৩-১২৫০) তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রভূত সম্মান দানে তাঁহাকে নিজরাজ্যে আনিয়া রাখেন। তিনি পিতৃজ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিতেন। চোল, মালব এবং কলচুরি-রাজগণও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন এই বিদ্যোৎসাহী গণপতিরাজ গৌড়-দেশ হইতে আগত বহুসংখ্যক শৈবাচার্য্য ও কবিবৃন্দকে প্রচুর উপহার-দানে ভূষিত করেন।

কর্ণভূষণে অলঙ্কৃত, সোনালি রঙের জটাজুটে মস্তক মণ্ডিত এবং কণ্ঠাবরণে ভূষিত বিশ্বেশ্বর শম্ভু যখন গণপতি রাজপ্রাসাদস্থ বিদ্যামণ্ডপে উপবিষ্ট থাকিতেন, তখন শত শত নরনারী "শম্ভু" জ্ঞানে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইত। ১১৮৩ শকাব্দে, খ্রীঃ ১২৬১ অব্দে গণপতিরাজ-দুহিতা রুদ্রদেবী বিশ্বেশ্বর শম্ভুকে মন্দার গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাহা বেল-নানরু বিষয়ের অন্তঃপাতী কণ্ড্রবাটির অন্তর্গত ছিল। মন্দার গ্রামের বর্ত্তমান নাম মন্দোদম। বেলঙ্গপুণ্ডি গ্রামও তাহাকে দান করা হইয়াছিল।

বিশ্বেশ্বর পরহিতব্রত ও ধর্ম্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। মন্দার গ্রামে তিনি গোলকি-সম্প্রদায়ের জন্য একটী মন্দির, একটী বিহার ও একটী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করেন এবং সেখানে অনেক ব্রাহ্মণ আনিয়া স্থাপন করেন। তিনি গ্রামটীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "বিশ্বেশ্বর গোলকি" রাখেন এবং এই গ্রামে ও বেলঙ্গপুণ্ডি গ্রামে ষাট ঘর দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ স্থাপন করেন। উক্ত ব্রাহ্মণদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ভূমি দান করা হয়। উল্লিখিত গ্রাম দুইটির অবশিষ্টাংশ সাধারণ শৈবমঠের পরিপোষণার্থ, শুদ্ধ শৈবমঠের ছাত্রবর্গের ভরণপোষণের জন্য, সন্তান-প্রসবের ও অন্যান্য হাঁসপাতালের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রদান করা হয়। গ্রামে গোলকি মঠ ভিন্ন একটী সাধারণ ও আর একটী শুদ্ধ শৈব মঠ অবস্থিত ছিল।

বিশ্বেশ্বর প্রসূতিদের সাহায্যার্থ গ্রামে একটী মেয়ে-হাঁসপাতাল খুলিয়াছিলেন। গ্রামস্থ কালামুখ শৈবদের ভরণপোষণেরও তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষকদের ভরণপোষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমি দান করেন। ঋক্, যজুঃ ও সাম-বেদ অধ্যাপনার জন্য পাঁচ জন শিক্ষক তিনি নিযুক্ত করেন। দশজন নর্ত্তকী, আটজন বাদ্যকর, একজন কাশ্মীরী গায়ক চতুর্দ্দশজন সাধারণ গায়িকা, একজন পাচক ব্রাহ্মণ এবং চারিজন ভৃত্য সাধারণ শৈবমঠের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চোলদেশ হইতে আগত কতিপয় লোককে গ্রামের চৌকিদার নিযুক্ত করা হয়—ইহাদের বীরভদ্র বলা হইত। অধিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত স্বর্ণকার, তাম্রকার, মিস্ত্রি, কুম্ভকার, রাজমিস্ত্রি, সূত্রধর ও ক্ষৌরকার বসবাস করিত।

বিশ্বেশ্বরের জন্মভূমি রাঢ়ের পূর্ব্বগ্রাম হইতে বহু বাঙালী আসিয়া বিশ্বেশ্বর গোলকি গ্রামে বাস করেন। এই বাঙালীদের মধ্য হইতে কতিপয় ব্যক্তি গ্রামের আয় ব্যয় তত্ত্বাবধানের ও হিসাবরক্ষার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত সকল বর্ণের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তিনি অন্নসত্র খুলিয়া দিয়াছিলেন।

বিশ্বেশ্বর আদেশ দিয়াছিলেন যে মন্দির, ধর্ম্মশালা, বিহার ও গ্রামের অন্যান্য অনুষ্ঠানের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক

গোলকি-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবে। অন্যায় কর্ম্মের জন্য তত্ত্বাবধায়ককে অপসৃত করা ও উপযুক্ত লোককে সেই পদে পুনর্নিয়োগ করার ক্ষমতা সমগ্র শৈবধর্ম্মাবলম্বীদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। বিশ্বেশ্বর শম্ভুর দানপত্রের সর্ত্তগুলি সুচারুরূপে পালন করার জন্য একজন কর্ম্মচারীকে এক শত 'নিষ্ক' বেতনে নিযুক্ত করা হয়। বিশ্বেশ্বরের কর্ম্মানুষ্ঠান মন্দার গ্রামের বাহিরে অন্ধ্রদেশের অনেক স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল। অন্ধ্র দেশের বহুস্থানে তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠান এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কালীশ্বর গ্রামে তিনি একটী বিহার স্থাপন করিয়া উহার নাম উপলমঠ রাখেন; উহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত পোন্নগ্রাম দান করেন। মন্ত্রকূটে বিশ্বেশ্বর মঠ নামে একটী মঠ স্থাপন করিয়া তিনি উহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দির ও তৎসংলগ্ন অন্নসত্রের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মানেপল্লি ও উটপল্লি গ্রামদ্বয় দান করেন। তিনি চন্দ্রবল্লি নগরীতে আরও একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থানীয় একটী দীর্ঘিকার আয়তন বৃদ্ধি করেন এবং তাহার আয়ের অর্দ্ধেক উক্ত শিবমন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রদান করেন। বিশ্বেশ্বর প্রাচীন আনন্দপদ নগরের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া স্বীয় নামানুযায়ী উহার নাম রাখেন বিশ্বেশ্বর নগরী। এই স্থানে তিনি একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মুনিকূটপুর এবং আনন্দপুর দান করেন।

কোম্মগ্রামে এবং উত্তর-সোমশিলায় তিনি আরও দুইটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ঐত্তপ্রোলু গ্রাম অর্পণ করেন। শ্রীশৈলের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত এনিশ্বরপুরে তিনি একটী মঠ স্থাপন করেন। কাকতিয়-বংশের গণপতিরাজ এই মঠের অন্তর্ভুক্ত অন্নসত্রের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অবারী-গ্রাম দান করেন এবং দক্ষিণা-স্বরূপ স্বীয় গুরু বিশ্বেশ্বরকে পলিনারু বিহারের অন্তর্গত কণ্ডুকোট গ্রাম দান করেন। বিশ্বেশ্বর শম্ভু যে মঠের আচার্য্য সেই গোলকি মঠের প্রভাব তাঞ্জোর ও টিনেভেলি জিলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার দেহরক্ষার পর প্রিয় শিষ্য কাশীশ্বর গোলকি মঠের আচার্য্য-পদ গ্রহণ করেন। বিশ্বেশ্বর শম্ভুই দক্ষিণ-ভারতে প্রথম বাঙালী ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন না। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে গৌড়ের অধিবাসী বাঙালী বৌদ্ধশ্রমণ অবিঘ্নাকর কোঙ্কন প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করেন। তৎকালীন কোঙ্কন প্রদেশ রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষের (৮১৫-৮৭৭ খ্রীঃ) করদরাজা কপর্দ্দিনের অধীনে ছিল। অবিঘ্নাকর স্বীয় প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তিতে কোঙ্কনের অন্তর্গত কৃষ্ণগিরিতে কতিপয় বিহার নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অনেক অর্থ দান করেন।

বিশ্বেশ্বর শম্ভুর নাম আজ বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছে। সেই মহাপুরুষ বাঙালীর অধ্যাত্ম-সাধনা, কর্ম্মশক্তি, জনসেবার আদর্শ সুদূর দক্ষিণ দেশেও বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং তথাকার অধিবাসীদের শৈব সাধনায় দীক্ষা দিয়াছিলেন। মধ্যযুগে যেমন দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান বাংলার সভ্যতার প্রদীপ তিব্বতে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন সেইরূপ বিশ্বেশ্বর শম্ভু বাংলার জ্ঞান ও শিক্ষার আলোকে সমগ্র দক্ষিণ-ভারত আলোকিত করিয়াছিলেন।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
(প্রবাসী, মাঘ)

—————
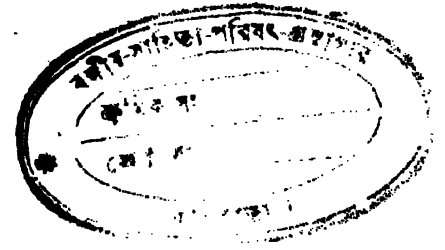
আলোচনা

গোবিন্দ কবিরাজ

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় গোবিন্দ কবিরাজের কথা লিখিতে গিয়া প্রথমেই বলিয়াছেন,—"শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে গোবিন্দ কবিরাজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ভক্তি-রত্নাকর, প্রেমবিলাস, বাঙ্গালা ভক্তমাল প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেই তাঁহার উল্লেখ দেখা যায়। তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু ও জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা-সম্বন্ধে ঐ সকল গ্রন্থে কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। সামান্য যাহা কিছু পাওয়া যায়, উহার মধ্যেও অনেক অনৈক্য আছে; সুতরাং মহাকবি গোবিন্দদাসের জীবন-বৃত্তান্ত অনেক পরিমাণেই সন্দেহপূর্ণ মনে হয়।"

সতীশবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবল গোবিন্দ কবিরাজ বলিয়া নহে, অনেক প্রাচীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তখনকার লোকেরা ইতিহাস লিখিবার বড় একটা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন না। বিশেষতঃ সমসাময়িক গ্রন্থকারেরা ভাবিতেন, এবং কেহ কেহ বলিয়াও গিয়াছেন যে, সকলেই যখন এই সকল ঘটনা অবগত আছেন, তখন উহা লিখিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু তাঁহারা কোন কোনও প্রসিদ্ধ-নামা ব্যক্তির বিষয় যাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও স্থিরচিত্তে অনুসন্ধান করিয়া বাছিয়া বাহির করিবার ধৈর্য্যই বা আমাদের কোথায়? গোবিন্দ কবিরাজের সম্বন্ধেই এখানে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

সতীশবাবু উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাহার পরেই লিখিয়াছেন, "যাহা হউক, জগদ্বন্ধুবাবু গোবিন্দ কবিরাজের জীবনবৃত্তান্ত-সম্বন্ধে তাঁহার গৌরপদ-তরঙ্গিণী গ্রন্থের উপক্রমণিকায় যাহা লিখিয়াছেন, ঐ গ্রন্থখানি ইদানীং দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, ঐ বিবরণটী কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও, অনুসন্ধিৎসু পাঠকদিগের সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।"

ইহাতে কেবল যে 'অনুসন্ধিৎসু' পাঠকদিগেরই সুবিধা হইল তাহা নহে, সতীশবাবুর পরিশ্রমও যে অনেকটা লাঘব হইল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু তিনি যদি সামান্য একটু কষ্ট-স্বীকার করিয়া জগদ্বন্ধুবাবুর লেখাটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিতেন এবং জগদ্বন্ধু বাবুর ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লইতেন, তাহা হইলে আজ আমাদের এইসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইত না। সতীশবাবুর ন্যায় একজন বিচক্ষণ বিজ্ঞ বৈষ্ণব-সাহিত্যিকের সম্বন্ধে কেন এরূপ কথা বলিতে বাধ্য হইলাম তাহার কারণ দিতেছি।

গোবিন্দ কবিরাজের পিতার নাম যে চিরঞ্জীব সেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু এই চিরঞ্জীব সেন-সম্বন্ধে দুই স্থানে দুইরূপ কথা পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

> "মুকুন্দদাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
> খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥"

আবার প্রেমবিলাসে দেখিতেছি রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসের নিকট এই বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন—

> "তিলিয়া-বুধরী গ্রামে জন্মস্থান হয়।
> পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন মহাশয়॥"

কাজেই, এই বিভিন্ন স্থাননিবাসী চিরঞ্জীব সেন এক কি বিভিন্ন ব্যক্তি তাহাই লইয়া গোল বাধিল। সুবিজ্ঞ জগদ্বন্ধুবাবু ঐ কথা উল্লেখ করিয়া লিখিলেন, "ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব ও বুধরীবাসী চিরঞ্জীব স্বতন্ত্র ব্যক্তি। এ যুক্তি যে খুব সারবান্ তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি আমাদিগের বিশ্বাস, এই দুই চিরঞ্জীবই এক ও অভিন্ন। গোল বড় বিষম, কিন্তু

আমরা অনুমিতি-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গোল মিটাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।"

জগদ্বন্ধুবাবু তৎপরে বলিতেছেন, "আমরা আরো অনুমান করি যে, রামচন্দ্র ও গোবিন্দের জন্ম কুমার-নগর মাতামহালয়েই হইয়াছিল।" এই বিষয় লইয়া অনেক বিচার-আলোচনা করিয়া শেষে তিনি লিখিলেন, "আমাদের অনুমান নিশ্চয় সত্য হইলে, তাহার ফল এই দাঁড়াইল—চিরঞ্জীব সেনের পূর্ব্বনিবাস শ্রীখণ্ডে; শ্বশুরালয় কুমারনগরে।"

এই সূত্রটী ধরিয়া ভদ্রমহাশয় অনুমিতি-প্রমাণের বলে আরও চারিটী দফা সাব্যস্ত করিয়া লইলেন এবং শেষে লিখিলেন, "আমরা বিবিধ গ্রন্থোক্ত বিবরণের সামঞ্জস্য করিবার জন্য উপরে যে সকল অনুমিতি বা যুক্তির আশ্রয় লইয়াছি, তাহা যে সত্য, নির্দ্দোষ ও অভ্রান্ত, আমরা এরূপ নির্দ্দেশ করিতে সাহস করি না এবং আশা করি অতঃপর কোন তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত ও বৈষ্ণব-লেখক এই সকল তত্ত্বের নির্ভুল মীমাংসা করিবেন।"

জগদ্বন্ধুবাবুর এই উক্তি-সম্বন্ধে সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "জগদ্বন্ধুবাবুর এই :সকল অনুমিতির অনেক কথা শুধু কল্পনামূলক হইলেও এইরূপ কল্পনা ব্যতীত কোনও 'তত্ত্বজ্ঞ', 'ভক্ত' ও 'বৈষ্ণব' যে পূর্ব্বোদ্ধৃত গ্রন্থের আপাত-বিরুদ্ধ উক্তিগুলির ইহা অপেক্ষা সুমীমাংসা করিতে পারিবেন, এরূপ মনে হয় না। তিনি এ সম্বন্ধে যে ধীরতা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, ইহা নিতান্ত প্রশংসনীয়।"

'এই সকল বড় বড় মহারথীদিগের বড় বড় উক্তি শুনিয়া, গোল মিটিয়া যাওয়া তো দূরের কথা, আমাদের মাথার মধ্যে আরও গুলিয়া গেল। তাঁহাদিগের ঐ সকল কথা বুঝিবার জন্য, সুবিজ্ঞ সাহিত্যিক ও পাঠকদিগের নিকট আমরা কয়েকটী কথা উপস্থাপিত করিতেছি।

প্রথমতঃ প্রেমবিলাস গ্রন্থ-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাস শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতির সমসাময়িক; তিনি তৎকালীন ঘটনাবলী যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা অনেকটা স্বচক্ষে দেখিয়া লেখা। এ-কথা জগদ্বন্ধুবাবুও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "প্রেমবিলাস-রচয়িতা (নিত্যানন্দ দাস) গোবিন্দ দাসের পিতা চিরঞ্জীব সেনের সমসাময়িক লোক। সুতরাং তাঁহার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রেমবিলাস হইতে গোবিন্দদাসের আখ্যায়িকা গ্রহণ করিলেও তিনি প্রেম-বিলাসের সকল কথা প্রামাণ্য না হইলে গ্রাহ্য করিতেন না; কারণ তিনি প্রগাঢ় ঐতিহাসিক কবি।"

ভক্তিরত্নাকরে চিরঞ্জীব সেন ও দামোদর কবিরাজ-সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণটী পাইতেছি—

"রামচন্দ্র গোবিন্দ-এ দুই সহোদর।
পিতা চিরঞ্জীব—মাতামহ দামোদর॥
দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
যেহোঁ মহাকবি—নাম বিদিত জগতে॥"

আবার গোবিন্দ কবিরাজ তাঁহার রচিত "সঙ্গীত-মাধব নাটক"এ লিখিয়াছেন—

"পাতালে বাসুকির্ব্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো বক্তা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥"

এখানে আমরা পাইতেছি দামোদর সেনের বাড়ী শ্রীখণ্ডে ছিল। ভক্তিরত্নাকরে আরও আছে—

"দামোদর কবিরাজ মহাভাগ্যবান্।
চিরঞ্জীব সেনে কৈলা কন্যাদান॥
ভাগীরথী তীরে গ্রাম কুমারনগর।
অনেক বৈষ্ণব তথা—বসতি সুন্দর॥
সেইগ্রামে চিরঞ্জীব সেনের বসতি।
বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি॥
কি কহিব চিরঞ্জীব সেনের আখ্যান।
খণ্ডবাসী সবে জানে প্রাণের সমান॥
শ্রীচৈতন্যপ্রভুর পার্ষদ বিজ্ঞবর।
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত অন্তর॥
'খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব'— বিদিত সর্ব্বত্র।
দীনহীনে কৈলা যেহোঁ ভক্তিরস পাত্র॥
চৈতন্যচরিতামৃতে প্রভুর মিলনে।
বর্ণিলেন খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনে॥"

এখানে আমরা পরিষ্কারভাবে জানিতে পারিলাম যে, চিরঞ্জীব সেনের বাড়ী কুমারনগরে। তিনি খণ্ডবাসী দামোদরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া খণ্ডে শ্বশুরালয়ে

আসিয়া বাস করেন। সেখানে তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন এবং সর্ব্বত্র 'খণ্ডবাসী-চিরঞ্জীব' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা নরহরি দাস চিরঞ্জীব সেনের ঠিক সমসাময়িক ছিলেন না,—কিছু পরবর্ত্তী কালের লোক। তাঁহার সময়ে 'খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব' এই চলিত কথা হইতে কাহারও কাহারও ধারণা তাঁহার পৈতৃক বাড়ী শ্রীখণ্ডে। ইহা দেখিয়া তাহাদিগের ভ্রম সংশোধনের জন্য, নরহরি দাস তাঁহার ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত কবিতায় চিরঞ্জীবের পরিচয় বিশদভাবে দিয়াছেন। ইহাই আমাদের মনে হয়।

জগবন্ধুবাবু গোবিন্দ কবিরাজের জীবন-বৃত্তান্ত-সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তিরত্নাকর হইতে "দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডে" এবং গোবিন্দ কবিরাজের সঙ্গীতমাধব নাটক হইতে "পাতালে বাসুকির্ব্বক্তা" ইত্যাদি সুবিখ্যাত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াও কেন যে তিনি চিরঞ্জীব সেনের পৈতৃক বাড়ী শ্রীখণ্ডে ও দামোদর কবিরাজের বাড়ী কুমারনগরে লিখিলেন, এবং সতীশবাবুই বা জগবন্ধুবাবুর এই ভুলটী সংশোধন না করিয়া কেন যে গ্রহণ করিলেন,—তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

যাহা হউক ইহার পরে ভক্তিরত্নাকরে দেখিতেছি একদা শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজিগ্রামে নিজবাটীর পশ্চিমদিকে সরোবরতীরে নিজগণসহ বসিয়া ভক্তিশাস্ত্রালাপ করিতেছেন, এমন সময় একখানি দোলা লইয়া বাহকেরা বিশ্রামার্থ তথায় উপস্থিত হইল। দোলার মধ্যে একটী পরম রূপবান্ যুবক সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত হইয়া বসিয়া আছেন। দেখিয়া বোধ হইল তিনি বিবাহ করিয়া নিজবাটী ফিরিয়া যাইতেছেন। তাহাকে দেখিয়া আচার্য্যপ্রভু বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন, এবং ভাবিলেন——

"কি অপূর্ব্ব যৌবন—দেবতা মনে হয়।
এ দেহ সার্থক যদি কৃষ্ণেরে ভজয়॥"

তাহার পর সঙ্গের লোকদিগকে যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে—

"কেহ প্রণমিয়া কহে—'এ মহাপণ্ডিত।
রামচন্দ্র নাম—কবি-নৃপতি বিদিত॥
দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক—যশস্বিপ্রবর।
বৈদ্যকুলোদ্ভব—বাস কুমারনগর॥"

এই কথা শুনিয়া মন্দ মন্দ হাস্য করিতে করিতে শ্রীনিবাস নিজালয়ে চলিয়া গেলেন :

রামচন্দ্র নিকটে দোলার মধ্যে বসিয়া ছিলেন। শ্রীনিবাসপ্রভুর কথাবার্ত্তা তাঁহার কাণে গেল; তিনি অমনি আচার্য্যপ্রভুর পানে চাহিলেন, এবং তাঁহার তেজস্কর ভক্তিমাখা মূর্ত্তি দেখিয়া তখনই মনে মনে তাহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন।

যাজিগ্রাম হইতে কুমারনগর বেশী দূর নহে। বিশ্রামান্তে লোকজনসহ রামচন্দ্র বাটীতে গেলেন। তিনি সারাপথ কেবল আচার্য্যপ্রভুর কথাই ভাবিতেছিলেন। বাটীতে গিয়াও তিনি সুস্থির হইতে পারিলেন না,—কখন প্রভুর সহিত মিলিত হইবেন, এই চিন্তাই তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কোনপ্রকারে দিনমান কাটিয়া গেল; সন্ধ্যার পরই তিনি পদব্রজে যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন এবং এক ব্রাহ্মণের বাটীতে রহিলেন। অতি প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া আচার্য্যপ্রভুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পদতলে ছিন্নমূলতরুর ন্যায় পতিত হইয়া বারংবার দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস তাড়াতাড়ি রামচন্দ্রের বাহুদ্বয় ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন এবং হৃদয়ে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, তারপরে গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—

"জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধবাতিশয়।
অদ্য বিধি মিলাইলা হইয়া সদয়॥"

শেষে দুইজনে বসিয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

রামচন্দ্র সেখানে থাকিয়া আচার্য্যপ্রভুর নিকট ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত ছিলেন, শাস্ত্রাদিও অনেক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং মনপ্রাণ দিয়া দিবানিশি বৈষ্ণবগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই পাঠ শেষ করিলেন। তখন শ্রীনিবাস শুভক্ষণে তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।

সে সময় রামচন্দ্র ভ্রাতৃসহ কুমারনগরে বাস করিতে ছিলেন। শ্রীখণ্ড মাতামহের বাটী হইতে তাঁহারা কোন সময় নিজ বাটী কুমারনগরে আসিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ

কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে তাঁহাদিগের শৈশবাবস্থায় চিরঞ্জীবের মৃত্যু হওয়ায়, মাতামহের আলয়ে তাঁহাদিগের অনেক দিন থাকিতে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ মাতামহের মৃত্যুর পর তাঁহারা পিত্রালয় কুমার নগরে আসিয়া বাস করেন।

রামচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণের কিছুদিন পরে নবদ্বীপে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত অদর্শন হইলেন। তৎপরে কণ্টক-নগরে গদাধর দাস ও শেষে শ্রীখণ্ডে সরকার ঠাকুর সঙ্গোপন হওয়ায় ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে হাহাকার উপস্থিত হইল। শ্রীনিবাস শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং দেশে অতিষ্ঠ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে ছুটিলেন। তাঁহার অভাবে তাঁহার শিষ্যসেবকেরা ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজনেরা চারিদিক্ শূন্যময় বোধ করিতে লাগিলেন। এই সময় রামচন্দ্র শ্রীখণ্ডে গমন করেন। তাঁহাকে পাইয়া রঘুনন্দন কতকটা আশ্বস্ত হইয়া করুণার্দ্র বচনে তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই, আর তো তিষ্ঠাইতে পারিতেছি না। এ সময় আচার্য্যপ্রভুর দেশে আসার নিতান্ত প্রয়োজন। এ কার্য্য তুমি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারিবে না। কৃপা করিয়া শীঘ্র বৃন্দাবনে গিয়া তাঁহাকে লইয়া এস। তারপর রামচন্দ্রকে বৃন্দাবনে যাইবার পথ বলিয়া দিলেন। কারণ, রামচন্দ্র পূর্ব্বে আর কখনও বৃন্দাবনে যান নাই। শ্রীখণ্ড হইতে রামচন্দ্র যাজিগ্রামে আসিয়া দেখিলেন সকলে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় রহিয়াছেন।

তথায় রামচন্দ্রে সবে কহে বার বার।
শ্রীআচার্য্য বিনা সব হৈল অন্ধকার॥
না কর বিলম্ব—শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন।
আচার্য্যে আনিয়া রাখ সবার জীবন॥"

রামচন্দ্র সকলকে প্রবোধ দিয়া নিজবাটী কুমারনগরে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার অনুজ গোবিন্দকে লইয়া নিভৃতে বসিলেন এবং ক্রমে জানাইলেন যে পরদিবস প্রাতে আচার্য্য প্রভুকে আনিবার জন্য তিনি বৃন্দাবনে যাত্রা করিবেন। তাহার পর অতিশয় স্নেহের আবেগে বলিতে লাগিলেন (যথা ভক্তি-রত্নাকরে)—

"এবে হেথা বাসের সঙ্গতি ভাল নয়।
সদা মনে আশঙ্কা উপজে অতিশয়॥
আছয়ে কিঞ্চিৎ ভৌম বহু দিন হৈতে।
তাহে যে উৎপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে॥
শাস্ত্র এই বাসাদিক পরিত্যাগ করি।
নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র বাস হয় সর্ব্বোপরি॥"

সেই "অন্যত্র বাস" কোথায়?—তাহাও বলিলেন—

"তাহে এই গঙ্গা-পদ্মাবতী-মধ্যস্থান।
পুণ্যক্ষেত্র 'তেলিয়া বুধরি' নামে গ্রাম॥
অতি গণ্ডগ্রাম—শিষ্টলোকের বসতি।
যদি মনে হয় তবে উপযুক্ত স্থিতি॥"

তাহার পর বলিলেন, বিশেষতঃ

"শ্রীমাতামহের পূর্ব্বে ছিল গতায়াত।
সকলে জানেন তেঁহো—সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥"

সুতরাং সেখানে বাস করিলে সকল রকম সুখ ও সুবিধা হইবে।" জ্যেষ্ঠের এই প্রস্তাব গোবিন্দের বেশ মনে ধরিল; তিনি সম্মত হইলেন। কনিষ্ঠের সম্মত পাইয়া রামচন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন।

রামচন্দ্র হঠাৎ বাসস্থান পরিবর্ত্তনের কথা কেন তুলিলেন এবং যদিই বা পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইল, তবে মাতামহের আলয় শ্রীখণ্ড ছাড়িয়া অন্যত্র বিশেষতঃ তেলিয়া-বুধরি যাইবার কথা কেন বলিলেন, ইহা এক সমস্যা বটে। কিন্তু ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয় রামচন্দ্রের মনের কথা টানিয়া বাহির করিয়াছেন। সেই ব্যাপারটী একটু গোড়া হইতে বলিতে হইতেছে।

যে দিবস রামচন্দ্র প্রথমে গিয়া শ্রীনিবাস প্রভুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন। সেইদিন শ্রীনিবাস কথা-প্রসঙ্গে নরোত্তম ঠাকুরের কথা উত্থাপন করেন। তিনি বলিয়াছিলেন (যথা ভক্তিরত্নাকরে)—

"জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধবাতিশয়।
অদ্য বিধি মিলাইলা হইয়া সদয়॥
ঐছে নরোত্তমে মিলাইলা বৃন্দাবনে।
"নিরন্তর কেবা না ঝুরয়ে তাঁর গুণে॥

তেঁই একনেত্র—তুমি দ্বিতীয় নয়ন।
দোঁহে মোর নেত্র—ভুজদ্বয় দুই জন॥"

নরোত্তমের যশোরাশি তখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রামচন্দ্র অবশ্য তাহা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার মনোবৃত্তি অন্যরূপ থাকায় রামচন্দ্র তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আচার্য্য প্রভুর মুখে নরোত্তমের গুণকীর্ত্তন শুনিয়া রামচন্দ্রের মন স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। আচার্য্য প্রভু তাহা বুঝিতে পারিয়া ঠাকুর মহাশয়ের কাহিনী অর্থাৎ কি প্রকারে তিনি লোকনাথের সেবা করিয়াছিলেন এবং লোকনাথ প্রথমে তাহাকে দীক্ষা দিতে রাজী না হইলেও শেষে তাঁহার সেবায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন, ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন। শেষে—

"হাসিয়া শ্রীআচার্য্য কহে ধীরে ধীরে।
মনে যে কহিলা তাহা হইবে অচিরে॥'"

সেই হইতে সর্ব্বদা—

"রামচন্দ্র এই চিন্তা করে মনে মনে।
শ্রীনরোত্তমের সঙ্গ হবে কত দিনে॥
হইলে তাঁহার সঙ্গ যাবে সব দুঃখ।
দরশন বিনা মনে না জন্মিবে সুখ॥
ঐছে স্থানে বহি, যাতে সুখ সর্ব্ব মতে!
স্থান স্থির হৈল—মনে ঐছে বিচারিতে॥

সেই স্থানটী তেলিয়া-বুধরী। ইহা নরোত্তম-ঠাকুরের স্থান খেতুরি হইতে মাত্র চারি ক্রোশ ব্যবধান—পদ্মাবতীর পরপারে। যথা; প্রেমবিলাসে—(তেলিয়া-বুধরী) "পদ্মাবতী-তীরে—ও-পারে গড়ের বাট দেশ।"

যাহাহউক, মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন বটে, কিন্তু এতদিন এই মনোভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার সুবিধা-সুযোগ পান নাই। আজ তাহাই উপস্থিত হওয়ায় কনিষ্ঠের নিকট কৌশলে 'পুণ্যক্ষেত্র' তেলিয়া-বুধরীর কথা জানাইলেন, কিন্তু এই স্থান যে নরোত্তমের বাড়ীর সন্নিকট সে কথা বলিলেন না। যাহাহউক তিনি জানিতেন—

"নিজানুজ ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ বিদ্যাবান্।
কার্য্যেতে চাতুর্য্য চারু সর্ব্বাংশে প্রধান।"

কাজেই গোবিন্দ যখন তেলিয়া-বুধরী যাইতে সম্মত হইলেন তখন রামচন্দ্রের আনন্দের সীমা রহিল না।

পরদিবস প্রাতে রামচন্দ্র বৃন্দাবন-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

"আচার্য্য গেলেন মার্গশীর্ষ মাসশেষে।
রামচন্দ্র গমন করিলা শেষ পৌষে॥"

আর গোবিন্দ ইহার ২।৪ দিন পরে, অর্থাৎ মাঘের প্রথমে কুমারনগর হইতে তেলিয়া-বুধরী গেলেন। এবং

"বুধরী পশ্চিমে শ্রীপশ্চিমপাড়া নাম।
তথা সর্ব্বারম্ভে বাস—সেহ রম্য স্থান॥"

কিন্তু শেষে—"তেলিয়া-বুধরী গ্রামে গোবিন্দের স্থিতি।
তেলিয়ার নির্জ্জন স্থানেতে প্রীত অতি॥"

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, প্রথমে গোবিন্দ কুমারনগর হইতে বাস উঠাইয়া তেলিয়া-বুধরী গিয়া বসবাস করিলেন, আর এই প্রথমে রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে রামচন্দ্রের সুন্দর চেহারা, অগাধ পাণ্ডিত্য ও প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া বৃন্দাবনবাসী মাত্রেই মুগ্ধ ও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। শেষে

"শুনিয়া রামচন্দ্রের কবিত্ব চমৎকার।
'কবিরাজ' খ্যাতি হৈল—সম্মত সভার॥"

জগদ্বন্ধুবাবু 'অনুমিতি' ও 'যুক্তি দ্বারা' বিশেষ গবেষণা করিয়া যে পাঁচটী দফা স্থির করিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রথম দফাটী অর্থাৎ "চিরঞ্জীব সেনের পূর্ব্বনিবাস শ্রীখণ্ডে ও মাতুলালয় কুমারনগরে"—লইয়া আমরা প্রথমে বিচার করিয়া তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছি। তাঁহার অনুমিতি ও যুক্তির ফল অপর চারিটী দফা নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

"(২) চিরঞ্জীব কুমারনগরবাসী দামোদর সেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়েই কিছুদিন বাস করেন; এইস্থানে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে।

(৩) শ্বশুরের সহিত তাঁহার কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় তিনি দুই পুত্র লইয়া বুধরী গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এই বুধরী গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়।"

(৪) ভ্রাতৃদ্বয় পিতার ও মাতামহের মৃত্যুর পর বুধরী হইতে পুনরায় কুমারনগরে যাইয়া বাস করেন।

(৫) রামচন্দ্রের উপদেশক্রমে গোবিন্দ পুনরায় বুধরীতে যাইয়া বাস করেন।"

আর-জগদ্বন্ধু বাবু 'এ-সম্বন্ধে যে ধীরতা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন' তজ্জন্য সতীশবাবু তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, জগদ্বন্ধুবাবুর এই সকল উক্তির মূল কোথায়? তিনি কোনরূপ প্রমাণ প্রয়োগ না করিয়া কি প্রকারে এই সকল লিপিবদ্ধ করিলেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ইঁহাদের ন্যায় বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট আমরা এইরূপ যুক্তি ও উক্তির আশা করি নাই। আমাদের মনে হয়, জগদ্বন্ধু-বাবু গোড়ায় গলদ করিয়া সমস্ত বিষয়টা একেবারে ওলট-পালট করিয়া আরও গোল পাকাইয়াছেন এবং দুর্ব্বোধ্য করিয়া ফেলিয়াছেন।

ক্রমশঃ

——*:*:*——

সম্মোহিতা

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীঊষা মিত্র

চৌদ্দ

স্নানের জন্য পিতাকে তাড়া দিতে আসিয়া তাঁহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সুলেখা শিহরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা ও কি, কি হয়েছে তোমার?"

উন্মাদের মত চাহিয়া ডাক্তার জড়িতকণ্ঠে কি বলিলেন লেখা তাহার বিন্দুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া নিকটে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্লে বুঝতে পারলাম না—আবার বল বাবা আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।"

"কি শুনবি মা, সব শেষ হ'য়ে গেছে. বাড়ী পুড়ে ছাই হ'য়েছে, জিতেন খুন করা অপরাধে হাজতে।"

সুলেখা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, কিছুক্ষণ পরে পিতাকে বলিল,—"মিথ্যে কথা কে এ সব বল্লে?"

"মিছে কি করে হ'বে, কম্পাউণ্ডার টেলিগ্রাম করেছে যে।"

"কই দেখি?" পতিত টেলিগ্রাম তুলিয়া লেখা পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু কতকগুলি অক্ষরের সমষ্টি ব্যতীত অপর কিছু বুঝিতে পরিল না। আবিষ্টের ন্যায় উহা হাতে লইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল।

উভয়ে কিছুক্ষণ নির্ব্বাকভাবে বসিয়া থাকিয়া ডাক্তার বলিলেন,"আমি আর যে পারছি না মা, কি দিয়ে এই মকদ্দমা চালাব—জিতেনকেই বা উদ্ধার করব কেমন করে?"

কথাটা বলিয়া ডাক্তার কোচে শুইয়া পড়িলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজেকে সংযত করিয়া সুলেখা উঠিল।

গোলাপ জলে অঞ্চল সিক্ত করিয়া পিতার মুখ যত্নে মুছাইয়া বাতাস করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করিল, "বাবা একটু সুস্থ হয়েছ ?"

"হয়েছি লেখা পাখা রাখ শোন, নগদ কিছু নেই, রাখি নি কোন দিন, তোমার মার আর তোমার গহনা এবং ঐ বাড়ী তা তো সব পুড়েই গেল এখন কি দিয়ে জিতুকে ছাড়াব ?"

"কেন বাবা আমার গায়ে যা গহনা আছে তা দিয়ে দাদাকে ছাড়ান যাবে না ? আমি এ বিশ্বাস করি না যে সত্যি দাদা মানুষ খুন করেছে।"

"এ কথা আমিও বিশ্বাস করি না মা কিন্তু কোর্টের কথা। ভীষণ জায়গায় সত্যি মিথ্যে হয়, আর মিথ্যে সত্যি হয়। কি হ'বে মা ও কটা গহনায়।"

"এ ছাড়া মুক্তার মালা আর চুড়ি ক'গাছা ও তো আছে।"

"বুদ্ধির কাজ করেছ লেখা অন্ততঃ দেড় হাজার টাকা হ'বে; যাক তবু ভাল, কিন্তু কিছু হ'বে না এ টাকায় মা।"

"ভয় কি বাবা চল আগে যাই কলকাতায়।"

"চল মা" বলিয়া ডাক্তার উঠিলেন।

"এ-বেলা ট্রেণ নেই যে বাবা।"

"নেই ট্রেণ-নেই মা" বলিয়া বৃদ্ধ হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন।

"অধৈর্য্য হয়ো না তুমি দাদা নিশ্চয় খালাস পাবেন, চান করে একটু কিছু খাও আমি ততক্ষণ সব গুছিয়ে নি।"

জোর করিয়া পিতাকে স্নানাহার করাইয়া ক্ষিপ্রতার সহিত সুলেখা প্রস্তুত হইয়া লইল। একটী ছোটবাড়ী ভাড়া করিবার জন্য কম্পাউণ্ডারকে টেলিগ্রাম করিয়া কতক নিশ্চিন্ত হইয়া সুলেখা আহার করিতে বসিল।

* * *

কলিকাতায় আসিয়া পিতাকে বলিল, "এখানে থেকে ঠিক জানা যাবে না তার চেও চল বাবা আজকেই আমরা সিরাজগঞ্জে যাই।"

"সেখানে গিয়ে কোথায় দাঁড়াবে মা।"

"সেখানে দাদার কুন্তলা-দিদি আছেন সেখানকার জমীদারের বড়-বৌ, গাঁয়ে বাড়ী খুঁজে নিতে কষ্ট পেতে হ'বে না।"

"জিতুর দিদি কয়বার সেখানে গেছলেন নয় মা ?"

"হাঁ বাবা।"

"তবে চল।"

সেই দিনই তাঁহারা সিরাজগাঁয়ে রওনা হইলেন।

সেখানে গিয়া ডাক্তার কি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন; কারণ স্থানীয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া জুতা-মোজা-পরিহিতা অপূর্ব্ব-দর্শনা লেখাকে কৌতূহলদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; পথ ছাড়িয়া দিবার আগ্রহমাত্র দেখাইল না। গ্রামের বাহিরে যাইবার সৌভাগ্য যাঁহাদের কোন দিন হয় নাই, তাহারা এই অপূর্ব্ব বেশধারী রমণীকে দুই ব্যগ্র চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া দেখিয়া বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য তাহার মুখের উপর প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেছিল না।

ডাক্তারের সানুনয় অনুরোধেও যখন তাহারা তাহাদের গন্তব্য স্থান-সম্বন্ধে কোন উত্তর দিল না, তখন তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন; এমন সময় ভগবৎ-প্রেরিতের মত এক বৃদ্ধ ভিড় ঠেলিয়া উঁহাদের নিকটে আসিয়া প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদের গন্তব্যস্থান জানিয়া লইয়া তাহাদিগকে কুন্তলার গৃহে পৌছাইয়া দিলেন। সারাপথ বালকের দলও মজা দেখিবার জন্য তাঁহাদের পিছু লইয়া আসিয়াছে। সুলেখা ঐ অসভ্য লোকগুলার বর্ব্বরতা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলে এই মহিমময়ী নারী দৃঢ়কণ্ঠে তাহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা বাড়ী যাও, এঁরা ক্লান্ত হ'য়ে এসেছেন, এখন জিরুবেন।" তারপর ডাক্তারকে প্রণাম করিয়া লেখার হস্ত ধারণ করিয়া চিরপরিচিতার ন্যায় বলিলেন, "বাড়ী চিনতে কষ্ট হয় নি তো বাবা ?"

"হয়েছিল বৈ কি মা।"

"আগে যদি একটু লিখতেন।"

জীতেনের জন্য কুন্তলা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কিভাবে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবেন সে বিষয়ে পরামর্শ করিবার লোক পাইতেছিল না। ইহাদের

দেখিয়া এখন কতকটা আশ্বস্ত হইল। তাহাদের সঙ্গের জিনিস-পত্র ক্ষিপ্রহস্তে তুলিতে তুলিতে লেখাকে বলিল,—"ভাই ব্যাগ্ খুলে বাবার জামাটা বার করে দাও আমি ততক্ষণ ওঁর জুতা-টুতা খুলে নি।"

কুন্তলাকে জুতার দিকে ঝুঁকিতে দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন, "ওকি মা থাক্-থাক্ আমিই খুলে নিচ্ছি।"

জোর করিয়া জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে আব্দারের সুরে কুন্তলা বলিল, "কেন বাবা, লেখাই তোমার মেয়ে আর আমি কেউ নই?"

এই মেয়েটির সঙ্কোচবিহীন অথচ ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া ডাক্তার বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া সস্নেহে তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া বলিলেন,—"তা নয় মা তুমিই যে আমার বড় মেয়ে।"

"কিন্তু বাবা আমি যে আপনার কাছে ভীষণ অপরাধী; আমার যে দোষ সে যে কোন পিতাই ক্ষমা করতে পারেন না।"

কথাটার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া হতভম্বের ন্যায় ডাক্তার উহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া বলিল, "বাবা বুঝছেন না? আর কি করেই বা বুঝবেন যে, আজ জিতেনভাই এ রাক্ষসীর জন্যই জীবনমৃত্যুর সন্ধি-স্থলে এসে দাঁড়িয়েছে।" অনুশোচনায় অনুতাপে সে যেন কাঁদিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে সকল কথা শোনা হইলে ডাক্তার বলিলেন, "মানুষের কাজই করেছে সে; নিজকে অপরাধী ভেবে কষ্ট পেও না মা, এখন বুঝতে পারছি তাকে বাঁচাতে পারব; কারণ এ-ক্ষেত্রে সে সত্যের ন্যায়ের পথে চলেছে—আর যারা সত্য ও ন্যায়ের পথে চলে ভগবান সর্ব্বদাই তাদের সহায় হন।"

"কিন্তু বাবা তার বিরুদ্ধে যে এক ভয়ানক প্রমাণ আছে শুনছি।"

"কি?"—

"এখানে বিনয়বাবু বলে একজন লোক আছেন, তিনি সাক্ষ্য দেবেন, আরো না কি কয়েকজন ভদ্রলোক সাক্ষ্য দেবেন, তাঁরা দেখেছেন জিতেনের লাঠির আঘাতে লোকটা খুন হয়েছে; কিন্তু আমিও বলে রাখছি আমি প্রাণপণে তাদের সে চেষ্টায় বাধা দেবো।"

"চেষ্টা কর মা লক্ষ্মী। ভগবান অবশ্যই আমাদের সহায় হ'বেন! আর ওই আমার এক ছেলে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় যদিও আমার সর্ব্বস্ব গেছে তবুও যেমন করে পারি টাকা আমি যোগাড় করব, বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার আমি দেব; কিন্তু যাতে এরা সাক্ষী না দেয় তাই করো মা।"

"আশীর্ব্বাদ করুন বাবা যেন কৃতকার্য্য হই, আমায় কিছু বল্‌তে হ'বে না, সে আপনার যেমন ছেলে আমারও তো ভাই।"

লেখা জিজ্ঞাসা করিল "সে মেয়েটীর সন্ধান কিছু পেলে দিদি?"

"না ভাই তার সন্ধান মেলে নি, সেই গোলমালের মধ্যে তারা শিবানীকে নিয়ে পালিয়েছিল; সবাই সন্দেহ করছে ঐ বিনয় না কি এ কাজের পাণ্ডা।"

"ও মা এমন পাজি! তাই নিজের দোষ দাদার ঘাড়ে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাইছে।"

"তাই, কিন্তু ভগবানের রাজ্যে এত বড় অবিচার হয় না লেখা, জিতেন নির্দ্দোষ নিশ্চয় খালাস পাবে, তার সৎকার্য্যের পুরস্কার এভাবে সে কখনই পেতে পারে না।"

"জান না দিদি সংসারে অসম্ভব বলে কিছু নেই।"

উহার ব্যথা কোথায় বুঝিতে পারিয়া মমতায় কুন্তলার চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল।" বলিল, ভুল বুঝনা লেখা সৎকার্য্যের পুরস্কার আছেই।"

"তাই যদি হয়, তবে গীতালি মার আমার অকালমৃত্যু কেন হ'ল দিদি? সে যে তোমার একমাত্র সম্বল—।"

বাধা দিয়া ব্যস্ততার সহিত কুন্তলা বলিল,—"বেলা হলে বাবা চান্ করে নিলে তুমিও চান্ করে নিও লেখা—দেরী করো না।"

ডাক্তারের স্নানাহারের পর শূন্য কলসী কুন্তলাকে তুলিতে দেখিয়া সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছ দিদি।"

এই রমণীর প্রত্যেক কার্য্য সুলেখা প্রশংসামান মুগ্ধ-নেত্রে দেখিতেছিল।

"জল আনতে যাচ্ছি ভাই, তুমি ততক্ষণ চান করে নাও।"

"জল আনতে কি তুমিই যাবে?"

হাসিয়া কুন্তলা বলিল, "নয় তো কে যাবে লেখা? ঝি চাকর নেই তো?"

"দিদি সব কাজ তুমিই করো?"

"আমি না করলে কে করবে ভাই।"

"আগে জামাইবাবু থাকতে তো কখনও করতে হয় নি তোমাকে দিদি।"

"তখনও করতুম ভাই—শুধু জল তোলা, বাসন মাজা বাদে সব কাজই করতাম।"

"তখন অনেক লোকজন ছিল শুনেছি, তবে নিজে কেন করতে দিদি?"

"নারী-জীবনের সার্থকতাই যে সেবা ও আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে ফুটে ওঠে।"

স্তব্ধ-নেত্রে তাঁহার দিকে লেখাকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া কুন্তলা প্রশ্ন করিল,—"কি দেখছ লেখা?"

"কিছু না, কাজ করতে আমারও ভাল লাগে, কিন্তু বাসন মাজা, জল তোলা এ সব বাদে। আচ্ছা দিদি সত্যি করে বলো, যখন এ সব কাজ তোমায় প্রথম করতে হ'য়েছিল তখন কষ্ট হ'ত না?"

"প্রথম প্রথম হ'ত বই কি?"

"এখন?"

"এখন কই কষ্ট তো আর হয় না—সয়ে গেছে। প্রকৃতির নিয়ম যে এই, চিরকাল কোন কিছুর তীব্রতা সমানভাবে থাকে না, নয় তো আজ পাগল হয়ে যেতুম।"

"কিন্তু—"

"আর কিন্তু নয় বেলা যে আর নেই পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর ভাই, জল নিয়ে আসছি।"

"তুমিও কি পুকুরে স্নান করবে?"

"হ্যাঁ।"

"তবে আমিও যাব।"

"বেশ চল পুকুরে। কখন চান কর নি বোধহয়, আজ দেখ কেমন লাগে।"

পুকুরে নামিতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া কুন্তলা বলিল, "কি চান করার সাধ মিটল?"

লজ্জিত লেখা উত্তর করিল, "কিন্তু এ যে একেবারে খোলা যায়গা যদি কেউ দেখে?"

"কেউ দেখবে না, এ সময় এখানে বড় একটা কেউ আসে না, জমিদারের পুকুর কি না।"

স্নান করিয়া ভিজা-কাপড়ে উঠিতে উঠিতে লেখা বলিল, "এ গাঁয়ে এতবড় বাড়ী তো দেখি নি, এ কাদের বাড়ী দিদি?"

"জমিদারদের।"

"জমিদারদের—তোমাদের?"

সুন্দর অট্টালিকা ভাল করিয়া দেখিবার মানসে চাহিতে গিয়া সুলেখা দ্বিতলস্থ গবাক্ষ-পার্শ্বে মনুষ্য-মূর্ত্তিদর্শনে লজ্জা পাইয়া চোখ নাবাইয়া লইল।

"দেখ দিদি কি অসভ্য লোকটা, মেয়ে চান করছে তা ও হাঁ করে দেখছে?"

আশ্চর্য্য হইয়া কুন্তলা উপরের দিকে চাহিল।

"কে ও দিদি? দেখতে পেয়েছ? না ও সরে গেল তোমাকে দেখে, মাগো কি বিশ্রী, কি কালো।"

কুন্তলা রমেনকে দেখিতে পাইয়াছিল, কি ভাবি চুপ করিয়া রহিল।

পনের

সজ্জিত কক্ষে আস্তৃত কারুকার্য্য-খচিত গালিচার উপর বৃহৎ শুভ্র তাকিয়ায় ঠেস দিয়া পারিষদ-বেষ্টিত জমিদার রমেন চৌধুরী বসিয়াছিল। ট্রের উপর দুইটা বোতল ও কয়েকটা কাঁচের গ্লাস সম্মুখে রক্ষিত ছিল, এক ধারে কতকগুলা সোডার বোতল পড়িয়াছিল। অশ্লীলতা-পূর্ণ নগ্ন ও অর্দ্ধনগ্ন সুন্দরীদিগের কদর্য্য চিত্র দেয়ালগাত্রে লম্বিত রহিয়াছে। গৃহের এক কোণে কারুকার্য্যযুক্ত সুন্দর এক প্রকাণ্ড বীণ রহিয়াছে। গুণের মধ্যে রমেন বীণ বাজাইত চমৎকার। এ অঞ্চলে উহার ন্যায় বীণ বাজাইতে বড় একটা কেহ ছিল না। খ্যাতনামা ওস্তাদগণ দূরদেশ হইতে বীণ শুনিতে আসিয়া মুগ্ধ হইতেন। এই মজলিসে তখন হারমোনিয়ামের চাবী টিপিয়া এক ব্যক্তি ভাঙ্গা গলায় গান ধরিল। বিরক্ত হইয়া রমেন বলিল, "থাম, হে থাম"। কথাটা মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র বিনয় মিত্র গ্লাস পূর্ণ করিয়া উহার মুখের নিকট আগাইয়া ধরিল।

তাচ্ছিল্যভরে উহা ঠেলিয়া দিয়া জমিদার বলিলেন,—"আর নয় আজ থাক্।"

"সে কি ব্রহ্মার আজ মন্দাগ্নি—আজ দেখ্ছি তোমার মেজাজ ভাল নেই, চল না শিবানীর কাছে যাওয়া যাক, সে বোধ হয় এতদিনে সায়েস্তা হ'য়েছে, গহনাও তো কম পায় নি, আর ছিঁচ-কাঁদুনে নেই বোধ হয়, চল না হে।"

"না আজ থাক্।"

"তবে বীণই না হয় বাজাও, অনেক দিন শুনি নি।"

"তাও ভাল লাগচে না, আমি এখন একলা থাক্তে চাই বিনয়।"

বোতলের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে নিরাশ হৃদয়ে সে দিবসের মত সকলে বিদায় লইল।

গৃহ নীরব হইলে রমেন ডাকিল, "শ্যাম।"

"আজ্ঞে।"

"দিগম্বরকাকাকে ডাক।"

দিগম্বরবাবু রমেনের পিতার আমলের বৃদ্ধ কর্ম্মচারী। তরুণ জমীদারকে ইনি বাস্তবিক স্নেহ করিতেন, রমেনের অসম্ভব অসম্ভব খেয়াল এই বৃদ্ধ যথাসম্ভব পূরণ করিতেন। রমেন ইঁহাকে ভয় এবং একটু মান্যও করিত।

দিগম্বরবাবু আসিয়াই প্রশ্ন করিলেন, "আমাকে ডেকেছ রমেন।"

"হ্যাঁ কাকা ডেকিছি।"

"বেশ করেছ বাবা, সব সময়ে ঐ বাঁদর লম্পট-গুলোর সঙ্গে থেক না। রাতদিন ভগবানের কাছে কামনা করি—"

"বোস কাকা হাঁ এবার আমি ভালই হ'ব। তুমি দুঃখ ক'র বংশ লোপ হ'বে বলে।"

"সে তো ঠিক। বিয়ে যদি না কর বংশ তো লোপ পাবেই বাবা—স্বর্গীয় কর্ত্তামহাশয় এক গণ্ডুষ জল পাবেন না—কত বোঝাই তোমায়, ঐ যে শনিরা সব তোমায় ঘিরে থাকে—"

বাধা দিয়া রমেন বলিল, "এই কথা বলতেই তো ডেকেছি কাকা, বিয়ে দাও আমার।"

আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিলেন—"হুকুম দাও, একবার বল বাবা, হাজার হাজার মেয়ে এনে হাজির করে দেব।"

"কিন্তু সেই মেয়েকে যদি না পাই তো বিয়ে করবো না।"

বিস্মিত হইয়া দিগম্বর বলিলেন, "কোন মেয়ে? কোথায় থাকে?"

"তা তো জানি না কাকা, আজ বৌদির সঙ্গে পুকুরে স্নান করতে দেখেছি।"

"হাঁ হাঁ বুঝেছি, তাঁরা বড়মার বাড়ীতে এসেছেন, কিন্তু তারা যে ক্রিশ্চান"

হাসিয়া রমেন বলিল, "ক্রিশ্চান হ'লে কি বৌদি বাড়ীতে থাকতে দিতেন?"

"তাও বটে, বড়মার বাড়ীতে আছেন, আবার জুতো মোজা পায় দেয়।"

"আজকাল কলকাতার মেয়েরা ওসব পরে থাকে। ঐ মেয়ে না হ'লে বিয়ে করবো না কাকা তা আগে থাক্তেই ব'লে দিচ্ছি।"

"কি এমন সুন্দর সে মেয়ে—তার চেও ঢের ভাল মেয়ে এনে দেব।"

"তবে থাক।"

দিগম্বর অস্থির হইয়া উঠিলেন, "না না ও কথার কথা বইতো নয়, সে মেয়ে যেখানে থাক—পাতালে থাকলেও এনে বে দেবো।" দিগম্বর গমনোদ্যত হইলে রমেন পুনরায় উঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল, "এ পাত্রী না হ'লে কিন্তু কাকা আর বিবাহ করব না।"

পরদিবস অন্দরে আসিয়া রমেন মাসীমাতাকে বলিল, "মাসী তুমি না বল, আর খাট্তে পারছি না, সেইজন্যে তোমার দাসী আনব বলে ঠিক করেছি।" কথাটা কিন্তু মাসী বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিলেন না, ভাবিলেন, সর্ব্বনাশ রমেন বিবাহ করিবে না কি! বধূ আসিয়া যদি উঁহার অপ্রতিহত প্রতাপ কাড়িয়া লয়। কোথায় তিনি ভাবিতেছিলেন পথের অন্তরায়স্বরূপ ইলার বিবাহান্তে অধিকারটুকু কায়েমী করিয়া লইবেন, না এ আবার এক বিভ্রাট্। রমেনকে আবার এ কুমত দিল কে? সেই বড়-বৌটা নয় তো?"

"কি মাসী বুঝলে না?"

"না বাবা।"

"বিয়ে করবো।"

এ-কথা হইতেই ইলা সেখানে আসিয়া কথাটা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "সত্যি দাদা বিয়ে করবে তুমি?"

"হ্যাঁ রে সত্যি।"

"না দাদা আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"আচ্ছা কি করলে তোর বিশ্বাস হয় বল?"

"বৌ ঘরে আনলে।"

"বেশ তো যোগাড়-যাত্রা কর,—ঠিক পরশু বিকেলে বৌ এনে দেব তোকে।"

বিস্মিতা মাসী কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রশ্ন করিল,—"ও মা পরশু বিয়ে করবি কিরে, কার মেয়ে, কেমন মেয়ে, জানা-শোনা নেই অমনি বিয়ে করবি?"

ধমক দিয়া ইলা কহিল, "নাও নাও তোমায় আর দরদ দেখাতে হ'বে না, না জেনেই কি দাদা বিয়ে করছে?"

"এই দেখলি বাবা, মুখের সামনে কেমন ধমক দিলে, এ মেয়ে যার ঘরে যাবে তার ভদ্রস্ত নেই, বে থা করে আমায় বিদেয় করে দে, এত মুখনাড়া আর সইতে পারি না? কিসের জন্যে পড়ে আছি—বলি সংসারটা বয়ে যাবে তাই না এ অপমান সয়ে পড়ে আছি, আর পারি না, আমায় বিদেয় করে দে রমেন।"

একটু আদরের ধমক দিয়া রমেন বলিল, "আজ জ্বর আসে নি তো ইলা?"

"এসেছে দাদা।"

"তবে যে বাইরে এসেছিস্, যা ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক, ওর বিয়ে হ'লে সব পাগলামী সেরে যাবে মাসী।"

"অতবড় মেয়ে হ'ল বিয়ের জন্যে কিছু দেখছি না বাছা, চেষ্টাও করছ না।"

"কিন্তু আমি যে কিছু করতে পারি না মাসী, সে বৌদি করবে।"

মুখ বাঁকাইয়া মাসী বলিলেন, "কে জানে সেদিন বললুম তা গ্রাহ্যি করলে না। ছেলে পর্য্যন্ত ঠিক করেছিলুম—সে ছেলে মেয়ের পছন্দ হ'ল না, দেখি বড়-বৌ কেমন বর আনে।"

"কোন ছেলে।"

"এই বাবা আমার দেওরপো, মস্ত জমিদারের ছেলে।"

"লেখা পড়া কতদূর শিখেছে?"

"তিনখানা কেতাব পড়েছে, এমন ছেলে হাতছাড়া করলে পস্তাতে হ'বে।"

"কেমন ক'রে হয় মাসী, লেখাপড়া জানে না যে মোটে, এ ছাড়া বৌদির যখন মত নেই।"

"মেয়েমানুষের মতে কি এসে যায়, মেয়েমানুষের আবার একটা মত—আসল কথা তোমার নিজেরই মত নেই।"

"কিন্তু এ হ'বার উপায় নেই, বাবা-মা যে ইলাকে মৃত্যুর সময় বৌদির হাতে দিয়ে গেছেন।"

"কিন্তু সে যখন করে না তখন?"

"কি করে জানলে তিনি চেষ্টা করছেন না? হয় তো বুঝেছেন বিয়ের সময় এখন হয় নি।"

জ্বলিয়া উঠিয়া মাসী বলিলেন, "তোদের ঐ এক কথা বাপু, আঠার-উনিশ বছর বয়স হ'ল এখনও না কি বিয়ের বয়েস হয় নি। বড়বৌ মুখেই ওকে যা আদর দেখায়, জান না তো ও মিট্-মিটে ডান, মনে বিষের ছুরী।"

গৃহের মধ্যে থাকিয়াই রাগে গর-গর করিতে করিতে ইলা বলিল, "খবর্দ্দার মাসী, বৌদির নামে যা তা বল' না তুমি।"

"কি করবি তুই, বড় দরদ, তবে বিয়ে দিচ্ছে না কেন?"

"সে তার ইচ্ছে, আর আমি বিয়ে করবো না, কি করবে তুমি। দেখ দাদা বৌদিকে মাসী যদি এমন করে অভদ্রের মত কথা বলে ভাল হ'বে না কিন্তু।"

উচ্চস্বরে মাসীমাতা চেঁচাইয়া উঠিলেন, "বটেই তো, আমিই হ'য়েছি যত মন্দ, এত অপমান সয়ে থাকছি না আর এ বাড়ীতে।"

মধ্যস্থ হইয়া অতি কষ্টে উভয়কে কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা করিয়া রমেন বহির্ব্বাটীতে গমন করিল।

ষোল

গৃহে ফিরিয়া ভাল ভাল উকিল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া কোর্টের খরচ চালাইতে লেখার গহনা-বিক্রীবাবদ যথ

মাত্র শতখানেক মুদ্রা অবশিষ্ট রহিল, ডাক্তার তখন প্রমাদ গণিলেন—ভাবনায় চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। কোথায় কাহার নিকট টাকা চাহিবেন, আর চাহিলেই যে মিলিবে তাঁহারই বা নিশ্চয়তা কি? পত্নীর মৃত্যুর পর হইতে প্র্যাক্‌টিস্‌ও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এখন সংসার চলানই ´ট। অত দামী ঔষধপূর্ণ আলমারী গুলিও পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, দুর্ভাবনায় ডাক্তার অস্থির হইয়া উঠিলেন।

লেখা বলিল, "বাবা তুমি অত ভেব না, কি হ'য়ে যাচ্ছ দিন দিন। যেমন করে হোক চলে যাবে, দাদার খরচের টাকা তো আছে এখনও?"

পিতা হইয়া কেমন করিয়া বালিকাকে জানাইবেন যে অবশিষ্ট টাকা আর সামান্যই আছে। সুলেখা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "যে টাকা আছে তা'তে এখনও কতদিন চলতে পারে?

ডাক্তার এ-কথার কোন উত্তর দিলেন না, কারণ সত্য কথা বলিয়া উহাকে অধিকতর চিন্তান্বিত করিয়া তুলিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।"

"কথা কচ্ছ না যে, বল না বাবা?"

"সে হ'বে এখন, তুই কিছু ভাবিস্‌ না মা।"

লেখা যখন বুঝিল পিতা তাঁহাকে গোপন করিতেছেন, তখন সে আবার প্রশ্ন করিল, "আর কিছু হাতে নেই বুঝি বাবা!" ডাক্তারকে নীরব থাকিতে দেখিয়া উদ্বেগের সহিত সে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা আর কত আন্দাজ লাগতে পারে?"

"তিন চার হাজারও পারে।"

সুলেখা শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে পিতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "এর জন্যে ভেব না তুমি, ও টাকা যোগাড় হ'য়েই যাবে।"

কিন্তু এ হ'য়ে যাওয়া যে কিরূপ দুরূহ পিতা-পুত্রীর কাহারও অবিদিত ছিল না।

"শিগ্‌গীর কি টাকার দরকার হ'বে?"

"হ্যাঁ।"

লেখা কি বলিতে গিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান নব আগন্তুক-দ্বয়কে দেখিয়া থামিয়া গেল; বিরক্তিতে চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল, নিশ্চয় উহারা তাহাদের দৈন্যের কথা শুনিয়া ফেলিয়াছেন ভাবিয়া লেখা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বাবা দেখ ওঁরা কে এসেছেন!'

অপর দ্বার দিয়া লেখা বাহির হইবার সময় তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, "এইটী বুঝি আপনার মেয়ে। আপনার কাছে একটা বিশেষ কাজে আমরা এসেছি।"

লেখার আর যাওয়া হইল না। দ্বারের পশ্চাতে উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তারবাবু তাঁহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে দিগম্বর মিত্র ও তাহার সঙ্গী আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে দিগম্বরবাবু বলিলেন, "আপনার কন্যার একটী ভাল সম্বন্ধ এনেছি মশায়।"

ডাক্তার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের সম্বন্ধ!"

দিগম্বরের সঙ্গী বলিলেন, "বিয়ের সম্বন্ধ।"

"কার?" ডাক্তার যেন বুঝিতে পারিতে-ছিলেন না।

"আপনার মেয়ের।"

"আমার মেয়ের? এখন তার বিয়ে দেবার মত আমার মনের অবস্থা তো নয়? আপনারা কি এ বৃদ্ধের সঙ্গে পরিহাস করতে এসেছেন। আর বিয়ে তো এখন দেব না।"

"সে কি মশায়, বয়স্থা মেয়ের বিয়ে দেবেন না? অন্যত্রে ঠিক হ'য়ে গেছে বুঝি?"

"হাঁ—না" বলিয়া অবিচলিতকণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু বিয়ে এখন দেব না।"

ক্ষুব্ধকণ্ঠে দিগম্বর বলিলেন, "দিলে কিন্তু ভাল করতেন, এমন পাত্র হাজারে একটা মেলে না, এ ছাড়া বরপণও কিছু তিনি নেবেন না, শুধু মেয়েটী।"

"না বিয়ে দেব না।"

"তবুও দেখবেন বাড়ীর মধ্যে একবার পরামর্শ করে।"

দৃঢ় অথচ শান্তকণ্ঠে ডাক্তার বলিলেন, "মাপ করবেন মশায় এ হ'বার নয়।"

"কিন্তু এমন পাত্র, থাক্‌ আপনার যখন ইচ্ছেই নেই,

—তবে সুযোগ বড্ড হারালেন, আর মনের অবস্থার কথাটা শুনতে পেলে তারও প্রতীকার করবার চেষ্টা করতে পারি।"

কোনরূপ আগ্রহের ভাব না দেখাইয়া ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্র কতদূর পড়েছেন ও কি করেন?"

"পড়েছে কি মশায়, সিরাজগাঁয়ের জমিদার—তিনি আবার পড়বেন কি? তার জমিদারীর আয় যে বছরে তিন লাখের ওপর তবে ঘরে মাষ্টার রেখে রীতিমত লেখাপড়া করেছেন।"

"সিরাজগাঁয়ের জমিদার—শুনেছি তার স্বভাব-চরিত্র না কি ভাল নয়।"

"আঃ ওসব বাজে কথা, অমন হীরের টুকরো ছেলে দেখা যায় না, তা কি জানেন জমিদারের শত্রু অনেক, কেউ হয় তো এই রকম রটিয়ে থাকবে; তা' মশায় কার মুখ বন্ধ করবো বলুন? এখন আপনাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

ইঁহাদের আচরণে ডাক্তার বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; সেইজন্য বলিলেন, "কি হ'বে পরিচয়ে ওখানে যখন বিয়ে হ'তেই পারে না।"

এই সামান্য লোকটাকে বার বার খোসামোদ করিতে দিগম্বরের ইচ্ছাই হইতেছিল না। কোথায় এমন এক জমিদারকে জামাতৃরূপে পাইয়া আনন্দে বৃদ্ধ খুসী হইয়া উঠিবে, না আপত্তির ওপর আপত্তি, কিন্তু কি করিবেন, জেদী রমেন যখন জেদ ধরিয়াছে তখন যে কোনও উপায়ে হোক্ ইহাকে রাজী করিতেই হইবে। কি একটু ভাবিয়া দিগম্বর বলিলেন, "মাপ্ করবেন মশায়, অনিচ্ছায় দৈবযোগে আপনাদের পিতা ও কন্যার কথাগুলা খানিকটা শুনে ফেলেছি, কি অভাবের—বিপদের কথা না বলছিলেন। ৪।৫ হাজার যত চান এখুনি জমিদারমশায় দিতে পারেন—পরিবর্তে শুধু মেয়েটাকে তাঁর বধূরূপে আমাদের দিন।"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাক্তার বলিলেন, "টাকার লোভ দেখাবেন না। না, না পারব না আমি লেখাকে বলি দিতে—"

বিচক্ষণ দিগম্বর তাঁহার অন্তরের কথা যেন বুঝিতে পারিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "সে কি, বলির কথা কি বলছেন, আমাদের বধূ হ'বেন আপনার মেয়ে, আমরা কত না আদরেই রাখব। তারপর দেখুন কত বড় সাহায্য পাচ্ছেন; উপরন্তু জমিদারকে জামাতৃরূপে পাবেন।"

কি বলিতে গিয়া ডাক্তার চুপ করিয়া গেলেন।

দিগম্বর আসন ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা নমস্কার তা হ'লে আসি মশায়, বিকেলের দিকে একবার আসব—মনস্থির ক'রে উত্তর দেবেন—পরশু ভাল দিন আছে, যদি ইচ্ছা করেন ঐ দিন বিয়ে দেবেন, টাকাও পরশু পাবেন।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া উঁহারা প্রস্থান করিলেন। প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় ডাক্তার বসিয়া রহিলেন। নমস্কার বা ভদ্রোচিত দু'টা কথাও বলিতে পারিলেন না।

ঝড়ের বেগে গৃহে প্রবেশ করিয়া আকুলকণ্ঠে লেখা বলিল, "ফিরোও বাবা, ওঁদের ফিরোও, অমত করো না, তুমি কি বুঝছ না, টাকা পেলে দাদা খালাস হ'বে।"

বৃদ্ধের গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বাষ্পগদগদ-কণ্ঠে বলিলেন, "মা জেনে শুনে টাকার লোভে অতবড় পশুর হাতে তোমাকে তুলে দিতে পারব না।"

"কিন্তু দাদার কথা কি একবার ভাবছ না।"

"ভাবছি সবই লেখা, কিন্তু উপায় নেই।"

"যদি দোষ সাব্যস্ত হ'য়ে যায়, তাঁর কি শাস্তি হ'বে তা কি ভাবছ না?"

"ভেবেছি, হয় ফাঁসি নয় দ্বীপান্তর।"

"এ জেনেও আপত্তি করছ তুমি।"

অসহ্য বিস্ময়ে সুলেখার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ব্যথিতস্বরে ডাক্তার বলিলেন, "সব জেনেও আপত্তি করছি মা, তার সঙ্গে সঙ্গে বিনাদোষে আর একজনকে ফাঁসিতে তুলে দিতে বলিস তুই?"

"কিন্তু ফাঁসিতে তুলে দিচ্ছ না তুমি, জমিদারের গৃহিণী করে দিচ্ছ, অমত করো না বাবা।"

"এতে আমি মত দিতে পারি না, মিথ্যে অনুরোধ

করো না ; বিনাদোষে এমন ভীষণ শাস্তি কোনও বাপই তার মেয়েকে দিতে পারে না।"

"মেয়েকে পারে না, কিন্তু বিনাদোষে ছেলেকে পারে, এই তো বলতে চাও তুমি।"

"আমি তো তাকে শাস্তি দিচ্ছি না মা, আমি যে কত নিরুপায়, কত অসহায়, সে তো তুই বুঝবি না। নিষ্ঠুর আমি, বড় নিষ্ঠুর, তবু সবটা তুই জানিস না। শোন লেখা, আমি কত বড় হৃদয়হীন পাষণ্ড, যখন তারা টাকার লোভ দেখিয়ে চোখের সামনে জিতেনের মুক্তির চিত্র এঁকে দিয়েছিল, তখন লুব্ধ হ'য়ে উঠেছিলুম, তোকে পাষণ্ডের হাতে তুলে দিতে প্রাণের মাঝে কিসের প্রেরণা জেগে উঠেছিল, এমন পাষণ্ড অর্থলোলুপ পিতা সংসারে কি আছে মা ?"

পিতার পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া ঊর্দ্ধমুখে লেখা বলিল, "বাবা বাঁচালে আমায়, তোমায় নিষ্ঠুর ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলুম, ক্ষমা করো বাবা, কিন্তু অমত করো না, দাদাকে বাঁচাও।"

"কিন্তু, তুই তো জানিস্ না মা সে কত বড় চরিত্রহীন—লম্পট—আর— ।"

"জানি বাবা, শুনেছি সব, কিন্তু মিছেও তো হ'তে পারে, ওঁরা সেই কথাই বলছিলেন না ?"

"হ'তে পারে, কিন্তু সে মূর্খ, এ কথা তো মিথ্যে হ'তে পারে না লেখা। আর দেখতেও সে কুৎসিত।"

"আমি তাকে দেখেছি বাবা।"

"তুই তাকে দেখেছিস্ কোথায় ?

"কুন্তলা-দিদিদের পুকুরের কাছে তাঁদের বাড়ী, সে দিন জানলায় তাঁকে দেখেছি।"

পিতা কন্যাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "দেখে, সব জেনেও বিয়ে করতে চাচ্ছিস মা।"

"হাঁ বাবা।"

"না লেখা এ কবার—আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখব।"

"মিছে চেষ্টা, অনর্থক দেরী করো না, পরশু দিয়ে ফেল। টাকা হাতে এলে দাদার ব্যবস্থা হ'বে।"

"পরশু ? কি বলছ লেখা, ভাববারও সময় পাব না ?"

"না বাবা ভাববার সময় নেই, এতে আমাদেরই লাভ, টাকাটা যত শিগ্‌গীর হাতে আসে—ওঁদের কথায় অমত করো না। পরশু দিয়ে ফেল।"

"না আমি আরও একবার চেষ্টা করবো।"

"কে দেবে অত টাকা, বুঝ্‌ছ না কেন বাবা, এখন তুমি বুড়ো হয়েছ, দাদাকে ছাড় পাবারও ঠিক নেই, এ সময় কে টাকা ধার দেবে, কার এমন মহৎ প্রাণ আছে যে, আমাদের এ অবস্থায় নিঃস্বার্থভাবে টাকাটা এখনকার মত পাবার আশা না রেখে ধার দেবে—"

"পারে মা একজন দিতে পারে।"

আগ্রহভরে লেখা জিজ্ঞাসা করিল, "কে সে বাবা ?"

"শুনেছি নরেনের বাবা মারা গেছেন, উইলের সর্ত্তানুসারে অর্দ্ধেক তার—আর নগদ টাকাও সে অনেক পেয়েছে।"

হস্তদ্বারা পিতার মুখ চাপিয়া আহতকণ্ঠে সুলেখা বলিল, "চুপ কর বাবা, ওঁর কাছ থেকে সত্যিই যদি সাহায্য নেও, তা হ'লে কোনদিন তোমায় আর ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারব না। বাবা, বাবা, আমার একমাত্র আনন্দ, একমাত্র সম্বল কেড়ে নিও না তুমি।"

স্তব্ধ ডাক্তার পাষাণের ন্যায় অচলভাবে বসিয় রহিলেন।

কতক্ষণ পরে নিজেকে সংযত করিয়া লেখা উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবিচলিতকণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে যখন তাঁরা আসবেন মত দিয়ে পরশু দিন ঠিক করে ফেল।"

ভূতাবিষ্টের মত ভীত-চকিত ডাক্তার কিছুক্ষণ কন্যার মুখের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ তাই হ'বে মা।"

আনন্দগদগদকণ্ঠে গমনোন্মুখ লেখা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবা কিছু দুঃখ করো না, তুমিই তো নিজে আমার বিয়ে দিচ্ছ না। আমি স্বেচ্ছায়, খুসী হ'য়ে বিয়ে করছি—স্বয়ম্বরা হচ্ছি।"

"লেখা মা আমার, তোর মন যে এত উঁচু তা জানতুম না, আমার জন্য তুই চিরজীবনের মত এত বড় ত্যাগ স্বীকার করবি ? কিন্তু মেয়ের কর্ত্তব্য ছাড়া বাপেরও তো কর্ত্তব্য আছে মা।"

"আবার তুমি অমন করছো ? তা হ'লে তোমার

অবাধ্য হ'য়ে নতুন করে তোমায় আঘাত দিতে হ'বে, কিন্তু সে আঘাত দিতে প্রাণ যে আমার চাইছে না, তোমার অবাধ্য হ'তে বাধ্য ক'রো না বাবা।"

"আচ্ছা তাই হ'বে—জীবনের সার্থকতা কোথায়, আজ এত বড় আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে তুই দেখিয়ে দিলি, কিন্তু এ ত্যাগে সবারই সমান অধিকার এ কথাটা যেন ভুলে যাস্ না লেখা।"

"ভুল তুমি করছ বাবা, আত্মত্যাগের একমাত্র নারীই অধিকারিণী—এর ভেতর দিয়েই যে তাদের জীবন ধন্য হয়, পরিপূর্ণতার ও সার্থকতার আনন্দে ভরে ওঠে। এ যে তুমিই কতবার আমায় শিখিয়েছ, আজ তা ভুললে চল্‌বে কেন বাবা।"

পুলকিতকণ্ঠে মুগ্ধ ডাক্তার বলিলেন, "লেখা মা আমার, আশীর্ব্বাদ করি তোর অসহায় বাপের দেওয়া এ দুঃখ সইবার মত মনের বল যেন কোনদিন না হারাস্।"

ভক্তিভরে পিতার পদধূলি মস্তকে লইয়া লেখা বলিল, "তোমার কথা তো কোনদিন মিছে হয় নি বাবা।"

ক্রমশঃ

যোগমায়া কি ?

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
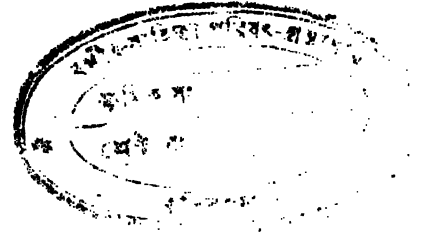
যোগমায়া ভগবানের শক্তি অর্থাৎ ভগবতী।

তিনি ভগবানের পরা-প্রকৃতি এবং ভগবানে যুক্ত। তিনিই মায়াশক্তিকে প্রকাশ করিয়াছেন।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ মহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টবিধ ভগবানের অপরা প্রকৃতি।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

গীতা ৭।৪

পুরুষোত্তমের দুই প্রকৃতি আছে, একটী পরা বা শ্রেষ্ঠ, আর একটী অপরা বা নিকৃষ্ট। চেতন প্রকৃতিই অপরা বা অচেতন প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ গীতা ৭।৫

প্রকৃতি ও পুরুষ বাক্য ও অর্থের ন্যায় নিত্যযুক্ত। যোগমায়া যখন ভগবানে বা পুরুষে যুক্ত, তখন তিনি বিশিষ্ট জ্ঞানরূপিণী বা ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনি অর্থাৎ যে বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় এবং যিনি ব্রহ্মবিৎ তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন। জীব চৈতন্যকে জানিতে পারিলে পরমাত্মাকে বিদিত হয়। ঈশ্বর যোগমায়ারূপ আবরণে আচ্ছাদিত বলিয়া লোকে তাঁহাকে জানিতে পারে না।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥

গীতা ৭।২৫

তাই ভক্তিহীন মূঢ়গণ তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেও তাহাকে দেখিতে পায় না। আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই যোগমায়াকে অর্থাৎ ভগবানের পরা-প্রকৃতিকে প্রসন্না না করিতে পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা ভগবানে যুক্ত হইতে পারি না। যোগমায়া কৃপা করিয়া স্থির বুদ্ধির দ্বার খুলিয়া দিলে, আমরা আমাদের হৃদয়স্থিত নারায়ণের সহিত যুক্ত হইবার অধিকার

করি। ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে বাস করেন এবং তিনি নিজের মায়ার বলে, প্রাণীদিগকে ঘুরাইতেছেন।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

গীতা ১৮।৬১

যেমন সূত্রধার, কাষ্ঠনির্ম্মিত পুতুলসকলকে যন্ত্রারূঢ় করিয়া ঘুরাইয়া দিলে তাহারা ঘুরিতে থাকে এবং সূত্র সংযত করিলে তাহাদের গতি রুদ্ধ হয়, সেইরূপ ভগবানের মায়া-সূত্রের প্রভাবে জীবসমূহ নানাভাবে নানাদিকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বশীভূত হইয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে।

বিশ্বপ্রকৃতি মায়ারই নামান্তর; ব্রহ্ম হইতে এই প্রকৃতির পৃথক সত্তা নাই। তাঁহার মহিমারূপ মায়াতেই জীব ও জগৎ বিকাশ পাইতেছে।

অনাদি জন্মের সংস্কারবশে, ব্রহ্মে জীবের জগৎ-বোধ হইয়া থাকে এবং স্ব চৈতন্যের স্বরূপোলব্ধি হয় না, ইহাই ভগবানের অনির্ব্বচনীয় মায়া। এই রহস্যে একমাত্র ব্রহ্ম-সত্তাই সত্য এবং তাঁহার আস্তত্বই ইহার কারণ। এই যোগমায়া সকলের অন্তরে আছেন এবং তিনিই সংসার-সাগর-তারিণী, নিত্যানন্দময়ী, নিত্যব্রহ্মস্বরূপিণী। ইনি যাহাকে অনুগ্রহ করিয়া বিদ্যা ও জ্ঞান দান করেন, তিনি সূক্ষ্মতম পরাৎপর শুদ্ধ ব্রহ্মময় রূপকে জানিবার অধিকার লাভ করেন।

অপরা প্রকৃতি অষ্টধা ভিন্ন, কিন্তু পরা প্রকৃতি এক।

'যোগমায়া ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ-কর্ত্রী দৈবীগুণময়ী মায়া। তিনি সগুণা, কিন্তু তাঁহার আরাধনা করিলে তিনিই জীবকে গুণাতীত করিয়া দেন এবং গুণাতীত হইলেই ঈশ্বরকে জানা যায়। নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার অতীত এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উপাসনা করিলেও উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। যিনি নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও নিস্তরঙ্গ তোমার জন্য তাঁহার স্বভাবের ভাবান্তর হয় না। ভ্রম-মোহই জ্ঞানের আবরণ। একান্তচিত্তে দৃঢ়ব্রত হইয়া তাঁহাকে ভজনা করিলে তিনি সেই আবরণ উন্মোচন করিয়া দেন। তীব্র ভক্তির বেগ সাধু হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে যোগমায়ার দুরপনেয় আবরণও বিদূরিত হইয়া যায়।

তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, জরা-মরণের মোক্ষের জন্য যাঁহারা যত্ন করেন, তাঁহারা পরম ব্রহ্মকে জানিতে পারেন এবং সমস্ত অধ্যাত্মবিদ্যা অবগত হন, যাহার দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারেন।

জীব ত্রিগুণময়ী মায়ায় মোহিত হইয়া, ভগবানকে জানিতে পারে না। ত্রিগুণ-বিমোহিত জীব যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই গুণত্রয়ের প্রকাশ হইয়াছে, সেই ভগবানকে লক্ষ্য করিতে পারে না। তিনি ত্রিগুণের অতীত এবং ত্রিগুণের অধিষ্ঠানভূত। তিনিই জীবের আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু জীব মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। ভগবানের ত্রিগুণময়ী মায়াতে জীব আবদ্ধ হইয়া আছে।

যিনি আপনার অভিমান অহঙ্কার দূরে ফেলিয়া, নিতান্ত নিরাশ্রয়ের ন্যায়, যোগমায়াকে অগতির গতি জানিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হন, তিনি দয়া করিয়া তাহাকে মায়ামুক্ত করিয়া দেন। যাঁহার অচ্ছেদ্য মায়াময় পাশে জীব আবদ্ধ, তিনি ভিন্ন এ মায়া-গ্রন্থি খুলিবার কৌশল আর কেহই জানে না।

শক্তির আরাধনা করিলে তবে শক্তিমানকে লাভ করা যায়।

কৃপা করিয়া যোগমায়া সর্ব্বাবরণ ভেদ করিয়া দিলে, আত্মায় ও পরমাত্মায় যোগ হয়—তখনই মায়া-বন্ধন মোচন হয়, তৎপূর্ব্বে নহে।

আপনাকে নিরাশ্রয় জানিয়া, যোগমায়ার একান্ত শরণাগত হওয়াই প্রকৃত পুরুষার্থ।

যাহারা পাপকর্ম্মা, মূঢ় ও নরাধম এবং যাহাদের জ্ঞান মায়া-কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, যাহারা দম্ভ-দর্পাদির দ্বারা আসুরভাব লাভ করিয়াছে, তাহারা যোগমায়ার ভজনা করে না।

এই যোগমায়া পুরুষোত্তমের অর্দ্ধাঙ্গিনী হ্লাদিনী শক্তি। তাঁহার কৃপা হইলে সকল গুণের নাশ হয় এবং জীব নিরভিমান ও নিরহঙ্কার হইয়া আত্মস্থ হইবার শক্তি লাভ করে।

অতএব সদ্‌গুরুর নিকট সুসমাহিত-চিত্তে শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়া, মন্ত্রার্থযুক্ত মন্ত্র জপ ও স্বধর্ম্ম পালন করিলে যোগমায়া প্রসন্না হইয়া ব্রহ্মদ্বার খুলিয়া দিলে, জীব মঙ্গলের পথে আরোহণ করিবার শক্তি লাভ করে, কারণ তখন তিনি কৃপা করিয়া মায়ার দ্বারা আর জীবকে মোহিত করেন না।

মুমুক্ষু ব্যক্তি নিয়ত যুক্ত চেষ্টার দ্বারা, এইরূপে বিধিযুক্ত কর্ম্ম করিয়া স্থির বুদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হয়। তখন তিনি সর্ব্বদা কামাদি ও হিংসা পরিত্যাগ করিবার শক্তি লাভ করেন। যে ব্যক্তি এইরূপ আচরণ করেন, তিনি সকল অজ্ঞানতা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন, যদ্দ্বারা আত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায় এবং আত্মাকে জানিতে পারিলে জীব মুক্তি লাভ করে।

ভগবতী-গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে, যে সকল ব্যক্তি ভগবতীকে ভক্তি করে না, তাহাদের মুক্তিলাভ বড়ই দুর্ল্লভ, সেই হেতু মুমুক্ষুগণ যত্নের সহিত তাঁহার প্রতি উৎকৃষ্ট ভক্তি করিবে।

বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর প্রাচীন কীর্ত্তি

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

অদ্য আমরা বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালীর প্রাচীন কীর্ত্তির পরিচয় দিব, যাহা অনেকেরই অজ্ঞাত।

মধ্যভারতে মান্ধাতা নামক স্থানে, যাহা ওঙ্কার-মান্ধাতা নামে পরিচিত, অমরেশ্বর-মন্দিরের ভিতরে মণ্ডপ গাত্রে অনেকগুলি খোদিত লিপি আছে, তন্মধ্যে একটী ৬৪ শ্লোকযুক্ত শিবের স্তোত্র আছে। ইহা দক্ষিণরাঢ়ী নবগ্রামবাসী হলায়ুধনামা এক ব্যক্তির কীর্ত্তি। ইহার তারিখ সংবৎ ১১২০। এই লিপিটী যখন বাঙ্গালীর কীর্ত্তি তখন ইহাকে শকসংবৎ বলিয়াই মনে হয়। যদি আমাদের অনুমান সত্য হয় তবে ইহা শক ১১২০=১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে খোদিত হইয়াছিল। এইসময়ে বাঙ্গালায় লক্ষ্মণসেন রাজত্ব করিতেছিলেন। আমরা লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক 'ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব' প্রণেতা এক হলায়ুধ ছিলেন জানি। ইহা ভিন্ন আমরা লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেন প্রদত্ত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত তাম্রশাসন হইতে আবল্লিক (আবন্তিক?) হলায়ুধের পরিচয় পাই। এই উভয় হলায়ুধ একব্যক্তি নহেন। ইঁহাদের পিতার নাম বিভিন্ন। আমরা যে উপরে মান্ধাতা-নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছি উহা ঐ সময়ে অবন্তিরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ঐ অবন্তির সহিত সংশ্লিষ্ট এই শেষোক্ত হলায়ুধ সম্ভবতঃ আবন্তিক নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির তাঞ্জোর জেলার অচ্যুতমঙ্গলম্ গ্রামস্থ সোমনাথেশ্বর-মন্দিরের দক্ষিণ প্রাচীর-গাত্রে একখানি খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, রাঢ়বাসী গোস্বামী মিশ্রের ভ্রাতা শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় শ্রীকণ্ঠশিব নামক একজন শৈবাচার্য্য কর্ত্তৃক এই মন্দির শক ১১০৪=১১৮২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ মন্দিরের উত্তর প্রাচীর গাত্রস্থ আর একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে, চোলরাজ ত্রিভুবন চক্রবর্ত্তী তৃতীয় রাজেন্দ্রদেব তাঁহার রাজত্বের ৫ম বর্ষ (১১৮২ খ্রীষ্টাব্দে) সোমনাথদেবের জন্য পুষ্করিণী ও পুষ্পোদ্যানের জন্য স্বামিদেবকে জমি দান করিয়াছিলেন। আর্পাক্কম লিপি হইতে জানা যায় এই স্বামিদেব রাজার গুরু ছিলেন।

কাশ্মীর-দেশীয় শ্রীকণ্ঠের কুটুম্ববংশীয় নারায়ণকণ্ঠের পুত্র রামকণ্ঠ 'মতঙ্গবৃত্তি' নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

ইঁহার শিষ্য শ্রীকণ্ঠ। শ্রীকণ্ঠ 'রত্নত্রয়-পরীক্ষা' লিখিয়াছেন। এই শ্রীকণ্ঠের সহিত উপরোক্ত শ্রীকণ্ঠের কোন সম্পর্ক থাকিলেও থাকিতে পারে। এই রত্নত্রয় পরীক্ষায় টীকাকার লিখিয়াছেন, তাঁহার গুরু গৌড়দেশ হইতে আসিয়াছিলেন; টীকাকার কিংবা তাঁহার গুরুর নাম নাই। সম্ভবতঃ এই টীকাকারের গুরু শ্রীকণ্ঠ।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গুণ্টুর জেলাস্থ গুণ্টুর তালুকের মল্‌কাপুরম্ গ্রামে একটী ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের সম্মুখে একটী স্তম্ভ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভগাত্র-খোদিত লিপি দক্ষিণ রাঢ়ের পূর্ব্বগ্রাম-নিবাসী বিশ্বেশ্বরশিব-নামক এক শৈবাচার্য্যের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই লিপির সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল :—

ভাগীরথী ও নর্ম্মদার মধ্যে দাহল-মণ্ডল অবস্থিত। ঐ দেশে দুর্ব্বাসা একটী শৈব-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্ব্বাসা শিষ্যপরম্পরাভুক্ত সদ্ভাবশম্ভু কলচুরিরাজ যুবরাজদের নিকট ত্রিলক্ষী-প্রদেশ (ইহাতে তিন লক্ষ গ্রাম ছিল) ভিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি গোলকি-মঠ নামে একটী মঠস্থাপন করেন এবং ঐ ত্রিলক্ষী-প্রদেশ মঠের আচার্য্য-দিগের বৃত্তিস্বরূপ দান করেন। এই সম্প্রদায়ে সোমশম্ভুর আবির্ভাব হয়। ইনি 'সোমশম্ভু-পদ্ধতি' নামে পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহার পরে বামসম্ভু আবির্ভাব। কলচুরিরাজ ইঁহার অত্যন্ত সম্মান করিতেন। আজ পর্য্যন্ত ঐ রাজগণ ইঁহার চরণারাধনা করিয়া থাকেন। (বাস্তবিক পক্ষে কলচুরিরাজ কর্ণদেবের বারাণসী তাম্রশাসনে (১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত আছে, 'পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীবামদেবপাদানুধ্যাত')। তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যের সংখ্যা সহস্রাধিক ছিল, ইঁহার কটাক্ষপাত দ্বারা রাজরাজড়াদিগকে নিগ্রহ কি অনুগ্রহ করিতে সমর্থ ছিলেন। যথাসময়ে শক্তিশম্ভুর আবির্ভাব হয়। তাঁহার শিষ্য কীর্ত্তিশম্ভু। ইহার পর কেরল-দেশীয় বিমল শিব আবির্ভূত হন। ইঁহার শিষ্য ধর্ম্মশম্ভু। ধর্ম্মশম্ভুর শিষ্য বিশ্বেশ্বর শম্ভু বা বিশ্বেশ্বরশিব, ইনি কাকটীয়রাজ গণপতির দীক্ষাগুরু ছিলেন। এই বেদবেদাঙ্গবিশারদ বিশ্বেশ্বর চোল, মালব ও কলচুরী রাজগণেরও গুরু ছিলেন। তাঁহার নিবাস ছিল গৌড়দেশের অন্তর্গত রাঢ় প্রদেশের পূর্ব্বগ্রামে। গণপতি দীক্ষার পর আপনাকে তাঁহার গুরুর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন। গণপতির উপর যে বিশ্বেশ্বর শিবের অত্যন্ত প্রতিপত্তি ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। গুরুর অনুরোধে গণপতি গৌড়দেশাগত বহু ব্যক্তিকে এবং বহু কবিকে পুরস্কৃত করিয়াছেন। বহু রাজা বিশ্বেশ্বরের কৃপায় পাপমুক্ত হইয়াছিল। কর্ণে মুক্তাকুণ্ডল, গলে হার, শিরে জটাজাল-সমন্বিত উজ্জ্বলমূর্ত্তি বিশ্বেশ্বর যখন গণপতির বিশ্রামমণ্ডপে অধিষ্ঠান করিতেন তখনকার দৃশ্য দেখিবার মত ছিল।

গণপতির কন্যা রাজ্ঞী রুদ্রদেবী ১১৮৩ শকে (১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে) পিতার নির্দ্দেশানুসারে কৃষ্ণবেণী নদীর দক্ষিণতটে বেলনাণ্ডু-বিষয়ে কন্দ্রবাটিস্থ নদীমধ্যস্থ লঙ্কাভূমি-সমেত মন্দর (মন্দদম) নামক গ্রাম দান করেন এবং এই সঙ্গে তিনি নিজেও বেলঙ্গপুণ্ডি নামক গ্রাম দান করেন। (গণপতির মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা রুদ্রদেবী, রুদ্রদেব মহারাজ এই পুরুষোচিত নাম গ্রহণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন)। বিশ্বেশ্বর এই মন্দর গ্রামে বিশ্বেশ্বরের মন্দির, মঠ, অন্নসত্র নির্ম্মাণ করাইয়া বহু ব্রাহ্মণ স্থাপন করেন এবং এই গ্রামের নাম বিশ্বেশ্বর গোলকি রাখেন। মন্দর এবং বেলঙ্গপুণ্ডি গ্রামদ্বয়ে তিনি ৬০টী দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ-পরিবারের প্রত্যেককে দান বিক্রয়ের অধিকারযুক্ত ২ পুট্টি জমি দান করেন। অবশিষ্ট জমি তিন ভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ শিবমন্দিরের জন্য, আর এক ভাগ শুদ্ধ শৈবমঠে ছাত্রগণের ভরণপোষণের জন্য এবং তৃতীয় ভাগ প্রসূতিশালা, আরোগ্য-শালা এবং ব্রাহ্মণভোজনের ব্যয়ের জন্য দান করেন। তিনি ঋক্, যজু ও সামবেদ অধ্যাপনার জন্য তিনজন অধ্যাপক, পদ, বাক্য, প্রমাণ, সাহিত্য ও আগমব্যাখ্যার জন্য পাঁচজন ব্যাখ্যাকার, একজন বিচক্ষণ কায়স্থ এবং একজন বিচক্ষণ বৈদ্য নিযুক্ত করেন এবং দশজনের প্রত্যেককে ২ পুট্টি জমি দান করেন। মন্দিরের জন্য দশজন নর্ত্তকী, দুইজন বংশীবাদক সমেত ৮জন মাদল বাদকের প্রত্যেককে ১ পুট্টি জমি দান করেন। ইহা ভিন্ন একজন কাশ্মীরদেশীয় গায়ক, ১৪ জন গায়িকা, ৬ জন নর্ত্তকী এবং ৬ জন কাড়াবাদক, ২ জন ব্রাহ্মণ পাচক ও ৪ জন পরিচারক এবং এই প্রকার ৬ জন ব্রাহ্মণ মঠ ও অন্নসত্রের জন্য নিযুক্ত

করেন। গ্রামরক্ষার জন্য জটাযুক্ত ১০ জন চোল-দেশীয় বীরভদ্র এবং ২০ জন শিবভক্ত বীরমুষ্টি নিযুক্ত করেন। এই বীরমুষ্টিগণ স্বর্ণ, তাম্র, বাঁশ, প্রস্তর, কুম্ভকার, রাজমিস্ত্রী, কারুকার ও নাপিতের কার্য্য করিত। মোট ৭৭ জন চাকরের প্রত্যেককে এক পুট্টি করিয়া জমি দান করিয়াছিলেন। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যানের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ নিবর্ত্তন জমি দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন গৌড়দেশীয় দক্ষিণ-রাঢ়স্থ পূর্ব্বগ্রামবাসী শ্রীবৎস-গোত্রীয় সামবেদী ৩০ জন ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে ১ পুট্টি করিয়া জমি দিয়া তাহাদিগকে গ্রামের আয়ব্যয় পর্য্যবেক্ষণ ও হিসাব-রক্ষার কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। মোট নানা কর্ম্মের জন্য ১৫০ পুট্টি চিরকালের জন্য জমি দান করেন। সন্তানহীনা কুলাচারবিশিষ্টা স্ত্রীলোকগণও যদি লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করাইত তাহা হইলে তাহারা জমি ভোগ করিতে পারিত। গ্রামের অবশিষ্ট জমি দেবতার ভোগের জন্য কালামুখ শৈব-পরিব্রাজক ও পাশুপতব্রতাচারী বিদ্যার্থিগণের অন্নবস্ত্রের জন্য রক্ষিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডাল পর্য্যন্ত যে কোন সমাগত অন্নপ্রার্থীর জন্য অন্নসত্রের দ্বার অবারিত ছিল। এই দাতব্যশালা মঠ,দেবালয় ও গ্রামের জন্য একজন শৈবাচার্য্য অধিকারী নিযুক্ত হইতেন। তিনি ১০০ নিষ্ক পাইতেন। যদি তিনি তাহার কার্য্যে অবহেলা বা অন্য কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করেন, তবে মঠের সন্তানগণ তাঁহার স্থলে অন্য আর একজনকে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। শত শত ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে ধীমান্ রাজগুরু দেশিকেন্দ্র বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্য এই নিয়ম করেন যে, গোলকিবংশের সন্তানগণের মধ্যে যিনি কৃতাভিষেক, শান্ত, শুচি, শৈব-রহস্যবেদী, শৈবাগমসমূহের পারগামী, শৈবসন্তানপালক, যাঁহার স্বর্ণ ও লোষ্ট্রে সমজ্ঞান, যিনি সর্ব্বভূতে অনুকম্পমান, সমস্ত বিদ্যাপারগ, সুকৃতী, শীলবান্ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রধান, তিনিই এই অধিকারীর কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

ইহা ভিন্ন বিশ্বেশ্বর আরও বহু কীর্ত্তি স্থাপন করেন। তিনি কালীশ্বরে উপলমঠ স্থাপন করিয়া নিজ-প্রতিষ্ঠিত পোন্নগ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। (সম্ভবতঃ বেলারী জেলার সুপরিচিত কলমঠই এই উপলমঠ)। মন্দ্রকূটে নিজ নামে একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার ও অন্নসত্রের ব্যয়ের জন্য মানেপল্লী এবং উট্টুপল্লী গ্রামদ্বয় দান করেন। চন্দ্রবল্লী নগরে নিজ নামে আর একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইঁহার পূজার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কন্দপল্লী পুকুরের বান্ধ বিস্তৃত করিয়া দিয়া তাহার অর্দ্ধেক দান করেন।

আনন্দপদে বিশ্বেশ্বরনগর নামে একটী নগর স্থাপন করিয়া তথায় একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আনন্দপুর এবং মুনিকুটপুর গ্রামদ্বয় দান করেন। কোম্মুগ্রামে নিজ-নামে আর একটী লিঙ্গ স্থাপন করিয়া ইঁহার ভোগের জন্য ৩০ খারি উচ্চ জমি এবং ৩০ খারি নিম্ন জমি প্রদান করেন। শ্রীশৈলের উত্তরপূর্ব্বে এলীশ্বরপুরে তিনি একটী মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শিষ্য গণপতি তথাকার অন্নসত্রের জন্য অভারি গ্রাম এবং পল্লিনাড়ু বিষয়ে কণ্ডুকোট গ্রাম দান করেন। নিবৃত্তি নামক স্থানে একটী লিঙ্গ স্থাপন করিয়া দুগ্গাল নামক অরণ্যের একাংশে বেল্লালের অন্তর্গত পূনুরু গ্রাম দান করেন। উত্তর সোম-শীলা নামক স্থানে বিশ্বেশ্বরের নামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐতপ্রোলু নামক গ্রাম দান করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ উত্তর-ভারত এবং দক্ষিণ-ভারতের রাজগণের গুরুত্বে বরিত হইয়াছিলেন এবং জনসাধারণের জন্য প্রসূতিশালা, আরোগ্যশালা এবং বহু অন্নসত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা কম শ্লাঘার কথা নহে। সবচেয়ে প্রশংসনীয় তাঁহার আচণ্ডালে অন্নবিতরণ। যে দাক্ষিণাত্য এই বিংশ শতাব্দীতেও নিকৃষ্ট জাতির প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, সেই দাক্ষিণাত্যে ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যে উদারতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার উপযুক্ত। সত্য বটে শৈবধর্ম্মগ্রন্থে এইরূপ উদারতার কথা লিখিত আছে, যথা— "পাষাণঃ সংস্কারাৎ ভুক্তিমুক্তিপ্রদো ভবেৎ।

পাষাণঃ শিবতাং যাতি শূদ্রস্তু ন কথং ভবেৎ॥"

অর্থাৎ শৈবশাস্ত্রানুসারে সংস্কৃত হইয়া যদি পাষাণ শিবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ভক্তিমুক্তি প্রদান করিতে পারে, তবে শূদ্র কেন শিবত্ব প্রাপ্ত হইবে না?

আবার দেবীপুরাণের ৫১ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে,

দেবীগণের পূজায় কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র তত্ত্বজ্ঞ হইলেই তাহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ উদারমত শাস্ত্রেই বদ্ধ রহিয়াছে কার্য্যতঃ এই বিধি কতদূর প্রতিপালিত হয় তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।

এই শৈব-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা দুর্ব্বাসা কোন সময়ে এবং কোথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার কোনো সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে এই সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই দুর্ব্বাসা যে পুরাণাদিতে উল্লিখিত দুর্ব্বাসা নহেন তাহা বলাই বাহুল্য। যদিও ইহাকেও কোন কোন শৈবগ্রন্থে দুর্ব্বাসা মুনি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বহু তন্ত্রে এই দুর্ব্বাসার উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্রিলোচন শিবাচার্য্য-বিরচিত প্রায়শ্চিত্ত-সমুচ্চয় নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে আমর্দ্দক-মঠস্থিত গুরু দুর্ব্বাসার বন্দনা করা হইয়াছে, যথা :—

শ্রীআমর্দ্দকস্থান গুরু বংশসমুদ্ভবং।
দুর্ব্বাসসং ঋষিং বন্দে তন্মুখাংশ্চ গুরূনমু॥"

উত্তর-ভারতের কয়েকখানি প্রাচীন লিপিতে আমর্দকের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই আমর্দক কোথায়? মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তিনিভেলী জেলায় তেনকশীস্থ একটী মন্দিরের ভাণ্ডারগৃহের প্রাচীরগাত্রে খোদিত একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে, মহারাজ জটিলবর্ম্মণ ত্রিভুবন চক্রবর্ত্তিন্-কুলোত্তুঙ্গ পাণ্ড্য ১৩৮৮ শকে তাহার পরমাচার্য্য মহাগণপতি-নয়িনার বামদেবকে কতক জমি প্রদান করিয়াছিলেন। এই মহাগণপতি উত্তর-ভারতের গৌড়-রাষ্ট্রের গঙ্গার উত্তর তীরস্থ বারেন্দ্রগ্রামের আমর্দাশ্রমা-চার্য্যের শিষ্যবংশীয় ছিলেন। ইহা দ্বারা মনে হয় যে, আমর্দাশ্রম বারেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। যদি আমাদের অনুমান ঠিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় দুর্ব্বাসা-প্রতিষ্ঠিত শৈব-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বারেন্দ্রদেশে। অঘোর-শিবাচার্য্য-বিরচিত ক্রিয়াক্রমদ্যোতিকার টীকা 'লঘুপ্রভা'য় লিখিত আছে যে, দুর্ব্বাসাই জগতে তন্ত্র প্রচার করেন। এ কথার কোন সত্য থাকিলে বলিতে হয়, সমস্ত না হউক অন্ততঃ কোন কোন তন্ত্রের উৎপত্তি স্থান বাঙ্গলা-দেশ। দাক্ষিণাত্যের বহু লিপি হইতে জানা যায়, দুর্ব্বাসা-প্রতিষ্ঠিত শৈব-সম্প্রদায়ের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে মঠস্থাপন ও শৈবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে শৈবধর্ম্মের যেরূপ প্রচলন এরূপ ভারতের অন্য কোথায়ও দেখা যায় না। ইহার মূলে যে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শৈবাচার্য্যগণ বহু শৈবধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন, যথা দুর্ব্বাসা-প্রণীত কতিপয় স্তোত্র; শ্রীকণ্ঠ বিরচিত রত্নত্রয়পরীক্ষা; অঘোর শিবাচার্য্যকৃত মৃগেন্দ্রবৃত্তি-দীপিকা, ক্রিয়াক্রমদ্যোতিকা; ত্রিলোচন শিবাচার্য্যকৃত প্রায়শ্চিত্ত সমুচ্চয়, সিদ্ধান্তরত্নাবলী; ঈশানশিবাচার্য্য-প্রণীত ক্রিয়াক্রমদ্যোতিকা, ঈশানশিবগুরুদেব পদ্ধতি, সিদ্ধান্তসার। বেদজ্ঞানমুনি-বিরচিত আত্মার্থ-পদ্ধতি দীক্ষাদর্শ; জ্ঞান-শিবকৃত জ্ঞানরত্নাবলী, জ্ঞানশঙ্কর-প্রণীত বালরত্নাবলী; সোমশিবকৃত কর্ম্মকাণ্ডক্রম; উত্তুঙ্গশিবকৃত পদ্ধতি, ব্রহ্মশিবকৃত পদ্ধতি, হৃদয়দেশিককৃত সিদ্ধান্তদীপ, বরুণশিব-কৃত বরুণপদ্ধতি, প্রাসাদশিবকৃত ক্রিয়াকরণ, নটেশদেশিক-কৃত ক্রিয়াকরণ, রামনাথকৃত পদ্ধতি; নিগমজ্ঞানদেশিক-কৃত শিবজ্ঞানবোধসূত্রের টীকা; রজতসভেশকৃত ঐ সূত্রের টীকা; পঞ্চাক্ষর গুরু-প্রণীত স্নপনসারাবলী; মৃত্যুঞ্জয়নাথ-কৃত উহার টীকা; উমাপতি শিবাচার্য্যকৃত পৌষ্করতন্ত্রের টীকা। ইহা ভিন্ন আরও বহু শৈব-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে আরও বহু শৈবাচার্য্যগণের নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই সম্প্রদায়ের বলিয়া মনে হয়।

ত্রিলোচন শিবাচার্য্য ও ঈশান শিবাচার্য্য আমর্দক-মঠবাসী ছিলেন। বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্যের কাশীশ্বরশিবাচার্য্য নামে শ্রীবৎস-গোত্রীয় একজন শিষ্য ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম বিদ্যাশিব এবং মাতার নাম সোমসানি-আম্মা। ইঁহার শ্রীবৎস গোত্র দেখিয়া মনে হয় ইনিও দক্ষিণ-রাঢ় হইতে আগত শ্রীবৎসগোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণের বংশধর। বিশ্বেশ্বর শিবের শিষ্যের শিষ্য একজন ঈশানশিব নামক আচার্য্যের নাম পাওয়া যায়। উপরোক্ত ঈশানশিবই সম্ভবতঃ বিশ্বেশ্বরের প্রশিষ্য। একখানি লিপিতে পাওয়া যায় যে, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মহাদেব চট্টোপাধ্যায় (?) নামক এক ব্যক্তি ১২০৪ শকে বিশ্বেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত মন্দরপুরস্থ পশুপতির মন্দিরে প্রদীপের জন্য ৫০টী মেষ দান করিয়াছেন। যদি
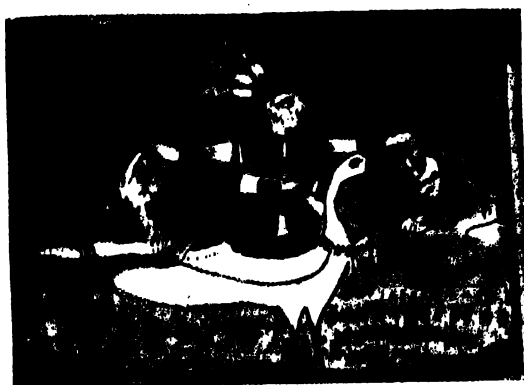
ময়ূরবাহনা সরস্বতী — [illegible]

ইলোরা

ময়ূরবাহনা সরস্বতী

শ্রীযুক্ত পুরাণচাঁদ নাহার মহাশয়ের চিত্রশালায় রক্ষিত

যবদ্বীপে সপ্ততন্ত্রী-বীণাবাদিনী সরস্বতী

জাপানে সরস্বতী "বেন তেন"

'চট্টোপাধ্যায়' পাঠ ঠিক হইয়া থাকে তবে এই মহাদেবকে বাঙ্গালী বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু চট্টোপাধ্যায়ের গোত্র ভরদ্বাজ নহে, শাণ্ডিল্য; আর রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের উপাধ্যায়-সংযুক্ত পদবীও অত প্রাচীন নহে। সম্ভবতঃ 'ভট্টোপাধ্যায়' স্থলে ভুলক্রমে 'চট্টোপাধ্যায়' পাঠ ধৃত হইয়াছে।

ত্রিলোচন শিবাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, রাজেন্দ্র চোল এদেশ হইতে শৈবাচার্য্যগণকে দাক্ষিণাত্যে স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার পিতা রাজরাজের সময়ে সর্ব্বশিবের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার প্রথম কুলোত্তুঙ্গ চোলের সময়ে গৌড়ের রাঢ়দেশীয় উমাপতি নামক একজন শৈব গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা মনে হয় দশম শতাব্দী হইতে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ দাক্ষিণাত্যে শৈবাগম প্রচার করিতে গমন করিয়াছিলেন।

শৈবধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে পাশুপত-সম্প্রদায়ই সর্ব্বপ্রাচীন। ইহার শাখা নকুলীশ-সম্প্রদায়ও কম প্রাচীন নহে। খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে গুজরাটের কায়াবরোহণবাসী নকুলীশ বা নকুলীশ-কর্তৃক প্রবর্ত্তিত। বায়ুপুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। দুর্ব্বাসা-প্রবর্ত্তিত শৈব-সম্প্রদায় ও পাশুপত-সম্প্রদায়ের শাখা বলিয়া মনে হয়। নকুলীশকে শিবের অবতার বলিয়া মনে করা হয়। এই নকুলীশ হইতেই শিবের এক নাম নকুলীশ্বর বা নকুলেশ্বর হইয়াছে। নকুলীশ-পাশুপত ও শৈব-সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ আছে। মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে নকুলীশ-পাশুপত দর্শন ও শৈবদর্শন পৃথকভাবেই লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহাদের পৃথক কোন সত্ত্বা না থাকিলেও ইহারা শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসী মত নামমাত্র মানিয়া থাকে। পাশুপত-গণ নিজেদের মতের জন্য সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল। যে সকল রাজা ইহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত, ইঁহারা তাহাদের হইয়া যুদ্ধ করিত। সম্ভবতঃ এইজন্যই বহুরাজা ইঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত। তাঁহারা তাঁহাদের তাম্রশাসনাদিতে 'পরম মাহেশ্বর' বলিয়াই ক্ষান্ত ছিল না; অনেকে আবার পিতৃপাদানুধ্যাত না লিখিয়া গুরুর পাদানুধ্যাত লিখিত। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইহারা গুরুর সন্তান বলিয়া পরিচয় দিত। শিব এবং শৈব-সন্ন্যাসীগণকে বপ্প বা বাবা বলা হয়। মহান্তদিগকে মহারাজ বলা হয়। বলভীরাজবংশীয় ৪র্থ শিলাদিত্য 'বাবপাদানুধ্যাত' এবং তাঁহার পরবর্ত্তী শিলাদিত্যগণ 'বপ্পপাদানুধ্যাত' বলিয়া নিজদের পরিচয় দিয়াছেন। কলচুরীরাজ কর্ণ ও তাঁহার পরবর্ত্তিগণও 'পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীবামদেব পাদানুধ্যাত' বলিয়া নিজদিগের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় রাজাদিগের উপর ইহাদের কিরূপ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। পরবর্ত্তীকালে এই যোদ্ধা সন্ন্যাসীগণ ডাকাতে পরিণত হইয়াছিল। যাঁহারা মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে এবং ব্রিটিশ-রাজত্বের প্রথম ভাগে এই সন্ন্যাসী ডাকাতগণ বাঙ্গালার প্রজাগণের উপর কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত ইতিহাস জানিতে চান তাঁহারা রায় যামিনীমোহন ঘোষ বাহাদুর-কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত "সন্ন্যাসী এণ্ড ফকির রেডারস্ ইন্ বেঙ্গল" নামক ইংরেজী পুস্তক দেখিতে পারেন। ইহা নানা সরকারী রিপোর্ট হইতে সংকলিত হইয়া সেক্রেটারীয়েট বুক-ডিপো-হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠে এই সন্ন্যাসীদিগের কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

ইরাণীয়গণের উপনয়ন ও বিবাহ-প্রথা

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

পারসীগণ ভারতে আসার পর হইতে এদেশের তিনটী জিনিস মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন—ভাষা, পরিচ্ছদ ও বিবাহ-পদ্ধতির কিয়দংশ। অবশ্য ইহা ছাড়া আরও এমন অনেক ছোট ছোট আচার, রীতি ও নীতি ধীরে ধীরে পারসীদিগের সামাজিক-জীবনে স্থান পাইয়াছে, যাহা মোটেই সুপ্রাচীন নহে। বহু শতাব্দী ভারতবাসের ফলে ঐগুলি আজ তাঁহাদের মজ্জাগতপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কালবশে সুপ্রাচীন সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ায় পারসীগণ যখন প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলির নিগূঢ় মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া কেবল বাহ্যাড়ম্বরের ভক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, তখনই তাঁহাদের উপর গুজরাটপ্রদেশবাসী হিন্দুগণের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। এইরূপে তাঁহারা ধীরে ধীরে গুজরাটী বনিয়া উঠেন।

তথাপি আধুনিক পারসীসমাজ তাহার প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতিগুলি মোটেই ভুলে নাই। ভারতে পারসীদিগের সংখ্যা কয়েক লক্ষের অধিক না হইলেও তাঁহারা এইজন্যই এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতে পারিয়াছেন। একাদশ শতাব্দীরও অধিক কাল এদেশে বাস করার ফলে তাঁহারা পুরাদস্তুর এদেশীয় বনিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু জীবনের তিনটী বিশেষ সন্ধিক্ষণে—দীক্ষা, বিবাহ ও মৃত্যুকালে—তাঁহারা আজিও তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলেন। আর এজন্যই তাঁহাদিগকে "ভারতীয়" বলিতে আজিও আমাদের একটু কুণ্ঠা বোধ হইয়া থাকে।

ইরাণীয় উপনয়ন সংস্কারের নাম ("নবজোৎ") বিধি। ইহার দ্বারাই ইরাণীয় বালক-বালিকাগণ স্বধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই দীক্ষার চিহ্ন দুইটী—কঞ্চুক (সুদ্‌রেহ) ও মেখলা (কুস্‌তি)। এই উপনয়নবিধি অতি প্রাচীন সংস্কার। আচার্য্য জরথুশ্‌ত্রের জন্মের পূর্ব্বেও এ-প্রথা প্রচলিত ছিল। বোধহয় ইহা সকল আর্য্যজাতিরই সনাতন সংস্কার। বর্ত্তমানে শুধু হিন্দু ও ইরাণীগণের মধ্যেই ইহা প্রচলিত আছে। এই উভয় জাতির মধ্যেও উপনয়নবিধির পার্থক্য বড় অল্প নহে। পারসী-সমাজে কি বালক, কি বালিকা —উভয়েরই কঞ্চুক ও মেখলা দ্বারা ('নবজোৎ') সংস্কার হইয়া থাকে; কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে কেবল বালকগণই * উপনয়ন সংস্কারে অধিকারী। পারসীগণ বলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে এ পদ্ধতি প্রায় অপরিবর্ত্তিতভাবেই চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু হিন্দুগণের মধ্যে এ-প্রথাটীর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কঞ্চুকটীর অপভ্রংশ দাঁড়াইয়াছে 'উপবীত'; আর মেখলা + তো অধুনা একেবারেই লোপ পাইয়াছে। এই কঞ্চুক ও মেখলা ছাড়া প্রত্যেক দীক্ষিত ইরাণীয়কে একটী মস্তকাবরণ ব্যবহার করিতে হইত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও কোন পারসী ভদ্রলোক কোন সময়েই অনাবৃত মস্তকে থাকিতেন না। আজকাল যদিও পারসী পুরুষগণ প্রায়ই বিলাতী পোষাক ব্যবহার করেন ও শিরোদেশে কোন আবরণ ব্যাবহার করেন না, তথাপি উপাসনাকালে, মন্দিরাভ্যন্তরে অথবা কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান-সময়ে তাঁহাদের পক্ষে ভেল্‌ভেট বা সিল্কের ক্ষুদ্র টুপি ('স্কাল-ক্যাপ') পরিধান করিবার বিশেষ বিধান আছে। প্রাচীনা মহিলাগণ

---

* মনু (২।৬৭) বলিয়াছেন যে, বিবাহবিধিই স্ত্রীলোকের উপনয়ন সংস্কারের সামিল। কিন্তু শুনা যায় যে, পুরাকালে স্ত্রীগণেরও 'মৌঞ্জীবন্ধন' সম্পাদিত হইত। মৌঞ্জী—মুঞ্জাতৃণ-নির্ম্মিত মেখলা—উপবীত ব্রাহ্মণের ব্যবহার্য্য। অতএব, মৌঞ্জীবন্ধন উপনয়নেরই অঙ্গ বলিতে হইবে।

\+ মনুর যুগেও মেখলা পরিধানের রীতি ছিল। ব্রাহ্মণের মেখলা মুঞ্জাতৃণ-নির্ম্মিত ও ত্রিবৃৎ করা হইত। ক্ষত্রিয়ের ছিল মূর্ব্বাতৃণময়ী মেখলা; উহাতে আবার ধনুকের জ্যার কার্য্যও চলিত। বৈশ্য ধারণ করিতেন শণতন্তুময়ী মেখলা। ইহাদের অভাবে যথাক্রমে কুশ, অশ্মন্তক, বল্বজ প্রভৃতি তৃণময়ী মেখলা ব্যবহৃত হইত।

সর্ব্বদা সাদা সুতার কাপড়ের রুমাল দিয়া তাঁহাদের চুল বাঁধিয়া রাখেন। নবীনাগণ এ প্রথা আজকাল পরিত্যাগ করিলেও উপাসনার সময় রুমাল অথবা সিল্কের সাড়ীর আঁচল দিয়া নিজ নিজ শিরোদেশ আবৃত করিয়া থাকেন ‡। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হিন্দুদিগের 'শিখা'ধারণ প্রথা অনেকটা ইহার অনুরূপ। শিখাগুচ্ছ মস্তকাবরণের অপভ্রংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

'নব্‌জোৎ' শব্দের অর্থ—নূতন জন্ম। ইহাই প্রত্যেক ইরাণীয় কুমার-কুমারীর দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া পরিগণিত হয়।* শাস্ত্রানুসারে ইহা সাত হইতে পনর বৎসর বয়সের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কার্য্যতঃ প্রায়ই উহা কৈশোরাবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়া থাকে।† দীক্ষার পর প্রত্যেক ইরাণীয়কে সর্ব্বদা (স্নানের সময় ব্যতীত) ঐ কঞ্চুক ও মেখলা ব্যবহার করিতে হয়। এমন কি মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সময়েও ইহাই শবের পরিধানে থাকে।

কঞ্চুক পদার্থটী অনেকটা সার্টের মত। সাদা সুতার † কাপড়ের একটী ঢিলা পোষাক। শ্বেত বর্ণ (=পবিত্রতা)—জরথুশ্‌ত্র-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের মূল উৎস 'অষে'র প্রতীক মাত্র। ইরাণীয় ভাষায় এই কঞ্চুকের নাম—'সুদ্‌রেহ্‌' (সৎপথ)। প্রায়ই ইহার হাতা ছোট হয়; এবং ইহার ঝুল প্রায় হাটু পর্য্যন্ত নামিয়া থাকে। ইহার 'কলার' থাকে না। গলা প্রায় বুকের উপর পর্য্যন্ত কাটা থাকে। আর ঠিক বুকের উপর (মাঝখানে) একটী ছোট থলি সেলাই করা থাকে। ইহার নাম 'গিরেহ্‌-বান্‌'। সমস্ত পোষাকটীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়; কারণ, ইহাই সুচিন্তা, সুনৃতা বাক্‌ ও সৎকার্য্যের বাহ্য আধাররূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে।

'কুসতি' বা মেখলা পরিধানেরও একটী নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে। ইহাতে বুঝায় যে, যিনি উহা পরিধান করেন তিনি সর্ব্বদাই আচার্য্যের উপদেশ বা আদেশ প্রতিপালনে বদ্ধপরিকর। 'কুসতি'র নির্ম্মাণ-প্রণালীও বড় বিচিত্র। সাদা ভেড়ার লোম (পশম) হইতে সচরাচর ইহা বোনা হয়। ইরাণীয় পুরোহিত-সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরাই সাধারণতঃ ইহা বুনিয়া থাকেন। তবে আজ-কাল অপুরোহিত সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরাও * ইহা বুনিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, পশম হইতে খুব সরু সুতা তৈয়ারী করা হয়। তাহার পর উপযুক্ত পরিমাণ লম্বা দুইটী সুতা একত্র পাকাইয়া লওয়া হয়। দুইটী সুতার এই পাক প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন সূচিত করে। এইরূপ বাহাত্তরটী পাকান সুতা দিয়া সরু লম্বা ও ফাঁপা একটী ফিতা বোনা হয়। বাহাত্তর সংখ্যাটীর একটী বিশেষত্ব আছে। আবেস্তার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ 'যস্ন' বাহাত্তর অধ্যায়ে বিভক্ত। বাহাত্তরটী পাকান সুতা তাহারই পরিচায়ক †। ইহার পর ঐ ফিতাটীকে এমন-ভাবে উল্টাইয়া লওয়া হয় যে, ভিতর দিকটী বাহিরে আসিয়া পড়ে ও বাহিরের অংশটী ভিতরে চলিয়া যায়। তাহার পর শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ইহা ধৌত করিয়া গুটাইয়া রাখা হয়।

'সুদ্‌রেহ্‌'-এর উপর এই কুস্‌তি ধারণ করিতে হয়। তিনগুণ করিয়া ইহা কোমরে জড়ান থাকে। এই

---

‡ উপাসনা কালে হিন্দু, ক্রিশ্চিয়ান্‌ ও ইহুদী রমণীগণেরও শিরোদেশ আবৃত করার অনুশাসন আছে।

* ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়ন-সংস্কার বিহিত বলিয়া সাধারণ নাম 'দ্বিজ'।

‡ ব্রাহ্মণবটুর উপনয়ন সংস্কারের কাল—গর্ভাষ্টম হইতে গর্ভষোড়শ বর্ষ। ক্ষত্রিয়বালকের গর্ভৈকাদশ হইতে গর্ভদ্বাবিংশ; ও বৈশ্যের গর্ভদ্বাদশ হইতে গর্ভচতুর্ব্বিংশ।

† শীতপ্রধান ইরাণে ইহা সাদা পশমেরও তৈয়ারী হইত।

* হিন্দুগণের যজ্ঞোপবীতও ব্রাহ্মণীগণই কাটিয়া থাকেন। তবে আজ কাল ব্রাহ্মণেতর বর্ণের স্ত্রী বা পুরুষেও পৈতা কাটিতেছেন। যাহাই হউক ইরাণীয় ভিন্ন অন্য জাতিতে 'কুস্‌তি' প্রস্তুত করিলে ইরাণীয়গণ তাহা ব্যবহার করেন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন হিন্দু 'কুস্‌তি' প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করায় পারসী মহিলাগণ তাঁহাদের কলকব্জা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।

† ৭২টী সুতা আবার ছয়ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগে বারটী করিয়া সুতা থাকে। এ সংখ্যাগুলির একটী করিয়া বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে।

ত্রিবৃৎকরণ * আচার্য্য জরথুশ্ত্রের তিনটা আদেশের প্রতীক মাত্র। 'হুমত' (সুচিন্তা), 'হুখ্ত' (সুনৃত বাক্য) ও 'হুবর্শ্ত' (সৎকার্য্য)—আচার্য্যের এই তিনটী আদেশ প্রতিপালনে প্রত্যেক পারসী নরনারী বদ্ধপরিকর—ইহাই কুসতি ধারণের নিগূঢ় ধর্ম্ম। সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটী গ্রন্থি 'সেলার্শ নট' দিয়া আঁটা থাকে। এই গ্রন্থি দিবার সময় প্রত্যেক পারসী চিন্তা করেন যে, পরমেশ্বরই একমাত্র নিত্য সদ্ বস্তু—মজ্দয়স্নি ধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ—আচার্য্য জরথুশ্ত্রই একমাত্র ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ—আচার্য্যের আদেশত্রয় আমার অবশ্য পালনীয়।

ইহা তো গেল উপনয়নের কথা। এইবার বিবাহ। সকল আর্য্যজাতির মধ্যেই বিবাহ জীবনের প্রধান সন্ধিক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। 'বেন্দীদাদ্' গ্রন্থে (৩। ২ ও ৪। ৪৭) উক্ত হইয়াছে যে, অবিবাহিত অপেক্ষা বিবাহিত পুরুষই অহুরমজ্দের অধিক প্রিয় ও নিঃসন্তান ব্যক্তি অপেক্ষা সন্ততিবিশিষ্ট পুরুষই তাঁহার প্রিয়তর। বিবাহের দ্বারাই বংশ রক্ষা হইয়া থাকে আর বংশরক্ষাতেই ধর্ম্মের প্রবাহ-রক্ষা। এইজন্য পারসীগণ বিবাহ ও সন্তানোৎপাদনরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্মকেই উচ্চতম আসন প্রদান করিয়াছেন।

পারসীগণ যখন স্বদেশ হইতে পলাইয়া আসিয়া গুজরাট প্রদেশের সন্জান অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন ঐ প্রদেশের যাদব (যদুকুল সম্ভূত) নরপতি ‡ কয়েকটী সর্ত্তে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিতে সম্মত হন। উভয় জাতির মধ্যে বৈবাহিক-সম্বন্ধ-স্থাপন সেই সর্ত্তগুলির অন্যতম। সেই দিন হইতে পারসী-বিবাহের সময়ও পরিবর্ত্তিত হইল। দিবাভাগের পরিবর্ত্তে সূর্য্যাস্তের অব্যবহিত পরক্ষণেই বিবাহের প্রশস্ত সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল *।

বিবাহ-পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ হইতেছে পুরোহিত-কর্ত্তৃক তিনবার সম্প্রদান বাক্য "ম্যারেজ-কন্‌ট্রাক্ট" উচ্চারণ। আসল মন্ত্রটী পহ্লবী ভাষায় রচিত †। ইহার পর কোন কোন স্থলে সংস্কৃত ভাষাতেও উক্ত মন্ত্রার্থ পঠিত হইয়া থাকে। যাদব নরপতির নিকট পারসীগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাহারা রাজার অধিকারে বাস করিতে অনুমতি পাইলেন—সেই রাজা ও তাহার প্রজাবৃন্দের বোধগম্য ভাষায় বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিতে তাঁহারা বাধ্য থাকিবেন। তদনুসারেই কোন কোন পরিবারে সংস্কৃত মন্ত্রার্থ পঠিত হইয়া থাকে। বিবাহপদ্ধতির একটী সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পুরোহিত।......নগরীতে সম্মিলিত এই সভ্যগণ মধ্যে পুণ্যভূমি ইরাণের সাসানীয়' বংশোদ্ভূত সম্রাট্ 'যজদেজর্দ শাহ্রিয়ার'-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অব্দের ‡ ...বৎসরে ..মাসের... দিবসে—বল,...নাম্নী কন্যাকে এই বরের নিমিত্ত গ্রহণ

---

* মেখলা তিনগুণ করিয়া গ্রন্থি দিবার প্রথা হিন্দুদিগের মধ্যেও ছিল। মনু (২। ৪৩) বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের মেখলা ত্রিবৃৎ হইবে। ক্ষত্রিয়ের মাত্র একগুণ—উহা আবার ধনুকের ছিলারও কাজ করিত। কুলাচার অনুসারে উহাতে এক, তিন অথবা পাঁচটী গ্রন্থি পড়িত।

‡ পারসীগণ ইঁহার নাম দিয়াছেন—"জাদি রাণা।"

*পারস্যে বিবাহ আজিও দিবাভাগে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

† আরবগণ যখন ইরাণ জয় করেন, তখন ইরাণে "পহ্লবী" ভাষা প্রচলিত ছিল। অতএব মন্ত্রাদি সকলই সেই ভাষায় রহিয়া গিয়াছে; কোন পরিবর্ত্তন বা সংস্কার পরাধীনতার চাপে সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

† বর্ত্তমানে পারসীগণ 'যজদেজর্দি' অব্দ ব্যবহার করেন। ইরাণের শেষ জোরোয়াষ্ট্রিয় সম্রাট্ যজ্দেজর্দ শাহ্রিয়ার (তৃতীয় যজ্দেজর্দ)এর সিংহাসনপ্রাপ্তির দিন হইতে ঐ অব্দ গণিত হইয়া থাকে। সম্রাট্ ৬৩২ হইতে ৬৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তদনুসারে বর্ত্তমানে তাঁহাদের ১৩০০ অব্দ চলিতেছে। পারস্যে বাসন্ত মহাবিষুবের দিন হইতে নববর্ষ গণনা করা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে পারসীগণের কোন সম্প্রদায় আগষ্ট হইতে কোন সম্প্রদায় বা সেপ্টেম্বর হইতে বর্ষারম্ভ ধরিয়া থাকেন। এই প্রভেদের কারণও আছে। আমাদের সৌর বৎসরের পরিমাণ ঠিক ৩৬৫ দিন নহে; ৩৬৫ দিন অপেক্ষা প্রায় ৬ ঘণ্টা বেশী অর্থাৎ আমাদের ১২০ বৎসরে সৌরবৎসর ১ মাস বেশী হইয়া থাকে। সেজন্য প্রাচীন ইরাণে প্রত্যেক ১২০ বৎসরে (মলমাস হিসাবে) একটী মাস অধিক সন্নিবেশিত করা হইত। আরবগণ-কর্ত্তৃক পারস্যবিজয়ের পর হইতে পারসীগণের একটী সম্প্রদায় একবারমাত্র এই মলমাস অধিক

করিতে সম্মত হইয়াছ কি না ? এবং মজ্দ-উপাসকগণের পবিত্র আচারানুসারে 'নিশাহ্পুর' মুদ্রার ২০০ পবিত্র শ্বেতবর্ণ রৌপ্য 'দির্হেম' ও দুইটী স্বর্ণ 'দিনার' পাত্রীকে দান করিতে প্রতিশ্রুত আছ কি না ?

বরকর্ত্তা *।—হাঁ।

পুরোহিত।—তুমি সপরিবারে শুদ্ধচিত্তে কায়মনো বাক্যে ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্দেশ্যে চিরদিনের জন্য এই কন্যাকে... বরের হস্তে সম্প্রদান করিতে সম্মত আছ কি ?

কন্যাকর্ত্তা।—হাঁ, সম্মত আছি।

পুরোহিত। তোমরা উভয়ে আমরণ এই পবিত্র সম্বন্ধ স্বীকার করিতে সম্মত আছ কি ?

বর ও কন্যা।—হাঁ। আমরা ঐরূপ ইচ্ছা করিয়াছি।

ইহার পর পুরোহিত মহাশয় অহুরমজ্দ,অমেষস্পেন্তগণ ও যজতগণের নিকটে দম্পতীর মঙ্গলকামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন; এবং আদর্শ দাম্পত্য-জীবন-সম্বন্ধে বরবধূকে উপদেশ দিয়া বিবাহকৃত্য সমাধা করেন।

সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। অন্য সম্প্রদায় আবার একবারও মলমাস নিবেশিত করেন নাই। কাজেই এই উভয় সম্প্রদায়ের বর্ষারম্ভের মধ্যে ঠিক একটী মাসের ব্যবধান দেখা যায়। আর প্রাচীন ইরাণের মতে বর্ষারম্ভ সময় হইতে প্রচলিত পারসী বর্ষারম্ভকালের ব্যবধান ন্যূনাধিক দশমাস। সম্প্রতি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ (বসন্তবিষুবদিবস) হইতে পারস্যের শাহ্ রেজা শাহ্ পহ্লবী মহোদয় পারস্যদেশে প্রাচীন ইরাণীয় বর্ষ প্রচলিত করিয়াছেন। এই নবপ্রচলিত প্রথানুসারে প্রতিমাসে ত্রিশ দিন; বারমাসে বৎসর; বৎসরান্তে পাঁচ দিন ফাউ। প্রতি চতুর্থ বৎসরে ফাউ একদিন বাড়িয়া ছয় দিন হয় (ইউরোপীয় 'লীপ ইয়ারে'র মত)। ভারতবর্ষের কোন কোন পারসী সম্প্রদায়ও পারস্যের এই প্রথা অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে।

* বরকর্ত্তা—বরপক্ষের প্রতিনিধি বা সাক্ষী। ইউরোপীয়দিগের বিবাহে "দি বেষ্ট ম্যান"এর অনুরূপ। সাধারণতঃ বরের নিকটজ্ঞাতি বা বিশিষ্ট বন্ধুই বরকর্ত্তা হইয়া থাকেন। বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা উভয়কেই বোম্বাইএর "ম্যারেজ-রেজিষ্টার" এ সহি করিতে হয়।

——:**:——

মহুয়া *

(গীতি নাট্য)

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

কুশীলব

নদের চাঁদ—বামনকান্দের জমীদার।

হুমড়া—বেদের সর্দ্দার।

সুজন—ঐ পালিত পুত্র।

মাণিক—হুমড়ার ভ্রাতা।

মহুয়া—হুমড়া-কর্ত্তৃক অপহৃতা ব্রাহ্মণ-কন্যা, পরে পালিত-কন্যা

পালঙ্ক—মহুয়ার সখী।

অন্যান্য সখিগণ—

প্রস্তাবনা

[বামনকান্দার জমীদার-বাটীর প্রাঙ্গণ। নদেরচাঁদ সভা করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী বালক আসিয়া বেদেদের আগমনের সংবাদ দিল।]

বালক।—(দ্রুত প্রবেশান্তর অভিবাদন করিয়া)

শুন শুন ঠাকুরমশায় বলি যে তোমারে।
নূতন একদল বেদে আইছে তামসা দেখাইবারে॥
পরম এক সুন্দরী কন্যা সঙ্গেতে তাহার।
জন্মিয়া এমন কন্যা দেখি নাইক আর॥

নদেরচাঁদ।—(উৎসাহের সহিত)

কোথায় দেখি? আন গিয়া সঙ্গে করি ত্বরায়।
দেখি নূতন বেদের দলে কেমন খেলা দেখায়॥

(বালক বেদের দলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল। বেদে ও বেদেনীর দল নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিল। মহুয়া নাচিয়া নাচিয়া গান ধরিল।)

গান

বলে রে বলে রে বলে রে—বাঁশী বলে রে ফুকারি
পথে পথে ঘোরার লাগি জনম তোমারি;
নাইরে তোমার ঘরের মায়া,
নাইরে ঘিরা স্নেহের ছায়া,
উইরা ঘুইরা ফির যেন বনের কৈতরী;
চল্ রে চল্ রে চল্ রে পথে ইনাম-ভিখারী।

(নদেরচাঁদ বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল।)

নদেরচাঁদ।—

আহা হা, দুঃখের জনম তোমার বেদের কুমারী॥

মহুয়া।— আইছ এবার বামনকান্দে,
তুষবা ঠাকুর নইদাচান্দে,
আবার ঘুরবা বনের পথে বেদের কুমারী,—
চল্ রে চল্ রে চল্ রে পথে ইনাম-ভিখারী॥

নদেরচাঁদ।—

না, না, দিব না তোমায় ঘুরতে বনে বনে,
ইনাম দিব রহ হেথায় আনন্দিত মনে।

মহুয়া।—(নদেরচাঁদের দিকে অগ্রসর হইয়া)

ঠাকুর, তামসা করলাম শেষ এবার ইনাম চাই।
তার সাথে যেন প্রভু মনটি তোমার পাই॥
বল্‌ছে বাঁশী বিদায় লইতে বল্‌ছে ফুকারি—
চল্ রে চল্ রে চল্ রে পথে ইনাম-ভিখারী।

(নদেরচাঁদের বহুমূল্য শাল ও প্রচুর অর্থ দান। এমন সময়ে হুমড়া বেদে অগ্রসর হইয়া বলিল:)

---

* ১৯২৫ সালে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের নির্দ্দেশে এবং নটশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর উপদেশে মৈমনসিং গীতিকবিতার একটী গাথা অবলম্বনে "ইটালীয়ান অপেরা"র ছাঁচে মহুয়া রচিত হইয়াছিল। ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গের ভাব ও ভাষা যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে।

হুমড়া ।—

ইনাম পাইছি বহুৎ ঠাকুর, পাইলাম টাকা কড়ি,
বসত করতে বেদের দল যে চায় একখান বাড়ী।

নদেরচাঁদ ।—(হুমড়ার দিকে তাকাইয়া)

দিব তোমায় নূতন বাড়ী দিব নূতন ঘর,
সুখে গিয়া নিদ্রা যাও নিশ্চিন্ত অন্তর।

(মহুয়ার প্রতি)

পথে পথে না ঘুরিয়ো বেদের কুমারী
বাসা বাঁধ এবার তুমি বনের কৈতরী।

(চুপে চুপে মহুয়ার কাণে)

শুন শুন কন্যা ওরে আমার কথা রাখ,
মনের কথা কইব আমি একটু কাছে থাক।
সন্ধ্যাবেলা চন্দ্র উঠে—সূর্য্য বসে পাটে,
হেনকালে একলা তুমি যেয়ো জলের ঘাটে।

মহুয়া ।— চল্ রে যাই, চল্ রে যাই, ঘোরাঘুরি শেষ
ধন্য ধন্য নদের ঠাকুর ধন্য রে এই দেশ।
বনের পাখী ছিল বনে খাঁচায় পশিছে,
এবার তবে বিদায় ঠাকুর মহুয়া মাগিছে।

(গায়িতে গায়িতে সকলের সহিত মহুয়ার প্রস্থান।)

প্রথম দৃশ্য

জলের ঘাট—সন্ধ্যা।

(মহুয়ার জলের ঘাটে কলসী লইয়া প্রবেশ ও কলসী ভরিতে ভরিতে গান)

মহুয়া ।—　　　　গান

কে রে আমার এমন করি পরাণ ভুলাইল ?
কে রে আমার নয়ন হ'তে নিদ্রা ঘুচাইল ?
কে দিল রে ভাবনা শত
বুকে আমার ব্যথা এত
এমন করি বেদের বালার কপাল পোড়াইল ?

নদেরচাঁদ ।—(অগ্রসর হইয়া)

জল ভর বেদের বালা জলে দিছ মন,
আমারে দেখেছ কভু পড়ে কি স্মরণ ?

মহুয়া ।— তুমি তো গো ভিন্নদেশী পথ ছাড় যাই,
তোমারে দেখেছি কভু মনে কিছু নাই।

নদেরচাঁদ ।—

কতজনে ভুলাও তুমি ভোলা তোমার মন,
এরি মধ্যে ভুল আমায় ? হয় না কি স্মরণ ?

মহুয়া ।— ভিন্নদেশী পুরুষ তুমি, আমি একা নারী,
তোমার সাথে কইতে কথা লজ্জায় আমি মরি।

নদেরচাঁদ ।—

জল ভর সুন্দরী বালা জলে দাও গো ঢেউ
হাসিমুখে কও না কথা সঙ্গে নাই তো কেউ।
কেবা তোমার মাতাপিতা কোথায় তোমার ঘর,
জানিতে এসব কথা চাহিছে অন্তর।

মহুয়া ।— নাহি আমার মাতাপিতা নাহি সোদর ভাই,
স্রোতের শেওলা হইয়া আমি ভাসিয়া বেড়াই।
কপালে লিখন ছিল বেদের সঙ্গে ফিরি
ঘর নাই জন নাই স্নেহের ভিখিরী।
দেশে দেশে ঘুরলাম কত কারে কব কথা,
কোথা আছে দরদী সে বুঝবে আমার ব্যথা!
মনের সুখে আছ ঠাকুর সুন্দরী নারী নিয়া
অভাগিনী আমার কথা কি হবে জানিয়া!

নদেরচাঁদ—

কঠিন তুমি কন্যা তোমার শাণে বান্ধা হিয়া,
মিছা কথা কইছ কেন না করেছি বিয়া।
কোথায় আমার সুখ রে কন্যা কোথায় আমার নারী,
তোমার মত নারী পাইলে নিয়া যাই যে বাড়ী।

মহুয়া ।— লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর করতে চাও বিয়া ?
গলায় কলসী বাইন্ধা জলে ডুইব্যা মর গিয়া।

নদেরচাঁদ ।—

কোথায় পাব কলসী কন্যা কোথায় পাব দড়ি,
তুমি হও গহন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মরি।

(মহুয়া ও নদেরচাঁদের প্রস্থান)

(পালঙ্ক ও মহুয়ার প্রবেশ)

পালঙ্ক —(মহুয়ার গলা ধরিয়া গায়িতে গায়িতে)

সখি কে রে তোর মনচোরা

কে সে তোর প্রেমিক গোরা ?
তোর মন হরিল প্রাণ কাড়িল,
জীবন গাঙ্গে ঢেউ তুলিল,
করল তোরে প্রেম বিভোরা ?
মাথা খাও সখি কও না কথা
কি যে তোর মনের ব্যথা,
কেন ঝরে গণ্ড বহি অশ্রু অঝোরা ?

মহুয়া ।— জানি না জানি না জানি না সখি এদশা মোর কেন !

পালঙ্ক ।—কও না বইন্ সত্য কথা আমার মাথা খাও,
একলা কেন সন্ধ্যাবেলা জলের ঘাটে যাও ?
সারা নিশি কাইন্দা জাগ প্রহর প্রহর গুণি
একটিবার মনের কথা কও না কেন শুনি ?
শুন্‌ছি না কি নদেরঠাকুর পাগল তোমার গানে,
তাই গো বুঝি চাইয়া থাক ঠাকুরবাড়ীর পানে।

মহুয়া ।—কি যে কইব বল না সই রে কি যে কইব তোরে,
মনের আগুন ধিকিধিকি পুড়াইছে মোরে।
বুঝাইলে না বোঝে মন কি দিয়ে যে বুঝাই,
জানি না কি হইল আমার, সখি এ কোন্ বালাই।

পালঙ্ক ।—শোন লো বইন্ শোন লো কথা মনরে বুঝান দাও,
সন্ধ্যাবেলা জলের ঘাটে আর না তুমি যাও।
নদের ঠাকুর আসে যদি বইলা দিব তারে
সুন্দরী সে তোমার নারী গেছে মরণ পারে।

মহুয়া ।—(ধীরে ধীরে)
কেমনে সই পারব আমি একথা রাখিতে
মুহূর্ত্ত না দেখ্‌লে তারে পারি না থাকিতে।
চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী আছে, কহি সত্য আমি,
নদের ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী।
কি করিব বল না সই বাঁচি কিম্বা মরি
বন্ধুরে কি লইয়া আমি হইব দেশান্তরী ?

পালঙ্ক ।—অত না গো ভাবিয়ো সই মনরে বাঁধি রাখো
কেউ না যেন জানে সখি সাবধানে থাক।

(কাহার যেন পদশব্দ)

এই বুঝি কে আসে রে সই চল ঘরে যাই
তোমার প্রাণরে বল আমি কেমনে বুঝাই।

(মহুয়া ও পালঙ্কের প্রস্থান)।

(মহুয়া ও নদেরচাঁদের প্রবেশ)

নদেরচাঁদ ।—
মা ছেড়েছি, বাপ্ ছেড়েছি, ছেড়েছি ঘরবাড়ী
তোমায় নিয়া কন্যা আমি হব দেশান্তরী।

মহুয়া ।— কেন তুমি বল ঠাকুর বল এমন কথা,
বেদের কন্যা বিয়ায় হবে নিন্দা যথাতথা।

নদেরচাঁদ ।—
কিসের আমার জাতি-সম্মান, কিসের নিন্দা ভয়
তোমারে না পাইলে কন্যা মরিব নিশ্চয়।
তুমি আমার নয়ন আলো, দেহের মধ্যে প্রাণ
স্বপনের দেবী তুমি জাগরণে ধ্যান।
বল বল বল কন্যা মিলব নিত্য সাঁঝে
আমার মরণ বাঁচন কন্যা যে আছে তোমার মাঝে।

মহুয়া ।—(নদেরচাঁদের গলা ধরিয়া)
তুমি আমার গলার মালা নয়নের মণি,
তিলেকমাত্র না দেখিলে হই পাগলিনী।
কি কহিব বান্ধা আমি পিঞ্জরের পাখী
বাহির হইব উপায় নাই রে মনের দুঃখে থাকি।
হইতে যদি বন্ধু তুমি হইতে বনের ফুল,
বেণী বাইন্ধ্যা রাখতাম তোমায় ঢাকা দিয়া চুল।
আমি মরি জলে ডুব্যা আমার মাথা খাও
ছাড়ান দিয়া আমার আশা ঘরে চল্যা যাও।
যাই রে বন্ধু যাই রে আমি বেলা বইয়া যায়
আমারে না দেখলে তারা আসিবে হেথায়।

নদেরচাঁদ ।—(ম হুয়ার হাত ধরিয়া)
কেমনে রে ছাড়ব তোমায় কিছুই বুঝি না
তোমায় ছাইড়া ঘরে আমি রইতে পারি না।
তুমি আমার নয়ন-তারা দেহের মধ্যে প্রাণ,
তোমায় লইয়া যাব কন্যা যাব অন্যস্থান।

মহুয়া ।—(বৃক্ষান্তরালে মনুষ্যের ছায়া দেখিয়া)
ঐ যেন কে গাছের পিছে আঁধারে লুকায়
আর না থাক ঠাকুর হেথায়, চাহি যে বিদায়।
ইচ্ছা করে শুনি তোমার বচন সুমধুর
কেমনে যে পুরবে আশা জানি না ঠাকুর।

(উভয়ের প্রস্থান)

(হুমড়া, মাণিক ও সুজনের প্রবেশ)

হুমড়া।—মন দিয়া শোন রে সুজন শোন্ রে মাণিক ভাই
এদেশ ছাইড়া চল রে আমরা অন্য দেশে যাই।
কি হইবে রে বাড়ী ঘরে খাইব ভিক্ষা মাগি,
মহুয়ারে পাগল দেখি নদের ঠাকুর লাগি।

সুজন।—বুঝছি এখন মহুয়া তাই নদীর ঘাটে যায়
রাতের বেলা আইসা ফিরা প্রেমের গান গায়।
যাবার যদি নদের ঠাকুর ঘাটের পথে চলে
এই ছুরিতে মাইরা তারে ফেলব নদীর জলে।

মাণিক।—থাম্ রে সুজন থাম্ রে বাছা মুখের বড়াই রাখ্
সালের চিরায় দধি মাইখা খাইয়া সুখে থাক্।

হুমড়া।—কি করিতে ইচ্ছা এখন বল রে মাণিক ভাই
মিছা কেন হেথায় থাকি' মনে দুঃখ পাই।

মাণিক।—কি যে কথা বল রে ভাই কিছু বুঝ্‌তে নারি
কেন তুমি ছাড়তে চাও সোণার জমী বাড়ী
শানে বান্ধা পুষ্করিণী গলায় গলায় জল
পাইকা আছে সালের ধানে সোণার ফসল।
মিছা তুমি মন্দ বল মহুয়া বেটীরে
আনন্দে সে থাকে, নিয়া পালঙ্ক সখীরে।

হুমড়া।—সন্দেহ মোর গেছে ঘুচি রইব না এ দেশে
আর থাকিলে হারাই পাছে মহুয়ারে শেষে
দেখ্‌ছি তারে সাঝের বেলায় নদের ঠাকুর সাথে
নিত্য বুঝি তাঁহার পাশে যায় সে গহন রাতে।
যাইব আমরা এদেশ ছাড়ি' প্রস্তুত হও ত্বরায়
পলাইব সকল বেদে গভীর এই নিশায়।

(হুমড়ার প্রস্থান)

মাণিক।—হায় রে সুজন কেমন করি বাড়ী ছাড়ব বল্
এমন পাকা সালের চিরা পুষ্করিণীর জল।
করুক গিয়া নদের ঠাকুর মহুয়ারে বিয়া
সুজন তুমি সুখে থাক বাড়ী জমী নিয়া।
অনেক কন্যা দিব তোমায় থাকলে বাড়ী ঘর
পাকা ফল রে দিব খাইতে আমার কথা ধর।

সুজন।—(বিরক্ত হইয়া)
চল চল মাণিক-খুড়া চল এ দেশ ছাড়ি'
মহুয়ারে চাই যে আমি, চাই নে জমী-বাড়ী।

(মাণিককে টানিয়া লইয়া সুজনের প্রস্থান)

(মহুয়া ও পালঙ্কের প্রবেশ ও গীত)

পালঙ্ক।—কি ভাবিছ বনের পাখী বসি পিঞ্জরায়
বাসনা উড়িতে বুঝি মনেতে জাগায়।
আস্‌মানেতে 'বউ কথা কও' ডাক দিয়া যায়
সোণার কোকিল গাছে বসি কুহু কুহু গায়।
বঁধুরে জাগাতে বাঁশী ঠারে কে বাজায়
কে তোরে পাগল করি ছুটিয়া পলায়।
বান্ধা পাখী পাগলিনী ভাবিয়া লোটায়
পিঞ্জরে বসিয়া নিশা কেমনে পোয়ায়।

মহুয়া।—ভাবিয়া ভাবিয়া সখি হই যে আকুল
ঝরিয়া যেতেছে আমার জীবন-মুকুল।

পালঙ্ক।—কি ভাবিছ বসি সখি বদন করি কালি
তোমার কথা বেদের দলে করে বলাবলি।
নিদ্রা নাহি যাও গো সখি না ছোও ভাত পানি
পাগলিনী বলি সবে করে কানাকানি

মহুয়া।—কি বলিব সখি তোরে আমার মনের ব্যথা
নদের ঠাকুর স্বামী আমার শোন্‌রে বলি কথা
তার বিহনে তিলেক আমি না পারি রহিতে
ভাবিয়া না দেখি উপায় যাতনা সহিতে।

পালঙ্ক।—উঠ উঠ সখি তুমি সুখে নিদ্রা যাও
ভাবিয়া ভাবিয়া কেন মনে দুখ না পাও।
দুজনে বিরলে বসি গাথি ফুলের মালা
সাজাইব যতন করি তোমার নাগর কালা।

(হুমড়ার প্রবেশ)

হুমড়া।—কই রে তোরা মহুয়ারে পালঙ্ক রে কই?
শোন্ রে আসি আমার কথা তোরা দুটী সই।

যাইব আমরা এ গ্রাম ছাড়ি এই না গভীর নিশায়
তোরা দুজন প্রস্তুত থাকিস্ আমরা যাইব ত্বরায়

(হুমড়া ও পশ্চাতে পালঙ্কের প্রস্থান)

মহুয়ার গান

জনম গোঙানু দুখে, কত না সহিব বুকে
কেমনে গো জীবন ধরিব।
পরাণে রহিল ব্যথা সুখ মোর গেল কোথা
বঁধু লাগি গরল ভখিব ॥
বঁধু তরে আঁখি ঝরে, রহিতে পারি না ঘরে
তারে ছাড়ি কেমনে যাইব।
তবু মোরে যেতে হবে পাখী যে গো বাধা রবে
বাঁশী তার আর না শুনিব ॥

(পার্শ্ব হইতে নদেরচাঁদের প্রবেশ)

নদেরচাঁদ।—
কি কথা শোনাও তুমি কি কথা শোনাও
আমারে ছাড়িয়া তুমি কোনখানে যাও।
মহুয়া।—উপায় নাই রে বন্ধু আমার উপায় যে রে নাই,
এ গ্রাম ছাড়ি বেদের দল রে যাবে অন্য ঠাই।
তোমার সঙ্গে বুঝি আমার এই না শেষ দেখা
কেমনে থাকিব বন্ধু তোমা বিনা একা।
আর না তোমার বাঁশী আমায় ডাকিবে নিশিতে
আর না আইসা পাইব হেথায় তোমারে দেখিতে।
জাগিয়া না দেখব কভু এই না সোণা মুখ
তোমার সাথে বসি হেথায় আর না পাব সুখ।
নদেরচাঁদ।—
কি শুনিরে নিঠুর কথা মহুয়া সুন্দরী
তোমারে না দেখলে আমি যাব নিশ্চয় মরি।
মহুয়া।—ভেব না ভেব না বন্ধু রাখ আমার কথা
পাহাড়তলে খুঁজো আমায় মনে জাগ্‌লে ব্যথা।
তোমারে কি বুঝাব যে নিজেই বুঝি না,
পরাণ কাটি' কান্না আসে রহিতে পারি না।
ঐ বুঝি গো আমার খোঁজে আসে দল দল
বিদায় বন্ধু বিদায় দাও, অশ্রু যে সম্বল।

(মহুয়ার কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান)

(নদেরচাঁদ বিহ্বল অবস্থার পর উঠিয়া)

নদেরচাঁদ।—
কোথায় যাও মহুয়া রে আমারে ফেলিয়া
কি হবে সম্পত্তি নিয়া তোমারে ছাড়িয়া ॥

(প্রস্থান)

(প্রস্থানোক্ত বেদের দলের প্রবেশ)

গান

ঝমর ঝমর ঝমর বোলে
রিণিনি রিণিনি বাজে ঢোলে
তালে তালে চরণ ফেলে নাচি রে
বনে বনে ঘুরে ঘুরে
পাহাড়ে পাহাড়ে ঢুরে ঢুরে
পথে পথে ভিখারী ইনাম যাচি রে ॥

হুমড়া।—চল চল মাণিক ভাই চল তাড়াতাড়ি
আঁধার-নিশায় পলাই চল বামনকান্দা ছাড়ি।
পাছে আবার নদের ঠাকুর টের পাইয়া আসে
মহুয়ারে লইয়া যায় কাইড়া আপন বাসে।
মাণিক।—এমন ছিল জমী বাড়ী এমন ক্ষেতের ধান
তারে ফেইলা যাইতে প্রাণ করে আনচান্।
সানে বাধা পুষ্করিণী, গলায় গলায় জল
কাকচক্ষুর মতন পানি করে টলটল।
এসকলে ছাইড়া যাইতে মনে দুঃখ পাই
মহুয়ারে দিয়া কেন এইখানে না রই।
সুজন।—চল চল মাণিক-খুড়া বৃথা কও কথা
মহুয়ারে না ছাড়িব যাইতে যথাতথা।
পালঙ্ক।—(মহুয়ার হাত ধরিয়া)
বল বল মহুয়া সই ফিরা কেন চাও
ছাড়তে বুঝি নদেরঠাকুর মনে ব্যাথা পাও।

মহুয়া।—কি বলব তোরে সখি কথা নাইরে পাই
মনে হয় রে বুঝি আমার দেহে প্রাণ নাই।
চলতে আমার চরণ কাঁপে অঙ্গ থরথর
এখন শুধু মহুয়া চায় মরণ নিরন্তর।

হুমড়া।—(ডাক দিয়া)
কইরে তোরা মহুয়া রে পালঙ্ক রে কই
তাড়াতাড়ি আয় না কেন তোরা দুটী সই।

(সকলের প্রস্থান)

(মহুয়াকে খুজিতে খুজিতে নদেরচাঁদের প্রবেশ)

গান

নদেরচাঁদ।—
কোথায় ওরে বেদের বালা কোথায় পরাণ প্রিয়া
কোন দেশেতে গেলে সখি আমার জীবন নিয়া
বিনা সূতায় গাঁথতা মালা বনের কুসুম দিয়া
কণ্ঠে আমার দুলায়ে দিতা প্রেমে ভরি হিয়া
আমার হৃদয়-পিঞ্জর ভাঙ্গি উড়ল প্রেমের টিয়া
এমন পাগল করি কোথায় বাসা বাধল গিয়া।
সকল ভুলি মাতাল হইছি প্রেমের সুধা পিয়া
কে নিল রে হৃদয়-চাঁদে আঁধারিয়া হিয়া।
সাক্ষী হও চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী হও তারা
মহুয়ারে খুঁজতে আমি হব গৃহছাড়া।
ছাড়ব আমি সুখের শয্যা ছাড়িব স্বজন
ঘর হইবে পাহাড়-পর্ব্বত গহন কানন।
বেদের কন্যা পরাণ আমার জীবন সম্বল
বিহনে তার মরব আমি ছাড়ি অন্নজল।

প্রস্থান)

যবনিকা পতন

ক্রমশঃ

———:০:———

চন্দ্রকোণা

শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায়

বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোণা একটী প্রসিদ্ধ নগর। ইহার ভৌগলিক অবস্থান অক্ষ-রেখা ২২°-৪৪'-২০" উত্তর, দ্রাঘিমান্তর ৮৭°-৩৩'-২০" পূর্ব্ব। এখানে থানা, পোষ্ট আফিস, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, মিউনিসিপ্যালিটী, দাতব্যচিকিৎসালয় ও সবরেজেষ্টারি অফিস আছে। পূর্ব্বের প্রতিষ্ঠার নিদর্শন প্রাচীন মন্দির, দীঘি, গড় ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও অনেক বিদ্যমান আছে। ১৮৭২ সালের আদমসুমারিতে ইহার লোকসংখ্যা ছিল ২১,০০০ হাজার, ১৮৮১ সালে ১২,০০৭, ১৮৯১ সালে ১১,০০০, ১৯০১ সালে ৯০০০, ১৯২১ সালে ৬৪৭০ এবং ১৯৩১ সালে ৬০০০ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে কাপড়, ঘৃত ও কাঁসার বাসন যথেষ্ট উৎপন্ন হইত এবং চতুর্দ্দিকে রপ্তানি হইত; বিশেষতঃ কাপড় ও মুটকি ঘিএর প্রসার যথেষ্ট ছিল। উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজে চন্দ্রকোণার কাপড়ের এখনও বেশ সম্ভ্রম আছে, যদিও তালপুকুরের তালগাছের একান্ত অভাব। স্থানীয় শিল্পধ্বংসে ও ম্যালেরিয়ায় চন্দ্রকোণা এখন মৃতপ্রায় কঙ্কালবশিষ্ট।

কথা, কিংবদন্তী ও কাহিনীতে চন্দ্রকোণার প্রাচীন ইতিহাসের অনেক উপকরণ রক্ষিত আছে। ইহার বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্য্য, রাজবংশের উত্থান ও পতন, শিল্পসাধনার ইতিহাস

সংগ্রহ এখনও অতীতের বিষয় হইয়া উঠে নাই। এখনও অনুসন্ধান করিলে উপাদান যথেষ্ট পাওয়া যাইবে বলিয়া বেশ আশা করা যায়। এস্থানের বিশ্বস্ত ও যুক্তিসঙ্গত ইতিহাস রচনা করিবার কথা জানা নাই। মাঝে মাঝে মেদিনীপুরের ইতিহাস-লেখকগণ গেজেটিয়ার হইতে যাহা পাইয়া থাকেন তাহারই কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যান মাত্র। কেবল মাত্র 'কলিকাতা-রিভিউ' নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকায় একবার একটু বিস্তারিত-ইতিহাস বাহির হইয়াছিল। সে ১৮৮৩ সালের কথা, প্রবন্ধের নাম ছিল 'ক্রনিকেলস্ অফ্ চন্দ্রকোণা' এবং লেখক ছিলেন সি, এস্, বি। এই সি, এস্,বি ছিলেন শ্রীযুত চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—একজন সেকালের নাম-জাদা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। লেখক বলিয়াও তাঁহার বেশ নাম ছিল; ইংরেজি ও বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকাদিতে তাঁহার প্রবন্ধ সাদরে প্রকাশিত হইত। এই ইংরাজী প্রবন্ধের কতকাংশ গেজেটিয়ারে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে বহু অবান্তর, অসম্ভব ও কষ্ট-কল্পনা থাকিলেও তাহা একেবারে ঐতিহাসিকত্ব-বর্জ্জিত নহে এবং আমরাও তাহাকে ভিত্তি করিয়াই স্থানীয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এক্ষণে [আমরা প্রথমেই 'ক্রনিকল'স্ এর বক্তব্যের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

প্রবন্ধকার ঐ প্রবন্ধটী নিম্নলিত ৪ খণ্ডে বিভাগ করিয়াছেন ঃ—

১। আদিম বাসী ও মল্লদের কথা
২। চন্দ্রকেতু রাজার সময়
৩। বীরভানু-বংশীয় চোহান রাজবংশ
৪। বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের আক্রমণ ও চন্দ্রকোণা-বিজয়।

১। প্রাচীনকালে চন্দ্রকোণার বর্ত্তমান ৺মল্লেশ্বর-মহাদেবের মন্দিরের সন্নিকটে মল্লবংশের প্রতিষ্ঠা ছিল। মন্দিরের উত্তরে তাহাদের মাটীর কেল্লার প্রাকার ও খাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মল্লবংশীয় রাজাদের মধ্যে কেবল একজনের পরিচয় পাওয়া যায়—তিনি খয়ের মল্ল। পূর্ব্বে এ স্থানকে লোকে মালা বলিত এবং মল্লরাজারা শৈব ছিলেন।

২। খয়ের মল্লের রাজত্বকালে চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজপুত সরদার অনেক সৈন্যসামন্ত লইয়া ৺পুরীধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বর্ত্তমান চন্দ্রকোণার চার মাইল পূর্ব্বে দেবগিরির জঙ্গলে ছাউনি করিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন এবং জঙ্গল কাটিয়া একটী পত্তনের প্রতিষ্ঠা করেন। এখন ঐ স্থানের নাম চাঁদা-মেটেনি—পূর্ব্বে নাম ছিল চন্দ্রা। অদূরবর্ত্তী মানার সমৃদ্ধির কথা ক্রমে ক্রমে তিনি শুনিয়া আপন বীরত্ব ও কৌশলের উপর নির্ভর করিয়া সদলবলে খয়ের মল্লকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করেন এবং মানার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া চন্দ্রকোণা রাখেন। খয়ের মল্ল রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পলায়ন করেন এবং উত্তরে ২৮ মাইল দূরে মল্লরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

খয়ের মল্লের রাজ্যলিপ্সা বাড়িতে থাকে এবং "বিশালা শিলাবতী" নদীর অপর পারে সমৃদ্ধিশালিনী জাড়া নগরের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। ওখানের রাজার নাম ছিল জর—প্রসিদ্ধ জরাসন্ধ-বংশীয় বলিয়া প্রবাদ। এখানেও চন্দ্রকেতুর প্রতাপ বিজয়লাভ করে। ইহাতে চন্দ্রকেতুর রাজ্যের পরিমাণ প্রায় ৮০ বর্গ মাইলে পরিণত হয়। ইহার পর পশ্চিমের বদ্বীপ বা বগ্ড়ি রাজ্যও তাঁহার করতলগত হয়।

চন্দ্রকোণার দক্ষিণে ব্রাহ্মণভূম পরগণা। পূর্ব্বে এখানে মাজি চোয়াড়দিগের রাজত্ব ছিল। ইহাদিগকেও তিনি পরাস্ত করিয়া উমাপতিদেব নামক জনৈক আগন্তুক ব্রাহ্মণকে ঐ রাজ্য দান করেন এবং স্বয়ম্ভুলিঙ্গ কামেশ্বরের অর্চ্চনার ভার দেন। ঐ কামেশ্বরের মন্দিরই প্রাচীন রাঢ়া দেউল বা হালের নেড়া দেউল। ব্রাহ্মণভূমের রাজাদের কুলপঞ্জিকানুসারে ৭৭২ শকে (৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে) উমাপতিদেব রাজা হন, সুতরাং চন্দ্রকেতুর আগমন তাহার পূর্ব্বেই হইয়াছিল। বিষ্ণুপুর রাজবংশের ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, ৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে আদিমল্ল বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন; সুতরাং চন্দ্রকেতুর সময় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আসিয়া পড়ে।

৩। কালক্রমে বীরভানুসিংহ নামক চোহান সরদার ৺পুরীধাম হইতে ফিরিবার পথে বর্ত্তমান ক্ষীরপানি গ্রামের

সন্নিকটে শ্যামদেবের মাঠে ছাউনি করিয়া থাকেন। তিনি চন্দ্রকেতুর-রাজ্য আক্রমণ করেন এবং বিনা রক্তপাতে চন্দ্রকোণা রাজ্য তাঁহার হস্তগত হয়; কারণ কেতু-বংশীয় তাৎকালিক-রাজা "জয়হরি" নামক পুষ্করিণীতে সবংশে প্রাণত্যাগ করেন।

এই ভানুবংশের দুইটী রাজার নাম ৺লালজীউ-মন্দিরের প্রস্তরফলকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে এইরূপ লেখা আছে—

শুভমস্তুঃ শকাব্দাঃ ১৫৭৭।

শাকেশ্বমণি বাণেন্দৌ বৈশাখে শুক্লপক্ষকে।
তৃতীয়ায়াং ভৃগুদিনে আরম্ভেস্য বভুব॥
হরিনারায়ণ ভূপস্য পত্নী শ্রীলক্ষ্মণাবতী।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রীত্যৈ নবরত্নমিদং দদৌ॥
রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দরসিক শ্রীবীরভানু বধূ খ্যাত।
শ্রীহরিভূপতেশ্চ বণিতা শ্রীসেন রায়াত্মজা।
মাতা শ্রীযুৎ মিত্রসেন নৃপতেবিখ্যাতকীর্ত্তে ক্ষিতৌ।
শ্রীনারায়ণ মল্লভূপ ভগিনী রম্যং দদৌ মন্দিরং॥
গিরিধারী পদাম্ভোজে নবরত্নমিদং শুভং।
নির্ম্মায় বহুযত্নেন সমর্পিতবতী মুদা॥
পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্ত্তী কুলদাস॥

ইংরেজি হিসাবে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বীরভানুর পুত্রবধূ মিত্রসেনের মাতা হরিনারায়ণের পত্নী শ্রীনারায়ণ মল্লরায়ের ভগ্নী রাণী লক্ষণাবতী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

৪। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচাঁদ বাহাদুর চন্দ্রকোণা-রাজ্য জয় করেন এবং এখনও ইহা বর্দ্ধমান রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত।

"ক্রনিকিলস্ অফ্ চন্দ্রকোণা" প্রবন্ধে আমরা মোটামুটী এরূপ একটী গল্প পাই। ইহা ব্যতীত ইহাতে তখনকার অন্যান্য কথাও অনেক আছে।

এখনকার চন্দ্রকোণা তখনকার কোন রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল? পুরাণে পাওয়া যায় মহর্ষি দীর্ঘতমার বরে বলির পাঁচ পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র; তাঁহারা স্বীয় নামে পাঁচটী রাজ্যের পত্তন করেন এবং পরে ঐ রাজ্যগুলি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। গৌড়ের ইতিহাস প্রথম খ(শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত) দেখা যায় "সুহ্মরাজ্য দ[ক্ষিণ রা]ঢ়ের প্রাচীন নাম। তমলুক বা তাম্রলিপ্তি প্রাচীন সুহ্মের অন্তর্গত তাম্রলিপ্তিরাজ্য হুগলী নদীর পশ্চিম হইতে উত্তরে বর্দ্ধমান ও কালনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুহ্মনগর তাম্রলিপ্তির নাম। বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলা প্রাচীন সুহ্মের অন্তর্গত।" এক্ষণে রাঢ়দেশ কাহাকে বলিত দেখা যাক। উক্ত গ্রন্থেই আছে—"রাঢ় দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। অজয়নদ রাঢ়কে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। 'দিগ্বিজয়' নামক গ্রন্থে এইরূপ সীমা আছে—

গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্ব্বতঃ।
দামোদরোত্তরে ভাগে রাঢ়দেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

দিগ্বিজয় প্রকাশ মোগল রাজত্ব কালে রচিত হইয়াছিল।"

"মেদিনীপুরের ইতিহাসে" (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়-প্রণীত) দেখি, "পরবর্ত্তীকালে সুহ্ম বা তাম্রলিপ্তি-রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া গেল। উহার কিয়দংশ উৎকলের সহিত মিলিত এবং অবশিষ্টাংশ রাঢ়দেশ নামে পরিচিত হয়। সেই সময় রাঢ়দেশ বলিতে প্রায় সমস্ত পশ্চিম বঙ্গকেই বুঝাইত। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, "সুহ্মাঃ—রাঢ়া। * বর্ত্তমান হুগলী ও হাবড়া জেলা এবং মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইত। উৎকলের সীমা উত্তরে রূপনারায়ণ নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার প্রায় সমস্ত ভূভাগই উৎকলের অন্তর্ভুক্ত হয়। গৌড়ের ইতিহাস প্রথমখণ্ডে আরও লিখিত আছে যে, "পূর্ব্বে জলাঙ্গী নদী, পশ্চিমে রাজমহল পর্ব্বত, উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে দামোদর নদ—রাঢ়ের অন্তর্নিবিষ্ট।"

১০২১ ও ১০২৩ খ্রীষ্টাব্দের রাজেন্দ্র চোল দেব উত্তর ও দক্ষিণরাঢ় বিজয় করেন। মান্দারের অধিপতি কণ্ঠশূর তখন দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি বলিয়া কথিত আছে এবং রাজেন্দ্র চোলের দ্বারা ইনিই পরাজিত হন। এই মান্দারকে বর্ত্তমানে গড় মান্দারণ বলে এবং ইহা এখন হুগলী জেলায় সামিল।

পাঠান রাজত্বকালে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের সেনাপতি গাজি ইস্মাইল মান্দারণ দখল করেন; পরবর্ত্তী পাঠান যুগে

ক্রমে ক্রমে তাম্রলিপি পর্য্যন্ত পাঠান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। আকবরের সময়ে রাজা টোডরমল্লের বিভাগানুসারে সরকার মান্দারণ অর্দ্ধবৃত্তাকারে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নগর হইতে আরম্ভ হইয়া বর্দ্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ, হুগলী জেলার জাহানাবাদ এবং হাওড়া জেলার পশ্চিমাংশ হইয়া মেদিনীপুর বিতুরা ও মহিষাদল পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান সুজা সুবা বাংলার রাজস্বের এক হিসাব প্রস্তুত করেন। তাহাতেই বোধ হয় প্রথম রীতিমতভাবে চন্দ্রকোণার নাম লিখিত-পঠিতের মধ্যে আসিয়া পড়ে। মহাল হাভেলি মন্দারণের অন্তর্গত বরদা ও চন্দ্রকোণা ভূভাগ সরকার পেসকোশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। "মেদিনীপুরের ইতিহাসে" দেখি, সরকার পেসকোশ কোন সীমানির্দ্দিষ্ট স্থানকে বুঝাইত না। বঙ্গের সীমান্তপ্রদেশের স্বাধীন হিন্দুরাজারা যখন মুসলমান-রাজ্যের নিকট পরাজিত হইতেন, তখন তাহারা কিঞ্চিৎ উপঢৌকন, কখন বা কিঞ্চিৎ নজর পেস্‌কোশ্ স্বীকার করিয়া অব্যাহতি পাইতেন। সুবা বাংলায় তৎকালে বিষ্ণুপুর, চন্দ্রকোণা, পঞ্চকোট প্রভৃতি স্থানে এইরূপ যে সকল জমিদার ছিলেন সুলতান সুজা সেই সকল জমিদারিকে সরকার পেস্‌কোশের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। সরকার মান্দারণ ও সরকার পেস্‌কোশের কিয়দংশ বর্ত্তমান ঘাটাল মহকুমা।

পূর্ব্বোক্ত উক্তি হইতে ইহা অনেকটা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হইবে না যে, পুরাতন সুহ্ম, উৎকল বা রাঢ় রাজ্যের অন্তর্গত চন্দ্রকোণা নগর, এমন কি বর্ত্তমান চন্দ্রকোণা পরগণাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। বহু পূর্ব্বে অত্যন্ত স্বাধীনভাবে এবং অনতিপূর্ব্বে অর্দ্ধ স্বাধীনভাবে এই পরগণাটী ছিল।

সে সময়ে ইহার একটী স্বতন্ত্র নাম ছিল। আমরা দেখিয়াছি চন্দ্রকোণার নাম রাজা চন্দ্রকেতুর পূর্ব্বে মানা ছিল। পরে মানা নামে একটী পরগণারও সৃষ্টি হয়। চন্দ্রকোণার পুরাতন ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে করিতে একটী—নাগরী অক্ষরে লেখা পত্র হস্তগত হয়। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন এবং লিপিখানির সময়ও নির্দ্দেশ করেন। ইহা ১০৭৬ সালে চন্দ্রকোণার "রাজা মিত্রসেনজীকর্ত্তৃক শ্রীরঘুনাথ চক্রবর্ত্তী পৌরাণীক জা বেটা শ্রীগোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী"কে দেওয়া হয়। ইহাতে পরগণা মানা লিখিত আছে। সুতরাং অনতিপূর্ব্বে এদেশকে মানা বলিত। এখানে এখনও কিংবদন্তি আছে যে ঈশ্বর মল্লেশ্বর মহাদেবের উত্তর দিকে যে মৃন্ময় গড়ের প্রাকারাদির চিহ্ন পাওয়া যায় তাহা মানাদের গড় ছিল। মানারা খুব যোদ্ধা ও ছিল। তাহারা যে কি জাতি বা কোন দেশীয় ছিল তাহা এখনও জানা যায় নাই। এদিকে কবি মুকুন্দরাম তাঁহার 'চণ্ডী-মঙ্গলে' ব্রাহ্মণভূমির রাজধানী আড়রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই আড়রা শব্দ অরাঢ়ার অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। রাঢ়ের পাশে অরঢ়ার অবস্থিতি আশ্চর্য্য নয়। ব্রাহ্মণভূমির শেষ দক্ষিণাংশে নেড়া দেউল বা রাঢ়া দেউল বলিয়া শিব-মন্দির আছে। রাঢ়ের শেষ সীমা অরাঢ়েরও শেষ সীমা আবার তাৎকালিক উড়িষ্যারও শেষ উত্তর সীমা। এই ত্রিসীমায় শিবমন্দির স্থাপন বোধ হয় হিন্দুযুগের অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান করিয়া দিয়াছিল; সুতরাং সেকালেও এ-দেশকে অরাঢ় বলিত।

আরও একটী কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রকোণা-প্রদেশ একসময় ভানদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। দেশাবলী বিবৃতি নামক একটি পুঁথিতে ইহা দেখা যায়। পুঁথিখানি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কার করেন এবং তিনি অনুমান করেন ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জগমোহন পণ্ডিতের রচনা। ইহাতে তখনকার কতকগুলি দেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ভান দেশের সংস্থান তাহাতে এরূপ দেখা যায়—

> কংসবত্যা হি সরিতঃ শিলাবত্যা হি ভূমিপ।
> উভয়োর্ম্মধ্যবর্ত্তী চ ভানকো বিশ্রুতো ভুবি॥
> বকদ্বীপাৎ পূর্ব্বভাগে মণ্ডলঘট্টস্ত পশ্চিমে।
> ত্রয়োদশ যোজনৈশ্চ মিতোহি ভানদেশকঃ॥

কাংসাবতী ও শিলাবতী নদীদ্বয় এবং বকদ্বীপ (বগড়ি) ও মণ্ডলঘাট এই সীমান্তর্ব্বর্ত্তী স্থানকে ভানদেশ বলিত। চন্দ্রকোণার ভানবংশীয় রাজাগণ অনেকদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নামেই হয়তো তাঁহাদের রাজত্ব ভানদেশ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া থাকিবে। 'মেদিনীপুরের ইতিহাসে' দেখি—"ভানদেশে তিনটী প্রধান নগর ছিল। চন্দ্রকোণা, ভূরিশ্রেষ্ঠ ও বলিয়ার।" যদি ভান রাজাদের রাজত্ব ভানদেশ বলিয়া ধরা যায় এবং ভূরিশ্রেষ্ঠ (বর্ত্তমান

ভুরসুট) ও বলিয়ার ঐ দেশের অন্তর্গত হয় তবে ভানদেশের সীমা বহুদূর বিস্তৃত ছিল সন্দেহ নাই।

উপসংহারে আমরা এই কথা বলিতে চাই যে, চন্দ্রকোণা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, উৎকল প্রভৃতি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কখনও ছিল না। এমন কি পাঠান বা মোগল রাজত্বেও ইহা স্বাধীন বা অর্দ্ধস্বাধীন অবস্থায় ইহার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। এই প্রদেশের প্রাচীন কীর্ত্তি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজবংশের উত্থান ও পতন এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলির সহিত ব্যবহার ইত্যাদি অনেক আলোচনা করিবার আছে। আমাদের এই কার্য্যে চন্দ্রকোণা মিউনিসিপ্যালিটির বর্ত্তমান চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত জানকীপদ দত্ত ও শ্রীমান্ রাধারমণ সিংহের সাহায্য ও সাহচর্য্যে বিশেষ উপকৃত হইতেছি এবং সেখানের অন্যান্য সহৃদয় ভদ্র জনসাধারণও অনুসন্ধান কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন; সে জন্য তাঁহারা যথেষ্ট ধন্যবাদই।

ব্যবসা বাণিজ্য

জীবনবীমার সার্থকতা
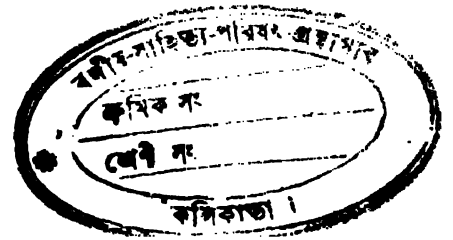
শ্রীমণীন্দ্র মৌলিক

(সম্পাদক, ইন্সিওরেন্স এণ্ড ফিন্যান্স্ ইয়ারবুক এণ্ড ডিরেক্টরী)

অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানবজাতি সঞ্চয়ের আদর্শ ও পথ গ্রহণ করিয়াছে। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে, দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই সঞ্চয়ের পক্ষপাতী। বার্ষিক আয়ের অতি ক্ষুদ্র অংশও সঞ্চয় করিয়া রাখিলে ঐ সঞ্চিত অর্থদ্বারা বিপদের দিনে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়।

মানুষের আয়ুষ্কাল অনিশ্চিত, উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পোষ্যবর্গ অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। কি ভাবে তাহাদের দৈনন্দিন জীবন-ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে, তাহা তাহারা ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না। ভারতে একান্নবর্ত্তী পরিবারের সংখ্যা বেশী, কিন্তু, আজকাল একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত পরিবারবর্গের মধ্যে হৃদ্যতার বন্ধন অনেকটা শ্লথ হইয়া পড়ায় নিজ নিজ স্ত্রী, পুত্র-কন্যা যাহাতে নিজের অবর্ত্তমানে পরিজনবর্গের অনাদরে দুরবস্থায় পতিত না হয়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সকলের পক্ষেই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। নিজের অবর্ত্তমানে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যাহাতে কাহারও গলগ্রহ না হয় তৎপ্রতি সকলেরই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। তাহাতে ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগ দূর হইবে, দেশেরও অনেকাংশে শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

একমাত্র জীবনবীমার দ্বারা বার্দ্ধক্যের বা নিজের অবর্ত্তমানে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান করা যায়; বীমাকারী সামান্য পরিমাণ অর্থ বার্ষিক প্রদান করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা সঞ্চয় করিতে পারেন; বার্দ্ধক্যে ঐ অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারেন;—পুত্র পরিজনের গলগ্রহ হইয়া থাকার জ্বালা ও লজ্জা তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না। অন্যদিকে, অসময়ে নিজের মৃত্যু হইলে আত্মীয়-স্বজন ঐ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বীমার টাকা পাইবে জানিতে পারিয়া মৃত্যুকালেও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে চিন্তা শেষ নিঃশ্বাস-পতনের পূর্ব্বেও তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিবে না।—জীবনবীমা সঞ্চয় ও স্বস্তির সমন্বয় সাধন করে।

ধনী ব্যক্তিগণের নামও চিত্রগুপ্তের হিসাবে লিখিত হয়; কাজেই, অসময়ে সাহায্য করিতে ও অতর্কিত বিপদে বাধা

দিতে সক্ষম জীবনবীমাকে তাঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন না।

জীবনবীমার বহুল প্রসারে সমগ্র সভ্য-জগতে পারিবারিক অনেক দুঃখ-কষ্টের লাঘব হইয়াছে। ভারতবর্ষ যে জীবনবীমা-ক্ষেত্রে এখনও পিছনে পড়িয়া আছে, সে কথা আমি বলিতেছি না; কিন্তু আমাদের দেশে বীমা-ব্যবসায় অন্যান্য সভ্যদেশে ঐ ব্যবসায়ের মত প্রসারতা লাভ করিতে পারে নাই।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে শুধু বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি ব্যবসায় করিত; আজ এদেশে কোম্পানীর অভাব নাই। কিন্তু, দেশীয় কোম্পানীতে বীমা করা যে সম্পূর্ণ নিরাপদ, উপযুক্ত প্রচারের অভাবে আমাদের দেশবাসী এখনও তাহা বুঝিতে পারে নাই। অর্থব্যয়ের দ্বারা এই প্রচার কার্য্য সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না; ভারতীয় বীমা-ব্যবসায়ের ব্যক্তিগণ প্রভূত পরিশ্রম এবং দেশবাসী স্বদেশী কোম্পানীর প্রতি সহানুভূতি না দেখাইলে ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে না;

বীমা কোম্পানীগুলি আজ-কাল বীমাকারীকে যে সব সুবিধা প্রদান করিতেছে তাহা প্রত্যেককে বুঝাইয়া দিতে হইবে; নতুবা আমাদের মত গতানুগতিক ধারার অনুসরণকারী জাতি জীবনবীমার সুবিধা ও সুযোগ-সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিবে। পণ-পরিশোধ বীমাপত্র-প্রত্যর্পণ মূল্য, স্বতশ্চল নিয়ম, প্রসারিত বীমা, অকর্ম্মণ্যতা-হেতু বীমার টাকা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের ব্যবস্থা—ইত্যাদি সুবিধাগুলি প্রত্যেককে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

শুধু ব্যক্তিগত ও পরিবারিক জীবনে নহে—ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও বীমার উপকারিতা অত্যন্ত বেশী। ব্যবসায়ীকে অনেক সময় কোন কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিতে হয়; ঐ কর্ম্মচারীর অভিজ্ঞতা ও সততার উপর অনেক সময় উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইলে ব্যবসায়ীকে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এ-ক্ষেত্রে, ঐ কর্ম্মচারীর জীবনবীমা করিয়া অনেকটা নির্ভয়ে ব্যবসায় করিতে পারেন; মৃত্যুর করাল হস্ত ঐ কর্ম্মচারীকে ছিনাইয়া লইয়া গেলে তাঁহার অভাবনিবন্ধন যে ক্ষতি হইবে, তাহার অন্ততঃ একটা অংশ বীমা কোম্পানী প্রদান করিবে। ব্যবসায়ের অংশীদারগণও অনেক সময় যৌথ বীমা (জয়েণ্ট লাইফ ইন্‌সিওরেন্স) করিয়া থাকেন। ভবিষ্যতে ব্যবসায়ী মহলে বীমার বহুল প্রচার ঘটিলে দেশে আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হইবে।

মেয়েদের জীবনবীমা

ডাঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

(নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী, কলিকাতা-শাখার জীবন-বীমা-বিভাগের সেক্রেটরী)

নারী ও পুরুষের মধ্যে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা আজকাল আমরা প্রায়ই শুনিতেছি; এ সময়ে বীমাকারী পুরুষের তুলনায় বীমাকারিণী রমণীর জীবনে বিপদের সম্ভাবনা কতখানি তাহার আলোচনা উপভোগ্য হইতে পারে। সাধারণতঃ অতিরিক্ত প্রিমিয়ম (বীমার বার্ষিক চাঁদা) না লইয়া ভারতীয় কোম্পানিগুলি ভারতীয় রমণীর জীবনবীমা করে না। পাশ্চাত্যদেশে বীমা-কোম্পানিগুলি রমণীর জীবনবীমা করিতে বিশেষ দ্বিধা বোধ না করিলেও এদেশে ভারতীয় রমণীর জীবনবীমা করিতে ভারতীয় কোম্পানিগুলি বিশেষ দ্বিধা বোধ করে। এ-সম্পর্কে আমরা আমাদের গতানুগতিকতা এখনও পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।

রমণীর জীবনবীমা করায় কোম্পানিকে কিন্তু বাস্তবিকই কোন অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় কি? রমণীর জীবনে বিপদ বেশী—এইরূপ একটা ভুল ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে; সেইজন্যই কি আমরা রমণীর জীবনবীমার ইতস্ততঃ করি? ইহার পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত আছে?

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কয়জন বিশিষ্ট চিকিৎসক বিভিন্ন বয়সে নারী ও পুরুষের মৃত্যুহার সম্পর্কে ধীরভাবে অনুশীলন ও আলোচনা করিয়া অবশেষে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "পুরুষের জীবনবীমা করায় কোম্পানির বিপদ যতটুকু, রমণীর জীবনবীমা করায় ও বিপদ প্রায় ততটুকু।"

১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিপার্থ্য নামক একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক পুরুষ ও রমণীর মৃত্যু-হার-সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা

করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—"যে কোন বয়সের নারী সমবয়সী পুরুষের অপেক্ষা বেশীকাল বাঁচিবে বলিয়া আশা করা যায়।" তিনি আরও বলিতেছেন,—"রমণী পুরুষের অপেক্ষা দীর্ঘকাল বাঁচে; আবার বিবাহিতা রমণী অবিবাহিতা বা স্বামিহীনা রমণী অপেক্ষা বেশীদিন বাঁচিয়া থাকে।"

১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ হেসান প্রোক্ত-মন্তব্য অনুমোদন করিয়া ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন,—

(১) পুরুষ সাধারণতঃ রমণার তুলনায় অধিকতর পরিমাণে মাদকদ্রব্য-সেবী।

(২) রমণীর তুলনায় পুরুষকে অনেক বেশী দুঃখ কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়।

ইংলণ্ডে "ঈগল এণ্ড এম্পায়ার" বীমা কোম্পানী ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রস্পেকটাস প্রকাশ করেন তাহাতে লিখিত হইয়াছিল যে, রমণিগণ সাধারণতঃ পুরুষের অপেক্ষা বেশী বাঁচে বলিয়া পুরুষের তুলনায় রমণিগণের বীমার প্রিমিয়মের হার কমাইয়া দেওয়া হইল। নিম্নে আমরা পুরুষ ও রমণীর বীমা-সম্পর্কে প্রিমিয়মের তালিকা উদ্ধৃত করিতেছি:—

আজীবন বীমা—১০০ পাউণ্ড

বার্ষিক প্রিমিয়াম

বয়স	পুরুষ			রমণী		
	পাঃ	শিঃ	পেঃ	পাঃ	শিঃ	পেঃ
১০	১	১২	৭	১	৮	১
১৫	১	১৭	৬	১	১২	—
২০	২	২	৬	১	১৫	১
২৫	২	৫	৬	১	১৮	৯
৩০	২	৯	১০	২	৩	২
৩৫	২	১৬	০	২	৮	৭
৪০	৩	৪	৪	২	১৫	—
৪৫	৩	১৫	৮	৩	৩	৪
৫০	৪	১২	৪	৩	১৫	০
৫৫	৫	১৩	০	৪	১১	৮
৬০	৬	১৮	২	৫	১৪	৭

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সরকারী একচুয়ারি মিঃ জন ফিনল্যাসন পার্লামেণ্টের সম্মুখে উত্থাপিত এক রিপোর্টে বলেন,—"১২ বৎসরের নিম্নতন বা ৮৫ বৎসরের ঊর্দ্ধতন পুরুষ ও রমণীর মধ্যে মৃত্যুহারের তারতম্য নির্দ্ধারিত হয় নাই, কিন্তু ১২ হইতে ৮৫ বৎসর বয়সের মধ্যে পুরুষের তুলনায় রমণীর জীবন অনেকটা নিরাপদ।"

"অনেকে মনে করেন যে, সন্তান-ধারণে রমণীকে অনেকটা বিপদ বহন করিতে হয়; কিন্তু, কার্য্যতঃ দেখা গিয়াছে যে, অবিবাহিতা বা বিধবা রমণীর তুলনায় সধবা রমণীর মধ্যে মৃত্যু হার বেশী নহে।"

ইংলণ্ড, মার্কিণ ও জার্ম্মেণীতে পুরুষের সমান প্রিমিয়মে রমণীর জীবনবীমা হইতেছে; আমাদের দেশে ও নারী শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জীবন বীমায় রমণীকে সমান সুবিধা দিতে হইবে। অদূর ভবিষ্যতে রমণার জীবন-বীমা করার জন্য রমণিগণই যে বীমা কোম্পানী স্থাপন করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই, অদূরবর্ত্তী সেই দিনের অপেক্ষায় না থাকিয়া আমাদের দেশে রমণিগণের জীবনে বিপদ কতটুকু তাহা নির্দ্ধারণের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। *

বীমা ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

কয়েক বৎসর কাল যাবত নিদারুণ অর্থসঙ্কটে ভারতীয় বীমা-ব্যবসায় অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। চারিদিকে আর্থিক অনাটন না থাকিলে এই কয়বৎসরে বিভিন্ন বীমা-কোম্পানী অনেক বেশী টাকার কাজ সংগ্রহ করিতে পারিতেন,—একমাত্র অর্থসঙ্কট ও রাজনীতিক অনিশ্চয়তার জন্য বীমা কোম্পানীগুলি আশানুরূপ কার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না।

রাজনীতি ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা সর্ব্ববিধ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতিকর; ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে গত কয়বৎসর যাবত একটা অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিয়াছে; তাহার ফলে, ব্যবসায়িগণ সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে কালযাপন করিতেছে; নিশ্চিন্ত মনে

* মূল ইংরেজী প্রবন্ধটী "ইন্সিওরেন্স ও ফিনান্স রিভিউ" ও "ইন্সিওরেন্স ওয়ার্ল্ড" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহারা কোন ব্যবসায় করিতে পারিতেছে না বা নিজ নিজ ব্যবসায়ের উন্নতি করার জন্ত বেশী টাকা খাটাইতেও সাহসী হইতেছে না।

আমাদের দেশে চাকুরীজীবী ব্যক্তিগণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় জীবন বীমা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান দুর্ব্বৎসরে কখন যে কাহার চাকুরী যাইবে তাহা বলা যায় না; ইতিমধ্যেই অনেকের চাকুরী গিয়াছে; অবশিষ্ট সকলের চাকুরী না গেলেও বেতন হ্রাস হইয়াছে।

সাধারণ চাকুরীজীবী ভারতবাসী কায়ক্লেশে দিনযাপন করে; সংসারের বিবিধ ব্যয় বহন করিয়া তাহাদের হাতে মাসের শেষে একটা পয়সাও থাকে না; অনেকে আবার কাবুলীওয়ালার বা আফিসে দরোয়ানের নিকট হইতে অত্যধিক চড়া সুদে টাকা ধার করিয়া অকস্মাৎ প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করেন। "নুন আনতে পান্তা ফুরায়"—যাহাদের অবস্থা, তাহারা নানাভাবে অসুবিধা ভোগ করিয়া বীমার প্রিমিয়ম প্রদান করে; বর্ত্তমান বৎসরে বেতন কমিয়া যাওয়ায় কি ভাবে প্রিমিয়মের টাকা নিয়মিত-ভাবে প্রদান করিবে ইহাই তাহাদের নিকট বড় সমস্যা। নূতন বীমা করা দূরের কথা, পুরাতন বীমার প্রিমিয়াম প্রদান করাই অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে; ইহার ফলে অনেকে প্রিমিয়াম না দেওয়ায় বহু বীমা পত্র বাতিল হইয়া গিয়াছে; অনেকে আবার প্রিমিয়ম দিতে অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়া বীমার পরিমাণ কমাইয়া নিয়াছে; অনেকে আবার বীমা-পত্র গচ্ছিত রাখিয়া কোম্পানীর তহবিল হইতে টাকা ঋণ করিতেছে।

দেশের সর্ব্বত্র নিদারুণ অর্থকষ্ট দেখা না দিলে অবস্থা আজ এরূপ শোচনীয় হইত না, ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির কাজ যেভাবে কমিয়া গিয়াছে সেভাবে কমিতে পারিত না। একমাত্র অর্থসঙ্কটই দেশে বর্ত্তমান দুরবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, এবং বীমা ব্যবসায়ে তাহার প্রতিক্রিয়া তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে।

স্বদেশী-আন্দোলন প্রসারতা লাভ করায় দেশীয় বীমা কোম্পানীগুলি বর্ত্তমানে তত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, বার্ষিক মোট বীমার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে সত্য;—কিন্তু, বিদেশী কোম্পানীগুলি ইতিপূর্ব্বে প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকার নূতন কাজ সংগ্রহ করিত,—এক্ষণে তাহাদের কাজ শতকরা ৮০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে এবং এই ৮০ ভাগের একটা অংশ স্বদেশী বীমা কোম্পানীগুলি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯৩[illegible] সালে সমস্ত বিদেশী কোম্পানী ভারতে যত টাকার নূতন বীমা সংগ্রহ করিয়াছে, মাত্র একটা ভারতীয় কোম্পানী তদপেক্ষা বেশী টাকার নূতন বীমা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অতীব দুঃখের বিষয়, জাতির হিতসাধনোদ্দেশ্যে বীমার টাকা যে ভাবে খাটান উচিত অধিকাংশ স্বদেশী কোম্পানী সেইভাবে খুব বেশী টাকা খাটায় না। কোন কোন স্বাধীন দেশে স্বদেশী বীমা কোম্পানী তাহাদের মোট তহবিলের শতকরা ৬৫৲ টাকা জাতীয় শিল্পের উন্নতি সাধনোদ্দেশ্যে খাটাইয়া থাকে—কিন্তু, ভারতীয় কোম্পানী-গুলি মোট তহবিলের শতকরা ৫ ভাগ মাত্র এই ভাবে বিনিয়োগ করে। জাতীয় শিল্পোন্নতি সাধন করে বীমা-কোম্পানীগুলি আর একটু মনোযোগ দিলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে।

ইন্সিওরেন্স য়্যাণ্ড ফিন্যান্স ইয়ার বুক
(১৯৩০-৩১)

—শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক সম্পাদিত ও কলিকাতা, ১৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট হইতে রায়চৌধুরী য়্যাণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।—মূল্য তিন টাকা মাত্র।

জীবনবীমা-সম্পর্কে বিবিধ তথ্যপূর্ণ একখানা নির্ভরযোগ্য পুস্তকের অভাবে বীমাসংশ্লিষ্ট সকলেই এতদিন বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেন। এতদিনে সেই অভাব দূর হইয়াছে। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে শ্রীমান্ মণীন্দ্র মৌলিক বিশেষ শ্রমসহকারে বীমা-সম্পর্কিত নানাবিধ উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া উপরোক্ত পুস্তক খানি রচনা করিয়াছেন।

আটটি অধ্যায়ে সম্পাদক পুস্তক খানিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন। জীবনবীমা-সম্পর্কে প্রথিতযশ ব্যক্তিগণের মতামত, বীমা-ব্যবসায়ে চলতি কথাগুলির তালিকা ও তাহার ভাবার্থ, ভারতীয় বীমা-কোম্পানীগুলির হিসাব কয়েকটী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মেয়েদের জীবনবীমা সম্পর্কে সম্পাদক মহাশয় খুঁটি নাটি অনেক কথা আলোচনা করিয়াছেন। যে সমস্ত দেশী ও বিলাতী কোম্পানী কারবার গুটাইয়াছে, তাহার একটা বিস্তৃত তালিকাও পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বীমা-সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের সমাবেশে এই পুস্তক খানি এজেন্টগণের নিকটে অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

ডাঃ শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র রায়ের আন্তরিক চেষ্টা ব্যতীত এই মূল্যবান পুস্তকখানি প্রকাশিত হইতে পারিত না। বীমা-ব্যবসায়-সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের নিকটই তিনি ধন্যবাদার্হ।

কুমুদের কীর্ত্তি

(গল্প)

শ্রীতারাপদ মজুমদার

রাঁচি এক্‌স্‌প্রেস্‌ তখন হাওড়া ষ্টেশন হইতে ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে, মধ্যে মধ্যে ধোঁয়া ছাড়িয়া গর্জ্জনও করিতেছে কম নয়, এমন সময়ে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সম্মুখেই একখানি থার্ড ক্লাসের গাড়ী দেখিয়া উঠিয়া পড়িলাম। গাড়ীখানির ভিতর দেখি, বাঙ্গালী একজনও নাই, যেন একমাত্র বাঙ্গালীকেই বর্জ্জন করিয়া ভারতের প্রায় সকল জাতিরই মিলন-ক্ষেত্র হইয়াছে।

কোনক্রমে এক কোণে একটু বসিবার উদ্যোগ করিতেই চারি হাত পরিমিত একজন কাবুলী তাহার জুতা-সমেত শ্রীচরণ দুইখানি সেস্থানে তুলিয়া দিয়া চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিল, 'ইধার নেই বাবু, মেরা দোস্ত্‌ আয়ে গা।'

তাহার সহিত বিবাদ করিব কি না ভাবিতেছি, এমন সময় একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সস্ত্রীক আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একটু ভরসা হইল। কাবুলির সহিত কিছুক্ষণ বাক-বিতণ্ডা করিয়া জায়গাটা অধিকার করিলাম। কিন্তু সেখানে বসিবে কে? আমার অধ্যবসায়ের ফলে স্থানটী অধিকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা হইলে এই ভদ্রমহিলাটীকে দাঁড়াইয়া যাইতে হয়। ভদ্রলোকটীর দিকে চাহিয়া বলিলাম, 'ওঁকে এখানে বসিয়ে দিন, তারপর যা' হয়, করা যাচ্ছে।'

ভদ্রলোকটী একটু ইতস্ততঃ করিয়া, অন্য উপায়ও কিছু না দেখিয়া অবগুণ্ঠিতা মহিলাটীকে সেইখানে বসাইয়া দিলেন। আমি দুই বেঞ্চের মধ্যস্থিত একটী 'লাগেজের উপর কোনওরূপে দেহভার ন্যস্ত করিলাম। তিনিও কতকটা একটা ট্রাঙ্কের উপর ও কতকটা আমার জানুর উপর ভর দিয়া অতিকষ্টে বসিয়া পড়িলেন।

গাড়ী ততক্ষণে ছাড়িয়া দিয়াছে। এক্‌সপ্রেস্‌ গাড়ী, ভীষণ বেগে ছুটিতেছে। ওদিক্‌কার কোণে একজন হিন্দুস্থানী একখানি হিন্দী "বিশ্বামিত্র" পড়িতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে ঈষৎ হাসিতেছিল, আমি বোধ হয় তাহার সুবর্ণমণ্ডিত দন্তপংক্তির সৌন্দর্য্যেই আকৃষ্ট হইয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম। কাগজখানি পড়িতে পড়িতে হঠাৎ সে মুখখানি তুলিয়া পাশের লোকটীকে বলিল; 'ভেইয়া দেখিয়ে দেখিয়ে, মজাদার খবর দেখিয়ে, একঠো বাংগালী দোসরাকো জরু লেকর্‌ ভাগ্‌ গিয়া হায়। পুলিস্‌ উন্‌কো পত্তাভি নিকাল্‌নে নেই শক্‌তা হায়।"

পাশের ভদ্রলোকটী, এখন তাঁহাকে আমার সহযাত্রীই বলব, হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, 'বেটাচ্ছেলের ফূর্ত্তিটা দেখুন একবার, বাঙ্গালীর একটা কেলেঙ্কারীর খবর পেয়েছে কি না?'

আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, এ ব্যাপারটা তো সব দেশেই রয়েছে, তবে আজকাল আমাদের দেশেই যেন একটু বেশি, অন্ততঃ আমাদের চোখে তাই ঠেকে,...আপনি যাবেন কদ্দূর?'

"আমি রাঁচি পর্য্যন্ত যাব, সেখানকার রেল্‌ওয়ের 'বুকিং' অফিসের আমি একজন 'ক্লার্ক,'...আপনি?"

'ভালই হ'ল, এই লম্বা রাস্তাটা একা একা যেতে কি বিড়ম্বনাটাই না হোত; দেখছেন তো? এই সব পাগড়ীর মধ্যে চাপা পড়ে যেতাম আর কি? আমিও আপনার দলের। একেবারে রাঁচি। ওখানে আমার দাদা 'ম্যাসাইলামের ডাক্তার। তাঁরই কাছে দিন কয়েক বেড়াতে যাচ্ছি।'

'বেশ ভালই তো, গল্প করতে করতে দিব্যি যাওয়া যাবে 'খন' বলিয়া তিনি পকেট হইতে বিড়ির কৌটাটা বাহির করিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন। আমি ইংরেজদে

অনুকরণে সেটা অঙ্গীকার করিয়া পকেট হইতে নস্যের ডিবা বাহির করিলাম।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'ও তা' হ'লে চলে একটা, একেবারে নিরিমিষ ন'ন্।'

ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, 'আজ্ঞে না।'

গাড়ীখানি অতিরিক্ত বেগে যাইতেছিল বলিয়া দুলিতেছিল, তন্দ্রাতুর একটী মান্দ্রাজীর মস্তক হইতে পাগ্‌ড়ী খসিয়া পড়িল, এবং সে চমকিয়া উঠিয়া ভূলুণ্ঠিত শিরস্ত্রাণটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার মাতৃভাষায় কি যে বলিয়া উঠিল তাহার একবিন্দুও বুঝিতে পারিলাম না। তাহার মুখাবয়ব দেখিয়া বুঝিলাম, মস্তকাবরণটীর পতনের জন্য সে আদৌ সন্তুষ্ট হয় নাই; কারণ গাড়ীর মধ্যে কে জল ফেলিয়াছিল এবং পাগ্‌ড়ীটী ধূলা ও জলে মাখামাখি হইয়া কিম্ভূতকিমাকার হইয়া পড়িয়াছে। মান্দ্রাজীর পাগড়ীর দুর্গতি দেখিয়া আমার পার্শ্বস্থিতা সেই মহিলাটী ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিলেন।

কোলাঘাট ষ্টেশনের আগে আসিয়া আমাদের বাষ্পীয় রথ মন্থরগতি হইল এবং ধীরে ধীরে থামিয়া গেল। একজন উড়িয়া,—চেহারা দেখিয়া মনে হয়, ভৃত্য শ্রেণীর লোক,—ধীরে ধীরে সেস্থানে নামিয়া পড়িল। জনৈক মাড়োয়াড়ী তাহার সঙ্গীকে এক ঠেলা দিয়া দন্তবিকাশ করিয়া বলিল, 'ভাগ্‌তা ক্যায়্‌সা দেখো।'

আমিও উড়িয়াটাকে লক্ষ্য করিয়া আমার সহযাত্রীকে বলিলাম, 'দেখুন রেল্ কোম্পানীকে কেমন ফাঁকি দিচ্ছে।'

এটা বোধ হয় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার,—ভদ্রলোকটী কোন উত্তর করিলেন না।

চলন্ত ট্রেণে অনেক সময় অনেকের বেশ ঘুম পায়। জানালার ফাঁক দিয়া চমৎকার হাওয়া আসিতেছিল, কখন তন্দ্রা আসিয়াছিল, টের পাই নাই। গোলমালে ঘুম ছুটিয়া গেল, দেখি, খড়্গপুর ষ্টেশন। আমার সঙ্গীটী উঠিয়া আমায় বলিলেন, 'একটু দেখ্‌বেন এঁকে, আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আসি, বেশি দূর নয়, ঐ 'ওভার ব্রিজ্'টার পরেই,—ট্রাফিক্ সেটেল্‌মেণ্টে, ট্রেণ এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াবে।'

আমি বলিলাম, 'স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন।'...মহিলাটী জানালায় মুখ বাহির করিয়া বোধ হয় ষ্টেশনের জনতার পাদবিক্ষেপ-ভঙ্গী দেখিতে লাগিলেন ও ফিরিওয়ালার ডাকের তারতম্য ও বিশেষত্বের দিকে মনোযোগ দিলেন।

সম্মুখের বেঞ্চের একটী হিন্দুস্থানী বাম হস্তের তালুতে 'শুখা' রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে তাহাতে এক তালি লাগাইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'আপ্ কাঁহাতক্ যাইয়েগা বাবু।'

আমি উত্তরে বলিলাম, 'রাঁচি,...আপ্?'

সে আরম্ভ করিল, 'হাম্‌ভি রাঁচি যায়েগা বাবুজি, হুঁইসে হামারা একঠো লেড়্‌কা কল্‌কত্তামে ঘিউ চালান্ লাগাতা হ্যায়। গায় রোজ হো গিয়া হ্যায়, ঘিউ ভি আয়া নেই, লেড়্‌কাকো পাশ্‌সে কুছ জবাব ভি আয়া নেই, উসি-ওয়াস্তে হাম্ এক দফে হুঁই পর যাতা হ্যায়,... মুল্লুকমে হামারো একঠো ..।

হিন্দুস্থানীটী তাহার ব্যবসায়ের কথা শেষ করিয়া, বোধ হয় তাহার সংসারের কথা পাড়িতেছিল, কিন্তু আমার অত ধৈর্য্য ছিল না, আমি মুখ ফিরাইয়া ডাকিলাম, এই পান। পানওয়ালা কাছে আসিয়া বলিল, 'জল্‌দি পৈসা নিকালাইয়ে বাবুজি, গাড়ী ছোড় দিয়া হ্যায়্।'

তাড়াতাড়ি একটী পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম, সেও ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে আমার হাতে পান দিয়া চলিয়া গেল। কলাপাতার মোড়ক খুলিয়া দেখি, পান দুইটীর স্থলে একটী!

হঠাৎ খেয়াল হইল, সেই ভদ্রলোকটী আসিলেন না তো! মহিলাটীও তখন আকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'ইস্ মহীন্-দা' উঠ্‌তে পারলেন না?' বলিয়াই গাড়ী হইতে অবতরণের উপক্রম করিলেন। গাড়ীখানি তখন সবে প্লাটফরম্ ছাড়াইয়াছে।

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'করেন কি? তিনি নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি অন্য গাড়ীতে উঠেছেন।'

অনন্যোপায় হইয়া মহিলাটী বসিয়া পড়িলেন। সেই অবসরে দেখিলাম, তাঁহার সুন্দর মুখখানি ভীতি ও উৎকণ্ঠায় ভরিয়া গিয়াছে। বলিলাম, 'কিছু ভয় নেই

আপনার, পরের ষ্টেশনেই তিনি এ গাড়ীতে আসবেন, আপনি ততক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকুন...হ্যাঁ ওর নাম মহীন্‌বাবু? উনি আপনার দাদা হন্।'

মহিলাটী একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাথার ঘোমটাটা আরও একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন, 'না, উনি আমার স্বামী।'

ক্লাসে শিক্ষকের মুখের উপর কোন দুর্ধর্ষ ছাত্র পূর্ণ সাহসে অতি অশ্লীল কথা বলিলে শিক্ষকের মুখের ও মনের অবস্থা যেমন বিস্ময়ে ভরিয়া যায়, মহিলাটীর কথা শুনিয়া আমার অবস্থাও হইল ততোধিক। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম, কিন্তু মাত্র একখানি অবনত মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত দেখিলাম। বুঝিতে পারিলাম না, সেই অবগুণ্ঠনের মধ্যে কোন্ রহস্যের লীলা চলিয়াছে। তৎক্ষণাৎ হিন্দুস্থানীর সেই 'বিশ্বামিত্রের' সংবাদটী মনে পড়িয়া গেল। ভাবিলাম, সেই রকম কিছু নহে তো, কিংবা সেই আসামী দুইটাই নহে তো! পরক্ষণেই ভাবিলাম, করিতেছি কি, একটী ভদ্র-মহিলা-সম্বন্ধে সম্যক্ না জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা দোষারোপ করিতেছি, যদি তাহাদের এই সম্পর্কের মধ্যে কোনও যাথার্থ্য থাকিয়া যায়! তবু ব্যাপারটা জানিবার জন্য মনটা কেমন উস্‌খুস্ করিতে লাগিল। কিন্তু মনের আব্‌দারে সব সময় কর্ণপাত করিলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না, তাই চুপ করিয়া গেলাম। আবার নিজের দায়িত্বের কথাও ভাবিতে লাগিলাম, ভদ্রলোক যদি সত্য সত্যই ট্রেণ ধরিতে না পারিয়া থাকেন! তবে? এই রাত্রে একটী সম্পূর্ণ অপরিচিতা তরুণীকে লইয়া এতটা পথ! এতদ্ব্যতীত ইহাদের সম্পর্কের মধ্যেও যেন কেমন একটা খট্‌কা লাগিতেছে। শেষটায় 'সিন্দুর কৌটা'র 'সুশী'র ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে না তো?

দেখিতে দেখিতে ট্রেণখানি একটী ছোট ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই গার্ডের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। ভদ্রলোকটী আসিলেন না। মহিলাটী এবারে রীতিমত উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন। বিপদে পড়িয়া তাঁহার লজ্জাও ক্রমশঃ ভাঙিয়া আসিতেছিল, বলিলেন, 'কই, এখানেও তো উঠ্‌লেন না, তা' হ'লে নিশ্চয়ই ট্রেণ ধরতে পারেন নি, দেখ্‌ছি।'

আমি সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, 'টাটাতে ট্রেণ অনেকক্ষণ দাঁড়াবে, সেইখানেই যা' হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে 'খন। একটা টেলিগ্রাফও' করা যাবে ওখান থেকে।'

স্থানাভাবে ট্রাঙ্কের উপর বসিয়াই চলিয়াছিলাম। উদ্বেগে উভয়েরই চোখে নিদ্রাও ছিল না। ট্রেণখানির গতি লঘু হইয়া আসিয়াছিল, ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, রাত্রি দুইটা। কিছু পরেই একটা ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীখানি যেন আধমিনিটের জন্য ষ্টেশন মাষ্টারের সহিত আলাপ করিয়া আবার ছুটিল। সাগ্রহে মহিলাটী জানালায় মুখ বাড়াইয়া, আশা না থাকিলেও ভদ্রলোকটীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু কোথায় সেই ভদ্রলোক! আমি বলিলাম, 'আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি তো আর বনে যাচ্ছি না, না হয় আমার সঙ্গে গিয়েই আমার বৌদি'র কাছে কাল্‌কের দিনটা কাটিয়ে দেবেন। তারপর তিনি এলে খোঁজ ক'রে তাঁর কাছে আপনাকে পাঠিয়ে দেব 'খন।'

গাড়ীতে একটী চেকার উঠিয়াছিল, লক্ষ্য করি নাই। তিনি সন্নিকটস্থ হইলে আমার টিকিট্‌খানি দেখাইলাম। আমার টিকিট্‌খানি ফিরাইয়া দিয়া মহিলাটীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, 'আপনার স্ত্রীর টিকিট্‌খানা?'

চেকারবাবুর শেষ কথাটায় আমি একটু নড়িয়া [উঠিলা]ম, বলিলাম, 'ওঁর স্বামী খড়্গপুরে নেবে আর উঠ্‌তে পারেন নি, তাঁর কাছেই টিকিট্ আছে, টাটানগরে গিয়ে ব্যবস্থা করব।'

চেকারটী ওদিকে সরিয়া গেলে মহিলাটী বলিলেন, 'এখন তো কোন রকমে পার পাওয়া গেল, কিন্তু পরে?'

আমি বলিলাম, 'পরের ব্যবস্থা পরে, এখন তো যাওয়া যাক্' বলিয়া আমার আড়ষ্ট পদযুগলকে টানিয়া একটু আরামে বসিবার চেষ্টা করিতে গেলাম, কিন্তু আরাম করা আর হইল না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেরূপ ভাবে ছিল, ঠিক সেইরূপ ভাবেই রহিয়া গেল।

মহিলাটী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, 'আপনি আমার জন্য খুবই ব্যস্ত হ'য়েছেন, দেখ্‌ছি, আমিও যে হই নি, তা' নয়, কারণ আমার কাছে টাকাকড়িও নেই,

টিকিটও নেই, যেখানে যাচ্ছি, সেখানকারও কিছুই জানি না,...তবে আপনার কাছে আর লুকোব না, আমি মোটেই মেয়ে মানুষ নই।'

ভাবিলাম, হায় রে কোথায়ই বা 'সিন্দুর কৌটা', কোথায়ই বা মুনী। এতক্ষণ কেন জানি না, মনটায় বেশ একটু পুলক হইতেছিল, বোধ হয় একটা বিপন্না যুবতী রমণীকে লইয়া বেশ একটা 'অ্যাড্‌ভেঞ্চারে'র সৃষ্টি হইবে ভাবিয়া। আমি একেবারে গুম্‌ হইয়া গেলাম। একটু পরে বলিলাম, 'আপনি,—তুমি এ রকম করে' আসছ কেন?'

ছেলেটা বলিল, 'ওই যে মহান্‌-দা' আস্‌ছিলেন না? ওঁর সঙ্গে কি খেয়াল হ'ল,—একবার রাঁচিতে বেড়াতে যাব মনে করলাম। উনি এসেছিলেন, কলকাতায় ওঁর শ্বশুর বাড়ীতে, ওঁর স্ত্রীকে নিয়ে যাবেন বলে। কোন কারণে ওঁর স্ত্রীর আসা হ'ল না। মাঝে থেকে আমি জুটে গেলাম। মহীন্‌বাবুর 'পাস্‌' ছিল সস্ত্রীকের, তাই মাথা ঘামিয়ে এই ষড়যন্ত্র। এখন দেখ্‌ছি যে বিপদ্‌, সেই বিপদ্‌। কি করব বলুন দেখি?'

ছেলেটার কথায় হাসিব কি দুঃখিত হইব ভাবিতে পারিতেছিলাম না। তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলাম, 'বলিহারি হে ছোক্‌রা তোমার বাহাদুরি আছে, গল্প লিখতে সুরু করো, নাম হ'বে।'

ও পাশের বাঙ্কের উপর একটা মাদ্রাজী শুইয়াছিল মাত্র, ঘুমায় নাই। আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল, অর্থাৎ বলিতে চায়, ইহার মধ্যেই জমাইয়া ফেলিলে?

আমি তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ছেলেটাকে বলিলাম, 'তা' তো হ'ল, এখন 'পাশ' থাকতেও ভাড়াটা গুণোগারি দিতে হ'বে, যাক্‌ অন্য উপায় নেই, তার কি হ'বে।...তোমার নাম কি হে?'

'কুমুদ', বলিয়া সে তাহার অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল।

আমি বলিলাম, 'উঁহু, এখন নয়, একেবারে বাসায় গিয়ে, নইলে সন্দেহের সম্ভাবনা আছে।...তোমায় যা' মানিয়েছে, ভাই। কোন্‌ ক্লাসে পড়?'

'থার্ড ক্লাসে।'

'থিয়েটারের শখ আছে, বোধ হয়?'

ছেলেটা হাসিয়া বলিল, 'তা' একটু আছে বৈ কি। সেবার 'রিজিয়া' প্লেতে আমিই নায়িকার পার্ট্‌ করেছিলাম, ...মাফ্‌ করবেন, আপনার নামটা?'

'আমার নাম পবিত্র রায়, আমার বাড়ী বর্দ্ধমান্‌ জেলায় সীতাডিহি গ্রামে।'

'সীতাডিহি? আপনি উমেশ বাগ্‌চীকে চেনেন?'

'সে কি হে, চিনি বই কি! তিনি তো আমার দাদার শালা।

'আর আমিও তাঁর মাসতুত ভাই। বেড়ে একটা সম্বন্ধ বেরিয়ে গেল, কিন্তু, যাক্‌, দিদি ভাল আছেন?

"বৌদি'র কথা বল্‌ছ? তাঁর কাছেই তো যাচ্ছি। কিন্তু ভাই, একটা মজা করতে হ'বে। বাসায় গিয়েও তোমার এই মোহন মূর্ত্তিটার পরিবর্ত্তন করা হ'বে না। বৌদি তোমায় চিনে ফেল্‌বেন না কি?"

'মোটেই না, বছর পাঁচেক আগে সেই তাঁর বিয়ের সময় আমায় দেখেছিলেন, এতদিনে ভুলেই গেছেন।'

চক্রান্ত সমস্তই স্থির হইল। গাড়ীও তীব্রবেগে ছুটিতেছে, যেন খাঁচার পাখী মুক্তির হর্ষে দিশাহারা হইয়া ছুটিয়াছে, কোথায় যে বিরাম লইবে তাহা যেন সে নিজেই জানে না। বসিয়া বসিয়া বালকের এই কীর্ত্তির কথাগুলি ভাবিতে লাগিলাম, তাহার আর সে উদ্বেগ, সে উৎকণ্ঠা নাই। বাঙ্কের সেই মাদ্রাজীটী এখনও ঘুমায় নাই। এখনও মিটী মিটী চাহিতেছে, আর মৃদু মৃদু হাসিতেছে। ভাবিলাম, একবার তাহাকে বলি যে ওহে গর্দ্দভ, তোমার অনুমান একেবারে মিথ্যা।

টাটানগরে আসিয়া মহিন্‌বাবুকে টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়া কিছু জলযোগাদি করিলাম। কুমুদের কলিকাতা হইতে টাটানগরে পর্য্যন্ত ভাড়া আমাকেই মিটাইয়া দিতে হইল, কারণ সে শূন্যহস্তেই আসিয়াছিল।

পরের দিন রাঁচি গিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা প্রায় দশটা। বাসায় গিয়া গাড়ী হইতে একটী স্ত্রীলোককে নামিতে দেখিয়া বৌদিদি জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে চাহিলেন। বলিলাম, 'ট্রেণে এঁকে হঠাৎ পেয়ে গেছি, বৌদি, আশা করি তোমরা এঁকে পায়ে ঠেলবে না।'

বৌদিদি কিছুক্ষণ অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর কুমুদের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'এস' দিদি —ভাই এস,' বলিয়া তাহাকে লইয়া অন্দরে ঢুকিলেন।'

কুমুদ একেবারে তুখোড়—থিয়েটার করা ছেলে। আমি হাসি চাপিতে না পারিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম না। বাহিরের ঘরেই বসিয়া রহিলাম। দাদা তখন সবেমাত্র হাঁসপাতালে গিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরেই বৌদিদি কিছু খই আনিয়া উলু দিতে দিতে আমার মাথায় ছড়াইয়া দিলেন। একটী বৃহদাকার রসগোল্লা আমার সাধ্যাতীত হইলেও মাত্র দুই কামড়ে আমাকে শেষ করিতে হইল। কুমুদের হস্তস্পর্শ করিবামাত্রই বৌদিদি টের পাইয়াছিলেন, হাজার হোক্ পুরুষের হাত তো! এখন অধিকক্ষণ গাম্ভীর্য্য রাখা তাঁহার পক্ষে সুকঠিন হইল, আমার তো হাসির চোটে বুক ফাটিয়া যাইবার মত হইল। দুজনেই তখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলাম। কুমুদও শান্ত সুবোধ বালকটীর মত আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া আমাদের হাসিতে যোগ দিল। হাসি থামিলে বৌদিদি আমায় বলিলেন, 'হাসি তামসা করতে করতে যা' করে' ফেল্‌লে ভাই, তার কতকটা বোধ হয় ভগবানের কৃপায় সত্যি হয়ে পড়্‌বে। কুমুদের দিদির সঙ্গেই তোমার বিয়ের ঠিক কর্‌ছি।'

কুমুদের বিকসিত কুমুদের মত মুখ খানির পাশে আর একখানি স্নিগ্ধ-কম মুখের কল্পনা করিয়া আমি আনন্দের আতিশয্যে নিস্তব্ধ হইয়া সেই শুভ-দিনের প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিলাম।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী :—

বস্ত্র-ব্যবসায় কমিটী হইতে যে তদন্ত-কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল তাঁহাদের নিকট হইতে এক প্রস্তাব ওঠে যে, ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলসমূহ হইতে এক কোটী অতিরিক্ত টেকো এবং এক লক্ষ তাঁত তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। যে সমস্ত কারখানা অতঃপর কাপড়ের কল চালাইবে, তাহাদের উপর একটা কর বসান হইবে। এই ঘটনা হইতে ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে বিলাতী বস্ত্র-শিল্পের অবস্থা কিরূপ। কাটতির অভাবেই এই কলগুলি বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটিশের বস্ত্র-শিল্পের যেরূপ আদর ও কাটতি ছিল—যেরূপ বাণিজ্যের প্রসার ছিল সেরূপ অবস্থা আর নাই, এমন কি, সহজে সে অবস্থা ফিরিয়া আসিবার উপায়ও নাই। ইহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষ, জাপান ও সম্প্রতি চীনে বস্ত্র-উৎপাদন-শক্তি বাড়িয়া গিয়াছে।

ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অফ কমার্স-রিপোর্টে জানা যায় যে, কোরা কাপড়ের রপ্তানী প্রতি বৎসরেই অস্বাভাবিক-ভাবে কমিতেছে। ১৯২৯ সালে বৃটিশ বণিক্‌গণ বাঙ্গালা-দেশে ৪৮ কোটী ৯০ লক্ষ গজ, ১৯৩০ সনে ২১ কোটী ৮০ লক্ষ গজ এবং ১৯৩১ সনের ১১ মাসে ২ কোটী ৬০ লক্ষ গজ কোরা কাপড় পাঠাইয়াছে।

গত ৩০শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দরে কত হাজার গজ বিলাতী কাপড় আমদানী হইয়াছে, তাহার হিসাব ও ১৯৩১ সালের অনুরূপ সপ্তাহের তুলনায় কি পরিমাণ

বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কোরা কাপড়

	১৯৩২	১৯৩১
কলিকাতা—	১২১৬ হাজার গজ	২২৯৯ হাজার গজ
বোম্বাই—	৯০১ "	১০৫২ "
করাচী—	৪৪৪ "	১৭০২ "
মাদ্রাজ—	৩৯৯ "	১১০৮ "
রেঙ্গুন—	৩৮	২০১ "

ধোয়া কাপড়

	১৯৩২	১৯৩১
কলিকাতা—	৯২ হাজার গজ	২২২ হাজার গজ
বোম্বাই—	৬৫১ "	৫৬১ "
করাচী—	৫০৩১ "	২১৫৬ "
মাদ্রাজ—	৩৬০ "	১০৬৩ "
রেঙ্গুন—	৬৭৮ "	৩২৬ "

অন্যান্য কাপড়

	১৯৩২	১৯৩১
কলিকাতা—	৫৮২ হাজার গজ	৮৮৭ হাজার
বোম্বাই—	৮৭১ "	৭০৮ "
করাচী—	১৪৫২ "	৫৫২ "
মাদ্রাজ—	৪৩ "	৫২৯ "
রেঙ্গুন—	৭৪৩	৬৩২

১৯২৯-৩০ সনে ভারতে নানা প্রকার কাপড় আমদানী হইয়াছিল ৭৮ কোটী টাকার, আর ১৯৩০-৩১ সনে হইয়াছে মোট ৪১ কোটী টাকার। ১৯২৯-৩০ সনে মোট ১৯১, ৯০, ০০০০০ গজ কাপড় ভারতে আমদানী হইয়াছিল, আর ১৯৩০-৩১ সনে তাহা দাঁড়াইয়াছে ৮৯, ০০, ০০০০০ গজ।

ভারতে সুগন্ধি-দ্রব্য :—

বর্ত্তমানে আর্থিক অস্বচ্ছলতাহেতু বাজারে যেরূপ প্রতিকূল ঢেউ উঠিয়াছে তাহাতে যে কোনরূপ বিলাসদ্রব্য পূর্ব্বের মত চলিতে পারে, তাহা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু মানুষের জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের পক্ষে সুগন্ধি-দ্রব্যের ব্যবহার ও আদর যে আছে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে যদি ভারতেই আমরা সুগন্ধি-দ্রব্যের কেন্দ্র করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের দেশের ঐ বাবদ অনেক টাকা দেশে থাকিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা আমরা উপেক্ষা করিয়া প্রায় সকল প্রকার গন্ধ-দ্রব্যই বিদেশ হইতেই আমদানী করি। ১৯২৭-২৮ ও ১৯২৮-২৯ এই দুই বৎসরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ সুগন্ধি-দ্রব্য আমদানী হইয়াছিল তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
বাঙ্গালা	৪১৬৮৫১৲	৯০৮৫৭৲
বোম্বাই	৩০০৩৯১৲	১৫০৬০২৲
সিন্ধু	৮৭২১১৲	১০৬৪৭৭৲
মাদ্রাজ	৫৮৯৩২৲	৭৬৯৬৭৲
ব্রহ্ম	৭৬৭৫৮৲	৬৫৩৯৩৲

এতদ্ভিন্ন সুগন্ধি ও তৈল সুগন্ধি সুরাসার আমদানী হইয়াছিল—

	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
কর্পূর তৈল	৩১৮৫৩৲	৩১৪৮০৲
লবঙ্গ তৈল	২৬৫৩৲	১৪০২৲
লেভেণ্ডার তৈল	৯৮৩৩৲	৩৯৮৲
লেবু তৈল	৬১৪৮০৲	৫১৯৩৭৲
অটোরোজ	১২৩৬৲	৩৪২৮৲
অন্যান্য	৬৫০৭১৬৩৲	৬৮১২৭৯৲

এ ছাড়া সুগন্ধ সুরাসার মিশ্রিত নানা প্রকারের এসেন্স আমদানী হইয়াছিল—

	১৯২৭-২৮	১৯২৮-২৯
বাঙ্গালা	৩৭২৯৮০৲	৩২৭০৬৯৲
বোম্বাই	৪৩৪৮৬২৲	৭০৬১২৲
সিন্ধু	৬৯৪৫২৲	৭০৬১২৲
মাদ্রাজ	৬৮৩১৪৲	৯০৪৩৯৲
ব্রহ্ম	৩২০০২৩৲	৩১৫১১২৲

বাণিজ্য-শুল্কে রাজস্ব :—

গত জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষে বাণিজ্য শুল্ক হইতে ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে আদায় হইয়াছিল ৪ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে আদায় হইয়াছিল ৪ কোটী ২৩ লক্ষ টাকা।

১৯৩১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩২ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত দশ মাসে ৩৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, পূর্ব্ববৎসর অনুরূপ সময়ে আদায় হইয়াছিল ৩৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা।

১৯৩১-৩২ সালের দশ মাসে আমদানী শুল্ক হইতে ২৯ কোটি ২০ লক্ষ, রপ্তানি শুল্ক হইতে ২ কোটি ৬৯ লক্ষ, কেরোসিন হইতে ১ কোটি ৯০ লক্ষ, স্থল-বাণিজ্য হইতে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে।

ঠাকুরদাস দত্তের পাঁচালী

[ঠাকুরদাস দত্তের পাঁচালী এক সময়ে বাঙ্গালীর নিকট বিশেষ আদৃত ছিল। কিন্তু তাঁহার পাঁচালী এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। প্রাচীনপন্থী হিসাবে পঞ্চপুষ্পের কয়েক সংখ্যায় এই অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব 'পাঁচালী' বাহির হইবে।—পঞ্চপুষ্প-সম্পাদক]

ঠাকুরাণী বিষয়

অচিন্ত্য অমৃতাকারো দুর্গে দুর্গে নিস্তারো
পরাৎপরা আস্তা সোনাতনী।
বিশ্বজ্ঞান-বিধায়িনী বিশ্বের প্রসবিনী
বিশ্বেশ্বরী বিশ্বপ্রপালিনী।
বিশ্ববীজ-প্রসবিনী ব্রহ্মাণ্ড-লয়কারিণী
বিশ্বনাথের হৃদয়বাসিনী।
জগত-আনন্দ-কারিণী, হে শিবে শিব-দায়িনী
নিস্তার পামরে তারা, নিস্তারকারিণী।
পেয়েছি প্রপঞ্চ দেহ এ দেহের বহু সন্দেহ
দেহ পদতরী তরি শিবে।
বিতরিলে কৃপাবিন্দু হেলায় তরি ভবসিন্ধু
দীনে দিন দিতে তারা হবে।
দিনে দিনে গেল দিন নিকট বিকট দিন
দিনমণি-সুত ভয়ঙ্কর।
সে আসি বাঁধিবে কর সে ভয়ে মা মুক্ত কর
দুষ্কর ভাস্করসুতের দুরন্ত কিঙ্কর।
ভবে আসিয়ে শঙ্করী ভ্রমিলাম বিফল সংকরি
সঙ্গে রঙ্গে ফুরাইল কাল।
কালাকালের হলে ঘটনা কাল গৌণ ত সে করেনা
এরূপে কাটাব কত কাল।
পেয়েছিলাম হাঁসীল জমি লয়েছিলাম জমায় কমি
তবু মা হলো না মালগুজারি।
বিফল তলপ সুদ আর তথরচে বাকির দায়ে পড়ে মিছে
তবিল হলো ভারি।
মন হলো মা অবোধ কৃষাণ, সোনার জমী করলে শ্মশান
হলো না এর চাষ।
মময়েতে চাষ না দিলে সে জমিতে কি ফসল ফলে
ফুরালে বরষ,
ছটা রিপু প্রবল এঁড়ে জ্ঞান লাঙ্গলে তাদের জুড়ে
যত্তপি চাষ দিতে।

তারানামের বীজ তায় দিলে পুতে ফসল রাখ তে এভারতে
জায়গা কি মা হতো।
আমি বায় ভূতের মন্ত্রণাতে পথ ছেড়ে এসে কুপথে
হতে বস্‌লেম সারা।
যারা আমায় সং দেখালে রঙ্গের সময় রং করালে
এখন ক্রমে সরছে তারা।
পড়েছিলাম কামের দমে সে বেটা পলাল ক্রমে
মায়া মোহ কেহ না রহিল।
আয় যখন ছিল তাজা সকলে করেছে মজা
মটকাফাঁক দেখে তারা সবাই ফাঁক হলো।
সকলে করে কারসাজি দেখালে মা ভোজের বাজী
বাজী হারায়ে পড়েছি বিপাকে।
এখন তারা হলো বাম খালির শয্যায় কালীর নাম
তাই ডাকি মা তোকে।
মহামারীর মহিমা সংসার জননী শ্যামা
অপার মহিমা শুনি বেদে।
রবিসুত দূত-ভয়ে শরণ করি অভয়ে
অভয়দান কর মা বিপদে॥
হইয়ে মা দায়স্বীকৃত শ্রীপদে করি দরখাস্ত
রেস্তহীন বেস্ত শুভঙ্করী।
লিখিতং নিখিল দাসে সন্তানে তোষ সন্তাষে
শঙ্করী সারদা শুভঙ্করী।

২নং

আমি গরজি হয়ে আরজি দিতে এলাম তোমার আদালতে
আমলার হাতে পড়ে পড়লাম গোলে।
ঘুস যারা দিতে পারে হুজুরেতে দেয় গুজুরে
তাদের মিছিল আগে ভাগে তুলে।
এখন সকল হল আপ্ত যারা আপনার কাজ সারা
সারা হলাম পড়ে তাদের হাতে।
দেখে আমার দায়সিকস্থ মিছিলেতে দেয়না হস্ত
রাখে কেবল নথীর সঙ্গে গেঁথে।
ধরলেম বিষ্ণু পেষকারে যদি মিছিল পেষকরে
শেষ করেন দীনের দুর্গতি।

তিনি ত একে চক্রুরে বেড়ান চক্রকার করে
চক্রে খেলেন সর্ব্বদা তাঁর মতি।
তুলসী পাতার হালসী গেঁথে এত দিলাম তাঁর পায়েতে
তাঁর রায়ের রা বুঝা হল ভার।
ভেবে সেই কালবরণ কর্ত্তেছি কাল হরণ
আরজী দিতে মরজি হলনা তার
শুনন নবীস চতুর্ম্মুখের দাঁড়ালাম তার সম্মুখে
মুখতুলে একবার কি মা দেখে।
যে বেটা মা দেয় শুনানি তারি মিছিল হয় শুনানি
বাকির মিছিল বাঁধিয়ে তলে রাখে।
সেরেস্তাদার সদাশিবে এতকরে ধরলাম শিবে
শিব হতে শিব যদি হয়।
যে নিজে খায় মা সদা সিদ্ধি তার কাছেতে কার্য্যসিদ্ধি
হওয়া ভার হয়েছে সংশয়।
তিনটী আমলা তিনটী কাল, প্রবীণ যিনি মহাকাল
তিনকাল এঁদের কাছে গেল।
আমি কাল পেলাম না আরজী দিতে কাল কাটালাম এইরূপেতে
কাল পেয়ে মা কালের কাল এলো।
কর্ম্ম হয়না বিনে রেস্ত করি নাই তায় উপুড় হস্ত
দায়সিকস্থ মনে মনে জানি,
আমি সবদিকে মা হয়ে ফাঁপর শেষে করেছি পাঁপর
এখন তুমি যা কর ঈশানী
থাকতে কড়ি করিনি নালিশ তোমার আস্‌না তুমি শালিষ
তোমার পুলিশে তুমি দাও সাজা,
দোষ না থাকে ত ডিক্রি পাব কালেরে কলা দেখাব
ভয় কি করি অভয়া যার রাজা।
আমি মুখ ছেড়ে ভাত নাকে দিয়ে পেষকারের পেষমান হয়ে
শেষ হওয়া থাক, পেশ হলোনা আরজী।
মলেম তুলে তুলসী পাতা দিলাম করে হালসী গাঁথা
তবু তার ফিরল নাকো মরজী।
সে বেটাত গণ্ডলা দূত সেরেস্তাদার চন্দ্রচূড়
চুকস্থ হন গাঁজায় দম লাগাতে।
পেটে নাইক রস্ত সিদ্ধি বস্তুর মধ্যে খান সিদ্ধি
কার সাদ্ধি এর সওয়াল যোগাতে।

শুনন নবিস হাঁস পোঁদা চাপটে মুখ কেবল মোদা
আটটা চোখ থাকতে তিনি অন্ধ।
লোকে বলছে করছে ধ্যান আমি বলি তার নাইকো জ্ঞান
থাকলে বলতো ভাল মন্দ
তিনটি ধিঙ্গি তিনটী জন মনে ভাবলেম ওরে মন
এমন করে কদিন আর কাটাব।
আমি হলেম না পার থাকৃতে তরী মিছে কেন ভেবে মরি
চল সে পাঁপরে আরজী দিবো।

নং

আমি অশীত লক্ষ্য ক্ষেত্রে ভ্রমি বন্দোবস্ত নিলাম কমি
ভাগ্যক্রমে শূন্য ভূমি হলো
দুঃখ ।ক কর অপণ্যা হল না মা শুভ পুণ্যা
কেবল বাকি আখীরির দিন এলো
মনে করলাম করবো চাষ খাস জ্ঞান লাঙ্গলে দিব চাষ
তারা নামের বীজ ছড়াব তায়
ভক্তি নদী করে সেচন ফলাব মনের মতন
হাজাশুকো না হতে যায় পায়
আর মনে মনে করলাম জারী নোটের আগে মালগুজারী
করবো এবার করেছিলাম মনে।
বোম্বেটে জুটেছ ছজনে ফাঁকি দে নিয়ে পত্তনে
নোট করলে ভবের হাটে এনে।
তারা মহল আগে করে হাত তবিল করলে তচ্ছপাত
হাত থাকতে পরের হাতে গিয়ে,
হাতিয়ে নিচ্ছে সকল রেস্ত হয়ে আছি শূন্যহস্ত্য
আছি গো মা দায়সীকস্থ হয়ে
তাদের কিমা একটা মত ছ বেটার ছ রকম মত
আসল পথ চলেনা মলে
তারা পাকা রাস্তায় চায়না ফিরে কাঁটা বনদে হাঁটা করে
বিষম লেঠা ছ বেটায় বাধালে
যেখানেতে ফসল ফলে তাতেই এসে গর্ত্ত আগে খুলে
সালী জমিতে বালি এনে ফেলে
ওবার খেতে আবা দিয়ে পাশের খেতে ধান ছড়ায়ে
লাভে-মূলে আমারে মজালে।

বরং পাচ বেটারে পারা যায় এক বেটার দায় বিষম দায়
তার বাগ ফেরান বড় ভার।
সে পাঁচ বেটার উপরে বীর যেমন ধারা তিতুমির
তার কেল্লা মারে সাধ্য কার।
সকল বেটা তারি হাতে সে বেটাকে আনতে হাতে
এত করলেম চেষ্টা
দুই অক্ষরে নাম ধরে সকল ঘরে ঘর করে
তারে ধরে কার এমন সাধ্য।
হরের যোগ সে করে ভঙ্গ অঙ্গ নাই তার এত রঙ্গ
যার কুহকে বাধ্য আবালবৃদ্ধ।
সে রাজার রাজ্য করে নাশ তবু কি তার মেটে আশ
ঘাস ছোলায় সে হাতে খুরপা দিয়ে,
তবু কি সে ক্ষান্ত পায় তার আশে খেতে চায়
কাবু যাতে যত বাবু-ভেয়ে,
যদি বল গো শঙ্করী করে মাফিক আইন জারী
তশীলকরে হাশীল করি কায
তাদের পত্তনে কর্ত্তন দিয়ে আপনার তালুক আপনি নিয়ে
হুজুরেতে হব সরফরাজ।
তারা বাস বাসস্থান নাইকো হেলে নাইকো ধান
চাষ করেনা বলায় নাম কৃষাণ।
যেমন মা কোম্পানীর নোট কথায় নোট কাজেতে নোট
ধরতে গেলে কে কোথায় প্রস্থান
যেমন স্কন্ধকাটার শিরপীড়া এই ছয় ভেড়ের ভেড়ে
যুতে.তেড়ে পেড়েছে আমাকে
যেমন ধারা চুঁচড়োর মেকি তেমনি এরা ফোপরা ঢেকী
ধরতে গেলে ধরা পাইনে কাকে।
আমি ত বামন নর, ঋষির শ্রেষ্ঠ পরাশর,
তার শরেতে তিনিও বিভোল।
পদ্মযোনী হরিণবেশে ছুটেছিল সঙ্গে আশে
সন্ধ্যা আহ্নিক ছেড়ে কমুণ্ডল।
তার ক্ষমতা বা কব কত ইন্দ্র হয়ে বুদ্ধিহত
বস্‌লেন গিয়ে অহল্যার পাঁদাড়ে।
গুরুর ভার্য্যা হরে শশী কলঙ্ক অঙ্ক প্রকাশি
দোষী হয়ে রইল জগৎ জুড়ে।

ক্ষমতা তার বলিহারি, নারীর পায়ে ধরেন হরি
নারী বেশে নারীর মানের দায়।
কি কব তার বাণের কাণ্ড এমন বীর দশমুণ্ড
লণ্ডভণ্ড হয়ে সোণার লঙ্কা ছেড়ে যায়।
ধন্য তার শরের শক্তি দুই নারীতে করে যুক্তি
জন্মালে এক পুত্র ভগীরথ।
কিচক চুকলে তার কুহকে ভীমকে নারীরূপ দেখায়
তার ক্ষমতায় করি দণ্ডবত।
যার ঘরে করে বুদ্ধিবাস সে করে সেই দেহে বাস
সর্ব্বনাশ করেছে শঙ্করী।
থাকতে চক্ষু হয়ে অন্ধ গুটীপোকার মতন বন্ধ
হয়ে আছি উপায় না-হেরি।

৪নং

আমার জ্ঞান অন্ধ মন মাঝি ধরেছে মা হাল
হৃদিওড়ায় মাঝে তোলে ঝঞ্ঝারূপ একপাল।
এদেহনৌকার নয় দিকেতে কালাপাতি উঠে কত জল
কলুষে বোঝাই নৌকা করে টলমল।
সদা কুমাতেতে নৌকা লয়ে যোর রাখে
দেহের দাড়ীগুলা যেমন বোকা তেমনি বোকা মাঝি।
ছটা দাড়ী জনঠাকুরে শুনে নাকো মানা
পাকনা দেখে নৌকা নে যায় যেখানেতে হানা।
একটু ভাঁটিয়ে গেলে সুখাট মেলে তায় হয় না মতি
সদা টানে উজান কজন, কুজন হয় যায় দুর্গতি।
ভাবের তুফান দেখে ভয় লাগে মা, হয় পাছে বাণচাল
নৌকায় কালাপাতি সল হয়েছে হয়েছে আজকাল।
এদেহ নৌকায় পেরেকগুলো হলো জরা
তক্তা হলো রদি।
তবু বিষয় বুঝে কাজ করেনা মা
সবাই প্রতিবাদি।
এতেই আছে রাজকাচারি, এতেই আছে পুলিষ
এতেই আছে থান ফাঁড়ি করতে পাইনা নালিশ।
তবে নালিশ যে করতে পাইনা তারণ কারণ
আশারূপ একটা আটমাঝি সঙ্গে সদাই থাকে
মা সেটাও হলো ঘুষখেকো বেড়ায় ঘুষের পাকে।
পরমিট একটা বসিয়ে দিলে থানা
বলে হাসিল দিয়ে ব্যাপার কর
গেঁতো মাল ছুওনা।
গোঁতো মালটাই বাকি
বুঝিলামঞ্চসুধা খেলে ক্ষুধা তায় হয়না রত
সদা মদে মত্ত মদৃকা পান তাতেই বশীভূত,
যেমন চাঁদপালের ঘাটেতে থিয়া সামনে গিরিশ বুরি—
তেমনি তোমার সামনে থিগ্না আমরা আজ যে মরি।

শিবের বিবাহ

১নং

দক্ষ যজ্ঞে যোজ্ঞেশ্বরী যোগ অবয়ব করি
পরিহরি গেল নিজ কায়া।
হিমালয়েরে প্রসন্ন, হইলেন সুপ্রসন্ন
মনেতে ইচ্ছিলেন মহামায়া।
শিব হয়ে শক্তি শূন্য দশদিক দেখেন শূন্য
ক্ষুণ্ণ হয়ে বসিলেন যোগে।
মনে রেখে সতীপক্ষ যোগে বসিলেন বিরূপাক্ষ
জ্ঞানচক্ষু সতীরূপ মনযোগে
যদি যোগে বসিলেন মৃত্যুঞ্জয় সৃষ্টি সব হয় লয়
সুরচয়ে ভাবিয়া অস্থির
শিব হলে শক্তি প্রাপ্ত সকলে হইবে তৃপ্ত
তবে জুড়াবে অপ্সরার শরীর
এখানে মায়ার মায়া পাষাণে হয়ে সদয়া
পাষাণীর গর্ভে আবির্ভাব
রাণীর অঙ্গেতে উঠেছে শির স্তনেতে জন্মেছে খির
শঙ্করীর কে বুঝিবে ভাব
রাণী চতুর্থ মাসে খান সাধ যতছিল মনের সাধ
পোড়ামাটী সুস্বাদু অম্বল
শোন হয়ে ধরাসনা দেখে বলে কুলাঙ্গনা
কন্যা হবার লক্ষণ এ সকল
রাণীর ক্রমে ক্রমে যায় দিন দশমাস দশদিন
প্রসব বেদনা আসি হোল

বেদনায় বদনে ঘাম জপিতেছেন দুর্গানাম
ধাত্রীবলে কন্যা তার হোল
কন্যার কথা শুনে রাণীর হরিষে-বিষাদ
সখীদের বলে হলো সকলি বিষাদ
দীন যেমন তুষ্ট পেলে গিল্টির আভরণ
বেচবার সময় সল্প মূল্য মচ্‌কে যায় মন,
গর্ভ হয়ে তেমনি রাণী মনের সুখে ছিল
কন্যার কথা শুনে অমনি অঙ্গ জ্বলে গেল।
বলে সলিলে লাগিলে অপরাহ্নের তপন
সে উষ্ণ উদকে হয় কি কানন দাহন
বৃদ্ধকালে গর্ভ হলে তার কি সুফল ফলে
যেমন বিকারের পিপাসা যায়না গণ্ডুষের জলে
এত আরাধনা করে কন্যাটা জন্মিল
যেমন বামন নারিকেল রোপণ করে আকাশ ফাটা হল।
বিষাদ ভাবিছে রাণী পড়িয়ে ধরায়
কোন ধনী গিয়ে রাজায় সংবাদ জানায়।

২ নং

শুনিয়ে ভূধর কয় ছিল সাধ হবে তনয়
তা না হয়ে তনয়া জন্মিল।
তাতেও হয়েছে সন্ধ বুঝিতে নারি ভাল মন্দ
কেন এমন আশ্চর্য্য ঘটিল।
একচন্দ্র সৃষ্টি পরে বিধাতা সৃজন করে
করে যায় জগৎ আলোময়
শুনি অসম্ভব কাণ্ড কি কবো সে শশীখণ্ড
হয়ে হলো চরণে উদয়।
যথায় শশী উদিত তথায় শশী বিকসিত
দেখিয়ে যে না প্রত্যয়
ভুজঙ্গ ভেকেতে বন্ধ সলিল মাঝে অনলবিন্দু
ইন্দু দেখে কমল প্রকাশ হয়।
তখন বলিতেছে প্রসূতী শুনহে ভূধর পতি
শশী আসি যে রয়েছে চরণে
যে মেয়ে গঠয়ে বিধি সোনাতে করিল বিধি
সুধা রাখি ঐ চন্দ্রাননে।
সুধাপাত্র পূর্ণ দেখে ফেলে দিল মণ্ডলোকে
ভেঙ্গে বিধু দিখণ্ডিত হইল।
এ নয় সামান্য মেয়ে সুধাংশু দশাংশ হয়ে
পদনখে লয়েছে আশ্রয়।
দিবাকর তা দেখতে পেয়ে চরণে শরণ আছে লয়ে
তাতেই পাদপদ্ম প্রকাশ হয়
ভাবলে এক হায় পৃথক ফল [যে পাদপদ্মে মোক্ষ ফল]
সে ফল ছেড়ে বিফল বিমানে
রবি স্বস্থানে প্রস্থান হয়ে পাদপদ্মে স্থান লয়ে
শশীভানু আছে সম্মিলনে

৩ নং

মুনি ত্যজে গিরিধাম মুখে শিব শিব নাম
কৈলাসেতে হইলেন উদয়।
হইয়ে পরম আহ্লাদ শিবকে দিলেন সুসংবাদ
সেরে গিয়ে সব নিমন্ত্রণ।
বিয়ের বড় হুলুস্থূল শিব হলেন বুদ্ধিভুল
এলো মেলো সকলি বেঠিক
একেত ভাঙ্গা বুদ্ধি কসে খায় গাঁজা সিদ্ধি
বুদ্ধি কেবল হয়েছে বাতিক
আভরণ ধনসর্ব্বস্ব গায়ে মেখে চিতাভস্ম
বিশ্বশোভা বলিহারি যাই
বস্ত্র হলো বাঘের চামড়া পাল্কি হলো বুধ দামড়া
হাতের শিঙ্গে বাজিছে সানাই,
বরযাত্র সাজে ভূত কত শত অদ্ভুত
অদ্ভুত বিদকুটে আকার
কাল মুখে দৃপ্ত ছটা পুটাধ ছিনে চেপল মাথা
আস্ত পাদ দেখতে কি বাহার
খগেন্দ্র কমলাপতি হংসোপরে প্রজাপতি
গজোপরে যান সুরপতি,
বৃষভেতে ভূতনাথ সঙ্গে ভূত নানা জাত
নন্দী ভৃঙ্গী দানা নানাজাতি
তারা বম্ বম্ বাজায় গাল ভূতে দেয় করতাল
করে গান মালসাট মারে,

যত ভুতে ভুতে হয়ে গীত হয়ে সবে আমোদিত
বর লয়ে যায় আস্তে বরদারে
তারা নৃত্য করে দিয়ে লম্ফ দেখে হয় হৃদকম্প
পদভরে ক্ষিতি কম্পমান,
সঙ্গে সুরাসুর যান হেসে হেসে লবেজান
শুনে সব ঐ ভুতের মুখে গান
আয়না ভাই বাবার বিয়ে দিতে তোরা কে কে যাবি
গিয়ে সেই গিরিপুরে উদরপুরে পুরী খাবি।
আসবে সব কুলবালা মাথায় লয়ে বরণ-ডালা
খেয়ে সেই ডালার কলা আগের ভাগে রোজ পোষাবি,
মায়ের মা সুতোয় জুকে যখন লবে বাবাকে
ঐ সুতায় কলা তুলবে মুখে, কেউ গিয়ে তায় আবা দিবে,
তারা গান করে নানা স্বরে শুনিতেছে সুরাসুরে
গিরিপুরে হইল উদয়,
মিলি যত কুলধনী করিছে মঙ্গল ধ্বনি
হুলু ধ্বনি শব্দ সমুদয়,
জয়ঢাক বীরঢাকী বাজায় মেরে ধাকাধাকি
ঢাকাঢাকি নাহিক সংসারে,
কেহ বাজায় জগঝম্প করে কত লম্ফঝম্প
শব্দ স্তব্ধ হইল চরাচরে,
কেহবা করে আঁকাড়া বাজাইছে রাম কাড়া
কাড়াকাড়ী করে দেয় কাঁশী।
কেহবা বাজায় বেহালা শুনিয়ে সুর বে-য়্যালা
সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গে রণবাঁশী
কেহ বাজায় রাম সিংঙ্গে রাম সিংঙ্গে রামসিংঙ্গে
কারবা পিতলের রামসিংঙ্গে।
যান খেতে হয় সিংঙ্গে বলে থাকে রামসিংঙ্গে
কিন্তু সিংঙ্গের সিংঙ্গে সেই শৃঙ্গের শৃঙ্গে,
বাঁধিয়ে যন্ত্র তরল বাজাইছে কত বোল
কত বোল বলা যায় না বোলে
সাবাস সেধেছে হাত বাজায় মেরে আড়ে হাত
কি করে হাত ফিরিছে তবলে
নবীন নবীন বিন বাস্ত কর সুনবীন
বাজায় বীণ ঝিনঝিন স্বরে,
সবাই খুসি শুনে বীণ বালক, নবীন, প্রবীণ,
বিন শুনে মুখে বাক্য সরে
সেতার সুতার করা তম্বুরায় তানে পোরা
মনোহরা বাজিছে পাখোয়াজ
বাজিছে মধুর বীণা নাছিছে কত নবীন
গিরি বিনা কার এমন রাগ,
ঐক্য কার সপ্ত স্বর বাজাইতেছে সপ্ত স্বর
সুরাসুর দেখিতেছে রঙ্গ
তালে তালে মন্দিরে বাজে কত মন্দিরে
কেহ মন দিয়ে বাজায় মৃদঙ্গ,
বাজে কত করতাল কেহ দেয় কর তাল
নাচে তাল বেতাল দানা
মাথা যেন হেঁড়েতাল নাচে তাল-বেতাল
গলে মাল অস্থি গাথা দানা।
বরযাত্র কন্যাযাত্র উভয় দলে একত্র
ধূমকেত্র বাধিল তুমুল
দেখিয়ে ভূতের বুদ্ধি উড়ে গেছে ভূতসুদ্ধি
বুদ্ধি-সুদ্ধি স্থূলে হল ভুল,
নাপ্তে ছিল মনে ভেবে কাপড় আটকে টাক লবে
বাঘের চামড়া দেখেই ত অজ্ঞান,
সেতো হয়েছে সতর্ক কে খেলিবে মধুপর্ক
পরামাণিক গৃহেতে পিট্টান,
গিরি আচমন করিয়ে জিজ্ঞাসেন প্রজাপতিরে
বল হরের বাপের নাম কি?
হেসে কন পদ্মযোনী পিতামহ শুলপাণি
হরের পুত্র দেও ওরে ঝি
তখন স্থির করি মুনিগণ দেবগণে দেবগণ
বিচার করলেন সুরগণ।
গিরিধামের গিরিগণ উভয় পক্ষের বিপ্রগণ
নরগণ আদি ঋষিগণ সমর্পণ করে তারা
দিন শুদ্ধ চন্দ্র তারা
তারাপতি কোলে ত্রিলোকতারা,
পুরনারী দেখিছে তারা চাঁদে যেমন ঘেরা তারা
তারা হেরে সলজ্জিতা তারা

দুস্তারা নিস্তারা তারা মেনকার নয়ন-তারা
তারার কাছে শোভা পায় কি তারা
যেমন কুরঙ্গ-নয়নের তারা তার কাছে মার্জ্জারের তারা
তারা হেরে তুচ্ছ প্রায় তারা।
এইরূপে কর্ম্ম সেরে পাঠাইলেন অন্তপুরে
স্ত্রী-আচার করিবার তরে
আসি যত কুলবালা সাজাইছেন বরণডালা
নারদ দিলেন ইসের মুল রেখে এক ধারে
ঔষধের গন্ধ পেয়ে ফণে সব গেছে পলায়ে
খসিয়ে পড়েছে বাগাম্বর
নারী সব বর দেখে জিব কাটে অধমুখে
উলঙ্গ হয়ে পড়েছেন হর
দেখেন ছাদলা-তলায় দাড়িয়ে বর বরের কটিতে নাই বাগাম্বর
দিগম্বর শূন্য কটীদেশ,
বরের গলে দোলে রুদ্রাক্ষ ভস্মি-মাখা বিরূপাক্ষ
চক্ষুস্থির রেখে রাণী বেশ
বরের কপালে অনল জ্বলে দেখে রাণী ক্রোধে জ্বলে
জলে যায় ঝাঁপ দিতে খেদে
বলে বৃদ্ধকালে একি সাজা বর এনেছে ভূতের রাজা
বোঝা যায় না বলে
রাজা পড়েছে বিপদে ওমা ওমা আই ভূতগুলো বলে আই
কি বালাই মরে যাই লাজে,
চতুর্দ্দিকে নাচে ভূত মূর্ত্তি গুলো অদ্ভুত
যমদূত পলায় সহজে।
আবার তবু করে এসে গলা বরণডালার খায় কলা
একি জ্বালা সবই অমঙ্গল
যন্নে হেসে নাড়ে দাড়ী ভয়েতে পাক পেলে নাড়ী
বাড়াবাড়ি আর করে বল
কালমুখে দৃপ্ত ছটা যেন ভাজনী খোলায় চুনের ফোঁটা
কান লোটকা উল্টো চেটোয় চলে।
নাকের কাছে ঝাড়ে কপ্পা কার নাকে গলে সিক্‌নী
হেসে হেসে আই আই বলে
আবার কোটর চখে চক মটকায় পলাতে যাই পথ আটকায়
হরের মটকায় ঠ্যাং।দয়েছে তুলে

হেসে হেসে পড়ে চলে মাথার ঘোমটা খুলে ফেলে
বলে যাও গোঁদের তলাদে গলে
নারদ ভাল করলি ঘটকালি এই বিয়েতে হাড়কালি
নারদ গালে দিলি কালি চূণ।
গৌরী আমার স্বর্ণলতা এমন বুড়ো পেলি কোথা
কপালেতে জ্বলতেছে আগুন,

। রাগিণী বিভাষ—একতালা

বর হেরে কলেবর যে জ্বলে দিগম্বর ভালে অনলজ্বলে
ঋষিবর খুঁজে বর না পাইয়ে যেমন দৈন্যের ঘরে কনে দিলে,
অঙ্গ আভরণ, মেখেছে ভস্ম গুণের মধ্যে পেটসর্ব্বস্ব
সবাকার সব, সবেরি দৃশ্য, রঙ্গে ভঙ্গে পড়িছে চংল,
ঢং করে রঙ্গ-রমণী পাইয়ে কোথা ছিল মালা এমন অলপেয়ে
গিরিবর খুঁজে বর না পাইয়ে এমন দৈন্যের ঘরে কন্যা দিলে
রাণী আয় আয় জামাই দেখবি আয়,
এমন ঘরে এমন বরে এমন মেয়ে দেওয়া যায়।
অকলঙ্ক শশী সমারূপে গিরি বালা তায়
ভুতুড়ে সাপুড়ে বুড়ো ঘণ ঘণ গাঁজা খায়
ভুলে দিলে ঢলে পড়ে বিভোল সদা নেশায়
দৃশ্যেতে কুসগু পাকা ভস্মি মাখা খর্ব্বকায়
উদর মোটা মাথায় জটা ফণী বেড়া আছে তায়
জলে ফেলে উমায় দিলে কাছে গেলে সাপে খায়
গোলাপ ফেলে বিল্বদলে পূজলে পরে তুষ্ট তায়
হয়ে হরিষ খায় সদা বিষ রাগলে পরে খরিষ প্রায়
ভালে আগুন বিধি বিগুন পোড়া কপাল তায় ঘটায়
কর্ম্মে কুড়ে বলদ চড়ে পোস্তাটা সিদ্ধি ঘোটায়
আবার শুনি সুরধনী বেখে নাকি জটায়
হোক বালাই মরণ ত নাই, এই কোরে দেশটা জ্বালায়
তখন ভবানী ভঙ্গিতে ভবে বলিলেন আভাসে
দেবমূর্ত্তি হও দেব লোকেতে কুভাষে
ইঙ্গিতে সে ভঙ্গি, শিব পরি হরি বেশ
মদনারি হলেন তখন মদন হতেও বেশ
দেখে যত রমণিগণ মদনে আবেস
বেশ দেখে সবাই বলে কি বেশ কি বেশ।

তখন মুকুটমণ্ডিত মণি, ফণা লুকায়েছে
বিচিত্র সুচিতাম্বর, বাঘম্বরা গেছে,
বর লয়ে বলছে যত গিরিপুর-নারী
অপরূপ রূপ দেখে বলে একি হেরি।
বিবাহ নির্ব্বাহ করি বর নিয়ে বাসরে
হেরয়ে বরের রূপ মুখে বাক্য নাহি সরে
কৌতুকে যৌতুক দিব্য দেয় গিরি রাণী
হরের বেশে হরে মন, ভোলে সব রমণী।

গান

নারী সব দেখে বর বলে কিছার ইন্দুবর
কিবা নাসা নাসা খগবর।
গৌরীকে দিলে বর পেয়েছে মনোমত বর
ভাল বর আনিলে গিরিবরে।
আমরা হেসেছিলাম দেখে বর ছাদলা-তলায় দিগম্বর
এখন দেখি বিচিত্র অম্বর।
আমরা যে পেয়েছি বর সে বর মাখালে বর
সদা পরিচ্ছন্নাম্বর দিতে পারে না অম্বর
রক্তাম্বর কি ভাল পিতাম্বর।
জননি কেবল বাকস্বরে ঘরে যেতে মনকি সরে
অঙ্গে জরা পতির আঁখি সবে।
হাতের জলকি ভূমে সরে কড়াকড়ি পাছে সরে
অতীত পতিত নাম শুনে সবে।
পিতা মা হলে ভূপতি কন্যার কি মেলে ভাল পতি
তার সাক্ষী দেখ পশুপতি।
হয়েছে পার্ব্বতীর পতি, সবাই বলে জগৎপতি
তার গুরু গৌরী পেলে পতি।

আগমনী

১নং

একদিন নিশি শেষে গিরিরাণা নিদ্রাবেশে
স্বপ্নযোগে করে সন্দর্শন।
স্বীয় কন্যা উমাশশী শিয়রে আসিয়ে বসি
মৃদুস্বরে বলিছে বচন।

শুনগো পাষাণ-জায়া কি তব পাষাণ কায়া
শ্মশানবাসিনী করে মোরে।
সম্বৎসর তনয়ার তত্ত্ব না লইলে আর
কি মায়া না তোর শরীরে।
পিতা আমার গিরিবর, দিয়ে বর দিগম্বর
নিশ্চিন্ত আছেন বাসে
সিদ্ধি ঘুটে চিরকাল অঙ্গ হলো আমার কালি
জননী গো কি সুখ কৈলাসে।
হায় সেই পাগলের নারী আর দুঃখ সইতে নারি
অতিশয় কষ্টে প্রাণশেষ,
শয়নে চর্ম্ম বিছাই সদা অঙ্গে মাখি ছাই
তৈলাভাবে জটা বাঁধে কেশ।
পতি সেই মহাকাল ভিক্ষাতে কাটান কাল
কষ্টে কাল যায় কালকূট খেয়ে,
গাঁজা ভাঙ্গে অভিভূত সঙ্গে সদা ফেরে ভূত
দর্পকরে সর্পগুলো গায়ে।
নাহি অন্ন অতিদিন কোনদিন যায় দিন
গঙ্গাজল বিল্বদল আহারে
ভেবে তনু হইল কৃশ বিষয়ের মধ্যে বৃষ
দেখতে পাই বুড়াটার ঘরে।
মা তোর কঠিন প্রাণ দরিদ্রে করিয়ে দান
কন্যা জন্য না ভাবিলি আর।
এই দুঃখ করে বর্ষণ অমনি উমা অদর্শন
নিদ্রাভঙ্গ হইল মেনকার।
কাঁদে রাণী পড়ে ধরা নয়নে বহে অশ্রুধারা
কোথায় গো মা তনয়া তারা বলে।
ধূলাতে ধূসর অঙ্গ উথলে মায়া তরঙ্গ
মহামায়ার মায়ার ঢেউ উথলে
রাণীকে দেখে কাতরা পুরবাসিনী গণে তারা,
জিজ্ঞাসিছে করি জোড় পাণি
কেনগো মহিষী কুণ্ঠিতা মহীতলে লুণ্ঠিতা
শুনে কেঁদে কহেন পাষাণী।

ক্রমশঃ

সাবমেরিণে উত্তরমেরু-অভিযান—

আর্টিক মহাসাগরে অভিযান করা যে কিরূপ শক্ত ব্যাপার তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। এরূপ ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল সাগর আর নাই। চারিদিকে বড় বড় বরফের পাহাড় আর বরফের দ্বীপ—চারিদিক বরফেই পূর্ণ। অনেকে অনেকবার এই স্থানে অভিযান করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হ'ন নাই; কারণ এখানে জাহাজ চালান দুষ্কর।

সম্প্রতি একজন সাবমেরিণে এই মহাসাগর অতিক্রম করিয়া উত্তর-মেরুতে যাইতে পারিয়াছেন। ইঁহার নাম স্যর হিউবার্ট উইলকিন্‌সে। পূর্ব্বে কয়েকজন জার্ম্মেনী জেপ্‌লিনের সাহায্যে উত্তর-মেরু পরিদর্শনে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং নানা নূতন স্থানও আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার উইলকিন্‌সে জলের ভিতর দিয়া সাগর অতিক্রম করিয়াছেন।

উইলকিন্‌সের সাবমেরিণের নাম নটীলাস্। নটীলাসের আরোহিগণ আর্টিকের বিশাল বরফরাশির তলদেশ দিয়া যাওয়া খুবই সৌভাগ্য বলিয়া জানিয়াছেন। এ সৌভাগ্য লাভ করিতে যে কিরূপ অসীম সাহসিকতা তাহাদের অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়প্রদ

সার হিউবার্ট 'নটীলাস'এ আরোহণ করিয়া উত্তর-মেরুর শেষ সীমানা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত আর কেহই

নটীলাসের বার্গেনে পৌছিবার সময়
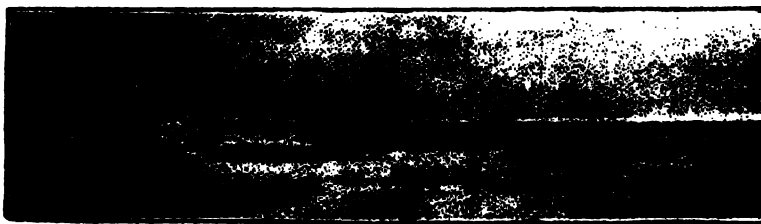
— আর্টিক-মহাসাগরের উপর নটীলাস —

—সাবমেরিণ সমুদ্রের গর্ভে নামিয়া যাইতেছে—

-আর্টিক-মহাসাগরের মধ্যে বরফের উপর হইতে বেতারে অন্যস্থানে সংবাদ-প্রেরণ-
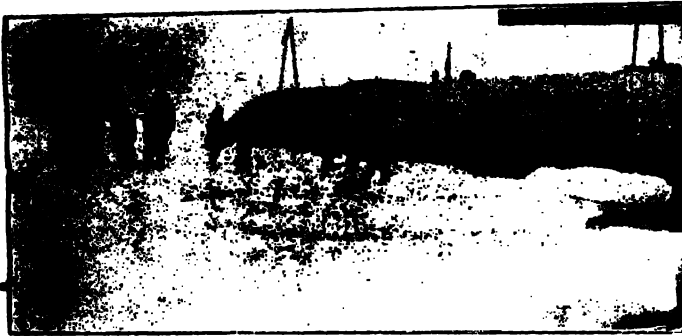
— বরফের উপর নটিলাস-যাত্রিগণ —

এতদূর যাইতে পারে নাই। প্রথম যখন ইনি যাত্রা করেন, তখন কেহ ভাবিতে পারে নাই যে ইনি ফিরিয়া আসিবেন—হয় তো কোথায় বরফের তলায় আটকাইয়া থাকিবেন—সেইখানেই তাঁহাদের মৃত্যু হইবে, কিন্তু সে আশঙ্কা হিউবার্ট রাখিতে দেন নাই। এই দুর্গম অভিযান হইতে ফিরিয়া তিনি জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

স্যর উইলকিন্‌সে কেবলমাত্র যে উত্তর-মেরু পরিক্রম করিয়াছেন, তাহা নহে, নানা নূতন নূতন স্থানও আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই ভীষণ মহাসাগরের দুর্গম পথ হইতে তিনি বেতারে বহির্জগতে সংবাদ দিতেন।

জাপানের নূতন প্রধান মন্ত্রী—

মিঃ হামাগুচী জাপানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি পদত্যাগ করায় ব্যারন্ রেজিরো বাকাট্‌চুকী প্রধান মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। গত এপ্রিল মাসে এই

জাপানের নূতন প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী

নির্ব্বাচন হয়। আমরা নূতন প্রিমিয়র ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর একখানি ছবি দিলাম।

জাপানের কয়েকটী রীতিনীতি—

ধনুর্ব্বিদ্যা জাপানের একটী অতি আদরের জিনিস। উৎসব প্রভৃতিতে ধনুর্ব্বিদ্যা-কৌশল দেখান জাপানীদের একটা মস্ত রীতি। পার্শ্বের ছবিতে একটী উৎসবে একজন ধনুর্ব্বিদ্যা প্রদর্শন করিতেছে—ইহার নাম মিঃ কাকো মেয়া

জাপানের একটী উৎসব

গৌতমের স্মৃতিকল্পে ফুলোৎসব

জাপানীগণ প্রতি বৎসর গৌতম বুদ্ধের স্মৃতিরক্ষার্থ এক বিরাট্ ফুলোৎসবের অনুষ্ঠান করে। লক্ষ লক্ষ নরনারী ইহাতে যোগদান করে। পূর্ব্বে উৎসবের যে ছবিটী দেওয়া হইয়াছে, তাহা গত বৎসর জাপানের টোকিও শহরের হাচিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে শ্যাম-দেশের সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী যোগদান করিয়াছিলেন।

উপাসনা-মন্দিরে যাহাদের মাথায় টাক আছে তাহাদের আদর খুব বেশী। এই ছবিতে যাহারা উপাসনায় যোগ দিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই মাথায় টাক।

মাথায় টাক-ওয়ালাদের উপাসনা

জাপানী উৎসবে ধনুর্ব্বিদ্যা

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার প্রথমে যে দেওয়া গিয়াছে, উহা জাপানের

—জাপানের নৃত্য-রীতি —

একটী বিশেষ উৎসবের চিত্র। চামীডা পার্কে উহা সংঘটিত হইয়াছে। ৩০০ বৎসর ধরিয়া জাপানীগণ এই উৎসব পালন করিতেছে।

নৃত্য-গীত জাপানীরা খুব ভালবাসে। জাপানের রাজ-অঙ্গনে অনেক যুবতী নাচিয়া রাজার মঙ্গল কামনা করে—এটা তাহাদের রীতি। গতবৎসর যে নৃত্য হইয়াছিল তাহাতে প্রায় ৪০০ তরুণী যোগদান করিয়াছিল।

তাহারা বাহিরে নানা প্রকার উপায় দ্বারা কৃষকগণের উৎপন্নের সাহায্য করিতেছে। ৬৫ জন এই দলটীর গঠন করিয়াছে। এই দলের অর্দ্ধেক ছাত্র ও অর্দ্ধেক বেকার। কাজ করিবার সময়ের তাহাদের একখানি ছবি নিয়ে দিলাম।

সাসেক্সের একটী পুরাতন রীতি—

সকল দেশের একটা না একটা অদ্ভুত রীতি থাকে।

—জাপান-ছাত্রগণের স্বেচ্ছাসেবকতা—

জার্ম্মেনীর স্বেচ্ছাসেবক ছাত্র—

জার্ম্মেনীর ছাত্রগণের অবস্থা বিশেষ সচ্ছল নয়, সেইজন্য অন্য উপায়ে যাহাতে তাহাদের খোরাক-পোষাকের ব্যবস্থা হয় তাহাই তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য। সম্প্রতি টুবেঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ একটি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছে।

সাসেক্সে একটী রীতি আছে—সেটী একটী পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা। পর পৃষ্ঠায় আমরা যে ছবিটী দিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে যে, একটী দল তরুণ যুবক পাহাড়ের গাত্র বহিয়া উপরে উঠিতেছে—উহারা সকলেই ছাত্র। পাহাড়ে উঠিবার সময় লাটীন ভাষায় তাহারা একটী সঙ্গীত করে। ঐ গান গাহিবার যোগ্যতা অনুসারে উহাদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

—সাসেক্সের হার্ষ্টপিয়ার পয়েন্ট কলেজের ছাত্রগণ পাহাড়ে উঠিতেছে—

সাসেক্সের ন্যায় ইউরোপের অন্যান্য ছাত্রগণের মধ্যে এই জাতীয় রীতি ও সঙ্গীতাদির প্রচলন আছে।

—— শ্রীশৌরীন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(শিলং কেন্দ্র)

শিক্ষা, সেবা ও প্রচার এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। এই শিলংকেন্দ্রের শিক্ষা :—

ক। সেলা মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় ও ২টী নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়।

খ। নংউয়ার উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়।

গ। মউলং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ঘ। উম্‌ওয়াই নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নৈশ বিদ্যালয়।

ঙ। জোয়াই নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। ইহা আপাততঃ বন্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৩০ নভেম্বর মাস হইতে ওয়ারলং গ্রামেও একটি বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এই সমুদয় বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ছাত্র-সংখ্যা (১৯৩০) :—

সেলা	৮৭
মউলং	৩৫
নংউয়ার	৪০
উম্‌ওয়াই	৩০
জোয়াই	৩০

এবং শিক্ষক সংখ্যা :—বাঙ্গালী ৯জন, খাসিয়া ৩ জন। সেলা, সুনামগঞ্জ ও শিলংএ ৩টী বোর্ডিং পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান ছাত্র-সংখ্যা (১৯৩০) :—

সেলা	৮ হইতে ১০
সুনামগঞ্জ	৪
শিলং	৫

এখানে গরীব ছাত্রদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য দেওয়া হয়। একটী গরীব ছাত্রীকে বিনা খরচে কলিকাতা নিবেদিতা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়ান হইতেছে।

সেবা বিভাগ :—সেলা-আশ্রম-ঔষধালয় হইতে গত বৎসর মোট ১৩২৯ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। নূতন রোগীর সংখ্যা ৬৯২ ছিল।

প্রচার-বিভাগ :—সেলার বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে প্রতি রবিবারে,'হরিসভা'র অধিবেশন হয়। গীতা,রামায়ণ,চরিতামৃত, কথামৃত প্রভৃতি শাস্ত্রীয় পুস্তক খাসীয়া ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। জন্মোৎসব, ঝুলন, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, কালীপূজা প্রভৃতিও বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শত শত খাসীয়া

কয়েকজন কর্ম্মী

সেলা মাইনর ইংরেজী বিদ্যালয়ের কয়েক জন ছাত্র

স্ত্রী-পুরুষ সানন্দে ঐ সব উৎসবে যোগদান করিয়া থাকে।

ম্যাজিক-লণ্ঠনে বক্তৃতা :—'শ্রীগৌরাঙ্গ', 'প্রহ্লাদ', 'ম্যালেরিয়া', 'সাধারণ স্বাস্থ্য', 'জগতে ভারতের স্থান', 'রামকৃষ্ণ', 'বিবেকানন্দ', ইত্যাদি বিষয়ে সেলা, শিলং প্রভৃতি স্থানে ১০।১৫টী বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে গড়ে ৫০।৬০ জন উপস্থিত ছিল।

লাইব্রেরী :—বর্ত্তমানে সেলা আশ্রমের পুস্তকাগারে নানারূপ পুস্তক ২৭৫ খানি আছে। এতদ্ব্যতীত শিলং-আশ্রম-কেন্দ্রে 'বিবেকানন্দ লাইব্রেরী'টী পারচালক-সমিতির হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রকারের ৩১৮ খানি এবং শিশুপাঠ্য অনেকগুলি পুস্তক আছে। কর্ম্মীদের দ্বারা স্কুল-পাঠ্য ও ধর্ম্মবিষয়ক ৪।৫ খানি বই খাসীয়া ভাষায় লেখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও পুস্তকাদি প্রকাশিত হইতেছে।

সেলার সাপ্তাহিক হরিসভার একটী অধিবেশন

বর্ত্তমান প্রয়োজন :—আরও স্কুল খোলা দরকার এবং একটী স্কুলে স্থানীয় কর্ম্মী তৈয়ারী করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বিভিন্ন পার্ব্বত্য জাতিদের মধ্যে সমিতির কার্য্য প্রসার করিতে হইবে। এসব কার্য্যের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন।

———:০:———
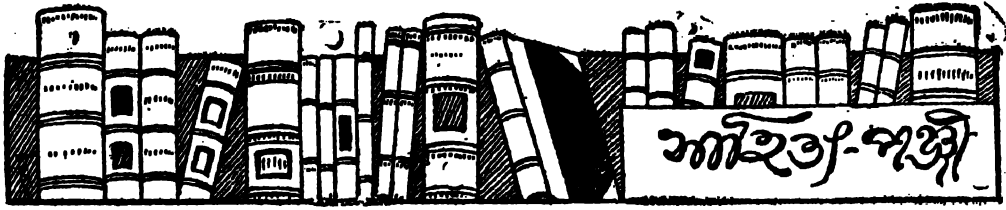
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

১২৯১ বঙ্গাব্দের ৩রা আশ্বিন (ইং ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) বৃহস্পতিবার মহালয়া তিথিতে কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে মাতুলালয়ে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি "হিন্দু-পেট্রিয়ট" ও "বেঙ্গলী" পত্রের প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক, বিখ্যাত বাগ্মী ও দেশনায়ক গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র। ইঁহার পিতা (অধুনা অবসরপ্রাপ্ত সবজজ) শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ইংরেজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ব্যতীত অন্যান্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাতেও যথেষ্ট অধিকার ও অনুরাগ আছে। ইনি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী কবিদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির যে ইংরেজী পদ্যানুবাদ করিয়াছেন এবং যাহার কতকগুলি মাত্র "ডেথলেস্-ডিটিস্" নামক কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার ইংরেজী পদ্যরচনার বিশেষ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ "ক্যাপ্‌টিভ লেডী" ইনি সুললিত বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের একটী অভাব মোচন করিয়াছেন। ইনি কবি জয়দেব প্রণীত-"প্রসন্ন-রাঘব" নামক সংস্কৃত নাটকখানিও বাঙ্গালা ভাষায় যথেষ্ট কৃতিত্বের সহিত অনুবাদ করিয়াছেন, উহা এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই (কিয়দংশ মাত্র 'প্রবাহিনী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল)। মন্মথনাথের জননীও সুপ্রসিদ্ধ লেখক বাগ্মী ও দেশনায়ক কিশোরীচাঁদ মিত্রের দৌহিত্রী এবং বিদুষী ও বুদ্ধিমতী রমণী। বাঙ্গালা-সাহিত্যে এমন কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নাই যাহা ইঁহার অপঠিত। মন্মথনাথ বলেন তাঁহার জননী 'সজীব বিশ্বকোষ'।

মন্মথনাথ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে তাঁহার পিতার কর্ম্মস্থল নওগাঁতে (রাজসাহী জিলা) কৃষ্ণধন হাইস্কুলে নবম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল মহাশয় এই বিদ্যালয়ে মন্মথনাথের সহপাঠী ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ডবল প্রমোসন পাইয়া মন্মথনাথ পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেন। ঐবৎসরের মধ্যভাগে তিনি কলিকাতার সেণ্ট্রাল কলিজিয়েট স্কুলে প্রবেশ লাভ করেন এবং উক্ত বিদ্যালয় হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাল্যকালে চিত্রাঙ্কনে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং প্রবেশিকা

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

পরীক্ষায় চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। অতঃপর ইনি উচ্চশিক্ষার জন্য জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশনে (এক্ষণে স্কটীশ চার্চ্চ কলেজ) প্রবিষ্ট হন এবং অধ্যক্ষ ডাক্তার মরিসন-প্রমুখ য়ুরোপীয়গণের নিকট ইংরেজী

সাহিত্য, আচার্য্য গৌরীশঙ্কর দের নিকট গণিত, আচার্য্য অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট তর্কবিদ্যা ও ইতিহাস, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, বরুণচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নিকট পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন, পণ্ডিত নন্দলাল ভট্টাচার্য্য এবং বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সংস্কৃত-সাহিত্যে উপদেশ লাভ করিয়া বিশেষ উপকৃত হন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রথম বিভাগে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা-রচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "বঙ্কিমচন্দ্র"-পদক প্রাপ্ত হন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইনি গণিতে সম্মানের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলেজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার এবং ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। বি-এ ক্লাসে সুকবি ৺সত্যেন্দ্র দত্ত, সমালোচকশ্রেষ্ঠ ৺অজিত চক্রবর্ত্তী ও সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ইঁহার সহপাঠী ছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইনি জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে বিশুদ্ধ-গণিতে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসনে এম্-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজেও বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ডাক্তার সি-ই-কালিস সাহেবের নিকট মিশ্রগণিত এবং সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক এইচ এম পার্সিভ্যালের নিকট ধনবিজ্ঞান শিক্ষা করেন। এই সময়ে কয়েকমাস রিপণ কলেজেও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নিকট ব্যবস্থাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে ইঁহার বিবাহ হয় এবং উক্ত বৎসর জুলাই মাসে ইনি কণ্ট্রোলার জেনারেলের অফিসে এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতীয় রাজস্ব বিভাগে উচ্চতর কর্ম্মের জন্য 'এনরোল্ড লিষ্ট' পরীক্ষা দেন কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। তখন উক্ত পরীক্ষা আই-সি-এস পরীক্ষার ন্যায় কঠিন ছিল। সেবারে দুই জন মাত্র ভারতবাসী (বাঙ্গালী নহে) সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন ; যিনি দ্বিতীয় হইয়াছিলেন তিনি এক্ষণে স্বর্গগত, যিনি প্রথম হইয়াছিলেন তিনি উক্ত কর্ম্মপ্রাপ্তির পর রাজকর্ম্ম স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া উচ্চতর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আজ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন,—তিনি আর কেহই নহেন,—স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণ। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মন্মথনাথ আর একবার উক্ত পরীক্ষা দেন, সেবারেও দুইজন সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন বাঙ্গালী,—আচার্য্য গৌরীশঙ্কর দে'র জামাতা প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিধারী শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস। মন্মথনাথ যখন কণ্ট্রোলার জেনারেলের অফিসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত, তখন রাজধানী এবং কণ্ট্রোলার-জেনারেলের অফিস দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। কতিপয় ব্যক্তিগত কারণবশতঃ ইনি দিল্লী যাইতে অস্বীকৃত হ'ন এবং দ্রুত পদোন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া কলিকাতায় ইণ্ডিয়া ট্রেজারী সমূহের কণ্ট্রোলারের অফিসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ গ্রহণ করেন। যে সকল কারণে আর্থিক উন্নতির প্রলোভন ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় থাকিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হ'ন, তন্মধ্যে কলিকাতায় জ্ঞানচর্চ্চার সুবিধা অন্যতম প্রধান কারণ। ইনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়্যাল ষ্টাটিষ্টিক্যাল সোসাইটী এবং রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটীর ফেলো বা সদস্য নির্ব্বাচিত হন। মন্মথনাথ কিছুদিন একাউণ্টেণ্ট জেনারেল সেণ্ট্রাল রেভিনিউজ অফিসে এসিষ্ট্যাণ্ট একাউণ্টস্ অফিসার ছিলেন এবং পরে 'সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র 'পে এণ্ড একাউণ্টস্ অফিসারে'র দায়িত্বপূর্ণ পদে উন্নীত হ'ন।

মন্মথনাথ কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেসন, ইণ্টারমিডিয়েট ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে এম্-এ উপাধিপ্রার্থীর থিসিস পরীক্ষার জন্য তিনি একবার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হিসাব-বিভাগের শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া সাহিত্য-সেবার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যায় না বলিয়া মন্মথনাথ দুঃখপ্রকাশ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা-সাহিত্যের জীবন-চরিত-বিভাগে যথেষ্ট কর্ম্মী নাই দেখিয়া তিনি প্রধানতঃ এই বিভাগে তাঁহার শক্তি বিনিয়োগ করিয়াছেন। এই বিভাগে তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন সুধীগণ তাহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছে। এই কার্য্যের জন্য মন্মথনাথকে বহু অর্থব্যয়ে অনেক প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও কাগজপত্র সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থাগারে এমন অনেক গ্রন্থ আছে যাহা আর কোথাও পাওয়া যায় না।

মন্মথনাথের প্রকাশিত গ্রন্থগুলির একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল —

Life of Grish Chunder Ghose. by one who knew him 1. 1. 1911
Selections from the writings of Grish Chunder Ghose. ... 5. 6. 1912
মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ ১লা আশ্বিন ১৩২২
রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১০ই পৌষ ১৩২৪
হেমচন্দ্র ১ম খণ্ড ১লা বৈশাখ ১৩২৬
Memoirs of Kali Prosunno Singh 24. 7 19.20
হেমচন্দ্র ২য় খণ্ড ১লা ভাদ্র ১৩২৭
হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০
নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৩৩০
সেকালের লোক ১লা বৈশাখ ১৩৩০
মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র ১ বৈশাখ ১৩৩১
কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৩৩৩
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ২রা ভাদ্র ১৩৩৪
বাঙ্গালা সাহিত্য ১৭ই শ্রাবণ ১৩৩৫
হেমচন্দ্র ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ) ২৮শে কার্ত্তিক ১৩৩৫
রঙ্গলাল ৩রা আশ্বিন ১৩৩৬

মন্মথনাথের অধিকাংশ রচনা এখনও সাময়িক পত্রাদিতে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে—গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার রচনাগুলির একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তালিকাটী সম্পূর্ণ নহে। উহা ব্যতীত তাঁহার অনেকগুলি বেনামী-রচনা এবং পুস্তক সমালোচনাদি সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রদান করা সম্ভব নহে।

১৩২০

ভাদ্র	স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্রের রোজনামচার একপৃষ্ঠা	সাহিত্য
আশ্বিন	ধারকরা শাল (গল্প) (৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের ইংরেজী হইতে অনুবাদিত)	আর্য্যাবর্ত্ত
অগ্রহায়ণ	কিশোরীচাঁদ মিত্র (১)	ঐ
পৌষ	বাসনা (কবিতা) (৺কালীপ্রসাদ ঘোষের ইংরাজী হইতে)	আর্য্যাবর্ত্ত
	কিশোরীচাঁদ মিত্র (২)	ঐ
মাঘ	কিশোরীচাঁদ মিত্র (৩)	ঐ
ফাল্গুন	দেশব্রত হরিশ্চন্দ্র	সাহিত্য
	কিশোরীচাঁদ মিত্র (৪)	আর্য্যাবর্ত্ত

১৩২১

বৈশাখ	কিশোরীচাঁদ মিত্র (৫)	আর্য্যাবর্ত্ত
জ্যৈষ্ঠ	কিশোরীচাঁদ মিত্র (৬)	ঐ
আষাঢ়	কিশোরীচাঁদ মিত্র (৭)	ঐ
শ্রাবণ	কিশোরীচাঁদ মিত্র (৮)	ঐ
ভাদ্র	কিশোরীচাঁদ মিত্র (৯)	আর্য্যাবর্ত্ত
আশ্বিন	সেকালের শিক্ষা (১)	ঐ
কার্ত্তিক	সেকালের শিক্ষা (২)	ঐ
	দুঃখ (কবিতা) (৺কালীপ্রসাদ ঘোষের ইং হইতে)	ঐ
	রামগোপাল ঘোষ	ঐ
অগ্রহায়ণ	প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্মৃতিসভায় কিশোরীচাঁদ মিত্র	সাহিত্য
	কিশোরীচাঁদ মিত্র (১০)	আর্য্যাবর্ত্ত
	লালবিহারী দে	যমুনা
ফাল্গুন	রামগোপাল ঘোষের স্মৃতিসভায় কিশোরীচাঁদ	সাহিত্য

১৩২২

বৈশাখ	দেশহিতব্রত গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে	যমুনা
জ্যৈষ্ঠ	স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র	ঐ
শ্রাবণ	স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র	ঐ
ভাদ্র	ডিঙ্কওয়াটার বেথুন ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	ঐ
আশ্বিন	অম্বা (সমালোচনা)	ঐ
কার্ত্তিক	বিচ্ছেদে (কবিতা) (কাপ্তেন ডি, এল রিচার্ডসনের ইং হইতে)	অর্চ্চনা
অগ্রহায়ণ	প্যারীচাঁদ মিত্রের স্মৃতিসভা	যমুনা

১৩২৩

আষাঢ়	প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাল্য রচনা	সাহিত্য
	বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র	যমুনা
শ্রাবণ	মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু (১)	মানসী ও মর্ম্মবাণী
ভাদ্র	মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু (২)	ঐ
আশ্বিন	ভুল (গল্প)	যমুনা
কার্ত্তিক	নীরবকর্ম্মী রমাপ্রসাদ রায় (১)	মাঃ মঃ
	কালীপ্রসাদ ঘোষ	যমুনা

অগ্রহায়ণ বঙ্কিমবাবুর প্রবন্ধ (হিন্দুদর্শনের আলোচনা) সাহিত্য
নীরবকর্ম্মী রমাপ্রসাদ রায় (২) মাঃ মঃ
স্বর্গীয় বিহারীলাল গুপ্ত যমুনা
পৌষ বঙ্কিমবাবুর আর একটী প্রবন্ধ (নব্য বাঙ্গালীর স্বীকারোক্তি) সাহিত্য
কণ্ঠাভরণ (গল্প) যমুনা
মাঘ বাঙ্গালা সাহিত্য (১) (বঙ্কিমবাবুর ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে অনূদিত সাহিত্য
ফাল্গুন বাঙ্গালা সাহিত্য (২) ঐ ঐ
রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১) মাঃ মঃ
চৈত্র রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (২) ঐ
ভ্রাতৃজায়া (কবিতা) (ডিরোজিওর ইং হইতে) যমুনা

১৩২৪

বৈশাখ বাঙ্গালা সাহিত্য (৩) সাহিত্য
রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (৩) মাঃ মঃ
রাজা স্তর রাধাকান্ত দেব যমুনা
জ্যৈষ্ঠ বাঙ্গালা সাহিত্য (৪) সাহিত্য
রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (৪) মাঃ মঃ
মহাত্মা নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর (১) মালঞ্চ
৺মধুসূদন বাচস্পতি যমুনা
আষাঢ় রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (৫) মাঃ মঃ
মহাত্মা নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর (২) মালঞ্চ
শ্রাবণ রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (৬) মাঃ মঃ
মহাত্মা নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর (৩) মালঞ্চ
ভাদ্র দাদাভাই নৌরোজী মাঃ মঃ
আবদুল রসুল ঐ
মহাত্মা নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর (৪] মালঞ্চ
আশ্বিন মহাত্মা নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর (৫) ঐ
ফাল্গুন হেমচন্দ্র ১ম খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ মাঃ মঃ
সেকালের গল্প ভারতী
চৈত্র হেমচন্দ্র (১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ) মাঃ মঃ

১৩২৫

বৈশাখ হেমচন্দ্র ১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ মাঃ মঃ
আষাঢ় হেমচন্দ্র ১ম খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ ঐ
শ্রাবণ হেমচন্দ্র ১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ ঐ
ভাদ্র হেমচন্দ্র ১ম খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঐ
আশ্বিন প্রলোভনের পথে (গল্প) ঐ
কার্ত্তিক হেমচন্দ্র ১ম খণ্ড ৭ম প ঐ
ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম ঈশ্বরবাদ মালঞ্চ
অগ্রহায়ণ হেমচন্দ্র ১ম খণ্ড ৮ম পঃ মাঃ মঃ
ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম ঈশ্বরবাদ মালঞ্চ
পৌষ হেমচন্দ্র ১ম খণ্ড ৯ম প (১) মাঃ মঃ
জননী (গল্প) যমুনা
মাঘ হেমচন্দ্র ১ম খণ্ড ৯ম প (২) মাঃ মঃ
৺ স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাহিনী
ফাল্গুন হেমচন্দ্র ২য় খণ্ড ১ম প মাঃ মঃ
আনন্দময়ী প্রবাহিনী

১৩২৬

বৈশাখ হেমচন্দ্র ২য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ মাঃ মঃ
জ্যৈষ্ঠ স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মুকুল
আষাঢ় স্বদেশ (৺ রায় শশীচন্দ্র দত্ত বাহাদুরের ইং হইতে) মুকুল
শ্রাবণ হেমচন্দ্র ২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ (১) মাঃ মঃ
হরিশ্চন্দ্র ও দীনবন্ধু ভারতী
ভাদ্র হেমচন্দ্র ২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ (২) মাঃ মঃ
কার্ত্তিক হেমচন্দ্র ২য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ (১) মাঃ মঃ
অগ্রহায়ণ হেমচন্দ্র ২য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ (২) মাঃ মঃ
পৌষ মেঘনাদ বধ সম্বন্ধে আলোচনা মাঃ মঃ
ফাল্গুন আলোচনা (মেঘনাদ বধ সম্বন্ধে আলোচনা) মাঃ মঃ
চৈত্র হেমচন্দ্র ২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ (১) মাঃ মঃ

১৩২৭

বৈশাখ হেমচন্দ্র ২য় খণ্ড ৫ম পঃ (২) মাঃ মঃ
জ্যৈষ্ঠ হেমচন্দ্র ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ পঃ মাঃ মঃ
বৌদিদির দৌত্য (গল্প) যমুনা
আষাঢ় হেমচন্দ্র ২য় খণ্ড ৭ম পঃ (১) মাঃ
ভারতবর্ষ (কবিতা) (৺হরচন্দ্র দত্তের ইং হইতে অর্চনা

শ্রাবণ হেমচন্দ্র ২য় খণ্ড ৭ম পঃ (২) মাঃ মঃ
বিদ্যাসাগর
পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী (১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
ভাদ্র পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী (২) ঐ
আশ্বিন আশুতোষ অঞ্জলি
কার্ত্তিক আমার গুরু (গল্প) যমুনা
পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী (৩)তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
অগ্রহায়ণ হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ১ম প মাঃ মঃ
পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী(৪) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
পৌষ হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ২য় পঃ মাঃ মঃ
মাঘ স্বর ও সঙ্গীত (কবিতা) (লংফেলো হইতে) অর্চ্চনা
ফাল্গুন হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৩য় পঃ মাঃ মঃ
বাণী সেবায় জ্ঞানশরণ অর্চ্চনা
মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ অঞ্জলি
চৈত্র ৺ডাক্তার স্তর রাসবিহারী ঘোষ
বর্ষার দিনে (কবিতা) লংফেলো হইতে অর্চ্চনা
মতিলাল শীল (সংবাদ প্রভাকর হইতে সঙ্কলিত) ঐ
সাহিত্য বিপ্লব ও বিজ্ঞান বিকাশ (সোমপ্রকাশ হইতে সঙ্কলিত) অর্চ্চনা

১৩২৮

জ্যৈষ্ঠ হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৪র্থ প মাঃ মঃ
স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অঞ্জলি
মনীষী কিশোরীচাদ মিত্র (১) তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা
আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অঞ্জলি
শ্রাবণ হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৫ম প মাঃ মঃ
মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র (২)তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
ভাদ্র ডেভিড হেয়ার অঞ্জলি
আশ্বিন কৃষ্ণদাস পাল ঐ
কার্ত্তিক মহাত্মা জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন মাঃ মঃ
গিরিশচন্দ্র ঘোষ অঞ্জলি
অগ্রহায়ণ হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৬ষ্ঠ প মাঃ মঃ
মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র (৩) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
জন্মদিনে (কবিতা) যমুনা
দ্বৈকনাথ ঠাকুর অঞ্জলি
পৌষ হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৭ম প (১) মাঃ মঃ
কিশোরীচাঁদ মিত্র অঞ্জলি
চৈত্র হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৭ম প (২) মাঃ মঃ
মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র (৪) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

১৩২৯

বৈশাখ তুষানল (হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের অসঙ্কলিত-পূর্ব্ব কবিতা) মাসিক বসুমতী
জ্যৈষ্ঠ হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৭ম প (৩) মাঃ মঃ
আষাঢ় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের ইং হইতে) নব্যভারত
শ্রাবণ হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৮ম প (১) মাঃ মঃ
ভাদ্র হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় অর্চ্চনা
মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র (১) মাসিক বসুমতী
আশ্বিন দুর্গেশনন্দিনী (রহস্য-সন্দর্ভ হইতে সঙ্কলিত) অর্চ্চনা
কার্ত্তিক ভারতবর্ষ (কবিতা) (৺কালীপ্রসাদ ঘোষের ইং হইতে) নব্যভারত
বিজয়া (হেমচন্দ্রের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব কবিতা) মাসিক বসুমতী
মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র (৩) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
অগ্রহায়ণ হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৮ম পঃ (২) মাঃ মঃ
হেমচন্দ্রের গদ্যরচনা (বঙ্গদর্শন হইতে সঙ্কলিত) অর্চ্চনা
মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র (৬) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
পৌষ হেমচন্দ্র (৬) ৩য় খণ্ড ৮ম প ৩ মাঃ মঃ
মাঘ হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৯ম পঃ (১) ঐ
মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র (২) মাসিক বসুমতী
ফাল্গুন রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মাঃ মঃ
মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র (৭) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

১৩৩০

বৈশাখ হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৯ম প (২) মাঃ মঃ
সেকালের কথা (১) যমুনা
জ্যৈষ্ঠ হেমচন্দ্র ৩য় খণ্ড ৯ম পঃ (৩) মাঃ মঃ
মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র (৮)
আষাঢ় নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১) মাঃ মঃ
শ্রাবণ নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (২) ঐ

শ্রাবণ হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিসভায় রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা নব্যভারত
ভাদ্র সেকালের কথা (২) যমুনা
কার্ত্তিক সেকালের কথা (৩) ঐ
অগ্রহায়ণ ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত মাঃ মঃ
ভারতমাতা সচিত্র শিশির (৭ই অগ্রহায়ণ)
পৌষ ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মাঃ মঃ
মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র (৯) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
ফাল্গুন বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকার্য্যের ইতিহাস সচিত্র শিশির ১১ই ফাল্গুন
মাইকেল মধুসূদন দত্ত অর্চ্চনা
চৈত্র সময়ের গতি (কবিতা) ঐ
মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র (৩) তত্ত্ববোধিনী

১৩৩১

বৈশাখ মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র (১০) তত্ত্ববোধিনী
জ্যৈষ্ঠ আবাহন তরুণলিপি
আষাঢ় বিপদে (কবিতা) (রামশর্ম্মার ইং হইতে) নব্যভারত
মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র (১১) তত্ত্ববোধিনী
শ্রাবণ চিন্তা (কবিতা) (তরুদত্তের ইং হইতে) নব্যভারত
ভাদ্র মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র ১২ তত্ত্ববোধিনী
আশ্বিন মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৩ ঐ
অগ্রহায়ণ ৺স্যর আশুতোষ চৌধুরী ১ মানসী ও মর্ম্মবাণী
মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৩) তত্ত্ববোধিনী
পৌষ ৺স্যর আশুতোষ চৌধুরী (২) মানসী ও মর্ম্মবাণী
থিয়েটারী বিজ্ঞাপন (গল্প) রূপ ও রঙ্গ, ৫ই পৌষ
মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৫) তত্ত্ববোধিনী
ফাল্গুন গিরীন্দ্রমোহিনীর শেষ রচনা মানসী ও মর্ম্মবাণী
হরিমোহন ঠাকুর ঐ
রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম অর্চ্চনা
চৈত্র কিশলয় (সমালোচনা) সচিত্র শিশির, ৭ই চৈত্র
মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৬) তত্ত্ববোধিনী

১৩৩২

বৈশাখ মৃণালিনী (রহস্য সন্দর্ভ হইতে সঙ্কলিত) অর্চ্চনা
জ্যৈষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১) মানসী ও মর্ম্মবাণী
আষাঢ় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (২) ঐ
নকুলবাবুর অভিনয় শিক্ষা (গল্প) রূপ ও রঙ্গ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১) তত্ত্ববোধিনী
শ্রাবণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (২) ঐ
ভাদ্র সুরেন্দ্রনাথ মানসী ও মর্ম্মবাণী
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (৩) ঐ
দাতার বিপদ (গল্প) গল্পলহরী
আশ্বিন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ সচিত্র শিশির
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ৩ তত্ত্ববোধিনী
কার্ত্তিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (৪) মানসী ও মর্ম্মবাণী
গিরীন্দ্রমোহিনীর বাল্য রচনা ঐ
অগ্রহায়ণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (৫) মানসী ও মর্ম্মবাণী
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (৪) তত্ত্ববোধিনী
পৌষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (৬ মানসী ও মর্ম্মবাণী
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (৫) তত্ত্ববোধিনী
ফাল্গুন কলিকাতায় প্রথম ইংরাজের ফাঁসী অর্চ্চনা
স্মৃতি (কবিতা) ঐ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (৬) তত্ত্ববোধিনী
চৈত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (৭) মানসী ও মর্ম্মবাণী
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (৭) তত্ত্ববোধিনী

১৩৩৩

বৈশাখ হীরার ক্রচ (গল্প) গল্পলহরী
জ্যৈষ্ঠ শ্যামাপিসীর উইল (গল্প) ঐ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (৮) তত্ত্ববোধিনী
আষাঢ় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (৯) ঐ
শ্রাবণ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ মাঃ মঃ
ভাদ্র ত্রিশক্তি (সমালোচনা) অর্চ্চনা
আশ্বিন বসন্তক মাঃ মঃ
কার্ত্তিক বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা ঐ
পৌষ মূর্ত্তির মূল্য (গল্প) গল্পলহরী
মাঘ সাহিত্যিক বর্ণপরিচয় (কবিতা) মাসিক বসুমতী
চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব কবিতাবলী মাঃ মঃ

১৩৩৪

বৈশাখ প্রিয়তমার প্রাণনাশ (গল্প) গল্পলহরী

জ্যৈষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১০) তত্ত্ববোধিনী
আষাঢ় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১১) ঐ
শ্রাবণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১২) ঐ
আশ্বিন মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বঙ্গীয় নাট্যশালা নাচঘর ১১ই আশ্বিন
৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর আলপনা
ফাল্গুন প্রায়শ্চিত্ত (গল্প) গল্পলহরী
চৈত্র বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য (গল্প) ঐ

১৩৩৫

বৈশাখ রঙ্গলাল ১ম পঃ মাঃ মঃ
জ্যৈষ্ঠ রঙ্গলাল ২য় পঃ ঐ
মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষ
আষাঢ় রঙ্গলাল ৩য় পঃ মাঃ মঃ
বন্দী (গল্প) গল্পলহরী
মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র ভারতবর্ষ
শ্রাবণ রঙ্গলাল ৪র্থ পঃ মাঃ মঃ
হৃদয় পরীক্ষা (গল্প) গল্পলহরী
রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর ভারতবর্ষ
ভাদ্র রঙ্গলাল ৫ম পঃ মাঃ মঃ
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ভারতবর্ষ
আশ্বিন রঙ্গলাল ৬ষ্ঠ (১) মাঃ মঃ
কার্ত্তিক জননী ঐ
আচার্য্য লালবিহারী দে ভারতবর্ষ
অগ্রহায়ণ রঙ্গলাল ৬ষ্ঠ (২) মাঃ মঃ
হরিশঙ্করের উইল (গল্প) গল্পলহরী
পুরুরাজ (কবিতা) (মাইকেলের ইং হইতে) নবযুগ
পৌষ রঙ্গলাল ৭ম পঃ (১) মাঃ মঃ
মাঘ রঙ্গলাল ৭ম (২) ঐ
ফাল্গুন সহধর্ম্মিনী (১) ঐ
চৈত্র রঙ্গলাল ৮ম পঃ ঐ

১৩৩৬

বৈশাখ রঙ্গলাল ৯ম পঃ (১) মাঃ মঃ
জ্যৈষ্ঠ রঙ্গলাল ৯ম পঃ (২) ঐ
স্নেহের ঋণ (গল্প) গল্পলহরী
আষাঢ় রঙ্গলাল ১০ম পঃ মাঃ মঃ
সহধর্ম্মিণী (২) ঐ
শ্রাবণ রঙ্গলাল ১১শ পঃ ঐ
উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষ
ভাদ্র রঙ্গলাল ১২শ পঃ মাঃ মঃ
আশ্বিন সহধর্ম্মিণী (৩) ঐ
বাহাদুর (গল্প) গল্পলহরী
কার্ত্তিক পিতা ঐ
অগ্রহায়ণ বঙ্গ-ইংলণ্ডীয় কাব্যসাহিত্যে দেশাত্মবোধের
পৌষ বাণী বিচিত্রা
Public characters of Calcutt‸ 1838—45
The Calcutta Municipal Gazette 21. 12. 29
মাঘ ঐ 11. I 30
ঐ III 8. 2. 30

১৩৩৭

বৈশাখ গ্রাণ্টের রেখাচিত্রে সেকালের লোক পঞ্চপুষ্প
জ্যৈষ্ঠ শতবর্ষ পূর্ব্বে কলেজীয় ছাত্রের পদ্য রচনা ঐ
আষাঢ় ভালবাসিতাম তোমা (কবিতা) পঞ্চপুষ্প
বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প গল্পারতি
শ্রাবণ হিতৈষী (গল্প) গল্পলহরী
কাজী (কবিতা) পঞ্চপুষ্প
দীনবন্ধুর গল্প গল্পারতি
ভাদ্র বিদ্যাসাগরের গল্প গল্পারতি
Forgotten citizens of Calcutta I ... Kasi Prosad Ghose. ... C. M. G. 13. 9. 30
কার্ত্তিক শিবচন্দ্র দেব ভারতবর্ষ
অগ্রহায়ণ হেমচন্দ্রের গল্প গল্পারতি
পৌষ The First memorial meeting in Calcutta C. M. G 20. 12. 30
পৌষ রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে কলিকাতাবাসীর প্রথম প্রচেষ্টা (১) বিচিত্রা
মাঘ ঐ (২) ঐ

১৩৩৮

বৈশাখ
Forgotten citizens of Calcutta II. Mutty Lall Seal C. M. G. 25. 4. 31
জ্যৈষ্ঠ বিভীষিকা (গল্প) গল্পলহরী
বিশ্ববিদ্যালয় পত্রীর একপৃষ্ঠা (১) পঞ্চপুষ্প
আষাঢ় ঐ (২) ঐ
শ্রাবণ বঙ্গের মহিলা কবি ঐ
আশ্বিন কবি-পত্নী বিচিত্রা
মাঘ বাটীভাড়া (গল্প) গল্পলহরী

যৎকিঞ্চিৎ

গত মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে 'মধ্যযুগে দক্ষিণ-ভারতে বাঙালীর প্রভাব' নামে একটী উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটী ডক্টর ধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌-এ, মহাশয়ের লেখা। এই সারগর্ভ প্রবন্ধটী আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় 'জানবার কথা'-বিভাগে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। প্রবন্ধটীর কয়েকটী জায়গায় আমাদের কিছু বলিবার আছে। প্রবন্ধকার সূচনায় লিখিয়াছেন, 'বাঙালী বহুকাল দক্ষিণীদের নিকট যুদ্ধে ও ক্ষাত্রবলে পরাজিত হইয়াছে।' জয়-পরাজয় চিরকালই হইয়া থাকে। বাঙ্গালীরাই চিরকাল পরাজিত তাহা বলা চলে না। সেন ও বর্ম্মন্‌-বংশ যেরূপ এদেশে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়াছে, তেমনই বহু পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালী বহুদিন দক্ষিণে রাজ্যস্থাপন করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের গঙ্গ-বংশ, গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক, ভগদত্ত-বংশীয় শ্রীহর্ষ, করবংশ, তুঙ্গবংশ ও সোমবংশী গুপ্তগণই তাহার প্রমাণ। ইহা দ্বারা বাঙ্গালী দাসত্ব-স্বীকার করিয়াছে বলা যায় না। সেন ও বর্ম্মনেরা বাঙ্গালীই হইয়া গিয়াছিলেন।

প্রবন্ধে শৈব আদিগুরুর নাম 'দুর্ব্বাস' স্থলে দুর্ব্বাসা হইবে ও গোলকি-মঠের আচার্য্য 'রামশম্ভু' বামশম্ভু হইবে। এ দুইটী সম্ভবতঃ ছাপার ভুল। বিশ্বেশ্বর শম্ভুর বাড়ী ছিল দক্ষিণ-রাঢ়ের পূর্ব্বগ্রামে। মুর্শিদাবাদ কি দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল? সুতরাং এই পূর্ব্বগ্রাম হুগলী, হাওড়া বা মেদিনীপুর অঞ্চলে হওয়াই সম্ভব। প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে 'ঋক্‌, যজু ও সামবেদ অধ্যাপনার জন্য পাঁচ জন শিক্ষক তিনি (বিশ্বেশ্বর) নিযুক্ত করেন।' স্তম্ভলিপিতে পাঁচ জন অধ্যাপকের কথা নাই, তিন জন অধ্যাপকেরই কথা আছে। লেখক প্রবন্ধের শেষে পাদটীকায় ১৯১৭ সালের সাউথ ইণ্ডিয়ান্‌ এপিগ্রাফির বার্ষিক বিবরণ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন, 'বিশ্বেশ্বর শম্ভুর জীবন বৃত্তান্ত মাদ্রাজের গাণ্টুর জেলার অন্তর্গত মালবন-পুরম গ্রামে আবিষ্কৃত অপ্রকাশিত স্তম্ভলিপি অবলম্বনে লিখিত। 'মালবনপুরম' গ্রামে লিপিটী আবিষ্কৃত হয় নাই, গ্রামের নাম 'মল্‌কাপুরম', আর লিপিটী অপ্রকাশিতও নয়, বহুকাল হইল বিশ্বেশ্বর শম্ভুর এই স্তম্ভলিপি অন্ধ্র-হিষ্টরিক্যাল রিসার্চ-সোসাইটীর জর্ণালে প্রকাশিত হইয়াছে।

'বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর প্রাচীন কীর্ত্তি' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের লিখিত আরও একটী সুলিখিত প্রবন্ধ আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশ করিলাম। কয়েকমাস পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হইয়াছিল।

* * *

গত পৌষমাসের 'শনিবারের চিঠিতে' দীনবন্ধু-সম্বন্ধে নানাকথা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। আলোচনাগুলি প্রশংসার্হ। "দীনবন্ধু মিত্র-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" নানা তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। ইহাতে জানিবার, আলোচনা করিবার অনেক কথা আছে। প্রবন্ধটী চারিভাগে বিভক্ত—(১) অপ্রকাশিত বাল্যরচনা (২) গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা (৩) দীনবন্ধু-রচিত নাটক ও প্রহসনের অভিনয় (৪) জীবনীর উপাদান। প্রথম তিন দফা-সম্বন্ধে আলোচনা আমরা পরে করিব। চতুর্থ দফা-সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব। লেখক 'কৃষ্ণনগরের দীনবন্ধুর বক্তৃতা' উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে মুখবন্ধে যে অংশটী দিয়াছেন তাহা ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত সূচনার হের-ফের মাত্র। ভারতীতে প্রকাশিত অংশ ও লেখকের প্রকাশিত অংশ তুলনীয়—

"১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জুন তারিখে হিন্দুপেট্রিয়টের স্বদেশব্রত সম্পাদক চিরস্মরণীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহলোক হইতে অপসৃত হন। তাঁহার পরলোকগমনে সমগ্র ভারতবর্ষ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল এবং তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থ উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য উৎসুক হইয়াছিল। ...মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্বানুযায়ী সুকিয়াবাগান ষ্ট্রীটে অবস্থিত দুই বিঘা জমি ও পঞ্চ শত মুদ্রা হরিশ্চন্দ্র স্মৃতি-সমিতির হস্তে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হ'ন...।...এই সভায় দীনবন্ধু একটী সুললিত করুণরসপূর্ণ

জলার্থিনী

শিল্পী—বন্দে আলী

JUNO PRINTING WORKS, CAL.

চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয়ার্দ্ধ | ফাল্গুন, ১৩৩৮ | পঞ্চম সংখ্যা

শক্তিপূজা ও বিবেকানন্দ

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ অল্পদিন আমাদের চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক লোক, যাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁহারা এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার চরিত্র কোন পৌরাণিক গাথা বা গল্পের দ্বারা সমাচ্ছন্ন নহে। তাঁহার কার্য্যকলাপ অনেকেই বিদিত আছেন। তাঁহাকে যিনি যে ভাবে দেখেন তিনি তাঁহাকে সেইরূপ বিশেষণে বিভূষিত করুন। আমরা সকলে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে করি এবং সেইজন্য তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার সামান্য নিদর্শন দেখাইতে উপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু তাঁহার মহত্ত্ব কোথায় তাহা কি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি? তিনি যে মহান্ আদর্শ আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, নিজেকে ও জাতিকে উন্নত করিতে হইলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া অগ্রে সেই মহত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

কেহ কেহ মনে করেন, শিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনে জ্ঞানবিজ্ঞানবিদ্ সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট তিনি আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া আমাদের পতিত ও অবজ্ঞাত জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় এইরূপ ভাব-পোষণকারীরা তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্ব অল্পই অনুভব করিয়াছেন; ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ যদি কাহাকেও মহৎ বলে, তবে সাধারণ লোকে তাঁহাকে মহৎ না বলিয়া থাকিতে পারে না। সে ব্যক্তি সত্যই মহৎ না হইলেও বড় লোকের কথার সমর্থন করে। আবার যখন অল্পদিন পরে সেই ব্যক্তিকে বড় লোকেরা ক্ষুদ্র ঘোষণা করে, তখন সেই সব লোকে তাহাকে ক্ষুদ্র বলিতে দ্বিধা বোধ করে না। আমাদের জাতির অবস্থা ঠিক তাহাই হইয়াছে। আমাদের সকল মনীষীদেরই বর্ত্তমান যুগে বড়জাতির নিকট মহত্ত্বের চাপরাশ আনিতে হয়। ইহাতে আমরা মহত্তের মহিমা-বোধের পরিচয় না দিয়া আমাদের ক্ষুদ্রত্বকে উজ্জ্বলভাবে ফুটাইয়া তুলি; যে ব্যক্তি মহিমার উপাসনা করিয়া মহৎ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই মহত্তের মহিমা

যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারে। স্বামীজী আর্য্যধর্ম্মের মহিমার সম্যক্ অনুভব করিয়াছিলেন এবং সুপ্ত স্বজাতির নিকট সে মহিমার পরিচয় না দিয়া জাগ্রত ও প্রাণবন্ত পাশ্চাত্য জাতির নিকট তাহা জানাইবার জন্য ছুটিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মমহাসম্মেলনে বিচারের দ্বারা তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন

কেহ কেহ ক্ষুদ্রের মত বড়লোকের কথায় সায় দিয় তাঁহার সামান্য সংবর্দ্ধিত করিয়াছিল, অধিকাংশই স্বপ্ন-ঘোরে অথবা নেশার ঘোরে স্বমহিমার আস্ফালন করিতেছিল। স্বামীজী আমাদের ক্ষুদ্রতায় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন—আমাদের মত্ততায় মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি তাহার উপাস্য মহিমা কি, কোথায় পাইয়াছিলেন এবং

স্বামী বিবেকানন্দ

তাঁহারা যে মহিমার উপাসক সেই জড়শক্তির বহু উচ্চে এই মহিমা স্থাপিত। তাঁহার এই মহামহিমাজ্ঞানের পরীক্ষার জন্য অতুলনীয় পার্থিব সম্পদ্ তাঁহার পদানত হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার ত্যাগের আসন টলাইতে পারে নাই—তাঁহার আরাধ্য মহামহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

কিরূপে তাহা পাওয়া যায় তাহা জানাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি নিজে মহান্ হইয়া সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি সকলকে মহৎ করিয়া তুলিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই খানেই তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। 'তারয়িতে জগদ্ধর্ত্তুং সংসার মকরাকরাৎ মতিমহানুভবানাম্ অত্রানুগ্রহতে যথা।" মকরাদি গ্রহ-সঙ্কুল সংসার সাগর হইতে জগদ্-

বাসীকে উদ্ধার করিবার জন্য মহানুভবদিগের মত হইয়া থাকে, তাহাতেই তাঁহাদের মহত্ত্ব প্রচারিত হয়। স্বামীজী পাশ্চাত্য-জাতির নিকট তাঁহার নিজের বা কোন এক জন বিবেকানন্দের পরিচয় দিতে যান নাই। তিনি আর্য্যধর্ম্মের মহিমার পরিচয় দিতে গিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মের উপাসক জাতি যদি মহত্বের পরিচয় দিতে না পারে, তবে তাহার গৌরব করা বৃথা। ব্যক্তি বিশেষের মহত্ব দিয়া জাতীয় ধর্ম্মের গরিমা প্রকাশ পায় না। তাই তিনি কত শত লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ গড়িতে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

তাঁহার উপাস্য মহিমাকে চেনেন কি?—তাহা আত্মশক্তি। আত্মা তো সকলের আছে; তাহার শক্তির বোধ কয়জনের আছে? আত্মার, ক্ষুদ্রত্ব আত্মার নিরাশ্রয়তা আমরা সর্ব্বদা অনুভব করি। আত্মা যাঁহা কর্ত্তৃক ধৃত হ'ন সেই দেহী আত্মাকে ইচ্ছামাত্র হত্যা করিতে পারে। উদ্বন্ধনে, বিষ-প্রয়োগে, শস্ত্রাঘাতে, আগুনে পোড়াইয়া অথবা জলে ডুবাইয়া তাহাকে হত্যা করা যায় কিংবা আততায়ীর আঘাতেও নিহত করা যায়; অথচ যাঁহারা আত্মশক্তি অবগত আছেন তাঁহারা বলেন, আত্ম অণু হইয়াও অখিল বিশ্বের আশ্রয়। তিনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য—তিনি অমৃত-স্বরূপ। এইরূপ শুনা যায়, ইহার জ্ঞান তো কখন হয় না। এইরূপ জ্ঞান থাকিলে আমাদের মধ্যে নিয়ত আত্মহত্যার প্রবৃত্তি দেখা যাইত না।

তাঁহার এ জ্ঞান কিরূপে আসিয়াছিল? একজন নিরীহ নিরক্ষর পাষাণ-প্রতিমার উপাসক ব্রাহ্মণের নিকট তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইহা বড় বিচিত্র কথা এবং আরও অধিকতর বিস্ময়কর যে, এই ব্রাহ্মণ আমাদের ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব। তখন আমাদের ভগবান ছিলেন পূজারী ব্রাহ্মণ, আর স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন নরেন্দ্রনামা মহিমার উপাসক; কূটতার্কিক এক দৃপ্ত যুবক। তিনি একদিন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে ঠাকুর, তুমি কি সকল মহিমার আকর পরমেশ্বরকে দেখিয়াছ?' ব্রাহ্মণ বহু লোকের সাক্ষাতে অম্লান-বদনে বলিলেন, 'যেমন তোমাকে দেখছি এবং ইহা অপেক্ষা আরও উজ্জ্বলতর।'

যুবক জিজ্ঞাসা করিল—'তিনি কে?'

ঠাকুর উত্তর দিলেন—'তিনি আমার মা।'

যুবক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তিনি কোথায়?'

ঠাকুর বলিলেন—'তিনি ঐ মন্দিরে আছেন।'

শ্রোতৃবর্গের অনেকেই এতবড় মিথ্যা কথায় বিস্মিত হইলেন ও ভাবিলেন এ নিশ্চয় পাগল। যাঁহারা ঠাকুরকে মিথ্যাবাদী বা পাগল সিদ্ধান্ত করিয়া ব্যথা পান, তাঁহারা ঠাকুরের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব দূর করিবার জন্য মনে মনে মা'র নাম জপ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রের ঠাকুরের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি ঠাকুরকে মিথ্যাবাদী বা পাগল মনে করিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন—'চল দেখি তোমার মা কেমন মহিমময়ী দেখিয়া আসি।' এই বলিয়া তিনি মন্দিরের দিকে ধাবিত হইলেন। নরেন্দ্র মা'র মূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন—'এই তোমার মা এ তো পাষাণী?'

ঠাকুর কাঁদিয়া ফেলিলেন। 'এ্যা, তুই আমার মা'কে পাষাণী বললি—মা যে আমার চিন্ময়ী, মা তুমি বল মা নরেন্দ্রকে আমি কেমন করে বুঝাব।'

মা'র সঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল, নরেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইলেন। তারপর নরেন্দ্রের চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি ঠাকুরের শ্রীচরণ ধারণ করিয়া বলিলেন, 'গুরুদেব আপনার কৃপায় আমার অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, আপনার কৃপায় আমি জগজ্জননীকে চিনিতে পারিয়াছি।'

অপূর্ব্ব দীক্ষা—পরম আশ্চর্য্য—রমণীয় ইহার সন্ধান। গুরু যে জ্ঞান দিতেছিলেন তাহার আর দ্বিতীয় ভাষা নাই। ভাবের প্রতীক চিত্র অথবা ভাষা, জ্ঞানের প্রতীক উপাসনা, প্রেমের প্রতীক আচরণ। ভাষা না থাকিলে ভাবকে কিরূপ বুঝা যাইবে? অরূপের একটী চিহ্ন বা লিঙ্গ থাকা চাই জ্ঞানের স্বরূপ জানাইতে হইলে উপাসনা ব্যতীত অন্য কি উপায় আছে? প্রেমিকের প্রেমের নিদর্শন তাঁহার কর্ম্ম ছাড়া কিছু কি হইতে পারে? কিন্তু ভাষা ভাব নহে, উপাসনা জ্ঞান নহে, কর্ম্ম প্রেম নহে। যে ইহা বুঝিতে পারে না সে নিত্য ঠকিয়া থাকে। জুয়াচোরের মিষ্ট কথায় সাধু বা বন্ধুর ভ্রম হয়। ত্যাগের উপাসনা দেখিয়া মঠের মোহান্তকে জ্ঞানী বলিয়া ভ্রম হয়। কাতর আচরণ দেখিয়া লম্পটকে প্রেমিক বলিয়া মনে করে; কিন্তু উপায়ান্তর

নাই—বাহ্য প্রতীক দিয়াই অন্তরের ভাবকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

নরেন্দ্রের প্রথম প্রশ্নের উত্তর 'তত্ত্বমসি' ইহার অর্থ 'তুমিই সেই' নহে—'তৎ তস্মিন্ ত্বমসি'। তাহাতে তুমি আছ। তাই ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—'তোমাকে যেমন দেখছি এবং ইহা হইতেও উজ্জ্বলতর। ইহার মর্ম্ম তোমার মধ্য দিয়া তাহার স্বরূপ সম্যক দেখিতে পাইতেছি। হইাতেও ভ্রান্ত শিষ্য প্রবুদ্ধ হইলেন না। তখন গুরু তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলেন 'তিনি মা'। মাকে যদি প্রত্যক্ষ দেখিতে না পাই তবে সন্তানকে দেখিলে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। যে দেখিতে জানে সে সন্তানের মধ্যেই মাতৃসম্পদের বিকাশ দেখিতে পায়। তবু নরেন্দ্রের ভুল ঘুচিল না। এইবার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর হইল, 'তিনি ঐ মন্দিরে আছেন।' গুরু তাঁহার সম্মুখস্থিত মাতৃরচিত মন্দিরের নির্দ্দেশ করিলেন, আর ভ্রান্ত নরেন্দ্রনাথ মনুষ্য-রচিত মন্দিরে মা'কে দেখিতে ছুটিলেন। সেইখানে তো পাষাণ-প্রতিমা আছে। নরেন্দ্র তাহাই দেখিলেন। এবার তাঁহার চতুর্থ প্রশ্ন তিরস্কারের আকার ধারণ করিল। বালসুলভ আচরণে গুরু বিহ্বল হইলেন, বলিলেন—'মা যে আমার চিন্ময়ী তাহাকে পাষাণী বললি'। তাঁহার ভাষা যোগাইল না, বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। তিনি মা'র উপর বুঝাইবার ভার দিলেন, কারণ বাক্যের দ্বারা বুঝাইবার চরম হইয়াছিল।

গুরুর অশ্রুতে শিষ্যের অহংজ্ঞানের মলিনতা ধৌত হইয়া গেল। এই অহংজ্ঞানটী যখন ভাঙ্গে তখন মানুষ চেতনা হারায়। জীবন থাকিতে নিজের অহং সত্তার লয় করা কি সহজ ব্যাপার! নরেন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের মধ্যে বিশ্বজননীর শ্বাসপ্রশ্বাস শুনিতে পাইয়াছিলেন—তাঁহার অম্বদর্শন হইয়াছিল। তিনি পাষাণীকে জীবন্ত বলিয়া ভ্রম করেন নাই; তাহা করিলে তাহার পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ ভিন্ন প্রকার হইত। তিনি অবশিষ্ট জীবনটা প্রতিমার পূজায় কাটাইতেন

সেইদিন মর্ত্ত্যে যে মহাযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কদাচিৎ ঘটে। সাধনার সহিত সিদ্ধির মহামিলন সংঘটিত হইয়াছিল। শিষ্য গুরুর মধ্যে মূর্ত্তিমান সাধনাকে প্রত্যক্ষ করিলেন; ফলে তাঁহার সকল অভিমান দূর হইয়া জীবন ধন্য হইল। গুরু-শিষ্যের মধ্যে চির-প্রার্থিত সিদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলেন। বহুকাল পরস্পর পরস্পরকে খুঁজিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। আজ মিলিত হইয়া উভয়েই ধন্য হইলেন—শিষ্যের মধ্যে গুরু সমাহিত হইলেন। সমাহিত ভগবান রামকৃষ্ণদেবের জীবন্তমূর্ত্তি স্বামী বিবেকানন্দ। 'আচার্য্য-পূর্ব্বরূপম্ অন্তেবাসী উত্তররূপম্ বিদ্যাসন্ধিঃ প্রবচনম্ সন্ধানম্।' যে বিদ্যা শিষ্যের মধ্যে প্রসারিত হইয়াছিল, যাহার মধ্য দিয়া গুরু অন্তেবাসীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হ'ন সেই আত্মাবস্থার প্রতীক মাতৃমূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা' বিশ্ববিধাতার অনন্ত প্রতীক। ধ্যায়মান সাধকের অন্তরে ব্রহ্মবোধের উৎকর্ষের জন্য তাহার সম্মুখে প্রতীক স্থাপিত করা হয়। শুধু প্রতীকের উপাসনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। প্রতীক যাহাকে জানায় তাহারই ধ্যান, জপ ও উপাসনা করিতে হইবে। রামকৃষ্ণদেব সকল ধর্ম্মের প্রতীক অবলম্বন করিয়া উপাসনার দ্বারা এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আমাদের মাতৃমূর্ত্তি বিশ্বজননীর প্রতীক।

যে শক্তি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালিত করিতেছে, তাহাকে কি আমরা দেখিতে পাই? তাহার নিয়ম কি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ? সেই পাষাণসম নির্ম্মম নিয়ন্ত্রী অদৃশ্য শক্তিকে যদি কোন মূর্ত্তি দিয়া জানাইতে হয়, তবে কৃষ্ণ পাষাণময়ী মূর্ত্তি তাহার যোগ্য প্রতীক নহে কি? শক্তির কার্য্যই শক্তির পরিচায়ক্। কার্য্যমাত্রেই হস্ত-সাপেক্ষ। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ধর্ম্মসংরক্ষণ যাহার কর্ম্ম সেই কর্ম্মচতুষ্টয়কে কিরূপে দেখাইব? প্রাণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বর হইতে পারে না, প্রাণই জন্মের বা উৎপত্তির স্বরূপ; তাই মার এক হস্তে বর-মুদ্রা। স্থিতিই আমাদের মৃত্যুভয় হইতে রক্ষা করে; মাতার দ্বিতীয় অভয়মুদ্রা স্থিতিক্রিয়ার দ্যোতক। অন্তিমে মৃত্যু অনিবার্য্য, তাই প্রলয়ঙ্কর খড়্গ তাঁহার তৃতীয় হস্তে এবং বিনষ্ট অধর্ম্মের প্রতীক ছিন্ন দৈত্যশির মাতার চতুর্থ হস্তে স্থাপিত। নির্ম্মম অদৃশ্য-শক্তির এই ক্রিয়া-চতুষ্টয়ের অনুভব-কর্ত্তা কে? তাহা কি জড় হইতে পারে? যাহার চেতনা আছে তাহারই এই শক্তির বোধ হয়। প্রাণই সেই চেতনার আধার। 'প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাম্' যে প্রাণকে পাইবার

জন্য সকলজ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচেষ্ট, যাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সকল বিভার, সমস্ত নীতি ও ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি, সেই সত্যসুন্দর সর্ব্বকল্যাণনিদান প্রাণের ছবি দেখাইতে হইলে শুভ্রশিবজ্যোতিরূপ মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব ব্যতীত অন্য কোন প্রতীক কি অবলম্বন করা যায়? জ্ঞানবন্ত প্রাণবন্ত অনন্ত জীবহৃদয়েই শ্যামাশক্তির ক্রীড়ার সংবেদন নিত্য হইতেছে। জগৎপিতার বক্ষে জগন্মাতার নৃত্য তাহারই পরিচয় দিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ গুরুকৃপায় বিশুদ্ধসত্ব হইয়া পাষাণ-প্রতিমার মধ্য দিয়া বিশ্বজীবের অন্তর্গত বিশ্বজননীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন—তাঁহার লোল রসনার মধ্য দিয়া জগৎপ্রকৃতির অনন্ত ক্ষুধা বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছিলেন, জগন্মাতা বলি চান। তাহাই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। সিন্ধুর মধ্যে বারিবিন্দুর মত বিশ্বজীব বিশ্বজননীর বক্ষে খেলা করিতেছে। বিন্দুর মধ্যস্থিত মাতৃশক্তি স্বমহিমা জানাইবার জন্য অহঙ্কার দিয়াছেন। যদি মাতার মহাশক্তি পাইতে চাও তবে অহঙ্কারকে বলি দাও। অহঙ্কার যেমন শক্তির দ্যোতক, তেমনি ক্ষুদ্রত্বের জনক। শক্তিসিন্ধুর মধ্যে ভাসমান বিন্দুটী অহঙ্কার ছাড়িয়া শক্তি হারাইবে না, বরং মহাশক্তির সহিত নিজেকে মিলাইয়া মহিমান্বিত হইবে। তাই স্বামীজী বিশ্ববাসীকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন 'ওগো কে কোথায় মাতৃশক্তিতে শক্তিধর হইয়াছ, আত্মবলি দিয়া মাতার পূজা কর। তাহাতে তোমার শক্তি ক্ষয় হইবে না, তাহাতে তুমি শক্তিময়ই হইবে। বিশ্বজননী বিশ্ববাসীর মধ্যে আছেন, তুমি তাহাদেরই একজন। তুমি যদি ব্যক্তিত্বের মূল অহঙ্কারকে ছাড়িতে পার, তবে কতটুকু তুমি কত বড় হইয়াছ বুঝিতে পারিবে। তোমার যাহা কিছু আছে মাতার চরণে নিবেদন কর। সেই নিবেদনের নিদর্শন সেবা। দরিদ্রের সেবা, অজ্ঞানীর সেবা, যাহাদের মধ্য দিয়া অন্নের ক্ষুধা, শক্তির ক্ষুধা, জ্ঞানের ক্ষুধা জানাইয়া মাতার লোলরসনা বাহির হইতেছে, জননী সন্তানকে আত্মশক্তিদান করিয়াছেন, সেই মাতার সন্তান বলিয়া যদি পরিচয় দিতে চাও, তবে মাতার মত শক্তিদান কর। দেবে কাহাকে? মা ছাড়া বিশ্বে তো আর কিছু নাই। মাতারই চরণে মাতার দেওয়া সম্পদ্ নিবেদন করিতে হইবে।

মহাসিন্ধু হইতে বিন্দু বিন্দু বারি উত্থিত হয়। সেই বিন্দু ভুবন ভ্রমিয়া শেষে সিন্ধুতেই ফিরিয়া আসে। তাহার ভ্রমণ-পথে মহারসেরই মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়। বিন্দু যদি চিরদিন বিন্দু থাকিত তবে সিন্ধুর মহিমা কি প্রচারিত হইত? তাই বিন্দুর সহিত বিন্দু মিলিত হইয়া ঝরঝর বারিধারা সৃজন করে। সেই ধারাসমূহ মিলিয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী হয়। এইরূপ বহু স্রোতস্বতী মিলিয়া নদী, বহু নদী মিলিয়া মহানদী, শেষে সকল মহানদী মহাসিন্ধুতে আসিয়া মিলিত হয়। প্রত্যেক মিলনেই রসের শক্তি প্রচারিত হয়। মাতৃশক্তির মহিমা যদি দেখাইতে চাও তবে, বিন্দুর মত মিলিত হও। ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলিত হইয়া সমাজ, আর সমাজ মিলিত হইয়া জাতি। জাতি মিলিত হইয়া বিশ্বমানব। সেই বিশ্বমানবের মধ্যে মানবিকতাই মাতার বিগ্রহ। মাতৃশক্তিই আত্মশক্তি। আত্মশক্তির বোধই অহঙ্কার। এই অহঙ্কার না থাকিলে শিশু চিরদিনই শয়ান থাকিত। আত্মশক্তির অহঙ্কারবশেই সে বসিতে শেখে, দাঁড়াইতে শেখে, এক এক পা করিয়া চলিতে শেখে, শেষে দৌড়াইতে শেখে। এই অহঙ্কারবশতঃই সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। আত্মশক্তির বোধ যে হারাইয়াছে সে মৃত জড়। আত্মা তো আছেন, জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে হইলে আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ হইতে হইবে। তাই স্বামীজী উপনিষদের বাণী ঘোষণা করিয়া বলিতেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। ধীরে ধীরে আত্মশক্তির অনুশীলনে শক্তিমান্ হইয়া মহান্ আত্মায় সমাহিত হইতে হইবে। মাতৃদত্ত অহঙ্কারে শক্তিমান্ হইয়া পরিশেষে যে সেই অহঙ্কারকে মাতার অহঙ্কারে মিশাইতে পারে সেই মহিমান্বিত হয়। বিন্দু হইতে মহাসিন্ধু পর্য্যন্ত যে সংবিৎকে পরিচালিত করিতে পারে সেই রসরূপী আত্মাকে পূর্ণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। দেহাভিমানবশতঃ আমাদের সংবিৎকে আমরা একস্থানেই আবদ্ধ করিয়া রাখি। আমরা জানি না কোথা হইতে এই দেহের শক্তি পাইয়াছি, আমরা জানি না আমাদের গতি কোথায়।

বিন্দু তাহার মধ্যে যে আত্মশক্তির অহঙ্কার আছে, তাহা

বিসর্জ্জন দিয়া প্রতিদিন-জাত জীবের শক্তি সৃষ্টি করে। দৈনিক সঞ্জাত শক্তির অভিমানী জীব তাহার অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া দেহীর শক্তি বার্দ্ধত করে। আমাদের অন্তরে এইরূপে শক্তির উপাসনা চলিতেছে। যখন যে কার্য্যটী করা হয়, অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি তখন তাহার বশবর্ত্তী হয়—দিনের সুখের জন্য ব্যসনাসক্ত ও আলস্যপরায়ণ হইয়া জীবনের সম্পদ্ নষ্ট করিতেছে বুঝিতে পারে না, ক্ষণিকের সুখের জন্য শক্তির মূল ক্ষয় করিতেছে ধরিতে পারে না। পরিণামে শক্তিহীন হইয়া হাহাকার করিতে থাকে। যে দেহী আত্মশক্তি উপার্জ্জন করিয়াছে, সে তাহার মহত্তর আত্মার উপলব্ধির জন্য অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিবে। ইহাতে সমাজ বা জাতির শক্তি সৃষ্টি হইবে। জাতি বিশ্বমানবের কল্যাণে মহত্তম আত্মার উপলব্ধির জন্য তাহার অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিবে। মাতার এই আদেশ অলঙ্ঘ্য। অন্যথা করিলে মাতার নির্ম্মম খড়্গ তাহার অহঙ্কার চূর্ণ করিবে। আত্মধর্ম্ম-অর্জ্জন ও রক্ষা এইরূপে হয়। ইহাই শক্তি-পূজা, ইহাই তপস্যা।

ব্রহ্মচর্য্য বিন্দুশক্তি অভিমানী জীবের তপস্যা। সেই তপস্যার দিন ভব জীব বীর্য্য লাভ করে। সত্যনিষ্ঠা দৈনিক বীর্য্যাভিমানী জীবের তপস্যা। সত্যনিষ্ঠাই ইন্দ্রিয়-সমূহকে সংযত রাখে, নিত্য নূতন জ্ঞান ও সম্পদ্ আনয়ন করে। তাহাতে দেহাভিমানী জীব শক্তিমান হয়। আর সেবাই দেহাভিমানী জীবের তপস্যা, দেহী-সন্তান ও পরিজনের সেবা করিয়া গৃহের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করে। গৃহস্থ সেবাদ্বারা বহু গৃহস্থের কল্যাণ-সাধনে সমাজের শক্তি গড়িয়া তুলিবে। সমাজ জাতির কল্যাণের জন্য সেবাপরায়ণ হইবে। তাহাতেই মহাশক্তির জাগরণ হইয়া থাকে। এইরূপে আত্মজ্ঞানের প্রসারের সহিত আত্মশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে একই শক্তি সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। যদি একের পূজা করিতে চাও, তবে ব্যক্তিগত অহঙ্কার ছাড়িয়া দশের সেবা কর। দরিদ্রকে দুই মুষ্টি চাউল দিলেই সেবার কার্য্য শেষ হইল না, তাহাকে অন্নবান্ ও ধনবান্ করিয়া তুলিতে হইবে। দুর্ব্বলকে রক্ষা করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ হইল না, তাহাকে সবল করিয়া তুলিতে হইবে। অজ্ঞানীকে দুইটী জ্ঞানের উপদেশ দিয়া শান্ত হইলে চলিবে না, তাহাকে কর্ম্মী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিশ্বমাতৃকার ইহাই প্রকৃত পূজা, ইহাতে তাঁহার শক্তির মহিমা প্রচারিত হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রাণহীন পূজার আচার ভাঙ্গিয়া দিয়া সত্য-পূজা দেখাইবার জন্য নবীন বাঙ্গালীকে সঙ্ঘ-সৃজনের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, মঠের মহান্ত গড়িবার জন্য নহে। এই-সত্য পূজায় মাতা তৃপ্ত হইলে শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হইয়া বিশ্ববাসীকে বিমুগ্ধ করিতে পারিবে, ইহাই তিনি কহিয়াছিলেন। তিনি জাতিকে শক্তিমান্ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। অজ্ঞানী বালক গ্রন্থের পূজা করিয়া জ্ঞানের গরিমা করে। অশক্ত শক্তিমূর্ত্তির পূজা করিয়া শক্তির গরিমা করে। কিন্তু শক্তিমান্ই শক্তির গরিমা বোঝে এবং তাহার মহিমা দেখাইতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ যে মহিমার উপাসক ছিলেন, সেই শাশ্বত মহিমাক্রমের মূল—আত্মশক্তির বোধ, ব্রহ্মচর্য্য স্বাধ্যায় ও তপস্যা তাহার কাণ্ড, সঙ্ঘ তাহার শাখা, সেবা তাহার পত্র; আনন্দ তাহার ফুল এবং জাতির মহিমা তাহার ফল। যে মহাপুরুষ নবীন বাঙ্গালীর মধ্যে এই মহিমাক্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন তাহার নাম জয়যুক্ত হউক।

———•:•:•———

ইংলণ্ডের সভ্যতা

শ্রীজীবনকৃষ্ণ গণ

ইংলণ্ডের সভ্যতার আদি প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে কে বা কখন অবির্ভূত হইয়াছিলেন এতদিন তাহা অজ্ঞাত ছিল। উক্ত দেশের প্রাচীন ইতিহাস-সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি ভ্রান্তিমূলক ধারণা আছে; প্রথমতঃ যাঁহারা জুলিয়স সিজারের আক্রমণের গতিরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অসভ্য ছিলেন; দ্বিতীয়তঃ খৃঃ পূঃ ৫৫ বৎসরের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে এমন কোন সভ্যতা ছিল না যাহা ইতিহাসে উল্লেখ-যোগ্য হইতে পারে। এ সকল সিদ্ধান্ত যে কিরূপ অবজ্ঞার পরিচায়ক তাহা আমরা ডাঃ টী. এফ. জি, ডেক্‌স্‌টার মহাশয়ের "সিভিলিজেশন্ ইন্ বৃটেন্, খৃঃ পূঃ ২০০০" নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝিতে পারিব। ডেক্সটার মহাশয় পুরাতত্ত্বের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, অতঃপর ইংলণ্ডের ইতিহাস খৃঃ পূঃ ৫৫ বৎসর হইতে আরম্ভ না হইয়া আভেবুরীতে, 'মেগালিথ' নির্ম্মাণের যুগ অর্থাৎ প্রায় খৃঃ পূঃ ২০০০ হাজার বৎসর থেকে করিতে হইবে। যে সব উপাদানের দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার সম্পূর্ণরূপে বিবরণ এখানে দেওয়া অসম্ভব। তবে প্রয়োজনীয় কয়েকটী বিষয় এখানে উল্লিখিত হইল। তিনি প্রথমতঃ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ ৫৫ অব্দে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা অসভ্য ছিলেন। মধ্য ও দক্ষিণ ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি প্রাচীন সুবর্ণ ও কৃত্রিম মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে সেগুলি পুরাতত্ত্ববিদদের মতে খৃঃ পূঃ প্রায় একশত বৎসরের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মিনার কার্য্য প্রাচীনকালে ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল। 'ব্যাটারসিয়া'তে প্রাপ্ত একটী কাংস্যযুগের ('ব্রঞ্জ-এজ') ঢালের উপর মিনার কার্য্য লক্ষিত হয়। ইহা খঃ পূঃ ২০০ বৎসরের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। এমন কি ডাঃ এণ্ডারসন বলেন যে, ইংলণ্ডের মিনার কার্য্য এত সুন্দর যে সে যুগের ফরাসীদেশে মিনারকার্য্য ইংলণ্ডের সহিত তুলনা হইতে পারে না। এগুলি উচ্চ সভ্যতার নিদর্শন নয় কি?

'ষ্টোন-হিঞ্জ', 'আভেবুরী' প্রভৃতি স্থানে যে সকল দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রস্তর যুগের শেষভাগে কিংবা কাংস্যযুগের প্রথম ভাগের অর্থাৎ খৃঃ পূঃ প্রায় ২০০০ হাজার বৎসরের পুরাতন বলিয়া ঐতিহাসিকেরা ঠিক করিয়াছেন। এ সকল স্থানে অনেক 'মেগালিথস্' পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার একটী মানচিত্রে অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন যে, ইংলণ্ডে যে সকল স্থানে তাম্র, স্বর্ণ, সীসা, জেট, টীন, মুক্তা পাওয়া যায়, সে সব জায়গাতে 'মেগালিথ্'-এর আধিক্য দেখা যায়। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, যাঁহারা এই সকল 'মেগালিথ্' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে আসিতেন। এখন তাঁহারা কে? তিনি 'মেগালিথ্' কোথায় কোথায় পাওয়া যায় এবং অন্যান্য বিষয় হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রাচীন মিশর হইতে আসিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ফ্লুরা ওয়েল্‌স প্রদেশের নৃতত্ত্বানুসন্ধানের ফলে একটু ময়লা রঙ, সবল চওড়া মাথাবিশিষ্ট লোকের সন্ধান পান। ইহারা সমুদ্রের তীরে বসবাস করে এবং কখন কখন তাহাদের 'মেগালিথ্'এর প্রতি অনুরক্ত দেখা যায়। ডাঃ ফ্লুরা মতে এই চওড়া মাথা-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাচীনকালে যাঁহারা 'মেগালিথ্' নির্ম্মাণ করিতেন তাঁহাদের কথা আছে। আর একজন পণ্ডিত, ডাঃ রেনড়েল হ্যারিস লণ্ডনের ওয়াট্‌লিং ষ্ট্রীটের 'ওয়াটলিং' কথাটী মিশর-দেশীয় কথা বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। প্রাচীনকালে ইংলণ্ড দেশে মিশর দেশীয় প্রভাব-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাগণ এই গ্রন্থ হইতে অনেক নূতন তথ্য পাইবেন।

যশোহরের গ্রাম্য শব্দ

(শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

বাঙ্গালার গ্রাম-প্রচলিত শব্দসমূহের মধ্যে বাঙ্গালার ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের অনেক তথ্য নিহিত আছে। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ৪টী বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছে। অনেকের মতে মৌর্য্য-যুগে বঙ্গদেশে আর্য্য-সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার পূর্ব্বে কোল, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতি মিলিয়া বঙ্গে একটী মিশ্র-সভ্যতার বিনাশ-সাধন করিয়াছিল। আর্য্যগণের আগমনের পূর্ব্বে কোল, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতি এদেশে বাস করিতেছিল, তাহার পরিচয় অনেকগুলি গ্রাম ও পল্লীর নাম হইতে এবং গ্রাম-প্রচলিত অনেকগুলি শব্দ হইতে কিছু কিছু পাওয়া যায়। (অধ্যাপক ডাঃ সুনীতি-কুমারের—"বাঙ্গলা ভাষা-তত্ত্বের ভূমিকা" নামক পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।)

গ্রাম-প্রচলিত শব্দসমূহের মধ্যে এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায়—যাহা সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং আর্য্য-গোষ্ঠীর কোনও ভাষার সহিতই তাহাদের মিল নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব অতি সুন্দর-রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায়—শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম্-এ, মহাশয় "মালায়ালাম ভাষার যৎকিঞ্চিৎ" শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মালায়ালাম ভাষার সহিত বাঙ্গালার কতকগুলি চলিত শব্দের অতি সুন্দর মিল দেখাইয়াছেন। যথা—বাঙ্গালা টেপা=মালায়ালী তেপ্পা; বাঙ্গালা কুপি=মালায়ালী কুপ্পি, বাঙ্গালা কল্লা=মালায়ালী কল্লো ইত্যাদি

সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালার গ্রাম-প্রচলিত শব্দ-সমূহ সংগ্রহ করিয়া একখানি 'অভিধান' প্রণয়ন করিবার জল্পনা-কল্পনা অনেকদিন হইতেই চলিতেছে। এই প্রাকৃত শব্দ সঙ্কলন-কার্য্যে স্বনামধন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ই উদ্যোক্তা। তাঁহার সংগ্রহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৮ম বর্ষে মুদ্রিত হয়। তাহার পর অনেকেই নানা স্থান হইতে কিছু কিছু শব্দ সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকার নিম্নোক্ত খণ্ডগুলিতে ঐ সকল সংগ্রহ ছাপা হইয়াছে :—৯ম খণ্ড, ১২শ খণ্ড, ১৪শ খণ্ড, ১৫শ খণ্ড, ১৬শ খণ্ড, ১৮শ খণ্ড, ১৯ শখণ্ড। সম্প্রতি ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যায় দক্ষ সুধী অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমারের উৎসাহে ও প্রেরণায় এই সকল গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহের কার্য্য বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে। তাঁহারই উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া, ইতঃপূর্ব্বে মৌলভী রবিউদ্দীন আহম্মদ সাহেব মুর্শিদাবাদ সীতা গ্রামের এবং শ্রীযুত কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী এম-এ, মহাশয় শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের বর্ত্তমান সংগ্রহ যশোহরের ঝিনাইদহ মহকুমার প্রায় সমগ্র এবং মাগুরা মহকুমার কতকাংশের গ্রাম্য ভাষার উপরই প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত। আমরা পণ্ডিতপ্রবর গ্রীয়ারসন্ সাহেবের 'বেহার পেসেণ্ট লাইফ' পুস্তকে প্রদর্শিত পন্থাই অনুসরণ করিয়াছি। এই সংগ্রহের মধ্য হইতে যাহাতে উক্ত ভাষাভাষী অধিবাসিগণের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ প্রভৃতি বিষয়ে একটা মোটামুটী জ্ঞান জন্মে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি। তবে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না, সুধী পাঠকবর্গের উপর বিচার-ভার অর্পণ করিলাম।

যশোহর জেলার কথিত ভাষার মোটামুটি দুই তিনটী রূপ আছে। মাগুরা মহকুমা এবং ঝিনাইদহ মহকুমার পূর্ব্বাংশের কথিত ভাষা ফরিদপুরের কথিত ভাষার প্রভাবে অনেকখানি প্রভাবান্বিত। নদীয়া ও যশোহর জেলার সন্ধিস্থলের ভাষা নদীয়ার কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা মহকুমার কথিত-ভাষার অনুরূপ। 'নদের ভাষা' বলিতে কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের সন্নিকটস্থ স্থান সমূহের কথিত ভাষাকেই বুঝায়।

কিন্তু এই ভাষাই নদীয়ার সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে। পূর্ব্ববঙ্গ-রেলপথ ধরিয়া গোয়ালন্দ অভিমুখে অগ্রসর হইলে, রাণাঘাট ছাড়াইয়া খানিকটা আসিয়াই এই ভাষার সীমা শেষ হইয়াছে। কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা মহকুমার কথিত ভাষা পূর্ব্বোক্ত 'নদের ভাষা' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

মাগুরা মহকুমার এবং ঝিনাইদহ মহকুমার কতকাংশের কথিত ভাষায়—'হ' স্থানে 'অ', যথা 'হবে'='অবে' এবং 'ড়' স্থানে 'র' ব্যবহৃত হয়, যা 'বাড়ী'='বারী'। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী বৈশিষ্ঠ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য (১) শহরের ভাষায় কর্ম্মকারকের "কে" প্রত্যয় সাধারণতঃ "রে" প্রত্যয় দ্বারা সূচিত হয়। যথা 'তারে দাও', 'খোকারে কোলে নেও,' ইত্যাদি। (২) সম্বন্ধ পদের বহুবচন "দিগের" (হিন্দি 'কো', ফরিদপুরের 'গো' যথা আমাগো,) যশোহরের সীমান্তে "গের" প্রত্যয় দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। যথা—তাগের=তাহাদের, আমাগের—আমাদের ইত্যাদি। (৩) নিম্ন-শ্রেণীর অধিবাসিদিগের মধ্যে শব্দের আদিস্থিত "র" ও "ল" স্থলে "ন" ব্যবহৃত হয়। যথা রাস্তা=নাস্তা, "নাঙ্গা দিদি খোকার মা।" লাল—নাল, লুচি=নুচি।

যশোহরের গ্রাম্য শব্দ

(১) খড়ের ঘর ও তাহার সরঞ্জাম :—

আটোন=চালের ভিতরের দিকের চেপ্টা চটা; রুয়া =চালে যে সকল সরু বাঁশ থাকে; পিঠকাবারী=চালের অপর পৃষ্ঠায় যে চটার সহিত আটন বাঁধা থাকে; পাইড়= খুঁটার উপর যে বাঁশ দিয়া তাহার উপর চাল দেওয়া হয়; আড়া=খড়ের ঘরের কড়ি; বাউনে=তীরের মাথায় যে ছোট আড়া থাকে; বাজাড়=খড়ের ছাউনির প্রতি সারি; কাচা=রুয়োর বাঁশ বাকা থাকিলে ঐ স্থান দুই ধার হইতে কাটিয়া একেবারে বিচ্ছিন্ন না করিয়া সোজা-করিয়া বাঁধা হয়, ইহাকে 'কাচা' করা বলে; তেতো=সরু দড়ি, থিরেটী—চালে আড় করিয়া যে চটা দেওয়া হয়; ছাটনি=চালে সন্নিবিষ্ট সরু চটা; তীর= আড়ার (কড়ি) উপরে দুই হাত পরিমিত যে ছোট বাঁশ দেওয়া হয়; বেটে—পাটের দড়ি কাটিয়া চটাতে জড়াইয়া বাঁধা হয় ইহার এক একটীকে বেটে বলে; সুমাজী=যে [illegible] চটার দ্বারা ছাটনির সময় বাঁধন ফিরানো হয়; রাগ=ঘরের জুত; বন্দ=ঘরের মাপ। "পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান।" কৃত্তিবাসী রামায়ণ; চৌরী=চারি খানি চাল বিশিষ্ট ঘর; বাঙ্গলা=দুইখানি চাল বিশিষ্ট ঘর। কানতা=খুঁটার মাথার খাদ; সন্তা=হাতে পাকানো মোটা পাটের দড়ি; দর=খুঁটা পুঁতিবার গর্ত্ত; ডুয়া= দাওয়া; ঝড়িকা=জানালা; শিগনো=খুঁটা পুতিবার পর ঐ গর্ত্তে মাটী দিয়া গাদিয়া দেওয়া; ছোপ=মাটীর দেওয়ালের যে পরিমিত অংশ একেবারে গাঁথা হয়; পুত্তন= বনিয়াদ, ভিত্তি; খাপাচী=বেড়া দিবার জন্ত ব্যবহৃত বাঁশের ছেঁচা; মলো চাটাই—বাঁশের বেতি দ্বারা নির্ম্মিত এক প্রকার মাদুর বিশেষ; চেগার=বাঁশের চটা দ্বারা নির্ম্মিত বেড়া; খান্‌কা=বাহিরের ঘর, বৈঠকখানা ধরণের। শব্দটী কেবল মুসলমানেরাই ব্যবহার করে।

(২) গৃহের সন্নিকটস্থ স্থান প্রভৃতি :—

কানাচ, কানটা=ঘরের পশ্চাৎদিকের সন্নিকটস্থ ভূমি। ছেঁচে=ঘরের ছাঁইচ।

(৩) ঢেঁকীর সরঞ্জাম :—

তর শাইল=যে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত খুঁটার দ্বারা ঢেঁকি পায়ার সহিত সংলগ্ন থাকে; গুলো—ঢেঁকির খেটের সহিত সংলগ্ন লৌহ-বলয়; শলা=ঢেকিতে সন্নিবিষ্ট যে কাঠখণ্ড ধানের উপর আঘাত দেয়; গড়ে, নোট=মাটীতে প্রোথিত যে কাষ্ঠ খণ্ডের উপর ভাঙ্গিবার সময় ধান দেওয়া হয়; এলোনি—মাটী দ্বারা নির্ম্মিত গোলাকার দ্রব্য বিশেষ।

(৪) ধান ভাঙ্গার পর্য্যায় ও প্রণালী :—

পালটা=ধান ভাঙ্গিবার সময় পর পর ২।৩ বার ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া ঢেঁকিতে দিতে হয়। ইহার এক একবারকে পালটা বলে; ডুয়া (কু)=ধান ২য় বার ঢেঁকিতে দেওয়াকে 'ডুয়া' করা বলে; ওসানো=ভাঙ্গিবার নিমিত্ত ঢেঁকিতে ধান দেওয়াকে "ধান ওসানো" অর্থাৎ চড়ানো বলে; এলে দেওয়া=ভাঙ্গিবার সময় নাড়িয়া দেওয়া। কাড়ানো =শেষ বারে চাউল ছাটিয়া তোলা; পাওটে দেওয়া—ধান শুকাইবার জন্ত পা দিয়া নাড়িয়া দেওয়া; পাচা—অনেক দুস্থ স্ত্রীলোক অপরের বাড়ী হইতে ধান আনিয়া চাউল প্রস্তুত করিয়া দেয়। ৫ পালি ধান আনিয়া গৃহস্থকে ৪ পালি ধানের চাউল দেয়। অবশিষ্ট ১ পালি তাহার পারি

শ্রমিক থাকে। ইহাকে পাঁচা বলে; চালকি=ইহাও অনেকটা পাঁচারই মত; ভাড়ানী=যে স্ত্রীলোক ধান ভাঙ্গিয়া দিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

(৫) রান্নাঘর ও পাকের সরঞ্জাম :—

হেঁসেল=রান্নাঘর। (হাড়িশালা শব্দ হইতে); তেকেটে=হাড়ি তুলিয়া রাখিবার পাত্র; তিউরী, চুলো, আখা=উনুন, চুল্লী; কাঁড়া=তৈল রাখিবার জন্য ব্যবহৃত বাঁশের চুঙ্গা; বাউলি=বেড়ী; শানকি=মাটীর থালা ন্যাতা=হাড়ি মুছিবার ন্যাকড়া, পোঁচ=ঘর গোবর দিবার ন্যাকড়া। নিকানো=ঘর গোবর দেওয়া। কেঠো=লবণ রাখিবার জন্য ব্যবহৃত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্র। বেলেন=মুড়ি প্রভৃতি ভাজিবার সময় যে মৃৎপাত্রে বালি রাখা হয়। পাটা=শিলা; তলো=মাটীর বড় হাড়ি; পাতিল=মাঝারী সাইজের মাটীর হাড়ি; বলকানো=চিড়া প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে ধান বিশেষ প্রণালীতে সিদ্ধ করা; ভাবদেওয়া=কোনও জিনিস রাঁধিবার পূর্ব্বে অতিরিক্ত একবার সিদ্ধ করিয়া লওয়া; উতো দেওয়া=জলে ভিজা কাষ্ঠাদি শুকাইবার জন্য উনানের উপর রাশি করিয়া রাখা।

খাদ্যাদির নাম :—

খাটা=অম্বল। ছুড়ুম=মুড়ি; ভাঙ্গা=ডালনা; জাউ=পায়াসান্ন বিশেষ; পুড় পুড়ি=মাছের বাটী চচ্চড়ি।

(পিষ্টক)

পাকান=মালপো জাতীয় এক প্রকার পিষ্টক। তক্তি=মুগের ডাল হইতে প্রস্তুত হয়; আস্কে=শুধু চাউলের গুড়ায় প্রস্তুত হয়।

সরোপিঠে; পাটী সাপটা; গুড়ঠিকরী; সরু চাকলী। ছাঁই বা ছেঁই=পিষ্টকের মধ্যে পুর দিবার জন্য যে নারিকেল বাটা মিশ্রিত ক্ষীর ব্যবহৃত হয়।

গৃহস্থালীর দ্রব্য :—

টেমী, কুপী=কিরোসিন ল্যাম্প; গাছা, দেলকো=দীপাধানি; খেলাই=মৎস্যধানী; কাঁকুই=চিরুনী ("কঙ্কতিকা" শব্দ হইতে)। পাট টাকুর=পাটের দড়ি কাটিবার তকলী; বাটা=মৃৎপাত্র বিশেষ; পালি=ধান মাপিবার জন্য ব্যবহৃত বেত্র নির্ম্মিত পাত্র; টুরি, খুচি=চিড়া মুড়ি খাইবার জন্য ব্যবহৃত বেত্রনির্ম্মিত পাত্র; আধলা=ধান মাপিবার জন্য ব্যবহৃত বেত্র নির্ম্মিত পাত্র বিশেষ; ছুড়াইন=চাবি; কোটা নগা, হলকা=আকসী; কোষ্টা=পাট।

খেজুর গাছ ও খেজুর গুড়-সংক্রান্ত :—

নলি=যে কঞ্চির নল দ্বারা খেজুর গাছ হইতে রস পড়ে। ঠিলে, গাছান, ঘপা=ভাণ্ড, ভাঁড়। ওলা—দিনমানের খেজুর রস; বাইন—যে উনানে খেজুর রস জ্বালানো হয়; জালা—যে মৃৎপাত্রে করিয়া রস জ্বাল দেওয়া হয়। ওড়—নারিকেল মালা দ্বারা নির্ম্মিত যে গুড় নাড়িবার হাতা ব্যবহৃত হয়; কানাচ—ভাণ্ডের সহিত যে দড়ি সংলগ্ন থাকে; নলেন—সুগন্ধ-যুক্ত গুড়; কুলাঙ্গ—গাছে উঠিবার সময় কোমরে যে চামড়া জড়ানো থাকে।

গরু-বিষয়ক :—

পলোটী—যে গাভী প্রথম প্রসব করিবে; কেলেন—যে গাভী প্রতিবৎসর গর্ভবতী হয় না; শড়কা—মৃত অবস্থায় প্রসূত গোবৎস। গুপাইল—লেজের অগ্রভাগের লোমরাজি। জাওল, শানি—খইল, বিচালী ও জল দিয়া একত্র মাখানো গরুর খাবার। নেদে, চাঁড়ী—যে মৃৎপাত্রে গরুর খাবার দেওয়া হয়। টাট—খোয়াড়। পিয়ালা—রাঙ্গা রংএর গরু। হাঁসা—সাদা রংএর গরু; কুমলে বাছুর—কচি বাছুর। পালান—গাভীর স্তন; গুত্তালি—গরু মাটীতে যে লাথি মারে; ছাঁদ—দোহন করিবার সময় যে দড়ি দ্বারা গাভীর পা বাধা হয়; ফুকো—দুগ্ধ বাহির করিবার প্রক্রিয়া বিশেষ; ফটক—দুটা গাভীকে দোহন করিবার ফটক। গাভ—গর্ভবতী; মলাট—গাভীর গুহ্যদেশ; পাল পাওয়া=ষাঁড়ের সহিত গাভীর সম্মিলন হওয়া; হেতো—যে গাভীর বৎস নাই অথচ কৃত্রিম উপায়ে দুগ্ধ দোহন করা হয়।

দুগ্ধ, গোময় ও গোমূত্র-সংক্রান্ত :—

সাজা—দধ্যম্ল; খড়েন—দধিমন্থন দণ্ড। ভোগ—দুগ্ধের নবনীতাংশ; ঘাসি—ঘুঁটে। নেদি—ঘুঁটে জাতীয়। নাদ—গোবর; ধেড়—পাতলা গোবর। ইহা গরুর অসুস্থতার চিহ্ন।

লাঙ্গলের সরঞ্জাম :—

মুড়ো—লাঙ্গলের ফলা বাদে যে ত্রিভুজাকার কাষ্ঠখণ্ড থাকে; ইশ—লাঙ্গলের গায়ে সংলগ্ন দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড;

জোয়াল—গরুর কাঁধে যাহা থাকে; নিজেন=লাঙ্গলের মুট; আউত—জুয়ালের সহিত সংলগ্ন যে দড়ি গরুর গলায় পরাইয়া দেওয়া হয়; শেয়ালী=জুয়ালের সহিত যে দুইটী বাঁশের খুটা থাকে।

হল-চালনার সময় ব্যবহৃত শব্দ :—

ভোইর ভর=গরুকে ঘুরিতে বলার সঙ্কেত। ইহার অর্থ "ঘুরিয়া যাও"। ঠেকো ভোইর—যেখানে আছে ঠিক সেইখান হইতে ঘুরিতে বলার সঙ্কেত; পারতলে, পাবতলে=একদিকের গরু সারিয়া যাইতেছে তাই নির্দ্দিষ্ট স্থানে লাঙ্গল লাগিতেছে না, এজন্য গরুকে অভিলষিত স্থান দিয়া যাইতে সঙ্কেত করা।

গো-শকটের সরঞ্জম :—

ঘুড়ি=ঝুরার উপর যে কাষ্ঠখণ্ড থাকে। পুটে=চাকার পরিধিতে যে সকল ছোট ছোট কাষ্ঠখণ্ড সংলগ্ন থাকে। উলো=চাকার ছিদ্রে সংলগ্ন লৌহ বলয়। ছিমলে=জুয়ালের প্রান্তভাগের কাঠি দুইটী। ফুলি=যে ডাসা গুলির দ্বারা গাড়ীর বাঁশ দুইটী জোড়া হয় এবং যাহার উপর বসিবার চটা বিছান হয়। ফড় গো শকটের বাঁশ দুইটী। কলিকাতাতে কাঠের ফড় ব্যবহার করিতে দেখা যায়। রেণখিল=ঝুরার প্রান্তে যে খিল দ্বারা চাকা আটকান থাকে। খুঁট=যে দড়ি দ্বারা জোয়াল বাধা হয়। দাবা=অত্যধিক ভারে যে গাড়ীর জুয়াল গরুর কাঁধে পুঁতিয়া পড়িতেছে। উলা পিছনে বেশী ভার হওয়ায় গাড়ী উলটাইয়া যাইবার মত অবস্থা।

কৃষক ও কৃষিসংক্রান্ত :—

পানাই,বাদা=হল চালনার সময় ব্যবহৃত কৃষকের পাদুকা, মাথাইল=কৃষকের মাথার টোকা, নাস্তা=প্রাতঃকালীন আহার, জোহওয়া=ভূমিতে বীজ-বপনের উপযোগী হওয়া, জাওলা=ধানের ছোট ছোট চারা; বীছন=বীজ, মাগুন হালা=কৃষক তাহার অন্যান্য প্রতিবেশীদিগকে একদিন ভোজ দিয়া তাহাদের দ্বারা জমি চষাইয়া লয়। ইহাকে মাগুন হালা বলে। হাল-মারা=জমিতে কোদাল মারা। খামার, খোলা=ধান মাড়িবার স্থান; গাতা=কৃষকগণ কার্য্যের সুবিধাবশতঃ অনেক সময় অনেকে একত্র মিলিয়া পালাক্রমে কার্য্য করে, ইহাকে 'গাতা' করা বলে। ছাটা=ধান নিড়াইবার সময় পালা করিয়া কাজ করাকে ছাটা বলে। কাঁকড়ী করা=বৃষ্টি অভাবে একরূপ কৃত্রিম উপায়ে ধানের বীজ বপন করা। পাইট=মজুর, মুনিষ=জন, ডাবা=হুঁকা, বুদা=তামাক খাইবার জন্য যে বিচালীর মশালে আগুন ধরাইয়া রাখা হয়; বাখারী=পাচন, বাইল=ধান্য-মঞ্জরী, গয়াল=ধানের ক্ষেতে উৎপন্ন আগাছা, বিশেষ; বতোর=শস্য প্রাপ্তির সময়, বতোর দুইটী, যথা আমুনে বতোর ও আউসে বতোর। আউস=আশু ধান্য, আমন=হৈমন্তিক ধান্য, বাস্থই দেওয়া=ভূমিতে মই দেওয়া। মলোন-মলা=ধান মাড়াই করা; কান্দুল=ধান মাড়িবার সময় যে লৌহ ফলকযুক্ত বংশদণ্ড দ্বারা ধান নাড়িয়া দেওয়া হয়; পাতকুটি করা=ধান-মাড়া শেষ হইলে খড় বাছিয়া ফেলা।

ধান্যের নাম :—

মাণিকমুদো, ঘেরতকলা, কুমরো হুলে মাদল, পাজরা, লক্ষ্মীকাজল, মেঘী, কেলে, সূর্য্যমণি, লঙ্কামই, আগুন-বাণ, মষদল, (মহিষাদল) বাগুনবিছে, গন্ধমুরারী, মোল্লাজটা, নোয়াশাইল, কইজুরী, খেজুর ছড়া, কেঁকো, কাঁচ কলম, বিরীটি, ডহর নাগ্রা, রোয়াকেলে, সুন্দর শাইল, মেঘনাল, ওড় কচু, গজালগুড়ো, লখনা, রাজা মণ্ডল, কালা মাণিক, খাঁকুই, মেরফল, বাদাই ঘুরুণ, কালা বয়রা, দীঘে, রায়দা।

ধানের মাপ :—

আড়ি, শলি, বিশা, পৌটী

ধান রাখিবার স্থান :—

গোলা=ধানের গোলা; আউড়ি=ঘরের মধ্যে মাচা বাঁধিয়া তাহার উপর চাটাই দ্বারা এক প্রকার মরাই তৈয়ারী করা হয়। ইহাকে 'আউড়ি' বলে; ডোল=বাঁশ হইতে নির্ম্মিত ধান্য রক্ষার পাত্র বিশেষ।

গৃহপালিত পশ্বাদি :—

বকরী=ছাগল, মেকুর=বিড়াল; খেড়ে=উদ-

বড়াল ; মাগুরা মহকুমার অনেক স্থানে জেলেরা মাছ তাড়াইয়া জালের মধ্যে আনিয়া দিবার জন্য উদবিড়াল পুষিয়া থাকে।

ড়ার বিভিন্ন প্রকার চলন :—

ধাপ। দোলক। কদম। ছারতোক।

মাছ ধরিবার যন্ত্রাদি :—

রারাণী (বংশ-নির্ম্মিত যন্ত্র); দুয়াড়ী; বাড়; আটোল; বেগে; পোলো; ঝাঁঝরি; পাউর; জোজরা; কোঁচ; চবোক; আতোর; জুত।

মাছধরা জালের নাম :—

ঠেলাজালি; কইজালা; ক্ষেপলা; খরাজাল; বেশাইল জাল; চটকাজাল; কচাল জাল; পাইত জাল;

মাছের নামের কয়েকটী বিশিষ্ট শব্দ :—

নওলা=রোহিত মৎস্য,নয়না=কাঁটাল কুশি, জিয়ল=সিঙ্গি মাছ, টাকি=শকুল জাতীয় একপ্রকার মৎস্য; ঝিয়া=এক জাতীয় ছোট মাছ; গরগতে=এক জাতীয় ছোট মাছ, টাটকিনী এক জাতীয় অতি সুস্বাদু ছোট মাছ; রায়েক= ইহারাও টাটকিনা জাতীয়; গজাড়=ইহা শকুল জাতীয় এক প্রকার মৎস্য। ইহা ব্রাহ্মণদিগের অভক্ষ্য।

কতিপয় সর্পের নাম :—

চ্যালো=এক জাতীয় ক্ষুদ্রাকার সর্প। ইহারা বিষধর নহে; ঘরচিতে=ঐ জাতীয়; লাউডগা=ঐ জাতীয়; শাখাব্যাটী=ইহারা ক্ষুদ্রাকার হইলেও অত্যন্ত বিষধর। কানল=ইহারা খড়ের চালে থাকিতে খুব ভালবাসে। বোড়া=এই জাতীয় সর্প খুব বৃহদাকার। যশোহর জেলার নলডাঙ্গা অঞ্চলে এক সময়ে এই জাতীয় সর্পের প্রাদুর্ভাব ছিল শুনা যায়। বোড়া=এই জাতীয় সর্প বিষহীন। ইহারা জলে বাস করে। পুঁয়ে সাপ=ইহাদের আকার কেঁচোর মত।

বৃশ্চিক

চেলা=বিছা।

কয়েকটী পাখীর নাম :—

ডাকু=আকারে খুব বড় নহে। ইহারা উভয়চর পাখী, কেপী=ক্ষুদ্রাকার উভচর এক জাতীয় পাখী, কাদাখোচা =এক জাতীয় ক্ষুদ্রাকার পাখী, ফিঙ্গে=ক্ষুদ্রাকার কৃষ্ণবর্ণ পাখী. কাণাকুয়ো=ইহারা ঝোপের মধ্যে থাকিতে ভালবাসে, যমকুলি=কাল পেঁচা; কুল্লো=বাজ পক্ষী, বিলেহাঁস=শিকারের পক্ষে উৎকৃষ্ট পাখী।

বাগিচা সংক্রান্ত :—

আড়,বেড়=বাগীচা বা শস্যক্ষেত্র যে বেড়া দ্বারা ঘেরা হয়। খোপা=বেড়া ঘিরিবার জন্য যে বাঁশ পোঁতা হয়; বাতা=যে চটার দ্বারা বেড়া বাঁধা হয়; জাফরী=বেড়া ঘিরিবার জন্য ব্যবহৃত বাঁশের চটা; পোল=আমবাগান;

নরিকেল ও নারিকেল গাছ :—

মুচি=নারিকেল ফলের শৈশব অবস্থার নাম, বেগো=নারিকেলের ডাল; কোঁপল=নারিকেলের ভিতর জল জমিয়া যে শাঁস হয়। নেওয়াপাতি=অতি সামান্য শাসযুক্ত ডাব।

কলাগাছ :—

এঁটে=কলাগাছের গোড়; বোগা কলাগাছের চারা।

আস্বাদ ও আকারানুসারে আম্রের নাম :—

শইলে=লম্বা ধরণের আম। কালমেঘা=বর্ণচোরা আম; জোয়ানে=যে আমের মধ্যে জোয়ানের মত গন্ধ আছে।

কাঁঠাল :—

পাতমুচি=অতি শৈশব অবস্থার কাঁঠাল ফল; ইঁচোড়= তরকারী খাইবার উপযুক্ত কাঁচা কাঁঠাল; রুয়া, কোষ= কাঠালের প্রত্যেকটী শাঁস; খাজা=রসহীন কাঁঠাল; ভূয়ো কাঁঠাল=যে কাঁঠালের মধ্যে শাঁসের ভাগ কম; ভূতড়া=কাঁঠালের খোসা।

শৈবাল জাতীয় :—

নেকুড়=পানিফল; দাম=এক জাতীয় শৈবাল; ধাপ=জমাট বাধা শেওলা; পাটা শেওলা=এই শেওলা চিনি প্রস্তুত করিবার সময় গুড়ের উপর দেওয়া হয়। মনসা কচুড়ী=কচুরী পানা; ইহার মধ্য হইতে অনেক সময় সাপ বাহির হইতে দেখা যায়, এজন্য ইহাকে মনসা কচুড়ী বলে।

রাজমিস্ত্রি, অস্ত্র শস্ত্র ও দালানের মাল মসলা :—

উষা=বালি কাজ করিবার সময় যে কাঠ বা লৌহফলক দ্বারা মাজা হয়, ডগনা=ভারা বাধিবার সময় যে সকল ছোট ছোট বাঁশের খণ্ড দিয়া তাহার পর মাচা দেওয়া হয়, তাগাড়=যে গর্ত্তে চুণ সুরকি ইত্যাদি মাখা হয়, বাঁশলে=ইট কাটিবার অস্ত্র; আঁজি বোর, দাগাবাজি=গাঁথনির ইঁটের মুখে চুণবালি দেওয়া, ফ্যারা=সুরকি মাপিবার পাত্র, র্যাজা বা রেজা যাহারা সুরকি ভাঙ্গে।

কৃষক ও পল্লী বাসীদিগের উৎসব ও পার্ব্বণাদি :—

(কৃষক দিগের গীতি :—)

বারুঞ্চ—নিড়ানের ক্ষেতে এই গান গায়িয়া থাকে, ধুয়োজারী—অনেকটা তরজার মত, হোইল-বোইল—পৌষ মাসে রাখাল বালকরা গান গায়িয়া সিরণী করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে, নলে=অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে মুসলমানরা এই গান গায়িয়া খোদার নিকট জল প্রার্থনা করে; ঝাপান=মনসা দেবীর মাহাত্ম্য-বিষয়ক গীত। চাপান=কবি তরজা প্রভৃতি গানে এক পক্ষ অপর পক্ষকে যে প্রশ্ন করে; ছড়াদার=কবি গানের প্রধান গায়ক; বালাকি=গাজন পূজার সময় ভক্তরা যে হরপার্ব্বতী-বিষয়ক গান গায়িয়া অর্থ সংগ্রহ করে; দোয়ার প্রধান গায়ক গায়িয়া দিলে পিছনে যাহারা একত্র গায়; গাইন—প্রাধান গায়ক।

বাদ্য যন্ত্রাদি-বিষয়ক :—

বাইন—বাদক; তালা—ঢাক, ঢোল প্রভৃতির ছাউনী; ছাট—ঢাক বাজাইবার কাঠি; ঢাকী—ঢাক বাদক; কাঁশিদার—কাঁশিবাদক; ঢুলি—ঢোলবাদক। চুহ্—যে ব্যক্তি জয়ঢাক কাঁধে করিয়া রাখে; চুহ্দার—যে ব্যক্তি জয়ঢাক বাজায়।

পার্ব্বণাদি :—তোড়—ফাল্গুন মাসের ত্রয়োদশ দিনে রাখালদিগের পার্ব্বণ, গো ফাগুনে—ফাল্গুন সংক্রান্তির দিনে রাখাল দিগের পার্ব্বণ; গারসী—আশ্বিন সংক্রান্তির দিনে কৃষক এবং পল্লীবাসীদিগের পার্ব্বণ।

পল্লীতে প্রচলিত ক্রীড়া কৌতুক :—

খোস্তাখুনি—বালক দিগের ক্রীড়া বিশেষ; গাদন—ক্রীড়া বিশেষ; গোল্লাছুট—কপাটী; ডুকডুকি—হাডূডুড; ন্নালাম—কুস্তি; ডাঙগুলি—ডাণ্ডাগুলি।

বালিকাগণ-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ব্রতাদি :—

নখখুটী—এই ব্রত চৈত্র মাসে করিতে হয়। যমপুকুর—মাসে; গোয়াল—বৈশাখ মাসে; সাজুই—অগ্রহায়ণ মাসে; এয়ো সংক্রান্তি; ধন গছানে; পুণ্যি পুকুর।

কতকগুলি প্রচলিত গালাগালি :—

খোলা ঝাড়া; হাড় পেকে; ঘর কুটনা; অনোকপেয়ে; ডেকয়া; ভরাপরা; খাইকুড়ী; বাখরা বাজানী; এতিথ-বোথিতথাগা; ডুকলা; ঠেঁটা; ভাবনী; ঠেকারী; গোঠ মজানী; তলোমুখী; শুয়োর ভাতারী।

গ্রামের নামের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট শব্দ :—

কামতা; গান্ন; ওয়াডিয়া; ভাদড়া; ভাটুই; নওদাপাড়া; কটেতলা, আরাকপুর, জাগলা; ফুদড়া; বেতাই; গিলে পোল; বোড়াই; সরুগুনা; কামান্ডা; জিয়ালা; বোইরগাছি; জিরনা; শুঁতি; বরাট; আজমতপুর; সারুটিয়া; ইকড়ে; চুটালিয়া; কাদিরকোল; কুল্লোগাছা; আবাইপুর।

গিরার নাম :—

বর্ব্বিগিরে; ফাঁদাল গিরে; ঝুট-গিরে; মরা-গিরে। ফাঁস গিরে; মেরা ঢসি গিরে; কানাচ গিরে।

নৌকা ও তাহার সরঞ্জাম :—

বাদাম=পাল, যথা :—হরিনামের তরি দুকুল কাণ্ডারী, রাধানামের বাদাম তুলে দাড়াল নিতাই হাল-ধ'রে'; বঁটে=বহিত্র; চইড়লগি=যে বাঁশ দিয়া নৌকা বাহে; গলুই=নৌকার মাথা; আতালি=নৌকার মাচাতে যে সকল বাঁশ বা কাষ্ঠ খণ্ড থাকে; ডাবের নৌকা—প্রতিমা বহন করিবার জন্য জোড়া করিয়া বাঁধা নৌকা; ছৈঁ=নৌকার উপরের আচ্ছাদন; বাইচ—নৌকা দৌড়; মালো—মাল্লা।

পাল্কী ও তাহার সরঞ্জাম: —

বাড়; খাট; আড়া; জাঙ্গী; কাঁহার—বেহারা; শুয়ারী=আরোহী।

প্রতিমা ও প্রতিমা গঠন সংক্রান্ত :—

দেউরী, কম্মীকার—প্রতিমা গঠনকারী; চিয়াড়ে—

প্রতিমা সাফ করিবার চটা; ঘামদেওয়া—রং করিবার পর গর্জন তৈল দ্বারা প্রতিমা ঘামানো; পুঁতলো=মূর্ত্তি; লেখা—প্রতিমা চিত্র করা।

কয়েকটী গহনার নাম :—

তাবিজ; যশম; হাসুলি; পায়জোড়; বেঁকী; চুল; নলোচ (নোলক); কামরাঙ্গা মাদুলি; খাড়ু; ধুকধুকি; বোর; বাজু; দায়মন; পাশুলি; নোতালি; বায়লা (বালা)।

অ

অকাটা=নির্ম্মম; অম্বা=ঐরূপে; অয়ে=ঐ দিকে।

আ

আওলা=মেঘখণ্ড; আড়ং=মেলা; আক্তা=যে ঘোড়াকে কাটান দিয়া লওয়া হইয়াছে; আনকা=অচেনা। আনচান=ছটফট করা; আজুড়=অবসর; আয়োমা=মাতামহী; আসানো=রৌদ্রে শুকান। আমানি=পান্থা ভাতের জল; আচাড়=অস্ত্রাদির বাঁট; আতান্তর=সঙ্কট; আঁকোড়=কঠিন; অ্যাঁৎ=ঢেঁকুর; আলকাচ=বেকুব, বুদ্ধিহীন।

ই

অবধি, পর্য্যন্ত।

উ

উছা=সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; উগরা=খিচুড়ী; উসারো॥ প্রশস্ত; উমি=অশিক্ষিত বা নিরক্ষর ব্যক্তি; উভদো=উল্টা; উনানো=গলানো; উপিক্তে=স্বতঃপ্রবৃত্ত য়া।

এ

এওলোবিন্দি=বিশৃঙ্খল; এলোনা=আলিপনা; একরার=স্বীকৃতি, কড়ার।

ও

ওশ=শিশির; ওজোড়=আপত্তি; ওক্ত=আহারের সময়।

ক

কাচে=অনবরত বৃষ্টি-বাদলা হইয়া যেরূপ অবস্থা হয়। ক্যাওচোল=বিবাদ; ক্যাতর=নেত্রমল; কুয়োরা=নেকরামি করা। কিতে—ধরণ; কেজে—হাঙ্গামা,মারামারি, কামায়—রোজগার; কানি—নেকড়া; কসবী—বেশ্যা; কাল্লা=মাথা, মুড়ো; যেমন ছাগলের কাল্লা। কুয়ো=কুয়াসা; কয়ালী যে ব্যক্তি ধান্য প্রভৃতি শস্য মাপ করিয়া দেয়। ক্যালানো=ফাঁক করা; কল্লা=বদমায়েস, কাওরা=যাহারা শূকর চরায়।

খ

খাল=চামড়া; খিজালৎ=উৎপাত; খিস্তা=অশ্লীল গালাগালি; খিতেনী=গঞ্জনা; খিসা=নিন্দা; পেই দড়ির মধ্যস্থ প্রত্যেকটী তার; খামাকা=হঠাৎ, আচম্বিতে; খিরকিচ=অনর্থক বাদানুবাদ; খানকা=বাহিরের ঘর (মুসলমানদিগের), খোড়োল=ছিদ্র, গহ্বর; খচাই=ধূর্ত্ত ব্যক্তি।

গ

গস্তান=বেশ্যা; গুদো=অকর্ম্মণ্য; গিদোড়=অলস; গামাল=মাথায় করিয়া গ্রামে গ্রামে জিনিস-পত্র বিক্রয় করা; গাল্ছি=জর-ঠুঁটো; গেঁজে=পয়সা রাখিবার জন্য কাপড়ের থলি বিশেষ; গজাল=পেরেক; গেওরাণী আর্ত্তনাদ; গুপিস খুব পুরু; গুছি=পরচুলি; গাঁওড়া গ্রাম্য।

ঘ

ঘাগি=দুষ্টা স্ত্রীলোক; ঘেড়ো, ঘ্যাচড়া=অবাধ্য; ঘোতে=উপপতি; ঘাইট=অপরাধ।

চ

চাবা=চর্ব্বিত তাম্বুল, চশম=লজ্জা, চশমখোর=লজ্জাহীন, চ্যারাগো=ঘাক করা, চিল্তে=অপ্রশস্ত খণ্ড, চিলু=চিতা, চেঙড়া=অল্প বয়স্ক, চুচি=নবোদিত স্তন, চুকো=টক, চাড়া=নখ, চুক=ভুল, চিয়াড়ে=প্রতিমাদি গড়িবার সময় যে বাঁশের চটা দিয়া সাফ করা ও মাজা হয়, চুকড়া=মাছের মোটা কাঁটা, চেনু=শিশুদিগের লিঙ্গ, চুলো=আশ্রয়, যথাঃ—"তার আর কোনও চাল চুলো নেই;" চুহু=যে ব্যক্তি জয়ঢাক কাঁধে করিয়া রাখে চুহুদার=যে ব্যক্তি জয়ঢাক বাজায়।

ছ

ছিলকে = বৃষ্টির পশলা, ছ্যাঁদলা = পালিত, ময়না ইত্যাদি ছেমা = ছায়া, ছিয়ালো = লম্বা, ছ্যাপ = থুথু. ছ্যাঁচন = প্রহার, ছিনাল = বেশ্যা।

জ

জুলি = গর্ত্ত, জিল্লা = দীপ্তি, জাব্দা = শক্ত, টেঁকসই, জিগ্গাদা = যথেষ্ট, প্রচুর, জকার = চীৎকার, জাঁড় = শীত জোক = মাপ, জবর = খুব পোক্ত, জুত = সুবিধা।

ঝ

ঝাড়া = মল, ঝাপসা = আচ্ছায়াপূর্ণ, ঝিমান = বসিয়া বসিয়া ঘুমান।

ট

টেটোন = শয়তান, টাটানো—ক্ষতাদিতে যন্ত্রণা হওয়া, টেঙা = টক, টোয়ানো = চুপি চুপি ভালভাবে লক্ষ্য করা, টিকলী = ইক্ষু প্রভৃতির খণ্ড, টোপলা = তল্পী, টাপর = ছাদলা, টিপিনি = অল্প অল্প বৃষ্টি, টোলা = পাড়া, যথাঃ—"ছোট বৌ তুই যদি পেত্তোই টোলায় টোলায় বেড়াস্, তবে আর সংসার চলে কি করে?" টিকারা = বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

ঠ।

ঠুল—ছাগ গোবৎস প্রভৃতি মাথা দিয়া যে আঘাত করে, ঠুক্না—ঠোনা মরা, যথা "শ্বাশুড়ী মারে ঠোনা শ্বশুর বাড়ী আর যাব না।" ঠেকো = নিকটস্থ, ঠেঁটী—অপ্রশস্ত বস্ত্রখণ্ড।

ড

ড্যাবরা—যে ব্যক্তি ডানি হস্তের কার্য্য বাম হস্তদ্বারা এবং বাম হস্তের কার্য্য ডানি হস্তের দ্বারা করে, ডাবরি—কলসী, ডেঙ্গা—স্থল ভুমি, ডাবি = ঘুঁষি, ডুমা—খণ্ড, ড্যাম—সর্প শিশু।

ত।

তাউত = শুশ্রূষা, তলোক = তামাক প্রভৃতির তেজ, তঞ্চক = প্রতারণা, তাবিজ = মাদুলি, কবচ, তাক = কৌশল; তেড়ি = ক্রোধ, তবল = লুঙ্গী, তবলদার = যে ব্যক্তি খড়ি চেলায়। তেনা = নেকড়া, তোকড় = বুদ্ধিমান, তামান = সমস্ত।

থ

থাবা = চপেটাঘাত, থিয়ো = সোজা, থুবড়ো = আইবুড়ো।

দ

দিয়াড় = নদীর ধার, দগি = কর্দ্দমাকীর্ণ, দলক = বৃষ্টি, দোপ = খাদযুক্ত স্থান, দোয়াল = যে ব্যক্তি দুগ্ধ দোহন করে, দেড়ী = মজুত, দাঁড়া = ধরণ, দাপানী = ছটফটানি দ্যাওর = আওয়াজ, দোমত করা = বস্ত্রাদি ভাজকরা, দলা = খাদ্যাদির মুষ্টি, দুয়া = দহ।

ধ

ধুকা = চালবাজী, ধাওট—কাথার উপরিভাগস্থিত বস্ত্র খণ্ড। ধাওর = ধূর্ত্ত, ধাউই করা = করাত দ্বারা কাঠ চেরা, ধাউইদার = যে ব্যক্তি কাঠ চেরাই করে, ধুপ = রৌদ্রতাপ, ধক তেজ, উগ্রতা যথা "এ তামাকে মোটে ধক নেই।" ধুকড়া = ছেঁড়া কাপড়, ধড়ি = কাছা।

ন

নাকাল = দুর্গতি, নিওর = শিশির, নকুতো = নৌকিকতা, নিপান = সমূলে বিনষ্ট, নাড় = নাড়ী, নেতিয়ে পড়া = অবসন্ন হইয়া পড়া। নিস্তে = ক্ষমতাহীন, নোতানি = নথ, নোগ্গি = প্রসাব, নেকরা = ঠাটকরা, নেতুর = অপরিষ্কার।

প

পান = বংশ, পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত "পোলাপান" শব্দের "পান"ও এই ভাবই প্রকাশ করে। পিস্তে = নেত্রমল, পোয়াত = প্রভাত, পুঁয়ে = আমের অঙ্কুরযুক্ত আঁটী, পিড়ে = মাটীর ঘরের বারান্দা, প্যাদানো—প্রহার করা, পস্তানো = পশ্চাদ্পদ হওয়া, পিছে = মাছের পুচ্ছ, পদানো = বৃথা বাগাড়াম্বর করা, পগার = গর্ত্ত, পয়ান = সাঁকো বা বাঁধান নৌকা বাহির হইয়া যাইবার যে পথ থাকে পোক্ত = শক্ত, কর্ম্মঠ।

ফ

ফেদা = ময়লা; ফইড় = চালবাজী

ফড়ে=ব্যাপারী ; ফাঁড়=উদর ; ফেঁাট=ফোঁটা, ফালি=খণ্ড, ফেঁাস=কুপরামর্শ, ফলদেখা=প্রথম রজস্বলা হওয়া। ফাণ্টা মারা—কোনও জলাশয় শুকাইয়া একেবারে শুষ্ক ভূমিতে পরিণত হওয়া। ফাঁড়া—চেয়াইকরা, ফুকোট=কোটর, ফুকাচি মারা=উঁকি মারা, ফাঁস করে=শীঘ্র করিয়া, ফুল=সন্তপ্রসূত শিশুর নাভির সহিত যে নাড়ী সংলগ্ন থাকে।

ব

ব্যাকলা=খোসা, বস্তো=ফল প্রভৃতি পাকিবার উপযোগী হওয়া, বায়নাকরা=আব্দার করা, বাইত=বমি, বরুই=কুলফল, বেয়াড়া=অসভ্য, বেইল্লা=বেইজ্জত, বোচকা=গাঁঠরী, বোকড়া=দন্তহীন, বেদাড়া=অবাধ্য, বিউনী=চুলের বিনানি। বাও=বাতাস, বেজার=অত্যধিক। বেজার=ক্ষুণ্ণ, বিটকেল =লজ্জাজনক ব্যাপার। বিদিকিচ্ছি=বিশ্রী, বোগদা=ধার বিহীন। বাতা=যোনি, বাঁক=নদীর বাঁক।

ভ

ভাবন=স্ত্রীলোকদিগের বিলাস ভঙ্গী, ভোইল ছলনা। ভোকছানি=ক্ষুধার পীড়নবশতঃ অবসাদ।

ম

মেনতা=নিস্তেজ, মস্কারা=ঠাট্টা তামাসা, মিছাক-করা=দাঁতন করা, মুরোদ=সামর্থ্য, মেলা=অনেক, মজাড়=সমাধি, কবর, মেচী=মাদী, মিয়াদ=নির্দ্ধারিত সময়।

র

রোক=ক্রোধ, রগ=শিরা, রুটো=নীরস, রোয়া=হাঁক, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, রলা=গাছের সরু ডাল, রেঁ্যাৎ দেওয়া=নিষ্কৃতি বা অব্যাহতি দেওয়া। রাঁড়=বিধবা, রুকা=হাত চিঠি, রিক=গাড়ীর চাকার দাগ। রেঁয়াজ=নিয়ম, প্রথা ইত্যাদি, রোকড়=জমিদারী সেরেস্তার খাতা বিশেষ, রুচ=রুচি।

শ, ষ, স।

সিঁয়াটা=শীতকালে বৃষ্টি ও কুজ্ঝটিকা হইয়া যে আব-হাওয়ার সৃষ্টি হয়। সাখরুজে=যে ব্যক্তি কৃপণ নহে ; শল=ঢিলা।

হ

হাউস=সখ, হাউড়ে পেটুক, হিস্তে=নির্দ্দিষ্ট অংশ ; হাবোড়=কাদা, হিল্লে=আশ্রয় ; হেকমৎ=মনোযোগ ; হামেসা=সদা সর্ব্বদা, হাল=অবস্থা, হালি=নূতন, ৪টাতে এক হালি।

———:*:•*:———

মুদ্রণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ

শ্রীঅজিত ঘোষ

ভারতবর্ষে ছাপাখানা বড় বেশী দিন হয় নাই। ১৫৫৬ সালে সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার নামক একজন পর্ত্তুগীজ পাদরী গোয়াতে একটী মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন করেন। ইহা হইতেই হইল ভারতে ছাপাখানার সূত্রপাত।

জেভিয়ার ১৫৪২ সালের ৬ই মে গোয়াতে অবতরণ করেন ও এই শহরেই তাঁহার একাধিপত্য বিস্তার করেন। গোয়া ছিল ভারতে পর্ত্তুগীজদিগের উপনিবেশ ও বাণিজ্যের কেন্দ্র। এখানে পাদরীগণ তাঁহাদের দীর্ঘ, শ্রমসাধ্য ও বিপদসঙ্কুল ভ্রমণের অবসানে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কলেজ, বিদ্যালয় এবং অসংখ্য খৃষ্টধর্ম্মীগণের সুবিধার জন্য প্রধান প্রধান পাদরীগণ এইস্থানে একটী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বিবেচনা করেন। এই প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া পাদরী জুয়ান্-দে-বুশ্ তামাতে ইউরোপ হইতে ছাপাকল ও 'টাইপ' লইয়া আসেন; ইহাই ভারতের প্রথম মুদ্রাযন্ত্র। ১৫৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর গোয়াতে পৌছিয়াই অচিরে ইহার কার্য্য আরম্ভ করা হয়।

আবিসিনীয় পাদরীগণও কয়েকবার নিজেদের একটী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহারা রোমের আবিসিনীয় প্রচার-সমিতির কার্ডিনাল প্রোটেক্টরের নিকট পুস্তক ছাপাইবার জন্য একটী মুদ্রাযন্ত্র, ইথিয়পীয় অক্ষর এবং কার্য্যক্ষম দু'একজন লোক চাহিয়া এক আবেদন করেন। এই আবেদন যথাযথভাবে গ্রাহ্য না হওয়ায় ১৬২৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই পেট্রিয়ার্ক আলফোন্সো মেন্ডেজের পুনরাবেদনে ইহার অনুমতি পাওয়া যায়; কিন্তু ইথিওপিয়ার ইতিহাসে ফাদার মানোয়েল-দে-আল্মেদা, পেড্রো পায়েজ্, মানোয়েল বারাডাস্ ও আল্ফোন্সো মেন্ডেজ্ প্রভৃতি যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের এই মিশনের মুদ্রাযন্ত্রের উল্লেখ নাই।

আমরা কিন্তু দেখি পর্ত্তুগীজ পাদরিগণ আবিসিনীয় পাদরিগণের এই অভাবপূরণের জন্য তাহাদিগকে সাহায্য করিতে থাকেন এবং পর্ত্তুগীজ ভাষায় তাঁহাদের প্রয়োজনীয় পুস্তকাবলী ছাপাইয়া দেন।

ইহার পর ১৭৬৫ সালে আমরা মিঃ বোলট্সের পরিচয় পাই। তিনি সংবাদপত্র-হিসাবে প্রত্যহ একপ্রস্থ কাগজ ছাপিয়া টাঙ্গাইয়া দিতেন; তাঁহার ছাপাখানা থাকাই সম্ভব। অতঃপর ১৭৭৮ সালে বোম্বাই শহরেও একটী ছাপাখানা খোলা হয়। ঠিক ঐ সময়ে বাঙ্লা দেশে হুগলীতে চার্লস উইল্কিন্স্ পঞ্চানন কর্ম্মকার নামে এক মিস্ত্রিকে নিজে মুদ্রণ-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া তাহার সাহায্যে বাঙ্লা অক্ষর প্রস্তুত করেন। অক্ষরগুলি কাঠের হইয়াছিল। উইলকিন্স্ স্বহস্তে অক্ষর তৈয়ারী করিয়া এবং প্রথমে ১৭৭৮ সালে হ্যাল্‌হেডের বাঙ্লা ব্যাকরণ ছাপাইয়াছিলেন। অতঃপর পঞ্চানন শ্রীরামপুরে কার্য্যের অনুসন্ধানে গমন করেন। ঐ সময় কেরী তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণের জন্য দেবনাগরী অক্ষর প্রস্তুতের চেষ্টা করিতেছিলেন। পঞ্চাননকে পাইয়া তিনি কৃতকার্য্যের উপায় প্রাপ্ত হইলেন। পঞ্চাননের দ্বারা তিনি দেবনাগরী অক্ষর ও অন্যান্য নানা ভাষার অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

পঞ্চাননের পর তাহার শিক্ষানবীশ মনোহর কর্ম্মকার শ্রীরামপুর-মিশনের প্রচার, সাহিত্য ও খৃষ্টীয় সভ্যতার ক্রমোৎকর্ষের জন্য সর্ব্বপ্রকার ভাষার সুন্দর সুন্দর মুদ্রাক্ষরের সাট প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে থাকে। চল্লিশ বৎসরেরও অধিক সে এই কার্য্য করিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারে সাহায্য করিলেও মনোহর হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই। ১৮৩৯ সালে যুবক পাদরী রেভারেণ্ড জেমস্ কেনেডি যখন ভারতে আগমন করেন, তখন তিনি পঞ্চাননকে হিন্দু-দেববিগ্রহের তলে আসন গ্রহণ করিয়া 'বাইবেল'এর জন্য অক্ষর ও ছাঁচ তৈয়ারী করিতে দেখিয়াছিলেন।

১৮০০ সালে পাদরী ওয়ার্ড শ্রীরামপুর-ছাপাখানার মুদ্রাকর হইয়া আসেন। তিনিই প্রথম বাঙ্লা 'নিউ টেষ্টামেণ্ট'

ছাপান। কেরী নিজে ইহা মূল গ্রীক হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি ইহা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং রাম বসু-প্রমুখ তৎকালীন সুধীজনবর্গ ও সর্ব্বজাতীয় লোকের সাহায্যে মূল গ্রীকের সহিত মিল রাখিয়া চারি বার সংশোধন করেন। ১৮০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই গ্রন্থের মাত্র দুই হাজার সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ইহাতে খরচ হইয়াছিল ৬১২ পাউণ্ড এবং ইহা ছাপিতে সময় লাগিয়াছিল ৯ মাস। কেরীর পুত্র ফিলিক্স ও মুদ্রাকর ওয়ার্ড স্বহস্তে ইহার অক্ষর সাজাইয়াছিলেন।

ডাঃ জন্ মার্শম্যান তাঁহার 'লাইফ্ এণ্ড টাইমস্ অফ দি

নির্ম্মিত অক্ষরে মুদ্রণ-তত্বের দ্বিসহস্র বর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম ধাতুনির্ম্মিত অক্ষরে চীনাপুস্তক মুদ্রিত হইল। ইহা চীনা-সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা।

১৮১২ সালের ১৩ মার্চ শ্রীরামপুর-প্রেসের এক স্মরণীয় দিন। ঐদিন সন্ধ্যাকালে সবেমাত্র কারখানার কাজ শেষ হইয়াছে, এমন সময় কারখানায় আগুন লাগিল। ওয়ার্ড ও মার্শম্যান্ উভয়ে তখন উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আগুন নিবাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল কেরী তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি তখন কলিকাতার কলেজে তাঁহার সাপ্তাহিক কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

জন্ গুটেন্‌বার্গ

থ্রি' নামক পুস্তকে বলেন যে, শ্রীরামপুরের এই কারখানা মাত্র একশত পাউণ্ড অর্থে যে পরিমাণ দেবনাগরী অক্ষর নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইত, লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাপার কারখানা 'ফ্রাই এণ্ড ফিজিন্‌স্' সাত শত পাউণ্ড অর্থে তাহার অর্দ্ধেকও পারিত না। ১৮১৩ সালে মার্শম্যান ধাতু-নির্ম্মিত অক্ষরে চীনা ধর্ম্মকাহিনী মুদ্রিত করেন। চীনের কাষ্ঠ-

পরদিবস সকালেই মার্শম্যান্ কেরীর নিকট এই শোচনীয় সংবাদ বহন করিয়া আনিলেন। কেরী এই সংবাদে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই—মার্শম্যানের চোখেও জল আসিয়াছিল। কেরী যখন ঐদিন সন্ধ্যায় শ্রীরামপুরে পৌছিলেন, তখনও তাঁহার এই সাধের কারখানার ভগ্নস্তূপে ধূমোদ্গীরণ হইতেছিল। তাঁহার প্রিয়

পুথি-পত্রাদি তখন প্রায়ই সব নিঃশেষ হইয়াছে। ওয়ার্ড ইতিমধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রমে মুদ্রাক্ষরের ছাঁচ ও সাট-গুলি ভগ্নস্তূপের ভিতর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন্। সৌভাগ্যবশতঃ ছাপাকলের কোন ক্ষতি হয় নাই। যাহা হউক আবার কোনক্রমে প্রেসের কার্য্য ও অক্ষর-নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল।

ইহার পর ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত শ্রীরামপুরের কারখানা প্রাচ্যে সর্ব্বপ্রধান ছাপার কারখানা বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা সর্ব্বজনবিদিত বলিয়া স্থানাভাব-বশতঃ লিখিলাম না।

এই তো গেল ভারতে ছাপাখানার প্রথম ইতিহাস। এইবার গতে ইহার আবির্ভাব ও ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলিব।

মুদ্রণ করিবার প্রাথমিক দৃষ্টান্ত আমরা প্রাচীনকাল হইতেই দেখিতে পাই। প্রাচ্য হইতেই ইহার প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। আমরা দেখি, অতি প্রাচীনকালে আসীরীয়গণ ইষ্টকের উপর সাঙ্কেতিক লিপি ও মূর্ত্তি খুব ছাপিত। মিশরের ইষ্টকেও এইরূপ দেখা যায়। তথাকার কতকগুলি আবিষ্কৃত মোহর হইতে আমরা জানিতে পারি যে,সেই মোহরগুলি খৃঃ পূঃ ৩৭৫০ অব্দে নির্ম্মিত হওয়া সম্ভব। এই মোহরে ছাপার কাজ হইত। এতদ্ব্যতীত ছাপমারা যে সমস্ত ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে সেগুলি খৃঃ পূঃ ৫০০০ অব্দেরও পূর্ব্বের বলিয়া অনুমান করা যায়।

মূলতঃ ছাপিবার পদ্ধতি প্রথম অঙ্কুরিত হয় চীন হইতেই। প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনারা কাঠের উপর কুঁদিয়া অক্ষর তৈয়ারী করিয়া পাতলা কাগজের উপর তাহা ছাপিত। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে পি-সিঙ্ নামক জনৈক কর্ম্মকার প্রথম ধাতুনির্ম্মিত অক্ষর ('টাইপ') প্রস্তুত করিয়া ছাপা পুস্তকের প্রচলন করে, কিন্তু তাহা প্রথমতঃ পূর্ব্বতন মুদ্রণ-পদ্ধতির অনুরূপ ফল দিতে পারে নাই; কারণ 'ব্লক'এ খরচ পড়িত কম এবং শ্রমও হইত অল্প। বিশেষতঃ চীনা অক্ষর যেরূপ কদর্য্য তাহার অনুপাতে অক্ষর প্রস্তুত করার অপেক্ষা 'ব্লক'এ ছাপা সুবিধা হইত। যাহা হউক, পরে বহুল পরিমাণে চীনা অক্ষর নির্ম্মিত হইতে থাকে তবে তাহা বাহির হইতেই হইয়াছিল।

প্রাচীন রোমীয়গণকে আমরা 'ষ্ট্যাম্প' অর্থাৎ ছাঁচ ব্যবহার করিতে দেখি। তাহারা বিশেষতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক ব্যাপারে ইহা ব্যবহার করিত।

কাঠের 'ব্লক'এ ছাপা ইউরোপে প্রথম প্রচলিত হয় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। তখনকার ছাপাইবার পদ্ধতির আমরা সম্যক পরিচয় পাই আবিষ্কৃত খেলিবার তাস হইতে। তাস খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রথম প্রচলিত হয়। মূর্ত্তি-চিত্রের পুস্তকই ইউরোপের প্রথম পুস্তক। চীনের অনুকরণে উহা মুদ্রিত হয়। প্রত্যেক পৃষ্ঠা একটী মাত্র 'ব্লক'এ ছাপা হইত।

ধাতু ঢালাই করিয়া ছাঁচে অক্ষর প্রস্তুত করিবার প্রয়াস বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হার-লেমের লরেন্স্ কশ্টার ও মেন্জের জন্ গুটেনবার্গই ইহার প্রথম প্রচলন করেন। অনেকের মতে লরেন্স কশ্টার ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কাঠের অক্ষর প্রস্তুত করিয়া ছাপিতেন কিন্তু তাহার কোন যথাযথ প্রমাণ আমরা পাই না। কশ্টারের পুস্তকাবলী ডেনমার্কের প্রাচীনতম ছাপার পরিচয় দেয়।

উন্নতির চরমকালে সাউপজনের হাতে টাকা দিয়া গুটেন্বার্গের চেষ্টা

কেম্ব্রিজের ডাঃ হেসেলস্এর মতে হার্লেম্ ছাপা কার্য্যের জন্মস্থান ও কশ্টারই উহার জন্মদাতা; কিন্তু গুটেনবার্গের মতবাদিগণের লেখনীতে সে কথার আমরা কোন মৌলিকতা

দেখিতে পাই না। জার্ম্মেনীর ডাঃ ভ্যান্ ডার্ লিণ্ডের পুস্তকেও গুটেনবার্গের কথাই দেখা যায়।

গুটেনবার্গের অমর কীর্ত্তি মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার। তিনিই প্রথম উন্নত প্রণালীর যন্ত্র প্রস্তুত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের বিশেষ অভাব ছিল, কিন্তু পরে তাহা পূর্ণ হয়। মেনজেই তিনি এই ছাপাকলের প্রতিষ্ঠা করেন। মুদ্রাযন্ত্রের ইহাই প্রথম কথা। অবশ্য জার্ম্মেনী ইহার জন্য গৌরবান্বিত এবং জগতের নিকটে প্রশংসাস্থানীয়।

প্রায় ১৪০০ খৃষ্টাব্দে (কাহারও কাহারও মতে ১৪১০ খৃষ্টাব্দে) গুটেনবার্গ মেনজে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গ্যান্সফ্লেজ্। গান্সফ্লেজ্ জার্ম্মেনীর একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনী পুরুষ। গুটেনবার্গের বয়স যখন মাত্র দশ বৎসর তখন জার্ম্মেনীর ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সময় তিনি পলায়ন করিয়া ষ্ট্র্যাস্‌বার্গ নামক স্থানে গমন করেন। ১৫ বৎসর বয়ক্রম হইতেই তাঁহার আবিষ্কারিক প্রতিভার বিকাশ হয়। এই সময় তিনি ড্রিটজেন নামক এক ব্যক্তির সহযোগে এক ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রায় ১৫ বৎসর এই ব্যবসা চালাইবার পর দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাতে বিশেষ লোকসান যাইতে আরম্ভ করে। অতঃপর তিনি ছাপার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। ইহাতে তাঁহার পুরাতন বন্ধু ড্রিটজেন ও অন্য দুইজনকে সহকর্ম্মী করিয়া তিনি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

গুটেনবার্গের এই নূতন ব্যবসা কিছুকাল চলিবার পর ড্রিটজেনের মৃত্যু হয়। অতঃপর ড্রিটজেনের এক ভ্রাতা ড্রিটজেনের অংশ দাবী করিয়া গুটেনবার্গের নামে মামলা করেন। গুটেনবার্গ ইহাতে জয়লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর ছাপাখানার ক্রমোৎকর্ষের জন্য গুটেনবার্গ বিশেষ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি ষ্ট্র্যাসবার্গ পরিত্যাগ করিয়া জন্মস্থান মেনজে আগমন করিলেন এবং নূতন করিয়া ছাপাখানার কার্য্য আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাঁহার অর্থের খুব প্রয়োজন হইল। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি জন্ ফাষ্ট নামক এক ধনী সওদাগরের সংশ্রবে আসেন। তাঁহার নিকটে তিনি তাঁহার ছাপাখানার যাবতীয় দ্রব্য বাঁধা রাখিয়া কিছু অর্থ ধার করিলেন এবং অক্ষর প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অক্ষর কাঠের হইয়াছিল।

গুটেনবার্গ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অক্ষরের কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন করিলেন কিন্তু পুস্তক ছাপাইবার মত সুযোগের অভাবে তাঁহাকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হইল অক্ষর লইয়া, কারণ কাঠের অক্ষর শীঘ্রই ক্ষয় হয়। তাই তিনি প্রথম ধাতুনির্ম্মিত অক্ষর প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাইলেন এবং অবশেষে কৃতকার্য্যও হইলেন। প্রথমেই তিনি 'বাইবেল' ছাপাইতে মনস্থ করেন এবং বহু কষ্টে জন্ ফাষ্ট ও শফেরের সহযোগিতায় ১৪৫৬ সালে একখণ্ড ও ১৪৬৯ সালে আর একখণ্ড—এই দুই খণ্ড লাটিন ভাষায় মুদ্রিত করিলেন। এইস্থানেই গুটেনবার্গের মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের সকল পরিশ্রম সার্থক হইল। কিন্তু এই সময় একটী অনর্থ আসিয়া জুটিল। গুটেনবার্গ সওদাগরদিগের নিকট হইতে যে অর্থ ঋণ করেন, তাহা শোধ করিতে না পারায় উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। বিশেষতঃ সওদাগরগণ ছাপাকলটীকে হস্তগত করিবার জন্য ঋণদত্ত টাকার দাবী করেন। গুটেনবার্গ মুদ্রাযন্ত্র রক্ষা করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

১৪৬২সালে আডল্ফ্-ভন্-নাসাউ নামক একব্যক্তি মেনজের মুদ্রাযন্ত্র হস্তগত করিয়া তথাকার শ্রমিকদের তাড়াইয়া দেন ও দূরদেশে উহার প্রসারকল্পে উহা তুলিয়া লইয়া যান।

জীবনের অধিকাংশ সময়ই গুটেনবার্গ মুদ্রাযন্ত্রে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মুদ্রাযন্ত্র হাতছাড়া হইলে তিনি যে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইলেন, তাহা বেশীদিন তাঁহাকে সহ্য করিতে হইল না। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় দীর্ঘ চারিশত বর্ষ পরে মেনজ্-নগরবাসিগণ তাঁহার স্মৃতিকল্পে এক মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই গুটেনবার্গের প্রতি জার্ম্মেনীর শ্রদ্ধাঞ্জলি; কিন্তু জগতে তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিল।

মেনজ্ শহরে মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়—গুটেনবার্গই ইহা করিয়াছিলেন। মেনজের পরে ষ্ট্র্যাস্‌বার্গ এবং তৎপরে ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে ফিস্টার-কর্ত্তৃক বামবার্গে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হইল। শীঘ্রই মুদ্রাযন্ত্র ইউরোপের নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িল। ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে কনরাড্ স্বেনহেইম্ ও আর্ণল্ড্ পানার্স নামক দুইজন জার্ম্মেনী-কর্ত্তৃক ইটালীর সুবিয়াকো

নামক স্থানে, ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে মার্টিন ক্রা স্, উলরিক্ গেরিঙ্ ও মাইকেল ফ্রিবুর্গের নামক তিনজন জার্ম্মেনী কর্ত্তৃক ফ্রান্সের প্যারী শহরে, ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে নিকোলাস্ কেটেলের ও গেরার্ড ডে-লেম্প্ট্ কর্ত্তৃক নিম্ন-দেশসমূহে, অতঃপর তিএরী মার্টিন্স্-কর্ত্তৃক উট্রেখট্ ও অলোষ্ট নামক স্থানে, ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে জনৈক অনামা মুদ্রাকর-কর্ত্তৃক স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া নামক স্থানে, ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে জন্ স্নেল্ কর্ত্তৃক ডেনমার্কের অডেন্স্ নামক স্থানে ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে লরবা ও এলীজার কর্ত্তৃক পর্তুগালের লিসবন্ শহরে এবং ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্ ফেব্রি-কর্ত্তৃক সুইডেনের ষ্টক্হলমে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হয়।

'সিসারো-ডে-অফীজ' নামক পুস্তকে গ্রীক অক্ষরের প্রথম প্রচলন হয়। জন্ ফাষ্ট ও শফের ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে মেনজে উহা মুদ্রিত করেন; তবে সম্পূর্ণ গ্রীক ভাষার প্রথম পুস্তক ছাপা হয় মিলানে ১৪৭৬ সালে। ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে উরটেম-বার্গের এস্লীনজেন নামক স্থানে ফাইনার প্রথম হিব্রু অক্ষর প্রচলিত করেন।

যদিও পূর্ব্বে কয়েকখানি পুস্তক ছাপা হয়, কিন্তু সর্ব্ব-প্রথম সম্পূর্ণভাবে 'টাইটেল'-পৃষ্ঠাসহ পুস্তক মুদ্রিত করেন ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রাসবার্গে মার্টিন্ ফাচ্ নামক এক ব্যক্তি; সুলভে ছাত্রদের সুবিধার জন্য প্রথম নূতনভাবে পুস্তক প্রকাশ করেন এলডাস্ মানুসাস্ নামক এক মুদ্রাকর; ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে কোলন্ নামক স্থানে এ,টার, হোর্নলেন্ প্রথম পুস্তকের পৃষ্ঠা-নম্বর দিবার প্রচলন করেন। পুস্তক ছাপিবার প্রথম তারিখ দিয়া প্রকাশ করা হয় ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে শফেরের 'সামোরাম্' কোডেক্স নামক পুস্তকে; প্রথম চিহ্ন-প্রকরণ ব্যবহৃত হয় ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে; প্রথম ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিত্রগ্রন্থ 'ইমেজেস্ অফ্ পিটি' নাম দিয়া প্রকাশিত হয় ইংলণ্ডে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে—তবে ইহার পূর্ব্বে উইলিয়াম্ কেক্সটন্ ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টমিনষ্টারে 'দি ডিক্টেস্ এণ্ড সেইংস্ অফ ফিলজফার্স' নামক পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

উইলিয়াম্ কেক্সটন্ কেন্টে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথমে লণ্ডনে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তৎপরে তিনি নিম্নদেশ-সমূহে গমন করেন—সেখানে তিনি ত্রিশ বর্ষ যাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর ইংলণ্ডের রাজভগিনী ও বার্গানডীর চার্লস্ দি বোল্ডের স্ত্রী মার্গারেটের আদেশে ট্রয়-ধ্বংসের কাহিনী ইংরেজীতে অনুবাদ করেন এবং বার্গেসের কলার্ড

ওয়েষ্টমিনিষ্টারের ছাপাখানায় কেক্সটন্

ম্যান্সান্ নামক মুদ্রাকরকে উহা ছাপাইতে দেন। ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে 'রিকুয়েল্ অফ্ দি হিস্টরিস্ অফ্ ট্রয়' নামে এই পুস্তক মুদ্রিত হয়—ইহাই ইংরেজী ভাষার সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত পুস্তক। অতঃপর ফরাসী হইতে অনুদিত 'গেম্ এণ্ড প্লে অফ্ দি চেজ্' নামক তাঁহার পুস্তক প্রকাশিত হয়—ইহাই ইংরেজী ভাষার দ্বিতীয় মুদ্রিত পুস্তক। ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওয়েষ্টমিনিষ্টারে মুদ্রালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

কেক্সটনের পরে নরম্যানডীর রিচার্ড পীন্সন্ ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম রোমীয় অক্ষরের প্রচলন করিলেন। ইঁহার পূর্ব্বের মুদ্রাকর ছিলেন উইন্‌কেন্-ডে-ওয়ার্ডে।

এল্ডো মেনুজিও ইতালীর আর একজন বিখ্যাত মুদ্রাকর। ইনি ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে ভেনিস্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই প্রথম 'ইটালিক্' অক্ষরের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

স্কট্‌ল্যাণ্ডে মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় ১৫০৮ সালে। এণ্ড্রু মিলার এডিনবরার 'সাউথ্-গেট্'এ এই মুদ্রালয়ের উদ্বোধন করেন। এই সময় ফ্রান্স ও স্কট্‌ল্যাণ্ডে ব্যবসা-সূত্র খুব প্রবল ছিল। এই সুযোগে

বিলার ক্রয়েনে যাইয়া মুদ্রাক্ষরের একটী ছাঁচ কিনিয়া এডিনবরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহা হইতেই তাঁহার মুদ্রালয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল।

স্কট্ল্যাণ্ডের পর মুদ্রাতত্ত্ব প্রসারিত হইল আয়ার্ল্যাণ্ডে। ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে হ্যাম্ফ্রে পাওয়েল ডব্লিনে তাঁহার 'কমন্ প্রেয়ার' নামক প্রথম পুস্তক মুদ্রিত করিলেন—ইহাই আইরিশ প্রেসের প্রথম প্রকাশিত পুস্তক।

আমেরিকায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের আমদানী হয় ১৫৩৫ সালে। মেক্সিকোয় একজন স্পেনদেশীয় ব্যক্তি ইহা আনয়ন করেন। ১৫৩৮ সালে আমেরিকার প্রথম ইংরেজী পুস্তক ছাপা হইল—এই গ্রন্থ হার্ভাড্-কলেজে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই কলেজ একজন ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত করেন; এক্ষণে ইহা হার্ভাড্-বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ার মিঃ জি, ক্লাইমার কলম্বীয় মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেনে তাহা প্রচলিত করিলেন। ইহার পর ১৮২০ সালে আর, ডব্লিউ, কোপ্ নামক লণ্ডনের একজন ইঞ্জিনীয়ার 'আলবীয়ন্'-যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ইহা পূর্ব্বতন যন্ত্রগুলির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চস্তরের হইল।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি মূলতঃ ছাপাকল খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। মোটকথা বলিতে গেলে উইলিয়াম্ নিকল্সন্ ইহার প্রথম উদ্যোক্তা। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার প্রয়াস পান। তাঁহার প্রায় দশ বৎসর পরে ফ্রেডারিক কনিগ্ নামক সাক্সনীর একজন মুদ্রাকর ছাপাকলের উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু স্বদেশে
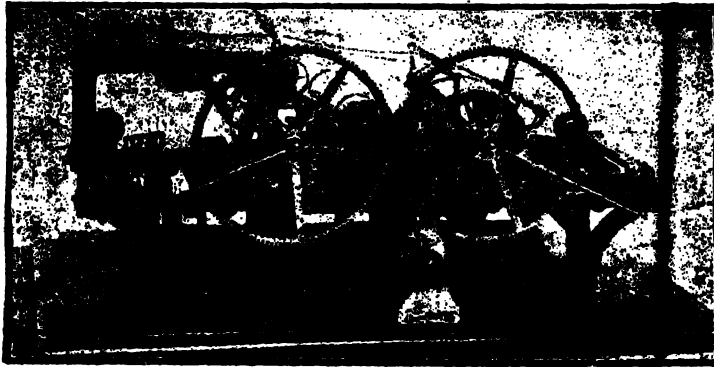
১৮১১ খৃষ্টাব্দের আবিষ্কৃত মুদ্রাযন্ত্র; ইহাতে ঘণ্টায় ১৫০০ বার ছাপ দেওয়া যায়

গুটেন্বার্গের ব্যবহৃত ছাপার কল পরবর্ত্তীকালের উন্নত প্রণালীর মুদ্রাযন্ত্র অপেক্ষা অনেকাংশে হীন ছিল। উহা অনেকটা মাখন-তৈয়ারীর যন্ত্রের মতন। ইহাতে অক্ষর ভাঙ্গিয়া যাইত খুব এবং অসুবিধাও হইত অনেক। যাহা হউক পরে নানারূপ উন্নত যন্ত্রের আবির্ভাব হইতে লাগিল এবং প্রায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যানহোপের তৃতীয় আর্ল চার্লস্ মাহন্ প্রথম সুবৃহৎ উচ্চশ্রেণীর মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। পূর্ব্বের মুদ্রাযন্ত্রগুলি কাঠের হইত, কিন্তু মাহনের এই যন্ত্রের অবয়ব হইল লৌহনির্ম্মিত। ইহার পর এডিনবরার জন্ রুড্ভেন্ নামক এক মুদ্রাকর ছাপাকলের আরও কিছু উন্নতি সাধন করেন।

সাহায্যের অভাবে তিনি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে আগমন করিয়া একটী যন্ত্রের উদ্ভাবন করিলেন। ফ্রেডারিকের এই যন্ত্র অনেকটা নিকল্সনের অনুরূপ। টমাস্ বেন্সলি একজন সুযোগ্য মুদ্রাকরের সাহায্য পাইয়া কনিগের যন্ত্র ব্যবহার করিয়া ১৮১২ খৃষ্টাব্দে কয়েকটী পুস্তক ছাপিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দেই প্রথম বাষ্পচালিত যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। 'টাইম্স্' পত্রিকার মিঃ জন্ ওয়ালটার তাঁহার পত্র ছাপিবার জন্য কনিগ্-আবিষ্কৃত একটী যন্ত্র চাহিয়া পাঠান কিন্তু আলোচ্যবর্ষের ২৯ নবেম্বর তিনি খবর পাইলেন যে, একটী নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে; তাহা

বাষ্পে পরিচালিত করা যাইতে পারে। এই যন্ত্রটী ঘণ্টায় ১৮০০ বার ছাপ দিতে পারিত। ওয়াল্টার উহাই তাঁহার ছাপার কার্য্যের জন্য গ্রহণ করিলেন।

'টাইম্‌স্'এর কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন না, তাঁহারা অধিকতর দ্রুত ছাপ দিবার জন্য উন্নত যন্ত্রের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে অগাস্‌টাস্ আপ্লেগাথ্ নামক এক ব্যক্তির দ্বারা একটী যন্ত্রের আবিষ্কার হইল—ইহাতে ঘণ্টায় ১০,০০০ বার ছাপ দেওয়া যাইত।

'টাইম্‌স্'এর কারখানাতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহাতে ৮০০ পাউণ্ড ওজনের চার মাইল লম্বা রোল করা কাগজ ব্যবহৃত হইত। একটী ছুরিকাও ইহাতে সংযোজিত থাকিত—ছাপার সঙ্গে সঙ্গে তাহা নির্দ্দিষ্ট মাপে কাগজ কাটিয়া ঠিক করিয়া রাখিত।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লিভারপুলের জর্জ্জ ডান্‌কান্ ও আলেকজেণ্ডার উইল্‌সন্ আর একটী যন্ত্র আবিষ্কার করেন; ইহার নাম 'ভিক্টরী'। ইহার পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মেসার্স ফশ্‌টার এণ্ড্ সন্স কর্ত্তৃক 'রোটারী-মেসিন' আবিষ্কৃত হইল।

আধুনিক ছাপাকল—ইহাতে ঘণ্টায় ১,২০,০০০ বার ছাপ দেওয়া যায়

ইহার পর 'দি টাইপ্ রিভলভিং ফাষ্ট প্রিণ্টিং মেসিন' আবিষ্কৃত হইল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক ও লণ্ডনের মেসার্স হো এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক। রিচার্ড মার্চ হো ছিলেন ইহার স্বত্বাধিকারী। এই যন্ত্রে ঘণ্টায় ছাপ দেওয়া যাইত ২০,০০০ বার। অতঃপর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের পেন্‌সিল্‌ভানিয়ার উইলিয়াম্ বুলক্ একটী যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন; উহার নাম হইল—'বুলক্-মেসিন' যন্ত্রটী

প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রমশঃ নিত্য নানা উন্নত ছাপার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। মেসার্স হো এণ্ড কোম্পানী আর একটী নূতন যন্ত্রের আমদানীর জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা একেবারে নূতন একটী যন্ত্রের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন। ইহা হইল মুদ্রণজগতে একটী অদ্ভুত উপাদান।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইঞ্জিনীয়ারগণ-কর্ত্তৃক ইহার নানারূপে আরও উন্নতি করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। ইহাতে দুইটা মেসিন্ সরলভাবে একসঙ্গে করিয়া একটী যন্ত্র করা হইল, উহা এক বিরাট্ যন্ত্রে পরিণত হইল। এই যন্ত্র ঘণ্টায় আট পৃষ্ঠার ফর্ম্মায় ৯৬,০০০ ছাপ, ১৬ পৃষ্ঠার ফর্ম্মায় ৪৮,০০০ ছাপ ও ২৪ পৃষ্ঠার ফর্ম্মায় ২৪,০০০ ছাপ দিতে সক্ষম হইল।

বর্ত্তমান যুগে মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি যে কতদূর হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজকালকার 'ইলেক্‌ট্রিক্'-চালিত যন্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহাই জগতে বিশেষ আসন পাইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতচালনাশক্তিযুক্ত যে যন্ত্রের খবর আমরা পাই তাহা ঘণ্টায় ১,২০,০০০ বার ছাপ দিতে পারে।

ছাপাকলের মধ্যে 'লিনো-টাইপ' যন্ত্রই জগতে বিখ্যাত। ইহার বেগ অতি দ্রুত এবং অতি অল্প খরচে ইহার ছাপাকার্য্য চলিতে পারে। জার্ম্মেণীর ষ্টমার মেগেন্থেলার ইহার আবিষ্কারক। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম ব্যবহার করা হয়।

পুরাকালে যখন ছাপাকল ছিল না তখন হাতে লিখিয়াই সমস্ত কাজ হইত, পুস্তকের অভাব ছিল খুবই—ছাত্রেরও অসুবিধা ছিল তদ্রূপ। আজকাল মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারে সে অভাব মোচন হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র এখন আমাদের সকল বিষয়েই প্রয়োজনীয়—অতি প্রিয় বস্তু। শিক্ষার প্রচারে, সংবাদ প্রচারে, দেশ-বিদেশে পরস্পর মিলনের কেন্দ্রস্থলে ইহা সভ্যজগতের এক অপরূপ অত্যাশ্চর্য্য দান।

মহুয়া

(দৃশ্যকাব্য)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পর্ব্বতের নিম্নে বেদের কুটীরের নিকটস্থ বনপ্রান্তর—
এক পার্শ্বে বেদে-মেয়েদের নৃত্যগীত]

গান

মেঘে করে ঝিলিমিলি সোণার বরণ ঢাকা,
সন্ধ্যাবেলায় চাদ্‌নী উঠে গায়ে হলুদ-মাখা।
মেঘের গায়ে করে খেলা চাঁদের দেশের মেয়ে,
মেঘের উপর চড়ি' তারা নাচে ধেয়ে ধেয়ে।
চাঁদের রাণার নূপুর বাজে আসমান দেয় সাড়া,
মেঘের রঙে মেশে কেশ তার জ্বলে আঁখিতারা।
নাচে নাচে মেঘের মাঝে মেলি' সোণার পাখা
চাঁদের কোলে পড়ে ঢ'লে মুখে সোহাগ আঁকা।

(পালঙ্কের প্রবেশ)

পালঙ্ক।—কোথায় জান মহুয়া সই? এখানে তো নাই!
কোথায় থাকে আপন মনে খুঁজিয়া না পাই।

একজন বেদের মেয়ে।—কি জানি ভাই কি যে ব্যথা
মহুয়ার প্রাণে,
মুখে নাই সে হাসির রেখা যোগ দেয় না গানে।
একলা থাকে মুখটী বুজি' বনের কিনারে,
কাছে গিয়ে পাই না সাড়া যত ডাকি তা'রে।

পালঙ্ক।—জানি না ভাই কি যে তাহার মনে আছে ব্যথা,
ছাড়ি' অবধি বামনকান্দি কয় না সে যে কথা।
মনে হয় সে নদেরচাঁদের প্রেমেতে পাগল,
তা'র বিহনে নিদ্রা যায় না ছাড়ে অন্নজল।
শুইয়া থাকে ভূমির উপর আঁচল পাতিয়া,
দিন যায় যে রাত্রি যায় যে কান্দিয়া কান্দিয়া।

(হুমড়ার প্রবেশ)

হুমড়া।—দেখে পালঙ্ক বেটী মহুয়া কন্যারে?
কোথায় যে রে গেছে কন্যা দেখি না তাহারে।

পালঙ্ক।—দেখি নাই তো মহুয়ারে, জানি না সে কোথা।

হুমড়া।—দেখি আমি কোথায় গেল থাকে যথা-তথা।

পালঙ্ক।—আসমান জুড়ি' মেঘ এসেছে বর্ষা আসে পাছে
চল সবে দেখি গিয়া মহুয়া কোথায় আছে।

(পালঙ্ক ও বেদের মেয়েদের নাচিতে নাচিতে ও
গায়িতে গায়িতে প্রস্থান)

গান

আকাশ-ভরা মেঘ জমেছে আঁধার আনি' সাথে
'বউ কথা কও' বলি পাখী কান্দে পথে পথে।
গুরু গুরু ডাকে দেয়া ঝিলিক দিয়া যায়
পুবেতে গর্জ্জিয়া পরে পশ্চিমেতে ধায়।
হাতে ল'য়ে সোণার ঝারি বর্ষা নামে রথে॥

(প্রস্থান)

[বিষণ্ণমনে মহুয়ার প্রবেশ ও একখানা পাথরে উপবেশন।
পরে মহুয়ার মনের দুঃখে গান]

গান

কোথায় ওরে প্রাণের বঁধু আমার গলার মালা,
দেখ আসি' তোমার লাগি' কাঁন্দে বেদের বালা।
তুমি হও তরু বন্ধু, আমি হই লতা,
বেড়ি' তোমার চরণ যাব তুমি যাবে যথা।
তুমি আমার ভ্রমর-বন্ধু আমি তোমার ফুল,
আমার মধু পিয়া তুমি হইবে আকুল।
নাহি দেখা দিবে যদি কেন দিলে জ্বালা,
দেখ কাঁদি' নিশা পোহায় তোমার বেদের বালা।

(সুজনের প্রবেশ)

সুজন।—শোন শোন মহুয়া রে শোন আমার কথা,
নদেরঠাকুর লাগি' তুমি কেন পাওরে ব্যথা।
এতদূরে গহন বনে কেমনে আসবে সে
আমার বিয়া কইরা কন্যা থাক এই দেশে।

মহুয়া।—বারে বারে সুজন তুমি কেন আমায় জালাও।
দুঃখের উপর দুঃখ দিয়া কেন আমায় কান্দাও।

সুজন।—মিছা তোমার মনের ব্যথা, মিছা জ্ঞানহারা,
মিছা তুমি ঠাকুর লাগি' ভাবি হও রে সারা।
সে ছিল যে সখের পরাণ খেয়ালী শিকারী,
তুমি ছিলা দু'দিনের তা'র খেলার কৈতরী।
ভালবাসা বেদের বালায় থাকবে কিসে তা'র
তুলি' মধু ফেইলা দিত বাসি ফুল হার।

মহুয়া।— কেন আমায় জালাও তুমি সমুখ হইতে যাও
আপন মনে কান্দি আমি, আমায় ছাইড়া দাও।

সুজন।—আমার বিয়া করবা তুমি কহ একটি কথা,
যাইব আমি যাইব নিশ্চয় বলবা তুমি যথা।

মহুয়া—দিব আমি গলায় দড়ি ডুব্‌ব নদীর জলে,
তবুও না ভুলব আমি তোমার কথার ছলে।

সুজন।—কহ তুমি সত্য করি' করবা কি না বিয়া।

মহুয়া।—তাহার আগে মরব আমি গলায় দড়ি দিয়া।

সুজন।—(সরোষে)
দেখ্‌ব আমি থাকে কেমন তোমার এমন জেদ,
ইহার তরে পরে তোমায় করতে হ'বে খেদ।
আসে যদি নদেরঠাকুর পরাণে বধিব,
সমুখে মারিয়া তারে আনন্দে নাচিব।

(সুজনের প্রস্থান)

(পালঙ্কের প্রবেশ ও গীত)

গান

পালঙ্ক।—গাঁথ গাঁথ সুন্দর কন্যা মালতীর মালা,
আসে তোমার বনচোরা বকুলগাছের তলা।
কোন্ বা দেশে থাকে ভ্রমর কোন্ বাগানে বসে,
কোন্ বা ফুলের মধুর আশায় ফিরা ফিরা আসে'
না ফুটিতে বনফুল রে তুলিতে সে কলি,
মধু না আসিতে ফুলে কেন জুটে অলি।
এসেছে তোমার বঁধু আঁধারেতে আলা,
উঠ উঠ প্রাণসখি, উঠ বেদের বালা।

মহুয়া।—(আবেগের সহিত উঠিয়া)
কি হেরিলি বল্ না সখি হেঁয়ালি তোর থাক্
বল্ না সখি কি বলিলি আমার পরাণ রাখ্।

পালঙ্ক।—দেখ্‌ছি সখি নদেরচাঁদে ঘুরতে বনের ধারে,
তোমায় খুঁজতে আসছে ঠাকুর এই না নদীর পারে।
আর না থাক বিরস বদন দুঃখ তোমার নাই,
আসছে তোমার প্রাণের ঠাকুর আসছে তোমার ঠাঁই।

মহুয়া।—(ব্যস্ত হইয়া)
কই! কই! পালঙ্ক রে নদেরঠাকুর কই?
চল রে সাথে দেখ্‌ব তারে নিয়া চল রে সই।

(উভয়ের প্রস্থান)

(অপর পার্শ্ব দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নদেরচাঁদের প্রবেশ)

নদেরচাঁদ।—দিন যায় মাস যায় বছর ঘুইরা আসে,
মহুয়া বেদের কন্যা নাই রে আমার পাশে।
খুঁজছি তা'রে বনের ধারে খুঁজছি পাহাড়তল,
তবু না মিলিল কন্যা এ কেমন তা'র ছল।
বল বল তরু লতা বল দয়া করি'
এই পথে যাইতে কি দেখেছ মহুয়া সুন্দরী।
মেঘের মতন কেশ রে তার তারার মতন আঁখি,
কোথায় উইড়া গেল আমার পিঞ্জরেরি পাখী।
বল বল কোথায় গেলে তা'র পাব দরশন,
তিলেক আর না হ'লে দেখা আমার নিশ্চয় মরণ।

(এমন সময় অন্তধার দিয়া প্রবেশোন্মুখ মহুয়ার গান
নদেরচাঁদের কর্ণে পৌছিল)

গান

মহুয়া।—যেদিন হ'তে দেখেছি বন্ধু তোমার চাঁদমুখ,
সেদিন হ'তে পাগল আমি গিয়াছে মোর সুখ
আঁধারে ডুবেছে যেন চন্দ্র, সূর্য্য, তারা,
তোমায় ছাড়ি হইছি আমি দু'টী আঁখিহারা।

কপালেরি দোষে বন্ধু নাহি বাপ ভাই,
দোসর দরদী কেহ তুমি ছাড়া নাই।
মুখ না ফুটে রে বন্ধু ফেটে যায় রে বুক,
অসহ আগুনে মোরে জ্বালায় পোড়া দুখ।

(নদেরচাঁদ দৌড়িয়া মহুয়ার কাছে গিয়া তাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া)

নদেরচাঁদ।—কার ভাবনায় বিরস বদন চক্ষে বহে পানি,
চিন্‌তে আমার পার কন্যা আমার পরাণ-রাণী?

(মহুয়া চমকিত হইয়া ফিরিয়া ঈষৎ হাসিয়া)

মহুয়া।—তুমি যে বিদেশী ঠাকুর কেমনে চেনা যায়,
মহুয়ার প্রাণ তবু লুটাইছে ঐ পায়।
নদেরচাঁদ।—জানি জানি জানি কন্যা জানি তোমার ছল
পুরুষ বাঁধিতে তুমি জান কত কল।
আমার প্রাণটী চুরি ক'রি উড়ছ বনের পাখী,
কান্দ্‌তে কান্দ্‌তে ঘুর্‌ছি বনে অন্ধ হইছে আঁখি।
মহুয়া।—মিথ্যা কেন কও রে বন্ধু দেখ আমার পানে,
তোমায় ছাড়ি বর্ণ মলিন সুখ নাই মোর প্রাণে।
তুমি পার নদেরঠাকুর পাইতে কত নারী,
দয়া কইরা বাস্‌ছ ভাল বেদের কুমারী।
কিন্তু তা'র তো তুমি বিনা অন্য কেহ নাই,
চরণ-তলে দিও স্থান রে আর না কিছু চাই।
নদেরচাঁদ।—কি কহ যে বেদের বালা কি কহ যে কথা,
এমন কথা শুনলে আমার প্রাণে লাগে ব্যথা
তুমি আমার পরাণ-প্রিয়া নয়নেরি আলো,
তোমায় আমার হৃদয় দিয়া বাসিয়াছি ভালো।
আর তো তোমায় ছাড়ব না রে এই করেছি পণ,
বনের ধারা বাসা বান্ধ্যা থাক্‌ব দুইজন।

(পালঙ্কের সহসা প্রবেশ ও নৃত্যগীত)

গান

মিলেছ কি শুকের সাথে বিরহিণী সারী?
বেঁধেছ কি বুকের মাঝে প্রাণবঁধু নারী?
তোমার বন্ধু বনের পাখী উইড়া ফিরা গুঞ্জরে,
এবার যখন পড়েছ ধরা বাঁধ প্রাণের পিঞ্জরে।
মধুলোভে আস্‌ছে অলি বনফুলে বিহরে,
রাখ তারে রাখ ধরি রাখ হিয়া ভিতরে।
শিকারে এসেছে আজি চতুর শিকারী
দেখ যেন পরাণ বাধ উড়ে না সে ছাড়ি'।

মহুয়া।—মিছা কেন পালঙ্ক সই বাড়াবাড়ি করিস্,
বুঝি না রে তুই যে কত রসিকতা জানিস্।
পালঙ্ক।—থাক থাক চাতকিনী সুধাভাণ্ড নিয়া
নদেরঠাকুর রহুন হেথায় ভরি তোমার হিয়া।

(পালঙ্কের প্রস্থান)

মহুয়া।—(অগ্রসর হইয়া নদেরচাঁদের হস্ত ধরিয়া)
আজকের মত রহ ঠাকুর হিজল গাছের তলে,
কালকে বন্ধু তোমায় লইয়া যাব অন্যস্থলে।

(মহুয়ার অঞ্চল বিছাইয়া দেওন এবং নদেরচাঁদের বৃক্ষতলে শয়ন ও নিদ্রা)

(অন্যপার্শ্বে সুজনের গোপনে প্রবেশ এবং বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে মহুয়া ও নদেরচাঁদকে অবলোকন; পরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শাসাইয়া)

সুজন।—এখানেও জুটছ ঠাকুর বেদের বালার টানে
ভাবছ বুঝি মহুয়ারে বিঁধবা প্রেমের বাণে।
চেন নাই কি সুজনচাঁদে তোমার দুষমণ রে
যাই যে আমি খবর দিতে বেদের সর্দার রে।

(সুজনের প্রস্থান)

(ধীরে ধীরে মহুয়া উঠিয়া একটু দূরে পাথরের উপর বসি। গান ধরিল)

গান

কতদিনে বন্ধু আমার আসবে সুখের দিন,
তোমার লাগি' ভাবি আমার যৌবন হ'ল ক্ষীণ
আপন চোখের জল আমার চোখের জ্যোতিঃ হীন,
মলিন হইছে বর্ণ আমার মুখের হাসি লীন।
কতদিনে বন্ধু আমার আসবে সুখের দিন॥

(হুমরার দ্রুত প্রবেশ)

হুমরা। মহুয়া রে এতরাত্রে নিদ্রা কেন না যাও,
কিসের তোমার ভাবনা এত বাপকে কেন না কও।
ষোল বছর পালুলাম তোমায় কত দুঃখ করি'
একটী কথা রাখ্‌বে আমার মহুয়া সুন্দরী।

(দূরে নদেরচাঁদকে নিদ্রিত দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিয়া ও বক্ষের কাপড় হইতে ছুরি বাহির করিয়া)

এই ছুরি লইয়া তুমি যাওরে এই ধারে,
শুইয়া আছে নদেরঠাকুর মাইরা আস তারে।
ভিন্নদেশী দুষমণ সে রে মন্ত্র-তন্ত্র জানে
বুকে তা'রে মাইরা ছুরি মার তারে প্রাণে।
আমার মাথা খাও রে কন্যা আমার মাথা খাও,
দুষমণেরে মাইরা তুমি নদীর জলে দাও।

(মহুয়া চমকাইয়া উঠিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল)

[দৃশ্যের একটু পরিবর্তন। আকাশে তারা ডুবিল, চাঁদ দেখা গেল না, সোণালী চাঁদিনী-রাত পাতলা মেঘে ঢাকা পড়িল]

হুমরা।—কেন কন্যা এমনভাবে আমার পানে চাও,
এই লও রে বিষের ছুরি শীঘ্র তুমি যাও।

(তথাপি মহুয়া নড়িল না, তখন হুমরা গর্জ্জন করিয়া উঠিল)

না না আমি শুনব না রে নদেরচাঁদরে মার,
মারব আমি নিশ্চয় তারে নিস্তার নাই রে তার।

(হুমরা মহুয়ার কোলে ছুরি দিয়া প্রস্থান করিল। মহুয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ছুরি হাতে লইয়া উঠিল। গাছের তলায় নদেরচাঁদ নিদ্রিত ছিল। চাঁদের আলো তাহার মুখে পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুরিকা-হস্তে মহুয়া নদেরচাঁদের নিকটে গিয়া]

মহুয়া।—ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর হিজলগাছের তলে,
আসমানেরি চাঁদ যেন রে আঁধার রাতে জ্বলে।
উঠ উঠ বন্ধু আমার কত নিদ্রা যাও,
অভাগী মহুয়া তাকে আঁখি মেলি চাও।
পাষাণ বাপে দিল ছুরি তোমারে বধিতে,
সেই ছুরি মাইয়া বুকে চাই গো পরাণ দিতে।
বিদায় দাও রে প্রাণের ঠাকুর মহুয়া দাসীরে
তোমার পদে মাথা রাখি জীবন ত্যজি রে।

(মহুয়ার নিজের বক্ষে ছুরিকাঘাতের উদ্যোগ এবং নদেরচাঁদের সহসা জাগিয়া চমকাইয়া মহুয়ার হস্তধারণ)

নদেরচাঁদ।—কি কর কি কর কন্যা শিয়রে আসিয়া,
হাতে কেন ছুরি লইয়া কাঁদিছ বসিয়া।

মহুয়া।—শুন শুন প্রাণের ঠাকুর শুন মোর কথা,
কঠিন তোমার প্রাণ-প্রিয়ার কঠিন বারতা।
নিঠুর আমার মাতা-পিতা পাষাণ-পরাণ,
তোমার বধে আজ্ঞা দিল কহিয়া সন্ধান।
হাতে দিল বিষের ছুরি বধিতে তোমারে,
নিজের বুকে মারি আমি, তুমি যাইও ঘরে।
তোমার পায়ে মাথা রাখি মহুয়া মরিবে,
তোমার সাথে দেখা বন্ধু আর না হইবে।

নদেরচাঁদ।—তোমার তরে ছাড়ছি বাড়ী দিছি জাতিকুল,
ভ্রমর হইয়া ফিরি আমি তুমি বনফুল।
তোমার লাগি ছাড়ছি দেশ বেড়াই বিদেশে,
তোমায় ছাড়ি' মহুয়ারে না যাইব দেশে।
তোমায় যদি না পাই কন্যা মিথ্যা জমি বাড়ী,
লও রে আমার পরাণ তুমি বুকে ছুরি মারি'।

মহুয়া।—পইড়া থাকুক মাতা-পিতা পইড়া থাকুক ঘর,
তোমায় লইয়া বন্ধু আমি যাইব দেশান্তর।
দুটী আঁখি যেদিক্ যায় রে যাইব সেইখানে,
আমরা দুজন মনের সুখে থাকব গহন বনে।
কেউ না পাবে সন্ধান সেথা না জানিবে কেহ,
বনের ফল রে হ'বে আহার বনে হ'বে গেহ;
বাপের আছে তেজী ঘোড়া নদীর এই না ধারে
দুইজনেতে উঠি' চল যাইব দেশান্তরে।

নদেরচাঁদ।—(মহুয়ার গলা ধরিয়া)
চল সখি চল সখি চল সখি যাই,
বনে বনে থাকব আমরা যেথা সুখ পাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

(অপর পার্শ্ব দিয়া হুমড়া, মাণিক ও সুজনের প্রবেশ)

হুমড়া।—কোথায় গেল নদেরঠাকুর এই না ছিল হেথা,
আইল কন্যা ছুরি হতে সেই বা গেল কোথা।
মহুয়া পলাইল রে নদেরচাঁদের সাথে,
উড়ল আমার পোষা পাখী গভীর গহন রাতে।
কত যত্নে পাল্‌লাম আমি মহুয়ারে তোরে,
এমন ব্যথা আমার প্রাণে কেন দিলি ওরে?
কেন কেন নদেরঠাকুর বেদের বাসায় পড়ি',
স্নেহের শাবক কন্যা আমার নিলি তুই রে কাড়ি।
কোথায় সুজন, মাণিক ভাই, দেখা আসি হেথা,
নদেরঠাকুর মহুয়ারে লইয়া গেল কোথা!

সুজন।—আমি তা'রে আনব ধইরা যেথায় যেন থাক্,
নদেরচাঁদের শোণিত-পানে হৃদয় জুড়ায় যাক্।

মাণিক।—যেথায় যাবে সেথায় যাব তোমার সাথে ভাই,
মিথ্যা ছাড়লা জমি বাড়ী সকল মুখে ছাই।

হুমড়া।—(কিয়ৎক্ষণ থামিয়া)
বনের পথে চুড়্‌ব আমি জলের পথে যাব,
পাহাড়চুড়ায় চড়ব আমি, যেথায় সন্ধান পাব।
নদেরচাঁদের বক্ষে আমি এ ছুরি হানিব,
কন্যা আমার যেথায় থাকে কাড়িয়া আনিব।

[সকলের প্রস্থান]

পট-ক্ষেপণ

গৌরীর তপস্যা

শ্রীফণিভূষণ রায়

বিশিষ্ট অবস্থার মধ্যে বিশ্বসত্য ফুটাইয়া তোলাই কবিত্ব—ঋষিত্ব। বৌদ্ধ ও হিন্দুর দ্বন্দ্বের চির-অবসান ঘটিয়াছে, কিন্তু কবি তাঁহার সমসাময়িক দ্বন্দ্বকে যে শাশ্বত সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পঙ্কে প্রস্ফুট-পদ্মের মত চিরকালের শোভায় দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। সকল চিত্রেরই একটা "চিত্র-সংস্থান" (ব্যাক-গ্রাউণ্ড) থাকা চাই। সেই জন্য স্থানকালাতীত যে সৌন্দর্য্য সত্য, তাহা প্রকাশ করিতে হইলে স্থান ও কাল দ্বারা খণ্ডিত অবস্থা-বিশেষের পরিকল্পনা অবশ্যই করিতে হয়। কুমার-কাব্যের নায়িকার চরিত্র-চিত্রণে তাহাই আমরা লক্ষ্য করি; সুতরাং বলি, বৌদ্ধ ও হিন্দুর যুগযুগান্তব্যাপী দ্বন্দ্বের কথা মনে না রাখিলে গৌরীর "চরিত্র" আমরা বুঝিব না—বুঝিতে পারিব না; কারণ এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে বিশেষ কালের পঙ্কেই চিরকালের পদ্ম তাহার মূল গভীরভাবে প্রেরণ করিয়া থাকে।

কবি ও প্রকৃতি সৃষ্টি-ব্যাপারে অভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। "ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা"—ইহা সৃষ্টি-রহস্যের সংক্ষিপ্ততম এবং শোভনতম সংজ্ঞা নয় কি? মানুষ বলিলে—যুগপৎ দুইটী কল্পনা আমাদিগের মনে আসে, এক প্রত্যক্ষ মানুষ—অপর পরোক্ষ মানুষ; এক ভাব-মানুষ, অপর রূপ-মানুষ। ভাব-মানুষকে বাদ দিলে রূপ-মানুষকে গড়িয়া তোলা যায় না; রূপ-মানুষকে বাদ দিলে ভাব-মানুষ অপ্রত্যক্ষ থাকিয়া যায়। এই জন্য বিশেষ অবস্থার আনুকূল্যে গৌরীর চরিত্র যতখানি ফুটিয়াছে বুঝিতে হইবে, আবার

বিশেষ অবস্থাকে ছাড়াইয়া যতখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে হইবে; তাহা হইলেই ভাব ও রূপের সু-সামঞ্জস্য হইবে এবং আমরা গোরী-চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য্য—সমগ্র সৌন্দর্য্য বুঝিতে সক্ষম হইব।

প্রথমতঃ বিশেষ কালের গৌরীকে বুঝিতে চেষ্টা করি।

কুমার-কাব্যের ৫ম সর্গে গৌরীর তপস্যা বর্ণিত হইয়াছে। মদন ভস্মীভূত হইলে পর—গৌরী মৌঞ্জী-মেখলা ধারণ করিয়া গৌরী-শিখরে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন (অবশ্য এ তপস্যার উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ-লাভ নহে—মদন-ভস্মকারী শিবের পত্নীত্ব-লাভই তপস্যার উদ্দেশ্য) এবং "সহস্যরাত্রীরুদ-বাসতৎপরা" হইয়া উৎকট কৃচ্ছ্র-সাধন করিতে লাগিলেন। তাহার সেই অভূতপূর্ব্ব তপস্যায় আকৃষ্ট হইয়া শিব যুবক ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে সেইখানে উপস্থিত হইলেন এবং যাহা আশা করা যায় না (তৃতীয় সর্গের মদনভস্মের কথা মনে করিয়া) বিজ্ঞের মত গৌরীকে মৃদুমন্দ ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। আমরা বলিব—শিবের অবশ্যই মদনভস্ম করিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছিল; তাহা না হইলে তিনি তপস্বিনী (!) গৌরীকে ভৎর্সনা করিবেন কেন? সত্যই তো গৌরীর পক্ষে তপস্বিনী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র—শয্যায় শয়ান হইলে স্বকেশস্খলিত পুষ্পের আঘাতে যে চারুগাত্রী ক্লিষ্ট হ'ন, তাঁহার পক্ষে তপস্যার কৃচ্ছ্রসাধন যে অস্বাভাবিক তাহা সকলেই বলিবে। ছদ্মবেশী শিব চটুল বাগ্মিতার সহিত তাহাই সবিস্তারে বলিলেন। সেই বহুল-ভাষণ হইতে দুই একটা কথার উল্লেখ এইখানে করিব। শিব বলিলেন, কৃচ্ছ্র-সাধনে আপনি সকলের পুরঃস্থানীয় হইয়াছেন সন্দেহ নাই—কিন্তু হে কৃশোদরি, আপনি আকৃতি-লোভনীয়া, আপনার "নবংবয়ঃ"—এবং আপনি রাজপুত্রী—আপনি কিসের জন্য তপস্যা করিতেছেন—বুঝি না—আপানার আবার কিসের তপস্যা?......

আদিম বসন্ত-প্রাতে উর্ব্বশী যেদিন মন্থিত সাগর-তটে পদ্ম-কোরকপ্রভ পদ স্থাপন করিয়াছিলেন—সেদিন এই ছদ্মবেশী উপস্থিত থাকিলে অনুরূপ কথাই তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইত...হে সুন্দরী, আপনার আবার তপস্যা কি? রূপই তো আপনার তপস্যা—যৌবনই তো আপনার তপস্যা—আর আপনার প্রার্থিত যদি কেহ থাকে—তবে তাহারই তো তপস্যা করা উচিত; কারণ, "ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ (রমণীয় মনসহস্র বর্ষেরই সখী—সাধনার ধন)—হে সন্নতগাত্রি, আপনার পক্ষে তপস্যা করা কেবল বৃথা নয়—অনাবশ্যক বাহুল্য মাত্র..শুক্লপক্ষের পরে যেমন কৃষ্ণপক্ষ আসে—গঠন-যুগের পরে তেমনই বিচার-যুগ আসে—"উদয়" যুগের পরে তেমন "অস্ত" যুগ আসে। মদন-ভস্ম, গৌরীর তপস্যা—ইহা সব বিচারযুগের কথা—দুঃখ-যুগের কথা—গঠনযুগ, কৃতযুগ, সত্যযুগের কথা নয়। কুমার-কাব্যের গতি-ভঙ্গী কিন্তু (সৌভাগ্যের কথা) এই মধ্য-যুগীয় মনোভাবে পর্য্যবসিত হয় নাই—কবি এই বিচারযুগের মনোভাবকে সত্যযুগের (গঠন-যুগের) মনোভাবে অনায়াসে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। যে সময়ে উত্তর-কোশল হইতে দক্ষিণে অন্ধ্র পর্য্যন্ত সহস্র সঙ্ঘারামে শত সহস্র যুবতী "ভিক্ষুণীব্রত" গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেছিলেন—সেইযুগে তপস্যানিরতা গৌরীকে "জীবনের ডাক" শুনাইবার স্পর্দ্ধা কবি রাখিয়াছেন—গৌরীর সখী-মুখে অবলীলাক্রমে বলাইয়াছেন—গৌরী নির্ব্বাণ-লাভের তপস্যা করিতেছে না। "পিনাকপাণিংপতি মাপ্তু-মিচ্ছতি"র তপস্যা করিতেছে; সুতরাং বলিতে সাহস করি, মহাকবির জন্ম-তারিখটা পড়িবে সেই স্মরণীয় শতাব্দীতে—যে শতাব্দীতে নির্ব্বাণ-বাদ গঙ্গা ও গোদাবরী-তীরে নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হইতেছিল—আবার দেশে "অশ্বমেধ" যজ্ঞের আয়োজন হইতেছিল। সে যাহাই হউক এ কথার উত্তর প্রত্নতাত্ত্বিক দিবেন—ঐতিহাসিক দিবেন। আমার কর্ত্তব্য কাব্যের মধ্যে জীবনের জয়ধ্বনি আবিষ্কার করা—বিশেষ কালের বিশেষ তথ্যকে উদঘাটন করিবার চেষ্টা করা।

তাই বলি—অবন্তী কিংবা উজ্জয়িনী কিংবা তক্ষশীলার সঙ্ঘারামে ধরুন মণিদত্ত শ্রেষ্ঠীর যে কন্যাটী (মানস-সরোবরের স্বর্ণ-সরোজ যে কন্যার রূপদ্যুতিতে হতমান হইয়া যায়) ভিক্ষুণী-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি যখন আষাঢ়-সন্ধ্যায়—

"বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা
বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে।"

নিম্নকণ্ঠে আবৃত্তি করিতেন—তখন যে তিনি অকারণেই "অন্যথা বৃত্তিচেতা" হইয়া পড়িতেন—তাহাতে আর কোনো

সন্দেহ নাই! যৌবনে "বার্দ্ধক-শোভি"—বল্কল-পরিহিতা সেই কন্যাও চকিত-দৃষ্টিতে হয় তো ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেন, তাহার জন্যও কি কোনো ছদ্মবেশী আসিবে না; মহাকালের মহাডাক কি তাহার দুয়ারেও পৌছিবে না! জীবনের ক্রমদীর্ঘ পথে পৌনঃপুনিক নৃত্য করাই যে দেবদেবের একান্ত স্বভাব! তিনিও কি কোনো বিস্মরণের মুহূর্ত্তে, অসতর্ক 'মুহূর্ত্তে' "স্তনভিন্নবল্কলা" হইবার গৌরব লাভ করিবেন না...শরৎকালের সহিত বসন্তকালের যে পার্থক্য, ৩য় সর্গের মহাদেবের সহিত ৫ম সর্গের মহাদেবের সেই পার্থক্য লক্ষ্য করি—বৌদ্ধ দেবতার সহিত হিন্দু-দেবতারও সেই প্রভেদ—ইহাই ঐ স্থলে মনে রাখিব; তবে, মহাদেব যে হিন্দু-দেবতা ইহার মধ্যেও কোনো সংশয়ই নাই; কারণ তপস্বিনীর সঙ্গে যিনি প্রেমে পড়েন—তপস্বিনীকে যিনি গৃহিণী করেন—তিনি যে বৌদ্ধ দেবতা হইতে পারেন না —ইহা বলাই বাহুল্য। ভগীরথ শিবজটাজুটের গ্রন্থিবন্ধন হইতে জাহ্নবীর মুক্তি-ধারাকে মুক্ত করিয়াছিলেন,--মহাকবিও জীবনধারাকে বিরুদ্ধ মতবাদের জটিল গ্রন্থি হইতে মুক্ত করিলেন—সেই ধারা এখনও বহিয়া চলিয়াছে—শতধারং উৎসমিব অক্ষীয়মাণম্—থামিয়া পড়িবার "মহতো" ভয় হইতে মহাকবি চিরকালের জন্য আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। বস্তুতঃ কুমারসম্ভবের মত একখানি জীবন-কাব্য পৃথিবীতে নাই।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে—ঘাত এবং প্রতিঘাত সমতুল্য কিন্তু বিপরীত। ভারতবর্ষের শিশুপাঠ্য ইতিহাসে পড়া যায়—সুবেশ, সুকুমার, সুখোচিত যুবক সিদ্ধার্থ কেমন করিয়া রুগ্ন-বৃদ্ধ-মৃতকে দেখিয়া জীবনে হতাশ্বাস হইয়াছিলেন এবং গভীর বিষাদে মগ্ন হইয়া সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন। ছদ্মবেশী শিবকে গৌরীর সখী যখন জানাইলেন—গৌরী "পিনাকপাণিং পতিমাপ্তুমিচ্ছতি"—তখন ছদ্মবেশী ছদ্মগাম্ভীর্য্যের সুরে বলিলেন,—বৃদ্ধ-রুগ্ন-শ্মশানচারী শিবকে পতিত্বে বরণ করিয়া আপনার সখী—যাঁহার রূপ-লাবণ্য জ্যোৎস্নার মত নেত্রোৎসবকারী, বন্ধুজনের শোচনীয় হইলেন। যেমন আঘাত—তেমনি প্রতিঘাত—জীবন পথে রুগ্ন-বৃদ্ধ-মৃতকে দেখিয়া বুদ্ধদেব জীবনের অসারত্ব বুঝিয়াছিলেন এবং অপরকে বুঝাইয়াছিলেন—সেই রুগ্ন-বৃদ্ধ শ্মশানচারীকে মহাকবি গৌরীর পতিত্বে অনায়াসে বরণ করাইলেন। বৌদ্ধের একদেশ-দর্শিতা হিন্দুর সমদর্শিতার দ্বারা সংশোধিত হইল; কারণ, ছদ্মবেশীর ছদ্ম বাগ্মিতায় উত্যক্ত হইয়া যখন গৌরী ক্ষোভের কণ্ঠে বলিলেন,—'মমাত্র ভাবি করসং মনঃ স্থিতম্' (শিব রুগ্নই হউন—বৃদ্ধই হউন—শ্মশানচারীই হউন—তাঁহার উপরেই আমার ভাবিকরসং মনঃ স্থিতম্) তখন ছদ্মবেশ (অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের) আর কিছু বলিবার রহিল না; কারণ, ভাল বুঝাইলেও যে মন্দ বুঝিবে—তাহাকে বুঝাইয়া লাভ কি! বৌদ্ধ-হিন্দুর দ্বন্দ্বে হিন্দুর জয়লাভ হইল—গৌরী শিব-গৃহিণী হইলেন। এইরূপে বিশেষ কালের গৌরীকে আমরা বুঝিতে পারি। বিরুদ্ধ মতবাদের নিকট পাথরের উপর স্ফুট স্বর্ণ-রেখার মত যে কাঞ্চনবর্ণা তন্বঙ্গীকে মহাকবি কল্পনাবলে সৃজন করিয়াছেন—তিনি চিরকালের সৃষ্টি হইয়াও বিশেষ কালের মাধুরীতে অপরূপ শোভা লাভ করিয়াছেন। আজ বহুকাল পরে—এই জয়শীলা নারীর কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলেই আমরা আত্মার আপ্যায়ন লাভ করি। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করি কি মহৎ সামর্থ্য থাকিলে—এমন মহৎদৃষ্টি সাধ্যায়ত্ত হয়।

পৃথিবীর যাহা কিছু মহাসৃষ্টি,তাহাই বিশেষ কালকে এবং অবস্থাকে অতিক্রম করে। কুমার-কাব্যের গৌরীর চরিত্রও তাহা করিয়াছে। এক কথায় গৌরীর চরিত্রে বিশ্বনারীত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন সেই চিরকালের গৌরীকে বুঝিবার চেষ্টা করি। কাব্যের নায়িকা এবং সংসারের নারী হয় লতিকার মত নির্ভরশীলা—না—হয় নদীর মত দৃঢ়ব্রতা। কুমার-কাব্যে নায়িকা লতিকা-প্রকৃতি নহেন—নদী-প্রকৃতি। প্রচণ্ডকোপা শিবের ললাট নির্গত স্ফুরন্ উদচিঃ যখন মদনকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করিল—তখন গৌরী আত্মনঃ ললিতং বপুঃ ব্যর্থ্যং সমর্থ্য—পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, রূপকে তিনি সফল করিবেন—চারুতাকে সৌভগ্যফলা করিবেন। এই প্রতিজ্ঞাতেই তাহার নদীপ্রকৃতি সূচিত হইয়াছে। সংসার-দ্রুম ভগ্ন হইলে যে বল্লরী "পতনায় কল্পতে"—গৌরী সে বল্লরী নহেন; পরন্তু সহস্র যোজন দূরের সমুদ্রে মিশিবার উৎসাহ এবং একাগ্রতা কুমার-কাব্যের গৌরীর আছে। প্রার্থিত জন বড়ই দুর্লভ

মহার্ঘ্য রত্নের মত দুষ্প্রাপ্য—কিন্তু তাই বলিয়া কি পাইতে হইবে না—কারণ প্রার্থিত জন যে "বড়"—প্রার্থিত জন যে ইষ্ট। প্রার্থিত জনকে না পাইলে যে জীবনই বৃথা। তাই দেখি কুসুক-কোমলাঙ্গী গৌরী ক্ষীণ কটিতে মৌঞ্জী-মেখলা দৃঢ়-পিনদ্ধ করিয়া সুদুঃসহ কৃচ্ছ্র-সাধনা এবং সুদুষ্কর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই যে তপস্যা—ইহা হইল রূপের তপস্যা—জীবনের তপস্যা—মাতৃত্বের তপস্যা—ঘর বাঁধিবার তপস্যা—নির্ব্বাণ-লাভের তপস্যা, বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর তপস্যা নহে। ইহাতে ত্যাগ নাই—ছাড়িয়া দিবার কোনো কথা নাই—দান আছে—আত্মদান, আত্মোৎসর্গ আছে—কারণ বিবাহই যজ্ঞ—সৃষ্টিযজ্ঞ। মুক্তি—জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন ইত্যাদি কষ্ট-কল্পনা কুমার-কাব্যের হরগৌরী-মিলনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কেহ যেন না করেন।" কুমার-সম্ভব-কাব্য আধ্যাত্মিক সন্দর্ভ নহে। "ওথেলো"কে পাইবার জন্য যে একদিন দেস্‌দেমনা অভিসার করিয়াছিলেন—তাহার মূলেও নারীপ্রকৃতির এই চিরন্তন সত্য রহিয়াছে। গৌরী এবং দেসদেমনা-গৃহিণী—ঘর বাঁধিবার তপস্যাই ইঁহাদিগের শ্রেষ্ঠ উপাসনা। কিন্তু ইঁহাদের প্রার্থিত সর্ব্বদাই দুরায়ত্ত; কিন্তু না পাইয়াও ইঁহারা ছাড়েন না। নদী যেমন সাগরে মিশিবেই—ইঁহারা তেমনি বহু বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রার্থিত জনের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবেনই। তবে—সেক্‌সপীয়রের "ওথেলো" বিয়োগান্ত বলিয়া খণ্ডিত-কাব্য, সব কথা বলিবার সুযোগ কবির ঘটে নাই; মহাকবির কুমারকাব্য পূর্ণাঙ্গের কাব্য—পূর্ণকাব্য—আরম্ভ ও শেষের কাব্য।

গৌরী এইরূপ নদীপ্রকৃতি না হইলে—৩য় সর্গের শিবের রূঢ় আচরণের পরে আমাদের আশা করিবার কিছু থাকিত না; কিন্তু শিবের অবমাননায় গৌরী আপনাকে পরাজিত মনে করেন নাই, পরন্তু উৎকট তপস্যা করিয়া শিবকে পতিরূপে লাভ করিয়াছেন—মদনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন—এবং বলিব কি—তরুণীলা ও বিক্রমশীলার সঙ্ঘারামের সহস্র ভিক্ষুণীর ব্রতকে—তপস্যাকে নিরর্থক এবং অর্থহীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুচিত্রিত "চালি"র আবেশ না হইলে দুর্গামায়ের, দুর্গা-প্রতিমার রূপ খোলে না—বিশেষকালের অবগুণ্ঠনের তলে না দেখিলে গৌরীর রূপও খুলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—উমাচরিত্রের (নারীচরিত্রের) শাশ্বত সত্যের কথা—কেমন করিয়া সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নারী বহুলায়াসে প্রার্থিতকে লাভ করে। মহাদেবকে পাওয়া—ইহা চিরকালের কথা; বৌদ্ধ-বাধাকে দূর করা ইহা বিশেষকালের কথা—উমা-চরিত্রের অবস্থায়ও এই অবস্থাতীত সৌন্দর্য্য—উমাচরিত্র বুঝিতে গিয়া মনে রাখিব।

উমার তপস্যা—বিবাহের তপস্যা। সুতরাং বিবাহের কথা মনে না রাখিলে—বলিবার কথায় অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়। বিবাহের কথা বলিতে গিয়া মহাকবিরও অফুরন্ত উৎসাহ লক্ষ্য করি। রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-বর্ণনা তাঁহার লেখনীমুখে সর্গব্যাপী বিস্তারলাভ করিয়াছে। মহাকবি অনেক কিছু দর্শনীয় সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন—শৈল, ঋতু, সাগর—আরও কত কি; কিন্তু বিবাহের মঙ্গল-যাত্রা যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৃশ্য—"দর্শনীয়া নামস্তঃ"। কুমার-কাব্যে এবং রঘুবংশে বিবাহযাত্রাদর্শনোৎসুকা পুরসুন্দরীদিগের লোলতা তাই কি মহাকবি অভিন্ন শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন? বিবাহমঙ্গলের প্রতি মহাকবিরই যে অত্যানুরাগ ছিল—তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই। সে যাহাই হউক—হরগৌরীর মিলনের কথা বলিয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী শেষ করিয়াছি। সমবয়স্কা সখীদিগের সহিত গৌরী বাসর-ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন—লজ্জাশীলার লজ্জা ভাঙ্গাইবার জন্য, শিব নানাবিধ শৃঙ্গার-চেষ্টার আবৃত্তি করিলেন—অকৃতকার্য্য হইয়া বিকট মুখভঙ্গী আরম্ভ করিলেন—সকলেই হাসিয়া উঠিল—গৌরীকেও হাসিতে হইল—তবে গূঢ়ভাবে—গূঢ়ং হাসয়ামাস...এই হাসির উপরই গৌরীর তপস্যার যবনিকা পড়ুক। বহুকাল অতীত হইয়াছে—উৎকর্ণ হইলে শুনিব সেই হাসি ফল্গু-স্রোতের মত এখনও ঘরে ঘরে প্রবাহিত হইতেছে। কেন যে প্রবাহিত হয় কুমার-কাব্যে তাহাই আধ্যাত্মিক অর্থাৎ কাব্যিক তত্ত্ব।

পঙ্ক-পুষ্প

(উপন্যাস)

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শব্দহীন মধ্যাহ্ন। প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড প্রখর কিরণধারা ধরণীর উপর অবিশ্রান্ত বর্ষণ করিয়া গগন-বক্ষে অগ্রসর হইতেছিলেন। রবিকর-ঝলসিত তরুপত্ররাজি অবশ-ম্রিয়মাণ দেহে প্রবল উৎপীড়নকাতর দুর্ব্বলের মতই অসহায়ভাবে আতপ্ত-সমীরপ্রবাহে ধীরে সঞ্চালিত হইতেছিল। সুনীল নভঃবক্ষে দুই একখানি লঘু কৃষ্ণ মেঘ খণ্ড বিহঙ্গ-পক্ষের মত চঞ্চলভাবে ইতস্ততঃ চলিয়া বেড়াইতেছে। সৌধ-কীরিটমালিনী বিশাল নগরীর জন-কলরোল তখন অনেকটা স্তব্ধপ্রায়। দাবদগ্ধ জনপদ যেন অবশ ক্লিষ্ট দেহে মূর্চ্ছিতের মত এলাইয়া পড়িয়াছে। প্রতপ্ত পবন রুদ্ধদ্বার-বাতায়নে আঘাত করিয়া সবেগে বহিয়া চলিতেছিল। তাহারই শন্ শন্ শব্দ একটা অস্ফুট হাহাকারের মতই অবিশ্রাম শ্রবণ-পটে আঘাত করিয়া একটা অস্বস্তির ভাব অন্তরে জাগাইয়া তুলিতেছিল।

রৌদ্রতপ্ত রাজপথ বহিয়া একজন সুবেশ যুবক দ্রুত চলিয়াছিল। স্বেদধারাসিক্ত পরিচ্ছদ তাহার গাত্রের সহিত সংলগ্ন হইয়া ভিতরের প্রস্ফুট গৌরবর্ণাভা বাহিরে দেখা যাইতেছিল। একটা ক্লান্ত অস্বাচ্ছন্দের ভাব তাহার আননে বিরাজিত। যুবক মধ্যে মধ্যে ললাটস্থ স্বেদ-বারি রুমালে মুছিয়া লইতেছিল। কিছুদূর আসিয়া সহসা সে দাঁড়াইয়া বিস্মিত কৌতূহল দৃষ্টিতে পথপ্রান্তস্থিত আবর্জ্জনা-স্তূপের দিকে চাহিয়া রহিল। রাশিকৃত ধূলি ও জঞ্জালের উপর বস্ত্রাবৃত কি একটা জিনিস যেন ধীরে ধীরে নড়িতেছিল দেখিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বহুক্ষণ সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া যুবক তাহার সন্নিকটে আসিল। আর একবার সেদিকে চাহিয়াই বস্ত্রাবৃত দ্রব্যটী সে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদক্ষেপে পথ অতিক্রম করিয়া চলিল। অদূরস্থ ঘন নীপ-শাখা ভেদ করিয়া একটা কঠোর বায়স-কণ্ঠ তখন চতুর্দিক মুখরিত করিয়া ধ্বনিত হইতেছিল। কিছুদূর আসিয়াই একটা পুরাতন ধরণের জীর্ণ অথচ বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে যুবক দাঁড়াইল। বাটীর প্রবেশ-দ্বার ভিতর হইতে আবদ্ধ। হস্তস্থিত দ্রব্যটীকে এক হস্তে বক্ষের উপর ধরিয়া সে সজোরে দ্বারের কড়া ধরিয়া শব্দ করিল। ভিতর হইতে রমণীকণ্ঠে উত্তর আসিল, 'কে সুকান্ত এলি না কি?'

যুবক উত্তর দিল, 'হাঁ, দোরটা খোল না।'

দ্বার উন্মোচন করিয়া প্রৌঢ়া রমণী বলিলেন 'যে রদ্দুর কষ্ট হয়েছে খুব তোর?'

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বক্ষস্থিত দ্রব্যটী তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া যুবক বলিল, 'দেখ তো মা এটা কি জিনিস?'

জননী আতঙ্কে কয় হাত দূরে সরিয়া গিয়া বলিলেন, 'একি রে এ যে একটা মেয়ে দেখ্‌ছি! অতটুকু মেয়ে কোথা হ'তে নিয়ে এলি তুই?'

'রাস্তা থেকে মা। পথে জঞ্জালের উপর পড়ে ছিল।'

'আর তা'কে তুই নিয়ে এলি? ওরে তোদের জ্বালায় কি আমি মাথা খুঁড়ে মরব রে! কোন হতভাগীর পাপের চারা পথে ফেলে গেছে তুই তাকে স্বচ্ছন্দে কুড়িয়ে নিয়ে এলি, একটু আক্কেল-বিবেচনাও কি তোর নেই রে একেবারে ম্লেচ্ছ হ'য়েছিস। শীগ্‌গীর ওটাকে ফেলে গঙ্গা নেয়ে আয়। যা, যা আর দেরী করিস নি।'

মাতার তিরস্কারে সুকান্তর রৌদ্র-তপ্ত ক্লিষ্ট মুখ-কান্তি আরও বিমলিন হইয়া পড়িয়াছিল। ব্যথিত কণ্ঠে সে বলিল, 'ওকে পথ থেকে তুলে না আনলে তখুনি মরে যেত মা।'

'যেত-যেত? তোর কি? ওসব ছেলে-মেয়ে মরবে না তো কি হ'বে। মরবার জন্যই ওর আপনার যারা তারা পথে রেখে গেছে। তাদের তা'তে কষ্ট হ'ল না, যত দরদ উথলে উঠল তোর। তুই কি বল দেখি!'

'আমি মানুষ মা। তাই একে ও অবস্থায় দেখে থাকতে না পেরে তুলে এনেছি।'

'তবে আর কি আমি কেতাথ হ'য়ে গেলুম ; তুই কি আর মানুষ আছিস, তুই ভূত হয়েছিস। বৌয়ের পরামর্শ শুনে শুনে তোতে আর তুই নেই !'

একটু বিরক্তভাবেই সুকান্ত বলিল,'অনর্থক সে বেচারীকে দোষ দিচ্ছ কেন মা সে তো আর আমায় বলে নি ওকে নিয়ে আসতে।'

'বৌকে বলেছি অমনি গায়ে বেজেছে, না? আচ্ছা সে বলুক আর না বলুক তুই ওটাকে কেন আন্‌লি। যা এখন এই দুপুর রোদে আয় গঙ্গা নেয়ে, তবে ঘরে ঢুকতে পাবি। যা বলছি শীগগার।'

বস্ত্রের উপরিস্থিত শিশুটী ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া সুকান্ত বলিল, 'এখনি এটা মরে যাবে মা। বৌদের কা'কেও বল একে দেখ্‌তে। দেখ না কি করে কাঁদছে।'

'ওরে লক্ষ্মীছাড়া আমি যে বলছি ওটা ফেলে দিয়ে আয়, সে বুঝি তোর কাণে যাচ্ছে না। আমি তো আর তোর মত ম্লেচ্ছ হই নি যে বৌদের বলব ওকে দেখ্‌বার জন্য।'

সুকান্ত আর কিছু না বলিয়া নিজেই ভূমিতলে বসিয়া অনভ্যস্ত হস্তে শিশুটাকে তুলিতে চেষ্টা করিল।

জননী তখন দুর্ব্বার হইয়া উঠিলেন। রুদ্রকণ্ঠে বলিলেন, 'ওরে হতচ্ছাড়া, ওটার গায়ে হাত দিতেও কি তোর একটু সংকোচ বোধ হচ্ছে না। তুই একেবারে অধঃপাতে গেছিস। ওঠ বলছি যা ওটাকে পথে ফেলে আয়। কথা শোন সুকান্ত নইলে আমি মাথা কুটে মরব বলছি।'

স্থির অচপল স্বরে সুকান্ত বলিল, 'একে যখন এনেছি মা তখন এর একটা ব্যবস্থা না ক'রে আমি ফেলব না, সে তুমি যাই বল না কেন? ওর যেখানেই জন্ম হ'ক ও তো ঈশ্বরের সৃষ্ট একটা জীব। ইচ্ছা করে মরণের হাতে ওকে কখনও আমি তুলে দেব না।'

বিদ্রূপের স্বরে জননী বলিলেন, 'মস্ত পণ্ডিত হ'য়েছিস কি না তাই আমায় বোঝাতে এসেছিস। যারা ওকে পৃথিবীতে এনেছে তারাই যদি ওকে পথে ফেলে দেয় তখন তুই কেন ঘরে আনবি।'

সুকান্ত একটু হাসিয়া বলিল, 'এ তো তোমার বেশ যুক্তি মা। একজন অন্যায় করেছে বলে আমিও তাই করব। তারা ওকে মরণের মুখে স'পে দিয়েছে সত্যি, কিন্তু আমি মানুষ হ'য়ে তাই দেখব অথচ তার কোন প্রতীকার করব না।'

'কি তুই করতে চাস্ তাই শুনি আমি? ওকে ঘরে রেখে পালন করবি না কি?'

একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস মধ্যাহ্নের তপ্ত সমীরপ্রবাহে মিশাইয়া সুকান্ত বলিল, 'না মা সে কথা আমি বলতে চাই না। গরীব কেরাণী আমি,এই পথে পরিত্যক্ত শিশুকে পালন করে সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি আমার নেই এটা ঠিক।'

একটু সন্তুষ্ট হইয়া জননী বলিলেন, 'তবে কি করবি ওকে নিয়ে?'

উপস্থিত একে বাঁচাতে চেষ্টা করব, তারপর যা হয় একটা সুব্যবস্থা করতে হ'বে।'

'ততদিন ও তো এই বাড়ী থাকবে? না বাছা ওসব ম্লেচ্ছ-কাণ্ড এখানে চলবে না। আমরা হিন্দু, হিন্দুর মতই আমাদের থাকতে হ'বে তো! তুমি বরং ওকে তোমার শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাও তারা রাখবে এখন।'

ক্ষুণ্ণভাবে মাতার দিকে চাহিয়া সুকান্ত বলিল, 'তুমি মা হ'য়ে যখন আমার এইটুকু কাজকে সমর্থন করছ না, তখন তারা পর হ'য়ে কেন করবে মা? কিন্তু থাক অনেক কথা কাটাকাটি হ'য়ে গেছে। এতটা পথ এই রৌদ্রে এসে আমিও বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। মেয়েটা হয় তো মরেই গেল ; কি রকম নির্জ্জীব হ'য়ে রয়েছে দেখছ মা?'

বিকৃত মুখে জননী বলিলেন, 'ওসব ছেলে-মেয়ে মরবার নয় বাছা, তা হ'লে জলে এতক্ষণ পড়ে থেকে বাচত না। ও বেশ ঘুমাচ্ছে দেখছি।'

অতি সন্তর্পণে তাহাকে বক্ষের উপর তুলিয়া লইয়া সুকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইল।

'হ্যা যা ফেলে দিয়ে গঙ্গা নেয়ে বাড়ী আয়—

উন্মুক্ত দ্বারটা বন্ধ করিয়া ভিতরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে সুকান্ত বলিল, 'বলেছি তো মা একে ফেলতে আমি পারব না।' জননীর পাশ দিয়া ধীর পাদক্ষেপে সুকান্ত ভিতরের দিকে অগ্রসর হইল।

এতক্ষণের কোলাহলে বাটীর পরিজনবর্গ প্রায় সকলেই

সেখানে সমবেত হইয়াছিল। একযোগে তারস্বরে সকলে এইবার চীৎকার করিয়া উঠিল, 'সর্ব্বনাশ করলে জাত-ধর্ম্ম কিছু রইল না আর। ঐ ছেলেটা নিয়ে ঘরে যাচ্ছে এ কি হিন্দুর বাড়ী না আর কিছু—'

সুকান্ত একবার ফিরিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিল, —'দুপুর রৌদ্রে চেঁচিয়ে কেন নিজেরা কষ্ট ভোগ করছ, যে যার কাজে যাও। তোমাদের জাত-ধর্ম্ম থাক আর যাক, যাই হোক,একে আমি মরণের মুখে ফেলে কিছুতেই দেব না, তা তোমরা যাই বল না কেন।'

সকলে নির্ব্বাক হইয়া এই স্বেচ্ছাচারী অনাচারদুষ্ট যুবকের দিকে চাহিয়া তাহার যে কি শাস্তিবিধান করা যায় তাহাই বোধ হয় ভাবিতেছিল। অদূরে খড়মের শব্দ উত্থিত হইল। সুকান্ত গতিবেগ রুদ্ধ করিয়া আর একটা কিছুর প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

ক্ষণমধ্যেই সুকান্তর পিতৃদেব রঙ্গভূমিতে দর্শন দিলেন। পুত্রের এই নিদারুণ অনাচারের সংবাদ বোধ হয় এতক্ষণে তাহার শ্রুতিগোচর হইয়া ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। এইবার সুকান্ত তাহার ধৃষ্টতার প্রতিফল পাইবে নিশ্চয়। সত্যই তো এ কি অনাচার। একটা পথের আবর্জ্জনা—কোন-পাতকী যাহাকে জগতে আনিয়া কলঙ্কের ভয়ে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, সেই ঘৃণ্য জীব, যাহাকে দর্শন করিলেও মহাপাপের সঞ্চার হয়, তাহাকেই কি না পবিত্র পুণ্যের সংসারে লইয়া আসা, দিনে দিনে এ সব হইল কি?'

সুকান্তর জনক অধিক বাক্য ব্যয় করা কোনদিনই পছন্দ করেন না, তাই পুত্রের মুখের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'তুমি বেশ লেখাপড়া শিখেছ কি না, কাজেই এসব ব্যবহার আমি তোমার কাছেই প্রত্যাশা করি। আমার অন্য কোন ছেলে ঐ জিনিসটা ঘরে আনা দূরে থাক্ দেখ্‌লেও একশত হাত দূরে সরে যেত কিন্তু তুমি বিদ্বান ছেলে কি না আমার, তাই ওটাকে নিয়ে আস্‌তেও একটু দ্বিধা বোধ কর নি। তা যা করেছ বেশ করেছ, এখন ওটাকে ফেলে আসবে কি না আমি শুন্‌তে চাই।'

নতমুখে স্থিরকণ্ঠেই সুকান্ত উত্তর দিল, 'এর যা অবস্থা তা'তে একটু চেষ্টা না করলে একে বাচানই দুষ্কর। এখন যদি পথে ফেলে আসি তা হ'লে এক্ষুণি মরে যাবে।'

'যায় যাবে সেজন্য আমরা তো দায়ী নই।'

'কতকটা দায়ী বৈ কি। একে যখন আমি চোখে দেখেছি, তখন যাতে এ বাঁচতে পারে সেই চেষ্টা করাই কি আমার কর্ত্তব্য নয়? একে আমি ফেলতে পারব না।'

পুত্রের দুঃসাহসে পিতা একেবারে প্রজ্জ্বলিত বহ্নিশিখার মতই জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'হতভাগা বাঁদর একটু লেখা-পড়া শিখেছিস বলে একেবারে লঘু গুরু মানিস না। আমাকে কর্ত্তব্য শেখাতে এসেছিস! ওকে না ফেললে তোকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করব জানিস! এখন বল ওকে ফেলবি কি না। এক কথা বল?'

সকলেই রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে সুকান্তর উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছিল, এই দুঃসাহসিক অপরিণামদর্শী ছেলেটা কি কাণ্ডই না বাধাইয়া বসে। একটা পথের আপদ কুড়াইয়া আনিয়া এ কি বিভ্রাট্। এখনকার ছেলেগুলার ঘটে কি বিন্দুমাত্র বুদ্ধি নাই, ওর আপনার যাহারা তাহারাই যখন নিঃসংকোচে উহাকে মরিবার জন্য পথে আবর্জ্জনার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছে, তখন তোর সেজন্য এ শিরঃপীড়া কেন?

শিশুটী কাঁদিয়া উঠিল, তাহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিবামাত্র উপস্থিত সকলে দারুণ ঘৃণায় নাশাগ্রভাগ কুঞ্চিত করিল। কি নিঘৃণ্য এই সুকান্ত ছেলেটা। ঐ অপবিত্র প্রাণীটাকে কেমন অসংকোচে বুকের উপর ধরিয়া রাখিয়াছে দেখ দেখি। একটু দ্বিধা পর্য্যন্ত নাই। না পৃথিবী রসাতলে যাইবার আর অধিক বিলম্ব নাই দেখা যাইতেছে।

ধীরে ধীরে সদ্যজাতা কন্যাটীর পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া সুকান্ত জননীর দিকে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা মা, তোমার বৌদের মধ্যে একজন না হয় আর একবার স্নানই করত, এই গরমের মধ্যে সেটা তো কিছু কষ্টকর নয়, কিন্তু এই অসহায় জীবটা একটু পরিচর্য্যার অভাবে যে মরতে বসেছে, কেউ কি তার প্রতীকার করবে না। একটু দয়াও কি তোমাদের হচ্ছে না এর উপর।'

মাতা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই পিতা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন,

'ওরে হতভাগা দয়া কর্ত্তে খালি তুমিই জান। আমাদের মায়াদয়া কিছু নেই? ওরে বাঁদর দয়ারও পাত্রাপাত্র আছে। স্বয়ং ভগবান যা'র উপর নির্দ্দয় তা'কে মানুষে দয়া ক'রে কি করবে। ওর অদৃষ্ট যদি ভালই হ'বে তবে ও অমন স্থানে আসবে কেন! এখন ও সব জ্যাঠামি বন্ধ রেখে ওকে ফেলে দিয়ে আয়।'

'না বাবা, ওর একটা কিছু ব্যবস্থা না করে আমি ফেলতে পারব না আমায় ততটুকু সময় দিন। ওকে তো আমি ঘরে রাখতে চাইছি না।'

'কিন্তু কি ব্যবস্থা তুই করবি তাই শুনি?'

'দেখি যদি আর কেউ ওকে নিতে চায়।'

'কে নেবে? তোর মত এমন বাঁদর আর কে আছে?'

সুকান্ত কোন উত্তর না দিয়া ধীরপদে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেই পিতা বলিলেন, 'যাচ্ছিস কোথা?'

'আমার ঘরে।'

'ঐটেকে নিয়ে। ওরে লেখা-পড়া শিখে কি এমন বাঁদরও তৈরী হয়। ওটাকে তুই কোন আক্কেলে ঘরে নিয়ে যাচ্ছিস বল দেখি। এটা হিন্দুর বাড়ী তো?'

হতাশভাবে সুকান্ত বলিল, 'তা হ'লে একে কোথায় রাখব?'

'কোথায় রাখবি তা আমি কি জানি। ওটাকে নিয়ে ঘরে তুই যেতে পারবি নি, এ আমি বলে দিলুম।'

মর্ম্মাহত সুকান্ত ভূমির উপর বসিয়া পড়িল। শিশুটী তখন ক্ষীণ ভাঙ্গা গলায় কাঁদিতেছিল। এক অবগুণ্ঠনবতী তরুণী অন্তঃপুরের দিক হইতে বাহির হইয়া আসিল; সুকান্ত একবার তাহার দিকে চাহিল। তরুণী ধীরপদে অগ্রসর হইয়া শিশুটাকে তাহার অঙ্ক হইতে তুলিয়া লইল।

আবার সকলে একযোগে কোলাহল করিয়া উঠিল, 'এ্যাঁ এ কি কাণ্ড বৌমা তুমি কোন আক্কেলে ওটাকে ছুঁলে? এ্যাঁ এসব কি ম্লেচ্ছপণা কাণ্ড। তাই তো বলি সুকান্তর এমন মতি-গতি হ'ল কি করে? হাজার হো'ক সে তো এই বাড়ীর ছেলে। এসব শুধু ওই ম্লেচ্ছ বৌয়ের পরামর্শ। এমন তো কখনও দেখি নি, শুনিও নি। ঘরের বৌ তুমি ঐটেকে কোলে নিয়ে বসলে একটু সংকোচও হ'ল না! রাম রাম মহাভারত!'

সুকান্ত হর্ষ-বিজড়িত দৃষ্টিতে একবার পত্নীর দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বধূর এই স্বেচ্ছাচার ও অসমসাহস দেখিয়া তাহার শ্বশুর-শ্বশ্রূ স্তম্ভিত, বাক্য-রহিত হইয়া গিয়াছিলেন। কি এ কাণ্ড, বধূর এতবড় দুঃসাহস, একটু ভয় পর্য্যন্ত নাই! এও কি সহ্য করা যায়। উভয়ে একযোগে তাহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ হইতে নিম্নতন সপ্তপুরুষের গুণাবলী কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অবগুণ্ঠিতা বধূটী কোনও রূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া স্থিরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং শিশুটাকে বক্ষে লইয়া ধীরপদে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল।

সুকান্ত জননীর দিকে চাহিয়া বলিল, 'ভয় পেও না মা, ওকে আমি বাড়ী রাখব না, যেটুকু সময় ওর একটা সুব্যবস্থা করতে না পারি ততটুকু তোমরা বেচারাকে থাকতে দাও। এতে তোমাদের জাত-ধর্ম্মে কোনও আঘাত লাগবে না মা! খানিকটা সময় তোমরা আমায় দাও।'

আর কিছু শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই ত্রস্তপদে সুকান্ত পত্নীর অনুগমন করিল। পশ্চাতে বাড়ীর আর আর সকলে নিস্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সকলে একবাক্যে স্থির করিলেন বধূর নির্দ্দেশমত চলিয়া সুকান্ত একেবারে উৎসন্ন গিয়াছে।

কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুকান্ত ডাকিল, 'শেফালী!'

গৃহতলে বসিয়া একখানা তোয়ালে ভিজাইয়া শেফালী তখন অজ্ঞ শিশুর গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিতেছিল। পার্শ্বেই একটা কাঁচের বাটীতে কিছু মধু রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অঙ্গুলীর অগ্রভাগে তাহা মাখাইয়া সে শিশুর ওষ্ঠাগ্রে দিয়া পুনরায় তাহাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিতে নিযুক্ত হইল।

গাত্রস্থিত জামাটা খুলিয়া আলনার উপর রাখিয়া দিয়া সুকান্ত ক্লান্তদেহে পত্নীর সন্নিকটে বসিয়া পড়িল; কিছু দূরে একখানা ব্যজনী পড়িয়াছিল। সেটা তুলিয়া লইয়া সঞ্চালন করিতে করিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া সুকান্ত বলিল, 'কি মনে হচ্ছে বাঁচবে?'

একটা ছোট জামা সন্তর্পণে শিশুটাকে পরাইয়া দিয়া

স্বামীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া শেফালী বলিল, 'তাইতো মনে হচ্ছে।'

'যাক, তারপর ওর কি ব্যবস্থা করি বল তো?'

কতকগুলা ছিন্ন বস্ত্র একত্রিত করিয়া একটা ক্ষুদ্র শয্যা প্রস্তুত করিতে করিতে শেফালী বলিল, 'সে কথা আমি কি ক'রে বলব। তুমি এনেছ তুমিই জান।'

'তাই তো ভাব্‌ছি। আচ্ছা শেফা তুমি ওকে রাখ না কেন?'

'আমি?' বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া শেফালী বলিল, 'পাগল হয়েছ তুমি, আমি একে রাখব। তোমাদের বাড়ীর ভাব-গতিক কি তুমি জান না! একে আমি এই ঘরে নিয়ে এসেছি, তাই দেখ আমার জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা হয়। কি করব, দেখলুম যখন তুমি এনেছই তখন সত্যি একটু পরিচর্য্যার অভাবে একটা ক্ষুদ্র জীব মারা যায়—তুলে আন্‌লুম। এখন কপালে কি আছে তা জানি না।

মলিন হাসির সহিত সুকান্ত বলিল, 'যাই থাক, সেটা তোমায় সহ্য করে নিতেই হ'বে। বকুনির মাত্রাটা হয় তো বেশী হ'বে, হোক ও তো গা-সওয়া হ'য়ে গেছে।'

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস বক্ষে চাপিয়া শেফালী বলিল, 'হাঁ একরকম তাই বৈ কি।'

সুকান্ত ভূমিতলেই শুইয়া পড়িল। শিশুটী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে ধীরে ধীরে শয্যার উপর স্থাপন করিয়া শেফালী বলিল, 'একে কোথায় পাঠাবে এখন ব্যবস্থা কর। সত্যই আমি তো আর রাত্রি-দিন একে নিয়ে বসে থাকতে পারব না।'

'তাই তো শেফা কোথায় কার কাছে ওকে দিই? কে নেবে?'

'অনাথ-আশ্রমে কি মিশনারীদের কাছে দিলে হয় না?'

'না, না, তাতে ওর জীবনটা একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে, অনাথদের মতই ওর সারা জীবনটা কাটবে।'

'জ্বালালে তুমি, তা ভিন্ন ওদের আর কি গতি হ'বে তাই শুনি? বাঁচল যে এই ওর পক্ষে যথেষ্ট।'

'তাই কি?' সুকান্তর মুখে চিন্তার ছায়া পড়িল।

'তা ভিন্ন আবার কি? ভদ্র-গৃহস্থের ঘরে ওর স্থান হ'বে কি কখনও! না, না, যা বলছি তোমায়, তাই কর। কোনও অনাথ-আশ্রমে কি মিশনারীদের কাছে ওকে পাঠিয়ে দাও, দেরী ক'র না। আমি আর কতক্ষণ ওকে নিয়ে থাকব।'

সুকান্ত উত্তর দিল না। নতনেত্রে সে কি ভাবিতে লাগিল।

শেফালী একটু জোরের সহিত বলিল, 'অত ভাববার কি আছে। অনাথ-আশ্রম তো এদেরই জন্যে হ'য়েছে। মিশনারীরাও ওদের স্থান দেবার ব্যবস্থা করবে।'

সহসা উঠিয়া বসিয়া সুকান্ত বলিল, 'একটা কাজ করতে পার শেফা?'

'কি আবার কাজ তোমার করতে হ'বে?'

'একবার নীরজার ওখানে গিয়ে তাকে নিয়ে আসতে পার?'

'নীরজা? তাকে তোমার কি দরকার?'

সুকান্ত হাসিয়া বলিল, 'দরকার একবার আছে, তুমি একটু যাও লক্ষ্মীটী।'

'দেখ পাগলের মত যা তা বকনা তুমি। এখন কি ক'রে আমি যাই? কে নিয়েই বা যাবে। আর স্নান না করলে তো এখন আমার ঘরের কোন দ্রব্যটী পর্য্যন্ত ছোঁবার উপায় নেই।'

'বেশ, তুমি স্নান ক'রে এস, ও তো ঘুমাচ্ছে।'

'কিন্তু শুধু শুধু নীরাকে এনে কি হ'বে, সে কি একে নিয়ে যাবে ভাবছ তুমি! পাগল আর কি!'

একটু গম্ভীরভাবেই সুকান্ত বলিল, 'তোমার বোনটীকে তোমার চেয়ে আমি বেশী চিনি শেফা, সে নিশ্চয় একে রাখবে।'

'চাইলেও সে তো স্বাধীন নয়। সেও গৃহস্থ-ঘরের বৌ'।

'যাই হোক তুমি একবার তাকে নিয়ে এস তো।'

'কিন্তু আমার যাবার কি দরকার, তুমিই যাও না।'

ব্যস্তভাবে সুকান্ত বলিল, 'না, না, তুমিই যাও শেফা, আমি গেলে সে না আসতে পারে।'

'বেশ, বলছ যখন আমি যাচ্ছি, কিন্তু সে যেএকে নেবে সে আশা তুমি মনে স্থান দিও না, তার চেয়ে আমি যা বলছি সেই ব্যবস্থাই কর। ও আশা ছেড়ে দাও।'

'তোমার কথামত কাজ তো করবই, তার আগে শেফালী আমি যা বলছি তুমি একবার কর—যাও নীরজাকে ডেকে আন।'

'আচ্ছা যাই। মাকে বলে দেখি তিনি কি বলেন।'

'মা কিছু বলবেন না, যদি শোনেন এতে ওটাকে বিদায় করবারই ব্যবস্থা হচ্ছে। তুমি আর দেরী ক'র না।"

শেফালী কক্ষের বাহির হইয়া গেল। সুকান্ত পুনরায় ভূমিতলে শুইয়া পড়িল। বাহিরে তখন একসুরে ঝঙ্কৃত অনেকগুলো কণ্ঠের গভীর নিনাদ সমস্ত বাড়ীখানা মুখর করিয়া তুলিয়াছিল; সম্ভবতঃ শেফালীর উপরই তাহা বর্ষিত হইতেছিল।

ক্রমশঃ

———:•:———

নব-বৃন্দাবন

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

তোরা আয় কে যাবি মর্ত্ত্যেরি এই মৃত্যুজয়ী নন্দপুরে,
ওরে নবীন যুগরঙ্গ সেথা উঠ্‌লো নব ছন্দসুরে।
আজি বিশ্বজোড়া নন্দলালার অমৃতেরি সিংহাসন,
সেযে অনন্ত এক জাতির দেহে গড়্‌লো নব-বৃন্দাবন।
তার অকূলরূপে বাধন-হারা ভাঙ্‌লো কোটি মনের কূল,
সারা মর্ত্ত্যজুড়ে ফুটলো তাঁহার রক্ত-চরণ-পদ্মফুল।
ওরে সেই চরণের পদ্মে আজি আয় রে মোরা রচ্‌বো ধাম,
ওই জগৎ-জুড়ে মৃত্যুজয়ী গর্জ্জে হরেকৃষ্ণ নাম।

যদি স্তনের বোঁটায় বিষ মেখে আজ পুৎনা আসে ছদ্মবেশে,
ওরে গরল হ'বে অমৃত তার এই শ্রীভগবানের দেশে।
ওরে কালকালীয়ের হিংসাবিষে মরবে না কেউ মরবে না,
আর যমরাজেরি ডঙ্কাতে ভয় করবে না কেউ করবে না।

ওরে জগন্নাথের বক্ষে আজি জীবন-দোলা দুলিয়ে দে,
এই জীর্ণ-হিয়ার ঝুলন্‌-ঝোলা চরণ-তলায় ঝুলিয়ে দে।
বিশ্বজুড়ে মানব-কণ্ঠে শোন্‌রে ভগবানের গান
ওরে মর্ত্ত্যলোকে কর্ব্বে সে আজ অমর নব-জন্মদান।
ওরে নৃত্যে তাহার চরণ-তলায় জীবন-সুধার উঠ্‌ছে ঢেউ,
মর্ত্ত্যেরি এই নূতন ব্রজে রইবে না আর আর্ত্ত কেউ।

ওরে সব নিখিলের রাখাল নিয়ে রচ্‌লো সে যে রাজ্য আজ,
তোরা আর্ত্তজনের পরিত্রাণের দেখ্‌বি রে আয় রাখাল-রাজ।
ওরে এই মথুরার রক্ত-ধূলি সুধায় হ'বে সিক্ত আজি,
ওই দুঃখজয়ী মৃত্যুজয়ী উঠ্‌ছে মাভৈঃ বংশী বাজি'।
ওরে ব্রজের ধূলি মাখ্‌রে গায়ে বিশ্বে যে তুই চিরন্তন,
আয় দেখ্‌বি নব-রাখালরাজে দেখ্‌বি নব-বৃন্দাবন।

———•:•:•———

ছড়া

শ্রীইন্দুবিকাশ বসু

মানুষের শিক্ষা অনেক রকমে হয়। পাঁচ রকম দেখিয়া শুনিয়া এবং বিদ্যালয়ে গমন করিয়া মানুষে শিক্ষা লাভ করে। এই শেষোক্ত উপায়ে শিক্ষালাভ করিতে সকলের সৌভাগ্য হয় না। পূর্ব্বকালে গুরুগৃহে এই প্রথায় শিক্ষা লাভ করিতে এক ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ ব্যতীত কাহারও সৌভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। তৎপরযুগেও মুসলমান-রাজত্বকালে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা, টোল প্রভৃতি গ্রামস্থ অর্থশালী ব্যক্তি-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াও দেশের সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা সুবিস্তার করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ এই প্রকার শিক্ষা দিতে গেলে বহু অর্থের ব্যয় হয়; এককালে দেশের যাবতীয় বালক-বালিকার শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই জন্য এখন এত অর্থব্যয় করিয়াও, রাশি রাশি পাঠশালা,টোল, মাদ্রাসা, মোক্তব, স্কুল, কলেজ স্থাপন করিয়াও বাঙ্গালাদেশের কেবল নাম সই-করিতে পারিবে এমন লোক লইয়া শিক্ষিতের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ১১ জন। জনসাধারণকে শিক্ষিত করিতে বিদ্যালয় মারফৎ পঠিত বিদ্যার প্রচারে কোন যুগে,কোন দেশে কোন লোক বা কোন জাতি পারিয়া উঠে নাই এবং কখনও পারিয়া উঠিবে কি না সন্দেহ।

মানুষ দেখিয়া বা শুনিয়া অনায়াসে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। এই পন্থায় অল্প আয়াসে, অল্পব্যয়ে শিক্ষাদান হইতে পারে বিবেচনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে-আমাদের দেশে তো বটেই, অন্যান্য দেশেও বিদ্যা দান করা হইত। বাঙ্গালাদেশ পূর্ব্বকালে অন্যদেশ অপেক্ষা এই বিষয়ে বহু অগ্রসর হইয়াছিল। ভারতে প্রথম পুস্তক শ্রুতি আদিকালে যেরূপভাবে চলিত, ঠিক সেইভাবেই বাঙ্গালার লোকসাহিত্য লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইত।

গণশিক্ষা সঙ্গীত, কাব্য, নাটক, কথকতা, তর্জ্জা, কবি, পাঁচালী, ছড়া ও রূপকথার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। উৎসবে বৎসরান্তে বারোয়ারীতলার গ্রামের দীন-দরিদ্র, ধনী, গৃহী প্রভৃতি সমাবিষ্ট হইয়া লোকসাহিত্যের অর্চ্চনা করিত। সঙ্গীত, কাব্য, নাটক, তর্জ্জা, কবি, পাঁচালী, কথকাদি আসরে আসরে গীত হইয়া ধনী, নির্ধন, ব্রাহ্মণ, মুচী, মেথর ও মুর্দ্দফরাস-সকলেরই সমান ভক্তি, আনন্দ, আবেগ, কৌতূহল প্রভৃতির উদ্রেক করিত। এই সব আসরে কাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে ভিখারী, বৈষ্ণব, বাউল প্রভৃতি 'ভজন', 'জাগ' 'ভাসান' প্রভৃতি নানারূপ গান গায়িয়া যাইত। নগরের তো কথাই ছিল না—সেখানে ধনীর অভাব ছিল না এবং তাঁহারাও এই উদ্দেশ্যে অর্থদানে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহাদের অর্থব্যয়ে যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, কবিওয়ালার কল্যাণে জ্ঞানপিপাসুর জ্ঞানপিপাসা বর্দ্ধিত হইত। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইহারাই ভিত্তিভূমি। এই সহজ সরল ভিত্তিভূমি বুঝিবা বর্দ্ধিষ্ণু বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীরের আবরণে দৃষ্টির অগোচরে চলিয়া যায়!

তখন স্মরণ করিয়া রাখাই ছিল শিক্ষার মূল; সুতরাং সকলের স্মরণশক্তিও ছিল প্রখর। এখন পুস্তকেই সকল জিনিস পাওয়া যায়; কাজেই কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিবার উপকারিতা কেহই বোঝেন না বা আবশ্যক মনে করেন না। ঐ কালে অনেকেই বিশেষতঃ অন্তঃপুরিকারা চাল, কড়ি, পয়সা দিয়া বাউল, ফকির, বৈষ্ণব-গায়কদের ডাকিয়া নানা-গান, কীর্ত্তন, কথা প্রভৃতি শুনিয়া শিক্ষা করিয়া লইতেন এইভাবে প্রতি গ্রামের অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা হইতে প্রাচীনেরা পর্য্যন্ত ঐ সব শুনিয়া শিক্ষা করিতে উৎসুক ছিলেন। বৎসরান্তে বা শারদীয়া পূজাতে বা কোন পূজা-পার্ব্বণ-উপলক্ষে অন্য গ্রামস্থ খ্যাতনামা গায়ক আনিয়া দেশস্থ 'মৌখিক সাহিত্য' সমৃদ্ধ করা হইত।

আর একটী জিনিস লোক-সাহিত্য, চরিত্র, সংসার ও সমাজ-গঠনে সাহায্য করিত—উহা রূপকথা ও ছড়া। এমন বালক-বালিকা ছিল না যে, সন্ধ্যার পরে গৃহের বর্ষীয়সী রমণীকে না ঘিরিয়া থাকিতে পারিত—তাহাদের পুরাকালের

'রূপকথা, ছড়া শোনা চাই। হয় তো এমন হইত একই 'গল্প', একই 'ছড়া,' একই 'কথা' উপর্য্যুপরি প্রতি রাত্রেই শুনিতেছে, তথাপি শুনিবার ক্লান্তি নাই, জিজ্ঞাসার শেষ নাই—এমনই উহা চিত্তমুগ্ধকর! সেই 'রূপকথা' এবং 'ছড়ার' মধ্য দিয়া প্রণয়, প্রীতি, স্নেহ, মায়া, মমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশির যে চিত্র বালক-বালিকাদের কোমল মনে অঙ্কিত হয় তাহা পরকালে জীবন-গঠনে, সদ্‌গুণরাশি ভূষণে যথেষ্টই সহায়তা করে।

আজ পর্য্যন্ত 'রূপকথা'র আলোচনা ৺লালবিহারী দে, পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রভৃতি অনেকেই করিয়াছেন এবং পুস্তকাকারে বহু 'রূপকথাও প্রকাশিত হইয়াছে। 'রূপকথা' এবং 'ছড়া' উভয়কে একসঙ্গে দেখা যায়। বিশুদ্ধ রূপকথা (ছড়াহীন) পাওয়া প্রায়ই যায় না; কিন্তু বিশুদ্ধ 'ছড়া' (কথাহীন) পাওয়া মোটেই দুর্ঘট নহে। 'রূপকথা' ও 'ছড়া' এবং 'কথাহীন ছড়া' চীন, ইজিপ্সিয়ান, গ্রীক, রোম প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। আর সকল দেশেই ইহাদের প্রভাব সাহিত্য-গঠনে, জীবনগঠনে ও জাতিগঠনে দেখিতে পাওয়া যায়।

ছড়া সম্ভবতঃ 'ছন্দ' শব্দের অপভ্রংশ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরক্ষরা অন্তঃপুরিকারাই মুখে মুখে সুমধুর 'ছড়া', রূপকথা, ব্রতকথা, হেঁয়ালী প্রভৃতি রচনা করিতেন। শিক্ষার প্রণালী হিসাবে ইহার মূল্য অতুলনীয়। মোটামুটী খনা' বা 'ক্ষেণা'র সময় হইতে যদি বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রারম্ভ বলিতে হয় তাহা হইলে খনা ছিলেন একজন রমণী এবং 'খনার বচন' ছিল ছড়া। তাহা হইলে ছড়ার প্রচলন বাঙ্গালা-সাহিত্যের অন্ততঃ প্রথম অবস্থা হইতে চলিয়া আসিতেছে। এইস্থলে শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর ভবানীপুর উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত—"আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে নারীর দান"-প্রবন্ধের কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

"তখনকার আমলে নিরক্ষরা পল্লীবাসিনীরা মুখে মুখে রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, সুমিষ্ট সরস ছড়া, শ্লোক এবং সঙ্গীত প্রভৃতি যা রচনা করতেন, তা'র প্রাচুর্য্য ও মূল্য নিতান্ত তুচ্ছ নয়। তাঁদের এই 'মৌখিক সাহিত্য' একদিন আমাদের জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে প্রতি প্রদেশে একটী অতি সুন্দর সাহিত্য-রসের আনন্দামৃত পরিবেশন ক'রেছিল। সে সম্পদ্ আজও আমাদের উন্নত ও উৎকর্ষিত 'লিখিত সাহিত্যে'র কাছে নিষ্প্রভ বা ব্যর্থ প্রতীয়মান হয় নি। তার সহজ সরস স্বচ্ছসুন্দর রূপ,—মধুর প্রগাঢ় রস,স্বচ্ছন্দ সাবলীল অনাড়ম্বর গতি এবং পরিপূর্ণ প্রাণযোগ সাহিত্য-রসিকের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে থাকে।

"যদিও এই পুরাতন 'মৌখিক সাহিত্য' এখন হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে এবং যা'ও বা অবশিষ্ট আছে, তা পূর্ব্বেকার সেই সুন্দরতর বিশিষ্ট রূপটী হারিয়ে ফেল্‌ছে।

"ঘুমপাড়ানী গান ও ছেলেভুলানী ছড়া-রচনায় তাঁরা এমন একটী ভাব ও সুরের মাঝে কথা গাঁথতেন যে, সে কথাগুলি খুব সাধারণ সহজ এবং স্থানে স্থানে অর্থহীন হ'লেও তার রসের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় নি। আশ্বিনে আগমনীর আনন্দ সঙ্গীত, বেদনা-করুণ গান, অগ্রহায়ণে নবান্নের ছড়া 'নূতনে'র উৎসব গীত, পৌষে পৌষ পার্ব্বণের বিবিধ ও বিচিত্র ছড়া, শ্লোক, ফাল্গুনে রাধাকৃষ্ণের দোল, কিশোর-কিশোরীর লীলাগান—ষড়ঋতুকে একটী অপূর্ব্ব রূপ দিয়ে অন্তরের আনন্দ-মন্দিরে বরণ করে নিয়েছে।

"মেয়েরাই এইসকল ছড়া, শ্লোক, গল্প, গীত-রচনায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। আমরাই দেখেছি, বিবাহের বাসর-ঘরের সঙ্গীত রচনায়, জামাই-ঠকানো বিচিত্র ধাঁধা তৈয়ারীতে, সরস-রসিকতাপূর্ণ ছোট ছোট শ্লোক-রচনায় আমাদের পিতামহী-মাতামহীরা একপ্রকার সিদ্ধবাণী ছিলেন বলা চলে।

"এখন 'লিখিত সাহিত্যে'র ভাষা বা 'ষ্টাইল' যেমন সাহিত্যকলার একটী প্রসাধনরাগ হয়েছে, তখনকার আমলে মেয়েদের এই সকল গল্প, ব্রতকথা, রূপকথা বলার ভঙ্গীর তেমনি বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য ছিল। এইজন্য একই গল্প বা কথা-বক্তার বলার বিচিত্র কারুকুশলতায় বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রাগে সুন্দর রং ধরে উঠেছে। এই সকল নিরক্ষরা মহিলাদের কল্পনাশক্তি যে কতদূর সুবিস্তৃত, স্বপ্নময়, ও সুলীলায়িত ছিল, তার প্রমাণ প্রত্যেক রূপকথার কৌটায় ভরা রয়েছে।"

সবক্ষেত্রেই যে নিরক্ষরা মহিলারা 'ছড়া' বা 'রূপকথা' রচনা করিয়াছেন এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না।

খনা, লীলাবতী, আত্রেয়ী, ভারতী, দেবভূতি, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি অনেক বিদুষী রমণীর জন্মস্থান এই ভারতবর্ষে। এই সব রচনার কতক যে তাঁহাদের নয়, বিশেষতঃ যখন জাজ্বল্যমান 'খনার বচন' বর্ত্তমান—এ-কথা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। ডাকের বচন থাকিতে থাকিতে উহাদের কতক যে পুরুষের রচনা তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, অধিকাংশই স্ত্রীরচিত। আর 'শ্লোক' বা 'ছড়া' কাটতে মেয়েদিগকেই দেখা যায়।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশের অন্তঃপুরিকার মধ্যে বিদ্যালোচনা, জ্ঞান-পিপাসা যথেষ্ট পরিমাণ ছিল। তাঁহারা নিজ নিজ ভূয়োদর্শন, রসরচনা প্রভৃতি ছড়ার আকারে ব্যক্ত করিতেন। সেইগুলি বংশপরম্পরায় তাঁহাদের কন্যা, বধূ, আত্মীয়া প্রভৃতির মধ্যে মুখে মুখে প্রচারিত হইত। এই সব ছড়ার কোন কোনটী হয় তো পূর্ব্বকালের কোন আউল, বাউল-কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। সেই সব আউল, বাউল গৃহে গৃহে অন্তঃপুরিকা-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কিংবা ভিক্ষায় বাহির হইয়া পল্লীতে পল্লীতে গমন করিয়া উহা প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহাদের রচিত জ্ঞানগর্ভ পংক্তি কয়েক হৃত-আকার হইয়া ছড়ার আকারে এখনও গৃহে গৃহে বিদ্যমান। কিন্তু এইরূপ ছড়ার সংখ্যা অল্প।

নিম্নলিখিত রূপ ছড়া সাধারণতঃ দেখা যায় :—

(১) বারব্রতের ছড়া,
(২) রূপকথা-সহ ছড়া,
(৩) ঘুমপাড়ানো ছড়া,
(৪) জ্ঞানগর্ভ ছড়া,
(৫) পাঁচমিশালী ছড়া।

প্রথম তিন রকম ছড়ার রূপ আজ পর্য্যন্ত অনেকেই প্রকাশ করিয়াছেন। পাঁচ মিশালী ছড়ার মধ্যে শ্লীল ও অশ্লীল দুই ফেলা যায়। শ্লীলতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমি (৪) দফার জ্ঞানগর্ভ ছড়া ও (৫) দফার পাঁচমিশালী ছড়া কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছি; সেই সংগ্রহের মধ্যে ১০০ ছড়া ইতঃমধ্যে "পঞ্চ-পুষ্পে" বাহির হইয়া গিয়াছে।

প্রবন্ধ বড় হইয়া যাইতেছে—এইখানে এই পাঁচরকমের ছড়ার নিদর্শন দিলাম :—

বারব্রতের ছড়া—

হরি হরি বোশেখ মাস।
কোন শাস্ত্রে পড়লো মাস?
চন্দনে ডুবু ডুবু হরির পা,
হরি বলেন, মা গো মা!
আজ কেন আমার শীতল পা?
কোন ভক্তে পূজে পা?
সে ভক্ত কি বর মাগে?

ইত্যাদি

(২) রূপকথাসহ ছড়া—সাতভাই চম্পার 'কথা' এবং তৎসহ—

সাতভাই চম্পা জাগ রে,
কেন বোন পারুল ডাক রে?

ইত্যাদি

(৩) ঘুমপাড়ানো ছড়া—

খুকু ঘুমুলো পাড়া জুড়লো বর্গি এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে?

ইত্যাদি

(৪) জ্ঞানগর্ভ ছড়া—

জানি না, পারি না, নেইক ঘরে
এ তিন কথায় দেবতা হারে।

ইত্যাদি

(৫) পাঁচমিশালী ছড়া—

যা যাউলী, আপনা উলী,
ননদ মাগী পর;
খাশুড়ী মাগী ম'লে পরে
হব স্বতন্তর।

ইত্যাদি।

"দিনের গতির সঙ্গে আমাদের সাহিত্য আমরা ভাঙ্গিয়াছি, গড়িয়াছি। আমাদের ভোজ্য আমরা বিবিধ দেশের চর্ব্বচোষ্য-লেহ্যপেয়ের দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছি। তাহাতে আমাদের সাহিত্য গৌরবান্বিত। বঙ্গীয় রমণিগণের সাহিত্য সে বিচারে হীন হইলেও, উহা যজ্ঞ-হবির মত সাত্বিক; এবং উহা মাতৃস্তন্যের অমৃত ধারায় আমাদিগকে শুধু আমাদিগকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।"

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের উক্ত বাক্যের দ্বারা এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

আলোচনা

গোবিন্দ কবিরাজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ

এখানে গোবিন্দ কবিরাজের জীবন-বৃত্তান্ত-সম্বন্ধে কিছু বলিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাবলী ধারাবাহিকরূপে কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, কর্ণানন্দ, নরোত্তমচরিত প্রভৃতি গ্রন্থের স্থানে স্থানে ইঁহার বিষয় যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা হইতে ইঁহার জীবনের কতকগুলি ঘটনা সংগ্রহ করা হইয়াছে।

গোবিন্দ কবিরাজ চিরঞ্জীব সেনের কনিষ্ঠপুত্র। তাঁহার বাড়ী ছিল কুমারনগরে। তিনি শ্রীখণ্ডের দামোদর কবিরাজের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করেন। শ্বশুর দামোদর ছিলেন শাক্ত এবং জামাতা চিরঞ্জীব ছিলেন বৈষ্ণব—মহাপ্রভুর অনুরক্ত ভক্ত। কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহাদের কাহারও ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিশেষ গোঁড়ামী ছিল না বলিয়া শ্বশুর-জামাই একত্রে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেন। জগদ্বন্ধুবাবু যদিও বলিয়াছেন যে, 'শ্বশুরের সঙ্গে জামাতার কোন কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে তিনি দুই পুত্র লইয়া বুধরি গ্রামে যাইয়া বাস করেন', কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ তিনি দেখাইতে পারেন নাই।

কনিষ্ঠপুত্র প্রসবের সময় গর্ভধারিণী অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছিলেন। দাসী আসিয়া সেই কথা দামোদরকে জানাইল। তিনি তখন পূজায় নিমগ্ন ছিলেন, কাজেই মুখে কোন কথা না কহিয়া ইঙ্গিতে দাসীকে ভগবতীর যন্ত্র দেখাইলেন এবং নেত্রও হস্ত ভঙ্গিদ্বারা ইসারায় বলিলেন,—

> "লয়ে যাহ ইহা শীঘ্র করাহ দর্শন।
> হইবে প্রসব—দুঃখ হবে নিবারণ॥"

কিন্তু দাসী এই ঠারঠোরের কথা বুঝিতে না পারিয়া, যন্ত্র ধৌত করিয়া সেই জল গর্ভিণীকে পান করাইল। ইহার ফলে তিনি এক পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রই মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজ। ইহার অল্পকাল পরেই চিরঞ্জীবের মৃত্যু হইল। সুতরাং ভ্রাতৃদ্বয়কে সম্পূর্ণ ভাবে মাতামহের তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইল।

শাক্ত-মাতামহের প্রভাব সম্ভবতঃ রামচন্দ্রের উপর সেরূপ বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই; কারণ পরম-গৌরভক্ত পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন রামচন্দ্র বেশ বড় হইয়াছিলেন,—তাহার আগেই তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছিল। সুতরাং পিতার সংসর্গে থাকিয়া ও ভক্তদিগের সহিত তাঁহাকে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে দেখিয়া, স্বভাবতঃই রামচন্দ্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দিকে অনেকটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

কিন্তু গোবিন্দের কথা স্বতন্ত্র। শৈশবাবস্থায় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। সুতরাং রামচন্দ্র অপেক্ষা মাতামহের স্নেহ-ভালবাসা তিনিই অধিক পরিমাণে পাইয়াছিলেন। শৈশব হইতেই তিনি শুনিয়া আসিয়াছিলেন যে, ভগবতীর যন্ত্রধৌত জল পান করিয়া তাঁহার মাতা সহজেই তাঁহাকে প্রসব করিতে পারিয়াছিলেন। আরও তাঁহার মাতামহের মুখে সর্ব্বদা শাক্তধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের কথা শুনিয়া তিনি ক্রমে শাক্তভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং মাতামহের মৃত্যুর পর পিত্রালয়ে গিয়াও শাক্তদিগের সহিতই তাঁহার সৌহার্দ্দ্য বেশী হইয়াছিল। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

> "কুমারনগরে বৈসে অতি শুদ্ধাচার।
> ভগবতী বিনা কিছু না জানয়ে আর॥
> গীতবাদ্যে করে ভগবতীর বর্ণন।
> শুনি হর্ষ শক্তি-উপাসক সঙ্গিগণ॥"

গোবিন্দ ছিলেন স্বভাবকবি। তিনি যে শাক্তধর্ম্ম-সম্বন্ধে অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে,

এখন আর তাহা উদ্ধার করিবার উপায় নাই। তবে প্রেমবিলাসে তাঁহার একটী পদের নিম্নলিখিত দুইটী মাত্র চরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

"না দেব কামুক না দেবী কামিনী
কেবল প্রেম-পরকাশ।
গৌরী-শঙ্কর চরণে কিঙ্কর
কহই গোবিন্দদাস।"

মাতামহের মৃত্যুর পর ভ্রাতৃদ্বয় মাতুলালয় হইতে পৈতৃক বাসস্থান কুমারনগরে আসিয়া বাস করেন। ইহার কিছুকাল পরে রামচন্দ্র শ্রীনিবাসপ্রভুর নিকট রাধাকৃষ্ণ-যুগলমন্ত্রে দীক্ষিত হ'ন। সে সময় শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং ঠাকুরমহাশয়ের গণে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের অনেক স্থান ভরিয়া গিয়াছিল। তখন শ্রীখণ্ড, যাজীগ্রাম, কণ্টকনগর, খেতুরি, বুধরি প্রভৃতি স্থান-সমূহে প্রায়শঃই মহোৎসব হইত। এই সকল মহোৎসবে অনেক গোস্বামি-সন্তান, মোহন্ত ও সাধারণ বৈষ্ণব যোগদান করিতেন। নরোত্তমের দলের গড়েরহাটী-কীর্ত্তন প্রায় সকল স্থানেই হইত। আর সে সকল মহোৎসব-সম্বন্ধে আলোচনা সর্ব্বস্থানে সকলের মুখে শুনা যাইত। তেলিয়া-বুধরির বৈষ্ণবেরাও এই সকল মহোৎসবে যোগদান করিতেন এবং গৃহে ফিরিয়া এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। কাজেই গোবিন্দের কাণে সেই সকল কথা এবং মহোৎসবের বিবরণাদি পৌছিত। তাহা ছাড়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের ভজননিষ্ঠা, শাস্ত্রালাপ ও বৈষ্ণবদিগের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী দেখিয়া-শুনিয়া গোবিন্দের হৃদয়ে ক্রমে এক নূতন-জগতের নব-আলোক উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। তখন আর মাতৃস্নেহ তাঁহার নবযৌবনকে তৃপ্তি-দান করিতে সমর্থ হইত না,—ক্রমে নবীন-নটবরের নূতন সোহাগের জন্য তাঁহার কবি-হৃদয় ভরপুর হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ তেলিয়া-বুধরি গিয়া নরোত্তমের প্রেমরাজ্যের স্নিগ্ধ, সুবিমল ও সুশীতল সমীরণ স্থরের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রেমপিপাসু হৃদয়ে নব-নব ভাবের নূতন-নূতন কবিতা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল,—তখন শ্রীআচার্য্যপ্রভুর পদাশ্রয় গ্রহণের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কাজেই জ্যেষ্ঠের ন্যায় সঙ্গীর অভাব তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। সে সময় রামচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন হইতে আচার্য্যপ্রভুসহ ফিরিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু বাটীতে না আসিয়া যাজীগ্রামে গুরুগৃহে থাকিয়াই ভজনসাধন ও ভক্তিগ্রন্থাদি আস্বাদন করিয়া দিবানিশি এরূপ বিভোর হইয়া রহিয়াছেন যে, অনেক সময় আহার-নিদ্রা পর্য্যন্তও তিনি ভুলিয়া যান।

এই সময় একদিন গোবিন্দের নিকট হইতে একখানি পত্র লইয়া একজন লোক যাজীগ্রামে আচার্য্যপ্রভুর গৃহে আসিল। পত্রে গোবিন্দ জ্যেষ্ঠকে লিখিয়াছেন,—"আমার দেহ দুর্ব্বল, শীঘ্র আসিবেন,—না হয় দুই চারি দিন থাকিয়া আবার যাইবেন। আপনার শ্রীচরণ-দর্শনের জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে।" রামচন্দ্র "অবসর নাই" বলিয়া সে লোককে বিদায় করিয়া দিলেন।

ইহার পর আরও দেড় মাস কাটিয়া গেল। আবার লোক আসিল। এবার গোবিন্দ লিখিলেন,—"গ্রহণী-রোগগ্রস্ত হইয়াছি। হাত পা ফুলিয়াছে। দেহ আর বহে না। ব্যাধি ক্রমে প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃপা করিয়া ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনের জন্য মন অস্থির হইয়াছে।" এই পত্র পাইয়াও রামচন্দ্র তাঁহার গুরুদেবকে পত্রের মর্ম্ম জানাইলেন না। এমন কি, ঠাকুর নিজ হইতে জিজ্ঞাসা করিলেও সমস্ত কথা তাঁহার নিকট গোপন করিলেন।

এই পত্র পাইয়াও যখন রামচন্দ্র আসিলেন না, কিংবা গুরুদেবকে সঙ্গে লইয়া সত্বর আসিবার কোন আশাও দিলেন না, তখন গোবিন্দ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহাতে তিনি ভীত হইলেন এবং আর বেশী দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, পরকালের ভাবনা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি তখন অনন্যোপায় হইয়া মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া মহামায়া-শক্তির উপাসনা করিতে লাগিলেন। তখন (যথা প্রেমবিলাসে)—

"মন্ত্রসিদ্ধি করিলেন—ইষ্ট হইল সাক্ষাৎ।
মরণ সময়ে পদে করে প্রণিপাত॥
'জীবনে মরণে মাতা আর নাহি জানি।
ভব তরিবার তরে দেহ গো তরণী॥
হেনকাল গেল,—অন্তে যুক্তি দেহ মোরে।

তোমা বিনে গোবিন্দেরে কৃপা কেবা করে ॥
কাতর হইয়া ডাকে—"কর পরিত্রাণ।
জীবনে মরণে তোমা বিনে নাহি আন ॥"

তখন দৈববাণী হইল,—

"রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র-সর্ব্ব বাছা সার হয়।
সেই পাদপদ্ম তুমি করহ আশ্রয় ॥"

এই কথা শুনিয়া গোবিন্দের প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি তখনই নিজপুত্র দিব্যসিংহকে ডাকাইয়া, অতি মিনতি করিয়া রামচন্দ্রকে এই ভাবে পত্র লেখাইলেন—"জীবন সংশয়। প্রভুকে একবার দেখিবার জন্য এখনও প্রাণ রহিয়াছে। কৃপা করিয়া তাঁহাকে আনিবেন।" এই পত্র ও খরচসহ পাঁচজন লোক তখনই যাজীগ্রামে পাঠান হইল। তাহারা দিবারাত্র চলিয়া পরদিবস বেলা আন্দাজ চারি দণ্ডের সময় যাজীগ্রামে আসিয়া পৌছিল। শেষে আচার্য্য-ঠাকুরের বাটীতে গিয়া রামচন্দ্রের হাতে পত্র দিল এবং কান্দিতে কান্দিতে গোবিন্দের অবস্থা জানাইল।

লোকদিগের মুখে সমুদয় শুনিয়া ও পত্র পাঠ করিয়া রামচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনই গুরুদেবের নিকট যাইয়া তাঁহার পাদপদ্মে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন এবং আবেগভরে বলিলেন—

"মোর গোষ্ঠী প্রতি কর অঙ্গীকার।
তোমার সাক্ষাতে কি কহিব মুঞি ছার ॥"

রামচন্দ্রের মুখে সব কথা শুনিয়া এবং তাঁহার আর্ত্তি-ভাব দেখিয়া আচার্য্যপ্রভুর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি সেইদিনই আহারান্তে রামচন্দ্রসহ যাত্রা করিলেন এবং পরদিবস তেলিয়া-বুধরিতে উপনীত হইলেন। বাটীতে পৌছিয়াই রামচন্দ্র গুরুদেবকে লইয়া গোবিন্দের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন—

"দুই চারি লোক ধরি বসাইল তাঁরে।
মুখে বাক্য নাহি,—চক্ষে বদন নিহারে ॥
করযোড় করে,—মুখে বাক্য না সরয়।
ঠাকুর চরণ দিলা তাঁহার মাথায় ॥"

সে দিবস বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। গোবিন্দের এত আনন্দ হইল যে, তিনি আপনার গুরুতর পীড়ার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। পরদিবস আচার্য্যপ্রভু সহাস্যবদনে রামচন্দ্রকে বলিলেন, "গোবিন্দকে স্নান করাইয়া দাও; তাহাকে দীক্ষা দিব।" রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ নিজহস্তে গোবিন্দকে ভাল করিয়া স্নান করাইয়া দিলেন এবং শুক্লবস্ত্র পরিধান করাইয়া নিজে তাঁহাকে কোলে করিয়া বসিলেন।

এদিকে আচার্য্যপ্রভু স্নানাদি সারিয়া সেই ঘরে আসিলেন এবং গোবিন্দের সম্মুখে দিব্যাসনে উপবেশন করিয়া তাঁহার কর্ণে "হরিনাম" মহামন্ত্র দিলেন। তখন কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই কীর্ত্তন শুনিতে-শুনিতে গোবিন্দের নয়নদ্বয় দিয়া অনবরত প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। তাহার পরে আচার্য্যপ্রভু তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণ যুগলমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তখন গোবিন্দ গুরুদেবের চরণতলে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন, আর গুরুদেব শিষ্যের মস্তকে পদস্পর্শ করিয়া আশার্ব্বাদ করিলেন। গোবিন্দের মনে হইতে লাগিল তাঁহার সিংহপ্রায় বল হইয়াছে। তিনি হৃদয় উঘাড়িয়া কান্দিতে-কান্দিতে প্রথমে জ্যেষ্ঠের এবং পরে অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের পদপ্রান্তে পতিত হইতে লাগিলেন। তার পর ভাবাবেশে প্রথমে বলিলেন,—"শ্রীনিবাস যা'র প্রভু তা'র কি আছে দায়।" শেষে গুরুদেবের উদ্দেশে বলিলেন—

"এবে নিবেদন করেঁা শুন প্রভুবর।
নিবেদিতে বাসি ভয় কাঁপয়ে অন্তর ॥"

ইহা বলিয়া গোবিন্দের বদন হইতে নিম্নলিখিত সুমিষ্ট অমৃততুল্য পদটী বহির্গত হইল :—

ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্ল্লভ মানব দেহ সাধুসঙ্গ
তরাইতে এ ভবসিন্ধু রে ॥
শীত-আতপ বাত বরিখত
এ দিনযামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ পুরজন
চপল সুখ লব লাগি রে ॥
এ ধন-যৌবন পুত্র-পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।

নলিনী-দল-জল জীবন টলমল
ভজহু হরিপদ নিতি রে ॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণ-বন্দন
পদ-সেবন দাসী রে।
পূজহ সখীগণ আত্ম নিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে ॥

তখন গোবিন্দের আবেশাবস্থা। তিনি যেন এক স্বপ্নময় জগতে বিচরণ করিতেছেন। এই প্রকার বিভোরভাবে গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া গোবিন্দ বলিলেন—

"এবে সে জানিনু পদ জীবন আমার।
আজ্ঞা হয় কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিবার ॥
গৌরাঙ্গের লীলা বর্ণি সাধ হয় মনে।
সর্ব্বসিদ্ধি পরাৎপর যাহার বর্ণনে ॥"

এই কথা শুনিয়া গুরুদেব বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন এবং সস্নেহে বলিলেন—

"গৌরপ্রিয় বাসুদেব ঘোষ মহাশয়।
নির্যাস বর্ণন কৈল যত গুণচয় ॥

সুতরাং—"সচ্ছন্দে বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণ-লীলা।"

গোবিন্দ ক্রমে ব্যাধিমুক্ত হইয়া স্বাস্থ্যতালাভ করিলেন। আচার্য্যপ্রভু বুধরি থাকিয়া তাঁহাকে গোস্বামি-গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইলেন। গোবিন্দ অল্পদিনের মধ্যে বৈষ্ণব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন এবং রস-সিদ্ধান্ত ভাব দশা সমস্তই সুন্দররূপে আয়ত্তাধীন করিলেন। এইরূপে—

"কতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন।
এইরূপ ছত্রিশ বৎসর করিলা যাপন ॥
সেই দিন হইতে লীলার করিলা ঘটন।
গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা করিলা বর্ণন ॥"

এইরূপে গোবিন্দ গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলার বহু পদাবলী রচনা করিলেন। ক্রমে ঠাকুর-মহাশয়ের ভ্রাতা রাজা সন্তোষ দত্তের সহিত তাঁহার সখ্যতা হইল এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে গোবিন্দ সংস্কৃত-ভাষায় রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ-সম্বন্ধে "সঙ্গীত-মাধব-নাটক" রচনা করিলেন।

ক্রমে তাঁহার কবিত্ব ও বর্ণনাশক্তির গুণগ্রাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার কবিতাপাঠে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'কবিরাজ'-উপাধি প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি জাহ্নবা ঠাকুরাণীর সহিত বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিপাদগণ তাঁহার বিরচিত "সঙ্গীত-মাধব-নাটক" শ্রবণ এবং তাঁহার অলৌকিকী কবিত্বশক্তি দর্শন করিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার কবিত্বশক্তি বিদ্যাপতি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। গোবিন্দ দেশে ফিরিয়া আসিলে শ্রীজীব গোস্বামী মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া তাঁহার রচিত নূতন পদ পাঠাইতে অনুরোধ করিতেন। শেষে গোস্বামিপাদগণ অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'কবিরাজ'-উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ কবি সবে প্রশংসয় ॥
শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যাঁর গীতামৃত পানে ॥
'কবিরাজ'-খ্যাতি সবে দিলেন তথাই।
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঞি ॥"

তথা 'অনুরাগবল্লী' গ্রন্থে—

"বড়-কবিরাজ-ভ্রাতা গোবিন্দ-কবিরাজ নাম।
সংক্ষেপে কহিয়ে-কিছু তাঁর গুণগ্রাম ॥
তিহোঁ গীত পাঠাইলা শ্রীজীব-গোসাঞির স্থান।
যাহা শুনি ভক্তগণের যুড়ায় পরাণ ॥
গোসাঞি সগণ তাহা কৈলা আস্বাদন।
বিচারিয়া দেখ দিয়া নিজ নিজ মন ॥"

গোবিন্দকে 'কবিরাজ' উপাধী প্রদান করিবার সময় গোস্বামিপাদেরা নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। যথা—

"শ্রীগোবিন্দ-কবীন্দ্র-চন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিল-
নানিতঃ কবিতাবলী-পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দু-সম্বদ্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীব-সুরাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বত্রাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্তৎ পরম্ ॥"

যদুনন্দন দাসের "কর্ণানন্দ" গ্রন্থে আছে, শ্রীনিবাসপ্রভুর

শিষ্যদিগের মধ্যে প্রধান হইয়াছেন—

"অষ্ট কবিরাজ আর চক্রবর্ত্তী ছয়।
পৃথিবীতে ব্যক্ত ইহা—সবাই জানয়॥"

এই আটজন কবিরাজ-শিষ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ইঁহারা দুই ভ্রাতা। যথা—

"কবিরাজের জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবিরাজ।
ব্যক্ত হৈয়া আছেন যিঁহো জগতের মাঝ॥
তাঁহার অনুজ শ্রীকবিরাজ গোবিন্দ।
যাঁহার চরিত্রে দেখ জগৎ আনন্দ॥"

আর, যে সংস্কৃত-শ্লোক হইতে যদুনন্দন দাস উল্লিখিত পদ্যানুবাদ করিয়াছেন তাহা এই—

"শ্রীরামচন্দ্র-গোবিন্দ-কর্ণপুর-নৃসিংহকাঃ।
ভগবান বল্লবীদাসো গোপীরমণ গোকুলৌ॥
কবিরাজ ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে।
উত্তমা ভক্তিসদ্রত্নমালাদান-বিচক্ষণাঃ॥"

প্রবন্ধ ক্রমে বড় হইয়া যাইতেছে, অথচ অনেক আবশ্যকীয় কথা বলা হয় নাই। এই প্রবন্ধ এখানেই শেষ করিলাম। গোবিন্দ কবিরাজের পদাবলীর আলোচনা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে করিবার ইচ্ছা রহিল।

কবিচর্য্যা

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

কবিরাজ রাজশেখর কাব্যমীমাংসায় রূপ ও রসে সমুজ্জ্বল কবিজীবনের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সংস্কৃত-সাহিত্যেও তাহা অতুলনীয় বলা চলে। তিনি কবির শিক্ষা-দীক্ষা, সংসর্গ ও সংস্কার, শৌচ ও স্বভাব, তাঁহার বাসভবন ও অন্তঃপুরিকা, মিত্র ও পরিজন, তাঁহার কবিতা-রচনার আসবাব, দৈনন্দিন জীবনযাপন-পদ্ধতি, কবির মনস্তত্ত্ব, জনমত ও স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে এত সুন্দর সুন্দর কথা সূত্রাকারে গুছাইয়া লিখিয়াগিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুগের কবিযশঃপ্রার্থী নবীন লেখকদিগের এ সকল বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য কৌতূহল হওয়া অতি স্বাভাবিক।

কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে নবীন কবিকে গুরুর নিকট হইতে যথাবিধি বিদ্যা ও উপবিদ্যা গ্রহণ করিতে হইত। নামধাতুপরায়ণ, অভিধানকোশ, ছন্দোবিচিতি ও অলঙ্কারতন্ত্র—এইগুলি কাব্যের উপকারী বিদ্যা-নামধাতুপরায়ণ বলিতে মোটামুটি ব্যাকরণের অংশবিশেষকে বুঝায়। যে শাস্ত্র দ্বারা কেবল নানাবিধ নামের ব্যুৎপত্তি ও রূপসিদ্ধি শিক্ষা করা যায়, তাহার নাম 'নামপরায়ণ'; আর যে শাস্ত্রে ধাতুগণের ব্যুৎপত্তি, রূপ প্রভৃতি বিবৃত আছে, তাহাই 'ধাতুপরায়ণ'। অতএব নামধাতুপরায়ণ বলিতে শব্দরূপ, ধাতুরূপ, স্ত্রীপ্রত্যয়, তদ্ধিত, কৃৎ, কারক ও সমাস—এ সমস্তই বুঝাইতে পারে। 'অভিধানকোশ' অর্থে 'ডিক্সনারী'—পর্য্যায়ক্রমে বা বর্ণানুক্রমে বা অন্য কোন ক্রমানুসারে সজ্জিত শব্দসমষ্টিকে বুঝায়। 'অভিধান' শব্দের অর্থ নাম; ও 'কোশ' শব্দের অর্থ সমূহ। অতএব অভিধান-কোশ বা নামমালা বলিতে ইংরেজীতে 'এ কলেকসন্ অফ্ নেমস' বুঝাইয়া থাকে *। 'ছন্দোবিচিতি' শব্দটীর অর্থ একটু

* আমরা চলতি ভাষায় 'অভিধান' শব্দের অর্থ বলিয়া থাকি 'ডিক্সনারী' কিন্তু শুধু কয়েকটী অভিধান বা নামে 'ডিক্সনারী' হয় না। উহাকে 'অভিধানকোশ' বলা উচিত।

গোলমেলে। কেহ বলেন যে, ইহা একখানি বিশিষ্ট প্রাচীন ছন্দোবিষয়ক গ্রন্থের নাম। আবার কেহ বলেন যে, তাহা নহে ছন্দোবিচিতি সাধারণ ছন্দঃ-শাস্ত্রেরই পর্য্যায়। ছন্দঃ সমূহের বিশেষরূপ চিতি অর্থাৎ চয়ন ('কলেকসন্') ইহাতে আছে বলিয়াই ছন্দঃশাস্ত্রের নামান্তর বিচিতি। অতএব, ছন্দোবিচিতি বলিলে যে কোন ছন্দোগ্রন্থই বুঝায়। আর অবশিষ্ট রহিল 'অলঙ্কারতন্ত্র' বা অলঙ্কার শাস্ত্র। 'তন্ত্র' শব্দটী বিস্তার অর্থ বুঝাইয়া থাকে। মোটামুটি ধরিতে গেলে ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দঃ ও অলঙ্কার—এই চারিটী শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান থাকা উচিত; কারণ, এগুলি কাব্যের অঙ্গবিদ্যা।

তারপর উপবিদ্যা। চতুঃষষ্টি ললিতকলা উপবিদ্যা বলিয়া বিখ্যাত। চতুঃষষ্টি ললিতকলার নাম নিম্নে দেওয়া গেল। (১) গীত, (২) বাদ্য, (৩) নৃত্য, (নাট্য ইহারই অন্তর্গত বলিয়া বাৎস্যায়ন ধরিয়াছেন; অপর কেহ কেহ নাট্যকলাকে পৃথক করিয়া ধরেন), (৪) আলেখ্য, (৫) বিশেষকচ্ছেদ্য, (৬) তণ্ডুলকুসুমবলিবিকার, (৭) পুষ্পাস্তরণ, (৮) দশনবসনাঙ্গরাগ, (৯) মণিভূমিকাকর্ম্ম, (১০) শয়নরচনা, (১১) উদকবাদ্য, (১২) উদকাঘাত, (১৩) চিত্রযোগ, (১৪) মাল্যগ্রথনবিকল্প, (১৫) শেখরকাপীড়যোজন, (১৬) নেপথ্যপ্রয়োগ, (১৭) কর্ণপত্রভঙ্গ, (১৮) গন্ধযুক্তি, (১৯) ভূষণযোজন, (২০) ইন্দ্রজাল, (২১) কৌচুমারযোগ, (২২) হস্তলাঘব, (২৩) বিচিত্র শাকযূষভক্ষ্যবিকারক্রিয়া, (২৪) পানরাগাসবযোজন, (২৫) সূচীবানকর্ম্ম, (২৬) সূত্রক্রীড়া, (২৭) বীণাডমরুকবাদ্য, (২৮) প্রহেলিকা, (২৯) প্রতিমালা, (৩০) দুর্ব্বাচকযোগ, (৩১) পুস্তকবাচন, (৩২) নাটকাখ্যায়িকাদর্শন, (৩৩) কাব্যসমস্যাপূরণ, (৩৪) পট্টিকাবেত্রবানবিকল্প, (৩৫) তর্ক্কর্ম্ম, (৩৬) তক্ষণ, (৩৭) বাস্তুবিদ্যা, (৩৮) রূপ্যরত্নপরীক্ষা (৩৯) ধাতুবাদ, (৪০) মণিরাগাকরজ্ঞান, (৪১) বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ, (৪২) মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধি, (৪৩) শুকসারিকাপ্রলাপন, (৪৪) উৎসাদনে, সংবাহনে ও কেশমর্দ্দনে কৌশল, (৪৫) অক্ষরমুষ্টিকাকথন, (৪৬) ম্লেচ্ছিতকবিকল্প, (৪৭) দেশভাষাবিজ্ঞান, (৪৮) পুষ্পশকটিকা, (৪৯) নিমিত্তজ্ঞান, (৫০) যন্ত্রমাতৃকা, (৫১) ধারণমাতৃকা, (৫২) সংপাঠ্য, (৫৩) মানসীকাব্যক্রিয়া, (৫৪) অভিধানকোষ, (৫৫) ছন্দোজ্ঞান, (৫৬) ক্রিয়াকল্প, (৫৭) ছলিতকযোগ, (৫৮) বস্ত্রগোপন, (৫৯) দ্যূতবিশেষ, (৬০) আকর্ষক্রীড়া, (৬১) বালক্রীড়নক, (৬২) বৈনায়িকী, (৬৩) বৈজয়িকী, ও (৬৪) বৈয়ামিকী।* এই চৌষট্টি কলাই কাব্যের উপবিদ্যা। কবির ইহাতেও সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ বলা বাহুল্য মাত্র।

সুজনগণের উপজীব্য কবির সাচ্চর্য্য, নানা দেশের সংবাদ রাখা, রসিক ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ-আলোচনা, সাধারণের জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখা, ও বিদ্বানগণের গোষ্ঠীতে মেশা, আর প্রাচীন কবিদিগের রচনাসমূহের আলোচনা—এগুলি কাব্যের অত্যন্ত উপকারক। কবিরাজ বলিয়াছেন যে, সুন্দর স্বাস্থ্য, প্রতিভা, বিদ্যাভ্যাস, পূজ্যগণের প্রতি ভক্তি, বিদ্বানগণের সহিত আলাপ, প্রভূত পাণ্ডিত্য, দৃঢ় স্মৃতিশক্তি ও অভীষ্ট যশ না পাইলেও মনের নিরুদ্বিগ্ন ভাব—এই আটটী কবিত্বের মাতৃস্থানীয়।

কবিকে সর্ব্বদা শুচি থাকিতে হইবে। শৌচ ত্রিবিধ—বাক্‌শৌচ, মনঃশৌচ ও কায়শৌচ। প্রথম দুইটীর বিষয় শাস্ত্র হইতে জানিতে হইবে। তৃতীয় কায়শৌচের নমুনা হইতেছে—হাত-পায়ের নখগুলি পরিষ্কারভাবে কর্ত্তিত, মুখে তাম্বুলরাগ, দেহে চন্দনাদির স্বল্প অনুলেপন, মহার্ঘ অথচ আড়ম্বরবিহীন পরিচ্ছদ, মস্তকে কুসুমদাম ইত্যাদি। সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকিলে সরস্বতী প্রীত হন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পরিচ্ছন্নতার উপর এতটা জোর দিবার হেতু এই যে, সাধারণতঃ কবির যেমন স্বভাব, তেমনি তাঁহার কাব্য হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইলে কবির কাব্যেও সৌন্দর্য্যের আভাষ পাওয়া যায়। সেই জন্য রাজশেখর নবীন কবিকে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সর্ব্বদা প্রফুল্লভাবে থাকা, কথা বলিবার সময় মৃদু হাস্য, ব্যঞ্জনাময় শব্দ ব্যবহার, সকল

---

* ইহা হইল বাৎস্যায়নোক্ত চতুঃষষ্টিকলা। শৈবতন্ত্রে, ভাগবতের টীকাগুলিতে, শুক্রনীতিসার প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার কিছু কিছু ইতরবিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বা চতুঃষষ্টি অপেক্ষা তিন চারিটী অধিক কলার নামও পাওয়া যায়। সেগুলির সহিত একবাক্যতা করিলে ৫৪ ও ৫৫ সংখ্যক উপবিদ্যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যক বিদ্যার যে পুনরুক্তিদোষ ঘটিয়াছে তাহা নিবারিত হইতে পারে।

বিষয়েরই রহস্য-অন্বেষণ, না জিজ্ঞাসা করিলে অপরের কাব্যের দোষ বাহির না করা এবং জিজ্ঞাসা করিলে যথার্থ পক্ষপাতশূন্য সমালোচনা—এইগুলি কবির সতত পালনীয়।

কবির বাসভবন সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে রাজপ্রাসাদকেও হার মানাইত। গৃহটী উত্তমরূপে চূণকাম করা হইত; ধূলিকণার লেশমাত্র থাকিতে পাইত না। ছয়টী ঋতুতে বাসের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন মহল থাকিত। বহু তরুমূলে নির্ম্মিত বেদী, বৃক্ষবাটিকা, কৃত্রিম ক্রীড়াপর্ব্বত দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, কৃত্রিম নদী, খাল, ঝিল, সমুদ্রের মত বিশাল হ্রদ এই ভবনের মধ্যে শোভা পাইত। ময়ূর-ময়ূরী, হারীত, সারস, চক্রবাক, রাজহংস, চকোর, ক্রৌঞ্চ, কুরর, শুক সারিকা প্রভৃতি পালিত পক্ষিগণের মধুর কলতানে ভবনের চারিপ্রান্ত মুখরিত হইত। উদ্যানে মৃগ চরিত, তরুলতায় ফুল ফুটিত, মধুকরগুঞ্জনে কর্ণ তৃপ্ত হইত। গ্রীষ্মের তাপ অধিক হইলে স্নিগ্ধশ্যামছায়াময় লতা-মণ্ডপের মধ্যে ধারা-যন্ত্রোত্থিত সুশীতল জলকণাবৃষ্টিতে কবির ক্লান্তি বিদূরিত হইবার উপায় থাকিত। কখন বা চিত্ত ভারাক্রান্ত হইলে কবি দোলারোহণে মানসিক খেদ দূর করিতেন। আর যখন ইহাতেও নির্ব্বেদ দূর হইত না, তখন কবি বিজনে লুকাইতেন; অথবা তাঁহার আদেশে পরিজনবর্গ বাক্যালাপ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া মূকভাব অবলম্বন করিত। কবির বাসভবনের এই যে চিত্র কবিরাজ আঁকিয়াছেন, তাহা সেকালের কয়জন সৌভাগ্যবান্ কবির ভাগ্যে বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল—তাহা প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্গণের গবেষণার বিষয় সন্দেহ নাই। আজকাল পাশ্চাত্যের কয়েকটী বড় বড় বায়স্কোপ-কোম্পানীর রঙ্গভূমিতে এই সকল কৃত্রিম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সমাবেশ আছে বলিয়া শুনা যায়।

কবির ভবনে ভাষাব্যবহারেরও একটা নিয়ম থাকিত। পরিচারকেরা শুধু অপভ্রংশ ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিত। পরিচারিকাদের অপভ্রংশ ছাড়া মাগধভাষাও জানিতে হইত। অন্তঃপুরিকাগণ প্রাকৃত ও সংস্কৃত—এই দুই ভাষা শিখিতেন; আর কবির মিত্রগণের সকল ভাষাই অল্পবিস্তর জানা থাকিত। কবিগণ নিজ হস্তে কবিতা লিখিতেন না। তাঁহার যিনি [illegible] থাকিতেন, তাঁহাকে বাক্‌পটু সর্ব্বভাষাবিৎ, ইঙ্গিতাকারজ্ঞ, নানালিপিতে পারদর্শী ও কবি হইতে হইত হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল। অবশ্য গভীর রাত্রিতে বা অন্যসময়ে লেখকের অনুপস্থিতিতে কবির মিত্রগণ বা অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে কেহ কেহ লেখকের কাজ করিতেন। কোন কোন কবি আবার নিজের অন্তঃপুরে নূতন রকমের ভাষাও চালাইতেন।*

কবিতা রচনার আসবাবের মধ্যে—একটী ছোট সুদৃশ্য পেটিকার মধ্যে একটী কাঠের ফলক বা প্লেট ও ছোট কৌটায় খড়ি, দোয়াত ও কলম, তালপত্র, ভূর্জ্জপত্র ও তাড়িপত্র (তেরেট পাতা), লোহকণ্টক ও ('ষ্টাইলো') চক্‌চকে পলিশ করা পিতলের ফলক সর্ব্বদা কবির কাছে থাকিত। পিতলের ফলকে কবিতা লেখা বা চূণকাম করা দেওয়ালের উপর কবিতা লেখা তখনকার দিনে খুব প্রচলিত ছিল। এখনও দক্ষিণের কোন কোন দেশে দোকানদারেরা পিতলের ফলকে হিসাব কসিয়া থাকে। রাজশেখর এসকল বাহ্য আস্‌বাবের প্রতি অনাস্থা দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, এ সকলে কবিত্বশক্তির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হয় না। যিনি প্রতিভাবান্ তাঁহার এ সকল বাহ্যাড়ম্বর কিছু না থাকিলেও চলে। খুব সত্য কথা!

যে সকল কবি পরের অনুগ্রহপ্রার্থী, তাঁহাদের প্রথম কয়েকটী বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। তাঁহার নিজের সংস্কার ও শিক্ষা কতদূর, কোন্ ভাষায় তাঁহার অধিকার বেশী, সাধারণের রুচি কোন্ দিকে, তাঁহার প্রভু কিরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্য দিয়া প্রতিপালিত, তাঁহারই বা অভিরুচি কীদৃশ,—এই সব আলোচনা করিয়া কবি ভাষাবিশেষ অবলম্বনে কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করিবেন। তবে এ সকল নিয়মই পরমুখাপেক্ষী কবির জন্য। যিনি স্বাধীন,

---

* রাজারাও অনেক সময় এইরূপ নিয়ম চালাইতেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মগধের রাজা শিশুনাগের অন্তঃপুরে ট, ঠ, ড, ঢ, শ, ষ, হ ও ক্ষ ব্যবহৃত হইত না। শূরসেনরাজ কুবিন্দের অন্তঃপুরে পরুষ-সংযুক্ত বর্ণ বাদ দেওয়া হইত। কুন্তলপতি সাতবাহনের অন্তঃপুরে সকলেই প্রাকৃতে কথোপকথন করিতেন; এবং উজ্জয়িনীর অধিপতি সাহসাঙ্ক (বিক্রমাদিত্য) অন্তঃপুরেও সংস্কৃত চালাইতেন।

গদগে সরস্বতী

JUNO PRINTING WORKS, CAL.

তিনি যে কোন ভাষায় ও যে কোন বিষয়ে কাব্য রচনা করিতে পারেন—ইহা বলাই বাহুল্য।

কখন আধাআধি কিছু লিখিয়া অপরের কাছে পড়িয়া শুনান উচিত নহে; তাহাতে সে রচনার আর সমাপ্তি হয় না। কোন নূতন রচনাও একাকী কাহারও সম্মুখে পড়িতে নাই; কারণ, শ্রোতা যদি উহা তাঁহার নিজের বলিয়া দাবী করেন, তখন সাক্ষ্য দিবার কেহ থাকে না। আপনি আপনার রচনার গৌরব করাও উচিত নহে; কারণ, নিজের প্রতি পক্ষপাত গুণকে দোষ ও দোষকে গুণ করিয়া দেখায়। কদাচ দর্প করাও অনুচিত; কেন না লেশমাত্র দর্পও সকল সদ্গুণকে ধ্বংস করিয়া দেয়। এই সকল কারণে কবিতা রচনা করিয়া বিশ্বস্ত গুণবান্ বন্ধুকে দিয়া যাচাই করাইয়া লইতে হয়; যেহেতু নিরপেক্ষ ব্যক্তি যে সকল দোষ দেখিতে পান, তাহা প্রায়ই কর্ত্তার চক্ষুতে পড়ে না। বন্ধুদের মধ্যে যদি কেহ কবিম্মন্য থাকেন, তাঁহার সমক্ষে কবিতা পাঠ করিতে নাই; কারণ আত্মাভিমানবশতঃ কবিবন্ধু বন্ধুর কবিতার প্রশংসা মুখ ফুটিয়া করিতে পারেন না, অথচ সুযোগ পাইলেই উহা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করেন। নবীন কবিরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিবেন যে, রাজশেখরের এই উপদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কবিদের সময় যাহাতে বৃথা না নষ্ট হয়, সে জন্য কবিরাজ দিবা ও রাত্রিকালকে প্রহরানুসারে ভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে বলিয়াছেন। দিবাভাগের কর্ত্তব্য নিম্নলিখিত ভাবে স্থির করা যাইতে পারে। প্রথমে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান। প্রাতঃকৃত্য, সন্ধ্যাপূজাদি সমাপনান্তে বৈদিক সারস্বতসূক্ত পাঠ (ঋ, বে, ৬।৬১)। পরে বিদ্যাপীঠে উপবেশন করিয়া প্রথম প্রহর পর্য্যন্ত কাব্যের সহায়ক বিদ্যা ও উপবিদ্যাগুলির অনুশীলন। প্রতিভা যতই থাকুক না কেন, নিত্য নূতন সংস্কার না করিলে প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সে জন্য নিত্য অনুশীলন আবশ্যক। দ্বিতায় প্রহরে কাব্য-রচনা। প্রায় মধ্যাহ্নের কাছাকাছি সময়ে স্নান ও তৃপ্তিপূর্ব্বক লঘুপাচ্য ভোজন। ভোজনান্তে কাব্যগোষ্ঠী অর্থাৎ আড্ডায় বসিয়া কাব্যালাপ। কখন কখন প্রশ্নোত্তর আলোচনা। উহা নানা রকমের আছে—সমস্যাপূরণ, অক্ষরের খেলা, প্রহেলিকা, চিত্রকাব্য ইত্যাদি। এগুলি সবই ললিতকলার অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত এইভাবেই কাটিবে। চতুর্থ প্রহরে একাকী অথবা কয়েক-জন নির্ব্বাচিত বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত পূর্ব্বাহ্নে রচিত কাব্যের পরীক্ষা। কাব্যরচনার সময় ভাবের আধিক্যবশতঃ দোষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে না; সেই জন্য পরে আর একবার উহা পরীক্ষা করিতে হয়। বাড়তি অংশের বর্জ্জন, কমতি অংশের পূরণ, যাহাতে ঠিক অর্থবোধ হয় না তাহার পরিবর্ত্তন, ও বিস্মৃত অংশের সংযোজন—ইত্যাদি দ্বারা কাব্য সম্পূর্ণাঙ্গ হইয়া থাকে। এইরূপে দিবাভাগ অতিবাহিত হইলে সায়ংকালে সন্ধ্যা ও দেবী সরস্বতীর উপাসনা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তাহার পর প্রথমপ্রহর পর্য্যন্ত দিবাভাগে পরীক্ষিত কাব্যাংশের পুনর্লেখন, যাহাতে কোন ভ্রম-প্রমাদ না থাকে। তাহার পর ভোজন ও শয়ন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে নিদ্রা। সুনিদ্রা স্বাস্থ্যের প্রধান সহায়। চতুর্থ প্রহরে নিদ্রাভঙ্গ ও শয্যাত্যাগ। প্রথম প্রথম ইহা অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হইলেও চেষ্টা করিয়া অভ্যাস করিতে হইবে; কারণ, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রাভঙ্গের ফলে মন সুপ্রসন্ন ও সকল কার্য্য সুনিষ্পন্ন হয়। ইহাই হইল কবির অহোরাত্রিক কার্য্যোপদ্ধতি।

রাজশেখর চারিশ্রেণীর কবির উল্লেখ করিয়াছেন - অসূর্য্যম্পশ্য, নিষণ্ণ, দত্তাবসর, ও প্রায়োজনিক। যিনি গুহাগর্ভে কিংবা ভূমিগৃহে থাকিয়া নৈষ্ঠিকবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক কাব্যরচনা করেন, তিনিই "অসূর্য্যম্পশ্য"। কাব্যরচনায় তিনি এরূপ একনিষ্ঠ যে সূর্য্যের মুখ দেখাও তাঁহার ঘটিয়া উঠে না। যিনি কাব্যরচনায় সবিশেষ অভিনিবিষ্ট, কিন্তু অসূর্য্যম্পশ্যের মত একনিষ্ঠ নহেন, তিনিই "নিষণ্ণ"। যিনি নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে অবহেলা করেন না, অথচ অবসরমত কাব্যরচনাও করেন তিনি "দত্তাবসর"। আর যিনি কোন উপস্থিত উৎসব উপলক্ষে কাব্যরচনা করেন, তাঁহাকে "প্রায়োজনিক" কবি বলা যায়। প্রয়োজনমত কবিতা লেখাই তাঁহার কার্য্য।

সারস্বত অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান, লঘু আহার, মনের প্রফুল্লতা, ইন্দ্রিয়সংযম, চিত্তের একাগ্রতা ও শিবিকা করিয়া ভ্রমণ—এই সকল বিধি-ব্যবস্থা কবিগণের একান্ত

পালনীয়। উহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা ও বুদ্ধির পরিপক্কতা—এ উভয়ই হইয়া থাকে।

যে কোন কাব্য রচনার পর অনেকগুলি আদর্শে উহা নকল করিয়া রাখিবার কথা কবিরাজ বহুবার বলিয়াছেন। একখানি মাত্র আদর্শ থাকিলে উহা সহজেই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। পরহস্তে ন্যাস, দান বা বিক্রয়, কবির দেশত্যাগ বা অল্পায়ুতা এবং অগ্নিদাহ বা বন্যার প্রকোপে প্রায়ই বহু মূল্যবান্ রচনা নষ্ট হইয়া থাকে। কবির দারিদ্র্য অথবা ব্যসনাসক্তি, পৃষ্ঠপোষকের অবজ্ঞা, শত্রুকে অথবা বিষকুম্ভ পয়োমুখ বন্ধুকে বিশ্বাস—এই কয়টী কাব্যের মহাপদ্ বলিয়া গণ্য। পরে শেষ করা যাইবে, পরে সংস্কার করিলেই চলিবে, বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া লিখিতে হইবে—কবির এইরূপ মনোভাব এবং রাষ্ট্রবিপ্লব কাব্যের উচ্ছেদের কারণ হইয়া থাকে। অতএব, নবীন কবির যথাসাধ্য এই সকল স্বকৃত, পরকৃত ও আকস্মিক দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে রাজশেখর অতি উদার মনোভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন। কাব্যমীমাংসার বহু স্থলে কবির সহধর্ম্মিণী 'চৌহানকুলমৌলিমালিকা' অবন্তিসুন্দরীর মত প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিরাজ বিশ্বাস করেন যে, পুরুষের মত নারীও কবি হইতে পারেন ; কেন না সংস্কার, আত্মসমবেত—উহা স্ত্রী-পুরুষ-বিভাগ বিচার করে না। শোনা যায় যে সেকালে রাজকন্যা মহামাত্যদুহিতা, গণিকা ও কৌতুকিভার্য্যাগণ শাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ্ট ও কবি হইতেন। সূক্তি-মুক্তাবলীতে রাজশেখর এইরূপ চারিজন স্ত্রী কবির প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নাম শীলাভট্টারিকা, বিকট-নিতম্বা, বিজয়াঙ্কা ও প্রভুদেবী। বিজ্জকা নামে আরও একজন স্ত্রীকবির সগর্ব্বোক্তি এখনও আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে—

"নীলোৎপলদলশ্যামাং বিজ্জকাং মামজানতা।
বৃথৈব দণ্ডিনাপ্যুক্তং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী॥"

দণ্ডী যদি নীলোৎপলদলশ্যামা বিজ্জকাকে জানিতেন তবে সরস্বতীকে সর্ব্বশুক্লা বলিতেন না।

রাজশেখরের কবিচর্য্যার ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

—:o:—

গোবিন্দ-ভজন

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী।

[মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তীর্থভ্রমণকালে দাক্ষিণাত্য হইতে "কৃষ্ণকর্ণামৃত" ও "ব্রহ্ম-সংহিতা" নামে দুইখানি অমূল্যগ্রন্থ আনেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পঞ্চম অধ্যায়ের ২৯-৫৬ পর্য্যন্ত ২৮টী শ্লোকে গোবিন্দ-ভজন লিপিবদ্ধ আছে। তদবলম্বনে বর্ত্তমান কবিতাটী রচিত হইল।]

১

চিন্তামণি খচিত মরি গোকুল মহাধাম
ঘিরিয়া কোটী কল্পতরু তাহারি চারিধার,
সেই গোকুলে গোধন যিনি চরান্ অবিরাম
লতার মত লক্ষ গোপী লুটায় পদে যাঁর—
পরম সেই পুরুষবর কৃষ্ণ প্রাণধন
ভৃত্য সম নিত্য তাঁরে ভজন করে মন।

২

বদনে যাঁর কণিত বেণু সুরের তুলে ল'য়
আয়ত যাঁর লোচন যুগে কমলদলশোভা
অঙ্গ যাঁর বিজলি-ভরা অসিত জলধর
মাধুরী যাঁর মদন কোটী জিনিয়া মনোলোভা

যাঁহার মাথে ময়ূর-চূড়া কণ্ঠে বন-হার
চিত্ত মম ভৃঙ্গ সম ভজন করে তাঁর।

৩

নাচিলে যে বা দোদুল দোলে চূড়ার শিখি-পাখা
হাতের বাঁশী গলার মালা নূপুর বাজে পায়,
অঙ্গ তিরি- ভঙ্গ যাঁরি, নয়নে দিঠি বাঁকা,
অরুণাধরে রজত হাসি নবনীরদ কায়,
প্রণয়-কেলি- বিলাস-কলা নিত্য লীলা যাঁর
চিত্ত মম নৃত্যভরে ভজন করে তাঁর।

৪

সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তি ধরে যাঁহার প্রতি অঙ্গ
নয়ন শোনে শ্রবণ হেরে পরশ করে ঘ্রাণ,
যাঁহার বাণী চরণ-পাণি শিরস-মুখ-ভঙ্গ
সকল দিশি জুড়িয়া করে জগতরাজি ত্রাণ
মূরতি যাঁর সত্ব-চিদা- নন্দ-সমূজল
চিত্ত ভজে নিত্য তাঁরি চরণ নিরমল।

৫

নাহিক আদি নাহিরে চ্যুতি অনন্ত নাহি যাঁর
অতুল যিনি অমূল যিনি সবার যিনি মূল,
পুরাণ যিনি পুরুষবর কিশোর সুকুমার,
কারণ-হীন কারণ যিনি সূক্ষ্মক সুস্থূল,
বেদের আঁখি পায় না যাঁরে, ভকতি যাঁরে পায়,
চিত্ত মম নদীর মত সেই সাগরে ধায়।

৬

জিনিয়া বায়ু সূক্ষ্মগতি মৌনী মুনিমন
যতনে যারে ধরিতে নারে বরষ কোটি ধ্যানে,
গোবিন্দেরি সেই সে পদ- তত্ত্ব সুগহন
কি অচিন্ত্য! ভাব কি ভাষা কেউ না তারে জানে।
তুচ্ছ আমি, উচ্চ মোরে করে আকর্ষণ,
চিত্ত মম নিত্য ভজে কৃষ্ণ প্রাণধন।

৭

একাই যিনি করেন কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচন
যাঁহার মাঝে ইচ্ছা-রূপে জগত কোটি ভায়
বিশ্ব যাঁরে ধরিতে নারে বিশ্বাতীত র'ন,
যাঁহার কোটি জগত অনু চরণ-রেণু প্রায়,*—
পরম সেই পুরুষবর কৃষ্ণ প্রাণাধার
চিত্ত মম ভক্তিভারে ভজন করে তাঁর।

৮

গোষ্ঠ মাঝে গোপাল যত যাঁহার ভাবে ভোর
বাজায় বেণু নাচায় ধেনু উড়ায় শিখি-চূড়া
রূপের ধ্যানে রূপটী যাঁহার ব্রজের যত চোর
অঙ্গে ধরে— চন্দ্রে যেন সূর্য্যালোক গুঁড়া
ঘিরিয়া যারে ভক্তগণে করেন বেদ গান
চিত্ত করে নিত্য তাঁরি ভজন-সুধা পান।

৯

যাঁহার চিদা- নন্দ-মন উজল প্রেমরসে
গাহন করি বল্লবীরা স্বরূপ লভে তাঁর,
নিখিলে যিনি আত্মা, যোগ- মায়াটী যাঁর বশে,
লক্ষ্মী সনে গোলোকধামে নিত্য লীলা যাঁর,
পরম সেই পুরুষবর কৃষ্ণ প্রাণধন
ভৃত্য সম নিত্য তাঁরে ভজন করে মন।

১০

অমল হিয়া ভকত সাধু ভকতি-আঁখি পরে
মধুরাতে প্রেমাঞ্জন করিয়া বিলেপন
চিন্তা যাঁরে চিন্‌তে নারে সে শ্যামসুন্দর
নয়ন ভরি মানস-পটে করেন বিলোকন।
পরম সেই পুরুষবর কৃষ্ণ অভিরাম
মুগ্ধ মম চিত্ত করে ভজন অবিরাম।

১১

রামাদি নানা মূরতি মাঝে অংশরূপে পশি
ভূতলে অব- তারিলা যিনি বিবিধ অবতার
গোকুলে শেষে যদুর কুলে হইয়া কালো শশী
উদিলা নিজে উজলি রূপে কংস-কারাগার,

---

* পদরেণু হইতে পদ যেমন পৃথক্ অথচ তদ্বারা মণ্ডিত, তদ্রূপ।

পরম সেই পুরুষবর । প্রাণধন
ভৃত্য সম নিত্য তাঁরে ভজন করে মন ।

১২

যাঁহার জ্যোতি হৃদয়ে ধরি উজলি মহাকাশ
লক্ষ কোটি জগত ঘোরে চক্রে অনিবার
সত্তা যাঁরি সত্ত্ব-রজ- তমসে পরকাশ,
বসুধা-বুকে চেতনে জড়ে নিহিত নানাকার,
অনন্ত সে নিষ্কল সে, ব্রহ্ম সনাতন,
চিত্ত মম সেই ভূমারে ভজে অনুক্ষণ ।

১৩

যাঁহার মায়া প্রসব করে জগতে কোটি অণ্ড
তিনটী গুণে বাঁধন দিয়ে নাচায় চরাচর,
সেই মায়া যে তাঁহার হাতে কুহক যাদু দণ্ড
মন তা জানে, বেদের তাহা নয় গো অগোচর ।
নাইক রজ, নাইক তম, সত্ত্ব নিরমল
বিশুদ্ধ সে গোবিন্দেরি ধেয়াই পদতল ।

১৪

যাহার চিদা- নন্দ-রস বিন্দু পরিমাণ
জীবের হিয়া আস্বাদিয়া মদন করে জয়
মধুর যাঁরি প্রেমের লীলা জগত করি পান
নমিত-ফণা ফণীর মত চরণ তলে রয়-
পরম সেই পুরুষবর কৃষ্ণ প্রাণারাম
চিত্ত মম নিত্য তাঁরি ভজন করে নাম ।

১৫

গোলোক নামে স্বধাম তাঁরি নন্দ-নিকেতন
যাহার তলে দুর্গা-পুরী, মহেশ-হরি-ধাম,
তাঁহারি জ্যোতি- নদীটি সবে করিয়া বেষ্টন
সূত্ররূপে যেন রে গাঁথে মালিকা অনুপাম ।
দীপের আলো আত্মা দেহে কৃষ্ণ প্রাণধন
চিত্ত মাঝে নিত্য লীলা করেন অনুখণ ।

১৬

যিনি গো কায়া, যাঁহার ছায়া দুর্গা মহামায়া,
ইচ্ছা যাঁরি শক্তিরূপে মায়ের ভুজে রয়,
যাঁহার লীলা পোষণ তরে চন্দ্রচূড়-জায়া
সৃজন করি পালন করি করেন শেষে লয়,
পরম সেই পুরুষবর কৃষ্ণ প্রাণধন
ভৃত্য সম নিত্য তাঁরে ভজন করে মন ।

১৭

দুগ্ধ যথা বিকার যোগে দধির রূপ ধরে
কারণ যথা কার্য্য রূপে আপনি পরকাশ
ত্রিগুণাতীত কৃষ্ণ তথা প্রলয়-লীলা তরে
তমস যোগে মহেশরূপে পুরা'ন্ স্বাভিলাষ ।
পরমযোগী শম্ভুরূপী কৃষ্ণ প্রাণধন
ভৃত্য সম নিত্য তাঁরে ভজন করে মন ।

১৮

যেমন এক দীপেরি শিখা অন্য দীপে লাগি
জ্বালায় তারে জ্যোতিঃ তবু ভিন্ন নহে রূপ,
তেমনিতর কৃষ্ণ-শশী- পরশে উঠে জাগি
গর্ভশায়ী বিষ্ণু মহা মুর্ত্তি অপরূপ ।
নির্গুণ সে কৃষ্ণ, মহা- বিষ্ণু গুণময়,
চিত্ত মম কৃষ্ণ পদে নিত্য লাগি রয় ।

১৯

ক্ষুদ্র যাঁর রোমের কূপে জগত কোটী হয়
কারণ-জলে রহেন যোগ- নিদ্রাগত যিনি
সেই সে মহা- বিষ্ণু মাঝে আধার রূপে রয়
যেই শকতি কৃষ্ণেরি তা চরণ-বিহারিণী ।
ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণ প্রাণধন
রাতুল দুটী চরণ তাঁরি নিত্য মাগে মন ।

২০

যাহার রোম- বিবর-জাত লক্ষ জগ-পতি
নিশ্বাসেতে সঞ্জীবিত প্রশ্বাসেতে লয়
সেই সে মহা- বিষ্ণু, চির আনন্দেরি পথি,
ষোড়শ কলা কৃষ্ণেরি যে একটী কলা হয় ।
পরম সেই পুরুষবর কৃষ্ণ প্রাণধন
চিত্তে মম নিত্য হোক্ তাঁরি পদার্পণ

২১

ত্বিষাম্পতি সূর্য্য যথা বিন্দু নিজ কর
বিতরি বুকে উজ্জল করে তপনমণিচয়,*
জ্যোতির জ্যোতি কৃষ্ণ-তেজে তেমনি ভাস্বর
ব্রহ্মা বেদ- বিধান দানে ভুবনে সমুদয়।
বিধাতা যাঁরে বরণ করে সেই সে প্রাণারাম
কৃষ্ণ মম চিত্ত-তম হরেন অবিরাম।

২২

এ তিন লোকে বিঘ্ন রাশি নাশিতে মন করি
শুভঙ্কর বিঘ্ন-হর গণেশ গণ-নাথ
যাঁহার পাদ- পদ্ম দুটি দন্ত যুগে ধরি
মৃণাল-লোল শুণ্ডে চুমি' করেন প্রণিপাত
সেই সে বর- অভয়-দাতা সঙ্কট-হরণ
চিত্ত মম নিত্য ভজে কৃষ্ণেরি চরণ।

২৩

অনল মহী গগন বারি পবন দিক কাল
আত্মা মন মিলনে সেই উদিল জগ তিন
সে তিন লোক রচনা করে যাঁহার মায়াজাল,
যাঁ হ'তে আসে, যাঁহাতে ভাসে, যাঁহার মাঝে লীন,
পরম সেই পুরুষবর কৃষ্ণ প্রাণধন
চিত্ত মম নিত্য করে তাঁহারি আরাধন।

২৪

সকল সুর- মুরতি-ধর সকল গ্রহরাজ
জগত-আঁখি সবিতা ওই জ্যোতির ঘনাকার
ঘুরিছে কাল- চক্র ধরি অসীম নভ মাঝ
নিরন্তর আদেশে যাঁর, চক্ষু যিনি তার,
পরম সেই পুরুষবর জ্যোতির সেই জ্যোতি
কৃষ্ণপদে চিত্ত মম নিত্য করে নতি।

২৫

প্রভাব যাঁর শ্রুতির পথে বিভূতি তপে রয়,
ধরমে যাঁর শকতি, জ্বলে পাপের মাঝে আঁখি,
করমে যাঁর গোপন কর ভুবন তিনময়
নিয়োগ করে অমর, নর, পতঙ্গ, কীট, পাখী,
পরম সেই পুরুষবর কৃষ্ণ প্রাণধন
ভৃত্য সম নিত্য তাঁরে ভজন করে মন।

২৬

অমর-পতি ইন্দ্রে কিবা ইন্দ্রগোপকীটে *
সাধনা সম করম ফল করেন যিনি দান,
উচ্চ-নীচ নাহিক ভেদ যাঁহার সম দিঠে
ভকতে যাঁর করুণা আনে ভোগের অবসান,
পরম সেই পুরুষবর কৃষ্ণ প্রাণারাম
চিত্ত মম ভজন করে তাঁহারে অবিরাম।

৭

সখ্য, কাম, বৎসলতা, দাস্য, গুরুপনা
বিস্মৃতি কি রোষ বা ভীতি, বৈর কি বিদ্বেষ,
যে ভাবে যে বা হৃদয়ে করে তাঁহার উপাসনা
ভজনা মত যোগ্য দেহ পায় সে সবিশেষ।
নিঠুর, মধু সকল ভাবে প্রাপ্তি ঘটে যাঁর
সেই সে মম কৃষ্ণ-পদে কোটি নমস্কার।

২৮

লক্ষ্মীরা সব কান্তা যেথায় কান্ত স্বয়ং কৃষ্ণ,
যেথায় বারি অমিয়ধারা ভক্তেরা স-তৃষ্ণ,
যেথায় তরু কল্পতরু, চিন্তামণি ভূমি,
গমন যেথা নৃত্য, বচন সঙ্গীতেরে চুমি,
চিন্তা যেথায় অচিন্ত্যেরি, বংশী সহচরী,
সুরভীদের স্তন্যে দুধের সাগর বহে মরি,
যেথায় চিদা- নন্দ আলো রস আস্বাদন,
কালের যেথা নাইক গতি- সেই ত বৃন্দাবন।
ক্ষীর-সাগরে শ্বেত নলিনী শ্বেত-দ্বীপ নাম,
মধ্যে তাহার নিত্য গোলোক বৃন্দাবনধাম।
কেই বা জানে তাহার কথা? কৃষ্ণ প্রাণধন
সেই ধামেরি পতি, তাঁরে ভজ আমার মন।

---

* সূর্য্যকান্তমণিচয়।

* বর্ষাকালের কীটবিশেষ।

গীতার অক্ষয় বীজ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

গীতা কেবল সপ্তশত শ্লোকযুক্ত গ্রন্থ নয়; ইহা প্রতি জীবের হৃদয়স্থ হৃৎপতির অক্ষয় ও অব্যয় বাণী, আর এই অমোঘ বাণী একদিকে যেমন নর-নারায়ণের যোগ-কৌশল শিক্ষা দিয়া থাকে, অপর দিকে তেমনি গুরু-শিষ্য সংবাদ আমাদের অন্তরে প্রকাশ করিয়া দেয়।

ইহা স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখের অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী মালামন্ত্র, ইহার দ্বারা শ্রীভগবান সেই যোগ-কৌশললাভের সদুপায় প্রদর্শন করেন। ইহা শ্রদ্ধা করিয়া শ্রবণ ও মনন করলে, জীব ব্রাহ্মী-স্থিতিলাভ করে। এই বাণী শোক মোহ নাশের অমোঘ মহৌষধ। সেই শ্রদ্ধার ফলে, হৃদয়স্থ নারায়ণ জীবের অজ্ঞানজতম, তাহার জ্ঞান-প্রদীপ জ্বালাইয়া দূর করেন।

তেষামেবানুকম্পার্থ মহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ গীতা ১০।১১

তিনিই আত্মস্বরূপে সাধকের হৃদয়-মধ্যেই জ্ঞানালোকের বিকাশ করিয়া দেন। তিনি দয়া করিয়া দেখা না দিলে কোন কৌশলেই কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যাহাদের চিত্ত ভগবানে একাগ্র হইয়াছে, সেই ভক্তগণের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি হয়।

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলিয়া, তাঁহার অভয় চরণে শরণ লইলে, তোমার বিশিষ্ট বোধশক্তি প্রকাশ পাইবে এবং তোমার প্রত্যক্ষ অনুভূতি ফুটিয়া উঠিবে। তুমি বুঝিতে পারিবে যে ভগবানই সদ্‌গুরু। সৎশিষ্য হইলে তিনিই সদ্‌গুরুরূপে হৃদয়াভ্যন্তরে দীক্ষা প্রদাম করেন। দীক্ষা প্রাণের ভিতরেই হয়। দীক্ষা মানে মন্ত্রের সহিত প্রাণের যোগ। ইহাই প্রকৃত দীক্ষা।

গীতা কি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব গীতোক্ত সপ্তশত মন্ত্রের সাধনার সিদ্ধিলাভ করিলে, তুমি মুক্তি-মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

গুরুমুখ হইতে গীতামন্ত্র শ্রবণ করিয়া, তাহা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। সেই মন্ত্রকে, হৃদিস্থিত নারাণকে শুনাইতে হয়, তাহা হইলে, তুমি তাঁহার পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি বা প্রণবধ্বনি, তোমার হৃদয় মধ্যেই শুনিতে পাইবে, তখন তোমার দেহমধ্যস্থ চক্রে চক্রে কমল সকল ফুটিয়া উঠিবে। সেই ফুলদল হৃদিস্থিত নারায়ণের চরণে অর্পণ করিয়া পূজা করিলে, তবেই পূজা সার্থক হয় এবং সেই ভক্তি-প্রদত্ত ফুল ভগবান গ্রহণ করেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

গীতা ৯।২৬

সরলতা, ব্যাকুলতা ও সদালাপে সদ্‌বৃত্তি জাগে। ইহার দ্বারা তুমি যোগমায়ার কৃপালাভ করিবে। তাঁহার কৃপালাভ করিলে তোমার চক্রের কমল দল ফুটিয়া উঠিবে।

যোগমায়ার কর্ত্তৃত্বে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া, পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে অভ্যাস কর, তখন বুঝিতে পারিবে, যে কোন অজ্ঞেয় শক্তি তোমার সকল বাধা বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া দিতেছেন।

মাতৃ-কর্ত্তৃত্বে বিশ্বাসবান্ সাধকের, ব্যবহারিক জীবন-যাত্রাও বিঘ্ন শূন্য হইয়া যায়।

যতদিন যোগমায়া দয়া করিয়া জীবের মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া না দেন, যতদিন নিদ্রারূপিণী মা প্রবোধরূপে প্রকাশিত না হন, ততদিন জীব বিষয়জালে জড়িত ও কর্ম্মচক্রে পতিত থাকে। তারপর আরাধনার দ্বারা তাঁর কৃপালাভ হইলে গীতা-জ্ঞান উন্মেষিত হইলে, জগৎময় সত্য দর্শন হয়।

মায়াচ্ছন্ন অবস্থায় ভগবানের স্বরূপকে অনুভব করা যায় না; বিদ্যা যখন অবিদ্যাকে নাশ করে, তখন ঐ মায়ার

যবনিকা অপগত হয় এবং সংসারের সকল কার্য্যে ভগবানের স্বরূপ অনুভূত হয়।

এই নাট্যলীলার লীলা-হস্ত, তাঁর কৃপা না হইলে, কাহারও জানিবার সামর্থ্য নাই।

ভগবান্ আশ্রিতবৎসল, তিনিই শরণাগত ব্যক্তির চিত্তে অবিদ্যার উপশম করেন।

শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণই জীবের একমাত্র মুক্তির উপায়।

গীতার প্রত্যেক শ্লোক মন্ত্র স্বরূপ পবিত্র।

উপাসনাকালে বিশেষ বিশেষ ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া, চেতনাকে সম্যকরূপে তন্ময় করিবার জন্য, বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের আবশ্যক।

অনুভূতিই জীবচেতনার স্বরূপগত ধর্ম্ম। অনুভূতিকে অভীষ্টের আকারে যথাশক্তি ধরিয়া রাখিতে হইবে এবং উপাস্যের ভাবগুলি স্মৃতিতে জাগাইয়া রাখিতে হইবে।

শব্দশূন্য ভাব হয় না। বিশিষ্ট বিশিষ্ট ভাব, বিশিষ্ট বিশিষ্ট শব্দ দ্বারাই ধরিয়া রাখিতে হয়।

এইরূপ বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দগুলিকে আমরা মন্ত্র বলি। মন্ত্রের সাহায্যে অনুভূতিকে তন্ময়তা দিতে চেষ্টা করি; ইহাই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু মন্ত্রের অর্থজ্ঞান না থাকিলে এবং সেই অর্থানুসারে অনুভূতি ফুটাইতে না পারিলে, মন্ত্রোচ্চারণ বৃথা হয়। মন্ত্রের ভাববোধের জন্য, মন্ত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সাধনা করা আবশ্যক। সাধনার দ্বারা মন্ত্রে উপদিষ্ট তত্ত্ব সকল, সাধকের মন ও বুদ্ধির অঙ্গীভূত হইয়া যায়।

যে মন্ত্র পাঠের দ্বারা এইরূপ নবজীবন লাভ করা যায়, সেই পাঠই সার্থক, নতুবা অন্যথায় পাঠের নামে আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র; চরিত্র গঠন করিয়া, মানবকে নবজীবন দেওয়ার জন্যই, গীতার মন্ত্র সকল উক্ত হইয়াছে।

জ[illegible] এই শব্দটী মুখে শত সহস্রবার উচ্চারণ করিলে, যেমন [illegible]পাসা মেটে না, তেমনি শুধু মুখে গীতার শ্লোক-সমূহ শুকের ন্যায় শব্দময় আবৃত্তি করিলে ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না।

মহাত্মা তুলসীদাস তাঁহার রামায়ণে বলিয়াছেন—

উল্টা নাম জপৎ জগ জানা
বাল্মীকি হুয়া ব্রহ্ম সমানা।

উল্টা রাম নাম জপ করিয়া, বাল্মীকি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা শতবার রামনাম উচ্চারণ করিয়াও, ব্রহ্মজ্ঞান দূরে থাকুক, মনে একটুও শান্তির উদয় হয় না, ইহার কারণ কি?

ইহার কারণ সদ্‌গুরুর অভাবে ও যোগ-কৌশল শিক্ষার অভাবে আমরা মাত্র শব্দময় উচ্চারণ করি এবং নামে শক্তি সঞ্চার করিতে পারি না!

যেমন মন্ত্রের ঋষি, দেবতা, ছন্দাদি আছে, গীতারও সেই রকম আছে।

গীতার ঋষি বেদব্যাস, কারণ তিনিই মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন। "ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ,"। যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বা-বস্থায়, আত্মানুভূতিতে অভ্যস্ত, তাঁহার সেই অনুভূতিগুলি যখন ভাষার আকারে বাহিরে আসে, উহাই তখন মন্ত্র নামে অভিহিত হয়। সেই মন্ত্রদ্রষ্টা সাধকই ঋষি।

বেদব্যাস মন্ত্র দর্শন করিয়া, বিষয়টী শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে মন্ত্রমালাটী প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং তিনিই গীতার ঋষি। "শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা" অর্থাৎ তাঁহার বিশেষ বিষয় লইয়া মন্ত্র রচিত হইয়াছিল।

"অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ,"—অর্থাৎ এইরূপ ছন্দে মন্ত্রের ভাবা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

যেমন সমস্ত মন্ত্রে বীজ আছে, গীতারও বীজ আছে। যেমন বীজ হইতে প্রত্যেক বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তেমনি গ্রন্থ মধ্যে এমন একটী বিষয় থাকে, যাহা অবলম্বন করিয়া, বাকি সমস্ত বিষয়টী লেখা হয়।

গীতার বীজ কি?

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।"

গীতা—২।১১

এই মন্ত্রটী গীতার অক্ষয় বীজ। এই বীজকে হৃদয়ে ধারণ করিলে, ইনি অক্ষয় কবচ রূপে জীবকে "ত্রায়তে মহতোভয়াৎ,"—অর্থাৎ সাধক জন্ম-মরণরূপ সংসারের মহাভয় হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন। এই মহামন্ত্র হৃদয়স্থ হৃষীকেশের পাঞ্চজন্য সঙ্খের অব্যয় অক্ষয় বাণী, ইহাই তাহার স্মৃতিকে প্রবুদ্ধ করিয়া সর্ব্বদা বলিতেছে, হে "জীব তোমার শোক করিবার কিছু নাই, আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে

জীব হইয়াছে—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীতা —১৫।৭), তুমি অশোকার্হ, অশোকার্হ আত্মার জন্য বৃথা শোক করা তোমার সাজে না।"

ব্রহ্মবিদ্যারূপ যোগ শাস্ত্রের মধ্যে ইহাই প্রবেশ দ্বার। এই বীজমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিলে, তুমি ব্রহ্মবিদ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবে।

এই মহামন্ত্রের আরম্ভের নাশ নাই, ইহার বিপরীত পরিণাম নাই। এই মন্ত্র সাধন করিলে, তোমার অন্তরে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, এবং ইহাই তোমার কর্ম্ম বীজকে দগ্ধ করিয়া দিবে এবং তুমি আত্মজ্ঞান লাভ করিবে। এই মন্ত্র নিবদ্ধ সত্যকে দর্শন করিলে, তুমি আত্মবিৎ হইবে এবং তখন তুমি যোগশক্তি লাভ করিবে এবং তখন যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই তোমায় সকল পাপ হইতে মুক্ত করিবেন, কারণ তখন যোগমায়ার কৃপায়, তুমি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছ। প্রত্যেক মন্ত্রের শক্তি আছে। গীতারও শক্তি আছে; এই শ্লোকে তাহা নিবদ্ধ—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণংব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

গীতা ১৮।৬৬

শ্রীকৃষ্ণ জগতের নিয়ন্তা। তুমি সব ছাড়িয়া দিয়া তাঁর শরণাপন্ন হও, তোমার সব ঠিক হইয়া যাইবে। তিনিই কাল-রূপ ধারণ করিয়া, বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার লীলা করিতেছেন।

তিনি সর্ব্ব নিয়ন্তা, তিনি নিজের শক্তির প্রভাবে, জীবের মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিকে, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়কে, এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম সকল বস্তুকে পরিচালিত করিতেছেন। তিনিই বহু-রূপ ধারণ করিয়া নিজের বিশ্বমূর্ত্তি প্রকটিত করিতেছেন।

আমাদের সামান্য ভক্তি এবং জ্ঞান, মহামায়ার একটী ফুৎকারে কোথায় উড়িয়া যাইবে; অতএব আমাদের কখনও আত্মশক্তির উপর নির্ভর করা উচিত নয়, এই জন্য ভগবানের আশ্রয় লওয়াই যুক্তিসঙ্গত। লোকে বিপদে পড়িলে, সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার পথ শ্রীভগবানই তাহাদিগকে দেখাইয়া দেন।

তিনিই আমাদের অন্তরে পরমাত্মারূপে রহিয়াছেন, তিনিই মানুষের গুরু, তাঁহার প্রেরণাতেই লোকে হিতাহিত জ্ঞান লাভ করে।

মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ। গীতা ১৫।১৫

অতএব তুমি শ্রুতি, স্মৃতি, বিধি-নিষেধ প্রভৃতি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হও, তাঁহার ইঙ্গিতমত চল, তবে তুমি সর্ব্বপ্রকার ভয়ের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে ও মোক্ষলাভ করিতে পারিবে। তুমি কর্ম্মযোগ, আত্মযোগ মন্ত্রযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম উপেক্ষাপূর্ব্বক কেবল ভক্তিযোগনিরত থাকিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। যিনি এই ভাবটী মনে দৃঢ় রাখিতে পারেন, তিনি মহামায়ার কৃপায় মহাশক্তি লাভ করেন। তাঁর অহঙ্কার দূর হয় এবং জ্ঞান আসে।

ঈশ্বরের অংশ জীবরূপে জীবদেহে বর্ত্তমান এবং এই জীবদেহেই পরমাত্মাও অন্তর্য্যামীরূপে আছেন। প্রহ্লাদ তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, "হে পিতঃ, পরমাত্মা আমাদের অন্তরে থাকিয়া আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন; তিনিই জগতের গুরু; তিনি ছাড়া কে কাকে উপদেশ দিতে পারেন?

শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদিস্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তাতকঃ কেন শাস্য তে॥"

বিঃ পুঃ ১।২০

ইহাই সর্ব্বসিদ্ধিলাভের মূল ও সর্ব্বগুহ্যতম মন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণই সর্ব্বসিদ্ধলাভের একমাত্র উপায়।

তিনি আমাদের অন্তরে সর্ব্বক্ষণ বলিতেছেন—

"মামেকং শরণং ব্রজ।"

কেবল মাত্র আমারই শরণাগত হও। যিনিই নিষ্কপট-ভাবে এই বাণী শুনিতে চাহেন, তিনিই ইহা শুনিতে পান এবং তদনুযায়ী চলেন। ইহাই মহাপুরুষ ও মহাত্মাদের লক্ষণ।

অতএব আমরা শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে আত্মসমর্পণ করিয়া বলি—

নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্।
অলক্ষ্যং সর্ব্বভূতানামন্তর্ব্বহিরবস্থিতম্॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১।৮।১৮

হে শ্রীকৃষ্ণ আপনি আদি পুরুষ, এবং সকল বস্তুর অন্তরে এবং বাহিরে অবস্থান করিয়া, তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন অথচ আপনি কি রূপে কার্য্য করিতেছেন, কেহ তাহা দেখিতে পায় না। আমি আপনার তত্ত্ব অবগত নহি, কিন্তু ভক্তির সহিত আপনাকে প্রণাম করিতেছি এবং আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

বিদূষী

(গল্প)

শ্রীচুটবিহারী মুখোপাধ্যায়

এক

ভোর বেলার একমুঠো ঝির্-ঝিরে হাওয়া জানালার পর্দা সরিয়ে এসে গদাই এর গায়ে পিঠে মাথায় প্রেয়সীর কোমল হাতের পরশ বুলিয়ে গেল।

গদাই উঠে বসল। সামনের টেবিলের ওপর এদিক-ওদিক এলোমেলো ভাবে ছড়ান বইগুলো নজরে পড়তেই গদাইএর মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। আশ্বিনের মধুর-ভোগ্য সকালটুকু তার প্রাণের মধ্যে যে সুখের আমেজ এনে দিয়েছে তা সে কিছুতেই নষ্ট হ'তে দেবে না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে গায়ে জামা চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল, সামনের খোলা পার্কের খানিকটা টাট্‌কা বাতাস সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে নিতে। পার্কের গেট ঠেলে ঢুকতেই ওদিকে স্ত্রী-কণ্ঠে আওয়াজ হ'ল—'আজ তোমার দেরী হ'য়েছে গদাই।' গদাই মুখ তুলে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে এগিয়ে গেল।

পাড়ার কাঞ্চন-দির শত্রুও যত মিত্রও তত। মাত্র একটা বৎসর এই পাড়ার মধ্যে এসে কাঞ্চনদি পাড়াটাকে বেশ মাতিয়ে তুলেছে। কলকাতার শহরের মধ্যে এই পাড়াটা বরাবরই একটু 'কন্‌জার-ভেটিভ্'—সেকেলে। কাঞ্চন-দি পাড়ার মধ্যে এল যেন বিদ্রোহ করতে, যেন একটানা সুরের মাঝখানে একটা বেখাপ্পা বেসুর। তার কখনো পায়ে নাগরা, কখনো বা ফুল-কাটা চটী, পরণে কখনো ছাপা সিল্কের সাড়ী, কখনো ফুলপাড় খদ্দর, মুখে মাঝে মাঝে ইংরেজী বুলি, সকল বয়সের ছেলের সঙ্গেই ভাব। এই 'সেকেলে' পাড়ার কলেজে-পোড়ো ছেলেদের অনেকদিনের একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল শিক্ষিতাদের সঙ্গে মিশবে, সুতরাং বয়স মুখল না, পাড়ার সব যুবকই এই একদিকে হেলে পড়ল। পাড়ার বুড়োরা সশঙ্কিত হ'য়ে রইল—এইবার বুঝি ছেলেগুলো সত্যিই ব'য়ে যায়।

পাড়ার প্রবীণ নারাণবাবু অনেক পয়সার মালিক, পাড়ার মধ্যে তাঁরই কথা প্রায় সকলেই মান্য করে। এক দিন সমস্ত 'ইয়ংম্যান'দের ডেকে চা আর হালুয়া খাইয়ে বল্‌লেন—'দেখ বাপুরা, কি দরকার ঐ ক্রীশ্চান মেয়েদের সঙ্গে মিশে, আমরা গরীব গেরস্থঘরের ছেলে, ওরকম স্ত্রীলোকের সঙ্গ আমাদের পক্ষে বড়ই অশুভ। ওদের মধ্যে অনেক ঢং, অনেক কারসাজি, ওদের চরিত্র প্রায়ই—যাক্ গে সে সব অনেক কথা, মোট কথা মিশো না—' এই সব ছেলেদের বাপেরা নারাণবাবুর কাছে অনেক রকমেই ঋণী। তাই অনেকেই নারাণবাবুর কথাতেই সাবধান হ'য়ে গেল। হ'ল না কেবল দু'তিন জন। গদাই নারাণবাবুর কথার মাঝখানেই মুখের হালুয়া থু থু ক'রে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

গদাই সেদিন একেবারে তার কাঞ্চন-দির কাছে এসে বল্‌লে—'এসব একেবারে অসহ্য!'

কাঞ্চন-দি হাতের বইখানা আঙুলের মধ্যে মুড়ে হাসতে হাসতে উঠে এসে গদাইএর কাঁধে হাত রেখে, বললে—'কি অসহ্য গদাই?'

গদাই এক মিনিট চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে—'ঐ সব ওরা আপনার নামে যা' তা' বলে।'

—'তাতে তোমার অসহ্য কেন?'

গদাই থতমত খেয়ে কাঞ্চন-দির মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—'বাঃ তা কেন, আমারও তো—'!

এই কারণেই পাড়ার ছেলেরা গদাইএর সঙ্গে কম কথা বলে, বুড়োরা নাক সিঁটকায়। গদাইএর তাতে কিছু এসে যায় না।

সেদিন পার্কের মধ্যে গদাইএর হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে কাঞ্চন-দি একটা বেঞ্চির ওপর বসালে। গত রাত্রের বই এর মধ্যে পড়া কতকগুলো কথা মনে পড়তেই গদাই একবার নড়েচড়ে সিধে হ'য়ে বসে ফস্ ক'রে ব'লে ফেল্লে—'আচ্ছা, কাঞ্চন-দি, আপনার কি মনে হয়, একনিষ্ঠ প্রেম ব'লে কোনও জিনিস পৃথিবীতে বাস্তবিকই আছে, না শুধুই মানুষের উর্বর মস্তকের কল্পনামাত্র।'

গদাইকে কাঞ্চন-দির কেমন ভাল লাগত। তার পাগলাটে ভাব, তার আলগোছা ঢিলে ঢিলে কথা, তার কথা বলার সহজ-সরল ভঙ্গী, অথচ বিচার-বুদ্ধির প্রখরতা, মুখের একটা স্বাভাবিক কারুণ্য—সব জড়িয়ে কাঞ্চন-দির চোখে বড় মধুর ঠেকত। গদাইএর কথায় কাঞ্চন-দি প্রথমটা একটু অবাক্ হ'ল, পরে অল্প একটু হেসে বল্লে—'গদাই, ব্যাপার কি, কেউ ছেলেমানুষ পেয়ে তোমাকে ঠকালে না কি?'

গদাই একটু সন্ত্রস্ত হ'য়ে বললে—'নাঃ, এ কোনও ঘটনা-সম্পর্কে নয়, কাল রাতে একটা বইএ পড়ছিলুম—'

কাঞ্চন-দি গদাইএর ডান হাতখানি নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে বললে—

'ওঃ তাই ভাল।' একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—'কি জান গদাই, ব্যাপারটা কিছু গুরুতর। প্রথম কথা, একনিষ্ঠ-প্রেম বলতে তুমি কি বোঝ?'

গদাই অবিবাহিত, অল্পবয়সী যুবক প্রেম-সম্বন্ধে বইএ পড়া ছাড়া তার কোন অভিজ্ঞতাই নেই, খুব বেশী ভেবে কথা বলার অভ্যাসও তার নেই। গম্ভীরভাবে বললে—'আমি বুঝি এই যে—যে প্রেমে একজন,আর একজনের জন্যে সর্ব্বদাই উন্মুখ হ'য়ে থাকবে,দেহে,মনে,প্রাণে,কর্ম্মে,চিন্তায়—'

কাঞ্চন-দি হঠাৎ খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। পরে গদাইএর হাতের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বললে—'সর্ব্বনাশ! এ প্রেম তুমি পেলে কোথায়। এ যে ঠাকুর দেবতার ব্যাপার। এ যে একেবারে নীরেট খাঁটী সোনা কোথাও খাদ নেই, কোথাও ফাঁক নেই, এসবে কোথাও চাওয়া নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, বিরহ নেই, হা হুতাশ নেই, এমন কি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পায়, এ শুধু দেবতার-সম্পর্কে কাজে লাগে, মানুষের কাজে লাগে না।'

গদাই একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে—'তা হ'লে কি বলেন, ওটা মানুষের শুধু কল্পনা, অথচ এই কল্পনার পেছনেই মানুষ যুগ যুগ ধরে ছুটছে, আর এই কাল্পনিক ভিত্তির ওপরেই আমাদের দেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ-সাহিত্য খাড়া হ'য়ে আছে।'

কাঞ্চন-দি একটু চুপ করে থেকে বললে—"দেখ গদাই এসম্বন্ধে আমার বেশী কিছু জানা নেই, তোমার কথার ঠিক জবাব দিতে পারব কি না জানি না তবে আমার মনে হয়, তুমি যা বলছ তা সত্যি। যুগ যুগ ধরে মানুষ এই কল্পনার পেছনে ছুট্‌ছে এবং হতাশার দুঃখভোগও কচ্ছে-এমনই এর মোহ। যারা ছুট্‌ছে তাদেরও দুঃখ ভোগ হ'চ্ছে, আর যারা না ছুট্‌ছে তাদেরও অল্পে সন্তুষ্ট থাকার এবং জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ভোগ না করার দুঃখভোগ হচ্ছে। তবে সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে—আমরা দু দল লোক দেখতে পাই। যারা চালাকের দলে তারা ছোটে না, তারা একদিক দিয়ে প্রেমের নামে যেটুকু পায়, তাইতেই সন্তুষ্ট, বাকিটুকুর জন্যে গোল বাধায় না। আর যারা গোল বাধায় তারাই মরে,—হয় আত্মহত্যা করে, না হয় স্ত্রী-হত্যা করে, না হয় পুত্র-হত্যা করে, না হয় উন্মাদ হ'য়ে পড়ে, সংসারে বীতরাগ হ'য়ে চলে যায়। আর যারা খুব বেশী সহিষ্ণু তারা সারা জীবনই ভেতরে ভেতরে পুড়ে মরে, বাইরে আত্মীয় বন্ধু, সমাজ, সকলের চোখে ঠিক থাকে।

এই গেল একদল লোক। আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা, 'সব পেয়েছি' এবং 'বেশ আছি' ব'লে,নিজেদের অজ্ঞাতসারে প্রবঞ্চিত হয় এবং সুখেই জীবন কাটায়।"

'আমি ঠিক বুঝলুম না কাঞ্চন-দি। ধরুন, আপনার কথায় চালাক লোক যারা, তারা প্রেমের নামে কি পায়, কতটুকুই বা পায়, আর কতটুকুর জন্যেই বা গোল বাধায় না।'

কাঞ্চন-দি পাশের একটা বাহারি-পাতার গাছের ডগার সবুজ রংএর কচি তুল্‌তুলে পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে গদাইএর হাতের ওপর বুলোতে বুলোতে বললে—'দেখ গদাই, আমরা সাধারণতঃ যাদের 'হ্যাপি কপ্‌ল্' (সুখী-দম্পতী) বলি তারাই হ'চ্ছে চালাক লোকের দল। তারা মনে মনে বেশ বোঝে যে,

অনেক কিছুই তারা অপর পক্ষ থেকে পায় না এবং বুঝেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না, চোখ বুজে থাকে। এই দলের লোকেরা যা পায় তা অনেক রকমের হ'তে পারে ; কেউ কেবল 'ইনটেলেকচুয়াল প্লেজার' (বুদ্ধির উপভোগ্য সুখ) পেলেই সন্তুষ্ট,কেউ 'ফিজিক্যাল' (দৈহিক),কেউ 'সার্ভিস'(কাজ); কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই যা পায় তা হচ্ছে—কিছু কিছু করে এই তিনের সংমিশ্রণ। এই তিনের সংমিশ্রণের মধ্যে কোথাও প্রেমের ছোঁয়াচ থাকে, কোথাও বা তাও থাকে না। অথচ চালাক লোকের দল এই নিয়েই গর্ব্ব করে এবং প্রেমের ছোঁয়াচ থাকে না ব'লে দুঃখ করে না। তুমি যাকে একনিষ্ঠ-প্রেম বল তা পেতে হ'লে, কোনও পক্ষেরই কোনও দুর্ব্বলতাই থাকা চলবে না, অথচ মানুষ মাত্রেই দুর্ব্বলতায় ভর্ত্তি,—হয় বুদ্ধিতে, না হয় অর্থে, না হয় শরীরে, না হয় নৈতিক-সম্পর্কে এবং তোমার একনিষ্ঠতা পেতে হ'লে সবার ওপরে থাকা চাই স্বাভাবিক মানসিক সংগঠন, যার ওপর প্রেমের সুদৃঢ় ছাপ সহজেই পড়তে পারে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এসব দেখা যায় না সুতরাং সে কথা এখন থাক। তবে এই সব চালাক লোকের দলকে আমরা যতই 'হ্যাপি কপ্‌ল্' বলে বাহবা দিই না কেন, তারা বাইরে সুখের ভাণ করলেও তাদের মনের মধ্যে কোথায় যেন থেকে থেকে হঠাৎ একটুখানি অস্বস্তির সুর বেজে ওঠে। অথচ যে চালাক লোকের মনের এই অকিঞ্চিৎকর অস্বস্তিটুকু দিনে দিনে বিস্ফোটকের মত বড় হ'য়ে পেকে ওঠে তারাই আবার বোকার দলে পড়ে যায়।'

পায়ের ওপর কাপড়ের জল্‌জলে লাল রংএর পাড়টুকুর ওপর একফালি রোদ্দুর এসে অনেক্ষণ থেকে লেগে লেগে কাঞ্চন-দির পা দুটো তেতে উঠেছিল, পা দুটো সরিয়ে নিয়ে কাঞ্চন-দি একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে বললে—'এই ধর, অরুণের কথা-আমার স্বামী—তাঁকে তুমি দেখ নি। আমরা ছিলুম পাড়ার মধ্যে 'আইডিয়াল কপ্‌ল্' (আদর্শ স্বামী-স্ত্রী) ; বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ ক'রে এল, দিব্যি লম্বা-চওড়া সুপুরুষ,প্রচুর অর্থ—কোথাও কোন খুঁৎ নেই। আমি তাঁকে কোনদিন তাঁর বিলেতের জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করি নি, তিনিও আমার বিবাহের আগের খবর জানবার চেষ্টা করেন নি ; অর্থাৎ আমরা ছিলুম,যাকে বলে চালাক লোকের দলে। নিজের হাতে চা, রুটী, খাওয়া-দাওয়া যায় বেরুবার সময় তাঁর জুতোর ফিতেটা পর্য্যন্ত বেঁধে দিতুম, তিনিও তাঁর প্রতিদান যথেষ্টই দিয়েছেন। সমস্ত আমোদ-প্রমোদে সর্ব্বদাই দুজনে বেরুতাম, যখন একলা বেরুতেন, বিচ্ছেদটুকু পুষিয়ে দিতেন, আলিঙ্গনে আর চুম্বনে—যাক্ সে তুমি বুঝবে না—মোট কথা যাকে বলে আদর্শ চালাক। ক্ষিতীশকে বোধ হয়, তুমি চেন, লম্বা ছিপছিপে লোকটা, মাঝে মাঝে এখনও আমার বাড়ীতে আসে, সে আমার ছেলে বেলার বন্ধু। বিয়ের পরও বরাবরই এসেছে, তাঁর সঙ্গেও বেশ সদ্ভাব ছিল। কে জানত বিয়ের পর পাঁচটা বচ্ছর ধরে' অরুণের মনের মধ্যে কোথায় এক অস্বস্তির সুর একটু একটু ক'রে ঘনিয়ে উঠছে। একদিন সন্ধ্যার সময় ক্ষিতীশ আর আমি পাশাপাশি ব'সে গল্প করছি, তিনি কাজ থেকে ফিরলেন। আমি তখন ক্ষিতীশের সঙ্গে এক তর্কে মেতে উঠেছি। তাঁর শরীরটা ছিল অসুস্থ। কি বলেছেন শুনতে পাই নি। ব্যস্ সেই অস্বস্তির দাহ—যা এতদিন গুমিয়ে গুমিয়ে জ্বলে এসেছিল, হঠাৎ দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল। সেই রাত্রেই নিজের মাথায় গুলি মেরে আত্মহত্যা করলেন।

কাঞ্চন-দির গাল বেয়ে দুফোঁটা চোখের জল টপ্ টপ্ করে তার পায়ের ভেলভেটের স্যাণ্ডেলের ওপর পড়তেই গদাই চম্‌কে উঠল। অথচ কাঞ্চন-দির গলার আওয়াজের মধ্যে কোথাও কান্নার লেশমাত্র ছিল না। গদাই তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হ'য়ে হঠাৎ বললে—'ইস্, চুপ করুন, চুপ করুন, আর আমি শুনতে চাই না।'

সেদিনের অল্প কুয়াসা ভেদ ক'রে আসা সকালের প্রথম রোদটুকুর মত একটুখানি হেসে কাঞ্চন-দি বললে—'অথচ এই অস্বাস্তটুকু যে আমার মধ্যেও ছিল না তা নয়—কারণ তাঁর লুকোন ছোট্ট চামড়ার বাক্‌সর মধ্যে যে ক'খানি বিলেতের ফটো আছে তা যে কোনও স্ত্রীর পক্ষেই সত্যিসত্যিই অস্বাস্তকর হ'তে পারে। কিন্তু আমি র'য়ে গেলুম চালাকের দলেই, তিনি শুধু......'কথাটা অসমাপ্ত রেখেই কাঞ্চন-দি দাঁড়িয়ে উঠে বললে—'উঃ গদাই বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে, চায়ের সময় হ'য়ে গেল।'

হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়তেই কাঞ্চন-দি চীৎকার

করে উঠল এবং গদাইএর হাত ধরে প্রায় ছুটতে আরম্ভ ক'রে দিলে। গদাই জোরে জোরে চলতে চলতেই বললে—'ব্যাপার কি?'

কাঞ্চন-দি সেই রকম ভাবেই গদাইকে টান্‌তে টান্‌তে অল্প একটু হেসে বললে—'চট্‌পট্‌ চল, আমার বাড়ী গেলেই সব ব্যাপার বুঝতে পারবে।'

দুই

গদাই কাঞ্চন-দির বৈঠকখানায় ঢুকেই অল্প হেসে তাকে কি বলতে যাচ্ছিল, কোণের চেয়ারে উপবিষ্ট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের এক তন্বী যুবতীকে দেখে থেমে গেল। ঘরের মধ্যে এদের আগমন টের পেয়েও যুবতীটী মুখ তুলে চাইলে না, হাতের খবরের কাগজে যেমন নিবিষ্ট ছিল তেমনই রইল। কাঞ্চন-দি হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে সস্নেহে রেণুর মুখটা তুলে ধরে তার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নীচু গলায় বললে—'নে, অভিমান রাখ, দশ মিনিট দেরী হ'য়েছে তো মেয়ের রাগ দেখে আর বাঁচি না।' বলার সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চন-দি রেণুর হাতের কাগজখানা কেড়ে নিলে।

রেণু ফিক্ করে হেসে ফেলে বল্‌ল—'আধঘণ্টার ওপর ব'সে আছি তা জান?'

'খুব জানি। আর তোকে আমার এক অকৃত্রিম বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই' বলে রেণুর হাত ধরে টেনে এনে গদাইএর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বল্‌লে—'গদাই, ইনি হচ্ছেন আমার বোন, পরম বন্ধু—'

রেণু কাঞ্চন-দির হাতের উপর একটা চিম্‌টী কেটে বল্‌লে 'আঃ, কি কর কাঞ্চন-দি, ঢের হয়েচে। আর ওঁর পরিচয় তোমার চিঠিতে, মুখে অনেকবারই শুনেছি; গদাইবাবু নমস্কার।"

গদাই ব্যস্ত হ'য়ে স্মিতহাস্যে হাত তুলে নমস্কার করলে।

কাঞ্চন-দি বললে—'ইনি বি-এ, পাস ক'রে রেঙ্গুণে মাষ্টারি করতে যান, উনি যা কিছু ভাল, সমস্তই ঘৃণার চ'খে দেখেন, ভালবাসার ওপর ওঁর বিশ্বাস নেই, রেঙ্গুণে থাকতে এক ডাক্তার ওঁকে বিবাহ করবার জন্তে প্রায় পাগল হ'বার উপক্রম হ'য়েছিল, তারই জ্বালায় ও পালাতে পথ পায় নি, তাই আত্মরক্ষার্থে কলকাতায় পালিয়ে এসেছে। এখন এখানে 'লোন আফিস' (কর্জ্জ দেবার আফিস) খুলে দিব্যি ব্যবসা চালাচ্ছে।—আচ্ছা ততক্ষণ দুজনে গল্প কর, আমি চায়ের জোগাড় দেখি—' ব'লে কাঞ্চন-দি ভেতরের দিকে চলে গেলেন।

রেণু মেয়েটীর প্রখরবুদ্ধি মুখে-চোখে ফুটে বেরুচ্ছে, খুব সুন্দরী না হ'লেও সে মুখ, সে চোখ একবার দেখলে কিছুতেই ভুলতে পারা যায় না, ঠোঁটের কুঞ্চনটুকুতে এমনি তার করুণ-ব্যঞ্জনা। সে স্বভাবতঃই একটু চঞ্চল, বেশী কথা বলে। আবার তার কথা বলার মধ্যে একটু তিক্ততা মেশান থাকবেই, লোককে হঠাৎ অপ্রতিভ করতে সে অদ্বিতীয়া। তবে তার বাচালতা কোনদিন সভ্যতার গণ্ডী পার হ'য়ে চলে না।

গদাইএর হাতের ওপর নজর পড়তেই রেণু বললে—'আপনার আংটীর ওটা কি পাথর, 'ক্যাট্‌স্ আই' (বৈদূর্য্য-মণি) না?'

গদাই আংটীই পরে, কোন্‌টা কি তা' তার জানবার দরকার লাগে না। থতমত খেয়ে বললে—'কি জানি বোধ হয়—'

রেণু প্রায় ধমকের মত সুরেই বললে—"যদি জানেনই না তবে 'বোধ হয়' ব'লে কেন আর বিড়ম্বনা করছেন, আন্দাজে কিছু বলার চেষ্টা না করাই ভাল।"

গদাই অবাক্। গদাই কখনও ভাবতে পারে নি, এক মুহূর্ত্তের আলাপে কোনও যুবতী ঠিক এই রকমভাবে কোনও পুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারে। তার মনে মনে ঘৃণাও হ'ল, ভয়ও হ'ল। বুক পকেটের কলমটার ক্লিপ্‌এ ছোট্ট একটু লাল রংএর পাথর বসান আছে মনে পড়তেই, গদাই আস্তে আস্তে কলমটী খুলে পকেটের মধ্যে ফেলে দিলে। রেণু আড়চোখে দেখে নিয়ে অল্প একটু মুখটিপে হেসে বললে—'ক্যাট্‌স আই' পাথরগুলো কিসের পরিচয় দেয় জানেন? জানেন না বোধ হয়, জানলে পরতেন না।'

গদাইএর ভারি রাগ হ'ল, তার ইচ্ছা হ'ল বলে,—আপনি যে বোধ হয় বললেন; কিন্তু বিরক্তি চাপা দিয়ে বললে—'কি আপনিই বলুন না।'

'জেলাসি—হিংসা।'

'এরি ভেতর তোদের মধ্যে হিংসা প্রবেশ ক'রে গেছে দেখছি যে' ব'লে কাঞ্চন-দি সবুজ খদ্দরের পর্দা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকল। সামনের টিপয়ের ওপর হাতের আহার্য্য নামিয়ে রেখে বললে—'আয় রেণু, এস গদাই, এবার এগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক্।' সকালের এই আহার্য্যগুলি আকারে এবং প্রকারে অপর্য্যাপ্ত না হ'লেও অপ্রচুর নয়। দুধ, চা, কফি, বিস্কুট, পাঁপরভাজা, সন্দেশ। তিন জনে মিলে এক সঙ্গে যথোচিত সদ্ব্যবহার করতে লাগল। কাঞ্চন-দি পাঁপরভাজার এক টুকরো মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে বললে—'দেখ্ রেণী, আজ সকালেই গদাইএর সঙ্গে একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা হ'চ্ছিল।' তারপর সমস্ত আলোচনা টুকু রেণুকে বুঝিয়ে দিয়ে বললে—

'এখন 'যারা সব পেয়েছি' বলে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই প্রবঞ্চিত হয়, অথচ আমরণ শান্তিতেই জীবন কাটায় তাদেরই কথা বলি। শুনেছি বাবার দেশ-সম্পর্কে এক খুড়ো ছিলেন, তিনি দেশেই থাকতেন, ডকে কাজ করতেন মাহিনা ছিল তাঁর সাতাশ টাকা; বাবার খুড়ীর হাতের দুগাছি শাঁখায় জড়ান সোণার পাতটুকু ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁদের আর্থিক অভাব ছিল চতুর্দ্দিকে, কিন্তু মনের অমিল একদিনের তরেও হয় নি। সাত আটটা ছেলেপুলে হ'য়েছিল। খুড়ো মারা গেলেন ৭৩ বৎসর বয়সে, খুড়ী মারা গেলেন ৬০ বৎসর বয়সে—তবে একই দিনে। খুড়ো অনেক দিন থেকেই রোগে ভুগছিলেন; খুড়ী জানতেন, খুড়ো আর বেশীদিন বাঁচবেন না—তাঁরও কাজ হ'ল—অনাহারে অনিদ্রায় থাকা। খুড়ী ইদানীং খুড়োর পাশেই শু'য়ে থাকতেন, নড়বার পর্য্যন্ত তাঁর আর ক্ষমতা ছিল না। সে না কি এক দেখবার দৃশ্য ছিল। পাড়ার লোকে এসে দুজনেরই মুখে জল দিয়ে যেত। খুড়ো মারা গেলেন সকালে, খুড়ী মারা গেলেন রাত্রে। তিনি তাঁর ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী কারও মুখ তাকিয়েই বাঁচলেন না।" একটু থেমে কাঞ্চন-দি হেসে বললে—'গদাই, তুমি যে একনিষ্ঠ-প্রেমের কথা বলছিলে তার এদের সঙ্গে বাইরেটার অনেকটা মিল আছে বলতে হ'বে।'

গদাই এতক্ষণ প্রশংসমান দৃষ্টিতে কাঞ্চন-দির সমস্ত কথাগুলি উদ্গ্রীব হ'য়ে শুনছিল। কাঞ্চন-দির কথার প্রত্যুত্তরে বেশ একটু উত্তেজিত হ'য়েই বললে—'কি বলছেন, বাইরের মিল? শুধু বাইরে কেন, ভেতর-বাইরে সব দিক থেকেই একনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে। কে বলে অসম্ভব? এই তো মানুষের মধ্যেই সম্ভব হ'য়েছিল এবং হ'বেও। এ ছাড়া আর কোথায় যে একনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে আমি তো ভেবেই পাই না কাঞ্চন-দি। এ তো শুধু মানুষের কল্পনা নয়, এ যে মানুষের অভিজ্ঞতা, তা যদি না হ'ত মানুষ এর পেছনে আহাম্মকের মত যুগ-যুগ ধরে কিছুতেই ছুটত না।'

কাঞ্চন-দি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে—'দাঁড়াও দাঁড়াও, এখনও সবটুকু বলা হয় নি। এঁদের দু'জনেরই বুদ্ধি ছিল একেবারেই ভোঁতা, 'ইন্টেলেকচুয়াল প্লেসার' বলে কোনও জিনিসের স্বাদই এরা জীবনে পায় নি, আজীবন 'মেকানিক্যালি' (যন্ত্রের মত) চলে এসেছে, চাকরী করা, রান্নাবান্না করা, সেবা- শুশ্রূষা করা, আর সংসার করা, এ ছাড়া —'

গদাই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে—'তাঁদের জীবনে ওর চেয়ে বেশী দরকার ছিল না 'ইন্টেলেকচুয়াল' আনন্দ নাই বা হ'ল। সংসারের গয়লার হিসেব, মুদির দেনাশোধ, ছেলের অন্নপ্রাশনের ফর্দ্দ, মেয়ের বিবাহে উপবাস—তাই ছিল তাদের 'ইন্টেলেকচুয়াল' আনন্দ, তার মধ্যেই তারা প্রচুর রসানুভূতি পেয়েছেন, নাই বা আলাদা করে আর্টের চর্চ্চা করলেন, নাই বা আলাদা করে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে সৌন্দর্য্য উপভোগ করলেন—তাতেই বা কি এসে যায়।'

কাঞ্চন-দি অল্প একটু হেসে বললে—'দাঁড়াও, দাঁড়াও গদাই অত উত্তেজিত হ'য়োনা, এখনও বলার একটু খানি বাকি আছে। এই একনিষ্ঠ প্রেমের নিখুঁত ছবির অন্তরালে বিশেষ রকমের একটু যে খুঁত ছিল তার প্রমাণ খুঁজলে এখনও পাওয়া যায়।'

গদাইএর মুখের সমস্ত রক্ত এক নিমিষেই কে যেন শুষে নিলে, সাপের গায়ে পা পড়লে মানুষ যেমন আতঙ্কে এবং ঘৃণায় শিউরে উঠে পেছিয়ে আসে, গদাই তেমনি করেই টেবিল ছেড়ে চেয়ারে ঠেসান দিলে।

রেণু গদাইএর মুখের দিকে তাকিয়ে সকলের অলক্ষ্যে একটু ফিক্ করে হেসে ফেলে বললে— 'তাতে কি এসে যায় কাঞ্চন-দি, তবুও তো ওরা চালাক লোকের দলেই ছিল, সারাজীবনটা বেশ সুখেই কাটিয়ে গেল।'

কাঞ্চন দি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে—"উঁহু, এরা নিজেদের 'অজ্ঞাতসারে প্রবঞ্চিত' এবং 'সব পেয়েছি'—ব'লে সন্তুষ্ট। তবে তোর শেষ কথাটা ঠিক, বরাবর সুখেই কাটিয়ে গেল। তবে তাদের ধারণায় যতটুকু সুখ, ততটুকু।"

কাঞ্চন-দির একটু আগেকার বর্ণিত দেশসম্পর্কে বাপের খুড়ো-খুড়ীর ব্যাপারটা গদাইএর সহজ-সরল নিষ্কলঙ্ক চিত্তকে অত্যধিক ক্ষুণ্ণ করেছিল, সে তদবস্থায় খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল, রেণুদের কথোপকথনে তার যোগ দেবার আর প্রবৃত্তি রইল না। হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়তেই আবার একটু সিধে হ'য়ে বসে বললে—'আচ্ছা কাঞ্চন-দি—' রেণু তার মুখের ওপর বড় বড় উজ্জ্বল টানা চোখ দুটোকে একাগ্রভাবে নিবদ্ধ করে রেখেছে। গদাইএর কথা অসমাপ্তই রয়ে গেল। গদাই তাড়াতাড়ি হাত তুলে নমস্কার ক'রে চলে গেল।

তিন

গদাইএর মামা বড়লোকও নয় গরীব লোকও নয়, তবে তার তিনকুলে গদাই ছাড়া আর কেউ নেই, নিজেও অবিবাহিত। কলকাতার ছোট বাড়ী। কিছু নগদ টাকা, তারই [illegible] গদাইএর পড়ার খরচ, খাওয়া-দাওয়া, বেশ স্বচ্ছলভাবেই চলে। গদাইএর মামা হেমন্তবাবু নিজে খুব গম্ভীর হ'লেও গদাইএর প্রতি তাঁর স্নেহ গভীর এবং অকৃত্রিম। গদাই বড় হওয়ার পর থেকে তার কোনও কাজের ওপর তিনি কোনও কথাই বলেন না। আর কোনও কিছু বলেন না বলেই গদাই হেমন্তবাবুকে একটু বেশী করেই ভয় করে। হেমন্তবাবু এম-এ পাশ করে সেই যে বসে রইলেন, তাঁকে আর কেউ ঘরের বাইরে দেখলে না। [illegible] অদ্ভুত বাতিকগ্রস্ত মানুষ। তিনি বৎসরের মধ্যে [illegible] বার স্নান করেন, আহার করেন প্রচুর, তাঁর [illegible] ছোট্ট লাইব্রেরীটাই তাঁর সর্বস্ব। এই লাইব্রেরীর মধ্যে না কি গণিতশাস্ত্রের বই বেশী। তাঁর বরাবরের অভ্যাস, ঠিক দশটার সময় তিনি গদাইকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসবেন। গদাই যেখানেই থাকুক, ঠিক দশটার মধ্যে এসে হাজির হয়। আগে দুদিন কাঞ্চন-দির বাড়ী থেকে আসতে দেরী হওয়ায় গদাই ঠিক সময়ে এসে হাজির হ'তে পারে নি। মামা একবার মাত্র গদাইএর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—"কোথায় যাও?" গদাই ঘাড় হেঁট করে মাথা চুলকে অস্পষ্টভাবে কি একটা জবাব দিয়েছিল, তারপর আর কোনও কথাই হয় নি।

সে দিন গদাই কাঞ্চন-দির বাড়ী থেকে বেরিয়েই রাস্তার আসপাশের দোকানের ঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে চলল। হঠাৎ মুদির দোকানের একটা ঘড়িতে নজর পড়তেই দেখলে—সাড়ে দশটা। তার মনে মনে ভয়ও হ'ল, অনুতাপও হ'ল—অকারণেই সে তার মামাকে অসন্তুষ্ট করছে। মামা তার জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছেন। গদাই তার সমস্ত শক্তি জড় করে বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে। সেদিনও তার দেরী হ'য়েছিল, সেদিনও তার ভয় হ'য়েছিল কিন্তু কেন কে জানে আজকার এই দেরী হওয়ার মধ্যে কোথায় যেন একটু আনন্দের সুর বাজছে। অথচ এই আনন্দ কিসের, এর উৎসই বা কোথায়—তা' তলিয়ে দেখবার তার অবসর হ'ল না। হঠাৎ গেটের সামনে মামাকে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে চমকে উঠল। তার এই ছাব্বিশ বৎসরের জীবনের মধ্যে সে তার মামাকে বাড়ীর বাইরে এতদূর এগিয়ে আসতে আজ এই প্রথম দেখলে। সে মামার সামনে এসে ঘাড় হেঁট ক'রে থমকে দাড়িয়ে পড়ল। হেমন্তবাবু কোনও কথা না ব'লে সটান বাড়ীর মধ্যে ঢুকে এলেন। দোতলার কোণের ঘরটা চিরকাল তালাবদ্ধ থাকে। গদাই মামার সঙ্গে এত কাল এই বাড়ীতে বাস করেও জানে না সে ঘরে কি আছে।

আজ হঠাৎ হেমন্তবাবু যখন গদাইকে সঙ্গে ক'রে এনে দোতলার কোণের ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, গদাই এক অজ্ঞাত ভয়ে মনে মনে শিউরে উঠল—তার স্বল্পভাষী গম্ভীর-প্রকৃতি মামা হয় তো অত্যধিক চটেছেন—হয় তো বা এই ঘরে তালা বন্ধ করে রাখবেন, হয় তো বা এই ঘরে ঘোড়ার চাবুক আছে।

কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে এবং মামার মুখের কথা শুনে, আর দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে সে কেঁদে ফেললে। কি অপরাধ সে করেছে যার জন্য এতবড় শপথ তাকে করতে হ'বে। ঘরের দরজা খুলতেই দু তিনটা চামচিকে উড়ে গেল। হেমন্তবাবু সমস্ত জানালা খুলে দিয়ে বললে,—'তাকাও দিকিন, দেওয়ালের দিকে।' গদাই ঘরের চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে গেল—দেওয়ালের কোথাও ফাঁক নেই। তার মামার এবং তার নিজের আত্মীয় ও আত্মীয়ার ছোট ছোট অয়েলপেন্টিং। এক দিকের একটা মাঝারি ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে হেমন্তবাবু বললেন—'নলিনী, তোমার মা, চিনতে পার?' গদাই এর মনটার ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠল। তার চোখ দুটো জলে ভ'রে এল, ঘাড় নেড়ে বলল—'হ্যাঁ—'

হেমন্তবাবু বললেন—'দিব্যি কর, আর যাবে না।'

গদাই ঘাড় হেঁট করে বললে—'কোথায়?'

'তা জানি না শপথ কর।'

গদাই এবার বিরক্ত হ'ল—এ মন্দ কথা নয়, কি জন্যে শপথ করব তা জানব না, অথচ শপথ কর।—বিরক্ত হ'য়ে বললে—'মাপ করুন মামা—কোথায়, কেন, কিসের জন্য—না জানলে আমি শপথ করব না।'

গদাই আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে গেল। হেমন্তবাবু মিনিটটাক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, পুনরায় ঘরটাকে তালা বন্ধ করে নীচে নেমে গেলেন।

লোকে বলে, হেমন্তবাবু লোকটা না কি একটু পাগলাটে ধরণের, আর ওঁরই সমবয়সী যাঁরা তাঁরা কেউ কেউ অন্য কথা বলেন। তাঁরা বলেন—যে বছর গণিতশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে বেরিয়ে এলেন হেমন্তবাবু, সেই সময়ে তাঁদের সঙ্গে একজন ব্রাহ্ম মেয়ে পড়ত। সে না কি প্রখর বুদ্ধিমতী এবং সুন্দরী। হেমন্তবাবু তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলেন। হেমন্তবাবু একটু অন্যমনস্ক ধরণের লোক হ'লেও জীবনে দু'টো জিনিস অকৃত্রিমভাবে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন—এক গণিতশাস্ত্র, অপর—সেই ব্রাহ্মিকা। সেই মেয়েটীর লোভ ছিল কিন্তু ঠিক হেমন্তবাবুর ওপর ততটা নয়, যতটা হেমন্তবাবুর বিদ্যার ও বুদ্ধির ওপর; তাই তার ভালবাসা হ'ল অপলকা। বছর দু'য়েকের মধ্যেই মেয়েটীও হেমন্তবাবুর বিদ্যার সাহায্য নিয়ে বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ল এবং সেই সঙ্গে হেমন্তবাবুর কাছে সে হ'য়ে গেল দুর্লভ এবং দুষ্প্রাপ্য। তারপর শোনা গেল সে অপর একজনকে বিবাহ করে বেশ সুখেই আছে। এই দুবৎসর হেমন্তবাবু কিন্তু অনেক কিছুই ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর বাঁধা-ধরা চলা-ফেরা, আহার-নিদ্রা—সবই উলট পালট হ'য়ে গিয়েছিল। তাঁর মা তখন জীবিত। তাঁর মার প্রতিদিনের নিষেধসত্ত্বেও সে ঝোড়ো হাওয়ার মত বেরিয়ে যেত। তখন সে কোনও দিকে, কোনও কথায়, কোনও অনুরোধে কাণ দিত না, আপন মনে ছুটে যেত। নিজের জীবনের এই সব দুঃস্বপ্নময় দিনগুলির কথা তাঁর মনে পড়ল, ভয় হ'ল, পাছে গদাইএর যৌবন বুঝিবা কোনও এক বিদুষীর লোভে হা-হুতাশের মধ্যে পড়ে ব্যর্থ হ'য়ে ওঠে। তাই গদাইএর প্রতি তাঁর এত সাবধানতা, তাই তার শপথের জন্য এত আয়োজন।

গদাই কিন্তু অনেক ভেবেও এতবড় শপথের প্রয়োজনীয়তা কোনও দিক থেকেই খুঁজে পেলে না। তাই সে কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারলে না তার স্বল্পভাষী এই মামাটীর হঠাৎ এত বেশী রকম বিচলিত হ'বার কারণটা কি। সে হঠাৎ এক সময়ে আপন মনে ঠিক করে নিলে তাঁর আহারের সময় অনুপস্থিতিই তার স্নেহপরায়ণ মামার বুকে বড় বেশী করেই বা বুঝি বাজে। তাই সে তাঁর আহারের সময় সম্বন্ধে খুব বেশী সতর্ক হ'য়ে উঠ্‌ল এবং পূর্ব্বের মতই কাঞ্চন-দির বাড়ী যাতায়াত করতে লাগল।

কাঞ্চন-দির বাড়ীর ফটকে ঢুকেই বাঁ-দিকে কামিনীফুলের গাছ, তারই একটা ছোট ঝোপ এবং তারই গায়ে ছোট ছোট সীজন্ ফ্লাওয়ারের গাছে নানা বিচিত্র রংএর ফুল ফুটে আছে। তাদের কচি পাপড়ির ওপর গত রাত্রের শিশির পড়ে ফুলগুলিকে ম্রিয়মাণ করে তুলেছে। গদাই অন্যমনস্কভাবে পাপড়িগুলির ওপর হাত বুলিয়ে নিয়ে আঙুলের ডগায় শিশির বিন্দুগুলি স্পর্শ করতে লাগল। পরে কি ভেবে সেইখান থেকেই ডাকলে—'কাঞ্চন-দি!'

বাইরের দিকের জানালা থেকে কাঞ্চনদির উৎফুল্ল মুখখানি বেরিয়ে এল—ব'লে—'এই যে আমিও প্রস্তুত, চল,

এক মিনিট।' তারপর কাঞ্চন-দি বেরিয়ে এসে গদাইএর হাতখানি ব্যগ্রভাবে নিজের মুঠোর ভেতর নিয়ে বললে '—তুমি আজ একটু শীগ্‌গির উঠেছ গদাই।'

গদাই একটু অন্যমনস্কভাবেই জবাব—দিলে 'হ্যাঁ।' তারপর দুজনেই পার্কের দিকে চলল।

কিছুক্ষণ বেড়াবার পর অল্প একটু রোদ উঠতেই গদাইএর অন্যমনস্কতার কারণটাকে লক্ষ্য করেই কাঞ্চন-দি বললে—'চল গদাই আজ রেণুর ওখানে যাওয়া যাক। তারপর আধঘণ্টা পরে দুজনে যখন রেণুর বাড়ী এসে হাজির হ'ল রেণু তখন তার আফিসঘরে মহাব্যস্ত। আফিস-কোয়ার্টারের একটা বাড়ীর দোতলার কখানি ঘর; কোণের দুখানি তার নিজের ব্যবহারের, পরের দুখানা বড় বড় ঘর তার অফিসের 'ষ্টোর রুম' (গুদামঘর)। তার পরের খানি তার অফিস ঘর।

রেণু অফিস-ঘরের টেবিলের সামনে চেয়ারের ওপর ব'সে আপন মনে কি কাজ করছে—তার সামনে বড় বড় খাতা খোলা ও ছড়ান। কাঞ্চন-দি ঘরে ঢুকেই বললে "ওরে বাবা, কি কাণ্ড তোর, এত সকালেই এ সব কি ফেঁদেছিস ?—'

রেণু একবারখানি মুখ তুলে আবার কাজে মন দিয়ে বললে—"আর বল কেন ? ইন্‌কমের (আয়ের) নামে অষ্টরম্ভা এদিকে ট্যাক্স দাও—রিটার্ণ তৈরী করছি, যদি কিছু কম করতে পারি।"

সামনের টেবিলের ওপর এক কাপ চা ধোঁয়া উড়িয়ে কখন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। ওদিকের ষ্টোভে একটা কেৎলি চাপান। কাঞ্চন-দি চ'য়ের বাটীটার দিকে তাকিয়ে বললে—'চা যে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে দেখছি।'

।—'আর চা—এখন আমাকে না তা'রা ঠাণ্ডা ক'রে দেয়, কাঞ্চন-দি! যা শত্রুতা করছে তা আর বলবার নয়—' তারপর গদাইএর দিকে তাকিয়ে বললে—'কি বলুন—উঃ কি ক্যালাদ, আপনার নামটাও ছাই ভুলে গেলুম, মাথা একদম গোলমাল হ'য়ে গেছে—দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনার নাম "ক্যাট্‌স্‌-আই" না ?'

কাঞ্চন-দি রেণুর দুষ্টুমি বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বললে—'গদাইবাবু, গদাইবাবু!'

গদাই কখনও কল্পনা করতে পারে নি যে, বাস্তবিকই বাঙ্গালীর ঘরের কোনও অল্পবয়সী যুবতী মেয়ে ঠিক এ ভাবে অফিস খুলে ব্যবসা চালাতে পারে। সে কিছুতেই বিশ্বাস করত না আজ যদি না সে নিজের চোখে দেখত। গদাইএর মন এই কর্ম্মকুশলা মেয়েটার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করলে। রেণুর কথায় মোটেই ক্ষুণ্ণ হ'ল না।

একটু পরেই একজন বলিষ্ঠ সুপুরুষ যুবক হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল। তার শার্টের হাত গুটোন, মালকোচা মারা। সে রেণুর দিকে তাকিয়ে হাত তুলে নমস্কার ক'রে কোণের টেবিলের সামনে গিয়ে বসল। সামনের টাইপরাইটারের ঢাকনাটা খুলতেই রেণু বললে—'দেখুন, একটু সাবধানে টাইপ করবেন, একটু শীগ্‌গির চাই, আজকে শেষ তারিখ—' বলে হাতের একতাড়া খসড়া কাগজ তার দিকে এগিয়ে দিলে। তারপর একহাতে কাঞ্চন-দিকে আর এক হাতে গদাইকে ধরে বললে—'চল আমরা ওঘরে যাই।'

কাঞ্চন-দি ওঘরে যেতে যেতে বললে 'ঐ বুঝি তোর টাইপিষ্ট, চেহারা-খানা তো দিব্যি ষণ্ডামার্কা কাজকর্ম্মে কেমন ? বোধ হয় একেবারে নীরেট।'

রেণু বললে—'না ভাই, ঠিক উল্টো খুব চটপটে, বুদ্ধিমানও বটে, তবে—' রেণু থেমে গেল।

কাঞ্চন-দি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলে—'তবে কি ?'

রেণু হাসতে হাসতে বললে—'সব শিয়ালের যা রা—ওরও তাই। ওর আগে আর একটা ছোকরা ছিল—সে ছিল যেমন বুদ্ধিমান, তেমনই ওস্তাদ—সে ছিল আমার ডানহাত, অর্ডার জোগাড় করতেও যেমন, টাইপ্‌ করতেও তেমনি, ছ' মাসের মধ্যে আমার ব্যবসার অনেক উন্নতি করে দিয়েছিল আরও কিছু দিন থাকলে, আমার বড় উপকার হ'ত। কিন্তু তা তো হ'বার নয়, বাধ্য হ'য়ে তাড়াতে হ'ল। আমি কোথায় ফিরিঙ্গি খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইছি, তা তাঁর সহ্য হ'বে না। আমি "চ্যাপ্‌ম্যান কোং"র কাজ বাগাবার জন্যে তার বড়বাবুর সঙ্গে একদিন বায়স্কোপে গেছি—তার রাগ, চোখ রাঙ্গানি। আ মলো যা—তোর তাতে কি, তুই মাইনে পাবি কাজ করবি, তোর অত গাত্রদাহ কিসের, তুই কি এখানে 'লভ্‌' (প্রেম) করতে এসেছিস না কি ? আমি ত

একদিন গম্ভীরভাবে বারণ করলুম, তৃতীয় দিন এক মাসের মাইনে দিয়ে বিদায় দিলুম।' সে মাইনে ফেলে রেখে চলে গেল। ইনিও দেখছি—আজ ক'দিন হ'ল একই রোগে আক্রান্ত হ'য়েছেন—এঁরা শুধু নিজেদের সমাজকে দেখে দেখে দৃষ্টি ছোট করে ফেলেছে, নতুবা এদের বেশ বুদ্ধিও আছে, ভদ্রও বটে—মোট কথা আর সব দিকেই ভাল।'

গদাই রেণুর নির্ভীক কথাগুলো শুনেই মনে মনে একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠল। মনে মনে সে সাবধান হ'ল—সে যেন ঐ দুটো বেকুবের মত এমন কিছু না বলে বসে যার দ্বারা রেণুর মনে অশ্রদ্ধা জাগে।

পাশের ঘরের টেবিলের সামনে বসে তিনজনে যখন চা আর রুটীর সদ্ব্যবহার করতে লাগল, হঠাৎ রেণু হাতে খানিকটা পাউরুটীর টুকরো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অন্যমনস্ক-ভাবে বললে—'আচ্ছা কাঞ্চন-দি—সেদিনের তোমাদের তর্কের কথা মনে আছে তো। রেঙ্গুণে থাকতে সেখানকার একটা ঘটনার কথা আমার বারবার মনে পড়ছে, তোমাদের কাছে বলি, গদাইবাবু আর তুমি, দুজনেই বিচার ক'রে বল—সেটা একনিষ্ঠতা, কি দ্বিনিষ্ঠতা, কি শতনিষ্ঠতা—' বলে রেণু ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে একটু থেমে আবার বলতে লাগল—'কোনও বিশেষ কারণে আমাকে দিনকতক রেঙ্গুণ হাঁসপাতালে থাকতে হ'য়েছিল—সেখানকার একটী নার্স, নাম তার যাই হ'ক—তার কিছু রূপ ছিল, গুণও ছিল যথেষ্ট। প্রত্যেক রোগীটাকে সে তার নিজের ছেলে-মেয়ের মত করেই দেখত, শুশ্রূষা করত—আর সব চেয়ে মজা ছিল এই যে, তার হাতের সব রোগী সেরে উঠত—এক বছরের মধ্যেই হাঁসপাতালে নাম করেছিল যথেষ্ট। সকলের মুখেই শুনতাম—সে না কি এক বড় ঘরেরই মেয়ে, কোনও এক বিশেষ কারণে সে তার বাপ, মা, ভাই-বোন সব ত্যাগ করে ইচ্ছা করেই হাঁসপাতালে সেবাব্রত অবলম্বন করেছে। তার চোখে-মুখে, চলনে বেশ একটা 'রোমাণ্টিক' ভাব ফুটে উঠত। সত্যিই ফুটে উঠত কি না জানি না, তবে আমার ঐরকম মনে হ'ত এবং সেই কারণেই আমার তাকে বেশ ভাল লাগত।

একদিন সন্ধ্যার সময় বারান্দায় ওদিকে একখানা ইজিচেয়ারে ব'সে আছি, সামনে উদার এক বিস্তৃত মাঠ, তারই শেষপ্রান্তে লাল আকাশের গায়ে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে—সন্ধ্যার অন্ধকার সারা আকাশের গায়ে একটু একটু ক'রে তার ডানা মেলছে, আমি একলা ব'সে ব'সে তাই উপভোগ কচ্ছি, কোলের উপর বইখানা বন্ধ হ'য়ে পড়ে আছে, হঠাৎ মনে হ'ল পাশেই কোথায় যেন চাপা গলায় কান্নার আওয়াজ আসছে। আমার ভারি কৌতূহল হ'ল। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে যে দৃশ্য দেখ্‌লাম, তা বলবার নয়। সেদিন সারারাত ঘুমুতে পারি নি, আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় ঘিন্‌ঘিন্ করতে লাগল।'

গদাই একাগ্রমনে রেণুর সমস্ত কথাই শুনছিল, এখনই হয় তো এই দুর্মুখ নির্ভীক মেয়েটী কোনও এক বিশ্রী অসঙ্গত বীভৎস রসের বর্ণনার অবতারণা করবে ভেবে সে একবার শিউরে উঠল।

রেণু দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভেবে ইচ্ছা করেই সেই বর্ণনাটুকু বাদ দিয়ে বললে—তার পরদিন সকালবেলা নার্স টী যখন আমার টেবিলের ওপর আমার দৈনিক প্রাপ্য দুধের কাপটা বসিয়ে দিলে, তখন আমি ঘৃণায় মুখ পর্য্যন্ত তুললাম না।

নার্স-মেয়েটীর গত সন্ধ্যার বিশৃঙ্খল অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় এক হতশ্রী বিগত-যৌবন মদ্যপায়ীর গলা জড়িয়ে কান্নার বিশ্রী সুর তখনও আমার কাণে বাজছে।

—বাস্তবিক কাঞ্চন-দি, সে রকম লোক তোমার চোখে কখনও পড়েছে কি না জানি না, কিন্তু সে রকম পুরুষ যদি কখনও তোমার চোখে পড়ে তো দেখবে সমস্ত পৃথিবী নিমিষের মধ্যেই তোমার কাছে কালো কুশ্রী হ'য়ে দেখা দেবে, পুরুষটী যেমন শীর্ণ তেমনি তার পোষাক কুরুচিতে পূর্ণ। মাথায় লম্বা লম্বা রুক্ষ চুল সামনের দিকে উড়ে এসে পড়েছে, শরীরে কোথাও মাংস নেই, মুখের হাড়গুলো পর্য্যন্ত ঠেলে উঠেছে, হাতে মুখে ব্যাধির চিহ্ন বর্ত্তমান, ঠোঁটের দুটো কোণে ঘা, মনে হয় ঘা চিরকালই আছে, সারে না, দাঁতগুলো অপরিষ্কার, পানের লাল ছোপ দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে জমা হ'য়েই আসছে, চোখ দুটো ঘোলাটে, দৃষ্টি কোথাও স্থির হ'য়ে দাঁড়ায় না—উঃ সে কি বীভৎস—'

কাঞ্চন-দি তাড়াতাড়ি বললে—'থাক্ থাক্ ও আর বলিস নি বাপু—তারপর কি তাই বল।'

রেণু বললে—'আমি যে কাল তাদের ঐ অবস্থায় দেখেছিলুম সে তা বুঝতে পেরেছিল। দুধের কাপটা নামিয়ে রেখে আমার দিকে ফিরে অল্প একটু হেসে বললে—'আপনি কালকের কথা মনে করে আমার ওপর খুব রাগ করেছেন—না? আচ্ছা, আমি আসছি—' বলে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বললে—'যাক, আমার উপস্থিত সব কাজ সারা হ'ল, শুধু তিন নম্বরকে একবার স্পঞ্জ দিতে হ'বে, তা আপনার কাছে একটু কথা ক'য়ে গেলেই হ'বে, সে এখন ঘুমোচ্ছে—আপনি কি আমাকে আপনার খাটের একদিকে একটু বসতেও আজ দেবেন না কি?'

স্ত্রীলোক ঠিক কতটা নির্লজ্জ হ'তে পারে তা সেদিন প্রথম জানলুম। চুপ করে রইলুম। হুঁ, না, কিছুই বললাম না দেখে সে আপনা হ'তেই মেঝের একদিকে বসে পড়ে বলতে লাগল—'দেখুন কাল যাঁকে দেখলেন উনিই আমার স্বামী—আপনি অবাক্ হ'বেন, তা আর আশ্চর্য্য কি, কেন না আমি স্ত্রী হ'য়ে নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হ'য়ে যাই। ঠিক্ যে ওঁকে আমি ভালবাসি তা আমি বলতে পারি না—কেন না আমি নিজেই জানি না। অথচ এটাও খুব সত্যি যে, আমি আমার বাপের সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমস্তই ত্যাগ করেছি ওঁরই জন্যে। অথচ তার চেয়েও সত্যি—যে ওঁর সঙ্গ আমি বিবাহের আগে থাকতেই ঘৃণা করি, আর ঘৃণা করি বলেই ওঁর রাজপ্রাসাদের মত অট্টালিকায় একদিনের তরেও পা দিতে পারলাম না। জানি না ওঁর মহৎ ত্যাগ আর অদ্ভুত মেধা আমাকে আকৃষ্ট করেছে কি না। আমার মনে হয় ঠিক তাই। উনি রেঙ্গুনের মধ্যে সব চেয়ে ধনী এবং বিদ্বান বৈজ্ঞানিক হ'য়েও আমার মত এক সামান্য নারীর জন্যে সমস্তই খোয়ালেন—তাঁর যশ, অর্থ, মান, রাজোপাধি, বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য—কি নয়? সমস্ত—সমস্ত—যা কিছু মানুষের কাম্য, যা কিছু মানুষের বাঞ্ছনীয় হ'তে পারে...' বলতে বলতে মেয়েটার দুটো চোখ জলে টলমল ক'রে উঠল, দেখতে দেখতে গাল বেয়ে হু হু করে গড়াতে লাগল—তাঁর তুলনায় আমি আর কি করলুম বলুন, একটু রূপ আমার আছে—এই যা। তারপর চুপি চুপি তাঁ'র স্বামীর নাম যা বললে তোমরা শুনে চমকে উঠবে—'

কাঞ্চন-দি আর গদাই দুজনেই প্রায় সমস্বরেই উত্তেজিত হ'য়ে বললে—'ন—।'

রেণু ঘাড় নেড়ে জানালে—ঠিক তাই।

রেণু একটু থেমে বললে—'কাঞ্চন-দি, এদের তুমি কি বল?'

গদাইএর গাল বেয়ে কখন দু ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল গদাই জানতে পারলে না, তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'এদের একনিষ্ঠতা-সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কারুর কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না—'

রেণু আপন মনেই বলে যাচ্ছিল। গদাইএর নির্ম্মল সুডৌল গণ্ডের ওপর দুটী সরু জলরেখা দেখেই তার বুকের মধ্যে হঠাৎ ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল, তার মুখের সেই চাঞ্চল্য, চোখের সেই দুষ্টুমিভরা হাসি নিমিষে কোথায় মিশিয়ে গেল, সামান্য দু'টী নির্ম্মল জলরেখা বুকের কোন্ দুর্ব্বল জায়গায় মুহূর্ত্তের মধ্যে কি ভাবে যে রেখাপাত করলে তা কে বলতে পারে, তার মুখে এক অপরূপ গম্ভীর লাবণ্য ফুটে উঠল। নিজের বর্ণিত মিথ্যা কাল্পনিক ঘটনা এতক্ষণ তার কাছে মিথ্যা ঘটনাই ছিল, কিন্তু গদাইএর সহজ-সরল, নিঃসন্দিগ্ধ নির্ম্মল প্রাণের কান্না এবং জলরেখার তার প্রকাশভঙ্গী, তার মিথ্যা গল্প তার নিজের কাছেই মূর্ত্তিমান সত্য হ'য়ে উঠল। নিজের মধ্যে এক অননুভূত আনন্দ এবং গদাইএর প্রতি এক অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় সে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল। রেণু তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললে—'উঃ, অনেক কাজ বাকি আছে কাঞ্চন-দি, এবার তোমরা ওঠ।'

কাঞ্চন-দি কি একটা বলতে যাচ্ছিল, রেণুর হঠাৎ এই খাপছাড়া দাঁড়িয়ে ওঠায় এবং তার মুখচোখের হঠাৎ এই পরিবর্ত্তনে কাঞ্চন-দি একবার চমকে উঠে থেমে গেল। তারপর তিনজনেই উঠে পড়ল। কাঞ্চন-দি আর গদাই যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, তাদের পায়ের আওয়াজ শেষ হ'তেই রেণু ছুটে গিয়ে তার বিছানার ওপর উবুড় হ'য়ে শুয়ে ফোঁপাতে লাগল।

গদাই মনে মনে রেণুর প্রতি যত আকৃষ্টই হ'ক না কেন,

তার মনের মধ্যে কেবল একটা কথাই বার বার তোলাপাড়া করতে লাগল। অদ্ভুত! অদ্ভুত মেয়ে এই রেণু! রেণু গদাইএর মনে কেবল চমক লাগিয়ে দিয়েছে কিন্তু মনের উপর কোথাও রেখাপাত করতে পারে নি। গদাই অনেক দেরী করেই বাড়ী ফিরল। হেমন্তবাবু সেই যে সেদিনের জন্যে ঘরের তালাবন্ধ করলেন, সেই সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের মুখটাও বন্ধ করলেন, আর কোনও দিন গদাইকে কোনও কথাই বললেন না।

রেণু মেয়েটা নিজে আজীবন দেশ-বিদেশে স্বাধীনভাবে ঘুরে পৃথিবীকে একটু ভিন্ন চ'খেই দেখতে শিখেছে। তার এই আটাশ বৎসরের জীবনে সে আশী বৎসরের অভিজ্ঞতা লাভ করে ফেলেছে, তাই সে কোনও জিনিসকেই স্নেহের চ'খে দেখতে পারে না, কোনও কিছুর মধ্যেই অভিনবত্ব খুঁজে পায় না। তার মধ্যে এমন একটা কাঠোরতা আশ্রয় করেছে যা প্রত্যেক মানুষকে তার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয়, সহজ জিনিসও কঠিন হ'য়ে ঠেকে। কিন্তু সে তার নিজের দিক থেকে সততা রক্ষা করেই চলে, কারুকে প্রবঞ্চনা করে না। তার অফিসের প্রত্যেক কর্ম্মচারী স্বীকার করবে যে তাদের পরিশ্রমের একটা পয়সারও ভুলচুক তার কাছে হয় না তবে তার সহানুভূতি কেউ বড় পেত না। মোট কথা রেণুর মধ্যে অবিশ্বাস করা একটা ধর্ম্ম এবং তার মধ্যে 'সেন্টিমেন্টে'র (উচ্চাঙ্গের অনুভূতির) স্থান নেই। নিজের মধ্যে অবিশ্বাসের এই দৈন্যটুকু সে মাঝে মাঝে অনুভব করে বটে, কিন্তু তার জন্যে সে দুঃখিত নয়; কেন না তার ধারণা, পৃথিবীর অনেক গোলমাল অনেক জটিলতা এড়াবার এই একটীমাত্র উপায়।

তাই সে কোনদিন কারুকে ভালবাসতে পারে নি, আপনার করতে পারে নি, এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সে কোনদিন তা পারবেও না।

কিন্তু সেদিন গদাইএর মুখের দিকে তাকিয়ে, অকৃত্রিম বিশ্বাসের সুখ যে কি, তা সে জীবনে সেই প্রথম বুঝলে। তার এত কালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মূলে গদাইএর চোখের দুটী মন্ত্রপূত জলরেখা সীমার গণ্ডী টেনে দিলে। ফুটো জাহাজ তলিয়ে যেতে সময় নেয়, কিন্তু রেণু বিশ্বাসের সমুদ্রে তলিয়ে যেতে দুটী মাসের বেশী সময় নিলে না। তার মধ্যে আমূল পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। রেঙ্গুণ-হাঁসপাতালের কাল্পনিক মেয়েটীর কথা একদিন সে শুধু গল্প জমিয়ে তুলতেই বানিয়ে বলেছিল আজ তাই সে প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করলে। সেদিনের কাঞ্চন-দির দেশের বাপের খুড়ীমার একান্ত আত্ম-ত্যাগের কথা আজ বিশ্বাস করতে তার একটু বাধল না। তার চাঞ্চল্য, তার বাচালতা, যা তার একমাত্র সঞ্চয় এবং গর্ব্ব ছিল সবই তার কাছে অতি হেয় হ'য়ে ঠেকল। তার মনে হ'ল, তার জীবনের সুদীর্ঘ বৎসরগুলি বৃথাই সে কাটিয়ে এসেছে। জীবন তাকে আবার নতুন করে সুরু করতে হ'বে। সে হ'ল গম্ভীর, অল্পভাষী এবং নিঃসন্দিগ্ধ। কিন্তু গদাইএর কাছে সে ধরা দেবে না, কেন না কামনার কাছে কোনওদিনই সে মাথা নীচু করে নি, করবেও না।

তাই সে একদিন হঠাৎ আপিস তুলে দিয়ে তল্পী বেঁধে বেরিয়ে পড়ল, পৃথিবীর সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করতে।

গদাই সেদিন আপন খেয়ালে রেণুর আপিসের সিঁড়ির ওপর উঠে এসে দেখে সব দরজাই বন্ধ, সিঁড়ির একদিকে একটু চেপে ব'সে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—'উঃ আচ্ছা অদ্ভুত তো!' কাঞ্চন-দি গদাইএর অজ্ঞাতসারে পেছনে পেছনেই এসেছিল। গদাইএর হাত ধরে বললে—'চল, গদাই বাড়ী চল—'

কাঞ্চন-দির ঠোঁট দুটো একবার কেঁপে উঠতেই কাঞ্চন-দি ঘাড় ফিরিয়ে নিলে।

পুস্তক-পরিচয়

চলন্তিকা—আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান—শ্রীরাজশেখর বসু-সঙ্কলিত। মূল্য ২৸০

বাঙ্‌লাভাষার যে একটী ছোট খাটো অথচ মোটামুটি কাজ চলে এমন একটী অভিধানের দরকার আছে—এ-সম্বন্ধে, বোধ হয়, চলন্তিকার বিজ্ঞ সঙ্কলয়িতার সহিত সকলেই এক-মত। এই উদ্দেশ্যেই চলন্তিকার প্রকাশ হইয়াছে এবং কতক পরিমাণে এ উদ্দেশ্য সফলও হইয়াছে। আলোচ্য অভিধান-খানিতে বিস্তর চলিত শব্দ ও বাক্যাংশের পরিচয় আছে, গ্রাম্য অবর ভাষায় প্রচলিত যাহা (স্ল্যাঙ্) তাহাও বড় একটা বাদ যায় নাই, অথচ বেশ সুরুচির পরিচয় দিয়া একার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। গ্রন্থের পরিশিষ্টে আবার কতকগুলি সংখ্যাবাচক শব্দের তালিকা, কতকগুলি ব্যাকরণ-দুষ্ট ও অশুদ্ধ শব্দের তালিকা, কতিপয় পারিভাষিক শব্দের পরিচয় থাকাতে গ্রন্থের উপযোগিতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার উপর বাঙ্‌লা সাহিত্য ও কথিত ভাষায় ব্যবহৃত অনেক-গুলি শিষ্টপ্রয়োগ-সম্মত বাক্যাংশ ও প্রচলিত বিদেশীয় শব্দের পরিচয় দিয়া সঙ্কলয়িতা মহাশয় যে সাহিত্যানুরাগীদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থের আকার বাঁধাই ('গেট আপ') প্রভৃতি ভালই হইয়াছে; দামও খুব বেশী হয় নাই।

এ তো গেল বইখানির গুণের কথা, কিন্তু অভিধান-খানিতে ত্রুটিও বড় কম নাই। ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে —"যাঁহারা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা প্রধানতঃ যে প্রয়োজনে অভিধানের সাহায্য লইয়া থাকেন, বিনা বাহুল্যে তাহা সাধিত করাই এই অভিধানের উদ্দেশ্য।" এখানে আধুনিক সাহিত্য বলিতে কি বুঝিব? আধুনিক সাহিত্য বলিতে যদি মধুসূদন, হেমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতিকে বাদ দিতে হয়, তাহা হইলে অবশ্য কিছু বলিবার নাই। আবার, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', কাশীরামদাসকৃত বাঙ্গালা মহাভারত ও কৃত্তিবাস-প্রণীত বাঙ্গালা রামায়ণ, কালীপ্রসন্ন সিংহ-কর্ত্তৃক অনূদিত ব্যাসের মহাভারত প্রভৃতি বাদ দিয়া যদি কেহ খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে রচিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিতে চান, তাহা হইলেও কোন কথাই বলিবার নাই। কিন্তু যদি কেহ সংস্কৃতানুযায়ী তথাকথিত "সাধু"ভাষায় লিখিত কোন বাঙ্গালা পুস্তক পড়িতে চান, বা কোন শব্দবিশেষের (যথা, নক্ক্রা, গায়ত্রী) খুব প্রচলিত অর্থ ছাড়া অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত অথচ শিষ্ট-প্রয়োগশুদ্ধ কোন অর্থের পরিচয় লাভ করিতে চান, তাহা হইলে চলন্তিকা অনেক সময়েই অচল হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—'অধ্যশন', 'ইষু' 'ইজ্যা' 'ঐষিক' প্রভৃতি সুপ্রচলিত শব্দগুলির অর্থসম্বন্ধে যদি কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রের খটকা লাগে, তাহা হইলে বেচারীকে সুবলচন্দ্র মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রভৃতির সাহায্য লইতে হইবে, কিংবা কেশীমাধব গাঙ্গুলী-সঙ্কলিত বাঙ্গালা-ইংরেজী অভিধানের পাতা হাতড়াইতে হইবে। অথচ এই চলন্তিকাতে অলাত (জ্বলন্ত অঙ্গার), মলদ্বা (সোনার পাত মোড়া), গরুত্মতী (পালওয়ালা নৌকা) হৈয়ঙ্গবীন (মাখন [?]) প্রভৃতি বহু অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত সংস্কৃত ও অসংস্কৃত শব্দের পরিচয় আছে।

শব্দের অর্থের দিকে আভিধানিকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

চলন্তিকায় 'অক্কা' শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে 'মৃত্যু'। বন্ধনীতে যে 'অক্কাপাওয়া' আছে তাহার মানে 'মরা' হইবে। কিন্তু 'অক্কা' শব্দের অর্থ 'মাতা'। 'কৃষ্ণপাওয়া', 'গঙ্গা-পাওয়া' মানেও 'মরা', কিন্তু 'কৃষ্ণ' বা 'গঙ্গা' মানে 'মৃত্যু' নয়। 'অক্কাপ্রাপ্তি', 'গঙ্গাপ্রাপ্তি' = জগন্মাতৃপ্রাপ্তি, কৃষ্ণ-প্রাপ্তি = জগৎপিতৃপ্রাপ্তি। সকলগুলিরই মানে 'মৃত্যু'।

'চন্দ্রশালা'র অর্থ দেওয়া হইয়াছে—'ছাদের উপরে বিলাস-গৃহ'; কিন্তু ছাদের উপরে যে কোন গৃহকেই 'চন্দ্রশালা' বলে।

'চক্ষুদানে'র 'চুরিকরা' একটী অর্থ দেওয়া উচিত ছিল।

'চঞ্চরীক' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'চঞ্চরীকা' হয়—'চঞ্চরিকা' নয়।

'গন্ধর্ব্ব' শব্দের নীচে 'গন্ধর্ব্ববিদ্যা', 'গন্ধর্ব্ববেদ' আছে, বেশ। কিন্তু 'গন্ধর্ব্ববিবাহ' না হইয়া 'গান্ধর্ব্ব বিবাহ' হইলেই ভাল হইত।

'গায়ত্রী'র অর্থ ধরা হইয়াছে 'ত্রিপদ মন্ত্র বিঃ'—গায়ত্রী বলিতে কি শুধু এইটাই বুঝায় ?

'নক্সা' মানে 'রসিকতাপূর্ণ গল্প' বাদ পড়িয়াছে। 'অক্রোধ' সাধারণতঃ বিশেষণ, বিশেষ্যও হয়। বিশেষ্যের মানে দেওয়া হইয়াছে, বিশেষণের মানে বাদ পড়িয়াছে।

'অপর্য্যাপ্ত' শব্দের সাধারণ অর্থ 'অল্প', 'যাহা অপেক্ষা পর্য্যাপ্ত নাই' অর্থও হয়। কিন্তু শেষেরটার অর্থ ধরিয়াই 'প্রচুর', 'প্রয়োজনের অধিক' দেওয়া হইয়াছে। মেয়েরা 'পাতিত' অর্থে যেমন অপতিত বলে, 'পর্য্যাপ্ত' অর্থে 'অপর্য্যাপ্ত' ও বলে। এইরূপ অনেক আছে।

'অপারক'—অপপ্রয়োগ। প্রথমে 'অপারগ' লিখিয়া পরে 'অপারক' লিখিলে ভাল হইত।

কতকগুলি শব্দের ব্যুৎপত্তি সুবিধাজনক হয় নাই। যেমন 'আলাল' শব্দ ফার্সী লেখা হইয়াছে। ফার্সী ভাষায় এরূপ শব্দ নাই। 'তবক' শব্দকে তুর্কী লেখা হইয়াছে, অথচ মানে দেওয়া হইয়াছে স্তবক, স্তর, পাত, থাক। পাত প্রভৃতি অর্থ হইলে শব্দটী আরবী হইবে। যদি গুলী ছুড়িবার বন্দুকই হইত তাহা হইলে তুর্কী তুপক হইতে ব্যুৎপন্ন করা যাইত।

কয়েকটী অশুদ্ধ বানানও চোখে পড়িল। 'ব্যবহারিক' 'ব্যাবহারিক' হইবে। 'বাস্তু' শব্দের অর্থে ভ্রমক্রমে 'পৈত্রিক বাসভূমি' হইয়া গিয়াছে—'পৈতৃক' হইবে।

'সংবরণ' শব্দের 'বর' 'অন্তঃস্থ ব'—'বর্গীয় ব' নয়। অবশ্য 'স্বয়ংবর' 'স্বয়ম্বর' ঠিকই আছে। এখানে 'বর' বর্গীয় ও অন্তঃস্থ দুইই হয়।

যদিও 'চলন্তিকায়' ছাব্বিশ হাজারের অধিক শব্দ আছে, এবং এই গ্রন্থে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুপ্রচলিত শব্দকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে যে, সাহিত্যে ও দৈনন্দিন বাক্যালাপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এমন বিস্তর প্রচলিত সংস্কৃত ও অসংস্কৃত শব্দ এই গ্রন্থে বাদ পড়িয়াছে। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। মাইকেল মধুসূদন-ব্যবহৃত, অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত 'স্বরীশ্বর' 'প্রক্ষেড়ন', 'সুনাসীর', 'পূর্ব্বাশা' 'বীতিহোত্র' প্রভৃতি শব্দগুলি না হয় বাদই দেওয়া গেল, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের খাতিরে না হয় "মেঘনাদ-বধ" উপভোগ ছাড়িয়াই দেওয়া গেল, কিন্তু তাই বলিয়া স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বাঙ্গালীর মুখে মুখে প্রচলিত—ও ঘরে ঘরে প্রবচনতুল্য ব্যবহৃত মাইকেলের কয়েকটী বাক্য কি করিয়া আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অনুরোধেও বাদ দেওয়া যায়। স্কুলের কোন ছাত্র যদি আবৃত্তি করিবার সময় "রঘুজ-অজ-অঙ্গজ", "পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে" প্রভৃতি বাক্যাংশগুলির অর্থ বুঝিতে চায়, "উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে" কিংবা "নাদিলা ভৈরবে মহেষ্বাস" কিংবা "স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে" প্রভৃতি সুপ্রচলিত বাক্যগুলির অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে 'চলন্তিকা' তাহাকে কি কিছুই সাহায্য করিবে না ?

আবার, ভারতচন্দ্রকে আধুনিক স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ ভুলিলেও তাহাদের পাঠ্যপুস্তকে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটী অংশ, পাঠ্যপুস্তকের সঙ্কলয়িতৃগণ ও শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ পাঠ্য বলিয়া স্থির করিতে ছাড়েন নাই। এখন যদি একজন 'আধুনিক' যুগের ছেলে 'অন্নদার জরতী বেশে ব্যাসে ছলনা' কিংবা 'অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা' পড়িতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে চলন্তিকা তাহাকে আশানুরূপ সাহায্য করিতে পারিবে কি না কেহ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। আবার, ধরা যাক্, মুদী সুর করিয়া কাশীদাসী মহাভারত পড়িতেছে,—

"হরবাক্য শুনি হাসি বলে হয়গ্রীব।
অপ্রাপ্য দ্রব্যের কেন বাঞ্ছা কর শিব ॥"

কিংবা,—

"নেউটিয়া মোর পানে চাহ চারু মুখে,
হের মরি ত্রিশূল মারিয়া নিজ বুকে ॥"

কিংবা,—

যে উলার মূল ধরিয়াছে সর্ব্বজনে।
মূষিক খুঁড়িছে মূল না দেখ নয়নে ॥"

পড়িতে পড়িতে খেয়ালবশতঃ 'হয়গ্রীব', 'নেউটীয়া' ও 'উলা' এই কয়টী শব্দের মানে সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল হইল

এবং পার্শ্বে উপবিষ্ট পুত্রকে তাহার সদ্যঃক্রীত 'চলন্তিকা' হইতে শব্দ কয়টার মানে দেখিতে বলিল। ইহার উত্তরে ছেলে কি বলিবে? চলন্তিকার চল্‌তি খাতায় শব্দ কয়টা নাই বলা ছাড়া তাহার আর উপায় কি?

আর উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। ঘরে বসিয়া অল্প চেষ্টায় এরূপ ত্রুটি বাহির করা শক্ত হইবে না। কিন্তু সহৃদয় সমালোচক মাত্রেরই মনে রাখিতে হইবে যে, ত্রুটি বাহির করা এক কাজ, আর অভিধান প্রণয়নতুল্য দুরূহ সুবৃহৎ ব্যাপার আর এক কাজ। এরূপ অধ্যবসায়-সাপেক্ষ দুরূহ ব্যাপারে ত্রুটি ঘটা ও ছাড় পড়িয়া যাওয়া অনিবার্য্য। তবে আশা করি, এই অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার সময় সুপণ্ডিত ও 'পরশুরাম'-রূপে সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত সঙ্কলয়িতা মহাশয়, ত্রুটিগুলির প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিবেন, যাহাতে এই গরীব দেশের লোক দুই তিন টাকা মূল্য দিয়া বইখানি কিনিয়া একটু কম হতাশ হয়, ও অভিধানখানি হইতে অপেক্ষাকৃত একটু বেশী সাহায্য পায়।

শান্তিপুরের লেখকগণ

শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বঙ্গের শান্তিপুর, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, গুপ্তিপাড়া, ত্রিবেণী, পূর্ব্বস্থলী ও বিক্রমপুরের পাণ্ডিত্যের খ্যাতির কথা আবহমান কাল হইতে প্রচলিত আছে। এসম্বন্ধে প্রথমতঃ সাধারণভাবে কতিপয় মন্তব্য ও ঘটনার উল্লেখ করিয়া মূল প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করা যাইবে। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী ভট্টাচার্য্য, 'বাসুদেববিজয়ঃ'-প্রণেতা ৺রামনাথ তর্করত্ন, 'কোকিল দূত'-লেখক কবি ৺হরিমোহন প্রামাণিক, কবি শ্রীবনোয়ারীলাল গোস্বামী, সুকবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমোজাম্মেল হক্, ঔপন্যাসিক ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীফটিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সম্বন্ধনির্ণয়'-প্রণেতা ৺লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য, 'কুলার্ণবকারিকা'-রচয়িতা ৺রামগোপাল সার্ব্বভৌম, 'প্রকৃতিবিবেক'-সঙ্কলয়িতা ৺রামকমল বিদ্যালঙ্কার, সম্পাদক ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'গোবিন্দ দাসের করচা'-প্রকাশক ৺জয়গোপাল গোস্বামী, ভাগবতরত্ন ৺মদনগোপাল গোস্বামী ও ৺রাধিকানাথ গোস্বামী, সাধক পণ্ডিত ৺অদ্বৈতাচার্য্য, ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ৺অঘোরনাথ গুপ্ত প্রভৃতি মহোদয়ের কথা সাধারণ পাঠকের নিকট উপভোগ্য হইবে আশা করা যায়। নিম্নের শ্রেণীবিভাগে কতকটা প্রসিদ্ধি-অনুযায়ী করা হইলেও, প্রধানতঃ গোস্বামি-বংশ, কবি, ঔপন্যাসিক, সংবাদপত্রসেবী ও বিবিধ এই ভাবেই করা হইয়াছে। সমস্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এ কথা বলা যায় না। প্রচারিত লেখক ব্যতীত অন্য পণ্ডিত ও ও সাহিত্যিকবর্গের সমগ্র পরিচয় ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। শান্তিপুরের শিক্ষার কথা অন্যত্র লিখিত হইবে।

(এক)

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লং সাহেব লিখিয়াছিলেন, "এখনও ৩০টার অধিক চতুষ্পাঠী আছে, পূর্ব্বে অবশ্য আরও বেশী ছিল।" (১)

'বেঙ্গল পাষ্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট' ভলুম ৬,১৯০৯, ৩য় খণ্ড (পৃঃ ২২) হইতে জানিতে পারা যায় যে ত্রিবেণীর উত্তরে ২০ হইতে ৩০ মাইলের মধ্যে হিন্দু শিক্ষার প্রসিদ্ধ তিনটী স্থান বা সমাজ হইতেছে গুপ্তিপাড়া, শান্তিপুর, নবদ্বীপ।'

---

(১) দি ক্যালকাটা রিভিউ ভলুম ৬; 'দি ব্যাঙ্কস্ অফ দি ভাগীরথী'

একবার দাশরথি রায় ছড়কোডাঙ্গায় পাঁচালী-গান করিতেছিলেন। লোকে বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে গান বন্ধ করিতে বলিল। তিনি উত্তর করিলেন,—

যিনি ভাগারথী গঙ্গা আন্‌লেন ত্রিভুবন ধন্যে।
তাঁর আবার খেদ রইলো পুকুর প্রতিষ্ঠার জন্যে॥
যার বিয়েতে কুলো ধ'রলেন স্বয়ং লক্ষ্মী আসি'।
তার বিয়েতে এয়ো হ'লো না আকালে হাড়ীর মাসি॥
ন'দে শান্তিপুরে যার জয় জয় রব।
ছড়কোডাঙ্গায় হার হ'ল তার হরির ইচ্ছা সব॥ (১)

একবার কাশীধাম হইতে শ্যামদাস নামে দ্রাবিড়দেশীয় এক সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শান্তিপুরে প্রখ্যাত ৺কমলাক্ষ বেদপঞ্চাননের (অদ্বৈতাচার্য্য) নিকট উপস্থিত হইয়া তুলসী ও ভাগীরথীর মহিমা বর্ণনা করিলেন এবং ভগবান্‌কে 'নির্গুণ নিরাকার অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম' বলিয়া বিশিষ্ট করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য ইঁহার বর্ণিত 'গঙ্গার বস্তুতত্ত্বে' ভ্রম দেখাইয়া পরমব্রহ্মকে 'শ্রীসচ্চিদানন্দময় অনাদি সাকার সর্ব্বশক্তিমান্ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বেদ্য' বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন। এই ঘটনা হইতে তাঁহার 'অদ্বৈত' নাম হইল। তখন তিনি শ্যামদাসের 'ভাগবতাচার্য্য' নাম দিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। (২)

অদ্বৈতাচার্য্যের সময় শান্তিপুরে অনুরূপ আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদা প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা সঙ্গীতজ্ঞ মহাপ্রভুর শাখাভুক্ত বলিয়া গণ্য ৺রঘুনাথ দাস মহোদয়ের দীক্ষাগুরু ৺যদুনন্দন আচার্য্য তর্কচূড়ামণি অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়া নামসঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন ব্রহ্ম হরিদাসের হাবভাব দেখিয়া তাঁহাকে 'বেটা বাউল' প্রভৃতি শ্লেষে বিশেষিত করিলেন। তাহাতে অদ্বৈতাচার্য্য-শিষ্য ভূতপূর্ব্ব লাউড়-নৃপতি কৃষ্ণদাস হরিদাসের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করিয়া বুঝাইলেন। ইতিমধ্যে হরিদাসের কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল। তখন তর্কচূড়ামণি হরিদাসকে, 'ব্রহ্ম সাকার কি নিরাকার' 'অনাদি কারণ কি', 'ব্রহ্মের স্রষ্টা কে', 'সৃষ্টি বহু প্রকার কেন', 'সুখদুঃখের তারতম্য হেতু ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বে পক্ষপাতিত্ব-দোষ কিরূপে খণ্ডিত হয়', প্রভৃতি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিদাস সদুত্তর প্রদান করিলেন। এমন সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য আসিলেন এবং তর্কচূড়ামণির ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। (১)

১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন তারিখে মুর্শিদাবাদে আহূত সভায় লিখিত পরকীয়ামত-সিদ্ধান্তমূলক দলিলে শান্তিপুরের পণ্ডিতের নাম স্বাক্ষর রহিয়াছে। ঘটনাটী এইরূপ হইয়াছিল। জয়পুররাজ দ্বিতীয় জয়সিংহের সময় বৃন্দাবন ও জয়পুরবাসী পরকীয়ামতবাদী বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ স্বকীয়া-পরকীয়া-মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে অসমর্থ হইয়া (সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া) স্বকীয়া-মতে দস্তখত করিয়া দেন। তাঁহাদের প্রার্থনানুযায়ী জয়পুররাজ দিগ্বিজয়ী সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে প্রয়াগ ও কাশীর বৈষ্ণবগণও স্বকীয়া-মতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। বঙ্গদেশেও দিগ্বিজয়ীর জয় হইতে লাগিল। কেবল শ্রীখণ্ড ও জাজিগ্রামে আপত্তি উঠিল। শান্তিপুর, নবদ্বীপ, খড়দহ, বর্দ্ধমান-কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী সুদপুর, কানাইডাঙ্গা ও লূতা, সুবর্ণগ্রাম, কাশী এমন কি সুদূর তৈলঙ্গ হইতেও পণ্ডিত আহূত হইলেন। নবাবের আনুকূল্যে মুর্শিদাবাদে সভা হইল, এবং সেখানে শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের বংশধর পণ্ডিতপ্রবর রাধামোহন ঠাকুর বিচারে দিগ্বিজয়ীকে পরাভূত করিয়া পরকীয়া-মত স্থাপন করিলেন এবং দিগ্বিজয়ীকে শিষ্য করিলেন। পুনরায় বৃন্দাবনাদি স্থানে পরকীয়া-মতের জয়পতাকা উড়িল ('ঢাণ্ডা গারা গেল')। স্বকীয়া-মত স্বাক্ষরকারী বৈষ্ণবগণ পরকীয়াবাদীগণের পঙ্ক-পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইস্তফাপত্র লিখিয়া দিলেন। (২)

'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' ও 'কুলপঞ্জিকা'-প্রণেতা সুবিখ্যাত উদয়নাচার্য্যের (৩) বংশসম্ভূত শান্তিপুরস্থ 'কাশ্যপ' ভট্টাচার্য্যের বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া এককালে শান্তিপুরকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য চার পুত্র ও দুই স্ত্রী লইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের সময় শান্তিপুরে আসিয়া বসবাস করেন। তিনি অদ্বৈতবংশের পৌরোহিত্য করিতেন। তাঁহার বংশে ৺মুকুন্দদেব

(১) 'বঙ্গবাসী'-সংস্করণ—দাশরথি রায়
(২) অদ্বৈতপ্রকাশ, ষষ্ঠ অধ্যায়

(১) অদ্বৈতপ্রকাশ, ৭ম অধ্যায়
(২) কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল); নদীয়া কাহিনী;
(৩) 'কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা' ৯৮৪ খৃষ্টাব্দে এবং 'কুলপঞ্জিকা-

সার্বভৌম জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইনি শান্তিপুরে এক দিগ্বিজয়ী দণ্ডীকে শাস্ত্র-বিচারে পরাস্ত করায়, দণ্ডীকে দণ্ড

কার' ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় অংশ

কেহ কেহ বলেন, কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীই 'কুসুমাঞ্জলি'র প্রণেতা। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী ঘটক অদ্বৈত গোস্বামীর বৃদ্ধ প্রপিতামহ নৃসিংহ লাড়ুলীর সমসাময়িক লোক। ইঁহার নিবাস নিসিন্দা গ্রাম, জিলা রাজসাহী। খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর লোক। কাউয়েল 'কুসুমাঞ্জলি'কে খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীর লিখন বলিয়াছেন। 'কুসুমাঞ্জলি'-প্রকাশক উদয়নাচার্য্য কাশ্যপগোত্রীয় বারেন্দ্র-কুলের ভাদুড়ীগোষ্ঠীসম্ভূত। —সম্বন্ধনির্ণয়

রাজেন্দ্রকুলাচার্য্যগণের মতে বারেন্দ্রশ্রেণীতে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠাতা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীই প্রসিদ্ধ ন্যায়গ্রন্থ 'কুসুমাঞ্জলি'র প্রণেতা। এক পক্ষ ইঁহার জন্মস্থান নিসিন্দায়, অন্য পক্ষ মাণিকগঞ্জের বালিয়াটীতে ছিল বলেন। ইনি খৃঃ ১৪শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। —চরিতাভিধান

বস্তুতঃ উদয়নাচার্য্য দুইজন—একজন 'কুসুমাঞ্জলি'-রচয়িতা মৈথিল উদয়নাচার্য্য (১০ম শতাব্দী); দ্বিতীয় বাঙ্গালী উদয়নাচার্য্য (উদয়ন ভাদুড়ী); ইনি ১৪শ শতাব্দীতে (মতান্তরে ১২শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধদেব(?) মৈথিল উদয়নাচার্য্যের ধর্ম্মশিক্ষক ছিলেন। লঘুভারত-রচয়িতার মতে, ইনি তীর্থপর্য্যটনকালে 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। —সুবল মিত্রের 'অভিধান'

১২শ শতাব্দীতে বগুড়া (?) জেলার অন্তর্গত নিসিন্দা গ্রামে উদয়নাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা বৃহস্পতি আচার্য্য বৌদ্ধাচার্য্য জিজ্ঞানির সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া লজ্জায় প্রাণত্যাগ করেন। উদয়নাচার্য্য এই ঘটনায় ক্রোধান্ধ হইয়া বৌদ্ধদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন।

তাহারই ফলস্বরূপ 'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশ ও আস্তিকতা প্রতিপন্ন করেন। —সাহিত্য, পৌষ ১৩১৮

ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইনি গদাধর সার্ব্বভৌমের 'ন্যায় কুসুমাঞ্জলি'র টীকা দেখিয়া অবহেলায় সুরে 'গদাই-পাঁতি কালে চলিবে' বলিয়াছিলেন। মুকুন্দদেবের ভিটায় তাঁহার অধস্তন ৭ম পুরুষ কলিকাতার হিন্দু স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সহকারী প্রধান শিক্ষক ও মাড়োয়ারী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ৺রামযাদু ভট্টাচার্য্য বি-এ বাস করিতেন। এই বংশের বলরাম বিদ্যাবাচস্পতি, মহেশ তর্কপঞ্চানন, লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন, চাঁদ তর্কবাগীশ, ব্যাসদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক সময়ে বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। একদা নবদ্বীপরাজের সভায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ এক উদাসী নবদ্বীপস্থ সকল পণ্ডিতকে পরাস্ত করেন। তখন মহারাজ শম্ভুচন্দ্র নাটোরাধিপতির মধ্যস্থতায় পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়পঞ্চাননকে সভাপণ্ডিত করিয়া আনয়ন করেন। এক সপ্তাহ বিচারের পর উদাসী পরাস্ত হন। (১)

শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য্য, বল্লভী, সর্ব্বানন্দী, চৈতল, নপাড়ী, আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য, উড়িয়া গোস্বামী প্রভৃতি বংশে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। "শান্তিপুরের লক্ষ্মীতলা পাড়ায় সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু ছিলেন। কোন কারণে মহারাজের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায়, তিনি তাঁহার সাহচর্য্য ত্যাগ করেন।" (২) ইনি সর্ব্বানন্দী বংশে জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহার প্রপিতামহ বা পিতামহ বেজপাড়া হইতে লক্ষ্মীতলা বা সর্ব্বানন্দী-পাড়ায় উঠিয়া আসিয়া বসবাস করেন; এই বংশের কয়েকজন শান্তিপুর ঝাউগাছি পল্লীতেও বাস করেন। বল্লভীবংশের ৺গোপীনাথ সার্ব্বভৌম বোধ হয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। অদ্বৈতবংশগৌরব নাটোর-রাজগুরু ৺রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণনগররাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি একবার সুপ্রীম-কোর্টের স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্ মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন। সাহেব ইঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ ইঁহাকে জজ

(১) যুবক, অগ্রহায়ণ ১৩২২

(২) কলিকাতা, সেকালের ও একালের, পৃঃ ৯৫৭

পণ্ডিতের পদ দিতে চাহিলেন। কিন্তু ইনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে, সাহেব বলিলেন,

অনক্ষরে বীক্ষ্য মহাধনিত্বং
ত্যজ্যানবদ্যা কৃতিভির্বিদ্যা।
স্বর্ণাবতংসাং কুলটাং সমীক্ষ্য
কুলস্ত্রিয়ঃ কিং কুলটা ভবেয়ুঃ॥ (১)

"এই গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাটোরের দিকৃপতি মহারাজ বিশ্বনাথ রায়ের সভায় অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সৌরাষ্ট্র-মগধ-কর্ণাট প্রভৃতি দেশীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতবর্গকে বিচারে পরাজিত করিয়া অন্য দেবতার মন্ত্র ত্যাগ করাইয়া উপরোক্ত ব্রাহ্মণ নৃপতিকে শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া বিষ্ণু-ভক্তির জয়পতাকা উড়াইয়াছিলেন।" (২) মহারাজ বিশ্বনাথ রাণী ভবানীর পৌত্র, ইনি নাটোর রাজবংশের 'বড় তরফের' প্রবর্ত্তক। "মহারাজ বিশ্বনাথ পূর্ব্বে শাক্ত ছিলেন, পরে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মহারাণী নূতন ধর্ম্মগ্রহণে অস্বীকার করিয়া শ্বশুরদত্ত সম্পত্তি লইয়া মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগরে গঙ্গাবাসছলে গিয়া বাস করেন। তখন বিশ্বনাথ কৃষ্ণমণিকে বিবাহ করেন।" (৩) বিশ্বনাথ ও কৃষ্ণমণি শান্তিপুরে গমন করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের 'বিশ্ব' ও রাধামোহনের 'মোহন' লইয়া গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজ বাটীতে 'বিশ্বমোহন' বিগ্রহ স্থাপিত করেন। মহারাণী শান্তিপুরে ব্রতপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ৫০০৲ টাকা তৈলবট স্বরূপে দান করিয়াছিলেন প্রসিদ্ধি আছে; তৎকালে মহারাণী অশুচি হওয়ায় এবং পণ্ডিতমণ্ডলী আপত্তি করায় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ॥' এই শ্লোকের বলে ব্রতকার্য্যে ব্যবস্থা দিলেন। কৃষ্ণমণির শ্রাদ্ধক্রিয়া শান্তিপুরে মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হয়।

(১) যুবক, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩২৪

(২) রাধিকানাথ গোস্বামী—যতিদর্পণ বা সন্ন্যাস

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কাণ্ড, ২য় অংশ

চৈতন্যবংশের পীতাম্বর তর্কবাগীশ জজ আদালতের পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া 'জজ ভট্টাচার্য্য' নামে খ্যাত ছিলেন। কবি হরিমোহন প্রামাণিক একবার বৃন্দাবন হইতে জয়পুর মহারাজের সভায় জনৈক শৈব-কর্ত্তৃক বৈষ্ণবদের পরাজয় সম্ভাবনায় স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর-কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন; দুঃখের বিষয় ইনি সেবার বৃন্দাবনে যাইতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইঁহার পত্রালাপ হইত। ইনি একবার রথপ্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে পাকুড়-রাজবাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তত্রাগত কাশী, কাঞ্চী দ্রাবিড় প্রভৃতির পণ্ডিতমণ্ডলী একটী শাস্ত্রীয় মীমাংসায় অসমর্থ হওয়ায়, হরিমোহন তাহার সদুত্তর দিয়াছিলেন। (১)

মদনগোপাল গোস্বামী একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। ভক্তপ্রধান পণ্ডিত রাধানাথ গোস্বামী তাড়াশের ভূস্বামী রাজর্ষি বনমালিভূষণ রায়, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি মহোদয়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন। ইনি পিতৃশিষ্য ব্রহ্মরাজসভার পদস্থ রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তীর আগ্রহে ব্রহ্মে গিয়া রাজপণ্ডিত হন এবং ব্রহ্মরাজ ইঁহাকে 'শ্রীগোস্বামী পণ্ডিত রাজগুরু' উপাধি দিয়া তাহা স্বর্ণপত্রে লিখিয়া দান করেন। "বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের আর্য্যধর্ম্মের অবান্তর, রাজাও আপনাকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া খ্যাপন করিতেন, সুতরাং আমার সদৃশ একজন ব্রাহ্মণের বৌদ্ধ নৃপতির নিকট 'রাজগুরু' উপাধিলাভ আশ্চর্য্য নহে। উক্ত উপাধি-লিখিত স্বর্ণপত্র আমাদের গৃহে অদ্যাপিও আছে। কিছুদিন পরে ২০ ভরি স্বর্ণের মুকুট ও ৪০ ভরি স্বর্ণের যজ্ঞোপবীত আমাকে প্রদান করেন।" (২) এই সকল মহাত্মাদের বিষয় পরে লিখিত হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে শান্তিপুরের ভাষার সুখ্যাতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন যে নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের লোক বিশুদ্ধতম বাংলা ভাষায় কথা কহে। একবার ঢাকা ধামরাইএর কোন লোক শান্তিপুরে আসিয়া বসবাস করে। বহু বর্ষ পরে সেই বংশের একজন শান্তিপুর হইতে ঢাকা অঞ্চলে যায়। তখন সেখানকার

(১) শ্রীযোগানন্দ প্রামাণিক—শান্তিপুর-রত্ন

(২) যতিদর্পণ

লোক না কি তাহার মুখ হইতে শান্তিপুরের ভাষা শুনিবার জন্য তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে। (১) এই ভাষার বিশুদ্ধতা কতদূর বিকৃত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। (২) "বঙ্গদির পশ্চিম ভাগে নবদ্বীপ অঞ্চলে নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া গঙ্গাতীরে বসত করিয়াছিল। তজ্জন্য এই স্থানে বঙ্গভাষা ও গৌড়ীয় ভাষা মিশ্রিত হইয়াছিল। এই স্থানে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা অধিক হওয়ায় এখানকার প্রাকৃত ভাষা সমধিক মার্জ্জিত হইয়াছিল। সেই হেতু নদীয়া শান্তিপুরের প্রাকৃত ভাষাই সমস্ত বাঙ্গালা দেশের আদর্শ ভাষা হইয়াছিল। তাহাই এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষা নামে পরিগৃহীত হইয়াছে। এখন বাঙ্গালা গদ্যে যেরূপ ভাষা সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় তাহা নদীয়া শান্তিপুরের সাধু ভাষা। কিন্তু সাধারণ কথোপকথনে এই সাধু ভাষা কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় না। রাঢ় ও বারেন্দ্র ভূমিতে গৌড়ীয় ভাষা, পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় বঙ্গভাষা এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে 'কলিকাতাই' ভাষা সাধারণ কথোপকথনে প্রচলিত আছে।" (৩)

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ও দীনবন্ধু মিত্র, মনস্বী ভোলানাথ চন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীহরিহর শেঠ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীসুজননাথ মুস্তফী, শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক, লং ও হলওয়েল প্রভৃতি 'শান্তিপুর'-সম্বন্ধে অল্পবিস্তর লিখিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ, কেশবচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেশচন্দ্র সমাজ-পতি, অক্ষয়কুমার বড়াল, শ্রীজলধর সেন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীমতী সরলা দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি কত প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শান্তিপুরে পদধূলি দিয়া শান্তিপুরকে কৃতার্থ করিয়াছেন তাহার একরূপ ইয়ত্তা নাই। ললিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ধাত্রীবিদ্যা' প্রভৃতি-প্রণেতা যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, লাহিড়ী কোম্পানীর জগদীশ লাহিড়ী সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার, বাগাঁচড়ার কবিভূষণ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী রসসাগর, ডাঃ যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত প্রভৃতি মহোদয়ের শান্তিপুরের সঙ্গে কমবেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল। আধুনিক কৃতবিদ্যগণের মধ্যে স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার চারি ভ্রাতা, শ্রীরাধবিনোদ গোস্বামী, কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটীমেয়র আবদুল রজ্জক ও তাঁহার ভ্রাতা, মিঃ দাউদ এম-এ বি-এল বার-অ্যাট্-ল, অধ্যক্ষ হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম সগৌরবে উল্লেখযোগ্য।

(১) যুবক, ফাল্গুন ও চৈত্র—১৩২৪

(২) ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৭৬৬ ও আশ্বিন, পৃ ৫১৯, ১৩২৫

(৩) দুর্গাচরণ সান্যাল—বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস

(দুই)

অদ্বৈতাচার্য্য

প্রণীত গ্রন্থ—যোগবাশিষ্ঠ ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার ভক্তিবর্ত্ম ভাষ্য (সংস্কৃত)। এক সময়ে চৈতন্যদেবকে শান্তিপুরে আনয়ন করিবার জন্য অদ্বৈতাচার্য্য বাহ্যতঃ ভক্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া জ্ঞানমার্গের আলোচনা করিয়াছিলেন। তখন চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত আসিয়া স্নেহপূর্ণ ভর্ৎসনা ও মুষ্টিবর্ষণ দ্বারা অদ্বৈতাচার্য্যকে আপ্যায়িত করিলেন। তাহার পরই আচার্য্য উক্ত গ্রন্থদ্বয় বাহির করিয়া আনিয়া চৈতন্যদেবকে দেখাইলেন। ঈশান নাগর লিখিতেছেন—

শ্রীযোগবাশিষ্ঠ আর শ্রীভগবদ্গীতা।
এই দুয়ের ভাষ্য মোর প্রভু রচয়িতা॥
ভক্তিবর্ত্ম ভাষ্য সেই অতি চমৎকার।
গোরে দেখাইলা প্রভু করিয়া আদর॥
শ্রীগৌরাঙ্গ সেই দুই ভাষ্য পাঠ করি।
শুদ্ধ প্রেমে আর্দ্র হঞা কহয়ে ফুকারি॥
এই দুই ভক্তিবর্ত্ম ভাষ্য যে রচিলা।
সেই অপ্রাকৃত ভক্তি-সাগর মথিলা॥
সেই কৃষ্ণের আত্মরূপ ভক্ত অবতার।
তাঁহার চরণে মোর কোটী নমস্কার॥
উর্দ্ধবাহু হঞা কহে কৃষ্ণ নিত্যানন্দ।
এই ভাষ্যকার হয় জগতের বন্দ্য॥ (১)

(১) অদ্বৈতপ্রকাশ, ১৪শ অধ্যায়

অদ্বৈতাচার্য্যের বিস্তৃত জীবনী নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়ঃ—বীরেশ্বর প্রামাণিক (শান্তিপুর নিবাসী ব্রাহ্মসমাজভুক্ত)—অদ্বৈতবিলাস (২য় খণ্ড) ; ঈশান নাগর —অদ্বৈতপ্রকাশ ; হরিচরণ দাস—অদ্বৈতমঙ্গল ; শ্যামদাস —অদ্বৈতমঙ্গল ; কৃষ্ণদাস—বাল্যলীলাসূত্রং। শ্রীহট্টের প্রাচীন লাউড় রাজ্যের রাজা দিব্যসিংহ শেষ বয়সে শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য হইয়া কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া বা ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত হন ; তিনি শান্তিপুর বাস করিবার সময়ে ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে 'বাল্যলীলাসূত্রম্'-প্রণয়ন করেন (১) ; অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা-কুবেরাচার্য্য ইঁহার মন্ত্রী (মতান্তরে সভাপণ্ডিত) ছিলেন।

শক্তিমন্ত্র ছাড়ি গোপালমন্ত্রে দীক্ষা নিল।
কৃষ্ণদাস নাম তার অদ্বৈত রাখিল ॥
বৃন্দাবনে চলিলেন হইয়া ভিখারী।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী বৃন্দাবনে খ্যাতি ॥ (২)

অদ্বৈত-শিষ্য ঈশান দাস বা নাগর জীবনের সায়াহ্নে গুরুর আদেশক্রমে শান্তিপুর হইতে লাউড়ে গমন করিয়া ১৫৬৮ (৩) খৃষ্টাব্দে 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থ লেখেন। "হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈতমঙ্গল' গ্রন্থ 'অদ্বৈত-প্রকাশেরই' অনুবর্ত্তী—অতিরিক্ত যাহা আছে, তাহা অমানুষী তত্ত্বে পরিপূর্ণ।" (৪) অদ্বৈতাচার্য্য সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি চৈতন্যলীলা-প্রচারক গ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

প্রণীত গ্রন্থ—যোগসাধন, আশাবতীর উপাখ্যান, ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর, ধর্ম্মশিক্ষা, ব্রাহ্ম-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনে পরীক্ষিত বিষয়, ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন, শোকোপহার (কবিতা), বক্তৃতাবলী ও উপদেশ। ইঁহার প্রবন্ধ 'ধর্ম্মতত্ত্ব,' 'বামাবোধিনী' প্রভৃতি পত্রিকার অঙ্কে শোভা পাইত। ইঁহার রচিত সঙ্গীত ও লিখিত পত্রাদি উচ্চ ধর্ম্মভাবদ্যোতক।

(১) শ্রীমুরারিলাল অধিকারী—বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী। ইনি বিষ্ণুপুরীকৃত সংস্কৃত 'রত্নাবলী'র বঙ্গানুবাদ করেন।
(২) প্রেমবিলাস
(৩) ১৫৬০—দীনেশচন্দ্র সেন—'চৈতন্য এণ্ড হিজ এজ'
(৪) সতীশচন্দ্র মিত্র—হরিদাস ঠাকুর।

ইঁহার বিস্তৃত জীবনী ও উপদেশ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে :—কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—সদ্‌গুরুসঙ্গ (৫খণ্ড) ; সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—আচার্য্য-প্রসঙ্গ ; বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—বিজয়মঙ্গল ; হরিদাস বসু—মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুলীলা, সদ্‌গুরু ও সাধনতত্ত্ব (২ খণ্ড) ; নবকুমার বাগ্‌চী—বিজয়কথামৃত (২ খণ্ড) ; বঙ্কুবিহারী কর—মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ ; জগদ্বন্ধু মৈত্র (গোস্বামী মহাশয়ের জামাতা)—প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, করুণাকণা ; শ্রীসীতানাথ গোস্বামী (ভ্রাতুষ্পৌত্র, শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান)—বালক বিজয়কৃষ্ণ ; অমৃতলাল সেনগুপ্ত—বিজয়কৃষ্ণের জীবনী, সাধনা ও উপদেশ, যোগমায়া ঠাকুরাণী ; জিতেন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্ত—অমৃত-প্রসঙ্গ ; মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা—মনোরমার জীবনচিত্র (২ খণ্ড) ; শরৎকামিনী বসু—স্বদ্‌গুরু কথামৃত, সৎপ্রসঙ্গ ; নগেন্দ্রনাথ রায়—বক্তৃতা ও উপদেশ ইত্যাদি।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ অদ্বৈতাচার্য্য-পৌত্র দেবকীনন্দনের (শান্তিপুরের আতাবুনিয়া গোস্বামি-শাখার প্রবর্ত্তক) অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া যোগমায়া ঠাকুরাণীর লিখিত একটী সুন্দর কবিতা—'দয়াময়ের চরণাশ্রয় প্রার্থনা'—প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (১) বিজয়কৃষ্ণ-শিষ্য শান্তিপুর-সন্তান লালবিহারী বসুরও একটী দার্শনিক প্রবন্ধ ও কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। (২)

এখানে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের ভগিনীপতি কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয়ের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইনি প্রথমে শান্তিপুরে বাস করিতেন। ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণের শান্তিপুরে নির্য্যাতন-সময়ে ইনি তাঁহাকে লইয়া সাঁতরাগাছি আসেন। ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, এবং 'ভক্ত মহদাস গোস্বামী' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহার ৪ পৌত্রই কৃতী—নিত্যরঞ্জন কলিকাতায় অঙ্কন-শিল্পের কার্য্য করেন, সত্যরঞ্জন,—এম-বি, ডি-পি এইচ (লণ্ডন)

(১) পঞ্চপুষ্প, শ্রাবণ ১৩৩৮, পৃষ্ঠা ৫৪৮
(২) নবকুমার বাগচী—বিজয়কথামৃত, ২য় ভাগ

গয়ায় ডাক্তারী করেন; বিশ্বমোহন,—বি-এসসি, বি-এল হইয়াছেন; এবং মনোমোহন,—বি-এসসি (লণ্ডন ও ম্যানচেষ্টার) হাতোয়ায় ষ্টেট এঞ্জিনীয়ারের কার্য্য করেন। নিজ শান্তিপুরে অন্য যে দুই চারি ঘর ব্রাহ্ম আছেন, তাহার মধ্যে লেখক স্বর্গীয় বিশ্বেশ্বর প্রামাণিক, শ্রীযোগানন্দ প্রামাণিক ও শ্রীকালাচাঁদ দালালের কথা পরে উক্ত হইবে।

স্বর্গীয় রাধিকানাথ গোস্বামী ও শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী গোস্বামী মহাশয়ের প্রণীত গ্রন্থ :—

যতিদর্পণ বা সন্ন্যাস (আত্মজীবনী ও সন্ন্যাসের ঔচিত্য-স্থাপক ব্যাখ্যা)। প্রকাশের তারিখ বাং ১৩৩৭ সাল। বিনামূল্যে দেয়।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত,'—বঙ্গানুবাদ।

ঐ 'সংস্কারচন্দ্রিকা'—বঙ্গানুবাদ; ইহাতে সমগ্র ভক্তিতত্ত্ব সন্নিবেশিত আছে।

সনাতন গোস্বামীর 'শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতং'—বঙ্গানুবাদ।

চৈতন্যচরিতামৃত—পয়ার ও ত্রিপদীর কঠিন কঠিন স্থলের বৈষ্ণবসিদ্ধান্তানুমোদিত ব্যাখ্যা ও টীকা।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃতং'—বঙ্গানুবাদ।

হরিসাধক-কণ্ঠহার (কবিতা)—'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার' অভিনব সিদ্ধান্তানুমোদিত সাধন বা রাগানুরাগ ভজনের উপযোগী ব্যাখ্যান।

রঘুনাথ দাস গোস্বামির 'স্তবপুষ্পাঞ্জলিঃ'—বঙ্গানুবাদ।

রায়শেখরের 'পদাবলী'—টীকা।

জীব গোস্বামী-কৃত 'সর্ব্বসম্বাদিনী'র ব্যাখ্যা—সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, ইহাতে শ্রীভগবান্ মদনমোহনের মানবলীলা ও নিত্যলীলা-সম্বন্ধে অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত বা স্বকীয়াবাদ স্থাপন করা হইয়াছে।

'বিষ্ণুপ্রিয়া' মাসিক পত্রিকা (সম্পাদন)।

ইহার মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃতের ও গোবিন্দলীলামৃতের সংস্করণে এবং হরিসাধক-কণ্ঠহারে শান্তিপুরের শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহযোগিতা ছিল।

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রণীত অন্যান্যগ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবতম্,৫ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ও ১০ম স্কন্ধ (ভাবাবোধিনী সমেত); ভগবদ্গীতা-কণিকা; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সংস্করণ (কিয়দংশ); শ্রীকৃষ্ণ—বাল্যলীলা; ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা; গৌরাঙ্গজয়লীলা; প্রেমানন্দ দাসের মনঃ শিক্ষা (কবিতা); শ্রীকৃষ্ণদাগীতচিন্তামণির সংস্করণ; ভক্তজীবনে বেদান্ত, শিখরিণী (কবিতা); দাস আমি; ইত্যাদি। ইনি চৈতন্যভাগবত, হরিভক্তিতরঙ্গিণী, ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু এবং শান্তিপুরে গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তত্ত্বসন্দর্ভের টীকা সম্পাদিত করেন; ভাগবতের কিয়দংশের ও নিম্বার্কের 'ব্রহ্মসূত্রের' হিন্দী অনুবাদ করেন, শেষোক্ত পুস্তকখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য। ইনি শান্তিপুর সূত্রগড়ে মাতুলালয়ে থাকিয়া বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। তখন ইঁহার নাম ছিল 'তিনকড়ি সান্যাল'। তার পর গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করেন। ইনি প্রথমে বৈষ্ণব ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন, পরে 'নিরঞ্জনানন্দ তীর্থ' নাম লইয়া শঙ্করমঠে প্রবেশ করেন। বর্ত্তমানকালে নাইনিতালে যক্ষ্মারোগার জন্য তিনটী আশ্রম স্থাপন করিয়া তথায় কার্য্য করিতেছেন। এই সূত্রে তাঁহাকে বহু ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সংশ্রবে আসিতে হয়।

প্রভুপাদ রাধিকানাথ অদ্বৈত-প্রপৌত্র যাদবেন্দ্রের (মদনগোপাল গোস্বামী-শাখার প্রবর্ত্তক) বংশসম্ভূত। ইঁহার জন্ম বাং ১২৬১ সালে, মৃত্যু বাং ১৩১৮ সালে ২১শে বৈশাখে। ইঁহাকে দেখিয়াই কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার শান্তিপুরগমন সার্থক হইল' বলিয়াছিলেন। (১) ইঁহার পিতামহ আনন্দচন্দ্র তর্কভূষণ 'গোস্বামী ভট্টাচার্য্য' মহাশয়ের সর্ব্বপ্রধান ছাত্র ছিলেন। ইঁহার পিতা শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী নৈয়ায়িক ছিলেন। রাধিকানাথ প্রভু লিখিতেছেন—"আমার পিতামহের জীবৎকালে শান্তিপুরে ৪০ খানি ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠী ছিল তাহার মধ্যে আমার পিতামহের চতুষ্পাঠী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল এবং তিনি শান্তিপুরের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। পূর্ব্বে আমাদের বঙ্গদেশের নবদ্বীপাধিপতি নৃপতিগণ সমাজপতি ছিলেন। তাঁহাদের শাসনে কেবল ন্যায়শাস্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্রের অধ্যাপকগণ অধ্যাপনার নিমিত্ত চতুষ্পাঠী করিতে রাজাজ্ঞা পাইতেন না। তৎকালে স্মৃতি-প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপকগণ ঘরে বসিয়া অধ্যাপনা করিতেন এবং তাঁহাদের অধ্যাপকের পরিবর্ত্তে অধ্যাপককল্প খ্যাতি হইত। গিরীশচন্দ্র ভূপতির

(১) নবীনচন্দ্র সেন—আমার জীবন; যুবক, আষাঢ় ১৩৩৭

রাজ্যকালে স্মার্ত্তগণ এক কুকুরে টোল (এক দ্বার চতুষ্পাঠী) করিতে রাজানুমতি প্রাপ্ত হন এবং অধ্যাপক খ্যাতিও লাভ করেন। তাহা হইলেও নৈয়ায়িক পণ্ডিতদিগের সম্মান অন্যান্য শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। চতুষ্পাঠী শব্দের অর্থ চারি দর্শন অধ্যয়নের বিদ্যালয়। গিরীশচন্দ্র ভূপতির পূর্ব্বে ন্যায়শাস্ত্রের টোলে অবকাশ মত ধর্ম্মশাস্ত্রাদির অধ্যাপনা হইত। আমার শ্রীপাদ পিতৃদেব শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী প্রভু নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদিগের সময় হইতে বঙ্গদেশের গৌরবস্বরূপ শাস্ত্রের অধ্যায়ন অধ্যাপনায় দেশের লোকের প্রযত্ন শিথিল হইতে আরম্ভ করে। সুতরাং আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া মাঘ-নৈষধ প্রভৃতি কাব্য ও কাব্যপ্রকাশ প্র তি অলঙ্কার, পিঙ্গলাদি ছন্দঃশাস্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবত ও স্বসম্প্রদায়ী ষট্‌সন্দর্ভপ্রভৃতি গ্রন্থের অধ্যাপনা করিয়া বিখ্যাত অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তাঁহার অনেক কৃতী ছাত্রের মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিলাম— শান্তিপুরের মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয়, শ্রীবৃন্দাবন-ধামের নীলমণি গোস্বামী মহাশয়, মুর্শিদাবাদের কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ও ঢাকার দীনবন্ধু গোস্বামী মহাশয়।" (১) প্রভু রাধিকানাথ মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। ইঁহার ব্রহ্মদেশ গমনের কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। ইনি বৃন্দাবন যাইলে ভক্তশিরোমণি গৌরকিশোর দাস ও গৌরহরি দাস মহাশয়েরা ইঁহাকে গিরিধারী জীউর সেবার ভার অর্পণ করেন। সেখানে ইনি হরচন্দ্র গোস্বামী, গল্লুজী গোস্বামী, নিত্যানন্দ দাস বাবাজী, জগদীশ দাস বাবাজী প্রভৃতি বৈষ্ণবচূড়ামণিগণের সাহচর্য্যে পরম ভাগবত-জীবন যাপন করেন। ইনি ৫৬ বৎসরে পরমহংস সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। "পূর্ব্বে সূর্য্যোপরাগে ক্রমিক অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপাল মন্ত্রের চারিটী পুরশ্চরণ করিয়াছি এবং বৃন্দাবনে একটী যথাবিধি মহাপুরশ্চরণ করিয়াছি, তাহার ফলেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিলাম ইহাই আমার ধারণা।

নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ
ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো
ভিক্ষুর্নচাহং নিজবোধরূপঃ॥

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়োক্ত অবস্থা লাভ করিতে পারিলে সন্ন্যাস-গ্রহণ করা সফল হইল মানিব।" (১) বৃন্দাবনে প্রভু রাধিকানাথের কুঞ্জ বা পরমানন্দাশ্রম ভক্তদিগের শান্তির আবাস স্থল ছিল। ইঁহার পুত্রেরা বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন।

স্বর্গীয় মদনগোপাল গোস্বামী ভাগবতরত্ন

প্রণীত গ্রন্থ :—চৈতন্যচরিতামৃতের, লঘুভাগবতের ও হরিভক্তিবিলাসের সংস্করণ, রাসপঞ্চাধ্যায়, ঋতু-সংহার (কবিতা)। কালিদাসেরর সংস্কৃত গ্রন্থ 'ঋতু-সংহারে'র বঙ্গানুবাদ। ইহার বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে, "মহাকবি কালিদাস-প্রণীত সংস্কৃত মূল গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। তাহাতে যে সকল শ্লোক অশ্লীল ছিল তাহা একেবারেই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। আবশ্যকবোধে কোন কোন ভাব পরিবর্ত্তিত বা কোন কোন ভাব নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইতি—২৪শে শ্রাবণ, ১২৬৭ সাল।" কিন্তু ইহা কলিকাতায় ১৯১৬ সংবতে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। এই গ্রন্থের কবিতার নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

তৃষিত চাতকদল নিরন্তর যাচে জল
জলভারে লম্বমান জলধরচয়।
সহশ্রোত্রহররব বর্ষে নবজললব
আর মন্দ বায়ুবলে মন্দবেগে ধায়॥
ব্রজরববিভূষণ আকাশে সঞ্চরে ঘন
সহসৌদামিনী দাম শক্রধনুযুত।

(১) যতিদর্পণ

(১) যতিদর্পণ।

তীক্ষ্ণ জল ধারাশরে বিয়োগীর প্রাণ হরে
সুখের সাগরে ভাসে অপ্রবাসিচিত ॥
আবর্ত্তনিচিত তল গৈরিক-মিশ্রিত জল
মৃদিতসিন্দুররাগ জিত তার রাগে।
মন্দ-পবন-হিল্লোলে উর্ম্মিমালা হেলে দোলে
কামিনী রমণী যেন ধায় অনুরাগে ॥

ইনিও পূর্ব্বোক্ত যাদবেন্দ্র-শাখার অন্তর্গত। ইনি প্রসিদ্ধ বক্তা, পণ্ডিত ও মনোরঞ্জক ভাগবত-পাঠক ছিলেন।

স্বর্গীয় রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবাচস্পতি

এই মহামনস্বীর কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। রাধিকানাথ গোস্বামী ইঁহাকে 'তর্কবাচস্পতি' উপাধিতে আখ্যাত করিয়াছেন। (১) ইঁহার প্রণীত গ্রন্থ :—রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের টীকা; কুসুমাঞ্জলির টীকা (২ খণ্ড); ভাগবতের আংশিক ব্যাখ্যা; ষট্‌সন্দর্ভের আংশিক টীকা; নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌমের পদাঙ্ক-দূতের (১৭২৩ খৃঃ) (২) টীকা; তত্ত্বসংগ্রহ প্রভৃতি। এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি-সম্বন্ধে শান্তিপুর 'পুরাণ-পরিষদের' প্রাণস্বরূপ শ্রীঅজিত-কুমার স্মৃতিরত্ন লিখিতেছেন—"গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয় অদ্বৈতবংশে শান্তিপুরে প্রায় ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া বহু গ্রন্থের টীকা ও অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাহার কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে এবং কতকাংশ লোকলোচনের অন্তরালে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য-রচিত জীব গোস্বামি-কৃত তত্ত্বসন্দর্ভের টীকা শান্তিপুরের কোনও গোস্বামী-পরিবার হইতে সংগ্রহ করিয়া নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য পুথিখানিও আমি শান্তিপুরের কোনও গোস্বামী বাড়ী হইতেই সংগ্রহ করিয়াছি। ইহা গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কৃত 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামক দার্শনিক গ্রন্থ।...তত্ত্বসন্দর্ভের টীকার সহিত মিলাইয়া দেখা গেল যে, ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই গ্রন্থে মঙ্গলাচরণে আছে।—শ্রীমদদ্বৈত বংশেন রাধামোহনশর্ম্মণা। প্রণম্য রাধিকাকান্তং ক্রিয়তে তত্ত্বসংগ্রহঃ ॥ এই পুথি ৫৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।...শ্রীমদদ্বৈত বংশেন শ্রীরামতনু শর্ম্মণা। অলেখি পরমামোদ তত্ত্বসংগ্রহ নামক ॥ শুভমস্তু শকাব্দা ১৭২৪ চৈত্র ৮।" (১) এ-সম্বন্ধে রাধিকানাথ গোস্বামী একটু ভিন্ন রকম লিখিতেছেন (২) "অদ্বৈত প্রভু হইতে সপ্তম পর্য্যায়ে (৩) রাধামোহন তর্ক-বাচস্পতি গোস্বামী ভট্টাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। এই সর্ব্বদর্শন-বেত্তা সাক্ষাৎ বৃহস্পতিকে অদ্যাপিও বঙ্গদেশের কোন্ দার্শনিক পণ্ডিত না জানেন? নৈয়ায়িকগণ তৎকৃত কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতির টীকা নব্যন্যায়ের ক্রোড়পত্র (পাতরা) অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ বিচারক্ষম হইয়া থাকেন। স্মার্ত্তগণ তাঁহার রচিত একাদশীতত্ত্ব, দায়ভাগ প্রভৃতির টীকা অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মমীমাংসায় বিশেষরূপে পটুতালাভ করিয়া থাকেন। ভক্তিশাস্ত্রাভিজ্ঞগণ তাঁহার রচিত ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ও একাদশ স্কন্ধের এবং শ্রুতিস্তুতির ও ব্রহ্মস্তুতির দার্শনিক ব্যাখ্যা অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ভক্তিনিষ্ঠ মহাত্মাগণ তত্ত্বসংগ্রহ ও ভক্তিরহস্য প্রভৃতি নিবন্ধ-গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া ষট্‌সন্দর্ভের অমীমাংসিত স্থলের মীমাংসা অবগত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকেন।" কবি হরিমোহন প্রামাণিক লিখিতেছেন—"যদিও ইনি কেবল ন্যায়, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কাব্যাংশে তাদৃশ বিখ্যাত ছিলেন না, তথাপি পদাঙ্কদূতের টীকা প্রভৃতি যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা দৃষ্ট করিলে

---

(১) যতিদর্পণ। (২) নাটোরের রাজা রামজীবনের সভাসদ্ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা ১৬৪৫ শকে (বাং ১১৩০ সাল) পদাঙ্কদূত রচনা করিয়া শেষ যুগের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের প্রতিভা দেখাইয়া গিয়াছেন।—সহিত্য, চৈত্র ১৩৩৫; রাজশাহীর বিবরণ। পাবনা জেলার অন্তর্গত ঘুরকা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদ জজ আদালতের পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁহার পৌত্র। এই কৃষ্ণনাথের শিষ্য লঘুভারতপ্রণেতা গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ।
—সাহিত্য, চৈত্র, ১৩১৮

(১) শান্তিপুর, আষাঢ় ১৩৩৬ (২) যতিদর্পণ (৩) অদ্বৈত—বলরাম—মধুসূদন (গোস্বামী ভট্টাচার্য্য শাখার প্রবর্ত্তক)—নরোত্তম—শ্রীরাম—রামানন্দ—রাধামোহন
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কাণ্ড, ২য় অংশ

ইঁহাকে কবিশ্রেণীর মধ্যে গণনা করিতে হয়। ইনি শকাব্দা ১৭৩৭ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।" (১)

ইঁহার খ্যাতি-সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারকালে নবদ্বীপের হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি (২), গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ সুকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এবং শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি সুপণ্ডিতগণের যশঃসৌরভে বঙ্গভূমি আমোদিত হইতেছিল।...রাজা বিক্রমের সভায় ক্ষপণক, ধন্বন্তরী, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতাল ভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচিসহ নবরত্নের যেমন সমাবেশ ছিল, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাও তদ্রূপ নবদ্বীপের ন্যায়বিৎ হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, রামরুদ্র বিদ্যানিধি, কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, ষড়্দর্শন-বেত্তাশিব-রাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী-প্রমুখ ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণ ও গুপ্তিপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও হালিসহর-নিবাসী রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি সুকবিগণ এবং মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, গোপালভাঁড় ও হাস্যার্ণব প্রভৃতি অসাধারণ হাস্যরসিক ও উপস্থিত বক্তা প্রভৃতির অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল ছিল। (৩)

রাজা রামমোহন রায় গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্যই শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন। শান্তিপুরবাসী পণ্ডিত রামনাথ তর্করত্নের 'বাসুদেব বিজয়ঃ' নামক মহাকাব্যের সম্বন্ধে স্থানীয় পত্রে (৪) ইঙ্গিত করা হইয়াছিল যে ইহার শেষ ৩ পৃষ্ঠা গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘরে আছে এবং তাহাতে নাম সহী আছে, অতএব প্রকৃত গ্রন্থকার গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ইত্যাদি। এই কথায় আপত্তি হওয়ায়, পরে (১) প্রকৃত কথা লেখা হইয়াছিল। এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের বিষয় আর একবার যথাস্থানে উঠিবে।

শান্তিপুরে আর একজন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য ছিলেন। ইনি রাঢ়া শ্রেণীর গদাধর-পরিবারভুক্ত উড়িয়া গোস্বামি-বংশের কৃষ্ণদেব গোস্বামী। ইনি বড়্দর্শনে পণ্ডিত ছিলেন এবং কৃষ্ণনগররাজ রঘুরাম রায়ের নিকট 'মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য' উপাধি ও ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও ইঁহাকে ১১৪০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ১৪১ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি বৃত্তিস্বরূপ দান করিয়া ছিলেন। (২)

এখানে 'ভট্টাচার্য্য' পদবীর তাৎপর্য্য লিখিত হইল। "ইঁহার (অদ্বৈতের) ছয় পুত্র। তন্মধ্যে ৪ জন নির্ব্বিঘ্ন হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দুই জন মাত্র গৃহে থাকিলেন, ইঁহাদের নাম কৃষ্ণ মিশ্র ও বলরাম মিশ্র। এই 'মিশ্র' উপাধি বর্ত্তমান সময়ের উত্তরপশ্চিম দেশের যাজক ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় কেবলমাত্র যাজকতার পরিচায়ক নহে, পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ষড়্দর্শনের মধ্যে যাঁহার দুইটী দর্শনে পূর্ণ পাণ্ডিত্য থাকিত তিনিই 'মিশ্র' উপাধি পাইতেন। ...কৃষ্ণমিশ্র গোস্বামীর পুত্র রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী এবং বলরাম গোস্বামীর পুত্র মথুরেশ চক্রবর্ত্তী। ইঁহাদের উভয়ের 'চক্রবর্ত্তী' উপাধি, আধুনিক যাজক ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় যাজকতার পরিচায়ক নহে। পূর্ব্বকালে তিন হইতে চারি বা পাঁচ দর্শনের পণ্ডিতগণ 'চক্রবর্ত্তী' এবং 'সার্ব্বভৌম' উপাধিপ্রাপ্ত হইতেন, এবং সর্ব্ব দর্শনের অধ্যাপকের 'ভট্টাচার্য্য' পদবী লাভ হইত। এই বংশে রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী নামক সাঙ্গবেদবেত্তা এক মহানুভব জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার সম্মত বৈদিক ক্রিয়াকলাপ তাঁহার সন্ততিদিগের মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত আছে।" (৩) এখানে প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য যে উক্ত মথুরেশ চক্রবর্ত্তী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন; তাঁহার তিন পুত্র—রাঘবেন্দ্র, ঘনশ্যাম ও রামেশ্বর—যথাক্রমে শান্তিপুরের বড় গোস্বামী, মধ্য বা হাটখোলা গোস্বামী এবং চাকফেরা গোস্বামি-শাখার

(১) ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়নিরূপণ
(২) যশোহর জেলার মহেশপুরের
(৩) নদীয়া-কাহিনী
(৪) যুবক, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩২৪

(১) যুবক, অগ্রহায়ণ, ১৩২৪
(২) যুবক, আষাঢ়, ১৩২৭　　(৩) যতিদর্পণ

প্রবর্ত্তক; তাঁহার 'কালিকাস্তোত্র' টীকাসহ প্রকাশিত হইয়াছে; রামেশ্বরের 'সন্ধ্যা' সুবিখ্যাত; এবং মথুরেশের অন্যতম ভ্রাতা কুমুদানন্দ শান্তিপুরের পাগলা গোস্বামি-শাখার প্রবর্ত্তক।

পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও জীবিত ছিলেন দেখা যায়। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের সময়ে রাজসভাপণ্ডিত ছিলেন। (১) মহারাজ ঈশ্বরচন্দ্র ১৮০২ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। আর এক কথা। ইনি স্যর উইলিয়াম্ জোন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জজপণ্ডিতী প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। জোন্স্ সাহেব ১৭৮৪-৯৪ খৃঃ সুপ্রীম কোর্টের বিচারক ছিলেন।

গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে 'স্মার্ত্ত' বলিয়া অনেকে অজ্ঞতাবশতঃ নিন্দা করিয়া থাকে। ৺দীনবন্ধু মিত্রের কবিতার প্রকৃত ব্যাখ্যাসহ ইঁহার শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবে ভক্তির এবং 'বিশ্বমোহন' বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কথা পূর্ব্বে ও অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। (২) "তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন তাহা তদ্বিরচিত যে কোনও গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ পাঠেই অবগত হওয়া যায়। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের টীকার প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—

> তন্নিন্দীতো নীলাম্বুদরুচিররূপস্তরুতলে
> লসদ্বংশানাদামৃত নিকরবর্ষী প্রিয় সখি।
> নবীনোহয়ং কিং মে রচয়তি হৃদীতীঙ্গিত কথা
> মৃদুস্পন্দা রাধা জয়তি বকশত্রোহৃদিগতা॥
> স্ফুটা প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ব্যাখ্যা মোহন শর্ম্মণা
> ক্রিয়তেদ্বৈতবংশেন গোবিন্দরতিকাম্যয়া॥" (১)

'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থের প্রারম্ভেও ইনি 'রাধিকাকান্ত'কে প্রণতি করিয়াছেন ইহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

ইঁহার বিখ্যাত চতুষ্পাঠীর নিয়ম ছিল এই যে, যদি কোন প্রবেশার্থী ছাত্রের মস্তক অনবধানতাবশতঃ চতুষ্পাঠীর ক্ষুদ্র দ্বারে তিন বার আহত হইত, তাহা হইলে তাহাকে চতুষ্পাঠীভুক্ত করা হইত না। এই 'এক কুকুরে টোল'-সম্বন্ধে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইঁহার চতুষ্পাঠীতে শান্তিপুরের বাহির হইতেও ছাত্র আসিত।

শান্তিপুরের কবিরাজ রঘুনন্দন সেন উদ্ভটসাগর মহাশয়ের মুখে একটী আখ্যায়িকা শোনা যাইত। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত পণ্ডিতের পক্ষে এইরূপ ভ্রম না হওয়াই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। একদা পিণ্ডদান করিবার সময় পুরোহিত মন্ত্র পড়াইলেন, "পিতা রামানন্দ ইত্যাদি", পিণ্ড তখন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হস্তে। তিনি আপত্তি করিয়া "পিতঃ রামানন্দ ইত্যাদি" হইবে বলিলেন। মীমাংসার জন্য প্রতিবেশী সর্ব্বানন্দবংশীয় প্রখ্যাত রামধন তর্কবাগীশের নিকট লোক গেল। ইনি তখন আহারান্তে আচমন করিতেছিলেন। ইনি অতিরিক্ত পাঠের জন্য অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু এমন স্মৃতিশক্তি যে অধীত পুস্তকের কোন্ পৃষ্ঠায় কি আছে বলিয়া দিতে পারিতেন। ইনি বিসর্গ-সন্ধির নিয়মানুসারে পুরোহিতকেই সমর্থন করিলেন। এই গোস্বামী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অন্যতম শাখায় পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণগোপাল তর্করত্ন মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়া শান্তিপুর অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

(১) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত

(২) পঞ্চপুষ্প, শ্রাবণ ১৩৩৮, পৃঃ ৫৭৮

(১) শান্তিপুর, আষাঢ় ১৩৩৬

—:০:—

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙ্গলা-সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব :—

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ-সভায় রাজস্ব-সচিব মিঃ এ মার বাঙ্গালা-গভর্ণমেণ্টের এক বজেট-উপস্থাপিত করেন—উহাতে বাঙ্গালার আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। গত বৎসর, বর্ত্তমান বৎসর এবং আগামী বৎসর এই তিন বৎসরেরই হিসাব ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাব আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৩০-৩১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর বাঙ্গালা-সরকারের আয় হইয়াছিল ১০ কোটী, ৫৭ লক্ষ, ৯০ হাজার টাকা, আয়, ব্যয় হইয়াছিল ১২ কোটী, ১৩ লক্ষ, ১ হাজার টাকা। ১ কোটী, ৯৪ লক্ষ, ৭৮ হাজার টাকার মজুত তহবিল লইয়া এই বৎসর আরম্ভ হইয়াছিল এবং শেষে মজুত রহিল ৩৯ লক্ষ, ৬৭ হাজার টাকা। বাঙ্গালা সরকারের অনুমান ছিল যে, এই বৎসরের শেষে ৩১ লক্ষ, ১৬ হাজার টাকা মজুত থাকিবে, কিন্তু পরিমাণে উহা ৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা আরও বেশী হইয়া দাঁড়াইল।

বর্ত্তমান বৎসর অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ সালের অনুমিত হিসাবে দেখা যায় যে, এই বৎসরে মোট ১১ কোটী, ৫৮ লক্ষ, ৪ হাজার টাকা ব্যয় হইবার কথা ছিল কিন্তু বর্ত্তমান খরচ-পত্রের মিতব্যয়িতায় কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, উহা আরও কমিয়া ১১ কোটী, ১৩ লক্ষ, ৮৯ হাজার টাকা হইবে; অর্থাৎ বরাদ্দ অপেক্ষা ৪৪ লক্ষ, ১৫ হাজার টাকা কম ব্যয় হইবে। এ বৎসরে অনুমান রাজস্ব পাওয়া যাইবে ৯ কোটী, ৬ লক্ষ, ৩৯ হাজার টাকা। পূর্ব্ববৎসরের রাজস্বের আয়ে আমরা দেখি ৯ কোটী, ৬৬ লক্ষ, ৩৪ হাজার টাকা, আবার ১৯২৯-৩০ সালের হিসাবে আয় দেখিতে পাই ১১ কোটী, ৩৫ লক্ষ, ৮৭ হাজার টাকা। সুতরাং ১৯২৯-৩০ সালের তুলনায় এ বৎসর রাজস্ব বাবদ ২ কোটী, ৭৭ লক্ষ, ৮৪ হাজার টাকা কম পাওয়া যাইতেছে।

ব্যয়ের দিকে যদিও গত বৎসরের ন্যায়ই অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, অধিকন্তু কর্ম্মচারীদের খরচ বেতন প্রভৃতি শতকরা দশটাকা হারে হ্রাস করা হইয়াছে, কিন্তু রাজস্বের তহবিল হইতে ঐ ১১ কোটী, ১৩ লক্ষ, ৮৯ হাজার টাকা ব্যয় হইবেই—অর্থাৎ বর্ষশেষে ২ কোটী, ৭ লক্ষ, ৫০ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে। এরূপ ব্যয়বৃদ্ধির কারণও মিঃ মার দেখাইয়াছেন। গত আগষ্ট মাসে কাশিমবাজার ওয়ার্ডস্ এষ্টেটকে আড়াই লক্ষ টাকার কর্জ্জ দেওয়া মঞ্জুর, রাজনৈতিক চাঞ্চল্য, বিপ্লব, জেল-পুলিশের বৃদ্ধি প্রভৃতির ব্যয়ে খরচের পরিমাণ এইরূপ দাড়াইয়াছে। মোটামুটি বাঙ্গালা-সরকারের ২ কোটী, ১০ লক্ষ, ৯৪ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে। স্থির হইয়াছে এই টাকা ভারত-সরকারের নিকট হইতে কর্জ্জ লওয়া হইবে এবং বার্ষিক ১৪ লক্ষ, ৩৩ হাজার টাকা হিসাবে ৫০ কিস্তিতে তাহা শোধ করা হইবে।

এইবার আগামী বৎসর অর্থাৎ ১৯৩২-৩৩ সালের হিসাব। ইহার হিসাবে মিঃ মার বলেন যে, এ বৎসর মোট ৯ কোটী, ৪৯ লক্ষ, ৮৪ হাজার টাকা আয় হইবে অর্থাৎ বর্ত্তমান বর্ষের তুলনায় ৪৩ লক্ষ, ৪৫ হাজার টাকা বেশী।

আগামী বৎসরের মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ১১ কোটী, ১২ লক্ষ, ৯৮ হাজার টাকা অর্থাৎ বর্ত্তমান বৎসর অপেক্ষা ৯১ হাজার টাকা কম। বর্ত্তমান বর্ষে যে ব্যয় সঙ্কোচ করা হইয়াছে আগামী বৎসরেও তাহাই চলিবে। ১৯৩১-৩২ সালের যে কয়মাসের জন্য এই ব্যয় হ্রাস করা হইয়াছে, তাহাতে ৯ লক্ষ, ১০ হাজার টাকা বাঁচিবে বলিয়া আশা করা গিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ১৯৩২-৩৩ সালে কার্য্যতঃ ২৭ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা বেশী বাঁচিতেছে। এতদ্ভিন্ন যদিও আরও অনেক উপায়ে ব্যয়-সঙ্কোচ করা হইবে, কিন্তু তাহা জেল, পুলিশ, কর্জ্জের কিস্তি, রোড-ফণ্ড প্রভৃতি ব্যয়ে খরচ হইয়া যাইবে।

১৯৩২-৩৩ সালে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট যে বিভাগে যে ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটী বিভাগের টাকার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল—

রাজস্ব-বিভাগ	৪১,২৫,০০০	টাকা
আবগারী-বিভাগ	১৭,৮০,০০০	"
ট্যাক্স আদায়	৫,৩৮,০০০	"
বন-বিভাগ	১৬,১৩,০০০	"
রেজিষ্ট্রেসন	১৮,৯৯,০০০	"
সাধারণ শাসনকার্য্য	১,১৮,৭৯,০০০	"
বিচার-বিভাগ	৯৭,০৫,০০০	"
জেল-বিভাগ	৫০,৫১,০০০	"
পুলিশ-বিভাগ	২,২০,৭০,০০০	"
শিক্ষা-বিভাগ	১,১৭,৪২,০০০	"
মেডিক্যাল	৫১,৮৮,০০০	"
শিল্প-বিভাগ	১১,৩৮,০০০	"

মোটকথা, বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নয়। ইহার অর্থনৈতিক অবস্থা যে ক্রমশঃ কিরূপ সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে, তাহা বাস্তবিকই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের যদি উন্নতি হয়, তবে রাজস্বও বাড়িবে এবং ভারতের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইবে। প্রথমতঃ ১৯৩২-৩৩ সালের শেষে অনেক ঘাটুতি তো পড়িবেই, উপরন্তু সেই ঋণভার শোধ করিতে গিয়া ১৯৩৩-৩৪ সালের শেষে যে কিরূপ অবস্থা ধারণ করিবে, তাহা বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিবার কথা।

মিঃ মার তাঁর রিপোর্টের উপসংহারে বলিয়াছেন—'আমি আজ যে বর্ণনা দিলাম, তাহা বাস্তবিকই নৈরাশ্যজনক। বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-বিষয়ক কমিটীর অধিবেশন হইতেছে। আমি শীঘ্রই এই কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিতে যাইব। এই কমিটী যদি বাঙ্গালার প্রতি সুবিচার না করেন, তাহা হইলে আমি বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে কোন আশাই দেখিতেছি না। লর্ড মেষ্টনের ব্যবস্থার ফলে বাঙ্গালার প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া বাঙ্গালা-দেশের অর্থাগমের অবস্থা সুগম করা হইবে, ইহাই আমি প্রত্যাশা করিতেছি।'

ডাক-বিভাগের সমস্যা :—

ভারত-সরকারের ডাক ও তার-বিভাগের ১৯৩০-৩১ সালের রিপোর্টে প্রকাশ—এই বৎসর এই বিভাগে গভর্ণমেণ্টের মোট ৬২ লক্ষ ৯ হাজার ২ শত ১২ টাকা ক্ষতি হইয়াছে; ইহার পূর্ব্ববৎসর অর্থাৎ ১৯২৯-৩০ সালে মোট ক্ষতি হইয়াছিল ২১ লক্ষ, ৪০ হাজার, ৩শত ৩৩ টাকা। এই বৎসরে ডাক ও তার-বিভাগে সরকারের মোট ৭ কোটী, ৫০ লক্ষ, ৯১ হাজার, ৩ শত, ৭১ টাকা আয় ও ৮ কোটী, ১৩ লক্ষ, ৫ শত, ৮৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

রিপোর্টে প্রকাশ, আলোচ্যবর্ষের শেষে ভারতবর্ষে মোট ২৪ হাজার, ১ শত, ৭৫টী পোষ্ট অফিস এবং মোট ১ লক্ষ, ১৫ হাজার, ২ শত, ৫ জন কর্ম্মচারী ছিল। এই বৎসরে ৫ কোটী, ৪০ লক্ষ রেজেষ্টারী জিনিস লইয়া মোট ১২৯ কোটী ৯৭ লক্ষ জিনিস ডাক-বিভাগের মারফতে বিলি হইয়াছে, ৬৩ লক্ষ টাকার ডাকটিকিট বিক্রয় হইয়াছে, ৩ কোটী, ৯০ লক্ষ মণি-অর্ডারে ৮৬ কোটী, ৪৬ লক্ষ টাকার মণি অর্ডার হইয়াছে এবং ভিঃ পিঃ পার্শেলের মারফতে ২৪ কোটী, ৭০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৫০ লক্ষ 'ইন্‌সিওরে' মোট ১৩৮ কোটী, ৭৫ লক্ষ টাকা বিলি হইয়াছে। এই বৎসর অস্থায়ীভাবে নূতন পোষ্ট অফিস ১৩৮টী খোলা হইয়াছে। এই পোষ্ট অফিসগুলি এবং গত বৎসর যত পোষ্ট অফিস অস্থায়ীভাবে খোলা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ৪১৩টী স্থায়ী করা হইয়াছে।

যাহা হউক, দেশের অর্থনীতিক সঙ্কট ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দার জন্যই এই ক্ষতি হইয়াছে, ইহাই কর্ত্তৃপক্ষের মত কিন্তু ইহার জন্যই কি এইরূপ হইয়াছে? ডাকমাশুলের হার বৃদ্ধি করাও ইহার একটী অপর কারণ। আমরা দেখি, ডাকমাশুল বৃদ্ধি করিবার পূর্ব্বে ডাক-বিভাগের যেরূপ আয় হইত, তাহার পরে তাহা অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া গিয়াছে।

ভারতে স্বর্ণ-রৌপ্যের আমদানী ও রপ্তানী :—

বর্ত্তমানে বাজারের স্বর্ণের অবস্থা যে কিরূপ, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই। ভারতের স্বর্ণ ক্রমে ক্রমে অস্বাভাবিকরূপে বিলাতে রপ্তানী হইতেছে। পূর্ব্ববৎসর ও বর্ত্তমান বর্ষের আমদানী-রপ্তানীর তুলনা করিলে সকলেই সম্যক্‌রূপে ইহা বুঝিতে পারিবেন।

গত ৩০শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে এবং পূর্ব্ববৎসর অনুরূপ সপ্তাহে ভারতের বিভিন্ন বন্দরে কি পরিমাণে স্বর্ণরৌপ্যের আমদানী-রপ্তানী হইয়াছে তাহার তালিকা এখানে হাজার করা প্রদত্ত হইল—

আমদানী

	১৯৩২		১৯৩১	
	স্বর্ণ	রৌপ্য	স্বর্ণ	রৌপ্য
কলিকাতা	...	...	৬৮	৯৪৩
বোম্বাই	১১৪	৫	২১৪	১৬৩১
করাচী	৮৪	৯	...	৩
মাদ্রাজ	...	...	...	...
রেঙ্গুণ	...	...	...	১৯৫

রপ্তানি

	২৫৯২৯	৭৩৮		১৫

১৯৩১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩২ সালের এবং ১৯৩০-৩১ সালের অনুরূপ সময়ের হিসাব—

আমদানী

	১৯৩১—৩২		১৯৩০—৩১	
	স্বর্ণ	রৌপ্য	স্বর্ণ	রৌপ্য
কলিকাতা	৩১	১২৪৯	৮৬৩০	২৬৮২৪
বোম্বাই	১৫৯৬	২৭৩৭	৮৪২১০	৬৩৪০১
করাচী	৩৬৭	৭৫২	৪১৫	২৩০১
মাদ্রাজ	১৪৮৭	৩২১	২১৮৫১	৬১২
রেঙ্গুণ	২৫০	৩৩৭	১০৪৫	১১১১

রপ্তানি

	৪৬৩২৫০	১৫২৫৮	৩৭২৪	৪৩০৯

তিন মাসের হিসাব

গত অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাস এবং এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নয় মাসে কত (হাজার) আমদানী-রপ্তানি হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্ন প্রদত্ত হইল :—

স্বর্ণ

	অক্টোঃ	নবেঃ	ডিসেঃ	এপ্রিল—ডিসেঃ
আমদানী	৪৯২৭	২৭০২	২৯৯৪	২৩১০২
রপ্তানি	৯০৫৪৪	৮৫৭৪৫	১৭৭৬৫২	৩৭০৪৩৬

রৌপ্য

আমদানী	৪৭০৫	৩০৪৯	৬৭৯৬	৪১৪৮০
রপ্তানি	১২৯৫	৯০৪	৯৭১	১৩৮৭২

ভারতে জাপানী দ্রব্যের প্রসার :—

আমাদের দেশে নানাপ্রকার জাপানী দ্রব্য ক্রমশঃ ছাইয়া পড়িতেছে ; বিশেষতঃ মোজা, গেঞ্জি, নানা প্রকার বস্ত্র, সাবান, খেলনা প্রভৃতি এত প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইতেছে যে, তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করা ভারতবাসীর পক্ষে একান্ত অসম্ভব। আমরা যদি গত কয়েক বৎসরের জাপানী জুতার আমদানীর তুলনামূলক হিসাব দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে উহা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা দেখি,

১৯২৬—২৭	১৯১৫০০০ টাকায়
১৯২৭—২৮	২৭৭৩০০০ "
১৯২৮—২৯	৩৩২০০০০ "
১৯২৯—৩০	৬৭৬১০০০ "
১৯৩০—৩১	১০৯২১০০০ "

এতদ্ভিন্ন ১৯৩১ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বরের মধ্যে আসিয়াছে ৭৩০৪০০০ টাকার। এই সমুদয় জুতার মূল্য ১৷০ টাকা হইতে ১৮৹ টাকা পর্য্যন্ত।

এইরূপ সকল জাপানী দ্রব্যই বাজারে বেশ প্রসার লাভ করিতেছে। এই প্রসারের মূল কি ?

মায়াবাদ

স্বামী বাসুদেবানন্দ

৪। প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপাসনা ও আপ্ত

চার্ব্বাকেরা বলে থাকেন, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু তা' হ'তে পারে না—তবে ইন্দ্রিয়-তন্ত্র রাজ্যে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলা যেতে পারে। দিনমানে আকাশে তারা দেখা যায় না বলে কি দিনে আকাশে তারা থাকে না? অনুমান ছাড়া আমরা এক পাও চলতে পারি না; কিন্তু অনুমান আবার প্রত্যক্ষমূলক। দশটা জিনিস দেখে তবে আমরা অনুমান করে থাকি। সাধু মরেছে, অসাধু মরেছে, রাজা মরেছে, প্রজা মরেছে, সেইজন্য আমরা অনুমান করে থাকি সকলকেই মরতে হ'বে। যে জিনিস কখনও আমরা দেখি নি সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও অনুমানও চলে না; কিন্তু প্রত্যক্ষ করতে হ'লে পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে করতে হয়। তবে প্রত্যক্ষের অনেকগুলি বাধা আছে। নিম্নে * সেগুলার কথা বল্‌ছি:—

(১) অতি দূর—বিষয় যদি অতি দূরে থাকে তা হ'লে প্রত্যক্ষ হয় না। উড়ো-জাহাজ আকাশে ভেসে যাচ্ছে, প্রথমে তাকে শব্দ দিয়ে ও চক্ষু দিয়ে জানছি। তারপর যত দূরে যেতে লাগল শব্দ ক্ষীণ হ'য়ে মিশিয়ে গেল, কেবল চোখে একটা চিলের মত দেখা যেতে লাগল, তারপর চোখও আর দেখতে পেলে না, অতিদূর বলে।

(২) অতি-নিকট—বিষয় যদি অতি নিকটে থাকে—যেমন চোখের কাজল। একখানা চিঠি পড়তে গিয়ে খুব চোখের কাছে নিয়ে এলে অক্ষর আর পড়তে পারা যাবে না।

(৩) ইন্দ্রিয়-বৈগুণ্য—ইন্দ্রিয়ের গঠনে যদি দোষ থাকে, তা হ'লেও বিষয় অনুভব হয় না; অন্ধ, কালা ইত্যাদি

(৪) মনের অনবস্থান—মন চঞ্চল হ'য়ে রয়েছে আর একজনকে দেখবার জন্য—ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মোপদেশ হচ্ছে তার একটী কথাও কাণে ঢুকলো না।

(৫) সূক্ষ্মতা—গায়ে কত বালি লেগে রয়েছে, কিন্তু স্পর্শ তা ধরতে পারছে না। বিছানার চাদরে কত ধূলিকণা ছড়ান রয়েছে, দু'বার ঝেড়ে দেখলুম বেশ ধবধবে পরিষ্কার।

(৬) ব্যবধান—মেঘের অবগুণ্ঠন না সরে গেলে চাঁদ দেখা যায় না।

(৭) অভিনব—সূর্য্যের তেজে নক্ষত্র বা পদ্মের রূপে অপর ফুল আর নজরে পড়ে না।

(৮) সমানাভিহার—দু'টো জিনিস এমন মিশিয়ে থাকে যে, একটাকে আর একটা থেকে পৃথক করে ধরা যায় না। যেমন সোণা থেকে খাদ, বা সুন্দর দেহ থেকে কুৎসিত মনকে ধরা বড় কঠিন।

প্রত্যক্ষের এই সকল দোষ থাকা সত্ত্বেও, প্রত্যক্ষ ছাড়া অনুমান হ'তে পারে না। যখন আমরা অনুমান করি তখন যে বিষয়-সম্বন্ধে আমরা অনুমান করি, সে-সম্বন্ধে আমাদের কিছু জ্ঞান থাকা দরকার (সামান্যরূপে জ্ঞান এবং বিশেষ-রূপে অজ্ঞান)। আর সেই সন্দেহপূর্ণ অল্পজ্ঞানকে সম্পূর্ণ করবার জন্যই অনুমান। প্রথমে যে অল্প জ্ঞান থাকে সেটা প্রত্যক্ষমূলক। এ জিনিসটা বৈশেষিকের ন্যায়ের পাঁচটা অবয়ব পর পর বিভাগ ক'রে সাজিয়ে গেলেই অনুমানে প্রত্যক্ষের প্রয়োজনীয়তাটা বেশ বোঝা যাবে—

ন্যায়াবয়ব *

১। পাহাড়ে আগুন আছে—প্রতিজ্ঞা

২। ধূম আছে বলিয়া—হেতু

৩। উনন প্রভৃতি জায়গায়,

---

* অতিদূরাৎ সমীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্যাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥

—সাংখ্যকারিকা, ৭

* ন্যায়—প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনাত্মক পঞ্চাবয়ব বাক্যম্। —ইতি গণেশ।

যেখানেই ধূম দেখা যায়,

সেখানেই বহ্নি দেখা যায়—উদাহরণ (প্রত্যক্ষমূলক)

৪। পাহাড়ে ধূম দেখা যাইতেছে—উপনয়

৫। পাহাড়ে বহ্নি আছে—নিগমন

এখানে হেতু হ'ল ধূম, সাধ্য হ'ল বহ্নি, আর পক্ষ হ'ল পর্ব্বত। এখন যেখানেই ধূম আছে, সেইখানেই বহ্নি আছে, এই ব্যাপ্তি-জ্ঞান-সাহচর্য্য নিয়ম বা অবিনা ভাব পেতে হ'লে, প্রত্যক্ষ ছাড়া হয় না। দশটা জায়গায় দেখতে হ'বে যে, যেখানেই ধূম আছে সেখানেই বহ্নি আছে। তখন আমাদের ধূম আর বহ্নির সাহচর্য্য-জ্ঞান হয়। আর এই সাহচর্য্য বা ব্যাপ্তি-জ্ঞান ছাড়া অনুমান হ'তে পারে না।

প্রমাণ জিনিসটা গৌতম-ন্যায়েতে যেমন বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে এমন আর জগতের কোনও দর্শন-শাস্ত্রে হয় নি। এ্যারিষ্টটলের লজিকটা একেবারে গৌতম ন্যায়ের নকল। তিনি যেমন তাঁর 'লজিক'এ আদি-গৌতম-ন্যায়ের অনুমানের পাঁচটী অবয়ব থেকে মাত্র তিনটী অবয়ব নিয়েছেন, আমাদের দেশের নব্য নৈয়ায়িকেরাও অনুমানের মাত্র তিনটী সদৃষ্টান্ত অবয়ব রেখেচেন; কিন্তু বৈশেষিক কণাদ প্রথম অনুমানের পঞ্চ-অবয়ব আবিষ্কার করেন এবং যা গৌতম তাঁর ন্যায়ে গ্রহণ করেছেন এবং যা আজকালকার লজিক (ইন্‌ডাকশান ও ডিডাক্‌শন) বলে পরিচিত—সেইটাই হচ্ছে ঠিক্ সম্পূর্ণ ন্যায়। এ্যারিষ্টটল পঞ্চাবয়বের মাত্র তিনটীতে সংক্ষেপ করে যুক্তি পদ্ধতির অবনতি ছাড়া উন্নতি করেন নি। দৃষ্টান্ত বা 'অব্‌জারভেশন' জিনিসটা বাদ দিলে—যুক্তির মধ্যে আর রইল কি? সুখের বিষয় নব্য-নৈয়ায়িকেরা প্রতিজ্ঞা, হেতু ও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করায় যুক্তি সংক্ষেপ হ'লেও, আসল জিনসটা ঠিক আছে। কণাদ ছিলেন বৈজ্ঞানিক—তাই জগদ্রহস্যের নির্ণয় করতে গিয়ে ঐ পাঁচ অবয়বের উপকারিতা বুঝতে পেরেছিলেন। বৈজ্ঞানিক নইলে যুক্তির মধ্যে উদাহরণ ও উপনয়ের উপকারিতা বুঝতে পারবে না।

সূত্রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, গৌতম চারটী প্রমাণ মেনেছেন—(১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান, (৩) উপমান বা সাদৃশ্য জন্য জ্ঞান এবং শব্দ। আর ন্যায়ের অবয়বও পাঁচটী ধরেছেন—১। প্রতিজ্ঞা, ২। হেতু, ৩। উদাহরণ,৪। উপনয় ৫। নিগমন * কিন্তু সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ উপমান বাদ দিয়ে কেবল তিনটী প্রমাণ মেনেছেন। † —দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্ত-বাক্য। তিনি বলেন, অন্য যত রকমের প্রমাণই আবিষ্কার হো'ক না কেন, সবই এই তিনটী প্রমাণের মধ্যে পড়ে যাবে। যা কিছু প্রমেয় এই তিন প্রমাণে সিদ্ধ হ'তে পারে।

এঁদের মতে অনুমান আমরা তিন রকম করি—

১। পূর্ব্ববৎ—কারণ দেখে কার্য্যের নির্ণয়। যেমন, বীজ দেখে বৃক্ষের অনুমান। (বীত বা অন্বয়)

২। শেষবৎ—কার্য্য দেখে কারণের নির্ণয়। যেমন ঘট দেখে কুম্ভকারের অনুমান। (অবীত বা ব্যতিরেক)

৩। সামান্যতোদৃষ্ট—একটা বিশেষ জিনিস দেখে সেই জাতির সমস্ত জিনিসের জ্ঞান-সম্বন্ধে অনুমান। (বীত বা অন্বয়)

একটা ঘট দেখে, সব ঘটের (ঘটজাতির) জ্ঞান-সম্বন্ধে অনুমান।

দু'চারটী মানুষকে মরতে দেখে সব মানুষ-জাতির মৃত্যু অনুমান করা।

কিন্তু স্বর্গাদি অলৌকিক বিষয়ে আপ্ত প্রমাণ ছাড়া আর উপায় নেই,ইহা এঁরা স্বীকার করেন বটে,কিন্তু যুক্তি বিরোধী হ'লে শাস্ত্র-বাক্যও শোধন করে নিতে হ'বে, এ-কথাও আবার বলে থাকেন।

অনুমিতি = ব্যাপ্তি-বিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানং পরামর্শঃ। যথা, 'বহ্নি ধূমবানয়ং পর্ব্বতঃ' ইতি জ্ঞানং পরামর্শঃ, তজ্জন্যং, 'পর্ব্বতো বহ্নিমান' ইতি জ্ঞানমনুমিতিঃ। ৪৬। অন্নম্ ভট্ট।

অবয়ব-দৃষ্টান্ত=পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ, যো যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্, যথা মহানসং, বহ্নিব্যাপ্য ধূমবাংশ্চায়ং, তস্মাদ্‌-বহ্নিমান। —ইতি জগদীশ।

* প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্ত-অবয়ব-তর্ক-নির্ণয় বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিশ্রেয়সাধিগমঃ। এষাং লক্ষণানি যথা—প্রত্যক্ষ-অনুমান-উপমান-শব্দাঃ প্রমাণানি।১। প্রতিজ্ঞা-হেতু-উদাহরণ-উপনয়-নিগমনানি-অবয়বাঃ। ৭।

† দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণাসিদ্ধত্বাৎ ত্রিবিধং প্রমাণ মিষ্টং প্রমেয় সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি ॥৪॥

৫। বেদ

কিন্তু যত রকমেরই প্রমাণ প্রয়োগ হোক না কেন, অলৌকিক বিষয়ে বেদই স্বতঃপ্রমাণ। বাক্য মনের অতীত সত্তাকে ও স্বর্গাদি লোককে জানতে গেলে শ্রুতিকে মানা ছাড়া এবং তার অনুকূল যুক্তি ছাড়া উপায় নেই। তারপর শ্রুতি যে সাধনের উপদেশ করেছেন, ঠিক সেই রাস্তা দিয়ে গেলে সত্যের উপলব্ধি হ'বে। প্রত্যক্ষমূলক তর্ক করতে গেলে ভুল হ'বে। প্রত্যক্ষ জিনিসটা আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আবদ্ধ। সেই প্রত্যক্ষের আবার কত রকমের দোষ হতে পারে, তাও আমরা দেখিয়েছি। প্রত্যক্ষমূলক অনুমান করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক একজন দার্শনিক, এক এক নূতন সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছেচেন। এখন কার অনুমিতি ঠিক? পরন্তু বেদের সিদ্ধান্ত এক ব্রহ্মবস্তুতেই পরিসমাপ্ত। সকল সমাধিবান ব্যক্তি সেখান থেকে ফিরে এসে সেই অদ্বয় সত্যেরই সন্ধান দিয়েছেন। পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতে যুক্তিতর্ক দিয়া কতকটা সত্য নির্ণয় করতে পার, কিন্তু অলৌকিক বিষয়ে শ্রুতির উপদেশ ও সাধন ছাড়া আর কি উপায় থাকতে পারে? তবে বৈদান্তিকেরা যে যুক্তি করে থাকেন, সে হ'ল নিজের মত দৃঢ় করবার জন্য শ্রুতির অনুকূল যুক্তি। সে যুক্তির অভিপ্রায়, বেদের সত্যকে মানলে জগতের সকল সমস্যার সমাধান হয়, কিন্তু এ ছাড়া আর যা কিছু মেনে জগতের তত্ত্ব সমাধান করতে যাবে তাইতেই গোল বেধে যাবে এবং পদে পদে স্ববিরোধ এসে উপস্থিত হবে—এইটে বোঝবার জন্য। ব্যবহারিক রাজ্যে ন্যায়ের অবয়ব যত রকম ইচ্ছে বাড়িয়ে গেলে ক্ষতি নেই, কিন্তু পারমার্থিক সত্তাকে বুঝতে গেলে অধ্যারোপ অপবাদ-ন্যায় দিয়ে বুঝতে হ'বে। অধ্যারোপ মানে এই জগৎটা ব্রহ্মের উপর দেশ-কাল-নিমিত্ত বা নাম রূপ দিয়ে কল্পিত। এই অধ্যারোপ ন্যায় দিয়ে জগৎ-রহস্য বোঝা আর এর বিরোধী কথা যা কিছু তাতে অপবাদ দিয়ে তার ভুল দেখিয়ে দেওয়া —এর উদাহরণ হচ্ছে রজ্জুতে সর্প ভ্রম।

এখন তোমারা যে এই উদাহরণের ভুল ধরেছিলে যে, পূর্ব্ব সর্পজ্ঞান না থাকলে রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তি হ'তে পারে না। আবার এই সর্পজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক। ব্রহ্মেতে জগৎ-ভ্রান্তি হ'বার পূর্ব্বে জগতের জ্ঞান থাকা চাই, আর সে জ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক, তা হ'লেই জগতের পূর্ব্ব অস্তিত্ব মানতে হয়; কিন্তু আমরা বলি, কোন বিষয়ের ধারণা হ'তে লেগেই যে (১) একটা বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ করা চাই বা (২) একটা বাহ্য বস্তুকে প্রত্যক্ষ করলেই যে ঠিক সেই বাহ্য বস্তুরই প্রমাণ জ্ঞান হ'বে, বা (৩) অনুমান দ্বারা প্রত্যক্ষ শোধন করে নিলেই প্রমা জ্ঞান হ'বে—তার কোনও মানে নেই। এ যুক্তির ভুল আমরা দেখাচ্ছি।

তোমরা বলেছিলে কোন বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ ছাড়া কোনও সংস্কার হ'তে পারে না এবং সে সংস্কার স্মৃতিতেও উঠতে পারে না। সাপ দেখেছিলুম, তার সংস্কার ছিল, রজ্জুতে এখন সেই সংস্কারের স্মৃতি এসে আরোপিত হ'য়েছে। আমরা বলি এ সংস্কার অনাদি, রজ্জুকে উপলক্ষ করে বর্ত্তমানে স্মৃতি পথে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। জ্ঞান জিনিসটা বাইরে থেকে এসে আমাদের ভেতর ঢোকে না, ও ভেতরেই আছে, অজ্ঞাত বাহ্য বস্তুর সংঘাতে সে তার নাম-রূপ বদলাচ্ছে মাত্র, বা বাহ্য বস্তুকে উপেক্ষা করেও নিজের মনে ইন্দ্রপুরী গড়ছে। * দেখ, তোমারা বলেছিলে দেহের অতিরিক্ত আত্মা তোমরা বেশ বোঝ, দেহে ও আত্মাতে ভ্রম হবার কোনও হেতু নেই। যুক্তিতে বেশ বোঝা গেল বটে কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে রাম-শ্যাম কি ঠিক চেতন আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক করে ভাবতে পারে? তুমি যখনই বল, 'আমি ঘরে শুয়ে আছি, এখন আমি বাইরে যেতে পারব না'—তখন কি দেহের অতিরিক্ত চেতন আত্মার কথা তোমার মনে ছিল। বলতে পার ওটা আমারা গৌণ প্রয়োগ করেছিলাম— 'বীরসিংহ' মানে লোকটা যথার্থ সিংহ নয়, সিংহের মত বলবান—কিন্তু গৌণ প্রয়োগের কথা ব্যবহার মনে থাকে না, আমরা তখন দেহকেই আত্মা বলে বুঝি। মানুষে সিংহের গৌণ-প্রয়োগ হ'তে পারে—সিংহের ন্যায় বলবান মানুষ, কিন্তু আত্মাতে দেহের গৌণ প্রয়োগ কি করে হ'বে? দেহের কোনটার মত আত্মা?—ব্যবহারিক কালে দেহটাই আত্মা এইরূপ প্রমা বা নিশ্চয়-জ্ঞান হ'য়ে থাকে। এখন বল দেখি, দেহতেই যখন আত্মার অধ্যারোপ করছি, তখন

The Phenomenon is the product of reason; it does not exist outside of us, but in us; it does not exist beyond the limits of intuitive reason. —*Kant*.

আত্মাকে কবে প্রত্যক্ষ করেছিলুম এবং সেই প্রত্যক্ষ-জন্য চেতনের সংস্কার আজ দেহকে অবলম্বন করে স্মৃতি-রূপে উদিত হয়েছে?

আমরা এটাকে নিয়ে ন্যায় শৃঙ্খলে সাজাচ্ছি—

দেহ ও আত্মা পৃথক

কারণ, দেহ জড় এবং আত্মা চেতন

কিন্তু দেহেতে আমাদের আত্ম-ভ্রম হচ্ছে

যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম

কিন্তু রজ্জুতে সর্প ভ্রম হ'তে গেলে বাহ্য প্রত্যক্ষমূলক পূর্ব্ব সর্পজ্ঞান বা সংস্কার থাকা চাই

এখন দেহেতে আত্মভ্রম হ'য়েছে

তখন আত্মার পূর্ব্বজ্ঞান থাকা চাই

পূর্ব্বজ্ঞান বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষ থেকে হয়

যেমন পূর্ব্বে সাপ দেখেছিলুম তাই এখন সাপের সংস্কার আছে।

তা হ'লে আত্মাকে কবে প্রত্যক্ষ করেছিলুম যার সংস্কার আজ স্মৃতিপথে আরূঢ় হ'য়ে দেহের ওপর আত্মার অধ্যারোপ করেছে।

আত্মা বাহ্য বস্তু নয় আত্মা আছেন বলে বাহ্য বস্তু আছে।

যা বাহ্য বস্তু নয় তা প্রত্যক্ষ হয় না

অতএব আত্মার পূর্ব্বজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নয়

অনুমানমূলকও নয় [চক্রক দোষ হইবে]

কারণ অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক

অতএব আত্মার জ্ঞান অনাদি সংস্কার

তেমনি আবার দেশ, কাল নিমিত্ত এসকলের জ্ঞান কোথা থেকে এল। প্রত্যক্ষ করতে গেলেও ঐ গুলোকে আগে ধরে নিয়ে তবে বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হয় * বেদান্তীরা দেশকেই আকাশ বলেছেন, আকাশের চেয়ে বড় জিনিসের জ্ঞান মানুষের হ'তে পারে না। অনন্ত বলতে সাধারণ মনুষে আকাশকেই বোঝে। এই আকাশের বা দেশের প্রতিযোগী জ্ঞানের তুলনা থেকে মানুষের সাবয়ব সীমাবদ্ধ জিনিসের জ্ঞান হয়। এই দোয়াতটার জ্ঞান হ'তে গেলে দোয়াতের পারিপার্শ্বিক সমস্ত জ্ঞানকে 'না' করে দেওয়া চাই। দোয়াত কি? যা বিছানা নয়, মেজে নয়, বই নয়, কলম নয়, বাতাস নয়, এই রকম করে সমস্ত দোয়াত-ভিন্ন সমস্ত প্রতিযোগী দেশ-জ্ঞানকে নিরস্ত করে একটা বিশেষ গুণ (রূপরসাদি) বিশিষ্ট এবং দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধরূপ সীমাবদ্ধ যা পূর্ব্বে ক্ষার ও বালিরূপে অবস্থান কালে একপ্রকার দেশে অবস্থান করছিল, এখন এইরূপে বা দেশে অবস্থান করছে, ভেঙে যাওয়ার পর আর একরূপ নেবে বিভিন্ন দেশে ও কালে অবস্থান করবে। মাত্র একটা জিনিসের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'তে পারে না। বহু বস্তু থাকলে তাদের মধ্যে তুলনা করে তবে আমাদের জ্ঞান হয়। একটা বিশেষ বস্তুর জ্ঞান হ'তে গেলেই তার একটা বিশেষ দেশের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধের জ্ঞান চাই, এই-ভাবে সীমাবদ্ধ করতে গেলেই অপর জিনিস মানতে হয় যা তাকে সীমাবদ্ধ করবে। যদি মাত্র একটা জিনিস থাকে, তাকে দেশে আছে বলা যায় না, কারণ তাকে দেশে আছে বলতে গেলেই সীমাবদ্ধ করবার জন্য দ্বিতীয় বস্তুর দরকার হ'য়ে পড়ে। কিন্তু যখন বলছ এক জিনিসই আছে আর কিছু নেই তখন তাকে সীমাবদ্ধ করবার জন্য দ্বিতীয় জিনিস কোথায় পাওয়া যাবে। আর যে জিনিস সীমাবদ্ধ হ'ল না তা অনন্ত সর্ব্বব্যাপী হ'য়ে পড়ল। ইনিই হ'লেন বেদান্তের অদ্বয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যখন অদ্বয় তখন তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। তাঁরই ওপর অনাদি সংস্কার, দেশ, কাল, নিমিত্ত জগৎ-প্রবাহ চিত্রিত করছে। এ জগৎটা কেবল কতকগুলা কাল্পনিক রেখা। প্রবাহ বা পরিবর্ত্তন মানে এই অনাদি দেশ-জ্ঞানের বিভিন্ন আকার পূর্ব্ব-পর-রূপ অনাদি কালের সংস্কার দিয়ে নিমিত্তের কাল্পনিক সম্বন্ধ জুড়ে দেখা। পরিবর্ত্তন জ্ঞানই হ'তে পারে না যদি পূর্ব্বাপর জ্ঞান না থাকে। আগে এই রকম ছিল, পরে এই রকম হ'য়েছে, এই জ্ঞানের নামই পরিবর্ত্তন। * কাজেকাজেই পরিবর্ত্তন জ্ঞানের আগে কালের জ্ঞান থাকা চাই। দেশের জ্ঞানও কালকে অপেক্ষা করে। কোনও দেশের জ্ঞান হতে গেলে যখন তার প্রতিযোগী

Space and time are original intuitions of reason, prior to all experience. —*Kant*

The modification of extention are motion and rest. —*Spinoza*.

One event follows another, but that we can never observe any i.e between them. They seem conjoined, but never connected. —Hume.

Absolute mind cannot unconditionally subject itself to anything but mind. —*Hegal*.

জ্ঞানের সহিত তুলনা করতে হয়, তখন আগে পূর্ব্বাপর জ্ঞানের প্রয়োজন।

নিমিত্তও আমাদের একটা সংস্কার। এও প্রত্যক্ষমূলক নয়। ঘটনার পারম্পর্য্য দেখে আমাদের সুবিধামত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করি। সূক্ষ্মের পর স্থূল ঘটে দেখে আমরা বলছি সূক্ষ্ম—কারণ, স্থূল—কার্য্য। স্থূল থেকেও সূক্ষ্ম হচ্ছে, তখন স্থূল—কারণ, সূক্ষ্ম—কার্য্য, এও তো বলা যেতে পারে? কারণ অধিক দেশ ব্যেপে যে থাকবেই সেটা স্থূল সম্বন্ধেও ঘুরিয়ে বলা চলে। বীজের কারণ অঙ্কুর, না অঙ্কুরের কারণ বীজ তা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নি। কারণ সৎ, কার্য্য অসৎ—যে হেতু তার নাশ হয় এবং পুনরায় স্বরূপ কারণকেই প্রাপ্ত হয়—এরূপ কথাও বলা যায় না। তোমরা যাকে কারণ বলছ তাও যখন পরিণাম প্রাপ্ত হ'য়ে কার্য্য হচ্ছে,তখন তাকে সৎ কি করে বলতে পার? তা হ'লে কারণও তো কার্য্যর ন্যায় পরিণামী এবং অসৎ হ'য়ে পড়ে। যদি বল নিরবয়ব নিত্য পরমাণু সংযোগে মহত্তাদির সৃষ্টি—তাও হ'তে পারে না—নিরবয়ব থেকে সাবয়বের সৃষ্টি অসম্ভব। যদি বলি অপরিণামী নিত্য কারণের ওপর কার্য্য বিবর্ত্ত বা অধ্যাস—তা হ'লে স্থির হ'ল কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধটা একটা কাল্পনিক সম্বন্ধ। শুক্তি না থাকলে রজতের ভ্রম হ'ত না, সেই জন্য শুক্তি রজতের কারণ। কিন্তু বাস্তবিক শুক্তির সংস্কার আর রজতের সংস্কার সম্পূর্ণ পৃথক কারও সঙ্গে কারও সম্বন্ধ নেই, কেবল দ্রষ্টা একটা সংস্কারকে আর একটা সংস্কার দিয়ে ঢেকে ফেলেছে, আর নিমিত্তরূপ সংস্কার দিয়ে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করছে। নিমিত্তকে কেউ প্রত্যক্ষ করে সংস্কার পাই নি।

অনাদি সংস্কার (মূলা-মায়া) রয়েছে, দ্রষ্টা (অহং উপহিত চৈতন্য) খণ্ড-সংস্কার (তুলা-মায়া) দিয়ে, স্বস্বরূপ ব্রহ্মেতে (পারমার্থিক সত্তা) রজ্জু ভ্রম (ব্যবহারিক সত্তা) করছে, আবার রজ্জুতে সর্পভ্রম (প্রতিভাসিক সত্তা) করছে, কখনও বা আকাশ-কুসুমের (তুচ্ছ-সত্তা) রচনাও করছে। দ্রষ্টার অধিষ্ঠানও যিনি, রজ্জুর অধিষ্ঠানও তিনি, সর্পের অধিষ্ঠানও তিনি। আত্মাতেই অহংএর ভ্রম হয়েছে, আত্মাতেই রজ্জুভ্রম, আত্মাতেই সর্পভ্রম। কাজেকাজেই রজ্জুর সর্পভ্রম হয় না, পৃথক তৃতীয় ব্যক্তির কল্পনা করতে হ'য়—এসব প্রশ্নই ওঠে না। আর সংস্কার যখন অনাদি, তখন আর প্রত্যক্ষমূলক বাহ্য জগতের অস্তিত্বই থাকতে পারে না। জগৎটা ব্রহ্মের ওপর দেশ-কাল-নিমিত্ত সংস্কারাত্মক মায়ার অনাদি অনন্ত-প্রবাহ।

সমষ্টি অজ্ঞানে বা অনির্ব্বাচনীয়া মূলা মায়ায় জগতের সংস্কার অনাদিকাল ধরে রয়েছে। এই অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর। তিনি সমগ্র মায়াকে জানেন তাই তিনি সর্ব্বজ্ঞ। জীব ব্যষ্টি মায়াকে জানে বলে অল্পজ্ঞ। বেদই হচ্ছে ঈশ্বরের জ্ঞান। বেদ মানে খানকতক বই নয়। ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান। জীবাত্মা পরমাত্মারঅংশ বলে, সে জ্ঞান সেও সাধন বলে লাভ করে ঋষি হয়। ঋষিত্ব আবার মানবত্বকেই অপেক্ষা করে। উপযুক্ত আধার হ'লে যে কোনও দেশে কালে বা পাত্রে ঋষিত্বের আবির্ভাব সম্ভব। ঋষি আবিষ্কৃত মন্ত্র বা অলৌকিক সত্যই বেদান্ত (জানার শেষ)। এই জ্ঞান সাধন-সাপেক্ষ। এই সাধনা আলোচনা, বিচার, চিন্তা, মনন, ধ্যান, বিদ্যাপ্রভৃতি নামে পরিচিত কঠোর তপস্যা বিশেষ। আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক সত্য হঠাৎ বিদ্যুতের মত মানব হৃদয়ে প্রতিভাত হয় ঈশ্বর কৃপায়, ইহা ঠিক—কিন্তু সেই কৃপা কখনও পশু বা বর্ব্বরের মধ্যে প্রকাশ পায় নি—ঈশ্বর-কৃপা চিরকালই মার্জ্জিত হৃদয়েই অপ্রতিফলিত হয়েছে। সাধনা আবার উপদেশ (গুরু-বেদান্ত) সাপেক্ষ। ব্যবহারিক জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমান সাহায্যে হ'তে পারে কিন্তু সেটাকে নিত্য সত্য বলতে পারি না। আজ পর্য্যন্ত যুক্তি-তর্ক করে কেউ কোনও নিত্য সত্য বের করতে পারেন নি। তার্কিকদের জগৎকারণ অনন্ত প্রকারের। অজ্ঞেয়বাদীদের অবস্থা সাধারণ লোক-দের চেয়ে বিশেষ উন্নত বলে বোধ হয় না, কারণ তাঁরাও বলেন, জগৎকারণ আমরা জানি না এবং জানবারও উপায় নেই। কাজেকাজেই বৈদান্তিকদের যে প্রয়োগের দিক্ অর্থাৎ অহিংসা, অপ্রতিকার, প্রীতি এবং ত্যাগ এ জিনিস-গুলির মূল্যও তাদের কাছে খুব অল্প। *

---

* বাচস্পতি মিশ্র-কৃত শংকর ভাষ্যের টীকা 'ভামতী' ও গোবিন্দানন্দ-কৃত 'রত্ন-প্রভা' টীকা অবলম্বনে এই অদ্বৈত-বাদের উপন্যাস মাত্র লিখছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে বাচস্পতি মিশ্র সপ্তম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্ব

পূর্ব্বে পূর্ব্ব-পক্ষ ও সিদ্ধান্ত-পক্ষের যে বাদানুবাদ হ'ল সেগুলি আমরা ন্যায়ের অবয়বে দেখবার চেষ্টা করব। এতে পাঠক-পাঠিকার বোঝবার আরও সুবিধা হবে।

পূর্ব্ব-পক্ষ—

ব্রহ্ম অজিজ্ঞাস্য
যেহেতু, তাহা নিষ্প্রয়োজন ও অসন্দিগ্ধ
যেমন, স্ফীতালোক মধ্যবর্ত্তী সমনস্ক ব্যক্তির
ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট ঘট অথবা বায়স দন্ত

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—(১) ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য
যেহেতু, তাহা সপ্রয়োজন ও সন্দিগ্ধ
যেমন, স্বর্গাদির সাধক ধর্ম্ম সকল

(২) ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা শাস্ত্র সপ্রয়োজন
যেহেতু, ইহা বন্ধন-নিবর্ত্তক জ্ঞানের হেতু
যেমন, রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি যুক্ত ব্যক্তিকে
বলিয়া দিতে হয়
'ইহা রজ্জু সর্প নহে।'

(৩) বেদান্ত শাস্ত্র আরম্ভনীয়
যেহেতু, ইহা আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ সপ্রয়োজন
যেমন, ক্ষুন্নিবৃত্তিরূপ ভোজনাদি ক্রিয়া

(৪) ব্রহ্ম সন্দিগ্ধ
যেহেতু, ব্রহ্ম-বিষয়ে বহু বাদীর বহু প্রকারের
বিপ্রতিপত্তি বা সিদ্ধান্ত দেখতে পাওয়া যায়
যেমন, দেহই আত্মা, মনই আত্মা

এই ন্যায় গুলির দ্বারা সিদ্ধ হ'ল ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য।

পূর্ব্ব-পক্ষ—

প্রপঞ্চ মিথ্যা নহে অর্থাৎ অধ্যস্ত নহে
যেহেতু, তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ
যেমন, আত্মা

প্রবন্ধে ইউরোপীয় দার্শনিকদের সমমত সকল যে উদ্ধৃত করেছিলাম তার হেতু, ইউরোপ যখন অর্দ্ধসভ্য, তখন ভারতে আধুনিক সভ্য ইউরোপের মতবাদ সকল পরিস্ফুট ছিল, এই বিষয়টী পাশ্চাত্য মোহমুগ্ধ অনুকরণ-প্রিয় 'আধুনিক' সভ্য ভারতবাসী যেন একটু চিন্তা করবার অবসর প্রাপ্ত হন।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—

প্রপঞ্চ মিথ্যা অর্থাৎ অধ্যস্ত
যেহেতু, ইহা জ্ঞান-নিবর্ত্ত্য (জ্ঞানের দ্বারা নাশ হয়)
যেমন, শুক্তিতে রজত বা রজ্জুতে সর্প ভ্রম

এর দ্বারা বোঝা গেল, অধ্যাস অনুমানের সপক্ষ (দৃষ্টান্ত) প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। পূর্ব্বে দেখান হয়েছে, সংস্কার প্রত্যক্ষমূলক নয়, অনাদি, প্রত্যক্ষ কেবল তার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। অহং, দেশ, কাল, নিমিত্ত, ঈশ্বর, ভূত, দেব প্রভৃতি কত জিনিসের আমাদের সংস্কার রয়েছে, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তা হ'লে কেউ বলতে পারেন না কবে তাঁরা এ সব জিনিস পুরোভাগে দেখেছেন। তারপর দেখ, দেশ, কাল, নিমিত্ত, অহং যখন প্রত্যক্ষমূলক বাস্তব সংস্কার নয়, তখন আর জগৎকে বাস্তব ও প্রত্যক্ষমূলক বলব কি করে। দেশ, কাল, নিমিত্ত, অহং ছাড়া কেউ কখন জগৎকে ত ধারণাই করতে পারে না। দেশ-কাল-নিমিত্ত-অহং যখন কাল্পনিক তখন জগৎটা আর বাস্তব হ'বে কি করে? কাল্পনিক স্বপ্ন যেমন সত্য বলে বোধ হয়, ব্রহ্মের ওপর জগৎটাও ঠিক তেমনি কল্পনা। দেশ-কাল-নিমিত্ত-অহং হ'ল আপেক্ষিক সত্য। কিন্তু আপেক্ষিক সত্য মানতে গেলেই নিত্য-সত্য অর্থাৎ ত্রিকালে যা অবিচারী তাকেও মানতে হ'বে। এই নিত্য-সত্যই ব্রহ্ম। এটা একটা অবস্থা। যেখান থেকে, "ভাসে ব্যোমে ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর।" আয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়ে। বোধ হয় যেন তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘনত্ব আছে কিন্তু স্পর্শের দ্বারা তা কিছুই বোধ হয় না। ছবিতে দেখলুম গাছের অনেক দূরে যমুনা, কিন্তু সেটা চ'খের ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই অবস্থায় জগৎটা ঠিক ঐ রকম বোধ হয়। যে অবস্থা থেকে নামলেই আবার এই দেশ-কাল-নিমিত্ত-অহং-এর গণ্ডী—এই প্রত্যক্ষ-মূলক ব্যবহারিক সত্তা। ঐ অবস্থার ওপরে উঠলে জগৎ মিশে যায়, জগৎ না থাকলে অহং ও থাকে না। তখনকার অবস্থা মুখে বলা যায় না। মুখে বলতে গেলেই আপেক্ষিকের রাজ্য এসে পড়বে।

যা হোক, এখন আত্মা-সম্বন্ধে কত রকমের মত দেখ—

১। সাধারণে	আত্মাকে	দেহ	বলে থাকেন
২। চার্ব্বাক	"	ঐ	"
৩। ভিন্ন-চার্ব্বাকেরা	"	ইন্দ্রিয়	"
৪। নৈয়ায়িক-(প্রভাকর)	"	মন	"
৫। যোগাচারী	"	ক্ষণিক বিজ্ঞান	"
৬। মাধ্যমিক	"	শূন্য	"
৭। গৌতম (ন্যায়)	"	দেহাতিরিক্ত, কর্ত্তা ভোক্তা	"
৮। কণাদ (বৈশেষিক)	"	ঐ	"
৯। ঈশ্বর কৃষ্ণ (সাংখ্য)	"	অকর্ত্তা কিন্তু ভোক্তা	"

আত্মা-সম্বন্ধে যখন এত মতামত তখন আত্মা অবশ্য বিচার্য্য। এই বিচার আরম্ভ করবার পূর্ব্বে আচার্য্য শংকর তাঁহার শারীরিক উপোদ্ঘাতে নিম্নলিখিত পূর্ব্ব-পক্ষ ও তাহার সিদ্ধান্ত করেছেন—

পূর্ব্ব-পক্ষ—'আমি' এবং 'আমি যা নই' অর্থাৎ 'তুমি' ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। 'আমি' হ'ল বিষয়ী এবং 'তুমি' হ'ল বিষয়। ইহারা আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধ-স্বভাব। চেতন-আমি ও জড়-জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব অস্মৎ-প্রত্যয় গোচর-চিদাত্মক বিষয়ীতে, যুষ্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয়ের এবং তাহার ধর্ম্মের অধ্যায় হ'তে পারে না।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহা সত্ত্বেও, এক বস্তুতে অপর বস্তুর ও ধর্ম্মের অধ্যাস করে, ইতরেতর (বিষয় ও বিষয়ীর) অবিবেক-বশতঃ, তারা অত্যন্ত বিষিক্ত (বিরুদ্ধ) স্বভাব হ'লেও, অজ্ঞান-বশতঃ সত্য এবং অনৃতকে একত্রে গ্রহণ করে 'আমি এই', 'আমরা ইহা' এইরূপ নৈসর্গিক (সহজাত) লোক ব্যবহার দেখা যায়।

পূর্ব্ব-পক্ষ—এই অধ্যাস কি?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্ব দৃষ্টাবভাসঃ—ইহা অপর বস্তুতে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় (স্মৃতিরূপ) আর একটী বস্তুর জ্ঞান।

[আমরা পূর্ব্বে বলেছি যে স্মৃতিরূপ যে সংস্কার তা অনাদি এবং ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট বাহ্য বস্তুকে অপেক্ষা করে না। অনাদি সংস্কার দিয়ে আমরা সাজিয়ে-গুজিয়ে ব্রহ্মের ওপর নানা রঙ-বেরঙের ছবি আঁকছি। আর বাহ্য বস্তু দেখলেই যে ঠিক তদাকার জ্ঞান হ'বে তারও কোনও মানে নেই। হরফ গুলো প্রত্যক্ষ করছি তাদের কোনও অর্থ নেই, অর্থ মনের মধ্যে উঠছে অন্য বস্তুর হরফের সঙ্গে ও অর্থের সঙ্গে কোনরূপ সাদৃশ্যও নেই। বালিতে যখন জলের তরঙ্গ ভঙ্গ দেখা যায় সেখানে আরোপ্য অধিষ্ঠানে কোন সমানাকারতা বা সাদৃশ্য থাকে না। অধ্যাসের আর একটা ব্যাপার আমরা দেখছি পরবর্ত্তী জ্ঞানের দ্বারা বর্ত্তমান আরোপ্য-জ্ঞানের বাধ বা নাশ হয়। যেই অধিষ্ঠানের (রজ্জুর) স্বরূপ জ্ঞান হ'ল, অমনি আরোপ্যের (সর্পের) জ্ঞান নাশ হ'ল। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, আরোপ্য (সর্প) তখনকার মত প্রকাশমান (সত্য) বলে বোধ হ'লেও বাস্তবিক অসৎ। মরীচিকার জল যদি সত্য হোত তা হ'লে হরিণের পিপাসা মিটত। তেমনি দেশ কাল দিয়ে গড়া কামকাঞ্চনের রসে জীবের পিপাসাও কখনও মিটবে না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—কিন্তু আত্মখ্যাতিবাদী—বৈভাষিক, সৌত্রা-ন্তিক ও যোগাচারী এবং অসৎখ্যাতিবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা বলে থাকেন (১) অন্যধর্ম্মীতে অন্যের ধর্ম্মের আরোপকে অধ্যাস বলে। আবার অখ্যাতিবাদী প্রভাকর-দের মত (২) যেখানে যাহার অধ্যাস হয় সেখানে তাহাদের বিবেকের আগ্রহ-নিবন্ধন ভ্রম হয়, তাহাই অধ্যাস এবং অনির্ব্বচনীয়া খ্যাতিবাদীরা বলেন, (৩) যেখানে যাহার ভ্রম হয়, তথায় তার বিপরীত ধর্ম্মত্ব কল্পনা করা অধ্যাস।

[বৈভাষিকদের মতে আন্তর জ্ঞান ও বাহ্য বস্তু উভয়ই সৎ। বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। যা দেখছি তা ঠিক দেখছি। সৌত্রান্তিকদের মতে বাহ্য পদার্থ সৎ কিন্তু প্রত্যক্ষ হয় না। ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে আসে বলে অনুমান করে নিতে হয়। যোগাচারীরা বলে থাকেন, আন্তর জ্ঞানই সৎ, বাহ্য বস্তু বলে কিছু নেই। বাহ্য বস্তু জ্ঞানের বিভিন্ন আকার মাত্র। মাধ্যমিকের মতে, আন্তর জ্ঞানও অসৎ। বিভিন্ন জ্ঞানের আকার ও তাহার পরিবর্ত্তন ছাড়া অখণ্ড জ্ঞান বলে কিছু নেই; শূন্যের ওপর এই বিভিন্ন জ্ঞানের আকার প্রবাহাকারে চলেছে, কিন্তু অলাত চক্রেরমত তাতে একটা অখণ্ডের মিথ্যা জ্ঞান হচ্ছে।]

সিদ্ধান্ত পক্ষ—কিন্তু 'অনন্ত অন্যধর্ম্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি' —সকল মতেই' অন্যেতে অন্য ধর্ম্মের আবোপ অধ্যাসের এই লক্ষণটীর ব্যভিচার (বিরোধ) হয় না। যেমন

শুক্তিকায় রজত-ভ্রম, এক চন্দ্রে দ্বিচন্দ্র জ্ঞান, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম মরুভূমিতে জলের ভ্রম ইত্যাদি।

পূর্ব্বপক্ষ—অবিষয় প্রত্যগাত্মাতে বিষয় ও তাহার ধর্ম্ম সমূহের অধ্যাস কি করে সম্ভব? তোমরা বল যুষ্মৎ প্রত্যয়ের অতীত যে প্রত্যগাত্মা তা অবিষয়। যা বিষয় তা পুরোভাগে অবস্থান করে। এই পুরোভাগে অবস্থিত এক বিষয়ে আর এক বিষয়ের ভ্রম হ'তে পারে। কিন্তু অবিষয়ে বিষয়ের ভ্রম হ'বে কি করে?

[অন্যথা-খ্যাতিবাদী নৈয়ায়িকেরা, বিষয় হ'লেই তা বাহিরে থাকবে, এইটের ওপর যে জোর দিচ্ছেন, তার হেতু তাঁদের মতে জীবাত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ হ'লে চৈতন্য ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, তখন বার্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়ই এই চৈতন্য বা জ্ঞানের বিষয় হয় এবং তখন এক বিষয় (কর্ত্তা) আর এক বিষয়ে (কর্ম্মে) ভ্রম হতে পারে। কিন্তু আত্মা যদি নিজেই চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ হন, তা হ'লে তিনি অবিষয় বলে বিষয়ের সহিত তাঁর অধ্যাস হতে পারে না। কারণ বেদান্তীরা সে অধ্যাসের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, তাতে রজ্জু ও সর্প দুইই বিষয় এবং সেইজন্য একের ধর্ম্ম (সর্পত্ব) অপরের ধর্ম্মে (রজ্জুতে) আরোপিত হ'তে পারে। এর মধ্যে একটী অবিষয় হ'লে অধ্যাস সিদ্ধ হয় না। তারপর বাহ্যবিষয় প্রত্যক্ষ করতে গেলে একজন দ্রষ্টা চাই, বাহ্য বস্তু চাই এবং এই উভয়ের সংযোজক কারণ বা ইন্দ্রিয় চাই। এই সংযোগকে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বলে। এই সন্নিকর্ষ কালে যে সম্বন্ধ ঘটে তা দু' রকম—(১) লৌকিক ও (২) অলৌকিক। *]

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—আত্মা একেবারে অবিষয় নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষও নহে। ইহা অস্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় এবং অপরোক্ষ। ইহা সকলের নিকট প্রত্যগাত্মারূপে প্রসিদ্ধ। আর এরূপ কোনও নিয়মও নেই যে পুরোভাগে বা সম্মুখে অবস্থিত এক বিষয়ের অন্য বিষয়ের অধ্যাস হয়। দেখ আকাশ অপ্রত্যক্ষ কিন্তু উহা অজ্ঞ লোকের নিকট নীল এবং কড়ার মত বলে বোধ হয়। এই হেতু প্রত্যগাত্মাতে অনাত্মার অধ্যাস অযৌক্তিক নহে।

[নৈয়ায়িকেরা যে বলেছিলেন, আত্মা একেবারে অবিষয় তাও নয়, কারণ আত্মা অস্মৎ প্রত্যয়ের কিঞ্চিৎ বিষয়, প্রত্যক্ষ বস্তুতেই অন্য গুণের অধ্যাস হয়, তাও নয়, কারণ অপ্রত্যক্ষ আকাশে নীলত্বাদির অধ্যাস হয় এবং বিষয় হ'লেই যে পুরোভাগে থাকবে, তাও নয়, কারণ নৈয়ায়িকদের অলৌকিক প্রত্যক্ষের কোনটাই পুরোভাগে হয় না। এই জন্য তাঁদের যুক্তিটি সব্যভিচার-হেত্বাভাস-দোষদুষ্ট।]

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—পণ্ডিতগণ উক্ত লক্ষণযুক্ত অধ্যাসকে অবিদ্যা বলে থাকেন এবং যাহার দ্বারা বস্তুর স্বরূপ অবধারণ করা যায় তাকে বিদ্যা বলে থাকেন। "এবং যত্তি যত্র যদধ্যাসঃ তৎকৃতেন দেষেণ গুণেন বা অনুমাত্রেণ অপি স ন সম্বদ্ধতে।" রজ্জুতে সর্পের ভ্রান্তি হ'লে তো সর্পের দোষ গুণে যেমন রজ্জু যেমন দুষ্ট হয় না, সেইরূপ অবিদ্যাকৃত জগতের দোষ-গুণে ব্রহ্মও কিঞ্চিৎ মাত্রও দুষ্ট হন না। এই অবিদ্যাখ্য আত্ম-অনাত্মার পরস্পর অধ্যাসকে অবলম্বন করেই সমস্ত লৌকিক, বৈদিক প্রমাণ, প্রমেয়, ব্যবহার ও বিধিনিষেধপর সমস্ত শাস্ত্র প্রবৃত্ত হ'য়েছে।

পূর্ব্ব-পক্ষ—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং শাস্ত্র অবিদ্যার বিষয় কি করে?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—দেহ এবং ইন্দ্রিয়তে যদি 'অহং' এবং 'মম' অভিমান না থাকে, তা হ'লে কর্ত্তৃত্বের উৎপত্তি হয় না। 'আমি প্রমাণ কর্ত্তা' এইরূপ অহং-জ্ঞান যদি না ওঠে, তা হ'লে প্রমাণ-প্রবৃত্তিও সম্ভব নয়। আবার দেখ ইন্দ্রিয় সকলকে অবলম্বন না করে, প্রত্যক্ষাদি সম্ভব নয়। আবার অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে ইন্দ্রিয়গণের ব্যবহার সম্ভব নয় এবং যে দেহে আত্ম-ভাব অধ্যস্ত না হয়, সে দেহের দ্বারা কেউ কার্য্যও করতে পারে না। এ সকল ব্যাপার যদি না ঘটে তা হ'লে আত্মার প্রমাতৃত্ব সম্ভব হয় না আর প্রমাতা যদি ন থাকে প্রমাণ-প্রবৃত্তিও সম্ভব নয়। সেই জন্য অবিদ্যা পরিকল্পিত বিষয়ই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও শাস্ত্রের বিষয় হ'য়ে থাকে।

এর পর আচার্য্য বলছেন, যে পশু পক্ষী ও অতিবড় পণ্ডিতে ব্যবহার একই রকমের। কারণ পণ্ডিত যখন যুক্তি করছেন, তখনও যে দেহাভিমান, আর পশু যখন আহারের

---

* লৌকিক—সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত সমবেত সমবায়, সমবায় সমবেত-সমবায় এবং বিশেষণতা এই ছয়টি। অলৌকিক—সামান্য লক্ষণ, জ্ঞান-লক্ষণ ও যোগজ—এই তিনটী।

চেষ্টা করছে বা ভয়ে পালাচ্ছে সেই দেহাভিমানযুক্ত হ'য়েই করছে। নির্গুণ আত্মাতে, বর্ণ, আশ্রম বয়সের আরোপ না করলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম হয় না। কত রকমের দেহাভিমান হচ্ছে দেখ—

১। পুত্রাদির ধর্ম্ম	আত্মাতে অধ্যাসের	কালে আত্মা	সুখী ও দুঃখী হয়	
২। দেহের "	"	"	স্থূল ও কৃশ	"
৩। ইন্দ্রিয়ের "	"	"	মূক ও কাণ	"
৪। মনের "	"	"	সন্দেহযুক্ত	"
৫। বুদ্ধির "	"	"	নিশ্চয়যুক্ত	"
৬। অজ্ঞানের	"	"	অহমাকার বৃত্তি	"
৭। আত্মার ধর্ম্ম জড় মন বুদ্ধিতে আরোপিত হ'য়ে			চৈতন্যযুক্ত হয়	"
৮। " " পুত্র ধন যশেতে	"	"	এসব আমার জ্ঞান	"

এরই নাম ব্যবহারিক জগৎ

বর্ণধর্ম্মা শ্রমাচারঃ শাস্ত্র যন্ত্রেন যোজিতঃ।
নির্গতোঽসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী॥
বর্ণাশ্রমাভিমানে শ্রুতিদাসো ভবেন্নরঃ
বর্ণাশ্রমবিহিনশ্চ বর্ত্ততে শ্রুতিমূর্দ্ধণি॥ *

* আচার্য্য শংকরকৃত, অজ্ঞান-বোধিনী, ২৪।

গান

শ্রীঅরুণকুমার সিংহ

আছ যদি মনোমাঝারে
তবে ভাবি কেন দূর পারে
আলো-আঁধারে॥

তুমি হে আমার জীবনের সাথা,
হেরিতে তোমারে চাহি দিবারাতি,
পূজিব তোমারে নিয়ত আমি হে
হৃদয়-কুসুম-ভারে

তোমারে তো কিছু হয়নিক' বলা,
হৃদয়ে রয়েছে কি ব্যথা উতলা,
সকল যাতনা দিব হে উগাড়ি'
তব মন্দির-দ্বারে॥

জানি আমি তুমি চাহ নাই মোরে
আমি চাহি তোমা' অন্তর ভ'রে,
এস এস তুমি হরষে আমার,
এস হে বিষাদভারে॥

বঙ্গে সংক্রামক ব্যাধি

প্রাদেশিক স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ ১৯৩২ সালের ২রা জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গালার ১১টি জিলায় কলেরা রোগে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। মেদিনীপুরে ঐ রোগ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৪ হইতে ৪৯, মুর্শিদাবাদে ১১ হইতে ২৬, যশোহর ৯৯ হইতে ১৩৫, দিনাজপুরে ১৯ হইতে ৩২, বগুড়ায় ১৬ হইতে ১৮, ঢাকায় ৫৪ হইতে ৫৬, ময়মনসিংহে ৭০ হইতে ৭৩, ফরিদপুরে ১৫ হইতে ২৮, বাখরগঞ্জে ৪১ হইতে ৫৩, ত্রিপুরায় ২৫৫ হইতে ৩৩২, ও নোয়াখালিতে ৭৬ হইতে ১২১ হইয়াছে; বর্দ্ধমানে ঐ রোগে মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৩০ হইতে ১৭, বীরভূমে ২৭ হইতে ৫, বাঁকুড়ায় ১৮ হইতে ৫, হুগলীতে ১৯ হইতে ৯, হাওড়ায় ১৩ হইতে ৮, ২৪ পরগণায় ১৭৫ হইতে ৪৩, নদীয়ায় ২৪ হইতে ১, খুলনায় ১৭৫ হইতে ১১৫, রাজসাহীতে ৪৭ হইতে ৩২ ও পাবনায়, ১৪ হইতে ৪ হইয়াছে। হওড়া জিলায় বসন্ত রোগে ১৩ জন, ময়মনসিংহে ৪, বর্দ্ধমানে ২, ত্রিপুরায় ২, ও বাঁকুড়ায় ১ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কলিকাতায় ৮ জনের ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে প্রাণত্যাগের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

—চুঁচড়া বার্ত্তাবহ

গত ১৯৩১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গালার ১০টী জিলার কলেরার মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্দ্ধমানে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩ হইতে ৩৩, বীরভূমে ২২ হইতে ২৭, বাঁকুড়ায় ১০ হইতে ১৮, হুগলী ১৪ হইতে ১৯, ২৪ পরগণায় ১৫৪ হইতে ১৭৫, নদীয়ায় ৮ হইতে ২৪, খুলনায় ১৬৩ হইতে ১৭৫, দিনাজপুরে ১৭ হইতে ১৯, বগুড়ায় ১৪ হইতে ১৬, ও পাবনায় ৬ হইতে ১৪ হইয়াছে।

মেদিনীপুরে এই রোগে মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৬৮ হইতে ৩৪, হাওড়ায় ৩৩ হইতে ৩২, মুর্শিদাবাদে ৩৩ হইতে ১১, যশোহরে ১৫৬ হইতে ৯৯, রাজসাহীতে ৬৫ হইতে ৪৭, ঢাকায় ৭৩ হইতে ৫৫, ময়মনসিংহে ১০৬ হইতে ৭০, ফরিদপুরে ৫০ হইতে ১৫, বাখরগঞ্জে ৪৯ হইতে ৪১, ত্রিপুরায় ৩১০ হইতে ২৭৫, ও নোয়াখালিতে ১৪৩ হইতে ৩৬ হইয়াছে।

ময়মনসিংহে বসন্ত রোগে ৭ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঐ রোগে ঢাকা জিলায় ২, বাঁকুড়া, কলিকাতা, রাজসাহী ও মালদহ জিলায় ১ জন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ৬ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

—বঙ্গরত্ন

বাঙ্গালায় ডাকাতির বাহুল্য

ইদানীং বঙ্গদেশ, মফস্বলের প্রায় সর্ব্বত্র যেরূপ ডাকাতির বাহুল্য দেখা যাইতেছে, বিগত এক শতাব্দী মধ্যে সেইরূপ কখনও দেখা যায় নাই।

পূর্ব্বে মফস্বলের সম্ভ্রান্ত গৃহস্থগণ নিজ নিজ বাটীতে বন্দুক রাখিতে পারতেন, সুতরাং দস্যুর আক্রমণ হইতে তাহারা আত্মরক্ষা ও গ্রামবাসীদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু ইদানীং রাজপুরুষগণ বহুস্থলেই গৃহস্থগণের নিকট

হইতে বন্দুক কাড়িয়া লওয়াতে গৃহস্থগণ নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন, অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দস্যুদিগের বন্দুক, তরবারি পিস্তল প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের অভাব হয় না। —হিতবাদী

শিক্ষা-বিভাগে অর্থসঙ্কট

কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশের কলেজ মাত্রই প্রবল অর্থাভাবে প্রপীড়িত হইয়া কোনওরূপে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছিল। বহু কলেজেই ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকাশ, সম্প্রতি বঙ্গীয় সরকার অর্থাভাবের জন্য বহু বিদ্যালয় ও কলেজের সাহায্য বন্ধ করিয়া দিবেন। ইহার ফলে বহু বিদ্যালয়ের ও কলেজের আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

—খুলনাবাসী

কলিকাতা শহরে প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমোন্নতি

গত ১৯২৩ সাল হইতে কলিকাতা করপোরেশন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। ক্রমশঃ এই ব্যবস্থার যে উন্নতি হইতেছে, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে:—

	১৯২৩ সাল	১৯৩১ সাল
স্কুলের সংখ্যা	২১	২২০
ছাত্রসংখ্যা	২৪৬৮	২৭৮০২
খরচ	১৪৮০০০৲	১০৩৬০০০৲

স্কুলেরও ছাত্রের সংখ্যা বাড়িতেছে বটে কিন্তু সুশিক্ষার দিকে মনোযোগ দেওয়া হইতেছে কি না, তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। অনেকগুলি বিদ্যালয় অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদিগকে শিক্ষকোচিত গুণ দেখিয়া নয়, কিন্তু কোন্ রাজনৈতিক দলভুক্ত তাহা দেখিয়াই অনেক সময় নিযুক্ত করা হয়। স্কুলগুলি নানা কারণে অনেক সময় বন্ধ করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীগণকে অধ্যয়নই যে তপস্যা, তাহা শিক্ষা না দিয়া গোলমাল করিতে দেওয়া হয়। এই সকল দোষ ও ত্রুটী সংশোধন করিবার জন্য চেষ্টা না করিলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ভাল হইবে না। —সঞ্জীবনী

পরলোকে ডাক্তার কুমারী যামিনী সেন

বাসণ্ডা নিবাসী বঙ্গদেশবিখ্যাত প্রসিদ্ধ লেখক ৺চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের কন্যা, কলিকাতার খ্যাতনামা এডভোকেট শ্রীযুত নিশীথচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভগিনী, ডাঃ কুমারী যামিনী সেন কিছুদিন হইল কলিকাতায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেশ-বিদেশে বরিশাল জিলার বহু কৃতী সন্তান আছেন, যাহাদের সম্বন্ধে বরিশালের সাধারণ কিছুই জ্ঞাত নহেন। সেই কারণে, এই স্থানে কুমারী যামিনী সেনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিলাম। শ্রীমতী যামিনী সেন ভারতে ও বিলাতে উভয়স্থানে চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। চিকিৎসা-শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার জন্য তিনি দুইবার বিলাত গিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন অতিশয় সম্মানের সহিত নেপাল গভর্ণমেণ্টের ডাক্তারী বিভাগে চাকুরী করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান উইমেন মেডিক্যাল সার্ভিসে দীর্ঘকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে আগরা, সিমলা, শিকারপুর, আকোলা প্রভৃতি স্থানে বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৎপরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের কিছুকাল পর তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং হাওয়া-পরিবর্ত্তনের জন্য পুরীতে গমন করেন। তিনি ডাক্তার হিসাবে এবং বিশেষজ্ঞ দেশসেবিকা হিসাবে এরূপ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে পুরীতে থাকা কালীন তথাকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া পুরীর জেনারেল হাঁসপাতালের ভার গ্রহণ করাইতে, তাহাকে বাধ্য করাইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ কিছুদিন পরে তাহার শরীরের অবস্থা এত খারাপ হইয়া পড়ে যে, বাধ্য হইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং তিনি কলিকাতায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ সুধীরকুমার সেনের বাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। ডাঃ কুমারী যামিনী সেনের মৃত্যুতে সত্য সত্যই বরিশালবাসী তাহাদের একটী কৃতী সন্তান হারাইল। বরিশাল জিলায় বাসণ্ডায় ৺চণ্ডীচরণ সেনের অতিরিক্ত পরিচয় বাহুল্য মাত্র। কবি শ্রীযুতা কামিনী রায় ডাঃ যামিনী সেনের জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

—বরিশাল

মাধবী হাটে তাঁতের কাপড়

ঢাকা জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র তীরবর্ত্তী মাধবদী হাট হস্তপরিচালিত তাঁতে নির্ম্মিত কাপড়ের জন্য সুবিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। এই হাট সাধারণতঃ 'বাবুর হাট' নামে পরিচিত। ইহা টঙ্গি ভৈরব রেলওয়ে লাইনের জিনার্দ্দি ষ্টেশন হইতে সাত মাইল দুরে অবস্থিত। বর্ত্তমান দেশব্যাপী অর্থসঙ্কটের তাড়নায় এই হাটের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের ইতর-ভদ্র সর্ব্বপ্রকার অধিবাসীই নিজেদের জীবিকার্জ্জনের জন্য নিজ হস্তে তাঁত পরিচালনা দ্বারা বস্ত্র নির্ম্মাণের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণও এই প্রকারে বস্ত্র বয়ন দ্বারা অর্থোপার্জ্জনে অসম্মান বোধ করেন না। দেশীয় কলের বিশেষতঃ 'ঢাকেশ্বরী' কলের প্রস্তত সূতাদ্বারা এই বয়ন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এইভাবে নানাপ্রকার রঙ্গীন এবং সাদা ধুতী, সাড়ী, চেক, লুঙ্গী প্রভৃতি বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া প্রতি সপ্তাহের সোমবার এই হাটে বিক্রয়ার্থে আমদানী হয়। ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলা হইতে বস্ত্র ব্যবসায়ী বেপারীগণ এই হাটে সমাগত হইয়া পাইকারী দরে বিস্তর বস্ত্র খরিদ করিয়া বিক্রয়ার্থে বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করিয়া থাকে। এবম্প্রকারে প্রতি হাটের দিবস প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের বস্ত্রের খরিদ-বিক্রয় হয়।

সাধারণতঃ প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে অনধিক ৫০৲ মুল্যের একটী দেশীয় তাঁত ব্যবহৃত হয় এবং তৎপরিচালনার কার্য্যে পরিবারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই অবসর সময় নিয়োজিত হইয়া থাকে। সমৃদ্ধ পরিবারের মধ্যে অনধিক চারিশত টাকা মুল্যের জাপানী তাঁতেরও প্রচলন আছে। এই সমস্ত তাঁতের প্রস্তত কাপড় কলের কাপড় অপেক্ষা অধিকতর সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে এবং তাহাদের স্থায়িত্বও অপেক্ষাকৃত অধিক। সাধারণতঃ পাঁচসিকা মূল্যে এক জোড়া পরিধান উপযোগী ধুতী এবং দেড় টাকা মূল্যে এক জোড়া সাড়ী বিক্রীত হইয়া থাকে। একান্নভুক্ত পরিবারের সকলেই অবকাশ কালে এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে, কলের কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায়ও তাহারা এই ব্যবসায়ে লাভবান হইতে সমর্থ হইতেছেন।

পাটের আবাদ লুপ্ত প্রায় হওয়াতে এই বয়ন শিল্পটী উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিয়া এতদঞ্চলের বেকার-সমস্যা সমাধানের একটী সুপ্রশস্ত উপায়স্বরূপ পরিগণিত হইতেছে। এতদ্দারা শ্রমশিল্পের প্রতি সমাজের উচ্চপদস্থ ভদ্রসন্তানগণেরও অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে।

প্রত্যেক জেলায় প্রধান প্রধান হাট যাহাতে এইরূপ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়, তৎপ্রতি সকলেরই সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

—চারুমিহির

গঙ্গার নিম্নে সুড়ঙ্গ

বহু ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া ছিলেন যে, কলিকাতার মাটি অত্যন্ত নরম। সে জন্য মাটির নীচে দিয়া রেল লাইন করিয়া সহরে ও সহরতলীতে যাতায়াতের জন্য টিউব রেল করা সম্ভব হইবে না। কলিকাতার ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এই কথার অসত্যতা কার্য্যে দেখাইয়াছেন। উক্ত বিদ্যুৎ কোম্পানীর গার্ডেন রীচে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের এক বৃহৎ কারখানা আছে তথা হইতে অপর পারে শিবপুর ও হাবড়ার বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবিধার জন্য গার্ডেন রীচের কারখানা হইতে সুড়ঙ্গ করিয়া গঙ্গা নদীর তলার নিম্ন দিয়া অপর পারে বোটানিকেল গার্ডেন পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ তৈয়ার করিয়াছেন। এই পথ ১৭৩৫ ফুট লম্বা এবং ব্যাস ৬ ফুট। গঙ্গার গর্ভের মাটির ৪০ ফুট নীচে দিয়া এই পথ তৈয়ারী হইয়াছে। প্রাচ্য দেশের কোথায়ও মাটির নীচ দিয়া এরূপ সুড়ঙ্গ পথ নাই। এই পথ দিয়া বিদ্যুতের তার শিবপুরের পারে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এবং উহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত স্থান সমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে।

এই সুড়ঙ্গ পথ তৈয়ারী করিবার জড় তিন বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গার কয়েক স্থানে মাটির শক্তি পরীক্ষার জন্য খনন করা হইয়াছিল। মাটির বহু নীচে বালি ও মাটি বাহির করিয়া দেখা গিয়াছে যে এক সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদী এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হইত। ইহার বিশদ বিবরণ সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

—সঞ্জীবনী

যক্ষ্মার প্রকোপ

বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই যক্ষ্মা রোগ বিস্তার লাভ করিতেছে। এ দেশের প্রচলিত কথা,—যক্ষ্মার নাই রক্ষা। প্রকৃতই এমন শিবের অসাধ্য ব্যাধি আর নাই। বাঙ্গালার যক্ষ্মা-সমিতির বার্ষিক সভায় সেদিন ডাক্তার অম্বিকাচরণ উকীল বলিয়াছেন,—বাঙ্গালায় যে ভাবে যক্ষ্মারোগ দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাতে কলিকাতায় পরিণত অবস্থার যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসার ফল অন্যূন ৩ হাজার এবং সমগ্র বাঙ্গালায় ১ লক্ষ শয্যার আশু ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা যায়। তাহা ছাড়া, তিনি বলেন,—প্রথম অবস্থার যক্ষ্মা রোগার চিকিৎসার জন্যও শয্যার প্রয়োজন ৯০ হাজার। তাঁহার হিসাবে বাঙ্গালার বালক-বালিকাদের মধ্যে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা খুব কম করিয়া ধরিলেও ৩০ হাজার হইবে। রোগীর বাড়ীতে এই রোগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা হওয়া একরূপ অসম্ভব। বাড়ীতে সুব্যবস্থার অভাবে রোগীর রোগ সারিবে না, বরং বাড়ী শুদ্ধ সকলেই এই রোগে আক্রান্ত হইবে। ইহা অবশ্য খুবই ভয়ের কথা। কারণ এখন কলিকাতায় নহে, মফস্বলেও যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ম্যালেরিয়াই এদেশের প্রধান ব্যাধি; এই ব্যাধি যতই পুরাতন হইতেছে, বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ততই মন্দ হইতেছে এবং সেই সুযোগে আরও নানা উৎকট ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করিতেছে। ডাক্তার অম্বিকাচরণ উকীল আরও বলিয়াছেন যে, যক্ষ্মা রোগীর জন্য হাঁসপাতালে দুই লক্ষ শয্যার প্রয়োজন; হয়ত আর এক বৎসর পরে তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, দুই লক্ষ শয্যায় কুলাইতেছে না। কিন্তু ক্রমেই যদি সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বিসর্পিত হয়, তবে প্রলেপ দিবেন কোথায়?

—বঙ্গবাসী

—:*০*:—

লাভ-ক্ষতি

শ্রীঅজিতকুমার সেন

কেহ বা ভিড়েছে নিকটে বাসিয়া ভালো,
ফিরিল কেহ বা ব্যঙ্গের হাসি হেসে;—
কেহ বা জ্বালিল পরাণে প্রেমের আলো,—
বেদন-বহ্নি জাগিল হৃদয়-দেশে!

কাহারো মদির নয়ন-তুলিকা পাতে—
শত কল্পনা-ছবি জাগে অন্তরে;
কারো বা কঠোর নির্ম্মম সংঘাতে—
অবসাদে হিয়া টুটিয়া লুটিয়া পড়ে।—

কেহ বা গলায় পরালো বরণ-মালা,
ধরিল সুমুখে মান-অর্চ্চনা ডালি;
কেহ কেড়ে নিয়ে সে উপহার-ডালা—
ক্রূর হাস্তেতে ভূমি-তলে দিল ঢালি!

রাগ-বিরাগের ঊর্ম্মি-ভঙ্গ-মাঝে,—
প্রেমের হেলোর আলোক-ছায়ার তলে—
দিনগুলি মোর সাজিল চিত্র-সাজে,—
জীবন-তরণী নাচিল কৌতুহলে!

আঁধার ঘনায়,—নামিছে সন্ধ্যা ধীরে,
পারাপার ঘাটে অধীর খেয়ার তরী;—
বিকিকিনি শেষে, অতীতের পানে ফিরে—
লাভ ও অলাভ ব'সে খতিয়ান করি।

এই যে কেহ বা হৃদি মোর দিল ভরি'
প্রেমের প্রীতির অঝোর বর্ষাদানে,—
দুঃসহ দাহে অন্তর জর্জ্জরি—
এই যে কেহ বা বিঁধিল বেদন-বানে;

জীবনের মোর তারা যে আলোক-ছবি
তাদেরি মাঝারে উঠিল আমার ফুটি'
যা কিছু অর্থ, যত ব্যর্থতা সবি,
পরম যে লাভ, চরম যা কিছু ত্রুটি!

আজ দেখি—যারা ভিড়িল প্রাণের'পরে,
জীবন-খাতায় তারা শুধু আছে জমা
উজল আখরে লেখা খরচের ঘরে—
কারা ফিরে গেল না পারি' করিতে ক্ষমা!

মীমাংসা

(গল্প)

শ্রীমতী বিহঙ্গবালা চন্দ্র

(১)

মাতা যন্ত্রণাব্যঞ্জক অস্ফুট শব্দ করিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে কন্যাকে ডাকিল, "বাসন্তী !"

শিয়রে উপবিষ্টা অর্দ্ধ-তন্দ্রাভিভূতা দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা বাসন্তী মাতৃ-আহ্বানে সচকিতভাবে মায়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সাগ্রহে বলিল, "কেন মা ?"

মা বলিল, "রাত কি পুয়িয়ে গেল ?"

ছোট টাইমপিসটীর দিকে চাহিয়া কন্যা বলিল, "না মা, ভোর হ'তে এখনও অনেক দেরি আছে।"

"অনেক দেরি আছে ! আমার যে আর দেরি সয় না মা।"

বাসন্তী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ও মা, তুমি ওসব কথা বলছ কেন ? আমার যে বড্ড ভয় করছে মা।"

জননীর চক্ষুও শুষ্ক রহিল না, তাহার শীর্ণ গণ্ড বহিয়া প্রবল বেগে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মৃত্যুপথ-যাত্রীর একমাত্র ভাবনা কাহার হস্তে তাহার অসহায়া ছোট কন্যাটীকে সমর্পণ করিয়া যাইবেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাতা আত্ম-সংবরণ করিয়া কন্যাকে বুঝাইয়া বলিল, "কাঁদিস কেন মা ? তোর ভাবনা কি ? তোকে যার হাতে দিয়েছি, সে তোকে কখনও অসুখী করবে না। কিন্তু আমার বিজু—"

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল ; কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া হরিমতি পুনরায় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাসন্তী, আর একবার ঘড়ীটা দেখ না মা, এতক্ষণে হয় তো রাত শেষ হ'য়ে এল। মোহন যে এই ভোরের ট্রেণে আস্‌বে। তার সঙ্গে দেখা না হ'লে আমি যে মরেও স্বস্তি পাব না।"

বাসন্তী অধীরভাবে মাতাকে বলিল, "তুমি অত কথা কেন কইছ ? ডাক্তারবাবু যে বারণ করেছে। তোমার অসুখ এতে বেড়ে উঠ্‌বে—সঙ্গে সঙ্গে কষ্টও বেড়ে যাবে মা।"

"না মা আজ আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না। হ্যাঁ রে তোর কিনুদাদা টেলিগেরাপখানা ঠিক করেছে তো মোহনকে ?"

বাসন্তী সলজ্জভাবে বলিল, "হ্যাঁ।"

"তবে কেন আসতে দেরি হচ্ছে বল দিকি ? তার বাপ-মা তাকে যদি আসতে না দেয়, তা হ'লে—? না, এমনিই কি হ'বে ? মোহন তো আমার তেমন ছেলে নয়। না না, সে ঠিক আসবে, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখাটা—"

রুগ্না জননী ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিত লাগিল দেখিয়া বালিকা বাসন্তী ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।

দুই বৎসর ধরিয়া হরিমতি অসুখে ভুগিতেছে। বাড়িতে বাড়িতে রোগটী যে এখন কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বালিকা তাহা অবগত ছিল না। গৃহে ছোট বোন সপ্তম বর্ষীয়া বিজয়া আর মাতা ছাড়া আর তাহাদের আপনার বলতে কেহ ছিল না। মার অসুখ যে অবধি বাড়িয়াছে, সেই অবধি প্রতিবেশিনী ন'কড়ির মা রাত্রে তাহাদের ঘরে আসিয়া শুইয়া থাকিত। আজও সে আসিয়াছে। পরোপকারিণী বলিয়া পাড়ায় তাহার খ্যাতি আছে। কিন্তু হইলে কি হইবে, নিদ্রাদেবী তাহার প্রতি অত্যন্ত সদয়। হরিমতির এই বাড়াবাড়ির ক'দিন রাত্রে তাহাদের ঘরে সে অকাতরে ঘুমাইলেও তবু একটা লোক ঘরে থাকিলে তাহাদের অনেকটা সাহস ছিল। ইহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট লাভ বা পরম উপকার।

সারা রাত্রি মার বকুনি শুনিয়া বাসন্তী ন'কড়ির মাকে ডাকিতে বাধ্য হইল। তাহার প্রাণটা যেন কেমন করিতেছে। মার ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহার বুকের ভিতরটা যেন শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক ডাকাডাকির পর উঠিয়া ন'কড়ির মা বলিল, "ক্যানে গা মাসী, ডাকিস ক্যানে ?"

"মাকে একবার দেখ না মাসী, মা আজ সারা রাত একবারও ঘুমায় নি, খালি বকেছে, দেখবে এস না মাসী, এই দেখ না—" বলিয়া বাসন্তী ন'কড়ির মাকে টানিয়া মার নিকট লইয়া গেল।

হরিমতি তখনও মোহনের নাম করিতেছে, "হ্যাঁ রে আর সে কখন আসবে? তবে বুঝি তার সঙ্গে দেখা হ'ল না।"

পূর্ব্বরাত্রে সকলেই হরিমতিকে দেখিয়া বুঝিয়াছিল, অবস্থা ভাল নহে। সেই জন্যই তাহারা তাহার পুত্রসদৃশ একমাত্র জামাতা মোহনকে টেলিগ্রাফ করিয়াছিল। কিন্তু রাত্রে থাকিবার জন্য এক ন'কড়ির মা ব্যতীত আর কাহারও অবকাশ ঘটে নাই।

ভোর হইতেই ন'কড়ির মার ডাকাডাকিতে ঘটনাস্থলে অনেকেই আসিয়া জুটিয়াছে এবং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থার জন্য অনেকেই ব্যতিব্যস্ত হইল। এমন সময়ে ত্রস্তপদে একজন শ্যামবর্ণ সৌম্যমূর্ত্তি যুবক উৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহে প্রবেশ করিল। সকলেই বলিয়া উঠিল, "ঐ গো তোর মোহন এসেছে।"

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একজন মহিলা বলিলেন,— এতক্ষণে এলে বাছা, তোমাকে দেখবার জন্যেই মাগীর প্রাণটুকু এখনও বুঝি বেরোয় নি।"

অপর একজন বলিল,—"সারা রাত মোহন মোহন করেছে, বুঝি কি বলবার ছিল।"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল,—"আহা ওর ছেলে নেই, তুমিই ছেলের কাজটা কর।"

মোহন তাহাদের মধ্যে কোনও রকমে একটু জায়গা করিয়া লইয়া শ্বশ্রূঠাকরুণের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। বাসন্তী ও বিজয়া তখন মায়ের বুকের উপর লুটিয়া পড়িয়া অধীরভাবে রোদন করিতেছে।

মায়াচ্ছন্ন জীবের পক্ষে মায়া-পাশ ছেদন করা বড়ই কঠিন। তাই বাসন্তীর জননী তাহার সময় যতই ঘনাইয়া আসিতেছে ততই তিনি কন্যাদুটীকে আকুল আবেগে দুই বাহুর বেষ্টনে নিবিড়ভাবে ধরিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না, শক্তি তখন রহিত হইয়া আসিতেছে। শুধু তাহার শীর্ণ গণ্ড দিয়া অশ্রু অজস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

মোহন ডাকিল, "মা, আমি এসেছি, চেয়ে দেখুন।"

সে মধুর কণ্ঠস্বরে মুমূর্ষুর মুখ মুহূর্ত্তের জন্য বড় উজ্জ্বল বড় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রসন্নদৃষ্টিতে জামাতার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, "এসেছ বাবা!"

অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি আর কোন কথা বলিতেছেন না দেখিয়া মোহন বলিল, "মা আমাকে কিছু বলবেন কি?"

হরিমতি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—"হাঁ।"

তারপর অতিকষ্টে বিজয়ার একটী হাত মোহনের হাতে দিয়া বলিল, "বাবা, আমার ছেলে নেই, তুমিই আমার ছেলে। ছোট বোনের প্রতি বড় ভায়ের কর্ত্তব্য পালন করো। আর কিছু বলবার নেই। শুধু এইটার জন্য আমার প্রাণটা এখনও বেরোয় নি—"

এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে তিনি চক্ষু মুদিত করিলেন।

(২)

দয়াময়ী ভাঁড়ার গুছাইতে গুছাইতে আপন মনেই গজ গজ করিয়া আওড়াইতেছিলেন—"দেখে শুনে অবাক হয়ে গেছি। আমাদেরও এক কাল গেছে, তাই তো বলছি— এ সব হ'ল কি! কালে কালে আরও কত দেখব,। খাশুড়ী ও মরে ঢের লোকের, টেলিগেরাপ খানা পেয়েই রাত দুপুরে দৌড়ল সেই ধাপধাড়া গোবিন্দপুর। এত করে মানা করলুম, কাণেও শুনল না, যাওয়াটাই বড় হ'ল। আর ঐ মিনসের হয়েছে তামাক খাওয়া, দিন রাত্তির এক অলুক্ষণ। মুখখানিতে তালা চাবি দিয়ে ভুড়ুক ভুড়ুক ভুড়ুক—যাবার সময় ছেলেটাকে একবার বারণও করলে না। আমার যেমন অদৃষ্ট।"

কর্ত্তা অদূরে বারান্দায় উবু হইয়া বসিয়া আপন মনে তামাকু টানিয়া যাইতেছিলেন। সহসা গৃহিণীর তর্জ্জন-গজ্জন শুনিয়া মিনিট কয়েক চুপচাপ থাকিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন "তাই তো, তাই তো, ছেলেটা বাড়ী এলে হয়।

কথাটা গৃহিণীর কাণেও পৌছিল এবং প্রাণেও লাগিল। স্বামীর কথায় সহসা সচেতন হইয়া একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হাঁ, তাই বটে, ডাইনিদের মুখ থেকে ঘরের ছেলে এখন ভালয় ভালয় ঘরে এলে বাঁচি।"

পুত্রের বিষয় আলোচনা আজ আর বেশীদূর গড়াইল না, এইখানেই স্থগিত রহিল।

চতুর্থ দিনে মাতার চতুর্থী ক্রিয়া শেষ করাইয়া মোহন পত্নী বাসন্তী ও শ্যালী বিজয়াকে লইয়া বাড়ি ফিরিল। বিদায়কালে বাসন্তী মাতার প্রত্যেক জিনিসটী লক্ষ্য করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। দিদির কান্না দেখিয়া বিজয়াও কাঁদিল। মোহন তাহার স্বভাবসুলভ সুমিষ্ট স্বরে সান্ত্বনা দিয়া ভগিনীর স্নেহে বিজয়াকে বক্ষে তুলিয়া লইল। বাড়ী আসিয়া মোহন বিজয়াকে মায়ের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিল, "এই নাও মা।"

মা বিস্ময়ের সহিত পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ আবার কে?"

পুত্র একটু ইতস্ততঃ করিল মাত্র, বলিল, "এটী—"

"ওঃ বুঝেছি আর বলতে হ'বে না। বৌমার বোন বুঝি? এখানে থাক্‌বে না কি?"

"হাঁ, ওদের থাকবার স্থান কোথা?"

মায়ের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। মোহন তাহা লক্ষ্য না করিয়া সমস্ত সঙ্কোচ সরাইয়া দিয়া বলিল, "এখানে না আনা ভিন্ন আর তো তেমন উপায় দেখলুম না কারণ সেখানে, আর সে রকম আপনার বলেও কাউকে দেখা গেল না কাজেই—"

মা মনে মনে বলিল, "হুঃ, তাই আপন করে নিয়ে এলে। দরদ তো খুব দেখ্‌ছি।" বলিলেন, "তা হ'লে চিরকাল পুষতে হ'বে বল।"

মোহন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "তুমি তো মা সুন্দর মেয়ে ভালবাস, তা মেয়ের মত মানুষ কর না। আহা বেচারী! বেশ দেখতে না মা।"

দয়াময়ীরও মনে হইল, আহা দিব্যি মেয়েটী। কিন্তু প্রকাশ্যে রুষ্টভাবে বলিলেন, "তা বলে রূপ দেখে তো পেট ভরে না মোহন। আর তোমার শ্বশুর বাড়ীর গোষ্ঠীকে যে পুষ্‌তে হ'বে এত আমার ভাত নেই বাছ।"

মা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল দেখিয়া মোহন মস্তক অবনত করিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।

পুত্রকে না পাইয়া দয়াময়ী কর্ত্তাকে লইয়া পড়িলেন, "বলি শুনছ গা।"

কর্ত্তা আফিংখোর মানুষ। তিনি চক্ষু মুদিয়া ঝিমাইতে-ছিলেন। ঝিমাইতে ঝিমাইতে বলিলেন,—"কি হ'ল আবার।"

"হ'ল বেশ। ছেলের কীর্ত্তিটা দেখেছ একবার, না, আফিং খেয়ে খালি ঝিমুতে লেগেছ। ওদিকে ছেলে যে পর হ'য়ে যায় গো।"

স্বামীর নেশা ছুটিয়া গেল। সচকিতভাবে পত্নীর মুখের দিকে অর্দ্ধ নিমিলিত আঁখি বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "পর হ'য়ে যায়?"

"যায় বৈ কি। সেই রকমই তো গতিক দাঁড়াল।"

সেই রকম গতিক দাঁড়াল—কর্ত্তা শিবেশ্বরের মনে পড়িল, পুত্র কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছে, কই তাহার প্রশান্ত মুখে 'পর' হইবার মত কোনও লক্ষণ তো প্রকাশ পায় নাই; সুতরাং তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় আরামে ঝিমাইতে সুরু করিলেন। দেখিয়া দয়াময়ীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহেন, সুতরাং চীৎকার করিয়া অবস্থা কি ছিল, এখন কি দাঁড়াইল এবং পরে কি দাঁড়াইবে—তাহা সালঙ্কারে, স-ঝঙ্কারে এবং সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া শেষে বলিলেন, "দেখেছ তো।"

নিরুদ্বিগ্ন স্বামী উদাসীনভাবে উত্তর করিলেন, "দেখছি, দেখছি গিন্নি, সব দেখছি।"

"দেখছ আমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। কি দেখছ ছাই শুনি।"

কর্ত্তা হাই তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "কলিকাল, কলিকাল!"

দয়াময়ী রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আঃ আমার কপালখানা। মিন্‌সের ভীমরতি হয়েছে গো—একে নিয়ে আমার কি জ্বলন হ'ল গো। চোখবুজে বুজে কলিকাল দেখলে কি হ'বে। ওদিকে যে উপসর্গ গলগ্রহ জুটলো।"

কর্ত্তা শিবেশ্বর শান্তিপ্রিয় লোক। তাহাতে শোকসন্তপ্ত চিত্ত, অকাল-বার্দ্ধকের লক্ষণ সকল দেহে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত, উপস্থিত পেনসন লইয়াছেন, কিন্তু সুগৃহিণীর হিসাব-নিকাশের জ্বালায় তাহাকে শান্তিতে থাকিতে দেয়

কাহার সাধ্য। গৃহিণীর হিসাবের খাতায় খরচের মাত্রাধিক্য ঘটিলেই আর রক্ষা নাই। তাঁহার চীৎকারে বাড়ীখানি মুখরিত হইতে থাকে।

স্বামীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া দয়াময়ী হতাশ-ভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "নাঃ, এ সংসারে থাকা আর আমি সুবিধা বুঝছি না। হ্যাঁ গা, এতক্ষণ ধরে যে ঠায় বকে মলুম, তা একটা কথায়ও কি কর্ণপাত করতে নেই?"

শিবেশ্বর এবার একটু অপ্রতিভ হইলেন, পত্নীকে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলছ বল দেখি ভাল করে, স্পষ্ট করে। এত রাগছ কেন?"

"রাগি কি আর সাধে, অনেক দুঃখে রাগি। বলে যার জ্বালা সেই জানে। লোকে দেখে মাগী বুঝি খালি চেঁচায়। চেঁচাই যে কেন লোকেরা তা' বোঝে না। ছেলের বিয়ে দিয়েছি, বৌ নিয়ে ঘর করব। বৌয়ের সঙ্গে উপসগ্‌গ জুটবে তা তো জানি না।"

শিবেশ্বর এতক্ষণে কূল পাইলেন, বলিলেন, "ওঃ, বৌমার বোনের কথা বলছ?"

দয়াময়ী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার যেমন সবতাতেই অন্যমন। কোনও কথা তো সহজে শুনতে চাও না, তা বুঝবে কি?"

শিবেশ্বরসহাস্য মুখে বলিলেন, "ও হরি, তাই বল। আমি মনে করি আর কি।" তারপর গৃহিণীর কাণে কাণে অনেকক্ষণ ধরিয়া কি বলিলেন; শেষে বলিলেন, "বুঝলে তো গিন্নি।"

ভবিষ্যতের প্রাপ্তির আশায় আনন্দে এই লোভাতুরা নারীর মন সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দয়াময়ী একগাল হাসিয়া বলিল, "আহা তাই কি আমি বলছি গা। আর মেয়েটার বিয়ে যা—"

কর্ত্তা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সে সব বন্দোবস্ত ভাল রকমই করে গেছে। এতে তোমার সিকি পয়সার ক্ষতি নেই, বরং যথেষ্ট লাভ আছে। বুঝতে পারলে তো?"

দয়াময়ী বুঝিল এবং মনে মনে বলিল, "হুঃ, মোহন আমার এমন কাঁচা ছেলেই নয়।"

পুত্রের গুণগরিমায় মায়ের মনে সহসা যেন বান ডাকিয়া উঠিল।

(৩)

দয়াময়ীর সংসারে আপন পুত্র-কন্যা ও স্বামী ব্যতীত আর কেহ ছিল না। ছিল না বলিয়াই কোনও অশান্তি ঘটে নাই। থাকিলে দিবানিশি আগুন জ্বলিত। দয়াময়ী এতদিন বাড়ীতে অপর কাহাকেও না পাইয়া স্বামী ও পুত্রকন্যার উপরই কারণে-অকারণে গাল ঝাড়িতেন। তাহাদের উহা সহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অনভ্যস্ত বিজয়া ও বাসন্তীর পক্ষে উহা মাঝে মাঝে বিরক্তিকর হইয়া উঠিত। বিজয়া বালিকা অল্পবুদ্ধি, সে অনেক সময়েই বড় ভ্রূক্ষেপ করিত না; কিন্তু বাসন্তীর বুঝিবার মত বয়স হইয়াছে, কাজেই সে মরমে মরিয়া থাকে। বিজয়া ক্রমে বড় হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে মেয়ে আবার তেমনি চঞ্চল, সেই জন্য আরও তাহাকে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয়।

এই দুইটী বোন আপন সহোদরা ভগিনী হইলে কি হইবে, দুইটীর আকৃতি এবং প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের ছিল। বাসন্তীর তেমন রূপ ছিল না। সে শ্যামাঙ্গী, শান্ত-প্রকৃতি, সংযত-হৃদয়া, লজ্জাশীলা। বিজয়া সুন্দরী, চঞ্চলা, নির্ভীকা। বাসন্তীতে যাহা আছে, তাহা যেন একটু অস্পষ্ট—বিজয়াতে যাহা আছে, তাহা স্পষ্ট—কোথাও জড়তা নাই—সহজ, স্বচ্ছ, পরিষ্কার। লজ্জাশীলা বাসন্তীর প্রকৃতি গম্ভীর—সে যাচিয়া কাহারও সহিত বড় একটা মিশিতে চায় না। বিজয়ার প্রকৃতিতে এমন কোন কোন গুণ আছে, যাহাতে প্রথম দর্শনে লোকে তাহাকে ভাল না বাসিলেও সে আপনি কেমন করিয়া ভালবাসা আদায় করিয়া লইতে হয় তাহা জানে। ক্রমে দয়াময়ীর মত লোকেরও—যাহার দুনিয়াতে কাহাকেও কখনও ভাল লাগে নাই, তাহাকেও ইহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে হইল। ক্রমে সে আপন পুত্রবধূ অপেক্ষা এই সুন্দর মেয়েটার অনুরক্ত হইয়া পড়িল। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু ছিল না। রূপ কে না ভালবাসে? রূপের যে মস্ত একটা আকর্ষণী শক্তি আছে।

মোহনও সৌন্দর্য্য-প্রিয় এবং গুণগ্রাহী। সে রূপেরও আদর করিতে জানে এবং গুণেরও কদর বুঝে। বাসন্তীর রূপ ছিল না, কিন্তু তবু সে তাহাকে কম ভালবাসিত না—পত্নীর শ্যাম আবরণের নিয়ে যে স্বভাব সুকুমার সরলতাময়

অন্তঃকরণখানি ছিল তাহারই প্রকৃত পরিচয় পাইয়া সে একান্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

দিন কাটিতে লাগিল। বিজয়া এখন বেশ বড় হইয়াছে। ভগিনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া বাসন্তীর বুক শুকাইয়া উঠে। সে ভাবে হতভাগীর বয়সের চেয়ে শরীরটা যেন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। কথাটা স্বামীর নিকট পাড়িবে পাড়িবে করিয়াও পাড়িতে পারে নাই, কেমন লজ্জা করে। সকল দায়িত্বই যে তাহারা অম্লান বদনে বহন করিতেছেন। কিন্তু মেয়েটা যে ক্রমে বড় হইয়া উঠিতেছে। সে বিষয়ে তাঁহারা মনোযোগ করেন না কেন? স্বামী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক। তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু শাশুড়ী তো তাহার অপেক্ষা 'বিজি'কে যথেষ্ট ভালবাসেন, তবে তিনিই বা কেন উদাসীন। তাঁহারা আপনারাই যদি কথাটা উত্থাপন করিতেন তাহা হইলে বেশ শোভন হইত, সে সুযোগও পাইত। বিবেচককে বিবেচনা করাইয়া দেওয়া—মাগো ছিঃ! বড় লজ্জা করে। লাজুক মেয়ে বাসন্তী সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। স্বামী সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত। কি এত কাজ? সে বুঝিতে পারে না। সে দিন বাসন্তী কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া স্বামীকে বলিল, "দেখ একটা কথা বলছিলুম—"

মোহন কি একখানা বই নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিল। "বল"—বলিয়া চোখ তুলিয়া পত্নীর দিকে চাহিল।

বাসন্তী টেবিলের উপরিস্থিত কাগজপত্রগুলা গুছাইতে লাগিল। মোহন তাহার কার্য্যকলাপ উৎসাহের দৃষ্টিতে চাহিয়া একটু অপেক্ষা করিল, তারপর বলিল, "কি হ'ল? কি বলবে বলছিলে বল?"

পত্নীকে তথাপি নিরুত্তর থাকিতে ও এটা-সেটা নাড়িতে দেখিয়া মোহন হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা আমি একটু পড়ে নিই। না হয় চোখ বুজছি, তুমি ততক্ষণ কথাটা ভেবে নাও।"

বাসন্তী এবার অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "ভাববে না হাতী করবে।"

মোহন হাসিতে হাসিতে বলিল, "ঐ তো ভাবছ।"

"ভাবছি বৈ কি।"

"আচ্ছা না ভেবেই বল, তা হ'লে হ'বে তো।"

"ঐ বলছিলুম—"

"কি?"

বাসন্তী মৃদু হাসিয়া বলিল, "ওই বিজির কথা বলছিলুম। বিয়ের যোগ্যি হ'ল তো—"

মোহন হাঁফ ছাড়িয়া বলিল, "ওঃ, এই কথা। এর জন্যে এত, বাসরে বাস!"

"কথাটা বুঝি বড্ড সহজ হ'ল।"

"এর ভেতর শক্তটা কি, সেটা তো আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। শালীর বিয়ে এতো মজার কথা।"

"আজকালকার দিনে বর খোঁজাটা বুঝি খুব মজার কথা হ'ল!"

"হুকুম কর হুজুরের কাছে হাজির—"

বাসন্তী মোহনের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আঃ, কি যে ছাই বল তার ঠিক নেই। ওকথা কি বলতে আছে?"

মোহন পত্নীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "বলতে নেই? বললে কি হয় বল?"

"জানি নি অত, যাকে তাকে অমনি যা-তা বললেই হ'ল কি না।"

"ও তুমি তা হ'লে আমার যা-তা—" বলিয়া মোহন খুব হাসিতে লাগিল।

স্বামীকে হাসিতে দেখিয়া বাসন্তীর ভারি রাগ হইল, বলিল, "অমন করলে আমি থাকতে চাই নি।"—বলিয়া সে গমনোদ্যত হইল।

মোহন বাধা দিয়া বলিল, "না না বস, আর কিছু বলব না। আচ্ছা ওসব কথা—যাক্ গে। এখন লেখা-পড়া কি রকম হচ্ছে বল তো।"

"ছাই হচ্ছে।"

"কেন ছাই হচ্ছে। বিজি তোমার চেয়ে কত ছোট। ও কেমন টপ টপ করে এগিয়ে যাচ্ছে দেখ দেখি। দু'জনে এক সঙ্গে ধরলে।"

বাসন্তী লজ্জিতভাবে মাথা নত করিয়া বলিল, "আমার দ্বারা কিছু হ'বে না, আমার আশা তুমি ছেড়ে দাও।"

মোহন সস্নেহকণ্ঠে বলিল, "তোমার আশা কি এত সহজে ছাড়তে পারি?"

বাসন্তী অপরাধীর মত ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।

মোহন এ দৃষ্টির অর্থ বুঝিল। সে জানিত বেচারীর অবসর বড় কম। আর সে নিজেও তার প্রতি বড় বেশী মনোযোগ দিবার সময় পায় না। বিজয়া স্কুলে যায়, নিয়মিত পাঠে কোনও ব্যাঘাত নাই, সুতরাং সে যে অগ্রসর হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি! তাই কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "তারপর কি হ'ল? চুপ করে আছ যে, রাগ হ'ল বুঝি?"

হাসিয়া বাসন্তী বলিল, "হ্যাঁ গো, তুমি খালি রাগ করতেই দেখ সবাইকে।"

"তবে কি ভাবছিলে?"

"ভাবছিলুম—সত্যি বলছি, আমি তোমার একেবারে অযোগ্য।"

সহসা দরজার সম্মুখ দিয়া বিজয়াকে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া মোহন ডাকিল, "এই বিজি, বিজি, শোন শোন একটা খুব ভাল খবর আছে।"

বিজয়া গৃহের মধ্যে ঢুকিয়া প্রশ্ন করিল, "কি দাদা, কি ভাল খবর?"

বিজয়া বড় ভায়ের মত মোহনকে দাদা বলিত।

মোহন বলিল, "তোর যে বিয়ে হ'বে রে রাক্কুসি।"

"যাও।"

"যাও কিরে পোড়ারমুখী।"

"আমি বিয়ে করব না।"

মোহন হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। তারপর হাসিতে হাসিতে পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "শুনছ তো বোনের কথা?"

"শুনছি"—বলিয়া বাসন্তী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। ভগিনী এবং ভগিনীপতিকে হাসিতে দেখিয়া বিজয়া মহা অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, বুঝিল কথাটা বলা ভাল হয় নাই। কিন্তু সে বড় চতুর মেয়ে, কথাটা সংশোধন করিয়া লইয়া চটুল চ'খে ভগিনীপতির দিকে চাহিয়া সপ্রতিভকণ্ঠে বলিল, "আমি তো ও কথা বলি নি মশাই।"

মোহন এবার হাসির মাত্রাটা একটু বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "আমি কি বিশ্বাস করছি ভাই? তা ভয় কি বিজি আমি তোর খুব শিগ্‌গির বিয়ে দিয়ে দেব, বলিয়া খপ করিয়া বিজয়াকে পাকড়াও করিয়া ধরিল। সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

বোনের দুর্দ্দশা দেখিয়া বাসন্তী স্বামীকে হাসিয়া বলিল, "ছেড়ে দাও না, পোড়ারমুখী যে ম'ল।"

"পোড়ারমুখী অমন মরে না গো তোমার মত। বিজি, বল্‌ত ভাই কার মত বর চাস? আচ্ছা আমার কাণে চুপি চুপি বল্ কার মতন"

"কারও মত চাই নি যাও।" বলিয়া বিজয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া একছুটে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্বারের আড়াল হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "কেমন দাদা, হারিয়ে দিইছি তো, কেমন জব্দ করেছি।"

মোহন একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তোদেরই আজকাল জিতের পালা রে"—বলিয়া পত্নীর প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জানাইল—"কি বল।"

"আহা" বলিয়া বাসন্তী স্মিতহাস্যে চরকার নিকট গিয়া সুতা কাটিতে বসিল।

"উত্তর দিলে না যে?"

"জানি না। সব কথার উত্তর দিতে হ'বে—না?"

"বিজি কেমন হারিয়ে দিয়ে পালাল দেখলে তো।"

বাসন্তী হাসিয়া বলিল, "পোড়ারমুখী যেন দিগ্‌বিজয়ী।" বলিয়া সে চরকায় পাক দিতে লাগিল।

"তা বলে তোমার দিকটা জয় করতে পারছে না গো। আজকাল চরকাকাটায় খুব উৎসাহ দেখছি। দেশের কাজে তা হ'লে লেগেছ বল।"

"না লাগবে না। দেশ যেন ওনাদেরই একলাকার একচেটে।"

মোহন মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল, আর তন্ময়ভাবে পত্নীর চরকা কাটা দেখিতে লাগিল।

(৪)

তারার মা বাড়ী ঢুকিয়া বলিল, "কই গো মোহনের মা, কি হচ্ছে?"

দয়াময়ী সহাস্যমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "কে তারার মা, অনেক দিনের পর, কি ভাগ্যি যে, এস দিদ, বস বস।"

তারার মা বসিতে বসিতে বলিল, "ওমা, এই যে বামুন-দিদি ও যে, কতক্ষণ ?"

বামুন-দিদি বলিল, "বেশাক্ষণ নয় বোন, এই এসে মাত্র বসেছি। মোহনের মা রোজ বলে—বামুন-দিদি এস এস। আসবার কি যো আছে বোন, পোড়া সংসার নিয়ে হ'য়েছে জ্বলন, দুদণ্ড কি বেরোবার যো আছে ভাই।"

আজ দয়াময়ীর দালানেই মজলিস বসিয়াছিল। দয়াময়ীর পিসীমা ও বাড়ী হইতে আসিয়াছে। বলিল, "তা যা বলেছ বামুণ-মেয়ে। দয়াও আমাকে বলে আসতে, তা সংসার হ'য়েছে পায়ের বেড়ি। ভাগ্যি এসেছি, তাই সবাইকার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎটা হ'ল। আমাদের আজ কপাল জোর দয়া।"

দয়াময়ী পিসীমার কথায় সায় দিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "ঠিক বলেছ পিসীমা, যেদিন আসে না তো কেউ আসে না। একলা দম ফেটে মরি দুটো কথা বলবার জন্যে। ও বৌমা গোটা কত পান সেজে নিয়ে এস গো।"

বধূ পান আনিয়া শাশুড়ীর হস্তে দিল। শাশুড়ী ইঙ্গিত করিতেই বধূ একে একে সকলকে নমস্কার করিল।

বামুন-দিদি বলিল, "এস মা এস, হয়েছে, আমি অমনিই আশীর্ব্বাদ করছি—জন্ম-এয়িস্ত্রী হও,হাতের নোয়া বজ্জর হ'ক।"

তারার মা দুই আঙ্গুলে চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া বলিল, 'বস মা বস, শীগ্‌গির শীগ্‌গির বেটা বিয়িয়ে দাও বাছা।"

বাসন্তী সঙ্কুচিতভাবে একপার্শ্বে উপবেশন করিল দেখিয়া তারার মা বলিল, "বউটী বড় লক্ষ্মী, না দিদি ?"

দয়াময়ী ডিবা হইতে পান বাহির করিয়া সকলকার হাতে দিতেছিল। একটী পান আপনার মুখের মধ্যে পুরিয়া বলিল, "ওই দেখতেই লক্ষ্মী"—বলিয়া কৌটা হইতে খানিকটা দোক্তার গুঁড়া বাহির করিয়া—"দোক্তা খাও তারার মা। ওমা সত্যি,তোমার ওসব বালাই নাই—এই নাও বামুনদি।" বলিয়া বামুনদিদিকে খানিকটা এবং আপনার মুখে আলগোছে খানিকটা ফেলিয়া দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আপনার অর্দ্ধসমাপ্ত কথার পাদপূরণ করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "গুণে তো অষ্টরম্ভা বোন, ছেলে তো হ'ল না।"

তারার মা প্রতিধ্বনি করিল, "তা সত্যি, ছেলে না হ'লে ঘর-সংসার সব অন্ধকার।"

বামুন-দিদিও সায় দিল, "মেয়ে-জন্মটাই মিথ্যে।" তারপর বাসন্তীর দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তা এখনও হ'বার সময় আছে।"

গৃহিণী দয়াময়ী ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি কি বল বামুন দি আরও হ'বার সময় আছে। তোমার মাণিকের বলে এই তিন বছর পেরোয় নি বিয়ে হয়েছে বলতে নেই, তোমার বৌ কেমন পুট পুট করে দুটী সোণার চাঁদ বিইয়ে দিলে। আর আমি কি বিয়ে দিয়েছি আজকে ! সে যে একযুগ হতে চলল।"

বামুনদিও তেমনি স্বরে বলিলেন, "তা হ'লে কি হ'বে বল। আমি যে তেমনি ধিঙ্গি বৌ এনেছি। বাবা, এলেন যেন পলটনের সেপাই, মানোয়ারি গোরা !"

"তা হোক মানোয়ারি হ'ল তো বয়েই গেল। বৌয়ের কথা ছেলে বুঝুক গে। তোমার তো বুক ঠাণ্ডা হ'ল. দিদি, সোণার চাঁদ বংশধরটী পেয়ে।"

তারার মা বলিল, "তা মোহনের মা যা বলেছ, কথাটা একেবারে মিছে নয়। ছেলে হ'লে তবেই তো বৌ, তা না হ'লে কিসের বৌ ? তার আর কি বৌকে ভাল লাগে। আমার তারাও ছেলে ছেলে করে সারা হ'য়ে যাচ্ছে। তোমার মত তারও একটা ছেলে, বংশ রক্ষা করা তো চাই। শুনেছি আবার বিয়ে দেবে।"

দয়াময়ী খুব সমর্থনের স্বরে বলিল, "দেবে না তো কি করবে। আটকুড়ো সংসার—বলে যার জ্বালা সেই জানে। এই দুঃখে কাশী চলে গেলুম, মনের দুঃখে বনে গিয়েও শান্তি পেলুম না বোন।"

"তা কি করে পাবে দিদি, তোমার সংসারের সার হ'ল মোহন। তার ছেলে পুলে হ'বে তাদিকে নিয়ে লালন-পালন করবে। সংসারী মানুষ—এখনই তোমাদের কি কাশীবাস করবার সময়।"

দয়াময়ী মহা খুসী হইয়া বলিল,—"বল দিদি, তোমরাই পাঁচজনে বল—সময় কি ? না ভাল লাগে ? বিশ্বেশ্বর আমার মাথায় থাক"—বলিয়া দয়াময়ী দুই হাত জোড় করিয়া ললাট স্পর্শ করিল।

মোট-গামার এতক্ষণ তন্দ্রা আসিয়াছিল তিনি ইহারই মধ্যে খানে আঁচল বিছাইয়া বেশ খানিকটা ঘুমাইয়া লইলেন। কেমন করিয়া তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল—বোধ হয় তাহাদের আলোচনা কিছু কিছু কাণে গিয়াছিল। তিনি সবলে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'ছেলের আবার বিয়ে দিবি দয়া? তবে আর এত ভাবনা কিসের? দিয়ে দে চুকে যাক ল্যাটা।"

পিসীমা যত সহজে ল্যাটা চুকাইতে চায়ে, কাজটা যে তত সহজ নয়, দয়াময়ী তাহা জানিত। পুত্রটী তাহার নিতান্ত আধুনিক। তাহাকে বিশ্বাস নাই। ইহা জানিত বলিয়া সে বিষণ্ণভাবে উত্তর করিল, "বিয়ে তো দোব পিসীমা তোমার নাতিকে তো তুমি জান, এখনকার ছেলে।"

পিসীমা হাই তুলিতে তুলিতে বলিল, "তা আর জানি নি। তা বলে ছেলেকে আবার কিসের ভয় শুনি? তোর পেটে সে হয়েছে তো—'

পিসীমার কথায় দয়াময়ী উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বিষণ্ণ মুখে প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিল।

বামুন-দিদি জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলে কি বলে?"

"-ল আর কি বলবে, কথাটা তো তার কাছে পষ্ট করে বলি নি; তবে পিসীমাকে দিয়ে কতবার বলিয়েছি। তা সে ছেলের অন্ত পাওয়া ভার।"

"আর কর্ত্তা? কর্ত্তার কি মত?"

"তার কথা বলছ? তার আবার মতামত বলে কিছু আছে কি বামুন-দি। সাতেও নেই পাঁচেও নেই। তোমাদের পাঁচজনের আশার্ব্বাদে তিনি আমার ভোলানাথ।"

স্বামি-গর্ব্বে দয়াময়ীর বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল। এমন সময় অঞ্চল দুলাইতে দুলাইতে চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় বিজয়া তাহার নয়ন দু'টীতে হাসি উদ্ভাসিত করিয়া তাহার দিদিকে -একটা মজার কথা বলিবার জন্য তথায় ছুটিয়া আসিয়া -সা সকলকে দেখিয়া থামিয়া গেল।

-ন সকলকার দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ হইল। তাহার- -বিস্মিত দৃষ্টিতে বিজয়াকে নিরীক্ষণ করিতে -লিল, "ওমা, বৌয়ের বোনটী তো খুব বড়

দয়াময়ীর হইয়া পিসীমা উত্তর দিল, "হ'বে না, বয়সটা বাড়ছে না কমছে?"

"বিয়ে-থার কথা আসছে তো?"

দয়াময়ী একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল, "হাঁ না, এখনও বিয়ের কথা কই নি। আমাকেই তো বিয়ে দিতে হ'বে।"

"তোমরাই হ'লে ওর বাপ-মা। তা মেয়েটাকে তো দেখতে-শুনতে মন্দ নয়।"

বিয়ের নামে বিজয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বামুন-দি সহসা একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি যেমন বৌ করেছি।"

দয়াময়ী জবাব দিল, "তোমার আবার মন্দটা কিসের দিদি। আমার বৌয়ের চেয়ে তা বলে শত গুণে ভাল। অমন পেলে আমি বর্ত্তে যেতুম।"

পিসীমা স্পষ্টবাদী লোক, তিনি সাফ বলিয়া দিলেন, "তুই তো আবার ব্যাটার বে দিবি বলছিলি বাপু, তবে আবার খুঁতখুতুনি কেন? এবার ভাল দেখে মনের মত করে বৌ আনিস চুকে যাক্ ল্যাটা।"

বামুন-দিও বলিল, "আর খুঁজতেই বা হ'বে কেন? মেয়ে তো দিদির হাতের মুঠোর ভেতর, খালি মালা-বদলের অপিক্ষে।"

পিসীমা বলিল, "যা বলেছ বামুন-মেয়ে। সেই তো খরচ-পত্র করে মেয়েটাকে পার করতে হ'বে। তার চেয়ে এ হ'ল ভাল, লাভে থাকতে মনের মত বৌ হ'বে, লোককে বলবারও একটা অছিলা পাবি।"

দয়াময়ীর মন খুসীতে এবং মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। এতদিন যে কথাটা মনের কোণে লুকান ছিল, আজ বামুন-দি ও পিসিমা তাহা প্রকাশ্যভাবে বলিয়া ফেলিল।

বাসন্তী বারান্দার একধারে বসিয়া তাহাদের সকল কথাই শুনিতেছিল। সহসা সে শিহরিয়া উঠিল; তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে একখানি যবনিকা সরিয়া গেল।

দয়াময়ী খুসীভরা অথচ নিম্ন স্বরে বলিল, "আমি অনেকদিন আগে থেকেই এরকম আঁচ করে রেখেছি বামুন-দি। আজ তোমরা আমার মনের কথা টেনে বার

মহীশূরে সরস্বতী

JUNO PRINTING WORKS, CAL.

করেছ। তাই তোমাদের কাছে বলছি—আমাদের মোহনেরও মনে মনে ওকে বড় পছন্দ।"

'মনে মনে ওকে বড় পছন্দ!' শুনিয়া বারান্দার ধারে একেবারে পাথরের মত নিস্পন্দভাবে বসিয়া পড়িল।

আরও কত আলোচনা হইয়া গেল। তাহার এক বর্ণও বাসন্তীর কর্ণকুহরে প্রবেশলাভ করিল না। তারপর কখন সভাভঙ্গ হইল, বেলা পড়িয়া আসিল, সূর্য্যদেব পাটে বসিল, সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা চতুর্দ্দিকে বাজিয়া উঠিল, তাহা সে কিছুই জানিতে পারিল না।

বধূর দিকে তাকাইয়া আজ দয়াময়ীও যেন একটু ভীত হইয়া গেল। তাহাকে সন্ধ্যা দিবার জন্য আদেশ পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না।

তারপর অনেকখানি রাত হইয়া গিয়াছে। মোহন বাহির হইতে বেড়াইয়া আসিয়া বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে পত্নীকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একি একলাটী এখানে এমনভাবে বসে কেন?"

বাসন্তী উত্তর দিতে পারিল না। ক্রন্দনে কণ্ঠ যে তাহার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে নতমুখে বসিয়াই রহিল। স্বামীর এই স্নেহ সম্ভাষণ মৌখিক শিষ্টতা বলিয়া মনে হইল। অভিমানে স্বামীর মুখের দিকে পর্য্যন্ত চাহিতে ইচ্ছা করিল না। উত্তর না পাইয়া মোহন হস্তস্থিত বইখানা দিয়া সাদরে পত্নীর পৃষ্ঠে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া চলিয়া গেল।

এতক্ষণ পরে বাসন্তীর রুদ্ধ বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। অশ্রু উৎসরূপে হু হু করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল—আর বুঝি তাহা রোধ করিতে পারে না, না কিছুতে না।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমাচার-চন্দ্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার জীবন-সম্বন্ধে অতি অল্প উপাদানই পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি হলদে তুলট কাগজে পুথির আকারে ছাপা মনুসংহিতার একখানি গ্রন্থ আমার হস্তগত হইয়াছে। এই মনুসংহিতা ১৮৫৪ শকের (১৮৩২ খৃষ্টাব্দের) ২০এ ফাল্গুন কলিকাতার সমাচার-চন্দ্রিকার যন্ত্রে মুদ্রিত হয় পুষ্পিকায় এই সংবাদ দেওয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশ-তালিকা সংস্কৃতে দেওয়া আছে। বংশ তালিকাটী পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

বন্দ্যো বন্দ্যঘটীবংশে জাতঃ খ্যাতো ভগীরথঃ। বভূবুস্তস্য সৎপুত্রাঃ পঞ্চ পঞ্চাননোপমাঃ ॥১॥ জ্যেষ্ঠো মনোহরো ধীমান্ জিতামিত্রশ্চ মধ্যমঃ। দেবানন্দস্তৃতীয়োহভূচ্চতুর্থঃ শ্রীপতিঃ কৃতী ॥২॥ আখ্যয়া পঞ্চমঃ শ্রীমানেতে পঞ্চ সহোদরাঃ। জিতামিত্রস্য পুত্রৌ দ্বৌ খ্যাতৌ বন্দ্যঘটীকুলে ॥৩॥ বাণীশিগ্দারকো জ্যেষ্ঠোহনুজঃ শ্রীরামনামকঃ। জ্যেষ্ঠস্য শিকদারস্য পুত্রাঃ ষড় ভুবি বিশ্রুতাঃ ॥৪॥ চণ্ডীদাসশ্চ মথুরানাথশ্চ হরিনাথকঃ। ভবনাথশ্চ বিখ্যাতঃ শিবরামশ্চ জীবনঃ ॥৫॥ মথুরানাথতো জাতাঃ পুত্রাঃ পঞ্চকুলোজ্জলাঃ। প্রথমো রামচরণো গোপীনাথশ্চ মধ্যমঃ ॥৬॥ তৃতীয়ঃ কৃষ্ণচরণঃ শিবকৃষ্ণশ্চতুর্থকঃ। বল্লভঃ পঞ্চমশ্চৈতে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ।৭। রঘুনাথো রামনাথো দ্বৌ কৃষ্ণচরণাত্মজৌ। রঘুনাথস্য চত্বারস্তনূজা অভবন্ ভুবি ।৮। রামভদ্রোহভবজ্জ্যায়ান্ রামচন্দ্রশ্চ মধ্যমঃ। তৃতীয়ো রামগোবিন্দশ্চতুর্থস্তেকুসংজ্ঞকঃ। রামচন্দ্রসুতাঃ সপ্ত সপ্তসপ্তিসমপ্রভাঃ। জ্যেষ্ঠ কেবলরামশ্চরামানন্দশ্চ মধ্যমঃ ।১০। তেষাং তৃতীয়ঃ শ্রীরামস্তুর্য্যো রামহরিঃ কৃতী। রাধাকৃষ্ণ পঞ্চমশ্চ বলরামশ্চ ষষ্ঠকঃ ।১১। পদ্মলোচননামা যঃ সপ্তমঃ সোহত্র কীর্ত্তিতঃ। রামানন্দসুতা এতে কুলশীলসমন্বিতাঃ ।১২। কাশীনাথকৃপারামবিজুরামজয়াহ্বয়াঃ। বভূবতু রামজয়াদয়ো দয়াম্মহোদয়ৌ দ্বৌ তনয়ৌ নয়ান্বিতৌ। শ্রীমান্ ভবানীচরণোহগ্রজস্তয়োর্ধীমান্কনীয়ানপি কৃষ্ণজীবনঃ। ১৩। শ্রীরাজকৃষ্ণঃ প্রথমো দ্বিতীয়ঃ শ্রীরাজরাজেশ্বরসংজ্ঞকশ্চ। শ্রীমান্নিমাইচরণস্তৃতীয়ো ভবানীচরণস্য পুত্রাঃ।

নিম্নে আমরা উদ্ধৃত সংস্কৃত হইতে একটী বংশ-লতা প্রস্তুত করিয়া দিলাম :—

- ভগীরথ
  - মনোহর
  - জিতামিত্র
    - বাণী শিগ্দার
      - চণ্ডীদাস
      - মথুরানাথ
        - রামচরণ
        - গোপীনাথ
        - কৃষ্ণচরণ
          - রঘুনাথ
            - রামভদ্র
            - রামচন্দ্র
              - কেবলরাম
              - রামানন্দ
                - কাশীনাথ
                - কৃপারাম (বিজু)
                - রামজয়
                  - ভবানীচরণ
                    - রাজকৃষ্ণ
                    - রাজরাজেশ্বর
                    - নিমাইচরণ
                  - কৃষ্ণজীবন
              - শ্রীরাম
              - রামহরি
              - রাধাকৃষ্ণ
              - বলরাম
              - পদ্মলোচন
            - রামগোবিন্দ
            - তেকু
          - রামনাথ
        - শিবকৃষ্ণ
        - বল্লভ
      - হরিনাথ
      - ভবনাথ
      - শিবরাম
      - জীবন
    - শ্রীরাম
  - দেবানন্দ
  - শ্রীপতি
  - শ্রীমান্

—:**:—
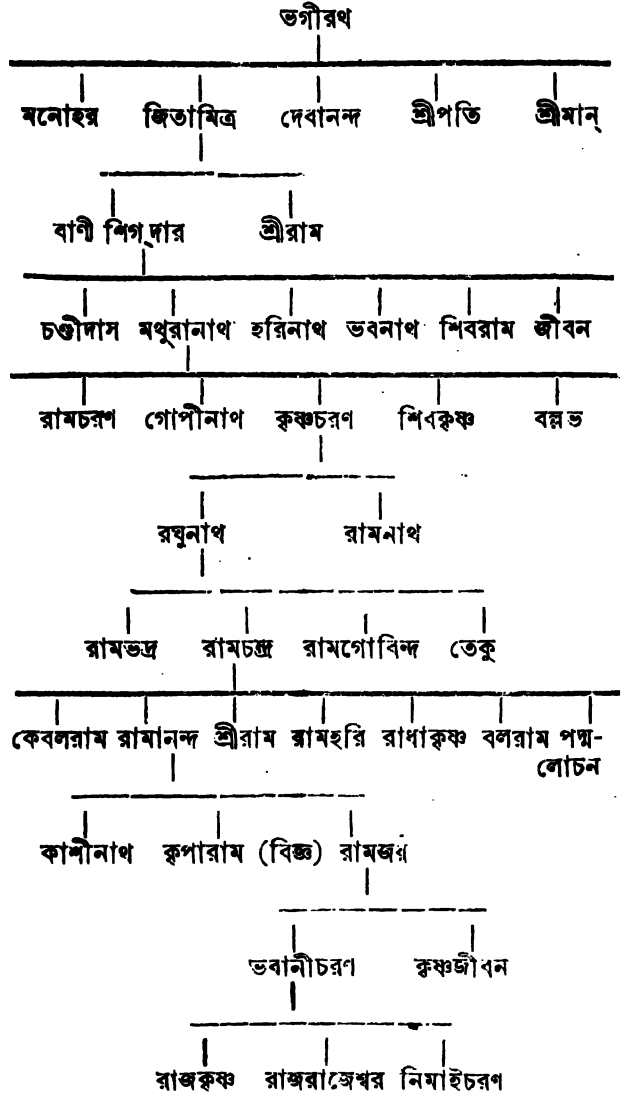
ঝরা ফুল

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

প্রতিদিন বেলা শেষে, আসন্ন সন্ধ্যায়,
পল্লবিত বনানীর নিস্তব্ধ ছায়ায়,
এই যে ঝরিয়া যায় সংখ্যাতীত ফুল—
আপন সৌন্দর্য্য ল'য়ে, বেদনা-ব্যাকুল,
চঞ্চল সুরভি রাগে, মৌন নতমুখে—
স্নেহহীন, সুকঠিন, ধরণীর বুকে ;
হে নিষ্ঠুর, ভাব' সে কি নিতান্ত নিস্ফল !
হিল্লোলিত প্রভাতের আনন্দ উচ্ছল
তাদেরো কি বরে নাই নিমেষের তরে,
চির অমরতা দিয়ে ? তুলি প্রেম-ভরে
শ্যামল অঞ্চল প্রান্তে কেহ গাঁথে নাই
মধুর-মিলন-মাল্য, তারা বৃথা তাই !
বঞ্জুল বীথিকাতলে, ক্লান্ত বায়ুবশে,
নিঃশব্দ সঙ্কোচ ভরে, দিবসে দিবসে
হেলায় ঝরিয়া গেছে, কেহ কোন দিন—
ধূসর, ঊষর, সেই ব্যথিত বিলীন
হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস শোনে নাই ব'লে,
ভাব' তারা বৃথা তাই অরণ্যের কোলে
প্রভাতে ফুটিয়া ওঠে, সাঁঝে ঝ'রে যায়,
বিপুল এ ব্রহ্মাণ্ডের কিবা ক্ষতি তায় ?
অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ, তাহাদের সাথে
ধরণীর অন্তর্লীন জীবন-সভাতে
ভাব' বুঝি জীবনের নাহি কোন যোগ ?
তাদের বিকাশ শুধু নিস্ফল দুর্ভোগ ?
হায় ভ্রান্ত ! ওই তুচ্ছ ছোট ফুল গুলি,
কোথা হ'তে এল' ওরা ? লক্ষ বাহু তুলি,
এক দিন সারা বিশ্ব এস' এস' ব'লে
ডেকেছিল তা সবারে, বসন্ত-হিল্লোলে
রোমাঞ্চিত বনাঞ্চল, ব্যথিত বিধুর,
অভ্যগ্র সঙ্কেত ভরে, করুণার সুর
তুলেছিল তা-সবার মঙ্গল আহ্বানে—
তাই তারা ছায়াচ্ছন্ন নিশি-অবসানে,
সহসা উঠেছে ফুটি, দ্যুলোকে-ভূলোকে
অখণ্ড সৌন্দর্য্যচ্ছটা ছড়ায়ে পুলকে ;—
দিবস চলিয়া যায়, মৌন অন্ধকার,
অবসন্ন কলরব, বিস্তীর্ণ পাথার—
কেহ তো বোঝে না কোন্ প্রচ্ছন্ন আশায়,
মুহূর্ত্তের সমুদ্বেল জীবন-লীলায়
মদির-বিহ্বল প্রাণে ফুটি ওঠে তারা,
অজানিত অসীমের মাঝে হ'তে হারা !
ঊষার শিশির-স্পর্শ, অরুণ কিরণ,
উতলা দক্ষিণ-বায়ু, শিলীন্ধ্র-গুঞ্জন,
অস্ফুট কাকলী-গান, মর্ম্মর সঞ্চার—
অব্যক্ত ব্যথার মত শুধু বার বার
বেজে ওঠে তন্দ্রাহত তাহাদের দ্বারে।
সেই নিমেষের সংজ্ঞা, বিপুল সংসারে
দিয়ে যায় যে যুগান্তের শূন্যতার বুকে
একটী প্রাণের বার্ত্তা, কত দুঃখে-সুখে
কত যুগ যুগান্তের তপস্যার ফলে,
ফোটে ফুল উচ্চকিত আকাশের তলে !

—:০:—

শ্রীশিবরতন মিত্র

শিবরতন মিত্র বীরভূম জেলার অন্তর্গত খয়রাশোল থানার অধীন বড়রা গ্রামে মিত্র-বংশে বাঙলা ১২৭৮ সালের ১লা চৈত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র এবং মাতার নাম নিত্যসখী দাসী।

ঈশ্বর চন্দ্রের দুই বিবাহ প্রথমা পত্নী নিত্যসখীর গর্ভে ৫ কন্যা ও তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের পঞ্চম সন্তান ও জ্যেষ্ঠপুত্র ১২৮৩ সালের ১৯এ চৈত্র (ইং ১৮৭৭ খৃঃ) নিত্যসখী পরলোক গমন করিলে ঈশ্বরচন্দ্র দ্বিতীয়বার দার গ্রহণ করেন। এই পত্নীর গর্ভে অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়াছিল ; কিন্তু কেহই জীবিত নাই।

পঞ্চমবর্ষ বয়সে যথারীতি হাতে খড়ি হইলে শিবরতন সিউড়ীতে অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তথাকার জেলা স্কুল হইতে তিনি ইংরাজী ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই সময় তাঁহার বিবাহ হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আর্ট-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি জেনারেল এসেমব্লিজে (বর্ত্তমান স্কটীশচার্চ্চ কলেজ) বি-এ, অধ্যয়ন করেন। এই সময় তিনি ওকালতী দিবার জন্য ল-ক্লাশে দুই বৎসর কাল আইন অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেন। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায় তাঁহার পিতা নিজে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আফিসের কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দেন।

কলেজে অধ্যয়ন কালে শিবরতন প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরী হইতে বহু ইংরেজী সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজী সাহিত্যে যথেষ্ট অগ্রসর হ'ন। এই সময় তিনি মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত "প্রোগ্রেস্". নামক ইংরেজী মাসিক পত্রে, কলিকাতার অধুনালুপ্ত "হোপ" নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক-পত্রে এবং "নব্যভারত" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। সময় সময় ইরেজীতে বক্তৃতাও দিতেন। কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে যাবতীয় ছাত্রগণের মধ্যে ইংরেজী প্রবন্ধ রচনার প্রতিযোগিতায় ইনি সর্চ্চোচ্চস্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করেন। স্কুলে অধ্যয়ন কালে তিনি তাঁহার কবিবন্ধু ৺আজীজ উস্ শোভানের সহিত একত্রে বহুবিধ ব্যায়াম কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ইনি উত্তরকালে যে স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন তাহাতে ইহাকে সুদীর্ঘকাল সাহিত্য-চর্চ্চা করিবার :অমানুষিক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

ছাত্রজীবন সমাধা করিয়া ইনি চাকুরীর ভার গ্রহণ করেন। এখন তিনি বীরভূম কালেক্টরীর হেড্ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট-এর পদে নিযুক্ত আছেন।

১৩০৪ সালে চাকুরিতে প্রবিষ্ট হইবার সময়ে ইহার মাতৃবিয়োগ হইলে ইনি বহু কবিতা রচনা করিয়া তদনীন্তন কালের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এই কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটী কবিতা ইঁহার 'দূর্ব্বা' নামক কবিতাপুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্টগুলি এখনও অপ্রকাশিত। ইঁহার ছাত্র-জীবন হইতে ইনি কবিবন্ধু আজীজ উস শোভানের সহিত একযোগে মহরমের ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া বাঙলা ভাষায় একখানি কাব্য লিখিবার কল্পনা করিয়াছিলেন।

ইঁহার কবিবন্ধুর পড়াশুনা বা আলোচনা করিয়া কিছু লেখার ধৈর্য্য ছিল না, সুতরাং মিত্র মহাশয়ই এই কাব্যের উপাদান-সংগ্রহে-সংকল্পে বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং সেই সমুদয় গ্রন্থ অধ্যয়ন কালে ইনি কতকগুলি মুসলেম ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ইনি ইঁহার কবি বন্ধুকে দিয়া বহু কবিতা রচনা করাইয়াছিলেন। সেগুলি সংগৃহীত হইয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "কুরঙ্গ" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় ইনি বন্ধুর উদ্দেশে যে শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে সহৃদয় ব্যক্তির চিত্ত দ্রব হইয়া যায়।

১৩০৬ সালে কর্ণাহার হইতে ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় "বীরভূমি" প্রথম প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে ইনি এই মাসিক পত্রিকায় (১) বীরভূমির ইতিবৃত্ত, (২) বীরভূমের প্রাচীন পুঁথি,(৩) ঐতিহাসিক ছড়া নামক তিনটী বড় প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে লিখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু প্রায় চারিবৎসর কাল "বীরভূমি" প্রচারিত হইয়া বন্ধ হইয়া গেলে ইহার প্রারব্ধ প্রবন্ধগুলিও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

১৩১০ সালে ইহার আবল্য বন্ধু লর্ড এস্ পি সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের আর্থিক সহায়তায় ইনি 'সোপান' নামক একখানি সচিত্র বৃহৎ মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময় 'প্রদীপ' নামক সচিত্র মাসিক পত্রিকার সত্ত্বাধিকারী ৺বৈকুণ্ঠনাথ দাস মহাশয় ইঁহার সিউড়ীর বাটীতে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহারই সহায়তায় ও পরামর্শে এই "সোপান" সিউড়ী হইতে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প হয়; কিন্তু দৈবদুর্বিপাকবশতঃ মাত্র একখণ্ড প্রকাশিত হইয়া 'সোপান' বন্ধ হইয়া যায়। এই সোপানেও মিত্র মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

মিত্র মহাশয় ছাত্রাবস্থা হইতেই বহু পুস্তক সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন এবং চাকুরীতে প্রবৃত্ত হইবার পরে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন। ইনি ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। এই সময় বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত আলোচনা কালে ইঁহার মনে বাঙলা সাহিত্যে কত সেবক আজ পর্য্যন্ত আত্মনিয়োগ করিয়া ইহার সৌষ্ঠব সাধনে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে ইঁহার আকাঙ্ক্ষা হয়। এই তালিকা সংগ্রহ করিতে ইনি প্রায় দুই বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ইনি প্রায় সাতশত গ্রন্থকারের নাম তালিকাভুক্ত করিতে সমর্থ হন। এই নামের তালিকা সংগৃহীত হইলে ইনি ইহা অভিধান আকারে পরিণত করেন। বঙ্গ-সাহিত্যের মনস্বিগণ এবং হিতৈষী বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকেই ইঁহাকে এই বিপুল ব্যয় ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইবার উপদেশ প্রদান করেন; কিন্তু তিনি যৌবনোচিত আশাপূর্ণ হৃদয়, প্রবল উৎসাহ ও বিপুল শ্রমপরায়ণতা মাত্র সম্বল করিয়া এই বৃহৎ কার্য্যে নিমগ্ন হন। ফলে ইঁহার 'বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক' নামক বঙ্গভাষায় পরলোকগত যাবতীয় সাহিত্য-সেবক গণের সুবৃহৎ চরিতা-ভিধান গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনায় ইনি অদ্যাবধি প্রায় ৩৬ বৎসর কাল অনন্যমনে পরিশ্রম করিতেছেন। ফলে এই গ্রন্থে এখন প্রায় পাঁচ সহস্র পরলোকগত বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের রচনাদর্শসহ বর্ণানুক্রমিক চরিত-কথা রচিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই সুবৃহৎ গ্রন্থ অর্থাভাবে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাই!

১৩১১ সালে 'বীরভূমি' পত্রিকা পুনঃপ্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে ইনি সর্ব্ব প্রথম ইহার বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক গ্রন্থ এই পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। কিয়দংশ মাত্র প্রকাশিত হইলে পর 'বীরভূমি' পুনরায় বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপে মাত্র দুইখণ্ড সাহিত্য সেবক প্রকাশিত হয়। তাহারপর বন্ধুবর্গের সহায়তায় আর দুই খণ্ড সাহিত্য সেবক প্রকাশিত হয়। পরে হেতমপুরের মহারাজ-কুমার ৺মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহায়তায় ৫ম হইতে ১১শ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার পর জনৈক বন্ধুর সহায়তায় ১২শ হইতে ১৬ শ খণ্ড প্রকাশিত হয়। কিন্তু অর্থাভাবে সাহিত্য-সেবকের পরবর্ত্তী খণ্ডের প্রচার স্থগিত রহিয়াছে। এইরূপ গ্রন্থ অপ্রকাশিত থাকা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়।

সাহিত্য-সেবক রচনা কালে মিত্র মহাশয় দারিদ্র্যের কঠোর যন্ত্রণায় উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইনি স্বয়ং লিখিয়াছেন —

"ইহজীবনের সর্ব্ববিধ আশা আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া]

সর্ব্ববিধ সুখৈশ্বর্য্যকে পরিহার করিয়া দারুণ দুঃখ ও দারিদ্র্যকে চিরবরণ করিয়া অনন্যমনে এই গ্রন্থ রচনায় নিবিষ্ট হইয়াছিলাম। সংসারের কত ঝড়ঝঞ্ঝা মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল—কত দিবারাত্রি সপরিবারে উপবাসে কাটাইলাম—কতদিন এক অশনে, এক বসনে অতিবাহিত করিলাম, কত দিন, কত বারমাস এই ভাবে চলিয়া গেল তাহার স্থিরতা নাই।

মানুষ সহজে এমন দিন অতিক্রম করিয়া তিষ্টিতে পারে না, এমন দারিদ্র্য-পীড়া মানুষ সহজে সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু এই "সাহিত্য-সেবক" আমার হৃদয়ে মত্ত হস্তীর অমানুষিক বল সঞ্চার করিয়া দিল বলিয়া আমি কোনরূপ বাধাবিঘ্ন বা ঝঞ্ঝা-বার্ত্তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করি নাই। উপবাস ক্লিষ্ট দেহে সমগ্র দিবসব্যাপী চাকুরীর কঠোর পরিশ্রমের পর কোন প্রকারে তৈলের পয়সা সঞ্চয় করিয়া মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর নিয়মিতভাবে রাত্রি তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত 'সাহিত্য সেবকে'র কার্য্য করিয়াছি। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিয়াছি উপবাসক্লিষ্ট পরিবারবর্গ ও শিশুসন্তান-গুলি অঘোর নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে; কিন্তু তাহাতেও বিচলিত হই নাই।

দরিদ্র আমি সন্তানগণের মুখের গ্রাস কাড়িয়াও সাহিত্য-সেবকের রচনার সৌকর্য্যার্থ পুস্তক ক্রয় করিয়াছি—শরীরের ক্লেশ ক্লেশ বলিয়া মানি নাই। দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি। এইভাবে এখন আমার একার চেষ্টার ফলে মফঃস্বলের এক নিভৃত গৃহে 'রতন-লাইব্রেরী' নামক যে গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে প্রায় ছয় সহস্র প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথি, ততোধিক মুদ্রিত গ্রন্থ এবং বাসুদেব ও সূর্য্য নামক দুইটী প্রাচীন মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। মূলতঃ এই সকল গ্রন্থ হইতেই এবং যেখানে যাহা কিছু সম্ভব সেই স্থান হইতেই আজ প্রায় ৩৬ বৎসর কাল ধরিয়া ক্রমাগত অবিরাম পরিশ্রমের ফলে এই গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।"

১৩১৫ সালে ইঁহার পিতৃ বিয়োগ ও তাহার অব্যবহিত পরেই ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র বিয়োগ হইলে ইনি একবৎসর কাল অবসর গ্রহণ করিয়া এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের সত্ত্বাধিকারী-কর্ত্তৃক বঙ্গভাষার শব্দাভিধান সঙ্কলনজন্য অন্যতম সঙ্কলয়িতারূপে কলিকাতায় নিযুক্ত হ'ন। ইনি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য হইতে শব্দ ও উদাহরণ সঙ্কলন করেন। অন্যান্য সহকর্ম্মীরা গদ্য ও পদ্য সাহিত্য হইতে এই ভাবে শব্দ ও তৎপরিপোষক উদাহরণ সঙ্কলন করেন। এইরূপ প্রায় এক বৎসরকাল কার্য্য করিবার পর যখন অভিধান প্রেসে দিবার মত প্রস্তুত হইয়া উঠিল তখন সত্ত্বাধিকারী মহাশয় ইঁহাদিগকে বিদায় দিয়া অভিধান মুদ্রণ কার্য্য স্থগিত রাখেন। পরবর্ত্তীকালে ইঁহাদের সঙ্কলিত এই অভিধান শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময় কলিকাতায় অবস্থানকালে 'মানসী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। মিত্র মহাশয় এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। 'মানসী' প্রথম প্রকাশকাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইঁহার বহু রচনা উহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতায় অবস্থান কালে ইনি "হস্তলিপি লিখন প্রণালী" নামক বালকগণের হস্তলিপি লিখিবার বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত উপদেশমূলক সচিত্র পুস্তক এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাসে'র সটিক ও সচিত্র সংস্করণ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত করেন।

ছুটি ফুরাইলে পুনরায় সিউড়ী আসিয়া কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে ইনি ইঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের সহযোগে বীরভূমে সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ইহার প্রথম সম্পাদক মনোনীত হন। এই সাহিত্য-পরিষদ হইতে মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদকতায় পুনরায় নব-পর্য্যায় 'বীরভূমি' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই বীরভূমিতেও ইনি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ রচনা ও প্রকাশিত করেন।

মিত্রমহাশয় যে সকল বাঙ্‌লা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সময়ানুক্রমিক একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

পুস্তকের নাম ও প্রকাশকাল—(১) বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক ১৩১১ সাল; (২) দূর্ব্বা ১৩১৩ সাল; (৩) বর্ণমালা (প্রথমভাগ) ১৩১৩ সাল; (৪) হস্তলিপি-লিখন-প্রণালী ১৩১৫, (৫) শকুন্তলা ১৩১৬; (৬) সীতার বনবাস ১৩১৭; (৭) বিদ্যাসাগর ১৩১৭; (৮) প্রবন্ধরত্ন ১৩২১; (৯) রত্নহার

১৩২৩; (১০) রত্ন পাঠ ১৩২৩; (১১) সচিত্র আরব্য উপন্যাস ১৩২৩; (১২) গোপীচন্দ্র ১৩২৬; (১৩) চিন্ময়ী ১৩২৬; (১৪) প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ১৩২৬; (১৫) সাজের কথা ১৩২৭; (১৬) ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৩২৮; (১৭) রত্নকণা ১৩২৮; (১৮) সাগর সুধা ১৩২৯; (১৯) কুরঙ্গ ১৩২৯; (২০) আরব্য উপন্যাস (১ম ও ২য়) ১৩৩০; (২১) শিশুতোষ ভারত ইতিহাস ১৩৩০, (২২) মোহন সুধা ১৩৩০; (২৩) অক্ষয় সুধা ১৩৩১; (২৪) সাগর কণা ১৩৩১ (২৫) ভারত কণা ১৩৩১; (২৬) উজ্জ্বল চন্দ্রিকা ১৩৩৩; (২৭) প্রসঙ্গ কোরক ১৩৩৭; (২৮) প্রসঙ্গ কলিকা ১৩৩৭; (২৯) প্রসঙ্গ মুকুল ১৩৩৭; (৩০) প্রসঙ্গ মালিকা ১৩৩৭; (৩১) প্রসঙ্গ চন্দ্রিকা ১৩৩৭; (৩২) ভারত কথা ১৩৩৭; (৩৩) প্রসঙ্গ কুসুম ১৩৩৭; (৩৪) কল্পকথা ১৩৩৭। এতদ্ব্যতীত তাঁহার "লাউসেন", "বঙ্গ সাহিত্য", "নিশির কথা", "বিদ্যাপতি", "বনের কথা" প্রভৃতি পুস্তক অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে। সম্প্রতি 'বঙ্গ লক্ষ্মী'তে ইহার "বঙ্গ-সাহিত্য" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ইনি "হিতবাদী" "বঙ্গবাসী", 'সোপান' 'নব্যভারত', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বঙ্গবাণী', 'মানসী', 'বীরভূমি', 'শিশু', 'শিশুসাথী', 'যমুনা', 'গল্পলহরী', 'নবযুগ', 'বাসন্তী', 'সচিত্র শিশির', 'শক্তি', 'বীরভূম হিতৈষী' প্রভৃতি পত্রিকার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন।

১৩২৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজীতে তাঁহার "টাইপস্ অফ্ আর্‌লি বেঙ্গলী প্রোজ্" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয় ও ১৩৩১ সালে তিনি 'ইজ্‌জি-পোয়েমস্' নামে আর একখানি ইংরেজী কবিতার বই প্রকাশ করেন।

ইনি কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৩২৫ সালে হেতমপুর কলেজে বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে এবং হেথিয়া গ্রামে বীরভূম-সাহিত্য-সম্মিলনের ৪র্থ অধিবেশনে ইনি সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি বীরভূমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশনে (১৩৩২ সাল) সম্পাদক মনোনীত হইয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লা ভাষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

সম্মোহিতা

(উপন্যাস)
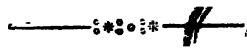
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী উষা মিত্র

সতের

নিকটস্থ গ্রামের জনৈক সখীর কন্যার বিবাহে গিয়া তিন দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া কুন্তলা রুদ্ধ দ্বারের তালা খুলিতে খুলিতে বহুপ্রকার বাদ্যের সুমিষ্ট রব শুনিয়া যার-পর-নাই বিস্মিতা হইলেন। তিন দিনের মধ্যে কেন যে হঠাৎ গ্রামখানি কোলাহল-মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা তিনি ভাবিয়াই পাইলেন না। ক্ষিপ্রহস্তে গৃহের কর্ম্ম সমাপন করিয়া জমিদারের বাটীর অভিমুখে চলিলেন, যদিও তাঁহার যাইবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না, কিন্তু না গিয়া উপায় ছিল না, কারণ জিতেনের মকর্দ্দমার মাত্র ৫।৬ দিন অবশিষ্ট। অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে জমিদার-ভবনে প্রবেশ করিলেন। কি এক অব্যক্ত ব্যথায় তাঁহার চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, কোন কিছু দেখিবার মত মনের অবস্থা তাঁহার ছিল না, না হইলে কয়েক দিবসের মধ্যে যে বৃহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা তাঁহার চক্ষুকে প্রতারিত করিতে পারিত না। লৌহ ফটকের দুইধারে বাদ্যকরগণ বাদ্যযন্ত্র হস্তে বসিয়া গিয়াছিল,—গ্রামের বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার অন্তর-বাহির ভরিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ চমকিত হইয়া বিস্ময়ভরে কুন্তলা দেখিলেন, মাত্র তিন দিবসের মধ্যে বহু কালের কালো দেয়ালগুলা সাদা ধবধবে হইয়া উঠিয়াছে—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অট্টালিকা-প্রাসাদের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তিনি ভাবিয়া পাইতেছিলেন না কোন মায়াবীর কুহক স্পর্শে এত শীঘ্র এমন পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইল। তাঁহাকে একান্তে লইয়া গিয়া ইলা বলিল, "দাদা বিয়ে করেছেন বৌ দেখবে চল বৌদি। আজ বৌ-ভাত।"

কুন্তলা অবাক-বিস্ময়ে ইলার কথা শুনিবামাত্র অপলক দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"বুঝছ না?"

কুন্তলা কথা কহিতে পারিল না।

"চল বৌ দেখবে, কিন্তু দাদা কি তোমায় নিজে গিয়ে ডেকে এনেছেন?"

কুন্তলা এবার ব্যাপার খানা কতকটা বুঝিয়া বলিল, "না বিয়ের কথা কিছুমাত্র জানি না, আর আমাদের কেউ ডাকেও নি।"

"তবে?"

"ঠাকুরপোর কাছে একটা জরুরী কাজের জন্য এসেছিলুম—জিতেনের মকর্দ্দমার দিন তো ঘনিয়ে এল।"

"বেশ তো চল।"

উভয়ে সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতলে এক সজ্জিত গৃহে প্রবেশ করিল। নববধূ সুলেখা দ্বারের দিকে মুখ করিয়া চিঠি লিখিতেছিল। বধূর মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতে কুন্তলা স্থাণুবৎ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া পড়িল ও তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল। অনুতাপ ও অনুশোচনায় চিত্ত ভরিয়া গেল। ইহা যে তাহারই অপরিণামদর্শিতার বিষময় ফল ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কেন সে উহাকে পুকুরে স্নান করিতে লইয়া গিয়াছিল, কেন তখন লেখার বারংবার প্রশ্ন সত্ত্বেও চুপ করিয়াছিল, কেন তখন দেবরের সত্য পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিল। সেই ক্ষণিক দুর্ব্বলতার জন্য আজ এক নারী-জীবনকে ব্যর্থ হাহাকারে পূর্ণ করিয়া দিল। গবাক্ষের গোপন দর্শককে কুন্তলা যে দেখিয়া ছিল তাহা জানিয়াও কেন তখনই সকল কথা বলিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দেয় নাই, আর তাহা যদি নাই করিল, তবে কেন, কিসের জন্য সে সখী-কন্যার বিবাহে এত দিন দিব্য আরামে কাটাইয়া আসিল, কি এমন

প্রয়োজন ছিল তাহার, যাহার মাথার উপর বিপদের শানিত ছুরিকা দুলিতেছে, যে কোন মুহূর্তে উহা আমূল বিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা—সেও পারে নিশ্চিন্তভাবে আমোদে যোগ দিতে। নিজের ব্যবহারে হাসি আসিল।

সুলেখা উঠিয়া শ্রদ্ধাভরে কুন্তলাকে প্রণাম করিল। একটু ঠেলা দিয়া ইলা বলিল, "ছোট-বৌদি যে প্রণাম করলেন বড়-বৌদি।"

অপরাধীর ন্যায় কুন্তলা মস্তক নত করিল।

"বৌদি অ বৌদি কি হ'য়েছে তোমার?"

ইলার বাক্যে কুন্তলা কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়া লেখার প্রতি চাহিয়া বলিল, "বিয়ের আগে বাবা যদি একবার জিজ্ঞেস করতেন?"

"কিন্তু তার যে আর সময় ছিল না দিদি।"

আশ্চর্য্যভাবে ইলা বলিল, "তুমি এঁকে চেন?"

"হ্যাঁ ও আর বাবা ক'দিন ছিলেন আমার কাছে। তোর তখন জ্বর, এ জিতেনের বোন সুলেখা।"

"জিতেনদার বোন?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু এত শীগ্‌গির কি দরকার ছিল লেখা?"

"ছিল দিদি, জানই তো দাদার জন্যে এখন কত টাকার দরকার, হাতে কিছু ছিল না সেই জন্যে—"

"চুপ করো না বল লেখা।"

"পাঁচ হাজার টাকা এঁরা দিলেন; বাবা রাজি হন নি, আমি জোর করে এ কাজ করেছি দিদি, কিন্তু তুমি অমন কাঁপছ কেন? পড়ে যাবে যে বসো।"

লেখা উহাকে জোর করিয়া বসাইয়া দিল। কুন্তলার নিজের হাতে চুলগুলো ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। কাহার দোষে কে শাস্তি পাইল, অপরাধ যে সবটুকু তাহারই, সে যদি না জিতেনকে সে দিন ঠেলিয়া পাঠাইত। জিতেন ফিরিয়া যখন শুনিবে তখন কি উত্তর দিবে সে।

"দিদি দিদি ও কি।" কুন্তলা ঢলিয়া পড়িল, যত্নে উহার মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়া অঞ্চল দিয়া বাতাস করিয়া ইলা ও সুলেখা উহাকে সুস্থ করিয়া তুলিল।

উঠিয়া বসিয়া কুন্তলা বলিল, "ঠাকুরপোকে ভিতরে ডাকতে পারিস?"

"আনছি ডেকে, কিন্তু তুমি আবার এখন অমন করো না বৌদি।"

মলিন হাসিয়া কুন্তলা বলিল, "না রে পাগল তখন মাথাটা কেমন ক'রে উঠেছিল, বার বার কি আর হয় তুই যা।"

ইলা চলিয়া গেলে কুন্তলা বলিল, "তুই আর জিতেন কোন দিন ক্ষমা করতে পারবি না আমায়?"

"কি বলছ দিদি এত সয়ে আজ সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে পড়তে চাইছ কেন?"

"সামান্য নয় বোন্ জানতিস্ যদি কত বড় অপরাধ করেছি, জানতিস্ যদি সেই অপরাধের দণ্ড সারা জীবন-ভোর কি ভীষণভাবে তোকে ভোগ করতে হ'বে, জানতিস্ যদি আমার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কাকে বরণ করে নিয়েছিস্ তুই—"। কুন্তলার গলা বুজিয়া আসিল।

বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া লেখা বলিল, "জানি দিদি জেনেই বিয়ে করেছি।"

"জানতে তুমি? ঠাকুরপোর সব কথা শুনেছিলি?"

আনত মস্তকে লেখা বলিল, "তুমি অত দুঃখ করছো কেন? দাদার কাছে আগেই সব শুনেছিলুম দিদি।"

অবাক্-বিস্ময়ে কুন্তলা বলিল, "তবু জেনে শুনেও—"

"হ্যাঁ উপায় যে ছিল না।"

"কেন উপায় ছিল না?"

"আমি কি বলি নি চেষ্টা করবো।"

"কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ লাভ হ'ত কি না তারও তো স্থিরতা ছিল না দিদি।"

"না তা ছিল না কিন্তু দুদিন অপেক্ষা করলে চলতে পারত তো? স্থিরতা যে ছিল না এমন কথা মনে করি না, ঠাকুরপো যত বড়ই অমানুষ হোক আমার বিশ্বাস অন্তরে তার এখনও আমার প্রতি একটু ভক্তি, শ্রদ্ধা, মান্য আছে। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি তার কাছে কেঁদে বললে আমার কথা হয় তো রাখতেন। দোষ সব আমার, যদি না এ কদিন বাইরে থাকতুম, কেন সেদিন পুকুরপাড়ে তোর কাছে লুকুতে গেলুম, আমি তাকে দেখেও চুপ করে গেলুম।"

মলিন হাসি হাসিয়া সুলেখা বলিল, "তুমি

তো কিছু লুকোও নি দিদি তোমার এ চুপ করে থাকাই যে ইঙ্গিতে আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছিল।"

কুন্তলার সলজ্জ মুখের পানে চাহিয়া সুলেখা পুনরায় বলিল, "কেন তুমি ভুল বুঝছ দিদি, কেন তুমি বলছ না যে আজ তোমার বোন হ'বার অধিকার পেয়ে, সত্যি আমি ধন্য, কৃতার্থ হয়েছি, হাসিমুখে পায়ের ধূলা দাও, আশীর্ব্বাদ কর দিদি যেন তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি—আর তোমার বোন হ'বার দাবী যেন কোনদিন হারিয়ে না বসি।" লেখা কুন্তলার পায়ের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িল। দুই ব্যগ্র বাহুর বেষ্টনীর মধ্যে টানিয়া কুন্তলা কি বলিতে চাহিল কিন্তু জমিদারকে দ্বার-সন্নিধানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া উভয়ে সরিয়া দাড়াইল।

হাসিয়া রমেন বলিল, "এ সময়ে এখানে এসে ভাল করি নি।"

স্মিতহাস্যে কুন্তলা বলিল "তোমায় ডেকে পাঠিয়ে ভুলেই গেছলুম—অন্য ঘরে চল তোমায় বিশেষ করে কিছু বলবার আছে।"

"তার কি এমন দরকার আছে বৌঠান।" কথাটা বলিতে না বলিতে ইলা সুলেখাকে লইয়া সরিয়া গেল। কুন্তলা জিজ্ঞাসা করিল, "জিতেনের মোকদ্দমার কি হ'ল ঠাকুরপো?"

অবুঝ ভাবে রমেন বলিল, "তার আমি কি জানি?"

"তুমি জান না তবে কে জানে?"

ব্যস্তভাবে রমেন বলিল, "এ সব কথা বিনয় জানে. শুনেছি সেই এ মকদ্দমায় প্রধান সাক্ষী।"

"নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপাতে একটুও লজ্জা করছে না?"

বিদ্রূপ করিয়া রমেন বলিল, "লেকচার দেবার জন্যে ডেকেছ জানলে আসতুম না, ওই তোমার দোষ, এই জন্যে না তোমার উপর রাগ করি।"

দৃঢ়কণ্ঠে কুন্তলা বলিল, "দাড়াও যেও না, যত বড় জমিদারির মালিক হও তুমি, যত বেশী ক্ষমতা থাক তোমার হাতে, কিন্তু ঈশ্বর বলে একজন কেউ আছেন, যার কাছে একদিন সকলকে বিচারপ্রার্থী হ'য়ে দাড়াতে হ'বে। তাঁর সদা-জাগ্রত চক্ষু দিয়ে সবই দেখছেন—এ কথা ভুলে যেও না, সব জেনে শুনেও নির্দ্দোষীর প্রাণ নিও না।"

"মিথ্যেই যে বলছি এই বা জানলে কি করে?"

"আমি সব জানি, সব শুনেছি, শিবানীর অপহারককেও জানি, সে এখন কোথায় আছে জানি, আরও অনেক জানি ঠাকুরপো, সব জেনেও আজ তুমি নিজের স্ত্রীর ভাইকে, একমাত্র সহোদরকে, বিনাদোষে ফাঁসি কাঠে তুলে দিতে যাচ্ছ আর আর—।"

"না, না তুমি চুপ করো বৌদি আমায় ক্ষমা কর—আর একটা কথা বলি এ কথা কি সত্যি যে, সে নূতন বৌর মার পেটের ভাই?"

"হ্যাঁ সত্যিই সে লেখার আপন ভাই।" লজ্জিত রমেন মস্তক তুলিতে পারিল না।

"ওরাও কি জানে সব?"

"না এ কথা বোধ হয় জানে না—যে তারই স্বামী দেবতা নিজের পাপ তার ভাইয়ের মাথায় তুলে দিয়ে তাকে ফাঁসি—"।

"চুপ কর বৌদি এখন আমায় কি করতে হ'বে শুধু সেইটুকু বলে দাও।"

"তাকে বে-কসুর খালাস দিয়ে দাও।"

"কিন্তু তা হ'লে যে তার পরিবর্ত্তে আমাকে ফাঁসীকাঠে ঝুলতে হ'য়—বৌদি সব প্রকাশ হ'য়ে পড়বে যে।"

একটু ভাবিয়া কুন্তলা বলিল, "ঐ পাষণ্ড বিনয়কে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বারণ করে দাও। পুরুষ তুমি, তোমাকে আর কি উপদেশ দেব, তোমার উকীলদের পরামর্শ নিয়ে যা ভাল হয় ঠিক করো; আর একটা কথা শিবানী,—হ্যাঁ তাকে—তার মায়ের ঘরে পাঠিয়ে দাও, আমি কথা দিচ্ছি সে কিছু প্রকাশ করবে না।"

অপ্রতিভ রমেন ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু সে বোধ হয় যেতে চাইবে না।"

"কে শিবানী নিজে? কি বলছ ঠাকুরপো তুমি?"

"ঠিক বলছি বৌদি বিশ্বাস না হয় নিজে গিয়ে দেখে এস।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কুন্তলা বলিল, "সে যা হয় হ'বে তুমি কিন্তু কথা দাও ঠাকুরপো।'

"আমার কথায় বিশ্বাস করবে তুমি ?"

"করবো ঠাকুরপো।"

"তবে কথা দিচ্ছি যাতে জিতেনবাবু নির্দ্দোষী প্রমাণ হ'য়ে খালাস পান তা করবই।"

"যাবার আগে আর একটা কথা বলে যাই, বিনয়কে তুমি চেন না, তার অন্তর নগ্ন অবস্থায় দেখতে পাও নি, তাই জান না সে কি ভীষণ প্রকৃতির পিশাচ, তার অসাধ্য কিছু নেই, লেখার ভাই যে জিতেন, সে জানত তবু কিছু বলে নি।"

"সে জানত ?"

"হ্যাঁ, তাই, তুমি জান না সে জিতেনকে কত বেশী ঘৃণা করে, কি তীক্ষ্ণ সে বিদ্বেষ।"

"জিতেনবাবুর সঙ্গে বিনয়ের শত্রুতা বুঝি আগেকার ?"

"মোটেই নয়, জিতেন বোধ হয় তাকে আগে কোন দিন দেখেও নি।"

"তবে ? হেঁয়ালি ছাড় বৌদি, পরিষ্কার করে বলো বুঝছি না কিছু।"

"সে কথা যে বলবার নয় ঠাকুরপো।"

"কেন ?"

"এই 'কেন'র উত্তর দেওয়াই তো শক্ত ভাই।"

অত্যন্ত বিস্মিতভাবে ধৈর্য্যশালা বৌদির মুখের দিকে সে ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল

"তবে যাই ঠাকুরপো।"

"যেও না,—শুনে যাও বৌদি।"

আশ্চর্য্য হইয়া কুন্তলা তাহার মুখের দিকে চাহিল।

"বিয়ের কথা তোমায় বলি নি, ডাকি নি বলে দুঃখ হয় নি একটুও ?"

শান্তকণ্ঠে কুন্তলা বলিল, "না।"

"কিন্তু কেন হয় নি ?"

হাসিয়া কুন্তলা বলিল, "আমাকে জানাবার যে তোমার উপায় ছিল না, এ কথা তোমার চেও আমি বুঝি ভাল—আমাকে জানালে কি এ বিয়ে হ'তে পারত ?"

"তবে যাবার আগে আরও একটা কথা বলে যেতে চাই—'যে অমূল্য রমণীরত্নকে আজ পত্নীত্বে বরণ করবার অধিকার পেয়েছ, জেনো তোমার প্রকৃতি জেনে-শুনে স্বেচ্ছায় তোমাকে বরণ করেছে—স্বয়ংবরা হ'য়েছে। যে বংশে তুমি জন্মেছ—যে বংশে তোমার স্বর্গীয় দাদা জন্মেছেন—সে বংশের মুখ যাতে উজ্জ্বল হয়—এই প্রেমময়ী ত্যাগশালা রমণীর মর্য্যাদা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে—তার চেষ্টা করো ভাই। ভগবান তোমাকে বল দেবেন—পত্নীর নির্ম্মল প্রেম তোমাকে সত্যের পথে চালিত করবে।"

রমেনের ইচ্ছা করিতে লাগিল যে দৌড়িয়া গিয়া এই মহিমময়ী রমণীর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া সকল অপরাধ, সব শত্রুতার শেষ করিয়া লয়; কিন্তু আত্মাভিমান আসিয়া উহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

অনুতাপানল তুষানলের ন্যায় রমেনের হৃদয়ে ধিকি ধিকি জ্বলিতে লাগিল।

আঠার

কন্যা ও জামাতাকে পাল্কীতে তুলিয়া দিয়া ব্যথিত, মর্ম্মাহত ডাক্তারবাবু সেই যে শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্য দুই দিবস যাবৎ আর উঠেন নাই। বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার এবং স্থানীয় ডাক্তারের শত অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও তিনি একটু জলস্পর্শও করেন নাই। ভীতচকিত ডাক্তার স্তূপীকৃত টাকাগুলাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে কম্পা ওারকে দেখাইয়া উহার দ্বারা যাহাতে জিতেনের তদ্বির ভাল করিয়া হয়, তাহারই আভাস মাত্র দিয়াছিলেন।

এই প্রভুভক্ত বৃদ্ধ প্রভুর অন্তর-যাতনা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়া টাকাগুলি উঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া, জিতেনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল। ঐ টাকা, উহার একমাত্র আদরিণী কন্যা-বিক্রয়ের অর্থ ভাবিয়া উহার দিকে চাহিতে অসহায় পিতার সাহস হইতেছিল না।

ডাক্তারের মনে পড়িল কত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সহধর্ম্মিণীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেয়েটাকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তারপর সতীসাধ্বী স্ত্রীকে বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয়হীন হইতে হইল, জন্ম-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আসিয়া পুত্রকে দাঁড়াইতে হইল; অবশিষ্ট রহিল মাত্র তাঁহার একমাত্র স্নেহের কন্যা। তিনি পরম আগ্রহে উহাকেই জীবনের আশ্রয় ভাবিয়া সবলে চাপিয়া ধরিয়া, সকল দৈন্য, সকল অভাব ঢাকিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভোজবাজীর ন্যায় কি এ

হইয়া গেল! প্রিয়দর্শন চরিত্রবান্ জামাতার পরিবর্তে, এক কুদর্শন, চরিত্রহীন মাতাল আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিল—অর্থের পরিবর্তে কন্যাকে বিক্রয় করিয়া আজ তিনি রিক্ত,সর্ব্বস্বান্ত।! আজ চিন্তা করিবার বল পর্য্যন্ত তাঁর নাই,কিন্তু কি এ করিয়াছেন তিনি দীর্ঘ কাল কন্যার সৌন্দর্য্য প্রীতির আহার যোগাইয়া শেষ মুহূর্ত্তে কোন গভীর দুর্গন্ধপূর্ণ কর্দ্দমের মধ্যে উহাকে ঠেলিয়া দিয়াছেন। উহার সৌন্দর্য্য-স্পৃহার খোরাক যোগাইবে কে? কদাকার, হৃদয়শূন্য লম্পট গর্ব্বিত জমিদার? আর ডাক্তার ভাবিতে পারিতেছিলেন না—তিনি কাতরভাবে ভগবানের নিকট চাহিলেন—সবই যখন কাড়িয়া লইয়াছ তখন এইটুকু লও প্রভু, চিন্তা শক্তি, হ্যাঁ ঐটাকেও কাড়িয়া লইয়া রিক্ত, অভিসপ্ত ও অনুতপ্ত জীবনের শেষ করিয়া দাও প্রভু—মৃত্যু দাও, মৃত্যু দাও। ভাবনায়, চিন্তায়, অতিরিক্ত আত্মনিপীড়নে ডাক্তারের ভগ্ন-স্বাস্থ্য আর সহ্য করিতে পারিল না তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

কম্পাউণ্ডার ব্যস্ত হইয়া ডাক্তার আনিলেন কিন্তু ঔষধ সেবন করাইতে পারিলেন না। কেমন করিয়া তিনি কন্যা বিক্রয়ের অর্থে ঔষধ সেবন করিবেন। ডাক্তার সেদিন গম্ভীর মুখে বলিয়া গেলেন অবস্থা খারাপ, ঔষধ বা চিকিৎসায় হইবে না শুশ্রূষাও প্রয়োজন। অদ্য কোর্টে যাইবার দিন কিন্তু ইঁহাকে একলা রাখিয়া কম্পাউণ্ডার যান কেমন করিয়া। একটা ঠিকা গাড়ী দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে কম্পাউণ্ডার উদ্বিগ্ন মুখে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন থান পরিহিতা, সুন্দরী যুবতী শাপভ্রষ্টা দেববালার ন্যায় গাড়ী হইতে নামিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা এখন কেমন আছেন?"

"ভাল নয় মা আপনি কি সিরাজ-গাঁ থেকে এসেছেন?"

"হ্যাঁ কিন্তু লেখা আসতে পারল না। এ অসুখের কথা শুনেও এলো না।"

"কিন্তু আপনি যে ভুলে যাচ্ছেন তার মতামতে এখন এসে যায় না।"

বৃদ্ধ নীরব রহিলেন।

রমণী বলিলেন, "আপনি কোর্টে যান, আমি বাবার কাছে বসছি; তদ্বির সব ঠিকঠাক হ'য়ে গেছে ফেরবার সময় জিতেনকে বেশ করে সব কথা বুঝিয়ে বলবেন নইলে হঠাৎ এ অবস্থায় একে দেখলে সে হয় তো সামলাতে পারবে না। তা হ'লে বাবার রোগ আরো বেড়ে যাবে।"

"তার যে ছাড়বার সম্ভবনা নেই শুনছি মা। ও তরফের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সাক্ষ্য দিবেন, জমিদার না কি পেছনে আছেন।"

সংক্ষেপে কুন্তলা বলিল, "আপনি ভাব্‌বেন না কিছু, যা শুনেছেন সব ভুল। আজই নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হ'বে—জিতেন-ভাই বেকসুর খালাস পাবে।" উহার কথার ভিতর এমন কি ছিল কে জানে বৃদ্ধ অসঙ্কোচে দ্বিধাশূন্য চিত্তে কথাগুলো বিশ্বাস করিয়া লইলেন।

সসম্ভ্রমে তিনি পুনরায় বলিলেন, "তুমি তা হ'লে হাত-মুখ ধুয়ে একটু জিরিয়ে নাও কোর্টে যাবার দেরী আছে।"

"আমার জন্য ভাববেন না একটুও। তা হ'লে একটা ট্যাক্সি করেই আনবেন, যাতে শীগগীর ফিরতে পারবেন।"

"যাই, বুকের মালিসের ওষুধ এই শেলফে রইল।"

ব্যথিত কুন্তলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "বুকে মালিস কেন?"

"নিউমোনিয়া হয়েছে যে কর্ত্তার।"

উঁহাকে বিদায় দিয়া কুন্তলা সাবধানে ডাক্তারের শিয়রে আসিয়া বসিল। সন্তর্পণে ললাট স্পর্শ করিয়া জ্বরের তাপ দেখিয়া ভীত হইল। পুনঃ উঠিয়া কুন্তলা গৃহের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলা যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিয়া ঔষধের শিশি-গ্লাস সুবিধামত একটা টিপয়ে রাখিয়া টেবিলের উপর অযত্নে পতিত চাবির রিং তুলিয়া অঞ্চলে বাঁধিল। কাজগুলা যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সারিয়া ডাক্তারের শিয়রে এইবার নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল। বহুক্ষণ পরে বেগের সহিত মোটর আসিয়া গৃহদ্বারে থামিতে কুন্তলা স্পন্দিত বক্ষে ব্যাকুল দৃষ্টিতে দ্বার প্রান্তে চাহিল, কিন্তু জিতেনের বিবর্ণ মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতে তাহার হৃদয় আত্মগ্লানিতে ভরিয়া গেল—মস্তক নত করিয়া লইল। একটা সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করিতে পারিল না। জিতেন পিতার শয্যা-পার্শ্বে ঝুঁকিয়া পড়িতে কুন্তলার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, উহাকে আকর্ষণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "চুপ কথা বলো না।"

জিতেন কি বলিতে চাহিল, হস্তদ্বারা নিষেধ করিয়া কুন্তলা বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিল। উহাদের বাহিরে আসিতে দেখিয়া কম্পউণ্ডার বলিল, "মা সেই একভাবে বসিয়া আছ, কাপড় পর্য্যন্ত ছাড় নি? আমি ততক্ষণ বসছি তুমি ততক্ষণ হাতে মুখে জল দিয়ে এস।"

"তার দরকার নেই, কতদিন আপনি পরিশ্রম করছেন, এখন গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন। আমি রান্নার উদ্যোগ করি।"

"তা হ'লে কর্ত্তার কাছে কে বসবে মা?"

"জিতেন।"

বৃদ্ধ কম্পউণ্ডার চলিয়া গেলে জিতেন বলিল, "আমায় তবে বাইরে ডাকলে কেন"?

"হঠাৎ তোমায় দেখলে উত্তেজনায় হার্টফেল করতে পারে, আগে তোমার আসবার কথা বলি, তার পর যেও জিতেন—"

…"না দিদি কিছু বলবার দরকার নেই সব শুনেছি তাইতে আসবার দেরী হলো, কিন্তু একটা কথার এখনও মীমাংসা হয় নি, তুমি থাকতে এ বিয়ে কেমন করে হলো?"

কুন্তলা সংক্ষেপে সকল বলিয়া অবশেষে বলিল, "আমার অপরাধের শাস্তি পৃথাবিতে নেই জিতেন—তাই আজও তা সইতে পারছি,আবার নির্লজ্জের মত তোমাদের সামনে—।"

"চুপ করো তুমি. অনর্থক নিজকে অপরাধী ভেবে কষ্ট পেও না, মিথ্যে করে আমায় তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। তোমায় যে অনেক দিন আমি চিনে নিয়েছি।" এমন সময় ডাক্তার কি বলিয়া উঠিলেন। বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া কুন্তলা তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বসিল।

এবার ডাক্তার বলিলেন, "কে আমার লেখা ফিরে এলি মা?"

এমন আশায় উৎফুল্ল রোগীকে নিরাশায় পরিণত করিতে কুন্তলার প্রবৃত্তি হইল না, কাজেই তিনি কোনও রূপ উত্তর না দিয়া নীরবে রহিলেন।

"মা লেখা, মা আমার।"

"বাবা বাবা একটু দুধ খাবে কি?"

"তুমি লেখা নও?" নিরাশার অবসাদে ডাক্তার নয়নদ্বয় মুদিত করিলেন।

"বাবা খাও একটু দুধ।"

"আবার বাবা, কে তুমি?"

"আমি, আমি বাবা, তোমার বড় মেয়ে কুন্তলা।"

"এসেছ মা, কিন্তু লেখা?"

কি একটু ভাবিয়া কুন্তলা বলিল,—"তাকে অসুখের কথা বলা হয় নি বাবা।"

"বল নি, ওঃ তাই।" তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার পুনরায় বলিলেন, "শুনলে সে-যে কেঁদে-কেটে অস্থির হ'ত নয় মা?"

"হ্যাঁ বাবা সেই জন্যে না জিতেন বারণ করলে তাকে জানাতে।"

"জিতেন? জিতেন?" ডাক্তার উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"ও কি অমন করছ কেন বাবা তুমি?"

"জিতেন আমাদের জিতেন, তবে কি আমি স্বপ্ন দেখছি মা?"

"তাই হ'বে বাবা।"

"কৈ তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় গেল জিতেন?"

"এই যে ডাকি বাবা।" পদতলে জিতেন আসিয়া বসিতে ডাক্তার আবার চঞ্চল হইয়া উঠিলেন দেখিয়া কুন্তলা বলিল, "তুমি উঠতে যেও না বাবা।"

"কই মা আমি উঠি নি, জিতেন একবার সামনে এসে বসো, কতদিন যেন দেখি নি।"

* * *

মাস খানেক ভুগিয়া ডাক্তার আরোগ্য হইয়া উঠিলে, জিতেন একদিন কুন্তলাকে বলিল, "জান দিদি, যখন এর সিকিভাগ টাকা পেলে কত অভাব মোচন হ'ত তখন নয়, এখন সব যখন গেল, তখন এল কি না একরাশ টাকা।"

ভাতের ফেন গালিতে গালিতে কুন্তলা বলিল, "টাকা কোথায় পেয়েছ?"

"সে এক ভারী মজা। মার দূর সম্পর্কে বড় বোন ছিলেন তিনি বাল-বিধবা তিনি না কি মাকে বলেছিলেন জিতেনকে আমি নেবো, তাই মরণের সময় আমার নামে উইল করে গেছেন।"

"কত টাকা পেলে তা হ'লে ?"

"সে অনেক দিদি মস্ত জমিদারী—।"

"ভালই হলো, বাবার বায়ু-পরিবর্ত্তনের দরকার ছিল, আমার যা ভাবনা হ'য়েছিল, যাক্ আর দেরী করো না ভাই যত শীগ্‌গীর পার তাকে নিয়ে যাও।"

"নিয়ে যাও মানে ?"

"নিয়ে যাবে তার আবার মানে কি।"

"তুমি যাবে না বুঝি ?"

আমি কি করে যাব ভাই ?"

"তবে থাক।"

কুন্তলা হাসিয়া বলিল, "থাক্ কি ?"

"তোমার মত প্রাণ ঢেলে যত্ন করতে পারব কি? সেবা করতে পারব ? যে টুকু সেরেছেন তাও যে নষ্ট হ'য়ে যাবে দিদি।"

"কিন্তু আমার যে এখনও মস্ত এক কাজ বাকি।"

"বেশ তো সেরে ফেল।"

"হয় তো তাতে মাস খানেক লাগতে পারে।"

"হোক দেরী একা আমি যেতে পারব না তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।"

"একবার তাকে—"

"বল দিদি থেম না।"

"না কিছু নয়।"

"আশ্চর্য্য—এখনও আমাকে পর ভাব ? এখনও সঙ্কোচ ?"

"বলছিলুম,নরেনকে যদি একবার ডাকিয়ে দিতে পার।"

"এই কথা,এর জন্যে এত সঙ্কোচ, এত ইতস্ততঃ করছিলে কেন দিদি ? সব সময়ে মনে রেখো তোমার একটু আজ্ঞা পালন করতে পারলে, দুনিয়ার মধ্যে আমার চেয়ে সুখী কেউ নিজেকে ভাবতে হয় তো না ও পারে। ভাল কথা সে দিন গেছলুম লেখাকে দেখতে ; আশ্চর্য্য তার পবিবর্ত্তন হয়েছে। এত শীগ্‌গীর যে মানুষের এত বড় পরিবর্ত্তন হ'তে পারে চোখে না দেখলে হয় তো আমি বিশ্বাস করতুম না।"

"ওর কথা বলো না জিতেন, বড় ব্যথা পাই।"

"এখনও এ দুর্ব্বলতা, কিন্তু এ যে তোমায় মানায় না দিদি।"

কুন্তলা কথা কহিতে পারিল না।

উনিশ

কাপ্তেন নরেন দাস খেলিতে গিয়াছিল। খেলা হইতেছিল একদল ভারতবাসী এবং অপর দল ইংরাজে। দুই দিকেই দর্শকের অভাব ছিল না, গড়ের মাঠের খানিকটা অংশ নানা বেশধারী দর্শকে ভরিয়া গিয়াছিল। খেলায় যখন ভারতীয় দলের জয় হইল এবং ভারতীয় দর্শকগণ যখন বিকট চীৎকারে জয়ের উল্লাসটুকু উপভোগ করিতে ব্যস্ত, তখন নরেন প্রফুল্ল গর্ব্বভরা নেত্রে জনতার দিকে চাহিতে গিয়া ম্লান হইয়া উঠিল, দর্শক দিগের মধ্যে দুই উজ্জ্বল চক্ষুর সম্মুখে দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র সে আপনাকে জনতার মধ্যে লুকাইতে চাহিল। কিন্তু তাহার মনোভাব সম্ভবতঃ ঐ ব্যক্তির অগোচর রহিল না, তাই মাঠের বাহিরে আসিয়া নরেন যখন কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ততা অনুভব করিতেছিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জিতেন উহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মাফ করো নরেন, দিদির হুকুম তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার।"

"কিন্তু এখন তো পারব না।"

"বেশ তবে এই কথাই তাঁকে বলি গিয়ে।

"তুমি কি আজকেই যাবে ?"

"তিনি যে কলকাতায় আছেন।"

"বৌদি কলকাতায় ?"

"আমি তবে যাই, সময় মত এস একদিন।"

"একটু দাঁড়াও তিনি কোথায়, কার কাছে আছেন ?"

"আমাদের বাসায়, কিন্তু সে বাসায় আমরা নেই—নতুন বাসার ঠিকানা লিখে নাও।"

নরেন চমকিত হইয়া উঠিলেন, জিতেন পাগল হইয়াছে না কি, অমন প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা পরিত্যাগ করিল কিসের জন্য। অসহিষ্ণু নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা ঐ বাড়ী ছেড়ে নতুন বাড়ী তৈরি করেছ বুঝি ?"

শান্তকণ্ঠে জিতেন কহিল, "ভাড়াটে বাড়ীতে আছি ভাই, বাড়ী পুড়ে গেছে কি না।"

আপন মনে নরেন বলিল, "বাড়ী পুড়ে গেছে আর—আর না এসকল জানবার অধিকার তো আর নাই সব যে শেষ করিয়া দিয়াই আসিয়াছি, তবে আজ প্রাণে এ

কিসের প্রেরণা, কিসের জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল—ছোট্ট একটী কথায়।”

নিজের ওপর নরেন্দ্র বিরক্ত হইয়া উঠিল অন্ততঃ দূর হইতে সংবাদ ও লইতে পারিত।

অল্পক্ষণে পরে জিতেন বলিল, “ঠিকানাটা লিখে নাও নরেন।”

“হ্যাঁ নি, না—না আমি যাব তোমার সঙ্গে।”

সরু গলির মধ্যে জিতেন যখন নরেনকে লইয়া ক্ষুদ্র এক গৃহদ্বারে করাঘাত করিল, নরেনের তখন সত্যই বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম করিল, এত শীঘ্র কিরূপে কল্পনাতীত ঘটনা সত্যে পরিণত হইতে পারে ইহা উহার বুদ্ধির অগম্য।

কুন্তলা দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া সহজ গলায় নরেনকে ভিতরে আহ্বান করিলেন, “এস ভাই এস।’

নরেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, তাহা হইলে কোন কিছুর কৈফিয়ত দিতে হইবে না, আরামে উহার বুকের গুরুভার কিঞ্চিৎ লাঘব হইল।

“এস ঠাকুরপো দাঁড়িয়ে থেক না, আহা তোমার বাবা মারা গেছেন শুনলুম, তাই বাইরে ঘুরে ঘুরে কি বিশ্রী চেহারাই না হ’য়ে গেছ, এখন বাড়ীতেই আছ বুঝি ?”

“বাবার মৃত্যুর পর দাদা আমায় আলাদা করে দিয়েছেন, এখন অন্য বাড়ীতে থাকি।”

“বিষয় ঠিক মত পেয়েছ তো ?”

“হ্যাঁ, অর্দ্ধেক পেয়েছি, কিন্তু তুমি কেমন করে এখানে এলে বৌদি কিছু যে বুঝতে পারছি না।”

মৃদু হাসিয়া কুন্তলা বলিল, “সবুর করো, ধীরে ধীরে সব শুনবে।”

“না সবুর করতে পারছি না বৌঠান।”

“এতদিন কিন্তু—” কুন্তলা থামিল, নরেন লজ্জায় মুখ ফিরাইল।

“হ্যাঁ শোন তবে ঠাকুরপো সে কিন্তু মস্ত কাহিনী তোমার ধৈর্য্য থাকবে কি ?

নরেন নীরবেই রহিল—দস্যু-কর্ত্তৃক শিবানীর অপহরণ হইতে লেখার বিবাহ পর্য্যন্ত সকল কথা কুন্তলা ধীরে ধীরে বলিল।

সহসা কুন্তলার পদযুগল বেষ্টন করিয়া নরেন কাঁদিয়া বলিল, “ক্ষমা—ক্ষমা করো বৌঠান।”

“তোমার ওপর রাগ যে কোন দিন করতে পারি না ভাই।”

“তা জানি কিন্তু—”

“থাক্‌গে ও সবের কোন দরকার নেই, তবে বাবা বা জিতেনের কাছে ক্ষমা চাইতে যেও না, মানুষ যা পারে না তাঁদেরও সেটা পারা সম্ভব হয় তো নাও হ’তে পারে। কিন্তু একটু তোমায় বকব, জানি এ এখন—”

বাধা দিয়া নরেন বলিল, “থেমো না,—বল বৌদি যদি তা ত বুকের ভারী পাথরখানা নেবে না যাক্ অন্ততঃ একটু সরে যায়।”

“শোন ঠাকুরপো খেয়ালের বশে যে অমূল্য রত্ন হারিয়েছ তার ক্ষতি পূরণ হ’বে না কোনদিন, কিন্তু তোমার এমন বিবাগী হ’য়ে থাকা চলবে না।”

“কি করতে হ’বে বৌঠান ?”

“আমার একটা কথা রাখবে বল ?”

“আজ তুমি অনুরোধ কেন করছ ?”

“বল রাখবে ?”

“তোমার আজ্ঞা প্রাণ দিয়েও পালন করবো বৌঠান।”

“যদি সে অনুরোধ রাখা তোমার কাছে শক্ত হয় ?”

সোজা হইয়া দাড়াইয়া নরেন বলিল, “তবুও।”

“তোমায় বিয়ে করতে হ’বে।”

নরেন স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। হাসিয়া কুন্তলা কহিল “এই না তুমি দিদির জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে চাইছিলে ?”

“জোর করিয়া হাসিয়া নরেন বলিল, “জান না তুমি তোমার এই ছোট ভাইটী তোমায় কত ভালবাসে, তোমার জন্যে কি না করতে পারে। যে দিন হুকুম করবে বিয়ে করবো। কিন্তু মেয়ে কি ঠিক হ’য়ে গেছে ?”

“হ’য়েছে, তাকে তুমি জান।”

“আমি, আমি জানি ? কে সে ?”

“আমার ননদ ইলা।”

হতবুদ্ধির ন্যায় নরেন চাহিয়া রহিল।

জিতেনকে ডাকিয়া কুন্তলা বলিল, “ভেবেছিলুম আমার

যেতে হয় তো দেরী হ'বে কিন্তু তা হ'বে না ভাই দিন পনেরোর মধ্যে আমার কাজ হ'য়ে যাবে।"

প্রফুল্ল চিত্তে জিতেন বলিল, "মাসীর দরুণ যে গ্রাম পেয়েছি বল তো একবার ঘুরে আসি।"

"বেশ যাও না।"

নরেনকে লক্ষ্য করিয়া জিতেন বলিল, "জান নরেন, ফাঁকি দিয়ে মস্ত জমিদারী আর অনেক টাকা পেয়ে গেছি, কিন্তু টাকার জন্যে একদিন আমাদের কি সর্ব্বনাশই না হ'য়ে গেল"

ব্যথায় জিতেনের গলা বুজিয়া আসিল। লজ্জায় ক্ষোভে নরেনের বক্ষ আলোড়িত হইয়া উঠিল।

কুন্তলা বলিল, "যাক্, সেজন্য দুঃখ করো না ভাই।"

নরেন বলিল, "কিন্তু সে জন্য দোষী আমি জিতেন, মানুষ যে কত সহজে কত বড় ভুল করে বসে, সে তো আমি বুঝি কিন্তু—"

"যাক্‌গে ও কথা, দিদি খাবার যদি থাকে নরেনকে দাও, ওকে মাঠ থেকে ধরেছিলুম এক কাপ চাও বেচারা খেতে পায় নি।"

"জানি এত বড় অপরাধীকে কেউ কোনদিন ক্ষমা করতে পারে না জিতেন, কিন্তু সে সময়ে আমার মনের অবস্থা—"

হাসিয়া জিতেন বলিল, "তবে কি এই মিথ্যেকেই সত্যি বলে মেনে নিতে বল ভাই যে ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা না করাই বড় গর্ব্বের, বড় গৌরবের বিষয়। দিদির হাতে নব-উপাদানে গড়ে তোলা নব-জীবনপ্রাপ্ত তোমার বন্ধুকে এত হীন ভেব না নরেন।"

জিতেনের গলা বেষ্টন করিয়া আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে নরেন বলিল, "তবে কি আজ ও সমান—"

"তেমনই ভালবাসি তোমায়, শৈশবের সহোদরতুল্য বন্ধু তুমি এমন সহজেই কি ভোলা যায় রে? এমন মানুষ কি দেখতে পার তুমি যার মধ্যে দোষ নেই, জীবনে ভুল করে নি একটাও।"

"কিন্তু তবুও অপরাধের লঘু-গুরু আছে তো?"

"তা ঠিক এমনও কি হ'তে পারে না যে, মানুষ যখন ভুল করে তখন তাকেই সত্যি বলে ধীরে, তখন তার বিচার-বুদ্ধি নিয়ে থাকাই সম্ভব হ'তে পারে না কি? ভুলই যদি আমরা না করতুম তবে হয়তো জগতে সবাই সুখী হতুম, দুঃখ বলে জগতে কিছুই থাকত না। আমার মতে ভুল করাই মানবের স্বভাব, তাই ভুলকেই সাক্ষাৎ মেনে তাকেই বড় করে আবার নতুন ভুলের অবতারণা করে।"

মুগ্ধদৃষ্টিতে কুন্তলা বন্ধুদ্বয়ের মিলন দেখিতেছিল, হাসিয়া বলিল, "ভুল, চুক্ সকলেরি হয়। তুমিও একটা ভুল করে ফেল না জিতেন? নরেন রাজী হয়েছে, বেশ একসঙ্গে দুই ভাই বিয়ে করো, গলদের ফাঁক্ পুরতে যেটুকু বাকি আছে তাও ভরে যাক্।"

কথাটা শুনিয়া জিতেন এমনভাবে চমকিত হইয়া উঠিল যে, উহা নরেন ও কুন্তলার দৃষ্টিতে অনেকখানি বিস্ময় ফুটাইয়া তুলিল।

"অমত করো না ভাই, কাল থেকেই মেয়ে খুঁজতে লেগে যাই, কি বল?"

তীব্র কণ্ঠে জিতেন বলিল, "সে পরে দেখা যাবে দিদি, তা হলে কালকেই যাই?"

"তাই যাও।" ক্রমশঃ

—•:০:•—
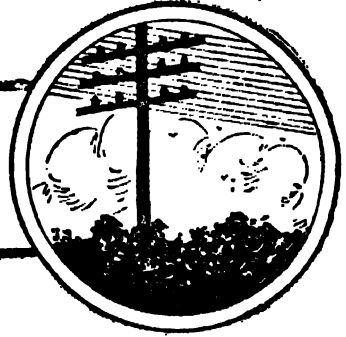
বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফেরাডেঃ—

মাইকেল ফেরাডের নাম জানেন না এরূপ লোক খুব কমই আছে। ইনি একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। ইঁহার কতকগুলি আবিষ্কারের পরিচয় আজ আমরা দিব।

মাইকেল ফেরাডে

ইংরেজী ১৮৩৩ সনে অর্থাৎ ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে ফেরাডে 'ইলেক্ট্রো-মেগ্‌নেটিক্ ইন্‌ডাক্‌শান্' আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে আজ 'রেডিও', 'টেলিফোন', 'টেলিভিশন' প্রভৃতি সম্ভব হইয়াছে। আমরা তাঁহার কতকগুলি স্বহস্ত-সজ্জিত পরীক্ষাকালীন গবেষণার চিত্র সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

দপ্তরীর বাড়ী

যে বাড়ীর ছবিটা আমরা উপরে দিয়াছি তাহাতে মাইকেল ফেরাডে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক বলিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভ করিবার পূর্ব্বে থাকিতেন। এখানে তিনি এক দপ্তরীর 'এপ্রেনটিস্' ছিলেন।

'রীক' পুস্তকের দোকান

উপরের চিত্রটা রীক নামক ব্লেণ্ডফোর্ড ষ্ট্রীটের একটী পুস্তকের দোকান। এইস্থানেই ফেরাডে কোন এক 'এন্-

সাইক্লোপিডিয়ার' একটী প্রবন্ধ পড়িয়া 'তড়িৎ-বিজ্ঞান'এর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হ'ন।

হর্স-শু-ইলেক্‌ট্রো ম্যাগনেট্‌

এই চিত্রটী ফেরাডের অমর আবিষ্কার 'হর্স-শু-ইলেকট্রো-ম্যাগনেট্‌'। ফেরাডের এই আবিষ্কারে জগতের বৈজ্ঞানিক-মহলে বিশেষ উপকার হইয়াছে।

ফেরাডের একটী পরীক্ষা

নিম্নের ও তৎপরবর্ত্তী চিত্রটী ফেরাডের দুইটী পরীক্ষার চিত্র।
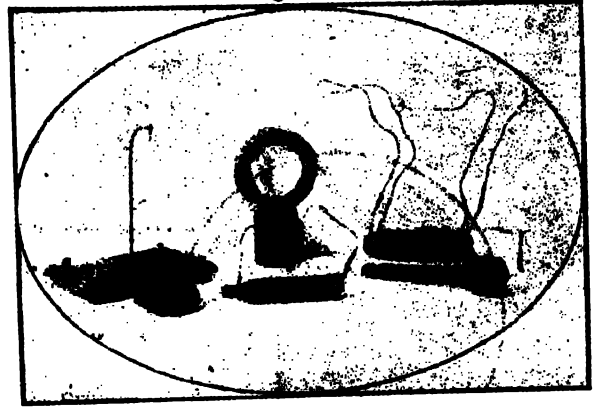
ফেরাডের আর একটী পরীক্ষা

বেতার ও টেলিফোনে প্রতিকৃতি :—

কয়েকমাস পূর্ব্বে বেতারে প্রতিকৃতি ওঠা-সম্বন্ধে আমরা অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছি। ডাঃ ই, এফ, ডব্লিউ আলেকজেণ্ডারসন্‌ নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বহু দূর দেশের

আলেকজেণ্ডারসন্‌ প্রতিকৃতি দেখাইতেছেন

কোন দৃশ্য, কথা কহিবার সময় অথবা গান বা নৃত্য করিবার সময় সম্মুখস্থ দৃশ্যপটে প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উপরের ছবিতে ডাঃ আলেকজেণ্ডারসন্‌ তাহার নিজ আবিষ্কৃত যন্ত্রের দ্বারা দৃশ্য প্রতিফলিত করিতেছেন এবং অঙ্গুলীনির্দ্দেশে তাহা দেখাইতেছেন।

টেলিফোনে বক্তার চেহারা দেখাও সম্প্রতি সম্ভবপর হইয়াছে। একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক এই যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। উপরে চিত্রে কিরূপভাবে টেলিফোনে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দেখান হইতেছে।

বিগত মহাযুদ্ধের হতাহত :—

বিগত মহাযুদ্ধে কত লোক যে প্রাণ দিয়াছে, আর কতই বা আহত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই ইহাতে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই যুদ্ধে যে, রাজ্যের যত লোক হত ও আহত হয়, তাহার একটী মোটামুটী হিসাবের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল, অবশ্য ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের হিসাব ইহাতে নাই।—

দেশ	হত	আহত
ফ্রান্স	১৩,৯৩,৩৮৮	১৪,৯০,০০০
বেলজিয়াম	৩৮,১৭২	৪৪,৬৮৫
ইটালী	৪,৩০,০০০	৯,৪৭,০০০
পোর্ত্তুগাল	৭,২২২	১৩,৬৫০
রুমানিয়া	৩,৩৫,৭০৬	প্রকাশিত নাই
সার্ভিয়া	১,২৭,৩৫৫	১,৩৩,১৪০
ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্	১,১৫,৬৬০	২,০৫,৬৯০
জার্ম্মেণী	২০,৫০,৭৬৬	৪২,০২,০২৮
অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী	১২,০০,০০০	৩৬,২০,০০০
বুলগেরিয়া	১,০১,২২৪	১৫,২৪,০০০
তুরস্ক	৩,০০,০০০	৫,৭০,০০০

—*:০:*—

কৈকেয়ী

(নাটক)

পারীমোহন সেনগুপ্ত

চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

যুধাজিৎ ... কৈকেয়ীর ভ্রাতা
সুমন্ত্র ... দশরথের সারথি ও মন্ত্রী
সিদ্ধার্থ দশরথের মন্ত্রী
জয়ন্ত ঐ
ধৃষ্টি ঐ
বিজয় ঐ
বশিষ্ঠ ... দশরথের কুল-পুরোহিত।
বামদেব ... বশিষ্ঠের পুত্র
জাবালী ... দশরথের পুরোহিত

দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ ভরত, শত্রুঘ্ন, অযোধ্যাবাসিগণ, হনুমান, বিভীষণ।

নারী

ঊর্ম্মিলা ... লক্ষ্মণের স্ত্রী
মাণ্ডবী ... ভরতের স্ত্রী
শ্রুতকীর্ত্তি ... শত্রুঘ্নের স্ত্রী

কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী, সীতা, মন্থরা, ধাত্রী, বন্দিনিগণ।

প্রস্তাবনা

[গান করিতে করিতে বৈতালিকগণের প্রবেশ]

গীত

রঘুকুলপুলক রঘুকুলতিলক অসুর-বিনাশক রাম হে।
নবনীত-কোমল কুলিশ-সুকঠোর পাপীজন-পাবক শ্যাম হে।
চারুচন্দ্র-মুখ,
মূর্ত্ত হরষ-সুখ,
ধরণী সমান ধীর,
পারাবার-গম্ভীর,
ভার্গবত্রাসক দয়াপ্রীতিকরুণা-ধাম হে।
জয় জয় রাম
নয়নাভিরাম,
দশরথ-অন্তিম
উজ্জলিয়া রক্তিম
ভাস্কর-সুন্দর বিভাসো নরবর অতুলগুণভাতিগ্রাম হে।
। ......

[সকলের প্রস্থান

[বশিষ্ঠ ও বামদেবের প্রবেশ]

বশিষ্ঠ। বৎস,
শুভবার্ত্তা শুনেছ নিশ্চয়—
কাল প্রাতে
রামচন্দ্র লভিবেন রাজসিংহাসন।
বামদেব। শুনেছি জনক।
অভিষেক-মাঙ্গল্যের তরে
আদেশ করুন
কি করিতে হ'বে মোরে।
বশিষ্ঠ। বৎস,
জাবালি প্রভৃতি পুরোহিতে
জানায়ে সংবাদ,
করো আয়োজন যথাবিধি।
যজ্ঞগৃহে সকলেরে করহ আহ্বান,—
আমিও যাইব ত্বরা।
বামদেব। যথা আজ্ঞা, দেব।

[উভয়ের প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক

[অযোধ্যা-প্রাসাদের এক অংশ। গভীর রাত্রিকাল। ক্রোধভরে কৈকেয়ী পদচারণা করিতেছেন। অদূরে দশরথ শয্যার উপর হাহাকার করিতেছেন।]

কৈকেয়ী। ঠিক কথা,
মন্থরা বলেছে ঠিক।
ভরত আমার
সে কি কেহ নয়?
রাজ্য পাবে রাম
সুখী হ'বে কৌশল্যা মহিষী।
আর আমি?
আর ভরত আমার?
কোনো সুখে নাহি অধিকার?
হ'বে না তা,
কোনো মতে নয়।
আমার ভরত, আমার দুলাল,
তারে রাজসিংহাসনে দেখে
জুড়াব নয়ন।
এ হ'তে আনন্দ নাহি আর,
কাম্য কিছু নাহি মোর।
এ পরম সুখ,
এ পরম সুখের গৌরব
আমার আমার শুধু।
ভরত আমার রাজা,
আমি রাজমাতা—
এ যদি না ঘটিল, কৈকেয়ী, ভাগ্যে তোর,
বৃথা জন্ম তবে।
সত্য কথা বলেছে মন্থরা—
কেন রাজা
ভরতে রাখিল দূরে আজ?
কেন রাম-অভিষেকে
ভরতে হ'ল না আনা?
অভিসন্ধি আছে এর পিছে।
দশরথ,
বুঝেছি কৌশল তব—
পাছে আমি চাহি পূর্ব্ব বর,
পাছে চাহি ভরতের সুখ,
তাই এই কৌশল তোমার
কিন্তু, জেনো—

ব্যর্থ হ'বে অভিলাষ তব।
দশরথ,
সত্য তব করাব সাধন।
জেনো স্থির,
কৈকেয়ীর পণ
অচল হিমাদ্রি সম ;
ধ্রুব তাহা
প্রভাতের সূর্য্যোদয় যথা।

[দশরথ ধীরে ধীরে উঠিয়া কাতরভাবে কৈকেয়ীর দুই হাত ধরিলেন।]

দশরথ। কৈকেয়ী, কৈকেয়ী, প্রিয়া,
ক্ষমা করো, করো দয়া।
রাজরাণী তুমি,
জানো রাজকুলনীতি।
ইক্ষ্বাকু-বংশের ধারা—
জ্যেষ্ঠ-সুত লভে সিংহাসন।
তুমিও তো কতবার বলেছ আমারে—
'ভরত যেমন প্রিয়
রাম মোর প্রিয় যে তেমনি।'
আজ তুমি হ'য়ো না বিমুখ
গুণবান সে রামের 'পরে।
কি আশঙ্কা তব
তার কাছে ?

কৈকেয়ী। মহারাজ,
সত্য তব করহ পালন।
ধার্ম্মিক বলিয়ে
খ্যাত তুমি ভূমণ্ডলে।
ধর্ম্ম তব করহ রক্ষণ।
সত্য রক্ষা তরে
অলর্ক নৃপতি
নিজ চক্ষু উপাড়িয়া
ব্রাহ্মণেরে করেছিল দান ;
শিবিরাজ নিজ দেহ হ'তে
মাংস কাটি'
শ্যেনে দিল উপহার,
তবু সত্যে করেনি বর্জ্জন।
মনে রেখ তাহা।

দশরথ। (বিমূঢ় বিস্ময়ে) এত নীচ,
এত ক্রূরমনা, কৈকেয়ী মহিষী তুমি ?
জান তুমি—
রাম হ'তে অধিক ধার্ম্মিক
ভরত তোমার।
জ্যেষ্ঠ-ত্যক্ত রাজ্য কভু
ল'বে না ভরত।
কি অখ্যাতি রটিবে তোমার তবে !
কি বলিবে কৌশল্যা; সুমিত্রা,
আর পুরবাসী যত ?
রাম বনে গেলে
অনাথা হ'বেন সীতা
বালিকা কোমলা,
পুত্রবধূ তব।
আমি বাঁচিব না ক্ষণতরে
রামে দিয়ে বনে।
স্বামীহীনা হ'তে হবে তোমা।
বোঝ, রাণী।
ভেবে দেখ—
কি কঠোর দুরবস্থা ঘটিবে তোমার।

কৈকেয়ী। আমারে তো মহারাজ,
করিতে চাহনি সুখী।
ভরতও তনয় তব ;
তারেও তো সুখী করিবারে
বাসনা নাহিক তব।
রাজ্য হ'তে দূর দেশে পাঠায়ে তাহারে
গোপনে সাধিতে চাও
রাম-অভিষেক।
মহারাজ,
পণ তব, সত্য তব
করহ পালন।

দশরথ। অন্যায্যা, পাপিষ্ঠা, ক্রূরা,
দুরদৃষ্ট মোর—

ঘরে এনেছিনু তোরে কলঙ্কিতে রঘুকুল।
কুণ্ঠা নাহি তোর
গ্লানি দিতে স্বামী-শিরে ?
ভরতেরো ইচ্ছা যদি—
রাম যাক বনে,
মৃত্যু হ'লে মোর
প্রেতকৃত্য যেন নাহি করে সে-ই।
হায়, হায়,
সুদগণ যারে নিত্য
উপাদেয় ভোজ্য দিতে আগ্রহে আকুল,
সেই রাম
তিক্ত ও কষায় ফলমূলে
যাপিবে জীবন ?
রাজপুত্র বল্কল-বসন
তৃণভূমি শয্যা তার ?
ধিক্ তোরে পাপিনী কৈকেয়ী,
যেই জিহ্বা তোর
এই বাক্য করে উচ্চারণ
এখনও তা খণ্ড হ'য়ে পড়ে না মাটীতে !
বিষ খাস্,
কিবংা কর্ আগুনে প্রবেশ,
বাক্য তোর রাখিব না কভু।
(কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর কৈকেয়ীর চরণ স্পর্শ করিয়া)
ক্ষান্ত হ'ও,
ক্ষান্ত হ'ও, কৈকেয়ী মহিষী,
স্বামী হ'য়ে চরণ পরশি' তব
করো ক্ষমা।
কৈকেয়ী। (সরিয়া গিয়া)
মহারাজ,
অন্যায় প্রার্থনা কভু
কৈকেয়ী না করে।
তব পণ রাখো তুমি,
চিত্ত কর স্থির।
দশরথ। কৈকেয়ী, কৈকেয়ী,
মৃত্যু মোর কাম্য তোর !
হে ধরণী অনুভূতিহীনা
বিমূঢ়া, নির্ব্বাক,
এখনও কেমনে
বহন করিছ এই পাপ-পূর্ণা অন্যায় প্রতিমা ?
দীর্ণ হও হে করুণাময়ী,
গ্রাসি' লও বক্ষে তব
গরলপূরিতা এই সর্ব্বনাশিনীরে
কৈকেয়ী, কৈকেয়ী,
বুঝেছি বুঝেছি—
এ চরিত্র তোর জন্মগত ;
মাতৃরক্ত সাথে
লভেছিস্ পাপ-বাঞ্ছা।
পিতা তোর ধার্ম্মিক মহান্ অশ্বপতি
জানিতেন পক্ষীভাষা।
যিনি তাঁরে শিখালেন এই ভাষা
নিষেধ আছিল তাঁর—
কাহারেও না জানাইতে ইহা,
জানালে ঘটিবে মৃত্যু।
মাতা তোর জানিত এ নিষেধ-বারতা ;
সেই ভাষা শিখিবারে তবু
অন্যায় আগ্রহ তার এমনি প্রবল
বারংবার পীড়িল পিতারে তোর,
স্বামী মরে যদি
কুণ্ঠা নাই তবু।
কৈকেয়ী,
সেই মাতৃজাতা তুই,
তোর এ আগ্রহ বিষময়
মাতৃযোগ্য তোর।
রাম, রাম, নয়নের মণি,
তোরে দিতে হ'বে বনে !
পারিব না, পারিবে না দশরথ কভু !
দৌবারিক, দৌবারিক,
নিয়ে এসো অসি, তীক্ষ্ণ অসি—
খণ্ড খণ্ড করি আমি পাপ-জিহ্বা কৈকেয়ীর,
সর্পজিহ্বা বিষ-লিপ্ত—

ওই জিহ্বা খণ্ড খণ্ড করি'
খাওয়াই কুকুরে ! (উন্মত্তভাবে)
কই তরবারি কই ?
কি ? পণ ? সত্য ? শপথ আমার ?
সে শপথ রাখিতে হইবে আজ !
ধিক্ ধিক্ তোরে দশরথ
রূপান্ধ কামান্ধ নরপতি !
ঘৃণ্যা-নারী-পদে উচ্চশির দিলি বিকাইয়া
তুচ্ছ করি'
রঘু-কুল-গৌরব-মহিমা ।
না, না, অসম্ভব,
অসম্ভব পালনীয় সত্য এই ।
কৈকেয়ী, কৈকেয়ী,
ক্ষমা করো ।
ক্ষমা, ক্ষমা কেন ?
কার কাছে ক্ষমা ?
ক্ষমা চাহে দশরথ !
ক্ষমা চাহে দশরথ রাজকুলপতি !
ক্ষমা চাহে পাপিনীর পদে !
দণ্ডদাতা আমি মহারাজ মানব-শাসক ।
কৈকেয়ী, কৈকেয়ী,
জীবন-মরণ তোর এই হস্তে মোর,
জানিস্ নিশ্চয় ।
দণ্ড দেবো, দণ্ডযোগ্যা তুই !
দৌবারিক !

কৈকেয়ী । পাপী নয়,
দণ্ডনীয়া নহেক কৈকেয়ী, মহারাজ !
সত্য মাগে সেই ।
মাগে অঙ্গীকারের পূরণ ।

দশরথ । ধিক তোরে কাপট্য-কৌশলা, ক্রূরা,
ঘৃণ্যা, পাপময়ী !
ক্রূর অঙ্গীকারে বদ্ধ করিয়ে স্বামীরে
বলি দিতে চাস
যূপকাষ্ঠে ছাগ সম !
হাস্যময়ী কান্তিময়ী কুল্লা অযোধ্যার
শ্মশান করিতে চাস !
কুণ্ঠা নাই, লজ্জা নাই !
রাম, রাম,
প্রিয় মোর প্রাণাধিক,
প্রাণ যায়, প্রাণ যায় !

কৈকেয়ী । (জনান্তিকে) দৃঢ় হ'ও মন,
চিত্ত দৃঢ় হ'ও !
ভরত, ভরত, আমার ভরত,
সিংহাসনে তোরে বৎস,
হেরিব নিশ্চয় ।
তা হ'তে নাহিক কাম্য মোর—
সে যে মোর শ্রেষ্ঠ অভিলাষ,
আনন্দ-স্বপন ।

দশরথ । রাম, প্রিয়-মোর !
তোরে দিতে হ'বে বিসর্জ্জন ?
শিরায় শিরায় মোর
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা তুই প্রিয়তম ।
পারিব না তোরে বিসর্জ্জিতে ।
অগ্নি, অগ্নি, বৈশ্বানর,
এস এস দগ্ধ কর পাপি দশরথে ।
এস মৃত্যু শান্তিময়,
সুশীতল, জ্বালাহারী, ব্যথানিবারণ !
নিয়ে যাও শান্তিধামে তৃপ্তিধামে মোরে ।
অসহ্য বেদনা এই মর্ম্মভেদী !
ভেঙ্গে যায়, পুড়ে যায়, গুঁড়া হ'য়ে যায়
চিত্ত মোর !
ওহো, অসহ্য দংশন !
দংশন করেছে মোরে সর্পিনী কৈকেয়ী !
জ্বালা, বড় জ্বালা !
জ্ব'লে যায় গরলে এ বুক !

কৈকেয়ী । মহারাজ,
রাত্রি ওই অবসন্নপ্রায় !
কথা দাও,
করো তব প্রতিজ্ঞা পালন !

দশরথ । ওই ওই ফুঁসিছে আবার

ফুঁসিছে নাগিনী !
রাখিবে রাখিবে সত্য,
দশরথ সত্যে নাহি করে অবহেলা ।
কিন্তু তা কেমনে ?
সত্য আজ একি ভয়ঙ্কর ;
একি সত্য সর্ব্বধ্বংসকর !
কৈকেয়ী, কৈকেয়ী,
বর লবি তুই ?
কুণ্ঠা নাই, লজ্জা নাই ?
যাবে রাম বনবাসে ?
যাক্ তবে,
হোক মোর সত্যের সাধন ।
ধিক্ ধিক্ মোরে,
ধিক্ রাজা দশরথে !
কৈকেয়ী, কৈকেয়ী,
ভার্য্যা তুই ন'স্ মোর,
ভরত সে পুত্র নয় ।
রাম বনে গেলে
মৃত্যু যবে হ'বে মোর
করিস্ না তোরা কিছু ;
বশিষ্ঠ করিবে শেষ ক্রিয়া !
[প্রভাতের আলোক দেখিতে পাইয়া]
এঁ্যা, এ্যা, ওই যায়,
ওই রাত্রি হয় শেষ !
এ্যা, এঁ্যা, রাত্রি কেটে গেল !
রাত্রি রাত্রি, শান্তিময়ী জননী আমার,
হ'য়ো নাকো অবসান,
কোল দাও, রাখো ঢেকে-ছেয়ে,
তাপিত এ দশরথে !
দশরথ, নরপতি দশরথ
মাগে জোড়-করে—
দীর্ঘ হও দীর্ঘতর দীর্ঘতম আজ !
প্রভাতা হ'য়ো না আর,
হও চিরতরে অপ্রভাতা !

তপন, তপন,
হে পূর্ব্বপুরুষ মোর পূজনীয়,
সন্তান তোমার রাজা দশরথ
মাগে আজ—
হ'য়ো না উদয় ।
তব উদয়ের সাথে
দীপ্ততম পূততম রাম রশ্মি তব
মলিন হইয়া যাবে ।
দেব,
হয়ো না উদয় ।
কিন্তু এ কি !
সূর্য্যদেব শুনিবে না অনুনয় ?
রজনী র'বে না ?
এঁ্যা, র'বে না, র'বে না ?
আসিবে প্রভাত ।
তারি সাথে কে জানে অশুভ কিবা !
না, না, যাও, যাও চ'লে
শীঘ্র চ'লে যাও !
আর নারি হেরিতে এ পিশাচীর মুখ !
দশরথ, দশরথ,
কোন্ পাপে, কোন্ অপরাধে
এ দুর্ভাগ্য ঘটে তোর ?
করেছিলি কোন্ অপরাধ ?
ওগো মনে পড়ে,
মনে পড়ে আজ—
সিন্ধু, সিন্ধু,
পুণ্যময় অন্ধ মুনি,
নিঃসহায় ছিলে তুমি একক-সন্তান !
তোমার সে অন্ধ-যষ্ঠি
তোমার সন্তানে
মেরেছিল এই দশরথ
এ খ্যাত-ধার্ম্মিক দশরথ
এই হাতে সুতীক্ষ্ণ শায়কে ।
ঐ ঐ সিন্ধু হাসে,
শূন্যে বসি' হাসে—

আমি জ্বলি, দেখে হাসে—
ঐ বলে—
'উপযুক্ত পুরস্কার পেলে তুমি রাজা।'
উপযুক্ত, উপযুক্ত, উপযুক্ত বটে!
ক্ষমা করো,
ক্ষমা করো, অন্ধ মুনি।
ফিরাও বচন।
এ্যাঁ, এ্যাঁ, ক্ষমা নেই?
ক্ষমা নেই মোটে?
(নতমস্তকে)
দশরথ,
সৌভাগ্য-গরব চূর্ণ আজি তোর।
ঘৃণ্যা, ঘৃণ্যা
অগ্নি সাক্ষী করি' যেই করযুগ তোর
করিনু গ্রহণ,
ত্যজি তাহা, ত্যজি তোরে আজ।
ত্যজি তোর পুত্র ভরতেরে।

[ইহা বলিয়া দশরথ নতমস্তকে বসিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে বৈতালিকগণ গান করিয়া উঠিল, সুমন্ত্র গান করিতে করিতে থামিলেন।]

গীত

উদিত সূর্য্য জগজ্জনপূজ্য।
জাগো, জাগো, দশরথ রঘুকুলসূর্য্য।
প্রভাতরশ্মিসম
তব যশ অনুপম
দিকে দিকে ভাসিত বাজে জয়-তূর্য্য।
দশদিকে দুর্ব্বার
তব রথ হুঙ্কার,
দশ-রথ-রথী তুমি রবি হ'তে উচ্চ।
কল্যাণে জাগো বীর,
সত্যেতে জাগো ধীর,
নাশো শাসন বলে ক্ষুদ্রতা তুচ্ছ।

সুমন্ত্র। প্রভাত হয়েছে, মহারাজ।
অভিষেক-আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত
রাম তরে।
শয্যা ছাড়ি' করুণ আদেশ।
কুলগুরু উপস্থিত ঋত্বিকের সহ।

দশরথ। সুমন্ত্র, সুমন্ত্র,
বাক্যে তব দীর্ণ হ'য়ে যায় মর্ম্ম মোর।
(সুমন্ত্র আশঙ্কায় সরিয়া দাঁড়াইলেন)

কৈকেয়ী। সুমন্ত্র,
গতরাত্রি অনিদ্রায় কেটেছে রাজার
রাম-অভিষেক তরে আনন্দে অধীর
পরিশ্রান্ত এবে তিনি।
যাও তুমি ত্বরা,
রামচন্দ্রে আনো একবার।

দশরথ। সুমন্ত্র, সুমন্ত্র
কোথা রাম, কোথা রাম মোর?
ব্যাকুল যে আমি দেখিতে সে প্রিয়মুখ।
সুমন্ত্র, সুমন্ত্র,
আমি রাজা দশরথ?
শত-দেশ-জয়ী?
শত-রাজশির চুম্বিত-চরণ?
গর্ব্বোন্নত এই শির
বাধা দিনু কপট নারীর পদে?
ধিক মোরে!

সুমন্ত্র। মহারাজ,
বুঝিতে না পারি কিছু।
কেন এত বিহ্বল আপনি
বলুন আমায়।

দশরথ। বলিব, বলিব তোমা?
কি বলিব বলো?
শুভ নহে এ সংবাদ।
চলো, চলো, নিয়ে চলো মোরে
শ্রীরামের কাছে।
এ ঘৃণ্য আবাসে আর না চাহি থাকিতে
[সুমন্ত্রের হাত ধরিয়া দশরথের প্রস্থান]

কৈকেয়ী। ঘৃণ্য এ আবাস আজ,
ঘৃণ্যা এ কৈকেয়ী!

এত ক্লেশ এত ব্যথা সত্যেরে পালিতে!
মহারাজ
বার্দ্ধক্য তোমার
শৈথিল্য এনেছে মনে।
কিন্তু জেনো স্থির
কৈকেয়ীর নাহি শিথিলতা।
দুলাল আমার
ভরত নয়ন মণি,
তারে রেখে দূরে
গোপনে সাধিতে চাও রাজ অভিষেক?
ভরত সে শত্রু তব?
প্রিতমা চিরদিন কৈকেয়ী মহিষী
আর আজ?
আজ তার বাঞ্ছা পুরাবারে
এত ক্লেশ, এত কাতরতা!
সত্য তব করিতে সাধন
সাহস নাহিক মনে!
ধিক্ তোমা ধিক

[মন্থরার প্রবেশ]

মন্থরা। রাণীমা, খবরদার তোমার পণ ছেড়োনা। মন খুব শক্ত ক'রে রাখো। রামের জন্যই সকলে আকুল আর ভরত কি রাজপুত্তুর নয়?

কৈকেয়ী। ভরত ও রাজার ছেলে।
অযোধ্যার সিংহাসনে।
ন্যায্য দাবী তার রামের যেমন।
ভরতের অভিষেকে
কিসের আক্ষেপ,
কিসের আপত্তি এত?
রাম যদি গুণবান
পিতৃসত্য করুক পালন।
ভরত তো অনুজ তাহার,
অনুজেরে দিতে সিংহাসন
কাতর হওয়া তো তার নহেক উচিত।

মন্থরা। রাণী, শম্বর অসুরের সঙ্গে রাজার যুদ্ধের কথা ভুলো না। তখন কোথায় ছিল কৌশল্যা, কোথায় ছিল সুমিত্রা? তুমিই তো রাজাকে বাঁচিয়েছিলে। আর আজ তোমার একটা সাধ মেটাতে রাজার এত আপত্তি!

কৈকেয়ী। যুদ্ধ-ক্ষত
কৈকেয়ী তা সারাবে যতনে।
সেবা, দাসীপণা—
কৈকেয়ী করুক চিরদিন।
প্রতিদান চাবে নাকো কিছু!
চায় যদি
অনর্থ ঘটিবে চারিদিকে।
কিন্তু হ'বে না তা,
কৈকেয়ী পেয়েছে চিরদিন
যা চেয়েছে।
আজও তার কাম্য লবে সেই
মন্থরা,
পূরাব সাধ
আয় সাথে মোর।

[উভয়ের প্রস্থান।

[রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ]

রাম। (সাশ্রু নয়নে) লক্ষ্মণ,
ঐ দেখ মাঙ্গলিক করিছে রচনা
শত শত পুরনারী;
অভিষেক-উৎসবের যত আয়োজন
সহস্র সম্ভারে
হতেছে সজ্জিত দেখো।
ভাই, এ অযোধ্যা প্রতিমরী
আনন্দ উৎসব ওই
জনক-জননী
সব ছেড়ে যেতে হ'বে? (ক্রন্দন)

লক্ষ্মণ। আর্য্য,
স্বার্থলুব্ধা গর্ব্বিতা রমণী করিছে আদেশ
অদর ক্রীতদাস তার দশরথ
সে আদেশে নতশির,
জ্যেষ্ঠ পুত্রে করে নির্বাসন,—
এ আমার মার্জ্জনা-অতীত

রাম। ভাই,
মার্জনা-অতীত বটে!
কিন্তু জেনো মনে
সত্য পাশে বদ্ধ পিতা।
সত্যঋণ হ'তে তাঁরে করিতে উদ্ধার
সন্তানের কর্ত্তব্য নিশ্চয়।

লক্ষ্মণ। সত্য, সত্য তুমি বল কারে?
কোন যুগে ক্ষতদেহ দশরথ
পরিচর্য্যা লভি'
করিলেন পণ
মহিষীর সাধিতে সন্তোষ।
জ্যেষ্ঠ পুত্রে বনে দিতে
সত্য বাক্ দেন নাই রাজা।
সত্য তবে বল এরে কেন?
জ্যেষ্ঠ পুত্রে বিবর্জ্জিতে,
মহারাজ্যে করিতে শ্মশান
শপথ ছিল না কভু।
আজ বৃদ্ধ রাজা শিথিল-মানস,
তাই প্রেয়সী তাঁহার
অন্যায় উপায়ে সত্য সাধিবারে চায়।
বুঝে দেখ তুমি,
ন্যায় নহে পুত্র-নির্ব্বাসন
ন্যায় নহে স্বীয় রাজ্য বিনাশ-সাধন।

রাম। বৎস, শোন,
রাজ্য এক দিকে
আর ধর্ম্ম এক দিকে
এ রাজ্য গ্রহণ মোর পিতৃ-অপমান।
রাজ্য-ত্যাগ পিতৃসত্যের পালন
আর ভেবে দেখ—
কৈকেয়ীর স্নেহ ছিল না পঙ্কিল কভু,
ছিল উভমুখী—
আমার ও ভরতের প্রতি।
আজ যে সে স্নেহ
বিমুখ আমার প্রতি
জেনো ইহা দৈবের বিধান

লক্ষ্মণ। আর্য্য, ক্ষমা করো—
যে দৈব-বিধান-বোধ
বুদ্ধি তব করেছে বিলোপ
ঘৃণ্য তাহা মোর কাছে।
পিতা সে তো কৈকেয়ীর ক্রীড়নক
বুদ্ধিশূন্য প্রাণশূন্য মর্য্যাদাবিহীন
আর কৈকেয়ী সে
স্বার্থলুব্ধা পাপ-বিধায়িনী।
এ দোঁহার কার্য্যবিধি
নহে পালনীয় কভু।
পালন সে অধর্ম্ম-সাধন।

রাম। কল্যাণ-মূরতি
স্নেহময় অনুজ আমার,
পিতৃবাক্যে অবস্থিতি
সাধু আচরিত পথ
জানি আমি—
কি হেয় এ প্ররোচন।
জ্যেষ্ঠ সুত যাহে
বিবাসিত নির্য্যাতিত
কিন্তু ভাই,
পণে বদ্ধ ছিলেন জনক।
যদ্যপি সে পণ রক্ষা হয় সুকঠোর
হয় যদি মর্ম্মভেদী,
তবু তাহা পালনীয়,
পালনীয় সন্তানের তাহা
হয় তো এ দৈবের বিধান,
লঙ্ঘনের নাহিক উপায়।

লক্ষ্মণ। আর্য্য,
বুদ্ধিমান গুণবান তুমি
তুলনা-অতীত।
আজ এ কি বুদ্ধি তব?
কোন্ বুদ্ধি-বলে
অধর্ম্মে মানিছ ধর্ম্ম?
অন্যায়ে বলিছ ন্যায় অতি
হীনবীর্য্য যারা জানহীন।

তারা মানে দৈব বলি,
অজ্ঞাত অদৃষ্ট কোন্ সংশয় আঁধারে
দৈব !
সে তো দুর্ব্বলের একান্ত শরণ,
বুদ্ধিহীনের আশ্রয়।
শক্তিমান দৃপ্তোরস তুমি,
তোমার সে পাল্য নয়।
তব মতে
যেই দৈব বিরূপ তোমার প্রতি,
আমি তারে করিব হনন
সুতীক্ষ্ণ শায়কে;
আর সাথে তার
কৈকেয়ী ও দশরথে।
বাহুদ্বয় মোর
শোভার্থে সৃজিত নয়,
ধনু নহে অলঙ্কার;
অসি নহে কটির বন্ধন,
শায়ক নহে শুধু তুন্তনের তরে।
দশরথ-প্রভুত্বেরে করিয়া বিলোপ
দৃঢ় করিব স্থাপন
তোমার প্রভুত্বে আজ।
আজ্ঞা দাও।

রাম। (লক্ষ্মণের পৃষ্ঠে হাত দিয়া)
স্নেহের লক্ষ্মণ,
শুভার্থী আমার।
ক্ষান্ত হও,
চিত্ত কর ধীর
যে বেদনা তোমারে বিহ্বল করে,
আমারেও পীড়িছে তা,
জানিও নিশ্চয়।
তবু ভাই,
পিতা সে যে জন্মদাতা;
গুরু আমাদের।
পিতৃঋণ আমাদেরো ঋণ।
চলো ভাই জননী-সকাশে;
কৌশল্যা-সুমিত্রা দোঁহে করি গে বন্দনা॥

[উভয়ের প্রস্থান

[রাম বনে বিবাসিত হইবেন শুনিয়া কয়েকজন প্রধান নগরবাসী প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য প্রাসাদের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। চারজন নগরবাসীর প্রবেশ।]

প্রথম। খবর নেবার জন্য লুকিয়ে-চুরিয়ে রাজ বাড়ীতে তো ঢোকা গেল। কিন্তু কিছুই তো বোঝা গেল না, ভাই।

তৃতীয়। আর বুঝ্বে কি, দাদা ?
কলকাঠি যে টেপ্বার সে ঠিক টিপেছে।

চতুর্থ। ছোটরাণা কেমন বুঝে বুঝে টোপ্টি ফেলেছে, দাদা ? বুড়ো গিলেছেও তো ঠিক।

প্রথম। ছোট রাণী ছোট রাণী ব'লে যে বুড়ো পাগল একদণ্ড সে মুখ না দেখ্লে যে অজ্ঞান। কটা মুখের কাছে কিছু নয় বাবা। সব ভুলিয়ে দ্যায়। হাতখানি নেড়ে আর মুখটী বেঁকিয়ে ছোটরাণী যখন বললে যে, রামকে বনে দাও, ভরতকে রাজা করো,—দশরথের সাধ্যি কি বাবা সে কথা ঠেলে !

দ্বিতীয়। দাদা, এ যে একেবারে শাস্তরের কথা, ভাই।
সেই যে কি বলে, মিথ্যে নয় বাবা,
বেদশাস্তরে স্বয়ং ভগবান বলেছে—
বিদ্ধের সে তরণী ভাজ্যে'—বাবা গাঁটে গাঁটে
সত্যি কথা। বুড়ো বয়সে রাঙ্গা মুখ একবারে
মাত্ ক'রে দিয়েছে।

তৃতীয়। শুধ্ মাত্, একেবারে সারে-মাতে মাত্।

প্রথম। ওঃ! কি রকম চালটী চেলেছে, ভাই!
ভেবে ভেবে একেবারে সব ঠিক্ ক'রে রেখেছিলো।
যেম্নি শুনেছে রাম রাজা হ'বে
একেবারে ছুটী ছোবল একসঙ্গে।

দ্বিতীয় একেবারে কেউটের ছোবল। আচ্ছা, দাদা তুমি তো অনেক জানো, শিরোমণি-দা'র কাছে অনেক বই পড়েছ। ঠাকুরুণ রামের কি মা হ'ল, দাদা ?

দ্বিতীয়। সে কথা কি জানি, দাদা? বলি ভাল শাস্তরের কথায় কি বলে?

তৃতীয়। বিমাতা বলে রে বিমাতা।

দ্বিতীয়। বিমাতা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বটে। আচ্ছা, দাদা, কইকই যখন রামের বিমাতা হ'ল দশরথ তখন ভরতের বি-পিতা হ'বে তো?

তৃতীয়। দূর বোকা তা হ'বে কি ক'রে?

দ্বিতীয়। হ'বে কি ক'রে? বললেই হ'ল? আলবৎ হ'বে। দুটো যে উলটো হচ্ছে বাবা! রামের বেলায় কইকই যেমন হ'ল বিমাতা, ভরতের বেলায় দশরথ বিপিতা হবে না? চালাকি না কি? এই শেখালে, আবার উলটে নিচ্ছ কেন বাবা?

(সকলের হাস্য)

চতুর্থ। তুই একেবারে হদ্দ বোকা! তোর মাথায় ওসব ঢুকবে না।

দ্বিতীয়। নাঃ! ঢুকবে না! আর তোমাদের কথাতেই বুঝি সাতটা ছেঁদা আছে যে ছোট বড় এণ্ডা বাচ্ছা যত বুদ্ধির ঝাড় আছে পিলপিল ক'রে ঢুকবে। বাবা আমি কি কচি ছেলে? শাস্তরের কথা আমিও জানি। আমার জেঠামশাইকে দেখে-ছিলি তো? বাবা এত মোটা মোটা বই সব একেবারে হজম! জেঠামশাই বলতেন "শরীরে অনেক দ্বার আছে, কখন কোথা দিয়ে প্রাণটা বেরিয়ে যায় কে জানে!" বাবা গুরুজনের কথা, শাস্তরের বাক্য সে তো আর মিথ্যে হ'বে না। আর সে ছেঁদা কেবল তোমার শরীরেই তো নেই। আমারো আছে। বুদ্ধি কেবল তোমার মাথাতেই ঢুকবে বুঝি?

প্রথম। হাঁ রে হাঁদা কার গায়ে কটা বুদ্ধি যাবার ছেঁদা আছে রে? তুই তো পণ্ডিত মানুষ।

দ্বিতীয়। কেন এই যে দুটো কান আর নাক গুরুমশাই যখন পড়ায় তার বুদ্ধি চন্ চন্ করে। কান আর নাক দিয়ে ছেলের মাথার মধ্যে ঢুকে যায়।

(সকলের হাস্য)

প্রথম। এই, এই থাম্। শিরোমণি-দা আসছেন। ওঁকে আমি সব জিজ্ঞেস ক'রছি কি হ'ল না হ'ল।

[শিরোমণি পুরোহিতের প্রবেশ]

সকলে। পেন্নাম হই শিরোমণি ঠাকুর। কি খবর, দেখ্‌লেন কি?

শিরোমণি। আর কি দেখ্‌বো বল্? অযোধ্যা এবার শ্মশান হ'ল। রাণীরা সব কাঁদছেন, ঝি-চাকর কাদছে রাজা দশরথ তো একেবারে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। ওঃ কি সর্ব্বনাশই করলে!

প্রথম। আচ্ছা দাদা কৈকেয়ী ঠাক্‌রুণই তো সব ঘটালে? কি মেয়ে-মানুষ দাদা?

শিরোমণি। তা নই আর কি? রাজবাড়ী একেবারে ছারখার ক'রে দিলে। এ রকমটী কখনো শুনিনি।

তৃতীয়। দাদা, তুমি যাই বলো, ভরতে আর ছোট রাণীতে এ সব ষড়যন্ত্র ঠিক ছিল। কেমন তালে রাজাকে ঠকালে বলো?

শিরোমণি। কি জানি ভাই বড় ঘরের বড় কথা। মনে তো হয় অনেক রকম। কি বলা যায় বলো?

তৃতীয়। আচ্ছা দাদা, ছোটরাণীর কথা শুনতেই হ'বে, এ কেমন কথা। বুড়ো রাজা একেবারে ছোটরাণীর দাস। অমনি এক কথায় রামকে বনে পাঠাবে?

শিরোমণি। আরে ভাই, তোরা বুঝ্‌বি কি করে বল্? রাজা ধার্ম্মিক লোক। বর দিবেন বলেছিলেন তখন আর না করেন কি ক'রে? ছোটরাণীরই মনটা দেখ, রাজার আর দোষ কি?

দ্বিতীয়। দোষ নেই? রেখে দাও তোমার ধম্মো, দাদা। সেই শাস্তরে বলে, জেঠামশাই বলে ছিল—গুরু জন না হ'বার যোটি নেই—মেয়েমানুষ দুষ্টু হ'লে—

প্রথম ও তৃতীয়। এই, এই আস্তে। বড় চালাকি পেয়েছিস্ নয়? আজ বাদে কাল ভরত যখন রাজা হ'বে, তোমায় একেবারে টেরটি পাইয়ে দেবে। একি তোর ঘর পেয়েছিস্ না কি যে পেগের বড়াই করছিস্?

দ্বিতীয়। আচ্ছা বাবা আচ্ছা। চুপ না হয় করলুম। হোক না ভরত রাজা একবার। দেব একদিন চুপি চুপি ঐ জন্তু ঘরের দরজা খুলে—যত কুকুর আর বাঘ হাঁই হাঁই ক'রে একেবারে সিংদরজা দিয়ে ঢুকে ভরত তো ভরত—সব একেবারে শেষ ক'রে দেবে।

প্রথম। শিরোমণি-দা ধমক দাও তো এই বোকাটাকে একবার, কি কাণ্ড বাধাবে।

শিরোমণি। (দ্বিতীয়ের প্রতি) এই থাম্ রাজবাড়ীর ভেতর গোলমাল করিস নি।

দ্বিতীয়। হক্ কথা বলব তার গোলমাল কি দাদা? হা দাদা, তুমি যখন এয়েছ একটা কথা জিগ্‌গেস্ করি। দাদা, তুমি তো শাস্তর পড়েছ। বলো তো দাদা কইকই যদি হয় রামের বিমাতা—তো দশরথ ভরতের বি-পিতা হয় না? আর যেন এরা আমায় বোকা পেয়েছে!

শিরোমণি। এই এই চুপ পালা পালা। ঐ ঐ, কে আসছেন এদিকে। চ, চ পালা পালা।

[সকলের সেই দিক দেখিয়া প্রস্থা

[ধীরে ধীরে কৈকেয়ী ও মন্থরার প্রবেশ]

মন্থরা। মজাটি দেখো, রাণীমা। রাম রাজা হ'বে তো সুখের আর শেষ নাই। আর যেই বলা হয়েছে ভরতকে রাজা করা হোক, অমনি সব হা-হুতাশ, কান্না, রাগা-রাগি! মজাটি দেখো। আর এই একটা সুবিধে, এবার সকলেই তোমায় মন্দ বলতে সুরু করবে।

[চারিদিকে পুরবাসীদের ক্রন্দন ও দশরথের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। কৈকেয়ী ও মন্থরা চকিত হইয়া উঠিল]

কৈকেয়ী। মন্থরা, শোন্

ঐ শোন্ রাম বনবাসতরে
কত না বিলাপ।
এ অযোধ্যা, এ ঐশ্বর্য্য যেন
রাম তরে শুধু
জানি আমি
আমার দুর্নামে
ছেয়ে যাবে রাজপুরী,
ছেয়ে যাবে অযোধ্যানগরী।
কিন্তু মোর লজ্জা নাই,
ভয় নাই তাতে।
বাসনার জয় যেথা
মান-অপমান অতি তুচ্ছ সেথা।
এই মোর রূপ,
এই মোর তীব্র তীক্ষ্ণ রূপ
রাজারে করেছে জয়।
চিত্ত মোর হ'বে জয়ী এমনি নিশ্চয়।
পরাজয় জানে না কৈকেয়ী;
পরাজয় লভে নি সে কভু।
কৈকেয়ীর বাসনার স্রোতে
রুধিবার শক্তি আছে কার?

মন্থরা। রাণীমা, রাজার ব্যবহারটা দেখলে তো? কত গালাগালিই তোমায় না দিলেন।

কৈকেয়ী। দেখ্‌লি মন্থরা?

অপবাদ ঘৃণা মোর তরে সব।
কৈকেয়ী সারাবে যুদ্ধক্ষত।
পরিচর্য্যা করিবে কৈকেয়ী।
আর পুরস্কার তার
ঘৃণা, অপমান!
আমারে বলিলে "দেবো,"
তাই তো চেয়েছি।
এখন কপট আমি?
ঘৃণায় ত্যজিবে মোরে?
ত্যজো, দুঃখ নাই,
কৈকেয়ী যে মানে না শাসন।
সে পেয়েছে সুখের সন্ধান,
সুখ, অফুরন্ত সুখ—
সন্তানের সুখে সুখ তার!
স্নেহসুখে পাগল কৈকেয়ী।
কৈকেয়ী সে দাসী নয়,
রাজকন্যা রাজরাণী সে যে,
কেন সে হ'বে না রাজমাতা?

মন্থরা। সেইজন্তেই তো তোমায় আমি এত ক'রে বুঝিয়ে ছিলাম, রাণী-মা।

কৈকেয়ী। মন্থরা,
ঠিক বলেছিলি তুই।
শাসন করিবে মোরে—
সাধ ছিল তাই সবাকার।
সব হিংসা লবে শোধ।
হ'বে না হ'বে না তাহা।
ইচ্ছা মোর হ'বে সর্ব্বজয়ী,
সর্ব্বজয়ী চিরদিন।
চাতুরী তোমার, দশরথ,
কৈকেয়ী বুঝিছে সবি।'
ভরতে রেখেছ দূরে ঠেলে,
কণ্টক ভেবেছ তারে রাম-সুখ-পথে।
সরাবে কোথায় তারে ?
আমি আছি কাঁটা
জননী তাহার।
ভরতের রাজ্যলাভ কে করিবে রোধ ?
অযোধ্যার সিংহাসনে
একচ্ছত্র ভরত আমার রাজা,—
সে কি সুখ সে মহা উল্লাস
সে সুখের পাশে
নগণ্য এ অপমান
নগণ্য এ ঘৃণা দীর্ঘশ্বাস।

———:*:———

প্রেমিক

(রিচার্ড আল্‌ডিংটনের অনুভাবে)

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

যদিও বন্ধুরা আছে,
আর আছে সুন্দরী প্রেয়সী,
সবার উপরে তবু আছে আর কেহ,
আমি তা'রি প্রতীক্ষায় আছি।

কোমল 'প্রামে'র ফুল ফুটিবে যখন,
পাখীদের গানে হ'বে বাতাস চঞ্চল,
আকাশে ভাসিবে সুখ, মৃদুল আরাম—
সে তখনো আসিবে না।

সে আসিবে সুবিপুল কলরোল হ'তে,—
তারার রহস্য-জ্যোতি চারিপাশে নিয়ে,
পুঞ্জ পুঞ্জ ধূম-কুণ্ডলীতে
আবরিবে ধাবমান অশ্বগুলি তা'র।
অকস্মাৎ নত হ'য়ে সে আমারে জড়ায়ে ধরিবে—
আমারে ব্যাকুল করি' ভীষণ সে বাহুর বন্ধনে,
আমারে করিবে বিদ্ধ একটী চুমায়!
তীব্র তা'র জ্বালা হ'তে
ধীরে ধীরে ওষ্ঠ বাহি' ঝরিবে রুধির।

উন্মত্ত আনন্দ-ভরে সে আমারে করিবে আঘাত,
তা'রপরে যতনে মুছায়ে আঁখি,
ওষ্ঠ হ'তে রক্ত মুছি' ল'য়ে
আমারে সে ঘিরে ল'বে স্বপ্নহীন প্রসুপ্তির মাঝে
চিরকাল তরে!

———:*:———

সত্যব্রত

(গল্প)

শ্রীমতী চিত্রা রায়

এক

সমস্ত দিন অনাহারে রৌদ্রে দ্বারে দ্বারে চাকুরির সন্ধানে ঘুরিয়া বিকালের দিকে ব্যর্থ মনোরথ সত্যব্রত ক্লান্তদেহে শিথিল চরণ দুখানি কোন মতে টানিয়া লইয়া নিজের ঘরে ফিরিতেছিল, কিন্তু আজ একমাস নিয়মিতভাবে চাকুরির সন্ধানে ঘুরিয়া তার সারা দেহ-মন যেন একান্তই অবশ হইয়া পড়িতেছিল.

অন্যমনস্ক ভাবে পথে চলিতে চলিতে সে একেবারে একখানি চলন্ত মোটারের সামনে গিয়া পড়িল। সঙ্কীর্ণ রাস্তায় গাড়ীর গতি চালক সংযত করিবার আগেই সত্যব্রতের দেহ গাড়ীর নীচে গিয়া পড়িল। রাস্তার লোকগুলি চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিবার পূর্ব্বেই গাড়ী চালক আহত ব্যক্তিকে কোনরূপ সাহায্য না করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে দ্রুতবেগে ছুটিয়া পলাইল। পথে পড়িয়া রহিল রক্তাক্ত কলেবরে মূর্চ্ছিত যুবক।

তিন দিন পরে সত্যব্রতের জ্ঞান হইলে সে চোখ মেলিয়া দেখিল। সে একখানি খাটের উপর শুইয়া রহিয়াছে চারিদিক্ চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিবামাত্র তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। স্থানটী তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কেন বা কি ভাবে সে এখানে উপস্থিত হইয়াছে স্মরণ-পথে আনিতে পারিল না।

উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিবামাত্র তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, সমস্ত শরীরের অসহ্য যন্ত্রণায় মৃদু আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়িয়া গেল যে একদিন সন্ধ্যার সময় মোটারের নীচে পড়িয়া গিয়া সে আহত হইয়াছিল, বোধ হয় সে হাঁসপাতালে চিকিৎসার জন্য নীত হইয়াছে। সত্যব্রতকে আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়া একজন নার্স ছুটিয়া আসিয়া তাকে ভাল করে শুয়াইয়া দিয়া বলিল, 'আপনি অত ব্যস্ত হ'য়ে উঠে বসবেন না, ডাক্তারবাবু বারণ করে গেছেন।"

সত্যব্রত বিহ্বল দৃষ্টিতে নার্সের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—"আমাকে ক'দিন এখানে আনা হ'য়েছে?"

"তিন দিন" বলিয়া নার্স সত্যব্রতের জন্য কিছু খাবার আনিতে চলিয়া গেল। সত্যব্রত তার সমস্ত শরীরের মধ্যে ডান হাত খানিতে অধিকতর যন্ত্রণা অনুভব করিল। তার চোখ দুটী জলে ভরিয়া আসিল, সে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল,—তার জন্য চোখের দু'ফোটা জল ফেলিবার কোন আত্মীয়-স্বজন নাই। এ জগতে তার মত নিঃস্ব ও আত্মীয়-স্বজন-রহিত আর কেহ নাই।

ঠিক একটী মাস পরে সত্যব্রত তার ভাঙ্গা ডান হাত নিয়ে, হাঁসপাতাল হইতে মুক্তি পাইল। তার মনে হইল, এই এক মাস কাল সে বেশ নির্ভাবনায় ছিল, এখন আবার তাহাকে বিষাদের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে—আবার অন্ন-বস্ত্রের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। সে ভাবিল গাড়ী খানা একেবারে তার বুকের উপর দিয়া চলিয়া গেলেই ভাল ছিল, তা' হইলে আর তাকে হাঁস পাতাল থেকে বাহির হইতে হইত না—অভিসপ্ত জীবনের শেষ হইয়া যাইত। সে যে যথার্থই নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল এইবার তার ভাল করেই মনে হইল। নিজের মনে চিন্তা করিয়া দেখিল এখন তার যেটুকু হাতে অর্থসম্বল আছে, তাহাতে তার ভাড়া করা ঘর খানির ভাড়া শোধ করিয়া দিয়া পনের দিন কোন রকমে কষ্টেস্বষ্টে চলিতে পারে। এর মধ্যে তাকে যা হোক কোন একটা চাকুরীর উপায় করিয়া লইতেই হইবে।

দুই

হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া সত্যব্রত প্রথমে নিজের ঘর ভাড়া শোধ করিয়া ঘরখানি ছাড়িয়া দিয়া অন্য জায়গায় সামান্য ভাড়ায় এক খানি ঘর ভাড়া করিল।

সত্যব্রতের পাশাপাশি ঘরে যারা বাস করিত তারা সকলেই নিম্ন শ্রেণীর, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী।

সত্যব্রত নিজের ঘরে বসিয়া দেখিত তাদের দিন কি সুন্দরভাবে কাটিতেছে, সেই শুধু ভদ্রলোকের ছেলে হইয়া নিজের অন্নের ভাবনায় ভাবিয়া মরিতেছে, কত জায়গায়ই তো সে চাকুরীর সন্ধানে ঘুরিল; কিন্তু একটা সামান্য চাকুরীও সে জুটাইতে পারিল না, আজ তিন মাস সে বেকারভাবে বসিয়া আছে। আর এই যে লোকগুলা এদের দিন তো বেশ হাসিয়া খেলিয়াই কাটিতেছে, এরা দিন আনে দিন খায়—ভাবনা নেই, চিন্তা নেই—যেন তারা সত্যব্রতের জগতেরই মানুষ নয়। সমস্ত দিন সব চলে যায়, কে জানে কোথায়, আর সন্ধ্যাবেলা এসে সব জড়ো হয় তাসের আড্ডায়। বেশ আছে এরা; এক একবার তার মনে হইত, সেও যদি এদের মত নির্ভাবনায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত!

সত্যব্রতকেও তারা নিজেদের আসরে নিমন্ত্রণ করিত, কিন্তু সে প্রায়ই যাইত না বটে, তবে মাঝে মাঝে গিয়া তাদের আসরে যোগ দিত।

একদিন সত্যব্রতের এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী সোৎসাহে তাহাকে উপদেশ দিল, "বাবু আপনি কেন এভাবে কষ্ট পাচ্ছেন, আমাদের মধ্যে আসুন, কোনও কষ্ট থাকবে না আপনার, একটা হাতই না হয় আপনার গেছে, কিন্তু আপনার। কাজ করবার জন্য—" বলিয়া বৃদ্ধ তাহার কাণের কাছে মুখ আনিয়া মৃদুস্বরে আরও কত কি বলিল।

সত্যব্রত চমকিয়া উঠিল, বলিল, "ছিঃ ছিঃ অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন, এ বড় অধর্ম্ম।"

বৃদ্ধ বলিল, "ছিঃ কিসে বাবু, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে যে আপনারা লাফান, ওটা তো আসলে ফাঁকিই। ভগবান কি নিজের হাতে লিখে দিয়েছেন, কোনটা ধর্ম্ম আর কোনটা অধর্ম্ম? তিনি হাত দিয়েছেন, পা দিয়েছেন করে খাবার জন্য। পেটের জন্য আমরা কাজ করে খাচ্ছি এতে ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম কি বাবু? স্বাধীন ব্যবসা, এর চেয়ে কি আর সুখ আছে?"

"আচ্ছা ভেবে দেখি" বলিয়া সত্যব্রত নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিল, বৃদ্ধ সর্দ্দারজীর কথাগুলি। বেচারা ভাবিতে লাগিল,—কি করাই বা যায়—হাতের সম্বলও তো হ'য়ে এ'ল—আচ্ছা ধর্ম্মটা কি সত্যই ফাঁকি, শুধুই কি ওটা দুর্ব্বলতা মাত্র!' আজন্ম ধর্ম্মবিশ্বাসী সত্যব্রত মুহূর্ত্তের জন্য শিহরিয়া উঠিল, পরক্ষণেই সর্দ্দারজীর কথাগুলি মাথা ঠেলিয়া উঠিল: সে ভাবিল এতে দোষই বা কি; এই যে সে এতদিন ধর্ম্ম পথে চলিয়া আসিল, তাহাতে ফল হইল কি—দুবেলা দু'মুঠা পেটের অন্ন সৎপথে থাকিয়া তো সে জুটাইতে পারিতেছে না। অনেকক্ষণ বিবেকের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে অধর্ম্মেরই জয় হইল। ভবিষ্যতের উপায় স্থির করিবার জন্য নিজের মনে ভাবিতে ভাবিতে সে কখন ঘুমাইয়া পড়িল। তাহা সে জানিতেও পারিল না।

তিন

সত্যব্রত ভাবিল, লোকের সহানুভূতি উদ্রেক করিবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় লইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা তাহার পক্ষে বোধ হয় সহজ হইবে। এতবড় বাঙ্গালা-দেশে দয়া-প্রবণ পুরুষ বা রমণীর অভাব নাই। পুরুষেরা যদিও দয়া দেখাইতে কৃপণতা করিতে পারে, তথাপি স্বভাব-কোমল জননীর জাতিরা দুঃস্থ ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি না দেখাইয়া থাকিতে পারিবে না। তাই সে ঠিক করিল দ্বিপ্রহরে যখন পুরুষেরা বাড়ীতে থাকিবে না, সেই সময়ে রমণীদের নিকট গিয়া সে বলিবে দেশ-সেবার ফল-স্বরূপে সে নির্য্যাতিত হইয়া হাত ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। এখন দেশে যাইবার গাড়ী-ভাড়া নাই—'স্বদেশী' বলিয়া আফিস অঞ্চলে সে চাকুরী জুটাইতে সে পারে নাই। এখন সাহায্য পাইলে সে দেশে চলিয়া যায়।

এইরূপ স্থির করিয়া সে একখানি খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী খরিদ করিয়া আনিল। তার পর নিজের উদ্ভাবিত জোচ্চুরী ফন্দিটা সর্দ্দারজীকে বলিল।

সকল কথা শুনিয়া বৃদ্ধ খানিকক্ষণ খুব হাসিয়া বলিল, "বাবু, তুমি স্বদেশীর জন্য জেলে গেছলে আর তোমার ডান হাতখানা ভেঙ্গে তারা তোমাকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে, একথা না হয় লোকে তোমার অবিশ্বাস করিবে না; তোমার খদ্দরের জামা কাপড়ও একথায় যেন সহায় হ'বে মানলুম, কিন্তু বাবু, এতে তোমার লাভ হ'বে কি?"

সত্যব্রত উত্তরে বলিল, "কেন আমি বলবো, আমার বৃদ্ধা মা দেশে না খেতে পেয়ে আমার জন্য ভেবে ভেবে সারা হচ্ছে, কিন্তু আমার কাছে সামান্য গাড়ী-ভাড়াটাও নেই যে, দেশে মা'র কাছেই যাই, অনুগ্রহ করে আপনারা আমাকে কিছু সাহায্য করুন এই বলবো। সর্দারজী তুমি দেখো, এই বলে লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বেশ সাহায্য চাইতে পারবো—এতে কারুর সাধ্য নেই যে আমাকে ধরতে পারবে।

বৃদ্ধ একটু ভাবিয়া বলিল, "তা এ নেহাৎ মন্দ হ'বে না।" তারপর সত্যব্রতকে 'নূতন পথের গোটা কয়েক উপদেশ দিয়া বিদায় করিল।

আজন্ম দুঃখপালিত সত্যব্রতের দিনগুলি এখন মন্দ কাটিতেছিল না। নিছক মিথ্যাকে এতটা সত্যের আবরণে ঢাকিতে তার কিছুমাত্র বিবেকে বাধিল না বরং আয়ের বৃদ্ধির সহিত উৎসাহ বাড়িয়াই চলিল, বেশ কিছু জমাও হইতে লাগিল। ধরা পড়িবার ভয়ে সে রোজ এক রাস্তায় যাইত না। ভিন্ন ভিন্ন রাস্তার বাড়ীগুলিতে ঐ একই কথা বলিয়া ভিক্ষা চাহিত।

চারি

সেদিনও সত্যব্রত এক বড় বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। দুপুর-বেলা, বাড়ীতে বোধ হয় তখন বাবুরা কেহই ছিল না, সে চারিদিকে চাহিয়া বাবুদিগের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া 'বেহারা' 'বেহারা' বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। এমন সময় বাড়ীর এক বৃদ্ধা ঝি কিসের জন্য বাহিরে আসিতেছিল, আগন্তুককে ভদ্র-সন্তান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি চাই বাবু?"

সত্যব্রত নিজের তৈরী দুঃখের কথাগুলি এক টুকরা কাগজে লিখিয়া ঝিয়ের হাতে দিয়ে বলিল, "ঝি, এই কাগজখানা মাকে দাও গে, আর বল গে যে আমি বড়ই অভাবগ্রস্ত, মা যেন সামান্য কিছু দিয়াও এই গরীব সন্তানের অভাব পূরণ করেন।"

কিছুক্ষণ পরে সত্যব্রতর চিঠির জবাব এল এক থালা-পূর্ণ নানারকম জলখাবার আর একখানি দশ টাকার নোট। ঝি সে সব তার সামনে রাখিয়া বলিল"বৌমা তোমার জন্য এই সব দিলেন।"

সে অবাক্-বিস্ময়ে ঝিয়ের মুখপানে তাকাইল। সেই মহিমময়ীর অপরিসীম দয়ায় তার সুপ্তবিবেক আজ সগর্ব্বে মাথা নাড়া দিয়ে উঠিল, 'এত দয়া কার গো, যে তার মত এমন প্রতারককে এত দয়া করেছেন।' কৃতজ্ঞতায় তার চোখদু'টা জলে ভরিয়া আসিল। বিবেকের বৃশ্চিক-দংশনে আজ তাহার মন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল—সে মরমে মরিয়া গেল—সঙ্গ-দোষে আজ তার কত দূর অধঃপতন হইয়াছে। কোন রকমে করুণাময়ী মাতার দান বলিয়া সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া নোট খানি হাতে লইয়া বাড়ীর বাইরে আসিয়া কৃতজ্ঞতপূর্ণ দৃষ্টিতে দোতালার জান্‌লার দিকে চাইতেই তার চোখে পড়িল একখানি অতি করুণ, সমবেদনা-ভরা সুন্দর মুখ। বৌটীর বয়স অল্পই, তার ব্যথা-ভরা উজ্জ্বল চোখ দু'টী সত্যব্রতের উপরই ন্যস্ত ছিল, অপরাধী সত্যব্রত সে দৃষ্টি থেকে নিজের চোখ দু'টা আস্তে আস্তে নামাইয়া লইল, তার মনে হইল ছুটিয়া গিয়া এখনই ঐ জননীর পাদু'টা ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলে, 'মাগো তোমার এত করুণার উপযুক্ত সন্তান আমি নই মা, আমি অপরাধী, তোমাকে প্রতারণা করিয়া অধর্ম্ম করেছি, মাগো আমাকে ক্ষমা কর।' কিন্তু লজ্জা আসিয়া তার সে শুভ ইচ্ছাকে বাধা দিল।

পাঁচ

সত্যব্রতের নিজের উপর অত্যন্ত ঘৃণা হইল, কিছুতেই যেন তার আর ভাল লাগিতেছিল না, শেষে সত্যই সে একদিন বহুকাল পরে নিজের দেশে চলিয়া গেল। দেশে তার আকর্ষণের কেহই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কেবল মাত্র তার বাল্যবন্ধু সুনীল ছাড়া। সুনীল তখনও তাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত।

অনেকদিন পরে সত্যব্রতকে পাইয়া সুনীল বড় খুসী হ'ল।

সত্যব্রত দেশে আসিয়া দেখিল দেশের সর্ব্ববিধ মঙ্গল-জনক কার্য্যে সুনীলই হইতেছে অগ্রণী। দেশ হইতে ম্যালেরিয়াকে তাড়াইবার জন্য সে দল বাঁধিয়া কার্য্য

করিতেছে। পুকুর-ডোবার পঙ্কোদ্ধার করিতেছে, বন-জঙ্গল কাটাইতেছে চাষা ও অনুন্নত জাতিদিগকে লেখা-পড়া শিখাইবার তাহার উৎসাহ দেখে কে? ভাল বীজ আনিয়া সে দান করিতেছে—জমীর উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্রমাগত উপদেশকে কার্য্যকর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। অনুন্নত জাতিদের ভিতর গিয়া কুপ্রথাগুলির উচ্ছেদ করিতেছে। এক কথায় দেশের লোকের নৈতিক, চারিদিকে ও সংসারিক উন্নতির জন্য সে আপনার প্রাণকে নিয়োজিত করিয়াছে।

দেশের কাজে তার অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়া সত্যব্রতের বড় আনন্দ হইল। সুনীলও বন্ধুর মনের ভাব বুঝিয়া বলিল, "তুইও চলে আয় সতু,আমাদের এ পথে, দেখবি কত আনন্দ এতে। অবশ্য তোর সংসারের জন্য আমাদের কাছ থেকে কিছু কিছু সাহায্য পাবি ভাই। তা'তে মোটা ভাতকাপড় চল্‌বে।"

সত্যব্রতের ভারাক্রান্ত মন প্রায়শ্চিত্তই করিতেই চাহিতেছিল। এই-ই সুযোগে সে ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করিল—তার স্বরচিত মিথ্যা আজ সত্যে পরিণত করিয়া দাও ভগবান সে যেন নিজ কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ নিজেকে দেশের কাজে মন-প্রাণ দিয়া উৎসর্গ করিয়া দিতে পারে। পরদিন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সত্যব্রত নিজের সমস্ত অপরাধ অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিয়া সেই অচেনা বন্ধুটীকে একখানি চিঠি লিখিল পত্রের শেষাংশে লিখিল :—

"মা করুণাময়ী মা আমার—তোমার অপরিসীম দয়াতেই নিজের অপরাধের মাত্রা বুঝিতে পারিয়াছি মা—তোমার প্রসন্ন আনন সেদিন আমাকে ইঙ্গিতে এই কথাই জানিয়ে দিয়েছিল। যদি স্বদেশ-সেবার ভাণ করে এত দয়া পেতে পারি, তখন প্রকৃত স্বদেশ সেবা করে দেখ্‌বো আমার অন্ন-কষ্টের অভাব দূর হয় কি না—অভাবের তাড়নায় আমার স্বভাব নষ্ট হ'য়েছিল মাত্র কয়েকদিনের জন্য—সেই নষ্ট-গৌরব ফিরে আন্‌বার জন্য দেবীস্বরূপিনী আমার মা'র আশীর্ব্বাদ চাই। তুমি এই অধম সন্তানের সব অপরাধ ক্ষমা করে তার এই দেশ-সেবাব্রত গ্রহণে আশীর্ব্বাদ কর মা। আমার মন বলে দিচ্ছে দেশের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করবার আগে তোমার ক্ষমা পাবই পাব।"

সেই বউটীর নাম জানা না থাকিলেও বাড়ীর ঠিকানাটী সে দেখিয়া আসিয়াছিল। খামের উপর শুধু "মা" লিখিয়া বাড়ীর ঠিকানায় চিঠিখানি পাঠাইয়া দিল।

চিঠিখানা সুলেখার হাতে যখন পৌছাইল, তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায় সে চিঠিখানি পড়িয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, "আমার এক নূতন ছেলের চিঠি এই মাত্র পেয়েছি পড়ে দেখ।"

স্বামী রণজিৎকুমার নিবিষ্ট চিত্তে একখানা বই পড়িতেছিল. চিঠিটা পড়িয়া বলিল, "দিন কতক আগে সুশীলের কাছে ঐ নামে একটা জোচ্চোরের নাম শুনে-ছিলাম বলে মনে হচ্ছে, তা ও সব পাকা জোচ্চোর, ওদের আবার দয়া করে।"

উত্তরে সুলেখা বলিল, "দেখ, আমি তো তা'কে পাকা জোচ্চোর ভেবে দান করি নি, আমি করেছিলাম সৎউদ্দেশ্যে, আমার সৎউদ্দেশ্য আমার দয়ার দানের পাত্রকে সৎপথে ফিরিয়ে এনেছে, এই কি যথেষ্ট নয়? আশীর্ব্বাদ করি সত্যব্রতের 'সত্যব্রত' নাম সফল হোক।"

সুলেখার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল—সেই হাত-ভাঙ্গা ছেলেটীর অতি করুণ মলিন মুখখানি।

———•:•:•———

সূর্য্য প্রণাম

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

* * *

ভীষণ, করাল ঘনতমিস্রা শাণিত কৃপাণে দীর্ণ করি,'
হিরণ্যপাণি, জেগে ওঠো দেব উষার ময়ূখ-মুকুট পরি' !

আজি দুর্য্যোগে, সূর্য্য তোমার,
কিরণ-ধনুতে হানো টঙ্কার—
উদয়াচলের গলিত নীহার,

শিহরি উঠিছে তোমারে স্মরি'
মেরু-তিমিরের বক্ষের মাঝে প্রথম চেতনা !—
প্রণাম করি।

* * *

ছায়াঘন কোন্ প্রদোষ-কালের প্রথম আলোর প্রতীক তুমি ;
হে রবি, তোমার জ্যোতি-সঞ্চারে, কাঁপে নৈমিষ-কানন-ভূমি !

বনে-পর্ব্বতে সোম-বল্লরী,
ক্ষণ-রোমাঞ্চে উঠিছে শিহরি' ;
গূঢ় চেতনার সৌরভে ভরি'

প্রভাতা ফুলেরা উঠে কুসুমি'—
পূর্ব্ব-তোরণে 'ভূ-র্ভুব'-প্রাণ, অরুণ তোমার চরণ চুমি।

* * *

সরস্বতীর পবিত্র নীরে পূর্ণ শঙ্খে, ধ্বনিত সাম—
সপ্ত-তুরগ-রঙ্কিতে তব চিহ্নিত 'আঁধি-বিজয়' নাম।

শ্যামলী ধরার তৃণ-পল্লবে,
অঞ্জন-ঘন স্নেহ-সৌরভে,
মৃত্তিকা হ'তে মহা-গৌরবে

ওঠে ওঙ্কার— কি অভিরাম,
পুণ্যপাবন, আদিত্যদেব, হে বিকার ভানু—লহ প্রণাম।

* * *

ভাস্কর তুমি, দেবতা জ্যেষ্ঠ, নেত্র-মণিকা তুমি সবার,
সপ্ত-সিন্ধু মেখলা-শোভিত লহ বিশ্বের নমস্কার।

মর্ম্ম-শোণিতে এ কি অনুভব,
সমিধ্ হবির দাহ-সৌরভ,
দক্ষিণ-মুখে, প্রসাদ-বিভব

উদ্ভাসি' তোলো অদিতি মা-র,
তোমারি প্রণামে ঝঙ্কৃত কত ঋষি-দেবতার সহস্রার।

———:*:*:———

আলাপ-আলোচনা

'নীল-নাগিনী দেবী'

প্রেম ও অহিংসা একদিন জগতে জয়লাভ করিবেই। গন্ধীজী বৃথায় তাঁহার নীতি প্রচার করেন নাই। ইহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসের হিল্লোলিত পোষাকে-সজ্জিত, তখনকার মত 'স্যাণ্ডাল'-দ্বারা আবৃতপদ সুন্দরী ও তরুণী একজন আমেরিকার মহিলা বোম্বাইয়ের লোকবহুল রাস্তা ত্যাগ করিয়া আবু-পর্ব্বতে গন্ধীজীর মুক্তির অপেক্ষা করিতেছেন।

* * *

ভারতবর্ষীয়ারা তাঁকে বলে 'নীল-নাগিনী দেবী'। তাঁর যথার্থ নাম 'নীলা ক্র্যাম কুক'। পার্ণাসাস্ পাহড়ে গ্রীসের রাখালদের মাঝে যিনি বসবাস করিতেছেন এবং সেখানেই যিনি লোকান্তরিত হ'ন, আমেরিকার কবি সেই ক্র্যাম কুক ছিলেন ইঁহার পিতা। ইঁহার বয়ক্রম মাত্র একুশ বৎসর। ত্যাগ, সেবা ও সন্ন্যাসধর্ম্ম-পালন-মানসে ইনি গ্রীস হইতে গন্ধীজীর আশ্রম-অভিমুখে তীর্থযাত্রা করিয়াছেন।

* * *

চতুর্দ্দশ দিবসব্যাপী উপবাস ও প্রার্থনার দ্বারা ইনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন, গন্ধীজীর যাহা আদর্শ, সেই আদর্শের সন্ধানে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ক্রম হইতে ইনি সংস্কৃত গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া আসিতেছেন। সাংসারিক জীবন কেবলই মায়া—তিনি তাই সেই জীবনধারা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

* * *

ইনি অধিকন্তু বলিয়াছেন, যে গন্ধীজী তাঁহাকে দেখিলে উপলব্ধি করিবেন যে, তাঁর আদর্শ-সম্বন্ধে তাঁহার অনুভূতি ও শ্রদ্ধা খেয়াল বা স্ত্রীসুলভ অকারণ ভক্তি বাহুল্য-প্রসূত নয়। তাঁহার জীবনের একমাত্র কাম্য ত্যাগ ও প্রেমের সনাতন পন্থা অনুকরণ করা। তিনি একথা বুঝেন যে প্রেমের, নম্রতার ও সত্যের সাহায্যে গন্ধীজী জগতে মুক্তির পথ দেখাইবেন। গন্ধীজী কোন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার নহেন। বেদের যে বাণী চিরদিন সত্য, শান্তি ও প্রেমের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছে—তিনি তাহারই শিক্ষাকে সার্থক করিতেছেন।

* * *

শ্রেষ্ঠতর ও মহত্তর জীবনের সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা স্বপ্নে ছিল, গন্ধীজীর মধ্যে তিনি তাহাকেই মূর্ত্ত দেখিতেছেন। তিনি একজন গুরু পাইবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। গন্ধীজীর ভিতর তিনি তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন। তিনি মহাত্মাজীকে চোখে না দেখিয়াই শুধু তাঁর অমৃতময়ী বাণী শুনিয়া গুরুপদে বরণ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে গন্ধীজী হইবেন তাঁহার পথপ্রদর্শক ও পিতা, তিনি হইবেন তাঁহার শিষ্যা ও কন্যা। গ্রীসে অবস্থানকালে শ্রীমতী কুক্ সেখানকার 'সিসটার্স্ অফ চ্যারিটী'দের মধ্যে এবং কৃষকদের মধ্যে বয়নের প্রচলন করাইয়াছিলেন। তিনি যখন এই কার্য্যকে দরিদ্রের মোক্ষের উপায় বলিয়া প্রচার করেন, তখন লোকে বলিয়াছিল ওই বিদ্যাকে তিনি একটী ধর্ম্মমতে দাঁড় করাইবার বাতুলতা পোষণ করেন।

* * *

সূত্র ও বয়ন-সম্বন্ধে গন্ধীজীর কি গভীর বিশ্বাস আছে তিনি তাহা অবগত। গন্ধীজীর নাম শুনিবার পূর্ব্বে হইতেই তাঁহার নিজেরও সেই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল ব্যক্তিগত অবিজ্ঞতার ফলে। ইহা সর্ব্বসাধারণকে কারখানার কবল হইতে মুক্তি দিবে এবং তাহাদের ক্রীতদাসত্ব-জনিত দরিদ্র দূর করিবে।

* * *

ভারতবর্ষের কৃষ্টিগত ঐক্য-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বেঙ্কট রমাণি

ভারতবর্ষের কৃষ্টিগত ঐক্য-সম্বন্ধে দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও কবি শ্রীযুক্ত বেঙ্কট রমাণি যাহা বলিয়াছেন তাহা অনুধাবন-যোগ্য। তিনি বলেন যে, তিনি যতই ভ্রমণ করিতেছেন হৃষীকেশ হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কৃষ্টিগত ও ভাবগত একতার বিষয় ততই তাঁহার হৃদয়ে মুদ্রিত হইতেছে। সর্ব্বস্থানের লোকের লক্ষ্য ও স্বভাব একই প্রকারের। তাহা হইতেছে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের প্রতি, বিশেষতঃ গাভী ও নদীর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা। যে বিক্ষোভ আজ ভারতবর্ষের রাজনীতিগত ঐক্যেরও গঠনপ্রয়াসী তাহার মূলে আছে কাঞ্চনের মধ্যে চুনি বসাইয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে বর্ত্তমান প্রয়োজন-অনুসারে পূর্ণ-করিয়া তুলিবার প্রবৃত্তি।

* * *

কিন্তু নূতন দিল্লীতে নূতন প্রয়াসব্রত নবজীবনের এই ছন্দের নৃত্য ও নাড়ীর স্পন্দনের পরিচয় পাওয়া যায় না। সেখানে তদুপযুক্ত পরিবেশ নাই। নূতন দিল্লী যেন বস্ত্রাবাসযোগ্য অতিশয় জাঁকজমকপূর্ণ একটী স্থানমাত্র। ভবঘুরে জীবনের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য সেখানে নাই; জরিপনবিশের মাপকাঠি তাহাকে বিশেষ পরিমাণ অনুসারে একঘেয়ে করিয়া তুলিয়াছে। ভারতীয় জীবনের বিবিধ ও বিচিত্র নমুনা ও রঙ্গের খেলা সেখানে নাই।

* * *

সেখানকার আফিস-বাড়ীর যে কাঠিন্যের কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা বাদ দিলাম। তিনি অতঃপর বলিয়াছেন, জাতির নাড়ীর সঙ্গে নূতন দিল্লীর কোন যোগ নাই। জাতীয় জীবনের শোকময় বা হর্ষোৎফুল্ল কোনো অবস্থার পরিচয়ই সেখানে পাওয়া যায় না। তিনি দিল্লীতে পঞ্চদশ দিবস ধরিয়া অনেক বাক্য শুনিয়াছেন, কিন্তু সে সব বাক্যের মধ্যে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান চাঞ্চল্যকর কোনো ভাবই ছিল না।

* * *

নূতন দিল্লী এখন কেবল রাজনীতিরই কেন্দ্র। ইহাকে ভাব ও কৃষ্টির কেন্দ্র করিতে হইবে, কারণ রাজনীতির চোরাবালির উপর কুতুবের মত কোন জিনিস গঠিত হইতে পারে না। নূতন দিল্লীতে এমন কিছু থাকা চাই যাহা অন্ততঃ সময়ে সময়ে ভারতের ও জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার ও শ্রেষ্ঠ চরিত্রের লোককে আকৃষ্ট করিবে। যমুনাকে নগরীর মধ্য দিয়া বহাইতে হইবে, আর উহার কূলে থাকিবে ব্যাঙ্ক, গ্রন্থাগার, সঙ্গীতালয়, নাট্যমন্দির এবং সাধারণের মেলামেশার আনন্দজনক প্রতিষ্ঠান। জানি না শ্রীযুক্ত বেঙ্কটরমাণির নূতন দিল্লীকে আকর্ষণীয় করিবার কামনা সফল হইবে কি না। যদি হয় তো বহুবৎসর এখনও বিলম্ব আছে এমন ভবিষ্যদ্বাণী আমরা নির্ভয়ে করিতে পারি।

* * *

প্রথম ভারতীয় রমণী ডি-পি-এইচ (লণ্ডন)

বোম্বাই শহরের মিউনিসিপ্যাল মাতৃমন্দিরের প্রধান কর্ম্মচারী ডাঃ হাজেল মাচাদো, এম-বি, বি-এস, ডি-পি-এইচ (লণ্ডন) সেখান হইতে সাধারণ স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিপ্লোমা ও উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। রমনী ডাক্তারদের ভিতর তিনিই সর্ব্বাগ্রে এই প্রশংসার্হ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আশা করি নূতন অভিজ্ঞতার সহিত মাতৃমন্দিরের কর্ম্ম তিনি সুচারুরূপে চালাইতে পারিবেন। ঐ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। এখনও এদেশে অশিক্ষিতা ধাত্রীদের জন্য প্রসূতি ও জাতকের যে কত বিষাদ ঘটিতেছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। অবশ্য তাহারও কারণ কতকটা অর্থের অনাটন।

চৈনিক কবির শোচনীয় মৃত্যু

চীনের কবি-সম্রাট্ সু-সি-মউএর অপঘাতে মৃত্যু ঘটিয়াছে। চীনদেশের সাহিত্যে যে নব-জাগরণ দেখা দিয়াছে, তিনি ছিলেন তার অন্যতম নেতা। ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদপত্র হইতে জানা যায়, যখন তিনি আকাশ-পথে পিকিং অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন স্যাণ্টুং প্রদেশে যন্ত্রখানি হঠাৎ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

তাহাতেই তিনিও ভস্মীভূত হন। তাঁহার চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল মাত্র ৩৪ বৎসর।

এই অল্পদিনের ভিতর জাতীয়-জীবন-গঠনে তিনি যে সহায়তা করিয়াছেন তাহা চিরদিন চীনারা স্মরণ করিয়া রাখিবে। তিনি প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাঃ পু-সিনএর অধিনায়কত্বে সাহিত্যে নূতন পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক প্রসিদ্ধ-ছাত্র। তিনি জগতের রত্নের সন্ধান পাইয়া অনুবাদ করিয়া সেই সকল তাহার দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত করিতেছিলেন। সেক্সপীয়রের অনেকগুলি অমর নাটকের তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার আরব্ধ কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

* * *

তিনি টমাস হার্ডি, ভলটেয়ার ও ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অনেকাংশ অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাব্যগুলির আদর জগতের অন্যদেশের মনীষীরাও অনেক সময় করিয়াছেন তাহার 'কবিতাবলী' 'ফ্লোরেন্সে এক রাত্রি' 'ভীষণ ব্যাঘ্র' প্রভৃতি কাব্য চীনাভাষাতেই পণ্ডিতেরা একবাক্যে সুখ্যাতি করিয়া থাকেন।

চিকিয়াং প্রদেশে কবি সু জন্ম গ্রহণ করিয়া সাংহাই ও পিকিংএ বিদ্যালাভ করিয়া যুক্তরাজ্যে জ্ঞানের অন্বেষণে গমন করেন। সেখানে উপাধি প্রাপ্তির পর কেম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য যান। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহাকে'ব্যাঙ্কিং'-শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন যাহাতে তিনি ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া ব্যাঙ্কের কার্য্য পাশ্চাত্য-পদ্ধতিতে সুচারুরূপে চালাইতে পারেন। কিন্তু কবির প্রাণে সে অনুরোধ কিছুমাত্র কার্য্যকর হয় নাই। কেম্ব্রিজে এক বৎসর সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন।

পৃথিবীর বহুদেশ তিনি ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। মানব-চরিত্রে তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল, তিনি চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করিয়াও যোগ্য যশস্বী হইয়াছিলেন। তাহার জ্ঞানগর্ভ কবিতা ও প্রবন্ধাদি চীন-দেশের সাহিত্য বিষয়ক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইত।

* * *

'জয়শ্রী'-পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ

মাসিক 'জয়শ্রী'-পত্রিকার কুমারী লীলাবতী নাগ ও কুমারী রেণুকা সেন সম্পাদিকাদ্বয়ের নিকট হইতে পত্রিকা-প্রকাশের জন্য জামিন চাওয়ায় পত্রখানি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি ঢাকা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট জামিনের আদেশ প্রত্যাহার করায় পুনরায় শীঘ্র পত্রিকা প্রকাশিত হইবে: কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্পাদিকারা উভয়ে অর্ডিন্যান্সের আসামী স্বরূপে সুরী জেলে আবদ্ধ আছেন সেখান হইতে পত্রিকা-সম্পাদন ব্যাপার সহজ হইবে কি?

* * *

অকাশপথে রবীন্দ্রনাথ

গত ২১ ফেব্রুয়ারী কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ডাচ দেশের এ. কন ডাইক-এর 'প্লেনে' ২০ মিনিট আকাশপথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন ডাচ কন্সাল ও তাঁহার পত্নী। এতদিন কবি মানস-লোকে বিচরণ করিয়া কতক নূতন তথ্যের সন্ধানই না দিয়া আসিয়াছেন, এখন এই বৃদ্ধ বয়সে আকাশপথে যাত্রা করিয়া তিনি যে সাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহার প্রসংশা না করিয়া থাকা যায় না। ইহার পূর্ব্বে তিনি একবার ব্রুসেল হইতে প্যারিসে আকাশমার্গে গিয়াছিলেন। সেই সময় স্বীয় ঘটনা স্মরণ করিয়া শিল্পী ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ যে অনিন্দ্যসুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহার কথা আমরা পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। শীঘ্রই তিনি পারস্যরাজ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া পারস্যে আকাশপথেই গমন করিবেন, ভগবান তাঁহার যাত্রা-পথ সুগম করিয়া দিন।

* * *

বেথুন-কলেজের লেডী-প্রিন্সিপ্যালের কার্য্য

গত ২৯শে জানুয়ারী বেথুন কলেজের কয়েকজন ছাত্রীর বিদ্যালয়ে উপস্থিত না হইবার কারণ লেডী-প্রিন্সিপ্যাল শ্রীমতী রাজকুমারী দাস এম এ, মহোদয় জিজ্ঞাসা করায় না কি একজন ছাত্রী উত্তর দিয়াছিল 'হরতাল বলিয়া

আমরা আসিতে পারি নাই।' ইহার জন্যই নাকি ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহাকে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয় হয়। ঐ ছাত্রীর প্রতি সমবেদনা দেখাইবার জন্য ছাত্রীরা মিলিত হইয়া ঠিক করে যে, অধ্যক্ষ মহাশয়ার নিকট তাহারা অনুরোধ করিবে যেন তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে এবারের মত সতর্ক হইতে আদেশ করেন ও তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এ কার্য্যে স্বীকৃত না হইয়া যে সকল সর্ত্ত দেন তাহাতে ছাত্রীরা রাজী হইতে পারে নাই, ফলে বহু ছাত্রী তাঁহার এই আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে শ্রীমতী দাস বহু ছাত্রীকেই বিদ্যালয় হইতে নাম কাটিয়া দেন। ইহার ফলে সারা কলিকাতা শহরে বেশ কয়েকদিন চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল। সংবাদপত্রের মারফতে জানিতে পারা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রদ্ধেয় যদুনাথ সরকার মহাশয় কোন এক বিতাড়িত ছাত্রীর জন্য দেখা করিতে গিয়াও তাঁহার সহিত দেখা করিতে অনুমতি পান নাই।

* * *

অবশ্য অনুমতি না দেওয়া যে কোনরূপ দোষের কার্য্য তাহা বলি না। শিক্ষা বিষয়ে যদুবাবু তাঁহার অপেক্ষা অধিক দিন ব্যাপৃত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার রূপেও তিনি ছাত্রদিগের সহিত অনেকদিন কার্য্য করিয়াছেন, এখন তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করিলে বোধ হয় কোনরূপ ক্ষতি হইত না, বরং দাস মহাশয়া যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার একটা সরল পথ দেখিতে পাইতেন। যাহা হউক তাহার পর ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। ফলে 'ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক ইনষ্ট্রাকসনের' উপর তদন্তের ভার পড়িল। বিশ্ববিদ্যালয়েও এ বিষয়ে আলোচনা হইল। এ দিকে বালিকদিগকে বিনাসর্ত্তে ট্রান্সফার পত্র-দেওয়ায় গোলোযোগের মীমাংসা হইয়া গেল।

* * *

আমরা এই মীমাংসা-ব্যাপারে বাস্তবিকই সুখী হইয়াছি। ... শিক্ষয়িত্রী প্রিন্সিপ্যাল দাসের কার্য্যকলাপে সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। যদি পূর্ব্ব হইতেই তিনি একটু সাবধানতার সহিত কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে এতদূর গড়াইত না। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি তাহাদের পিতৃ-মাতৃতুল্য অধ্যাপকদিগের প্রতি রুষ্ট হয় তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে না যে উভয়ের ভিতর প্রীতির বন্ধন যে কোনও কারণে শিথিল হইয়াছে? একটু সহানুভূতি দেখাইলে কত অল্প সময়ের মধ্যে গোলযোগ মিটিয়া যাইত। একদিন ছাত্রীরা না আসায় যত তাহাদের ক্ষতি হইয়াছিল বহুদিন বিদ্যালয়ে না আসায় তাহাদের কি অধিক ক্ষতি নাই? যে সকল শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদিগকে আপন পুত্র কন্যার ন্যায় ব্যবহার করিতে না পারেন তাঁহাদের এই গুরু-দায়িত্বপূর্ণ ব্রত গ্রহণ না করাই উচিত। হরতালে যোগদান কোনরূপে সমর্থন-যোগ্য নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতিতে যোগদান করা উচিত একথা আমরা কোন মতে কোন ক্ষেত্রেই স্বীকার করি না, তথাপি বলিতে বাধ্য যদি কোন বিশেষ কারণে চিত্তের সরসতার দরুণ কিংবা ভাবপ্রবণ বলিয়া তাহারা যদি বিদ্যালয়ে একদিন নাই বা থাকে তাহা হইলে তাহাদের সেই পিতামাতার ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা কি উচিত নয়। পিতা মাতার অপেক্ষা অধিকতর দরদ দেখাইতে গেলে বাংলা-দেশের সর্ব্বজনবিদিত প্রবচনের কথাই মনে পড়িয়া যায়।

* * *

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, এই সকল ছাত্রীকে যদি ভালবাসিয়া অধ্যক্ষ মহাশয়া আপন করিয়া লইতে পারিতেন, তাহা হইলে বুঝিতাম তিনি একজন প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী—তাহাদের দোষ বা ত্রুটি-বিচ্যুতির যদি সংশোধন করিতে পারিতেন তাহা হইলে শুধু ছাত্রীদের নয় বা তাহাদের অভিভাবকদের নয়—সমগ্র দেশের মঙ্গল-সাধন করিতে পারিতেন। 'ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকশান' মহাশয়ের মধ্যস্থতায় যদি ছাত্রীদের ও শ্রীমতী দাসের মনোমালিন্য দূর হইয়া সদ্ভাব স্থাপিত হইত তাহা হইলে, তর্কস্থলে ধরিয়া লইয়া ভ্রান্ত ছাত্রীদিগের চরিত্র সংশোধনও হইতে পারিত। এক্ষেত্রে অধ্যক্ষ মহাশয়া আপনার জেদ বজায় রাখিলেন সত্য, কিন্তু বাঙ্গালার ছাত্রীদের হৃদয় জয় করিতে পারিলেন না।

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ কর্তৃক বিশ্বভাণ্ডার প্রেস, ২১৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত
পঞ্চপুষ্প-কার্য্যালয়, ৩১ভেলিপাড়া লেন, কলিকাতা হইতে [illegible] প্রকাশিত।

সৰ্ব্বহারা

PRINTING WORKS. CAL.
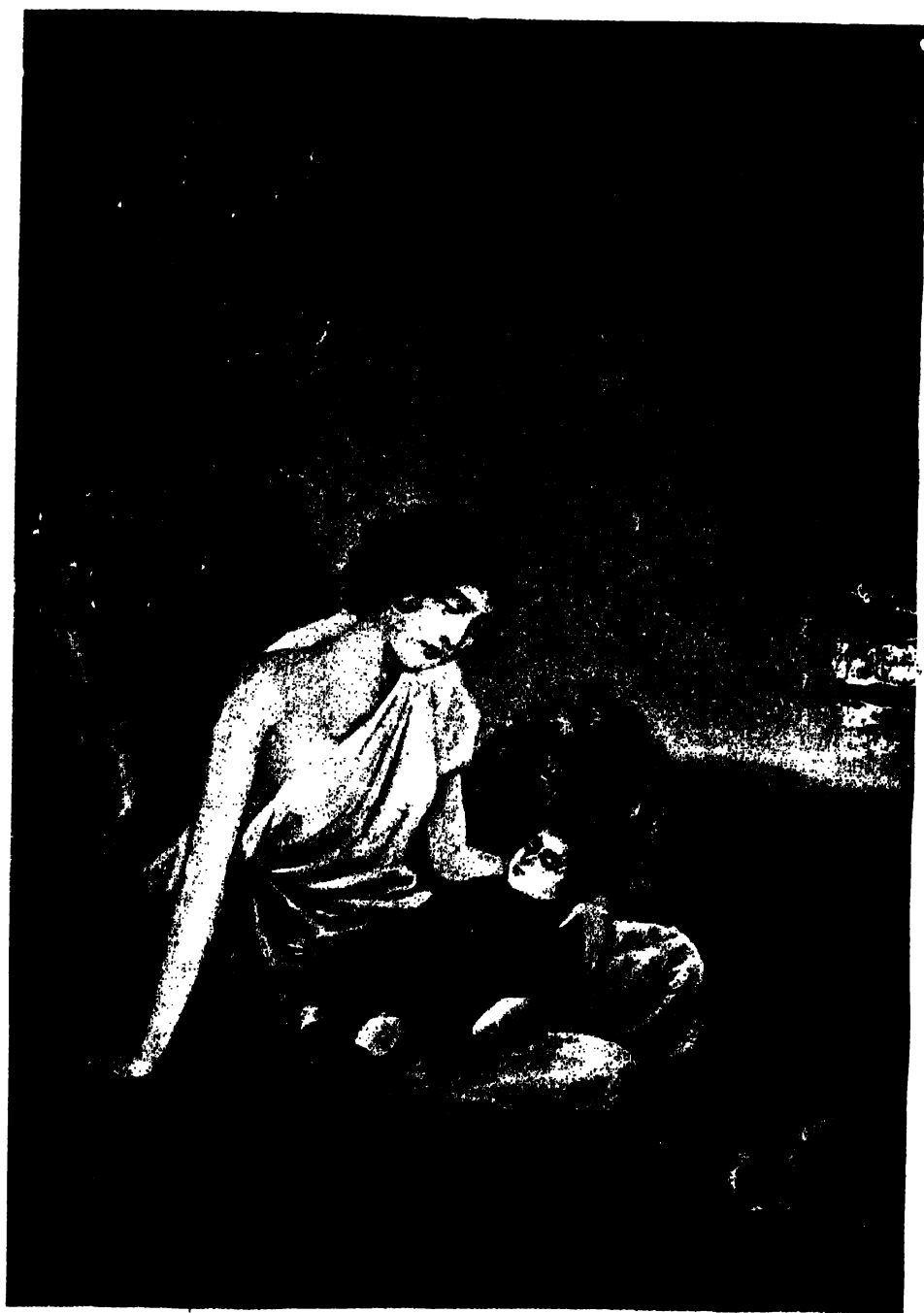
চতুর্থ বর্ষ
দ্বিতীয়ার্দ্ধ

চৈত্র, ১৩৩৮

ষষ্ঠ সংখ্যা

বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর রাজ্য-সংস্থাপন

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

'ঘরমুখো বাঙ্গালী' বলিয়া বাঙ্গালায় একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। জানি না কোন সময়ে এবং কি কারণে এই প্রবাদের উৎপত্তি। ইতিহাস কিন্তু ইহার বিপরীত সাক্ষ্যই প্রদান করিতেছে। বাঙ্গলাদেশ নদীমাতৃক এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী। সমুদ্রতীরের অধিবাসিগণ যে নৌবিদ্যা-বিশারদ হইবে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। বাঙ্গালীর পক্ষে এই সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। বাঙ্গালী যে অতি প্রাচীনকালে সমুদ্রে যাতায়াত করিত তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বাঙ্গলার প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্ত। বাঙ্গালী যে ধর্ম্মপ্রচার, বাণিজ্য এবং বিজয়-অভিযানের জন্য প্রধানতঃ সমুদ্রযাত্রা করিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কালিদাস বাঙ্গালীগণকে 'নৌসাধনোদ্যত' বলিয়া গিয়াছেন। ফরিদপুর জেলার ঘুঘরাহাটিতে প্রাপ্ত ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রদত্ত মহারাজ ধর্ম্মাদিত্যের তাম্রশাসনে 'নাবাতাক্ষেণি' ও 'নৌদণ্ড'-শব্দের ব্যবহার দ্বারা ঐ স্থানে জাহাজ নির্ম্মিত হইত এবং বন্দর বা পোতাধিষ্ঠান ছিল তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। মৌখরি-রাজ ঈশান বর্ম্মা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত ষষ্ঠ শতাব্দীর হরাহা-লিপিতে গৌড়বাসিগণকে 'সমুদ্রাশ্রয়ান্' অর্থাৎ সমুদ্রতীরবাসী বলা হইয়াছে। মুসলমান-রাজত্বকালেও দেখিতে পাই বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপাধিপতি (বর্ত্তমান বরিশাল, ফরিদপুর ও খুলনা) মহারাজা পরমানন্দ রায় ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত স্বাধীন রাজার ন্যায় সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতেছেন। এই সন্ধির একটী সর্ত্ত এই যে, পর্ত্তুগীজগণ আর বাণিজ্যের জন্য চট্টগ্রাম যাইবে না। বাক্‌লার উপকূলেই তাহাদের বাণিজ্য আবদ্ধ থাকিবে এবং বাক্‌লাবাসিগণ পর্ত্তুগীজদিগের অনুমতি-পত্র লইয়া গোয়া এবং ভারত-সমুদ্রের অর্মাস ও মলক্কায় বাণিজ্য করিতে যাইতে পারিবে। বেশীদিনের কথা নহে,

ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম ভাগে (১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে) বরিশাল জেলার ঝালকাঠী বন্দরের অপর তীরস্থ মদিপুর বন্দরে ৬০০ টন অর্থাৎ ১৬৮০ মণ বোঝাই হইতে পারে এরূপ জাহাজ প্রস্তুত ও বোঝাই হইয়া সমুদ্রে বাণিজ্য করিতে গিয়াছে। এই মদিপুরে পূর্ব্ববঙ্গের নাওয়ারা-মহলের নৌকা প্রস্তুত ও মেরামত হইত। ক্ষেমানন্দ দাস-বিরচিত 'মনসার ভাসান'এ বাঙ্গালা নাবিকগণের উল্লেখ আছে। নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের লস্করগণ এখন বিলাতী জাহাজে কার্য্য করিয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ সমুদ্রযাত্রা করে মনু তাহাকে হব্যকব্যে নিমন্ত্রণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন—(৩য় অধ্যায়, ১৫৮ শ্লোক)। যেখানে মনু 'সমুদ্রযায়ী' লিখিয়াছেন, মহাভারত সেইখানে 'সামুদ্রিক' অর্থাৎ পদ ও করতলাদির রেখা বিচার দ্বারা যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে তাহাদিগকেই অপাংক্তেয় বলিয়াছেন (অনুশাসনপর্ব্ব, ৯০ অধ্যায়)।

সমুদ্রযাত্রা-সম্বন্ধে স্মৃতি কিংবা পুরাণের নিষেধবিধি যে অন্ততঃ বাঙ্গালাদেশে প্রতিপালিত হইত না তাহার প্রমাণ চাঁদসদাগর ইত্যাদির বাণিজ্যার্থ সিংহল ইত্যাদি দেশে গমনাগমন। বঙ্গদেশীয় সওদাগরগণ যে দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে বাণিজ্য করিতে যাইত তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সীমোগ জেলাস্থ সিকারপুর তালুকে প্রাপ্ত ১১৮১ খৃষ্টাব্দের একখানি লিপিতে দেখিতে পাই লাল (রাঢ় ?), গৌল (গৌড়), কর্ণাট, বঙ্গাল, কাশ্মীর প্রভৃতি নানাদেশের গ্রাম, নগর ইত্যাদি হইতে আগত সম্ভ্রান্ত বণিক্‌গণ তথায় বাস করিতেছেন।

কত প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গবাসিগণ অন্যদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ডাক্তার পঞ্চানন মিত্র লিখিয়াছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরস্থ পলিনেসিয়ার অধিবাসিগণের চেহারার সহিত বাঙ্গালীর চেহারার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। হাওয়াই ও নিউ-জিলাণ্ডের রাজপথে তাঁহাকে অনেকে পলিনেসিয়ান্ বলিয়া ভুল করিত। নিউ-জিলাণ্ডের প্রধান খাদ্যের মধ্যে কলা একটী। তিনি মনে করেন এই কলাগাছ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নীত হইয়াছে। তাহাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীর মধ্যে শূকর ও মুরগী। ডাক্তার মিত্র মনে করেন, ইহা পূর্ব্ব-ভারত অথবা ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকিবে। পৃথিবী-সম্বন্ধে তাহাদের প্রাচীন বিশ্বাস ঋগ্বেদের নাসত্যসূক্ত ও ও শূন্যপুরাণের অনুরূপ।

নবম শতাব্দীতে জনপদবাসী হিরণ্যদাম নামক এক ব্রাহ্মণ কাম্বোডিয়াতে তন্ত্র প্রচার করেন। ডাক্তার বিজন-রাজ চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন, হিরণ্যদাম কর্ত্তৃক প্রচারিত তন্ত্রগুলি বাঙ্গালার বিশিষ্ট তন্ত্র। জৈন ভগবতীসূত্রানুসারে বঙ্গ ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে দামপদবীবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল কারণে হিরণ্যদামকে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ মনে করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন নবম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বহু বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের বহুস্থানে বাসস্থান করিয়াছেন দেখিতে পাই। তাহাদিগকে যে তদ্দেশীয় রাজগণ ভূমিদানে সম্মানিত করিয়াছেন, তাহা তাহাদের প্রদত্ত তাম্রশাসনাদি হইতে জানা যায়। ইঁহাদের মধ্যে একজনের—বিশ্বেশ্বর শিবাচার্য্যের কীর্ত্তিকথা আমরা গত মাঘ মাসের পঞ্চপুষ্পে প্রকাশ করিয়াছি।

আমরা এখন বাঙ্গালার বাহিরে কয়েকটী বাঙ্গালীর রাজ্য-সংস্থাপনের কথা বলিব।—

বিজয় সিংহ

বাঙ্গালী রাজপুত্র * বিজয়সিংহ যে সিংহল-বিজয় করিয়া তথায় রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই জানেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না।

মহাবলি বা বাণরাজবংশ

ইঁহারা মহীশূর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে দশম শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত এই বংশের প্রাচীনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন গঙ্গ, কদম্ব ও চোল রাজবংশের দ্বিতীয় শতাব্দীর লিপিতেও এই রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা বলি বা মহা-বলির পুত্র বাণের বংশধর বলিয়া পরিচিত। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে,যযাতির পুত্র অণুর বংশে অসুর বলি পূর্ব্বদেশীয় রাজা হেমের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা বলি চাতুর্ব্বর্ণস্থাপক অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামে পাঁচটী ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করেন। তাঁহার পুত্রগণের নামানুসারে

* বিজয়-সিংহ যে বাঙ্গালী এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।
—পঞ্চপুষ্প-সম্পাদক

পাঁচটী সুসমৃদ্ধ জনপদ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আবার বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, বলিপুত্র বাণের রাজধানী ছিল শোণিতপুরে। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর দেখাইয়াছেন যে, হেমচন্দ্রের অভিধান-চিন্তামণিতে বাণপুরের অন্য নাম—শোণিতপুর, দেবীকোট, কোটীবর্ষ ও উষাবন। দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে বাণরাজার বাড়ী ছিল বলিয়া প্রবাদ। এই বাণগড় দেবীকোট নামেও পরিচিত। দামোদরপুরে প্রাপ্ত পঞ্চম শতাব্দীর তাম্রশাসনে কোটীবর্ষের উল্লেখ পাই। সুতরাং নানা প্রমাণেই দেখা যাইতেছে যে, বলির ও বাণের রাজ্য ও রাজধানী বঙ্গদেশেই ছিল। এই বাণের বংশধর কেহ কোন কারণে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ ভারতে প্রথম শতাব্দী কিংবা তৎপূর্ব্বে রাজ্যস্থাপন করিয়া থাকিবে। সেখানে গিয়াও ইহারা রাজধানী দেবীকোটের নাম বলিতে পারে নাই। মান্দ্রাজ উপকূলে কোলারুণ নদীর মোহানায় দেবীকোট তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

গঙ্গ-রাজবংশ

ঐতিহাসিকগণ গঙ্গরাজবংশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য। পাশ্চাত্যগণ মহীশূর, কুর্গ, উত্তর আর্কট, তাঞ্জোর ও বেলগম অঞ্চলে এবং প্রাচ্যগণ কলিঙ্গ ও উড়িষ্যায় রাজত্ব করিতেন। পাশ্চাত্য গঙ্গরাজগণ ইক্ষ্বাকুবংশীয় এবং কাণ্বায়ন-গোত্রীয় এবং প্রাচ্যগণ তুর্ব্বসু-বংশীয় ও আত্রেয়-গোত্রীয় বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্যগণ বলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভরত রাজার রাজ্ঞী বিজয়মহাদেবী গর্ভাবস্থায় গঙ্গাস্নান করিয়া গঙ্গাদত্ত নামে পুত্রলাভ করেন। এই গঙ্গাদত্তের বংশীয়গণই গাঙ্গবংশ নামে খ্যাত হন। গঙ্গাদত্তের পুত্র বিষ্ণুগুপ্ত। ইঁহার দুই পুত্র শ্রীদত্ত ও ভগদত্ত। শ্রীদত্ত পৈতৃক রাজ্য এবং ভগদত্ত কলিঙ্গ রাজ্য প্রাপ্ত হন। শ্রীদত্তের বংশে পদ্মনাভ উজ্জয়িনীরাজ মহীপাল-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তাঁহার পুত্রদ্বয় দড়িগ ও মাধব (কাঙ্গনিবর্ম্মা) দক্ষিণে গিয়া জৈনাচার্য্য সিংহনন্দীর সাহায্যে দ্বিতীয় শতাব্দীতে গঙ্গাবাদী নামক রাজ্য কুবলাল নামক রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহারা বাণরাজগণকে পরাভব করেন এবং কোঙ্কনদেশ জয় করেন। ইঁহারা দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন।

প্রাচ্যগঙ্গগণ বলেন, যযাতির পুত্র তুর্ব্বসু গঙ্গার আরাধনা করিয়া গাঙ্গেয় নামে পুত্র লাভ করেন। এই গাঙ্গেয় হইতেই 'গঙ্গান্বয়'-বংশ নামের উৎপত্তি। গাঙ্গেয়ের বংশে কোলাহল গঙ্গাবাদী রাজ্যে কোলাহলপুরী স্থাপন করেন। কোলাহলের বংশে বীরসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। বীরসিংহের পঞ্চপুত্র—কামার্ণব, দানার্ণব, গুণার্ণব, মারসিংহ ও বজ্রহস্ত কামার্ণব পিতৃব্যকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া গঙ্গাবাদী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে আসিয়া মহেন্দ্রগিরিতে উপস্থিত হ'ন। এই স্থানে গোকর্ণ স্বামীর আরাধনা করিয়া কলিঙ্গ রাজ্য লাভ করেন। ইঁহারা পঞ্চম শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। প্রাচ্যগঙ্গগণ একটী সংবৎ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিকগণ ইহার নাম দিয়াছেন 'গাঙ্গেয় সংবৎ'। আমরা ইহার আরম্ভকাল ৪৯৪ খৃষ্টাব্দ অবধারণ করিয়াছি।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদিগের খৃঃ পূঃ চতুর্থ হইতে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে লিখিত বিবরণে গঙ্গ-জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা গঙ্গরিডি প্রদেশ-বাসী ছিল। টলেমীর ম্যাপে গঙ্গরিডির অবস্থান গঙ্গার মোহানার নিকট দেখান হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, গ্রীকগণ গঙ্গারাঢ়কে গঙ্গরিডি করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার এই দেশকে গঙ্গ-কলিঙ্গও বলিয়াছেন। দক্ষিণ বিহার হইতে আরম্ভ করিয়া এই দেশ সুন্দরবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেণ্ট মার্টিন বলেন, দক্ষিণ বিহারের গঙ্গ্রী, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গঙ্গয়ী এবং পূর্ব্ব-বঙ্গের গঙ্গার জাতি, এক গঙ্গ জাতিরই বিভিন্ন নাম। শ্রীযুক্ত সুব্বারাও বলেন যে, গঙ্গগণ গঙ্গাতীরবাসী ছিল বলিয়া ইহারা 'গঙ্গ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা বাঙ্গালা ও বিহারের গাঙ্গেয় প্রদেশে বাস করিত, পরে ক্রমে ক্রমে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত ইহাদের উপনিবেশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা যখন দক্ষিণ ভারতে যাইয়া রাজ্য-স্থাপন করিল, তখন ইহারা ইহাদের নূতন রাজ্য ও রাজধানীর নামকরণ পুরাতনের নামেই করিয়াছিল। বাস্তবিকপক্ষে উভয় দলের বিবরণেই দেখিতে পাই ইহারা গাঙ্গেয় প্রদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। রাজধানীর নামেও সাদৃশ্য রহিয়াছে। আমাদের মনে হয় ভাগলপুর জেলার কোহলগাঁওই (ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের লুপ-লাইনস্থ কলগঙ ষ্টেশন প্রাচীন কুবলাল বা কোলাহল-

পুর। এই স্থানে এখনও একটী প্রাচীন শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। এই স্থান গঙ্গাতীরে রাঢ়ের প্রান্তে অবস্থিত। মোগলদিগের সময়েও এই স্থানকে বাঙ্গালায় প্রবেশের দ্বার স্বরূপ মনে করা হইত। ইহার নিকটস্থ তেলিয়াগড় বা গঢ়িকে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ সিন্ধুতীরস্থ সাহওয়ান দুর্গের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সাহওয়ান দুর্গ যেমন সিন্ধু-প্রদেশের প্রবেশদ্বার স্বরূপ, গঢ়ও তদ্রূপ বঙ্গের প্রবেশদ্বার স্বরূপ ছিল।

চিদি বিলাস গ্রামে প্রাপ্ত ৩৯৭ গঙ্গ-সংবতে (৮৯৩ খৃঃঅঃ) প্রদত্ত পাশ্চাত্য গঙ্গ মহারাজ দেবেন্দ্র বর্ম্মণের তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, তিনি ভরদ্বাজ-গোত্রীয় বেদবেদাঙ্গবেদী-শ্রুতি স্মৃত্যুদিত ধর্ম্মজ্ঞ আদিত্য ভট্ট, যজ্ঞভট্ট ও খণ্ডিদেব ভট্ট প্রমুখ কয়েকজন বঙ্গজ ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় গঙ্গরাজগণের সুবর্ণমুদ্রাগুলিকে 'বঙ্গ-পরকলু' বলা হইয়া থাকে। এই মুদ্রাগুলি বেগুণ-বিচির ন্যায় ক্ষুদ্র। 'গঙ্গ' স্থলে সম্ভবতঃ ছাপার ভুলে 'বঙ্গ' হইয়াছে প্রথমতঃ এইরূপ মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু যখন দুই জায়গাই বড় 'ইটালিক' অক্ষরে 'বঙ্গ-পরকলু' পাইতেছি, তখন আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কদেব

কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কদেবের কথা অনেকেই জানেন। মাদ্রাজ-প্রদেশের গঞ্জাম জেলায় মহারাজ শশাঙ্কদেবের মহাসামন্ত সৈন্যভীত মাধবরাজের ৩০০ গুপ্তাব্দে (৬১৯খৃঃঅঃ) প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে উৎকল ও কলিঙ্গদেশ শশাঙ্কদেবের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটীই মহারাজ শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণ। রাঢ় প্রদেশ যে কর্ণ-সুবর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার অন্য প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। বপ্পঘোষবাটক-তাম্র-শাসন নামে পরিচিত ষষ্ঠ শতাব্দীর তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় মহারাজাধিরাজ—পরম-ভাগবত শ্রীজয়নাগের কর্ণসুবর্ণবাসকে অবস্থানকালে ঔদম্বরিক বিষয়ের সামন্ত নারায়ণভদ্র ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামীকে বপ্পঘোষবাটক নামক গ্রাম দান করিতেছেন। এই শাসন-খানি মালিয়া গ্রামস্থ নীলকুঠির প্রজাগণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনের সম্পাদক বার্ণেট সাহেব মালিয়া গ্রামের অবস্থাননির্ণয় করিতে না পারিয়া প্রদত্ত-গ্রামের নামানুসারে 'বপ্পঘোষবাটক-তাম্রশাসন' নাম দিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি এই মালিয়া গ্রাম হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানার অধীনস্থ একটী গ্রাম। পূর্ব্বে এই স্থানে একটী নীলকুঠি ছিল। এই সিঙ্গুরকে অনেকে বিজয় সিংহের পৈতৃক রাজধানী সিংহপুর মনে করেন; সুতরাং এই সিঙ্গুর অতীব প্রাচীন স্থান সন্দেহ নাই। ইহার সন্নিকটস্থ মালিয়া গ্রামে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। এই স্থান কর্ণসুবর্ণ হইতে বহুদূরে হইলে এই তাম্রশাসন ওরূপভাবে কর্ণসুবর্ণের নাম উল্লেখ করার সার্থকতা দেখা যায় না। ঔদুম্বর বিষয় যে আইন-ই-আক-বরিতে উল্লিখিত সরকার উদুম্বর তদ্বিষয়েও সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে কর্ণ-সুবর্ণ রাজধানী রাঢ় প্রদেশেই অবস্থিত ছিল।

মহারাজ শশাঙ্কের পরে তাঁহার রাজ্য হর্ষবর্দ্ধনের হস্তগত হয়। আবার হর্ষবর্দ্ধনের পরে কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্ম্মণকে কর্ণসুবর্ণের অধিপতিরূপে দেখিতে পাই। ইহার পরে ভগদত্ত-বংশীয় রাজা শ্রীহর্ষদেবকে 'গৌড়োড্রাদিকলিঙ্গ কোসলাধিপতি' রূপে দেখিতে পাই। ইঁহাকে কেহ কেহ কামরূপরাজ শালস্তম্ভ-বংশীয় শ্রীহর্ষ মনে করেন। ভগদত্ত-বংশীয়দিগের প্রধান রাজ্য কামরূপ, সুতরাং কামরূপের নাম উল্লেখ না করায় ইঁহাকে কামরূপরাজ মনে করিতে দ্বিধা উপস্থিত হইতেছে। আমরা উপরে দেখিয়াছি গঙ্গ-রাজবংশেও কলিঙ্গের রাজা একজন ভগদত্ত ছিল; কিন্তু ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ঐ শ্রীহর্ষ ভৌম ভগদত্তের বংশ হইলেও হইতে পারে; কেন না ইহার পরেই আমরা উড়িষ্যায় ভৌমকর-বংশকে রাজত্ব করিতে দেখিতে পাই।

উড়িষ্যার স্তম্ভবংশকে ও কামরূপের শালস্তম্ভ, বিগ্রহ স্তম্ভাদির বংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া সন্দেহ হয়। কামরূপের স্তম্ভ-বংশ আপনাদিগকে ম্লেচ্ছ ও ভৌম উভয়ই বলিয়াছে, কিন্তু ইহাদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কামরূপের ভৌম-পাল বংশ ইহাদিগকে ম্লেচ্ছই বলিয়াছে—ভৌম

বলিয়া স্বীকার করে নাই। উড়িষ্যায় স্তম্ভ-বংশ আপনাদিগকে 'শূল্কিকাংশ-বংশ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। ৺রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,এই শূল্কিক ও মৌখরিরাজ ঈশান বর্ম্মণের ষষ্ঠশতাব্দীর হরাহা-শাসনের শূলক একই বংশ, কারণ এই উভয় বংশকে একই স্থানে দেখা যাইতেছে। ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এই শূল্কাকে চালুক্যের অপভ্রংশ মনে করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুও এই মত পোষণ করেন। আবার ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বাগচী দেখাইয়াছেন যে, সাহপুর জেলায় এক শ্রেণীর কৃষক সুল্কী নামে পরিচিত। তিনি বলেন যে শূলিক ও চুলিক একই শব্দের বিভিন্ন রূপ। তিনি দেখাইয়াছেন, মহাভারতে চুলিক, তুষার, যবন ও শকগণ এক সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। মৎস্য ও বায়ু-পুরাণে লিখিত আছে ইহারা কলিকালে ভারতে রাজত্ব করিবে। মৎস্য-পুরাণের মতে ইহাদের বাসস্থান চক্ষু-প্রবাহিত দেশে, বায়ুপুরাণের মতে ইহারা উত্তরদেশবাসী, আবার বৃহৎসংহিতার মতে ইহাদের বাস উত্তর-পূর্ব্বে। চরকে ইহারা বাহ্লিক, পহ্লব, চীন, যবন ও শকদিগের একত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে ইহাদিগকে লম্পাক, কিরাত ও কাশ্মীরবাসীদিগের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছে। ডাক্তার বাগচী এই সব এবং অন্য কতকগুলি কারণে সোগ্ডিয়ানাবাসী বলিয়া মনে করেন। তারানাথ বলিয়াছেন, শূলিক দেশ তোগরের (তুখার ?) অপর প্রান্তে অবস্থিত। যাহা হউক ইহারা ভারতের বাহির হইতেই আসিয়াছে; সুতরাং ইহারা কামরূপে ম্লেচ্ছ বলিয়া পরিচিত হওয়া অসম্ভব নহে। এই কারণে বিশেষতঃ যখন ইহাদিগকে কামরূপে ও উড়িষ্যায় ভৌমদিগের সহিত একসঙ্গে দেখিতে পাই তখন স্বতঃই সন্দেহ হয় কামরূপের ভৌমগণ ও স্তম্ভগণই উড়িষ্যায় গিয়া রাজ্যস্থাপন করিয়া থাকিবে না। শালস্তম্ভ নামের 'শাল'এর সঙ্গে শূলিকের 'শূল'এর কোন সম্পর্ক নাই ত ? ইহারা বাঙ্গালার লোক না হইলেও বাঙ্গালায় প্রান্তস্থ কামরূপের অধিবাসী।

তুঙ্গরাজ বংশ

উড়িষ্যার তুঙ্গরাজ-বংশকেও বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়। ইঁহারা বঙ্গের চন্দ্ররাজ-বংশের ন্যায় 'রোহিতাগিরি-নির্গত' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই রোহিতাগিরি কোথায় ? অনেকেই ইহাকে সাহাবাদ জেলার রোটাসগড় বলিয়া মনে করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মনে করেন এই রোহিতাগিরি ত্রিপুরার ময়নামতী পাহাড়ের নিকটস্থ লালমাই পাহাড়। একটী কারণে এই মত আমাদের সমীচীন বলিয়া মনে হইতেছে। ত্রিপুরার লোকনাথের তাম্রশাসনে দেখিতে পাই, লোকনাথের সহিত জয়তুঙ্গ নামক এক রাজার যুদ্ধ হইবাছিল। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এই রাজার নাম জয়তুঙ্গবর্ষ পাঠ করিয়াছেন। এই পাঠ ঠিক কি না সন্দেহ হওয়ায় অধ্যাপক ভাণ্ডারকরকে দেখাইতে তিনি ইহা 'জয়তুঙ্গ ধর্ম্ম' পাঠ করিয়াছেন। বাস্তবিক বসাক মহাশয় যাহা 'ব' পাঠ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই 'ধ'। আমরা 'জয়তুঙ্গ বর্ষ' পাঠ ঠিক মনে করিয়া ইহাকে তারানাথ-উল্লিখিত 'বর্ষের' সঙ্গে এক মনে করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি রাজার নাম জয়তুঙ্গ। এই জয়তুঙ্গ সম্ভবতঃ ত্রিপুরা-জেলার ময়নামতী অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার চন্দ্র-রাজগণও এই স্থান হইতে আসিয়া নিকটস্থ চন্দ্রদ্বীপে রাজ্য-স্থাপন করিয়াছিলেন। লোকনাথ সম্ভবতঃ ত্রিপুরারাজ্যের সুবর্ঙ্গ নামক অটবিক প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। এই সুবর্ঙ্গ সম্ভবতঃ কোলা শহরের নিকটস্থ উনকোটি। ইহার প্রাচীন নাম সুবড়াইথুঙ্গ। এই স্থান এখনও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। উনকোটীতে পাহাড়ের গায়ে শিবের প্রকাণ্ড মুর্ত্তি খোদিত আছে। এ ছাড়া আরও অনেক দেবমুর্ত্তি আছে। ইহার বিবরণ 'আর্কিওলজিকেল সারভে'র বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে।

তুঙ্গরাজগণ বরেন্দ্র, শ্রাবস্তী এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে আগত ব্রাহ্মণগণকে জমি দান করিয়াছেন।

ত্রিকলিঙ্গের সোমবংশীয় গুপ্তরাজগণ

এই রাজবংশের প্রথম রাজা মহাশিবগুপ্ত 'বঙ্গবিমলাম্বর-পূর্ণচন্দ্রঃ' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন; সুতরাং এই বংশ যে বঙ্গ হইতে গিয়াছে তাহা এই পরিচয় দ্বারা প্রমাণ হইতেছে। এই বংশীয় রাজগণ রাঢ়, শ্রাবস্তী ও তর্কারি ইহাতে আগত ব্রাহ্মগণণকে জমি দান করিয়াছেন। উত্তর-বঙ্গে যে শ্রাবস্তী ও তর্কারি নামক স্থান বর্ত্তমান ছিল তাহা আমরা গত বৎসরের জানুয়ারী মাসের 'ইণ্ডিয়ান-এণ্টিকোয়ারী' নামক পত্রিকায় দেখাইয়াছি।

এই রাজবংশের আরও একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের সভায় ঘোষ, দত্ত, আদিত্য ও নাগ পদবীক সান্ধিবিগ্রহিক ও কায়স্থগণকে কাজ করিতে দেখি, যথা মহাসান্ধিবিগ্রহিক ধার-দত্ত-সুতরাণক শ্রীমল্ল দত্ত,মহাসান্ধিবিগ্রহিকরাণক শ্রীচারুদত্ত, সান্ধিবিগ্রহিক শ্রীসিন্ধবদত্ত কায়স্থ বল্লভঘোষসুত কৈ ঘোষ, কায়স্থ প্রিয়ঙ্করাদিত্যসুত শ্রীমাহুক কায়স্থ মঙ্গল দত্ত ও মহাক্ষপটালিক শ্রীউচ্ছব নাগ। এই পদবীগুলির দ্বারাই ইহাদের বাঙ্গালীত্ব সূচনা করিতেছে। এই রাজগণ বঙ্গবাসী বলিয়াই বোধ হয় তাহাদের প্রধান কর্ম্মচারিগণকেও বাঙ্গালী দেখিতেছি। এই শাসনগুলির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারও ইহাদিগকে বাঙ্গালী মনে করেন।

দক্ষিণ কানাড়ার বঙ্গরাজবংশ

দক্ষিণ কানাড়া জেলার পুট্টুর তালুকে কয়েকখানি প্রাচীন প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে। উহার একখানিতে দেখা যায়, কামিরায় অরস ভরকে বঙ্গ নামক একব্যক্তি বঙ্গবাদী (বর্ত্তমান নাম 'ইন্দবেত্তু') নামক স্থানের বীরভদ্রের পূজার জন্য দান করিতেছে। আর একখানিতে নরসিংহবঙ্গ জৈন মন্দিরের জন্য দান করিতেছে। অপর একখানিতে দেখা যায় নারায়ণ সেন বোব (সেন ভোগিক) নামক এক বীর নরসিঙ্গলক্ষ্মপ্পরস: ভরকে বঙ্গরাজ-ওড়েয়ের রাজত্বকালে নন্দকেশ্বর বিগ্রহ স্থাপন করিতেছে। এই লিপিগুলির সময় ১৩৭৯ হইতে ১৪১৯ শকাব্দ। ইহাদের 'বঙ্গ' নাম এবং স্থানের নাম 'বঙ্গবাদী' দ্বারা মনে হয় ইহারা বঙ্গদেশ হইতে গিয়া দক্ষিণ কানাড়ায় গিয়া রাজ্য-স্থাপন করিয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ ইহারা বিজয়নগর-রাজগণের সামন্ত রাজা ছিল।

কানাড়ায় আর এক বঙ্গার (বঙ্গাল ?) রাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেলদগী-বংশীয় রাজা প্রথম বেঙ্কটপ্প-নায়ক বঙ্গার-রাজ্যের বিরুদ্ধে ওল নামক স্থানের রাণীর পক্ষ অবলম্বন করায় তাহার সহিত পর্ত্তুগীজদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পর্ত্তুগিজগণ এই বেঙ্কটপ্পকে কাণাড়ার রাজা বলিত। ইনি ১৫৮২ হইতে ১৬২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। এই বঙ্গাররাজ সম্ভবতঃ উপরোক্ত বঙ্গরাজ-বংশীয়।

গৌড়-রাজবংশ

দক্ষিণ ভারতে গৌড় নামে একটী জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকাল হইতে নানা স্থানের লিপিতে ইহাদের নাম পাওয়া যায়। ইহাদিগকে কখন গৌণ্ড কখন গৌড় বলা হইয়াছে। ইহাদিগকে কৃষক, যোদ্ধা, গ্রামের প্রধান দেবমন্দির-প্রতিষ্ঠাতা ইত্যাদিরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ আবার রাজ্যও স্থাপন করিয়াছে, যেমন আবতি-নাড় প্রভুগণ। ইহারা পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিজয়-নগরের অধীনে পূর্ব্ব-মহীশূরে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। এই বংশের যে লিপিগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহার সময় ১৪২৮—১৭৯২ খৃষ্টাব্দ। ইঁহারা পরিচয়ে আপনাদিগকে চতুর্থ গোত্র বলিয়াছেন। ইহাদের একটীর নাম যেলহঙ্ক-নাড় প্রভু। ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দেও ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কেমেগ গৌড়ই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই ব্যক্তি ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালোর স্থাপন করেন। ইঁহারা প্রথমে 'চতুর্থ-গোত্র' বলিয়া পরিচয় দিলেও পরে আবার সদাশিব-গোত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই গৌড়-দিগের সহিত বাঙ্গালার গৌড়ের কোন সম্পর্ক আছে কি না জানিতে পারি নাই।

আরাকানের চন্দ্ররাজবংশ

আমরা গত বর্ষের মার্চ্চ সংখ্যার 'ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়াটারলি' নামক পত্রিকায় দেখাইয়াছি যে আরাকানের চন্দ্ররাজ-বংশ খুব সম্ভবতঃ বাঙ্গালার চন্দ্ররাজ-বংশের শাখা। উভয় রাজবংশই বৌদ্ধ, কিন্তু উভয় বংশই ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিয়াছে। ব্রহ্মদেশের সহিত বাঙ্গালার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় দেখাইয়াছেন যে, নিম্ন ব্রহ্মের মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালাদেশ হইতে নীত হইয়াছে। ইহার মূলে কতক পরিমাণে এই বৌদ্ধ চন্দ্রবংশের প্রভাব থাকা খুবই সম্ভবপর।

বৃহত্তর ভারতে যে সব বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে পৌণ্ড্রবাসিনী ও চুণ্টাদেবের মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। পৌণ্ড্রবাসিনীর মূর্ত্তি যে পৌণ্ড্র বা বাঙ্গালার গৌড়-দেশে পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার অবসর নাই। আবার তারানাথ লিখিয়াছেন, বঙ্গে

পালরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেব চুণ্ডাদেবীর উপাসক ছিলেন। পাল-বংশের প্রথম অভ্যুদয় সমতটে। প্রথম মহীপাল দেবের ৩য় বর্ষে প্রতিষ্ঠিত একটী মূর্ত্তি ত্রিপুরা-জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সবডিভিসনে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ঐ স্থান সমতটের অন্তর্গত বলা হইয়াছে। ঐ সবডিভিসনে চুণ্টা নামে একটী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম এখনও বর্ত্তমান। এই চুণ্টাদেবের নামানুসারে এই গ্রামের নাম হওয়া অসম্ভব নহে। আমাদের অনুমানে যদি কোন সত্য থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে বৃহত্তর ভারতে পৌণ্ড্র-বাসিনীর ও চুণ্টাদেবী-মূর্ত্তির আবিষ্কার দ্বারা ঐ দেশ-সমূহে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে বঙ্গদেশবাসীর আংশিক কৃতিত্ব রহিয়াছে।

দেখা যাইতেছে, যে সকল বঙ্গদেশবাসী উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে তাহারা অন্ততঃ কিছুকাল আপনাদের পূর্ব্ব নিবাসস্থান ভুলিতে পারে নাই। তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাসের পরিচয়ে যেন একটা গর্ব্বের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতিতে অনেক প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য বোধ হয় কিছুকাল তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইয়াছে। সেইজন্যই তাঁহারা পূর্ব্বনিবাস সহজে ভুলিতে পারে নাই বলিয়াই মনে হয়। যাঁহারা দক্ষিণ ভারতে বহুল পরিমাণে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা যে পশ্চিম-ভারতেও উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই তাহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। আদি গৌড়, শ্রীগৌড় ও গৌড়তাগা ব্রাহ্মণ, গৌড়রাজপুত ও গৌড়কায়স্থগণ সকলেই বলেন যে বঙ্গের গৌড়ই পূর্ব্ববাসস্থান

চাবীর গোছা

(গল্প)

শ্রীফণিভূষণ রায়

প্রহ্বাস্-এর আহ্বিঅঁ শহর—হারুণ-অল-রসিদের বোগদাদের মতন গল্পের শহর; হরেক রকমের গল্প শোন্‌বার এমন জায়গা পৃথিবীতে আর নাই। তাই যে মুহূর্ত্তে "ক্লক-টাওয়ার"এর নীচেকার ছোট্ট "কাফে"তে ঢুকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা করলাম—তখনই মনে হ'ল একটা না একটা নূতন গল্প আজ শুনতেই হ'বে। কাফে ভর্ত্তি তখনো আহ্বিঅঁ শহরের রসিক-সুজনদের গল্প না শুনে কি আর নিস্তার আছে—তাহ'লে তো "পোপদের" আহ্বিঁতে এসে পড়াই বৃথা...

এদের অনেকেরই আমি পুরাতন বন্ধু, সুতরাং বুঝ্‌তে পাচ্ছেন অভ্যর্থনার ঘটাটা কি রকম হ'য়েছিল—আমি কিন্তু ঘণ্টা কয়েকের জন্য এসে পড়েছি—রোন্ নদীর বুকে প্রকাণ্ড দ্বীপটা আর একবার চোখভ'রে দেখে নেবার জন্য। ...কেউ এগিয়ে এসে বললেন—এতদিন আস নি কেন? খুব অনুযোগের সুরে—কেউ বা আমার পারিবারিক জীবন-সম্বন্ধে মজাদার প্রশ্ন করতে লাগ্‌লেন—কারও বা অভ্যর্থনা কেবল মুখের কথাতেই পর্য্যবসিত হ'ল না—যত রাজ্যের "পানীয়" গ্লাসের পর গ্লাস আমার ওষ্ঠের দিকে শোভা-যাত্রা করে আস্‌তে লাগ্‌ল। তবে অভ্যর্থনার আতিশয্যে অনেক গ্লাসই উল্টে গেল—আর হাতে পায়ে গড়িয়ে পড়ে' সব "তছনছ্" হ'য়ে গেল। যাক্—বাবুদের হট্টগোলের অভ্যর্থনায় আমি খুব অভিনন্দিত হ'য়েছিলাম—সন্দেহ নাই।

* প্রসিদ্ধ ফরাসী কথা-সাহিত্যিক ওগুস্ত মারেঁর 'লে ক্লেফ্ দে মাইতর জোমের মূল গল্পের অনুবাদ।

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে গেলে পর—ওরা সকলেই টেবিলে ব'সে পড়লেন—আবার গ্লাসগুলো ভর্ত্তি' করা হ'ল—তারপর বহুদিনের পরে দেখা-সাক্ষাৎ হ'লে যেমনটী হ'য়ে থাকে—সকলেই যে যার কথা আদ্যোপান্ত বলতে সুরু করে দিলেন। তবে সকলেই এমন "ফলাও" করে বল্‌ছিলেন—যে শুনেই অবাক্—

আমার বন্ধু "বেজুকে"—হ'লেন একাধারে—কবি এবং সঙ্গীতজ্ঞ; অনেক কথা ওর পেটে জমেছিল আমাকে বল্‌বার জন্য—এখন ক্রমাগত ভড়্ ভড়্ করতে লাগল। আর কারও সঙ্গে কথা বলবার সাধ্য কি! গল্পের কি তোড়, কি লম্বা পাড়ি—আরম্ভ হ'লে শেষ হ'বার নামটী নেই... সে এক নিঃশ্বাসে সব বলে যেতে লাগল—সমসাময়িক সাহিত্যের কথা, স্থানীয় রাজনীতির কথা, ছোট বড় মাঝারি সব ঘটনা, দুর্ঘটনার কথা—সে বলাতে "দাঁড়ি, কমা" নেই—হাত নেড়ে—নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করে—"উদারা" থেকে "মুদারা," "মুদারা" থেকে "তারা"য় উঠে... আমাকে অবশেষে হাতজোড় করে বল্‌তে হ'ল—বন্ধু তোমার মত যদি অনর্গল ভাষা আমার থাক্‌ত তা' হলে তোমাকেও আমি শোনাতাম—তোমাকেও শোনাতাম...

বন্ধু বেজুকের কথার স্রোতে কিন্তু ভাঁটা পড়ল না।

অবশেষে তার কথার তোড়ে অতিবড় সমাজদারও রণে ভঙ্গ দিল—তাদের মধ্যে একজন থলি হ'তে বের করে এক গোছা চাবী সেই বাগ্মিপ্রবরের হাতে দিল।

বাগ্মিপ্রবর কিন্তু অবজ্ঞার ভঙ্গীতে হাত নেড়ে চাবীর গোছা ফিরিয়ে দিল—চাবীর গোছা দেওয়ার মধ্যে সে যে কি অসঙ্গতি আবিষ্কার করল—ভগবান্‌ই জানেন। পুনর্ব্বার বক্তৃতার সুরে বল্‌তে সুরু করল—সে কি অসম্ভব "পাক দিয়ে সুতো লম্বা করার কায়দা"—একেবারে অতিষ্ঠ—বাপ্ তখন আর একজন উঠে আবার চাবীর গোছা টেবিলের উপর রাখ্‌ল এবং ঠেলে ঠেলে বেজুকের দিকে দিয়ে সহজ স্বরে বল্‌ল—"নাও না, নাও না..." ছোঁ মেরে গোছাটা নিয়ে—ঝন্ করে মাটীতে ফেলে দিল—তারপর পা দিয়ে চেয়ারটা উল্‌টিয়ে দিয়ে বেজুকে বেরিয়ে গেল। রাগে তার দু'চোখ ফেটে পড়ছিল—কাকেও কোনো সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করে গেল না...এই হাস্যকর দৃশ্যে আমি একেবারে চমৎকৃত হ'য়ে গেলাম—ভাব্‌লাম, এ কোন নাটকের প্রস্তাবনা দেখ্‌লাম। আমি বেজুকে কি চিন্‌তাম—অমন গল্পের মাঝখানে আর অমন শ্রোতৃমণ্ডলী ছেড়ে সে যে উঠে যাবে—তার গুরুতর কারণ থাকা চাই-ই চাই।

বেরিয়ে গিয়ে তাকে আনবার অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু খুব গম্ভীরভাবে—প্রখর দৃষ্টিতে আমাকে আঘাত করে আহত আত্মসম্মানের মর্য্যাদায় সে চলে গেল। একবার বল্‌ল না কিসে তার এত রাগ হ'ল। মুখের কথাটী একবার বার করল না—বুঝলাম তার হৃদয়ক্ষত নিশ্চয়ই খুব গভীর।

এই যে "চাবীর গোছা"—মহা রহস্যময় প্রহেলিকা হ'য়ে উঠল—দেখ্‌ছি অথচ এর বিশ্বাসঘাতকতায় বন্ধু বেজুকের বিরক্তির আর অবধি নেই, আমার কাণে তখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল—নাও না, নাও না—নিশ্চয়ই কোনো প্রচ্ছন্ন কৌতুকের ইঙ্গিত এর মধ্যে আছে...পরে আমি গল্পটা ওদের মুখে শুনেছিলাম—বন্ধু হয় তো আমার উপর চটেই থাক্‌বেন তবুও না বলে পারছি না...

নাইম্ শহরে উৎসবের সময় যেদিন ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে ষাড়ের লড়াই আর হ'ত না—সেদিন অনেকেই শহরতলীতে—খোলা মাঠের ধারে ধারে ছোট ছোট ঘর ভাড়া করে গল্প-গুজব গান-বাজনা করত'। স্থানটা পছন্দসই—"পাইন" গাছের ওড়নায় ঢাকা; তার মধ্যে 'মাইতর জোমের' ভাড়াটে ঘরখানা চার্‌টে "সাইপ্রেস্" গাছের তলায় বলে—ভারী নির্জ্জন, ভারী শীতল—ভারী মনোরম!

গ্রীষ্মকালের রবিবার—অপরাহ্ণে কয়েকজন বন্ধু মিলে মাইতর জোমের ঘরে এসে জুটল। সান্ধ্যভোজ শেষ হ'লে—সখের সঙ্গীত আরম্ভ হ'ল—সকলেই যথাসাধ্য গান করল। কুসুম-সুবাসী হাওয়ায় তাদের উৎফুল্লতা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হ'ল—দূরে শুক্‌নো ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ঝিল্লীর অশ্রান্ত কলতান তাদের সঙ্গীতের সঙ্গে ঐক্যতানে বাজ্‌তে লাগ্‌ল কেবল একজন—নাম তার মারিয়ুস্—এই ঐক্য-সঙ্গীতে যোগ দেয় নাই—কারণ জীবনে তাকে গান কর্ত্তে কেউ এ পর্য্যন্ত বলে নাই! আমি একখানা গানই জানি—না, না মোটে দুইখানা—বড় লম্বা গানগুলো—

সকলেই তাকে গাইতে অনুরোধ করল—মাইতর জোম

নিজে তাকে গাইতে বললেন—মারিয়ুস্ তখন গান ধরল'। একটানে ছয় "কলি" গেয়ে—সে বলে উঠ্ল—বড়ই মুস্কিল তো! ব্যাপার কি?—এর পরে আর মনে আস্ছে না!

মনে করবার জন্য অনেকক্ষণ মাথা ঘামাল—আগের, আগের "কলি"গুলো বার বার গাইতে লাগ্ল'—কিন্তু মনে কি আর পড়ে ছাই!—কিছুতেই মনে কর্তে পারল' না।

—দূর হোক গে—আর একখানা যে গান জানি—তাই শোনাচ্ছি।

মরিয়ুস্ তখন তার দ্বিতীয় গান খানা ধরল'—ইনিয়ে-বিনিয়ে বহুক্ষণ গাইতে লাগ্ল', ইতিমধ্যে দু'একজন করে শ্রোতা আস্তে,আস্তে টুপী ছাতা নিয়ে সরে পড়্তে লাগ্ল—একজন—দু'জন—তিনজন—

কিন্তু গায়ক নিজের গানে নিজেই বিভোর হ'য়ে পড়েছিল—সে' তো আর বাহবা পাবার জন্য গাচ্ছিল না—সে গান গাচ্ছিল—আন্তরিক প্রেরণায়—যেমন করে বৃক্ষ-শাখা ধীরে ধীরে কম্পিত হয়—গাছের পাতায় পাতায় পুলকের ঢেউ ছোটে—বল্লরী বিনত-সহকারে ভূলুণ্ঠিত হয়—মরিয়ুস্ গাচ্ছিল—কারণ সারাদেশ—শান্তস্নিগ্ধ গ্রীষ্মের অপরাহ্নে তখনকার যেন"ঘুমপাড়ানি"গানে ঘুমিয়ে পড়েছিল!

এই যে মনোহারী কাব্য যা' তার সঙ্গীতে ফুটে উঠেছিল—শ্রোতাদের পক্ষে তা' যে চিত্তহারী ছিল না তা' নয়! যখন কাকের কাকলী আরম্ভ হয়—তখন কি পক্ক বিম্বদল অন্তরে অন্তরে তৃপ্ত হয় না?

গানের বিশ "কলিতে" পৌছে মারিয়ুস্ দেখলে—কেবল একজন মাত্র শ্রোতা তখনও রয়েছেন—ঘরের মালিক মাইতর্ জোম্ স্বয়ং—সে মহা উৎসাহে গান গেয়ে চল্ল'।

তখন মাইতর জোমও উঠ্লেন—আস্তে পকেট থেকে চাবীর গোছা বের করে নিয়ে তার হাতে দিয়ে বল্লেন——

চাবী রইল—জানই তো বুড়োমানুষ,আমি বেশী রাত হ'লে খারাপ রাস্তা দিয়ে যেতে পারব না—থাকাই উচিত ছিল—যাহোক—চাবীর গোছা নাও না—নাও না—যখন তোমার সঙ্গীত শেষ হ'বে—দরজায় চাবী লাগিয়ে যেও।

শিশিরের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

——:*:——

গ্রন্থকার গোবিন্দের সন্ধান

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী

শ্রীচৈতন্য-ভৃত্য গ্রন্থকার গোবিন্দকে লইয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য-ক্ষেত্রে বহু আলোচনা ও বিচার হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন—গ্রন্থকার গোবিন্দ বলিয়া কেহ ছিলেন না, গোবিন্দের কড়চা-গ্রন্থ জাল; কিন্তু কড়চার রচনা এমনি মোহময় ও মনোমোহকর, বর্ণনা এমনি স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী—স্থানকালাদির সন্নিবেশ এরূপ ঠিক ও ক্রমানুসারিণী যে, অপরেরা কিছুতেই কড়চার অমৌলিকত্ব স্বীকারে সম্মত নহেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, (গ্রন্থ জাল হইলে) এমন প্রাণমাতানো চিত্রাঙ্কনের যশগৌরব অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া গ্রন্থকারের লাভ কি? কি স্বার্থে তিনি মিথ্যার আশ্রয় লইয়া আপন কীর্ত্তি অপরে দিতে যাইবেন? তর্কস্থলে যদি স্বীকার করা যায় যে, কোন কৌশলী পুরুষ ইহা জাল করিয়াছেন, তবে সহজেই মনে হয় তাহা হইলে সুপ্রচারিত গ্রন্থের সহিত ইহার অমিল থাকিত না। জালিয়াতেরা সতর্ক; কোন অপ্রচলিত বেখাপ্পা কথা বলিয়া সহজে তাঁহারা অন্যের সমালোচনার বিষয়ীভূত হইতে চাহেন না। এ সব কারণে অপরেরা কড়চার বিপক্ষে আন্দোলন-কারীদের কথার বিশেষ গুরুত্ব বোধ করেন না।

বাঙ্গালা রামায়ণ-মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া বহুতর প্রাচীন গ্রন্থই মুদ্রিত হইয়াছে, প্রত্যেকের সঙ্গেই পুথি-নকলকারক অথবা সম্পাদকের কৃত অঙ্গরাগ দৃষ্ট হয়। এই-জন্যই মুদ্রিত পুস্তকে পাঠান্তর যোজনা করা হইয়া থাকে। গোবিন্দদাসের কড়চায় তাহার অসদ্ভাব হওয়া সম্ভব নহে; কিন্তু সেই দোষে কেবল কড়চাখানা বাতিল করিতে গেলে অবিচার হয়।

শ্রীমহাপ্রভুর সকল কথাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে একই গ্রন্থে থাকিবে, এমন আশা করা অন্যায়। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গের দক্ষিণ-ভ্রমণবার্ত্তা নাই, চৈতন্যচরিতামৃতে আছে। কবি কর্ণপুর বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ-ভ্রমনকালে শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গে গোদাবরী পর্য্যন্ত কোন কোন গিয়াছি তারপর প্রভু তাঁহাদের ফিরাইয়া দেন। কাজেই কৃষ্ণদাস কয়দূর মাত্র তাঁহার সঙ্গী ছিলেন, কবিকর্ণপুরের কথায় তাহা বলিতে হয়। গোবিন্দের কড়চাতেও ঐ কথারই প্রতিধ্বনি —"বারণ করিলা সবে"—আছে। ফলতঃ ইদৃশ অনৈক্য স্থলে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া লীলাক্রম বুঝিতে হয়। কোন এক প্রাচীন গ্রন্থের বর্ণনার সহিত অন্য গ্রন্থের সেই বিষয়ে পৃথক্‌রূপ বর্ণনা দেখিলেই যে একতর গ্রন্থ একবারে আমূল অবিশ্বাস্য হইবে, এমন মনে করিলে "কম্বল খালি" হইয়া পড়িবে।

সে যাহা হউক, শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালে তাঁহার অনুসঙ্গী ও পার্শ্বদগণের মধ্যে যে যে গোবিন্দ ছিলেন, এক সময় তাহাদের পরিচয় বিচার করা হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-গ্রন্থে পাঁচজন গোবিন্দের নাম পাওয়া যায়। এই পাঁচজনই শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক। তন্মধ্যে চারিজন তাঁহার পার্ষদ ও একজন নিত্যানন্দের পার্ষদ ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণান্তর যখন নীলাচল গমন করেন, তখন ইঁহাদের মধ্যে কেহ যে তাঁহার সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলেন, এমন কথা পাওয়া যায় না।

তবে চৈতন্যভাগবতে এক গোবিন্দের নামোল্লেখ আছে—যিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে গৌড় হইতে নীলাচলে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া পুনর্ব্বার দেশে আসিয়াছিলেন, এমন কথা কিন্তু ভাগবতে লিখিত নাই। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে ভাগবতের উক্তির পোষক বাক্য যথেষ্ট আছে।

এস্থলে ঐ গ্রন্থত্রয় হইতে দেখিতে হইবে, শ্রীমহাপ্রভুর সহিত কোনও গোবিন্দ গৌড় হইতে নীলাচলে গিয়াছিলেন কি না এবং গিয়া থাকিলে তিনি কে? এতদুদ্দেশ্যে আমরা দেখিব—

শ্রীমহাপ্রভুর (ক) নবদ্বীপ-লীলায় গোবিন্দ-সংস্রব।
(খ) কাটোয়ার লীলায় গোবিন্দ-সংস্রব।
(গ) নীলাচল-যাত্রায় গোবিন্দ-সংস্রব।
(ঘ) ক্ষেত্র হইতে গৌড়াগমনকালে ও গৌড়ে অবস্থানকালে গোবিন্দ-সংস্রব।
(ঙ) দক্ষিণ-ভ্রমণান্তে নীলাচলে অবস্থিতি-কালে গোবিন্দ-সংস্রব।

এ সব লীলায় পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দ পঞ্চক ছাড়া অপর কোন গোবিন্দের সংবাদ পাওয়া যায় কি না? পাওয়া গেলে—সে কোন্ কোন্ সময়ে তাহা দেখিতে হইবে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকার ১৩১৮ বাংলার আশ্বিন কার্ত্তিক যুগ্ম সংখ্যায় আমি উক্ত গোবিন্দগণ-সম্বন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলাম।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর পার্ষদ চারিজন গোবিন্দ ও নিত্যানন্দের পার্ষদ একজন গোবিন্দের নাম আছে। চারিজনের সমমূল শাখা বর্ণনে (১০ম পরিচ্ছেদে) ও অপর একজনের নাম নিত্যানন্দ-শাখা বর্ণনে (১১শ পরিচ্ছেদে) আছে। শ্রীচৈতন্যপার্ষদ চারিজনের মধ্যে—

(১) "প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।"
(২) "প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত॥"
(চৈঃ চঃ ১০ম পরি)

এই দুইজন প্রভুর কীর্ত্তন-গায়ক ও নবদ্বীপবাসী ছিলেন।

(৩) "গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞি॥"
(চৈঃ চঃ, ১০ম পরি)

ঘোষ-বংশীয় এই গোবিন্দ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় গোপীনাথ-বিগ্রহ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া অগ্রদ্বীপে চিরকাল অবস্থিতি করেন।

(৪) "শ্রীগোবিন্দ নাম তার প্রিয় অনুচর।"
"অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।"
(চৈঃ চঃ ১০ম পরি)

ইনি ঈশ্বরপুরীর শিষ্য; গুরুর অপ্রকটে নীলাচলে গিয়া মহাপ্রভুর আশ্রিত হ'ন।

(৫) "গোবিন্দ শ্রীরং মুকুন্দ তিন কবিরাজ।"
(চৈঃ চঃ ১১শ পরি)

শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য এই গোবিন্দ কবিরাজের নামের পরিচয় ব্যতীত আর কোন কথাই জানা যায় না। এখন গৌরাঙ্গপার্ষদ পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দ চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমতঃ—

[ক] নবদ্বীপবাসী ইজন গোবিন্দের নামোল্লেখ পাই, যখন প্রভু পূর্ব্ববঙ্গ-গমন-প্রাক্কালে প্রতিবাসীবর্গ-সকাশে তাহা প্রকাশ করেন তখন জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে নবদ্বীপ-বাসী বহু ভক্তের নামের সহিত এই নামগুলি আছে, যথা—

"গোবিন্দ কাশীনাথ মিশ্র লেখক জগাই।
* * *
গোবিন্দ সঞ্জয় মুকুন্দ সন্নিহিত।"

পূর্ব্ববঙ্গ-প্রত্যাগত গৌরাঙ্গের সম্বন্ধে মন্ত্রণালোচনা সভায় নবদ্বীপের বহু ভক্তের সহিত ইঁহাদের একজনের নাম আছে, যথা তত্রৈব—

"গোবিন্দ নন্দনাচার্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর।
একত্র বসিয়া সবে করেন মন্ত্রণা॥"

তারপর শ্রীগৌরাঙ্গের গয়াযাত্রার সঙ্গীদের মধ্যেও চন্দ্র-শেখর আচার্য্যরত্নের নামের সহিত নবদ্বীপের ঐ গোবিন্দের নামোল্লেখ আছে; যথা তত্রৈব—

"জগদানন্দ গোবিন্দ আচার্য্যরত্ন সঙ্গে।
গয়া যাত্রা করিলেন নবদ্বীপ খণ্ডে॥"

শ্রীমহাপ্রভু গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরে শ্রীবাসগৃহে সতত নৃত্যকীর্ত্তন করিতেন, ইহাতে নবদ্বীপের এই গোবিন্দ দত্ত ও গোবিন্দানন্দ নিয়ত উপস্থিত থাকিতেন যথা চৈতন্য ভাগবত মধ্য-খঃ ৮ম অঃ—

"গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সকল তপাই।"

এতদুপলক্ষে জয়ানন্দও নিজগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"শ্রীগর্ভ পণ্ডিত, মুরারি, গোবিন্দ, শ্রীধর।"

এবং "শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর চারি ভাই।
বাসুদেব মুকুন্দদত্ত আর গোবিন্দাই॥"

জয়ানন্দ গোবিন্দানন্দকেই "গোবিন্দাই" বলিয়াছেন, যেমন নিত্যানন্দ—নিতাই, জগদানন্দ—জগাই ইত্যাদি।

নবদ্বীপের নন্দনাচার্য্যগৃহে সদ্য-সমাগত নিত্যানন্দকে দেখিতে প্রভুর সহিত এই গোবিন্দানন্দও গিয়াছিলেন, যথা, তত্রৈব—"দামোদর গোবিন্দানন্দ শ্রীগর্ভ বক্রেশ্বর।"

নবদ্বীপের জগাই-মাধাই-উদ্ধার, কাজি-দলন, শ্রীধর-গৃহে বিজয়াদি প্রত্যেক প্রধান ঘটনায় এই দুইজনের নাম চৈতন্যভাগবতে আছে।

জগাই-মাধাই উদ্ধারে—

"গোবিন্দ শ্রীধর কৃষ্ণানন্দ কাশীশ্বর।
জগদানন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীশুক্লাম্বর॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য-খঃ ১৩ অঃ)

কাজিদলন প্রসঙ্গে—

"রামাই গোবিন্দানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর।
বাসুদেব শ্রীগর্ভ মুকুন্দ শ্রীধর॥
গোবিন্দ জগদানন্দ নন্দন আচার্য্য।
শুক্লাম্বর আদি যে যে জানে এই কার্য্য॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য-খঃ ২৩ অঃ)

শ্রীধর-গৃহে বিজয়কালে——

"গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীগর্ভ, শ্রীমান।"
(ইত্যাদি চৈঃ ভাঃ মধ্য-খঃ ১৩ অঃ)

শ্রীমহাপ্রভুর ভাবাবলী বর্দ্ধিত হইয়া তাহার কুলপ্লাবী তরঙ্গরাজি যখন তাঁহাকে অকূলে লইয়া যাইতে উদ্যত, যখন প্রতিবেশী ভক্তবর্গের কাছে একদিন তিনি বৈরাগ্য-মহিমা কীর্ত্তন করেন, তখনও এই দুই প্রতিবেশীকে সেইক্ষেত্রে উপস্থিত দেখা যায়। যথা জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে—

"গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ আর বনমালী।" ইত্যাদি।

(এই সময়ে আর এক গোবিন্দ-সংস্রব হয়, তাহা গোবিন্দের কড়চায় গোবিন্দ নিজেই বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে প্রভুর সন্ন্যাসের কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-গৃহে আশ্রয়প্রাপ্ত হন; কিন্তু তাহা এ স্থলে আলোচ্য নহে।)

[খ] অনন্তর গৌরাঙ্গের-সন্ন্যাস-গ্রহণ-উপলক্ষে

কাটোয়ায় গমন-সংসৃষ্ট লীলায় এক গোবিন্দের নাম পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প স্থির করিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাহা নিত্যানন্দকে বলেন এবং মাত্র নিম্নোক্ত পাঁচ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ভক্তের কাছে উহা প্রকাশ না করিতে বলিয়া দেন। যথা—

"আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য অপর মুকুন্দ?" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীনিত্যানন্দ এই আদেশ পালন করেন। ইঁহারা ছাড়া আর কাহাকেও বলেন নাই। এই গোপন কথাটী নিতাই শচীমাকে বলিলে, তাঁহার বিষাদ-বাক্যাদি শ্রবণে গৌরগৃহের সকলেই তাহা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। তখন গৌরগৃহে আর কে কে ছিলেন? ছিলেন—গৌর-গৃহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, প্রাচীন পরিচারক ঈশান, আর (কড়চার উক্ত) নবাগত গোবিন্দ ভৃত্য। (ইহার আগমন ও কাটোয়া-গমনের সংবাদ একমাত্র কড়চাতে আছে।)

এখানে দেখা যা'ক, কড়চা ছাড়া অন্য বৈষ্ণব-গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দগণ হইতে পৃথক কোন (৬ষ্ঠ) গোবিন্দের প্রসঙ্গ আছে কি না?

শ্রীমহাপ্রভু শেষরাত্রে উঠিয়া সন্ন্যাসোদ্দেশে কাটোয়ায় প্রত্যূষে প্রস্থান করিলে, তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া যে যে ভক্ত কাটোয়য় গমন করেন, তাঁহাদের নাম চৈতন্যভাগবতে পাই, যথা:—

"অবধূত চন্দ্র, গদাধর, মুকুন্দ।
চন্দ্রশেখরাচার্য্য আর ব্রাহ্মানন্দ।
আসিলেন প্রভু যথা কেশবভারতী।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে, তাঁহার জননী শচীদেবী, মেসো চন্দ্রশেখরাচার্য্য, সখা গদাধর, মুকুন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এই পাঁচ জনকে সন্ন্যাস-সঙ্কল্পের কথা বলিতে বলিয়াছিলেন। কাজেই শচী-গৃহের কয়জন ও এই চারিজন এবং নিতাই তাহা জ্ঞাত থাকায় সতর্ক ছিলেন বলিয়া, প্রভুকে গৃহে না পাইয়া, এই পাঁচজনই ভারতীর স্থানে উপস্থিত হইলেন।

প্রভুর প্রতিবেশী গোবিন্দ দত্ত ও গোবিন্দানন্দ এই সংবাদ জানিতেন না বলিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে পূর্ব্বোক্ত নিত্যানন্দের অনুসঙ্গী ঐ গোবিন্দ কে? কেবল চৈতন্যভাগবতে নহে, জয়ানন্দও বলিয়াছেন যে, নিত্যানন্দের সহিত কাটোয়ায় এক গোবিন্দ গমন করিয়াছিলেন। যথা:—

"মুকুন্দ গোবিন্দানন্দ সঙ্গী নিত্যানন্দ।"

জয়ানন্দ ঐ ব্যক্তিকে কখন গোবিন্দ, কখন বা গোবিন্দানন্দ বলিয়াছেন। প্রভুর প্রতিবেশী গোবিন্দ দত্ত ও গোবিন্দানন্দ হইতে পৃথক এই গোবিন্দানন্দের বিশেষ পরিচয় ও কাটোয়া-গমন কথা জয়ানন্দ আরও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার জাতি জানা যায়! যথা—শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে,—

"গঙ্গাপার হৈয়া আগে রৈলা নিতানন্দ।
মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার।
মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গাপার॥"
(জঃ চৈঃ মঃ)

অতঃপর প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ। তৎপর ভক্তগণসহ কাটোয়ায় প্রভুর-কীর্ত্তন ও নৃত্য-প্রকটন; জয়ানন্দ তৎ-কালেও ঐ গোবিন্দের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তদনন্তর প্রভু বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া পশ্চিমমুখে ধাবিত হইলেন। চক্ষু মুদ্রিত জ্ঞান একরূপ নাই, কোথায় পা ফেলিতেছেন জানেন না। করঙ্ককৌপীনাদির প্রতি লক্ষ্য নাই। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে, কাটোয়ায় প্রভুর অনুগামী ঐ গোবিন্দ তখন করঙ্ক-কৌপীনাদিবাহী অনুযাত্রী। যথা—

"আগম নিগম গীতা গোবিন্দের কাছে।
করঙ্গ কৌপীন কটিসূত্র তাহে বান্ধে॥
(জঃ চৈঃ মঃ)

এই ধাবনশাল উদ্‌ভ্রান্ত নবীন উদাসীনের সহিত ভারতীও কিয়দ্দূর গিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে জয়ানন্দের উল্লিখিত কৌপীন-করঙ্কবাহী গোবিন্দও ছিলেন, বৃন্দাবন দাস স্থানান্তরে তাহা বলিতেছেন, যথা—

"নিত্যানন্দ গদাধর, মুকুন্দ সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে অগ্রে কেশব ভারতী॥"
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য-খঃ ১ম অঃ)

(কড়চা গ্রন্থে ঠিক এইরূপ কথাই আছে, যথা—

"তারপর নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।
ভারতীকে ল'য়ে চলিলেন নানা রঙ্গে॥"
পেছনে পেছনে আমি খড়ি লয়ে যাই।

সে যাহা হউক)

তাহার পরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে পথ ভুলাইয়া কৌশলে শান্তিপুরে আনিলেন; তখনও ঐ গোবিন্দ (সঙ্গ-ত্যাগ করেন নাই) প্রভুর সহিত শান্তিপুরে উপস্থিত হন। প্রভুর তখন গৌড়ীয় ভক্তবর্গসহ সম্মিলন হইবে ভাবিয়া ভৃত্য গোবিন্দ পরম আনন্দিত হইয়াছেন। যথা—

"শান্তিপুরে গেলা গোবিন্দানন্দ আনন্দিত হৈঞা।"
(জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল)

[গ] শান্তিপুর হইতে প্রভুর নীলাচল-যাত্রা। যে যে ভক্তগণকে নিত্যানন্দ পূর্ব্বে, প্রভুর সন্ন্যাস-সঙ্কল্পের কথা জানাইয়াছিলেন, তাহা অবগত হইয়া যাঁহারা কাটোয়ায় গিয়াছিলেন এবং কাটোয়া হইতে তাঁহার সঙ্গে শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, এই সময় শান্তিপুর হইতেও প্রভুর নীলাচল যাত্রার সেই তাঁহারাই সঙ্গী হইয়াছিলেন, মাত্র তাঁহার মেশো চন্দ্রশেখর যান নাই, তিনি শচী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তত্ত্বাবধানের জন্য নবদ্বীপে থাকেন, তাঁহার পরিবর্ত্তে গৌরাঙ্গের সখা জগদানন্দ নিত্যানন্দাদির সহিত গিয়াছিলেন; বলা বাহুল্য যে গোবিন্দও সেই সঙ্গে ছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্য-খঃ ২য় অঃ—

"নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ॥"

তৎপরে প্রভু এই ভক্তগণসহ নীলাচলে গিয়া পৌছিলেন। তখনও করঙ্কাদিবাহী ভৃত্য গোবিন্দ সঙ্গে। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে প্রভু—

"ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে জলে করি স্নান।
রক্ত বস্ত্র করঙ্ক কৌপীন কটি সূত্র॥
মাল্য চন্দনাগুরু পরেন শচীপুত্র॥
সঙ্গে গোবিন্দানন্দ সিংহদ্বার তলে।
পাদ প্রক্ষালন করি করঙ্কের জলে॥
দণ্ডবৎ হৈয়া সিংহদ্বারে প্রবেশিল!
একশত দণ্ডবৎ গোবিন্দ দেখিল॥"

শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে গমন করেন। (কড়চায় তাহা বর্ণিত আছে, এ-স্থলে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক।)

[ঘ] তারপর প্রভুর নীলাচলে অবস্থিতি ও তথা হইতে গৌড়দেশে আগমন।

প্রভু নীলাচল হইতে শান্তিপুরে উপস্থিত হইলে, নবদ্বীপের সকল ভক্তই তথায় গিয়া সম্মিলিত হন। নবদ্বীপের গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ (দত্ত)ও তখন তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং আনন্দের সহিত উভয়েই শুভ-শঙ্খ-বাদন করিয়াছিলেন; যথা জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে—

"গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ শঙ্খ বাজায়।
বুদ্ধিমন্ত খান যেই চন্দন দেই পায়॥"

[ঙ] তদনন্তর মহাপ্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমনান্তে নীলাচলে অবস্থিতি—

মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের বার্ত্তা চরিতামৃত-গ্রন্থে আছে। দক্ষিণ-ভ্রমণান্তে মহাপ্রভু নীলাচলে আসিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তবর্গ প্রায় সকলেই (সংখ্যায় প্রায় দুই শত হইবে) রথযাত্রা সম্মুখে করিয়া প্রভু-দর্শনে নীলাচলে যাত্রা করেন। তখন নবদ্বীপের অপরাপর ভক্তের সহিত (নবদ্বীপবাসী) গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ দত্ত নীলাচলে চলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে অন্ত্য-খঃ ৮ম অঃ—

"চলিলা গোবিন্দানন্দ প্রেমেতে বিহ্বল।"
"চলিলা গোবিন্দ দত্ত মহাহর্ষ মনে।"

নবদ্বীপবাসী প্রভুর প্রতিবেশী এই দুই গোবিন্দ ব্যতীত গোবিন্দ ঘোষও ঐ সময় অপরাপর ভক্তবর্গসহ প্রভু-দর্শনে গিয়াছিলেন। ফলতঃ প্রভু দর্শনার্থী যাত্রীদলসহ যে যে গোবিন্দ তখন নীলাচলে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম চৈতন্য-চরিতামৃতে একত্রে পাওয়া যায়। যথা—

"শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ।
হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য-খঃ ১৩ পরি)

এই শেষোক্ত "মাধব, গোবিন্দ" ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়।

মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পরেই নীলাচলে চলিলে, নিত্যানন্দাদিসহ এক গোবিন্দ তাঁহাদের অনুষঙ্গে ছিলেন

এবং নীলাচলে গিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে; সেই ব্যক্তি যে ঐ (নবদ্বীপের) গোবিন্দ (দত্ত), গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ ঘোষ হইতে পৃথক একজন, তাহা স্পষ্টতর। যাহা হউক, ইঁহারা নীলাচলে রথের সময় নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য-খঃ ১৩ পরি :—

"দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত আর গোবিন্দানন্দ॥
অদ্বৈত আচার্য্যে তাহা নৃত্য করিতে দিল।

*　　　　*

গোবিন্দ ঘোষ কৈল আর সম্প্রদায়।"

চারি মাস ইঁহারা নীলাচলে থাকার পরে মহাপ্রভু গৌড়ীয় তাবৎ ভক্তকেই বিদায় দেন, সকলেই তখন চলিয়া আসেন। নিত্যানন্দকেও গৌড়ে নাম-প্রেম প্রচারার্থ ঘোষ গোবিন্দাদি জনকয়েক ভক্তসহ বিদায় দিয়াছিলেন, ইঁহারা নিত্যানন্দের কীর্ত্তনীয়া। যথা—চৈতন্য-ভাগবত মধ্য-খঃ ৫ম অঃ

"নিতানন্দ স্বরূপের মহাপ্রিয় ধাম।
মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই।"

যাঁহারা গৌড় হইতে রথের পূর্ব্বক্ষণে নীলাচলে গিয়াছিলেন, চারিমাস পরে তাঁহারা একসঙ্গে চলিয়া আসিলেন, নিত্যানন্দ পর্য্যন্ত আসিলেন,—পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দত্রয়ও আসিলেন। তাঁহারা গৌড়ে চলিয়া আসার পরে নীলাচলে গোবিন্দ একজন কি দুই জন ছিলেন, তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

একজন গোবিন্দের নাম অন্ত্যলীলায় বাহুল্য ভাবে চৈতন্যচরিতামৃতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, ইনি ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য নীলাচলে নবাগত গোবিন্দ। যথা চৈতন্য চরিতামৃতে—

"ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম।
পুরী গোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান॥"

পুরী গোসাঞির অভিপ্রায়ে মহাপ্রভু ইহাকেই "অঙ্গসেবা"র অধিকার দিয়াছিলেন। যখন ভক্তগণ প্রথম নীলাচলে প্রভুদর্শনে আগমন করেন, চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে যে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় ইনি স্বরূপ, গোস্বামীর অনুষঙ্গে ভক্তবর্গকে ফুলের মালা দিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতেও এই অভ্যর্থনার কথা আছে, যথা—

"পাত্র শ্রীপরমানন্দ রায় রামানন্দ।
চৈতন্যের দ্বারপাল সুকৃতি গোবিন্দ॥"

গম্ভীরা-গৃহে মহাপ্রভু রাত্রে শয়ন করিলে ইনি দ্বারে শয়ন করিতেন বলিয়া "দ্বারপাল গোবিন্দ" নামে খ্যাত হন। যথা—

"গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য-খঃ, ১৭ পরি।

একাধিক ব্যক্তি একত্রে থাকিলে, বিশেষ বিশেষ পরিচয়ের প্রয়োজন হয়। নীলাচলে একাধিক রঘুনাথ থাকায় নবাগত দাস রঘুনাথ "স্বরূপের রঘু" বলিয়া খ্যাত হন।

এস্থলেও একজন গোবিন্দ বরাবর মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন নবাগত (পুরীর সেবক) গোবিন্দ "দ্বারপাল গোবিন্দ" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

অতএব নীলাচলে দুইজন গোবিন্দের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না কি?

নীলাচলে দুই গোবিন্দ

পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, নবদ্বীপের গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ ও গোবিন্দ ঘোষ ছাড়া আর এক গোবিন্দ (সন্ন্যাসকালে) নিত্যানন্দাদির সহিত কাটোয়ায় গিয়াছিলেন (চৈঃ ভাঃ) আর কাটোয়ায় ঐ গোবিন্দই সন্ন্যাসী প্রভুর কৌপীন-করঙ্ক লইয়া নবীন সন্ন্যাসীর পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়াছিলেন (জঃ চৈঃ মঃ); তাহার পর প্রভুর শান্তিপুরাগমন কালেও ইনি সঙ্গী এবং তথা হইতে তৎপরে প্রভু নীলাচলে চলিয়া আসেন, তখনও ইনি প্রভুর সঙ্গী (চৈঃ ভাঃ) এবং নীলাচলে পৌছিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন স্নানকালে ঐ গোবিন্দই প্রভুর করঙ্ক-কৌপীন রক্ষা করিতেছেন (জঃ চৈঃ মঃ)। এই গোবিন্দ পরে কোথায় ছিলেন?

ইনি আর কোথায় থাকিবেন? যিনি একবার শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গ-লাভের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কি তাহা ছাড়িতে পারেন? এই নিষ্কিঞ্চন ভক্ত প্রভুকে ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই, যাইতে ইচ্ছা হয় নাই,

নীলাচলেই তিনি ছিলেন—ইহাই কি বোধ হয় না? তাঁহার অন্যত্র যাওয়ার কোনই সমাচার পাওয়া যায় না। অন্য সমস্ত ফেলিয়া প্রভুর শ্রীচরণ-দর্শন মাত্রই ছিল, যাঁহাদের একমাত্র কাজ, প্রসঙ্গভাবে গ্রন্থপত্রে তাঁহাদের বিবর খুঁজিয়া অল্পই মিলে।

উদাহরণস্থলে বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের কথা বলা যাইতে পারে। বৃন্দাবন-যাত্রায় প্রভুর অনুসঙ্গী এই বলভদ্রের কথা বাহুল্যরূপে মিলে। প্রভু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে পরে ইহার কথা তেমন পাওয়া যায় না। বলভদ্র কোথায় তখন ছিলেন?—আর কোথায় যাইবেন? তিনি নীলাচলেই ছিলেন ও প্রত্যহ প্রভুদর্শনে কৃতার্থ হইতেন। তবে বিশেষ বিশেষ লীলায় অসংস্পৃষ্ট বলিয়াই প্রসঙ্গাভাবে গ্রন্থে নাম তেমন পাওয়া যায় না। পরে মাত্র একটীবার ইঁহার নাম পাওয়া যায়;—সনাতন গোস্বামী নীলাচল হইতে বনপথে বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা করিয়া, ইঁহার নিকট হইতে, প্রভুর গমন-পথের পরিচয় লিখিয়া লইয়াছিলেন। ইনি যেমন নীরবে নীলাচলে ছিলেন, তদ্রূপ যে গোবিন্দ গৌড় হইতে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তিনিও নীরবে নীলাচলেই ছিলেন; ইহাই কি মনে হয় না?

যদি তাহাই হয়, তবে নীলাচলে স্থায়ীভাবে ছিলেন গোবিন্দ দুইজন।

(১) একজন প্রভুর সঙ্গে গৌড় হইতে আগত।

(২) অপর ঈশ্বর পুরীর সেবক ও নবাগত।

এখন দেখিতে হইলে এক সময়ে এই দুই গোবিন্দের নীলাচলে অবস্থিতির ইঙ্গিত গ্রন্থপত্রে কিছু আছে কি না?

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কথিত মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলার এই কয়েক পংক্তি বিবেচ্য :—

"প্রতাপরুদ্র মহারাজা দেখিলেন অষ্টভুজ।
বাণীনাথ (পট্টনায়ক) উপরে ছিলেন পদাম্বুজ॥
বড় অনুগ্রহ পাত্র প্রদ্যুম্ন কানাই।
যার কোলে নিদ্রা গেলা চৈতন্য গোসাঞি॥
বিষ্ণুপুরী দামোদর আর বিশ্বেশ্বর।
গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ সঙ্গে নিরন্তর॥"

নবদ্বীপের গোবিন্দ দত্ত ও গোবিন্দানন্দ (দ্বিজ) ছাড়া অন্য এক গোবিন্দকে জয়ানন্দ কখন কখন গোবিন্দানন্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই উদ্ধৃত বাক্যে পুরী গোসাঞির সেবক গোবিন্দ ও সেই গোবিন্দ এই দুইজনেরই স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে না কি? ইহারা দুইজনই নিরন্তর প্রভুর সঙ্গে থাকিতেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দুই গোবিন্দের এক সময়ে নীলাচলে অবস্থিতির ইঙ্গিত জয়ানন্দ ছাড়া বৈষ্ণববেদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও একটু যেন আছে, তাহা এই :—

একদা জগদানন্দ প্রভুর জন্য কিছু সুগন্ধি তৈল গৌড় হইতে নিয়াছেন; ইচ্ছা—প্রভু ইহা মাথায় দেন, স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে রাত্রে সুনিদ্রা হইবে। প্রভু তাহা শুনিবেন কেন? বলিলেন—জগন্নাথের প্রদীপে লাগিবে, ভালই হইল। শুনিয়া জগদানন্দ তৈল ভাণ্ডটী আনিয়া প্রভুর সম্মুখে আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া বলিতেছেন—"কে বলিল তোমার তরে তৈল আনিয়াছি আমি?" তৈলের এইরূপ সদ্গতি করিয়া জগদানন্দ সেই মুখেই নিজঘরে গিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া উপবাস করিতে লাগিলেন। দুইদিন জগদানন্দ জলবিন্দুও গ্রহণ করিলেন না। ইহা শুনিয়া তৃতীয় দিনে প্রভু স্বয়ং গিয়া রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—"পণ্ডিত! ওঠ, স্নান করিয়া রাঁধ; আজি তোমার ওখানে আমার নিমন্ত্রণ। একথার পর আর কি জগদানন্দের দুঃখ, রাগ থাকিতে পারে? জগদানন্দ উঠিলেন, স্নান করিলেন, এবং তাড়াতাড়ি অন্নাদি পাক করিয়া প্রভুকে সংবাদ দিলেন। প্রভু যথাকালে আসিলেন এবং আহার করিলেন। প্রভু পুনঃ পুনঃ পাকের সুখ্যাতি করিয়া বলিতেছেন, "রাগ করিয়া রন্ধন করিলে এত উপাদেয় হয়, আগে জানিতাম না।" অনন্তর যথা চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য-খণ্ড ১২শ পরিচ্ছেদে—

"তবে প্রভু উঠিয়া করিলা আচমন।
পণ্ডিত আনি দিল মুখবাস মাল্য চন্দন॥
চন্দনাদি লইয়া প্রভু বসিলা সেই স্থানে।
'আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে॥'
পণ্ডিত কহে—'প্রভু যাই করুন বিশ্রাম।
মুই এবে প্রসাদ লইব করি সমাধান॥
রসুইয়ের কার্য্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ।
ইহা সবার দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত॥'

প্রভু কহে—'গোবিন্দ তুমি ইহাই রহিবে।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে॥'
এত কহি মহাপ্রভু করিলা গমন
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন॥
'তুমি শীঘ্র যাই কর পাদসম্বাহনে।
কহিও—পণ্ডিত এবে বসিলা ভোজনে॥
তোমার তরে প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া।
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইও আসিয়া॥'
(তৎপর) রামাই নন্দাই গোবিন্দ আর রঘুনাথ।
সবারে বাঁটিয়া পণ্ডিত দিল ব্যঞ্জন ভাত॥
আপনি প্রভুর প্রসাদ করিল ভোজন।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইলা পুনঃ॥
'দেখ জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না-পায়।
শীঘ্র সমাচার আসি কহত আমায়॥'
কহিল গোবিন্দ দেখি আসি পণ্ডিতের ভোজন।
তবে মহাপ্রভু স্বাস্থ্যে করিলা শয়ন॥'

এই উদ্ধৃত বাক্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে

১। "প্রভু কহে গোবিন্দ তুমি ইহাই রহিবে।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে॥"

প্রভু যে গোবিন্দকে কহিলেন—'গোবিন্দ! তুমি এখানে থাকিয়া দেখ জগদানন্দ আহার করেন কি না, আহার দেখিয়া গিয়া আমারে কহিবে।' সেই গোবিন্দ ধরুণ, ঈশ্বর পুরীর সেবক অঙ্গ সেবার অধিকারী গোবিন্দ।

প্রভু চলিয়া গেলে জগদানন্দ ইঁহাকে বলিতেছেন—

২। "তুমি যাই শীঘ্র কর পাদ সম্বাহনে।
কহিও পণ্ডিত এবে বসিলা ভোজনে॥
তোমার তরে প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া।
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইও আসিয়া।"

ইহা বলিয়া পণ্ডিত এই গোবিন্দকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর জগদানন্দ কি করিলেন? তিনি—

৩। "রামাই নন্দাই গোবিন্দ আর রঘুনাথ।
সবারে বাটিয়া পণ্ডিত দিল ব্যঞ্জন ভাত॥
(৩) আপনি প্রভুর প্রসাদ করিল ভোজন।"

এই যে গোবিন্দ ভোজনে বসিলেন, ইনি কিন্তু প্রভুর পাদসম্বাদনে যান নাই, ইনি এইখানেই ছিলেন। যিনি জগদানন্দের কথায় পাদ সম্বাহনে প্রভুর পাশে চলিয়া আসিয়াছিলেন, প্রভু পুনর্ব্বার তাঁহাকে ফিরিয়া পাঠাইলেন, বলিলেন জগদানন্দ প্রসাদ খাইতেছেন কি না, তাহা দেখিয়া আসিয়া আমায় বলিবে।

৪। "তবে গোবিন্দরে প্রভু পাঠাইলা পুনঃ।
দেখ জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়;
শীঘ্র সমাচার জানি কহত আমায়'।"

এই বিষয়ের জন্যেই প্রথমেই প্র তাঁহাকে জগদানন্দের ঘরে রাখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দের "সেবা যে নিয়ম"—সেবাই তাঁহার জীবন ব্রত ছিল। বলামাত্র তাই তিনি প্রভুর কাছে চলিয়া গিয়াছিলেন। এখন প্রভু তাঁহাকে পুনর্ব্বার পাঠাইয়া দিলে, তিনি জগদানন্দের ঘরে গিয়া দেখিলেন যে রামাই, নন্দাই, গোবিন্দ ও রঘুনাথসহ জগদানন্দ ভোজন করিতেছেন। দেখিয়া গোবিন্দ প্রভুর কাছে গিয়া তাহা কহিলেন এবং শুনিয়া প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিলেন।

৫। গোবিন্দ দেখি আসি কহিল পণ্ডিতের ভোজন।
তবে মহাপ্রভু স্বাস্থ্যে করিলা শয়ন॥"

এই দর্শক গোবিন্দ, ও রামাইয়াদির সহিত ভোজনকারী গোবিন্দ, এই দুই গোবিন্দকে এক সময়েই নীলাচলে উপস্থিত দেখা যাইতেছে। ইঁহাদের মধ্যে একজন সন্ন্যাস গ্রহণকালে কাটোয়ায় প্রভুর অনুগামী এবং সন্ন্যাসান্তে প্রভুর নীলাচলে সহবাসী গোবিন্দ, তাহা স্পষ্টতর। অপর প্রভুর 'পাদসম্বাহন'কারী গোবিন্দকে ঈশ্বর পুরীর সেবক ও ক্ষেত্রে নবাগত গোবিন্দ বলিয়াই জানা যায়।

যদি তাহাই হয়, তবে নীলাচলে প্রভুর সহগামী কৌপীন-করঙ্কবাহী সেই গোবিন্দই প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রাকালেও কৌপীন করঙ্কে বহন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন—"পেছনে পেছনে আমি খড়ি লয়ে যাই। পেছনে থাকাই ইহার স্বভাব—ছায়ার ন্যায় প্রভুর পাছে থাকিতেন। বৃন্দাবন দাসও বলিয়াছেন—"গোবিন্দ পশ্চাতে আগে কেশব ভারতী।" দক্ষিণ-ভ্রমণান্তে ইনি প্রভুর সহিত নীলাচলে আসিয়া নীরবে বাস করিতেছিলেন। ইনিই যে কড়চাকার গোবিন্দ অবস্থাধীন

তাহাই কি বোধ হয় না? অতএব কড়চা জাল নহে—মৌলিক ও প্রামাণ্য গ্রন্থ।

গোবিন্দের কড়চায় যে সব জীবন্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে পূর্ব্বে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কড়চার সম্পাদক নূতন সংস্করণের দীর্ঘ ভূমিকায় প্রত্যেক বিষয়ের সদুত্তর দিয়াছেন। কড়চার বিরুদ্ধে প্রধান কথা ছিল, সন্ন্যাসের মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে প্রভুর জটার উল্লেখ অসম্ভব। "অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যম্" এ সোজা কথাটাও কি জালকারী জানিত না? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে, কড়চা-সম্পাদক অনেক অসম্ভব ঘটনা, অলৌকিক লীলা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি যে ভাবেই উদ্ধৃত করুন, বৈষ্ণবভক্ত উহা অবিশ্বাস করিবেন না। চরিতামৃতের এতটা অসম্ভব কথা বিশ্বাস করা হইলে—পাঁচ মাসে প্রভুর জটা হইয়াছিল, তাহাই বা অবিশ্বাস্য হইবে কেন? ইহা বলিবার অধিকার তাঁহার থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি শ্রীমহাপ্রভুর জটার একটা ব্যাখ্যাও ভূমিকায় দিয়াছেন।

সন্ন্যাসিগণ দীর্ঘভ্রমণকালে কৃত্রিম জটা ধারণের কথা আছে। সন্ন্যাসিগণ সতত মস্তক মুণ্ডন করিলেও ভ্রমণ-কালে কৃত্রিম জটাধারণ করেন। সন্ন্যাসীর প্রথামত মহাপ্রভুও জটা ধারণ করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে রামরূপে হরি দক্ষিণ-গমনকালে যেমন কৃত্রিম জটা ধারণ করিয়াছিলেন—

"জটা চীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্"

এবারেও হরি সেই দক্ষিণ-ভ্রমণকালে তেমনই কৃত্রিম জটা ধারণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ-প্রেমের প্রাবল্যে মহাপ্রভুর জটা খসিয়া পড়িত বলিয়া কড়চায় লিখিত আছে। জটা স্বাভাবিক হইলে খসিয়া পড়িত না, খসিয়া পড়াতেই প্রমাণ হয় যে, জটা কৃত্রিম ছিল। এ সম্বন্ধে ১৩৩৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' গৌরাঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত মল্লিখিত 'নীবীবন্ধ" প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

ভাব-বিশেষের আতিশয্যে, বদন রাগরঞ্জিত হয়। ক্রোধের তাড়নায় বিচলিত ব্যক্তির বদন রক্তিমাকার ধারণ করে বলিয়া ক্রোধের প্রতিশব্দ হইয়াছে 'রাগ'। রসশাস্ত্রের রাগ অষ্টবিধ প্রেমবাচী শব্দ। কোন যুবতী যদি প্রেমাসক্তা হয়, তবে তাহার প্রণয়াস্পদের প্রসঙ্গ করিলে, প্রেমের উদয়ে বদন কি সুন্দর লোহিত রাগ-রঞ্জিত হইয়া উঠে। প্রেমের গাঢ়তাবশতঃ তাহা নবনবায়মান-রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

"প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব মহাভাব হয়॥" (চৈঃ চঃ)

প্রিয়তমের স্মৃতি-উদ্দীপক ভাবের বৈষ্ণবশাস্ত্রে এক পারিভাষিক নাম আছে, উহাকে "উদ্দীপন" বলে। পদচিহ্ন, নূপুরধ্বনি, বংশীধ্বনি প্রভৃতির মধ্যে বংশীধ্বনিই প্রধান উদ্দীপন অর্থাৎ বংশীধ্বনিতে শ্রীমতীর সতত কৃষ্ণস্মৃতি উদ্দীপিত করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য-খঃ ১৭ পরি :—যথা—

"যেবা বেণু কলধ্বনি একবার তাহা শুনি
ব্রজনারী চিত্ত আউলায়।
নীবীবন্ধ যায় খসি বিনামূল্যে হয় দাসী
বাউলি হঞা কৃষ্ণ পাশে যায়॥"

অন্যত্র চরিতামৃতে যথা—

নীবী খসায় গুরু আগে লজ্জা ধর্ম্ম করায় ত্যাগে
কেশে ধরি যেন লঞা যায়।" ইত্যাদি

"নীবী" বস্ত্রবন্ধন-গ্রন্থি। মেয়েরা কাপড় পরিয়া শাড়ির খোঁটে কোমরে যে গ্রন্থি দিয়া বসন আটকাইয়া রাখে তাহা। বৃন্দাবনের মেয়েরা ঘাঘরা পরে এবং কোমরে বেষ্টনী দ্বারা তাহা আট্‌কাইয়া রাখে; নীবী ইহারই নাম। গোপীদের এই নীবী খসিয়া পড়িত—বেণুধ্বনি-শ্রবণে কৃষ্ণপ্রেমের প্রাবল্যে। বেণুধ্বনিতে নীবীর বন্ধন উন্মোচন হয় কেমন করিয়া?

দেহ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে নীবী উন্মোচিত হইতে পারে না। যদি কোন যাদুমন্ত্রে দেহখানি হঠাৎ অপেক্ষাকৃত কৃশতা প্রাপ্ত হয়, তবে দেহ হঠাৎ সরু হওয়ায় কোমরের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতে পারে।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে হরি-বিরহ দশায় দশটী অবস্থা হয়, তন্মধ্যে কৃশতা বা অঙ্গক্ষীণতা একটী, যথা :—

"অঙ্গেষু তাপ কৃশতা জাগর্য্যালম্বশূন্যতা।"

ইত্যাদি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

[illegible] কৃশতা। সচরাচর জ্বরে শরীরে তাপ হয়, [illegible] ফল কৃশতা। সে কিন্তু ক্রমে ক্রমে, প্রেমজ্বরের অর্থাৎ বিরহের তাপের কৃশতা বুঝি নিমেষের মধ্যে হইয়া যায়। অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইলে—রাগ হইলে ঘর্ম হইয়া কাহারো কাহারো পরিহিত বস্ত্র সখে যায়, কেমনে খসে বুঝা যায়না।

াগে বিরহিনী ব্রজকিশোরীদের কৃশতা (অঙ্গক্ষীণতা) কাজেঃ অঙ্গসঙ্কোচ ঘটিয়া নীবী খসিত—কটিবেষ্টনী আল্‌গা হইয়া পড়িত। তখনকার যাদুমন্ত্র ছিল বংশীধ্বনি।

গোপী হয় তো গুরুজনের কাছে আছেন—নিশ্চিন্ত মনে রহিয়াছেন; হঠাৎ মধুর রবে বিশ্ব-বিমোহন বাঁশী বাজিয়া উঠিল, বায়ুস্তর স্তব্ধ হইল, যমুনার স্রোত রুদ্ধ হইল। তার আগেই গোপকুমারীর প্রাণ আনচান করিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। গোপীর নীবী যে কখন খসিয়া পড়িয়াছে, বুঝেন নাই। পার্শ্বচারিণী সহচরী যদি কারণাধীনে তদবস্থ না হইয়া থাকেন তবে তিনিই সখীর কটিবেষ্টন বসন ঠিক করিয়া দিলেন।

বেণুধ্বনি শ্রবণে শ্রীমতীর প্রাণ নাচিয়া উঠিত; পাগলপারা শ্রীমতী-দেহে নানা ভাববিকার বিকসিত হইত। কেবল অশ্রুকম্প পুলক নহে, কেবল উৎকণ্ঠা উদঘূর্ণা প্রস্বেদ নহে, ইহাতে দেহ কখন কখন বিকৃত, সঙ্কোচিত, রূপান্তরিত হইত, সখীরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেন।

কৃষ্ণ-প্রেমের প্রাবল্যে শ্রীমহাপ্রভুর অঙ্গক্ষীণতা ঘটিত, যথা—"ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে।" প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে লিখিয়াছেন—"ক্ষণং ক্ষীণঃ পীনঃ ক্ষণমিহ সাশ্রু" ইত্যাদি। আর তাহাতেই কখন কখন অঙ্গ-সঙ্কোচের আতিশয্যে অঙ্গগুপ্তিবশতঃ তদীয় কূর্ম্মাকৃতির অদ্ভুত বর্ণনা জলন্ত অক্ষরে চরিতামৃতে রহিয়াছে। কি এক অলৌকিক বিধানে তাঁহার হস্তপদাদি দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইত।

এই অপরূপ আকৃতি যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তিনি (রঘুনাথ) লিখিয়াছেন—

"কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ বিব্যজন গৌরাঙ্গ।"

প্রেমের স্রোত যেথায় খরবেগে প্রবাহিত হয়, অঘটন-প্রায় কত ঘটনা নিমেষে সংঘটিত হয়,—নীবী খসিবে [illegible]?

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে যে, একদা শ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ-দর্শনে শ্রীবাস-গৃহ হইতে চলিয়াছেন। গৌরাঙ্গ স্মৃতিতে গৌরানুরাগে প্রেমার্দ্রচিত্ত নিতাই টলিয়া টলিয়া চলিয়াছেন। নিজগৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত বিরাজিত। নিতাইএর যে কিঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল, বিষ্ণুপ্রিয়া-বিশ্বম্ভরের দর্শনে, গৌর-প্রেমের ভীমাবর্ত্তে পড়িয়া বিলুপ্ত হইল; অঙ্গক্ষীণতাবশতঃ জ্ঞানহারা নিতাইএর নীবী খসিয়া গেল। দেবী পলাইয়া গেলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাড়াতাড়ি প্রেমপাগলাকে বসন পরাইয়া দিলেন।

গোবিন্দ দাসের কড়চায় এইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের হরিস্মৃতিতে কৃত্রিম জটার বন্ধন খসিয়া পড়ার উদাহরণ আছে, স্পষ্টই লিখিত আছে :—

"প্রেমভরে খুলে গেল জটার বন্ধন।
চরণে চরণ বাঁধি পড়িল তখন॥
মুখে লালা বহে কত জল নাসিকায়।
জড়ের সমান পড়ি রহে গৌর রায়॥"

মেয়েরা যেমন চুলের বেণী বাঁধে, জটার সেইরূপ। বেণীর খুলার কথা হইতেছে না। বংশীধ্বনিতে ব্রজকিশোরীর কেশ খুলিত না—নীবী খুলিত। শিররুহ (কেশ) কৃত্রিম নহে—স্বভাবজাত; নীবী কৃত্রিম—অঙ্গক্ষীণতায় তাহা খুলিয়া যাইবে।

বংশীরব ও হরিপদচিহ্নাদি উদ্দীপন ইহা বলা হইয়াছে। পদচিহ্ন-দর্শনে কৃষ্ণস্মৃতিতে শ্রীমহাপ্রভুর জটাবন্ধন ও নীবী-বন্ধন একসময়ে খুলিয়া পড়িবার কথাও কড়চায় আছে। নীবীবন্ধনের ন্যায় জটাবন্ধন একই প্রকৃতির, অর্থাৎ উভয়ই কৃত্রিম; একত্রে বর্ণিত হওয়াতে কি তাহাই বোধ হয় না?

গোবিন্দের কড়চায় লিখিত আছে যে, গুণার গিরির উপরে হরিপদচিহ্ন-দর্শনে কৃষ্ণোদ্দীপনে প্রবল প্রেমে শ্রীগৌরাঙ্গের জটা খসিয়া পড়িয়াছিল। কেবল জটা নহে—"জটাবন্ধ" এবং "কটিবন্ধ" অর্থাৎ নীবী খসিয়া পড়িয়াছিল। যথা :—

"চরণ পরসি প্রভু নয়ন মুদিল।
হৃদয় বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল॥

পদ প্রদক্ষিণ করে করতালি দিয়া।
কটিবন্ধ জটাবন্ধ পড়িল খসিয়া॥"

সন্ন্যাসীর দণ্ড গ্রহণ প্রথা—শ্রীমহাপ্রভুর তাহা ছিল। সন্ন্যাসের রীত্যনুসারে তাঁহার জন্মভূমি-দর্শনে যাওয়ার কথা আছে; তখন তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে খড়ম দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীরা যেমন খড়ম ব্যবহার করেন, তাঁহারও খড়ম না থাকিলে দিবেন কেমন করিয়া! কড়চায়ও খড়মের প্রসঙ্গ আছে; তদবস্থায় কৃত্রিম জটা ধারণ এমন অসম্ভবই বা কি? একথা বলা যাইতে পারে।

মহুয়া

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাস

তৃতীয় দৃশ্য

এক ধারে পার্ব্বত্য নদীর পার—বনপথ,
অপর ধারে ভগ্ন মন্দির।

(পারে একটী লোক জাল বুনিতে বুনিতে গান গায়িতেছে)

গান

কানা মেঘারে তুইনি আমার ভাই,
একটুখানি পানি দে রে সাইলের চিয়া খাই।
শুকাইল ক্ষেতরে আমার আসিল আকাল,
কি দিয়া পালিব আমার প্রাণের ছাওয়াল।
দেরে পানি, দেরে পানি, একটুক পানি চাই,
পানি দিয়া বাঁচারে প্রাণ কানা মেঘা ভাই।

(আর একটী লোকের প্রবেশ)

দ্বিতীয় লোক।
আরে বন্ধু, থামা এখন তোমনা গানের পালা,
ঐ দেখ্ নারে আসে দুজন দিয়া গাছের তলা।
আজরে বুঝি সুদিন এলো পথিক আসে তাই,
ছুরিখানি শানায়ে লই আড়ালে আয় ভাই।

প্রথম লোক।
আর না বন্ধু মানুষ মার, আর না পরাণ সরে,
দিবারাত্রি শঙ্কা রয় রে, মনটা পুইড়া মরে।

দ্বিতীয়। রাখ রে তোর এই ধর্ম্মের বড়াই আড়ালে আয় ত্বরা,
গোল করিস্ না,নইলে দেখবি ছাওয়ালের মুখ মরা।

(প্রথম লোকটাকে দ্বিতীয় লোকটী টানিতে টানিতে অন্তরালে লইয়া গেল। প্রথম লোকটী রাগে প্রস্থান করিল)

আর এক দিক হইতে মহুয়া ও নদেরচাঁদের প্রবেশ)

মহুয়া। পাহাড়ীয়া ভীষণ নদী ঢেউয়ে মারে বাড়ি,
কিবা সম্বল আছে মোদের কেমনে দিই পাড়ি।
চড়না পড়ি যাওরে নদী দুচার দণ্ডের লাগি,
পারে উঠি যাইব মোরা এইত ভিক্ষা মাগি।

নদেরচাঁদ।
ভাসিয়োনা মহুয়ারে নৌকা কাটে দেখি,
মাঝির হইলে দয়া মোরা পারে গিয়া ঠেকি।

(দ্বিতীয় লোকটীর প্রবেশ। নদেরচাঁদ তাহাকে সম্বোধন করিয়া)

শুন শুন শুন মাঝি এই যে ভিক্ষা মাগি,
নৌকাখানি বাওনা তুমি একদণ্ড লাগি।
গভীর দেখি নদীর জল যে উপায় নাহি জানি,
পার করিয়া দিলে বাঁচে এ দুটী পরাণী।

দ্বিতীয় লোক।
কোন আসমানের চাঁদ গো তোমরা কোন আস্মানের তারা?

নদেরচাঁদ। আমরা দুটী বনবাসী আমরা গৃহছাড়া।

দ্বিতীয় লোক। (একান্তে)

এইনারে কন্যারে দেখি সোণার বরণ,
পাইতে তারে মন তো আমার করে উচাটন।
কাল কাল ডাগর আঁখি লম্বা মাথার চুল,
বিধি না মিলাইল আজি মধু ভরা ফুল।
লইয়া যাইত নদীর পারে এখন এই বেলা,
পুরুষটারে হঠাৎ দিব জলে এক ঠেলা,
ডুবেবে গিয়া জলের তলে কিসের আর ভয়,
কন্যা তখন আমার ঘরে যাইবে সুনিশ্চয়।

মহুয়া। (চুপে চুপে নদেরচাঁদকে)

মাঝির ভঙ্গী দেখি আমার মনে শঙ্কা জাগে,
নৌকায় উঠি কাজ নাই চল পলাই গিয়া আগে।

নদেরচাঁদ। (চুপে চুপে)

কোথায় আর গো যাবে কন্যা উপায় কিছু নাই,
মাঝির খেয়ায় পারে চল যা করেন গোঁসাই।

দ্বিতীয় লোক।

আস তবে নদীর পারে নৌকায় চড়ি গিয়া,
যেখানে বলিবে আমি দিব পৌছাইয়া।

(সকলে অগ্রসর হইয়া জলের কাছে পৌছিতেই মাঝি নদেরচাঁদকে ধাকা দিয়া জলে ফেলিয়া দিল। নদেরচাঁদকে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া মহুয়া ঝাঁপ দিতে গেল, মাঝি আসিয়া তাহাকে জোর করিয়া ধরিল)

মহুয়া। (কাঁদিতে কাঁদিতে)

যে ঢেউয়ে ভাসায়ে নিল আমার নদেরচাঁন,
সে ঢেউয়ে ডুবিয়া আমি ত্যজিব পরাণ।

মাঝি। কেন কন্যা পরাণ দিবে বৃথা অকারণ,
আমারে ভজিয়া তুমি রাখ আমার মন।
এমন সোণার পানসী তুমি তাতে মাঝি নাই,
যৌবন চলি গেলে কন্যা কেউ না দিবে ঠাঁই।
ফুলে ভরা মধু তুমি ফির একেশ্বরী,
তোমারে লভিয়া আমি বাঞ্ছা পূর্ণ করি।

মহুয়া। আমি বড় অভাগিনী তোমার দয়া মাগি
পরাণ আমার ফাটি যায় রে প্রাণের স্বামী লাগি।

মাঝি। দুঃখ তোমার বৃথা কন্যা আস আমার সাথে,
ঠকুরাণী হ'বে তুমি রবে আমার মাথে।
বসন-ভূষণ দিব আমি দিব নীলাম্বরী,
নাকে কাণে দিব ফুলরে কাঁচা সোণায় গড়ি।
চন্দ্রহার গড়ায়ে দিব নাকে দিব নথ,
নূপুরে ঝুনঝুনি কন্যা দিব মনোমত।
গন্ধতেলে বান্ধি দিব তোমার কালো কেশ,
সাথে রবে দাসীবাদী নাহি কিছু ক্লেশ।

(একটু থামিয়া)এই নাওগো পানের বাটা পান সাজিয়া খাও,
আর ঐ হাতে বানায়ে পান আমায় একটা দাও।

(মহুয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া পান সাজিল, মাথায় পাহাড়ীয়া তক্ষকের বিষের বড়ী ছিল, পানের চুণ ও খয়েরে বিষ মিশাইল)

মহুয়া। (একান্তে)

এইবার বুঝি আমার পরাণ রাখেন ভগবান্
চুণ-খয়েরে বিষ দিয়া তো সাজি দিছি পান।

মাঝি। (পান খাইতে খাইতে)

কি পান দিছ কন্যা আমায় গুণের অন্ত নাই।
তোমার কোলে মাথা রাখি সুখে নিদ্রা যাই।

(বিষপান খাইয়া মাঝি ঢলিয়া পড়িল, কন্যা ছাড়া পাইয়া মাঝিরে জলে ফেলিয়া দিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করিল)

(কিয়ৎক্ষণ পরে হুমড়া ও মাণিকের প্রবেশ)

হুমড়া। এত ঘুরলাম তবু তো রে মহুয়া মিলিল কই?
আছে কি সে জলের তলে? ওই বুঝিরে ওই!
আহা ওরে বাছা আমার, কে জলে ডুবাল,
নদেরচাঁদ কি ভুজি মধু বাসি ফুল ছড়াল?

পাপিষ্ঠরে বক্ষে তোর দিব বিষের ছুরি,
কেমনে রে করলি দেখি বেদের মেয়ে চুরি।
ওই বুঝিরে জলের তলে মহুয়া কাঁদিয়া ডাকে,
যাই, যাই, যাই রে মাণিক, তুলি আনি তাকে।
কোথায় ওরে মোর দুলালী গভীর জলের তলে,
তোমায় আনতে বাপের কোলে পড়ব আমি জলে।

(ঝম্প-প্রদানের উদ্যোগ এবং মাণিকের হস্তধারণ)

মাণিক। কি হ'বে ভাই ত্যজিলে প্রাণ নদীতে ডুবিয়া,
পাবে কি মহুয়া সেথা আপনি মরিয়া।

হুমড়া। দিব আমি মাণিক ভাইরে নদীর জলে ঝাঁপ,
মরি যদি জুড়ায় তবে যত প্রাণের তাপ।

(আবার ঝম্প-প্রদানে উদ্যত)

মাণিক। (ধরিয়া লইয়া)
চল ভাইরে খুঁজি গিয়া মহুয়া যে কোথা,
নদেরচাঁদের সঙ্গে আছে আমরা যাব সেথা।
এস এস বেদের রাজা তারে আনি ফিরা,
নদেরচাঁদের বক্ষ ভেদি শাবক আনব ছিড়া।

(হুমড়াকে টানিয়া লইয়া—মাণিকের প্রস্থান)

(অপর ধার দিয়া ভগ্ন মন্দিরের কাছ দিয়া নদেরচাঁদকে অনুসন্ধান করিতে করিতে মহুয়ার প্রবেশ)

মহুয়ার গীত—

কোন্ গগনে ফোটে ফুলরে কোথায় জলে মণি,
কোথায় আমার প্রাণের রাজা অতল প্রেমের খনি।
বনের পাখী কওন্ কথা,
কওনা কথা তরুলতা,
ঢেউয়ে ভাসি বঁধু কোথা গেল বল শুনি।
দেখ কেঁদে কেঁদে ঘুরি,
ওগো ময়ুর ময়ূরী,
কওনা কথা দয়া করি তুলি মধুর ধ্বনি।
দরিয়ায় গলিয়া পড়ে আমার গলার মণি,
কোথায় আমার প্রাণের রাজা অতল প্রেমের খনি।

(অনুসন্ধান করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইতে)

নাইরে নাইরে বন্ধু আমার, নাইরে পরাণ তার,
বিধাতা করিল দুঃখী দুখিবা কারে আর।

মহুয়া। আমার লাগি ছাড়ল বন্ধু সকল সুখের আশা,
আমার লাগি নদীর কূলে করল আসি বাসা।
ঘর-বাড়ী ছাড়ল বন্ধু আমার লাগিয়া,
পরাণ হারায় আসি হেথায় জলেতে ডুবিয়া।
এই না নদীর জলে ডুবি আমিও মরিব,
বৃক্ষডালে ফাঁস দিয়া কি পরাণ ত্যজিব।

(হাটিতে হাটিতে ভগ্ন মন্দিরের দিকে গমন এবং মন্দিরের নিকট মৃতপ্রায় নদেরচাঁদকে দর্শন)

মহুয়া। (চমকাইয়া উঠিয়া)
হোথায় কেরে, হোথায় কেরে ঐ না নদেরচাঁন!
কোথায় তাহার সোনার বরণ সুন্দর বয়ান।

(নদেরচাঁদের পদপ্রান্তে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেবা করিতে লাগিল)

(এমন সময় এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

মহুয়া। (সন্ন্যাসীকে দেখিয়া মহুয়া সন্ন্যাসীর চরণ ধরিয়া)
কে আপনি গহন বনে প্রবীণ সন্ন্যাসী,
দয়া করি অভাগীরে দেখুন হেথা আসি
স্বামী আমার চেতনহারা বিষম জ্বরে কাতর,
বাঁচান তারে দূর করিয়া দাসীর বুকের পাথর।

সন্ন্যাসী। কেঁদোনা কেঁদোনা কন্যা উঠ ছাড়ি চরণ,
রক্ষা করি দিব আমি তোমার পতির জীবন।

(সন্ন্যাসী একটী বৃক্ষের পাতা তুলিয়া দাঁত দিয়া চিবাইয়া নদেরচাঁদের কপালে ও বুকে প্রলেপ দিলেন। অল্পক্ষণ পরে নদেরচাঁদ চেতনা পাইয়া উঠিয়া মন্দির-দ্বারে ঠেস দিয়া বসিল)

সন্ন্যাসী। শুন কন্যা শুন কথা এস বনের মাঝ,
প্রাণে বাঁচল তোমার পতি, আছে তবু কাজ।
পূর্ণিমার আজ নিশিশেষে শনিবারের দিন,
ঔষধ তুলতে যাবে কন্যা থাকতে দণ্ড তিন।

(সন্ন্যাসীর সঙ্গে মহুয়া অগ্রসর হইল, বনের অপর ধারে —নদেরচাঁদের দৃষ্টির বাহিরে গিয়া সন্ন্যাসী মহুয়াকে বলিল)

সন্ন্যাসী। তোমার রূপে শোন কন্যা যোগীর ভাঙ্গে যোগ
এই কারণে হ'ল তোমার এত কষ্ট ভোগ।

সুখের দেখা এ জীবনে মিলিবে না আর,
দোষী তোমার নিজের কপাল ঘোচায় সাধ্য কার।

মহুয়া। (সন্ন্যাসীর চরণ ধরিয়া)
অভাগী দুঃখিনী আমি ছেড়েছি সব আশ,
স্বামীর পরাণ রক্ষা করুন করুণানিবাস।

সন্ন্যাসী। (মহুয়ারে তুলিয়া করুণাব্যঞ্জক স্বরে)
জন্ম হ'তে মন্দভাগ্য মহুয়া তোমার,
ব্রাহ্মণকন্যা বাস করিলে বেদেরি মাঝার।
অশুভ মুহূর্ত্তে হ'ল বামনকান্দে গতি,
কি কুক্ষণে হ'ল তোমার নদেরচাঁদে মতি।

মহুয়া। স্বামীরে বাঁচাতে চাহি সত্য কহি বাণী,
তার তুলনায় পরাণ আমার অতি তুচ্ছ মানি।

সন্ন্যাসী। এস কন্যা আমার সাথে বলি দুটী কথা,
দেখি যদি ঘোচে তব প্রাণের কাতরতা।
ভাগ্য তোমার রোধ করিতে সাধ্য বুঝি নাই,
যোগের ফলে তথ্য কিছু দেখি যদি পাই।

(সন্ন্যাসীর সহিত মহুয়া বাহিরে চলিল। নদেরচাঁদ পূর্ব্বচেতনা লাভ করিয়া মন্দিরের দ্বারের নিকট নিদ্রামগ্ন হইল)

(হুমড়া, মাণিক ও পালঙ্কের প্রবেশ)

হুমড়া। বল বল তরুলতা বল পশুপাখী,
নদেরচাঁদ সে মহুয়ারে কোথায় নিল রাখি।
জান না কি জান না গো কোথায় বেদের বালা!
কোথায় আমার ঘরের দীপটী বনের কোণে জ্বালা।
(চারিদিকে চাহিয়া)
ও পথেতে গেছে কি সে ঐ বনেরি ধারে,
নদেরচাঁদ কি রাখে ধরি আমার মহুয়ারে?
ঐ উঠে কি কান্নার ধ্বনি, মহুয়া কি কাঁদে?
দুঃখ দিছে নদেরচাঁদ রে ছলে ধরি ফাঁদে।
বাইরে কন্যা বাইরে আমি আনব তোরে কাড়ি,
এই ছুরিতে নদেরচাঁদের বক্ষ দিব ফাড়ি।

(হুমড়ার প্রস্থান)

মাণিক। (পালঙ্কের দিকে চাহিয়া)
কি ভাবিস পালঙ্ক বেটী একা বসি বসি,
নয়ন হ'তে দৃষ্টি যেন পড়িতেছে খসি।

পালঙ্ক। কি হ'বে মহুয়া সখীর ভাবি বসি তাই,
বেদের হাতে পড়লে তাদের রক্ষা বুঝি নাই।

মাণিক। যে ভাবে ক্ষেপেছে সবে মহুয়া খুঁজিতে,
কি হ'বে যে নদেরচাঁদের পারি না বুঝিতে।
জান কি পালঙ্ক বেটী উপায় কিছু জান,
মহুয়া আর নদেরচাঁদে রক্ষা করি আন।

পালঙ্ক। উপায় কিছু জানি না তো বুঝিতে পারি না,
কেমনে সখীরে বাঁচাই আমি তো জানি না।
সখীরে বলেছি পথে বাঁশীটা বাজাব,
তা হ'তে বিপদের কথা তাহারে বোঝাব।
সখীর তরে দিবারাত আমার কাঁদে প্রাণ,
ভাবি সদাই বাঁচান তাদের সদয় ভগবান্।

মাণিক। চল তবে পথে তুমি বাঁশীটা বাজায়ে,
সে রবে বুঝিবে বিপদ্ এসেছে ঘনায়ে।
হয় তো বুঝি এ বন ছাড়ি যাবে পলাইয়া,
এ হ'তে কি উপায় আছে দেখি না ভাবিয়া।

(মাণিকের প্রস্থান)

পালঙ্ক। চল যাবে বনে বনে সখীরে খুঁজিতে,
পরাণ আমার আকুল কেন পারি না বুঝিতে।

গাত

পড়ে ক্ষণে ক্ষণে সে বদন মনে,
পরাণ আকুল ধায়।
হৃদয়ে ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া
নিয়ত বাসনা চায়।
তাহারি বিহনে আঁধার জীবনে
আর কিবা আসে যায়,
সে অমিয় হাসি হেরি সুখে ভাসি
পুরেনা এ আশা হায়।
তাহারি পরশে মোহের আবেশে
পরাণ কি সুখ পায়,
সে মোর বাসনা প্রাণের কামনা
আর না মিটিল হায়।

(পালঙ্কের প্রস্থান)

(ভোর হইয়া আসিল। মহুয়া নদেরচাঁদের ঔষধ আনিয়া তাহার নিকট উপবেশন করিল। নদেরচাঁদ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া মহুয়ার হাত ধরিয়া বসিল। মহুয়া গান ধরিল)

গীত

বনে বনে ফিরি মোরা বনে বনে রই,
দোঁহার প্রেমে সুখী তবু যতই দুখ সই।
মোদের নাইরে কোনও ঘর,
মোদের নাইরে আপন পর।
পশুর সাথে ফিরি মোরা বনে বনে ধাই,
পাখীর সাথে কণ্ঠ মিলাই ফুলের মধু খাই।
আমি জানি শুধুই জানি
তুমি আমার নয়ন মণি।
আমি তোমর চরণ বাঁদী, চরণ তলে ঠাঁই।

নদেরচাঁদ গাহিল—
আমি তোমার একলা রাজা, রাণী তুমি তাই।

পরে, নদেরচাঁদ। (সম্মুখের দিকে তাকাইয়া)
সামনে দেখ পাহাড়-নদী সাঁতার দিয়া যায়,
বনের কোকিল "বউ কথা কও" ডালে বসি গায়।
এইখানেতে বাঁধি এসো নিজের বাসা ঘর'
এইখানেতে থাকব মোরা প্রফুল্ল অন্তর।
সামনে দেখ নদীর বুকে ঢেউয়ে খেলে পানি,
এইখানেতে রব মোরা দিবস-রজনী।
চৌদিকেতে রাঙ্গা ফুল ও ডালে পাকা ফল,
এইখানেতে আছে কন্যা মিঠা ঝরণা-জল।

(কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া উভয়ে মালাম পাথরে উপবেশন করিল, নদেরচাঁদের কোলে মাথা রাখিয়া মহুয়া শয়ান করিল। এমন সময়ে অকস্মাৎ দূরে বংশীধ্বনি হইল, মহুয়া চমকাইয়া উঠিয়া বসিল)

মহুয়া। ওকি, ওকি. ওকি ধ্বনি বাজল বনের ধারে,
কি যেন গো ভীষণ শঙ্কা জাগাল অন্তরে।

নদেরচাঁদ। কি কারণে কন্যা তুমি হ'তেছ চঞ্চল,
কি কারণে বদন তোমার হ'তেছে বিকল।
প্রকাশ করি বল তোমার জন্ম-বিবরণ,
বেদের সঙ্গে কেন তুমি কর বিচরণ
শুনালে তো কতক কথা সেদিন বিজনে,
ছোটকালে হুমড়া বেদে চুরি করি আনে।

মহুয়া (কান্দিয়া)।
আজি যদি বাঁচি বন্ধু কহিব সে কথা,
শুন শুন হঠাৎ কেন বাজল প্রাণে ব্যথা।
দূর বনে ঐ বাজল বাঁশী শুনছ তুমি কানে,
আস্‌ছে জেনো বেদের দলে বধিতে পরাণে।
আমার যে গো পালঙ্ক সই বাঁশী বাজাইল,
সামাল দিতে পরাণ মোদের ইসারায় কহিল।
আজকে তুমি থাক বন্ধু আমার বুকে শুইয়া,
আর না দেখব মুখটী তোমার পরে ত উঠিয়া।
বনের খেলা সাঙ্গ হল যাব যমের দেশ,
বিদায় দাও গো, বিদায় এবার, বলি যে বিশেষ।

(শিকারী কুকুরের সহিত হুমড়ার দলের প্রবেশ।)
(নদেরচাঁদ ও মহুয়ার সম্মুখে হুমড়ার ছুরি হস্তে অবস্থান।)

হুমড়া। এই তো পেয়েছি এই, নাহি রে নিস্তার,
বিষাক্ত এই ছুরি দিয়া দুষমণেরে মার।
প্রাণে যদি বাঁচবি কন্যা আমার কথা ধর,
নদেরচাঁদে মারি তুই রে সুজন বিয়া কর।

মহুয়া। কেমনে এই ছুরির ঘায়ে পতিরে বধ করি,
মেরোনা মেরোনা তারে, আমি আগে মরি।
কেমন করি যাইব দেশে বন্ধুরে মারিয়া,
অন্য কোন জনে আমি না করিব বিয়া।
আমার বন্ধু চন্দ্র সূর্য্য কাঞ্চা সোনা জলে,
তাহার কাছে সুজন বেদে জোনি হেন চলে।

নদেরচাঁদ। মিছে কেন ভাব কন্যা আমারে তুমি মার,
তুমি নিজে সুখে থাক আমার কথা ধর।

মহুয়া। না, না, না, যাব না দেশে বন্ধুরে মারিয়া,
তাহার আগে প্রাণ দিব ছুরিতে মরিয়া।
(হুমড়ার পদতলে পড়িয়া)
আমার চক্ষু নিয়া তুমি একবার দেখি যাও,
এমন সোনার চাঁদে তুমি কেন মারতে চাও

হুমড়া (গর্জ্জিয়া)।

না, না, না, শুনব না আমি, নে রে ছুরি হাতে,
ইহারে মারিয়া এখন চল্‌রে আমার সাথে।

মহুয়া। (একবার পতির পানে চাহিয়া; একবার সখার পানে চাহিয়া)

শুন শুন প্রাণপতি বলি যে তোমারে,
জন্মের মত বিদায় দাও হে তোমার মহুয়ারে।
শুন শুন পালঙ্ক সই শুন বলি কথা,
তুমি তো জানগো আমার প্রাণের যত ব্যথা
শুন শুন হুমড়া বেদে বলি হে তোমায়,
ছোটকালে কার ধনেরে আনেছিলে হায়।
জন্মিয়া না দেখি কভু বাবা আর মোর মায়,
কর্ম্মদোষে এতদিনে পরাণ আমার যায়।

(হুমড়ার হস্ত হইতে ছুরি লইয়া নিজের বক্ষে আঘাত ও পতন)

নদেরচাঁদ। কই কই কোথায় যাও গো নদেরচাঁদে ছাড়ি।

(মহুয়ার বক্ষের নিকট উপবেশন)

হুমড়া। (দৌড়াইয়া আসিয়া)

না, না, ছুবমণ ছাড়বে কেন ? যাও তো সঙ্গে তারি।

(নদেরচাঁদের বক্ষে ছুরিকাঘাত এবং নদেরচাঁদের মহুয়ার বক্ষে পতন)

মস্তকাবরণ

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

মস্তকাবরণ দুই শ্রেণীর—এক শ্রেণী শোভার জন্য, অপর শ্রেণী মস্তকটাকে শাতাতপ হইতে রক্ষার জন্য। শ্রীকৃষ্ণের মোহন চূড়া, রাজার মুকুট ও বিবাহের টোপর প্রথম শ্রেণীর; বাঁশ ও খড় দ্বারা নির্ম্মিত কৃষকের "মাথাইল" দ্বিতীয় শ্রেণীর।

এই দুই শ্রেণার অন্তর্গত যে কত বিভিন্ন প্রকারের মস্তকাবরণ পৃথিবীতে প্রচলিত আছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। রুচির বিভিন্নতা ও প্রয়োজনের বিভিন্নতা মানুষের মস্তকাবরণে এত বিভিন্নতার সৃষ্টি করিয়াছে যে মানুষও বোধ হয় মূলতঃ তত বিভিন্ন নয়। মস্তকাবরণ দেখিয়া প্রায়ই জনসঙ্ঘের মধ্য হইতে লোকটী কোথাকার অধিবাসী তাহা নির্ণয় করা চলে। বাঙ্গালী বাবুর বেলায় অবশ্য বেশ একটু মুস্কিল ঘটে, কারণ বাঙ্গালী সাধারণতঃ—"নেড়া শির", আর সুবিধা বা খেয়ালের বশে অন্য যে কোন জাতির পাগ্‌ড়ী বা টুপী ব্যবহার করিতে সিদ্ধহস্ত। উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালী চিরকাল এমন ছিল না, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পাগ্‌ড়ী ব্যবহারের অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু এখন যে কারণেই হউক বাঙ্গালীর জাতীয় মস্তকাবরণের অভাব সকলেরই দৃষ্টিতে পড়ে।

মস্তকাবরণ আবিষ্কার করিতে সম্ভবতঃ আদিম মানবের অধিক দিন লাগে নাই। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে যে মাথাটা বাঁচান আবশ্যক সে জ্ঞান খুব শীঘ্র হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথমতঃ লতা-পাতা, গাছের বল্কল কি ঐ রকম কিছু দ্বারা মাথাটা ঢাকা হইত এইরূপই মনে হয়। ক্রমশঃ কাপড়, চামড়া, শোলা ইত্যাদি কাজে লাগান হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে পাখীর পালক ও নানা রকমের বাহারের উপাদান ও ব্যবহারে আসিয়াছে। আর জিনিসটা যাহাতে মাথার উপর শক্তভাবে লাগিয়া থাকে, বাতাসের সঙ্গে উড়িয়া না যায়

তাহারও নানা রকমের ফিকির আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে কোন উপাদানই এ পর্য্যন্ত সেই আদিম-যুগের লতা-পাতাকে সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। মুকুটের প্রচলনের আরম্ভ হইতেই বোধ হয় রাজা-রাণীদের মুকুটে বাহার চলিয়াছে। প্রাচীন মিশরের বিখ্যাত রাজা তুতান খামেন ও তাঁহার রাণীর ছবিতে যে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত লম্বা মুকুটের সমাবেশ দেখা গিয়াছে তাহা অবশ্য এ যুগের জিনিস নয়, আর মুকুটও হঠাৎ ধরাধামে দেখা দেয় নাই।

ইউরোপের লোক সকলেই টুপীওয়ালা হইলেও টুপীতে টুপীতে অনেক পার্থক্য। ইউরোপ জড়ান কাপড়ের ভক্ত নয়, পাগড়ী সেখানে অপরিচিত। ইউরোপের টুপী সাধারণতঃ 'হ্যাট' ও 'ক্যাপ' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। 'ক্যাপ' অপেক্ষা 'হ্যাট'-জাতীয় টুপী যে অধিক কার্য্যকর—অন্ততঃ দিনের বেলায় তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। তাই আজ দেশবিদেশে—প্রাচী ও প্রতীচীতে—হ্যাটের এত প্রচলন; কেবল পুরুষদিগের মধ্যে নয় স্ত্রীলোকের মধ্যেও। সেকালে কিন্তু স্থানে স্থানে 'ক্যাপ্'-এর একটা বিশেষ প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা ছিল। রোমে ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়ার সময় তাহার মাথায় স্বাধীনতার ধ্বজাস্বরূপ 'ক্যাপ' পরাইয়া দেওয়া হইত। রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম্মযাজকদিগের গুরু ইটালীর পোপ-রাজারাজড়া-দিগকে সম্মানের চিহ্নস্বরূপ 'ক্যাপ' উপহার দিতেন।

'হ্যাট' ও 'ক্যাপ্' এর ব্যবহার একই জাতির মধ্যে যে কত বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত অব্যবসায়ীর পক্ষে তাহার হিসাব দেওয়া কঠিন। সকাল বেলা টুপীর ব্যবহার হইবে, সন্ধ্যায় কোন টুপী, মজলিসে কোন টুপী পরিয়া যাইতে হইবে, ভোজনের নিমন্ত্রণে কোন টুপী ইত্যাদি সম্বন্ধে ইউরোপের সম্ভ্রান্ত সমাজ এত বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে যে বাহিরের লোকের পক্ষে তাহা ভালরূপ জানিতে হইলে রীতিমত গুরুমহাশয়ের প্রয়োজন।

প্রত্যেক প্রকার টুপীতেই আবার দেশকাল-পাত্র-ভেদে কত বৈচিত্র্য! কোন হ্যাট্ কেবল মাথার উপর বসিবার মত স্বল্পায়তন বিশিষ্ট, কোথা ও বা উহা খোলের উপরি ভাগে প্রকাণ্ড লম্বা, কোথাও বা মাথার চারিদিকে সামান্য বিস্তৃত, কোথাও বা বিস্তার এত বেশী যে হ্যাটের পাশটাকে কোঁকড়াইয়া ছোট করিতে হয়। 'ক্যাপ্' কখন মাথার খুলিটী জড়াইয়া থাকে মাত্র, আবার কখন উর্দ্ধ দিকে, কখন অধোদিকে কখন পার্শ্বদেশে নানা আকার শোভারে বহর তুলিয়া ধরে। আর পাগড়ী? তিনিই কি কম যাবার পাত্র? গাছের পাতা ও পাখীর পালক হইতে আরম্ভ করিয়া কোন্ জিনিসই বা তিনি কাজে না লাগান? আবার, তাঁর ভঙ্গিমাই বা কত রকমের?

যে সকল হ্যাটে সৌন্দর্য্য জ্ঞান কম,প্রয়োজনীয়তাব জ্ঞান বেশী তাহার মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে কোরিয়া ও মেক্সিকো দেশের হ্যাট্। দুইটাই পাশে বেশ চওড়া—রৌদ্রবৃষ্টির সময় বুঝিতে পারা যায় যে হ্যাঁ মাথায় কিছু আছে; আমাদের দেশের কৃষকদের ব্যবহৃত "মাথাইল"-এর সঙ্গে এ গুলির বেশ সাদৃশ্য আছে এবং আমাদের "মাথাইল", এগুলি দেখিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অভিব্যক্ত হইতে পারে।

টুপীর বাহারে পুরুষের উপর মেয়েরাই জিতিয়াছে—কোন বাহারেই বা নয়? ইংরাজী কবিতায় আছে—কোন রমণীর অন্তঃকরণ সোণাকে ঘৃণা করিতে পারে? বাস্তবিক সোণামণিমুক্তা যে একেবারেই অবজ্ঞার জিনিস নয়, মাথার টুপীকে পর্য্যন্ত ঝল্‌মল করাইবার জিনিস তাহা মেয়েরাই ভাল বোঝে। রাজা-রাণীদের গণ্ডীর বাহিরে যে সকল স্ত্রীলোক চক্‌চকে মণি-মাণিক্যখচিত মস্তকাবরণ ব্যবহার করে তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য মঙ্গোলিয়ার উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোক। এক দিকে সোণা-মণি-মাণিক্য, অন্য দিকে কাপড়ের উপর শিল্প-কার্য্যের বাহারে ইহাদের টুপী অপূর্ব্ব। মাঞ্চুরিয়ার স্ত্রীলোকদের সুঠাম মস্তকাবরণও ইহাদের কাছে বিশেষ হার মানে না। ফ্রান্সের আলসাস্ প্রদেশের রমণীগণের টুপী কাপড়ের বাহারে তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরও ফুটাইয়া তোলে। হল্যাণ্ডের সুন্দরীদের পাখাওয়ালা ও লেস্ দেয়ওা টুপী সম্বন্ধেও ঐ কথা। প্যালেষ্টাইনের মাথার টুপীর উপর মেয়েরা বিবাহের যৌতুক সোণারূপা সাজাইয়া জম্‌কাল ভাবে রাস্তায় বাহিরে হয়। চিলির মেয়েদের গির্জ্জায় যাওয়ার সময় মাথা ও শরীর ঢাকিয়া যে আবরণ ব্যবহার করিতে হয় তাহা আজকালকার অর্দ্ধ নগ্ন নারীদিগের

নিকট হাস্যকর মনে হইতে পারে কিন্তু বাস্তবিকই বেশ শোভন। উত্তর আফ্রিকার অনেক মেয়ে পেছন দিকে লম্বা ফ্যাটাঝুলান যে পাগ্‌ড়ী ব্যবহার করে তাহা দরবারী বাবুদের হিংসার উদ্রেক করিতে পারে।

আমাদের প্রতিবেশী কাবুলীয়া যে মাথায় পিরামিডের মত ক্রমশঃ সরু-টুপী ব্যবহার করে ও চারিদিক্ কাপড় দিবা জড়ায় সেও টুপী-জগতে একটা দর্শনীয় জিনিস। মণিপুরেরর মাঝিদের গালপাট্টা বান্ধা পালক-লাগান পাগ্‌ড়ী আর একটা।

কতকগুলি অসভ্য জাতির টুপী অদ্ভুত রকমের। যুদ্ধের সময়, নৃত্যের সময়, বৎসরের সময়, কার্য্য-বিশেষের সময় ইহারা লতাপাতা, কাপড়, পালক, শামুক, কড়ি ইত্যাদি জড়াইয়া এত রকমের টুপী ব্যবহার করে যাহার কথা সভ্য মানুষের মাথায়ই অনেক সময় ঢোকে না। চীন-দেশে নম্ব নামক এক আদিম জাতি আছে তাহাদের মেয়েরা মাথায় লম্বা চুলের সঙ্গে রংকরা পশম জড়াইয়া এমন এক অপূর্ব্ব টুপী তৈয়ার করে যাহা আর খুলিয়া রাখার যো থাকে না—সিন্ধবাদ নাবিকের বোঝার মত সর্ব্বদাই মাথা আঁকড়াইয়া থাকে। অনেক অসভ্য জাতি লতাপাতা দিয়া এমন করিয়া মাথা ও গা ঢাকিয়া বীভৎস বেশ ধারণ করে যে দেখিলে দূর হইতে সেলাম করিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হয়।

জল-বায়ুভেদে ও ব্যবসায়ভেদেও টুপীর কি বৈচিত্র্য! লাপ্‌লাণ্ডের উলের ন্যাটাবান্ধা টুপী ও এস্কিমোর চামড়ার টুপী দেশের অবস্থারই উপযোগী; যোদ্ধাদের লৌহনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ চির-প্রসিদ্ধ। কত প্রাচীন কাল হইতেই উহা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আকারে প্রচলিত আছে। প্রাচীন গ্রীক্ ও ইহুদীদের হেল্‌মেট্ সেকালে যুদ্ধের সময় উহাদের কতই উপকারে আসিত। আমাদের দেশেই কি দেশোপযোগী শিরস্ত্রাণের অভাব ছিল? ধর্ম্মযাজকদিগের টুপীর মধ্যেই কি বৈচিত্র্য কম? বৌদ্ধ লামাদের তো কথাই নাই। খৃষ্টান পাদরীদের মস্তকারণেরই বা পদমর্য্যাদানুসারে কত রকমের বিভিন্নতা ও কারিকুরী!

বিচারক দিগের 'উইগ্' ও ব্যবসায় ভেদে মস্তকাবরণের বৈচিত্র্য। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সুবিখ্যাত পর্য্যটক ইবন-বতুতা লিখিয়া গিয়াছেন যে আলেকজান্দ্রিয়ার কাজীরা মাথায় যে প্রকাণ্ড পাগড়ী পরিতেন প্রাচ্য বা পাশ্চত্য-জগতে এত বড় পাগ্‌ড়ী তিনি আর কোথাও দেখেন নাই। পাশ্চাত্য ধীবর ও 'নার্স' দিগের টুপী প্রাচীন কাল হইতেই কিছু বিচিত্র রকমের। নাবিকদের-টুপী, পুলিশের টুপী সম্বন্ধেও ঐ কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্র্যাজুয়েটে' বা যে স্লেটের মত জিনিস মাথায় পরিয়া উপাধি লইতে যান সেও তো জীববিশেষের জন্য আবিষ্কৃত মস্তকাবরণ বিশেষ।

এক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ও জাতির দিকে তাকাইলেই মস্তকাবরণের কত বৈচিত্র্য দৃষ্টিতে পড়ে। মুসলমানের ফেজ, তাজ, সাদাকাপড়ের গোল টুপী, জরির টুপী ইত্যাদি, বেহার ও যুক্তপ্রদেশের নানারকমের গোল টুপী, পাঞ্জাবী ও মাদ্রাজীর পাগড়ী, মারহাট্টা ও সিন্ধীর মস্তকাবরণ, পার্সীর লম্বা টুপী ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকমের যে কি আছে তাহার ঠিকানা নাই। এগুলির উদ্দেশ্য কতক অঙ্গসৌষ্ঠব, কতক শীত-গ্রীষ্মের প্রভাব হইতে মস্তকটাকে রক্ষা করা। সুতরাং ইহারা প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। রাজাদের —তথা রাণীদের—মুকুটই বা কত প্রকার। হীরা, মণি, মুক্তার বহর তো তাহাতে থাকিবেই। দরবারের সময় রাজা মাথায় যাহা পরেন যুদ্ধের সময় তাহা না পালটাইলে চলে না। কোমল জিনিসের পরিবর্ত্তে তখন শক্ত জিনিস আবশ্যক হয়। কিন্তু বাহারটা একেবারে যায় না। যুদ্ধ এদেশে এখন এক রকম উঠিয়া গিয়াছে, তবে ভড়ংটা আছে।

বিবাহের সময় বরক'নেকে আমাদের দেশে কতকটা রাজা রাণী সাজিতে হয়; কাজেই তখন তাহাদের মাথার চাপে মুকুট—মণিমুক্তার অভাবে সোলার মুকুট। এই মুকুটে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় কি হাস্যের উদ্রেক করে তাহা বিশেষজ্ঞেরা বলিতে পারেন।

এবার একটী কাজের কথা বলিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অধিকাংশ জাতিকেই মস্তকাবরণ দেখিয়া ধরিতে পারা যায়, ধরা যায় না বাঙ্গালীকে। ইংরাজের হ্যাট, হিন্দুস্থানী বা পাঞ্জাবীর পাগ্‌ড়ী, মুসলমানের তাজ, পার্সীর লম্বাটুপী, আজকালকার গান্ধীটুপী—সবই সময় বা অবস্থা বিশেষে বাঙ্গালীর মাথায় বিরাজ করে। বাঙ্গালীর এই

সার্ব্বজনীনতা সুখের কি ক্ষোভের বিষয় তাহা বলা কঠিন। তবে বাঙ্গালীর দেশীয় মস্তকাবরণ গুলি কিছুকাল পূর্ব্বেও এক ছাচে ঢালা ছিল এ অভিযোগ তাহার প্রতি কেহ আনিতে পারিবে না, ইহা ঠিক। কতক গুলি ছবি দেখিলেই বোঝা যাইবে বঙ্কিমবাবু ও দীনবন্ধু মিত্র একরকমের মস্তকাবরণ ব্যবহার করিতেন না। দ্বারকানাথ ঠাকুরেরও তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথের (অন্ততঃ মহর্ষি হইবার পূর্ব্বে) মস্তকাবরণ ভিন্নরকমের দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মস্তকাবরণ অন্য রকমের। এটা ঠিক যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসী বাঙ্গালীরও একটা মস্তকাবরণ আবশ্যক। যখন গা খুলিয়া স্ফীত উদর হইতে কোঁচাটা নামাইয়া বাঙ্গালী তাস কি পাসা-খেলায় প্রবৃত্ত হন তখন মস্তকাবরণের প্রয়োজন না হইতে পারে, লাট সাহেবের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময়ও ফরমান-মাফিক দরবারী মস্তকাবরণ চলিতে পারে কিন্তু যখন তাহাকে ঘরের বাহিরে কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়—বিশেষতঃ রৌদ্রের মধ্যে—তখন একটা মস্তকাবরণ যে আবশ্যক তাহা চিকিৎসাব্যবসায়ী ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। এই আবরণ কাপড়ের অবশ্য হইতে পারে, তবে সোলার হইলেই বেশী কার্য্যকর হয়। ইংরাজ নিজের দেশে সোলার টুপীর ভক্ত নয়, ফেল্‌ট কি অন্য কোন উপযুক্ত কাপড়ে সাধারণতঃ মস্তকাবরণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই গরম দেশে আসিয়া দেখিতে পায় যে দেশ-শাসন অপেক্ষা মথাটা বাচান কম গুরুতর ব্যাপার নয়। তাই সৌন্দর্য্যের জন্য না হউক দায়ে পড়িয়া সোলার টুপী ব্যবহার করে। কেহ কেহ সোলার উপর মোটেই কাপড় লাগায় না। কিন্তু সোলাটা থাকে মোটা। ইহা দেখিতে সুন্দর হয় না বটে কিন্তু কাজে সুন্দর হয়। কোন কোন বাঙ্গালী বাবুকে আজকাল বাইসাইকাল চড়িয়া ঘুরিবার সময় ধুতীর উপর সোলার টুপী ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ধুতীর কোঁচা বাইসাইকেলের সঙ্গে বেশ খাপ খায় না, একটু উপদ্রবেরই সৃষ্টি করে। কিন্তু বিদেশী পোষাকের উপর শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি ধুতী সামলাইয়া লইয়া মাথায় সোলার টুপী পরিয়া বাহির হইলে সে পোষাকটা দেখিতে কিছু অদ্ভুত রকমের হইলেও কাজে বিশেষ খারাপ হয় না।

সোলা এদেশেই জন্মে, সোলার টুপীও এদেশেই প্রস্তুত হয়। দামী কাপড় না লাগাইলে উহাতে খরচও বেশী পড়ে না। সাদাসিধে রকমের সোলার টুপীর এ দেশে প্রচলন হইলে মগজটা অনেক বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। ছাতার খরচও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায়। আর আমাদের চাষারা যে "মাথাইল" ব্যবহার করে তাহার পরিবর্ত্তে একটা হালকা রকমের মস্তকাবরণ পাইয়া হাফ ছাড়িতে পারে। যাহারা "মাথাইল" এর সঙ্গে ও অপরিচিত, জমিতে কাজ করিবার সময় শুধু একখানা কাপড় মাথায় জড়ায়, তাহাদের তো কথাই নাই।

একজন পদস্থ বৃটিশ কর্ম্মচারী এদেশে রৌদ্রের মধ্যে সোলার টুপীর ব্যবহার-সম্বন্ধে লেখকের সাক্ষাতে বিদ্রূপের স্বরে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইহা না হইলে একেবারেই চলে না, এদেশের লোকের সোলার টুপী প্রচলনের জন্য বৃটীশ জাতির নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমরা যে অকৃতজ্ঞ জাতি নই, আমাদের অনেক আচার-ব্যবহারই তাহার প্রমাণ। তবে এই দরকারী বিষয়টাতেই বা পশ্চাৎপদ হইব কেন? চীন ও জাপানের লোক ক্রমশঃ আপাদমস্তক বিলাতী পোষাকে আবৃত হইয়া লোকের কাছে দেখা দিতেছে, পোষাকটা—অন্ততঃ বাহিরের কাজের পক্ষে—সুবিধাজনক বলিয়া। কোথায় আজ সেই চীনার পিছন-দিকের সর্পাকৃতি লম্বা চুল? নাকটা আর একটু অন্য রকমের হইলে চীনাকে আর চীনা বলিয়া চেনাই যাইত না (দাড়ি, গোঁফ—সে তো এখন অনেকেই রাখে না)। চীনের সেকালকার কৃষকদের টুপীও আমাদের কৃষকদিগের মস্তকাবরণ অপেক্ষা কাজে সুবিধাজনক ছিল। ফিলিপপাইনের লোকও লতা পাতার বদলে সভ্যধরণের টুপীর ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে—কৃষিক্ষেত্রে পর্য্যন্ত। আনামের ও বোর্ণিওর ধীবরের টুপীও আমাদের 'মাথাইল' অপেক্ষা সভ্য রকমের। তিব্বতের অনেক পদস্থ লোক হ্যাট ব্যবহার করে; ভুটিয়াদের মাথায় পর্য্যন্ত উহা দেখা যায়। অনুকরণের অপবাদ এড়াইয়া যে আমরা আপামরসাধারণ বাঙ্গালীর জন্য একটা কার্য্যোপযোগী মস্তকাবরণ দাঁড় করাইতে পারি ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ না হয় বাদই দিলাম; সে সমাজ নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিতে সমর্থ।

বাঙ্গালী পুরুষের জন্য তো যাহা হউক একটা ব্যবস্থা মনে আসিল। এখন, গৃহলক্ষ্মীদের বেলা কি হইবে? যতদিন তাঁহারা অন্তঃপুরচারিণী ও অবগুণ্ঠনবতী ছিলেন ততদিন ইহা লইয়া মাথা ঘামইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এখন তাঁহরা অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিয়া সর্ব্বত্র বাহির হইতেছেন; সুতরাং খোলা জায়গায় শীতগ্রাম হইতে মাথাটাকে রক্ষা কয়া তাঁহাদেরও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে! সমস্যাটা জটিল কিন্তু আমার মনে হয় ইহার জন্য ব্যস্ততা-প্রদর্শন লেখকের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র; তাঁহারা নিজেরাই চিন্তা করিয়া একটা উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

বাবাজী

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

চিত্ত চিদানন্দে দোলে কক্ষে ঝোলা ভিক্ষা করি',
আত্মভোলা চল্‌ছে কে ঐ কৃষ্ণনামে বক্ষ ভরি'।
রাজপথেরি যাত্রী-ভিড়ে বদ্ধ নাহি নেত্র তার,
ভক্তি-প্রেম-সিক্ত আঁখি রিক্ত চলে নির্ব্বিকার।
বাংলা দেশের ঐ বাবাজী মাত্র দু'টি ভিক্ষা চায়,
ঢাল্‌ছে হরিমন্ত্র-সুধা বল্‌ছে মুখে জয় নিতাই।

করছে সে যে নিত্য ফেরি কৃষ্ণ-পরমান্ন-সুধা,
নিত্য তারি বিত্ত লভি' তৃপ্ত হ'ল চিত্ত-ক্ষুধা।
অর্থে সে অনর্থ ভাবি' সার করেছে ছিন্ন-ঝোলা,
একটি মুঠি ভিক্ষা লভি' আনন্দে সে আত্মভোলা।
নাম বিলানো ভিন্ন যে তার আর যে কোন বাঞ্ছা নাই,
বিশ্ব-চিতে তৃপ্তি দিতে বল্‌ছে নেচে জয় নিতাই

বৃন্দাবন-বার্ত্তা দিতে বিশ্বে শুধু স্বার্থ তার,
কাংলা সেজে বাংলাতেরে খুল্লে সে যে স্বর্গদ্বার।
যমরাজেরি ধম্‌কানিতে চম্‌কে না সে ভক্তবীর,
রাজার বাণী টল্‌তে পারে, টল্‌বে না সে শক্ত-ধীর।
ধর্ম্ম-বাঁধন সমাজ-শাসন-দম্ভ-ভাঙি' দণ্ডে চায়,
কৃষ্ণ তারি বক্ষে বাঁধা বল্‌ছে মুখে জয় নিতাই।

বিশ্ব তাহার খোঁজ রাখেনা নাই তা'তে তার কষ্ট মনে,
উপেক্ষারে বক্ষে করি' বিলায় সে যে কৃষ্ণধনে।
নিত্য দিনের বন্ধু সে যে কর্ণে পরমার্থ ঢালে,
হস্তে গোপীযন্ত্র বাজে ভৃত্য নাচে নৃত্য তালে।
গৃহস্থেরি শান্তি মাগে বান্দ' রাধাকান্ত-পায়,
বল্‌ছে নেচে গৌরহরি বল্‌ছে নেচে জয় নিতাই।
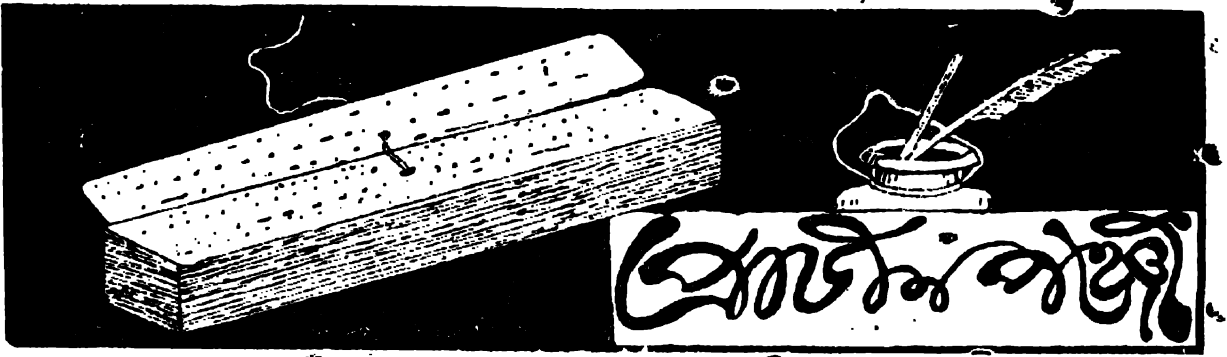
পুর্ণিমা-মিলন

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী

প্রকাশকের কৈফিয়ৎ

সাহিত্যের আসর বসে ছিল যবে
সেটা তেরশ তের সাল,
আজকে হ'ল তেরশ উনিশ
মাঝে ছটা বছর ঘাল !
এম্‌নি করিতকর্ম্মা আমরা সবাই
খেয়াল কিছুতে হ'ল না।
সে আসর জুড়িয়ে বহুদিন গেছে
স্মরণ কিছুই ছিল না ॥
কবি ধূর্জ্জটী শর্ম্মা তখনি তখনি
কলমের দুটো খোঁচায়।
নিয়েছিলেন তুলে ঠিক্ ঠাক্ 'স্কেচ'
এতদিন ছিল চাপায় ॥
চৈতালি ঝাড়পোছ করিতে সেদিন
ডেক্‌স বাক্‌সর ভিতরে,
কাগজ এক তাড়া ফিতে দিয়ে বাঁধা
হঠাৎ প'ড়ে গেল নজরে ॥
খুলে দেখ্‌নু তবে সেইগুলো সেই
ধূর্জ্জটী শর্ম্মার নক্‌সা।
ভাব্‌লেম এবারে সাহিত্যের খেলায়
আমারি কিস্তিটে ওঠ্‌সা !
আসর হ'তে শুধু দেখি জনা কত
গেছেন চলে পরলোকে।
আরও দেরী হ'লে যদি আর কেউ
পাছে আবার সিঙ্গে ফোঁকে !
তাই বৃথা বিলম্ব নাহি করে আর
ভাবনু ছেপে ফেলা যাক্।
পুরাণ সে দিনের পুরাতন কথা
সবই আছে ঠিক ঠাক।
সেই কথা সে কাজ সহিল না ব্যাজ
দিলাম ছেপে দেখেশুনে।
সাহিত্যের আসরে রগড় চাও যারা
ত্বরিত নিয়ে যাও কিনে ॥

মঙ্গলাচরণ

বাঙ্‌লা সাহিত্যের আসন পেতে
যাঁরা পগার পার।
এই আসর বন্দনার আগে
তাঁদের নমস্কার ॥
মূর্ত্তি তাঁদের অপর পাতে
দিলেম আজ সাজিয়ে,
সবাই সবার জানাশুনা
দিতে হবে না চিনিয়ে।
ওঁদের পায়ে গড়টা করে
আসরে নাম ভাই,
যাঁরা যাঁরা আজ হাজির হেথা
তাঁদের মঙ্গল চাই।

দীর্ঘ আয়ু আর যশ নিয়ে
সুখে থাকুন সবে।
সাহিত্যের আসর- মঙ্গল গীত
গেয়ে যাও তবে॥

উৎসর্গ

যাঁদের কথা লেখা আছে
এই কয়টা পাতে,
তুলে দিচ্ছি গো আদর করে
আজ তাঁদের হাতে।
হ'ল গো বলা যাঁদের কথা
হয় তো সবে তাঁরা,
আসেন নাইকো সভার মাঝে
কেবল লিখেই সারা!
কিছুই ক্ষতি নাইক তাতে
সবাই সাহিত্যিক,
কোন-না-কোন কাজের তরে
আসা হয় নি ঠিক।
দেখে শুনে হয় এতে যদি কেউ
হ'তে না পারে তুষ্ট,
বলতে পারি শুধু এইটুকু
হ'বে না কেউ রুষ্ট।
তবে যদি কেউ একান্ত ইথে
খুঁজে খুঁজে ধর ছল,
আমার পক্ষে বিড়ম্বনা বটে
সেইটাই আসল।
নামটি ধরে যাঁদের কথা
কিছু হ'ল না বলা,
তাঁরা হয় তো পাবেন ইথে
খোসামোদের গলা।
কল্পতরুর ডালের কলম
সমুদ্রের জল কালি,
বিপুল ধরার পিঠ্‌টে ভ'রে
রাতদিন ধরে খালি,
সারদা যদি লেখেন নিজে
তবুও শেষ নয়,
বাঙ্‌লাদেশের সাহিত্যিকদের
গুণগরিমাচয়॥
আনন্দের দিনে বেলাগ সুরে
ধরিয়ে দিও না মাথা,
সবাই আমার আদরের ধন
বিশ্বাস করগো কথা॥

মুখবন্ধ ও নায়কবর্ণন

সাহিত্যিকদের পূর্ণিমা-মিলন
বড় সাধের ছিল।
একটা বছর যেতে না যেতে
সেটা ডুবে গেল॥
তুললে টেনে নগেন বোস
বরাহ অবতার।
ভাগ্যটা ভাল হেমন্ত হে
তোমার পূর্ণিমার॥
উদ্ধার করা কাজটা কিছু
তার নূতন নয়।
বিশ্বকোষের পাতা ভরাতে
ঢের খুঁড়্‌তে হয়।
সেই কোষের দৌলতেতে
সুন্দর বাড়ী করে,
পূর্ণিমা-মিলন করলে হেথা
যত্ন আদরভরে।
দেখ্‌তে ভাল শুন্‌তে ভাল
জোটাজোটটি বেশ।
পূর্ণিমা-মিলনে মিশিয়ে দিনে
নবগৃহ প্রবেশ॥
বড় সেয়ানা বোস কায়স্থ
আসলে ফাঁকি দিল।
পাওনা হ'ল ছুটো খাওয়া
একটায় সারিল॥

নূতন 'হল'এ নূতন তর
এবার আয়োজন,
আজ সভাতে আছেন যাঁরা
তাঁদের নিবেদন।
হেথায় আজ প্রবীণ-নবীন
সাহিত্যিক সবে,
পরস্পরে মিলে মিশে
আলাপ করতে হ'বে।
এমন সভায় ছোটয়-বড়য়
আলাপ করা চাই,
না হ'লে ভাই এ মিলনটার
উদ্দেশ্য কিছু নাই।
সুখে হেথায় সবাই মিলে
করুন আলাপন,
গল্পের ছলে সাহিত্য-কথা
হোক না আলোচন।
এমন মিলন আমোদে শুধু
কেবল পণ্ড হয়,
গান বাজনায় যায়গো ভেসে
এমন ইচ্ছে নয়।
অনেক আশায় আজকে আবার
করছি অভ্যর্থনা,
মিনতি এই কেউ যেন ভাই
খোসামোদ ভেব না।
আমরা সবে পরস্পরে
যেমন যারে জানি,
তেমনি করে করব আদর
না শুনি নিন্দাবাণী।

——

অথ আসর বন্দনার আরম্ভে

দেবদেবী বন্দনা

গণেশ বন্দনা।

থ্যাঙ্ক ইউ গণেশ দাদা
তোমায় নমস্কার।
বিঘ্ন দূর করলে ভাল
মিলন-পূর্ণিমার
বিঘ্ন দূর আরও কর
আজকের আসরে
নায়কেরে দাও গো বর
কহে কবি সাদরে।
তব তরে অগ্র পূজার
শাস্ত্রের ব্যবস্থা
ভাল করে করে দাওগে
জলযোগের ব্যবস্থা।

——

সর্ব্বদেবদেবী বন্দনা।

তোমায় নমি বীণাপাণি
তোমার জন্যে সব।
নমি তোমায় মা ভগবতী
সর্ব্বকার্য্যেষু মাধব॥
নমি তোমায় পঞ্চানন্দ
ঘাড়ে চেপোনা আর,
ভৈরব মূর্ত্তি ছেড়ে দিয়ে
শিবত্ব কর সার।

——

অথ মিলনের মূলসূত্র

ভোজ্যবন্দনা

নমি তোমায় লুচি মোণ্ডা
জাগ্রত দেবতা বট,
তোমার জন্যই টেঁকছে মিলন
তুমি মঙ্গল ঘট।
তোমার দেবতা জগৎপালক
সত্ত্বগুণা নারায়ণ
ক্ষুধার পীড়নে জনান্ অর্দ্ধমৃতি
ভোজনেচ জনার্দ্দন।
প্রসন্ন থেক দয়াও রেখ
তোমার ভক্তের প্রতি,

হজম করিতে যদিও তোমায়
কবির নাই শকতি।
তবুও তোমার আরতি অগ্রে
সাহিত্যের আসরে,
কারণ যদি পেটটা জ্বলে
কবিতা কোথা কাতরে?
তাইতে নমি সবার আগে
ভোজ্যদেবের পায়।
সর্ব্বদুঃখ বিনশ্যন্তি
যাঁহার কৃপায়॥

অথ আসর

আসর শোভা মনোলোভা
তার আর বর্ণিব কি?
চাঁদোয়া ঝালর নিশান মালা
সর্ব্বত্র সমান দেখি।
চৌদিকে তাকিয়া ঢালা বিছানা
রূপার পানদান
আতর-গোলাপ শঁকা গড়গড়া
অম্বুরি খাম্বিরা খান।
বৈঠকে...হুকা চুরুট সিগারেট
যে যায় রাখে মান
অ্যাশট্রে আছে দেশালাই সাথে
পুরা হাল ফ্যাসান।
এসব আর বেশী বলব কি
যেমন সর্ব্বত্র রয়
প্রাণের মতন কোথায় কেমন
সেইটে বুঝতে হয়।

* * *

অথ সভ্য-বর্ণনা

(১)

আসুন আসুন সবার আগে
মহারাজ ঠাকুর।
ঝাঁকিয়ে বস্‌লে সভার মাঝে
সভা ভরপুর।
তোমার মত আজকের দিনে
প্রাচীন সাহিত্যিক,
আছে কি কেউ বাঙ্‌লা দেশে
জানিনে তা ঠিক। *
সেকাল-একাল দুয়ের মাঝে
তুমিই ব্যবধান,
বাঙ্‌লা ভাষায় গঠন-মার্জ্জন
দেখ্‌লে বিগুমান।
তোমার সাম্‌নে বিদ্যাসাগর
রামমোহনের ভাষা,
চেঁছে-ছুলে মেজে ঘোসে
দাঁড় করালে খাসা।
তোমার সামনে টেকচাঁদ খুড়ো
এনে দিলে নভেলে,
তোমারি হাতে দিলে মাইকেল
তিলোত্তমা ফেলে।
তোমার সাম্‌নে নাটুকে নারাণ
নাটকে দিল টান,
তুমিই নিজে কলম ধরে
দিলে 'চক্ষুদান'॥
"উভয় সঙ্কট" 'বিদ্যাসুন্দর'
তোমার কীর্ত্তি ভাল,
তোমার কৃপায় বাঙ্‌লা ভাষায়
ফার্স্ প্রথম হল।
তোমার সামনে আঁকা হল
হুতোমের নক্‌সা,
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা কলাপ
মজার দিক ফরসা।
তোমার সাম্‌নে রবীন্দ্র নাথ
কবীন্দ্র হয়ে বসে,

---

* আজ আর কেহ নাই। গত...পৌষ তারিখে মহারাজ-বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বর্গগত হইয়াছেন।

বাঙ্‌লা দেশটা ডুবিয়ে দিলে
গিরিকের রঙ্গে।
তোমার সাম্‌নে বঙ্কিমচন্দ্র
বিষবৃক্ষ বসিয়ে,
নূতন ফল ফলিয়ে দিল
ইংরাজী ভাব মিশিয়ে।
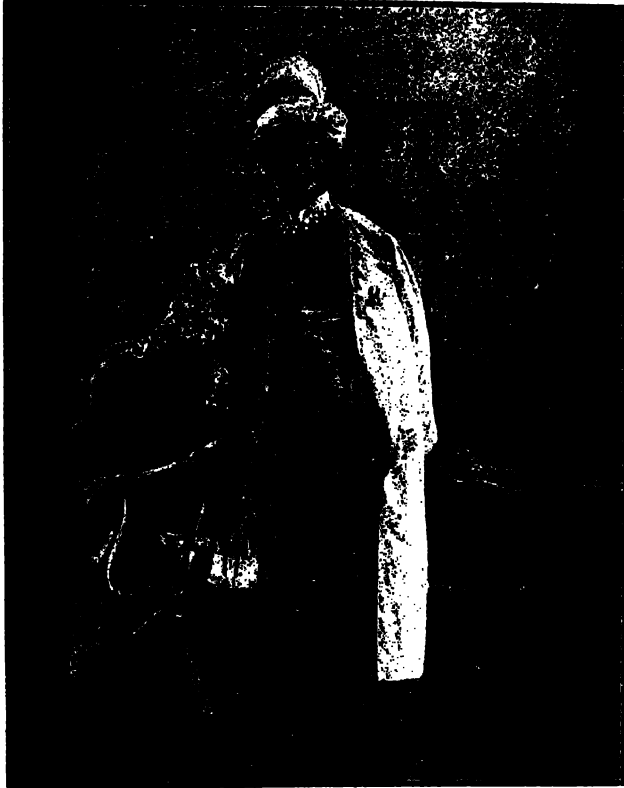
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

দেশের দোষ দূর করা যায়
সাহিত্যের মধ্য দিয়ে,
দেখিয়ে দিলে দীনবন্ধু
নীলদর্পণ আনিয়ে।
নিজে তোমার সরস্বতীর
বিশেষ কৃপাবলে,
ইংরাজী বাঙ্‌লা সংস্কৃততে
সমান কলম চলে।
জ্ঞানগম্ভীর বিদ্যায় ধীর
তোমার সম কেবা,
মিষ্ট বচনে তুষ্ট আলাপনে
তোমায় খোঁজে কেবা।
'সঙ্গীত-নায়ক' কনিষ্ঠ তোমার
তুমিও পটু তায়,
কতই সাহিত্য হয়েছে রচিত
তোমাদের কৃপায়।
বাঙ্‌লা ভাষার বহুকৃতজ্ঞতা
ঠাকুরগোষ্ঠী কাছে,
সকল দিকের সাহিত্যসেবক
ঠাকুর বংশেই আছে।
প্রার্থনা করি, আরও কিছুদিন
রাখুন তোমা বাঁচিয়ে,
পূর্ণিমা-মিলনে করিব আনন্দ
নবীন-প্রবীণে মিশিয়ে॥

(২)

বিদ্যাবুদ্ধি জমাট বেঁধে
গোট সোটটা হয়ে,
সার্ গুরুদাস এলেন ধরায়
খাটো দেহটী লয়ে।
কপাল ভাল বাঙ্‌লাবাসী
তাই তোদের দেশে,
জন্ম নিলেন অমর গুরু
সার গুরুদাস বেশে।
ছোট্‌টোখাট্‌টো মানুষটী বটে
সুসূক্ষ্ম সুন্দর,
বিদ্যাবুদ্ধির পরিধি কিন্তু
কেমনে পাব ওর।
শান্ত দান্ত ক্ষমাবন্ত
লোক বাছের বাছ;
স্বাদে-গন্ধে মধুর যেমন
গুজরাটী এলাচ।
রাজার দ্বারে খাতির ছিল
ধর্ম্মাধিকার ভার,
ধর্ম্মের মত ন্যায় বিচারে
উপাধি হল 'সার্'।

সারা জীবন শিক্ষাটা নিয়ে
করলে নাড়াচাড়া,
বুঝলে শেষে এমন শিক্ষায়
মানুষ হয় না খাড়া।
দেশের মাঝে শিক্ষার নায়ে
তাই ধরেছ হাল,
উতরে যাবে খোদার কৃপায়
সুযোগ দেশকাল।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিবেচনাটা বড়ই তীক্ষ্ণ
একটুও হেলে না,
বাঙ্‌লা লেখনি পরিষদে তাই
সভাপতি হলে না।
আচার নিষ্ঠার আদর্শ তুমি
বঙ্গার সাক্ষী তার,
সূর্য্যগ্রহণ দেখ্‌তে গিয়ে
কদিন নিরাহার।
অদ্ভুতকর্ম্মা তোমার মত
শাস্ত্রবিধি পালনে,
আজকের কালে বাঙ্‌লা মাঝে
পড়ে না ত নয়নে।
সভাপতি হয়ে বিতর্ক মেটাতে
তোমার গিন্নিপানা,
ভাঙে না লাঠি মারা যায় সাপ
এম্‌নি মুনশীয়ানা।
প্রার্থনা এই তোমার মত
আদর্শ লোকটাকে,
অরুচি ভেবে দক্ষিণের প্রভু
ফেলিয়ে যেন রাখে।

---

(৩)

তুমিও এস দাদার পাশে
সঙ্গীত-সিন্ধু-শশী,
পূর্ণিমা মিলন উজ্জ্বল কর
সভার মাঝে বসি'।
ছোট্‌টো খাট্‌টো ঠাকুরটী বট
লোকটী কিন্তু সেরা,
তুমিও একটী গুজরাটী এলাচ
গন্ধে ভুবনভরা।
সঙ্গীত-বিস্তার খাতির তাম্বটি
জগৎ জুড়ে আজ,
উপাধি দেছে সকল দেশের
গুণজ্ঞসমাজ।
রাজারাজড়ার তকমা আঁটা
তোমার পরিচয়,
টাইটেল যজ্ঞ করলে খতম
যশে জগজ্জয়।
যন্ত্র-তন্ত্র সঙ্গীত মন্ত্র
শাস্ত্র আদি যত,

---

* তখনও 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' লেখা হয় নাই।

কিছু ছিল না বাঙ্‌লা দেশে
উদ্ধার কর্‌লে কত।
গান বাজনা শেখার তরে
সঙ্গীত বিদ্যালয়,
স্থাপন করলে আপন ব্যয়ে
ধন্যবাদ তোমায়।
দেশের না কি দুর্দ্দশা বড়
তাইতে কিছুদিন,
চল্‌তে চল্‌তে ইস্কুলটার
নাড়ীটা হ'ল ক্ষীণ।
তোমার রস শুকিয়ে যেতে
সেটা গেল মরে,
সঙ্গীত শেখা চল্‌ছে এখন
যাত্রা-থিয়েটার করে।
বাহির কর্‌লে কৌশল তাল
স্বরলিপি রচনা
গুরুর কৃপায় সহজ হ'ল
সুর-স্বর-সাধনা।
'ভায়োলিন' ভেঙে 'বাহুলীন' করে
বেহালার দিলে নাম,
কানুন হল কচ্ছপী বীণা
বাহবা তোমার কাম।
হারমোনিয়মটা যন্ত্র কিছু নয়
হিন্দু-সঙ্গীত বাজাতে,
হাতে কলমে দেখিয়ে দিলে
খামতি আছে তাতে।
নমি তোমায় ঠাকুর মশায়
বেঁচে থাক গো তুমি,
অনাথ হবে না গাওনা বাজ্‌না
ধন্য বঙ্গভূমি।

—

(৪)

আসুন আসুন এগিয়ে বসুন
পণ্ডিত শিরোমণি,
প্রাচীন তত্ত্বে অতুলযশ
বহু বিদ্যার খনি।
খাতির বড় রাজার দ্বারে
তাঁরই টোলের গুরু,
মিষ্ট বচন সদাই মুখে
আওয়াজটুকু সরু।
'বাল্মীকির জয়' লিখলে ভাল
জয় জয় তোমার,
মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী হরু
তোমায় নমস্কার।
ঙ্‌লা ভাষার মীন অবতার
সবে তোমায় পুজি
করলে উদ্ধার বাঙলা পুথি
সারা দেশটা খুঁজি।
অন্তর্দৃষ্টি কাব্যশাস্ত্রে
তোমার বেশ আছে,
রস বুঝতে রস বোঝাতে
কেবা তোমার কাছে।
ঢের শিখেছ ঢের লিখেছ
কিন্তু এটা হ'ল কি,
চোরের পরে রাগটা করে
ভুঞ্জে আহার দেখি।
বাঙলা লেখা বাঙ্‌লা দেখা
ছেড়ে দিয়েছ হায়,
তোমার মতন মহাজনের
এটা কি শোভা পায়।
নানান্ দেশে নানান্ ভাষা
তায় মেটেনা আশা,
ঘুচবে কেন পিপাসা ভাই
বিনে মাতৃভাষা।
বিদ্যার ভারে গম্ভীর সদা
লোকে বলে গুম্‌টো,

যে মেশে নি সে বুঝে না
ভিতরে কত মিষ্ট।

কমলাকান্তের দপ্তরের মাঝে
চলতো ভাল হাতটা।

হরপ্রসাদ-শাস্ত্রী

তোমার হাতে ধর্ম্মের গাজন
বুদ্ধ উৎসব হ'ল,
পূর্ণিমা সভায় একপাশে কেন
আগবাড়িয়ে চল।

(৫)

আসুন আগে বসু চন্দ্রনাথ
তত্ত্ব নেছেন তুলে,
সাবিত্রী আর শকুন্তলার
বিউটী দেছেন খুলে।
পশুপতির কেচ্ছা লিখেছিলে বেশ
সরস ছিল হাতটা,

চন্দ্রনাথ বসু

তত্ত্ব চিন্তা উঠল পেকে
"কঃ পন্থা"র ভাবনা,
"হিন্দুত্ব" ছোটে ত্রিধারা হ'য়ে
চিন্তাটা কৈ গেল না।
প্রবীণ গম্ভীর লেখক দলে
খাতির আছে ভাল,
ছেলের জন্য এখন আবার
নাটক ধরতে হ'ল।
এগিয়ে বস সভার মাঝে
বোসজা মহাশয়,
পরিষদের পূর্ব্বসভাপতি
তোমার জয় জয়।

(৬)

সাহিত্যক্ষেত্রে মান্তগণ্য
হে মাননীয় মিত্র,
তোমার কৃপায় প্রথম পেলেম
বিদ্যাপতির চিত্র।
অনেক প্রবন্ধ লিখেছ সেকালে
ক্ষোভ নাইক আর,
এখন কেবল চেষ্টা উঠে পড়ে
একলিপি বিস্তার।
দুই পরিষদে তুমি কর্ণধার
চল্‌ছে ভাল হালে,
সমান নজর দুয়েতেই আছে
যাচ্ছ ঢিমে তালে।
বেঞ্চ এণ্ড বার দুই ছেড়ে দিয়ে
সালিসীতে দেছ মন,
বড় বড় ঘর দিলে গো বাঁচিয়ে
যাদের হ'ত পতন।
স্বদেশী-ব্যাপারে যারা এসে ধরে
সবার ভাল খুঁজে,
পরামর্শ দিতে হচ্চ ডিরেক্টর
চলা ভাল কিন্তু বুঝে।

স্বদেশের টান এতই প্রবল
শুক্রবার হ'লে,
যা কেন হ'ক না পানশিয়ালায়
যাওয়া চাই চলে।
সভায় বস উজ্জ্বল করে
তোমায় আগে চাই,
পরিষদের তুমি সভাপতি ব'লে
সাহিত্যের হ'লে চাঞ্চী

---

(৭)

হাত পাকালে নভেল লিখে
ও মুখুয্যে মশায়,
তিন তিনবার জীবন প্রবাহে
জোয়ার বহালে হায়।
কাঁচা বয়সের ধরণ-ধারণ
আবার ফিরিয়ে নিলে,
গীতার ব্যাখ্যা হচ্ছিল ভাল
সেটা থামিয়ে দিলে,
হাসি মুখে তুমি "দুই ভগ্নীর" সাথে
"মা ও মেয়ে" নিয়ে,
সারা জীবনটা সাহিত্য-সেবায়
দিলে বেশ কাটিয়ে।
শেষ দশাটায় বিদেশিনী প্রেম
কলিঙ্গের ঘরে চুরি,
"মৃন্ময়ী" গেল আনলে ঘরে
শুক্ল-বসনা সুন্দরী।
একদিন দেশে উঠেছিল কথা
উঠেনি তখনো রবি,
তুমি কি রমেশ নভেলের কেবা
হবেগো দ্বিতীয় কবি।
ক্ষীণ দৃষ্টি তবু দামোদর বাবু
সর্ব্বত্র দেখা পাই,

পূর্ণিমা-মিলনে বড়ই আগ্রহ
এগিয়ে বস ভাই।

৮

দেখছি কি অই দীর্ঘ ক্ষীণ দেহ
পণ্ডিত ম্লান বৃদ্ধ,
সাত্ত্বিক আচার ভক্তির পাত্র
ভাবটি পরিশুদ্ধ।
অনেক তত্ত্বে খোঁজ রাখেন
পণ্ডিতজী পাঁড়ে,
"মানবতত্ত্ব" সেরে, চেপেছেন এবারে
হিন্দুধর্ম্মের ঘাড়ে।
"জাহ্নবী"র জলে "সহচরী" নিয়ে
সেকালে কত খেলা,
"বিজ্ঞান-দর্পণে" নিত্য মুখ দেখা
ব্যাকরণে ছিল মেলা।
ধর্ম্মের সঙ্গে অর্থের নিত্য
সম্বন্ধ যে আছে,
বুঝাতে সে তত্ত্ব পাণ্ডেয় পণ্ডিত
বস্ত্রের হাট খুলেছে।
লেখেন ভাল বুঝেন ভাল
কিছু নাই ভাষায়,
বেদ-পুরাণ কথা নিয়ে নাড়া চাড়া
কেউ কি শুনতে চায়।
খৃষ্টীয় উনিশ শতাব্দীর মাঝে
নবীন মহাভারত,
নবীন ব্যাসের নবীন ব্যাখ্যা
আরে ছ্যা! মহা-ভারত!
তারই গুণাগুণ ব্যাখ্যা করে দিয়ে
নামটা নিলে গো বেশ,
তুমি সে ভারতের নব নীলকণ্ঠ
টীকায় মোহিত দেশ।
নটনটী নিয়ে ছেলে তোমার
অধিকারী গিরি পেশা,
দণ্ডবত হই পাঁড়ে ঠাকুর গো
কেন হ'ল না আসা।

---

(৯)

মহাপ্রভুর বড়ই ভক্ত
ফুঁ দিলে যান উড়ে
শিশিরবাবু গুণগরিমায়
বসুন সভা জুড়ে।
বয়স হয়েছে সাহস রয়েছে
কলম চলে জোরে,
অমৃতবাজারে হাট করে সতি
দাদার পন্থা ধরে।
নিমাই-চরিত পড়ে পড়ে পড়ে
"অমিয়-চরিত" হ'ল,
ঘোষের হাতে আওটান দুধ
ক্ষীর হ'য়ে দাঁড়াল।
মহাজনদের পদাবলীতে
পড়ে গেল দূ ,
বলরাম দাস নামটা চালিয়ে
পদ কল্লেন স্থ ।
গৌরাঙ্গের ধর্ম্ম এতটা দিন
নেড়ানেড়ীর হাতে,
সহজে ভাবে হচ্ছিল সারা
বষ্টুমী আখড়াতে।
শিশিরবাবু তুল্লেন তারে
সঙ্কীর্ত্তন ধরে,
শিক্ষিতের মাঝে পসার হ'ল
গৌরাঙ্ সভার জোরে।
তিলক মালা কাছা খোলা
না হলেও হায়,
বুঝলে লোকে ভেক না নিয়ে
গৌরাঙ্ ভজা যায়।
নবদ্বীপের নদের চাঁদটি
লর্ড গৌরাঙ্গ সেজে.

অভয়ানন্দের হাতটি ধরে
বিলেত গেলেন তেজে।
মহাপ্রভুর জন্ম উৎসব
তুমিই চালিয়েছিলে
আছত তুমি, জম্‌তে না জম্‌তে
হালটি ছেড়ে দিলে।
নিতাই পেয়ে নিমাই সন্ন্যাস
গোঁসাইরা বড় হ'ল,
তাড়িয়ে নিতাই রাখতে নিমাই
তোমার ভেসে গেল।
নূতন ক'রে হইবে দেশে
চেলাও পাবে ঢের,
পুরাতন ভেঙে নূতন করা
সে চিঁড়ের বাইশ ফের।
ঘোষজা মশাই বসুন এসে
আমরা বেঁচে যাই,
সাহিত্যের হাটে একটা মানুষ
সবাই দেখুক ভাই।

(১০)

কালীর বরণ সহাস বদন
বিহারী দাদা কই,
বসহে এসে তাকিয়া ঠেসে
তামাকু সাজা অই।
প্রভাতী হ'তে তোমায় চিনি
ছাপাখানার ভূত,
বঙ্গবাসীর আঁতুড় ঘরে
পঞ্চানন্দের দূত।
বিদ্যাসাগর চিরজীবী
বিধবার আশীষে।
তাহার কীর্ত্তি প্রকাশ করে
তুমিই বা কম কিসে।

হ'ত হে ভাল নিতেহে যদি
পুলিসের চাকুরী,
ধরে দিলে খুব শকুন্তলা-তত্ত্ব
কালিদাসের চুরি।
নারকেলবেড়ের তিতুমীর
বেঁধে বাঁশের কেল্লা,
গোরা পল্টন তাড়িয়ে দিলে
'গোলা তো খা ডালা'।
কোথায় লাগে প্রতাপাদিত্য
কোথায় লাগে সীতে,
জিনিসটা ভাল খুঁজে পেয়েছ
জেতের পরচে দিতে।
সবার চেয়ে তোমার গুণ
এইটে বেশী পাই,
বাঙ্গালীরা যে মিলিটারী সব
প্রমাণ কল্লে তাই।
সকল কথা গোরার সত্যি
বিশ্বাস করে নিলে,
মাঝে থেকে অন্ধকূপটা
কোথা উড়িয়ে দিলে :
সাবাস দাদা ইতিহাসেও
পাকিয়ে নিলে হাত,
যাদের শিল তাদের নোড়া
তাদের ভাঙ্গলে দাঁত।
গান বাঁধতে উতোর গাইতে
তোমার আসে বেশ,
মনমোহন আছে হাফ্‌ আখড়াই নেই
নইলে জমে যেত শেষ।

ক্রমশঃ

মীমাংসা

(গল্প)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীমতী বিহঙ্গবালা চন্দ্র

(৫)

ও বিজু, বিজয়া, ও রে কোথা গেলি ।"

নেপথ্য হইতে উত্তর আসিল—"কি—য়ে ।"

"আয় মা আয়, সেই থেকে ডাকতে নেগেছি, চুলটা বেধে দি আয় । সেই অবধি চুলগুলো যে মুড়োমুড়ি হচ্ছে ।"

বিজয়া সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল—হাতে তাহার তকলি ও তুলা । প্রবল এক ঝাকরানি দিয়া সাবান-ঘসা দীর্ঘ কেশের রাশি দুলাইয়া মাথা নাড়িয়া উত্তর করিল, "আমি এখন বাঁধব না মা" বলিয়াই সে তকলি কাটিতে মনোযোগ দিল ।

বিজয়া দয়াময়ীকে মা বলিত । দয়াময়ী আদর করিয়া বলিল, "লক্ষী মা আমার আয় । 'না' কি বলতে আছে ?"

"আমি দিদির কাছে বাঁধব এখন ।"

"হ্যাঁ দিদির কাছে বাঁধবে । সেই দিদি কি না তোমার ? বৌমাই যে চুলের বোঝা নিয়ে সারাদিন এলোথেলো হ'য়ে বেড়াচ্ছে, তা দি তো একবার চুলটা বেঁধে । সারাদিন কাজ নিয়ে উন্মত্ত । কি এত কাজ রে বাপু ?"

"দিদি এখন চরকায় স্থতো কাটছে যে । দিদির কেমন শীগ্‌গির শীগ্‌গির স্থতো হ'য়ে যাচ্ছে । আমার তকলি আদবে এগোচ্ছে না ।"

"তুইও চরকা কাট না ।"

"হ্যাঁ, আমি চরকা কাটতে পারি কি না, তা হ'লে আর ভাবনা কি ছিল । খালি পট পট করে ছিড়ে যায় । দিদির কেমন সুন্দর স্থতো হ'য়েছে । এই দেখ না মা কেমন চমৎকার মিহি স্থতো । আর আমারটা—মাগো, যেন নারকল দড়ি !"

"কেন এই তো তোরও বেশ সরু স্থতো হ'য়েছে ।"

"ও তো তকলিতে । চরকায় বুঝি তোমার ।"

"তোরও ভাল হ'বে গো, তোরও ভাল হ'বে, তুই চেষ্টা কর না । তোর দিদির চেয়ে বরং আরও তোর ভাল হ'বে, তোর মাথা আছে । আয় দিকিন এখন চুলটা বেঁধে দিয়ে যাই, আয় মা আয় ।"

"না মা, তোমায় চুল বেঁধে দিতে হ'বে না ।"

"কেন রে ?"

"সে বিচ্ছিরি হ'বে ।"

"না আমি ভাল করে দেবো এখন ।"

"তোমার যে ভাল, সেই তো এঁটে-সেঁটে মাথার বেহ্মতলোয় একটা গোঁজ বসিয়ে দেবে । বিচ্ছিরি হ'বে, দাদা ঠাট্টা করবে ।"

দয়ামরী হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা একটু নাবিয়ে দেব এখন, তা হ'লে হ'বে তো ?"

"একটু আলগা করে দিও । ঐ দাদা আসছে, ঠাট্টা করবে যখন, তখন বেশ হ'বে । দাদা এ রকম চুল বাঁধা আদবে পছন্দ করে না ।"

দয়ামরী মনে মনে হাসিয়া বলিল, "ও তাই !'

"কি রে,নাকে কাঁদতে আরম্ভ করেছিস কেন"—বলিতে বলিতে মোহন প্রবেশ করিল ।

"এই দেখ না বাছা, আমার চুল বাঁধা ওর কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না, তাই ।"

মোহন হাসিয়া বলিল, "তা না হ'বারই কথা । তুমি যে করে দাও মা, ওর সুন্দর মুখখানা পর্য্যন্ত কুৎসিত হয়ে যায় ।"

"তা বাছা, আমরা হ'লুম সেকেলে লোক, এখনকার মত অত কি পারি ফ্যাসান-ম্যাসান কেটে চুল বাঁধতে ।

"তা খোলাই থাক না, ও তো বেশ। মন্দ দেখায় না তো।"

দয়াময়ীর মুখখানা এক অজানা পুলকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হাসিয়া বলিল, "বিজি কি আমার মন্দ রে।" বলিয়া তাহার মুখখানা বেশ করিয়া মুছাইয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখ দিকিনি।"

মোহনও মায়ের হাসিতে যোগ দিয়া বলিল, "কে বলে মা তোমার বিজিকে মন্দ।"

"এমন সব বৌ-ঝি না হ'লে ঘর মানায়!"

সহসা পিসিমা সেখানে প্রবেশ করিয়া বলিল, "তা মানান-সই করে নে না বাপু। কি বলিস ভাই মোহন।"

মোহন হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়।"

"এক ছেলের দু'টী বৌ হ'তে দোষ কি? আগেকার সব রাজাদের হ'ত না?"

"হুঁ, আমিও সেই রকম এক মস্ত রাজা, না দিদিমা?"

"তা না তো কি? আর তোমার দুই রাণী—একজন সুয়ো আর একজন দুয়ো।"

মোহন চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া দয়াময়ী ডাকিল, "ও মোহন চলে যাচ্ছিস যে, জল খেয়ে যা।"

"না মা এখন জলখাবার সময় হ'বে না, অনেক কাজ আছে।"

"বাবা, দিন রাত কি কাজ রে? খাওয়া-দাওয়ার সময় নেই, দু'টো কথা বলবার সময় নেই। কে জানে বাপু, কি কাজে তোরা এত ব্যস্ত। যাস নি মোহন, যা হোক একটু কিছু মুখে দিয়ে যা।"

মোহন যাইতে যাইতে বলিল, "আমায় এখনই বেরোতে হ'বে যে। আমি বাইরের ঘরে আছি, দাও তো বিজিকে দিয়ে যা হোক পাঠিয়ে দিও।"

পিসিমার সহিত দয়াময়ীর একটা ইঙ্গিতসূচক কটাক্ষ বিনিময় হইয়া গেল। "তবে যা মা বিজু দৌড়ে তোর দাদার জলখাবারটা দিয়ে আয়।"

বিজয়া তখন একাগ্রমনে তকলিতে সূতা কাটিতেছিল। সে ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা রে বাবা, খালি তোমাদের ফরমাস্, আমি এখন পারি না।"

পিসিমা হাসিয়া বলিল, "পারি নি কি লো। এখন দেশ-উদ্ধার করা রাখ্ লো ছুঁড়ি, এখন নিজেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা দেখ্।"

দয়াময়ী পুনরায় অনুরোধ করিল, "যা মা, যা চট করে। সে আবার যে ছেলে, এখনই বেরিয়ে যাবে, মুখের খাবার যেমন তেমনি পড়ে থাকবে।"

"কেন দিদি দিয়ে আসুক না।"

"দিদিকে কি দিয়ে আসতে বললে, তোকেই তো বলে গেল।"

"বলুক গে, আমাকে বললে বলে, আমাকেই যেতে হয় না? দাও কি দেবে দাও।" বলিয়া গস্ গস্ করিয়া জলখাবারের থালাখানা মোহনের সামনে গিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল, "এই নাও ধর। বাবুর আর একটু তর সইল না, আমি যেন ঝি।"

মোহন পাঞ্জাবিতে বোতাম দিতে দিতে হাসি চাপিয়া আড়-চোখে তাহার দিকে একটু চাহিয়া বলিল, "একেবারে মিলিটারি মেজাজ যে। ঝি তোমায় কে বলে? তুমি হ'লে রাজরাণী, এবার পাটরাণী হ'বে আবার।"

আড়াল হইতে দেখিয়া পিসিমা ও দয়াময়ীর মধ্যে আবার একটা সহাস্যপূর্ণ কটাক্ষ-বিনিময় হইয়া গেল।

বিজয়ার হাতে তখনও তকলি চলিতেছিল। দেখিয়া মোহন বলিল, "বোনে বোনে ভারী দেশভক্ত হ'য়ে উঠ্লি যে। তোরা স্বরাজ না নিয়ে ছাড়বি নি দেখ্ছি। দিদিটী তো অন্দর-মহলে বসে গম্ভীরমুখে চরকাই চালিয়ে যাচ্ছে। কারও পানে ফিরেও চায় না একবার।"

"ও তাই এত দুঃখু! বিদেশী বলে 'বয়কট' (বর্জ্জন) করেছে দিদি তোমায়। ও মা গো!"—বিজয়া হাসিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িল।

"সেই রকমই তো গতিক" বলিয়া মোহন জলযোগ সমাধা করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

মোহনও কয়দিন সভা-সমিতি লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে—আহার-নিদ্রা ত্যাগ—বিশ্রাম করিবারও অবকাশ নাই। কাজের চাপে পতিপত্নীর বিশ্রম্ভালাপও কয়দিন ধরিয়া বন্ধ। এরূপ অবস্থায় বাসন্তীর মনের অবস্থা যে কিরূপ হইল, তাহা তাহার অন্তর্য্যামী ব্যতীত কেহই জানিল না। তাহার দেহ শীর্ণ হইল,

চোখের কোলে কালি পড়িল, মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, কাজে উৎসাহ নাই, দেহ এলাইয়া পড়িতেছে।

সেদিন মোহন শয়নগৃহে প্রবেশ করিতেই দেখিল সম্মুখে বিজয়া। বেশে সেদিন তাহার একটু বিশেষ পারিপাট্য ছিল। তাহাদের স্কুলে প্রাইজ, কি এমনই একটা কিছু —সেই জন্য।

দেখিয়া মোহন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "উঃ— খাস রে! একেবারে মুনি-মনোলোভা। সাধে কি আর আমার মুণ্ডু ঘুরেছে, তবে আর কি, আজই তা হ'লে মালা-বদলটা হ'য়ে যাক না। আর দেরি কিসের?—"

বিজয়া চুপ করিয়া থাকিবার মেয়ে নয়, সে টপ করিয়া উত্তর দিতে জানে; কিন্তু সে কয়দিন হইতেই দেখিয়া আসিতেছে, তাহার দিদি যেন কয় দিন হইতে ম্রিয়মাণ। তাই তাহারও যেন কিছু ভাল লাগিতেছিল না; সুতরাং সে দিদিকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখ না দিদি।"

"দিদি কি করবে, আমি অমন কাউকে ভয় করি নি রে—"বলিয়া মোহন কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া গম্ভীর-মুখে বীরপুরুষের মত চটপট জামা-কাপড় ছাড়িয়া এবং চটী জুতার চটাপট শব্দে রণজয় ঘোষণা করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

বাসন্তী ঘরের একধারে দাঁড়াইয়াছিল, সে সেইখানে তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামীর এই সরল পরিহাস আজ তাহার কাছে ঘোর নির্লজ্জতারূপে দেখা দিয়া তাহাকে যেন একেবারে মাটীর সহিত মিশাইয়া দিল। সারা অন্তরটা তাহার ধিক্কারে—আত্মগ্লানিতে ভরিয়া উঠিল। বাল্যকাল হইতেই দুঃখের ক্রোড়ে লালিত সে, সুতরাং ধৈর্য্যগুণ তাহার যথেষ্টই ছিল; কিন্তু আজকাল কেমন করিয়া কেন যে তাহা সীমা লঙ্ঘন করিয়া দাঁড়াইল, তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পায় না। এ কি হইল তাহার? তাহার মন এমন ব্যাকুল হইয়া উঠে কেন? কে তাহাকে বুঝাইয়া দিবে?

সে দেখিল বিজয়ারই জয়। যার জন্য সে চোর সাজিয়াছে, সেই বুঝি আজ চোর বলিয়া ধরাইয়া দেয়। কাহার জন্য সে শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বামীর কাছে ভাল করিয়া মুখ তুলিতে পারে না? আপনার সংসারে কাহার জন্য সে এত অধীনতা স্বীকার করিয়া আছে? কাহার জন্য সে সবার কাছে এত 'কিন্তু' হইয়া থাকে? কর্ত্রী হইয়া তাহার এতটুকুও ক্ষমতা নাই কেন? কিন্তু বিজয়ার এতে দোষ কি? সে ছেলেমানুষ, সে তো কাহাকেও জবরদস্তি করিয়া কাড়িয়া লইতেছে না। তবে—এ তাহার পোড়া অদৃষ্টেরই দোষ। তা না হইলে স্বামী তাহার দেবতাতুল্য। তাকেও কি অবিশ্বাস করা যায় কখনও? তার মত লোককেও যদি অবিশ্বাস করা যায়, এ জগতে তবে কাকে সে বিশ্বাস করিবে? এত স্নেহ সব মিছে? তার কি সব ছলনা এও কি কখন হ'তে পারে! এত ভালবাসা তাও কি সব মুখের? ওগো কেন সে এত ভালবাসলে? দাসীকে দাসী না করে কেন সে রাজসিংহাসনে বসালে। আজ অনেকদিনের পর তাহার মাকে মনে পড়িয়া গেল—মা মাগো, কোথা আছ মা, একবার এসে দেখে যাও মা। বাসন্তী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চক্ষু উছলিয়া অজস্র ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ কাঁদিয়া মনটা সুস্থ হইলে ভাবিল—না, তার তো দোষ নাই এতে, সে যে মায়ের এক ছেলে। আমি পুত্রহীনা বন্ধ্যা নারী, আমার আবার এত কেন! যদি বিজির পেটে ছেলে হয়, বেশ তো সে আমায় মা বলে ডাকবে। বিজিও সুখী হ'বে, আমি না হয়---আবার তাহার চোখ ছাপিয়া উঠিল, আবার অশ্রু প্রবলবেগে ঝরিতে লাগিল। আবার সে চোখ মুছিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু কিছুই নিষ্পত্তি করিতে পারিল না। স্বভাবতঃই সে শান্ত ও সংযত-হৃদয়া। অবশেষে সে সহিবার জন্যই খানিকটা প্রস্তুত হইল।

(৬)

মায়ের কথা শুনিয়া মোহন স্তব্ধ হইয়া রহিল। বন্ধুরা বলিয়া থাকে তর্কে না কি তাহাকে কেহ পরাস্ত করিতে পারে না। সেই মোহনের মুখ হইতে প্রতিবাদের একটী কথা পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইবার ক্ষমতা রহিল না। বিস্ময়ে সে একেবারে হতবুদ্ধি, নির্ব্বাক। সে কয়দিন ধরিয়া মিটিং করিয়া, সভা-সমিতি লইয়া, চাঁদা তুলিয়া দেশের কাজে মহা-উৎসাহে ও উল্লাসে মসগুল হইয়া রহিয়াছে। বাহিরের বিরাট্ কর্ম্মক্ষেত্রের বিশাল ব্যাপারের মধ্যে সে নিমগ্ন-চিত্ত। এদিকে যে তাহার ক্ষুদ্র গৃহের অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে কত

বড় প্রলয়ের মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে, তাহা সে আদৌ অবগত নহে। সে এমনই আত্মবিস্মৃত। সংসারের ছোট-খাট কর্ত্তব্যগুলা তাহার চোখের সম্মুখ হইতে যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি তখন অনুসন্ধিৎসায় উজ্জল হইয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে—উন্নতি আর উন্নতি; এই জাতীয় উন্নতি—আর্থিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতি, নৈতিক উন্নতি।

মা কয়দিন ধরিয়া কয়েকটা কথা আভাসে জানাইতেছিল। তখন সেটাকে সে গ্রাহ্যের মধ্যে গণ্য করে নাই; কিন্তু মা যে মৌন সম্মতির লক্ষণ বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছে তাহাও সে জানে না। আজ স্পষ্টভাবে কথা পড়িতেই বিস্ময়-বিহ্বল পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া দয়াময়ী থামিয়া বলিলেন, "কি রে তা হ'লে কি বলিস ?"

পুত্রের বলিবার মত তখন বোধ হয় কিছুই ছিল না। সে নিরুত্তরভাবে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পরে আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া গেল, বোধ হয় নির্জ্জন-গৃহে চিন্তা করিতে।

সমস্যা জটিল হইলেও উপায় তাহারি হাতে, কিন্তু জননীকে বোঝান একটু কঠিন—একটু কেন হয় তো যথেষ্টই। তবু সে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল, কাল মাকে সাফ বলিয়া দিবে—না না সে হ'তে পারে না—হ'বে না। কথাটা সে যত সহজ মনে করিয়া লইল, কার্য্যতঃ ঘটিতে তাহা অনেক বিলম্ব হইল। তাহার স্বভাবটা এমনই অদ্ভুত ধরণের। দৈহিক শক্তিতে তাহাকে বলিষ্ঠ বলিয়াই বোঝা যায়, কিন্তু মনটী তাহার কুসুমসদৃশ সুকোমল, আর স্বভাবও তদনুরূপ মৃদু। হঠাৎ সে কোনও কাজ করিয়া ফেলিতে অনেকখানি ইতস্ততঃ করে; সুতরাং সে কাহারও প্রাণে এতটুকুও আঘাত করিতে বা ব্যথা দিতে নিতান্তই নারাজ।

শোকাতুরা জনক-জননীর এক্ষণে সে একমাত্র সন্তান ও সান্ত্বনার স্থল। ভগিনীটীও শ্বশুরগৃহে। অনেকগুলি সন্তানকে বিসর্জ্জন দিয়া মাতা-পিতা এক তাহাকে মাত্র অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; সুতরাং তাঁহাদের সেই শোক-দীর্ণ জরা-জীর্ণ বার্দ্ধক্য জীবনের মাঝখানে একটী ক্ষুদ্র সুকুমার চঞ্চল শিশুর যে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা সে বেশ বুঝিত। এ আশা তাহাদের অন্যায় নয়, এ দাবী তাহাদের অমূলক নয়। একটী নবজাত অতিথির কলহাস্যে তাহাদের নীরস নীরব জীবনকে সার্থক সচেতন করিয়া রাখিবে, ইহা তাহাদের একমাত্র অভিলাষ। তাহাদের সেই সুখের স্বপ্নলোককে কেমন করিয়া সে ভাঙ্গিয়া দিবে! আজ যৌবনের মোহে যাহাকে সে ঘোর অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছে, হয় তো সে মোহ একদিন কাটিয়া যাইবে, হয় তো মাতা আজ যে অভাবে ক্ষুণ্ণ একদিন তাহাদের সেই অভাবের জন্য জীবনটাকে মরুভূমি জ্ঞান করিতে হইবে। কিন্তু নিরপরাধা বাসন্তী তাহার, কোন দোষ নাই; তাহার উপর এ অবিচার কেন? ক্রমে সমস্যা জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। যাহাকে সে এক কথায় মীমাংসা করিবে ভাবিয়াছিল, ক্রমে তাহার সূত্র হারাইয়া ফেলিল। সে কাহারও উপর দোষারোপ করিতে ভালবাসে না। সন্দেহ জিনিসটাকে সে এমনই চিরদিন ঘৃণা করে এবং সমস্ত বিষয়কে সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা বিচার না করাই ছিল তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এইরূপ সূক্ষ্ম বিচার দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া নিজের ভীরুতায় সে নিজের কাছেই লজ্জিত হইয়া পড়িল। হইলেও এ লজ্জা তাহার একার নহে। রামচন্দ্রের যুগ হইতে যে দেশের সন্তান পিতামাতার অন্যায়কে নির্ব্বিচারে মাথায় করিয়া বহন করিয়া আসিতেছে, সে দেশের পুত্রের পক্ষে এ ভীরুতা বা কাপুরুষতা তাহার একার নহে, তাহার দেশেরই। দুইটী নারী সম্মুখে—একজন জননী আর একজন জায়া। একজনকে সুখী করিতে হইলে আর একজনকে দুঃখ দিতে হয়। আজ-কালকার ছেলেদের পক্ষে পন্থা সহজ। মোহন পৌরাণিক যুগের মানুষ নহে, তথাপি সে সহজ পথ ধরিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে চলিতে পারিতেছিল না।

(৭)

ঠিক এই সময় মোহন বাহির হইতে তাহার ছোট বোন দেবীর গলা শুনিতে পাইল, "হ্যা মা, দাদার না কি আবার বিয়ে দেবে ?"

মা বলিল, "হ্যাঁ, কেন ?"

"ওমা ওকি গো! লোকে বলবে কি ?"

মা বিরক্তির স্বরে বলিল, "লোকের কথার আমি ধার ধারি না।"

"না ধার না। যা না তাই বল্লেই হ'ল কি না। তোমার বাপু সব গায়ের জোরের কথা। আবার না কি বিজয়ার সঙ্গে বিয়ে দেবে বলছ ?"

মা বলিল, "হ্যাঁ তা কি হ'য়েছে ?"

"তা কি হ'য়েছে ; অবাক কথা ; দাদা যাকে বোনের মত করে মানুষ করেছে, তারই সঙ্গে—মাগো ! তুমি মা যেন কি হয়েছ বাপু। আর দাদাই বা কি রকম মানুষ গা ? অমনি বলে বসল 'হ্যাঁ'।"

মা বলিল, "দাদা তো তোমার মত ভ্যাভা-গঙ্গারাম নয়

দেবী সবেগে বলিয়া উঠিল, "না হোক। দাদাকে ভাল মানুষ পেয়ে ভেবেছ, যা তা অমনি করিয়ে নেবে। না তা বলে রাখ্‌ছি, আমি সে কখনও হ'তে দেব না। এ তোমাদের সেকাল পেয়েছ কি না, অমনি মুড়ি-মুড়কির মত আচলে গাঁটছড়া বেধে দিলেই হোল।"

মা মুখরা হইলেও এই মার্জ্জিত-রুচি একালের বাক্‌-চতুরা কন্যার কাছে চিরদিনই পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হন ; সুতরাং আজও তাহাই করিতে হইল। শুধু অবাক-বিস্ময়ে একটু বিরক্তিভরে বলিল, "কি লো, তুই কি বলিস বল তো শুনি ? আমার শ্বশুরের বংশে কি কেউ এক গণ্ডুষ জল পাবে না ? বলতে চাস, তাঁদের বংশের নামটাও রক্ষা করতে হ'বে না ? তুই ছেলে-মানুষ, ছেলে মানুষের মত থাক দেবী। তোর অত বুড়োপনা আমার আদবে ভাল লাগে না, এই আমি বলে দিলুম। বৌমার বয়সী বৌ-ঝিরা চার ছেলের মা হ'তে গেল—আবার কি এতদিন আমি অপেক্ষা করিছি। সকলে বলছে—ছেলের বিয়ে দাও, ছেলের বিয়ে দাও। তুই 'না' বললেই অমনি 'না' হ'বে।"

দেবী মায়ের কথার আর প্রতিবাদ না করিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মা বৌদির বয়স কত হ'ল ? কুড়ি ? একুশ ? না, অত হ'বে না।"

মা মুখ ভার করিয়া বলিল, "না, তোমার ভাজ খুকি।"

"দেখ মা, আমার ভাগ্নীর এই বাইশ বছর বয়সে কেমন সুন্দর ছেলে হয়েছে। বৌদির বয়স সবে উনিশ-কুড়ি—ঢের সময় আছে। আমার শাশুড়ী গল্প করে মা, তাঁর পঁচিশ না ছাব্বিশ বছর বয়সে আমার ভাসুর হয়, তারপর দেখ না, পর পর এতগুলি। এখন দেখ তাঁর বাড়ীতে ছেলেপুলে নাতি-নাতনি ধরে না। আমার দিদিশাশুড়ীও সেকেলে মানুষ, কই আমার শ্বশুরেরও বিয়ে দেন নি, আর তুমি অমনিতেই অধৈর্য্য হ'য়ে উঠেছ। আচ্ছা আমি দাদাকে জিজ্ঞেস করি তার কি মতামত,—"বলিয়া মায়ের উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া দৃপ্তপদে দেবী দাদার ঘরে প্রবেশ করিল। ডাকিল, "দাদা অ দাদা—"

দাদা তখন ঘরের মধ্যে বিছানায় পড়িয়া লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল।

দেবী বিছানার উপর দাদার পাশে উপবেশন করিয়া বলিল, "হ্যাঁ দাদা, এসব তোমাদের কি হচ্ছে শুনি।"

দাদা তখন উঠিয়া বসিয়া পার্শ্বস্থিত বইখানা—যাহা এতক্ষণ অপাঠ্যভাবে পড়িয়াছিল—তাড়াতাড়ি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

"অ দাদা।"

"কি হ'বে রে ?"

"কি হ'বে বৈ কি ? আমি যেন কিছু শুনি নি। ওখানা কি বই দাদা ?"—বলিয়া দেবী দাদার হাতের বইখানা আকর্ষণ করিল।

বইটা মুড়িয়া দাদা মুখ তুলিয়া বলিল, "ও তুই বুঝতে পারবি নি। ও একখানা ইংরেজী বই। তোরা সব ভাল আছিস তো ?"

"হ্যাঁ।"

"কতক্ষণ এলি ?"

"এই তো আসছি সবে। এসেই মায়ের সঙ্গে এক পালা ঝগড়া করলুম।"

"তারপর ?"

"তারপর এবার তোমার সঙ্গে একপালা হ'বে। হ্যাঁ দাদা, অ দাদা, আবার বই খুলছ' কেন ? পোড় এখন বাপু। তোমার পড়া তো পালিয়ে যাচ্ছে না, আর কেউ কেড়েও

নিচ্ছে না। আগে আমার গোটা কত কথার উত্তর দাও।''

মোহন হাস্যময় সস্নেহ দৃষ্টি ভগিনীর মুখের উপর রাখিয়া বলিল, "কি বলছিস বল?''

"আমি জিজ্ঞেস করছি, তোমার মতামত কি?''

"কি মতামত রে?''

"না, মতামত আর নেই একটা মানুষের। জানি নি। তোমাদের কথার কেউ অন্ত খুঁজে পাবে না। এই শুনছি তুমি আবার বিয়ে করবে ছেলে হ'ল না বলে। হাঁ দাদা, সত্যি? সত্যি তুমি বিয়ে করবে বলেছ? সত্যি বল্‌তে কি কথাটা যদিও আমার বিশ্বাস হয় নি—। আচ্ছা দাদা বৌদি কি বলে? খুব রাগ করে? করে না? বৌদির মত আছে? দায় পড়েছে থাকবার জন্যে। বৌদিও যেমন মাটীর ঢিবি, তুমিও তেমনি মাটীর দেবতা। তা না হ'লে আর এ গোল বাধে। বৌদি কোথা গেল দাদা? ও ঘরে বুঝি। ও বৌদি, বৌদি, শীগ্‌গির শুনে যাও, একটা ভারী দরকারি কথা আছে। ও বৌদি!"

ননদের ডাকাডাকির চোটে বৌদির পরিবর্ত্তে বিজয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া দেবী কলহাস্যে গৃহখানিকে মুখরিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা! তুই এরই মধ্যে আমার বৌদি হ'য়ে পড়েছিস না কি! ওরে তোকে নয়, তোকে নয়, নতুন বৌদিকে নয়—আমার সেই মান্ধাতার আমলের পুরানো বৌদিকে ডাকছি।"

বিজয়া অপ্রতিভ মুখে দিদিকে ডাকিয়া দিতে পুনরায় ফিরিয়া গেল। মোহন এবার যথাসাধ্য বলে সঙ্কোচটাকে সরাইয়া ফেলিয়া সহাস্য আননখানিকে গাম্ভীর্য্যে ঢাকিয়া প্রসন্নমুখে বলিল, "কেন পাগলামি করছিস দেবী?''

"আমি বুঝি পাগলামি করছি—বাঃ। তোমাদের বলে সব ঠিকঠাক হ'য়ে গেছে, আমি এলুম নেমন্তন্ন খেতে।''

মোহন হাসিতে হাসিতে ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দুষ্টুবুদ্ধিটুকু কোনও জনমেও তোর যাবে না দেখছি। চিরকাল কি ছেলে মানুষ থাক্‌বি?''

দেবী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "আচ্ছা দাদা, বৌদি আসছে না কেন বল দিকি নি? বোধ হয় রাগ হয়েছে—না?''

"রাগ হ'বে না তো কি হ'বে বল। তোরা চার দিক থেকে তাকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে যে রকম কাণ্ড-কারখানা বাধিয়ে তুলেছিস।"

দেবী ঘাড় নাড়িয়া সোজা হইয়া বসিয়া দাদার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমরা—না? নিজের দোষটা পরের ঘাড়ে চাপাতে পারলে কেউ আর ছেড়ে কথা কয় না গো।"

এই প্রগল্‌ভা ভগিনীটীকে আঁটিয়া ওঠা ভার। যাহাই হউক দেবীর স্নেহাজ্ঞতে মোহনের বুক হইতে পাথরের মত ভারি একটা বোঝা নামিয়া গেল।

দেবীর এই অনর্গল বিশৃঙ্খল কথার জন্য সে কতবার তাহাকে শাসন করিয়া দিয়াছে, সেই কথাগুলো আজ তাহার কাছে বহু মূল্যবান বলিয়া মনে হইল। মোহন দেখিল, দেবী আজ একটা বিরাট্ সমস্যাকে তাহার সরল বুদ্ধির সাহায্যে অতি সহজে মীমাংসা করিয়া দিল। এমনি স্বাভাবিকভাবে ইহা প্রকাশিত না হইলে মনের মেঘ একটু একটু পুঞ্জীভূত হইয়া একদিন তাহা বিরাট্ বজ্রের সৃষ্টি করিত। অন্তরের এই নিদারুণ অনল কি অসহনীয়ই না হইয়া উঠিত। ইহা স্মরণ হইতেই সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

মোহনকে নিস্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছ দাদা?"

মোহন সে কথার কোনও উত্তর দিল না, শুধু সেই সুগভীর নয়ন দু'টী প্রীতিতে পূর্ণ করিয়া স্নেহভরে ভগিনীর মুখের উপর তুলিয়া ধরিল। সে চাহনি নীরবে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল। দেবী সে চাহনির অর্থ বুঝিল।

কোলের পিঠের ভাই-বোন তাহারা। তাহাদের মধ্যে গুরু-লঘুভাব কোনও কালেই ছিল না, আজও নাই এবং ছেলেবেলা হইতে সেই যে তাহাদের মধ্যে সহযোগিতা সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে, আজও তাহা তেমনি অটুট রহিয়াছে।

দেবী বলিল, "অ দাদা, বৌদির কি হোল গো, এখনও আসে না যে।''

মোহন হাসিয়া বলিল, "কি করবি তাকে আনিয়ে?"

দেবী মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, "আমি বুঝি এলুম খালি তোমাদের সঙ্গেই ঝগড়া করতে।"

মোহন স্মিতহাস্যে বলিল, "ওরে এবার কি ননদ-ভাজে

কোঁদল পাকাতে হ'বে ? ভারি কুঁচুলি হ'য়েছিস তো ! দুষ্টু মেয়ে কোথাকার।"

এই সময় বাসন্তী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আমায় ডাকছিলে ঠাকুর-ঝি ?"

"হ্যাঁ গো মহাশয়া"—বলিয়া দেবী সহসা থামিয়া গেল। তাহার শীর্ণ, ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মুখের কথা মুখেই বাঁধিয়া গেল—"এ কি বৌদি ?" বলিয়া দাদার দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—"কি দশা হয়েছে দাদা ? এর নাম তোমাদের দেশের সেবা করা। দেশের সেবা করা মানে ঘরকে ছেড়ে আর সবাইকে সেবা করা—না !"

দেবী গালে হাত দিয়া ক্রন্দনের স্বরে বলিল, "মা গো। তোমরা একেবারে মানুষ খুন করতে পার।"

বাসন্তী অন্তরাল হইতে সমস্তই শুনিয়াছিল। মোহন কথার উত্তর দিবার আগেই হাস্যমুখে ননদিনীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া সম্ভাষণ করিল, "তারপর দেবীর আজ হঠাৎ আবির্ভাব যে ? কি মনে করে ?"

দেবী মৃদু হাসিয়া বলিল, "মনে একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে। তা না হ'লে আমার সাক্ষাৎ পাও !"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি, দেবী আজ আমার প্রতি বড় সদয়া।"

"তোমার প্রতি নিদয়া সে কোনও দিনই নয়। অতএব হে ভদ্রে—" বলিয়া দেবী আড়-চোখে একবার দাদার প্রতি চাহিয়া লইল। দেখিল, দাদা তখন ঘাড় গুঁজিয়া সেই বইটা লইয়া পড়িয়াছে। সে তখন বৌদির দিকে ফিরিয়া বলিল, "এক্ষণে বর গ্রহণ কর।"

বাসন্তী উপস্থিত সাবিত্রী-উপাখ্যানটা পড়িয়াছিল। সে হাসিয়া ননদকে উত্তর করিল, "কেন, তুমি কি আমার যম এলে ?"

দেবী যথাসাধ্য মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল, "যম তো ভাই সাবিত্রীকে তিন বর দিয়েছিল, আমিও তোমাদের মোটে দু'টী দিচ্ছি।"

"তোমাদের মানে ?"

দেবী বৌদির কাণে কাণে বলিল, "তোমাকে একটী, আর তোমার বোনকেও একটী বর—এখন বুঝলে তো !"

বাসন্তী সহাস্যমুখে "এইবার তা হ'লে উঠি ভাই" বলিয়া সে গমনোদ্যত হইল।

দেবী বৌদির আঁচল চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বা কোথায় যাচ্ছ ?"

"রান্নাঘরে।"

"কেন এরই মধ্যে ?"

"দেব-দেবীর যুগল-পূজার আয়োজনে।"

"শুনছো দাদা, তবে না বৌদি কথা জানে না ?"

দাদা পত্নীর প্রতি একটা অর্থপূর্ণ গোপন কটাক্ষ করিয়া বলিল, "জানে রে জানে ; সব জানে, শুধু খরচ করে না অপব্যয় হ'বার ভয়ে।"

* * *

মোহন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাক, বাঁচা গেল।"

দেবী বলিল, "সেই জন্যে আরও আমার আসা। ছেলেটী বেশ দাদা। আমার মেজ জায়ের ভাই হয় কি না, তাই ও আমাদের বাড়ী যাওয়া-আসা করে। আমারও বাপু ছেলেটীকে বেশ লাগে। তোমাদের মতই স্বদেশী গো, খুব খদ্দর পরে, চেহারাও মন্দ নয়, তবে একটু কালো। তা তোমার বিজিকে বেশ মানাবে গো, যেন মেঘের কোলে বিজলী।"

"তা হ'লে"—নিতান্ত অনুগত ছোট ভাইটী তার দিদিকে যেমনভাবে জিজ্ঞাসা করে মোহন তেমনি স্বরে বলিল, "তা হ'লে শুভ কাজ শীগগির সেরে ফেলাই ভাল—কি বলিস্ দেবী ?"

"আমি বলি এই সামনেই যে লগ্নটা আছে, সেইটেতেই দিয়ে ফেল—কেমন ?"

মোহন তৃপ্তির সহিত বলিল, "বেশ।"

দেবী আবার বৌদিকে লইয়া পড়িল, "তা হ'লে বৌদি আমার কি ঘটকালি দেবে ভাই দাও। কি বল দাদা ? ভাল করেই তো খুসী করা উচিত—ওর হোল বোনের বিয়ে।"

দাদা হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়।"

আর বৌদি বুকভরা আনন্দ, মুখভরা হাসি, আর চোখ-ভরা কৃতজ্ঞতা-মাখানো জল লইয়া ননদিনীকে একটী ছোট কিল দেখাইয়া জানাইল, "এই তোমার ঘটকালি-বিদায়।"

পুত্রকন্যার ব্যবহারে দয়াময়ী একেবারে তাজ্জব বনিয়া গিয়াছিল; সুতরাং সে পুনরায় সংসারের বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া পিসীমার বাড়ী ত্রিবেণীতে গিয়া বাস করাই মনস্থ করিল। কিন্তু কিছুদিন বাস করিবার পর শরতের এক সুমধুর প্রভাতে যখন শুনিতে পাইল, তাহার বধূমাতা একটী রাঙ্গা খোকা ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে, তখন মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া যুক্তকরে ত্রিবেণী তীর্থের পায়ে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাহার স্বষ্টিধরকে বাড়ী ফিরিল।

———:*:———

শব্দব্রহ্ম

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়

শব্দ-ব্রহ্মের প্রসাদে আড্ডায় স্মৃতির প্রভাব লোপ পাইয়াছিল। মাস, তিথি, বারের বালাই ছিল না। যখন যে দেবতার পূজা করিবার ইচ্ছা হইত, তান-মান-লয় স্বরে তাঁহার আবাহন ও বিসর্জ্জন হইত। বাহিরে দেবার্চ্চনার কলরব উঠিলে আমাদের আড্ডা বন্ধ থাকিত। সাধারণের কোলাহলে অঙ্গ ভাসাইলে চলিত না, যার যেমন যোগ্যতা সেই রকম কাজে লাগিয়া যাইতে হইত। কাহারও কোন আবেদন থাকিলে তো কথাই ছিল না। মাষ্টারের এসব বিষয়ে খুব কড়া আদেশ ছিল। তবে, আড্ডায় আষাঢ়ে অম্বিকার আবাহন, হেমন্তে হোলি, শীতে সরস্বতীর অর্চ্চনা করিতে কোন বাধা ছিল না। বসন্তে বরযাত্রদের রথযাত্রার হুড়াহুড়ি লাগিত। মাষ্টার রথযাত্রায় না মাতিলেও, বামন-দর্শনে বিশেষ ব্যগ্র হইতেন। বলিতেন 'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে'। আড্ডার তরুণদের কেউ যদি বামন হইতেন, তবে মাষ্টারের আনন্দের সীমা থাকিত না। তিনি নবদম্পতিকে রথেই দর্শন করিতেন, স্বহস্তে ফুলের মালা পরাইয়া দিয়া বামনের কাণে কাণে বলিতেন 'বোন বিয়ে করেছিস, জয়কালীর নিকট জরিমানা দিয়ে যাবি। জরিমানার টাকায় একদিন জমাটী মজ্‌লিস্‌ হইত। মাষ্টার গায়িতেন :—

ছি ছি লাজে মরি হরি
জনক-দুহিতা তোমার পিয়ারী
ভদ্রা সনে এই কাজ শূদ্রজনেও পায় লাজ
তাই বুঝে আর্য্য করেছেন ধার্য্য এই জরিমানা
ভূভার হরিতে গোলোকপতে! (তোমায়)
করতে হ'বে আনাগোনা।

মহাপূজার তিনটী দিন আড্ডা ঠাণ্ডা ছিল। বিজয়ার দিন মহাসমারোহে বিজয়োৎসব হইয়া গেল। কোজাগরী পূর্ণিমার দিন পাশার পিতৃশ্রাদ্ধ ছিল। সত্যশরণ স্বয়ং শকুনি হইয়া বসিয়াছিলেন। তবে, 'ছয়-তিন-নয়' পেয়ে কেউ নূতন ঘরে উঠিবেন, আর কাহারও পুরাতন ঘর 'তিন-ছয় নয়' হইবে তার উপায় ছিল না। বাজীর টাকা জয়কালী পূজার জন্য জমা থাকিত। এইরূপে কটা মাস কাটিয়া গেল। একদিন কন্‌কনে শীতের রাতে আড্ডায় আড়ষ্ট হইয়া সব একযায়গায় জমাট বেধে বসিয়াছিল। আর বোসেদের পুকুরে সেই শীতে কে কটা ডুব দিয়ে আসতে পারে তারই তর্ক আর রকমারি বুক্‌নী চলিতেছিল। মাষ্টার সকলকে সতর্ক করিয়া পাশের ঘরে ঢুকিলেন। এদিকে অটুলা সর্দ্দিতে টল্ টল করিতেছিল। নষ্টামি করিতে নস্য লইয়া জটলার মধ্যে গিয়া এমন হাঁচি জুড়িল যে কাহারও কাহারও পুকুরে যাইবার প্রয়োজন হইয়া উঠিল।

অটুলা বলিল—বাবা, শব্দ, ব্রহ্ম, এই শীতের রাতে গরম গরম লুচির আলোচনা না করে কেবল পুকুরে ডুব পাড়বার কথা! আমি সর্দ্দিতে সেঁতিয়ে উঠেছি!

ইতমধ্যে মাষ্টার ডালায় করিয়া গরম ঘুগনী আর মুড়ি-

কড়াই প্রভৃতি সাড়ে বত্রিশ রকম ভাজা ঝাল-লবণ-তৈল সংযুক্ত আনিয়া হাজির করিলেন, আর বলিলেন—তোদের বয়সে আমি বরফের উপর হাডুডু খেলতুম, আর তোরা একেবারে জড়-ভরত মেরে গিয়েছিস? আয় সব, ভাজা খেয়ে তাজা হ'বি আয়।

স'তে' সেতার ছাড়িয়া তব্‌লায় হাত গরম করিতেছিল; ঘুগনিদানার নাম শুনিয়া তব্‌লার তেহাই ডিগ্‌বাজী দিয়া শেষ করিল অটলার সামনে পড়ে। আর ছিরে চমকাইয়া ঘুগনীর ঠোঙা হাত থেকে ফেলিয়া দিল। সতে সটাং শুয়ে মুখে পুরিতে লাগিল। আড়ষ্ট ভাবটা সকলের কাটিল। হাত, মুখ, বুক, পেট, গলা ক্রমে সকলের গরম হইয়া উঠিল। হারু মাষ্টারের জয়ধ্বনিতে ঘরও গরম হইয়া গেল!

সতের ডিগ্‌বাজীতে অটলার হাঁটুতে একটু লাগিয়াছিল; এতক্ষণ কোন কথা কয় নাই, খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া সকলে স্থির হইয়া বসিলে অটলা সতেকে বলিল—ওহে বাণীর বরপুত্র! স্বরময় 'মাষ্টার' বীণা রূপে প্রকাশ পেয়েছিলেন; কিন্তু তোমার ঐ কে'টো শরীর কি ক'রে প্রকট হয়েছিল বল তো শুনি।—;

শক্ত শরীরের উৎপত্তি সহজে হয় না, যদি তোরা বুঝতে পারিস তবে তোরা শক্ত হতে পারবি—এই বলে সত্যশরণ বলতে সুরু করল'—সে অনেক কথা তোদের ধৈর্য্যের উপর জুলুম হ'বে। পুরাকালে ধম্মা নামে এক ডোম ছিল সভ্য-সমাজের সীমান্তে তার দেখা পাওয়া যেত। কাজ ছিল তার কুলো বোনা। বীজ বাছাই করতে, তার ধুলো আগ্‌ড়া ঝাড়তে লোকে কুলো কিনত। কখন কখন সে বাঁধত ঝুড়ি; আল্‌গা জিনিস আটক রাখতে লোকে ঝুড়ি বাড়া নিয়ে যেত। ধম্মা, রাতে খেত তাড়ি, আর চৌকি দিত লোকের বাড়ী বাড়ী। বিপদের সময় সে ধরত লাঠি, মুখে বলত খাঁটা খাঁটী। পল্লীর সম্পদ শস্য-সম্ভার রক্ষা করতে—ছাড়া পশু তাড়া করত। দাদা, ভাই, খুড়ো-জ্যাঠা-সম্বোধনে লোকের কাছে আদর পেত।

ধম্মার বন্ধু ছিল কম্মা মুচী। সে সদাই শুচি। কারণ জ্ঞানের গরব তার পাশে পশে নাই, মায়ার ঘোর তার কাছে ঘেঁসে নাই। মরণ-ঘেরা জীবের চর্ম্মে, কখন বর্ম্ম, কখন ঢোল তৈয়ারী করত। অস্ত্র শুকিয়ে তন্ত্র করত। কখনও 'ছিলে' করে ধনুকে চড়াত, কখন যন্ত্রে বেঁধে সুর দিত। এই রকম ক'রে সমাজে বাঁচবার উপায় ও সুখের ব্যবস্থা করে দিত। ধম্মা বাজাত ঢোল, কম্মা বাজাত সানাই। মায়ের মঙ্গল আরতিতে গৃহস্থের মঙ্গল শঙ্খের সঙ্গে ঐ ঢোল ও সানাই সমান বাজত। ঢোল কোন দিন করত না গণ্ডগোল, বরং বিজয়ার দিন গৌরবে ফুলে ঢাক হ'ত। সেই ঢাক বাজত শিবের গাজনে—যখন জীব শিব হ'য়ে নৃত্য করত।

কালের প্রভাবে সোনা শুচি হ'ল, সুখের বাঁধন বাড়ল কম্মামুচী অশুচি হ'য়ে মরণ বরণ করলে। দুঃখমোচন করতে কেহ থাকল না। ছোট লোকের আদর গেল, ধম্মা লজ্জায় মুকুলো। কুলো, কাদায় পরে পচতে লাগল। ভেজাল বাছা দায় হ'ল। ঝুড়ি বাড়ী ছাড়ল। জড়করা জিনিস ছড়িয়ে পড়ল। সুখের নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। বিপদে লাঠি দূরের কথা, একগাছা কাঠিও নিয়ে কেহ বাধা দেয় না। সম্পদ্ সপাট শয়ন করলেন, শস্য পাটে পরিণত হ'ল। সেই পাট বাঁচাতে ছাড়া ছাগল তাড়াবার লোক থাকল না। সানাই, কানাইয়ের বাঁশী হ'য়ে বিদেশী বঁধুর মন-ভোলাতে গজল গাইতে শিখল। গৃহস্থের ঘরে মঙ্গলশঙ্খের নিনাদের স্থলে ক্রন্দনের রোলে আর কলহ-কোলাহলে পূর্ণ হ'য়ে উঠল। মা'র মঙ্গল আরতি বন্ধ হ'ল। পাড়ায় পাড়ায় ভোট-মঙ্গলের ভেরীর বাজনা সুরু হ'ল।

ধর্ম্মার সঙ্গে সঙ্গে জয়ঢাক বহুদিন অন্তর্হিত হ'য়েছে। ঢোলের অনেক রূপান্তর ঘটেছে। আল্‌গা প্রাণ আগ্‌লান যায় না। আগে চামের খোলের মধ্যে তাকে ভ'রে ধরতে হয়; তারপর তাকে যেমন নাচাবে তেমনি নাচ্‌বে। স্বরই প্রাণ, প্রাণই শব্দ, সেই শব্দব্রহ্মকে কর্ম্মার সৃজিত ধর্ম্মার ঢোলের মধ্যে ভরা হ'য়েছিল। কত মরা জীবের আঁত ও আবরণ দিয়ে কর্ম্মার পাকে বাঁধা ঐ ঢোলের সৃষ্টি। তর্কচূড়ামণি টোলে বসে বিচার করে বললেন, মড়ার চামড়া, ওর স্পর্শে সব অশুচি। শুচিবায়ুগ্রস্ত প্রবীণরা 'রাম রাম' বলে শান্ত হ'লেন, বুঝলেন না চামড়ার যন্ত্র বাজিয়ে কাহাকেও স্নান করে কোন দিন শুদ্ধ হ'তে হয় নাই। সবুজপ্রিয় নবীনরা 'আরে ছ্যা' বলে মা'র মন্ত্র সাধনের একমাত্র উপায় সজীব স্বরকে মৃত ও গলিত বলে প্রত্যাখ্যান করলে।

পীড়িতা

বুঝলে না শব্দব্রহ্মের স্পর্শে মৃতও সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠে, জীবন পেলে সবাই পবিত্র ও সকলের নিকট আদৃত হয়।

শব্দ-ব্রহ্মের প্রসাদে ঢোল অমর হ'লেও অন্নাভাবে শুকিয়ে উঠল। রহমান গড়িয়ে গড়িয়ে পেটও সমান হ'য়ে গেল। তিনি মাদলের রূপ গ্রহণ করলেন। তিনি যে শব্দব্রহ্মের পুত্র সে জ্ঞানও হারালেন। তাঁর কদাকার রূপ ও কুৎসিৎ শব্দে সুসভ্য সমাজে তাঁর স্থান হ'ল না। মাদল জঙ্গলের পথে গড়াচ্ছিল, মাতাল সাঁওতাল মাথায় করে নিয়ে ঘরে গেল। অসৎ সঙ্গে পড়ে মাদল ধরল মদ, শিখল কোঁদল।

সভ্য মানুষেরা নিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পকলা-দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের গৌরব করে। মাদল তাদের অনুদারতার পরিচয় পেয়ে মর্মে মর্মে চটেছিল, কিন্তু আলস্য ছাড়তে পারে নাই। পরের কথায় তালি দিলে দু'দিন খেতে পাওয়া যায়, বারমাস কেউ খেতে দেবে না। মাদল তা' বুঝেও চ'টেই থাকল। কিন্তু করবার কিছু উপায় নেই। মেড়া লড়ে খোঁটার জোরে। তার যেখানে খোঁটা, সেটা সভ্য সমাজের আঁস্তাকুড়। সভ্যদের সহিত সংঘর্ষের সুযোগ হ'ত না। তাই বিধির বশে যে দিন লাগত বাদল, সে দিন তার ফুটত বোল। বলত—

ধরতো খেড়ে দেতো ধ্যাতাৎ
খাচ্ছে দহী বলচে চ্যাটাং
মরতে যোয়া ধরতে কাতাৎ
ধরতো খেড়ে দেতো ধ্যাতাৎ॥

ধাঙড়-ধাঙড়নীরা শুনে হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ত, আর মদ খেয়ে খুব নাচত।

ছিরে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগল। জটলা হেসে কেসে অস্থির হ'য়ে পড়ল।

একদিন দেবর্ষি নারদ সেই পথ ঘুরিয়ে যাচ্ছিলেন। সাঁওতালদের মদ খেয়ে হুড়োহুড়ি করতে দেখে তাঁর দয়া হ'ল। তিনি বললেন, 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'। ছোটলোক, তারা কিছু বুঝলে না; ভাবলে রাজার দূত এসেছে, এমনি ব্যাপারে ধাড়াতে ধরে নিয়ে যাবে। [illegible] হুব চাওয়াচাওয়ি করে সব সরে পড়ল। একজন [illegible] মাদলকে বলে, 'ওরে মাদলার দিয়ে তো খুব [illegible]

লাফি কারস্, যা নারে, এইবার দু'কথা শুনিয়ে আয়। মাদলা এগিয়ে আসতেই দেবর্ষি তাকে চিনতে পারলেন, বল্লেন—ওহে তুমি ব্রহ্মার বরপুত্র, চাঁড়াল পাড়ায় এসে বাসা নিয়েছ।

মাদলা বল্লে—কিসের ব্রহ্মা, কিসের পুত্তুর, আমি ধাঙড় খেড়ের পুষ্যি-পুত্তুর। সরে পড় এখান থেকে ঠাকুর, নইলে গায়ে এঁটো জল ছিটিয়ে দেব।

নারদ বল্লেন—আরে তুই একেবারে অধঃপাতে গেছিস্ যে! মদ খেতে শিখেছিস,হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছিস্ দেখ ছি।

মাদলা বললে—যাও যাও ঠাকুর, আর ভদ্দরগিরি ফলাতে হ'বে না, তোমাদের তো কেবল বাক্যি; বাগদী, চাঁড়াল, ধাঙড়, ছোটজাত হ'লে হয় কি, ওদের হৃদয় আছে। বাবা, ওদের দয়াতে এখনও বেঁচে আছি।

নারদ বল্লেন—বেশ তো বাবা নিজে মানুষ হ'লে, ওদের কাছে কৃতজ্ঞতা দেখাবার ও জগতের কাছে গৌরব করবার অনেক অবসর হ'বে। রামচন্দ্র বানরের সাহায্যে সীতা উদ্ধার করে বানরদের জগতের নিকট মানুষ অপেক্ষা গৌরবান্বিত করেছিলেন, যার জন্ত এখনও সভ্যমানুষে হনুমানজীর পূজা করে। মানুষের কাছে সাহায্য না পেয়ে তিনি বানরের দলে মিশে বানর হ'ন নি। ভাল চা'স তবে ওখান থেকে বেরিয়ে আয়।

মাদল বল্লে—বেরিয়ে এসে কি হ'বে? আমার বদ চেহারা আর বেজায় আওয়াজে, সভ্যসমাজে স্থান হ'বে না।

নারদ বল্লেন—আমার কথামত যদি কাজ করিস্ তবে সশরীরে বৈকুণ্ঠে স্থান হ'বে। আর যদি দেহান্তর চাস, তবে নিজের সাধনায় মানুষ হ'তে হ'বে, আর, মানুষ হ'লেও পুরাতন পরিচয় থাকবে না।

মাদল বল্লে—নাও,আর লম্বা লম্বা কথা বলতে হ'বে না, স'রে পড়।

নারদ ক্রুদ্ধ হয়ে মাদলকে এক আছাড় দিয়ে চলে গেলেন। ছিল এক, হ'ল দুই। মাদলরূপ হারিয়ে তবলরূপ হ'লেন। আর আধখানা হ'লেন তার প্রেয়সী বামারূপিনী, নিতম্বহীনা স্থূলোদরী [illegible] কোলে বসিয়ে আদর করলে তবে তাঁর [illegible] [illegible] সে বোলও [illegible]

এই কর্ম্মনাশা কোণেবসা মাণিকজোড়কে কোন ভদ্রলোকে বাড়ীতে ঠাঁই দিতে রাজী হ'লেন না। দুটো লম্পট মাতাল যাচ্ছিল, তাদের পথে বসে থাক্‌তে দেখে বল্লে—কে বাব' তোমরা, যুগলে পথ আগলে ব'সে আছ ?

তবলার দেহান্ত হ'য়ে একটু উন্নতি হ'য়েছে, মাদলের চেয়ে বোল মিঠে হ'য়েছে, উত্তর করলে—তবলাঙ্‌— ।

মাতাল। কোথা হ'তে আগমন ?

উ। তলাঙ্‌—।

মাতাল। ও, চাঁড়াল পাড়ার দিঘী হ'তে আস্‌ছ। বেশ, এখন কোথায় যাওয়া হ'বে ?

উ। থাক দলাঙ্‌—।

মা। বটে, থাক'র দালানে উঠ্‌বার সাধ হ'য়েছে। সে তো অমনি হ'বে না। কিছু রেস্ত সঙ্গে আছে ?

উ। থাক্‌ বোলাঙ্‌—।

মা। আচ্ছা আচ্ছা। থাক'র খোসামোদে বাবা মুখ ব্যথা হ'য়ে গেছে। তুমি গেলে মাঝে মাঝে বিশ্রাম পাব। তব্‌লা তুলতেই বামা ঘুঙ্‌ করে পায়ে গড়িয়ে পড়ল তবলা তাঁই তাঁই করতে লাগল।

দ্বিতীয় মাতাল বল্লে—'এ কে বাবা'।

তবলা। উনি আমার প্রেয়সী অর্দ্ধাঙ্গিনী।

২য় মাতাল তাহাকে কোলে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

'ক্যা গুণ প্যারি তেরী কেয়া গুণ ?'

বামা 'ঘি, ঘি—ঘি, ঘি' করে শব্দ করলে।

২য় মা। একি চাঁদ হাসি, এ শুনলে থাক তোমায় পাঠাবে কাশী।

বামা। দি দি থাক ঘা ঘা ঘুঙ ঘুঙ।

মা। বটে বটে ? থাক দিদিকে খেতে বল্‌বে, ঘুমুতে বলবে। বেশ চল।

এইরূপে বামা তবলা থাক বাড়িওয়ালীর দালানে আশ্রয় পেলেন।

থাকর দিন দিন পশার বৃদ্ধি হতে লাগল'। এ দিকে তবলার তোষামোদ পুরা দমে চলতে লাগ্‌ল'।

লোকে যখন সংসার-সংরক্ষণের জন্য নানা কাজে ছুটোছুটী করছিল, তবলা তখন ঐ মাতাল ও বিলাসীদের আড্ডায় আরাম ও আলস্যের অর্চ্চনা করতে করতে বলছিল—

দেৎ তোরে খেটে খেটে মল্লোরা হেঁটে হেঁটে
না খেটে কাটা'না দিনে ঘা'দিগেনা গাদা ধনে।
থাক' নাচে টাকা খোনা, না থাকেতা ধার্ কন্না
লাখে লাখে টাকা দিন্ নাকে ধিন্ কাটে দিন্॥

আবার দৈবক্রমে দেবর্ষি সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে তবলার গলা চিন্‌তে পারলেন। তিনি থাক'র দালানে প্রবেশ করেই মাতালদ্বয়কে তবলের সম্মুখে সমাসীন দেখ্‌লেন—বল্লেন—

'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—'

মাতাল বল্লে—বাবাজী যা বলেছ ঠিক তাই। অমর্ত্ত শুঁড়ীর ঘরের খাঁটী অমর্ত্ত, আর পাকো—খাঁটার ভাঁটী। আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব ঐ খাঁটীতে আর ভাঁটীতে। থাক'র সঙ্গে পুরান আলাপ ঝালাতে এসেছ বাবাজী, বস বস। অমৃত অল্পই আছে, তুমি সিদ্ধপুরুষ, এক চুমুকে মেরে দেবে, ওতে কিছুই হ'বে না, তুমি গাইবে, নাচ্‌বে, বস্‌বে, শোবে, সমাধি হ'বে, শেষ, বমি না করে যাবে না। কেস্ দুই হুইস্কী আন্‌চি বাবাজী——বলে মদ আন্‌তে প্রস্থান করল'।

নারদ বল্লেন। ওহে তবল, আবার এই সব অসৎসঙ্গে মিশেছ।

তবল। কি করব ঠাকুর, আমার যে অর্দ্ধাঙ্গিনী করে দিয়েছ, ওর জন্য কোন ভদ্র-সমাজে যাবার উপায় নাই। পেট তো চালাতে হ'বে, থাক'র ধমকে চমক লাগিয়ে দিন কাটাচ্ছি।

"আচ্ছা হতভাগা দেখি তুই ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়ে কি করিস্" বলে নারদ তবলা ও বামা একত্র সংযোগ করে পাখোয়াজে পরিণত করলেন। পাখোয়াজ বড়লোকের বৈঠক খানায় স্থান পেলেন।

বড়লোকের সংসর্গে পাখোয়াজের আওয়াজ বাড়ল, পেটও বড় হ'ল। আগে ভোজন পরে বচন। তবে, দেউড়ীর দরওয়ানদের চেয়ে ভাল। সিদ্ধির শ্রাদ্ধ করে, আঠারপোয়া আটার চাপাটী উদরস্থ করে, গোঁফে তা দিয়ে আর ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে দিন কাটান নয়।

কাজের সময় অনেক রকম কসরৎ পাখোয়াজকে দেখাতে হ'ত। তার আগে সের খানেক আটা উদরস্থ করতেন। যাহা হউক দিন ক'টা বেশ কাট্‌ছিল। একদিন ছোট দাদা-বাবুর সঙ্গে পাখোয়াজের আলাপ চল্‌ছিল—

চৌতাল

চৌতাল—দা দা দিনটা কথা কেটে কেটে তিনটা

না খেটে গাদা ধনে বাঃ বা দ্বিনটা

ঝাঁপতাল

ঝাঁপতাল—ভাগী—না ভাগে দেনারে ঠুকে

যোগী—না ভাগে দেনারে কুটে।

সুর ফাঁকতাল।—যাঃ দরোয়ান্ দে ঘাড়েধরে ডাণ্ডা দ্বাতি যাঃ

নারদ এবার এসে এই উন্নতি দেখে অবাক হ'লেন। ছোটবাবু প্রণত হইয়া নারদকে অভ্যর্থনা-সহকারে বৈটকখানায় লইয়া গিয়া বসাইলেন। বল্লেন—আপনার শুভাগমনে দীনের ভবন পবিত্র হ'য়ে গেল, এখন কি অনুমতি হয়।

নারদ বল্লেন—তোমাদের প্রায় প্রত্যহই গীতবাদ্য হ'য়ে থাকে,—আমার সঙ্গীতরে কিছু চর্চ্চা আছে।

বাবু।—বেশ বেশ, আপনি আস্‌বেন। আজ সন্ধ্যার সময় গান। আমি সকলকে নিমন্ত্রণ করব'। কোন্ কোন্ যন্ত্র আপনার চাই।

নারদ।—বিশেষ কিছুর প্রয়োজন নাই। তোমাদের এই সব যন্ত্রাদিতেই হ'বে।

সন্ধ্যার সময় আসর জমিল। নারদ বল্লেন, "ভগবানের নাম করব, তোমরাও আমার সঙ্গে যোগদান করবে," বলিয়া একবার পাখোয়াজকে স্পর্শ করিলেন। বাদ্যকর ময়দার তাল পাখোয়াজে লাগাইতে গিয়া দেখেন দুই মুখই ছোট হইয়া গিয়াছে।

নারদ বল্লেন, ময়দা খাওয়াতে হ'বে না, আপনিই বলবে; মাঝে মাঝে জোরে প্রহার করবেন, তবেই স্বভাবটা ঠিক থাক্‌বে। পাখোয়াজ মৃদঙ্গ হইলেন।

নারদ মধুর হরিগুণগান করতেই সকলেই মাতিয়া উঠিল এবং 'হরে রাম, হরে রাম' বলে নৃত্য করিতে লাগিল। মৃদঙ্গ বলিতে লাগল—ধিকৃতাং ধিকৃতাং, হরি কথা নিতরাং যো ন কথয়তি—ধিকতাং। সেই অবসরে নারদ সরে পড়লেন।

হরি ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত হ'তে লাগল; কিন্তু সে দিন কতক মাত্র। মৃদঙ্গের বোল ফিরল তখন বলিতে সুরু করল—কহত কহত গোঁহাই, ধিগ্ ধিগ্ ধিগ্, ধিগ্ ধিগেতাং যদি পোয়া পুরি নাহি মিলিতং, কহত কহত গোঁহাই।

সেই পুরাতন কথা, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। হরি ও নাই রাম ও নাই। চামড়ার যন্ত্র পেটের দায়ে যখন যার কাছে থাকে তার গুণ গায়।

মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলে কেমন হে অটল! বুঝলে কিছু?

আমি বললাম—আমি যেমন বুঝেছি ও তেমনি বুঝেছে।

মাষ্টার বল্লেন—যে স্বরের ধর্ম্মকে চিনতে পারে, কর্ম্ম চিনে নিতে তার দেরী হয় না। চর্ম্ম-যন্ত্রকে সাধনার দ্বারা বশ করতে হয়। তার পরে তাকে যা বলাবে সে তাই বল্‌বে। দোষ কর্ম্মীর, যন্ত্রেরও নয়, শব্দেরও নয়। শব্দ নিত্য, নির্ম্মল ও নির্ব্বিকার। সে কর্ম্মের দোষ-গুণ দেখাইয়া কর্ম্মের অন্তে আপনি শান্ত হয়। নূতন সাধক, নূতন কর্ম্মী এসে তাহাকে জাগালে আবার প্রকাশ হয়। যেমন সুর দেবে তেমনি তাল উঠবে।

চুট্‌কি ধর ঠুংরী, দাদ্‌রা, কাওয়ালী, কাহার্বা চলবে। কবি গাও পোস্তা খয়রা খেমটা বাজবে। খেয়াল গাইলে তেতালা মধ্যমানের উদয় হ'বে। ধ্রুপদ ধর তবে চৌতাল ধামার আসবে। পঞ্চম সোয়ারী শুনতে চাও তবে কীর্ত্তন গাইতে হ'বে।

শিল্পী চতুর হ'লে, প্রয়োজন মত সকল রকম রং দেখাতে পারে। যখন শিল্পী ছিল, তখন কর্ম্মার একমাত্র সানাইএর সুরে ধর্ম্মার একমাত্র ঢোলে সকল রকম রং দিতে পারত। কাহারও সহিত কোন বিরোধ ছিল না। সকলেই আনন্দ পেত। এখনও শিল্পী আছে, কিন্তু স্বর ও শব্দের একতা ভুলে গেছে। দ্বৈতজ্ঞানের বশবর্ত্তী হ'য়ে নানা সুরের যন্ত্রের সৃজন করেছে এবং তার উপযোগী তালেরও যন্ত্র সৃজিত হ'য়েছে। অন্তর্নিহিত অদ্বৈত-তত্ত্বকে ধরতে পারলে, সহস্র স্বরযন্ত্রে এক রকম সুর বাজবে, আর সেই ঐক্যতান-বাদনে এক ঢোল—যখন যে তালের প্রয়োজন সেই তাল দেবে।

এইরূপে মাষ্টার সেদিনকার মত সঙ্গীতাভিজ্ঞ সত্য-শরণের সত্য গল্পের উপসংহার করলেন।

পঙ্কপুষ্প

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বালীগঞ্জের এক প্রকাণ্ড রাজপথের উপর একখানা প্রকাণ্ড অট্টালিকা। বাটীখানির দিকে একবার চাহিলেই সেটী যে কোন প্রসিদ্ধ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির গৃহ তাহা মুহূর্ত্তে প্রতিপন্ন হয়। গৃহস্বামী রমাকান্ত রায় সত্যই বিপুল বিত্তের অধিকারী। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিলেও রৌদ্রতপ্ত ধরণীর উত্তাপ তখন হ্রাস হয় নাই, পশ্চিম গগনে প্রৌঢ় রবির ক্লান্ত মূর্ত্তি হেলিয়া পড়িয়াছে। অপরাহ্নের সমীরণ তখনও স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হয় নাই। রমাকান্তের বিশাল ভবন মধ্যাহ্নের বিশ্রাম-শেষে তখন সবে জাগিয়া উঠিতেছিল। বাটীর সম্মুখস্থ পুষ্পলতা-সমাকীর্ণ বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর রক্তকঙ্কর-মণ্ডিত পথে একটা প্রকাণ্ড 'রোলস্ রয়েস্ কার' কাহারও বাহির-গমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সোফার অধীরভাবে বার বার ভিতরের দ্বারের দিকে চাহিতেছিল। উদ্যানরক্ষক পুষ্প বৃক্ষে জল-সেচনের উদ্যোগ করিতেছিল। আতপ্ত অনিল অদূরস্থ গন্ধরাজ গাছ হইতে কলিকার মোটা শুভ্র ফুলের বক্ষ-নিরুদ্ধ বাসি সুবাসটুকু বাহিরে আনিয়া ছড়াইয়া দিতেছিল।

রুদ্ধ দ্বার ও বাতায়নবিশিষ্ট এই বাটীর একটা কক্ষমধ্যে সুশীতল মর্ম্মর-বিনির্ম্মিত গৃহকুট্টিমে শায়িতা নীরজার স্বল্প তন্দ্রাটুকু বহুক্ষণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আলস্য-বিজড়িত দেহে তখনও সে শয়নঘর ত্যাগ করে নাই। সুবৃহৎ অট্টালিকা প্রায় নীরব। মধ্যে মধ্যে শুধু কর্ম্মনিরত ভৃত্যবর্গ ও পরিচারিকাগণের মৃদু কণ্ঠরব ক্ষণেক ধ্বনিত হইয়াই পুনরায় স্তব্ধতার সহিত মিশিয়া যাইতেছিল।

কিছুক্ষণ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের পর নীরজা উঠিয়া বসিল। অদূরে টিপয়ের উপর সংরক্ষিত ঘটিকায় পাঁচটী শব্দ ধ্বনিত হইয়া একটা মধুর ঝঙ্কারে গৃহখানি পূর্ণ করিয়া দিল।

আপন মনেই নীরজা, 'পাঁচটা বাজল' বলিয়া রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিল। এমন সময় দ্বারস্থিত খস-খসের যবনিকা সরাইয়া একজন দাসী কক্ষে প্রবেশ করিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, 'বৌদিমণি'।

খরোজ্জ্বল রৌদ্রশিখা অন্ধকারময় গৃহের বক্ষ দীর্ণ করিয়া নিকষ পটে কনক-রেখার মত হাসিয়া উঠিল। চোখের উপর একটা হাত রাখিয়া উজ্জ্বল আলোক হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়া বিরক্তভাবে নীরজা বলিল, 'কি চাই?'

ভিত্তিগাত্রসংলগ্ন মর্ম্মর-নির্ম্মিত ব্র্যাকেটের উপরিস্থিত একটা ছোট শিশি তুলিয়া দাসী বলিল, 'আপনার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে।'

'থাক থাক, ও আর ভাল লাগে না, তুই দোরটা বন্ধ করে যা এখন। আজ ওষুধ আর খাব না।'

কুণ্ঠিতভাবে পরিচারিকা বলিল, 'না খেয়ে কি করবেন বৌদিমণি, অসুখ যখন—'

'তা হোক তুই যা, ও আর ভাল লাগে না।'

ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া দাসী প্রস্থানের উপক্রম করিল। নীরজা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল, 'মা উঠেছেন রে? খোকা কি করছে?'

'কৈ মা তো ওঠেন নি এখনও। খোকাকে নিয়ে দাদাবাবু গল্প করছিলেন দেখ্‌লুম। বাবুও ঘুমোচ্ছেন।'

'আচ্ছা তুই যা।' নীরজা পুনরায় শুইয়া পড়িল।

কক্ষের বাহিরে মৃদু অলঙ্কার-শিঞ্জনের সহিত কোমল নারীকণ্ঠের আহ্বান আসিল, 'নীরা'।

নীরজার আননে আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল। ত্রস্তে উঠিয়া বসিয়া ফুল্লকণ্ঠে সে বলিল, 'সেজদি!'

হাস্যবিজড়িত আননে শেফালী কক্ষে প্রবেশ করিল।

অগ্রসর হইয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া নীরজা বলিল, 'এস ভাই সেজদি, তুমি যে আসবে এ আমার আশাতীত। আজ একি ভাগ্য সুপ্রসন্ন আমার।'

সস্নেহে তাহার কপোলে একটা মৃদু চপেটাঘাত করিয়া শেফালী বলিল, 'থাম, খুব জ্যেঠামী হ'য়েছে। এখন কেমন আছিস্ বল?'

দাসী কক্ষে প্রবেশ করিয়া গৃহতলে কোমল গালিচা বিস্তৃত করিয়া দিল। তরুণীর হাত ধরিয়া উপবেশন করিয়া দাসীর দিকে চাহিয়া নীরজা বলিল, 'পাখাটা চালিয়ে দিয়ে যা।'

বৈদ্যুতিক পাখার বোতাম টিপিয়া দিয়া দাসী প্রস্থান করিল।

তরুণীর দিকে চাহিয়া নীরজা বলিল, 'তারপর সেজদি কি বলছিলে? কেমন আছি?'

'হ্যাঁ কেমন আছিস্, জ্বর কি হয় এখনও?'

'জ্বর হচ্ছে বৈ কি? রোজই হয়। বেশ আছি ভাই।' বাক্যের সহিত মলিন হাসির রেখা নীরজার ক্লিষ্ট অধরে বিভাসিত হইল।

বেদনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া শেফালি বলিল, 'সত্য নীরা কি রকম হ'য়ে গেছিস্ তুই বল দেখি। দেখলে যেন চেনা যায় না। ডাক্তার দেখছে তো?'

'তার কিছু ত্রুটী নেই সেজদি! কিন্তু আমার এ অসুখ ডাক্তারের শক্তির বাইরে। ডাক্তার কি করবে।'

গভীর বেদনা উভয়েরই আননে ছায়া ফেলিল। গাঢ় কণ্ঠে শেফালি বলিল, 'বুঝতে পারছি সবই নীরা, এই বয়সে এতগুলা আঘাত সহ্য করা তোর পক্ষে যে কত কঠিন তা তো নিজের মন দিয়েই বুঝি; কিন্তু ভগবানের বিধান, এর ওপর আর তো বলবার কিছু নেই। এতগুলা শোক কি করে যে তুই সইছিস্ ভাবলেও অস্থির হ'য়ে পড়ি। শরীরও একেবারে ভেঙ্গে গেল। কি করে যে সারবে?'

'সারে সরুক, না সারে তাতেও দুঃখ নাই সেজদি। এই বয়সেই এই আরও বেশীদিন যদি বাঁচতে হয় তা হ'লে আরও হয় তো কত কষ্ট সহ্য করতে হ'বে। তার চেয়ে যত শীঘ্র যাওয়া যায় তাই কি ভাল নয়? তাই মনে করি সেরে ওঠার চেয়ে এখন যদি মরি তাই ভাল।'

একটা দীর্ঘশ্বাস বক্ষ মধ্যে নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যথিত কণ্ঠে শেফালি বলিল, 'কি বলিস্ তোরা তার ঠিক নেই।'

অস্তরবির ম্লান হাসির মতই একটু হাসিয়া নীরজা বলিল, 'অন্যায় কিছু বলি নি সেজদি। আমার পক্ষে এখন মরলে কোন দিক দিয়ে কোন ক্ষতিই তো আমার নেই। ছোট ছেলে-মেয়ে নেই যে তাদের কষ্ট হ'বে। মা-বাবা নেই যে কেউ চোখের জল ফেলবে।'

'তুই হাসালি নিরু, মা-বাবা ভিন্ন কেউ কি মরলে আর কাঁদে না? তোর স্বামী রয়েছে, ছেলে—'

'তুমি থাম সেজদি, স্ত্রী মরলে স্বামীর যা কষ্ট হয় সে আমি বেশ জানি। একবার মরলে হয়, তারপর চিতার আগুন নিবতে না নিবতে স্বামীর বিয়ের বাজনা আবার বেজে ওঠে। আমার মনে হয় প্রত্যেক স্বামীই উন্মুখ হ'য়ে থাকে কবে স্ত্রী মরবে, সে আবার বিয়ে করে। নূতন একটা বৌ আনবে। যে স্বামীর দুর্ভাগ্যক্রমে স্ত্রী না মরে সে যেন মনে মনে অস্থির হ'য়ে ওঠে!—এমনই বাঙ্গলার পুরুষদের মনোভাব—'

শেফালি হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল, 'যা কি পাগলামি করিস নীরা, তাই না কি সবাই মনে করে।'

সবাই করে কি না তা অবশ্য আমি জানি না সেজদি, তবে যেমন দেখতে পাই স্ত্রী মরতে না মরতে অমনি স্বামী আবার বর সাজে, তাতে তো আমার তাই মনে হয় যে পুরুষরা চায় বৌ মরুক আবার বিয়ে করি, জীবনে একটু নূতনত্ব আসুক।'

শেফালি হাসিয়া উঠিল। একটু জোরের সহিতই নীরজা বলিল, 'তাই মনে হয় স্ত্রীর যেমনি অসুখ হয় স্বামী অমনি আশান্বিত হ'য়ে উঠে। এইবার হয় তো ভগবান সদয় হ'লেন। তারপর যদি সে-যাত্রা সে বেচারীর ইহলীলা শেষ না হ'ল, তা হ'লেই স্বামীর মনে মনে আক্ষেপের সীমা থাকে না। মনে মনে বলে একটা সুযোগ হারালাম।'

'যা যা তুই আর পাগলের মত বকিস নি; সে যে মনে করে সে মনে করে বিজন তো আর সে রকম মনে করে না, তবে আর তোর কি? তুই এখন শাগগীর সেরে ওঠ।'

'না সেজদি তিনি যে আমার মৃত্যু কামনা করেন না এটা নিশ্চয়। তবে যদিই আমি মরি তা হ'লেও তাঁর পক্ষে এমনই বা ক্ষতি কি? এটা অবশ্য আমিই বলছি।'

'তাতো বুঝতেই পারছি। তুই কি ভাবিস্ পুরুষরা সত্যই এমন নিষ্ঠুর হৃদয়হীন—তা নয় রে।'

'অধিকাংশই তাই সেজদি, হৃদয় বলে কোন বস্তু পুরুষদের মধ্যে অল্পই আছে। স্বামী স্ত্রীকে কখন প্রকৃত ভালবাসে জান,যখন তার বয়স ঘাটের ঘরে পড়ে; অর্থাৎ যখন বৌ মরলে কেউ আর মেয়ে দেবে না,আর স্ত্রী বিনা তার সে রকম সেবাযত্নও কেউ করতে পারবে না, সেই সময় তার স্ত্রীর উপর সত্য একটু টান আসে, তখন স্ত্রী মরলেই তার সত্যিই বেদনা বোধ হয়, নয় তো স্ত্রী মরে আর স্বামীর মনটা আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠে, এইবার নতুন একটা বৌ পাওয়া যাবে। অনেকে আবার লোক-দেখান কান্নাকাটী করে, সেই ভণ্ডগুলো হচ্ছে আরও বেশী নীচ, মুখে স্ত্রীর জন্য সে কি হাহুতাশ তার অশৌচান্ত হ'তে তর সয় না অমনি একটা বৌ আনা হ'ল। এমন হৃদয়হীন পুরুষগুলোর সম্বন্ধে কি করে ভাল ধারণা হ'তে পারে বল দেখি? আচ্ছা তুমি দেখাও আমায় ক'টা পুরুষ স্ত্রী-বিয়োগের পর বিয়ে না করে শুধু স্ত্রীর স্মৃতি সম্বল করে ভালভাবে থেকে দিন কাটাচ্ছে। এরকম লোক দেখ্‌তে পাবে না। এ জাতের মধ্যে অতটা হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া দুর্লভ।'

'তা হ'লে তোর মতে পুরুষ মাত্রেই হৃদয়হীন?'

'অধিকাংশই তাই সেজদি। হৃদয় থাকলে কখনও যে লোককে নিয়ে একসঙ্গে পাঁচ দশ এমন কি কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত দিন কাটিয়েছে সেই লোক পৃথিবী ছেড়ে যেতে না যেতে কেমন করে তারা তার স্থানে অন্যকে এনে প্রতিষ্ঠিত করে? আবার স্ত্রী মরবার সঙ্গেই বিয়ে করবার জন্য তার সপক্ষে কত যুক্তি দেয়; যার ছেলে মেয়ে নেই,সে বলবে বংশ-রক্ষার জন্য বিয়ে করা দরকার, যার সন্তান আছে সে বলবে কি করি বিয়ে না করলে চলে না ছেলে-মেয়েগুলোর কষ্ট হচ্ছে বড়, নইলে এ বয়সে বিয়ে কি আর সে করে। যেন শুধু ছেলে-মেয়ের জন্যই বিয়ে করছেন। নতুন স্ত্রী এসে ছেলে-মেয়েকে তো কতই দেখবে? মা-হারা অভাগাদের দুখ ও সুবিধা তাতে আরও বেড়ে ওঠে। তারপর প্রথম স্ত্রী হয় তো স্বামীর কাছে কখন মিষ্টি কথাটা পর্য্যন্ত শোনে নি, বেচারীর ভাগ্যে ছিল কেবল স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত লাঞ্ছনা আর পীড়ন; কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের বা তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী অপমান বা লাঞ্ছনা করলেও নীরবে সহ্য করেন। বেচারী প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ভাগ্যে হয় তো কখনও একখানা ভাল কাপড়ও জোটে নি আর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর জন্য বাড়ী বাঁধা দিয়ে গয়না তৈরী হয়।'

'তুই তা হ'লে বলতে চাস পুরুষরা স্ত্রীকে ভালবাসে না; কিন্তু স্ত্রীর জন্যে তারা বাপ-মা-ভাই-বোনকেও পর করে দেয়, তাদের সঙ্গে পৃথক হ'য়ে যায় সে তো শুধু স্ত্রীর জন্যই, ঐতেই দেখ পুরুষদের মন কত নীচ, কত সংকীর্ণ। স্ত্রীর পরামর্শ মতই অতি আত্মীয়কে পর ভাবতে শেখে।'

'সত্যি কিন্তু সেটা স্ত্রীকে বেশী ভালবাসে বলেই নয় ওটা তাদের নীচ মনের পরিচয় মাত্র। যাদের প্রকৃত প্রাণ বলে জিনিস আছে তারা কারোর উপরই অন্যায় করতে পারে না। বাপ-মা, ভাই-বোন যাদের চেয়ে বেশী আপন কেউ নাই, স্ত্রীর কথায় অমনি তাদের বিষ-নয়নে দেখে, এর চেয়ে হীনতা আর কি হ'তে পারে? বড় ভাই যথাসর্ব্বস্ব খরচ করে পালন করে ছোট ভাইটাকে মানুষ করলে,বিয়ে দিলে, বৌটী ঘরে এল ভাই অমনি পথ দেখলে। বড় ভাই মরুক আর ভিক্ষে করুক তাতে তার কি যেতো, তখন নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। এমনি যাদের ব্যবহার এমনি যাদের মন তারা যে একটা স্ত্রী মরতে না মরতে আবার বিয়ে করবার সুযোগ এসেছে বলে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে এতে আর বিচিত্র কি।'

শেফালি সস্নেহে ভগিনীর পৃষ্ঠে একটা করাঘাত করিয়া বলিল, 'আচ্ছা ভাই তাই না হয় স্বীকার করে নিচ্ছি পুরুষরা অতি হৃদয়হীন, অতি পাষণ্ড তা হ'লেই হ'ল তো। মেয়েরা তো খুব ভাল।'

নীরজাও হাসিল, 'না সেজদি মেয়েরা যে ভাল তা আমি বলছি না, আজকাল দিন দিন মেয়েদের যা ভাব গতিক দেখছি তাতে ভয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে থাকি। অবাধ স্বাধীনতা

অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খলতা—স্বেচ্ছাচার—হচ্ছে তাদের কাম্য। একান্নবর্ত্তী সংসারে স্বামীর পরিজনদের মধ্যে থেকে সেটা পাওয়া দুষ্কর বলেই এখনকার মেয়েরা বিয়ে হ'তে না হ'তে স্বামীকে তার আত্মীয়দের কাছ থেকে পৃথক করে নেয় এ রকম তো প্রায়ই দেখ্‌ছি। দেশ আমাদের ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলেছে কি না তাই দেশের নর-নারীর মনের অবস্থা এই রকম হচ্ছে। তাই আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তী সংসার বিরল হ'য়ে আসছে। বাঙ্গালী স্বামী-স্ত্রীর বিবাহচ্ছেদের মকর্দ্দমা কোর্টে উঠেছে। ভদ্র কুমারীরা "ফ্রি লভ" চালাচ্ছে আর কিছু শুনতে চাও—তারপর সাহিত্য-ক্ষেত্রে—'

বাধা দিয়া সত্রাসে শেফালী বলিল, 'রক্ষে কর নীরা থাম ভাই তুই, সেই থেকে কেবল যত বাজে কথা বলে চলেছিস এ পর্য্যন্ত একটা দরকারী কথা আমি বলতে পারছি না।'

নীরজাও অপ্রতিভভাবে হাসিল, 'সত্যি ভাই সেজদি, আমার অন্যায় হয়েছে কতদিন পর তুমি এলে কোথায় তোমার আদর-যত্ন করব তা না কি সব বকে চলেছি। এই সব কথা উঠলে আমি বড় উত্তেজিত হ'য়ে পড়ি। আজকাল সব যা ব্যাপার দেখি চারদিকে তাতে সত্যিই যেন একটা ঘৃণা জন্মে যাচ্ছে এদের উপর। দিন দিন এত হীন হ'য়ে পড়ছে এই আমাদের দেশটা। স্ত্রী-পুরুষ সব সমান-এরা যেমন হীন তেমনই স্বার্থপর, তেমনিই অকৃতজ্ঞ। এত নীচতা এদের মধ্যে কি বলব যে আগে শাশুড়ীরা বৌয়ের উপর অত্যাচার করলে তারা নীরবে নিজেদের প্রাপ্য মনে করে সেটা সহ্য করত। আর এখন নতুন বৌ বাড়ীতে পা দিয়েই তার এতটুকু অসুবিধা হোক দেখি, তখনই সে তার প্রতিবাদ করবে, জোর করে বলবে এ আমি সহ্য করতে পারব না। নিজের সুখ-সুবিধার এতটুকু ত্রুটী তারা সহ্য করতে পারে না আর স্বামীর পরিজনবর্গকে তারা চুচক্ষের বিষ দেখে।'

'সেটা কি জানিস আগে আমদের দেশের মেয়েরা জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে জানত বাপ মা যার হাতে সপে দেবে সেই তার একমাত্র উপাস্য ইষ্ট দেবতা। তার কোনও দোষ সে দেখত না—বিয়ে হওয়া পর্য্যন্ত আজীবন দেবতা-জ্ঞানেই সে স্বামীর অর্চ্চনা করে যেত। তারপর যদি স্বামী বা শ্বশুর বাড়ীর লোক অত্যাচারী হ'ত সেটাও সে সইতে পারত ওইটুকুর জন্য,স্বামী দেবতা যে,তিনি বা তার পরিজনবর্গ যা করেন তার প্রতিবাদ করা চলে না। এটা ভাল কি মন্দ সে আলোচনা আমি করতে চাই না। তবে তাতে যে সাংসারিক অশান্তিটা এখনকার মত বেশী হ'ত না এটা ঠিক।'

'ঠিক বলেছ সেজদি। হয় তো তখনকার দিনে বৌদের কারো কারো অদৃষ্টে কিছু লাঞ্ছনা কিছু কষ্টভোগ হোত, কিন্তু তা হ'লে এখনকার দিনের মত সারা সংসারটা ছার খার যেত না। এই দেখ কটা ভাই একসঙ্গে বেশ আছে মাঝ থেকে বৌরা এমন আগুন জ্বালিয়ে দিলে কোথায় গিয়ে পড়ল তার ঠিক নাই। সংসারটা উচ্ছন্ন গেল। এখনকার মেয়েরা স্বামীকে ভাবে তার খেলার সঙ্গী—ভোগের বস্তু। তার সুখ-সুবিধা যোগাবার উপাদান। আর স্বামী ভাবেন স্ত্রী তার ইষ্টদেবী—ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ সব। আর তাও বলছি সেটা যে হয় সে শুধু একটা মোহের জন্য, স্ত্রীকে প্রকৃত ভালবেসে যে ঐ রকম ভাবটা দেখায় তা নয়। স্ত্রী যা বলে সেটা তার বেদবাক্য। বাপ-মা-ভাই-বোন সব পর। একমাত্র উপাস্য স্ত্রী। আর আত্মীয় হচ্ছে তার স্বজনরা। এই যে স্ত্রী সে মরুক। আবার দেখ দ্বিতীয় স্ত্রীর আরাধনা তার চেয়েও অনেক বেশী। এমনি লঘুচেতা হীনমনা এই পুরুষরা।'

'তুই সকলের মনের খবর রাখিস কি না? কিন্তু থাক এসব কথা আর আমার সময় নাই তোকে আমি নিতে এসেছি নীরা তুই চল ভাই।'

'আমায় নিতে এসেছ, কেন বল তো?'

'দরকার না থাকলে কি এই রৌদ্রে এসেছি ভাই, দরকার খুবই আছে। তুই যাবি তো তোর শাশুড়ীর কোন আপত্তি হ'বে না তো?'

'না সেজদি তিনি কোন কিছুতেই আপত্তি করেন না, কিন্তু আজই যেতে হ'বে কেন বল তো, তুমি কতদিন পর এলে। তুমিই আজ এখানে থাক।'

ব্যস্তভাবে শেফালী বলিল, 'না ভাই তোকে একবার যেতেই হ'বে, বড় দরকার, তুই তৈরী হ'য়ে নে।'

'নিতান্তই যেতে হ'বে দাঁড়াও তবে মাকে বলে আসি। বলে আর আসতে হ'বে না মা আসচেন।'

সহাস্যমুখে সুররাণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শেফালী উঠিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিতে করিতে বলিল, 'ভাল আছেন তো মা।'

গালিচার একাংশে বসিয়া পড়িয়া সুররাণী বলিলেন, 'এতদিনে মা'র কথা মনে পড়েছে তোমার। একদিনও তো এস না শেফা। বৌমার এত অসুখ যাচ্ছে তাও তো কৈ দেখ্‌তে এস না। আমি প্রায়ই তোমাদের কথা বলি।' অপ্রতিভ নতমুখে শেফালী বলিল, 'কি করব মা সময় পাই না একটুও, জানেন তো আমাদের কত বড় সংসার, চাকর-দাসীও তো বেশী নাই, সব কাজই নিজেদের করতে হয়, তার মধ্যে থেকে অবসর করে নেওয়া বড় কঠিন। আসব সব সময়ই মনে করি হ'য়ে ওঠে না, নীরার অসুখ তো সারে নি দেখ্‌ছি মা, ডাক্তার কি বলে।'

বধূর অসুখের কথায় সুধরাণীর মুখে বেদনার ছায়া পড়িল। চিন্তিতভাবে তিনি বলিলেন, 'ডাক্তার বেশী ভরসা দেন না মা, তিনি বলেন মনের কষ্টেই রোগের উৎপত্তি, মন না ভাল হ'লে শরীর সারবে না, কিন্তু মন ভাল করা সে যে আমাদের অসাধ্য এ ভগবানের দেওয়া ব্যথার প্রতীকার করি কি করে।'

সুররাণার চোখের পাতা ভিজিয়া ভারী হইয়া আসিল। নীরজা উদাস-দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে অস্তগামী রবি-রশ্মির দিকে চাহিয়া রহিল। গাঢ়কণ্ঠে সুররাণা বলিলেন, 'তোমাদের মা থাকলেও দিন কত তাঁর কাছে গিয়ে একটু সুস্থ হ'য়ে আসতে পার তো, মার কাছে গেলে সন্তানের সমস্ত ব্যথাই একটু কমে যায়। জগতে মার মত অমন পবিত্র স্বার্থলেশহীন হাসি-স্নেহ তো আর কেউ দিতে পারবে না, বড় বেদনা পেয়ে মার কাছে গেলেও মনে শান্তি আসবে; যার মা আছে তার কিছু না থাকলে অনেক আছে, যার মা নেই তার কেউ নেই। এই আমি তো এক রকম বুড়োই হ'য়েছি তবুও মার কথা মনে উঠলে আজও মনটা হাহাকারে ভরে ওঠে। তোমাদের দুর্ভাগ্য তাই এত অল্প বয়সে মা হারিয়েছ।'

সিক্তনেত্রে গাঢ়কণ্ঠে শেফালী বলিল, 'সে কথা একশ বার সত্য। মা কথাটা মনে করলেও মনটা শান্তিতে ভরে আসে। সংসারে যত দুঃখ-বেদনা পাই মার কাছে গেলে সেটা ভুলে যেতুম। আর এখন—' অশ্রু-প্রবাহে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সান্ত্বনার সুরে সুররাণী বলিলেন, 'থাক মা ওসব কথা মনে না করাই ভাল। যে ক্ষতি কখন পূরণ হয় না সেটা ভুলে যাওয়াই উচিত। ওকথা থাক আজ হঠাৎ কি মনে করে শেফা। বৌমাকে নিয়ে যাবার জন্য বোধ হয় কেমন তাই নয় কি?'

অশ্রুসিক্ত অক্ষিপ্রান্ত মুছিয়া অল্প হাসিয়া শেফালী বলিল, 'কেন মা কোন কারণ না থাকলে কি আসতে নাই।'

সম্মুখস্থ তাম্বুলাধারটা শেফালীর দিকে সরাইয়া দিয়া সুররাণীও হাসিমুখে বলিলেন, 'এস না তো মা, তাই বলছি। সত্যি কি না বল দেখি তুমি।'

সহাস্য বদনে শেফালী বলিল, 'হ্যাঁ তাই। নীরাকে আজ আমার সঙ্গে যেতে দিন মা।'

'তা বেশ তো যাক্ না বৌমা! আমি তো বলিই একটু বেড়াবার জন্য। তা বৌমা কিছুতে কোথায় যেতে চান না। কি যে করব' ওকে নিয়ে—আমার বড় দুর্ভাবনা হ'য়েছে। মনটা একে ওর ভাল নেই।'

নীরজা ধীরপদে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

সুররাণী তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বিমর্ষভাবে বলিলেন, 'শরীর ওর ক্রমশঃই খারাপ হ'য়ে পড়ছে, সব সময়ই বৌমা যেন কি রকম গম্ভীর হ'য়ে থাকে। হাসে অতি অল্পই। কথাও খুব বেশী বলে না। কান্নাকাটী করা যে তাও নয়। সেইটাই যে আরও খারাপ। চোখের জল ফেললে মনের ভারটা অনেক হাল্‌কা হ'য়ে যায়; কিন্তু তাও করে না কি রকম যেন শুধু গম্ভীর হ'য়েই থাকে। কখনও হয় তো কোন কিছুর আলোচনায় দু'চারটে কথা বল্লে তারপর আবার চুপ চাপ বসে থাকেন। এবার ছোট খুকীটী মারা যাওয়ার পর থেকেই এমনি হয়েছে মা।'

চিন্তিতভাবে শেফালী বলিল, 'তাই তো এরকম হ'লে বাঁচবেই বা কদিন।'

'তাই ভাবছি তো কি করব।' সুররাণী আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন। নীরজাকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি নীরব হইলেন।

একখানি সাধারণ লালপাড় শাড়ী পরিয়া নীরজা আসিয়া দাঁড়াইল। একবার তাহার দিকে চাহিয়া সুররাণী বলিলেন, 'এ আবার কি একটা পরণে বৌমা। শেফালী তোমায় নিতে এসেছে যে। একটু শীগ্‌গীর ক'রে কাপড় জামা পরে যাও ওর সঙ্গে ঘুরে এস একটু।'

আপনার পরিধেয়খানার দিকে একবার চাহিয়া লইয়া নীরজা বলিল, 'এই তো কাপড় ছেড়ে এলুম মা। চল সেজদি।'

'এই পরে যাবে। না না ও কাপড় ছেড়ে এস।'

'না মা আমার আর অত সাজতে ভাল লাগে না, সাদা-সিধেভাবে থাকতেই ভাল লাগে। বাইরের আড়ম্বরটা যত কমান যায় ততই ভাল। এখনকার মেয়েদের মত বেশভূষা নিয়েই তন্ময় হ'য়ে থাকতে আর ভাল লাগে না। ঘরে ভাত থাক আর না থাক বাইরের সজ্জার আড়ম্বরটা ঠিক আছে। ভিতরে হয় তো ভাঁড়ে মা ভবানী।'

সুররাণী হাসিয়া বলিলেন, 'কিন্তু তোমার ঘরে ভাতের অভাব নেই মা তুমি কি দুঃখে ভাল কাপড়-জামা পরবে না।'

'দেখে দেখে ঘৃণা জন্মে গেছে মা, তাই পরতে ইচ্ছা হয় না। ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণীর স্ত্রীরও সাজ দেখে মনে হ'বে কোন মহারাণী এসে দাঁড়িয়েছেন। ওদিকে ঘরে হয় তো বুড়ো শাশুড়ী ছেড়া নেকড়া পরে লজ্জা নিবারণ করছেন, কাবলীওয়ালা দেনার দায়ে ঘটিবাটী টেনে নিয়ে যাচ্ছে। স্বামী বেচারী খেতে পাচ্ছে না, রোগে ছেলেদের ওষুধ-পথ্য জুটছে না, কিন্তু স্ত্রীর একখানি গয়নায় হাত দেবার অধিকার নেই। তাঁর অঙ্গভরা সোণার অলঙ্কার শোভা পাচ্ছে। এই সব দেখে আর বেশ-ভূষা করতে ইচ্ছা করে না। চল সেজদি।'

সুররাণী বলিলেন, 'পাগলী মার আমার কেবল ঐ সব কথা। তা বেশ বাছা তুমি সাজসজ্জা কিছু কর' না। এমনিই মার আমার রূপে ঘর আলো, সাজবার দরকারও হয় না।' সস্নেহে তিনি বধূর চিবুকে হস্তার্পণ করিলেন।

নত হইয়া শ্বশ্রূর পদধূলি লইয়া নীরজা বলিল, 'তা হ'লে আসি মা।'

'এস মা। হ্যাঁ বৌমা গৌতম যাবে না?'

আপত্তির সুরে নীরজা বলিল, 'না না যে লক্ষ্মী নাতিটী আপনার। ও থাক।'

বিরক্তভাবে শেফালী বলিল, 'ও আবার কি কথা, ছেলে দুরন্ত বলে তাকে নিয়ে যাবি না আর এতো পরের বাড়ী নয়, কৈ সে নিয়ে চল তাকে।'

'তা হ'লে তাকেই নিয়ে যাও আমি থাকি।'

'কি জানি বাবু সবই তোদের অনাসৃষ্টি। মেম-সাহেবী—ছেলে নিয়ে কোথাও যাবে না। চল তবে।'

সুররাণীকে প্রণাম করিয়া ভগিনীসহ শেফালী কক্ষ ত্যাগ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নীরজার সহিত শেফালী যখন আপন কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যার মলিন ছায়া ধরণীর উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম আকাশের এক প্রান্তে তৃতীয়ার ক্ষীণ শশাঙ্ক স্নিগ্ধ হাসির মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার তিমির ভেদ করিয়া তাহার ক্ষীণ জ্যোতিঃ অস্পষ্টভাবে বিশ্ব স্পর্শ করিয়াছে।

একখানা ছোট কার্পেট বিছাইয়া ভগিনীকে বসাইয়া শেফালী বলিল,'একটু একা থাক ভাই নীরা আসছি আমি।'

'কিন্তু আমায় হঠাৎ নিয়ে এলে কেন তা' তো বল্লে না সেজদি?'

'বলছি রে বলছি, এত ব্যস্ত কেন? বস একটু কথা-বার্ত্তা বল; তোর জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করবি না?'

'নিশ্চয়, কোথায় তিনি ডাক না তাঁকে।'

'তাঁকেই খবর দিতে যাচ্ছি,তুই এসেছিস জানতে পারেন নি এখনও, তাই আসেন নি; নইলে এখনিই আসতেন।'

ক্ষুব্ধভাবে নীরজা বলিল, 'আসতেন বৈ কি একটী বারও তো আমার বাড়ীতে যেতে পারেন না। এত আমার অসুখ যাচ্ছে তাও তো গিয়ে দেখে আসেন না মরেছি কি বেঁচে আছি।'

'সময় পান না বলেই যেতে পারেন না ভাই নয় তো এমন একটী দিন যায় না যে তোর কথা না বলেন, ঐ তো আসছেন।'

'নীরা কখন এলে? খবর ভাল?'

সুকান্ত কক্ষে প্রবেশ করিল। নীরজা উঠিয়া তাহাকে প্রণাম করিবার উপক্রম করিতেই সত্রাসে কয় পদ সরিয়া গিয়া সে বলিল, 'না তোমরা দেখছি দেখা সাক্ষাৎ করার পথ পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিতে চাও। ওরকম করে পায়ের তলায় এসে পড়লে তো দেখছি আমায় স্থান ত্যাগ করতে হয়।'

উঠিয়া হাসিমুখে নীরজা বলিল, 'বা রে প্রণাম করাটা কি দোষের।'

'পায়ের তলায় মাথা লুটান আধুনিক সভ্যতা-বিরুদ্ধ, বড় জোর হাত দু'টো জোড় করে কপালে তুলবে। তার বেশী নয়, যাক বস তুমি। কেমন আছ নীরা।'

একটা চেয়ার টানিয়া সুকান্ত বসিল। নীরজাও কার্পেট ছাড়িয়া ভূমিতলেই বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'ভাগ্যে আজ আপনার বাড়ী এসেছিলুম জামাইবাবু তাই কেমন আছি সে সংবাদটা জানবার আগ্রহ হ'ল আপনার, নইলে তো এ গরীবের কথা মনেও পড়ে না। ভুলেও কোন দিন তো একবার আমাদের বাড়ীতে পা দেন না আপনি।'

হাসিয়া সুকান্ত বলিল, 'হ্যাঁ সে দোষ তুমি দিতে পার, কিন্তু সত্যি কথা যদি শুনতে চাও সে দোষ তোমার ঐ দিদিটীর।'

'তাই না কি সেজদি?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নীরজা জ্যেষ্ঠার দিকে চাহিল।

সক্রভঙ্গ কোপ-কটাক্ষে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া শেফালী বলিল, 'দেখ মিথ্যে কথাগুলো বল' না। আমি তোমায় যেতে বারণ করি?'

'কর না, যেতে চাইলেই তো তুমি বল বড়-লোকদের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা গরীবের পক্ষে শোভন নয়, তাতে তার আত্ম-সম্মানের লাঘব হয়। বল না কি তুমি?'

স্বামীর অকপট সত্য-ভাষণের উপযুক্ত প্রতিবাদে শেফালী সহসা কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া আনতমুখে রহিল।

নীরজা ব্যথাহত দৃষ্টিতে ভগিনীর দিকে চাহিল।

সুকান্ত পুনরায় বলিল, 'উনি কি বলেন জান নীরজ? বলেন, আমার যা বেশভূষা তোমার বাড়ীর চাকরদের কাপড়ও তার চেয়ে ভাল। আমার তারা অবজ্ঞার চোখেই দেখবে। তারপর বিজন যখন বেশী আসে না, তখন আমারও বেশী যাওয়া ভাল নয়।'

ক্ষুন্ন-করুণকণ্ঠে নীরজা বলিল, 'আমায় এতটা পর ভাবতে পারলে সেজদি? বিয়ে হ'য়ে গেলে কি ভাই-বোনের মধ্যে এতটা ব্যবধান আসে—এতদূর বিচার করে তখন চলতে হয়!'

ধীরকণ্ঠে শেফালী বলিল, 'এইটাই জগতের নিয়ম, ব্যবধান একটু আসবেই। তা বলে স্নেহ অবশ্য হ্রাস হয় না। তারপর গরীব-বড়মানুষে বেশী ঘনিষ্ঠতা সত্যই শুভজনক নয়, তাদের সম্বন্ধ যতই নিকট হ'ক না কেন দরিদ্রকে ধনী একটু কৃপার চোখে দেখবেই। সেইজন্য দূরে থাকাই সব দিক দিয়ে ভাল।'

'ওঃ তাই তোমরা কেউ আমার বাড়ী যাও না; তোমাদের কাছ থেকে এত দূরে যে আমি চলে গেছি তা জানতুম না' বলিয়া ক্ষুব্ধভাবে নীরজা অন্যদিকে চাহিল।

তাহার স্কন্ধের উপর একটা হাত রাখিয়া স্নেহ সরসকণ্ঠে শেফালী বলিল, 'কেন অনর্থক মন খারাপ করছিস নীরু, অন্যায় কিছু আমি বলি নি ভেবে দেখ। দরিদ্র যদি ধনীর সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করতে যায় সেটা তোষামোদের রূপান্তর হ'য়ে দাঁড়ায়। আর ধনীভাবে নিশ্চয় কিছু মতলব আছে, গরীব-বড়মানুষে এ পার্থক্য যাবার নয়।'

একটা ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরজা বলিল, 'সহোদর ভাই-বোনদের মধ্যেও যে এতটা বিবেচনা করে চলা হয়, এটা আমায় তুমি জানিয়ে দিলে সেজদি, আমি জানতুম না। তোমরা কেউ যাও না দেখে দুঃখ হ'ত—অভিমান হ'ত, আমি জানি নি তখনও যে বড়-মানুষের বউ হওয়ার অপরাধে তোমরা আমায় ত্যাগ করেছ, আজ সেটা জেনে গেলুম।'

বিরক্তভাবে একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া শেফালী বলিল, 'কি ছেলেমানুষী করিস নীরা, তোকে আমরা ত্যাগ করেছি?'

'ত্যাগ করা ভিন্ন একে কি বলা যায় বল তুমি। আমি বড়-মানুষ বলে তোমরা যখন এত দূরে থাকতে চাও, তাকে পরিবর্জ্জন ভিন্ন আর কি বলব। বেশ আমিও

এবার হ'তে দূরেই থাকব। তোমাদেরও আর যেতে বলব না।'

বিব্রতভাবে সুকান্ত বলিল, 'দেখ নীরজা রাণী, তুমি একটী আস্ত পাগল। তোমার ঐ সেজদির মন্তব্য শুনে মন খারাপ করছ। ওকে তো আমি মানুষ শ্রেণী থেকে বাদই দিয়ে রেখেছি। ওর কথায় মন খারাপ করতে হ'লে আমায় এতদিন 'লোটা-কম্বল সম্বল ক'রে' বেরিয়ে পড়তে হ'ত। ওর মত অত বিচার-বিবেচনা করে চলতে হ'লে সংসার ছেড়ে বাইরে থাকতে হয়। ওর কথা বাদ দাও।'

নীরজার মেঘাচ্ছন্ন মলিন মুখশ্রীর উপর দিয়া রবিকর-লেখার মত হাস্যদীপ্তি বারেক ফুটিয়া উঠিল। দৃষ্টি উন্নত করিয়া সে বলিল,—'যাই বলুন ওরই কথামত আপনি চলেন। নয় তো ওর নিষেধ অগ্রাহ্য করে একদিনও আমার ওখানে যেতে পারতেন। এক জায়গায় এই কলকাতার মধ্যে সব কটী ভাই-বোনই আছি, কিন্তু কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বছরে একদিনও হয় কি না সন্দেহ; নিজে যখন যার বাড়ী যাব তখন দেখা হ'বে, নয় তো কেউ আসে না, আমার একমাত্র অপরাধ আমার বড়-মানুষের বাড়ী বিয়ে হয়েছে, এই জন্য যদি নিজের ভাই-বোনের মধ্যেও এত পার্থক্য আসে, তা হ'লে এ ঐশ্বর্য্য আমার থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।' বাক্যের সঙ্গেই কয় বিন্দু অশ্রু নীরজার কপোল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। হাসির মধ্য দিয়া যাহার আরম্ভ হইয়াছিল তাহার এরূপ পরিণতিতে শেফালী ও সুকান্ত উভয়েই ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া পড়িল।

সস্নেহে অনুজাকে বাহু-বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিয়া শেফালী বলিল, 'কি বল্‌ছিস তুই নীরা। সাধারণতঃ ধনী-দরিদ্রে ঘনিষ্ঠতার যা পরিণাম হ'য়ে থাকে তাই আমি বল্লুম এতে তুই কেন ব্যথা পাচ্ছিস—তোকে আমরা পর করেছি এও কি সম্ভব?'

অশ্রু মুছিয়া অভিমান ক্ষুণ্ণকণ্ঠে নীরজা বলিল,—'যাই বল সেজদি তোমাদের মনের ভাব এখন বেশ বুঝেছি, কিন্তু থাক এখন ওসব আলোচনা, আমায় হঠাৎ নিয়ে এলে কেন কি দরকার আছে বল? আমার এবার যেতে হ'বে।'

হাসিয়া সুকান্ত বলিল, 'এই দেখ নীরজমণি, তোমার রাগ হ'য়েছে নইলে এখনি যেতে চাইছ কেন, এই তো সবেমাত্র এসেছ।'

গম্ভীরভাবে নীরজা বলিল, 'না জামাইবাবু আমি বেশী দেরী করতে পারব না কাজ আছে।'

শেফালী হাসিয়া বলিল, 'থাম, থাম কত কাজ তা আমি জানি, নভেল পড়া, না গল্প করা এইতো কাজ—এর জন্য এত ব্যস্ত হ'য়ে যাবার কোনও দরকার নেই।'

আরক্তমুখে নীরজা বলিল, 'বা রে আমার বুঝি নভেল পড়া ছাড়া আর কিছু কাজ নেই—আমাদের তোমরা কি ভাব বল তো। রাগ ক'র না সেজদি, তোমায় আমি বলছি না কিন্তু আমিও দেখেছি বড়-মানুষের উপর গরীবদের কেমন একটা যেন বিজাতীয় আক্রোশ থাকে। তাদের সব অন্যায়, সব দোষ, সব খারাপ।'

সংযতকণ্ঠে শেফালী বলিল, 'ওটা জগতের নিয়ম নীরা, একজন তার সম-অবস্থার লোক ছাড়া আর কাউকেও দু'চোখে দেখতে পারে না। ধনীরা দরিদ্রকে ঘৃণা-তাচ্ছিল্য করে। দরিদ্রেরা যখন অন্য উপায় নেই তখন সে দূর হ'তে তাদের উপর একটা জাতক্রোধ অন্তরে পোষণ করে, প্রতিশোধ নিতে চায় এটা উভয়েরই পক্ষে স্বাভাবিক, কাজেই তাতে কারো রাগ করা উচিত নয়। বরং আপন আপন মনোভাব গোপন রাখ্‌তে দূরে থাকা ভাল।'

'বেশ তো ভাই সেজদি তুমি দূরেই থেক, আমি কিছু বলব না, এখন আমায় যেতে দাও।' কথাটা বলিয়াই নীরজা উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যস্তভাবে তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া শেফালী বলিল, 'বোস নীরা অনেক কথান্তর হ'য়ে গেছে আর না, এবার আপোষে মিটিয়ে ফেলা যাক্; সত্যি ভাই তুই যদি এমনি রাগ করে চলে যাস তা হ'লে আমার দুঃখের সীমা থাকবে না।'

অপ্রতিভভাবে বসিয়া পড়িয়া নীরজা বলিল, 'ভারী তো দুঃখ আমি আর তোমার কে? পর বৈ তো নয়।'

'হুঁ ভাই বস তুই, আমি আসছি।' শেফালী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল

জ্যেষ্ঠার সহিত এই সামান্য বাদ-প্রতিবাদে মানসিক

উষ্মা প্রকাশ করিয়া নীরজাও অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। এই প্রসঙ্গটা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য সুকান্তর দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'আপনি যে বড় এমন ধীর, স্থির, গম্ভীর, নীরব, নিথর, নিস্পন্দ হ'য়ে গেলেন জামাইবাবু?'

সুকান্ত হাসিয়া উঠিয়া সত্রাসে বলিল, 'ওরে বাবা তুমি যে একধার থেকে অনেক বড় বড় কথা বলে গেলে, আমরা মুক্‌খু-সুক্‌খু মানুষ অত সাধুভাষা বুঝব না তো।'

'কেন জামাইবাবু আপনার নামের সঙ্গে এম-এডিগ্রী তো জোড়া আছে, আপনি মূর্খ হ'লেন কি করে।'

'আর এম-এ। কেরাণীগিরির চাপে পড়ে সে এম-এ টুকু বহুদিন নিঃশেষ হ'য়ে গেছে, এখন আমরা গাধা-গরুরা সমান। মানুষের বাইরে—'

'তাই না কি নিজের সম্বন্ধে এত বড় সিদ্ধান্তে কবে উপনীত হলেন?'

'যে দিন থেকে কেরাণীগিরিতে আত্মনিয়োগ করেছি সেইদিন।'

'কেরাণীর কাজের উপর আপনার দেখছি বড় বিদ্বেষ, তা হ'লে ও কাজ করেন কেন? এম-এ, পাশ করেছেন আর কি কাজ মেলে না?'

'হয় তো চেষ্টা করলে মেলে। কিন্তু সে ধৈর্য্য আর আমার নেই।'

'তাই বলুন আপনি যেমনি অলস তেমনি অধৈর্য্য।'

'ঠিক বলেছ নীরা তোমার তীক্ষ্ণ অনুভব-শক্তির প্রশংসা করছি।'

এক হস্তে ধূমায়িত চায়ের 'কাপ,' অপর হস্তে একটা কাঁচের ডিসে কতগুলা মিষ্টান্ন লইয়া শেফালী দর্শন দিল। নীরজা তাকে কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই বাধা দিয়া সে বলিল, 'চট্ করে খেয়ে নিয়ে চল, তোকে একটা জিনিস দেখাব।'

পত্নীর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া সুকান্ত বলিল, 'সেটাকে দেখে এলে কি করছে সে? কাঁদছে না কি?'

'কে সেজদি—জামাইবাবু কার কথা বল্‌ছেন?'

একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া শেফালী বলিল, 'তুই খেয়ে নে না, এখনি দেখতে পাবি।'

নীরজা আর কিছু বলিল না।

সুকান্তকে লক্ষ্য করিয়া শেফালী বলিল, 'তুমি যাও না এখান থেকে ও খেয়ে নিক।'

উঠিয়া দাড়াইয়া সুকান্ত বলিল, 'কেন আমার সামনে কি ও খেতে পারবে না। আমরা কি খাই না? তবে দেখ এইগুলো তোমাদের ভারী অন্যায়, খায় তো সকলেই, তবে এর সামনে খাব না, ওর সামনে খাব না এগুলো করা কেন? আর একটা দোষ আমাদের দেশের মেয়েদের খাবার সময় নিজের জন্য বড় কিছু তাদের থাকে না, অন্যকে সব দিয়ে অনেক সময় হয় তো বিনা উপকরণেই তারা খায়, যদি স্বামীর সামনে খায় তা হ'লে স্বামী বেচারারা সেটার একটা প্রতীকার করতে পারে, তা ছাড়া স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বসে খেলে বেশ একটু গল্প করে খাওয়া যায়। কেন যে তোমরা সেটা কর না তা আমি বুঝতে পারি না।'

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে শেফালী বলিল, 'আচ্ছা, তোমার কি আর কোনও কাজ নেই? তাই যত উদ্ভট আলোচনা করতে এলে। পোড়া কপাল খাওয়ার। কার গলায় দেবার দড়ি জোটে না যে ভাল খাওয়া হয় কি না স্বামী দেখবে বলে তার সঙ্গে বসে খাবে। মেয়েরা অমন খাওয়ার জন্য মরে না। অপরকে খাইয়ে তারা আনন্দ পায়, নিজে খেয়ে নয়। যাও তুমি, অমন অনাসৃষ্টি কথা আর বলতে হ'বে না।'

'আঃ রাগ কর কেন শেফা। এ তো ভাল কথা। নিজেদের সুখ-সুবিধার দিকে মেয়েরা লক্ষ্য রাখ্‌তে চায় না, বলেই তো তাদের এত দুর্দ্দশা এবং সেইজন্যই আজকাল পুরুষদের চেয়ে মেয়ে বেশী মরে।'

বিরক্তিভরে শেফালী বলিল, 'আরও বেশী বেশী মরে মেয়ের বংশ ধ্বংশ হ'ক। আমার তাতে একটুও আপত্তি নেই, তুমি যাও দেখি। নীরা খেয়ে নিক। আমরা এখনও এত উন্নতির আলোকে আসি নি যে গুরুজনদের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে যাব।'

'না এদের কোন মঙ্গলের আশা নেই—ভাল বল্লেও শোনে না' বলিয়া সুকান্ত কক্ষ ত্যাগ করিল।

নীরজাকে লইয়া শেফালী কক্ষের বাহিরে আসিল। তাহার শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী তখন প্রশস্ত বারান্দার একাংশে

বসিয়া হরিনামের মালা ফিরাইতেছিলেন। মালাটা তাহার হস্তে দ্রুত ঘুরিতেছিল বটে, কিন্তু মুখে হরিনাম উচ্চারণের পরিবর্ত্তে বধুদের কার্য্যের নানারূপ সমালোচনা চলিতেছিল। এবং এই সমস্ত অনাচারী বধূ ও তাহাদের পরামর্শ-দুষ্ট পুত্রদের লইয়া তিনি যে একেবারেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন উচ্চকণ্ঠে তাহাই বার বার ঘোষণা করিতেছিলেন। এই অনাচারদুষ্ট সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবনে গমন এখন তাঁহার পক্ষে শ্রেয়, পারিতেছেন না শুধু ইহারা তাঁহাকে ছাড়ে না বলিয়া। হরি মধুসূদন কবে যে তাহাকে কৃপা করবেন তাহা তিনিই জানেন।

নীরজা তাঁহাকে প্রণাম করিবার উদ্যোগ করিতেই শশব্যস্তে তিনি বলিলেন, 'দেখ বাছা ছুঁয়ে ফেল না যেন। এখন আর নাইতে পারব' না।'

সঙ্কুচিতভাবে নীরজা ভূমিতে শির স্পর্শ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অপ্রসন্নমুখে বধূর দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, 'বলেছ তোমার বোনকে? নেবে তো? যা হ'ক একটা কর বাছা, আমি আর সইতে পারছি না। কি আপদেই যে পড়েছি যত সব ম্লেচ্ছ ঘরের মেয়ে এসে সংসারটা আমার উচ্ছন্ন দিলে।'

নীরজা বিস্মিত দৃষ্টিতে জ্যেষ্ঠার দিকে চাহিল। ভগিনীর সম্মুখে এই লাঞ্ছনায় ক্ষোভে-দুঃখে শেফালী অভিভূতপ্রায় হইয়া পড়িল।

শ্বশ্রূ পুনরায় বলিলেন, 'দিনে দিনে এসব হ'ল কি? লঘু-গুরু বিচার করে বলে না; ছেলেগুলার বৌ যা বল্‌বে তাই একেবারে ইষ্টমন্ত্র হ'বে।'

শেফালী সন্ত্রস্তভাবে নীরজার হস্তে একটা মৃদু আকর্ষণ করিয়া বলিল, 'চল ভাই এখান থেকে।' চলিতে চলিতে শ্বশ্রূর দিকে চাহিয়া বিনীতস্বরে সে বলিল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মা। ওর যা হয় ব্যবস্থা এখনই করছি।'

বারান্দা অতিক্রম করিয়া একটা ছোট ঘরের মধ্যে উভয়ে প্রবেশ করিল। দ্বারের সম্মুখেই কতগুলা ছিন্ন-বস্ত্রের উপর শেফালী ফুলের মত ক্ষুদ্র শিশুটী পড়িয়া হাত-পা নাড়িতেছিল। অদূরে একটা কেরাসিনের আলো ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছিল। শেফালী অগ্রসর হইয়া তাহার শিখাটা উজ্জ্বল করিয়া দিতে দীপ্ত আলোক-রেখা পূর্ণ ভাবে শিশুর উপর পড়িল।

মুগ্ধনেত্রে সেদিকে চাহিয়া নীরজা বলিল, 'বাঃ কি চমৎকার, এ কে সেজদি?'

'ওরই জন্যে তোকে নিয়ে এসেছি ভাই!'

'এর জন্যে—তার মানে? কে এ তোমাদের বাড়ীর কারো মেয়ে বুঝি?

'না রে এ বাড়ীর কারো নয়। তুই একে নিবি নীরা?' শেফালী অনুজার বিস্ময়-জড়িত নয়নের উপর উৎসুক-ব্যগ্র দৃষ্টি সংস্থাপন করিল।

নীরজা ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে স্নেহভরে সে শিশুটীকে বক্ষে তুলিয়া লইল। বেশীদিনের কথা নহে বৎসরাধিক পূর্ব্বে তাহারও অঙ্কে এমনি একটী কুসুম-কোরক-তুল্য শিশু উপনীত হইয়াছিল। কালের কঠোর হস্ত মাত্র কয়মাস পূর্ব্বে তাহাকে বৃন্তচ্যুত করিয়া দিয়াছে। মাতৃবক্ষ হইতে আজও সে অভাবের বেদনা দূর হয় নাই। ক্ষুদ্র তনয়ার স্মৃতি এখনও স্তরে স্তরে সেখানে অঙ্কিত রহিয়াছে তাহার হাসি-কান্নার সহস্র ইতিহাস আজও জননী-হৃদয় দীর্ণ করিয়া প্রতি কার্য্যে জাগিয়া উঠে। সেই বেদনা-জড়িত স্মৃতি সুপরিস্ফুট হইয়া নীরজার নয়নপ্রান্তে কয় বিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। শিশুটীকে নিবিড় বেষ্টনে বক্ষে জড়াইয়া সে বলিল, 'সত্য একে আমায় দেবে দিদি? না ঠাট্টা করছ তুমি নিশ্চয়, যার মেয়ে সে দেবে কেন, এমন সুন্দর মেয়ে আমি তো পেলে এক্ষুনি নিয়ে যাই, কি চমৎকার যেন একরাশ চাঁপা ফুল।'

'সত্যিই মেয়েটা বড় সুন্দর কিন্তু সব কথা শুনে তুই কি নিবি ওকে।'

'সব কথা, কথাটা আবার কি? কার মেয়ে এ?'

'কার মেয়ে তা জানি না ভাই, তোর জামাইবাবু একে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছেন।'

'পথ থেকে?'

'হ্যাঁ পথ থেকেই, বুঝতে পারছিস তো কোথা থেকে তা হ'লে ওর উদ্ভব। তুই কি ওকে নিতে পারবি?'

স্নিগ্ধ নয়নে অঙ্কস্থ শিশুর দিকে চাহিয়া নীরজা বলিল, 'নিশ্চয় নেব, একবার যখন একে বুকে তুলে নিয়েছি তখন আর নাবাব না। আর এর কি দোষ, সদ্যজাত শিশু মাত্র।'

'কিন্তু ও তো সুজাতা নয়।'

'নাই বা হ'ল; জন্মের অপরাধ তো ওর নয়।'

'সেটা জানি তবুও আজন্মের সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি না। ও রকম ছেলে-মেয়েকে কি করে ঘরে স্থান দেব। তারপর আমার শ্বশুর-শাশুড়ী তাঁদের আচার-নিষ্ঠা হ'তে এক পা এদিক-ওদিক হ'ন না, ওকে তুলে আনার অপরাধে তোর জামাইবাবুর আর সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবহারের প্রশ্রয়দাত্রী আমার জন্য যে সব ব্যবস্থা হচ্ছে সে সব না শোনাই ভাল। হিন্দুর ঘরে এতবড় দুর্গতি অনাচারের আবির্ভাব হ'লে যে সংসার উৎসন্ন যায় তাতে আর কারো সন্দেহ নেই। ওকে এখনই পথে ফেলে আসবার আদেশ হ'য়েছিল। উনি জোর করে ওকে ঘরে রেখে তোর কাছে আমায় পাঠিয়েছিলেন। ওঁর ধারণা তুই একে নিয়ে যাবি।'

'নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। সত্যি সেজদি, জামাইবাবু এরকম ধারণা করে আমায় আনতে পাঠিয়েছিলেন এতে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কি সুন্দর মেয়েটা, একে পেয়ে আমার এত আনন্দ হচ্ছে।'

গম্ভীরভবে শেফালী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, 'কিন্তু নীরা তোরও শ্বশুর-শাশুড়ী আছেন, তাঁরা কি এতে মত দেবেন? শেষে এই পথের আবর্জ্জনার জন্য তোর শান্তির ঘরে কি অশান্তির শিখা জ্বলে উঠবে। এই জন্যই তোকে একথা বলবার ইচ্ছা আমার ছিল না। তোর জামাইবাবুর জেদেই কেবল তোকে নিয়ে এসেছি। ভেবে দেখ তুই।'

দৃঢ়ভাবে শিশুটীকে বক্ষে ধরিয়া নীরজা বলিল, 'একে যখন দেখেছি তখন ছাড়্তে কিছুতেই পারব' না।'

'কিন্তু যদি তোর শ্বশুর-শাশুড়ী রাগ করেন, তার চেয়ে ওকে কোনও অনাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে বলি।'

ব্যস্তভাবে নীরজা বলিল, 'না ভাই সেজদি না, একে দাও আমায়; সেখানে যে-ভাবে ছেলেরা মানুষ হয় আমি দেখেছি; শুধু জন্মের অপরাধে এমন একটা নির্ম্মল জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।'

অল্প হাসিয়া শেফালী বলিল, 'জন্মের অপরাধটাও অল্প নয় নীরা, ওর অদৃষ্টে যদি সুখ থাকত ভগবান তা হ'লে ওকে তো সুস্থানে পাঠাতে পারতেন। তা হ'লেই বুঝ্তে হ'বে এই ওর অদৃষ্ট-লিপি, তার পরিবর্ত্তন করতে যাওয়া মানে বিধিলিপির উপর হস্তক্ষেপ করা।'

কিছুক্ষণ নতমুখে চিন্তা করিয়া নীরজা বলিল, 'হয় তো তাই কিন্তু মানুষের যতটুকু সাধ্য ততটুকু চেষ্টা করা। উচিত এ না হ'লে তো কাকেও কষ্ট ভোগ করতে দেখলে তার প্রতীকার করতেও ভগবানের বিধানে হস্তক্ষেপ করা। না ভাই ও কথা বলে নিচেষ্ট থাকা চলে না। একে আমি নিজের সন্তানের মতই পালন করব, তারপর ওর ভাগ্যে যা আছে।'

'কিন্তু তোর বাড়ীর লোক যদি এতে বিরক্ত হ'ন?'

'হ'লে আর কি করছি বল। বৌ বলে একটা ভাল কাজও যদি স্বাধীনভাবে কর্‌বার ক্ষমতা আমার না থাকে, তা হ'লে সংসার ছেড়ে সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে যাওয়াই ভাল।'

ম্লান হাসির সহিত শেফালী বলিল, 'তা কি হয় রে, স্ত্রীলোকের আবার স্বাধীনভাবে কাজ করবার অধিকার কি? জন্মের সঙ্গেই সে পরাধীন।'

সবেগে শির-সঞ্চালন করিয়া নীরজা বলিল, 'না ভাই সেজদি তোমার একথা আমি মান্‌তে পারলুম না, পরাধীন বলে একটা কাজও যদি আপনার ইচ্ছামত করবার ক্ষমতা আমাদের না থাকে, সব বিষয়ে যদি অপরের মতানুবর্ত্তী হ'য়ে থাকতে হয় তা হ'লে সংসার ছেড়ে বনবাসী হওয়াই শ্রেয়। আর না ভাই আপন ইচ্ছামত সব কাজ না হোক কিছু যে আমরা করতে পারি না সত্যই এতটা অধীন আমরা নই।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেফালী বলিল, 'সকলের তো সমান নয় ভাই, তুই হয় তো আপন ইচ্ছামত কাজ করতে পারিস্, আমার সে উপায় নেই; কিন্তু নীরা, এ একটা সামান্য কাজ নয়। হয় তো তোর শ্বশুর-শাশুড়ী এতে রাজী হ'বেন না। ঐ মেয়েটার জন্য যে তোদের সাংসারিক একটা অশান্তির সৃষ্টি হ'বে, তার উপলক্ষ্য হ'ব আমি, সেটা আমার পক্ষে বড় অস্বস্তিকর হ'বে। তুই ভাল করে বুঝে দেখ ওর জন্য যদি তোকে কিছুমাত্র বিব্রত হ'তে না হয় তবেই তুই ওকে নিয়ে যা, নয় তো থাক।'

শিশুটী কাঁদিয়া উঠিল, সন্তর্পণে তাহাকে বক্ষের উপর হইতে অঙ্কে লইয়া মৃদু দোল দিতে দিতে ভগিনীর দিকে চাহিয়া

নীরজা বলিল, 'একে কি খেতে দিচ্ছ সেজদি, বোধ হয় কিছু খেতে চায়—একটু দুধ এনে দাও না ভাই। আর আমার যাবার ব্যবস্থা করে দাও।'

'এর মধ্যে যাবি ভাই। আর একটু থাক না।'

'না আজ যাই আর একদিন আস্‌ব, তুমি দেখ আমার গাড়ী এল কি না, আর একে একটু দুধ এনে দাও।'

'দেখি যদি আনতে পারি।'

'যদি আন্‌তে পারি তার মানে?'

অতি মলিনভাবে হাসিয়া শেফালী কক্ষ ত্যাগ করিল। শিশুটী তখনও কাঁদিতেছিল। নীরজা তাহাকে বক্ষে লইয়া গৃহে পাদচারণা করিয়া ফিরিতে লাগিল। শিশুটীর এই অসহায় দুরবস্থা একটা করুণার প্লাবন তাহার অন্তরে বহাইয়া দিল। দুর্ভাগ্য শিশু কেন যে অমন স্থানে আসিয়াছে। তাহার জন্মের গ্লানি গোপন করিবার জন্য যাহারা তাহাকে মরণের মুখে অর্পণ করিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই—তাহারা কি মানুষ না পশুরও অধম। সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না ইহার জননী কোন্ প্রাণে তাহাকে পথের ধূলায় বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছে। যে তাহাকে আনিয়াছে সে কি ইহার জন্য বিন্দুমাত্র ব্যথা অনুভব করে নাই। কিরূপে মা হইয়া সে তাহার মাতৃত্বকে পরিহার করিল। কি কঠিন অন্তর তাহার! অভাগিনী যদি ইহাকে পৃথিবীতে আনিল তবে বর্জ্জন করিল কোন্ অধিকারে। একটা নির্ম্মল জীবন এভাবে ব্যর্থ, বিফল করিবার কি প্রয়োজন ছিল। এ গ্লানি বহন করিবার শক্তি যদি নাই তবে এ নিষ্পাপ শিশুকে ধরাতলে লইয়া আসিল কেন? আর না জানি কোন মহাপাপী সে, যে জনক হইয়াও ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিল না। সমাজ-অঙ্গের দুষ্ট-ব্রণ স্বরূপ এই সব নরনারীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। একটা জীবন এইভাবে গভীর অন্ধকারে বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা উচ্চশিরে সমাজ-বক্ষে বিচরণ করিতেছে, কেহ তাহাদের অপরাধী করিবে না?

তাহাদের অপরাধের গুরুত্ব কত অধিক তাহাও হয় তো কেহ জানে না। তাহাদের জন্য একটা কিংবা আরও কত কলুষলেশহীন জীবন এইভাবে মৃত্যু বা আজীবন-ব্যাপী ঘৃণ্য জীবনকে বরণ করিয়া লইতেছে। অথচ তাহাদের জন্য কোন শাস্তির বিধান নাই; লোক-চক্ষুর অন্তরালে কি মহাপাতকে তাহারা লিপ্ত রহিয়াছে কে তাহার সন্ধান রাখে?

নীরজার স্নেহস্পর্শে শিশুটী কিছুক্ষণ নীরব হইয়াছিল। আবার মৃদুকণ্ঠে সে রোদন আরম্ভ করিল। তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহে নীরজা তাহার অস্ফুট কমল-কোরকের মত কপোলে স্নেহ চুম্বন করিল। আহা এটী যদি তাহারই অঙ্কে আসিত তাহা হইলে এর আদর-যত্নের সীমা থাকিত না। ভগবানের বিচিত্র লীলা তিনিই বুঝেন। যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করে তাহাদের কাছে না পাঠাইয়া কেন ইহাকে এমন স্থানে পাঠাইলেন যে, ইহার জন্মের কলঙ্ক গোপনের জন্য ইহার জন্মদাতারা ইহাকে পথের আবর্জ্জনার ভিতর বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই।

কক্ষের বাহিরে একটা কঠোর কণ্ঠ ধ্বনিয়া উঠিল। সচকিতে নীরজা সেই দিকে মনঃসংযোগ করিল। শেফালীর শ্বশ্রূ তীব্রস্বরে বলিতেছিলেন, 'এই তো খানিক আগে একবার ছোট বৌয়ের কাছ থেকে দুধ নিয়ে গেছ, আবার বলছ দুধ চাই! তা হ'লে আর লোকে খাবে কি, বলি আক্কেল-বিবেচনা একটু কর্‌তে নেই কি? সর, সর, সরে দাঁড়াও ওদিকে, সব ছুঁয়ে আমার ছিষ্টি একাকার করে দিও না, যাও চান করে রান্না ঘরে যাও। সেই থেকে তো ওটাকে নিয়ে উন্মত্ত হ'য়ে রয়েছ, একটা কাজে হাত দাও নি, যাও এবার কাজ কর গে।'

শেফালী মৃদুস্বরে কি বলিল শোনা গেল না। শ্বশ্রূঠাকুরাণী এবার সগর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন, 'বিরক্ত কর কেন বাপু একটুখানি দুধইবা আসে কোথা থেকে, দুধের দাম নেই; টাকায় তিনসের করে দুধ সে খবর রাখ, একটু জল খাইয়ে রাখ গে মরবার ছেলে ও নয়। পথে পড়ে থেকেও যে মরে না, সে না খেলেও মরবে না। দুধ পাবে না। বাপের বাড়ী থেকে জমিদারী সঙ্গে করে আস নি তো বাছা যে যত আপদ-বালাই জুটিয়ে আন্‌বে তার দুধ যোগাব আমি। অত বেশী দরদ হয় বাপের বাড়ী থেকে দুধ এনে খাওয়াও। আমি কথাটী বলব না। তোমার বোনকে বল সে নিয়ে যায় যাক, না হয় আমরা পথে ফেলে আসি এ আপদ কতক্ষণ ঘরে রাখব। আ এক কথা কতবার বল্‌ব, দুধ দেব না

কাঁদছে? তার আমি কি করব? মাথায় করে বসে থাকব। স্বর্গের সিঁড়ি এসেছে আমার—জ্বালিয়ে খেলে। যেমন বৌগুলা তেমনি হ'য়েছে ছেলেকটা, সুকান্ত হতভাগা সেই থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে আমার সামনে পর্য্যন্ত আসছে না। যাও বাপু কাজে মন দাও। আমরা তো বড়মানুষ নই যে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ান আমাদের ঘরে চলবে?'

আর কিছু শুনা গেল না। ঠাকুরাণী বোধ হয় নীরব হইলেন। নীরজা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। কি হৃদয়হীন ইহারা, মাতৃদুগ্ধ বঞ্চিত মূক শিশু তাহাকে একবিন্দু দুগ্ধ পর্য্যন্ত ইহারা দিতে অসম্মত। হ'লেই বা সে পথে পরিত্যক্ত, কুস্থান-উদ্ভূত, একটা জীব তো সে? তাহার উপর এই অত্যাচার! অন্ধ আচারনিষ্ঠা মানুষকে এত বিবেকহীন করিয়া তুলে। এই কুসুম সুকুমার শিশু ইহার উপরও লোক কঠিন হইতে পারে?

নীরজা পুনরায় তাহাকে চুম্বন করিল। কি সম্মোহন পরশ এই শিশুর—কি সুন্দর এই শিশুর আকৃতি। তাহার সেই নিষ্ঠুর পিতামাতা হয় তো খুবই সুরূপ। মুগ্ধনেত্রে শিশুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কয়বিন্দু অশ্রু নীরজার কপোল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল শিশুগুলা সবই যেন এক ধরণের তাহার সেই পরলোকগতা দুহিতার মূর্ত্তির প্রতি ছন্দটী যেন এই শিশুর অঙ্গে বহন করিয়া আনিতেছে। অথচ সে আজ কোথায়, কত দূরে! পুনরায় কয়বিন্দু অশ্রু শিশুর অঙ্গে পড়িল। গাত্রে বারিস্পর্শে অস্বস্তি হওয়ায় শিশু উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে বক্ষে লইয়া নীরজা উঠিয়া দাড়াইল। চিন্তার কয়টী রেখা তাহার আননে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। শিশুকে সে লইয়া যাইবে নিশ্চয় কিন্তু তাহার শান্তির নীড়ে সেজন্য কোন বিপ্লব উপস্থিত হইবে না তো? তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী যদি সম্মত না হন, তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ সে তো করিতে পারিবে না। অবশ্য তাঁহারা কোনদিন তাহার কোন কার্য্যে বাধা দেন নাই, কিন্তু সেও তো অসঙ্গত কোন কাজ এ পর্য্যন্ত করে নাই, তাঁহারা না রাখিলে শিশুর কি উপায় হইবে? অনাথ-আশ্রমে কিংবা খৃষ্টান মিশনারীদের কাছে পাঠাইতেই হইবে? না না তাহা হইবে না, জীবনের কোন সার্থকতাই সে তাহা হইলে উপলব্ধি করিতে পারিবে না। সে শিশুকে আশ্রয় দিবে, এজন্য তাহাকে যে কোন শাস্তি লইতে হয় তাহা সে মাথা পাতিয়া লইবে।

সন্তানের জননী হইয়া অঙ্কস্থ শিশুকে আর দুঃখ-বেদনার মধ্যে সে নামাইয়া দিতে পারিবে না। আহা অসহায় অবোধ, কি দোষ তাহার—জন্মের অপরাধের জন্য সে দায়ী নহে, তাহার উপর কেন সমাজের নিষ্ঠুর উৎপীড়ন হইবে! সমাজ তাহাকে অঙ্কে স্থান দিবে না, অথচ প্রকৃত দোষী যাহারা তাহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না, বিনিময়ে শাস্তিভোগ করিবে এই নিষ্পাপ শিশু। একি অত্যাচার!

শেফালী কক্ষে আসিয়া বলিল, 'তোর গাড়ি এসেছে ভাই।'

'চল্লুম তা হ'লে সেজদি, আর একদিন আসব।'

'ওকে তা হ'লে নিয়েই যাবি?'

'হ্যাঁ ভাই নিয়েই গেলুম।' জ্যেষ্ঠার পদধূলি লইয়া নীরজা কক্ষ ত্যাগ করিল।

শেফালী ধীরে ধীরে তাহার সঙ্গে আসিল। শাশুড়ীর তীব্র বাক্যবাণগুলা তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হইয়া তাহাকে যাতনায় অভিভূত করিয়া দিল। কোন কথা সে বলিতে পারিল না।

সুকান্ত কি কাজে এদিকে আসিতেছিল। গমনোদ্যতা নীরজার দিকে চাহিয়া বিস্মিতভাবে সে বলিল, 'একি তুমি এখনি যাচ্ছ কেন নীরা, এই তো এলে এর মধ্যে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ কেন?'

কেন যে ব্যস্ত হইয়াছে নীরজা তাহা খুলিয়া বলা সঙ্গত মনে করিল না। ক্ষুধাতুর শিশু কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার অঙ্কের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! শেফালীর বিশুষ্ক ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় দুগ্ধ চাহিবার কথা সে ওষ্ঠাগ্রে আনিতে পারে নাই। কোনরূপে বাটী গিয়া শিশুকে খাওয়াইবার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। সুকান্তর প্রশ্নে বিনীত-কণ্ঠে বলিল, 'আজ যাই জামাইবাবু, গৌতম হয় তো কাঁদছে।'

'ও তা হ'লে আর কি বলব কিন্তু তাকে কেন আন নি নীরা?'

কিছু না বলিয়া নীরজা অগ্রসর হইল। শেফালীর শ্বশ্রূ

কিঞ্চিৎ দূরেই দণ্ডায়মান ছিলেন। দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নীরজা বলিল, 'যাচ্ছি মা তা হ'লে।'

গম্ভীরমুখে তিনি বলিলেন, 'মেয়েটাকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ।'

'হাঁ মা নিয়েই গেলুম, ও আমার কাছেই থাকবে।'

'ভাল তা তোমার শাশুড়ী কিছু বলবেন না?'

'বোধ হয় না' দৃঢ়স্বরেই নীরজা উত্তর দিল।

বিরক্তি-কুঞ্চিত মুখে সুকান্তর জননী বলিলেন, 'তা হ'লে একটা কথা তুমি জেনে যাও, ওটাকে যদি তুমি ঘরে রাখ, তা হ'লে আমাদের কারো সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ থাকবে না, বৌমাকেও আমি তোমার ওখানে যেতে দেব না। তুমিও আমাদের এখানে আর এস না। তোমরা বড়-মানুষ তোমাদের সবই শোভা পায়, কিন্তু আমরা গরীব, আমাদের তো সমাজের ভয় করে চলতে হ'বে বাছা।'

নীরজা স্তব্ধ হইয়া রহিল। এই অপরাধে তাহাকে আত্মীয়-স্বজন হইতে দূরে থাকিতে হইবে। বেশ! ধীরস্বরে সে বলিল, 'বেশ, আপনারা আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখবেন না' বলিয়াই দ্রুতপদে সেস্থান ত্যাগ করিল।

ক্ষুব্ধ-ব্যথিত চিত্তে নীরজা আপনার সুবৃহৎ মোটরের মধ্যে উঠিয়া বসিল। সুকান্ত নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, জননীর ব্যবহারে সে অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল। অথচ নীরজাকে কি বলা যায় তাহাও ভাবিয়া স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। শেফালী অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই বিদায় লইয়াছে। বাহির-দ্বারপ্রান্তে: আসিবার অধিকার এবাটীর বধূ-কন্যাদের নাই।

শোফার নীরজাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল, 'চালাব তো?'

'হ্যাঁ চালাবে বৈ কি, আসি তা হ'লে জামাইবাবু! আর কি বলব, আমার বাড়ীতে যেতে বলবার অধিকার তো আর নেই। তবে যদি কখনও দাদার ওখানে গেলে দেখা হয়।'

ব্যস্তভাবে সুকান্ত বলিল, 'না না তা কেন? আমি নিশ্চয়ই তোমার ওখানে যাব।'

'না জামাইবাবু দরকার কি আমার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে!' অভিমানে তাহার কণ্ঠ ভারী হইয়া আসিল।

কুণ্ঠিতভাবে সুকান্ত বলিল,—'নীরা লক্ষ্মীটী ভাই, তুমি কিছু মনে কর না। আমার অবস্থা কি রকম বুঝতে পারছ তো তুমি। আমি নিরুপায়।'

সুকান্তর কথা শুনিয়া নীরজা চমকিয়া উঠিল। সত্যই ইঁহার নিকট এ ক্ষুব্ধভাব প্রকাশ করা সঙ্গত হয় নাই, উনি কি করিবেন। নিষ্ঠাবান পিতামাতা হইলেই বা অন্ধ আচার-পরায়ণ, তবু পিতা-মাতা তো সন্তানের নিকট শুধু জনক-জননী ন'ন, পূজ্য দেবতা। তাঁহাদের দোষ-গুণের বিচার সে তো করিতে পারে না। কষ্টে হাসিয়া আপনাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল, 'না জামাইবাবু আমি কিছু মনে করি নি। আপনি কি আমায় এতই ছেলেমানুষ ভাবছেন। মা ও কথা বলেছেন, তা'তে আর আশ্চর্য্য কি, ওঁরা সেকালের লোক একটু আচারনিষ্ঠ হ'বেনেই তো। এখন আসি, আপনি যাবেন একদিন।'

সুকান্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'হ্যাঁ যাব বৈ কি, নিশ্চয় যাব। হ্যাঁ, একটা কথা নীরা ওটাকে তো তুমি নিয়ে যাচ্ছ কিন্তু ওর জন্য তোমাদের বাড়ীর সকলে বিরক্ত হ'বেন না তো? তুচ্ছ বিষয়ের জন্য অশান্তির সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। সেটা বুঝে তুমি ওকে নিয়ে যেও।'

ব্যথা-কাতর মুখে নীরজা বলিল, 'একটা মানুষের জীবন কি তুচ্ছ জামাইবাবু? আমি অশান্তির ভয়ে একে না নিই যদি তা হ'লে এর কি উপায় হ'বে, আপনি তো রাখবেন না।'

'না নীরা সে উপায় আমার নেই। সেইজন্যই তো তোমায় নিয়ে এসেছিলুম, কিন্তু এজন্য যদি তোমায় কোন কষ্ট সইতে হয় সেটা আমি সইতে পারব না।'

'একটা জীবন সেজন্য ব্যর্থ হ'তে দেব না। নিজ সন্তানের মতই একে পালন করব।'

'কিন্তু ওর সত্য পরিচয়ই দেবে তো?'

'নিশ্চয়, আপনি কি মনে করেছেন এর পরিচয় গোপন রাখব আমি, না জামাইবাবু অন্যায় কাজ করার চেয়ে সেটাকে গোপন করা আমি আরও বেশী দোষের মনে করি। প্রতারণা আমি করব না; কারও অজ্ঞাতে

তার অপ্রিয় কাজ আমি করতে চাই না। এর সত্য পরিচয় আমি দেব তাতে যদি সকলে বিরক্ত হ'ন তাও ভাল।'

সুকান্ত প্রশ্নদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, 'তোমায় আমি চিনি নীরা'।

আদেশপ্রাপ্ত চালক তখনও মোটার চালাই নাই, জিজ্ঞাসুনেত্রে সে পুনরায় নীরজার দিকে চাহিতেই অপ্রতিভ-ভাবে হাসিয়া নীরজা বলিল, 'হ্যাঁ এইবার বাড়ী চল।'

আলোকমালা-শোভিতা নগরীর বুকের উপর দিয়া তীব্র গতিতে মোটার ছুটিয়া চলিল। সুপ্ত শিশুকে বক্ষে জড়াইয়া কোমল আসনের উপর দেহভার এলাইয়া দিয়া নীরজা ভাবিতেছিল—সমাজের একি অন্যায় উৎপীড়ন, একটা আশ্রয়হীন অসহায় শিশুকে গৃহে স্থান দিবার অপরাধে তাহাকে স্বজন-পরিত্যক্ত হইতে হইবে! ক্ষুদ্রশিশুর জাতি-ধর্ম্ম-বিচার করিয়া না চলিলে কি একটা মহা অপরাধ হয়? যাহারা এই শিশুর সঙ্গে অপবিত্র হইবার আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া দূরে সরিয়া যাইতেছেন, হয় তো তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এমনই কত শত অপরাধের সহিত বিজড়িত রহিয়াছেন; অথচ তাঁহারাই যখন অন্যের বিচার করিতে বসেন তখন সে কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হ'ন; উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযমের দিন দিন যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহাতে পরিণাম কি দাঁড়াইবে তাহা বলা দুষ্কর—তাহারই তো পরিণতি এই সব শিশু কিন্তু, তাহাদের জন্য কোন সুব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। কি হৃদয়হীন সমাজ! যদি কেহ দয়া করিয়া এই সব শিশুকে আশ্রয়দাতাই কষ্টও আশ্রয় দেয় তাহাতে তাহাদের নিষ্কৃতি নাই, প্রতিফলে শাস্তি ভোগ করিবে। হয় তো অপরাধীই বিচারক সাজিয়া দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছেন। চমৎকার! সুপ্ত শিশুকে নীরজা বক্ষে জড়াইয়া ধরিল। যাহাই হউক সকলে তাহাকে যত খুসী তিরস্কার করুক, যতই তাহার উপর বিরক্ত হ'ক শিশুকে সে ত্যাগ করিতে পারিবে না, তাহার জীবনটা যাহাতে ব্যর্থ ও বিফল না হইয়া যায়, প্রাণপণে সে চেষ্টা করিবে। মানব-জীবনে তাহার মত তুচ্ছ নারী ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক কার্য্যের অবসর পাইবে। একটা জীবনও সে যদি সার্থক আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারে, তাহাই যথেষ্ট। এ শিশু তাহারই সন্তান; সকলের ঘৃণার অন্তরালে বক্ষপুটে ইহাকে আবরিত করিয়া সে রক্ষা করিতেছে।

ক্রমশঃ

—— :*: ——

ভিন্ দ্যাশের বধূ

বন্দে আলী মিয়া

আধার রাইতে কান্দে মরে
পড়ানডা মোর দুখে
ক্যান্নে কইরে কিসের লাইগ্যা
কোন্বা বন্ধুর ভুখে—

মনের মধ্যি রইলা যে-ধন
দেখ্যাতি না পারনু কেমন
জলা চান্দা কান্দে যেম্নে
আবাকাশ্যার বুকে।

যার না লাগ্যা দিন গোঁয়ানু
বস্যা ত্রিক্ষির তলা
উজান গাঙ্গে পড়্লারে চর
সুরু হইল্যা চলা,—

যাইমু চল্যা কোন না দ্যাশ
নেইরে বন্ধু দুঃখুর শ্যাষ
হায়রে দুমমণ রইছো যেথেন
থাক্যো মনের সুখে।

ভুখে—(ক্ষুধার) জন্ম।

বাঙ্গালা দেশে ধান্যের চাষ

এ বৎসর অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ সালে বাঙ্গালা দেশে ১,৫৫,৭১,৪০০ একর জমিতে আমন ধান্যের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর ১,৫১,২০,৩০০ একর জমিতে আমন ধান্যের চাষ হইয়াছিল। যেরূপ আবহাওয়া গিয়াছে, তাহাতে শতকরা ৯০ ভাগ ফসল হইয়াছে। প্রতি একরে ১২৷৷০ মণ ধান্য হইবে এই হিসাবে ধরিলে এই বৎসর ২০,০২,০২,৮০০ মণ ধান্য হইবে। গত বৎসর ৫,৫৫,৪০,০০০ মণ ধান্য হইয়াছিল। সমগ্র ভারতে যে পরিমাণ জমিতে আমন ধান্যের চাষ হয়, তাহার শতকরা ১৭·৫ ভাগ জমি বঙ্গদেশে।

—নীহার

বিধবা-বিবাহ

১৯৩১ সালে কলিকাতার বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভার দ্বারা বাঙ্গলা দেশের ৫৬টা জেলায় ৫৬টী এবং শাখাগুলির দ্বারা ৫০টী বিধবা-বিবাহ হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ৭৯৬টী বিধবা-বিবাহের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশে মোট ৯০২টী বিধবা-বিবাহ হইয়াছে।

বাঙ্গলা দেশে কত বিধবা-বিবাহ কোন্ বৎসর হইয়াছে তাহার এক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

সাল	সংখ্যা	সাল	সংখ্যা
১৯২৪	৩২	১৯২৯	৪০০
১৯২৫	২৯	১৯৩০	৪৬০
১৯২৬	৬১	১৯৩১	৯০২
১৯২৭	৫০০		
১৯২৮	৩৫০	মোট	২৭৩৪টী

কোন্ জাতির মধ্যে কয়টী বিবাহ হইয়াছে তাহার তালিকা এই :—

নমঃশূদ্র	৪৬৯	মালাকার	১৫
রাজবংশী	২৮৭	তিলী	১০
কায়স্থ	১৯৩	কুম্ভকার	৬
নাপিত	১৫৩	সুবর্ণবণিক	৭
ব্রাহ্মণ	১১৭	বারুজীবী	৬
সূত্রধর	৮৭	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়	৬
বৈদ্য	৯৮	গোপ	৪
সাহা	৮৫	সদগোপ	৩
মাহিষ্য	৩২	বিবিধ	১১২০
কাপালী	৩২	মোট	২৭৩৩

বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা পাঞ্জাবের পরলোকগত স্যর গঙ্গারাম-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালা দেশে ইহার ৯৫টী শাখা আছে।

১৯৩১ সালে এই সভায় ১৪টী বিধবার বিবাহের আবেদন আসে, তন্মধ্যে ৪২ জনের বিবাহ হইয়াছে। বাকী ১০৬ জনের বিবাহের চেষ্টা হইতেছে। এই সকল পাত্রীর মধ্যে—

কায়স্থ	৩২	মাহিষ্য	৬
বৈদ্য	৩	সদগোপ	৩
মোদক	১	বৈষ্ণব	৩
কাপালী	১	সুবর্ণবণিক	৬
ব্রাহ্মণ	২৫	তিলি	২
গোপ	১	নমঃশূদ্র	৪
বেহারা	১	কর্ম্মকার	১
যোগী	৫	কুম্ভকার	১
সাহা	৫	সূত্রধর	১
তাম্বুলী	১	পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়	১
ক্ষত্রিয়	১		
নাপিত	২	মোট	১০৬

১৯৩১ সালে ৩৪৬ জন বিধবা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া পত্র দিয়াছে। তন্মধ্যে কায়স্থ ১০৯, ব্রাহ্মণ ৮৭, বৈদ্য ১২ ইত্যাদি।

এই সভা গুণ্ডার হাত হইতে ১১ জন স্ত্রীলোককে উদ্ধার করিয়াছে।

— সঞ্জীবনী

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অদলবদল

মিঃ প্রেণ্টিস হোম মেম্বর নিযুক্ত হওয়ার পর হইতে মিঃ হপ্‌কিন্‌স স্থায়ীভাবে চীফ্ সেক্রেটারীর কাজ করিতেছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ ছুটী লইয়া দেশে যাইতেছেন, এই ছুটী শেষ হইলে তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। চট্টগ্রাম-বিভাগের কমিশনার মিঃ রীড্ তাঁহার স্থলে চীফ্ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ গার্ণারও দীর্ঘ দিনের ছুটী লইয়াছেন। তাহার স্থলে মিঃ টাউনেণ্ড অস্থায়ীভাবে কাজ করিবেন। সেক্রেটারীগণের মধ্যে আপাততঃ আর কোন অদলবদল হইবে না।

গবর্ণরের শাসন-পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে মিঃ মারের স্থলে মিঃ উড্হেড রাজস্ব-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র ছুটী লইয়াছিলেন, তিনি শীঘ্রই কার্য্যে যোগদান করিবেন এবং এখন তিনিই শাসন-পরিষদের প্রাচীনতম সদস্য হিসাবে ভাইস প্রেসিডেণ্ট হইবেন। মিঃ প্রেণ্টিসের কার্য্যকাল এখনও শেষ হয় নাই। তথাপি তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনিও দীর্ঘ ছুটী চাহিয়াছেন। মিঃ প্রেণ্টিস ছুটী লইলে নূতন চীফ্ সেক্রেটারী মিঃ রীড্ অস্থায়ীভাবে হোম মেম্বরের কাজ করিবেন।

— সঞ্জীবনী

হঠযোগীর মৃত্যু

হঠযোগী নরসিংহ স্বামী সম্প্রতি রেঙ্গুণ-হাঁসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। গত ২৪শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণকালে তিনি বহু ব্যক্তির সম্মুখে কুঁচিলা বিষ, বিষাক্ত এসিড, অন্য নানা প্রকার সাংঘাতিক বিষ ও কাচখণ্ড প্রভৃতি যথারীতি ভক্ষণ করেন। উহার কয়েক ঘণ্টা পরেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। প্রকাশ প্রতিবারই বিষ ভক্ষণের পর উহার ক্রিয়া নিবারণের জন্য তিনি কিছুক্ষণ

হঠযোগী নরসিংহ

ধরিয়া হঠযোগ-সাধনা করিতেন। গত ২৪শে মার্চ্চ এই বিষ-ভক্ষণের পর রাত্রিতে যোগসাধনায় বিলম্ব ঘটায় তাঁহার শরীরে বিষের ক্রিয়া দেখা দেয়। তখনই তাহাকে হাঁস-পাতালে পাঠান হয়। তাঁহার শরীরে ষ্ট্রীক্‌নাইন্ বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কলিকাতায় এই যোগী ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে যেদিন বহু সাংঘাতিক বিষ, কয়েকটী বিষাক্ত এসিড, কাঁচা পারা, লোহার পেরেক ও কাচখণ্ড ভক্ষণ করেন তখন আমরা তাঁহার অতি নিকটে থাকিয়াই উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। ঐ সময়ে কি উদ্দেশ্যে তিনি ঐরূপ করেন, ইহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে,আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যোগের শক্তিতে বিশ্বাস করেন না বলিয়া যোগের শক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি ঐরূপ করিয়া থাকেন। যোগের শক্তি যে আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তিকে পরাভূত করিতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্যই তাঁহার আগ্রহ ছিল। তিনি উপযুক্ত অর্থ পাইলে ইউরোপ ও আমেরিকা যাইয়া এই শক্তির পরিচয় দিয়া পাশ্চাত্য

বৈজ্ঞানিকগণকে বিস্মিত করিবেন, ইহাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। যে উদ্দেশ্যে তিনি হঠযোগের শক্তির ব্যবহার করিতেন, ভারতীয় সাধকগণের মতে তাহা বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে কোনও আলোচনা যখন এখন নিষ্ফল, তবে পাশ্চাত্য জগৎ অনুসন্ধিৎসু, তথায় এইরূপ অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইলে অনেকেই ভারতীয় হঠযোগ-সাধনার মূলতত্ত্ব জানিবার জন্য চেষ্টা করিত, একথা বলাই বাহুল্য। — হিতবাদী

অর্থ-সঙ্কটের পরিণাম

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক প্রশ্নোত্তরে স্যর বি, বি, ঘোষ বলেন যে, ১৯৩১ সালের জুন, সেপ্টেম্বর ও ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসের কিস্তীতে মোট ১৩,৪৭৫ জন জমিদার রাজস্ব দিতে পারেন নাই। ১৯৩১ সালের জুন ও সেপ্টেম্বর মাসের রাজস্ব না দেওয়ায় ৫১৮টী জমিদারী বিক্রয় হইয়াছে। ১২২টী জমিদারী বিক্রয়ের জন্য নীলাম করিয়াও খরিদ্দার পাওয়া যায় নাই। আরও প্রকাশ যে, গত সেপ্টেম্বর মাসের কিস্তীর খাজনা না দেওয়ায় বাঙ্গলা দেশের ২৫১টী জমিদারী নীলামে বিক্রয় হইয়াছে; তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় ১৩টী জমিদারী আছে। —নীহার

সম্পত্তি নীলাম

গত সেপ্টেম্বর মাসর কিস্তীর সদর খাজনা না দেওয়ায় কোন জেলায় কয়টা সম্পত্তি নীলমে হইয়াছে তাহার তালিকা—

বৰ্দ্ধমান	৪	রাজসাহী	২
বীরভূম	২	দিনাজপুর	৬
মেদিনীপুর	১৩	রংপুর	৩
হুগলী	২১	বগুড়া	৩
হাওড়া	৪	পাবনা	৯
২৪ পরগণা	৬১	মালদহ	১
নদীয়া	৭	ঢাকা	৩৮
মুর্শিদাবাদ	৮	ময়মনসিংহ	৩
যশোহর	৫	ফরিদপুর	১০
চট্টগ্রাম	১৪	বাখরগঞ্জ	৭
খুলনা	২	ত্রিপুরা	১৮

— বরিশাল

বাঙ্গালায় যৌথ-কারবার

১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে বঙ্গদেশে ২২টী নূতন কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। এই সমস্ত কোম্পানীর মোট মূলধন ৪৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ইনভেষ্টমেন্ট এণ্ড ট্রাষ্ট ২টী	১০০০০০,
প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স ৬টী	১২০০০০০,
ছাপাখানা প্রভৃতি ১টী	১০০০০০,
রাসয়নিক ১টী	১০০০০০,
ক্যানভাস ও রবার ১টী	১০০০০০,
এজেন্সী ১টী	৫০০০০,
ট্রেডিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ৫টী	১২০০০০০,
কয়লার খনি ১টী	১০০০০০০,
অন্যান্য খনি ১টী	১০০০০০০,
চিনির কারখানা ১টী	২০০০০০০,

---আনন্দবাজার

মাদকদ্রব্যের পরিমাণ

বঙ্গীয় আবগারী-বিভাগের ১৯৩০-৩১ সালের বর্ষফল প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে প্রকাশ যে, আলোচ্য বর্ষে ১১৫৫ মণ ৯ সের গাঁজা বিক্রয় হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ১৫৫৯ মণ ৭ সের' অর্থাৎ বৎসরে ৪০৩ মণ ৩৮ সের হ্রাস পাইয়াছে। মাদক-বর্জ্জন-আন্দোলন ও পিকেটিংই এই হ্রাসের কারণ। আলোচ্য বর্ষে গাঁজার দর ছিল প্রতি মণ ২০০৲ টাকা।

ভাঙ্গ —পূর্ব্ববঙ্গের লোক ভাঙ্গ খাওয়া প্রায় ত্যাগ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গেই অধিকাংশ ভাঙ্গ বিক্রয় হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে ৩৩৪ মণ ৫ সের ভাঙ্গ কাটতি হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ৩৯৭ মণ ২ সের অর্থাৎ ৬২ মণ ৩৭ সের কমিয়াছে।

চরস—আলোচ্যবর্ষে ৩৮ মণ এবং পূর্ব্ব বৎসর ৫৩ মণ ১৬ সের আমদানী হইয়াছে।

আফিম—১৯৩০-৩১ সালে ৮৮৫ মণ ১১ সের আফিম কাট্তি হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসর হইয়াছিল ৯৯৩ মণ ২১ সের অর্থাৎ ১০৮ মণ ১০ সের হ্রাস পাইয়াছে। কোন জেলায় কত হ্রাস পাইয়াছে তাহার হিসাব যথা—বৰ্দ্ধমান ১২ মণ ১১ সের, বীরভূম ৩ মণ ৩৬ সের, বাঁকুড়া ৪ মণ ৩৫ সের, মেদিনীপুর

১০ মণ ১৭ সের, হাওড়া ৪ মণ ৩০ সের, নদীয়া ৫ মণ ৬ সের, মুর্শিদাবাদ ২ মণ ৩৭ সের, যশোহর ২ মণ ১৯ সের, খুলনা ৪ মণ ২৩ সের, ঢাকা ৬ মণ ৩১ সের, ময়মনসিংহ ৫ মণ ৮ সের, ফরিদপুর ২ মণ ২০ সের, বাখরগঞ্জ ৩ মণ ১ সের, নোয়াখালী ১ মণ ২৭ সের, ত্রিপুরা ৩ মণ ৩০ সের, রাজসাহী ১ মণ ২৪ সের, দিনাজপুর ৩ মণ ২৯ সের, জলপাইগুড়ি ১ মণ ১৭ সের, রংপুর ৫ মণ ৩২ সের, বগুড়া ১ মণ ২০ সের, পাবনা ২ মণ ১১ সের, মালদহ ৩ মণ ২২ সের এবং দার্জ্জিলিং ৩৪ সের।

—হিতবাদী

দণ্ডিত নরনারীর সংখ্যা

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ প্রেনটীস আইন-অমান্ত-আন্দোলন-সম্পর্কে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দণ্ডিতের তালিকা দিয়াছেন ; তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

জেলা	সংখ্যা	তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা
কলিকাতা	৫১৭	৫৫
২৪ পরগণা	২৫৯	০
ফরিদপুর	২৪৯	০
কুমিল্লা	২৪৭	১২
হুগলী	২৩০	৬
মেদিনীপুর	২১৮	৬
ঢাকা	১৯৩	৩
দিনাজপুর	১৩৭	১৮
বর্দ্ধমান	১৩৬	৮
বহরমপুর	১৩৪	৬
জলপাইগুড়ী	১১৯	০
পাবনা	১০৯	১৪
কৃষ্ণনগর	৯৬	১৫
রাজসাহী	৭৮	০
বাঁকুড়া	৭৪	০
খুলনা	৬৩	১৮
নোয়াখালী	৫৩	০
রংপুর	৫০	০
হাওড়া	৩৩	১
বরিশাল	২৩	০
ময়মনসিংহ	১৮	০
যশোহর	১১	০
দারজিলিং	৮	০
সিউড়ী	৭	১
মালদহ	৫	০
চট্টগ্রাম	১	০
	মোট ৩১৮৩ জন	মোট ১৭৩ জন

সর্ব্বমোট ৪২৯২ জন।

গ্রেপ্তার করিয়া ১১০৬ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

—হিতবাদী

বাঙ্‌লার গুড়

গত বৎসর (১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্‌লাদেশে মোট ৩৭৬২০০ টন গুড় উৎপন্ন হইয়াছে (তন্মধ্যে ২৭২৮০০ টন ইক্ষু-গুড় এবং ১০৩৪০০ টন খেজুর, তাল প্রভৃতি গাছের রসে প্রস্তুত গুড়)। একমাত্র কলিকাতাতেই বাৎসরিক ৩২৫০০০ টন গুড় বাহির হইতে আমদানী করা হয়। এই গুড়-আমদানী বাঙ্‌লার গুড় দিয়া বন্ধ করিতে হইলে, মোট উৎপন্ন গুড়ের অবশিষ্ট রহিবে ৫১২০০ টন মাত্র। বাঙ্‌লার অন্যান্য জেলাতেও যে বহুপরিমাণ গুড় আমদানী করা হয়, তাহা ধরা হইল না ; কিন্তু তথাপি, উক্ত ৫১২০০ টন গুড়ে বাঙ্‌লার কিঞ্চিদধিক পাঁচকোটী (দেশীয় রাজ্যসমেত) লোকের একমাসও চলিতে পারে না ; সুতরাং অভাব অল্প-স্বল্প নয়—অত্যন্ত অভাব। গত বৎসর সমগ্র বঙ্গদেশে ২৩৩৪০০ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। ইহার ৫।৭ গুণ অধিক জমিতে ইক্ষুর চাষ না হইলে, বাঙ্গালীকে গুড় ও চিনির জন্য পরের কাছে হাত পাতিতেই হইবে।

— কৃষি-সম্পদ

—:০:—

চিত্রকর

(চিত্র)

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

—এক—

সে ছিল চিত্রকর। দিল্লীতে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে তখন তার মত চিত্রকর ছিল না। তার নাম আগ্রার বাদশাহের কাছে পর্য্যন্ত পৌঁছে গেছে। সেদিন সে একটা তুলি নিয়ে চিত্রের বুকে তুলির মোহন স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে—এমন সময় সংবাদ এল তার নিমন্ত্রণ—আগ্রার বাদশাহের কাছ থেকে সংবাদ এসেছে। বাদশাহের এক ওমরাহ নিজে নিমন্ত্রণ নিয়ে উপস্থিত।

আগ্রার নাম শুনতেই তার বুকের পাঁজর মথিত করে এক দীর্ঘ-নিঃশ্বাস উঠে শূন্যে মিলিয়ে গেল। দূরে আকাশের দিকে সে চেয়ে রইল!

তারপর তার দিল্লীর চিত্রশালার জন্য দরকারী সব গুছিয়ে নিয়ে আগ্রায় রওনা হ'ল!

— দুই —

বাদশাহ তার চিত্রের নমুনা দেখ্‌ল—দেখে তাকে বল্‌ল—"হাঁ ধন্য তুমি"। আমীর ওমরাহ সকলেই তারিফ করতে লাগ্‌ল।

বাদশাহ পাত্রমিত্র,আমীর ওমরাহকে বিদায় দিয়ে বললেন, "দেখ চিত্রকর, আমার অন্দরে গিয়ে তোমাকে আমার 'জয়পুরী বেগমের' ছবি আঁকতে হ'বে। শুনেছি তোমার বাড়ীও ঐ দিকেই। তোমার হাতও আছে; তোমার হাতের চিত্রে জয়পুরী-হাবভাব যেমন ফুট্‌বে অন্যে তা তো আর পারবে না। তাই তোমাকে ডেকেছি।"

চিত্রকরের দু'টো কাণ পর্য্যন্ত রক্তের প্রবাহ বয়ে গেল, সে শুধু মাথা নীচু করে সম্মতি জানাল। সে শুধু জানাল, "আমার চিত্র সম্পূর্ণ না হ'লে কেউ দেখতে চাইবেন না, —এইটুকু চাই।"

বাদশাহ—"আচ্ছা তাই হ'বে!"

—তিন—

ঠিক হ'ল—অন্দরে জয়পুরী-বেগম একখানা বৃহৎ আয়নার সম্মুখে বসবেন। আর অন্য কোঠায় চিত্রকর বসে সেই আয়নার ছবি দেখে তার ছবি আঁকবে আর পটের উপর রংএর তুলি বুলিয়ে যাবে।

চিত্রকর তার বিচিত্র রং মিশিয়ে মিশিয়ে তুলি চালিয়ে চিত্র আঁকছে, মাঝে মাঝে সে এমন রং ফুটিয়ে তুলছে যে তা সাধারণ চিত্রকরে দুর্লভ!

বেগম শুধু নিশ্চল হ'য়ে বসে আছে। ও ঘরের চিত্রকরের দীর্ঘ-নিঃশ্বাসটুকু পর্য্যন্ত তার কাণে এসে পৌঁছায়—বেগমের বক্ষ মথিত করে তার একটা প্রতিধ্বনি আকাশে মিলিয়ে যায়। দর্পণে প্রতিফলিত চিত্র যেন একটু কাঁপতে থাকে।

— চার —

চিত্রকর আঁকে আর ভাবে, বাদশাহের ঐ ঐশ্বর্য্যের ছবি না দিয়ে সেই রাজপুতনার পর্ব্বতের ছবি, সেই ঝরণাতলায় উচ্ছ্বসিত ঝরণার পাশে পাষাণ-বেদীর উপর বসে জয়পুরী বেগমের ছবি। আর সে আঁক্‌ল ও সেই রকম। দূরে সূর্য্যদেব অস্তাচলে, তার ম্লান রক্তাভ কিরণ এসে বেগমের চিত্রকে এক স্বর্গের সৌন্দর্য্য দান করল।

চিত্র শেষ হ'লে—চিত্রকরের চক্ষু ফেটে দু' ফোঁটা তপ্ত অশ্রু এসে চিত্রের চরণে ঝরে পড়ল!

চিত্রকর ভাব্‌লে—আর কেন?

বেগম চিত্রলেখাও শেষ জেনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে গেল।

কিন্তু এ কি! চিত্রকরের যে সাহায্যকারী অনুচর ঘরের বাহিরে অপেক্ষা করত—সে চীৎকার করে উঠ্‌ল,—চিত্রকর মূর্চ্ছিত হ'য়ে সেই ছবির নীচে পড়ে আছে।

বাদশাহের কাছে সংবাদ যেতেই—বাদশাহ ছুটে এসে বললেন "ও, বড় পরিশ্রম গেছে—তাই মূর্চ্ছা গেছে।" দুইজন বাঁদীর উপর শুশ্রূষার ভার দিলেন যেন কোনরকমে অযত্ন না হয় :

— পাঁচ —

বাদশাহ ছবি দেখে সন্তুষ্ট হ'লেও—অমন গম্ভীর হ'লেন কেন? ছবিতে এমন রং ফলান তো দেখি নি। বেগমকে প্রণয়-উচ্ছ্বাসে আলিঙ্গন করলে তার মুখে যে রং ফুটে উঠে এ যে সেই রং—সেই ছবি! এ কি করে চিত্রকর ফুটিয়ে তুলল।

সুস্থ চিত্রকরকে—বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন।

সে শুধু বলল,—'আমার নাম পান্নালাল,বাড়ী জয়পুর,আর কিছু জানি না।" বাদশাহ বহু প্রশ্ন করেও আর কোন উত্তরই পেলেন না। বাদশাহের ক্ষোভ ও ক্রোধ হ'তে লাগল—এমন বেয়াদব তো দেখি নি।

হুকুম হ'ল—বন্দী করে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ কর। বাদশাহ জয়পুরী বেগমকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি জয়পুরের পান্নালালকে চেন?"

বেগম একটু বিস্মিত হয়ে বলল—"জয়পুরের পান্নালাল সে কোথায়? সে কোথায়?"

বাদশাহ বলল—"সে সেই বেতমিজ চিত্রকর।" আমি তাকে আজীবন বন্দী করে রেখেছি ঐ অন্ধকার কারাগারে—সে তোমার কে?"

বেগম —"সে আমার বাল্যবন্ধু।" বলেই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে গেল। তখন আগ্রার দুর্গ-প্রাচীরে পশ্চিম গগনের আলো ক্রমে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল।

সে চিত্রকরের নাম আর কেউ শোনে নি। শুধু তার হাতের আঁকা ছবি আগ্রার প্রাসাদের দেয়ালে আজও তার অস্তিত্বের ইতিহাস বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

আদি পরিণয়

শ্রীসুকুমার সরকার

আদিম রূপের সুরা-সমুদ্রে উঠিয়াছে হলাহল।
কামনার নাগ মন্থন করে ভোগের অমৃত লাগি;
নিবিড় আঁধার অধীর আবেশে হ'য়ে ওঠে চঞ্চল
প্রবাল-শয়নে কামনা- লক্ষ্মী কাঁপিছে সহসা জাগি।
সূর্য্য প্রথম আলোক-ওষ্ঠে চুম্বিছে নীলিমারে।
মাটীর বক্ষ ভেদিয়া উঠিছে প্রথম প্রেমাঙ্কুর;
প্রথম প্রাণের স্পন্দন শুধু সমীরণে সঞ্চারে
পয়োধি-অধর স্পর্শন মাগে রহস্য-বন্ধুর!
নবোঢ়া হ'য়েছে নবীনা ধরণী অনাদি-দেবের সাথে!
বিরহ-তিমির-তোরণ-দুয়ারে মিলন-দীপালি জ্বলে;
না-ফোটা তারকা প্রকাশ ব্যথার প্রথম পুলকে মাতে
সারা সৃষ্টির তনুর অণুতে মদিরোৎসব চলে!

আমি কবি ছিনু সে মহামিলনে প্রথম মিলন-ডোর!
স্বপ্ন কুসুমে হ'য়েছিনু মালা অদৃশ্য-লোকে বসি;
প্রণয়-প্রগাঢ় পরাগ-মন্ত্রে কুসুম-কণ্ঠ মোর
বিবাহ-লোকের পুরোহিত সম উঠেছিল উচ্ছ্বসি!
সে দিন আছিনু অশরীরী সুর নবীন সৃজন সাথে।
সে দিনের কবি শরীরী হ'য়েছি যুগ যুগান্ত পরে;
তবুও মনের আধ-বিস্মৃত স্বপন-গভীর রাতে
আজো হেরি যেন আদিম দেবতা আদি পরিণয় করে!
পুরানো যুগের বাসর-স্বপ্ন আজো মোর চোখ ভরি'
স্তিমিত দীপের এ সাধ আঁধারে রহস্য হ'য়ে ভাসে;
পুরানো জগতে ছায়া হ'য়ে যেন ফিরিতেছি সঞ্চরি
বিরাট পয়োধি হেরি দিশি দিশি তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে।

বিষাদ-যোগ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুস্তক। ইহা প্রতি জীবের জীবনের পথপ্রদর্শক, ভবার্ণবের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র।

অনেকে গীতার অনেক রকম পাণ্ডিত্য-পূর্ণ টীকা লিখিয়াছেন, অনেক বড় বড় পণ্ডিত গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু ইহা সত্বেও এমন সময় কখন আসিবে না, যখন গীতার নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে না। গীতা জগতের সমক্ষে নানারূপে রঞ্জিত।

গীতার বহু বিভিন্ন ভাষ্য, বিভিন্ন টীকা রচিত হইয়াছে এবং আজও হইতেছে। ইহার দ্বারা এই বুঝা যায় যে, গীতা-কথিত দার্শনিক তথ্যগুলির ঠিক অর্থ কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যের দ্বারা সম্ভব নহে, ইহা একমাত্র সাধনার দ্বারা অনেকাংশে বা কতকাংশে সম্ভব।

গীতার যথার্থ অর্থ বুঝিতে হইলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই বাণীর অনুসন্ধান করা উচিৎ, তাঁহার বাণীই গীতার প্রধান টীকাস্বরূপ।

বিদ্বৎসমাজে অনেক সময় গীতার তাৎপর্য্য লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়।

এই অবস্থায় গীতা কি বলেন, তাহা গীতাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিৎ, কারণ এইরূপ অর্থই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই সহজ সুগম পথ ধরিয়া চলিলে গীতাই প্রকৃত গীতার্থ সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন। সত্য সর্ব্বদাই স্বয়ং প্রকাশ।

গীতা "যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্"। গীতা—১৮।৭৫

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

শ্রীমদ্ভাগবত—১।৩।২৮

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥

—শ্রীমদ্ভাগবত—১।২।১৭

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিজের কথা শ্রবণ করেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই ঐ শ্রবণকারীদিগের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহাদের কাম-ক্রোধাদি অমঙ্গলকর বস্তু সকলকে বিশেষরূপে শিথিল করেন, অর্থাৎ তখন সাধকের চিত্তের উপর আর কাম-লোভাদির প্রভাব থাকে না।

সেই শ্রদ্ধার বলে, সাধকের তমোগুণের তিরোভাব হয় এবং সেই সঙ্গে সর্ব্ববিধ সংশয় দূর হইয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় হয়, যদ্দারা—

"ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানং............জায়তে।"

গীতা জীবের জীবনধারার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রাখিয়া, সাধকের মনে প্রত্যক্ষানুভূতি ফুটাইয়া তোলে।

গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাধারাকে একটী সংহত মূর্ত্তি দান করিয়াছেন, যাঁহাতে জীবন-সমস্যার সমাধানের উপায় পরিষ্কার করিয়া বলা আছে।

সুতরাং আমাদের চক্ষে, অর্থের তর্ক অপেক্ষা আস্তিক্য বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া, সাক্ষাদ্‌ভগবৎপদ্মনাভ মুখ-বিনিঃসৃত বাক্যের অনুসরণ করিয়া, সাধক শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের মত সমস্ত সংশয় ছেদন করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া বলিতে পারি—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

—গীতা-১৮।৭৩

শ্রীভগবানের বাক্য নিঃসন্দিগ্ধরূপে শ্রবণের ফলে, অর্জ্জুনের আত্মজ্ঞানস্বরূপ স্মৃতি উদিত হওয়ায়, তাঁহার মোহময় বিকার বিদূরিত হইল এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জীবনে ভগবদাজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করিবেন না।

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গন এবং জীব তাহার কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান আছে।

জীব ধীরে ধীরে যে প্রকারে মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়, কুরুক্ষেত্ররূপ আদর্শ রণাঙ্গনে আদর্শ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ

আদর্শ শিষ্য অর্জ্জুনকে তাহারই একখানি আদর্শ ছবি দেখাইয়া গিয়াছেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ জ্ঞাতিহত্যার সম্ভাবনা দেখিয়া অর্জ্জুনের মনের ভিতর অনেকরকম প্রশ্ন উদিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রকে বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিল।

বিষাদে, সন্দেহে, আশঙ্কায়, জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে সাধকের প্রাণ যখন দিশাহারা হইয়া যায়, তখনই সে বিষাদ-ভরা ক্লান্ত, দিগ্‌ভ্রান্ত হৃদয়টুকু লইয়া ভগবানের দ্বারস্থ হইয়া বলে—

কার্পণ্য দোষাপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম সংমূঢ় চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধিমাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

—গীতা—২।৭

সাধকের চিত্ত ধর্ম্মসংমূঢ় হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম কি, কর্ত্তব্য কি, অকর্ত্তব্য কি, বিচার করিবার শক্তিকে সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। কার্পণ্যদোষে,তাহার শক্তি, উৎসাহ, উদ্যম দুর্ব্বল হইয়াছে। নিজের ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা, বিষম সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই দেখিয়া, বিরাট শক্তির নিকটে সাধক সাহায্যপ্রার্থী হয়।

ভগবান প্রত্যেক জীবকে মুক্তির দিকে লইয়া যাইবার জন্য তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া জীবের সারথ্য স্বীকার করিয়া তাহাকে মুক্তিমার্গে লইয়া যান।

বিপদের ভিতর সম্পদ লুক্কায়িত থাকে। অমঙ্গল সাধনের দ্বারা ভগবান কাহাকেও বিপন্ন করেন না। বিপদ দ্বারা মতি-ভগবন্মুখী হইয়া ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়। অসুখ অশান্তি ও অসুবিধার মধ্যস্থলে সাধক বিশ্বসারথির সারথ্য স্বীকার করিয়া, সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহে ও তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া বলে, "হে প্রভু, আমি তোমার শিষ্য-শরণাগত, আমি অন্য কাহাকেও জানি না, তুমি আমায় শিক্ষা দাও ও রক্ষা কর।

অর্জ্জুন এক্ষনে আপনাকে দীনভাবাপন্ন জানিয়া জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের সখ্যত্ব ছাড়িয়া, শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। এইরূপ দৈন্যভাব না থাকিলে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করা একপ্রকার মৌখিক ব্যাপারে পরিণত হয়; সুতরাং শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। এমনি করিয়া যতদিন না নিজের জীবভাবকে নিজের ব্রহ্মভাবের শিষ্যত্বে নমিত করা যায়, ততদিন সাধনার পথ রুদ্ধ থাকে।

নির্ভরতা না আসিলে শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না।

প্রাণে যখনই সংশয় আসিবে, তখনই হৃদয়স্থ গুরুকে সে সংশয়ের মীমাংসা করিবার জন্য প্রার্থনা করিবে।

জীব, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য কাতর হইলে, শ্রীভগবান তাহাকে গুরু দেখাইয়া দেন, যিনি সাধকের তৃষ্ণা ও ও ব্যকুলতা অনুযায়ী তাহাকে শক্তি ও জ্ঞান দান করেন। গুরু ভগবৎশক্তি আকর্ষণ করিয়া শিষ্যের হিতার্থে তাহা নিয়ত দান করেন। জীব যখন জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে আসিয়া দিশাহারা হইয়া আপনার জীবন বৃথা হইয়া যায় দেখিয়া ব্যাকুল হয়, রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে স্তব্ধহৃদয়ে দাঁড়াইয়া জীবনে জয় পরাজয়ের আশঙ্কায় সন্দিগ্ধভাবে অপেক্ষা করে, তখনই তাহার চৈতন্য প্রবুদ্ধ হয় এবং সে নিজের কর্তৃত্বরূপ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, বিশ্বনিয়ন্তার নিকট কাঁদিয়া বলে— "প্রভু, জগৎগুরু, আমি বিপন্ন, পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমাকে সাহায্য করিবার কেহই নাই, আমার রক্ষা কর, আমায় পথ দেখাইয়া দাও, আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দাও।"

সেই মহামুহূর্ত্তে সাধকের হৃদিস্থিত নারায়ণ জাগ্রত হইয়া উঠেন এবং তাহার নিকট স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বলেন—

"মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ় ভাবো।"

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান তখন স্নেহপূর্ব্বক সাধককে বলেন—"তুমি পৃথিবীর বিকট রূপ দেখিয়া ভীত হইও না, তুমি তোমার দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ কর, আমি তোমার সহায়। তুমি যাহা এখন সঙ্কট বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, উহা বস্তুতঃ সঙ্কট নহে, উহা দৌর্ব্বল্যমাত্র ও অনিত্য, ইহাতে তুমি অভিভূত হইবে না।"

ইহাই বিষাদ যোগ। এইখান হইতে গীতার আরম্ভ। সাধক মাত্রেরই প্রাণে সর্ব্ব প্রথম এই ভাব উদিত হয়। এইখান হইতে সাধক তাহার মনোময়-ক্ষেত্রে গীতা শুনিতে পায়।

ভগবৎলাভের জন্য প্রাণের বিষাদময় ভাব হইতে সংযুক্ত

ভাব অবধি গীতা। বিষাদ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত গীতা।

জীব যখন এই ধ্বনি শুনিতে পায়, তখন সে বুঝিতে পারে যে, তার মুক্তির আর অধিক বিলম্ব নাই। ইহাই বিষাদের গূঢ়তত্ত্ব। সাধক তখন আপনাকে আপনার ভিতর খুঁজিয়া থাকে।

তখন সহসা বিদ্যুতের মত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবের আত্ম-শক্তি জাগিয়া উঠে এবং সে সাঙ্খ্য যোগ শিখিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। তখন সে জগতের সমস্ত বিষয়ে —শব্দে, স্পর্শে, রূপে, রসে, শীতে, উষ্ণে, আলোকে ও অন্ধকারে, সুখে, দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে, করুণা ও নিষ্ঠুরতায়, দয়া ও কার্পণ্যে—ভগবানকে অন্বেষণ করে এবং খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে ও ভগবানকে পাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠে। এই অনুসন্ধানে ও বিশ্বাসের ফলে তাহার ব্রহ্ম জাগিয়া উঠেন।

———:*:———

সম্মোহিতা

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীমতী উষা মিত্র

বিশ

শীতের মধ্যাহ্নে মাসীমাতা দালানের উপর আস্তৃত মাদুরে দেহভার ন্যস্ত করিয়া আরামে শুইয়াছিলেন, দাসী পায়ে মালিশের তৈল মর্দ্দন করিয়া দিতেছিল। কয়েকজন প্রতিবেশিনী তাঁহার নিকটে বসিয়া পান চিবাইতেছিলেন। প্রত্যহ উহার দরবার এইরূপে ভরিয়া থাকে এবং রমেনের অন্দরে আসিবার পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া যায়। এই দরবারে পাড়ার বধূ হইতে বালিকা কন্যার চাল চলন, হাব-ভাব, চরিত্রের সমালোচনা হইয়া থাকে। যে দিবস কোন বিশেষ কার্য্যে এই বৈঠক বসিতে পায় না, শুনা যায় সেদিন মাসীমাতার আহার্য্য বস্তুর পরিপাক হয় না। অদ্য আলোচনার বিষয় ছিল সুলেখা। যদিও তাহাকে লইয়া আলোচনা প্রত্যহই কিছু না কিছু হইত, তথাপি উহার অদ্যিকার অপরাধের গুরুত্ব অন্যদিন অপেক্ষা অনেক বেশী, সেইজন্য মিষ্ট রসের প্রাচুর্য্যটুকু মাসীমাতা সম্পূর্ণ উপভোগ করিয়াও তৃপ্ত হইতেছিলেন না বাসনের সিন্দুক হইতে কি বাহির করিবার নিমিত্ত সুলেখা চাবি চাহিয়াছিল। প্রথমে তিনি কথাটায় কর্ণপাত করেন নাই, কারণ আপনার অধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য তখন অতিমাত্রায় ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু সুলেখাও যখন ছাড়িল না তখন দস্তুর মত বকুনির পর তাহাকে উহা দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল— কিন্তু মাসী এ অপমান সহজে ভুলিতে পারিতেছিলেন না। এমনই করিয়া না কি প্রত্যেক কার্য্যের সূত্রপাত হইয়া থাকে, এই তো আজ বাসনের চাবি চাহিল, কাল হয় তো ভাঁড়ারের চাবি চাহিবে, পরশু হয় তো উহাকে ঠেলিয়া সকল কর্ত্তৃত্বের দাবী করিয়া গৃহিণীর আসন গ্রহণ করিবে—বৈঠকে তিনি এই মর্ম্মে কথাটা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, 'এ সবে তোর দরকার কি, জমিদারের বৌ হয়েছিস এই মনে করে খুসী হ'য়ে থাক্‌বে না চাবি চাহিয়া বসিল।' গৃহিণী রসান দিয়া বলিয়া যাইতেছিলেন শ্রোতারাও মাধুর্য্য সম্পূর্ণ উপভোগ করিয়া লইতেছিলেন।

গালে হাত দিয়া জনৈক রমণী বলিলেন, "বল কি দিদি সে দিন ঘরে উঠেছে আজ চাইল কি না চাবি। কি কাণ্ড, কালে কালে কতই না দেখ্‌ব, কিন্তু তোমায়ও বলি অমন ধেড়ে বৌ আনলে সে কি পোষ মানে।"

অপর একজন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "ছেলেরও ওতে শেখানি আছে ভাই, নইলে বৌর সাধ্যি কি চাবি চাইবার।"

রমেনের মাসীমাতা বলিলেন, "এমন দুর্নাম শত্রুরেও আমার রমেনকে দিতে পারে না ভাই, ওকে সে পোঁচে না কি! তা ছেলে আমার খুব ভাল দিদি, ঝোঁকের বশে করলে বটে বিয়ে, কিন্তু ওকে বোর ঘরে শুতে কেউ দেখে নি।"

সবিস্ময়ে রামের মাতা বলিলেন, "ও মা সে কি কথা গো বড় গিন্নী নতুন বিয়ে এ কি কাণ্ড একদিনও রমেন বৌমার ঘরে যায় না।"

হাসিয়া মাসী বলিলেন, "না মা ছেলে আমার বড় ভাল একদিনও যায় নি, বরং ঐ কালামুখী দিনরাত ওর পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়, জলটা, পানটা, খাবারটা সব নিজের হাতে করে নিয়ে যায় মাগো ঘেন্নায় বাঁচি না এ কি বেহায়াপনা।"

"কেন মাসী ছেলের হাতে হাতে যদি সব গুছিয়ে দেয় সে তো ভালই। শুনেছি বৌটী না কি বড় কর্ম্মিষ্ঠা, লক্ষ্মী।"

মুখ বিকৃত করিয়া মাসী বলিলেন, "এত দিন যে সে ছিল না, তা বাড়ীতে বাজারের খাবার কি চলত? কি জানি বাপু ওসব আদিক্ষেতা দেখ্‌তে পারি না, ভারী কর্ম্মিষ্ঠা কৈ এই কতক্ষণ তোমরা রয়েছো দিলে একটা পান এনে।"

"কেন এই মাত্তর যে ডিবে ভরে দিয়ে গেছল', ছাগলের মত চিবুলে সে বেচারা কি করবে।"

"কেন করবে না। তবে যে ঝি পান সাজত তাকে ছাড়িয়ে দিলে কেন, যদি নিজের যোগ্যতাই নেই, সাধে কি গাল বেরোয়। বলি ও নবাবকন্যে শুনতে পাচ্ছ?"

ছাতের ওপর বসিয়া সুলেখা ননদের জন্যে উলের কোট বুনিতেছিল, শাশুড়ীর মিষ্ট সম্ভাষণ কর্ণে প্রবেশ করিতে বিলম্ব হইল না, কারণ ইহা প্রাত্যহিক ঘটনা। প্রথম প্রথম অসহ্য হইলেও এখন উহা প্রায় সহিয়া গিয়াছিল। না সহিলে চলিবে কেন, স্বেচ্ছায় যে সে উহা বরণ করিয়া লইয়াছে। নীচে নামিয়া শান্তকণ্ঠে লেখা জিজ্ঞাসা করিল, "ডেকেছেন মাসীমা?'

মাসীমাতা উত্তর দিলেন না।

কতক্ষণ পরে পুনরায় বলিল, "আমায় ডেকেছেন।"

ঝঙ্কার করিয়া মাসীমা বলিলেন, "হাঁ গো হাঁ ডেকেছি, ডেকেছি, কতবার বলব? একটু দাঁড়াতে পার না, টেরেণ ফেল হ'য়ে যাবে না কি। চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পাচ্ছ না, পান যে নেই।"

লেখা নীরবে পানের কৌটা হাতে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে উঠিতে শুনিতে পাইল, "হা ঘরের মেয়ে কি না জমিদার-বাড়ীর কথা কি বুঝ্‌বে। একবার পান দিয়ে মনে করলে, কি কর্ম্মই না করেছি।"

কৌটা শুদ্ধ সাজা পান রাখিয়া ফিরিতে গিয়া মাসী-মাতার তীব্র মন্তব্য শুনিয়া আহত অন্তঃকরণে লেখা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"বলি নবাব্‌-কন্যে রাতদিন কেতাব নিয়ে বসে না থেকে ঘরসংসারগুলো দেখ এক একবার।"

অনুত্তেজিত কণ্ঠে লেখা বলিল, "এখন তো কোন কাজ নেই, তাই ওপরে গেছলুম।"

মুখ বাকাইয়া মাসীমা বলিলেন, "খাবার করা হ'য়েছে।"

"হাঁ।"

"তবে আর কি উদ্ধার করে দিয়েছ আমায়।"

বধূর মুখ দেখিয়া রামের মা দুঃখিত হইলেন, এমন সুবর্ণপ্রতিমা কর্ম্মিষ্ঠা শান্ত মেয়ের অদৃষ্টে বিনা অপরাধে এ কি লাঞ্ছনা; কথাটাকে চাপা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ মা তোমার বাবার বড় অসুখ ছিল না? এখন একটু সেরেছেন।"

পিতার কথায় উহার নেত্র অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। উত্তরে বলিল, "একটু সেরেছেন কাকীমা এইবার হাওয়া বদলাতে যাবেন।"

মাসীমাতা বিনা কারণে রাগিয়া উঠিলেন, কেহ যদি লেখাকে একটু স্নেহের বাক্য বলিত, তিনি সহিতে পারিতেন

না। কর্কশকণ্ঠে মাসীমা বলিলেন, "ওর কথা শোন কেন হাওয়া বদলাতে যাবে না হাতী। মেয়ে বিক্রী করে তো, পাঁচহাজার টাকা নিলেন তা মিন্‌সে খুব সেয়ানা আছে, কিন্তু সে টাকা কি আজও বসে আছে।"

একথা বহুবার স্বামী ও মাস-শাশুড়ীর মুখে শুনিয়া শুনিয়া লেখার একরূপ সহ্য হইয়াই গিয়াছিল, কিন্তু আজ এতগুলা লোকের সামনে, পিতার এ অপমানের কথা শুনিয়া বেচারী মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। কোন কিছু যখন সীমারেখা ডিঙ্গাইবার উপক্রম করে তখনই উহা অসহনীয় হইয়া ওঠে। লেখার আজ হইয়াছিল তাহাই। কোন দিকে না চাহিয়া লেখা উপরে উঠিয়া আসিয়া গৃহদ্বার ভেজাইয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সে যে নিজের মনের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করিয়া ইহাদের সংসারে মানাইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে, তবে বারে ব রে আঘাতে তার সেই সাধনাকে ধূলায় লুটাইবার এ প্রয়াস কেন ইহারা করিতেছে প্রভু। স্বামীকে লেখা চিনিয়া লইয়াছিল সেই দিন যে দিন পিতার অসুস্থ সংবাদ শুনিয়া উহাকে দেখিবার আকুল আগ্রহ লইয়া তাঁহার অনুমতি চাহিতে গিয়া বাক্যের নিষ্ঠুর কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। আর সে দিন মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর কোন দিন পিত্রালয়ে যাইবার জন্য অনুরোধ করিবে না। ধরিত্রীর ন্যায় সহনশীলা বাঙ্গলা দেশের নারীর পক্ষে এই স্পৃহাটা দমন করা কি এতই শক্ত। উহার বাস্তব অবস্থাটুকু স্বামী সে দিন চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন, জমিদার-বধূ, কাঙ্গাল কন্যা-বিক্রেতার কাছে যাইতে পারে না। ইহাতে জমিদারের মান্যের লাঘব হইবে। সে যে জমিদারের বধূ হইবার সৌভাগ্য বিধাতার নিকট হইতে কায়েমী করিয়া আনিতে পারিয়াছিল ইহাই যথেষ্ট মনে করিয়া তাহার খুশী হইয়া থাকা কর্ত্তব্য, ইহার অধিক কামনা করা কোন মতেই উচিত নয়। সত্যই কি তাহাই। সুলেখা জোর করিয়া মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, সত্যই তো তাহার কামনার কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। কামনা বাসনা আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবিষ্যতের রঙ্গীন চিত্র, পুষ্পিত কল্পনা ভ্রাতার উদ্ধারকল্পে যে দিন স্বেচ্ছায় ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে, তাহার ভাবপ্রবণ, সৌন্দর্য্যপিপাসু হৃদয় ও নির্ম্মল চরিত্র এই লম্পট মদ্যপ কদাকার জমিদারের চরণে নিবেদিত করিয়াছে—জীবনে-মরণে তাঁহার সহিত অচ্ছেদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে সে কি জমিদার-ঘরণী হইবার জন্য। এতবড় ত্যাগ-স্বীকারের পশ্চাতে কি তাহার কোনরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে। সুলেখা আপনার মনের গোপন কোণগুলি তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়া দেখিল এখনও তাহার হৃদয় মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে না—এখনও তাহাতে প্রেমের ফল্গু বহিয়া যাইতেছে—এখনও তাহার হৃদয়ভরা আকণ্ঠ পিপাসা রহিয়াছে। জোর করিয়া অস্বীকার করিতে চাহিলেও যে উহার নিবৃত্তি নাই—শেষ নাই। যুক্তকরে সে ভগবানের নিকট বল চাহিল—বল দাও প্রভু, শক্তি দাও। মর্ত্তের দেবতা, আকাশের দেবতা, যে যেখানে আছ আজ তাহার সহায় হও, মনে বল দাও সে যেন স্বামীকে ভালবাসিতে পারে তাঁহার শত অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়া একমাত্র উঁহাকেই দেবতার আসনে বসাইয়া পূজার পূত অর্ঘ্যটুকু উঁহারই চরণে অর্পণ করিতে পারে। শক্তি দাও প্রভু সকল সহিবার সহিষ্ণুতা দাও। স্বামীকে ভক্তি করিতে হইবে তিনি যাহাই হউন, ভালবাসিতে হইবে। কেন সে পারিবে না, তাহাকে নিশ্চয় পারিতে হইবে, কুন্তলার পার্শ্বে দাঁড়াইবার স্থান করিয়া লইতে হইবে।

হঠাৎ সুলেখার চিন্তায় বাধা পড়িল, ইলা আসিয়া বিস্ময়ে উহার অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদছ কেন বৌদি মাসী বুঝি বকেছে?"

ক্ষিপ্রহস্তে অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া লেখা বলিল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে ইলা?"

"তুমি লুকিও না, বুঝেছি, আবার বকেছে দাও তো দাদার খাবার।"

অপর গৃহ হইতে খাবারের থালা ও জল আনিয়া সুলেখা ইলার হস্তে তুলিয়া ধরিল। দিবানিদ্রা সাঙ্গ করিয়া রমেন অন্দরে আসিতেছিলেন, ইলা পথ আগুলিয়া বলিল, "এখন ভেতরে যেতে হ'বে না এই ঘরে বসো, খাবার খেতে খেতে আমার কথাগুলো শুনবে।"

"তোর আবার কথা কি রে?" বলিয়া রমেন হাসিয়া উঠিল।

"তামাসা নয় দাদা ও ঘরে চলো।"

ঘরে লইয়া একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট করাইয়া ইলা বলিল, "বড় বৌদিকে তুমি ওঁরই কথায় বিদেয় করে দিয়েছিলে, তারপর বাইরে গিয়েও সে বেচারীর নিস্তার নাই, বাক্যের যন্ত্রণায় শেষে দেশ পর্য্যন্ত ছাড়ালে, এখন বিয়ে করে এনেছো আমি যতদূর বুঝ্ছি এও তোমার ঐ মাসীর জ্বালায় কোন দিন গলায় দড়ি দেবে, এ যদি না হয় তবে আমার সব কথা মিথ্যে।"

উপেক্ষাভরে রমেন বলিল, "যায় কেন মাসীর সঙ্গে লাগ্তে।"

"বল কি দাদা, এত যে ওর ওপর অত্যাচার হচ্ছে, কিন্তু কেউ কোনদিন ওর মুখ থেকে টু শব্দ শুনতে পেয়েছে? অমন শিক্ষিত মেয়ে তার কপালে কি না এই দুর্দ্দশা।"

"তাই না কি রে।"

উত্তেজিত ইলা বলিতে লাগিল, "নয় তো কি। প্রবেশিকা পাশ করেছে, কি চমৎকার গান করে—"

বাধা দিয়া বিস্মিত রমেন জিজ্ঞাসা করিল, "লেখা পড়া জানে না কি? কে জানে, এক রান্না ছাড়া আর যে কিছু জানে এ কথা জানতুম না, বেশ তো শোনা না একদিন গান।"

"ওরে বাপ্রে ছোট বৌদি গাইলে মাসী কি আর রক্ষে রাখ্বে। তখুনি হয় তো গলা টিপে ধরবে, আর জান দাদা ও হা-ঘরের মেয়ে নয় ওদের সব ছিল।"

বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে রমেন বলিল, "তবে কোন রাজা-রাজড়ার ঘরের মেয়ে রে? সেই জন্যে বুঝি ওঁর বাবা পাঁচ হাজার টাকায় মেয়ে বিক্রী করলে?"

পান লইয়া সুলেখা আসিতেছিল কথাটা শুনিতে পাইল, কিন্তু এই মাত্র না কি নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করিয়া স্বামীকে ভক্তি করিতে, ভালবাসিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, তাই এই আঘাতের উগ্রতা হৃদয়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। যে মাটীতে সীতা সাবিত্রী জন্মিয়াছিলেন এবং তার দিদি কুন্তলা জন্মিয়াছেন, ভারতের সেই মাটীতে যে তাহারও জন্ম তবে এই তুচ্ছ, সামান্য আঘাতে সে এত অসহিষ্ণু ও অধৈর্য্য হইয়া উঠে কেন। না, নারী সে অধৈর্য্য হইলে চলিবে না মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়া পানের ডিবা টেবিলে রাখিয়া সুলেখা ফিরিল।

অদ্য রমেনের চিত্ত কিছু প্রসন্ন ছিল, যদিও একটা উত্তেজনা এবং খেয়ালের বশে উহাকে বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু ভালবাসিতে পারে নাই।

সাময়িক উত্তেজনা না কি অবসাদের বিস্তীর্ণ বালুকায় অন্তর্হিত হইতে বেশী সময়ের অপেক্ষা করে না, মুহূর্ত্তমাত্র সময়ই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। তাই সেই উত্তেজনার বন্যা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল বহুদিন পূর্ব্বে, কোন এক ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তে। স্ত্রীর বিষয় রমেন চিন্তামাত্র করে নাই কোন দিনই, স্ত্রী অন্তঃপুরে থাকিবে, এক আধদিন হয় তো একটু কথা বলিবে, ব্যস্ কর্ত্তব্যের তো ঐখানেই সমাপ্তি। স্ত্রীর গোলাম হওয়া কি জমিদারের মানায়। তবে আজ না কি ইলার নিকট ঐ মূক নারীর কতকগুলা গুণের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাই রমেন স্বীয় স্বভাববহির্ভূত সামান্য একটু আগ্রহ জানাইয়া বলিল, "চলে যাচ্ছ কেন ছোট বৌ, বোস না একটু।"

অবাক্-বিস্ময়ে সুলেখা ইলার নিকট বসিয়া পড়িল।

"তুমি না কি লেখা পড়া বেশ জান? গান বাজনাও জান, এ কথা আমায় বল নি তো কোন দিন।"

"তুমি তো জনতে চাও নি কোন দিন দাদা।"

"তাও বটে, তা হ'লে একদিন শুনিয়ে দে ইলি।"

"তাই দেবো" বলিয়া ইলা উঠিয়া দাড়াইল। "তুমি বস, বৌদি আমি এলুম বলে" বলিয়াই ক্ষিপ্রপদে সে চলিয়া গেল।

এত বড় গুণের মালিককে ভাল করিয়া দেখিতে গিয়া রমেনের শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়া উঠিল, "তোমাকে না হাজার বার বারণ করেছি এমন মোটা বিশ্রী কাপড় ব্যবহার করতে।"

সহজকণ্ঠে লেখা বলিল, "কিন্তু এ যে দেশের তৈরি, পরতে আমার কষ্ট হয় না।"

"তোমার পরতে কষ্ট না হ'তে পারে, কারণ বাপের ঘর থেকে তা অভ্যেস আছে, কিন্তু এতে আমার মাথা হেঁট্ হয়। বড় জেদী তুমি।"

"আর না হয় পরব না, তবে এ শাড়ীগুলো পরতে আমার বড় ভাল লাগে।"

"আবার সেই কথা, বুঝেছি, সেই জন্যে মাসীর তোমার

সঙ্গে বনে না, এর জন্যেই না মেয়েদের লেখা পড়া শেখান ভালবাসি না। লেখাপড়ার গুণ তো এই জেদ আর স্বাধীনতা।"

লেখার মুখ ক্রমশঃ পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, প্রত্যেক কার্য্যেই প্রত্যেক কথায় কি নীচ ভাবের ইঙ্গিত, অপমান, কি ভীষণ; কিন্তু এত যে জানা কথা তবে আজ কিসের এ জ্বালা অপমানের কেন এত তীব্র ব্যথা। সুলেখা উঠিয়া দাঁড়াইল।

কি ভাবিয়া রমেন সহসা স্ত্রীর হাত ধরিয়া কিঞ্চিৎ অনুতপ্তস্বরে বলিল, "রাগ হলো বুঝি ?",

স্বামীর স্পর্শে আড়ষ্ট হইয়া লেখা দাঁড়াইয়া রহিল।

স্ত্রীর শুষ্ক, ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া রমেন বলিল, "তুমি দেখতে তার চেও ঢের সুন্দর, কিন্তু তোমার মধ্যে প্রাণ নেই, শিবানীর মধ্যে তা আছে।"

ঘৃণায় লেখার নেত্র দীপ্ত হইয়া উঠিল।

"আচ্ছা বৌ তোমার বাবা তো গরীব, তবে তোমাকে লেখা পড়া কেমন করে শেখালেন ?"

সংযত কণ্ঠে লেখা উত্তর দিল, "আগে ছিলেন না।"

"ওই তো তোমার সঙ্গে বনে না, আমার কাছে বড় মানুষী না জানালেই নয়, পাঁচ হাজার টাকা যে আমিই তাঁকে দিয়েছি এতো আর মিথ্যে হ'বার নয়!"

লেখার শান্ত নেত্র উৎকট বেদনায় জ্বলিতে লাগিল— মস্তক ঘুরিতে লাগিল।

রমেন পুনরায় প্রশ্ন করিল, "কি আর যে বড় কথা কচ্ছ না ?"

"বলবার যে আমার আর কিছু নেই।" লেখা পুনরায় উঠিল।

"যেও না শোন।"

লেখা বলিল, "তরকারী কুটবার সময় হ'য়েছে" বলিয়াই বাহির হইয়া গেল।

রমেন ক্রোধে ফুলিতে লাগিল, দরিদ্র কন্যার এত তেজ কিসের ? আজ উহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিয়াছিল, কোথায় খুসী হইবে, না অবজ্ঞাভরে চলিয়া গেল।

এমন সময় রমেনের বৌদি আসিয়া ডাকিলেন, "ঠাকুরপো।"

"কে বৌদি ? এতদিন পরে ?"

ভূমিকামাত্র না করিয়া কুন্তলা বলিল, "ইলার সম্বন্ধ ঠিক করেছি, বিয়ের উদ্যোগ করো।"

প্রফুল্লমনে রমেন বলিল "আমি কি জানি, সে সব তোমরা ঠিক করো।"

"বেশ তাই। ভটচাজ্জকে তা হ'লে ডেকে পাঠাই।"

"পাঠাও সব ঠিক হ'লে আমায় বলো।"

"তুমি বরের কথা কিছু জিজ্ঞেসা করলে না যে ?"

তরলকণ্ঠে রমেন বলিল, "জানবার দরকার আছে বলে মনে করি না।"

"কিন্তু আমার তো জানাবার দরকার থাকতে পারে।"

নির্লিপ্তের ন্যায় রমেন বলিল, "তবে বল।"

"নরেনের সঙ্গে বিয়ের ঠিক করেছি।"

রমেন স্তম্ভিত হইল, কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া বলিল, "বেশ।"

"এতে তোমার কোন অমত নেই ?"

"একটুও না।"

"নরেনকে তুমি ভাল চোখে ——"

"—হ্যাঁ দেখি না বৌদি তবে এটাও ঠিক জানি ইলার ভাল-মন্দর কথা তুমি যত ভাববে আমরা তা ভাবব' না, ওকে যে সত্যিই তুমি ভালবাস—ওকে যে তুমি মায় পেটের বোনের মতই মানুষ করেছ; আর স্বর্গীয় কর্ত্তামা'শায়ের শেষ অনুরোধটা তো আমি উপেক্ষা করতে পারি না— আমি যত বড়ই অত্যাচারী, পাপী হই না—ইলার বিয়ের ভার তিনি তোমার ওপরই দিয়ে গেছেন—আমার ওপর নয়।"

একুশ

ক্রমে ইলার বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। ইলাকে সম্মত করাইতে কুন্তলাকে অনেক খানি বেগ পাইতে হইয়াছিল। কুন্তলা ইচ্ছা করিয়া এ কয়দিন জমিদার গৃহে রহিয়া গেল। মাসীমাতা ইহাতে অসন্তুষ্ট হন নাই বরং আগ্রহই দেখাইলেন এবং তাঁহার পথের কণ্টককে যে স্থানান্তরিত করিতে উদ্যত, সেই কুন্তলার প্রতি তাঁহার কঠোর চিত্ত ইহাতে কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হইল। কুন্তলা

এবং ইলার আগ্রহে রমেন বাধ্য হইয়া সুলেখার পিতা ও ভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইল।

কথায় কথায় একদিন রমেন জিতেনকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিবাহের পরে উহারা কোথায় যাইবে; কি করিবে।"

উত্তরে জিতেন বলিল, "সম্প্রতি বাবাকে চেঞ্জে নিয়ে যাচ্ছি; সেখানে বাবা আর দিদিকে রেখে আমি দেবীগাঁয়ে ফিরে যাব।"

"আপনার আর বোন আছেন না কি? কই এ কথা তো শুনি নি।"

হাসিয়া জিতেন বলিল, "আমার আপন সহোদরা নন, আমার দিদি আপনার বৌদিদি।"

"ওঃ" বলিয়া তৎপরেই অন্যমনস্কভাবে রমেন জিজ্ঞাসা করিল, "দেবীগাঁয়ে আপনি কাজ করেন?"

"সব দেখা-শুনা করতে হয়।"

"নায়েব আপনি?"

"না।"

"তবে?'

"ও গাঁ টুকু আমাদেরি কি না তাই দেখা শোনা সব করতে হয়।"

অসহ্য-বিস্ময়ে জমিদারের চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, এ বলে কি। পাগল না কি। যে লোকের বাবা টাকা নিয়া কন্যার বিবাহ দেয় তাহার এমন জমীদারী থাকা কি সম্ভব? তাঁর জমীদারীর মত তিনটা সিরাজ গাঁ একত্র করিলেও যে দেবীগাঁয়ের সমকক্ষ হয় না।

"দেবী গাঁ সবটাই না—"

"না সবটুকুই।"

এই তো পরিষ্কারভাবে বলিল, ভাবিল তবে শ্বশুর মহাশয় পাঁচ হাজার টাকা লইয়াছিলেন কেন? কে এ প্রহেলিকার উত্তর দিবে। রমেন স্থির করিল উত্তমরূপে সন্ধান লইতে হইবে। কিন্তু ইলাকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় যখন তাহার শ্বশুর মহাশয় পাঁচ হাজার টাকা বা তাহার অধিক মূল্যের একছড়া জড়োয়ার হার বাহির করিলেন তখন আর কোন সন্দেহ রহিল না এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পিতা-পুত্রের অভ্যর্থনার পার্থক্যও পরিলক্ষিত হইল—শ্বশুর ও জ্যেষ্ঠ শ্যালকের ন্যায়-সঙ্গত সাদর অভ্যর্থনা চলিতে লাগিল।

বাজনা ও আলো করিয়া বর বিবাহ করিতে আসল। মেয়েরা বর দেখিতে ছুটিল; কিন্তু কাজের মধ্যে ডুবিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র সুলেখার অবসর হইতেছিল না বর দেখিবার। বরণের সময় লেখার ডাক পড়িল, সুলেখার বেশের দিকে চাহিয়া মাসীমাতা তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "ছিরি দেখ, কি আক্কেল গা, যেন কিছু নেই, কোন গরীব দুঃখী ঘরের বৌ।"

লেখার গতি রুদ্ধ হইল। কথাটা শুনিতে পাইয়া কুন্তলা বলিল, "ছেলে মানুষ কি জানে। চট করে বেনারসী খানা পরে নাও লেখা।"

"শুধু বেনারসী পরবে কি গা, গহনা-টহনা—"

যাইতে যাইতে কুন্তলা বলিল, গহনাগুলো পরে নিস্; একটু শিগগীর করিস বোন।"

অলঙ্কারে ভূষিতা খস খসে বেনারসীর অঞ্চল সামলাইতে সামলাইতে মাসীমাতার সহিত সুলেখা গ্যাসালোকিত প্রশস্ত অঙ্গনে বরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কুন্তলা বরণ ডালা উহার হস্তে তুলিয়া দিয়া বরণ-প্রণালী দেখাইতে লাগিল। বরের মুখের দিকে চাহিতে গিয়া লেখার উত্তোলিত হস্তদ্বয় অবশ হইয়া পড়িল। অতর্কিত, অভাবনীয়, বিস্ময়কর ব্যাপারে উহার বোধশক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল। হস্ত কাঁপিয়া উঠিল, স্খলিত বরণ ডালা ক্ষিপ্রতার সহিত ধরিয়া কুন্তলা উহার সংজ্ঞাহীন দেহ জড়াইয়া ধরিল। কৌতূহলী স্ত্রী-পুরুষ উহাদিগকে ঘিরিয়া দাড়াইল। অপরের হস্তে বরণের ভার দিয়া কুন্তলা উহাকে লইয়া ভিড় ঠেলিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "সারাদিন যা পরিশ্রম গেছে, এতখানি আগুনতাত্ এ ছেলেমানুষ পারে কি সইতে।"

নরেন একবার মাত্র ঐ সুন্দরী ক্ষীণাঙ্গীর তরুণীর দিকে চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছিল। বুকের কোথায় যেন কিসের তীব্র ব্যথা জাগিয়া উঠিতেছিল। একদিন সে উহারই হইতে পারিত, তাহার চিন্তাও যে এখন পাপ, সে যে এখন পরের স্ত্রী। চক্ষের নেশা ভাবিয়া যাহাকে অবহেলা করা গিয়াছিল উহার মধ্যে যে বাস্তবতা কিছু ছিল, কে উহা ভাবিয়াছিল, নয় তো এমন ভুল করে কেহ!

তবে কি সত্যই সে উহাকে ভালবাসিয়াছিল। আর

এখন, এখন—নরেন শিহরিয়া উঠিল। উহাকে দেখিয়া লেখা অমন হইয়া পড়িল কেন? কিন্তু সত্যই যদি সে ভালবাসিত তবে পূর্ব্বে সেই অস্বীকারের দিবস, লেখা কিছু বলিল না! কেন এতটুকু—একটুখানি ইঙ্গিতও নয়, তখন উহার মুখ-ভাবেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতেও দেখা যায় নাই। কিন্তু আজিকার লেখার বিবর্ণ বেদনা-ভরা কাতর দৃষ্টি যেন তার অন্তস্তল পরিষ্কারভাবে দেখাইয়া দিল।

বাসর-ঘরে নরেনের আকুল নেত্র কাহাকে অন্বেষণ করিতে বারংবার ইতঃস্তত: ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত দর্শন আজ দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল। তাই শূন্যদৃষ্টিতে নিরাশ-হৃদয়ে বেচারা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। রমণীদলের হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রূপ-বাণ তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না—তাহাদের সঙ্গীতের উন্মাদনাও তাহার প্রাণে রেখা টানিতে পারিল না। তাঁহারা একবাক্যে মন্তব্য প্রকাশ করিল জামাতা যেমনই অহংকারী তেমনই গোঁয়ার—স্ত্রী-লোকদের মান রাখিতে জানে না।

বাইশ

"তা হ'লে তোমার সঙ্গে শীগ্‌গীর দেখা হ'বে না?"

"না।"

কথা হইতেছিল নরেন ও জিতেনের মধ্যে।

"বৌদিদি কি আর এখানে ফিরবেন না?"

"সে তাঁর ইচ্ছে সম্ভবতঃ দেবীগাঁয়েই থাকবেন। সাধ্যমত তিনি যাতে একটু শান্তি পান তাই করে দেবো ভাই।"

"অর্থাৎ?"

"এখুনি কি বলা যায়।"

"একটুও কি না?"

"মানুষ যা ভাবে সব সময় সে কি ঠিক হয় নরেন

"তবুও বল যদি বাধা না থাকে।"

"বাধা কি রে, তোর কাছে, দেবীগাঁ খুব বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, লোকজন বিস্তর, কিন্তু অতবড় গ্রামে একটা মেয়ে স্কুল বা ডাক্তারখানা নেই, তাই ভাবছি ভাল কয়জন নার্স নিয়ে যাব, শিক্ষয়িত্রীও নেব, এ দুটো যদি করে উঠতে পারি, তবে দিদিকে তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী করে রাখবার ইচ্ছা আছে। এই নিয়ে বেশ শান্তিতে জীবন কাটান যাবে কি বলিস?"

"তা তো বুঝলুম কিন্তু যখন সবই হলো তখন তুমিই বা অবিবাহিত থাক কেন জিতেন?"

"কি আহাম্মুখ রে তুই, তুই যে তাই করলি সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে জিজ্ঞাসা কচ্ছিস সীতা কার বাবা!"

"হেঁয়ালি ছাড় জিতেন।"

"সত্যই বলছি ভাই এখন বিয়ে আমি করবো না, এত-গুলো কাজ চোখের সামনেই পড়ে আছে, জীবনটা কি ঐ দিয়ে ভরে উঠবে না?"

"কিন্তু বিয়ে করলেও ওগুলো সব করা যায় মধ্যে থেকে তুই সংসারী হ'য়ে সুখী হ'বি?"

"কিন্তু আমার মানসিক পূজো যদি মনে মনেই করি।"

"সে আবার কি?"

"বলেছি আমার মতের সঙ্গে তোর মত কোনদিন মিলবে না, মিথ্যে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই কিছু।"

"লোকসানও নেই, সত্যি তোর কথা শুনে অবাক্ হচ্ছি বিয়ে করলে বুঝি মানসীর পূজো করা যায় না?"

হাসিয়া জিতেন বলিল, "বলেছি আমার মত অন্য রকম, আমার মতে তা যায় না। যে দেবী, যে পবিত্র তাঁকে কি পাঁকে ডোবান যায়? প্রেমের দোহাই দিয়ে ইন্দ্রিয়-লালসার তৃপ্তি তো চাই না কোন দিন। প্রাচ্যের কবিরা যার মহিমা গানে দিগদিগন্ত মাতিয়ে তুলে স্বয়ং কৃতার্থ হ'য়ে গেছেন, যার রস ও মাধুর্য্যে সাহিত্য আজও অমর, সে প্রেম কি একটু আলিঙ্গনে আর ক্ষুদ্র এক চুম্বনেই তৃপ্ত হ'তে পারে? সে কি এত ক্ষুদ্র যে সীমার মধ্যে সীমা দিয়ে তাকে আটক করা যায়? না নরেন তার জন্য সাধনা চাই, একাগ্রতার দরকার। সে যে অবিনাশী, অমর। তুমি এ বুঝবে না, আমার মানসী কত উঁচুতে দুনিয়ার বাইরে যে, তাঁকে কাছে ভাববার মত স্পর্দ্ধা কল্পনাতেও করি না, তাতে তাঁকে ছোট করা হয়। আত্মতৃপ্তির জন্য প্রেমের সৃষ্টি হয় নি বরং তার জন্য নিজকে নিঃস্ব উজাড় করে বিলিয়ে দেবার জন্যে।"

বিদিত জরেন নীরবে বসিয়া রহিল।

আহারাদির পর সাশ্রুলোচনে জিতেন ও কুন্তলা সুলেখার নিকট বিদায় লইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া লেখার চোখ-মুখ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল—সে পিতার বক্ষে ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। উহাকে শান্ত করিতে বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বাহির হইতে সুলেখাকে সুখী বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাই পিতা যেন বড়ই সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন। কতক্ষণ কাঁদিয়া একটু শান্ত হইয়া লেখা বলিল, "বাবা এই কি শেষ দেখা?"

রোদন-বিকৃতকণ্ঠে ডাক্তার বলিলেন, "তোকে নিয়ে যাব মা।"

পথ মধ্যে সহসা সর্প দেখিলে পথিক যেরূপ ভয়ে, শঙ্কায়, বিবর্ণ, ভীত হইয়া উঠে লেখাও সেইরূপ সর্প-দৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় চকিতে পিতার বক্ষ হইতে মুখ তুলিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "না—না—তুমি মিথ্যে মিথ্যে অপমান হ'য়ো না বাবা আমি সব পারি, সব পারব, শুধু ঐটুকু—তোমার অপমান সইতে আমি পারব না। ডেক না আমায়, কখন ডেক না।"

মূঢ়ের ন্যায় ডাক্তার কন্যার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আজ লেখার কথায় ডাক্তারের চমক ভাঙ্গিল, তাহা হইলে সকলই ভুল, কন্যার মনে কিছুমাত্র সুখ নাই। গর্ব্বিত জামাতা অবশ্য লেখার সহিত অসদ্ব্যবহার করে। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "লেখা মা কি বলছিস্ তুই?"

পিতার বাক্যে লেখার লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, নিজের দুর্ব্বলতাটুকু বুঝিতে পারিয়া সে লজ্জিত হইল। পিতার বক্ষে নূতন করিয়া ব্যথা জাগাইয়া তুলিয়াছে বুঝিয়া অনুতপ্ত হইল। এ কয় দিন দুর্ব্বলতার সহিত যুঝিয়া সে প্রায় সফলকাম হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে এ কি বিভ্রাট বাধাইয়া তুলিল। মলিন হাসিয়া লেখা বলিল, "তুমি আজ চলে যাচ্ছ কি না তাই আজ যা তা বলে ফেলেছি।"

করুণ হাসি হাসিয়া ডাক্তার বলিলেন, "বাপের চোখে ধূলো দিতে পারবি না মা, সত্যি বল লেখা রমেন কি তোকে পাঠাতে আপত্তি করেন?"

ইতস্ততঃ করিয়া লেখা বলিল, "এঁদের বাড়ীর বৌদের না কি বাপের বাড়ী যাওয়ার নিয়ম নেই।"

"ওঃ তাই।" বৃদ্ধ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। ভাবিলেন তবে লেখাকে এরা কষ্ট দেয় না।

লেখা জিজ্ঞাসা করিল "বাবা দাদা না কি অনেক বড় জমিদারী পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ মা, দেবী গাঁ পেয়েছে আর নগদও অনেক টাকা। তোদের এক মাসী ছিলেন ছোট বেলায় তাঁকে, দেখেছিলে মনে না থাকাই সম্ভব।"

"যাক, তা হ'লে টাকার জন্যে আর ভাবতে হ'বে না তোমায়, নয় বাবা?"

গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার বলিলেন, "এখন আর এতে লাভ কি মা? আমার সব কেড়ে নিয়ে তোকে—"

"চুপ করো বাবা আর হ'লে দিদিও যাচ্ছেন? তাকে কিন্তু আর আসতে দিও না তুমি।"

"পাগলের কথা শোন, জোর করে কি তাকে রাখতে পারি।"

"জোর করে নয় বাবা তোমায় তিনি বড্ড ভালবাসেন, তুমি না বল্লে কখনও আসবেন না, তিনি না থাকলে তোমার বড় কষ্ট হ'বে যে বাবা।"

জিতেন আসিয়া বলিল, "আর দেরী করলে ট্রেণ পাব না।"

কুন্তলাকে প্রণাম করিয়া লেখা পিতার হস্ত কুন্তলার হস্তের উপর রাখিয়া বলিল, "আজ থেকে বাবাকে তোমার হাতে দিলুম, বল দিদি এঁর সব ভার তুমি নিলে?"

অশ্রু মুছিয়া কুন্তলা বলিল, "সে যে অনেক আগে নিয়েছি বোন্ তোর দেবারও অপেক্ষা করি নি।"

কুন্তলাকে জড়াইয়া ধরিয়া ইলা উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল, "দিদি দিদি, আমার বৌদি কোথায় যাচ্ছ? পাষাণী আমায় ফেলে থাকতে পারবে তুমি?"

বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া আদর করিয়া কুন্তলা বলিল, "ফেলে যাচ্ছি না, ইলা সুলেখার কাছে তুই বেশী যত্নে থাকবি, আশীর্ব্বাদ করি তুই স্বামী নিয়ে সুখী হ'।"

কতক্ষণ পরে কয়েকখানা পাল্কী জমিদারের লৌহ ফটক পার হইয়া রাস্তায় পড়িল। সুলেখা দ্বিতলের গবাক্ষের গরাদে ধরিয়া বিষণ্ণ অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

পশ্চাৎ হইতে নরেন ডাকিল, "বৌদি, লেখা ?"

স্তম্ভিত লেখা ফিরিয়া দাড়াইল।

"তোমায় কি বলে ডাকব? বৌদি, না লেখা বলে ?"

"যা বলে আপনার ইচ্ছা হয় ?"

"বাঃ তুমি জমিদার বাড়ী এসে যে অনেকখানি সভ্য হয়ে পড়েছো, এর মধ্যে আপনি বলতে শিখে নিয়েছ ?"

হাসিয়া লেখা বলিল "আপনি বলা কি খারাপ ?"

"না খারাপ নয় তবে 'তুমি'র চেও মিষ্টিও নয়।"

"তা হ'বে কিন্তু শুনলুম আপনারা না কি আজ যাচ্ছেন ?"

"আপনি বল্লে যে :আমি কথার উত্তর দেবো না, লেখা।"

"বড় ভাইকে যে 'আপনি' বলতে হয়? তারপর এখন আপনি আমার পূজনীয় শ্বশুর মহশায়ের জামাতা।"

"কিন্তু জিতেনকে মহাশয়ার 'তুমি' বলতে একটুও আপত্তি হয় না, তবে সে কি তোমার চেও ছোট; আর এ নতুন সম্বন্ধের জোর তোমাকেই আমার মান্য করা উচিত। কিন্তু তা বলে রাখছি আমি 'আপনি' বলতে পারব না।"

"বেশ, 'তুমি'ই বলব—আজই যাবে কি? ইলা বড্ড কাঁদছে, দিদি চলে গেছেন কি না।"

"না হয় আজ নাই যাব।"

উভয়ে নীরব হইল। হঠাৎ নরেন বলিয়া ফেলিল, "এখানে বেশ সুখে আছ তো লেখা ?"

একি প্রশ্ন? লেখা কথা কহিল না।

প্রশ্নের অশোভনত্ব উপলব্ধি করিয়া নরেন অন্তরে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, এই স্থলে ঠিক এই প্রশ্ন করা সমীচীন হয় নাই এবং ইহাও তো সে জিজ্ঞাসা করিতে চাহে নাই। তাড়াতাড়ি এই অপরাধ স্খালনের মানসে অপর একটা দোষের সৃজন করিয়া ফেলিল, বলিল "শুনছি রমেনবাবু না কি তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন না। এ কি সত্য ?"

এ কি মূঢ়ের ন্যায় প্রশ্ন, এ প্রশ্ন করিবার তাঁহার অধিকার কি ?

"তুমি একটু বস নরেনদা, আমি রান্নাঘর থেকে ঘুরে আসি।" সুলেখা চলিয়া গেল। জড়ের ন্যায় নিস্পন্দ আড়ষ্ট নরেন ভাবে বসিয়া রহিল।

তেইশ

ইলার বিবাহের প্রায় দুই বৎসর ঘুরিয়া গিয়াছে; ইতিমধ্যে ডাক্তার একবার কুন্তলার সহিত সুলেখাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। প্রায় মাসাবধি পিতা ও ভ্রাতার নিকট হইতে কোন পত্রাদি না পাইয়া সুলেখা বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, কোন কাজে চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছিল না, মধ্যাহ্নের দীর্ঘ অবসর যেন কাটিতে চাহিতেছিল না, বৃহৎ ভবন নীরব নিস্তব্ধ। দাস-দাসী যে যাহার গৃহে গমন করিয়াছে সারারাত্রি জাগরণের গ্লানি দূর করিবার জন্য জমিদার বাহিরের গৃহে দিবা নিদ্রায় মগ্ন। রাত্রে পুনরায় বন্ধু-বান্ধব লইয়া নৃত্য-গীতের মজলিসে জাগিতে হইবে। মাসীমাতা নেপালের বধূ দেখিতে গমন করিয়াছিলেন। সুলেখা শেলাই করিতে বসিল, কিন্তু মন দিতে পারিল না; বিরক্ত চিত্তে উহা পরিত্যাগ করিয়া বহুদিবসের পরিত্যক্ত এসরাজের কাণ মোচড়াইতে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু মরিচা ধরা তার মিলাইতে গিয়া যখন সব কটাই প্রায় ছিঁড়িয়া গেল তখন এ অসাধ্য সাধনে নিবৃত্ত হইয়া অর্গানের ডালা খুলিল, অঞ্চল দ্বারা ধূলা ঝাড়িয়া সুলেখা বহুদিন পরে বাজাইতে বসিল। বাজাইতে, বাজাইতে কখন গান ধরিয়াছিল, লেখা নিজে সে কথা জানিত না, যদি না রমেন বাহবা দিয়া আর একটা গাহিতে বলিত। লজ্জা পাইয়া সুলেখা উঠিয়া পড়িল, মুগ্ধ-বিস্ময়ে জমিদার বলিলেন "বাঃ এমন সুন্দর গাইতে পার তুমি? কোথায় লাগে এর কাছে বেলাজান।" বিবাহের পরে অদ্য রমেন সুলেখার খাটে বসিল। উহা লেখা একাই ব্যবহার করিত। ইতিপূর্ব্বে রমেন কোন দিন লেখার সহিত একসঙ্গে এখানে বসে নাই।

"বন্ধ করলে কেন, গাও না নতুন বৌ।"

ব্রীড়াবনতা লেখা বলিল,—"মাসীমার ফেরবার সময় হ'য়েছে।"

সহসা রমেন উহাকে দুই হাতে আকর্ষণ করিয়া নিজের পাশে বসাইয়া বলিল,—"সত্যি বল—তুমি কি আমাকে একটুও ভালবাস না?"

সুলেখা শিহরিয়া উঠিল।

"চুপ করে থেক না—বল! জানি—আমি শুনেছি, সুন্দর জিনিস তুমি ভালবাস, কুৎসিত বলে কি—"

আর্ত্তকণ্ঠে লেখা চীৎকার করিয়া বলিল, "থাম, থাম তুমি চুপ কর।"

হঠাৎ রমেন গাম্ভীর্য্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"নরেনবাবুর সঙ্গে যদি বিয়ের ঠিক হ'য়েছিল, তবে হয় নি কেন?"

লেখা বিবর্ণ হইয়া উঠিল, দীর্ঘ দুই বৎসরের পর আজ এ কি প্রশ্ন! শাস্তির এ কি ব্যবস্থা, সে তো ভাবিয়াই ছিল স্বামীর পাদনিম্নে বসিয়া অভিশপ্ত, বিড়ম্বিত, জীবনের কাহিনী অকপটে শুনাইবে, তারপর স্বামীর দেওয়া শাস্তি মাথায় তুলিয়া লইবে। কুৎসিত হোন, তিনি স্বামী—পিতার বিপদের ত্রাণকর্ত্তা, সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া উঁহাকে পূজা করিবে। কিন্তু বলা হয় নাই কিছুই। স্বামী সম্ভাষণ হইয়াছিল এক বিচিত্রভাবে, ঘৃণিত আবরণের মধ্য দিয়া। সেই আবরণ সরাইয়া স্বামী কোন দিন নিকটে আসিয়া দাঁড়ান নাই, সে যে কথাগুলা বলিবারও সময় পায় নাই। কিন্তু আজ যখন স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে সে কথা বলিবার সুযোগ উপস্থিত হইল, তখন তাহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, কল্পনার সবটুকুই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

উত্তর না পাইয়া রমেন পুনরায় বলিল,—"চুপ করে থেক না আমি সব শুনেছি, অবশ্য নরেন বলে নি, ওঃ তাই বুঝি বিয়ের দিন তাঁকে দেখে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলে?" সুলেখার পাংশুবর্ণের মুখের প্রতি চাহিয়া গৃহ কম্পিত করিয়া রমেন হাসিয়া উঠিল, বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "এটা তা হ'লে শুধু ফার্স নয়, ট্রাজেডী কি বল? কিন্তু ভদ্রলোকের ঘরে এমন অভিনয় বড় একটা দেখা যায় না, তা হলে আমি খুব ভাগ্যবান ঘরে বসেই এমন চিত্তাকর্ষক অভিনয় দেখে নিলুম।"

স্বামীর কুৎসিত ইঙ্গিতটুকু লেখার বুকে বিঁধিয়া উহাকে অস্থির করিয়া তুলিল; কিন্তু তাহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইল না। এত বড় নিলর্জ্জতার উত্তর আছেই বা কি। লজ্জায় অপমানে সুন্দর মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিল। স্ত্রীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া রমেন বলিল, "আমি জানতে চাই যে এখনও কি তাকে তুমি তেমনি ভালবাস?"

চুপ করিয়া থাকিলে স্বামী কথাটাকে অধিকতর কুৎসিতভাবে লইবেন ভাবিয়া, অভিমান-হতা লেখা বাষ্পগদগদ কণ্ঠে সংযতভাবে উত্তর দিল, "কিন্তু মানুষকে অপমান করবারও একটা সীমা আছে।"

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া জমিদার বলিলেন, "বেশ তাই আমি দিন কতকের জন্য কলকাতায় যাচ্ছি, জান বোধ হয় যাবার সময় আমায় না জানিয়ে বৌদি শিবানীকে নিয়ে গেছেন, সে দেখতে ভাল না হ'লেও তোমার মধ্যে যা নেই, তার মধ্যে সে জিনিস ছিল। আহা—বেচারা!"

ঘৃণায় ও বিরক্তিতে সুলেখার নেত্র আরক্ত হইয়া উঠিল, এই স্বামী! বাহিরের আচরণ বাদ দিলেও ভিতরের দিকটাও তাহার কি কুৎসিত—অবাধে আপনার বিবাহিতা পত্নীর সহিত একজন গণিকার যে স্বামী তুলনা দিতে পারে, তাঁহাকে ভালবাসিতে, ভক্তি করিতে সে ব্যস্ত। ছিঃ ছিঃ তার আত্ম-সম্ভ্রম কি একটুকু নেই। কিন্তু কুন্তলাদি ও দাদা যে উঁহাকেই ভক্তি করিতে,শ্রদ্ধা দিয়া মনের সকল কালী ধুইয়া ভালবাসিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। অন্তর মধ্যে মহিয়সী চিরস্মরণীয়া রমণীগণের পূত চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। রমেন আবার বলিল, "নিয়েই যখন গেছে ওকে, বৌদির হাতে যখন গিয়েই পড়েছে, ফিরে পাবার তো আর উপায় নেই। তাই যাচ্ছি কলকাতায় মতিবিবিকে এনে রাখব। দেখি তাকে কেমন করে তাড়ায়। তোমার দাদা আর বৌদিকে লিখে দিও, ঘরের মধ্যে বদ্ধ হ'য়ে বৌয়ের গোলাম

হ'তে পারব না, তারা যত চেষ্টাই করুন। শিবানীকে যদি ফিরিয়ে দেয় তা হ'লে মতিকে আনব না, লিখ সব কথা বুঝেছ ?"

দন্তে অধর চাপিয়া সুলেখা মস্তক হেলাইয়া সম্মতি জানাইল। নিম্ন হইতে কয়েকবার ডাকিয়া সুলেখার উত্তর না পাইয়া মাসী উপরে উঠিলেন কিন্তু লেখার গৃহে গিয়া স্তম্ভিত হইলেন, এ কি সর্ব্বনাশ! ওই মায়াবী মেয়েটার ঘরে ছেলে? আবার দিনের বেলা—বসেছে কি না খাটের ওপর, তার ওপর আবার বৌকে কাছে বসিয়ে সোহাগ জানান হচ্ছে।

হঠাৎ মাসী ডাকিলেন "বৌ।"

ত্রস্তে ভীতভাবে স্বামীর দিকে চাহিয়া ত্বরিত চরণে লেখা বাহিরে গেল। ভিতরে উপবিষ্ট রমেন শুনিতে পাইল "ও মা অবাক কল্লে। কি বেহায়া গো, দিনের বেলা বরের কাছে বসে হেসে কথা বলতে লজ্জা হ'ল না তোর? তখন জানি ছোট-ঘরের মেয়ে আর কত ভাল হ'বে।"

ডাক্তারের অর্থের কথা, দেবীগ্রামের জমিদারীর কথা প্রকাশ হইবার পর হইতে রমেন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সম্মান করিত। মাসীমাতার এই অযথা দোষারোপ তার ভাল লাগিল না! যাহা কোন দিন করে নাই অদ্য তাহাই করিয়া ফেলিল। নীচে নামিয়া মাসীকে বলিল, "ওতো ইচ্ছে করে আমার কাছে যায় নি আমিই ডেকেছিলুম।"

পুত্রের বিরক্তি বুঝিয়া সহসা মাসী খানিকটা করুণ রসের অবতারণা করিয়া ছলছল নেত্রে বলিলেন, "তোর কাছে বসে, সে কি আমার অসাধ বাবা, তবে না কি মেয়ে মানুষকে বেশী নাই দিতে নেই—মাথায় উঠে বসবে, তাতে বৌমা যে রকম বেহায়া, তাই বলি বাবা বুঝে সুঝে—"

রমেন হাসিয়া বলিল, "সে ভয় করো না মাসী, বৌর গোলাম হ'বো না। দিন রাত বাইরেই থাকি—আচ্ছা শোন কাল আমি কলকাতায় যাচ্ছি ফিরতে হয় তো দেরী হ'বে।" ক্রমশঃ

গ্রামের বধূ

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

আজি নয়নের নীরে—
পল্লীর পানে দুটী আঁখি মোর চাহে খালি ফিরে ফিরে!
জ্যৈষ্ঠের দিনে তৃণ যে সেথায় পথে বিলায়েছে মায়—
মাঠের ওপর পড়িয়াছে স্নেহে আষাঢ় মেঘের ছায়া।
গ্রামের বালিকা গাগরী ভরিতে চলেছে দীঘির জলে
অলস চরণে আপনার মনে দু'পায় তৃণেরে দলে!
লীলাময়ী বধূ পাশে চলে তার লাজের মহিমা নিয়া—
ঝরায়ে সহজ লীলার সুষমা পল্লীর পথ দিয়া।
কভু চলে ধীরে দেহলতাটিরে সলাজ বসনে ঢাকি—
আবার কখনো থমকি দাঁড়ায়ে চাহে মেলি দুই আঁখি।
সুদূর হইতে পথিক দেখিয়া ভাবে বুঝি আসে প্রিয়,
বাতাস উড়ায় ঐ না তাহার শুভ্র উত্তরীয়?
তারপর হায় রে হতাশায় তাহার বুকের আশা—
যখন হেরে সে নিকটে পথিক, মিছা হ'ল ভালবাসা!
অলস কিশোরী কলস ভরিয়া সখী সাথে চলে ঘরে
জানিনাক ভাই নয়নে তখন ওর কি বাদল ঝরে?
ওর যেন হায় আঁখিজল শুধু জানে "প্রিয়-পরিচয়"-
নয়নের জলে করিয়াছে তাই প্রিয়তমে অক্ষয়
উহার অশ্রু সনে——
মোর মন যেন ফিরে যেতে চায় গ্রামের কুঞ্জবনে।
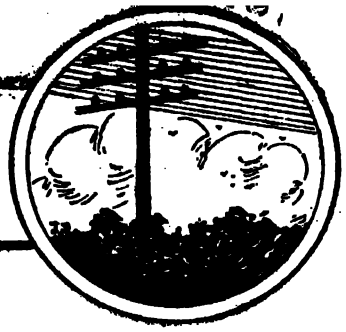
জার্ম্মেনীর বেকার-সমস্যা :—

জার্ম্মেনীর বেকার-সমস্যা-সমাধানের জন্য আজকাল খুবই চেষ্টা হইতেছে। কৃষি-মন্ত্রীসভা ইহার সমাধানের

হ্বারনিউকিনের কৃষি-উপনিবেশের একটা দৃশ্য

জন্য বার্লিনের হ্বারনিউকিন্ নামক স্থানে এক উপনিবেশ

টেগেলের সাম্প্রদায়িক ভোজনালয়

স্থাপন করিয়াছে। সেখানে পাথরের কাজ করা হয়। বেকার লোকসকল সেইখানে কাজ করে। এইখানে কেবলমাত্র পাথরেরর কার্য্যে নিপুণ লোকদের নেওয়া হয় এবং তাহাদের বাসস্থান দেওয়া হয়। বার্লিনের টেগেল

প্রুসীয় কৃষি-মহাসভার অর্থসাহায্যে নূতন উপনিবেশের বেড়ায় রং করা হইতেছে

নামক স্থানে সাম্প্রদায়িক ভোজনালয় আছে, সেইস্থানে তাহাদের কম খরচে ভোজন করিতে দেওয়া হয়।

নবনির্ম্মিত মোটার :—

এ পর্য্যন্ত আমরা জানি, পেট্রোলেই মোটরগাড়ী চালিত হয়; কিন্তু এখন একপ্রকার মোটরগাড়ীর আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে পেট্রোলের মোটেই আবশ্যক হয় না। তেলের পরিবর্ত্তে বাতাসের সাহায্যে ইহার কাজ চলে। এই গাড়ী প্রথম আবিষ্কৃত হইবার অব্যবহিত পরেই লস্ এঞ্জেলসে ইহার কার্য্যশক্তির পরীক্ষা হইয়াছিল। এই গাড়ীর পিছনে বাতাস রাখিবার ব্যবস্থা আছে। মিঃ রয়, জে, মার্স ইহার আবিষ্কারক। আজ প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া

তিনি এই গাড়ী নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।
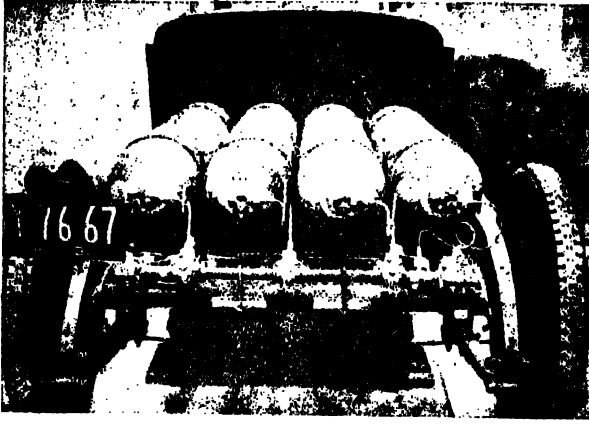
বাতাসে চালাইবার মোটর

মায়ার্সের এই চেষ্টার ফল জগতের মোটারের প্রসারে যে এক অভিনব অবদান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মানুষের খাদ্যের পরিমাণ-নির্দ্দেশক যন্ত্র :—

মিউনিকের মিউজিয়ামে একটী যন্ত্র আছে, তাহাতে মানুষের খাদ্যের পরিমাণ জানিতে পারা যায়। এই যন্ত্রে

মানুষের খাদ্যের পরিমাণ জানিবার যন্ত্র

নিজের ওজন ও বয়স লিখিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। তাহাতে বয়স ও ওজন লিখিয়া যন্ত্রের উপর নির্দ্দিষ্ট স্থানে শরীরে ভার অর্পণ করিতে হয়। তাহা হইলে সেই মানুষের শরীরের অনুরূপ আবশ্যকীয় খাদ্যের পরিমাণ জানিতে পারা যায়। আমরা এই যন্ত্রের একটী ছবি দিলাম।

সূর্য্যের রশ্মিতে চিকিৎসা :—

এই-লা-বেন নামক স্থানে সূর্য্যের রশ্মিতে রোগ চিকিৎসার জন্য এক অভিনব ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। এই
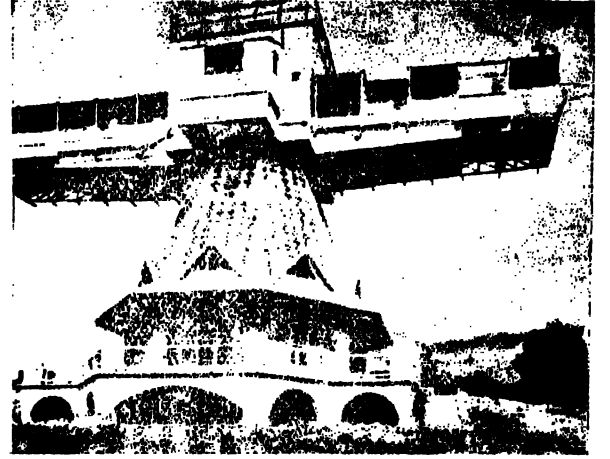
সূর্য্য-রশ্মির চিকিৎসালয়

ঘরটী পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। ইহা একটী অষ্টকোণ ঘরের মাথার উপর সর্ব্বদা ঘুরিবার জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। চিত্রে পাঠকগণ ইহার নূতনত্ব ও আশ্চর্য্য গঠন-

সূর্য্য-রশ্মি-চিকিৎসালয়ের একটী বাহুর ভিতরের দৃশ্য

কৌশলতা দেখিতে পাইবেন। ইহার দুই দিকে দুইটী বড় বাহু ও আর দুই দিকে দুইটী ছোট বাহু আছে। দীর্ঘ বাহুযুক্ত ঘরের মধ্যে সূর্য্য-রশ্মিতে চিকিৎসা করিবার জন্য ছোট ছোট ঘর আছে। ডাঃ জিন্ স্নেডম্যান্ ইহার আবিষ্কারক।

পালের সাহায্যে পৃথিবী-ভ্রমণ :—

এ, বাল্টার ও জে, বাল্টার নামক দুই ভাই সম্প্রতি ২৪ ফুট উচ্চ পালের সাহায্যে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিবার

...র করিয়াছেন। ছবিতে আমরা তাহাদের :নৌকার ছবি দেখিতে পাইব—টোবাকোর বন্দরে ইহা গৃহীত।

বাণ্টার ভাতৃদ্বয়ের নৌকা

ইহার সাহায্যে তাঁহারা আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

অভিনব স্বাস্থ্য-নিবাস :—

ছবিতে গোলাকৃতি সুবৃহৎ যে জিনিসটী আমরা দেখিতে পাইতেছি, উহা একটী স্বাস্থ্য-নিবাস। ইহাতে মোট পাঁচটা ঘর আছে এবং ৩৬ জন রোগী তাহাতে রাখা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে অক্সিজেন গ্যাসের সাহায্যে নানাবিধ রোগের চিকিৎসা করা হয়। রক্তহীনতা, বহুমূত্র, রক্তের চাপ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসাই এখানে করা হইয়া থাকে।

সম্প্রতি কানিংহাম :নামক এক ব্যক্তি ওহিও নামক স্থানে উহা নির্ম্মিত করিয়াছেন। সেইজন্যই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'কানিংহাম হেল্‌থ্ ট্যাঙ্ক'।

কানিংহাম-নির্ম্মিত স্বাস্থ্য-নিবাস

—— •:·:• ——

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

রক্ত মাংস দেহে এক
মানুষ মহান্
দেব নয়—ধরাতলে
মূর্ত্ত ভগবান্।

সুরেশচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্ত্তি

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত সুধীগণ !

সমাজপতি-স্মৃতি-সমিতি অদ্যকার সাম্বৎসরিক অধিবেশনে আমাকে আমার স্বর্গীয় সাহিত্য-গুরু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সাহিত্য-কীর্ত্তি-সম্বন্ধে কিছু বলিবার আদেশ প্রদান করিয়া আমাকে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে যে একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবকের নাম আমি শ্রদ্ধা করিতে উপদিষ্ট হইয়াছি, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার অননুকরণীয়া ভাবময়ী ভাষার সহিত পরিচয় লাভ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি, যাঁহার একান্ত নির্ভীক ও পক্ষপাতশূন্য সাহিত্য সমালোচনাসমূহ আমাকে বহুদিন বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়াছে এবং আমার সাহিত্য রুচি সংগঠিত করিয়াছে, যাঁহার ওজস্বিনী ও আবেগময়ী বক্তৃতায় সাগর তরঙ্গ-গর্জ্জন সদৃশ ধ্বনি হৃদয়ে কত উন্নত ভাবের তরঙ্গ তুলিয়াছে, এবং জীবনের শেষ দশ বৎসর যাঁহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার উদার হৃদয়ের প্রীতি ও স্নেহলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি, তাঁহার সহিত সাহিত্যালোচনা করিয়া, তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় এবং বহু সদুপদেশ লাভ করিয়াছি, তাঁহার স্মৃতি পূজায় শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে অস্বীকার করা অমার্জ্জনীয় অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবে। পক্ষান্তরে, মাদৃশ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার বিরাট্ সাহিত্য-কীর্ত্তির পরিচয় প্রদানের প্রয়াস যে উচ্চতরু শাখাবিলম্বিত ফলাহরণে উদ্যত উদ্বাহু বামনের অক্ষম প্রচেষ্টার ন্যায় হাস্যাস্পদ হইবে, সে জ্ঞানও আমাকে প্রতিক্ষণ পীড়িত করিতেছে। তবে আশার কথা এই যে, সমবেত সুধীমণ্ডলীর অনেকেই সেই স্বর্গীয় সাহিত্যাচার্য্যের জীবনব্যাপী সাহিত্যচর্য্যার সুবিস্তৃত ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত, তাঁহার কীর্ত্তি-সূর্য্যের অপরিম্লান জ্যোতিঃর স্মৃতি এখনও অনেকের মানসপটে বিভাসিত। সুতরাং ভাষায়, বর্ণে সে গৌরবময় চিত্র রঞ্জিত করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই, আমায় পক্ষে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। কবি যথার্থই বলিয়াছেন :—

জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি প্রখর ভাস্কর ভাতি,
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল।

সুরেশচন্দ্রের যশঃসূর্য্যের আলোক দেখাইবার জন্য আমার শ্রদ্ধার এই স্তিমিত প্রদীপ ধারণ করিবার আবশ্যকতা কোথায় ?

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমাজপতি মহাশয়ের অধিকাংশ রচনা দুষ্প্রাপ্য সাময়িক পত্রের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায় তরুণবয়স্কব্যক্তিগণ তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভা ও সমসাময়িক সাহিত্য-সমাজের উপর অনন্যসাধারণ প্রভাবের প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছেন বা কখনও পাইবেন কি না সন্দেহ। সেই জন্য যে সকল কার্য্যের জন্য আমরা স্বর্গীয় সাহিত্য গুরু সুরেশচন্দ্রের স্মৃতি স্বদেশবাসীর চিরসম্পূজনীয় বিবেচনা করি, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিবার প্রয়োজন আছে।

আমার বিবেচনায় সমাজপতি মহাশয়ের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য—বিদ্যাসাগর-অক্ষয়-ভূদেব-বঙ্কিম-রমেশ প্রভৃতি সাহিত্য-মহারথী-সেবিত বাঙ্গালা-সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ আমাদিগের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া সেই উচ্চ ও মহান্ আদর্শের অনুসরণে আমাদিগকে নিরন্তর প্রবৃত্তি দান। সাহিত্যের উন্নতি-সাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তাঁহার ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল সাহিত্যের উন্নতির উপরেই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। সেইজন্য, জীবনের প্রথম প্রভাতে, যখন তিনি সাহিত্য-সেবার ব্রত গ্রহণ করেন, তখন সাহিত্য-সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

"জাতীয় উন্নতি সাহিত্য-সাপেক্ষ, একথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। সাহিত্য দেখিয়া জাতির উন্নতির পরিমাণ অবধারণ

করা যায়। যে জাতি যত উন্নত, সে জাতির সাহিত্য তত শ্রীসম্পন্ন। যে জাতির সাহিত্য নাই, মানব জাতি-গণের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অতি অল্প। সাহিত্য সাধারণ মানব-মণ্ডলীর সাধারণ-সম্পত্তি, কিন্তু সাহিত্য সাধারণের সহজ-লব্ধ সম্পদ নহে। পুণ্য-লব্ধ প্রতিভায় সাহিত্যের উৎপত্তি, সেই প্রতিভার অনুশীলনে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি, সেই প্রতিভার ক্রমবিকাশে সাহিত্যের ক্রমপরিণতি। যখন প্রতিভা পূর্ণ বিকসিত হইবে, তখন মানব-সাহিত্যও চরম পরিণতির উচ্চতম, পূত সোপানে আরোহণ করিবে।

মানবের ক্ষুদ্রতা সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। সাহিত্য ক্ষুদ্রতার পোষক বা সঙ্কীর্ণ পথের পথিক নয়, সাহিত্য সম্প্রদায়গত মতবাদের দুর্গে বন্দী হইয়া থাকিবার বস্তু নয়। উদার পবিত্র সাহিত্য অতি মহান্, তাহা মানবকে বিস্তৃতির পথে, অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যায়। সাহিত্য অনন্ত উন্নতির সহায়; মহত্ত্ব তাহার উপকরণে; মহত্ত্বই তাহার ক্ষেত্র, মহত্ত্বই তাহার আদর্শ; সাহিত্যের যেখানে ক্ষুদ্রতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ক্ষুদ্রতার বা সঙ্কীর্ণতার পোষক নহে; সে ক্ষুদ্রতা, তুলনায় মহত্ত্বের মহিমা পরিস্ফুট করিয়া দেয়, এই মাত্র। সাহিত্যের মহত্ত্ব প্রবর্ত্তক—সাহিত্যের ক্ষুদ্রতা নিবর্ত্তক। সাহিত্যের মহত্ত্ব মানবের অনন্ত উন্নতির প্রকৃষ্ট পথ, সরল উপায় দেখাইয়া দেয়; আর, সাহিত্যে ক্ষুদ্রতার ছবি দেখিয়া আমরা তুলনায় মহত্ত্বের গৌরব বুঝিতে পারি। সাহিত্য অপক্ষপাত বলিয়াই আমরা তাহাতে ক্ষুদ্রতার অস্তিত্ব দেখিতে পাই—কিন্তু সাহিত্য কখনও ক্ষুদ্রতার, সঙ্কীর্ণতায়, অবনতির পক্ষপাতী নহে।

এই উন্নত সাহিত্যের বিমল বিভায় মানব-হৃদয় আলোকিত হয়, এই আলোকে মানবপ্রতিভা ধীরে ধীরে বিকসিত হইয়া উঠে এবং এই সাহিত্যের প্রভাবে মানব ক্রমে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে।

অতএব, যদি কিছু মানবের প্রার্থনীয় থাকে,—তাহা সাহিত্য, যদি মানবের কিছু বরেণ্য থাকে, তাহা সাহিত্য। যদি মানব-জাতির উন্নতির কিছু সহায় থাকে এবং তাহার অনুশীলন মানব-সাধারণের হিতকারী, উপকারী ও ধর্ম্ম-সধান হয়, তাহাও সাহিত্য।

সাহিত্য একটা প্রত্যক্ষ লক্ষ্য লইয়া অগ্রসর হয় না, বিধিবিহিত উদ্দেশ্য তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। কেন না, সাহিত্য স্বাধীনপ্রকৃতি, সর্ব্বতোগামিনী, স্বেচ্ছাময়ী প্রতিভায় স্বপ্রকাশ-পরিণাম। সে কাহারও অধীনতার ভার বহন করিতে পারে না। আনন্দময় হৃদয়ের যথেচ্ছ অনুশীলনে, স্বাধীন আলোচনায়, তাহার সত্ত্বা দেখিতে পাওয়া যায়। জগতে যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর, তাহাই সাহিত্যের বিষয়। সাহিত্য কেবল সত্য ও সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা করিয়া, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও সৌন্দর্য্যকে পূর্ণ বিকসিত করিয়া তুলে। সত্যের প্রতিষ্ঠায় ও সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশেই তাহার সুখ ও পরিণতি। তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিশদ ব্যাখ্যা করিতে সে সম্মত নহে। কেন না, অনুশীলন-জন্য সুখ ভিন্ন তাহার অন্য উদ্দেশ্য সাধারণের চক্ষে বড় একটা প্রতিভাত হয় না। অনুশীলনের যে সুখ অনুভব করিতে পারা যায়, তাহা প্রত্যক্ষ; কিন্তু এই প্রত্যক্ষ অবান্তর লক্ষ্যই সাহিত্যের একমাত্র ফল নহে। সাহিত্যের যাহা পরোক্ষ ও অবিনশ্বর উদ্দেশ্য তাহা অনুশীলন-জন্য সুখের মত ক্ষণিক নহে। মানব-সাধারণের অক্ষয়, অব্যয়, ক্রমিক উন্নতি, ও অমর বিশ্বপ্রেম, তাহার অমৃতময়, অবিনশ্বর মহাফল। সাহিত্যের এই উন্নতিই মহাফল; কেন না, এই উন্নতিই মানবের ধর্ম্ম এবং এই বিশ্বপ্রেমই পূর্ণ মানবত্বের আদর্শ ও লক্ষণ। এই দুই বস্তুই মানবকে মানবত্ব প্রদান করিয়াছে, এবং ইহাদের চরম উৎকর্ষেই মানব ক্রমে দেবপদ লাভ করিবে।

সুতরাং, সাহিত্য সকলেরই আরাধ্য দেবতা।

কত, প্রতিভাশালী মানব-দেবতা প্রতিভার প্রত্যগ্র পুষ্প দিয়া সাহিত্যের পূজা করিতেছেন। আমাদের সে মহনীয় উপকরণ নাই বলিয়া, আমরা বিরত থাকিব কেন। সূর্য্যের আলোক সত্ত্বেও জগতে খদ্যোতের ক্ষীণ দ্যুতি দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তি ক্ষুদ্র হউক, কিন্তু উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র করিবার প্রয়োজন কি? শক্তির হীনতাবশতঃ আমাদের সাধনা সিদ্ধ হউক না হউক, আমরা কায়মনোবাক্যে ভক্তিভরে এই মহান্ ও পবিত্র সাহিত্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছি।"

এই কঠোর সাহিত্য-ব্রত সুরেশচন্দ্র আজীবন একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় পালন করিয়াছিলেন। সাহিত্য বাস্তবিকই

তাঁহার আরাধ্য দেবতা ছিল। যেমন নিষ্ঠাবান পূজারী দেবমন্দির অশুচি বস্তু দ্বারা কলুষিত হইতে দেখিলে খড়্গ, হস্ত হন, সাহিত্যের পুরোহিত সুরেশচন্দ্রও সেইরূপ প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল সাহিত্য-দেবতার মন্দির দ্বারে সমালোচনার কুঠার হস্তে অসংখ্য, দুর্নীতি ও যথেচ্ছাচারিতার প্রবেশপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

বাঙ্গলা-সাহিত্যে সুরেশচন্দ্রের পূর্ব্বেও অনেক তীক্ষ্ণধী সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রবর্ত্তিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভ', পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ,' বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন', কালীপ্রসন্নের 'বান্ধব', যোগেন্দ্রনাথের 'আর্য্যদর্শন' প্রভৃতি বহু সাময়িকপত্রের সুধী সমালোচকবৃন্দ উচ্চশ্রেণীর সমালোচনার দ্বারা সাহিত্যকে উন্নত ও সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সাহিত্যের মহদুপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সুরেশচন্দ্রের 'সাহিত্য'-সমালোচনার একটু বিশিষ্টতা ছিল তাঁহার সমালোচনার যে সত্যপ্রিয়তা ও অকুতোভয়তা পরিদৃষ্ট হইত, তাঁহার অভিমত সমুহে যে উদারতা ও আন্তরিকতা লক্ষিত হইত, তাঁহার বিশ্লষণে যে নিপুণতা ও সূক্ষ্মদর্শিতা প্রকটিত হইত, দুর্নীতি, অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে তাঁহার যে সকল তীব্র শ্লেষবাণ নিক্ষিপ্ত হইত, তাহা তাঁহার সরস সমালোচনাগুলিকে একটী বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছিল এবং 'সাহিত্যে'র এমন পাঠক ছিলেন না যিনি মাসের পর মাস সেই বঙ্গবিশ্রুত সাময়িক পত্রের ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত শেষ কয় পৃষ্ঠা পাঠ করিবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেন না। সমাজপতি মহাশয়ের এই গুণ ছিল যে তিনি কখনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কাহারও রচনার নিন্দা করিতেন না। যদি তিনি তাহা করিতেন তাহা হইলে তাঁহার সমালোচনার কোনও মুল্যই থাকিত না—তাহা সাধারণ্যে কখনও সমাদৃত হইত না। আমি স্বয়ং অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে, যে লেখককে তিনি কিয়দ্দিবস মাত্র পূর্ব্বে তীব্র শ্লেষবাণে জর্জ্জরিত করিয়াছেন আমাদিগের নিকট তাঁহারই প্রশংসাযোগ্য অন্য রচনার উচ্চ সুখ্যাত করিতেন। বাস্তবিক কোনও লেখকের প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না—বিদ্বেষ ছিল রচনার অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা, দুর্নীতি ও যথেচ্ছাচারিতার উপর—সে রচনা যাহারই হউক—তথাকথিত সাহিত্য-সম্রাটেরই হউক বা বহু ভক্ত-পরিবৃত ঋষি কবিরই হউক। যদি কখনও তাঁহার আক্রমণ অতি মাত্রায় তীব্র হইয়া থাকে তাহা হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে তিনি সাহিত্য মন্দিরকে দেবমন্দির বলিয়াই বিবেচনা করিতেন এবং সেই জন্য দেবারাধনার উপকরণাদি যাহাতে পবিত্র ও নির্দ্দোষ হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা তিনি কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার আন্তরিক ও ঐকান্তিক আগ্রহই সেই আক্রমণের তীব্রতার একমাত্র কারণ; কিন্তু আমরা শুনিয়াছি তাঁহার সমালোচনার জন্য অনেক বন্ধু তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই যে সাহিত্য-সেবা সুরেশচন্দ্রের ধর্ম্ম ছিল—সাহিত্যের উন্নতিসাধনই তাঁহার একমাত্র কাম্য বিষয় ছিল এবং যেখানে সেই ধর্ম্মের তিনি অবমাননা দেখিতেন, সেইখানেই তিনি সমালোচকের দণ্ড হস্তে কঠোর কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হইতেন। সে অবমাননাকারী তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু হইলেও তাঁহার নিস্তার ছিল না।

সুরেশচন্দ্র আধুনিক সমালোচকগণের মধ্যে একরূপ বিরল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—তিনি সাহিত্যসমাজের সমাজপতি ছিলেন। তাঁহার আদর্শ (আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি) অতি উচ্চ, অতি পবিত্র, অতি মহান্ ছিল এবং সেই উচ্চ আদর্শ অনেকেরই অধিগম্য ছিল। এই আদর্শের জন্য তিনি তাঁহার পুণ্যশ্লোক মাতামহ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রভৃতি পূর্ব্বগামী সদ্‌গুরুদিগের নিকট ঋণী ছিলেন।

'সাহিত্য' নামক মাসিকপত্র-সম্পাদনে তিনি যে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার মূলেও সাহিত্যের এই উচ্চ আদর্শ। 'সাহিত্যে' সর্ব্বদা প্রথম শ্রেণীর রচনা প্রকাশিত হইত। যাঁহারা সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান লেখক ও সুরেশচন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান সহায় ছিলেন তাঁহাদেরও কোনও রচনা আদর্শের স্তরে না পৌছিলে ফেরৎ দিতেন। ইহা অনেকের আত্মাভিমানে আঘাত করিত এবং সময়ে সময়ে বন্ধুত্বের বন্ধন শিথিল করিত। সুরেশচন্দ্রের নিজমুখে শুনিয়াছি একবার বাঙ্গালার অভিজাত সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় এক ভূম্যধিকারী তাঁহার

সহধর্ম্মিণীর কতকগুলি কবিতা সংশোধন করিয়া সাহিত্যে মুদ্রিত করিবার জন্য যথেষ্ট আর্থিক প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু 'দারিদ্র্যের মৃদু গর্ব্বে চরিত্র সুন্দর', কর্ত্তব্যে চির-অবহিত সুরেশচন্দ্র সেই প্রস্তাব প্রশংসনীয় দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। বাস্তবিক সেই সাহিত্যের একাগ্র সাধকের নিকট পার্থিব সুখ, ঐশ্বর্য্য, সম্মান সকলই তুচ্ছ ছিল।

কিন্তু সুরেশচন্দ্রের সেই অত্যুচ্চ আদর্শ আমাদিগকে অল্প পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত করে নাই। তাঁহার উচ্চ আদর্শে উপনীত হইতে পারে নাই বলিয়া তিনি স্বকীয় অনেক রচনা নির্ম্মমভাবে ধ্বংস করিয়াছেন। তত্তুল্য রচনা প্রকাশিত করিয়া হয় তো অনেক প্রথম শ্রেণীর লেখক গৌরব অনুভব করিতে পারিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে মৌলিক স্থায়ী রচনা তিনি এই জন্য অতি অল্পই দান করিয়া গিয়াছেন। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, সুরেশচন্দ্রের যে গল্পগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে তাহারও অধিকাংশ তিনিই ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়া মুদ্রাযন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্রের কত প্রতিভাদীপ্ত ভাবৈশ্বর্য্যময়ী রচনা হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি, ভাবিলে দুঃখ হয়; কিন্তু ইহা হইতে নবীন লেখকগণ অনেক শিক্ষা আহরণ করিতে পারেন। অনেকে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক লিখিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করেন। ইহাতে যথার্থ গর্ব্বপ্রকাশের কিছু আছে কি না ভাবিয়া দেখা উচিত। বাঙ্গালা-সাহিত্য আন্যান্য দেশের সাহিত্য অপেক্ষা দরিদ্র হইলেও উহাতে কত প্রথম শ্রেণীর রচনা আছে। তত্তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা যদি প্রকাশিত না হইল তবে নিকৃষ্ট গ্রন্থের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া লাভ কি? রাশি রাশি গ্রন্থ রচনা করিলেই সাহিত্য উন্নত হয় না, জীবনব্যাপী সাধনা দ্বারা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা যায় এবং জগতের সাহিত্য-সমাজে জাতীয় সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। বাল্মীকির রামায়ণ, বেদব্যাসের মহাভারত এইরূপ সাধনার ফল। কথিত আছে প্রসিদ্ধ গ্রীক চিত্রকর আপেলেসকে কেহ তাঁহার চিত্রসংখ্যার ন্যূনতা সম্বন্ধে অনুযোগ করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন 'আমি অনন্তকালের জন্য চিত্র অঙ্কিত করি।' প্রসিদ্ধ নাট্যকার য়ুরিপিডিস্‌কে তাঁহার সমসাময়িক কোনও নাট্যকার একদা গর্ব্ব করিয়া বলেন যে, তিনি তিন দিনে তিন শত শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তদুত্তরে য়ুরিপিডিস্ উত্তর দেন যে তাঁহার তিনশত শ্লোক লোক মোট তিনদিন মাত্র পড়িবে, পক্ষান্তরে, তিনি তিন দিনে যে তিনটী মাত্র শ্লোক রচনা করিয়াছেন তাহা লোক তিনযুগ ধরিয়া পড়িবে। সকল লেখকেরই এইরূপ উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখা কর্ত্তব্য।

অনেকের বিশ্বাস, সুরেশচন্দ্র সংস্কৃতানুসারিণী সাধুভাষার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া সরল ও সহজ ভাষার বিরোধী ছিলেন। সুরেশচন্দ্র গম্ভীর-বিষয়ক রচনার সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু সরল ও সহজ ভাষার বিপক্ষ ছিলেন না। তিনি চলিত ভাষার সহিত দীর্ঘ সমাসভরাক্রান্ত সংস্কৃত পদাবলীর সংমিশ্রণ দেখিতে পারিতেন না। তিনি গুরু-চণ্ডালী ভাষার নিন্দা করিতেন। নূতন সংস্কারকগণের সঙ্গে তাঁহার এই খানে মতান্তর লক্ষিত হইত। নতুবা তিনি নূতন সংস্কারকগণ অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর ছিলেন। তিনি কেবল ভাষার সরলতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিতেন না, ভাষার সহিত ভাবও যাহাতে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় তদ্বিষয়ে লেখকগণকে অবহিত হইতে উপদেশ দিতেন। কেবল "হচ্ছি," "কচ্ছি" ইত্যাদি কথ্য-ভাষা ব্যবহার করিলে রচনা সহজবোধ্য হয় না। অনেক সময় সহজ কথা ব্যবহার করিয়াও লেখকগণ তাহাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট করিতে পারেন না। তিনি ভাব ও ভাষা উভয়ই যাহাতে সরল ও বোধগম্য হয় তজ্জন্য লেখকগণকে অনুরোধ করিতেন। তিনি যে সরল ও সহজ ভাষার কতদূর অনুরাগী ছিলেন তাহা আমি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনা সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় শ্রবণে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তিনি এক দিন বলিলেন "দেখুন, শাস্ত্রী মহাশয়ের বাঙ্গালা আমার খুব ভাল লাগে—উহা খাঁটী বাঙ্গালা। অত বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অথচ উহার রচনায় সংস্কৃত শব্দ কিংবা দীর্ঘ সমাসভরাক্রান্ত পদ প্রায়ই দেখা যায় না। কেমন সহজে বক্তব্যটী বলিয়া যান। যদি ভাষার নব্যসংস্কারকগণ

ইঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন তাহা হইলে কোনও কলহের কারণ থাকে না।"

শেষ-জীবনে সুরেশচন্দ্র 'বসুমতী' 'সন্ধ্যা," 'নায়ক', 'বাঙ্গালী' প্রভৃতি সংবাদ পত্রের সম্পাদন করিয়াছিয়াছিল। এই সকল সংবাদ পত্রের রচনার ভাষা বিষয়ানুসারে কোথাও গম্ভীর, কোথাও প্রাঞ্জল, কোথাও ওজস্বিনী, কোথাও আবেগময়ী, কোথাও সরল ব্যঙ্গরহস্যসমুজ্জল। বাক্যবিন্যাসে ও শব্দচয়ন নৈপুণ্যে তিনি বিরলপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন। তাঁহার রচনায় এমন একটী বিশিষ্টতা আছে যে সংবাদ পত্রের স্তম্ভে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কোন্ প্রবন্ধগুলি তাঁহার রচিত অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। এই সকল রচনার মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থায়ী ভাণ্ডারে রক্ষিত হইবার যোগ্য এবং সমাজপতি-স্মৃতি-সমিতি সুরেশচন্দ্রের অননুকরণীয় রচনাগুলির একটী সংগ্রহ পুস্তক প্রকাশ করিতে পারিলে উত্তরবংশীয়গণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

সুরেশচন্দ্র ভাষা ও ভাবের প্রসাধনে অত্যধিক যত্ন লইতেন। তাঁহার গদ্য পদ্যের ন্যায় শ্রুতিমধুর, ও আবেগময়ী: সুরেশচন্দ্রের সন্দর্ভগুলির একটী প্রধান গুণ ছিল—অসাধারণ সংযম। তিনি অবান্তর কথায় প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া অতি সংক্ষেপে বক্তব্য বিষয়টী এমন ভাবে বলিতেন যে, তাহা পাঠ করিলে পাঠকের মনের উপর তাহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া ঘটিত। তাঁহার লিখিত কোন কোন পরলোকগত মহাত্মার মৃত্যু-বিষয়ক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠে তাঁহাদের বিস্তৃত জীবনচরিত পাঠাপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়। ঋষিকল্প ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর তৎসম্বন্ধে সুরেশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিয়া একদা আমি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলে সুরেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, তিনি উহার এক একটী প্যারাগ্রাফে কতকগুলি মন্তব্য এরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে উহার প্রত্যেকটীতে ভূদেবের ভবিষ্যত চরিতকার এক একটী পরিচ্ছদের রচনার উপকরণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এদেশের অধিকাংশ লেখকের এরূপ ভাষার ও ভাবের ঘনীকরণের প্রতি লক্ষ্য নাই।

সুরেশচন্দ্রের তিরোধানে আজ বাঙ্গলা সাহিত্যের অবস্থা পুনরায় হুতোম-বর্ণিত বেওবাস্নিশ ময়দার অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। সাহিত্যে দুর্নীতি, উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছাচারিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কোথায় আজ বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচক-সম্রাট্, যাঁহার উদ্যত দণ্ডের সম্মুখে সাহিত্যের যথেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা অবনমিত ও উৎপাত হইবে? সুরেশচন্দ্রের ত্যক্ত সিংহাসন আজিও শূন্য রহিয়াছে। তাঁহারই ভাষায় আজ তাই আহ্বান করিতেছি:—"কে আছ সব্যসাচী, তাঁহার গাণ্ডীব কুড়াইয়া লও।" তাঁহার জীবন-ব্যাপী ব্রত উদ্‌যাপন কর,তাঁহার জীবনের স্বপ্ন সফল কর:—"যাহার অনাবিল দৃষ্টির শুভ্র পবিত্র কিরণে, ধীরে ধীরে সমগ্র শিশু মানবগণের ক্ষুদ্র হৃদয় ক্রমে বিকসিত ও মহত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার প্রসাদে আমাদের সাহিত্য ক্রম-বিকসিত হউক; সত্য ও সৌন্দর্য্যের দীপ্ত প্রতিভায় আমাদের দীন সাহিত্য আলোকিত হইয়া উঠুক।"*

* সমাজপতি-স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সুরেশচন্দ্রের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

পূর্ব্ব ও পর

(গল্প)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বৈশাখের দ্বিপ্রহর বেলা।

তপ্ত পথে ধুলা উড়াইয়া বাস্ ছুটিয়া চলিতেছে। মহেশডাঙা পাড়িয়া রহিল এক ক্রোশ পিছনে। ধূলিজালে আর তাহাকে দেখা যায় না! বামদিকে বোগ্‌লোর শস্য-শূন্য শুষ্ক প্রান্তর, তাহার পরে কালিগঙ্গা। দক্ষিণে সাল্‌তিপুর; আর সম্মুখে চারক্রোশের মাথায় তালবেড়ে, যেন বহু দূরের কল্পনা—ঝাপ্‌সা অথচ কয়েকটী স্থূল রেখাবদ্ধ।

বাসখানি যাত্রীপূর্ণ কিন্তু সকলেই বসিবার মত ঠাঁই পাইয়াছে। তাহাদের নিঃশ্বাসে ও দেহের তাপে ভিতরে দুঃসহ গরম। তাহার উপর আবার দু' পাশের পর্দ্দা ফেলা। মাঝে মাঝে পর্দ্দা দু'খানি উড়াইয়া ঝলকে ঝলকে প্রান্তরের তপ্ত হাওয়া প্রবেশ করিতেছে। বাহিরের প্রকৃতি স্তব্ধ। কোথাও একটি মানুষ নাই, শুষ্ক আকাশ-পথে একটা পাখীও উড়িয়া যাইতেছে না। ধরিত্রী যেন দুঃসহ পিপাসায় ক্ষুব্ধ ও ম্লান।

হঠাৎ সাল্‌তিপুরের প্রান্তসীমায় জোড়া বটতলায় বাসখানি থামিল। বটের ছায়ায় একটী লোক দাঁড়াইয়া ঘামে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত। সম্মুখে মাটিতে এক কাঁদি কচি ডাব ও দু'টী বৃহৎ কালো রংয়ের তরমুজ পড়িয়া আছে। বাসখানি তাহারই জন্য থামিয়াছিল। কিন্তু কন্‌ডাক্টর একবার তাহার দিকে, একবার ডাব ও তরমুজগুলির দিকে তাকাইয়া বলিল, "জায়গা হ'বে না।"

লোকটী করপুটে বলিল, "দোহাই ভাই, বড় দরকার—"

"কোথা যাবে?"

"তালবেড়ে।"

"না—হ'বে না। এই ছাড়্—"

তাহার অনুজ্ঞায় বাসখানি একটু নড়িল মাত্র, কিন্তু চলিল না।

ড্রাইভার বলিল, "নে তুলে। কিন্তু ভাড়া লাগবে দু'জনের।"

লোকটি মাথা নাড়িয়া জানাইল, তাহাও সে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু বাসের মালিক পূর্ব্ব রাত্রে কন্‌ডাক্‌টার ও ড্রাইভারকে পৃথক ভাবে গোপনে ডাকিয়া তাহাদের হাতে গাড়িখানি ও পরস্পরের ভার তুলিয়া দিয়াছেন। কন্‌ডাক্টার হাঁকিয়া বলিল, "না, নেব না। চালাও গাড়ি—"

ড্রাইভারও চীৎকার করিয়া বলিল, "তোকে নিতেই হ'বে।" বলিতে বলিতে সরোষে নামিয়া ছুটিয়া আসিল। কন্‌ডাক্‌টারেরও শিরায় বঙ্গবীরের রক্ত; সেও এক পা মাটিতে নামাইল।

"কি হ'য়েছে রে?" ভদ্রলোকটি বাসে উঠিবার পথে এক প্রান্তে বসিয়া এতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। দ্বন্দ্ব-রোলে তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিল নীচের সেই লোকটা। বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা, জায়গা নেই বলে আমায় উঠ্‌তে দেবে না।"

"দেবেই না তো। বস্‌বে কি লোকের মাথার ওপর?"

"আমি দাঁড়িয়েই যাব।

"কোথায়?"

"তালবেড়ে।"

"কার বাড়ী?"

"ঈশান ডাক্তারের—"

"কেন?

"আমার অসুখ।"

"হুঁ।" ভদ্রলোকটি আরও রুক্ষ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "অসুখ তো ঐ ডাবগুলো আর তরমুজ দুটো কি কর্‌বি? গিল্‌বি না কি?"

"তাঁর জন্যে নিয়ে যাচ্ছি —"

"তবে আয় উঠে।"

লোকটী উঠিয়া ভদ্রলোকটীর পায়ের কাছে ডাবের কাঁদি ও তরমুজ দু'টি ফেলিয়া রাখিল। যোদ্ধাদ্বয়ও আর দাঁড়াইল না, আস্ফালন করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেল।

আবার বাস ছুটিয়া চলিতেছে ভদ্রলোকটী বলিলেন, "ঈশান ডাক্তারকে আগে কখনও দেখিছিস?"

লোকটী বলিল, "দেখি নাই কিন্তু নাম শুনেছি।"

"আমারই নাম ঈশান ডাক্তার—"

তালবেড়ের ঈশান ডাক্তারের নাম পাঁচ-সাতখানা গ্রামের মধ্যে কে না জানে? লোকটীর গলা মেজাজ ও বিদ্যা পরিমাপ করিলে মাথায় মাথায় হয়। তাঁহার নামে মরা মানুষও না কি হঠাৎ উঠিয়া বসে।

ডাব-তরমুজগুলি ঈশান ডাক্তারের পায়ের কাছে মাথা কুটিতেছিল। সেগুলির পানে তাকাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কি অসুখ রে? আচ্ছা ওসব এখন থাক পরে হ'বে। একটা ডাব খাওয়াতে পারিস্? তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ—"

লোকটী একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "কাটারী নেই বুঝি? বেটা ডাব আন্‌লি আর কাটারীর কথা মনে রইল না?"

বাসের আর এক প্রান্ত হইতে একজন বলিল, "কর্ত্তা কাটারী আমার কাছে আছে। এই নাও গো—" বলিয়া কাটারীখানা আগাইয়া দিল।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর নাম কি রে?"

"চৈতন্য।"

"কৈবর্ত্ত—"

"আজ্ঞে।"

"নে—কাট্—কাট্—"

চৈতন্য কাটারীখানি প্রথমে নিজের চাদরে বেশ করিয়া মুছিয়া লইল। তারপর কচি দেখিয়া একটা ডাব বাছিয়া লইয়া কাটিয়া মুখ ছাড়াইয়া ডাক্তারবাবুর হাতে তুলিয়া দিল। ডাক্তারবাবু জলটুকু নিঃশেষে পান করিয়া শূন্যগর্ভ ডাবটীকে বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া একটী পরম তৃপ্তির উদ্গার ছাড়িলেন। তারপর চাদরে মুখ মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কি অসুখ রে চৈতন্য?"

"আজ্ঞে কর্ত্তা দেখুন" বলিয়া চৈতন্য হাত দু'খানা তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিল—"এ কিছুতেই সারছে না।"

ডাক্তারবাবু চৈতন্যের নখগুলির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এবার দেখিলেন, মুখের দুই কোণেও ক্ষুদ্র দুটী ক্ষত চিহ্ন! "এ যে কুষ্ঠ! কি করলি? ঐ হাতে আমায় ডাব খাওয়ালি?"

দুষ্ট ব্যাধির নাম শুনিয়া চৈতন্যরও মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। কুষ্ঠ! সে অসহায়ের মত বলিতে লাগিল, "দোহাই ডাক্তারবাবু, আমায় রক্ষে করুন।"

ঈশান ডাক্তারের পাকস্থলীটা তখন ঘৃণায় উঠিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে। ক্রোধ ও আতঙ্কে সারা মন আচ্ছন্ন। তিনি ক্ষিপ্তের মত বলিতে লাগিলেন, "নেমে যা। নাম শীগ্‌গির। এই মাথনা থাম। বাস্—"

বাস্ থামিল। চারিদিকে ছায়াহীন, জলহীন, শুষ্ক বিস্তীর্ণ প্রান্তর। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে।

"নাব, নাব।"

"ডাক্তারবাবু—" চৈতন্য তাঁহার পা দুটী জড়াইয়া ধরিল।

ডাক্তারবাবু দারুণ ঘৃণায় পা দুটী ছাড়াইয়া লইতে লইতে বলিলেন, "নাব আগে—"

চৈতন্যর চোখ ছাপাইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। "ডাক্তারবাবু—"

"ও রোগের অষুদ আমার কাছে নেই।" ঈশান ডাক্তারের ইচ্ছা করিতেছিল, নিজের ভিতরটা টানিয়া ছিঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। তাঁহার জিহ্বা ও ঠোঁট দুটী জ্বালা করিতেছে। গলার ভিতর অজানা কি যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে। নিঃশ্বাসে এখনও চৈতন্যের মুখের দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন।

চৈতন্য তখনও দাড়াইয়া আছে। ঈশান ডাক্তার

সক্রোধে ডাবের কাঁদি ও তরমুজ দু'টো পা দিয়া নীচে ফেলিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "এখনও নামলি নে? সকলকে মারবি?"

চৈতন্যর মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। সে অভিভূতের মত নীচে নামিতে নামিতে শুনিল, বাসের কোণ হইতে সেই কাটারীর মালিক তাহাকে যেন বলিতেছে, "ঐ কালিগঙ্গার ওপারে শিবতলীর ঘাটে শাস্তিনাথ তলায় হত্যে দিয়ে আমাদের—" বাকিটুকু আর শোনা হইল না। বাসখানি তাহাকে সেই বিজন প্রান্তরে একলা ফেলিয়া আবার ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

* * *

সপ্তাহ দুই পরে—

তিনখানা গ্রামে তখন কলেরার মড়ক লাগিয়াছে। চিতাধূমে আকাশ ম্লান। আচম্বিত আর্তনাদে পল্লীবাট সচকিত হইয়া ওঠে। ঈশান ডাক্তারের মরিবারও সময় নাই। সারাদিনমান গ্রামে গ্রামে ঘোরাঘুরি চলিতেছে, এমন কি, রাত্রেও নিস্তার নাই। সকলেই বলে, এখনই যাইতে হইবে।

সেদিন তিনি গিয়াছিলেন সেই কালিগঙ্গার ওপারে শিবতলী ছাড়াইয়া দাসুড়ে। ফিরিবার যান-বাহনের ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই। বেহারাও বাঁকিয়া বসে। অগত্যা একাকী পদব্রজে ফিরিতেছেন। ইচ্ছা, শিবতলীর ঘাট হইতে নৌকায় গৃহে যাইবেন।

তরুবীথিতল দিয়া পথ। ঝোপে ঝোপে শিয়ালকাঁটা ও কলিকাসুন্দীর হলদে ফুলগুলি ফুটিয়া আলো করিয়া আছে। মাঝে মাঝে ভাঁট-জঙ্গল, সাদা ফুল, ম্লান গন্ধ। মাথার উপর ফল-ভরা তরুশাখা—আম, জাম। দু' চারটী জামরুল গাছও দেখা যায়। তাহার ফুলগুলি ঝুর্ ঝুর্ করিয়া ঝরিয়া পথের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে। পাকা গোলাপ জামের গোলাপীগন্ধে পথতল ভরপুর। দূরে কোথায় পাতার তলে বসিয়া একজোড়া কুড়া পাখী পাল্লা দিয়া জল-তরঙ্গের সুরের নকল করিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া দোয়েলের শীষ্ ভাসিয়া আসিতেছে। ঈশান ডাক্তারের পা দুটী কেমন জড়াইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু ওদিকে বেলাও পড়িয়া আসিয়াছে, গৃহও বহুদূর। অলস ভাবটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দ্রুত পায়ে চলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিবতলীর শান্তিনাথ-মন্দিরের ত্রিশূল দেখা গেল—গাছ-পালার মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে যেন কালো তিনটী সাপ। একটা নীলকণ্ঠ পাখী তাহার উপর বসিয়া ক্রুদ্ধ স্বর ছড়াইতেছিল। ঈশান ডাক্তার মন্দিরের দিকে না গিয়া দক্ষিণে কুমোর পাড়ার কোল দিয়া বাঁশতলা ঘুরিয়া ঘাটে নামিলেন।

কিন্তু শূন্য ঘাট। কোথাও একখানি যাত্রী-নৌকা চোখে পড়িল না। কেবল একখানি ছোট পান্‌সী কিছু দূর দিয়া ধীরে চলিতেছিল। ভাব দেখিয়া মনে হইল, তখনই কাছে কোথাও হইতে ছাড়িয়াছে। তাহার মুখও তালবেড়ের দিকে।

তিনি সেখান হইতেই হাঁকাহাঁকি দর-দস্তুর সুরু করিলেন। মাঝি প্রথমে আপত্তি করিল। কিন্তু ব্যাপারীও অনুপস্থিত, ভাড়াও লোভনীয়। পরিশেষে রাজী হইয়া ডাক্তারবাবুকে তুলিয়া লইল। বলিল, "যাত্রী আছে একটী মালও আছে অল্প। একটী নামিবে সাল্‌তিপুর, আর একটীকে নামাইতে হইবে, তালবেড়ের ওধারে, তাই। নতুবা—"

ডাক্তারবাবু ছইয়ের নীচে মাল ও যাত্রীর দিকে মনোযোগ দিলেন না; হাতের ব্যাগটা পাটাতনের উপর রাখিয়া ছইয়ের উপর উঠিয়া বসিলেন।

খরস্রোতা নদী; গভীর তাহার জল। মন্থর বাতাসে ছোট পালখানি তুলিয়া পানসী উজানে চলিতে লাগিল। একটা বাঁক ছাড়াইয়া ধারাটী আরও প্রশস্ত হইয়াছে। একদিকে বিরাট্ চর; তাহার বুক জুড়িয়া বিরাট্ ঝাউ বন গজাইয়া উঠিয়াছে। আর একদিকে সু-উচ্চ তীর। চলিতে চলিতে সন্ধ্যার কাছাকাছি সাল্‌তিপুরের তরুরেখা দেখা গেল। সম্মুখের বাঁকটী ছাড়াইলেই তাহার ভাঙাঘাট। হঠাৎ উত্তর-পশ্চিম কোণে দু' ঝলক বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সকলে তাকাইয়া দেখে, সেদিককার আকাশখানা রক্তমেঘে লেপিয়া গিয়াছে। বাতাসও স্থির, নদী শান্ত।

মাঝি তৎক্ষণাৎ পাল নামাইল; দাঁড়িরা দাঁড়ে বসিল।

কিন্তু পান্‌সি হাত কয়েকও যায় নাই, হঠাৎ এক বিপুল দোলায় ধরণী ছলিয়া উঠিল। ঝঞ্ঝার হু হু শব্দ কাণে আসিতেছে। আকাশময় মেঘের জটাজাল ছড়াইয়া তীরের গাছ-পালা ভাঙ্গিয়া নোয়াইয়া ধুলা-বালি উড়াইয়া বৈশাখী ঝড় ছুটিয়া আসিল। সেই সঙ্গে নদী-রাক্ষসীও নাচিয়া উঠিল লক্ষ জিহ্বা মেলিয়া। আবর্ত্তপথে এক একবার হাঁক ছাড়ে। নৌকাখানিকে নাচায়, আবার স্রোতে টানিয়া লয়, পরক্ষণেই আবার ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দেয়। কখনও কখনও হাত দিয়া লোকগুলিকে স্পর্শ করে।

ডাক্তারবাবু ততক্ষণে পাটাতনের উপর দাঁড়াইয়া মাস্তুল আঁকড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিতেছিলেন, "চালাও, মাঝি চালাও—"

কিন্তু তীরের দিকে নৌকার মুখ ফিরান মাঝির সাধ্যাতীত। শান্তিপুরের যাত্রীটিও তখনই ছইয়ের মধ্য হইতে সভয়ে বাহির হইয়া তাঁহার একেবারে গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারও একখানি হাত মাস্তুলের গায়ে। সে বলিল, "সব মিছে কর্ত্তা। এখন ভগবান যা করেন—"

ডাক্তারবাবু ফিরিয়া দেখেন চৈতন্য! কিন্তু ডাক্তারবাবু সরিয়া দাঁড়াইলেন না, বলিলেন, "কি হ'বে চৈতন্য?"

চৈতন্য হাত তুলিয়া আকাশ পানে দেখাইল। তাহাতে কেহই ভরসা পাইল না। বাতাস আরও জোরে বহিতেছে বৃষ্টিও সুরু হইল। অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। তীর-তট মুছিয়া গিয়াছে। বিদ্যুতের ঝলকে ঝলকে প্রকৃতির ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি প্রকট হইয়া ওঠে; মনে আতঙ্ক জাগাইয়া দেয়। হঠাৎ বাতাসের প্রবল ধাক্কায় নৌকাখানি উল্টাইয়া মাঝিরা কে কোথায় ভাসিয়া গেল। ঈশানডাক্তার এক ঢোক জল খাইয়া ঢেউয়ের উপর ভাসিয়া উঠিলেন। চৈতন্য পড়িয়াছিল তাহার পাশে। তিনি দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহার কি যেন বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জলের ঝাপ্টায় মুখের কথা বাহির হইল না। চৈতন্যও নিজকে তাহার কবল হইতে মুক্ত করিবার প্রাণপণ প্রয়াস পাইতে লাগিল। কিন্তু ঈশানডাক্তারের আলিঙ্গন ক্রমে মৃত্যুসম কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। টানাটানি করিতে করিতে উভয়েই তলাইয়া গেল। আবার ভাসিয়া উঠিল। চৈতন্য তখন মুক্ত। ডাক্তারবাবু এবার তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিলেন। শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে; সারা দেহ ভারি হইয়া উঠিয়াছে; হাত পা আর চলে না। তিনি হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন—"চৈতন্য, বাঁচা—এক শো টাকা—"

অর্থের বিনিময়ে বাঁচান অপেক্ষা বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা চৈতন্যের প্রবল। তাহারও হাত-পা অবশ হইয়া আসিয়াছে। সে আবার ডাক্তারবাবুকে ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। প্রবল ঝাকানি দিয়া নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে, ডাক্তারবাবু তাহাকে আরও জোরে আঁকড়াইয়া ধরিলেন। সে সেই অবস্থায়ই তাঁহাকে লইয়া ধীরে সাঁতরাইয়া চলিল। কিন্তু তাহাদের চালাইতে লাগিল স্রোত ও ঢেউ। অল্প কিছুদূর গিয়াই তাহারা শুনিতে পাইল, সম্মুখেই স্রোতধারা বিকট শব্দ তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কোন আবর্ত্ত ভাবিয়া উভয়েই প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিল। কিন্তু শব্দটা ক্রমে কাছে আসিয়া দুজনকে যেন সহসা চাপিয়া ধরিল। গাছটা পড়িয়াছিল কিছুক্ষণ আগে; নদী তখনও তাহাকে টানিয়া লয় নাই। সেইটা ধরিয়া দু'জনে কূলে উঠিয়া পড়িলেন। এদিকে ঝড়-বৃষ্টির একটুও বিরাম ঘটে নাই। মাঝে মাঝে ভগ্নশাখার আর্ত্তনাদ শোনা যায়। দু'জনে কূলেই এক জায়গায় গুড়ি-গুড়ি মারিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর আরও কিছুকাল হাঁকাহাঁকি মাতামাতি করিয়া ঝঞ্ঝা যেমন আচম্বিতে আসিয়াছিল, দলবল লইয়া তেমনি হঠাৎ চলিয়া গেল।

ঈশানডাক্তার সেই রাত্রেই চৈতন্যের চেষ্টায় গৃহে রওনা হইলেন। যাইবার কালে বলিয়া গেলেন, "চৈতন্য, কাল সকালে যাস্, ওষুদ দেব—'

* * *

পরদিন তখন খানিক বেলা উঠিয়াছে। ঈশানডাক্তার ডিস্‌পেন্সারী ঘরে বসিয়া কম্পাউণ্ডারকে সেদিনকার বাজারের ফর্দ্দটা বুঝাইয়া দিতেছেন। বারান্দায় তাঁহার ছোট ছেলে ভোম্বল ক্রীড়ায় রত। চৈতন্য গিয়া দরজার বাহিরে দাড়াইল। তাহার হাতে তৈলে-লাল একখানি বাঁশের লাঠি। সেখান হইতেই নমস্কার করিয়া বলিল, "কর্ত্তা?"

ডাক্তারবাবু চসমার ভিতর হইতে বলিলেন, "বোস।'

বারান্দার একপ্রান্তে একখানি বেঞ্চি ছিল। চৈতন্য ডাক্তারবাবুর অনুজ্ঞায় তাহার উপর বসিতেই তিনি বলিলেন, "ওখানে নয়। ঐ আমতলায়—" বলিয়া বহিরাঙ্গনে আম্রবৃক্ষটী দেখাইয়া দিলেন।

চৈতন্য উঠিয়া গিয়া সেখানে বসিল। ভোম্বলের দৃষ্টি পড়িল, তাহার লাঠিখানার উপর। সে বারান্দা হইতে নামিয়া ছুটিতে ছুটিতে একেবারে চৈতন্যের ঘাড়ের উপর পড়িয়া লাঠিখানা চাপিয়া ধরিল। ডাক্তারবাবু ঘরের ভিতর হইতে ভীত কণ্ঠে কম্পাউণ্ডারকে বলিলেন, "ও হে পরিতোষ ধর ধর—লোকটার কুষ্ঠ হ'য়েছে দেখছ না?"

পরিতোষ ছুটিয়া গিয়া ভোম্বলকে চাপিয়া ধরিতেই সে ধনুকের মত বাঁকিয়া মাটীতে শুইয়া পড়িল এবং উচ্চ ক্রন্দনের রোলে ঘোষণা করিতে লাগিল, সে যাইবে না, কিছুতেই যাইবে না।

ডাক্তারবাবু হাঁকিলেন, "এই চৈতন্য, তুই উঠে গিয়ে ঐ রাস্তার ধারে বোস—"

চৈতন্য নিঃশব্দে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। তখনই পাশের গ্রামে 'কলে' যাইতে হইবে, পাল্কী প্রতীক্ষা করিতেছে। ডাক্তারবাবু ভিতরে উঠিয়া গেলেন। কিছু পরে বাহিরে আসিয়া ডিস্‌পেন্সারী ঘরের বারান্দা হইতে অঙ্গিনায় নামিতে নামিতে রাস্তার দিকে তাকাইয়া কম্পাউণ্ডারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে লোকটা গেল কোথা?"

কম্পাউণ্ডার বলিল, "ঐ দিকে—" বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে একটা দিক দেখাইয়া দিল। ডাক্তারবাবু তাহার বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কখন?"

"সেই তখনই—"

"বেটা একদম বোকা!"

বলিতে বলিতে তিনি পাল্কীতে উঠিয়া বেহারাদের বলিলেন, "চল্।"

বেহারারা তাঁহাকে কাঁধে তুলিয়া আমবাগানের মধ্য দিয়া হুম্ হুম্ শব্দে ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

৺সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীকরুণাময় বসু

বাণী মন্দিরে ভক্ত-পূজারি, পুণ্য সাধনাখানি
উড়িয়া উড়িয়া হোমশিখারূপে উর্দ্ধে উঠেছে জানি।
কত বিদেশের তীর্থ সলিলে
বাণী পদতল ধোয়াইয়া দিলে,
মণি-মঞ্জুষা খুলে দিলে ভূষা কত বরণের রূপে।
বিদায়ের বেলা আরতি করিলে চীনের গন্ধ ধূপে।
মুক্ত করেছ আত্মারে তুমি
প্রতি তীর্থের রেণুকণাচুমি;
ফিরিলে কুঞ্জে ছন্দনূপুরে আনন্দ করি' দান,
ছুঁড়িয়া মারিলে অভ্র-আবীর, তুলিলে রসের বান।

কনক-কাঠিতে ফুটাইয়া তোল ফুলের কমল প্রাতে।
মিলাইয়া দিলে রাখালের বেণু ভাবুকের বীণা সাথে
ধূপের ধোঁয়ায় যে ধ্যানের ছবি
অন্তরতলে আঁকিয়াছ কবি,
প্রাণের আড়ালে সঞ্চারী হ'ল রসের শুভ্র শিখা।
পরায়ে দিয়েছ বিমূঢ় ললাটে যৌবন-রাজটীকা।
তুমি চলে গেছ অনন্ত পারে
স্বর্গ-সভায় গান রচিবারে;
কি দিয়া পূজিব ছন্দের গুরু, ছন্দের মহারাজ।
লহ' এ কবির প্রাণের অর্ঘ্যচক্ষের জলে আজ।

পুস্তক-পরিচয়

অদ্বৈতসিদ্ধি।—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। অনুবাদক—কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের বেদান্তাদি-দর্শন শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ, ৬নং পার্শি-বাগান লেন, কলিকাতা। প্রথম ভাগ—পৃঃ ১৬+১৬+১২+৮+৪৩২+৩৬৭+৫১ ; দ্বিতীয় ভাগ—পৃঃ ১০২+৩৩+(৩৬৭—৯৫২)+(৫২—১১৫)। মূল্য একত্রে দুই ভাগ—দশ টাকা।

নব্য অদ্বৈত-বেদান্ত চিন্তাস্রোতে বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠ দান মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধি। তবে কেবল বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠ দান বলিলে পরিচয় নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। নব্য অদ্বৈত-চিন্তা-বেদান্ত-ধারার পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত সমগ্র ভারতে যে সকল বাদগ্রন্থ রচিত হইয়াছে, অদ্বৈতসিদ্ধি সে সকলের মুকুটমণি স্বরূপ। জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়ে মহিমমণ্ডিত বাঙালা সন্ন্যাসী শ্রীমধুসূদনের প্রোজ্জ্বল প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে এই অদ্বৈতসিদ্ধিতে। ইহা বাঙ্‌লার পরম গৌরব—ভারতের অমূল্য জাতীয় সম্পদ্‌।

দর্শনের ক্ষেত্রে একদিন ভারত বিশ্বের সকল দেশকে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া অগ্রগামী হইয়াছিল। আবার ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে নব্যন্যায়ের বিচারপদ্ধতির সূক্ষ্মতা ও প্রাচীন বেদান্তের গাম্ভীর্য্য একরূপ অতুলনীয়। নব্যন্যায়ের বিচার প্রক্রিয়া ও প্রাচীন বেদান্তের সিদ্ধান্ত—এ উভয়ের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণের ফলে নব্য বেদান্ত-চিন্তাধারার উৎপত্তি। আর অদ্বৈতসিদ্ধি নব্য বেদান্তের চরম পরিণতি। অদ্বৈতসিদ্ধি অধ্যয়ন না করিলে যে বেদান্তজ্ঞান একরূপ অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অদ্বৈতসিদ্ধির পরিচয় না হইলে যে ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত প্রকৃত পরিচয় হইল না—একথা দার্শনিকমাত্রেই মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিবেন।

অদ্বৈত আচার্য্যগণের মধ্যে মধুসূদনের স্থান অতি উচ্চে। প্রাচীনযুগে দাক্ষিণাত্যে লোকগুরু মহাজ্ঞানী ভগবৎ পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীশঙ্কর—মধ্যযুগে মধ্যভারতে শস্ত্র ও শাস্ত্রে সমান সুপণ্ডিত সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীবিদ্যারণ্য স্বামী (মাধবাচার্য্য) ও নব্যযুগে এই বাঙ্‌লাদেশে একাধারে জ্ঞান ও ভক্তির প্রকৃষ্ট আধার শ্রীমধুসূদন সরস্বতী—এই তিনজনকে অদ্বৈতবেদান্তের তিনটী প্রধান স্তম্ভ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীমধুসূদন আমাদের সোনার বাঙ্‌লার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ার উনসিয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। রাজেন্দ্রবাবু তাঁহার সুদীর্ঘ ভূমিকায় নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহপূর্ব্বক মধুসূদনের একটী বিস্তৃত জীবনেতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। আবাল্য সংসার-বিরাগী মধুসূদন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপালাভের আশায় কৈশোরেই গৃহত্যাগ করেন। নবদ্বীপে মহাপ্রভুর দর্শন না মিলায় তিনি তথায় ন্যায়শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অতঃপর গৌড়ীয় মতানুযায়ী একখানি দার্শনিক গ্রন্থ লিখিবার অভিলাষে তাঁহার অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত জানিবার আগ্রহ জন্মে। তদনুসারে তিনি বারাণসীধামে অদ্বৈত-বেদান্ত, মীমাংসা প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অদ্বৈতবেদান্ত অধ্যয়নের পর তাঁহার গৌড়ীয় দর্শনের প্রতি আকর্ষণ একেবারেই লোপ পাইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতবেদান্তই জ্ঞান-সমুদ্রের শ্রেষ্ঠ রত্ন। সেই হেতু তিনি সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক অদ্বৈত সম্প্রদায়ভুক্ত হন। তৎকালে দাক্ষিণাত্যে মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্য ব্যাসতীর্থ অদ্বৈতমত খণ্ডনের নিমিত্ত

"ন্যায়ামৃত" নামক কূটতর্কঘটিত একখান গ্রন্থ রচনা করেন। মধুসূদনও তাহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদানার্থ "অদ্বৈতসিদ্ধি" নামক নব্যবেদান্তবাদগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহু বিষয় রাজেন্দ্রবাবুর প্রথমভাগের ভূমিকায় গ্রন্থকার পরিচয়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভূমিকাটীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ হইতেছে গ্রন্থ পরিচয় (অর্থাৎ—গ্রন্থমধ্যে যে যে প্রতিপাদ্য বিষয় দার্শনিকভাবে আলোচিত হইয়াছে, সে সকলের একটী সরল বিশ্লেষণ) ও অদ্বৈতচিন্তাস্রোতের ধারাবাহিক ইতিহাস। অদ্বৈত-বেদান্তের চিন্তাধারায় অদ্বৈতসিদ্ধির স্থান যে কত উচ্চে, তাহা এই ভূমিকা পাঠ করিলেই সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। ভূমিকার এই অংশটী সত্যই নূতন—রাজেন্দ্রবাবুর মৌলিক গবেষণার ফল। ভবিষ্যৎ গবেষকগণ যে ইহা পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা ছাড়া রাজেন্দ্রবাবু ভূমিকামধ্যে বিস্তৃতভাবে ন্যায়-শাস্ত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধি পাঠের কি কি ফল, তাহার ইঙ্গিত করিতেও ছাড়েন নাই। পরিশেষে তিনি মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তগুলির একটী সংক্ষিপ্তসার প্রদান করিয়া সার্দ্ধচারিশতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাটীকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

দ্বিতীয়ভাগের ভূমিকাটী অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর। ইহাতে রাজেন্দ্রবাবু অদ্বৈতসিদ্ধি পাঠে প্রবৃত্তির প্রতি আধুনিক বাধাপঞ্চকের নিরাকরণ করিয়াছেন। ক্রমোন্নতিবাদ, বেদের পৌরুষেয়তাবাদ, বেদোক্ত পরস্পর বিরুদ্ধ মত সমূহের সত্যতাবাদ, মহর্ষিগণের ভ্রান্ততাবাদ ও জীবজ্ঞানের স্বোৎপত্তিবাদ—এই মতবাদগুলি রাজেন্দ্রবাবু সুকৌশলে অখণ্ডনীয় যুক্তিপ্রয়োগে একে একে নিরাকৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে একশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা আপনাদিগকে বাহিরে অদ্বৈতবেদান্তের অনুরাগী বলিয়া প্রকাশ করিলেও প্রচ্ছন্নভাবে ক্রমোন্নতিবাদেরই পোষকতা করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাব ও সম্প্রদায়সিদ্ধ শিক্ষাগুরুর নিকট অদ্বৈতবেদান্ত শিক্ষার অভাবপ্রযুক্ত অদ্বৈতবেদান্তের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে গভীর অজ্ঞতাই—ইহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে। অথচ ইহারা নিজেরা নিজেদের নিকটেও এই ত্রুটীটুকু স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। ইহা একরূপ আত্ম-প্রতারণামাত্র। আর সাধারণ ব্যক্তিগণও এই সকল ব্যক্তির পাশ্চাত্য শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরে বিমুগ্ধ হইয়া ইহাদের প্রদর্শিত প্রচ্ছন্ন ক্রমোন্নতিবাদের পথকেই অদ্বৈত-জ্ঞানমার্গ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ক্রমোন্নতিবাদের অসারতা ও উহার সহিত অদ্বৈতমতের পার্থক্য যুক্তিবলে প্রতিপাদনপূর্ব্বক রাজেন্দ্রবাবু এই সকল কপট বৈদান্তিকের প্রতারণা ভাল করিয়াই ধরিয়া দিয়াছেন। বেদান্ত-শিক্ষার্থী মাত্রেরই এ জন্য রাজেন্দ্রবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ইহা তো গেল ভূমিকার কথা। এইবার মূলের পালা। অদ্বৈতসিদ্ধির তিনটী প্রাচীন টীকাই বর্ত্তমানে বিখ্যাত—বলভদ্রের সিদ্ধিব্যাখ্যা ও ব্রহ্মানন্দের লঘুচন্দ্রিকা (গৌড় ব্রহ্মানন্দী) এবং বৃহচ্চন্দ্রিকা। ইহাদিগের মধ্যে বৃহচ্চন্দ্রিকার সম্পূর্ণ অংশ বর্ত্তমানে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। লঘুচন্দ্রিকার একটী টীকা আছে—বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়ী। মুখ্যতঃ পরমতখণ্ডনের উদ্দেশ্যে এই টীকাগুলি রচিত হইয়াছিল। সেইজন্য ইহাদিগের সাহায্যে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে মূলের আশায় সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা একরূপ দুরূহ হইয়া উঠিত। সম্প্রতি নানাদর্শনপরমাচার্য্য ঋষিকল্প পণ্ডিত-প্রবর পরমপূজ্য শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহোদয় উক্ত দোষ নিরাকরণের জন্য "বালবোধিনী" নামে একটী নূতন টীকা রচনা করিয়া মূলমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। টীকাটী এতই প্রাঞ্জল যে, ইহা হইতে মূলের আশয় অতি অল্পায়াসেই বুঝা যায়। অথচ ইহাতে পক্ষ প্রতিপক্ষের যাবতীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণও বাদ পড়ে নাই। ন্যায়ামৃত, অদ্বৈতসিদ্ধি, তরঙ্গিণী, সিদ্ধিব্যাখ্যা, লঘুচন্দ্রিকা, বৃহচ্চন্দ্রিকা, বিট্‌ঠলেশোপাধ্যায়ী প্রভৃতি মাধ্ব ও অদ্বৈতসিদ্ধান্তের গ্রন্থসমুদ্র মন্থন করিয়া এই টীকাটী রচিত হইয়াছে। ইহার অপর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, খুব সম্ভবতঃ বাঙালী মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধির উপর ইহাই প্রথম বাঙালী-রচিত টীকা। * প্রথমভাগে—

* কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে বলভদ্র বাঙালী ছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মিথ্যাত্ব নিরূপণে প্রথম লক্ষণ পর্য্যন্ত আলোচিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয়ভাগে—মিথ্যাত্বের শেষ চারিটী লক্ষণ (অর্থাৎ দ্বিতীয় লক্ষণ হইতে পঞ্চম লক্ষণ) ও মিথ্যাত্বসামান্যোপপত্তি (অর্থাৎ মিথ্যাত্বটী মিথ্যা কি সত্য)—এই পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এই মিথ্যাত্বসামান্যোপপত্তি পর্য্যন্তই হইতেছে মূলের অত্যন্ত দুরূহ অংশ। অতএব, এই পর্য্যন্ত বিস্তৃত-ভাবে আলোচিত হওয়ায় বিদ্যার্থিবৃন্দের যে অনেক অভাব দূর হইল, ইহা বলিতেই হইবে।

টীকা ব্যতীত মূলের অনুবাদ, টীকার অনুবাদ ও টীকার সুবিস্তৃত তাৎপর্য্য বাঙ্‌লা ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। অনুবাদ ও তাৎপর্য্য অতি প্রাঞ্জল অথচ প্রগাঢ়। পড়িলে মনে হয় না যে দুরূহ দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদ পড়িতেছি। দার্শনিক গ্রন্থের এরূপ সরল অনুবাদ ইহার পূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। বাঙ্‌লা ভাষার উপর অনুবাদক পণ্ডিত মহাশয়ের অসামান্য অধিকারই ইহাতে সূচিত হইতেছে।

অদ্বৈতসিদ্ধি যে ন্যায়ামৃত গ্রন্থের প্রত্যক্ষর প্রতিবাদ, সেই ন্যায়ামৃতের মূল ও মূলানুযায়ী অনুবাদ গ্রন্থের প্রতি ভাগের শেষ দিকে পরিশিষ্টাকারে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থ বুঝিবার পক্ষে যে বিশেষ অনুকূলতা হইবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

মোটের উপর গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। তবে সমালোচনা করিতে বসিলে উহার দুই একটা ত্রুটি না দেখাইলে চলে না; সেই জন্য দুই একটী দোষের কথা উত্থাপন না করিয়া পারা গেল না।

প্রথমতঃ গ্রন্থের মূল ও টীকাটী বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত না করিয়া নাগরাক্ষরে প্রকাশ করিলে বাঙ্‌লা দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশের ছাত্র ও তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের নিকট নবীন টীকাটী আদর লাভ করিতে পারিত—সন্দেহ নাই। পণ্ডিতমহাশয় বাঙালী। তাঁহার টীকা অবাঙালী পণ্ডিত-সমাজে আদৃত হইলে, একরূপ সমগ্র বাঙালী জাতিই তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিত। রাজেন্দ্র-বাবুর উদ্দেশ্য এই যে, বাঙালীর লেখা অদ্বৈতসিদ্ধি বাঙ্‌লা অক্ষরেই ছাপা উচিত। অবাঙালী কেহ উহা পড়িতে চায় তো বাঙলা অক্ষর শিখিয়া উহা পড়ুক। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা ঘটিয়া উঠে না। দুই চারিজন অনুসন্ধিৎসু ছাড়া সাধারণ অবাঙালী পাঠক নাগরাক্ষরের সংস্করণ ছাড়িয়া বঙ্গাক্ষরের সংস্করণ কিছুতেই কিনিবে না—ইহা ধ্রুব সত্য কথা। আর ইহার জন্য গ্রন্থ আশানুরূপ বিক্রীত হওয়ার পক্ষে সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়তঃ, টীকাটীর সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া মুদ্রিত করা অতি অশোভন হইয়াছে। যাঁহারা অদ্বৈতসিদ্ধির মত দুরূহ গ্রন্থ পাঠে সাহস করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা যে সামান্য সন্ধিবাহুল্য ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হইবেন—এরূপ কল্পনা অতি অসঙ্গত। এই বিসন্ধিদোষটী শুধুই শ্রুতিকটু ঠেকে নাই, অনেক স্থলে টীকাটীর গাম্ভীর্য্যও কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, প্রথমভাগের ভূমিকামধ্যে মধুসূদনের একশত কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী জীবনীটী বাহুল্য দোষদুষ্ট। চতুর্থতঃ, ঐ ভাগের ভূমিকা মধ্যে যে দুইশত পৃষ্ঠা ব্যাপী ন্যায়শাস্ত্রের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকিলেও বর্ত্তমান গ্রন্থকলেবরে উহা অবান্তর বিষয়রূপেই পরিগণিত হইয়াছে। উহা পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিলে বোধ হয় শোভন হইত। পঞ্চমতঃ, টীকাটীর অনুবাদ ও তাৎপর্য্য এ উভয়ই প্রদত্ত হওয়ায় গ্রন্থ-কলেবর অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কঠিন স্থলের তাৎপর্য্যসহ ধারাবাহিক অনুবাদ দিলে বোধ হয় গ্রন্থের ভার কিছু লঘু হইতে পারিত। এই সকল অতি-বিস্তৃতি বাদ দিলে হয় তো গ্রন্থখানি এক খণ্ডেই সমাপ্ত হইতে পারিত, ও উহার মূল্যও অন্ততঃ কিঞ্চিৎপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইত। আজিকার, দরিদ্র বাঙালী ছাত্রের পক্ষে (বিশেষতঃ তিনি যদি আবার চিরদরিদ্র ব্রাহ্মণে পণ্ডিতের সন্তান হন) দশ টাকা দিয়া পুস্তক ক্রয় করা যে কতদূর কঠিন ব্যাপার, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। ষষ্ঠতঃ, যে মাধ্ব-সিদ্ধান্তের সহিত অদ্বৈতসিদ্ধির এতদূর নিকট সম্বন্ধ, সে মাধ্ব মতের আরও, একটু বিস্তৃত পরিচয় ও মাধ্ব চিন্তাস্রোতের একটি বিস্তৃত ইতিহাস ভূমিকায় সংগৃহীত হওয়া উচিত ছিল। আশা করি, পরবর্ত্তী সংস্করণে রাজেন্দ্রবাবু এ বিষয়ে একটু বিশেষ বিবেচনা করিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, একদিন বাঙালী সন্ন্যাসী

মধুসূদনের রচিত অদ্বৈতসিদ্ধি যেমন বাঙালীকে ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিল, আজ বাঙালী পণ্ডিতের রচিত এই নবীন টীকাও তেমনি বাঙালীর সে পূর্ব্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

অদ্বৈতসিদ্ধি বাঙালার গৌরবের বস্তু। অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে এই বাঙলা দেশেই এই অদ্বৈতসিদ্ধির পঠন-পাঠন লোপ হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল। পরম-পূজ্যপাদ ঋষিকল্প পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গত মহামহোপধ্যায় লক্ষণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহোদয়ের প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থের এ দেশে পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়। তাঁহারই চেষ্টায় এই গ্রন্থ সংস্কৃত পরীক্ষায় বেদান্তের উপাধির পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তথাপি অধিকাংশ বেদান্ততীর্থ পরীক্ষার্থীই এখনও অদ্বৈতসিদ্ধির বিকল্প অপেক্ষাকৃত সরল শ্রীভাষ্য পড়িয়াই বেদান্ততীর্থ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে চাহে। কেবল পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের কৃতবিদ্য বিদ্যার্থিবৃন্দই এখনও এ গ্রন্থের আলোচনাদি করিয়া থাকেন। তাঁহার সুযোগ্য অন্তেবাসিগণের মধ্যে যোগেন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত মহাশয়ের প্রাণপণ পরিশ্রমে ও শ্রদ্ধাস্পদ রাজেন্দ্রবাবুর ঐকান্তিক আগ্রহে প্রথম শিক্ষার্থিগণের অদ্বৈতসিদ্ধি আলোচনার পথ বিশেষভাবে সুগম হইয়াছে। বাঙলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ঘরে ঘরে আবার নব্য-বেদান্তের চর্চ্চা নবোদ্যমে জাগিয়া উঠুক—শ্রীভগবানের চরণে ইহাই আমাদের প্রার্থনা; আর প্রার্থনা করি, রাজেন্দ্রবাবুর এ অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক।

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

মরণ

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য্যের পর আরও কিছু আশ্চর্য্য আছে কি না কেউ যদি প্রশ্ন করে আমায়, তার উত্তরে আমি বলি, "হ্যাঁ, তা মরণ।" আমার মনে হয় মৃত্যুই পৃথিবীর প্রথম আশ্চর্য্য ও শেষ আশ্চর্য্য হ'য়ে থাক্‌বে। মানুষ পৃথিবীতে এসেছে বুকে স্নেহ ভালবাসা নিয়ে, আর তারই সঙ্গে কুসুমে কীটের মতন প্রবেশ করেছে মৃত্যু। মানুষ জানে মৃত্যুকীট দংশন করবেই একদিন তাকে, বাধা দিতে পারবে না কেহই—ধনী, নির্ধন, রাজা, প্রজা সকলকেই প্রাণ হারাতে হ'বে তারই দংশনে। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, এতই অনিশ্চিত যখন পৃথিবীতে বাস আমাদের, যে কোন মুহূর্ত্তেই সকল ছেড়ে যাবার যখন সম্ভাবনা আছে আমাদের, তখন কি নির্ভাবনায়, কি চিন্তাশূন্য হ'য়েই সংসারে আবদ্ধ থাকি—যেন চিরকালের জন্যই থাক্‌তে এসেছি এখানে। গৃহ আলোকিত করে তুলি উৎসবের দীপালী জ্বালিয়ে, আনন্দের মধুর রাগিনী বেজে উঠে হৃদয়ে প্রাণপ্রিয় পরিজনের সম্মিলনে, আবার কলহের সৃষ্টি করি আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে—মনোমালিন্যের গভীর কুয়াসা আচ্ছন্ন করে সকলকে।

এই বিরাট্ অনিশ্চয়তার উপর গড়ে উঠেছে, ধর্ম্ম, সমাজ, সভ্যতা। স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকাশ করবে এই অনিশ্চয়তা একদিন আমাদের বিরাট্ ভুল প্রমাণ করবার জন্যে, তা আমরা বেশ জানি। ইতিহাস নীরবে বহন করছে তারই সাক্ষ্য। কোথায় সেই প্রাচীন মিশর, কোথায় সেই প্রাচীন ব্যাবিলন, কোথায় সেই ভারতের প্রাচীন মহেঞ্জোদারো। তারা যখন গৌরবের উচ্চ সীমায় পৌঁছেছিল, চিরকালের জন্য তাদের লোপ করে দিল মৃত্যু ধ্বংশ মূর্ত্তি ধারণ করে—বিস্মৃতির অতল তলে তারা তলিয়ে গেল। এই তো শোচনীয় পরিণাম মানবের কীর্ত্তির! কিন্তু আশ্চর্য্য যে, সৃষ্টি আবার গড়ে উঠ্‌ছে, মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে নূতন ধর্ম্ম, নূতন সভ্যতা, নূতন

সমাজ এই অনিশ্চয়তাকেই ভিত্তি করে। ক্ষুদ্র মানবের কার্য্যাবলী দেখে অলক্ষ্যে বসে কেবলই হাসে মৃত্যু।

পৃথিবীর প্রারম্ভে, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে সুখে ঘুরে বেড়াত যে প্রথম মানব-দম্পতি, যাদের লীলায়িত চঞ্চল চরণের নৃত্য ছন্দহীন করে নি জীবনের জটিলতা; মুগ্ধ, রোমাঞ্চিত, পুলকিত করে তুলত যাদের প্রকৃতির নব নব রূপের বিকাশ, আনন্দের বেশ ধরে প্রবেশ করল দুঃখ তাদের উভয়ের জীবনে। নারীর কোলে দেখা দিল একটী শিশু প্রকৃতির এই অপরূপ খেয়ালে অবাক হয়েছিল, তারা। সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ়রহস্যানভিজ্ঞ সরল দম্পতি সেই দিন প্রথম অনুভব করেছিল এই নবজাত শিশুটীর প্রতি তাদের অন্তরের আকর্ষণ—এতদিন অসম্পূর্ণ ছিল যেন তাদের জীবন, ফুলের মতন শিশুটী এসে তাদের অন্তরের শূন্য স্থান পূরণ করলে। আনন্দে রঙীন হ'য়ে উঠ্‌ল তাদের উভয়ের জীবন। কিন্তু একদিন অতি চুপি চুপি চোরের মতন চুরি করে পালাল মায়ের কোল থেকে তাদের আনন্দের পুত্তলিকে মৃত্যু। প্রথম মানব-দম্পতির প্রাণ প্রথম কেঁদে উঠেছিল, চোখের জলে বুক ভেসে গিয়েছিল তাদের। তারপর মৃত্যুকে কত বিভিন্ন রূপেই তারা দেখেছিল। সেই দিন থেকে প্রকৃতির সন্তানদের প্রাণে মৃত্যুভয় এসেছিল—বিপদের সম্মুখীন হ'লেই মৃত্যুর কথা তাদের মনে পড়ত।

তার পর কত শতাব্দী কেটে গেল, কত যুগ কেটে গেল, প্রকৃতির সন্তান পৃথিবী ছেয়ে ফেলল। মৃত্যুর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করলে তারা জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞান-তিমির দূর করে। এই পার্থিব দেহের উপরই মৃত্যুর প্রতাপ মানুষ বুঝ্‌তে পারলে কিন্তু দেহের মধ্যে অন্তরতম যে মানবটী আছে তাকে সংহার করা মৃত্যুর তিলমাত্র সাধ্য নেই। মানব বুঝ্‌লে ক্ষণভঙ্গুর তার এই পার্থিব দেহ, ধ্বংস ইহার অবশ্যম্ভাবী আর যে মানবটী অন্তর মধ্যে গোপনে রয়েছে সে অনন্ত, অমর—জন্ম হ'য়েছে তার সৃষ্টি-কর্ত্তার জ্যোতির এক কণিকায়। সেই অন্তরের মানবটী পেতে চায় মুক্তি, ফিরে যেতে চায় তার সেই সৃষ্টি কর্ত্তার কাছে, মিশে যেতে চায় সেই দিব্যজ্যোতিতে কিন্তু অবরোধ করে রেখেছে তাকে তার পার্থিব দেহ। মুক্তিদান করে মৃত্যুই তাকে, তাই মৃত্যুকে শত্রু বলে মনে করে না মানব, মৃত্যু এখন তার পরম মিত্র। মৃত্যু আছে বলেই আবার সেই জন্মদাতার কাছে ফিরে যাবার পথ মুক্ত হ'য়ে আছে। সংসারের মায়াতে আবদ্ধ থাকে বলেই ভুলে যায় মানুষ তার ফিরে যাবার কথা—মৃত্যু পরম মিত্রের ন্যায় এসে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় সেই কথা। মৃত্যু তাই এখন মানবের কাছে বিভীষিকা হারিয়েছে, মানবের মনে আর কিছুমাত্র ভয়ের উদ্রেক হয় না মৃত্যুর নামে।

মানবের জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর উদ্দেশ্য আরও ব্যর্থ হয়েছে। সংহার রূপ ধারণ করে পৃথিবীকে সকল চিহ্নই লুপ্ত করতে চায় মৃত্যু কিন্তু বাস্তবিকই সে কি সক্ষম হয় সে কাজে? রক্ত মাংসের দেহকে ধ্বংস করে মৃত্যু কিন্তু মানবের স্মৃতিতে সে যে সজীব হয়ে উঠে পুনরায়—মানবের স্মৃতিকে পুছে ফেল্‌তে পারবে না মৃত্যু কখনই। নিষ্ঠুর দানবের মতন মায়ের কোল থেকে যখন মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে যায় শিশুকে, মণিহারা ফণিনীর ন্যায় পাগলিনীকে সান্ত্বনা দেয় স্মৃতি। কায়াহীন শিশু এসে তার কাণে কাণে চুপিচুপি বল্‌তে থাকে "এই তো মা রয়েছি আমি তোর অন্তরে, আর তো আমার হারাবার ভয় থাক্‌বে না তোর"। শোকার্ত্তা মাতা চোখ বুজে দেখ্‌তে পায় তার খোকাকে—তাই সে চোখ খুলে দেখ্‌তে চায় না পাছে তার খোকা পালিয়ে যায়। নব-পরিণীতা বধূর বুক থেকে তার প্রেমের রতনটীকে দস্যুর মতন চুরি করে নিয়ে যখন মৃত্যু পালায়, তার প্রেমের স্বপ্নজাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে একেবারে অসহায়া করে দিয়ে যায় যখন মৃত্যু, সেই সরলা অবলা বালিকার শোকের তুফানের সামনে, অগ্রসর হতে কেহই যখন সাহস করে না, তখন স্মৃতিই তার প্রমত্ত শোককে শান্ত করে, ধীরে ধীরে অতি কোমলভাবে লাঘব করে তার শোকভার। স্বপ্নে তার প্রিয়জন যেন আলিঙ্গন করে বলতে থাকে "ভয় কি আমরা তো স্বপ্নের রাজ্য গড়তে চেয়েছিলাম, এখন থেকে স্বপ্নের রাজ্যেই আমাকে দেখতে পাবে। আমি

তো তোমায় ছেড়ে যাই নি তোমার সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ থাকৃতে পারব বলেই আমাকে কায়া ত্যাগ করে ছায়া হ'তে হয়েছে।" স্মৃতি আছে বলেই পৃথিবীতে বাস করা সম্ভব হ'য়ে উঠেছে মানবের। নীরব রাত্রে নির্জ্জন গৃহে মৃত আত্মীয় প্রিয় পরিজনকে ডেকে আনে স্মৃতি, তাদের কলরবে গৃহ যেন আবার মুখরিত হয়ে উঠে। মানবের স্মৃতি যতদিন থাকবে, ব্যর্থ হবে মৃত্যুর সকল চেষ্টা।

এই যে পঞ্চভূতে মানবের দেহ সৃষ্টি হয়েছে, মৃত্যুর পর এই দেহ আবার সেই পঞ্চভূতেই মিশে যাবে। মানুষ জানে তার প্রিয়জনকে যদিও সে আর পঞ্চভূতের সমবায়ে দেখ্‌তে পাবে না কিন্তু প্রকৃতির পঞ্চভূতের প্রত্যেক উপাদানে তার প্রিয়জনের চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে। তাই মানব প্রিয়জনকে হারালেও সমগ্র বিশ্বে তার রূপ দেখতে পায়। প্রকৃতির প্রতি বস্তুতেই সে জানে তার প্রিয়জনের অস্তিত্ব লুকান আছে। তাই নদীর জলে অবগাহনকালে মানব অনুভব করে তার প্রিয়জনের কোমল আলিঙ্গন; ফুলের ধন লুটে পালিয়ে যাবার সময় বাতাস যখন তাকে স্পর্শ করে যায়, সে অনুভব করে তারই প্রিয়জনের অঙ্গসৌরভ, তারই প্রিয়জনের শ্বাস-প্রশ্বাস; পাতার মর্ম্মর ধ্বনি তাকে চমকিত করে তোলে প্রিয়জনের পদধ্বনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে। বিশ্বের প্রতি অণু পরমাণুতে প্রিয়জনের চিহ্ন আছে তা মানব অনুভব করে তাই যে স্নেহ-ভালবাসা কেবলমাত্র এক জনকে কেন্দ্রীভূত করে থাকে তার অবর্ত্তমানে সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়ে—সারা বিশ্ব তার প্রিয় হ'য়ে উঠে, কারণ সারা বিশ্বে তার প্রিয়জনের প্রকাশ সে দেখতে পায়। বিনশ্বর দেহকে ধ্বংস করে বিশ্বের প্রতি বস্তুতেই মৃত্যু তাকে জন্মদান করে। মৃত্যু তাই তার উদ্দেশ্য হারিয়েছে, মানবের কাছে শক্তিহীন হ'য়েছে—পরাজয় হ'য়েছে তার সম্পূর্ণ

—:০:—

যাবেই যদি

শ্রীমতী আশারাণী দেবী

যাবেই যদি জোর কি আছে?
থাকতে যদি না চাও কাছে,
ফিরেও যদি না চাও পাছে,
রাখ্‌ব না আর তোমায় ধ'রে।

ডাগর আঁখির নীরব ভাষা,
রাঙ্গা ঠোঁটের মুচ্‌কি হাসা,
গোপন পদে কাছে আশা,
—স্মৃতির মাঝে রাখ্‌ব ভ'রে।
—যতন ক'রে॥
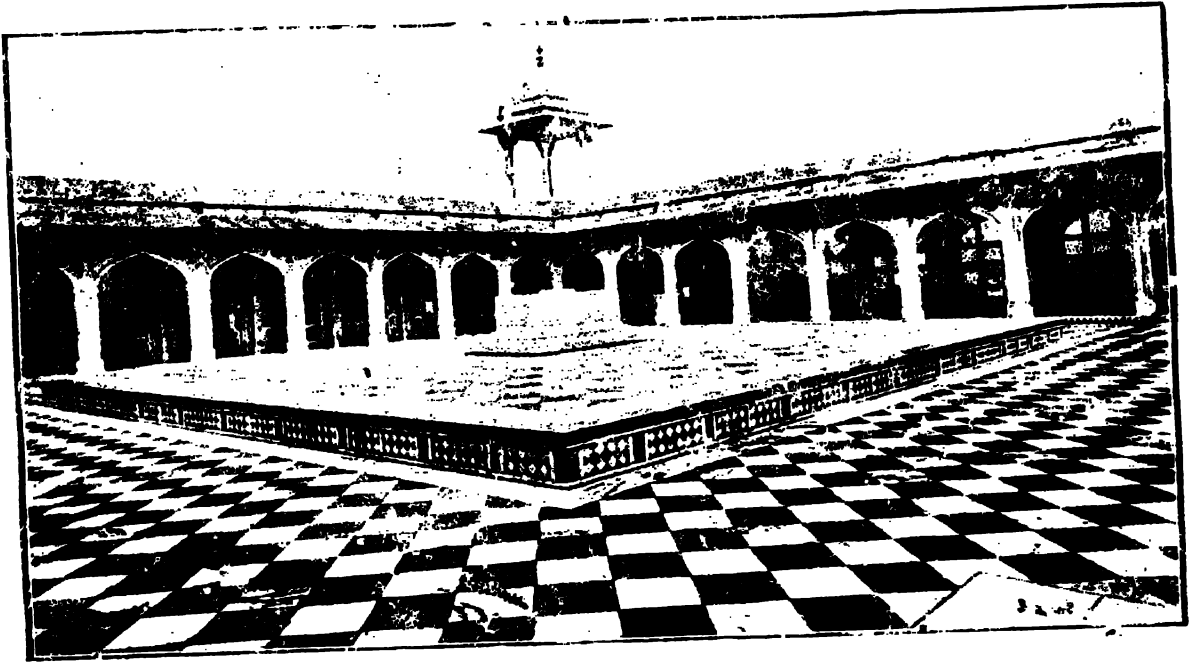
আকবরের সমাধি উপরের দৃশ্য

আকবর-সমাধি উদ্যান

আকবর সমাধি -সেকেন্দ্রা, আগ্রা

JUNO PRINTING WORKS, CAL
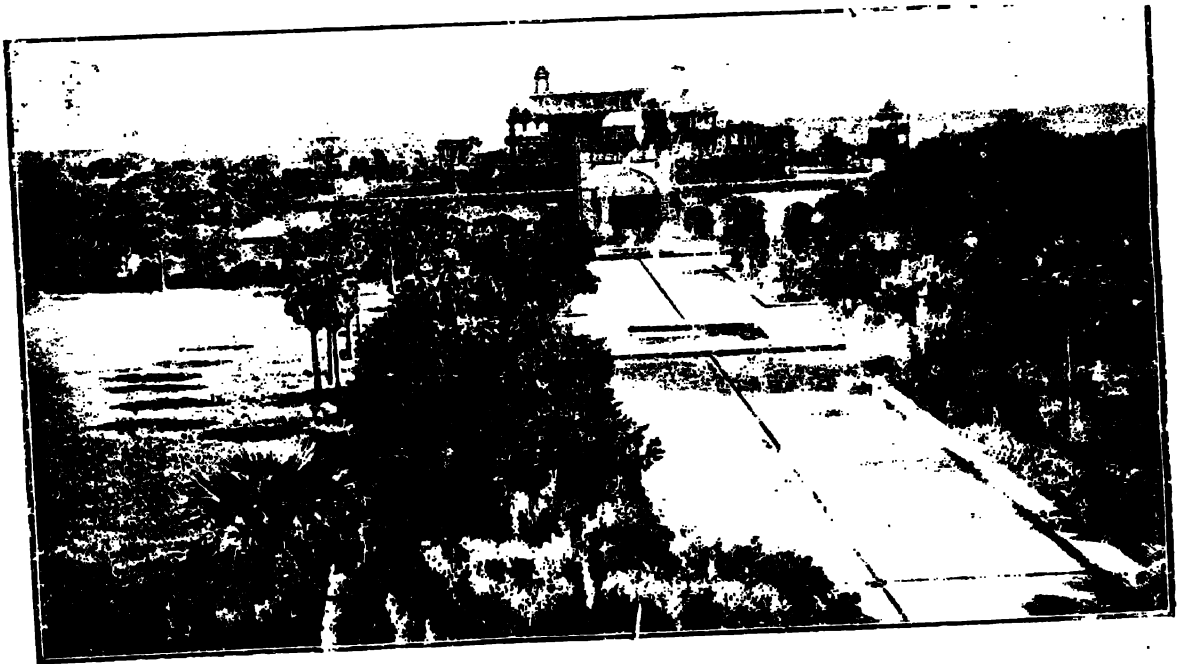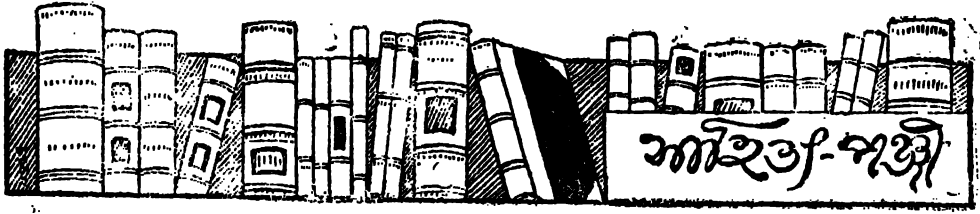
শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

নদীয়া জেলায় জমশেদপুর গ্রামের বিখ্যাত জমীদার-বংশে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে সুকবি যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। ইনি স্বর্গীয় হরিমোহন বাগচী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র; খুব অল্প বয়স হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ দেখা গিয়াছিল। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় তিনি সমগ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, পড়িয়াছিলেন; হেমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সহিতও তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন; অবশ্য এই মনীষিদিগের রচনার সর্ব্বত্রই যে তিনি অর্থবোধ করিতে পারিতেন তাহা নহে, কিন্তু পঠন-লিপ্সা তাঁহার এত অধিক ছিল যে যাহা তিনি পাইতেন তাহাই পড়িতেন। উত্তরকালে এই পাঠানুরাগ তাঁহার অধিকতর বর্দ্ধিত হইতে দেখা গিয়াছিল। বাল্যকালে কবিগণের নিকট হইতে তিনি ধ্বনি, ছন্দ ও গানের প্রতি যে অকৃত্রিম অনুরাগ লাভ করিয়াছিলেন, উত্তর কালে এগুলির সাধনা করিয়াই তিনি প্রথিতযশঃ কবি হইয়াছেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সুন্দর কবিতা ও গানের মাধুর্য্যে মুগ্ধ ভাব-বিহ্বল যতীন্দ্রমোহন একলব্যের ন্যায় তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া সাধনা করিতে থাকেন। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত কবিতা বাহির হয় ১৮৯১ সালে, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোক গমন উপলক্ষ্যে। তখন তিনি হেয়ার স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর 'বি' বিভাগের ছাত্র। পঞ্চম শ্রেণী হইতে দুইটী কবিতা প্রকাশিত হয়। 'এ' বিভাগের ছাত্রদিগের ভিতর শ্রীননীগোপাল বসুর কবিতা প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় কলেজের পাঠ্যাবস্থায় উক্ত ননীগোপাল মারা যান—কবি-যশোলাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কবি যতীন্দ্রমোহন পুরাদমে সাহিত্যচর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহার সাহিত্য-সাধনায় সংপর্য্যোনাস্তি আনন্দ লাভ করিতেন। তাঁহার তখনকার কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভাব ও শব্দ সম্পদের বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া গেলেও তাঁহার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল তাহা তাঁহার অনেক বন্ধুই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তিনি যে সাহিত্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিবেন তাহার ইঙ্গিত সেই সময়কার তাঁহার রচনা হইতে পাওয়া গিয়াছিল। প্রকৃতির নিখুঁত ছবি আঁকিতে তিনি বেশ দক্ষতার পরিচয় সে সময়েই দিয়াছিলেন। মাসিক 'সাহিত্য' ও 'ভারতী' তখন প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা। উভয় পত্রিকাতেই তাঁহার রচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইত। ইহা তাঁহার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা ছিল না, কারণ ইহা হইতেছে ১৮৯৬ সালের কথা। সে সময় শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সম্পাদিত 'সাহিত্য'-পত্রিকায় রচনা প্রকাশ হওয়া বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। বাস্তবিক প্রথম শ্রেণীর রচনা না হইলে কোন কিছুই উহাতে পত্রস্থ হইত না। এ সময় রাজসাহীর 'উৎসাহ' অপর একখানি সুন্দর পত্রিকা ছিল। তাহাতেও মাঝে মাঝে কবি যতীন্দ্রমোহনের কবিতা বাহির হইত।

১৮৯৮ সালে ২৪ পরগণার বনহুগলী গ্রামের প্রসিদ্ধ জমীদার ৺নিমচাঁদ মৈত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী

ভামিনী দেবীর সহিত কবি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। কবির দাম্পত্য-জীবন বড়ই মধুময়। শিক্ষিতা উন্নত-হৃদয়া পত্নীর অনুপ্রেরণায়ও তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন। ... কবিতার উৎস যে তিনিই একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

১৯০২ সালে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গদ্য ও পদ্য রচনায় যতীন্দ্রমোহন ব্যাপৃত হন। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার অক্লান্ত লেখনী বহু কবিতা প্রসব করিয়াছে, তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলি সর্বত্র আদৃত। ভাব ও ভাষার সাবলীল গতি তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য। চিরসুন্দরের পূজারীর কল্পনার লীলা ও [illegible] গতি এখনও সমভাবে চলিতেছে, এখনও তাঁহার রচনা বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইয়া তুলিতেছে, উন্নত চিন্তা ও ভাবের প্রবাহ বহাইয়া দিতেছে, প্রকৃত রসের সৃষ্টি করিয়া নিরানন্দ বাঙ্গালীর প্রাণে আনন্দের সঞ্চার করাইয়া দিতেছে। তাঁহার কবিতাগুলি যাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি :—রেখা (১৩১৩), লেখা (১৩১৭), অপরাজিতা (১৩২০), নাগকেশর (১৩২৪), বন্ধুর দান (১৩২৫), জাগরণী (১৩২৯), নীহারিকা (১৩৩৪), পাঞ্চজন্য (১৩৩৮)।

গাথা বা কবিতায় কাহিনী লিখিবার সুন্দর ক্ষমতা কবি যতীন্দ্রমোহনের আছে। এই ক্ষমতার বিকাশ আমরা পরিণত বয়সে তাঁহার 'পথের সাথী' উপন্যাসে বেশ দেখিতে পাই।

গদ্য-সাহিত্যে তাঁহার সর্ব্বপ্রথম দান 'পল্লীকথা' (ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ)। এই পুস্তিকাখানি এখন আর পাওয়া যায় না। শীঘ্রই তাঁহার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবে। পুস্তকখানি যন্ত্রস্থ। বাঙ্গালার প্রায় অধিকাংশ মাসিক পত্রিকায় তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

'মানসী' পত্রিকার সম্পাদন-কালে তাঁহার সমালোচনা ও আলোচনা-মূলক কয়েকটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলি হইতে তাঁহার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি, বিচার-পদ্ধতি ও রসানুভূতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পাঁচ বৎসর কাল শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহযোগিতায় এই পত্রিকা সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি 'যমুনা' পত্রিকাও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পালের সহিত একযোগে প্রকাশ করেন।

এখনও তাঁহার এত অধিক সংখ্যক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা আছে যাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলেও আরও তিন কিংবা চারিখানি সুন্দর কাব্যগ্রন্থ হইতে পারে। এগুলিকে শীঘ্রই পুস্তকাকারে দেখিবার আশা আমরা রাখি।

কবির সাহিত্য-সাধনা এখনও সমভাবে চলিতেছে। ইতিমধ্যে তিনি যে যশের অধিকারী হইয়াছেন তাহার নূতন পরিচয় তাঁহার রচনার সহিত পরিচিত সুধী পাঠকবর্গকে

দিতে হইবে না, তত্রাচ দুইবার তাঁহার ভাগ্যে যে যশোলাভ ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ না করিলে চলিতেছে না। ১৩৩০ সালে কাশীধামে সরস্বতী-পূজা-উপলক্ষ্যে যে সাহিত্য-সম্মিলন হয়, তাহাতে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন অবশ্য সাহিত্য সভার সভাপতির আসন ইহার পূর্ব্বে ও পরে বহুবারই তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। কিন্তু এই উপলক্ষেও তিনি যে অভিভাষণ ও কবিতা পাঠ করেন তাহা শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত-রাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন-প্রমুখ উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'কবিকুলেশ্বর' উপাধি দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। তর্করত্ন মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়া উপাধি দান করেন। কবিও নত মস্তকে তাহা গ্রহণ করেন কিন্তু কোন দিনই তাঁহাকে এই উপাধি ব্যবহার করিতে দেখা যায় নাই। বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় এই উপাধি পাইবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই বলিয়া তিনি ব্যবহার করেন না।

১৩৩৮ সালের ৬ই ভাদ্র তারিখে 'রস-চক্রে'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাধারণ সাহিত্য সভায় কবি যতীন্দ্রমোহনকে যে সংবর্দ্ধনা দান করা হয় তাহার কথা গত আশ্বিন মাসের 'উপাসনা' পত্রিকায় বিশিষ্ট যতীন্দ্রমোহন-সংখ্যায় বাহির হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের কবিদের এইরূপ সংবর্দ্ধনা হইতে দেখিলে বাস্তবিকই প্রাণে আনন্দ হয়। 'রস-চক্রে'র এই সাধু অনুষ্ঠানে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। আশা করি শীঘ্রই আমরা অন্যান্য কবিদের যথোচিত সম্মান ও সংবর্দ্ধনা দেখিতে পাইব।

———: :———

পরলোকে প্রভাতকুমার

শ্রীচারু চন্দ্র মিত্র

গত ২২শে চৈত্র সোমবার রাত্রি পৌনে দুই ঘটিকার সময় বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক কথা-সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল রত্ন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় অত্যধিক রক্তের চাপে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় রক্ত চাপের পরিমাণ ছিল ২৬০। তাঁহার দুই পুত্রই কলিকাতার কৃতী চিকিৎসক। রাত্রি ১২ টার সময় তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িয়া যান ও পৌনে দুই ঘণ্টার ভিতরই ইহলীলা সাঙ্গ করেন। তাঁহার আকস্মিক বিয়োগ-ব্যথায় আমরা অধীর। তিনি ছিলেন আমাদের পরমাত্মীয়—অগ্রজকল্প 'প্রভাত-দা'। তিনি ছিলেন আমাদের বন্ধু, পরামর্শদাতা ও পথ-প্রদর্শক। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল ৬০ বৎসর দুই মাস।

তাঁহার সম্বন্ধে আজ কেবল মনে পড়িতেছে তাঁহার চরিত্রের মহানুভবতা, উদারতা ও বাণীর ঐকান্তিক সেবার কথা। যৌবন কাল হইতে যে বাণী-সেবায় তিনি আত্মপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অকুণ্ঠচিত্তে সে সেবা করিয়া গিয়াছেন—এ সাধনায় কোন দিন তাহাকে কেহ বিরত হইতে দেখে নাই। বাণীর চরণে প্রত্যগ্র পুষ্পাঞ্জলি তিনি প্রত্যহই দান করিতেন, তাহা লিখিয়াই হউক—আর পুস্তক-পাঠে আপনার জ্ঞান-সম্ভার বৰ্দ্ধিত করিয়াই হউক, যে কোন ভাবেই তিনি করিতেন। তাঁহার ন্যায় নিরহঙ্কার, অজাতশত্রু মানুষ বড় কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ন্যায় রসালাপী, মিষ্টভাষী, সদাশয় বন্ধুর বিয়োগ অশনিপাতের ন্যায়ই আমাদের নিকট আসিয়াছে, কারণ দশ মিনিটের ব্যবধানের পথে থাকিয়াও জন্মের মত তাঁহাকে 'শেষ দেখা' দেখিতে ও তাঁহার চরণে ভক্তি-শ্রদ্ধার শ্রকৃন্দন দিতে পারি নাই, এ দুঃখের তীব্রতা এখনও কমে নাই।

১৮৯৫ সালে তিনি পাটনা কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন সরকারী টেলিগ্রাফ অফিসে চাকুরী করেন। ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯১ কিংবা ১৮৯২ সালে আচার্য্য কৃষ্ণকমল-প্রকাশিত সাপ্তাহিক হিতবাদী পত্রিকায় তাঁহার প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। তাঁহার পর 'দাসী', 'প্রদীপ', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বহু কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল।

চাকুরী ছাড়িয়া তিনি বিলাত-যাত্রা করেন এবং ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রথম দার্জ্জিলিং, তৎপরে রঙ্গপুরে ও শেষে গয়ায় ব্যারিষ্টারী করিতে থাকেন। বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হয়। তাহার পর আর তিনি বিবাহ করেন নাই।

ব্যবসা-ক্ষেত্রে গয়ায় তাঁর প্রসার ও প্রতিপত্তি বেশ হইয়াছিল। ফৌজদারী মোকদ্দমায় বেশ দুপয়সা পাইতেন; কিন্তু সাহিত্য-সাধনায় এমনই মশগুল হইয়া থাকিতেন যে অনেক সময় মক্কেলের কাজে মনোযোগ দিতে পারিতেন না। সে সময় কয়েকদিনের জন্য বন্ধুবর করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় গয়াধামে গিয়াছিলেন, তাহার একখানি পত্র হইতে জানিতে পারি, সে সময় তিনি প্রায় সারারাত্রি ধরিয়াই সংস্কৃত-সাহিত্যের আলোচনায় ব্যস্ত থাকিতেন। রস-শাস্ত্রের আলোচনার জন্য বোম্বাই শহর হইতে বহু পুস্তক ও পুঁথি আনয়ন করিয়া পাঠ করিতেন, এই সময় উদ্ভট-শ্লোকের যে সংগ্রহ তাঁহার নিকট ছিল তাহা দেখিয়া কবি করুণানিধান তো বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন ও তাঁহার নিকট হইতে বহু শ্লোক শুনিয়া অনুবাদ করিতে বসিয়া যান; কিন্তু এই সময় তাঁহার জননীর তীর্থদর্শন করিবার উদগ্র বাসনা হওয়ায় করুণানিধানই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িতে বাধ্য হন; কাজেই ঐ অনুবাদ-কার্য্য অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই।

তাহার পর যখন স্বর্গীয় মহাত্মা জগদিন্দ্রনাথ বন্ধুবর অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সহযোগিতায় ১৭ সালে সাহিত্য-বিষয়ক সচিত্র 'মর্ম্মবাণী' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন তখন প্রভাতকুমার স্বনামে-বেনামে বহু রচনা দিয়াছিলেন। 'সুকল-লোম পরিণয়' নাটকখানি তাঁহার রচিত। ছয় মাস নিয়মিতভাবে 'মর্ম্মবাণী' বাহির হইবার পর অষ্টম বর্ষে 'মানসী' ও 'মর্ম্মবাণী' যখন একত্র হইয়া মহারাজ ও প্রভাতচন্দ্রের সম্পাদনে বাহির হইতে লাগিল তখন হইতে পত্রিকার শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি সম্পাদকের গুরুভার গ্রহণ করিয়া আসিয়া পত্রিকাখানিকে রসপিপাসু ব্যক্তিদিগের মনোরঞ্জন ও চিত্ত-বিনোদন করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। এই সময় হইতে তিনি আইন-ব্যবসাকে একেবারে ছাড়িয়া দেন কিন্তু কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের
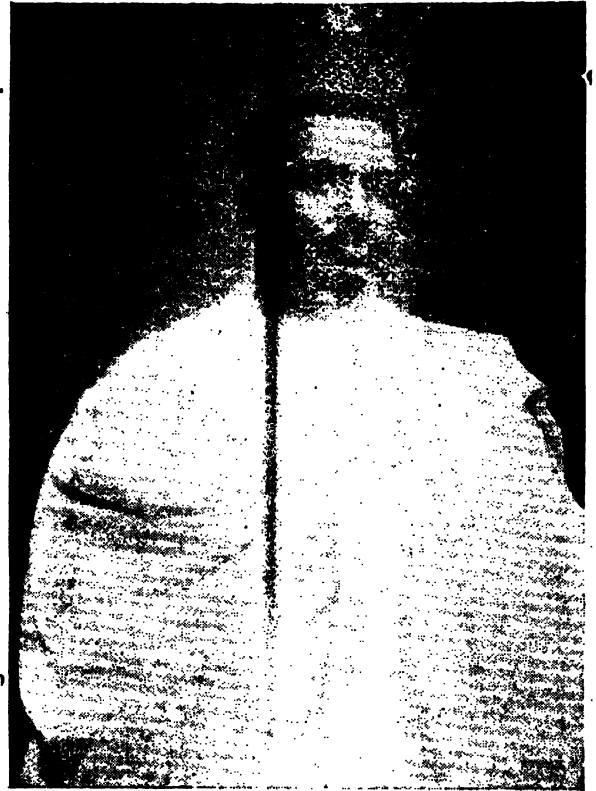
পরলোকে প্রভাতকুমার

আইন-কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ছাত্রদিগের অধ্যাপনা করিয়া তাহাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

বহু বৎসরের পরিচয়ের ভিতর বিলাত ফেরৎ প্রভাত-কুমারকে কোন দিন সাহেবী আনা করিতে দেখি নাই; বিলাতের অভিজ্ঞতায় তিনি বিলাতের লোকের দোষ ও গুণের যে পরিচয় পাইয়াছিলেন তাহার নিখুঁত চিত্র তাঁহার 'দেশী-বিলাতী' পুস্তক ও বহু গল্পে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার গল্পগুলিতে দেশীয় আদর্শের দিকে যে একটা

অসাধারণ 'টান' ছিল তাহা বেশ উপলব্ধি করা যায়। তাঁহার কথা-সাহিত্যে 'অশ্লীলতা'র লেশ মাত্র চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না—দুর্নীতির প্রশ্রয় তিনি কোন দিন দেন নাই। হাস্যরসের ও 'হিউমারে'র দিকটা তাঁহার রচনায় যেমন পরিস্ফুট, সেইরূপ গাম্ভীর্য্যের দিকটাও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত।

তিনি ছিলেন সাধারণের নিকট গম্ভীর প্রকৃতির লোক; কিন্তু বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট তাঁহার ন্যায় রসালাপী লোক ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই রসের ভিতর দিয়া তিনি শিক্ষা,জ্ঞান ও সচ্চিন্তার প্রসারতা বৃদ্ধি করিতেন—তিনি ছিলেন একরূপ উপদেষ্টা—কিন্তু ঘুণাক্ষরেও তিনি বুঝিতে দিতেন না যে তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য উপদেশ দেওয়া। কোন ব্যক্তির চরিত্রের উপর কোনদিন তাঁহাকে দোষারোপ করিতে শুনি নাই।

তাঁহার ন্যায় মত-সহিষ্ণু বন্ধুও বড় কম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা কালে দেখিতেছি তাঁহারমতের বিরুদ্ধ-সমালোচনাকারীরা কোন দিন তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল সাহিত্যিকের তিরোধানে বঙ্গ-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়।

প্রভাতকুমার জননীর একমাত্র সন্তান। তাঁহার জননীর বয়স এখন ৮২ বৎসর। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'দাদা এবার গ্রীষ্মের ছুটীতে কোথায় বেড়াতে যাবেন ?'

উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন 'এবার মার শরীরটা ভাল নেই, বোধ হয় কোথাও যাওয়া হ'বে না—মা ভাল হ'লে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও যাব।'

'মা এখন একটু ভাল হইলেন, কিন্তু তিনি যেথায় গেলেন সেখান হইতে কোন মানুষই আর ফিরিয়া আসে নাই—রাখিয়া গেলেন অম্লান-যশ আর ৮২ বছরের বৃদ্ধা জননীকে ও দুই পুত্র শ্রীমান্ অরুণকুমার ও প্রশান্তকুমারকে। তাহাদের দুঃখ রহিল পিতার শেষ সময়ে তাহারা কিছুই করিতে পারিল না—আর তাহার বৃদ্ধা জননীকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব তাহার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তাহার শোক-বিদগ্ধ চিত্তে শান্তি দান করেন।

অমরাবতী

(সঙ্কলন)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অমরাবতী বৌদ্ধদিগের একটী প্রাচীন প্রসিদ্ধ তীর্থ। অমরাবতী স্তূপের কথা ফর্গুসন, বর্জেস, সিউএল, গ্রুনভেডেল, ফুশে, ভিন্সেন্ট স্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আর্কিওলজিক্যাল রিপোর্টেও (ষষ্ঠ খণ্ড, ১৮৮৭) ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। অমরাবতী স্তূপ বেজওয়াড়ার প্রায় ৯ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্তূপটী পুরাতন ধরণীকোট বা ধান্যকটকের দক্ষিণে, মাদ্রাজে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ তীরে—এই নদীর মোহানা হইতে ইহা অন্যূন ৩০ ক্রোশ দূরে। অমরাবতীস্তূপ আন্ধ্র রাজ্যেরই অন্তর্গত। স্তূপের চারিদিকে পাথরের রেলিং দিয়া ঘেরা। ১৬০ হইতে ২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহা তৈরী হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। আন্ধ্ররাজ পুলমায়ি (১৩৮—১৭০ খৃঃ) ও যজ্ঞশ্রীর (১৮৪—২১৩ খৃঃ) দান-লিপি হইতে জানা যায় যে, স্তূপের বাহিরের দিকের রেলিং খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে বা শেষভাগে নির্ম্মিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের তিব্বতীয়

ঐতিহাসিক তারনাথের লিখিত বৃত্তান্তের সহিতও ইহার বেশ মিল আছে। নাগার্জ্জুন ধনশ্রীদ্বীপ বা শ্রাধান্যকটকের চৈত্যের চারিধার বেষ্টনী দিয়া ঘিরিয়া ফেলেন। নাগার্জ্জুন ছিলেন কণিকের সমসাময়িক। কণিকের রাজ্যকাল ছিল

সপার্ষদ বুদ্ধমূর্ত্তি

১২০—১৫০ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে ১৪০ হইতে ২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাহিরের রেলিং নির্ম্মিত ও অলঙ্কৃত হয়। ভিতরকার রেলিংএর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইতে অনেক দিন লাগিয়াছিল। ৩০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাহা শেষ হয় নাই।

বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য নিদর্শক বুদ্ধমূর্ত্তি
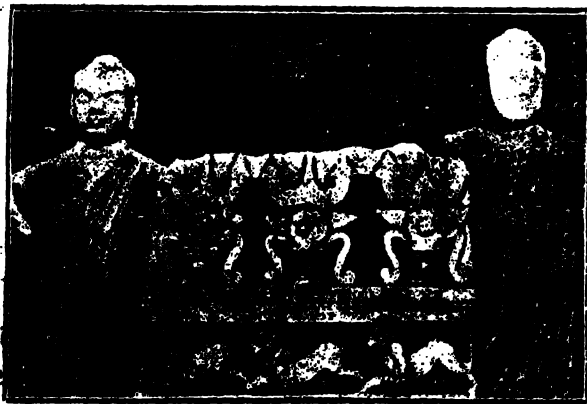
স্তূপ-কলেবর শ্বেত পাথর দ্বারা নির্ম্মিত। তাহার দুই ধারে দুইটী রেলিং, তাহাদের মধ্যে বাহিরের দিকে যেটী তাহা ১৩ কিম্বা ১০ ফুট উচ্চ এবং ভিতরেরটী ৫ ফুট। দুটী রেলিং এর পাথর ও স্তম্ভমূল ইত্যাদি উদাত্ত [illegible]-কার্য্যের দ্বারা অলঙ্কৃত।

স্তূপটীর ব্যাস ১৩৮ ফুট, ভিতরের রেলিংএর পরিধি ৬২১ ফুট এবং বাহিরের রেলিংএর পরিধি অন্যূন ৮০ ফুট,
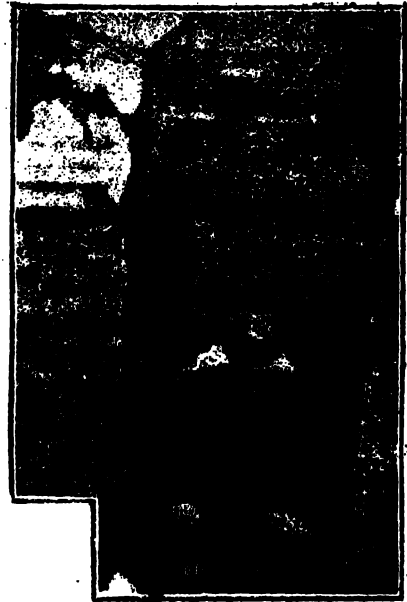
শিলাস্তম্ভ হইতে খোদিত সর্প মূর্ত্তি

বাহিরের রেলের সংখ্যা ১২,০০০ হইতে ১৪,০০০। হস্তিদন্তে কারুকরা ভিতরের রেলের সংখ্যাও অনেক।

দাক্ষিণাত্য হইতে সর্প পূজার নিদর্শন

বাহিরের রেল বেশ খাড়া খাড়া শিলাফলকের দ্বারা নির্ম্মিত। বাহিরের দিকের প্রত্যেক ফলকের মধ্যস্থলে একটী করিয়া পূর্ণ

গোলাকৃতি চক্র এবং সেই ফলক গুলির উপরে এবং নীচে অৰ্দ্ধ-গোলাকৃতি চক্র ছিল—এবং তাহাতে আরও ছোট ছোট খোদাইকার্য্য ছিল। তাকগুলিতে কতকগুলি

অশ্ব

মানুষের মূর্ত্তি, কতকগুলি ঢেউ খেলান ফুল ধরিয়া আছে। স্তম্ভমূল গুলিতে নানারকম ভঙ্গিতে জন্তু ও ছোট ছোট ছেলেদের মূর্ত্তি ক্ষোদিত করা আছে। ভিতরের যে ভাস্কর্য্য
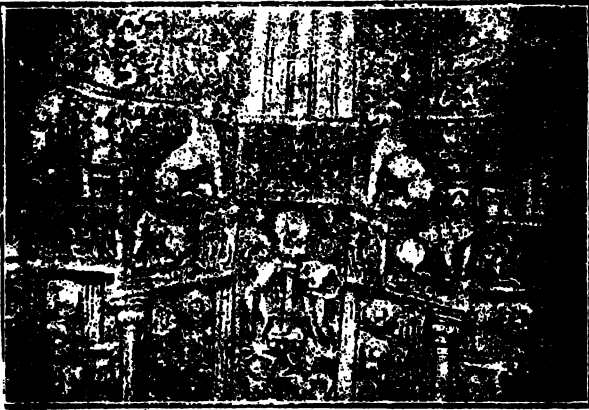
গ্রীক আদর্শের নিদর্শন

শিল্প তাহা বাহিরের অপেক্ষা অনেক ভাল, এবং শিল্প-নৈপুণ্যে অনেক শ্রেষ্ঠ।

ভারতীয় কলা ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য-শিল্প সম্ভারে অমরাবতীর গৌরব জগদ্বিখ্যাত।

বৈদেশিক পণ্ডিতগণ বলেন, ভারতীয় ভাস্কার্য্য শিল্প দুই স্থান হইতে প্রভাবান্বিত হইয়াছে, আলেকজান্দ্রিয়াও এসিয়া মাইনার। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, অমরাবতীর শিল্পকলার উপর গ্রীক ও প্যারস্যের প্রভাব আছে। ভারহুত, সাঁচী, বোধগয়ার শিল্প কার্য্য আলেকজান্দ্রিয়া হইতে আসে—ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয় ছাঁচে নির্ম্মিত। ইহা এমন ভাবে তৈয়ারী হইয়াছে যে কোন উপায়ে বুঝিবার যো নাই যে, ইহার মূলে বৈদেশিক শিক্ষা আছে। রাজা অশোকের রাজত্ব কাল হইতে খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্ব পর্য্যন্ত
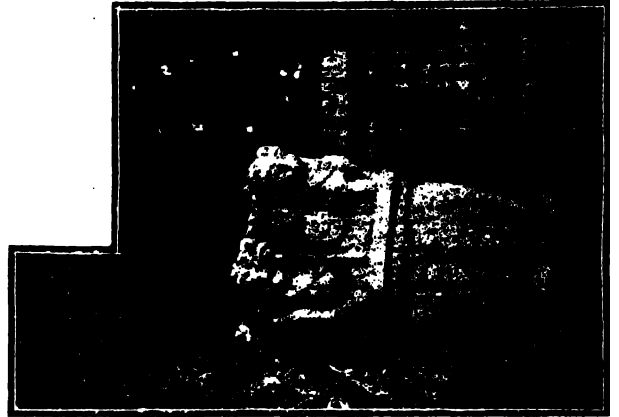
সিংহ মূর্ত্তি অঙ্কিত অমরাবতীর স্তম্ভ

ভারতের এই বিদ্যার যথেষ্ট চলন ছিল। গান্ধার, পেশোয়ারের যে ভাস্কর্য্য-শিল্প তাহার মূলে আছে পারগেমাম্ এবং এসিয়া মাইনারে কতকগুলি শিল্প-শিক্ষার চেষ্টা। অমরাবতীর যে ভাস্কর্য্য-শিল্প তাহাতে আছে আলেকজান্দ্রিয়ার শিল্পের

অমরাবতীর হিন্দু-মন্দিরের বেদী

নিকট অনুকরণ। এ গুলি প্রমাণ সাপেক্ষ। এই সিদ্ধান্ত গুলি একেবারে মানিয়া লওয়া যায় না। ধর্ম্মের দিক্ দিয়া ও সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়া অমরাবতীর স্থান

সাঞ্চী ও গান্ধারের মাঝামাঝি। পুরাকালের শিল্পীরা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বড় একটা আঁকিতেন না—তাঁহারা শূন্য আসন, পদচিহ্ন এবং আরও অন্যান্য প্রতীক খোদাই করিতেন।

অমরাবতীর স্থাপত্য-নিদর্শক বুদ্ধের বিশিষ্ট আসন

কিন্তু গান্ধার-শিল্পে বুদ্ধদেবের নানা রকম ভঙ্গিতে গড়া মূর্ত্তি পাওয়া যায়। অমরাবতীর শিল্পে খুব কমই সাঞ্চী বা ভারহুতের মত প্রতীক মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়॥ বুদ্ধদেবের নানা ভঙ্গীর মূর্ত্তি অমরাবতীতে খুব কমই আছে।

অমরাবতীর অতীত গরিমা কেবল কল্পনা করিতে পারা যায়। অমরাবতীতে অসংখ্য ভগ্নাবশেষ আছে। শিলা-লিপি আর ক্ষোদিত মূর্ত্তিও অসংখ্য আছে। পালি ভাষায় শিলালিপির ক্ষোদিত করা হইয়াছে। ক্ষোদিত মূর্ত্তি বুদ্ধ এবং আর তাঁর ধর্ম্ম-বিষয়ের মূর্ত্তিগুলি বেশীর ভাগ ভগ্ন অবস্থায় আছে।

অমরাবতীতে একটা হিন্দু-মন্দির আছে তাহা অনূ্যন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

আমরা এই নিবন্ধে অমরাবতীর শিল্পেতিহাসের নিদর্শন-স্বরূপ কয়েকটী চিত্র প্রদান করিলাম। এইগুলি হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম, লিঙ্গপূজা, বৈদেশিক প্রভাব ইত্যাদির উদাহরণ পাওয়া যাইবে।
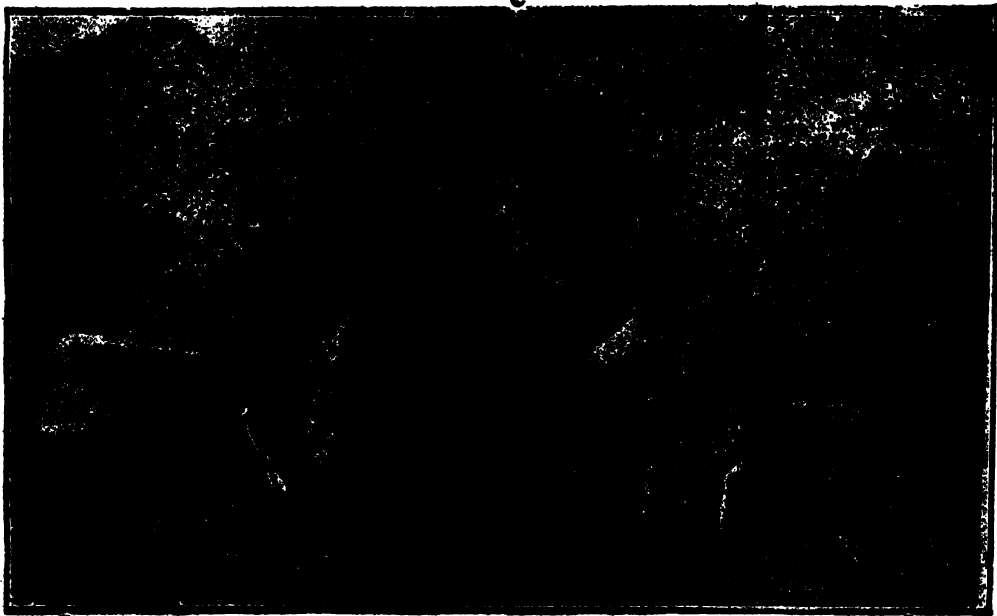
পরকীয়া

(শ্রীগৌরাঙ্গ-দেহে পরকীয়া শ্রীরাধার অবতারিত্ব)

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় প্রস্তাব

গত শ্রাবণ মাসের "পঞ্চপুষ্পে" প্রকাশিত "পরকীয়া"-সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমরা দেখিয়াছি যে, পরকীয়া শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের মিলিত দেহই হইতেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। ইহা সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যেরই মত। সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরও ঐ মত। শ্রীরূপগোস্বামিপাদের কড়চায় লিখিত একটী শ্লোকে ঐ কথা সুন্দর-ভাবে বলা হইয়াছে। এমন অনেক মহাজন-বাক্য আছে। কথিত শ্লোকটী এই—

রাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তিরস্মা
দেকাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধা ভাব-দ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

অর্থাৎ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের প্রেমের বিকার বা বিলাস-রূপিণী শক্তি শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদাত্ম হইলেও, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব-কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাদের উভয়ের দেহ-ভেদ ছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে তাঁহার দেহে তাঁহাদের উভয়ের শরীরের ঐক্য সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীরাধার ভাব-কান্তি-সুবলিত সেই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকে (শ্রীচৈতন্যকে) আমি নমস্কার করি।

এখন আমার কথা এই, যদি ঐ রূপ মিলিত-দেহই শ্রীগৌরাঙ্গ হ'ন, তবে শ্রীচৈতন্যরূপে কেবল শ্রীকৃষ্ণই অবতীর্ণ একথা বলা হয় কেন—শ্রীরাধা অবতীর্ণা, একথা অন্ততঃ একবারও কাহাকে বলিতে শুনি না কেন? অথচ শ্রীগৌরাঙ্গের বাহ্যদেহ শ্রীরাধা এবং অন্তর শ্রীকৃষ্ণ একথা সর্ব্ববাদী-সম্মত; তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যে শ্রীরাধারই বিশেষভাবে অভিব্যক্তি, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমরাও পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখিয়াছি এবং ইহাতেও দেখিব যে, শ্রীগৌরাঙ্গে শ্রীরাধাই সমধিকভাবে প্রকাশমানা; অন্যকথায়, তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা শ্রীরাধারই অবতারিত্ব ভাব দৃশ্যতঃ খুব বেশী। উদ্ধৃত শ্লোকে "রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিতং" কথা-গুলিতে তো তাহাই বুঝায়, অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার বাহ্যে (দ্যুতিতে) এবং কার্য্যে (ভাবে বা স্বভাবে) শ্রীরাধা; অথবা অন্য প্রকারে, দর্শন-শাস্ত্রের সহিত ঐ কথার ঐক্য রাখিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, শ্রীচৈতন্যের স্থূলদেহের উপাদান-কারণাত্মিকাই হইতেছেন শ্রীরাধা। শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে "অন্তর কৃষ্ণ বহিঃ রাধা" বৈষ্ণবগণের এই সাধারণ ভাবের উক্তিও ঐ সব কথার পোষকে যায়। ইহাতে বুঝি, শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তরে কৃষ্ণ; যেমন স্থূলভাবে বলিতে গেলে সকল জীবের অন্তরে পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি, কতকটা যেন তেমনি ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গেও তাঁহার স্থিতি; আর বাহিরে—স্থূল দেহে—শ্রীচৈতন্য হইতেছেন শ্রীরাধা। এ কথানুসারে শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ তেমন কারণ হইতে-ছেন না, যেমন কারণ হইতেছেন শ্রীরাধা। যে হেতু অবয়ব এবং স্বভাব সর্ব্বত্র ব্যক্তিগত আর ইহাদের মধ্যবর্ত্তিতাতেই একে অপরকে চিনে ও বুঝে—এই চিনা ও বুঝায় "অন্তর-কৃষ্ণে"র প্রয়োজন হয় না। তাই, শ্রীগৌরাঙ্গকেও ঐ প্রকারে ব্যক্তিগতভাবে—অর্থাৎ অবয়বে ও স্বভাবে—চিনিতে ও বুঝিতে গিয়া তাঁহার বাহ্যাবরণ শ্রীরাধাকেই আমরা তাঁহাতে দেখি ও বুঝি শ্রীকৃষ্ণকে তো দেখি না বা বুঝি না। তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার বলার কারণ হয় তো দর্শন-শাস্ত্রের দিক্ হইতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পরম-পুরুষ—তত্ত্বাতীত—এবং তিনিই পরমা-প্রকৃতির আশ্রয়; সুতরাং গৌরাঙ্গ-দেহে শ্রীরাধাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেরই প্রাধান্য, অতএব গৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার বলা হয়; কিন্তু দর্শনের কথা উজ্জ্বল-রসের ব্যাপারে কতটা খাটে তাহা আমি ঠিক জানি না, আর তাই রাধাকৃষ্ণকে সাংখ্য-দর্শন প্রভৃতি ঠিক ধরিতে পারে কি না তাহাও আমি ভাল বুঝি না। উজ্জ্বল-রসের অভিনয়ে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা প্রাধান্য রসিক ভক্তেরা সর্ব্বথা স্বীকার করেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ঐরূপ ভাবের কথা অনেক আছে। শ্রীচৈতন্যের দেহ ও ভাব সেই উজ্জ্বল রসেরই, তিনি উজ্জ্বল রসেরই অবতার; সুতরাং শ্রীরাধা তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে স্ফুটতর বটে।

এখন পাঠককে বলিতে হইবে না, এই প্রস্তাবে আমরা

বুঝাইব যে, শ্রীচৈতন্তে অবতারিত্ব-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যে দাবী, তাঁহার আদরিণী পরকীয়া শ্রীরাধার দাবী তদপেক্ষা অধিকতর জোরের; এ সম্বন্ধে কিছু উপরে বলিয়াছি। অবশ্য আমি যাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা একেবারে নূতন কথা, যাহা বোধ হয় কস্মিন্‌কালে কেহ বলেন নাই। তবে ইহা লিখিতেছি কেন? উত্তর—আমার প্রাণে শ্রীরাধার ঐ দাবীর কথা নিরতই উঠে, আর আবেগে আমাকে অস্থির করিয়া তুলে। যদি সে কথার বিবৃতিতে আমার দোষ হয়, রসিক ভক্তগণ আমাকে মার্জ্জনা করিবেন

শ্রীচৈতন্যকে প্রচ্ছন্নাবতার বলা হইয়া থাকে। "প্রচ্ছন্ন" কিনা "গুপ্ত"—"আবৃত"। এখানে অর্থ হইতেছে, শ্রীচৈতন্য-দেহে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধার দ্বারা আবৃত। এ অর্থেও শ্রীরাধার সেই প্রাধান্যই দেখি—অর্থাৎ বাহ্যতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ নারী, শ্রীরাধা। এজন্যই, আমার মনে হয়, পুরাণে শ্রীচৈতন্যের অবতারের কথা নাই; কারণ পুরাণে পরমা-পুরুষেরই অবতার কীর্ত্তিত হইয়াছে; তৎকথিত সকল অবতারই সেই পুরুষের।* কিন্তু পুরাণ আমাদের পক্ষে না হইলেও, অর্থাৎ পুরাণে পরমা-প্রকৃতি বা নারীর অবতারের কথা না থাকিলেও, অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধন-শাস্ত্র শিব-কথিত তন্ত্রে তাহার উল্লেখ দেখি। তন্ত্রমতে সকল অবতারই চিন্ময়ী পরমা-প্রকৃতির; কারণ অবতারের গুণ-কর্ম্মাদি প্রকৃতির নিজের, পুরুষে সে সব থাকে না। তাই যেন গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।

অর্থাৎ, আমি নিজের প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনার মায়ার দ্বারা আবির্ভূত হই। এই ব্যাপারে পুরুষের সে চিদত্ব আর থাকে না—তাহা ঘুচিয়া যায়, অন্য কথায় সাংখ্যকথিত তাঁহার সে "অসঙ্গোহয়ম্পুরুষঃ" ভাব আর থাকে না। গীতার উদ্ধৃত ঐ শ্লোক শ্রীগৌরাঙ্গেও খাটে। পুরাণোক্ত দশাবতারের কথা তোড়ল তন্ত্রের দশম উল্লাসের শেষে এইরূপ আছে—

শ্রীশিব উবাচ।
তারাদেবী মীনরূপা বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তিকা।
ধূমাবতী বরাহঃ স্যাৎ ছিন্নমস্তা নৃসিংহিকা॥
ভুবনেশ্বরী বামনঃ স্যান্মাতঙ্গীঃ রামমূর্ত্তিকা।
ত্রিপুরা জামদগ্ন্যঃ স্যাৎ বলভদ্রস্তু ভৈরবী॥
মহালক্ষ্মীর্ভবেদ্ বুদ্ধো দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী।
স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণমূর্ত্তিঃসমুদ্ভবা।

অর্থাৎ, তারা হইতেছেন মীনাবতার; বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তি; ধূমাবতী বরাহ; ছিন্নমস্তার অবতার নৃসিংহ; ভুবনেশ্বরী বামনাবতার; মাতঙ্গী রামমূর্ত্তি; ত্রিপুরা বা ষোড়শী পরশুরাম; ভৈরবী বলরাম; মহালক্ষ্মী বুদ্ধাবতার; দুর্গা কল্কিরূপা, আর স্বয়ং ভগবতী কালী শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণা।*

তন্ত্রমতে যখন অবতারই নারীর—পরমা-প্রকৃতির—তখন তন্ত্রের theory অনুসারে শ্রীগৌরাঙ্গে শ্রীরাধার অবতারিত্বই সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু আমি যতগুলি তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছি, তাহাদের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের উল্লেখ দেখি নাই। নাই বা উল্লেখ থাকিল? পুরাণ কিংবা তন্ত্র সকল অবতারের কথা তো বলেন নাই; বরং তন্ত্র ঐ দশাবতার ভিন্ন অন্য কোন অবতারের কথাই বলেন না কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে একথা আছে দেখি—

* মার্কণ্ডেয় পুরাণাদিতে শক্তির বিভিন্ন-মূর্ত্তির আবির্ভাবের কথা আছে; কিন্তু সে সকল ঘটনা মানব-সমাজের বাহিরের।

* পাঠক দেখিবেন, ভাগবতের "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এ কথা জোরের সহিতই "স্বয়ং ভগবতী কালী" ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে তন্ত্র মানিয়া লইয়াছেন। অনেক তন্ত্রাচার্য্য দশমহাবিদ্যার মধ্যে কালীরই পূর্ণতার পক্ষপাতী; তাই দশাবতারের মধ্যে তন্ত্র তাঁহাকে গণনা করেন নাই, তাঁহাকে—পুরাণের কথায়—অবতারী বলিয়াছেন আর তাঁহার পরিবর্ত্তে দশমহাবিদ্যার বাহিরের দুর্গাকে ধরিয়া দশাবতারের সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছেন। কালী ও কৃষ্ণের তন্ত্রোক্ত একত্বের ধারণা অনেকের দেখা যায়। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

যশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি।
সেরূপ লুকালি কোথা করাল বদনি॥

আবার কমলাকান্তের একটী পদে দেখি:—

জান না রে মন পরম কারণ শ্যামা তো সামান্য মেয়ে নয়।
শ্যামা মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়॥

মহাভাগবত উপপুরাণ। তাহাতে দেখি কংস-কারাগারে অবতীর্ণা শ্যামাই কৃষ্ণ। সম্ভব তোড়ল-তন্ত্রাদির পরে উক্ত ভাগবত লিখিত হইয়াছে।

অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়াঃ হরে সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।

অর্থাৎ সত্ত্বনিধি হরির অবতার অসংখ্য। সেই সকল অনুক্ত অবতারদের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ অন্যতম হইতে পারেন বটে, তবে ইহাতে তিনি যে অবতারী ইহা প্রতিপন্ন হয় না। না হউক, ক্ষতি নাই। *

শ্রীচৈতন্যে নারী-ভাব-প্রাবল্য সম্বন্ধে আরও কথা বলিব। শ্রীচৈতন্যের চিত্র দেখুন; দেখুন সে মুখ—তাহাতে পুরুষ-ভাবের কিছুই নাই, তৎপরিবর্ত্তে তাহাতে যে কমনীয়তা ও কোমলতা দেখা যায় তাহা সম্পূর্ণভাবে নারীজনোচিত। আর সে হৃদয়? তাহার কোমলভাবের তুলনা পুরুষে কোথায় পাইব? আবার সে আনন্দমাখা করুণ-কণ্ঠের গানের ঝঙ্কার—তাহার সেই ভাবের সুর, হয়ত যে ভাবের সুর পাখীর গানে শুনিয়া চমকিত হইয়া সে দিন Coleridge বলিয়াছিলেন—

And is she sad or jolly?
For ne'er on earth was sound of mirth
So like to melancholy.

আর Shelleyও একদিন সম্ভবতঃ যে ভাবের সুর পাখীর গানে শুনিয়া বলিয়াছিলেন যেন সে গানের সুরে,—

There is some hidden want.

—সে করুণ কণ্ঠের ঝঙ্কার, নারীকণ্ঠের বৈ আর কি হইতে পারে?* তবে সে কণ্ঠের যে পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্যও ছিল, ইহাও লেখাপড়ায় দেখি, সম্ভবতঃ ভগবদ্বিরহ-জনিত আর্ত্তিকালে সে কণ্ঠ নারী-কণ্ঠ হইত।

নারীই সর্ব্বত্র সর্ব্বসুখবিধায়িনী; ভক্তিমার্গের পারমার্থিক বিষয়েও তাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখি—

ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।

স্বয়ং সেই ভক্তসুখ-দায়িনী হ্লাদিনীই শ্রীচৈতন্যের দেহ। যদি হ্লাদিনী শ্রীগৌরাঙ্গে অধিষ্ঠিতা না থাকিতেন, তবে তাঁহাকে 'পুছিত' কে? এখনে গৌরাঙ্গ-দেহে কাহার প্রাধান্য—শ্রীকৃষ্ণের না শ্রীরাধার?

আবার জাগতিক ব্যাপারেও নারীরই শ্রেষ্ঠতা। Montgomery লিখিয়াছেন—

Here woman reigns; the mother,
daughter, wife,
Strew with fr sh flowers the
narrow way of life.

রাধাকৃষ্ণের পার্থিব লীলাতেও সেই নারীরই রাজত্ব দেখি। শ্রীবৃন্দাবনের রাণী কে? ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণকে কাহার

* "ভক্তভক্তি ভগবন্ত গুরুচতুর্নাম বপুঃ এক" "ভক্তমালে" ধৃত এই দোঁহার কথা হইতেছে আমাদের শাস্ত্রেরই কথা। অর্থাৎ ভক্তভক্তি, (ভক্তিদেবী) শ্রীভগবান্ স্বয়ং আর শ্রীগুরুদেব এই চারিটী নাম একেরই—অন্য কথায় এই চারিটীর দেহ একই। বৈষ্ণব-পুরাণাদি-শাস্ত্র ভক্ত আর ভগবানের প্রভেদ বড় মানেন না, বরং ভগবানের অপেক্ষা শাস্ত্র ভক্তেরই প্রাধান্য দেন। আদি-পুরাণে ভগবদ্বাক্য এই—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

অর্থাৎ আমার ভক্তগণ আমার যথার্থ ভক্ত নহেন। যাঁহারা আমার ভক্তগণের ভক্ত তাঁহারাই আমার ভক্ত-শ্রেষ্ঠ। আবার পদ্মপুরাণে শিববাক্য—

——— বিষ্ণোরারাধনা পরন্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং॥

অর্থাৎ হে দেবি, বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তদপেক্ষা তাঁহার ভক্তগণের অর্চ্চনা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। ভাগবতে দেখি, ভগবান্ বলিতেছেন—

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা

অর্থাৎ আমার পূজাপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা অভ্যধিক। এখন কথা হইতেছে এই যে, যখন একদিকে ভক্তের পরাকাষ্ঠা হইতেছেন শ্রীচৈতন্য, তখন কাজেই এ হেন তিনি ভগবান্ বৈ আর কি হইতে পারেন? আর উপরের কথানুযায়ী আমি যদি এমন কথাও বলি যে, তিনি ভগবান্ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর, তাহাতেই বা দোষ কি? অতএব ইহার পর পুরাণ বা তন্ত্রাদিতে তাঁহার উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক, সে খোঁজের আর কোন দরকার নাই। কেহ কেহ তাঁহার অবতারিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য পুরাণাদি হইতে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক দুই একটা অনর্থক তুলিয়া থাকেন।

*উদ্ধৃত ইংরেজী কবিতার অংশগুলিই কীর্ত্তনের সুরের সংক্ষেপে উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা। শুনা যায় মহাপ্রভুর আনন্দ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরের এবং কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত তাঁহার করুণ-বিলাপের কণ্ঠের অনুকরণে কীর্ত্তনের সুর প্রথম সৃষ্ট হয়। তাঁহার অন্তরঙ্গগণ না কি বিবিধ-রসপূর্ণ সে কণ্ঠের কলধ্বনি গোপনে শুনিতেন, আর তাহাতেই না কি তাঁহারা কীর্ত্তনের সুরের সন্ধান পাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং কীর্ত্তন করিবার সময়—তখনকার প্রচলিত চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব প্রভৃতির পদ গাইবার সময়—কোন ভাবের সুর অবলম্বন করিতেন, তাহা বলা কঠিন। এখনও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র জয়দেবের গান হয়, কিন্তু একমাত্র বাঙ্গালা ছাড়া অনেক স্থানেই তাহা এখনকার প্রচলিত কীর্ত্তনের সুরে হয় না।

কোটাল সাজাইয়াছেন? তাহা হইলে এখনে প্রাধান্য কাহার? সেই আমার বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা-রাণীর না? তাঁহার দেহে, সেই রাণীর অধিষ্ঠানের "গরবেই" তো শ্রীচৈতন্যের "গরব"? বলুন না কেন শতবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার—

নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই ॥

তাঁহার সে কথা ষোল-আনা-ভাবে আমি কখনই মানিব না। এটা যেন আমার ঝগড়া করা—

শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ ॥
—নইলে শুধুই মদন—

সেইরূপ।

এখন আর একদিক হইতে আমার বক্তব্য বুঝাইব। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এই সকল কথা আছে—

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥
কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেম-ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥
হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথাতথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা ॥

* * *

অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয় ॥

* * *

কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিতে অপরাধির না হয় বিকার ॥

* * *

তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহা না হয় অঙ্কুর ॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥

এই কথাগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীচৈতন্যের গুণগত বিভেদ বেশ দেখান হইয়াছে। উহাতে দেখি যে, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রেম পাওয়া বড় কঠিন; তিনি প্রেম দিতে চাহেন না, ভক্তি-মুক্তি দিয়া ভক্তকে ফাঁকি দেন। আবার তিনি ভক্তের অপরাধও গ্রহণ করেন। অপরাধী ভক্তের তাঁহার নামে সাত্ত্বিক বিকার হয় না। এরূপ স্থলে সে ভক্তের প্রচুর অপরাধ থাকা বুঝিতে হইবে; সে জন্যই উষর-ভূমিরূপ তাহার হৃদয়ে কৃষ্ণনাম-বীজ অঙ্কুরিত হয় না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যে এ সকল কিছুই নাই; তিনি অত্যন্ত উদার—নাম-গ্রহণেই তিনি নির্ব্বিচারে ভক্তকে প্রেম দেন। তাহাতে ভক্তে সাত্ত্বিকভাবের বিকাশ হয়—চোখে অশ্রু ঝরে। *

এখন দেখিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য একই বস্তু হইলেও কেবল শ্রীচৈতন্যেই এ উদারতা—তুলনায় প্রকারান্তরে এ প্রাধান্য—কেন? উত্তর, শ্রীচৈতন্যে যে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া শ্রীরাধাও অধিষ্ঠিতা; এ উদারতা, এ কোমলতা, যে তাঁহার সেই নারী-ভাবেরই ফল। প্রেম যে নারীরই নিজস্ব—তাহার সর্ব্বস্ব। এ সকল কথায় শ্রীগৌরাঙ্গ-দেহে শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা শ্রীরাধার প্রাধান্য তো খুব বুঝা যায়। তবু শ্রীচৈতন্য কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার! বাহবা!

শ্রীচৈতন্যের মিলিত-তনুর ন্যায় যে এক প্রকারের পুংস্ত্রী-ভাবের সামবায়িক দেহ হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে, একথা আমরা এখন আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে বলিব; এবং আরও দেখিব যে, ঐরূপ শরীরে স্ত্রীত্বের আধিক্যও

* যীশুরও ঐরূপ উদারতার কথা বাইবেলে আছে। কোন এক ইংরেজী কবিতা হইতে কিছু উঠাইতেছি—

Wanderer from thy Father's th one
Hasten back—thine errings own;
Turn—thy path leads not to Heaven;
Turn—thy sins will be forgiven,
Turn—and let thy songs of praise
Mingle with angelic lays. (নাম-কীর্ত্তন)
Wanderer, here is bliss for thee;
Leave them all to follow Me

থাকিতে পারে বা থাকে, যেমন আমাদের মতে উহা শ্রীচৈতন্তের শরীরে ছিল। যৌন-রহস্ত-বিশারদ (Sexologist) Dr. Magnus Hirshfeld হইতেছেন এখনকার যৌনতত্ত্বের Einstein। তিনি বলেন—

The fact is there is no such thing as an absolute man or an absolute woman. † When you bear in mind the fact that science can change the sex of guinea pig, or cause other animals to manifest the characteristics of the opposite sex, it will not be difficult for you to apprehend that there is or may be such a thing as relativity in sex. The effimenate man or the masculine woman is, to the sex-scientist, but expressions of "biological variations." The surprising fact is that you bear certain characteristics of the opposite sex in more or less extent whether you like it or not.

আবার এবথাও পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতের—

It is a scientifically established fact that about three per cent of the population are of the intermediate sex, in other words, there are more than ten millions of them in China.

তিনি আরও বলেন -

If you are married or are going to be married the chances of your finding happiness in life with your mate depends largely, though not entirely, upon how closely the bi-sexual characteristics in you compliment those in your mate. The perfect sexual union is the perf ct complimenting of these qualities on the part of the couple concerned.

এই কথানুসারে বলা যায় যে, শ্রীচৈতন্য ছিলেন বিজ্ঞানের ভাষায় "effimenate man," তবে স্ত্রীত্ব তাঁহাতে পরিস্ফুটভাবেই (Predominating ছিল, এবং তিনি উক্ত জার্ম্মান পণ্ডিত-প্রবরের কথা মত "Intermediate Sex"এর (পুংস্ত্রীর মধ্যবর্ত্তী) হইতে পারেন। শ্রীচৈতন্ত-সম্বন্ধে এসব লেখা ধৃষ্টতা। তবে তাঁহার রকমটা লৌকিকভাবে কতকটা বুঝানই আমার উদ্দেশ্য। স্ত্রীত্ব-প্রধান ভাবের জন্যই তো শ্রীচৈতন্য প্রেমের ঠাকুর—ভয়ের ঠাকুর (কাঁচা-খেগো দেবতা) নহেন। বৈদেশিক কবি Lyteএর ঈশ্বরের উদ্দেশে কাতর আহ্বানের ভাষা তাঁহার প্রতি বেশ খাটে—

Come, not in terrors, as the king of kings,
But kind and good with healing on thy wings,
Tears for all woes, a heart for every plea :
Come friend of sincners thus abide with me.*

"পরকীয়া" সম্বন্ধে আরও লিখিবার রহিল। এখন এস একবার শ্রীরাধাবল্লভ-পাদাব্জ-সমর্পিত-প্রাণে রাস রসেশ্বরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপিণি শ্রীরাধে! তুমি আমাকে যাহা লিখাইয়াছ, তাহাই লিখিয়াছি। এখন একবার এ পাপিষ্ঠকে এতটুকু কৃপা করিবে না কি বৃন্দাবনরাণী? এস এস প্রেমময়ি! তোমার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আমার কাণের কাছে নিয়ত শুনাও—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্॥
চেতঃ প্রাঙ্গনসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাংকৃতিং।
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥
সে দিন আমার কবে হবে গো?

* President of the Sex Science Institute in Berlin and one of the Presidents of the World League for Sexual Reform on a Scientific Basis.

† আমাদের শাস্ত্রের কথামতে সকল জীবেই পুরুষ-প্রকৃতি আছেন। স্বয়ং ভগবান্ পুরুষ-প্রকৃতির মিলিত মূর্ত্তি; তাই কাহারও কাহারও মতে তিনি কখনও পুরুষ কখনও বা নারীভাবে আবির্ভূত হ'ন। শ্রীচৈতন্যও একাধারে সেই পুরুষ ও নারী; তবে তাঁহাতে নারীভাবের আধিক্য এই মাত্র বিশেষ। প্রচলিত গানেই আছে—'তারা পরমেশ্বরী। কখনো পুরুষ হও মা কখনো নারী॥'

*ভগবান্ সম্বন্ধে বৈষ্ণবদের "প্রাণসখা" "পতিতপাবন" প্রভৃতি ভাবই এই। বলা অনাবশ্যক খৃষ্টানধর্ম্ম আংশিক ভাবেই বৈষ্ণবধর্ম্ম।

অভিভাষণ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার

আজ আপনারা আমার মত নগণ্য ব্যক্তিকে যে সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন, তার হয় তো যোগ্য আমি নই—কিন্তু আপনাদের এই উদারতার জন্য আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আজ হুগলি-জেলার গ্রন্থাগারসমূহের অধ্যক্ষ ও গ্রন্থরক্ষকদের সম্মেলনে বোধ হয় অনেকের অনেক কিছু বলিবার আছে এবং তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াও আসিয়াছেন। আমি আজ তাই শ্রোতা হইয়া শিক্ষার্থী হইয়া আপনাদের দ্বারস্থ হইয়াছি। আজ আর এখানে গ্রন্থরক্ষা ও গ্রন্থাগারের সৌষ্ঠব-সম্পাদনের ব্যবহারিক বিদ্যায় অঙ্গীভূত কোনও বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমার নাই। এই সম্মেলনে আপনাদের আলোচনা শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা আমি রাখি।

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থরক্ষা, সাধারণ গ্রন্থাগার, জনসাধারণের শিক্ষার উদ্বোধন ও আয়োজন এই সব ভাব ও কথাগুলো সম্পূর্ণ না হইলেও, প্রধানতঃ প্রতীচ্যের ও আধুনিক। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রাচ্যে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থরক্ষার কথা শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ব্যক্তি, বংশ ও সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি ছিল। মধ্যযুগের প্রতীচ্যেও লেখাপড়াটা--অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা—যাজক ও মঠবাসী খৃষ্টীয় মোহান্ত ও বৈরাগীদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের কথা আমরা মধ্যযুগের শেষ পাদে—খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে—প্রতীচ্যের সাহিত্যের মধ্যে দেখিতে পাই। ১৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নিকলো নিকলি তাঁহার নিজের সংগৃহীত হস্তলিখিত গ্রন্থসমূহ ফ্লোরেন্সের জনসাধারণকে দান করিয়া গিয়াছিলেন। নিকলো নিকলির এই দান অবলম্বন করিয়া বোধ হয় ইংলণ্ডের প্রতিভাময়ী লেখিকা জর্জ্জ এলিয়ট্‌ তাঁর 'রমলা' উপন্যাসে বার্দোর দানের চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁর উপন্যাসেরও যুগ হইতেছে ইতালীর পুনরুজ্জীবনের (Renaissance) সময়ে—পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা আধুনিক যুগের প্রারম্ভে। খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দী ইউরোপের একটা ঘটনাময় যুগ। আমেরিকার আবিষ্কার (১৪৯২), বাইজাণ্টাইন-সাম্রাজ্যের পতন (১৪৫৩), গামাকর্ত্তৃক ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার (১৪৯৮), মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবন, মধ্য-ইউরোপের পুনরুজ্জীবন, ফ্লোরেন্সে সাবোনারোলার প্রভাব (১৪৫২—১৪৯৮) আর ফ্লোরেন্সে প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার-প্রতিষ্ঠা সবই ঐ খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে হইয়াছিল।

এই তো গেল ইউরোপের কথা। ভারতে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের সময়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, পঠন-পাঠন জাতি, শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, আর মুসলমান-আক্রমণের পর যে অনেক অমূল্য বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-গ্রন্থ ভারতবর্ষ থেকে অদৃশ্য হইয়াছিল ও এখানে লোপ পাইয়া, দেশান্তরিত হইয়া বিদেশে ও বৈদেশিক ভাষায় সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহার অন্যতম গৌণ কারণ হইতেছে, শিক্ষা-দীক্ষার এই রকম একটা একতন্ত্র ব্যবস্থা।

গ্রন্থ লেখার প্রারম্ভ অতি প্রাচীন যুগে হইয়াছিল। সে যে মানব-মনোবিকাশের ইতিহাসের কোন ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে হইয়াছিল—সে যে কতদিন আগে—আর কোন দেশে তার সূত্রপাত সে বিষয়ে ঠিক কিছু বলা সুকঠিন। তবে ছবি আঁকা ও লেখা দুইই যে একসঙ্গে বিকাশ পাইয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশের প্রাচীন প্রস্তর-যুগে গুহা-গাত্রে চিত্রিত অনেক ছবি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল চিত্র তখনকার দিনে লেখার কাজ করিত। এই সকল ছবি আঁকিবার উদ্দেশ্য যে কোনও একটা বড় রকমের ঘটনার স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। এই যুগের অনেক পরে

বোধ হয় লৌহযুগের প্রারম্ভে অক্ষরের সৃষ্টি হইয়া ছবির কাজ অক্ষরে নিবদ্ধ করিবার প্রথা সুরু হইয়াছিল। এই লিখন-প্রণালীর সৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্যতারস বিকাশের সহিত বিভিন্ন সময় হইয়াছিল।

আমাদের দেশে ডাক্তার বুলারের মতে লিখন-প্রণালী খৃঃ পূঃ ৮০০ বৎসরের যে অনেক পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আবার হারাপ্পা ও মাহেঞ্জোদারোর প্রমাণানুযায়ী এই প্রারম্ভ আরও অন্ততঃ ৫০০০ বৎসর পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছে!

এ তো গেল লিখন-প্রণালীর কথা। পুস্তক-রচনা বোধ হয় লিখন-প্রণালীর প্রারম্ভের প্রায় সমসাময়িক ধরিয়া লইলে বেশী ভুল হইবে না। এই গ্রন্থ-রচনা-প্রথা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও সভ্যতার স্তর বিশেষে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। প্রাচীন সুমেরীয়দিগের মধ্যে বাবিলনে ও আসুরদেশে মাটীর ফলকে লিখিয়া আগুনে পুড়াইয়া কঠিন করিয়া আধুনিক পুস্তকের পাতার মত ব্যবহৃত হইত। উর ও নিনেভেয় খনন করিয়া এরকম অনেক খোদিত মৃৎফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের দেশেও যে এইরূপ ফলকের ব্যবহার ছিল তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। পরে আমাদের দেশে গাছের পাতা, বল্কল ও কাঠের ফলক গ্রন্থ-রচনার উপকরণ যোগাইত। প্রাচীন পাশ্চাত্য-জগতেও স্থান-বিশেষে বৃক্ষপত্র, বল্কল, পশুচর্ম্ম, হাতীর দাঁতের ফলক ও কাঠের পাটায় গ্রন্থাদি লিখিবার পদ্ধতি ছিল। কাগজের ব্যবহার প্রাচীনকাল মিশর দেশেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়—প্রাচীন মিশরে Cyperus papyrus নামক Cyperaceae শ্রেণীর জলজ উদ্ভিদ হইতে পাপিরস কাগজ প্রস্তুত হইত—প্রাচীন গ্রীস ও রোম মিশরীয়দের নিকট পাপিরস্ কাগজের ব্যবহার ও প্রস্তুত-প্রণালী শিখিয়াছিল। আধুনিক উপায়ে ব্যবহারোপযোগী কাগজ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনাদের দ্বারা প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল। কাগজের বহুল প্রচার মুদ্রণ-প্রণালীর উদ্ভাবনের সঙ্গে আরম্ভ হইয়াছিল। চীনদেশে ছাপা ও কাগজ উভয়ই বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

ছাপার অভাবে প্রাচীনকালে গ্রন্থ সকল হাতে লেখা হইত, আর তার জন্য কোনও কোনও দেশে গ্রন্থ-লেখকের দল গঠিত হইয়াছিল; তারা নানা রকম সৌষ্ঠব সম্পন্ন ও সুন্দর অক্ষরে পুঁথি ও কেতাব নকল করিত। আরব ও পারস্য দেশে ইহারা একটা বেশ বড় রকম সংঘ সংগঠন করিয়াছিল। তাদের হাতের লেখা এখন তারিফ করিবার জিনিস হইয়া পড়িয়াছে; আর সেমেতীয় লিখন-প্রণালীসমূহও তাহাদের ইতিহাস-গবেষণার ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যখন অপর সকল জাতি হাতে পুঁথি নকল করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, তখন কেবল একমাত্র চীন দেশেই গ্রন্থ ছাপার কাজ প্রচলিত ছিল। এখন এই বর্ত্তমান যুগে বই-ছাপা সভ্যতার একটা অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। বই ছাপার কাজ আমাদের দেশে ইংরেজ-রাজত্বের অভ্যুত্থানের সঙ্গে আরম্ভ হয়। ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা থেকেই আমাদের দেশে জ্ঞানের আলোক উজ্জ্বলভাবে বিকীর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এটা ইংরাজ রাজত্বের একটা গৌরবময় দান—পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা বিমল রশ্মি যা' আজ ভারতের জাতীয়-সমাজের অনেক অন্ধ-তমসাবৃত কূপ ও কন্দরকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। তবু এখনও অনেক বাকী আছে—এখন সবেমাত্র আমাদের জাতীয়-জীবন জ্ঞানের অমৃত-সেচনে অঙ্কুরিত—ভারতীয় জাতীয়-জীবনের আলবালে এ অমৃত আরও অনেকদিন ধরিয়া সেচন করিতে হইবে। আমাদের সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মবিশ্বাস—আমাদের অন্ধভীতিপূর্ণ কুসংস্কার—আমাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত ও ধর্ম্মগত ক্ষুদ্রত্ব ও জড়ত্ব—বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া একটা মিথ্যা আড়ম্বরময় ধর্ম্মের সৃষ্টি—এ সকলের মূলে এই এক জ্ঞানের অভাব। জ্ঞান আমাদের সম্যক্ দৃষ্টি দেয়—চিন্তাশক্তির বিকাশ করে—অন্ধবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে—প্রাণে সন্দেহ জাগাইয়া দেয়।

"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর"—এটা আলস্যের কথা—মানসিক জড়তার কথা।

আজকাল কেহ কোনও দেশের বা জাতির সভ্যতার নিদর্শনের কথা তুলিলে আমরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি—আর এটা একটা প্রধান নিদর্শন—যে যে দেশের

কথা বলিতেছি—যে জাতির সভ্যতার এত গৌরব করিতেছি, সে দেশে বা সে জাতির মধ্যে বৎসরে কত বই ছাপা হয় আর কত বইই বা কাটে? এই কষ্টিপাথরে যদি আমরা আমাদের জাতীয়-সভ্যতার যাচাই করি তাহা হইলে বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে আমরা ইউরোপের অনেক পিছনে পড়িয়া আছি। আমাদের দেশে বই পড়িবার সখ, আকাঙ্ক্ষা বা তৃষ্ণার এখনও বড়ই অভাব। এই আকাঙ্ক্ষাটাকে জাতির মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই পিপাসা মিটাইবার ব্যাকুলতার সঙ্গে আমাদের জাতীয়-জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়া যাইবে। চিন্তা-শক্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে—জাতির জীবন অভিনব নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইবে—একটা নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত হইবে।

জাতির মধ্যে বা দেশের মধ্যে জ্ঞানের প্রচার ও জ্ঞানের পিপাসা বাড়াইবার একটা অন্যতম উপায় স্থানীয় গ্রন্থাগার-গঠন ও সাধারণের বিনা খরচায় পঠন-পাঠনের সুবিধা বিধান করা। কোনও কোনও দেশে সুদূর পল্লীবাসিদের অধ্যয়নের সুবিধা-সম্পাদনের জন্য শহরের কেন্দ্র গ্রন্থাগার থেকে পল্লীতে সংস্থাপিত শাখা-গ্রন্থাগারসমূহে নূতন প্রকাশিত গ্রন্থসকল নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়—এ ব্যবস্থায় সুদূর গ্রাম ও পল্লীবাসিদের নূতন বই সকল পড়িবার বড় সুবিধা হইয়া থাকে। আবার কখনও কখনও এই সকল পল্লীর শাখা গ্রন্থাগারে শহরের কেন্দ্র থেকে লোক পাঠাইয়া বক্তৃতা ও চলচ্চিত্রের সাহায্যে অনেক দুরূহ বিষয় সাধারণ পল্লীবাসিদের বোধগম্য করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণের জ্ঞানের পিপাসা বাড়াইবার আর তার পরিধি প্রসারিত করিবার এ একটা প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, বাঙ্গালা দেশে এ রকম কোনও পন্থা এখনও অবলম্বন করা হয় নি।

আজ আপনারা আপনাদের হুগলী জেলায় যে এই রকম একটা প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারিয়াছেন, এটা বড় আনন্দের কথা—আপনাদের জেলায়, পল্লীতে-পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে যে একটা সাড়া পড়ে গেছে—এতে আমরা সকলেই উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়াছি, আর তার জন্য বাঙ্গলা দেশ আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা সকলেই আপনাদের এই প্রয়াসের সাফল্য কামনা করি।

অনেক দিনের সাহচর্য্যে পরস্পরের মধ্যে একটা সৌহার্দ্য ও প্রীতি জেগে ওঠে। সে প্রীতিটা অহেতুকী অর্থাৎ এ ভালবাসাটা ভালবাসবার জন্যই এর ভেতর অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকে না। আমি এক রকম আজন্মই এই বই-কেতাবের সাহচর্য্য করে থাকি—আমার জ্ঞানের উন্মেষ থেকে এদের সঙ্গে আমার পরিচয়—আর আজ এই সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর বইএর ধুলো ঝেড়েই আমি জীবিকা-অর্জ্জন করি—হয় তো বই-কেতাবকে আমি একটু বড় করে দেখে থাকি। কিন্তু আমার মনে হয় যে যাঁর এদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে—যিনি মানুষের মধ্যে মানুষের মনের মহত্ব স্বীকার করেন—যিনি জ্ঞানমার্গকে প্রকৃষ্ট মার্গ বলে মনে করেন—তিনি অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিবেন যে, মানুষের জীবনে এই ছেঁড়া পুঁথিগুলার স্থান খুব বড়। এরা মানুষকে মানুষ করে তোলে—তার পশুত্ব ঘুচিয়ে দেয়।

আর এই সব গ্রন্থ থেকে আমরা যে কত মনীষীর পরিচয় পাই তার সংখ্যা করা যায় না। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কত আলাপ হয়। যাঁদের আমরা কখন দেখি নি—যাঁদের সঙ্গে আমাদের আলাপের কোনও সম্ভাবনাই নাই—তাঁরা আমাদের আপনার জন হ'য়ে পড়েন—তাঁদের ওপর প্রীতি জেগে ওঠে। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট সময় নাই—আলাপ করিবার জন্য চিঠি লিখে সময় নির্দ্ধারিত করিতে হয় না—কার্ড পাঠাইয়া আগন্তুকের শূন্য কক্ষে ডাকের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না—তাঁদের সঙ্গে আলাপ ঘণ্টা মিনিট ও সেকেণ্ডের গণ্ডীর সীমায় আবদ্ধ থাকে না। আমার গ্রন্থাগারে বসিয়া প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে আমার যতক্ষণ ইচ্ছা আলাপ করিতে পারি—তাদের কথা শুনিতে পারি—তাতে তাঁদের বিরক্তি নাই—চিরকালই সর্ব্বসময়েই তাঁরা আলাপের জন্য প্রস্তুত। কালিদাস চিরকালই পুরাঙ্গনার কনককঙ্কনের শিঞ্জনের তালে তালে ভবন শিখীর নৃত্যের ললিতকাহিনী শুনাবেন, তাতে তাঁর ক্লান্তি নাই—সেক্সপিয়ার লিয়ারের বুকভাঙ্গা দুঃখের চিত্র দেখাবেন—

অতীতের আত্মাকে এরা সঞ্জীবিত করে রেখেছে। অতীতের সব চলে গেছে—আছে তার কাহিনীর অমূর্ত্ত ব্যঞ্জনা আর বিলুপ্ত রাগের অমর মূর্চ্ছনা। এই অতীতের আত্মার আলোকে আমরা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে গঠন করে তুলি। কত ভুল ভ্রান্তি, নীচত্ব ও মহত্ব, সংকীর্ণতা ও উদারতা, লজ্জা ও গৌরবের কত চিত্রই না আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। অতীতের শিক্ষায় আমাদের জাতীয়-জীবন সম্যক্‌রূপে গঠিত হ'য়ে ওঠে।

যথোপযুক্তরূপে সংগঠিত গ্রন্থাগারগুলি এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করে। যদি সুনির্ব্বাচিত গ্রন্থ সকল একটী সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত থাকে তাহা হইলে অনেকে মানুষ হইবার সুবিধা পায়—উচ্চ শিক্ষার অভাব জনসাধারণ অনুভব করিবার সুবিধা পায় না। যাঁরা কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে যাবার সুবিধা পান না, তাঁরা এই সকল গ্রন্থাগারে নিয়মিতভাবে কোনও একটা বিশেষ বিষয় অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান লাভ করেন এমন কি উহাতে পারদর্শিতা অর্জ্জনের পর নূতন সত্যের আবিষ্কার করে ধন্যবাদার্হ হন। জুড্-এর মত যারা অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসা লইয়া হতাশভাবে ঘুরে বেড়ান—বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁদের স্থান নাই—তাঁদের পিপাসা মিটাবার এই গ্রন্থাগার-গুলিই একমাত্র উৎস।

মানুষের জীবনটাও তো চিরকাল নিছক সুখের নয়—অভাব, দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক—সবই তো আছে—তার মধ্যে যদি একটু আনন্দ, একটু প্রীতি লাভ করা যায়, সেটা কি বড় কম লাভ? অন্ধকারাচ্ছন্ন তামসী রজনীতে যদি হঠাৎ ছিন্ন মেঘের প্রান্ত দিয়ে একটু নির্ম্মল জ্যোৎস্না আসিয়া পড়ে—তবে সেটা কি সুন্দর লাগে না? সেটুকু উপভোগ করায় কি কম আমোদ? এই সকল পাঠাগার যদি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের শোক দুঃখ ক্ষণিকের জন্য ভুলিয়ে দিতে পারে—সেটাও তো একটা বড় কথা? যাঁরা এই প্রীতি ও আনন্দ উপভোগ করেছেন তাঁরাই বলতে পারেন এ আনন্দ কিরূপ—এ মাদকতা কেমন—শোক দুঃখ ভুলিয়ে দেয়, প্রাণে বল সঞ্চার করে—এ অমৃতময় সোমরস দেবতার বাঞ্ছিত—যাঁরা এই অমরবাঞ্ছিত সুধা-পানে ধন্য হ'য়েছেন তাঁরা কি আজ প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে বলতে পারেন না?—

স্বাদোরভক্ষি বয়সঃ সুমেধাঃ
স্বাধ্যো বরিবো বিত্তরস্য।
বিশ্বে যং দেবা উত মর্ত্ত্যাসো
মধু ব্রুবন্তো অভিসংচরন্তি॥

সুবুদ্ধির সহিত আমি এই সুমিষ্ট আহার্য্যগ্রহণ করিয়াছি, এতে সুচিন্তা জাগিয়ে দেয়, দুশ্চিন্তা দূর করে দেয়, দেবতা আর মানুষ এই মধু একত্রে উপভোগ করেন।

অপাম সোমমমৃতা অভূমা-
গন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।
কিং নূনমস্মাকৃণবদরাতিঃ
কিমু ধূর্তিরমৃত মর্ত্ত্যস্য॥

আমরা সোম পান করিয়াছি; আমরা অমর হইয়াছি; আমরা জ্যোতিতে গমন করিয়াছি, আমরা দেবগণের সহিত পরিচিত হইয়াছি; শত্রু আমাদের কি করিতে পারে? হে অমর, মানুষের হিংসাই বা আমাদের কি করিতে পারে? যে এই সোম পান করিয়াছে সেই অমর হইয়াছে—আপনারাও উহা পান করিয়া অমর হ'ন।*

---

* বাঁশবেড়িয়ার বিগত গ্রন্থাগার-সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

শান্তিপুরের লেখকবর্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

৺জয়গোপাল গোস্বামী

প্রণীত গ্রন্থ—কাব্যদর্পণ, বাসবদত্তা, সীতাহরণ, চারুগাথা, সৎসন্দর্ভ, শৈবলিনী, রত্নযুগল (এই দুইখানি উপন্যাস), আটাকাটি, সমাসমালা, লঘুব্যাকরণ, অনুক্রমণিকা (সংস্কৃত ব্যাকরণ), গণিতবিজ্ঞান; গোবিন্দ দাসের কর (ড়)চা এবং কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনা।

'কাব্যদর্পণ' কিঞ্চিদধিক ৭১ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়; তখন বাঙ্গালা ভাষায় অলঙ্কার গ্রন্থ ছিল না; ইহা গভীর পাণ্ডিত্যপরিপূর্ণ। 'আটাকাটি' পদ্যে শান্তিপুরের তদানীন্তন 'মুদ্গর' পত্রিকার সহিত মসীযুদ্ধের ফল। ব্যাকরণ দুই খানির অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল।

'করচা' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরে লিখিত হইতেছে।

"শান্তিপুরের অদ্বৈতবংশজ (মদনগোপাল শাখাভুক্ত) গোস্বামী বংশের গৌরব, স্বনামধন্য সাহিত্যসেবী, সুপণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় অশীতিবর্ষ বয়সে বিগত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার পুত্রপৌত্রদৌহিত্রআত্মীয়স্বজনের মুখে হরিনামসঙ্কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে সজ্ঞানে ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা ভাষায় অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ৩০।৪০ বৎসরাধিককাল শান্তিপুর (মিউনিসিপ্যাল) ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার অসংখ্য ছাত্রবর্গের মধ্যে অনেকেই সংসারে নানাকার্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে' তিনি সেকালের একালের সংযোগ-গ্রন্থির মত বিদ্যমান ছিলেন।' বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল তিনি সাহিত্যচর্চ্চায় ব্রতী ছিলেন। এত দীর্ঘকাল এরূপ একনিষ্ঠভাবে সাহিত্যসাধনা করিতে সাধারণতঃ দেখা যায় না।...এমন মধুর ও উদারচরিত, নিরীহ, নির্ব্বিবাদী, অমায়িক, অল্পে সন্তুষ্ট, স্নেহময় মনস্বী আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তিনি সুকবি ও ভাবুক ছিলেন; এবং ইদানীং অনেক নূতন পালা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র (শ্রীমোহনলাল ও শ্রীবীণাবল্লভ) সেইগুলি আশ্রয় করিয়া কথকতায় যশস্বী হইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত কবি শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী পিতার সাহিত্যপ্রিয়তার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।" (১) ইঁহার বিস্তৃত জীবনও প্রকাশিত হইয়াছিল। (২)

গোবিন্দ দাসের করচা প্রথম ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করেন। ইহার প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে দুইবার ঘোরতর আন্দোলন হইয়াছিল—একবার গোস্বামী মহাশয়ের জীবিতকালে, এবং অন্যবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে। নব সংস্করণের ভূমিকায় দীনেশবাবু বিরুদ্ধমতবাদীদের মত খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। "সেই সুদীর্ঘ ভূমিকা পাঠ করিয়া বহু গোস্বামী ও পণ্ডিত আমাকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন যে এই অমূল্য পুস্তক-খানির সম্বন্ধে তাঁহাদের সমস্ত দ্বিধা দূর হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ৺সতীশচন্দ্র রায়, এম্‌-এ, শ্রীযুক্ত গৌরভূষণ অচ্যুতচরণ তত্বনিধি, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ, শান্তিপুরনিবাসী ভূতপূর্ব্ব স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্ন্যাল, এম-এ, রঙ্গপুরের সরকারী উকীল শান্তিপুর-সন্তান রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ঐতিহাসিক ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, পণ্ডিতবর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী গোস্বামী প্রভৃতি বহু মহোদয় এই পুস্তকের পক্ষপাতী।"

---

(১) ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২২।

(২) বঙ্গভাষার লেখক, ১ম ও ২য় ভাগ।

(১) করচার নব সংস্করণের ভূমিকায় লিখিত আছে—উপরোক্ত নলিনীমোহনবাবু ও শরৎবাবু পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন (আরোপিত অভিযোগের উত্তরে) যে ৺জয়গোপাল গোস্বামীকে শান্তিপুরে 'একঘরে' করা হয় নাই এবং তাঁহাকে শরৎবাবু পুরাতন করচার পুথি নকল করিতে দেখিয়াছিলেন। ঐ সম্বন্ধে শান্তিপুরস্থ কবি শ্রীকীর্ত্তীশচন্দ্র গোস্বামী ও ৺হরিলাল গোস্বামী মহাশয়দ্বয়ের পত্রও উদ্ধৃত হইয়াছে। কীর্ত্তীশবাবু শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ত্তমান চেয়ারম্যান শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিয়াছিলেন এবং ৺হরিলাল গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "করচার পুথি জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ছিল ইহা অনেকেই জানেন। কিন্তু ইহার ষোল আনা মৌলিকতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।" (২) দীনেশবাবু লিখিতেছেন, "তাঁহার কেন? আমি নিশ্চয়ই জানি যে মুদ্রিত ষোল আনা খাঁটী নহে। ৺জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় নিজেও আমার নিকট একথা স্বীকার করিয়াছেন। অপরাপর প্রাচীনপুথি সম্পাদকগণের ন্যায় প্রাচীন বর্ণবিন্যাসের প্রাকৃত রীতি কতকটা বদলাইয়াছেন; তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে অপ্রচলিত শব্দও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; পয়ার ছন্দের যেখানে ব্যতিক্রম পাইয়াছেন, দুই একটী শব্দ কমাইয়া বাড়াইয়া নিয়মিত করিয়াছেন। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ ও কাশীরাম দাস প্রভৃতির পুথিতে যেরূপ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে করচায় ততদূরও করা হয় নাই।...কৃত্তিবাসাদি-সম্বন্ধে বটতলার প্রকাশকগণ যাহা করিয়াছেন, করচা সম্বন্ধেও তিনি কতক পরিমাণে সেই রীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না পুথিতে বেশী কোন পরিবর্ত্তন করা। মাঝে মাঝে প্রাচীন শব্দ বদলাইয়া তিনি পুস্তকখানিকে সহজবোধ্য করিয়াছেন।...তিনি প্রাচীন জটিল শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, হয় ত কোন কীটদষ্ট ছত্রাংশ হওয়াতে তাহা পূরণ করিয়া দিয়াছেন।"

নব সংস্করণে পূর্ব্বেকার অপ্রচলিত শব্দ পরিবর্ত্তনের স্থানে শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী প্রাচীন পাঠই রক্ষা করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময় ইঁহার বয়স প্রায় ৪০ ছিল (এখন বয়স ৭৫) এবং ইনি পিতার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। ইনি এবং ইঁহার অনুজ শ্রীমোহনলাল গোস্বামী (বর্ত্তমান বয়স ৬৫) করচার প্রাচীন পুথি দেখিয়াছিলেন। দীনেশবাবু লিখিতেছেন, "বেনোয়ারীলাল বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁহার রচিত 'খিচুড়ী,' 'পোলাও' প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইঁহার সরল ও তেজস্বিতাপূর্ণ প্রকৃতি। কঠোর সত্য বলিতে যাইয়া তিনি সময় সময় মনুক্ত সাবধানতাও রক্ষা করিতে পারেন না।" এইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় লিখিতেছেন, "প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুর-নিবাসী ৺কালিদাস নাথ কয়েকখানি বৈষ্ণব পুথি পিতার নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে 'করচা' ও 'অদ্বৈত-বিকাশ' ছিল। বাবা কয়েকদিনে 'করচা'খানি নকল করিয়া লইয়া উহা কালীদাসকে ফেরত দেন। করচায় অনেক ভুল ছিল, উহা কীটদষ্ট ও উচ্ছৃলিতদোষদুষ্ট এবং প্রায় ৩০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমিত। পরমভাগবত ৺মদনগোপাল গোস্বামীর (১) সাহায্যে ইহার নষ্ট লিখন উদ্ধার হয়। (ইহার ৮।৯ বৎসর পরে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে ইহা প্রকাশিত হয়।) প্রায় ৪।৫ বৎসর পরে কলিকাতায় ভক্তবর ৺শিশিরকুমার ঘোষকে দেখিতে গিয়া বাবা অনুরুদ্ধ হইয়া স্বহস্ত-লিখিত কয়েক পৃষ্ঠা (২।৩ ফর্ম্মা) উঁহার নিকট রাখিয়া আসেন। শিশিরবাবু গ্রন্থ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে বাবা নিজেই প্রকাশ করিবেন বলেন। মেয়াদান্তে বাবা অনেক চিঠি লিখিলেন এবং

(১) শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৫ম সংস্করণ। এখনও বহু বৈষ্ণব ও পণ্ডিত উক্ত করচা ও জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র মৌলিক প্রামাণিকতা অস্বীকার করেন।

(২) করচার ২য় সংস্করণ।

(১) ইঁহার কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় চৈতন্যভাগবতের সংস্করণে ইঁহাকে "কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশাবতংস পণ্ডিতাগ্রগণ্য" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

উত্তর না পাওয়ায় শিশিরবাবুর নিকট গমন করিলেন। তিনি বলিলেন, "রেইজ এণ্ড রায়তে"র সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে (১) ঐ কয় পৃষ্ঠা পড়িতে দিয়াছিলাম, তিনি তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছেন।' ইতিমধ্যে কালিদাস নাথ মালিককে ঐ পুথি ফেরত দিয়াছিলেন। সুতরাং উহা আর পাওয়া গেল না। দৈবক্রমে দেখা গেল যে শান্তিপুরের পাগলা গোস্বামীদের হরিনাথ গোস্বামীর নিকটে একখানি 'করচা' আছে। উহা অসম্পূর্ণ ও পাঠ-বিকৃতিদোষে দুষ্ট। বাবার নিকট যে নোট ছিল তাহার সাহায্যে ঐ পুথির লেখা মিলাইয়া নষ্ট পত্রখানির পুনরুদ্ধার হইল, এবং ঐ পুথি ফেরত দেওয়া হইল। শিশিরবাবু গোবিন্দদাসকে 'কায়স্থ' বলিয়াছিলেন, এবং ২২৭ পৃষ্ঠার মধ্যে ৫১ পৃষ্ঠায় (২) 'হাঁটু ধরি রাম রায় করেন ক্রন্দন' পর্য্যন্ত (নষ্ট অংশ) অপ্রামাণিক বলেন, কিন্তু তিনি 'অমিয় নিমাই-চরিত, ৬ষ্ঠ খণ্ডে' চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ 'করচার' বর্ণনা অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছেন। পরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ও ৮কালিদাস নাথ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে' গোবিন্দদাসকে 'কর্ম্মকার বলিয়া উল্লেখ থাকায় সকল সন্দেহ ভঞ্জন হইল। ৮মতিলাল ঘোষও 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় 'করচার' ঐতিহাসিকত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এখন আবার সমগ্র পুথিখানিকে জাল প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। অমৃতবাজার অফিস হইতেই এই আন্দোলনের আরম্ভ, পরে শান্তিপুর ও অন্যান্য স্থলে ইহার বিস্তৃতি হইয়াছে।"

নব সংস্করণের ভূমিকায় শান্তিপুর-গৌরব শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী ও প্রধান শিক্ষক শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস, বি-এ, (ইঁহার স্পষ্ট নামোল্লেখ নাই) মহোদয়দ্বয়ের উপর অসঙ্গত শ্লেষ থাকায় আক্ষেপের কারণ হইয়াছে। জ্ঞাতি রাধা-বিনোদ না কি ঢাকায় প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছিলেন যে করচা জাল করার কথা তিনি নিজে জানেন এবং ৮জয়গোপাল গোস্বামী তজ্জন্য 'একঘরে' হইয়াছিলেন। (পূর্ব্বে এই শেষ কথার উত্তর দেওয়া হইয়াছে।) শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী লিখিতেছেন, "রাধাবিনোদ তখন জন্মান নাই, অথবা গৃহাঙ্গনে হামাগুড়ি দিতেছিলেন।" বোধ হয় রাধাবিনোদ শোনা কথাই বলিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বরবাবু-সম্বন্ধেও সঠিক সংবাদ বাহির হয় নাই। ঢাকা স্বর্ণগ্রামের যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় (বিরুদ্ধ বাদীদের মধ্যে জনৈক প্রধান স্থানীয়) ১৯২৫ ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় করচা ও দীনেশবাবুর বিরুদ্ধে বহু কথা লিখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন (১) যে নবদ্বীপে ১লা মাঘ ৮অদ্বৈতশাখাসম্ভূত ব্রজানন্দ গোস্বামীর ভবনে বিশ্বেশ্বরবাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; এবং বিশ্বেশ্বরবাবু তাঁহাকে করচা-সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। বিশ্বেশ্বরবাবু যোগেন্দ্রবাবুর কতিপয় কথায় আপত্তি করেন। (২) যোগেন্দ্রবাবুও উহার প্রতিবাদ করেন। (৩) সংক্ষেপতঃ এইরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল—বিশ্বেশ্বরবাবু পূর্ব্বে জয়গোপাল গোস্বামীর ছাত্র ছিলেন; পণ্ডিত মহাশয় প্রধান শিক্ষকে রামদুর্ল্লভ খাঁ, বি-এল, সতীশচন্দ্র রায়, এম্ এ, ও আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ,র অধীনে প্রায় চল্লিশ বৎসর কার্য্য করিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অবসর লন; এবং বিশ্বেশ্বর বাবু তাঁহার চতুর্থ শিক্ষক থাকা কালে শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাওয়ায়, পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার সুন্দর হস্তলিপি দ্বারা লিখিত অসম্পূর্ণ 'করচা' খানি তাঁহাকে দিয়া ছিলেন। ৮।৫ তারিখের পত্রিকায় আরও লিখিত আছে যে পণ্ডিত মহাশয় না কি প্রথমতঃ বিশ্বেশ্বরবাবুকে বলেন যে, রাণাঘাটের যজ্ঞেশ্বর ঘোষ ঐ পাতাগুলি হারাইয়া ফেলেন, পরে বলেন যে ৮শিশিরকুমার ঘোষই উহা হারান এবং অন্যস্থলে বলেন যে পুথিখানি তিনি রাঢ়দেশ হইতে পাইয়া-ছিলেন; আরও লিখিত আছে যে, বিশ্বেশ্বরবাবুই না কি অসম্পূর্ণ অংশ কবি গোস্বামী মহাশয়কে সম্পূর্ণ করিতে বলিয়াছিলেন; ইত্যাদি।

দীনেশবাবুর ভূমিকায় লিখিত পূর্ব্বোক্ত অসঙ্গত শ্লেষ উদ্ধৃত হইল—"শান্তিপুরবাসী আর এক মহোদয় বলিতেছেন,

(১) ইনি শান্তিপুরের বলভী বংশের সন্তান।
(২) বর্ত্তমান সংস্করণের ২১ পৃষ্ঠা।

(১) অমৃতবাজার পত্রিকা। ৮।৫।১৯২৬
(২) অমৃতবাজার পত্রিকা। ২১।৫।১৯২৬
(৩) অমৃতবাজার পত্রিকা। ২৯।৫।১৯২৬

গোস্বামী মহাশয় পুথির কয়েক পৃষ্ঠা হারাইয়া বহুকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন, আমিই তাহাকে সে কয়েক পাতা জাল (?) করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।' বালক যেরূপ ময়রার দোকানের মিঠাই পাইলে তখনই তাহা গলাধঃকরণ করে, গোস্বামী মহাশয়ও না কি সেই সুপরামর্শটী তখনই গ্রহণ করিয়া ঐ কয়েক পৃষ্ঠা জাল করিয়া ফেলেন।" সুস্পষ্টভাবে লিখিত ভাষার এরূপ বিকৃত বর্ণনা একান্ত অনুচিত।

উপর্য্যুক্ত ভূমিকায় লিখিত আছে যে প্রাগুক্ত যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় বিরুদ্ধ লেখা ব্যতীত নানা প্রতিবাদ সভাসমিতিও আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্বেও তাঁহার 'গৌরাঙ্গ ও তাঁহার ধর্ম্মগৌরব' পুস্তকে 'করচা' হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। রায়বাহাদুর ৺রাসময় মিত্র মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "৺জয়গোপাল গোস্বামী 'করচা'কে বিদ্যালয়-পাঠ্য করাইবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে প্রকৃত কথা বলিতে বলি। তাঁহার আকার-ইঙ্গিতে তিনি কয়েক পাতা জাল করিয়াছেন বলিয়া আমার স্পষ্ট ধারণা হইল।" ইহার উত্তরে শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী লিখিতেছেন, "সে কথা বাবা পথের আলাপী, গাড়ীর সহযাত্রী রসময়ের নিকট রসোদগার অবশ্যই করিতেন না। পাপ-গোপন লোকের স্বভাব, স্বকৃত পাপ-প্রচার করিবার জন্য প্রবীণ গোস্বামী মহাশয় রসময় ডঙ্কা গলায় বাঁধিয়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন—ইহা বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি হয় না।"

ঐ ভূমিকায় আরও লিখিত হইয়াছে যে বাংলার প্রসিদ্ধ লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কচূড়ামণি প্রায় ৪।৫৪৬ বৎসর পূর্ব্বে হুগলীর নিকট কেওটার ৺গোরাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সমীপে 'করচা'র পুথি দেখিয়াছিলেন; উহা কীটদষ্ট ও জীর্ণ ছিল, তিনি উহা নকল করিতেন এবং তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে ডাকিয়া দেখাইতেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলেন যে, ৺জয়গোপাল গোস্বামীর মুদ্রিত পুস্তক ও ঐ পুথি একপ্রকার। যে যে পুস্তকে করচা প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে দীনেশবাবু তাহার একটী তালিকা দিয়াছেন। তিনি নিজে 'দি কলিকাতা রিভিউ' (১) বসুমতী (২) প্রভৃতি পত্রিকায় ও বহু গ্রন্থে (৩) উহার প্রামাণিকতা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। প্রবাসী (৪), গৌড়ীয়, বিষ্ণুপ্রিয়া, সাধনা (কুমিল্লা), আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রে যে সব বিরুদ্ধ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল দীনেশবাবু তাহারও প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে প্রায় ৩৭৫ বৎসর পূর্ব্বেকার বলরাম দাসের লেখায়, চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদীতে ও চৈতন্যভাগবতে এই গোবিন্দের উল্লেখ আছে এবং 'করচা' যে কেন এতদিন গুপ্ত ছিল এবং কেন এখন তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় না তাহার কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহাকে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। ৺জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ও কম লাঞ্ছিত হন নাই। নব সংস্করণের উৎসর্গে এইরূপ লিখিত আছে—

যে শিবকল্প পুরুষবরের জটিল সাধনা-বিমুক্ত
ভগবৎপ্রেম
নবদ্বীপধামকে দ্বিতীয় হরিদ্বারে পরিণত করিয়া
মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল,
ভক্তি-সুসমাচারের অগ্রদূত—মাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয় শিষ্য
সেই জগৎপাবন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর
বংশধর
অশেষ নিগ্রহ ও অকৃতজ্ঞতা-লাঞ্ছিত, সত্যে প্রতিষ্ঠিত,
প্রভুপাদ স্বর্গীয় জয়গোপাল গোস্বামী মহাভাগ
—যিনি তদীয় পুণ্যশ্লোক পিতৃপুরুষের
ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া
ভক্তিগঙ্গার ক্ষুদ্র শাখস্বরূপ—বিস্মৃতির বালুকান্তরে
লুক্কায়িত—গোবিন্দদাসের করচা
আবিষ্কার পূর্ব্বক গৌরাঙ্গ-ঠাকুরের নবলীলার
চিত্রালেখ্য উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন,—
তাঁহারই পবিত্র নামে
করচার এই নব সংস্করণখানি
উৎসর্গ করিলাম।

---

(১) মার্চ্চ, ১৯২৫ (২) চৈত্র, ১৩৩১। (৩) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ; (৪) শ্রাবণ, ১৩৩২।

পুথিখানি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়। দীনেশবাবু বলেন যে উহা খণ্ডিত নয়, কারণ উহার পর গোবিন্দের আর লিখিবার দরকার ছিল না। 'করচা' প্রায় ১৫১১ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। ১৫১০-১১ খৃষ্টাব্দের চাক্ষুষ ঘটনাবলীর স্মারক প্রত্যহ গোপনে লিখিত হইত, কারণ চৈতন্যদেব এরূপ কার্যের বিরোধী ছিলেন এবং ১৫০৯-১০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা স্মৃতি হইতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

একদিন প্রভু মোর মিশ্রের ভবনে।
কৃষ্ণগুণ গান করে ভক্তগণ সনে॥
গোবিন্দ বলিয়া মোরে ডাক দিয়া পাছে।
যাইতে কহিলা মোরে আচার্য্যের কাছে॥
আজ্ঞা মাত্র পত্র সহ বিদায় লইয়া।
শান্তিপুরে যাত্রা করি প্রণাম করিয়া॥
পৃষ্ঠে হাত দিয়া প্রভু আশিস্ করিল।
মোর চক্ষে শতধারা বহিতে লাগিল॥
প্রভু বলে নাহি কান্দ প্রাণের গোবিন্দ।
আচার্য্যে আনিয়া হেথা করহ আনন্দ॥
এই বাক্য শুনি মোর চক্ষে বারি বহে।
প্রভুর বিরহ বাণ প্রাণে নাহি সহে॥
প্রভুর বিরহ বেগ সহিব কেমনে।
নিদারুণ কষ্ট আসি উপজিল মনে॥

এইখানেই করচার শেষ।

"শুনি গোবিন্দ আনন্দিত হঞা।
অদ্বৈতের স্থানে চলে মনেতে চিন্তিঞা॥"

—প্রেমদাস কর্তৃক ১৭১২ খৃষ্টাব্দে রচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদী। (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় ২১৪৫নং পুথি, ১৪৮ পত্র।)

'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী' কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' অনুসরণে লিখিত। ইহাতে লিখিত আছে যে গোবিন্দ শান্তিপুর হইতে কাঁচড়াপাড়ার শিবানন্দ সেনের নিকটে গিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে পুরী গিয়াছিলেন। গোবিন্দ ১৫০৮ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৫ বৎসর মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর গোবিন্দের খবর পাওয়া যায় না। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পরও গোবিন্দ একবার শান্তিপুর আসিয়াছিলেন। গোবিন্দ লিখিতেছেন—

তারপর নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।
ভারতীকে লয়ে চলিলেন নানা রঙ্গে॥
পেছনে পেছনে আমি খড়ি লয়ে যাই।
নামমদে মাতোয়ারা চৈতন্য গোঁসাই॥
লক্ষ লক্ষ লোক চলে প্রভুর পেছনে।
বিস্তর পণ্ডিত চলে প্রভু দরশনে॥
রুদ্রদেব রামরত্ন জগাই পণ্ডিত।
গঙ্গাদাস শম্ভুচন্দ্র ভুবনে বিদিত॥
ঈশান শঙ্কর বলরাম গদাধর।
পণ্ডিতের শিরোমণি চণ্ডচণ্ডেশ্বর॥
কাশীশ্বর ন্যায়রত্ন আর সিদ্ধেশ্বর।
পঞ্চানন বৈদান্তিক আর রত্নাকর॥
এই সব ... পণ্ডিত চলে সঙ্গে।
প্রেমে মত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চলে রঙ্গে॥
নৃত্যপরায়ণ প্রভু আগে আগে ধায়।
কখন ধাবন লম্ফ পতন ধরায়॥
ধারা বহি অশ্রুবারি বহিছে নয়নে।
ভারতী গোঁসাই কান্দে প্রেম আস্বাদনে॥
তারপর পূর্ব্বদিকে চলে আবেশেতে।
আচার্য্যের গৃহে ধায় মাতিয়া ভাবেতে॥
কিছুকাল আচার্য্যের গৃহেতে রহিলা।
তার মধ্যে শচীমাতা আসি দেখা দিলা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু মাতার চরণে।
প্রণাম করিয়া কথা কন সন্তর্পণে॥
দুই চারি বাত কহি মায়া কাটাইয়া।
দক্ষিণে করিলা যাত্রা সকলে ছাড়িয়া॥
ঈশান প্রতাপ গঙ্গাদাস গঙ্গাধর।
ন্যাসীর সহিত চলে আর বানেশ্বর॥

* *

(অদ্বৈতাচার্য্য সম্বন্ধে অন্যত্র)
এমন তেজস্বী মুহি কভু দেখি নাই॥
পক্ক কেশ পক্ক দাড়ী বড় মোহনীয়া।
দাড়ী পড়িয়াছে তাঁর হৃদয় ছাড়িয়া॥(১)

(১) 'প্রবল লোম বক্ষসম'—গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃষ্ঠা ৪৪১।

[illegible]্যাসের পর চৈতন্যদেবের শান্তিপুর গমনের বিভিন্ন [illegible] আলোচনা প্রবন্ধান্তরে দৃষ্ট হইবে। এখানে কেবল মাত্র একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। উক্ত সময়ে চৈতন্যদেবের দর্শনকামী ভক্তের নাম জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল' এইরূপ পাওয়া যায়—গদাধর, জগদানন্দ, হরিদাস, মুরারি গুপ্ত, শ্রীনিবাস পণ্ডিত, আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি, গোপীনাথ বিপ্র, চন্দ্রশেখর, নন্দনাচার্য্য, বক্রেশ্বর, দামোদর, কাশীশ্বর, পাটুয়া শ্রীধর, ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর, শ্রীগর্ভ, কাটা গঙ্গাদাস, ভগাই গঙ্গাদাস, লেখক জগাই, গোবিন্দ, মুকুন্দা-নন্দ, বাসুদেব দত্ত, বিষ্ণুপুরী প্রভৃতি। চৈতন্যচরিতামৃতে সময়ে শান্তিপুরে উপস্থিত ভক্তগণের নাম এইরূপ লিখিত আছে—শ্রীবাস, রামাই, বিদ্যানিধি, গদাধর, গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, মুরারি, শুক্লাম্বর, বুদ্ধিমন্ত খাঁন, নন্দন, শ্রীধর, বিজয়, বাসুদেব, দামোদর, মুকুন্দ, ইত্যাদি; এবং শান্তিপুর ত্যাগের পর পুরীর পথে মহাপ্রভুর সঙ্গিগণ এইরূপ ছিলেন লিখিত আছে—নিত্যানন্দ গোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত। 'চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত মহাপ্রভুর পুরীপথের সঙ্গীর নাম এইরূপ—নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গোবিন্দ দাস বর্ণিত মহাপ্রভুর ভক্ত ও সঙ্গিগণের নাম বিভিন্নরূপ। সে যাহা হউক, অদ্বৈতাচার্য্যের দাড়ী-প্রসঙ্গে দীনেশবাবু লিখিতেছেন, "দেববিগ্রহ নির্ম্মাণ করিতে গেলে আধুনিক যুগে দাড়ী দেওয়ার রীতি নাই। অদ্বৈতাচর্য্যের দাড়ী ছিল ইহা শুনিয়া খড়দহের এক গোস্বামী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কারণ শান্তিপুরে অদ্বৈতবিগ্রহের দাড়ী নাই। যাঁহারা দেবতা, তাঁহাদের কৈশোর-মূর্ত্তি কল্পনা করাই এ দেশের আধুনিক রীতি। কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্যের যে দাড়ী ছিল তাহা শুধু করচায় নহে, অনেক প্রাচীন পদেও পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, ৭৫৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্র দ্রষ্টব্য।" মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অদ্বৈত প্রভুর 'পাকা দাড়ী লাল মুখের' কথা লিখিয়াছিলেন। (১)

শান্তিপুরের সুকবি ও সাহিত্যিক মৌলবী শ্রীমোজাম্মেল হক্ বাং[illegible] [illegible]নবদ্বীপ-সম্বন্ধে [illegible] বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা করচার নব-সংস্করণে উদ্ধৃত [illegible] ইহা মহাপ্রভুর শান্তিপুরাগমনের পথ বুঝিবার কতকটা সুবিধাজনক হইতে পারে। করচার ভূমি[illegible] এইরূপ আরও বহুতর প্রসঙ্গ সমালোচিত হইয়াছে। দীনেশবাবু করচাকে ঐতিহাসিক ও চৈতন্যচরিতামৃতকে দার্শনিক গ্রন্থ হিসাবে কত উচ্চ স্থান দিয়াছেন তাহা দ্রষ্টব্য। তিনি লিখিয়াছেন যে, ভক্তের প্রাণে ব্যথা দেওয়ায় তাঁর আদৌ ইচ্ছা ছিল না বা নাই। করচায় চৈতন্যদেবের নরলীলার যে বর্ণনা আছে তাহা অতুলনীয় এবং সেই জন্যই তিনি ইহাকে এত বড় করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি করচার কতিপয় দোষেরও উল্লেখ করিয়াছেন। করচার প্রতি তাঁহার উচ্চ ধারণার বিবরণ উদ্ধৃত হইল—"করচা ৩০ বৎসর আমার অপরিহার্য্য সঙ্গী। প্রতি পত্রের উপর আমার শত শত অশ্রু বর্ষিত হইয়াছে। পদ্মফুল ফুটিলে যেরূপ সৌরভে দিক্ আমোদিত করে, করচা-প্রদত্ত মহাপ্রভুর কাহিনী তেমনি তাঁহার স্বর্গীয় প্রেম ও লীলামাধুরীতে ভরপুর। এই বই যে দিন আমি প্রথম পড়িয়াছিলাম, সে দিন আমার একটা স্মরণীয় দিন। সে দিন আমার কর্ণে যে দেবলীলার গীতি শ্রুত হইয়াছিল তাহার রেশ এখনও বাজিতেছে। করচা আমাকে চৈতন্যপ্রভুর যে স্বরূপ দেখাইয়াছে, অন্যত্র কোথাও তাহা পাই নাই। নানা জটিল অবতারবাদ স্থাপনের চেষ্টা ও কুহকের মধ্যে অন্যত্র মহাপ্রভুর জীবনের আভাসমাত্র পাওয়া যায়। কাদম্বিনী-পংক্তির মধ্যে ক্ষণস্ফুরিত বিদ্যুদ্দামের মত সেই আভাস পরক্ষণেই নানারূপ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের চেষ্টা ও অবতার-বাদের কুজ্ঝটিকার মধ্যে বিলীন হইয়া পড়ে; কিন্তু করচায় এই প্রেমের পাগলকে একবার দেখুন। ইনি যেন এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে স্বপ্রকাশ হইয়াছেন। এই পুস্তক আমার নিকট মহাপ্রভুর পাদপীঠের বেদীস্বরূপ।... জগতের আর কোথায়ও আর কোন সম্প্রদায়ের 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র ন্যায় এরূপ দর্শনাত্মক ধর্ম্মগ্রন্থ আছে কি না জানি না। কিন্তু তাই বলিয়া ইতিহাস হিসাবে ইহার দাবীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে পারা যায় না। যেরূপ অগ্নির সম্মুখীন হইলে চক্ষু বুজিয়া তাপ দ্বারাই অগ্নির অস্তিত্ব বুঝা যায়, সেইরূপ 'করচার' অপূর্ব্ব প্রেম-মাদকতাই আমার নিকট

---

(১) সদ্গুরুসঙ্গ।

...প্রকৃত... তান যে গোবিন্দ আঁকিয়াছেন, তাহার তাহার প্রধান। যে ভৌগোলিক চিত্র তিনি দিয়াছেন তাহাই র প্রধান সাক্ষী।"

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনও উদ্ধৃত ল—"বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চননগর গ্রামনিবাসী কর্ম্মকার-জাতীয় গোবিন্দ দাস ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে পত্নী শশিমুখীর সহিত কলহ করিয়া গৃহত্যাগ করেন। তিনি ... দেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং ... ছিলেন। দক্ষিণাপথে তীর্থযাত্রাকালে গোবিন্দ চৈতন্যদেবের সহচর ছিলেন। তিনি গোপনে তীর্থযাত্রা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন।" (১)

১। বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় ভাগ।

আলাপ-আলোচনা

ভারতবর্ষীয়ের সম্মানপ্রাপ্তি

সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো শহরের 'কালিফোর্ণিয়া একেডমি অফ্ সায়েন্স'-এর কর্তৃপক্ষেরা ভারতের 'জুলাজিকাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া'র অস্থায়ী অধ্যক্ষ ডাঃ বেণীপ্রসাদকে তাঁহাদের অবৈতনিক সভ্য পদে মনোনীত করিয়াছেন। শঙ্খ-শম্বুকাদি-বিষয়ক বিজ্ঞানে তাঁহার গবেষণার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তিনি বিজ্ঞানের এই বিভাগে অনেক নূতন সত্যের সন্ধান দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতবাসী এ সম্মানার্হ পদ পান নাই।

উত্তর-ভারতের লবণ-পর্ব্বতমালায় অভিযান

আমেরিকার ইয়েল-বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে তথাকার ...দায় অধ্যাপক হেলমুত দে তেরার কর্তৃত্বাধীনে উত্তর-ভারতের লবণ-পর্ব্বতমালা ('সল্ট রেঞ্জ') নামক পর্ব্বত শ্রেণীর ভূতত্ত্ব ও প্রাচীন জীবজন্তু-বিষয়ক সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটী অভিযান ... প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহারা গত ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছেন, সেখান হইতে তিনি লাডাক প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধান করিবার জন্য শ্রীনগর যাত্রা করিবেন। উক্ত বিষয়ের কোন বিশেষজ্ঞ এ সকল স্থানে ইতিপূর্ব্বে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করেন নাই। সেইজন্য অধ্যক্ষ মহাশয় বলেন যে, এ সব জায়গা খনন করিলে এমন অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে যাহা দ্বারা আদিম মানবের ক্রম-বিকাশ-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। অধ্যক্ষ মহাশয় ব্যতীত এই অভিযানে তাঁহার পত্নী, প্রাণীতত্ত্ববিদ অধ্যাপক জি, ই, হাচিন্সন, পুরাতত্ত্ব জীব-জন্তু-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জি, ই, লিউস্ আছেন।

JEWEL OF INDIA
CALCUTTA